বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস

আদি হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত

শ্রীসুকুমার সেন, এম্-এ, পিএইচ্-ডি
অধ্যাপক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

মডার্ণ বুক এজেন্সী
১০, কলেজ স্কোয়ার
কলিকাতা

ওঁ

Mangpoo P.O.
(Darjeeling Dist

কল্যাণীয়েষু

কিছুকাল থেকে দৃষ্টি-
ক্ষীণতাবশত ছাপার বা লেখার অক্ষর পড়া
ওটা আমার পক্ষে দুঃসাধ্য হয়েছে।
কিন্তু শ্রীমান সুকুমার সেনের রচিত বাঙ্গালা
সাহিত্যের ইতিহাসের মুদ্রিত যে অংশটুকু
আমার হাতে এসেছে ধীরে ধীরে তা আমি
পড়ে শেষ করেছি। শেষ পর্যন্ত
আমার ঔৎসুক্য জাগরূক ছিল। বাংলা
সাহিত্যের সমগ্র পরিচয়ের এমন পরিপূর্ণ চিত্র
ইতিপূর্বে আমি পড়িনি। গ্রন্থকার
তাঁর বিবৃতির সঙ্গে সঙ্গে আলোচিত পুস্তক
গুলি থেকে যে দীর্ঘ অংশ সকল উদ্ধৃত করে দিয়েছেন

তাতে করে ওঁর গ্রন্থ এক সঙ্গে ইতিহাস এবং
সঙ্কলনে সম্পূর্ণরূপ হয়েছে। সেই জন্যে এই
গ্রন্থ ছাত্রদের প্রয়োজন সিদ্ধ করবে এবং সাহিত্যরসসম্ভোগে
পরিতৃপ্তি দেবে। এই গ্রন্থে সাহিত্যের ইতিহাস
বাংলাদেশের রাষ্ট্রিক ও সামাজিক ইতিহাসের
পটভূমিকায় স্থাপিত হওয়াতে রচনার মূল্যবৃদ্ধি
করেছে। গ্রন্থকারকে আমার সকৃতজ্ঞ অভিনন্দন
জানাই।

* * *

ইতি ৪।৫।৪০ তোমাদের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

যাঁহার মধ্যে ক্ষণে ক্ষণে
অসাধারণকে প্রত্যক্ষ করিয়া
ধন্য হইয়াছি তাঁহার স্মরণে

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসকে যথাসম্ভব কালানুক্রমিক এবং objective বা বস্তুগত ভাবে বর্ণনা করা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের প্রধান উদ্দেশ্য। ইতিপূর্ব্বে এই বিষয়ে যে সব নিবন্ধ ও গ্রন্থ রচিত হইয়াছে সেগুলির মূল্য কিছুমাত্র খর্ব্ব না করিয়াও বলা যাইতে পারে যে সেসকল হয় অসম্পূর্ণ, নয় subjective বা অ-বস্তুগত। দেশের ইতিহাসের যথার্থ ধারণার অভাবও আমার পূর্ব্ববর্ত্তিগণের মূল্যবান্ লেখার অন্যতম ত্রুটি বটে। সত্যকথা বলিতে কি, বাঙ্গালা দেশে তথা বাঙ্গালা সাহিত্যে "বৌদ্ধ" "শৈব" "ব্রাহ্মণ্য" "বৈষ্ণব" "ঐস্লামিক" ইত্যাদি যুগবিভাগ একেবারে কাল্পনিক। একথাও বলিয়া রাখা ভাল যে আমি ইংরেজি সাহিত্যের ইতিহাস গ্রন্থের অনুসরণ করি নাই, কেন না আধুনিক-পূর্ব্ব বাঙ্গালা সাহিত্যে কেবলই খাড়া-বড়ি-থোড়ের গতানুগতিকতা, ইংরেজি সাহিত্যের উদার প্রসার ও অনুপম ঐশ্বর্য্যের সঙ্গে তুলনা হইতে পারে না।

বর্ত্তমান গ্রন্থ বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের প্রথম খণ্ড, ইহাতে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি পৌছানো গেল। প্রাচীন ধারার শেষ এইখানেই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের গদ্য লেখকদের কথা অতি সংক্ষেপেই সারিয়াছি। ইহার দুইটি কারণ, প্রথমতঃ সাহিত্য হিসাবে এই সব পাঠ্যপুস্তকের মূল্য যৎকিঞ্চিৎমাত্র, এবং দ্বিতীয়তঃ মুদ্রিত গ্রন্থ অপেক্ষাকৃত সহজপ্রাপ্য বলিয়া হস্তলিখিত পুঁথিতে পর্য্যবসিত নিবন্ধের মত বিস্তৃত আলোচনা অত্যাবশ্যক মনে করি নাই। মদীয় বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য (১৩৪১) গ্রন্থে ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকের গদ্য সাহিত্যের বিস্তৃততর পরিচয় মিলিবে।

অন্যান্য কবিদের তুলনায় বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের আলোচনাও যথাসম্ভব সংক্ষেপে সারিয়াছি। ইহারও দুইটি কারণ, প্রথমতঃ মৎপ্রণীত A History of Brajabuli Literature (১৯৩৫) গ্রন্থে বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ আলোচনা আছে, দ্বিতীয়তঃ অন্যান্য কবিদিগের মত করিয়া বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের আলোচনা করিতে

গেলে বইয়ের আকার দ্বিগুণিত হইয়া পড়ে। সেইজন্য বৈষ্ণব কবিদের আলোচনায় যথাসম্ভব পুনরুক্তি বর্জ্জন করিয়াছি।

এই গ্রন্থের কিছু অংশ বঙ্গশ্রী ও অন্যান্য পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। বর্দ্ধমান সাহিত্যসভার মাসিক অধিবেশনেও কিছু কিছু অংশ পঠিত হইয়াছিল।

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের মালমসলা সংগ্রহে আমার পূর্ব্ববর্ত্তী মনীষীদিগের কৃতিত্ব অসাধারণ। ইহাদের কেহ কেহ সুপরিচিত, কাহারো কাহারো নাম ঈষৎ পরিচিত, কিন্তু অধিকাংশের নাম হয়ত এখনকার দিনের পাঠকসমাজের অজ্ঞাত। ইঁহারা নমস্য, কেননা যেকালে ইহারা প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের অনুসন্ধান কার্য্যে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন তখন তাহাতে খেতাব অথবা জীবিকা কিছুই লাভ হইত না, বাঙ্গালা সাহিত্যের উপর অপরিসীম অনুরাগই ইহাদিগকে প্রেরণা যোগাইয়াছিল।

যেসকল প্রবন্ধ অথবা গ্রন্থ হইতে আমি উপাদান সংগ্রহ করিয়াছি তাহার উল্লেখ যথাস্থানে সর্ব্বদাই করিয়াছি, কিন্তু পাদটীকার কলেবরবৃদ্ধির আশঙ্কায় সর্ব্বত্র ইহাদের নাম উল্লেখ করা সম্ভবপর হয় নাই। এখানে একত্র সকলের নাম করিয়া আমার শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা নিবেদন করিতেছি।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়, রামগতি ন্যায়রত্ন, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, দীনেশচন্দ্র সেন, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, নগেন্দ্রনাথ বসু, অম্বিকাচরণ গুপ্ত, অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী, ঈশানচন্দ্র বসু, রসিকচন্দ্র বসু, ব্যোমকেশ মুস্তফী, রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী, শিবরতন মিত্র, শিবচন্দ্র শীল, কালিদাস নাথ, সতীশচন্দ্র রায়, বিনোদ-বিহারী কাব্যতীর্থ, নীলরতন মুখোপাধ্যায়, রমণীমোহন মল্লিক, হরগোপাল দাস-কুণ্ডু, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ, শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী, শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী তত্ত্বনিধি, শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, শ্রীযুক্ত মধুসূদন অধিকারী, শ্রীযুক্ত পূর্ণেন্দুমোহন সেহানবীশ, শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত, শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য, শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন।

আমার পূজনীয় শিক্ষাগুরু শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, ডি-লিট্, এফ্-আর্-এ-এস্-বি মহাশয়ের নিকট এই গ্রন্থ রচনায় বিশেষ সাহায্য পাইয়াছি। অনেকগুলি প্রুফ শীটও তিনি দেখিয়া দিয়াছেন। অনুজকল্প শ্রীমান্ সত্যেন্দ্রনাথ ঘোষাল, এম্-এ নির্ঘণ্ট সঙ্কলনে সবিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। আমার ভূতপূর্ব্ব ছাত্রদ্বয় শ্রীমান্ জানকীনাথ বসু, এম্-এ এবং শ্রীমান্ বিভূতিভূষণ ভট্টাচার্য্য এম্-এ সহায়তা না করিলে বইটি চারি মাসের মধ্যে বাহির হইত না। এ বিষয়ে কে. পি. বসু প্রিন্টিং ওয়ার্কসের কর্ত্তৃপক্ষ ও কর্ম্মচারিবৃন্দকেও ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিতেছি।

বইটির মুদ্রিত কতক অংশ (৭৫২ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত) দেখিয়া রবীন্দ্রনাথ তাঁহার যে অভিমত শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে লিখিত পত্রে জানাইয়াছেন তাহা বহুমান্য শিরোভূষণ করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

শ্রীসুকুমার সেন

বিশ্ববিদ্যালয়,
কলিকাতা
৮ই জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৭।

প্রথম পর্ব্ব

দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী

দ্বিতীয় পর্ব্ব

ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

তৃতীয় পর্ব্ব

পঞ্চদশ শতাব্দী

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

চতুর্থ পর্ব্ব

ষোড়শ শতাব্দী

পঞ্চম পর্ব্ব

সপ্তদশ শতাব্দী

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

ষড়্বিংশ পরিচ্ছেদ

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

নামা কবির রচিত বিবিধ অনুবাদ নিবন্ধ—স্বনিয়মদশক—চাটু-পুষ্পাঞ্জলি—চৈতন্যচন্দ্রামৃত—রসময় দাসের গীতগোবিন্দ—রঘুনাথ দাসের গীতগোবিন্দ—ভগবান্ দাসের গীতগোবিন্দ—অজ্ঞাতনামা কবিরচিত জয়দেবপ্রসাদাবলী—বৈষ্ণবচরণ দাসের শ্রীরূপমঞ্জরীপাদ-প্রার্থনা—নীলাম্বর দাসের সংগৃহীতসুধাসার—কিশোরীদাসেব অতি-দীন-শ্লোকার্থসিন্ধুর বিন্দুপ্রকাশ—গোবিন্দদাসের নিগমগ্রন্থ (গৌরাখ্যান)—গোপাল দাসের জগন্নাথবল্লভনাটক ভাষা—কৃষ্ণচন্দ্র দাসের বিলাপবিবৃতিমালা—ভবানীদাসের রামরত্নগীতা—কাব্যেব সূচী—যবনোৎপত্তিবিবরণ—কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামিত বিবিধ নিবন্ধ—স্বরূপবর্ণনে কৃষ্ণদাসের কথা—মুকুন্দদাসের বিবিধ নিবন্ধ—অমৃতরত্নাবলী—ব্রহ্মহরি দাসের নিবন্ধ—ধর্ম্মঠাকুর কর্ত্তৃক সৃষ্টিপত্তন বিবরণ—শঙ্কর দাসের যমপ্রজাসংবাদ (যমসংহিতা)—শঙ্কর দাসের দোললীলা—"পাগল" শঙ্করের পদাবলী—শ্যামানন্দ দাসের সাধনবর্ত্ম—রামচন্দ্র দাসের সিদ্ধান্তচন্দ্রিকা—অকিঞ্চন দাসের ভক্তিরসাত্মিকা (ভক্তিরসকারিকা বা চৈতন্যভক্তিতত্ত্ববিলাস) ও ভক্তিরসালিকা—রতিরাম দাসের সারগীতা—শ্যামদাস—রতিরামের নিবন্ধে সৃষ্টি-কাহিনী—পদাবলী—নন্দকিশোর দাসের বৃন্দাবনলীলামৃত—জয়কৃষ্ণ-দাসের তত্ত্বসার—রসিকানন্দের লীলামৃতরসপূর—নয়নানন্দের প্রেয়োভক্তিরসার্ণব ও ভক্তিমাধ্বীকণা—অচ্যুতদাসের গোপীভক্তি-রস—রাধাকৃষ্ণ দাসের রসভক্তিলহরী—সূচী—"দ্বিজ" শ্যামদাসের আত্মজিজ্ঞাসা—যুগলকিশোর দাসের চৈতন্যরসকারিকা—যুগল-কিশোর দাসের প্রেমবিষয়বিলাস—গৌরীদাসের নিগূঢ়ার্থপ্রকাশা-বলী—যুগলদাসের আগমগ্রন্থ—বলরাম দাসের সারাবলী—বৈষ্ণব-বিধান (বৈষ্ণবচরিত)—শ্যামানন্দের অদ্বৈততত্ত্ব—"দুঃখী" কৃষ্ণদাসের বৃন্দাবনপরিক্রমা—স্বরূপের উপাসনাপটল—প্রেমানন্দ দাসের চন্দ্র-চিন্তামণি—হরিদাসের চৈতন্যমহাপ্রভু—নরহরির নামামৃত—রসময়

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

রামায়ণ ও মহাভারত পাঁচালী

পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

একপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

ত্রিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

চতুঃপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

সপ্তম পর্ব্ব

ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ

শনির পাঁচালী—শীতলামঙ্গল—ছোটখাট ব্রতকথা—স্থানীয় দেবদেবী ও তীর্থস্থান মাহাত্ম্য কাব্য—রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগীর গোসানীমঙ্গল।

সপ্তপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণায়ন, বিবিধ পৌরাণিক এবং বৈষ্ণব নিবন্ধ ও পদাবলী ১০০১-১০১৮

বিবিধ রামচরিত কাব্য—রামানন্দ—জগৎমোহন—কমললোচন দত্ত—পরিচয়—রঘুনন্দন গোস্বামী—পরিচয়—রামরসায়ন কাব্যের পরিচয়—রাধামাধবোদয়—রচনাকাল—গীতমালা— পরিচয়— মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের সভাকবিদিগের গ্রন্থ—জয়নাথ মুনশীর রাজোপাখ্যান—শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অবলম্বনে রচিত কাব্য—গয়ারাম দাসের ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ—রামলোচন দাসের ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ও কল্কিপুরাণ—উপেন্দ্রনাথ মিত্রের শ্রীমদ্ভাগবত—পরিচয়—"দ্বিজ" রামকুমারের ভাগবত — বিশেযত্ব — "দ্বিজ" পীতাম্বরের রাসপঞ্চাধ্যায় ও ক্রিয়াযোগসার—কবিরতনের পূর্ণানন্দগীতা—বিবিধ কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য—শিশুরাম দাসের প্রভাসখণ্ড—পরিচয়—বদনচন্দ্র পালিতের নারদসংবাদ—নারায়ণ চট্টরাজ বিরচিত কৃষ্ণলীলারসোদয়—"দ্বিজ" বিশ্বনাথের কৃষ্ণকেলিকল্পলতা—সূচী—ঈশানচন্দ্র দে রচিত কাব্য—কুশদেব পালের হরিবিলাসসার—পরিচয়—গোপাল বসুর রাধাকালী—দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের মুক্তালতাবলী—পরিচয়—বনোয়ারিলাল রায়ের দ্বারকাকেলিকৌমুদী—পীতাম্বর সেনের উষাহরণ—কেবলকৃষ্ণ বসুর কাশীখণ্ড—ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশের হরিভক্তিবিলাস (ভাষা)—হিন্দীভক্তমালা অবলম্বনে রচিত কাব্য—জগন্নাথ দাসের ভক্তচরিতামৃত—বিদ্যাপতির কাহিনী—চণ্ডীদাসের কাহিনী—চণ্ডীদাসের পদ—গঙ্গাগোবিন্দ সিংহের কাহিনী—প্রতাপ মণ্ডলের কাহিনী—কৃষ্ণদাসের ভক্তমাল—রসশাস্ত্রের নির্য্যাস—কৃষ্ণদাসের পদ—

দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী

প্রথম পরিচ্ছেদ

উপক্রমণিকা

বঙ্গ জাতি হইতে দেশবাচক বঙ্গ নামের উৎপত্তি। বঙ্গ জাতি তথা বঙ্গ শব্দের প্রাচীনতম উল্লেখ রহিয়াছে ঐতরেয় আরণ্যকে সেখানে বলা হইয়াছে যে, তিনটি জাতি নষ্ট হইয়া গিয়াছিল. এবং এই তিন জাতি হইতেছে পক্ষী, অর্থাৎ পক্ষিসদৃশ যাযাবর (মতান্তরে পক্ষীর ন্যায় অব্যক্তভাষী, অথবা পক্ষীর "টোটেম্" অর্থাৎ আদিপুরুষরূপে কল্পিত পক্ষিবিশেষের চিহ্নধারী)—বঙ্গ, বগধ এবং চেরপাদ।

প্রজা হ তিস্রঃ অত্যায়মীয়ুরিতি যা বৈ তা ইমাঃ প্রজা স্তিস্রঃ অত্যায়মায়ং স্তানীমানি বয়াংসি বঙ্গা বগধাশ্চেরপাদাঃ। ২-১-১-৫।

ক্রমশঃ পূর্ব্বদিকে হটিতে হটিতে এই যাযাবর বঙ্গ জাতি এখন যে স্থানকে পূর্ব্ববঙ্গ বলা হয় তথায় বাস করিতে থাকে, তাহা হইতেই পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন নাম হয় বঙ্গ। বর্ত্তমান কালে এই নাম সমগ্র বাঙ্গালাদেশ বুঝাইতে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু কিছুকাল পূর্ব্বেও শুধু পূর্ব্ববঙ্গ বুঝাইতেই বঙ্গ শব্দের চল ছিল। মেয়েলী ছড়ায় বলে—"তুমি যাও বঙ্গে কপাল যায় সঙ্গে।" ১৮৬০ সালের দিকে মধুসূদন লিখিয়াছেন—"অলীক কুনাট্যরঙ্গে মজে লোক রাঢ়ে বঙ্গে।"

রাঢ় ও সুহ্ম জাতির নাম হইতে পশ্চিমবঙ্গের নাম হয় রাঢ় ও সুহ্ম দেশ। রাঢ় ও সুহ্ম (প্রাকৃতে "সুত্ত") দেশের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় জৈনদিগের আয়ারঙ্গ-সুত্ত বা আচারাঙ্গ-সূত্রে। ইহাতে এই দেশের শয়ন, আসন, ভোজন ও আচরণের নিন্দা করা হইয়াছে। ইহা হইতে আরও জানিতে পারি যে, জৈন শ্রমণদিগের প্রতি রাঢ়-সুহ্মের লোকেরা মোটেই প্রসন্ন ছিল না।

অহ দুচ্চর-লাঢং অচারী বজ্জভূমিং চ সুব্ভভূমিং চ।
পন্তং সেজ্জং সেবিংসু আসণগাইং যেব পন্তাইং ॥
লাঢেহিং তস্সুবসগ্গা বহবে—জাণবয়া লূসিংসু।
অহ লুক্খদেসিএ ভত্তে কুক্কুরা তত্থ হিংসিংসু নিবইংসু ॥
অপ্পে জণে নিবারেই লূসণএ সুণএ ডসমাণে।
ছুচ্ছুক্ কারেন্তি আহন্তুং সমণং কুক্কুরা ডসন্তু ত্তি ॥
এলিক্খএ জণে ভুজ্জো বহবে বজ্জভূমিং ফরুসাসী।
লট্‌ঠিং গহায় নালীয়ং সমণা তত্থ এব বিহরিংসু ॥
এবং পি তত্থ বিহরন্তা পুট্‌ঠ-পুব্বা অহেসি সুণএহিং।
সংলুঞ্চমাণা সুণএহিং—দুচ্চরগাণি তত্থ লাঢেহিং ॥

৯-৩-২—৬ ॥

বঙ্গ, রাঢ ও সুহ্ম জাতি আর্য্যেতর ছিল বলিয়াই মনে হয়; অন্ততপক্ষে ইহারা যে আর্য্য ছিল, এমন কোন প্রমাণ নাই।

বাঙ্গালাদেশে আর্য্যদিগের উপনিবেশ প্রথম স্থাপিত হয় বরেন্দ্র ভূমিতে এবং রাঢ়ের কোন কোন অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া ভাগীরথী ও দামোদরের তীবভূমিতে। বরেন্দ্রী বা বরেন্দ্র ভূমির প্রাচীন নাম পুণ্ড্র বা পুণ্ড্রবর্দ্ধন। এই স্থানের অধিবাসী (?) পুণ্ড্রদিগের উল্লেখ ঐতরেয় ব্রাহ্মণে (৭-১৮) পাওয়া যাইতেছে। এখানে অন্ধ্র, পুলিন্দ, শবর প্রভৃতি ব্রাত্য বা অন্ত্যজ দস্যুভূয়িষ্ঠ জাতিদিগের মধ্যে পুণ্ড্রগণের নাম করা হইয়াছে।

এখনও পুঁড় বা পুঁড়ো নামে জাতি এই ব্রাত্য পুণ্ড্রদিগের স্মৃতি জাগাইয়া রাখিয়াছে। বোধ হয় এই পুণ্ড্রজাতি আখের চাষে বিশেষ দক্ষ ছিল, এবং ইহাদের নাম হইতেই আখের নাম হইয়াছে পুঁড় এবং এক জাতীয় দেশী আখের নাম পুড়ী। অথবা এমনও হইতে পারে যে, "পুণ্ড্র" ইক্ষুর প্রতিশব্দ ছিল, পরে যাহারা আখের চাষ করিত তাহারা পুণ্ড্র নামে পরিচিত হয়। বরেন্দ্র ভূমির নামান্তর গৌড়। ইহা যদি গুড় শব্দজাত হয় তাহা হইলে এখানেও আখ-চাষের ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু

শব্দটি বোধ হয় গোণ্ড-জাতির নামের প্রাচীন রূপ হইতে আসিয়াছে। পাণিনি তাঁহার ব্যাকরণের একটি সূত্রে এই গৌড় দেশস্থিত গৌড়পুরের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া অনেকে অনুমান করেন—"অরিষ্টগৌড়-পূর্ব্বে চ" (৬-২-১০০)—অর্থাৎ অরিষ্ট ও গৌড় শব্দকে পূর্ব্বপদ করিয়া পুব শব্দের সমাস হইলে পূর্ব্বপদ অন্ত্যোদাত্ত হইবে। কিন্তু এই গৌড়পুর যে পূর্ব্বভারতে অবস্থিত ছিল না, তাহা ইহার অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী সূত্র হইতে জানা যাইতেছে—"পুরে প্রাচাম্", অর্থাৎ প্রাচ্যদেশে (অথবা, প্রাচ্যদেশীয় বৈয়াকরণদিগের মতে) পুর শব্দ পরে রাখিয়া সমাস করিলে পূর্ব্বপদ অন্ত্যোদাত্ত হইবে। "অরিষ্টগৌড়পূর্ব্বে চ" সূত্রটি "পুরে প্রাচাম্"-সূত্রের অপবাদ। সুতরাং এই গৌড়পুর পূর্ব্বদেশে অবস্থিত ছিল না নিশ্চয়ই। আরও একটি কথা, যখন স্বরের ব্যবস্থা রহিয়াছে তখন গৌড়পুর বৈদিক যুগের নগর ধরিতে হইবে, এবং এই স্থানের সহিত উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের আর্য্যেরা বিশেষ পরিচিত ছিলেন তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। তাহা হইলে এই স্থানকে পূর্ব্বভারতে টানিয়া আনা সঙ্গত হয় না।

গৌড় শব্দ সাধারণতঃ বরেন্দ্রভূমিকে বুঝাইলেও অনেক সময় রাঢ় ও সুহ্ম ভূমির সহিত বরেন্দ্রভূমিকে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গ বাদ দিয়া সমগ্র বাঙ্গালাদেশকে বুঝাইত।

বাঙ্গালা দেশ আর্য্যেতর জাতির দ্বারা অধ্যুষিত ছিল বলিয়া এদেশে আগমন ও বসতি করা উত্তর-ভারতের আর্য্যদিগের পক্ষে বহুদিন অবধি নিষিদ্ধ ছিল। এদেশে আসিলে প্রায়শ্চিত্ত না করিয়া কেহ স্বসমাজে গৃহীত হইত না। যাহারা এদেশে রহিয়া যাইত তাহারা ব্রাত্য, নষ্ট বা পতিত বলিয়া গণ্য হইত। বৈদিক যুগে বাঙ্গালা দেশে উপনিবিষ্ট আর্য্যের অস্তিত্ব থাকিলে তাহাদের সংখ্যা নিশ্চয়ই নিতান্ত অল্প ছিল। এদেশে ব্যাপকভাবে উপনিবেশ স্থাপন মৌর্য্যযুগেই আরম্ভ হয়। প্রথমে বরেন্দ্রভূমিতে এবং রাঢ়ের প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাহারা উপনিবিষ্ট হয়, তাহাদের বেশী ভাগ ছিল জৈনমতাবলম্বী। জৈনধর্ম্মের মূল কেন্দ্র মগধ বরেন্দ্রভূমি হইতে সুদূর নহে,

সেইজন্য জৈনধর্ম্ম এই অঞ্চলে সর্ব্বপ্রথম প্রসার লাভ করে। দিব্যাবদানে[১] আছে যে, অশোকের সময়ে পুণ্ড্রবর্দ্ধন জৈনধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল।

রাঢ-সুহ্মে অসভ্যজাতির প্রাচুর্য্য থাকায় এবং দেশ দুর্গম হওয়ায় এই অঞ্চলে জৈনধর্ম্ম তত বেশী প্রসার লাভ করিতে পারে নাই। জৈন-মতের পর বৌদ্ধমত এবং সর্ব্বশেষে ব্রাহ্মণ্যমত বাঙ্গালাদেশে প্রাধান্য লাভ করে। রাঢ় ও বরেন্দ্র ভূমিতে আর্য্য সংস্কৃতি আসিবার অনেক কাল পরে, সম্ভবতঃ এই দুই স্থান হইতে, বঙ্গে অর্থাৎ পূর্ব্ববঙ্গে ইহা বিস্তার লাভ করে। এই কারণে সংস্কৃতি ও সভ্যতায় পশ্চিমবঙ্গের তুলনায় যথেষ্ট পশ্চাৎপদ থাকায় পূর্ব্ববঙ্গের অধিবাসী, 'বঙ্গাল' বা 'বাঙ্গাল', আবহমানকাল সাহিত্যে ও লোকব্যবহারে উপহাসের পাত্র বলিয়া পরিগণিত হইয়া আসিয়াছে।

১৫৯ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ ৪৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ ও পাহাড়পুরের স্তূপমধ্য হইতে প্রাপ্ত অনুশাসনখানি[২] হইতে জানা যায় যে, খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকেও বরেন্দ্রভূমিতে জৈনমতাবলম্বী শ্রমণ-শ্রাবকের অসদ্ভাব ছিল না। ব্রাহ্মণ নাথশর্ম্মা ও তাঁহার ভার্য্যা রামী স্বগ্রাম বটগোহালী-স্থিত "কাশিক-পঞ্চ-স্তূপনিকায়িক-নির্গ্রন্থ-শ্রমণাচার্য্য-গুহনন্দি-শিষ্যপ্রশিষ্যাধিষ্ঠিতবিহারে" ভগবান্ অর্হৎদিগের উদ্দেশে গন্ধ, ধূপ, পুষ্প, দীপ প্রভৃতি পূজোপচার ও তলবাট (অর্থাৎ তৈলবট বা দক্ষিণা) নিমিত্ত দেড় কুল্যবাপ (=কুড়বা, কুড়া) ক্ষেত্র অক্ষয়নীবী (অর্থাৎ আট্‌কিয়া) রূপে দান করিবার উদ্দেশ্যে রাজকর্ম্মচারিগণের অনুজ্ঞা প্রার্থনা করায় পুণ্ড্রবর্দ্ধনস্থিত উচ্চরাজকর্ম্মচারিগণ ও স্থানীয় শাসনপরিষৎ যে অনুজ্ঞা প্রদান করিয়াছিলেন তাহাই এই অনুশাসনটিতে লিপিবদ্ধ হইয়াছে। এই অনুশাসনখানিতে আমরা বাঙ্গালী ভদ্রলোকের নামের প্রাচীনতম উল্লেখ পাইতেছি। ব্রাহ্মণ নাথশর্ম্মা ও তাঁহার স্ত্রী রামীর নাম পূর্ব্বে করিয়াছি। তাহা ছাড়া কয়েকজন 'পুস্তপাল' অর্থাৎ record-keeper বা নথীপত্র-রক্ষকের

১। Cowell ও Neil সম্পাদিত, পৃ ৪২৭।

২। Epigraphia Indica, XX, no. 5; ব-সা-প-প ৩৯, পৃ ১৩৯-১৫২।

নাম পাওয়া যাইতেছে—দিবাকর-নন্দী ('প্রথম পুস্তপাল'), ধৃতি-বিষ্ণু, বিরোচন, রাম-দাস, হরি-দাস, শশি-নন্দী। এই নামগুলি হইতে অনুমান হয় যে, ইঁহারা কায়স্থ ছিলেন। এই জাতীয় নাম ও পদবী (রামদাস ও হরিদাস ছাড়া) এখনও বাঙ্গালী-সমাজ ভিন্ন অন্যত্র প্রচলিত নাই।

দ্বাদশ শতকেও এই স্থানে একটি বৌদ্ধবিহার অবস্থিত ছিল। তখন ইহা সোমপুর বিহার নামে পরিচিত ছিল। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত নালন্দায় প্রাপ্ত বিপুলশ্রী-মিত্রের অনুশাসনে বাঙ্গাল সৈন্য কর্ত্তৃক এই বিহারের ধ্বংস এবং পরে বিপুলশ্রী-মিত্র কর্ত্তৃক সংস্কারের উল্লেখ আছে। বাঙ্গাল সেনা বিহারে অগ্নি প্রদান করে, তাহাতে গৃহাদির সহিত শ্রমণ করুণাশ্রী-মিত্রও বিনষ্ট হন। করুণাশ্রী-মিত্রের শিষ্য মৈত্রশ্রী-মিত্র, তৎশিষ্য অশোকশ্রী-মিত্র, এবং তাহার শিষ্য বিপুলশ্রী-মিত্র।

অনুশাসনটির প্রথম দুই শ্লোক এই—

> অস্তু স্বস্ত্যয়নায় বঃ স ভগবান্ শ্রীধর্ম্মচক্রঃ কিয়দ্
> যন্নাম শ্রুতবান্ ভবোঽস্থিরবপুর্নির্ব্যাজমুত্তাম্যতি।
> তত্র শ্রীঘনশাসনামৃতরসৈঃ সংসিচ্য বৌদ্ধে পদে
> তদ্ ধেয়াদপুনর্ভবং ভগবতী তারা জগত্তারিণী॥
>
> শ্রীমৎসোমপুরে বভূব করুণাশ্রীমিত্রনামা যতিঃ
> কারুণ্যাদ্গুণসম্পদো হিতসুখাধানাদপি প্রাণিনাম্।
> যো বঙ্গালবলৈরুপেত্য দহনক্ষেপাজ্জ্বলত্যালয়ে
> সংলগ্নশ্চরণারবিন্দযুগলে বুদ্ধস্য যাতো দিবম্॥[১]

অনুমান হয়, করুণাশ্রী-মিত্র একাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। এই "বঙ্গালবল" তাহা হইলে কি হরিবর্ম্মদেবের অথবা ভোজবর্ম্মদেবের?

গুপ্ত সম্রাট্‌দিগের সময় হইতেই ব্রাহ্মণ্যমত এদেশে প্রসার লাভ করিতে থাকে। এবং হয়ত এই সময়ের কিছু পূর্ব্ব হইতেই বৌদ্ধ মহাযানমতেরও

১। Epigraphia Indica, XXI, পৃ ৯৭-১০১।

প্রাদুর্ভাব হয়। জৈন, বৌদ্ধ ও ব্রাহ্মণ্য এই তিন মত সমকালে প্রচলিত থাকিলেও বাঙ্গালা দেশে কখনও ধর্ম্মবিরোধ উপস্থিত হইয়াছিল এমন প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। পাহাড়পুর অনুশাসনে দেখিতেছি যে, ব্রাহ্মণ নাথশর্ম্মা জৈনবিহারে অর্হৎদিগের পূজা চিরস্থায়ী করিবার জন্য ভূমিদান করিতেছেন। গুপ্তসম্রাট্‌দিগের রাজত্বকালেও শাসনকর্তৃপক্ষ জৈন ও বৌদ্ধ মঠে ভূমি ও ধন দান করিতেন। পালরাজগণ বৌদ্ধমতাবলম্বী হইলেও ব্রাহ্মণ্যমতের পোষকতা করিতে পরাঙ্মুখ ছিলেন না। বৌদ্ধমতাবলম্বী পালবংশের শেষ সম্রাট্ মদনপালদেবের মহিষী চিত্রমতিকা মহাভারত-শ্রবণের দক্ষিণাস্বরূপ পাঠক-ব্রাহ্মণ বটেশ্বর-স্বামীকে ভূমিদান করিয়াছিলেন।

প্রথম বাঙ্গালী স্বাধীন রাজা হইয়াছিলেন শশাঙ্ক নরেন্দ্রগুপ্ত। ইনি গুপ্তবংশীয় ছিলেন বলিয়া অনেকে মনে করেন। ইঁহার রাজত্ব স্বল্পকালস্থায়ী হইয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে বাঙ্গালায় পালরাজারাই প্রথম স্বাধীন রাজবংশ স্থাপিত করেন। ইঁহাদের আমলে বাঙ্গালী নৃপতি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ভূখণ্ডের উপর আধিপত্য করিয়া গিয়াছেন, এবং ইঁহাদের রাজ্যকালে বাঙ্গালা দেশ আর্য্যাবর্ত্তের মধ্যে বিশিষ্ট দেশ হিসাবে প্রথম পরিগণিত হইয়াছিল। পাল নৃপতিরা বৌদ্ধমতাবলম্বী ছিলেন, পরে ব্রাহ্মণ্যমতের পক্ষপাতী হন। পাল-বংশের পরবর্ত্তী রাজাদিগের মধ্যে শুধু বিক্রমপুরের চন্দ্রবংশীয় রাজারা বৌদ্ধ ছিলেন, কিন্তু এইস্থানে ইঁহাদের অব্যবহিত পরেই যে বর্ম্মরাজারা আসেন তাঁহারা সম্পূর্ণভাবে ব্রাহ্মণ্যমতাবলম্বী ছিলেন।

ব্রাহ্মণ্যমতাশ্রিতেরা পঞ্চোপাসক ছিলেন, ইঁহাদের ইষ্ট দেবতা বিষ্ণু, শিব, চণ্ডী। সেনরাজাদিগের কৌলিক ইষ্টদেবতা ছিলেন শিব। কিন্তু লক্ষ্মণসেনের সকল অনুশাসনই "ওঁ নমো নারায়ণায়" বলিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে; তাহার পর অবশ্য শিবের বন্দনা-শ্লোক আছে। লক্ষ্মণসেন-দেবের তৃতীয় রাজ্যাঙ্কে খোদিত একটি চণ্ডীমূর্ত্তি ঢাকায় পাওয়া গিয়াছে।[১]

১। Inscriptions of Bengal, N. G Majumdar, পৃঃ ১১৬-১৭।

দেবী চতুর্ভুজা, সিংহোপরি আসীনা। দুই পাশে দুই সখী, সম্মুখে উপবিষ্ট তিন ভক্ত বা অনুচর। দক্ষিণ হস্তদ্বয়ে যথাক্রমে পদ্ম ও জলপাত্র (কমণ্ডলু ?) এবং বাম উর্দ্ধহস্তে কুঠার এবং নিম্নহস্তে বরাভয়মুদ্রা; দুই হস্তী শুণ্ডে কলস লইয়া দেবীকে অভিষেক করিতেছে। পাদপীঠে এই লিপি আছে—

শ্রীমল্লক্ষ্মণ | সেন দেবস্য সং৩ | মালদেইস্থত অধিকৃত শ্রীদামোদ্র- | ণ শ্রীচণ্ডীদেবী সমারব্ধা তভ্রাদকণা | শ্রীনারায়ণেন | প্রতিষ্ঠিতেতি ॥

লক্ষ্মণসেন, কেশবসেন ইত্যাদি সেনবংশীয় রাজা ও রাজপুত্রেরা শ্রীকৃষ্ণের বন্দনা ও রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক বহু কবিতা রচনা করিয়া গিয়াছেন।[১]

মল্লিকার্জ্জুন-স্থরী নামক একজন জ্যোতির্বিদ ও গণিতজ্ঞ ১১০০ শকাব্দে অর্থাৎ ১১৭৮ খ্রীষ্টাব্দে লল্লাচার্য্য প্রণীত শিষ্যধীমহাতন্ত্রের একটি টীকা রচনা করেন।[২] টীকার মঙ্গলাচরণে ইনি চণ্ডিকার বন্দনা করিয়াছেন—

শ্রীমৎস্থরাস্থরাধ্যচরণাম্বুরুহদ্বয়াম্।
চরাচরজগদ্ধাত্রীং চণ্ডিকাং প্রণমাম্যহম্ ॥

দ্বাদশ শতাব্দীতে দেখি, বাঙ্গালা দেশে বুদ্ধও বিষ্ণুর অবতারপদবীতে উন্নীত হইয়াছেন; জয়দেব দশাবতারবন্দনার মধ্যে বুদ্ধের উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু ইহা সত্ত্বেও প্রাচীনকালে বাঙ্গালায় বৌদ্ধসমাজ আচারব্যবহারে ব্রাহ্মণ্যসমাজ হইতে অনেকটা স্বতন্ত্র ছিল। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

আর্য্যাবর্ত্তের ধারার অনুসরণে বাঙ্গালা দেশে বিদ্যা ও জ্ঞান চর্চ্চা যথেষ্টই হইত। অনুশাসনগুলি হইতে জানা যায় যে, গুপ্ত, পাল, এবং সেন ও অন্যান্য নৃপতিরা মধ্যদেশবিনির্গত বহু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়া বাঙ্গালা দেশে, রাঢ়ে ও গৌড়ে, বাস করাইয়াছিলেন। এই বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণেরা এদেশে

১। পালরাজাদিগের সময়ে খোদিত বিস্তর উৎকৃষ্ট বাস্থদেব মূর্ত্তি পাওয়া গিয়াছে। পাহাড়পুরে এবং অন্যত্র শ্রীকৃষ্ণলীলাঘটিত প্রস্তরচিত্রাবলী পাওয়া গিয়াছে। নারায়ণপালদেবের মন্ত্রী গুরব ভট্ট গরুড় স্তম্ভ স্থাপন করিয়াছিলেন।

২। ব-সা-প-প ৪০, পৃ ৮৩-৯৪।

আসিয়াও কিছুকাল যাবৎ বেদচর্চ্চা ভুলেন নাই। তবে বাঙ্গালা দেশ মধ্য-দেশ হইতে সুদূর বলিয়া বেদচর্চ্চা এখানে পরিপুষ্টি লাভ করে নাই। বরং চর্চ্চার অভাবে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণের সংখ্যা দিন দিন কমিয়া আসিতেছিল।

ব্যাকরণশাস্ত্রের চর্চ্চাতে সেকালের বাঙ্গালী মনীষীরা যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। উদাহরণ হিসাবে পুরুষোত্তম-দেবের ভাষাবৃত্তি, জিনেন্দ্র-বুদ্ধির ন্যাস ইত্যাদির উল্লেখ করা যাইতে পারে। অভিধান অথবা অভিধানের টীকা রচনায়ও বাঙ্গালীর কৃতিত্ব সামান্য নহে। এ বিষয়ে বন্দ্যঘটীয় সর্ব্বানন্দের নাম সমধিক উল্লেখযোগ্য। সর্ব্বানন্দের বিরচিত অমরকোষের টীকাসর্ব্বস্ব নামক টীকায় প্রায় তিন শতাধিক সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালা প্রতিশব্দ দেওয়া আছে। বাঙ্গালা ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন হিসাবে এই শব্দগুলি যথেষ্ট মূল্যবান।

বৌদ্ধ মহাযান এবং তান্ত্রিক মতের আলোচনা ত হইতই, তাহা ছাড়া সাধারণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণ্যমতের দর্শনাদির আলোচনাতেও যে সেযুগের বাঙ্গালী দার্শনিক পণ্ডিতেরা বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। ভূরিশ্রেষ্ঠি (বর্ত্তমানে হাওড়া জেলায় ভুরশুট) গ্রামনিবাসী পণ্ডিত ভট্ট শ্রীধর ৯১৩ শকাব্দে অর্থাৎ ৯৯১-৯২ খ্রীষ্টাব্দে ন্যায়কন্দলী নামে বৈশেষিক দর্শনের প্রশস্তপাদ-ভাষ্যের একটি অসাধারণ মূল্যবান টীকা রচনা করেন। ইনি স্বীয় পৃষ্ঠপোষক দক্ষিণরাঢ়ের অধিপতি "গুণবত্নাভরণ কায়স্থকুলতিলক" পাণ্ডুদাসের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই পাণ্ডুদাসই বিখ্যাত পাণ্ডুভূমি বিহার প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।

ন্যায়কন্দলীতে শ্রীধর নিজের এই পরিচয় দিয়াছেন—

আসীদ্দক্ষিণরাঢ়ায়াং দ্বিজানাং ভূরিকর্ম্মণাম্।
ভূরিসৃষ্টিরিতি গ্রামো ভূরিশ্রেষ্ঠিজনাশ্রয়ঃ ॥
অম্ভোরাশেরিবৈতস্মাদ্ বভূব ক্ষিতিচন্দ্রমাঃ।
জগদানন্দনাদ্ বন্দ্যো বৃহস্পতিরিব দ্বিজঃ ॥

তস্মাদ্ বিশুদ্ধগুণবত্নমহাসমুদ্রো বিদ্যালতাসমবলম্বনভূরুহোঽভূৎ।
স্বচ্ছাশয়ো বিবিধকীর্ত্তিনদীপ্রবাহপ্রস্পন্দনোত্তমবলো বলদেবনামা॥
তস্যাভূদ্ ভূরিযশসো বিশুদ্ধকুলসম্ভবা।
অব্বোকেত্যর্চ্চিতগুণা গুণিনো গৃহমেধিনী॥
সচ্ছায়ঃ স্থূলফলদো বহুশাখো দ্বিজাশ্রয়ঃ।
তাভ্যাং শ্রীধর ইত্যুচ্চৈরর্থিকল্পদ্রুমোঽভবৎ॥
অসৌ বিদ্যাবিদগ্ধানামসূত শ্রবণোচিতাম্।
ষট্পদার্থহিতামেতাং রুচিরাং ন্যায়কন্দলীম্॥

ইহা হইতে জানা যায় যে, শ্রীধরের পিতা ছিলেন বলদেব, মাতা অব্বোকা (পাঠান্তরে অচ্ছোকা), এবং শ্রীধর ছিলেন কুলপতিসদৃশ আচার্য্য।

দ্বিতায় পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালা দেশে আর্য্য ভাষা ও সাহিত্য

যাহারা বাঙ্গালা দেশে আসিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকে এমন আর্য্যভাষীর দ্বারাই আর্য্যভাষা বাঙ্গালা দেশে সর্ব্বপ্রথম আনীত হয়। সে সময়ে বাঙ্গালা দেশের যাহারা আসল বাসিন্দা ছিল তাহারা দ্রাবিড় অথবা অস্ট্রিক গোষ্ঠীর অন্তর্গত ভাষা বলিত। এই ভাষার কোন প্রাচীন নিদর্শন পাওয়া যায় নাই বটে, কিন্তু স্থান ও গ্রাম প্রভৃতির নাম হইতে এই ভাষার কিছু কিছু পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। গুপ্তসম্রাট্দিগের রাজত্বকালে বাঙ্গালা দেশ প্রায় সম্পূর্ণভাবে আর্য্যভাষীদের দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল, এবং এই সময় হইতে ভাষায়, আচারব্যবহারে ও সংস্কৃতিতে বাঙ্গালা দেশ আর্য্যাবর্ত্তের একতম অংশে পরিণত হইতেছিল। ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যেই বিস্তর অনার্য্যভাষীরা হয় আর্য্যভাষী হইয়া গেল, নয় ক্রমাগত কোণ-ঠেসা হইয়া শেষে প্রত্যন্ত অঞ্চলের পার্ব্বত্য, আরণ্য ও জনবিরল স্থানে আত্মগোপন করিল। সপ্তম শতাব্দীর প্রথমে চীনীয় পরিব্রাজক হিউএন্-ৎসাঙ্ বাঙ্গালা দেশ পরিভ্রমণের সময় গৌড়-বঙ্গ-কামরূপ-রাঢ়ে প্রায় একই ভাষা বলিতে শুনিয়াছিলেন। হিউএন-ৎসাঙের পর্য্যবেক্ষণ অভ্রান্ত হইলে, আমরা বুঝিতে পারি যে, খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর পূর্ব্বেই আর্য্যভাষা অস্ট্রিক ও দ্রাবিড়ীয় ভাষাসমূহকে বাঙ্গালা দেশের কেন্দ্রীয় স্থানসমূহ হইতে দূরীভূত করিয়া দিয়া বাঙ্গালা দেশের জাতীয় ভাষা হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

আর্য্যভাষীরা যখন বাঙ্গালা দেশে উপনিবিষ্ট হয় তখন তাহাদের কথ্য আর্য্যভাষা প্রাকৃত রূপ ধারণ করিয়াছে। অঙ্গ ও মগধ বাঙ্গালার নিকটতম প্রদেশ; এবং বাঙ্গালা দেশে উপনিবেশকারীদিগের অধিকাংশ এই দুই অঞ্চল হইতেই আসিয়াছিল। অঙ্গ ও মগধে যে প্রাকৃত ভাষা বলা হইত

তাহার একটি বিশিষ্ট প্রাদেশিক রূপ ছিল। এই প্রাদেশিক বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন প্রাকৃতকে পূর্ব্বী প্রাকৃত বলা হয়। বররুচি প্রভৃতি বৈয়াকরণ ও দণ্ডী প্রভৃতি আলঙ্কারিকদিগের কথিত যে মাগধী ভাষা তাহা কতকটা এই পূর্ব্বী প্রাকৃতের ছায়াবহ বটে। বাঙ্গালা দেশে যে আর্য্যভাষা প্রবর্ত্তিত হইল তাহা এই পূর্ব্বী প্রাকৃতের প্রকারভেদ মাত্র।

কথ্যভাষা প্রাকৃত হইলেও পোষাকী ভাষা, সাহিত্য ও রাজকার্য্যের ভাষা, ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশেও প্রায় যেমন সেইরূপ বাঙ্গালা দেশেও, সংস্কৃতই রহিয়া গেল। সুতরাং বাঙ্গালা দেশে সৃষ্ট সাহিত্যের সর্ব্বাপেক্ষা পুরাণ নিদর্শনগুলি সবই সংস্কৃতে রচিত।

বাঙ্গালা দেশে প্রবর্ত্তিত পূর্ব্বী প্রাকৃত ক্রমশঃ স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য লইয়া বিবর্ত্তন-বশে বাঙ্গালা ভাষা রূপে পরিণত হয় আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৯৫০ সালের দিকে। স্থূলদৃষ্টিতে দেখিতে গেলে, বাঙ্গালা ভাষার উৎপত্তির পরই বাঙ্গালা সাহিত্যের সৃষ্টি বা সৃষ্টির সম্ভাবনা খুঁজিতে হয়। কিন্তু ব্যাপকদৃষ্টিতে এবং যথার্থ ভাবে দেখিলে ইহা অস্বীকার করা যায় না যে, বাঙ্গালা দেশে যে সাহিত্যসৃষ্টি হইয়াছে তাহা, সংস্কৃত অবলম্বনেই হউক আর প্রাকৃত অথবা বাঙ্গালা অবলম্বনেই হউক, বাঙ্গালা সাহিত্যের আলোচনার বাহিরে পড়িতে পারে না, কারণ তাহাও বাঙ্গালীরই সাহিত্য। আর বাঙ্গালা ভাষা তাহার বিশিষ্ট প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য লইয়া বিবর্ত্তিত হইবার বহুকাল পরেও বাঙ্গালীর লেখনীমুখে সংস্কৃত এবং প্রাকৃত যে সকল রচনা বাহির হইয়াছে তাহার তো কথাই নাই। সুতরাং বাঙ্গালা দেশে আর্য্যভাষা প্রবর্ত্তিত হইবার পর হইতে সংস্কৃত ও প্রাকৃতে যে সাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার আলোচনা বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের অঙ্গ না হইলেও অন্ততপক্ষে উপক্রমণিকারূপে গণ্য হওয়া উচিত।

আজ অবধি বাঙ্গালা দেশে যে সকল প্রত্নলিপি পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে কিছুকাল পূর্ব্বে বগুড়া জেলায় মহাস্থানগড়ে প্রাপ্ত পূর্ব্বী প্রাকৃতে রচিত লিপি বা অনুশাসনটি। এটি মৌর্য্যযুগে প্রচলিত ব্রাহ্মী

অক্ষরে উৎকীর্ণ, সুতরাং ইহার রচনাকাল তৃতীয় কিংবা দ্বিতীয় খ্রীষ্টপূর্ব্ব শতাব্দী। অনুশাসনটি অক্ষত না থাকায় সমগ্র পাঠ উদ্ধার করা যায় নাই। ইহাতে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বিষয় হইতেছে 'পুডনগল' বা পুণ্ড্রনগরের উল্লেখ। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, মৌর্য্যযুগে অন্ততপক্ষে বরেন্দ্রভূমি আর্য্যদিগের দ্বারা অধ্যুষিত হইয়াছিল।

অনুশাসনটির পাঠ শ্রীযুক্ত দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর মহাশয় এইরূপ স্থির করিয়াছেন।

> -নেন স[ং]ব[ং]গীয়[া]নং [গলদনস] দুমদিন[-মহা-]
> মাতে সুলখিতে পুডনগলতে এ[ত]ং
> [নি]বহিপয়িসতি। সংব[ং]গিয়ানং [চ দি]নে [তথা]
> [ধা]নিয়ং। নিবহিসতি দ[ং]গ[া]তিয়া[ি]য়[ে]ক [ে]দ[বা-]
> [তিয়ায়ি]কসি। সুঅতিয়ায়িক[সি]পি গংড[কেহি]
> [ধানিয়ি]কেহি এস কোঠাগালে কোসং [ভর-]
> [ণীয়ে][১]

অনুশাসনটির সংস্কৃত অনুবাদ এইরূপ হইবে—

> ··সংবঙ্গীয়ানাম্ গলদনস্য।··
> মহামাত্রঃ সুলক্ষ্মীতঃ পুণ্ড্রনগরতঃ এতৎ নির্বাহয়িষ্যতি।
> সংবঙ্গীয়ানাং চ দত্তং তথা ধান্যম্। নির্বাহয়িষ্যতি
> দ্রঙ্গায়াত্যায়িকং দৈবায়ত্যায়িকে। স্বত্যায়িকেঽপি
> গণ্ডকৈঃ ধান্যকৈঃ এষঃ কোষ্ঠাগারঃ কোষং ভরণীয়ম্।

অর্থাৎ—সংবঙ্গীয়দিগের গলদনের প্রতি (এই আদেশ)—সুলক্ষ্মীক পুণ্ড্রনগর হইতে মহামাত্র ইহা নির্ব্বাহ করিবেন। সংবঙ্গীয়দিগকে ধান্য প্রদত্ত হইয়াছে। দৈববিপদের কালে অর্থ নৈতিক বিপদ কাটিয়া যাইবে। সুদিন আসিলে গণ্ডা (অর্থ) ও ধান্যের দ্বারা কোষ পূরণ করিয়া দিতে হইবে।

১। Eyigraphia Indica, XXI, no. 14.

তাহার পর বাঁকুড়ার নিকটবর্ত্তী শুশুনিয়া পাহাড়ে উৎকীর্ণ সংস্কৃতে রচিত (সিদ্ধবর্ম্মা বা) সিংহবর্ম্মার পুত্র চন্দ্রবর্ম্মার লিপি। এই লিপি গুপ্তযুগের প্রাচীনতম অক্ষরে উৎকীর্ণ। প্রত্নলিপিবিশারদদিগের মতে এই লিপি খ্রীষ্টীয় চতুর্থ অথবা পঞ্চম শতাব্দীতে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। লিপিটির শুদ্ধপাঠ এই—

পুষ্করণাধিপতের্ম্মহারাজশ্রীসিজ্ঘবর্ম্মণঃ পুত্রস্য
মহারাজশ্রীচন্দ্রবর্ম্মণঃ কৃতিঃ
চক্র্ স্বামিনঃ দাসাগ্রেণাতিসৃষ্টঃ।[১]

অর্থাৎ—পুষ্করণার[২] অধিপতি মহারাজ শ্রীসিংহবর্ম্মার পুত্র মহারাজ শ্রীচন্দ্রবর্ম্মার কৃতি; চক্রস্বামীর (অর্থাৎ বিষ্ণুর) দাসশ্রেষ্ঠের দ্বারা উৎসর্গীকৃত।

গুপ্তসম্রাট্‌দিগের আমল হইতে বাঙ্গালা দেশ একচ্ছত্র রাজার অধীনে আসে। গুপ্তসম্রাট্‌দিগের সামন্ত প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদিগের প্রদত্ত কয়েকটি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে যে দুইটি প্রাচীনতম তাহা সম্রাট্ কুমারগুপ্তের রাজ্যকালে প্রদত্ত হইয়াছিল। পাহাড়পুরে প্রাপ্ত যে অনুশাসনটির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি সেটি এই ধানাইদহ ও দামোদরপুর অনুশাসনদ্বয়েরই প্রায় সমসাময়িক। পাহাড়পুরের তাম্রশাসন ১৫৯ গুপ্তাব্দে অর্থাৎ ৪৭৮-৭৯ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল। বাঙ্গালাদেশে প্রদত্ত গুপ্তসম্রাট্‌দিগের অনুশাসনগুলিতে বাঙ্গালা দেশে সাহিত্য প্রচেষ্টার প্রাচীনতম নিদর্শন বিদ্যমান রহিয়াছে।

তাহার পর অষ্টম শতাব্দীতে পালবংশীয় রাজগণের অভ্যুদয়। এই বংশের রাজত্ব একাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত স্থায়ী হয়। এবং এই সময়ের মধ্যেই বাঙ্গালা দেশের নিজস্ব রীতিনীতি ও সংস্কৃতি বিশিষ্ট রূপ ধারণ করে। পাল রাজাদিগের অনেকগুলি অনুশাসন পাওয়া গিয়াছে।

২। Epigraphia Indica, XIII, no. 9.

৩। বাঁকুড়া জেলায় দামোদরতীরে আধুনিক পোখরনা-পলাশডাঙ্গা গ্রাম। এখনও এখানে যথেষ্ট প্রাচীন মূর্ত্তি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখা যায়।

ইঁহাদের প্রাচীনতম অনুশাসন খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্ম্মপালদেবের ৩২ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ তাম্রলিপির রচনাভঙ্গি চমৎকার। রচনাকারীর নাম উৎকীর্ণ হয় নাই, তবে খোদাইকরের নাম দেওয়া আছে—ভোগটের পৌত্র, সুভটের পুত্র, তাতট। রচনার পরিচয় হিসাবে নিম্নে যে শ্লোকটি উদ্ধৃত করা গেল সেটি সুপরিচিত ও বহুবার উদ্ধৃত। ইহা হইতে জানা যায় যে, ধর্ম্মপালদেবের পিতা গোপালদেব প্রজাগণ অথবা সামন্তচক্র কর্ত্তৃক অধিরাজ মনোনীত হইয়াছিলেন।

মাৎস্যন্যায়মপোহিতুং প্রকৃতিভির্লক্ষ্ম্যাঃ করং গ্রাহিতঃ
শ্রীগোপাল ইতি ক্ষিতীশশিরসাং চূড়ামণিস্তৎসুতঃ।
যস্যানুক্রিয়তে সনাতনযশোরাশি র্দিশামাশয়ে
শ্বেতিম্না যদি পৌর্ণমাসরজনীজ্যোৎস্নাতিভারশ্রিয়া ॥৪॥

অর্থাৎ—তাঁহার (বপ্যটের) পুত্র নৃপতিচূড়ামণি শ্রীগোপাল মাৎস্যন্যায় (অর্থাৎ দেশের অরাজক অবস্থা) দূরীভূত করিবার জন্য রাজলক্ষ্মীর পাণিগ্রহণ কারিত হইযাছিলেন; দিগ্‌বিদিকে বিস্তৃত ইঁহার শাশ্বতযশোরাশি পৌর্ণমাসরজনীর জ্যোস্নাতিভারশ্রীযুক্ত ধবলতার দ্বারা কিঞ্চিৎমাত্র অনুকৃত হইতে পারে।

ধর্ম্মপালদেবের পুত্র দেবপালদেবের মুঙ্গের এবং নালন্দায় প্রাপ্ত তাম্রানুশাসনদ্বয়ের প্রথম শ্লোকটি এই—

সিদ্ধার্থস্য পরার্থসুস্থিতমতেঃ সন্মার্গমভ্যস্যতঃ
সিদ্ধিঃ সিদ্ধিমনুত্তরাং ভগবতস্তস্য প্রজাসু ক্রিয়াৎ।
যস্ত্রৈধাতুকসত্ত্বসিদ্ধিপদবীরত্যুগ্রবীর্য্যোদয়াজ্
জিত্বা নির্বৃতিমাসসাদ সুগতঃ সন্‌সর্ব্বভূমীশ্বরঃ[১] ॥

অর্থাৎ—যাঁহার মতি পরার্থে সুস্থিত, যিনি সৎমার্গ অভ্যাস করিতেছেন, যিনি অত্যুগ্রবীর্য্যবলে ত্রিধাতু (অর্থাৎ ত্রিলোক)-নিবাসী জীবের সিদ্ধির

১। কীলহর্ন সাহেবের গৃহীত পাঠ 'সর্ব্বার্থভূমীশ্বর'; উদ্ধৃতপাঠ স্বর্গীয় ননীগোপাল মজুমদার মহাশয়ের।

উপায় জয় করিয়া নিবৃ তি (অর্থাৎ নির্ব্বাণ) লাভ করিয়াছেন, যিনি সুগত এবং যিনি সর্ব্বপারমিতাভূমির ঈশ্বর, এমন ভগবান্ সিদ্ধার্থের সিদ্ধি তাঁহার প্রজাদিগকে অনুত্তর (অর্থাৎ চরম) সিদ্ধি প্রদান করুক।

ভাগলপুরে প্রাপ্ত নারায়ণপালদেবের বিজয়রাজ্যের সপ্তদশ বর্ষে প্রদত্ত তাম্রশাসনের প্রথম শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। এই শ্লোকটি এবং পরবর্ত্তী বংশপরিচয়জ্ঞাপক শ্লোক কয়টি পরবর্ত্তী পালনৃপতিগণের প্রায় সব শাসন-গুলিতে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্লোকটিতে শ্লেষের সাহায্যে বুদ্ধের বন্দনার সহিত বংশকর্ত্তা গোপালদেবের বর্ণনাও করা হইয়াছে। সৎ সমতট দেশে যাহার জন্ম, শুভদাসের যিনি পুত্র এমন সজ্ঝদাস এই শাসন উৎকীর্ণ করিযাছিলেন।

মৈত্রীং কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ঃ প্রেয়সীং সন্দধানঃ
সম্যক্‌সম্বোধিবিদ্যাসরিদমলজলক্ষালিতাজ্ঞানপঙ্কঃ।
জিত্বা যঃ কামকারিপ্রভবমভিভবং শাশ্বতীং প্রাপ্য শান্তিং
স শ্রীমান্ লোকনাথো জয়তি দশবলোঽন্যশ্চ গোপালদেবঃ॥

অর্থাৎ—যিনি কারুণ্যরত্নপ্রমুদিতহৃদয়ে মৈত্রীকে প্রেয়সীরূপে ধারণ করিয়াছেন, যিনি সম্যক্‌সম্বোধিবিদ্যারূপ নদীর অমলজলে অজ্ঞানপঙ্ক ক্ষালন করিয়াছেন, যিনি মাররূপ অরির আক্রমণ পরাভূত করিয়া শাশ্বত শান্তি প্রাপ্ত হইয়াছেন, এমন শ্রীমান্ দশবল লোকনাথ এবং গোপালদেব জয়যুক্ত হউন।

নারায়ণপালদেবের মন্ত্রী ভট্ট গুরবের প্রশস্তি তৎপ্রতিষ্ঠিত গরুড়স্তম্ভে উৎকীর্ণ রহিয়াছে। প্রশস্তিটিকে ২৮ শ্লোকাত্মক একটি ক্ষুদ্র খণ্ডকাব্য বলা যাইতে পারে।[১]

রামপালদেবের পুত্র মদনপালদেবের মন্ত্রী সন্ধ্যাকর-নন্দীর রামচরিত খ্রীষ্টীয় একাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হয়। এই কাব্যটিতে দ্ব্যর্থের সাহায্যে শ্রীরামচন্দ্র এবং রামপালের জীবনকাহিনী একত্র বর্ণিত হইয়াছে।

১। অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত গৌড়লেখমালা, পৃ ৭১—৭৬।

কাব্যটির রচনা অতিশয় দুরূহ। প্রথম চারিটি সর্গের কবিকৃত টীকা পাওয়া গিয়াছে, সেই কারণে এই অংশটুকু সুগম হওয়াতে ইহা হইতে ইতিহাসের মালমশলা অনেক কিছু পাওয়া গিয়াছে। কাব্যটির আবিষ্কার হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অন্যতম অক্ষয় কীর্ত্তি।

পালনৃপতিদিগের পরবর্ত্তী রাজাদিগের অনুশাসনগুলির কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

রামপালে এবং কেদারপুরে প্রাপ্ত শ্রীচন্দ্রের তাম্রানুশাসনদ্বয়ের প্রথম শ্লোকটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহাতে বুদ্ধ, ধর্ম্ম এবং সঙ্ঘের বন্দনা করা হইয়াছে।

বন্দ্যো জিনঃ স ভগবান্ করুণৈকপাত্রং ধর্ম্মোঽপ্যসৌ বিজয়তে জগদেকদীপঃ।
যৎসেবয়া সকল এব মহানুভাবঃ সংসারপারমুপগচ্ছতি ভিক্ষুসঙ্ঘঃ॥

অর্থাৎ—করুণার একমাত্র পাত্র ভগবান্ জিন বন্দিত হউন; জগতের একমাত্র দীপ ধর্ম্মও জয়যুক্ত হউক; ইহার সেবায় সকল মহানুভাব ভিক্ষুসঙ্ঘ সংসারের পার প্রাপ্ত হয়।

ঢাকা জেলায় নারায়ণগঞ্জ মহকুমায় বেলাবো গ্রামে প্রাপ্ত ভোজবর্ম্মদেবের তাম্রানুশাসনে শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার উল্লেখ আছে। বর্ম্মরাজারা ব্রাহ্মণ্য-মতাবলম্বী ছিলেন। শ্লোকটি এই—

সোঽপীহ গোপীশতকেলিকারঃ কৃষ্ণো মহাভারতসূত্রধারঃ।
অর্ঘঃ পুমানংশকৃতাবতারঃ প্রাদুর্ব্বভূবোদ্ধৃতভূমিভারঃ॥৪॥

অর্থাৎ—সেই পূজনীয় পুরুষ (অর্থাৎ হরি) জগতে ভূমিভারোদ্ধারকারী অংশাবতাররূপে এবং গোপীশতকেলিকার মহাভারতনাটকের সূত্রধার কৃষ্ণরূপে অবতীর্ণ হইয়াছিলেম।

হরিবর্ম্মদেবের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন উত্তররাঢ়স্থিত সিদ্ধলগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ ভট্ট ভবদেব। ইঁহার আবির্ভাবকাল ১০২৫ হইতে ১১৫০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে। ইনি গুরব ভট্টের মত, এমন কি তাঁহার অপেক্ষাও, অসাধারণ পুরুষ ছিলেন। ইঁহার রচিত দুইটি স্মৃতিগ্রন্থ, কর্ম্মানুষ্ঠান (বা দশকর্ম্মপদ্ধতি)

এবং প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ, এখনও চলিতেছে। বেদ, বেদান্ত, মীমাংসা, জ্যোতিষ, স্মৃতি প্রভৃতি শাস্ত্রেও যেমন, রাজনীতি এবং শস্ত্রব্যবহারেও তুল্যরূপ ব্যুৎপত্তি ইহার ছিল। ভুবনেশ্বরে ইনি যে অনন্তবাসুদেবের অপূর্ব্ব মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন তাহার গাত্রে ইহার প্রশস্তি লিখিত রহিয়াছে। প্রশস্তিটি ৩৩ শ্লোকাত্মক একটি চমৎকার খণ্ডকাব্য। কবি বাচস্পতি কাব্যটির রচয়িতা।

প্রশস্তির মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি এই—

গাঢ়োপগূঢ়কমলাকুচকুম্ভপত্রমুদ্রাঙ্কিতেন বপুষা পরিরিপ্সমানঃ।
মা লুপ্যতামভিনবা বনমালিকেতি বাগ্‌দেবতোপহসিতোঽস্তু হরিঃ শ্রিয়ে বঃ ॥১॥

অর্থাৎ—কমলাকে গাঢ় আলিঙ্গন করায় তাঁহার কুচকুম্ভপত্রলেখার ছাপ যাহাতে লাগিয়াছে এমন বপুর দ্বারা আলিঙ্গনেচ্ছু হইলে, 'অভিনব বনমালা যেন নষ্ট না হয়' এই বলিয়া বাগ্‌দেবতা যাঁহাকে উপহাস করিয়াছিলেন এমন হরি তোমাদিগের শ্রীর কারণ হউন।

তাহার পর কবিকর্ত্তৃক সরস্বতীর বন্দনা—

বাল্যাৎ প্রভৃত্যহরহর্যদুপাসিতাসি বাগ্‌দেবতে তদধুনা ফলতু প্রসীদ।
বক্তাস্মি ভট্টভবদেবকুলপ্রশস্তিসূক্তাক্ষরাণি রসনাগ্রমধিশ্রয়েথাঃ ॥২॥

অর্থাৎ—হে বাগ্‌দেবি, বাল্যকাল হইতে তুমি (আমার দ্বারা) প্রত্যহ উপাসিতা হইয়াছ, সেই উপাসনা এখন ফলবতী হউক, তুমি প্রসন্ন হও। ভট্ট ভবদেববংশের প্রশস্তি সুললিত ভাষায় বর্ণনা করিব, তুমি (আমার) রসনাগ্রে অধিষ্ঠিত হও।

চারিটি শ্লোকে (২০—২৩) ভবদেবের পাণ্ডিত্য বর্ণনা করিয়া কবি বলিতেছেন, ইহার বালবলভীভুজঙ্গ এই নাম কে না শ্রদ্ধার সহিত গ্রহণ করিয়া থাকে?

তাহার পর ভবদেবের পূর্ত্তকীর্ত্তির বর্ণনা—

রাঢ়ায়ামজলাসু জাঙ্গলপথগ্রামোপকণ্ঠস্থলী-
সীমাসু শ্রমমগ্নপান্থপরিষৎপ্রাণাশয়প্রীণনঃ।
যেনাকারি জলাশয়ঃ পরিসরস্নাতাভিজাতাঙ্গনা-
রক্তাব্জপ্রতিবিম্বমুগ্ধমধুপীশূন্যাব্জিনীকাননঃ ॥২৬॥

অর্থাৎ—রাঢ়দেশে জলহীন জাঙ্গলপথযুক্ত গ্রামোপকণ্ঠসীমায় শ্রমার্ত্ত পান্থদিগের মনপ্রাণের প্রীতিদাযক জলাশয় ইনি প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন, যে জলাশয়ের সুবিস্তৃত বক্ষে প্রতিবিম্বিত স্নানার্থিনী কুলকামিনীদিগের মুখারবিন্দ দর্শনে মুগ্ধ হইয়া মধুপগণ পদ্মবন একেবারেই পরিত্যাগ করিয়াছে।

তাহার পর অনন্তবাসুদেব-মন্দিরপ্রতিষ্ঠা, তন্মধ্যে নারায়ণ, অনন্ত ও নৃসিংহ মূর্ত্তিপ্রতিষ্ঠা এবং মন্দিরসমক্ষে বাপীপ্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করা হইয়াছে (২৭—৩১)। মন্দিরের চারিদিকে তিনি সুন্দর উদ্যানও নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন (৩২)।

তাহার পর পুষ্পিকা শ্লোক—

তস্যৈব প্রিয়সুহৃদা দ্বিজাগ্রিমেণ শ্রীবাচস্পতিকবিনা কৃতা প্রশস্তিঃ।

আকল্পং শুচিসুরধামমূর্ত্তিকীর্ত্তেরধ্যাস্তাং জঘনমিব সুবর্ণকাঞ্চী ॥৩৩॥

অথাৎ—ইহার প্রিয়সুহৃদ্ দ্বিজাগ্রগণ্য শ্রীবাচস্পতি কবি কর্ত্তৃক এই প্রশস্তি রচিত হইল। এই প্রশস্তি ইহার এই পবিত্রদেবমন্দিরস্বরূপিণী কীর্ত্তির জঘনদেশে সুবর্ণকাঞ্চীর মত কল্পান্ত পর্য্যন্ত বিরাজিত রহুক।

প্রশস্তিটি হইতে ভবদেব ভট্টের সর্ব্বাঙ্গীন শ্রেষ্ঠত্বের অভ্রান্ত পরিচয় পাওয়া যায়। বাঙ্গালার ইতিহাসে এই ব্রাহ্মণের জোড়া মিলে না।

সেন-রাজাদিগের কুলদেবতা ছিলেন শিব। তাই শিবের বন্দনা করিয়াই ইঁহাদের প্রদত্ত অনুশাসনগুলির মঙ্গলাচরণ করা হইয়াছে।

দেওপাড়ায় প্রাপ্ত কবি উমাপতি-ধর বিরচিত বিজয়সেনদেবের অনুশাসনের প্রশস্তির মঙ্গলাচরণ এই—

বক্ষোহংশুকাহরণসাধ্বসকৃষ্টমৌলিমাল্যচ্ছটাহতরতালয়দীপভাসঃ।

দেব্যাস্ত্রপামুকুলিতং মুখমিন্দুভাভির্বীক্ষ্যাননানি হসিতানি জয়ন্তি শম্ভোঃ॥

অর্থাৎ—বক্ষের অংশুক হরণ করিলে লজ্জায় আকৃষ্ট শিরোমাল্যের ছটায় রতালয়-দীপের দীপ্তি ম্লান হইল, তখন ইন্দুকিরণে লজ্জায় (পদ্মকোরকের মত) মুকুলিত দেবীর মুখ দর্শনে শম্ভুর বদনসমূহের যে হাস্য তাহা জয়যুক্ত হউক।

দেওপাড়া প্রশস্তি ৩৬ শ্লোকাত্মক একটি কাব্য। ইহার রচয়িতা সুবিখ্যাত কবি উমাপতি-ধর। ইনি দীর্ঘজীবী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়, কারণ লক্ষ্মণসেনদেবের সভাসদরূপেও ইহার উল্লেখ দেখা যায়। প্রশস্তিটি খোদাই করিয়াছিল ধর্ম্মো বা ধর্ম্মের প্রপৌত্র, মনদাসের পৌত্র, বৃহস্পতির পুত্র, "বারেন্দ্রকশিল্পিগোষ্ঠীচূড়ামণি" রাণক শূলপাণি।

নির্নিক্তসেনকুলভূপতিমৌক্তিকানামগ্রন্থিলগ্রথনপক্ষ্মলসূত্রবল্লিঃ।
এষা কবেঃ পদপদার্থবিচারশুদ্ধবুদ্ধেরুমাপতিধরস্য কৃতিঃ প্রশস্তিঃ ॥৩৫॥
ধর্ম্মো-প্রনপ্তা মনদাস-নপ্তা বৃহস্পতেঃ সূনুরিমাং প্রশস্তিম্।
চখান বারেন্দ্রকশিল্পিগোষ্ঠীচূড়ামণী রাণকশূলপাণিঃ ॥৩৬॥

বারাকপুরে প্রাপ্ত বিজয়সেনদেবের অনুশাসনের মঙ্গলাচরণ-শ্লোকটি এই—

ক্রৌঞ্চারিদ্বিরদাস্যয়োঃ শিশুতয়া তাতস্য মৌলৌ মিথো
গঙ্গাবারিণি খেলতোঃ শশিকলামালোক্য মধ্যেজটম্।
শৈবালাবলিমধ্যবদ্ধশফরীবুদ্ধ্যা সমাকর্ষতো-
রাক্রন্দস্ফুটকন্দলেন বিহসন্নব্যাজ্জগদ্ ধূর্জ্জটিঃ ॥

অর্থাৎ—শিশুতাহেতু পিতার মস্তকে গঙ্গাবারিতে খেলা করিতে গিয়া জটামধ্যে শশিকলাকে দেখিয়া শৈবালমধ্যে বদ্ধ শফরী মনে করিয়া আকর্ষণ করিতে করিতে বিবদমান ক্রৌঞ্চারি (অর্থাৎ কার্ত্তিকেয়) এবং দ্বিরদাস্য (অর্থাৎ গণেশ), এই দুই জনের অস্ফুট কোলাহল শ্রবণে হাস্য করিতেছেন এমন ধূর্জ্জটি জগৎকে রক্ষা করুন।

কাটোয়ার সন্নিকটে নৈহাটিতে প্রাপ্ত বল্লালসেনদেবের তাম্রশাসনের মঙ্গলাচরণ শ্লোক এই—

সন্ধ্যাতাণ্ডবসন্বিধানবিলসন্নান্দীনিনাদোর্ম্মিভি-
র্নির্মর্য্যাদরসার্ণবো দিশতু বঃ শ্রেয়োঽর্দ্ধনারীশ্বরঃ।
যস্যার্দ্ধে ললিতাঙ্গহারবলনৈরর্দ্ধে চ ভীমোদ্ভটৈ-
র্নাট্যারম্ভরয়ৈর্জয়ত্যভিনয়দ্বৈধানুরোধশ্রমঃ ॥

অর্থাৎ—যাঁহার অর্দ্ধাঙ্গে সুললিত অঙ্গচেষ্টায় এবং অপর অর্দ্ধাঙ্গে ভীমোদ্ভট নাট্যারম্ভপ্রচেষ্টায় উদ্ভূত অভিনয়দ্বয়ানুরোধ শ্রম হইতেছে, সন্ধ্যাতাণ্ডবোৎসবে উদ্যত নান্দীনিনাদরূপ উর্ম্মির দ্বারা উদ্বেলিত রসার্ণব যাঁহার স্বরূপ, সেই অর্দ্ধনারীশ্বর তোমাদিগকে শ্রেয়ঃ বিতরণ করুন।

নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটি লক্ষ্মণসেনদেবের আনুলিয়া, গোবিন্দপুর, তর্পণদীঘি এবং শক্তিপুর গ্রামে প্রাপ্ত অনুশাসনগুলির মঙ্গলাচরণে দেখা যায়—

বিদ্যুদ্‌যত্র মণিদ্যুতিঃ ফণিপতের্বালেন্দুরিন্দ্রায়ুধং
বারি স্বর্গতরঙ্গিণী সিতশিরোমালা বলাকাবলিঃ।
ধ্যানাভ্যাসসমীরণোপনিহিতঃ শ্রেয়োঽঙ্কুরোদ্ভূতয়ে
ভূয়াদ্ বঃ স ভবার্ত্তিতাপভিদুরঃ শম্ভোঃ কপর্দ্দাম্বুদঃ॥

অর্থাৎ—ফণিপতির মণিদ্যুতি যাহাতে বিদ্যুৎস্বরূপ, বালেন্দু ইন্দ্রধনুস্বরূপ, স্বর্গতরঙ্গিণী বারিস্বরূপ, শ্বেত কপালমালা বলাকাস্বরূপ, যাহা ধ্যানাভ্যাস-রূপ সমীরণের দ্বারা চালিত এবং যাহা ভবার্ত্তিতাপভেদকারী, শম্ভুর এমন কপর্দ্দরূপ অম্বুদ তোমাদিগের শ্রেয়ঃশস্যের অঙ্কুরোদ্‌গমের কারণ হউক।

ধান্যোপজীবী বাঙ্গালীর জাতীয় মঙ্গলাচরণ শ্লোক হইবার পক্ষে এটি সম্পূর্ণ উপযুক্ত।

মাধাইনগরে প্রাপ্ত লক্ষ্মণসেনদেবের অনুশাসনে মঙ্গলাচরণের শ্লোকটি অন্য। সেটি এই—

যস্যাঙ্কে শরদম্বুদোরসি তড়িল্লেখেব গৌরী প্রিয়া
দেহার্দ্ধেন হরিং সমাশ্রিতমভূদ্ যস্যাতিচিত্রং বপুঃ।
দীপ্তার্কদ্যুতিলোচনত্রয়রুচা ঘোরং দধানো মুখং
দেবত্রাসনিরস্তদানবগজঃ পুষ্ণাতু পঞ্চাননঃ॥

অর্থাৎ—শারদ মেঘবক্ষে তড়িৎলেখার ন্যায় যাঁহার অঙ্কে প্রিয়া গৌরী, যাঁহার অতি অদ্ভুত বপু দেহার্দ্ধে হরিকে আশ্রয় করিয়াছে, দীপ্তার্কদ্যুতিময় ত্রিলোচনের আভায় যাঁহার বদন ভীষণ হইয়াছে, এমন দেবত্রাসকারী, দানবরূপ গজঘাতী পঞ্চানন (সিংহ অথবা শিব) (জগতকে) পোষণ করুন।

ইদিলপুরে প্রাপ্ত কেশবসেনদেবের অনুশাসনের এবং মদনপাড়ায় ও ঢাকায় প্রাপ্ত বিশ্বরূপসেনদেবের অনুশাসন দুইটির মঙ্গলাচরণে এই চন্দ্রবন্দনা-শ্লোকটি দেখা যায়—

বন্দেঽরবিন্দবনবান্ধবমন্ধকারকারানিবদ্ধভুবনত্রয়মুক্তিহেতুম্।
পর্য্যায়বিস্তৃতসিতাসিতপক্ষযুগ্মমুত্থান্তমদ্ভুতখগং নিগমদ্রুমস্য॥

অর্থাৎ—অরবিন্দবনের বান্ধব, অন্ধকাররূপ কারাগারে নিবদ্ধ ভুবনত্রয়ের মুক্তির হেতু, পর্য্যায়ক্রমে বিস্তৃত সিত এবং অসিত এই দুই পক্ষ বিধুননকারী, নিগমদ্রুমের অদ্ভুত পক্ষীকে বন্দনা করি।

চট্টগ্রামের নিকটবর্ত্তী নসিরাবাদ গ্রামে প্রাপ্ত ১১৬৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১২৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ দামোদরদেবের প্রশস্তিটির মঙ্গলাচরণ শ্লোক এই—

দেবি প্রাতরবেহি নন্দনবনান্মন্দঃ কদম্বানিলো
বাতি ব্যস্তকরঃ শশীতি কৃতকেনালাপ্য কৌতূহলী।
তৎকালস্খলদঙ্গভঙ্গিমচলামালিঙ্গ্য লক্ষ্মীং বলাদ্
আলোলাননবিম্বচুম্বনপরঃ প্রীণাতু দামোদরঃ॥

অর্থাৎ—'দেবি, প্রাতঃকাল হইয়াছে দেখ, নন্দনবন হইতে কদম্বানিল প্রবাহিত হইতেছে, শশীর কিরণ লুপ্ত হইয়াছে', ইত্যাকার আলাপ করিয়া কৌতূহল-বশে তৎকাল (অর্থাৎ শয্যোত্থান)-উচিত অঙ্গভঙ্গের জন্য স্খলৎচরণা লক্ষ্মীকে সবলে আলিঙ্গন করিয়া তাঁহার আলোল আননবিম্বচুম্বনপরায়ণ দামোদর প্রীত হউন।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের রচনা হিসাবে এই প্রশস্তিটি বিশেষ মূল্যবান।

পূর্ব্বভারতের পূর্ব্ব প্রান্ত বাঙ্গালা দেশে আর্য্যভাষার যে চলিত (অর্থাৎ প্রাকৃত) রূপ বিদ্যমান ছিল, তাহা ক্রমশঃ অপভ্রংশরূপে বিবর্ত্তিত হইয়া আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ৯৫০ সালের দিকে বাঙ্গালা ভাষার বিশিষ্ট লক্ষণ লইয়া 'বাঙ্গালা' ভাষায় পরিণত হইল। প্রাদেশিক ভাষায় পরিণত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রাকৃতের যে রূপ দাঁড়াইয়া যায় তাহাকে বলা হয় অপভ্রংশ।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশেই এইরূপে প্রাদেশিক অপভ্রংশের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু শুধু শৌরসেনী অর্থাৎ মধ্যদেশীয় অপভ্রংশ ব্যতীত আর কোন অপভ্রংশে রচিত কোন লেখা পাওয়া যায় নাই। শৌরসেনী অপভ্রংশে এক বড় সাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছিল। কতকটা সেই কারণেও বটে, এবং শূরসেন প্রদেশ আর্য্য সংস্কৃতি ও সভ্যতার কেন্দ্রভূমি বলিয়াও বটে, শৌরসেনী অপভ্রংশ এবং তাহার অর্ব্বাচীন রূপ অবহট্‌ঠ ('অপভ্রষ্ট') খ্রীষ্টীয় অষ্টম হইতে পঞ্চদশ শতাব্দী অবধি গুর্জ্জর হইতে তীরভুক্তি পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তরাপথে সাহিত্যের অন্যতম ভাষারূপে ব্যবহৃত হইত। অবশ্য সংস্কৃত আবহমান কাল ধরিয়া সমস্ত ভারতবর্ষের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের একমাত্র বাহন তো ছিলই।

প্রাদেশিক ভাষা সৃষ্ট হইল বটে, কিন্তু তাহা স্বভাবতঃই কিছুকাল যাবৎ অত্যন্ত দুর্ব্বল, পঙ্গু ও অকেজো রহিয়া গেল। কোন্ কবি সংস্কৃত ও অপভ্রংশ ছাড়িয়া এই নবজাত অক্ষম ভাষা, যে ভাষার কোন আভিজাত্য জন্মায় নাই এবং সে ভাষা রাজসভা অথবা বিদ্বদ্‌মণ্ডলীর অবজ্ঞাত, সে ভাষায় সাহিত্যসৃষ্টির প্রচেষ্টায় সাধ করিয়া ব্যর্থতা বরণ করিতে যাইবে? সংস্কৃতের প্রশস্ত রাজবর্ত্ম ও অপভ্রংশের সুগম সরণি ছাড়িয়া কে এমন সাহসী ছিল যে প্রাদেশিক ভাষার "দুসহ আরণে" "বাট কাটাইতে" যাইবে? এইজন্য বাঙ্গালা ভাষার উদ্ভবের পরও প্রায় চারিশত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালীর সাহিত্যসৃষ্টি পূর্ব্ববৎ প্রধানতঃ সংস্কৃত এবং অংশতঃ অপভ্রংশ অবলম্বনেই চলিতে থাকিল।

বাঙ্গালীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি জয়দেবের প্রসঙ্গ লইয়াই বাঙ্গালা সাহিত্যের যথার্থ ইতিহাসের আরম্ভ। জয়দেব লক্ষ্মণসেনদেবের সমসাময়িক ছিলেন, ইহা একরূপ সর্ব্ববাদিসম্মত। সম্ভবতঃ ইহার রাজসভাতেও কবির গতিবিধি ছিল। সুতরাং জয়দেব খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকের শেষাংশে বর্ত্তমান ছিলেন। জয়দেব বাঙ্গালী ছিলেন না, তিনি ছিলেন উড়িয়া—সম্প্রতি এইরূপ এক ধূয়া উড়িষ্যাদেশে উঠিয়াছে। এই বিষয়ে আমাদের বক্তব্য হইতেছে যে, যখন সমস্ত জনশ্রুতি এবং ঐতিহ্য জয়দেবের বাঙ্গালীত্ব সম্বন্ধে একমত, তখন

জয়দেব বাঙ্গালী নহেন তাহা প্রমাণ করিতে হইলে বিশেষ প্রবল যুক্তি উপস্থাপিত করিতে হইবে; শুধু জয়দেব কিছুকাল পুরীতে ছিলেন এবং উড়িষ্যাতেও কেন্দুবিল্ব গ্রাম আছে, এই উড়ো কথাতেই চলিবে না।

গীতগোবিন্দ হইতে জয়দেব সম্বন্ধে এইটুকুমাত্র জানা যায় যে, তাঁহার পিতার নাম ভোজদেব, মাতার নাম বামা (বা 'রামা'), পত্নীর নাম পদ্মাবতী; বাসস্থান কেন্দুবিল্ব[১], এবং ইঁহার এক প্রিয়বন্ধু ও গায়নের নাম পরাশর।

শ্রীভোজদেবপ্রভবস্য বামাদেবীসুতশ্রীজয়দেবকস্য।
পরাশরাদিপ্রিয়বন্ধুকণ্ঠে শ্রীগীতগোবিন্দকবিত্বমস্তু ॥ ১২ ২৯ ॥
বাগ্‌দেবতাচরিতচিত্রিতচিত্তসদ্মা পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী।
শ্রীবাসুদেবরতিকেলিকথাসমেতমেতং করোতি জয়দেব কবিঃ প্রবন্ধম্ ॥১-২॥
বর্ণিতং জয়দেবকেন হরেরিদং প্রবণেন।
কেন্দুবিল্বসমুদ্রসম্ভবরোহিণীরমণেন ॥৩, গীত ৭-১০ ॥[২]
ইতি চটুলচাটুপাটুচারু মুরবৈরিণো রাধিকামধি বচনজাতম্।
জয়তি পদ্মাবতীরমণজয়দেবকবিভারতীভণিতমতিশাতম্ ॥

১০, গীত ১৯-১০ ॥

বিহিতপদ্মাবতীসুখসমাজে।
কুরু মুরারে মঙ্গলশতানি ভণিতজয়দেবকবিরাজরাজে ॥

১১, গীত ২১-২১ ॥

সেখশুভোদয়ায় জয়দেব সম্বন্ধে কিছু নূতন খবর পাওয়া যায়। সেখশুভোদয়া[৩] ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান করা হয়।

১। বীরভূম জেলায় অজয় তীরবর্ত্তী; এখানে প্রতি বৎসর পৌষসংক্রান্তিতে জয়দেবের স্মারক মেলা হয় ও তদুপলক্ষ্যে বহু বৈষ্ণবসাধু সমবেত হন।

২। কাহারো কাহারো মতে জয়দেবের আর একটি পত্নী ছিল, ইঁহার নাম রোহিণী (শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত 'কবি জয়দেব ও গীতগোবিন্দ' ভূমিকা দ্রষ্টব্য)।

৩। মৎসম্পাদিত ও হৃষীকেশ সিরিজে প্রকাশিত (১৯২৭)।

ইহাতে জয়দেব ও তাঁহার পত্নী সম্বন্ধে যে কাহিনীটি আছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই কাহিনী অবশ্য ঐতিহাসিক নহে, কারণ বুঢ়ন মিশ্র যদি কপিলেন্দ্রদেবের সমসাময়িক হন, তবে তিনি পঞ্চদশ শতাব্দীর লোক হইয়া পড়েন। তবে এই কাহিনীতে যে পাই জয়দেব ও পদ্মাবতী বিশেষ সঙ্গীতজ্ঞ ছিলেন, এই কথা সত্য হওয়াই সম্ভব। জনশ্রুতিতে বলে, পদ্মাবতী নীলাচলে জগন্নাথমন্দিরে দেবদাসী ছিলেন। জয়দেবের উক্তি "পদ্মাবতীচরণচারণচক্রবর্ত্তী" বোধ হয় সেই সাক্ষ্যই দেয়। গল্পটি এই—

কশ্চিদ ব্রাহ্মণো বুঢনমিশ্রনামা রাজসভায়াং গত্বা রাজানমবাদীৎ, 'রাজন্, মহাগায়নোঽহং পুনঃ পণ্ডিতশ্চ। ওড্রেশং গত্বা তদ্রাজ্যস্য জেতাহম। সোঽপি রাজা কপিলেশ্বরশ্চাস্মাকং ষড়্চন্দ্রগজ-পুনর্জয়পত্রং দত্তাস্তে। পুনরিদানীং তব রাজ্যে সমাগতোঽস্মি। অস্মাকং সমঃ একোঽপি বিদ্যতে তমানীয় ময়া সহ বোধয়তু গীতেন শাস্ত্রেণ বা।' ইত্যুক্তে সতি তমুবাচ সেকঃ, 'হে বিপ্র, কশ্চিদ্ ধ্বনিরুদ্গীয়তাম্।' ততো দ্বিজঃ পঠমঞ্জরীরাগমুদ্গীরিতবান্। উদ্গীরিতে গতি পিপ্পলবৃক্ষতলে তস্য পিপ্পলস্য পত্রাণি সমস্তান্যপতৎ। দৃষ্ট্বা লোকা বিবদন্তে, 'সর্ব্বমেতদ্ আশ্চর্য্যমিতি, ধন্যোঽসি বিপ্রঃ, ইয়ং বিধি ন দৃষ্টং ন শ্রুতমিতি।' ততো রাজা ষড়্চন্দ্রজয়পত্রং দাতুমপেক্ষতে। ততো নানা বাদ্যমভূৎ। তদা সর্ব্বানানীতে সতি জয়দেবমিশ্রস্য ব্রাহ্মণী পদ্মাবতীনামা তচ্ছব্দমশ্রৌষীৎ। গঙ্গাস্নানং গতে সতি ত্বরয়া রাজসভায়াং সমায়াতা চ। পুনরুক্তবতী চ, 'সর্ব্বে সভাসদাঃ, বিদিতমস্তু মমোক্তানি চ। ময়া স্বামিনা সহ বর্ত্তমানে কস্য শক্তির্বিদ্যতে জয়পত্রং নেতুম্ পুনর্জ্জাতুং চ বা? যোঽস্মাকং গীতরসেন শাস্ত্রেণ বা জেতুং শক্নোতি সোঽপি জেতা, নান্যথেতি। মম ভর্ত্তা সমানীয়তাম্। তেন সহ ময়া বা বোধয়তু।' ততস্তামব্রবীৎ সেকঃ, 'হে ব্রাহ্মণি, বদসি "মম ভর্ত্তা কবীন্দ্র।" তস্য গুণো বোদ্ধব্যঃ পশ্চাৎ। সাম্প্রতং ত্বমপি ধ্বনিরুদ্গীয়তাম্।' ততঃ পদ্মাবতী জয়দেবস্য ব্রাহ্মণী গান্ধারনামা ধ্বনিরুদ্গীরিতা চ। তদুদ্গীরিতে সতি সমস্তা নৌকা গঙ্গায়াং যদ্ বিদ্যন্তে শ্রুত্বা তৎসন্নিধানং সমায়াতাঃ চ। ততস্তাং সর্ব্বে সভাসদাঃ

পূজয়ামাস তৎক্ষণাৎ, 'ধন্যেয়ং ব্রাহ্মণী। ঈদৃশং ন দৃষ্টং ন শ্রুতমিতি দ্বয়োরপি। ধন্যোঽসৌ। এতয়োর্মধ্যে ব্রাহ্মণী গরীয়সী, যস্মান্নির্জীবা নৌকাঃ শ্রুত্বা সমাযাতাঃ। পুনর্বৃক্ষঃ সজীবঃ।' ততঃ সেকঃ বুঢ়নমিশ্রমপৃচ্ছৎ, 'হে দ্বিজ, যুবাং দ্বয়োর্মধ্যে কো জেতা কঃ অজেতা চ শাস্ত্রেণ ময়া সহ বোধয়তু ব্রাহ্মণীবিবাদাৎ।' ততো বুঢ়নমিশ্রঃ, 'ময়া স্ত্রিয়া সহ ন বোদ্ধব্যম্। কিন্তু অস্মিন্ রাষ্ট্রে স্ত্রী বহুগুণা পুমান্ নিগুর্ণঃ।' ইত্যুদিতে সতি সা পদ্মাবতী জয়দেবমিশ্রমানয়িতুং দাসীং প্রেষয়ামাস। ততো মিশ্রঃ সমায়াতঃ। সমায়াতে অব্রবীৎ, 'মম ব্রাহ্মণী জেতা। পুনর্বক্তুমপেক্ষসে কথম্?' পুনঃ সেকঃ তং বোধয়ামাস, 'উভয়োরপি গুণো বিদ্যতে। ইদানীং তব গুণো দৃশ্যতাম্।' তদা জয়দেবমিশ্রোঽবদৎ, 'অস্য ধ্বনিনা নিস্পত্রবৃক্ষোঽভবৎ। কিন্তু বসন্তসময়ে সামান্যেন বৃক্ষস্য পত্রাণি পতন্তি। মহানিতি কথম্?' পুনস্তমব্রবীৎ সেকঃ, 'শৃণু মিশ্র, বসন্তে পত্রাণি পতন্তি ইতি নিশ্চয়ঃ। কিঞ্চ একদিবসে সর্ব্বাণি পত্রাণি ন পতন্তি। দিবসে দিবসে পতন্তি।' জয়দেবমিশ্রোঽপি পুনরাহ চ, 'পুনর্গীয়তাম্। নিষ্পত্রবৃক্ষঃ সপত্রো ভবতু।' বুঢ়নমিশ্রোঽবদৎ, 'অহং ন শক্নোমি। ত্বমপি সপত্রং কর্তুং শক্নোষি? পশ্যতাং কুরু ত্বম্।' পুনর্জয়দেবমিশ্রোঽবদৎ, 'যেনাপি সপত্রঃ ক্রিয়তে স এব জেতা?' ততো বুঢ়নমিশ্রোঽবদৎ, 'এবমস্ত্বিতি, নান্যথেতি।' তদুক্তং সেকঃ শ্লাঘয়ামাস, 'তয়োর্দ্বয়োরেব ভদ্রমুক্তম্'। ততো জয়দেবমিশ্রঃ বসন্তরাগমুদ্গীরিতবান্। উদ্গীরিতে সতি তস্য বৃক্ষস্য কমনীয়ানি নবপত্রাণি ভূতানি। ততো জয়শব্দঃ সর্ব্বত্র অশ্রৌষীৎ। পৃ ৬৯-৭১।

বনমালী-দাস রচিত জয়দেবচরিত্রে জয়দেব সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহাতে বর্দ্ধমানরাজ কর্ত্তৃক কেন্দুবিল্বে মন্দিরনির্ম্মাণের উল্লেখ আছে। এই মন্দির ১৬১৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৯২ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হয়। সুতরাং বনবালী-দাসের কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত হয় নাই।

গীতগোবিন্দে চব্বিশটি গান কতকগুলি প্রাসঙ্গিক ও অবান্তর সংস্কৃত

শ্লোকে উদ্‌গ্রথিত হইয়া দ্বাদশসর্গাত্মক কাব্যরূপে উপস্থাপিত হইয়াছে। সংস্কৃত শ্লোকগুলি সবই জয়দেবের রচনা নাও হইতে পারে। তবে জয়দেব যে গানগুলিকে কাব্যের কাঠামোয় ধরেন নাই, একথা বলিবার পক্ষেও বিশেষ কোন হেতু নাই। গীতগোবিন্দের প্রথম শ্লোকটি, আমার মনে হয়, লক্ষ্মণসেনদেবের রচনা, কেননা ইঁহার রচিত শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে গ্রথিত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক একাধিক শ্লোকের শেষ চরণে "রাধামাধবয়োর্জয়ন্তি" এইরূপ পদাংশ দেখা যায়।[১]

গীতগোবিন্দের একটী শ্লোকে (১-৪) জয়দেবের সহিত উমাপতি-ধর, শরণ, আচার্য্য গোবর্দ্ধন এবং ধোয়ী কবি উল্লিখিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ ইঁহারা সকলেই লক্ষ্মণসেনদেবের সভা অলঙ্কৃত করিতেন। সেকশুভোদয়াতে উমাপতি-ধর, আচার্য্য গোবর্দ্ধন এবং ধোয়ীর কথাও কিছু কিছু আছে। সেকশুভোদয়ার মতে ধোয়ী তন্তুবায় জাতীয় ছিলেন, সরস্বতীর বরে ইনি কবিত্বশক্তি লাভ করেন। পৃ ৮৫-৮৭।

লক্ষ্মণসেনদেবের মহাসামন্তচূড়ামণি বটুদাসের পুত্র মহামাণ্ডলিক শ্রীধরদাস ১১২৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১২০৫-৬ খ্রীষ্টাব্দে সদুক্তিকর্ণামৃত[২] নামে একটি কবিতাসংগ্রহগ্রন্থ সঙ্কলন করেন। ইহাতে জয়দেব, উমাপতি-ধর, শরণ, আচার্য্য গোবর্দ্ধন, ধোয়ী, লক্ষ্মণসেনদেব, কেশবসেন ও যুবরাজ দিবাকর ব্যতীত আরও অনেক বাঙ্গালী কবির শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। কতক কবির নামের সঙ্গে তাঁহাদের 'গাঁই' বা মূল বাসগ্রামের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহারা নিঃসংশয় বাঙ্গালী ছিলেন। যেমন—তৈলপাটীয় গাঙ্গোক, ভট্টপালীয় (পাঠান্তর 'ভট্টশালীয়') পীতাম্বর, কেশরকোলীয় (পাঠান্তর

১। সদুক্তিকর্ণামৃত ১-৫৫-২। এইরূপ একটি শ্লোক লক্ষ্মণসেনের পুত্র কেশবসেনের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে (১-৪৫-৫), কিন্তু পদ্যাবলীতে এটি লক্ষ্মণসেনদেবের নামেই উদ্ধৃত হইয়াছে।

২। মোতীলাল বনারসীদাস কর্ত্তৃক ১৯৩৩ সালে প্রকাশিত।

'কেশরকোনীয়') নাথোক, তালহড়ীয় রক্ষ, রত্নমালীয় পুণ্ড্রোক, গোতিথীয় দিবাকর, কেন্দ্রনীল নারায়ণ, ভবগ্রামীণ বাথোক, করঞ্জ ধনঞ্জয়, করঞ্জ মহাদেব, করঞ্জ যোগেশ্বর। কতকগুলি কবির উপাধি বা জাতির উল্লেখ হইতে তাঁহাদিগকে বাঙ্গালী বলিয়া জানা যায়। যেমন—কেবট্ট পপীপ, কালিদাস-নন্দী, তরণি-নন্দী, রুদ্র-নন্দী, সাঙ্ক-নন্দী, ত্রিপুরারি-পাল, দিবাকর-দত্ত, লঙ্ক-দত্ত, বৈদ্য জীবদাস, গদাধর-নাথ, বাসুদেব-সেন ইত্যাদি। এক বাঙ্গাল কবির ("বঙ্গালস্য") দুইটি কবিতা উদ্ধৃত হইয়াছে।[১] নট গাঙ্গোক বাঙ্গালী ছিলেন। ইঁহার ও ইঁহার পুত্রবধূর সম্বন্ধে এক কাহিনী সেকশুভোদয়ায় পাওয়া যায়।

জয়দেবের গীতগোবিন্দের গীত বা পদগুলি মূলে প্রাকৃতে অথবা অপভ্রংশে রচিত হইয়াছিল, পরে এগুলিকে সংস্কৃত রূপ দেওয়া হয়,—কাহারো কাহারো এইরূপ ধারণা আছে। জর্মান পণ্ডিত লাসেন (Lassen) সর্ব্বপ্রথম এই মত প্রচার করেন, তাহার পর পিশেল (Pischel) সাহেব ইহার বিশেষ পোষকতা করেন। কিন্তু এইরূপ অনুমানের সাপক্ষে যুক্তি বড় কিছু নাই। সত্য বটে, "সুমরই মণু মম কিঅ পরিহাসঁ" এইরূপ পড়িলে ছন্দ ঠিক থাকে, কিন্তু "স্মরতি মনো মম কৃতপরিহাসম্" এই পাঠেও তো ছন্দঃপতন হয় না। অবশ্য দুই এক স্থলে সংস্কৃত ধ্বনিপদ্ধতির হিসাবে ছন্দোভ্রংশ দেখা যায় এবং প্রাকৃতের মত পড়িলে ছন্দ ঠিক হইয়া যায়। যেমন—(১) "শ্রিতকমলাকুচমণ্ডল ধৃতকুণ্ডল কলিত-ললিতবনমাল" ইত্যাদি পদটিতে প্রত্যেক চরণে ১২+৬+১১ মাত্রা করিয়া; কিন্তু শেষ চরণ—"শ্রীজয়দেবকবেরিদং কুরুতে মুদং মঙ্গলমুজ্জ্বলগীতি"—এখানে প্রথম যতিতে ১২ স্থলে ১৩ এবং দ্বিতীয় যতিতে ৬ স্থলে ৭ মাত্রা পাইতেছি। এখানে 'ইদং' 'মুদং' স্থলে অপভ্রংশ ধ্বনি-পদ্ধতি অনুযায়ী 'ইদঁ' 'মুদঁ' পড়িলে ছন্দঃপতন হয় না। (২) "সজলনলিনীদলশীলিতশয়নে।

১। ২-৭০-৪; ৫-৩১-২।

হরিমবলোকয় সফলয় নয়নে ॥" এখানে প্রথম চরণের প্রথম যতিতে ৮ মাত্রার স্থলে ৯ মাত্রা পাওয়া যাইতেছে। "নলিনী" পদটি অপভ্রংশ অনুযায়ী "নলিনি" পড়িলে ছন্দোভঙ্গ এড়ান যায়। অথবা "নলিন" এই পাঠকল্পনা করিলেও চলে। কিন্তু শুদ্ধ এই দুইটি সন্দিগ্ধ উদাহরণের উপর নির্ভর করিয়া পদগুলি মূলতঃ সংস্কৃতে রচিত হয় নাই এমন অনুমান কি করিয়া হইতে পারে?

বাঙ্গালা ভাষায় রচিত না হইলেও গীতগোবিন্দ শুধু বাঙ্গালীর রচনা বলিয়া নহে, বাঙ্গালী জাতির কাব্য বলিয়া চিরদিন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্তর্গত হইয়া আসিয়াছে ও আসিবে। বাঙ্গালা সাহিত্যের আবহমান ইতিহাসে আর দ্বিতীয় কোন কাব্য অদ্যাবধি রচিত হয় নাই যাহা এই সাত আট শতাব্দী ধরিয়া সমানভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে রস সঞ্চার করিয়া ও বাঙ্গালী পাঠককে আনন্দ যোগাইয়া আসিতেছে। বড়ু চণ্ডীদাস হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত বাঙ্গালীর প্রায় সকল শ্রেষ্ঠ কবিই গীতগোবিন্দ হইতে কিছু না কিছু অনুপ্রেরণা লাভ করিয়াছেন। আরও এক কথা। কালিদাসের মেঘদূত ছাড়া আর অন্য কোন কাব্য অদ্যাবধি সমগ্র ভারতবর্ষে এরূপ সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। মেঘদূত যেমন অজস্র কবিকে "-দূত" কাব্যের প্রেরণা যোগাইয়াছে গীতগোবিন্দ তেমনি অসংখ্য কবিকে "গীত-" কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছে।

শিখগুরু অর্জ্জুন কর্ত্তৃক ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে সঙ্কলিত গ্রন্থসাহেবে জয়দেবের ভণিতাযুক্ত দুইটি অপভ্রংশ (একটি সংস্কৃতে রচিত হইতেও পারে) পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। পদ দুইটি এরূপ বিকৃত হইয়াছে যে, তাহার পাঠনির্দ্ধারণ অথবা অর্থগ্রহণ একেবারে অসম্ভব।

অপভ্রংশ ছন্দের লক্ষণবিচার বিষয়ে একটি বই পাওয়া গিয়াছে। গ্রন্থটির নাম প্রাকৃতপৈঙ্গল।[২] আভ্যন্তরীণ প্রমাণ বিচার করিলে দেখা যায় যে,

২। Bibliotheca Indica গ্রন্থমালায় প্রকাশিত।

প্রাকৃতপৈঙ্গল চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে বিভিন্ন ছন্দের যে সকল উদাহরণ দেওয়া আছে তাহা প্রায় সবই অর্ব্বাচীন অপভ্রংশে রচিত। কয়েকটি উদাহরণ-শ্লোকের ভাষা প্রাচীন হিন্দী বলা যাইতে পারে। দুই চারিটি শ্লোক বা কবিতা মূলতঃ প্রাচীন বাঙ্গালা অথবা বাঙ্গালার ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অপভ্রংশ রূপে বর্ত্তমান ছিল এইরূপ ধারণা করিবার কারণ আছে। অন্ততঃ ঐ কবিতাগুলি যে বাঙ্গালা দেশে এবং বাঙ্গালী কবির রচিত তাহা বুঝিতে বিলম্ব হয় না। উদাহরণস্বরূপ এইরূপ তিনটি কবিতা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। প্রথমটি শ্রীকৃষ্ণের নৌকাবিলাসের শ্লোক। দ্বিতীয়টি বাঙ্গালীর প্রিয় খাদ্যব্যঞ্জনাদির একটি তালিকা। তৃতীয় শ্লোকটির 'গাছ' আর 'আছে' পদ দুইটি বাঙ্গালা ভাষার।

আরে রে বাহহি কাহ্ন নাব ছোটি ডগমগ কুগতি ণ দেহি।
তই ইথি ণইহি সন্তার দেই জো চাহহি সো লেহি॥ পৃ ১২॥

অর্থাৎ—ওরে রে কৃষ্ণ, তুমি ছোট নৌকাটি টলমল (করিয়া) বাহিতেছ। (নদীতে ডুবাইয়া আমাদিগকে) কুগতি দিও না। অতএব এই নদীতে সাঁতার দিয়া যাহা চাও তাহা লও।

ওগ্গরভত্তা রম্ভঅ-পত্তা গাইক ঘিত্তা দুদ্ধ-সজুত্তা।
মোইলি-মচ্ছা নালিচ-গচ্ছা দিজ্জই কন্তা খা পুনবন্তা॥ পৃ ৪০৩॥

অর্থাৎ—ওগ্রা ভাত, রম্ভার পাত, গাওয়া ঘি, দুগ্ধ সংযুক্ত, মৌরলা মাছ, নালিতা শাক—কান্তা দিতেছে, পুণ্যবান খাইতেছে।

ণব-মঞ্জরি-সজ্জিঅ-চূঅঅ গাছে পরিফুল্লিঅ কেসু ণআ বণ আছে।
জই এত্থি দিগন্তর জাহিই কন্তা কিঅ বম্মহ ণত্থি কি ণত্থি বসন্তা॥
পৃ ৪৬৫॥

অর্থাৎ—(আমাদের গৃহের সন্নিকটে) নবমঞ্জরীসজ্জিত চূত গাছে এবং পরিফুল্লিত কিংশুক (বৃক্ষে পরিপূর্ণ) নব বন আছে। যদি এতেও কান্ত দিগন্তর যায়, তবে কি মন্মথ নাই, বসন্তও কি নাই?

বাঙ্গালী বৌদ্ধ ও শৈব তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য্যেরা অপভ্রংশে কিছু কিছু তত্ত্ব ও সাধন ঘটিত কবিতা বা 'দোহা' লিখিয়া গিয়াছেন।[১] ভাষা হিসাবেও বটে এবং বিষয় হিসাবেও বটে, এই দোহাগুলিতে বাঙ্গালা সাহিত্যের অব্যবহিত পূর্ব্বতন রূপ বিদ্যমান আছে। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল।

সহজ ছড়ি জো ণিব্বাণ ভাবিউ। ণউ পরমত্থ এক্ক তেঁ সাহিউ ॥
জো জস্‌ জেণ হোই সংতুট্‌ঠো। মোক্‌খ কি লব্ভই ঝাণ পবিট্‌ঠো ॥
কিন্তহ দীবেঁ কিন্তহ নিবেজ্জেঁ। কিন্তহ কিজ্জই মন্তহ সেব্বঁ ॥
কিন্তহ তিত্থ তপোবন জাই। মোক্‌খ কি লব্ভই পানী হ্নাই ॥
ছড্ডহু রে আলীকা বন্ধা। সো মুঞ্চউ জো অচ্ছহু ধন্ধা ॥
তস্‌ পরিআণেঁ অণ্ণ ণ কোই। অবরেঁ গণ্ণেঁ সব্ববি সোই ॥
সোবি পঢিজ্জই সোপি গুণিজ্জই। সত্থ-পুরাণেঁ বক্‌খাণিজ্জই ॥
ণাহি সো দিট্‌ঠি জো তাউ ণ লক্‌খই। এক্কেঁ বর-গুরু-পাঅ পেক্‌খই ॥
জই গুরু-বুত্তউ হিঅই পইসই। ণিচ্চিঅ হত্থে ঠবিঅউ দীসই[২] ॥
সরহ ভণই জগ বাহিঅ আলেঁ। ণিঅসহাব ণউ লক্‌খিউ বালেঁ ॥
ঝাণহীণ পব্বজ্জেঁ রহিঅউ। ঘরহি বসন্তেঁ ভজ্জে সহিঅউ ॥
জই ভিড়ি বিসঅ রমন্ত ণ মুচ্চই। সরহ ভণই পরিআণ কি মুচ্চই[৩] ॥
জই পচ্চক্‌খ কি ঝাণে কীঅঅ। জই পরোক্‌খ অন্ধার ম ধীঅঅ ॥
সরহেঁ ণিত্তঁ কড্ডিউ বাব। সহজ সভাব ণ ভাবাভাব ॥ পৃ ১০-১২ ॥

অর্থাৎ—সহজ ছাড়িয়া যে নির্ব্বাণ ভাবিয়াছে, তাহার দ্বারা পরমার্থ একটুকুও সাধিত হয় নাই। যে যাহাতে যেরূপে সন্তুষ্ট হয় (তাহার সাধন পথ তাহাই)। ধ্যানে প্রবিষ্ট হইলে কি মোক্ষ লাভ হয়? তাহা হইলে দীপে কি হইবে? নৈবেদ্যে কি হইবে? মন্ত্রের সেবা করিলেই বা কি হইবে?

১। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী প্রণীত Doha-Kosa (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Journal of the Department of Letters, Vol. XXVIII দ্রষ্টব্য)।

২। মূলে 'নিচ্চিঅ হত্যোঠ বিঅ উদীসই'।

৩। 'বুচ্চই'?

তবে তীর্থ তপোবনে গেলে কি হইবে? জলে নাহিলে কি মোক্ষ পাওয়া যায়? ওরে, অলীক বন্ধন ছাড়। যে ধাঁধায় আছে সে মুক্ত হউক। তাহার (অর্থাৎ তত্ত্ববস্তুর) পরিজ্ঞানে অন্য কিছুরই অস্তিত্ব থাকে না। আর, অপর বস্তুর বিচার করিলে সকলই সেই (তত্ত্ববস্তু) হইয়া দাঁড়ায়। তাহাই পঠিত হয়, তাহাই বিচারিত হয়, তাহাই শাস্ত্র পুরাণে ব্যাখ্যাত হয়। সে দৃষ্টি নাই, তাহাতে ইহার উপলব্ধি হয় না। (তবে) কেহ কেহ সদ্‌গুরুর পদ নিরীক্ষণ করে (অর্থাৎ গুরুর নিকট তত্ত্বদৃষ্টি লাভ করে)। যদি গুরুর উক্তি হৃদয়ে প্রবেশ করে, (তাহা হইলে ইহা) হস্তস্থাপিত (অর্থাৎ হস্তামলকবৎ) দৃষ্ট হয়। সরহ বলে জগৎ মিথ্যায় বাহিত হইতেছে; মূর্খ লোকে নিজস্বভাবকে লক্ষ্য করিতেছে না! ধ্যানহীন, অথচ প্রব্রজ্যায় থাকে, এবং ভার্য্যাসহিত গৃহে বাস করে। যদি প্রগাঢ়ভাবে বিষয় ভোগ করিয়া মুক্ত না হয়, তবে কি পরিজ্ঞানে মুক্ত হইবে? (তত্ত্ববস্তু) যদি প্রত্যক্ষগোচর হয়, তবে ধ্যানে কি করিতেছ? যদি পরোক্ষ হয়, তবে আঁধারে ধ্যান করিও না। সরহ সর্ব্বদা রা কাড়ে—সহজই স্বভাব, ইহার ভাবও নাই অভাবও নাই।

এক্কু ণ কিজ্জই মন্ত ণ তন্ত। নিঅ-ঘরিণি লই কেলি করন্ত॥
নিঅ-ঘরে ঘরিণি জাব ণ মজ্জই। তাব কি পঞ্চবণ্ণ বিহরিজ্জই॥
এসো জপ হোমে মঙ্গল[1]-কম্মে। অণুদিণ অচ্ছসি বাহিউ[2] ধম্মে॥
তো বিণু তরুণি ণিরন্তর ণেহেঁ। বোহি কি লব্ভই এণ বি দেহেঁ॥ পৃ ২৭॥

অর্থাৎ—(সাধক) একটিও করে না, না মন্ত্র না তন্ত্র, শুধু নিজ গৃহিণী লইয়া ক্রীড়া করে। নিজ গৃহে যাবৎ না মগ্ন (অথবা মৃত) হয়, তাবৎ কিরূপে পঞ্চবর্ণ লইয়া বিহার করা যায়? এই জপ হোম মঙ্গল-কর্ম্মাদি রূপ বাহ্য ধর্ম্মে তুমি অনুদিন (লিপ্ত হইয়া) রহিয়াছ! হে তরুণি, তোমার নিরন্তর স্নেহ বিনা কি এই দেহে বোধিলাভ হয়?

১। 'মণ্ডল' পুঁথির ও মুদ্রিত পাঠ।
২। 'কাহিউ' পুঁথির ও মুদ্রিত পাঠ; টীকায় আছে "বাহ্যভূতেন" সুতরাং অর্থসঙ্গতির জন্য 'বাহিউ' করা গেল।

হলে সহি বিঅসিঅ-কমলু পবোহিউ বজ্জেঁ।
অললললহো মহাসুহেণ আরোহিউ ণচ্চেঁ ॥
রবিকিরণেঁ প্রফুল্লিউ কমলু মহাসুহেণ।
অললললহো মহাসুহেণ আরোহিউ ণচ্চেঁ ॥ পৃ ৩২ ॥

অর্থাৎ—ওলো সহি, বিকশিত কমল বজ্রের দ্বারা প্রবোধিত হইয়া মহাসুখে নৃত্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে; রবিকিরণে প্রফুল্লিত কমল মহাসুখে নৃত্যে প্রবৃত্ত হইয়াছে।

বৌদ্ধ ও শৈব তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য্যদিগের এইসকল দোহা বা অপভ্রংশ পদ পারিভাষিক শব্দে কণ্টকিত হইলেও, ছন্দের জন্য ও গাঢ়বদ্ধ ভাব ও ভাষার জন্য এগুলির একটু বিশেষ মাধুর্য্য আছে। বাহ্য অর্থ ছাড়াও, এই সকল পদের একটি গভীর অর্থ আছে, সেই অর্থ ইঁহাদের সাধন-সঙ্কেত দ্যোতনা করে। কিন্তু এই ভিতরের অর্থ এখন আমাদের কাছে সকল সময় বিশেষ স্পষ্ট নহে, এবং যেটুকু বুঝা যায়, তাহা খুলিয়া বলাও সর্ব্বত্র শোভন এবং নিরাপদ নহে। যাহা হউক, সাহিত্য হিসাবে এই পদগুলির আদর বাহ্য অর্থ লইয়াই।

এই সিদ্ধাচার্য্যদিগের আবির্ভাবকাল লইয়া মতভেদ আছে। শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ বলেন যে, প্রাচীনতর সিদ্ধাচার্য্য যথা লুইপাদ প্রভৃতি খ্রীষ্টীয় সপ্তম ও অষ্টম শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয়দ্বয়ের মতে সিদ্ধাচার্য্যদিগের কাল স্থূলতঃ দশম হইতে দ্বাদশ শতকের মধ্যে পড়ে। নানা কারণে ইঁহাদের মতই সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। সিদ্ধাচার্য্যদিগের আবির্ভাব কালের নিম্নতম সীমা খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতক, কারণ ঐ শতকের প্রথম পাদে রচিত মৈথিল পণ্ডিত জ্যোতিরীশ্বরের বর্ণনরত্নাকরে চৌরাশী সিদ্ধার তালিকায় বাঙ্গালী সিদ্ধাচার্য্যদিগের অনেককেই পাইতেছি। যেমন—দারিপা (দারিক), বিরূপ (বিরুআ), জালন্ধর, কাহ্ন, ঢেণ্ঢণ, ভাদে, কামলি, শবর, শান্তি, চাটল (চাটিল), তান্তি ইত্যাদি।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ

দশম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী : চর্য্যাপদ

সকল দেশে এবং সকল যুগে দেখা গিয়াছে যে, সাহিত্যসৃষ্টির উন্মেষ হইয়াছে ধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া। ধর্ম্মের বাহন হইয়াই ভাষা সাহিত্যের দরবারে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। বাঙ্গালা ভাষার ইতিহাসেও আমরা ইহার প্রমাণ পাই। বাঙ্গালা ভাষা যখন নবজাত শিশু, তখন বাঙ্গালী কবির সাহিত্যসৃষ্টির প্রধান অবলম্বন ছিল সংস্কৃত। ইহার কারণও আমরা পূর্ব্ববর্ত্তী পরিচ্ছেদে নির্দ্দেশ করিয়াছি। কিন্তু যাঁহারা তথাকথিত পণ্ডিত অথবা অভিজাত নহেন, যাঁহাদের কারবার সমাজ ও জাতির নিম্নস্তরের ব্যক্তিদিগকে লইয়া, যাঁহারা এইরূপ লোকের জন্যই 'পদ' অর্থাৎ গান রচনা করিতেন অথবা উপদেশাত্মক ছড়া কাটিতেন, তাঁহাদের রচনার ভাষা তো সংস্কৃত হইলে চলিবে না, তাঁহারা অশিক্ষিত জনসাধারণের সহজবোধ্য "ভাষাতে" গীতাদি রচনা করিতে বাধ্য হইলেন। এমনি করিয়া তান্ত্রিক বজ্রাচার্য্য ও শৈব নাথাচার্য্যদিগের হস্তে বাঙ্গালা সাহিত্যের ভিত্তিস্থাপন হইল। অদ্যাবধি যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার মধ্যে সিদ্ধাচার্য্যদিগের সাধনতত্ত্বজ্ঞাপক 'চর্য্যাপদ'গুলিতেই অঙ্কুরোদ্‌গত বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম নিদর্শন রহিয়াছে।

চর্য্যাপদগুলির সামসময়িক প্রাচীন বাঙ্গালায় একটি রাধাকৃষ্ণবিষয়ক পদ বা গীতির এবং বিষ্ণুর দশাবতারস্তোত্রের যৎসামান্য টুকরা পাওয়া গিয়াছে মানসোল্লাস বা অভিলাষার্থচিন্তামণি নামক বিশ্বকোষজাতীয় গ্রন্থের 'গীতবিনোদ' নামক সঙ্গীত ও ছন্দঃশাস্ত্র সম্বন্ধীয় অংশে।[১] মানসোল্লাস ১০৫১ শকাব্দে অর্থাৎ ১১২৯-৩০ খ্রীষ্টাব্দে মহারাষ্ট্রের দ্বিতীয় চালুক্যবংশের রাজা সোমেশ্বর ভূলোকমল্লের নির্দ্দেশে রচিত হয়। পদ দুইটির বাঙ্গালা অংশটুকু নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল। বলা বাহুল্য, মহারাষ্ট্র দেশে গিয়া এবং

১। ব-সা-প-প ৩৩, পৃ ১১-৩৬।

মহারাষ্ট্রীয় লিপিকারের হস্তে পড়িয়া ভাষায় যথেষ্ট বিকৃতি ঘটিয়াছে। তথাপি ভাষা যে মূলতঃ বাঙ্গালা তাহাতে সন্দেহের অবকাশ নাই।

·· ···ছাড়ু ছাড়ু মই জাইবো গোবিন্দ সহ খেলণ······

নারায়ণু জগহকেরু গোসাঁঈ।

অর্থাৎ— ···ছাড় ছাড়, আমি যাইব গোবিন্দ সহ খেলিতে······নারায়ণ জগতের গোঁসাই।

জে ব্রাহ্মণের কুলেঁ উপজিয়াঁ, কাতবীর্যা জেণেঁ বাহুফরসে খাণ্ডিয়া. পরশরামু দেউ শে মোহর[২] মঙ্গল করউ।

অর্থাৎ—যিনি ব্রাহ্মণের কুলে উৎপন্ন হইয়াছিলেন, কার্ত্তবীর্য্য যাঁহার দ্বারা বাহু-স্পর্শে খণ্ডিত হইয়াছিল, সেই পরশুরাম দেব আমার মঙ্গল করুন।

দশাবতারস্তোত্রের অপর অংশগুলি যতটুকু পড়িতে পারা গিয়াছে তাহার কোনটি প্রাচীন মারাঠীতে, কোনটি বা প্রাচীন হিন্দীতে (ব্রজভাষায়) লেখা বলিয়া মনে হয়। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন যে, মৎস্যাবতারবন্দনা অংশটুকুও সম্ভবতঃ মূলে প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত ছিল।

নেপাল রাজদরবারের গ্রন্থাগার ঘাঁটিয়া সিদ্ধাচার্য্যদিগের চর্য্যাপদের পুঁথি আবিষ্কার করা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের অন্যতম অক্ষয় কীর্ত্তি। শুধু বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের নহে, আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলিয়া এই পদগুলি যথার্থই অমূল্য। চর্য্যাপদের পুঁথিটি আর তিনটি অপভ্রংশ দোহার পুঁথির সহিত একত্রে শাস্ত্রী মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৩২৩ সালে "হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা" নামে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। শাস্ত্রী মহাশয় সবগুলি পুঁথির ভাষাকেই প্রাচীন বাঙ্গালা মনে করিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা সত্য নহে। শুধু প্রথম পুঁথি চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের ভাষাই বাঙ্গালা, অপরগুলি অপভ্রংশে রচিত। 'চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়' নামটি অশুদ্ধ, শুদ্ধ নাম হইবে 'চর্য্যাশ্চর্য্যবিনিশ্চয়'; এটি অবশ্য টীকার নাম। টীকাকারের

২। মূলে 'মাহর'।

মতে[১], পদসংগ্রহের নাম 'আশ্চর্য্যচর্য্যাচয়'। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের পুঁথি খুব প্রাচীন নহে, চতুর্দ্দশ হইতে ষোড়শ শতকের মধ্যে অনুলিখিত বলিয়া অনুমান হয়। মূল টীকাটির রচনাকাল খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর পূর্ব্বে বলিয়া বোধ হয় না। চর্য্যাপদগুলি টীকারচনার বহুপূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল, কেননা টীকার মধ্যে বহু পাঠান্তর পাওয়া যাইতেছে।

চর্য্যাপদগুলি প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত হইলেও ইহাতে অপভ্রংশের ছাপ ও ছাঁদ কিছু কিছু থাকায় কেহ কেহ এই ভাষাকে বাঙ্গালা বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠিত হন, এবং কেহ কেহ বা স্পষ্টই ইহাকে প্রাচীন (হিন্দী' অথবা বাঙ্গালা ছাড়া অপর কোন আধুনিক ভারতীয় আর্য্য ভাষা) প্রতিপন্ন করিতে প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের গবেষণার সাহায্যে চর্য্যাপদের ভাষা যে প্রধানতঃ এবং মূলতঃ বাঙ্গালা তাহা নিশ্চিতভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে।

চর্য্যাসংগ্রহটিতে সর্ব্বসমেত একান্নটি 'চর্য্যা' বা পদ ছিল। তন্মধ্যে একটির সংখ্যা দেওয়া নাই এবং সেটি টীকাকার ব্যাখ্যা করেন নাই বলিয়া পুঁথিতে উদ্ধৃত হয় নাই[২], এবং পুঁথির মধ্যেকার কয়েকটি পাতা নষ্ট হওয়ায় তিনটি সম্পূর্ণ পদ [২৪, ২৫, ৪৮] আর একটি পদের [২৩-এর] কিয়দংশ পাওয়া যায় নাই। অতএব সর্ব্বসমেত সাড়ে-ছেচল্লিশটি পদ পাওয়া যাইতেছে। ইহার সঙ্গে অতিরিক্ত দুইটি পদ ও পদের অংশও ধরিতে হইবে। একটি পদের [২১-এর] ব্যাখ্যায় টীকাকার মীননাথের ভণিতাযুক্ত একটি বাঙ্গালা দোহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। অষ্টাদশ সংখ্যক পদের ব্যাখ্যায় টীকাকার অপর একটি চর্য্যার এক পংক্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন—"থালত পড়িলেঁ কাপুর নাশয়ে ;" এটি অপ্রাপ্ত চর্য্যাগুলির কোনটিতে ছিল অথবা নূতন কোন চর্য্যায় ছিল কি না তাহা বলা দুষ্কর।

১। "শ্রীলূয়ীচরণাদিসিদ্ধরচিতেহপ্যাশ্চর্য্যচর্য্যাচয়ে।"

২। দশম চর্য্যার ব্যাখ্যার শেষে টীকাকার বলিয়াছেন, "লাড়ীডোম্বীপাদানাম্ সুনেত্যাদি চর্য্যায়া ব্যাখ্যা নাস্তি।"

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের তিব্বতী অনুবাদ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহাতে পূর্ব্বোক্ত সাড়ে তিনটি লুপ্ত পদের অনুবাদও আছে।[১] এই তিব্বতী অনুবাদ চর্য্যাপদগুলির কঠিন অংশগুলির যথার্থ অর্থবোধে বিশেষ সাহায্য করিয়াছে।

চর্য্যাপদগুলিতে আমরা সর্ব্বসমেত ২৪ জন কবির রচনা বা রচনার সন্ধান পাইতেছি। অবশ্য সকলে স্থলেই যে, যাঁহার ভণিতা তিনিই রচয়িতা এইরূপ অনুমান করিতে হইবে, এমন কোন কথা নাই। অনেকে নিজের নামের বদলে গুরুর ভণিতা দিয়া থাকিবেন। তবে মোটামুটিভাবে ভণিতায় কবিরই নাম আছে, এইরূপ ধরিয়া লইলে বিশেষ ক্ষতি হইবে না।

নিম্নলিখিত সিদ্ধাচার্য্যদিগের পদ চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। তালিকাতে কাহার কয়টি পদ তাহাও নির্দ্দিষ্ট হইল।

লুইপাদ—চর্য্যা ১, ২৯।
কুক্কুরীপাদ—চর্য্যা ২, ২০, ৪৮ (শেষোক্ত পদটি পুঁথি খণ্ডিত থাকায় পাওয়া যায় নাই, তবে টীকার শেষাংশ পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় যে রচয়িতা কুক্কুরীপাদ।[২])

বিরূঅপাদ—চর্য্যা ৩।
গুণ্ডরীপাদ—চর্য্যা ৪।
চাটিলপাদ—চর্য্যা ৫।
ভুসুকুপাদ—চর্য্যা ৬, ২১, ২৩, ২৭, ৩০, ৪১, ৪৩, ৪৯।
কাহ্নুপাদ—চর্য্যা ৭, ৯-১৩, ১৮, ১৯, ২৪[৩], ৩৬, ৪০, ৪২, ৪৫।
কামলিপাদ—চর্য্যা ৮।
ডোম্বীপাদ—চর্য্যা ১৪।

১। Journal of the Department of the Letters (Calcutta University), Vol. XXX (১৯৩৮)।

২। "কুক্কুরীপাদেন তো যোগিন্" ইত্যাদি, পৃ ৭২।

৩। এই চর্য্যাটি পাওয়া যায় নাই, তবে তিব্বতী অনুবাদে কৃষ্ণাচার্য্যের নামে উল্লিখিত হইয়াছে।

লাড়ীডোম্বীপাদ—চর্য্যা উদ্ধৃত হয় নাই (১০ সংখ্যক চর্য্যার টীকা দ্রষ্টব্য)।

শান্তিপাদ—চর্য্যা ১৫, ২৬।

মহিত্তাপাদ—চর্য্যা ১৬।

বীণাপাদ—চর্য্যা ১৭।

সরহপাদ—চর্য্যা ২২, ৩২, ৩৮, ৩৯।

তন্ত্রীপাদ—চর্য্যা ২৫ (পুঁথি খণ্ডিত থাকায় পদটি পাওয়া যায় নাই, তবে টীকার শেষ অংশটুকু পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে টীকাকার বলিতেছেন "বইঠামনীতি ময়া নিত্যরূপা ময়া তন্ত্রীপাদেন প্রাপ্তা"।)

শবরপাদ—চর্য্যা ২৮, ৫০।

আর্য্যদেবপাদ—চর্য্যা ৩১।

ঢেণ্ঢণপাদ—চর্য্যা ৩৩।

দারিকপাদ—চর্য্যা ৩৪।

ভাদেপাদ—চর্য্যা ৩৫।

তাড়কপাদ—চর্য্যা ৩৭।

কঙ্কণপাদ—চর্য্যা ৪৪।

জয়নন্দীপাদ—চর্য্যা ৪৬।

ধামপাদ—চর্য্যা ৪৭।

এই নামের কতকগুলি—যেমন কুক্কুরী, বীণা, তন্ত্রী, তাড়ক, কঙ্কণ—এগুলি ছদ্মনাম বলিয়া মনে হয়।

(লুইপাদ সর্ব্বসম্মতিক্রমে বজ্রাচার্য্যদিগের আদি সিদ্ধা রূপে উল্লিখিত হইয়াছেন। সেই হিসাবে ইঁহাকে আদি চর্য্যাকার বলিতে পারা যায়। অনেকে অনুমান করেন যে, লুইপাদ আর মৎস্যেন্দ্রনাথ বা মীননাথ অভিন্ন। মৎস্যেন্দ্র-নাথ বা মীননাথ শৈব তান্ত্রিক বা যোগিদিগের আদি সিদ্ধ। লুই < লোহি < রোহিত = মৎস্যেন্দ্র, মীন—এইরূপে অর্থের দিক দিয়া কিছু সঙ্গতি হয় বটে, কিন্তু টীকাকার মীননাথের শ্লোক উদ্ধার করিতে গিয়া বলিয়াছেন, "তথাচ শবদর্শনে মীননাথঃ।")

লুইপাদের রচনার নমুনা স্বরূপ প্রথম চর্য্যাটি ও তাহার ভাবার্থ নিম্নে দেওয়া গেল। বর্ত্তমান আলোচনায় যে সকল চর্য্যা উদ্ধৃত হইবে সেগুলির পাঠ শ্রীযুক্ত প্রবোধবাবুর প্রকাশিত তিব্বতী অনুবাদের সাহায্যে যথাসম্ভব শুদ্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অপভ্রংশ দোহাগুলির মত চর্য্যাপদগুলিরও সাধনসঙ্কেতদ্যোতক গভীরতর অর্থ আছে। কিন্তু সে অর্থ এখন সম্পূর্ণরূপে জানিবার কোনই উপায় নাই। গুরুমুখী বিদ্যা সাধন-সাপেক্ষ, পরম্পরা লুপ্ত হইলে তাহার কোন হদিস মিলিতে পারে না। তাহার উপর, ভাষার সঙ্কেত সর্ব্বত্র সুবোধ্য নহে। তবে চর্য্যাগুলির বাহ্য অর্থ হইলেই সাধারণ সাহিত্যানুসন্ধিৎসুর পক্ষে যথেষ্ট হইবে।

> কাআ তরুবর পঞ্চ বি ডাল। চঞ্চল চীএ পইঠো কাল ॥
> দিঢ করিঅ মহাসুহ পরিমাণ। লুই ভণই—গুরু পুচ্ছিঅ জাণ ॥
> সঅল সমাহিঅ কাহি করিঅই। সুখ দুখেতেঁ নিচিত মরিঅই ॥
> এড়িঅ ছান্দক বান্ধ করণক আস। সুন পাখ ভিড়ি লেহুরে পাস ॥
> ভণই লুই—আম্হে ঝানে দিঠা। ধমণ চমণ বেণি পিণ্ডি বইঠা ॥ ১ ॥

অর্থাৎ—কায়া তরু (স্বরূপ), (তাহার) পাঁচটি ডাল; চঞ্চল চিত্তে কাল প্রবিষ্ট হইয়াছে। দৃঢ় করিয়া মহাসুখ পরিমাণ কর। লুই ভণে, গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়া জান। সকল সমাধি লইয়া কি করা যায়? (লোকে) সুখ ও দুঃখ ভোগ করিয়া মারা পড়ে। ছন্দের বন্ধ ও করণের আশা ছাড়িয়া শূন্য পক্ষকে ভিড়িয়া (নিবিড় ভাবে) আলিঙ্গন কর। লুই ভণে—আমি ধ্যানে দেখিলাম ধমন চমন (অর্থাৎ শ্বাস-প্রশ্বাস) রূপ উভয় পিঁড়িতেই উপবিষ্ট হইয়াছি।

কুক্কুরীপাদের দুইটি চর্য্যার একটিতে [২] 'গাইল' স্থানে 'গাইড়' ও 'সমাইল' স্থলে 'সমাইড়' পাওয়া যায়, এবং অপটিতে [২০] 'ভণথি' পদ পাওয়া যায়। ইহা হইতে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন যে, এই কবি উড়িষ্যা অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন। কিন্তু উড়িয়াতে 'গাইল' স্থলে 'গাইড়' হইতে পারে না; সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দে একক-অবস্থিত ল-কার থাকিলে, সেই 'ল' উড়িয়াতে মূর্দ্ধন্য ল হইয়া যায়, 'ড়' হয় না; এবং প্রাকৃত

'-ইল্ল'-প্রত্যয়ের প্রতিরূপ বাঙ্গালা ও উড়িয়া উভয়ত্রই '-ইল'। 'গাইড়' ও 'সমাইড়' পদ দুইটির মূল হইবে *গায়িত-ট ও * সমায়াত-ট ; এই দুইটি উড়িয়ার নহে। 'ভণথি'র '-থি' প্রত্যয় মৈথিল ভাষার অনুসারী। ইহা নেপালে লিপিকারের উপর মৈথিলের প্রভাবজাত। এই চর্য্যাদ্বয়কে প্রাচীন বাঙ্গালায় রচিত বলিতে কোন আপত্তি হইতে পারে না। কুক্কুরীপাদের একটি পদ উদ্ধৃত করা গেল।

দুলি দুহি পিঠা ধরণ ন জাই। রুখের তেন্তলি কুম্ভীরে খাই ॥
আঙ্গন ঘর-পন, সুন ভো বিআতী। কানেট চোরেঁ নিল অধরাতী ॥
সসুরা নীদ গেল, বহুড়ী জাগই। কানেট চোরে নিল, কা গই মাগই ॥
দিবসই বহুড়ী কাঅই ডরে ভাই [১]। রাতি ভইলে কামরু জাই ॥
অইসন চর্য্যা কুক্কুরী-পাএঁ গাইড়। কোড়ি মঝেঁ একু হিঅহিঁ সমাইড় ॥২॥

অর্থাৎ—দুলি (কচ্ছপ) দুহিয়া পেটা বা পাত্রে (দুগ্ধ) ধরিতেছে না ; গাছের তেঁতুল কুমীরে খাইতেছে। অঙ্গন ঘরের পানে ; ওগো মহিলা, শুন। অর্দ্ধরাত্রে চোরে কানেট (কর্ণভূষণ বা অন্তর্বাস) লইয়া গেল। শ্বাশুড়ী নিদ্রা গিয়াছে, বহুড়ী জাগিয়া আছে; কানেট চোরে লইল, কোথায় গিয়া খোঁজা যায় ? দিবসে বহুড়ী কাকের ডরে ভয় পায়, আর রাত্রি হইলে কামরূপ যায়। এইরূপ চর্য্যা কুক্করীপাদে গাইল ; কোটি-মাঝে একটির হৃদয়ে ইহা প্রবেশ করিল।

এই পদটিতে তৎকালপ্রচলিত কতকগুলি ধাঁধা রহিয়াছে, এবং চতুর্থ পয়ারে একটি গল্পের বীজও আছে। এই গল্পের আভাস পাওরা যায় এই উদ্ভট শ্লোকে—

দিবা বিভেতি কাকেভ্যো রাত্রৌ সন্তরতে নদীম্।
তত্র নক্রভয়ং নাস্তি তদ্ধি জানন্তি তদ্বিদঃ ॥[১]

ডম্বরুপাদের আটটি পদ পাওয়া গিয়াছে। কাহ্ন্পাদ ছাড়া আর কোনও

১। 'কাড়ই ডরে রাই' (অর্থাৎ ডরে রা কাড়ে) এইরূপ পাঠও কল্পনা করা যাইতে পারে।

১। মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের প্রবোধচন্দ্রিকায় [৮-৩] এই শ্লোকটি এবং তদাশ্রিত গল্পটি পাওয়া আছে।

চর্য্যাকারের এতগুলি পদ পাওয়া যায় নাই। ভুসুকুর কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করা গেল।

কায়-হরিনি মেলি অচ্ছহু বাঁষ। বেঢ়িল হাক পড়ই চৌদীশ ॥
অপণা মাংসে হরিণা বৈরী। খনহ ন ছাড়ই ভুসুকু অহেরি ॥
তিণ ন ছুঅই হরিণা পিবই ন পানী। হরিণা হরিণির নিলয় ণ জানী ॥
হরিণী বোলই, সুণ হরিণা তো। এ বণ ছাড়ী হোহু ভান্তো ॥
তরসন্তে হরিণার খুর ন দীসঈ। ভুসুকু ভণই—মূঢ়া-হিঅহি ণ পইসঈ ॥৬॥

অর্থাৎ—কায়-হরিণী[২] বিষ লেপিয়া ছাড়া আছে; চারিদিক বেড়িয়া হাঁক পড়িতেছে। আপনার মাংসে হরিণ (জগতের) বৈরী; ক্ষণকালও আখেটী ভুসুকু (হরিণকে) ছাড়ে না। হরিণ তৃণ ছোঁয় না, জল পান করে না; হরিণ হরিণীর নিলয় জানে না। হরিণী বলে, "হরিণ তুই শোন্, এ বন ছাড়িয়া ভ্রান্ত (অর্থাৎ দূরগত) হও।" ত্রস্ত হরিণের খুর দেখা যায় না। ভুসুকু বলে, মূঢ়ের হৃদয়ে (ইহা) প্রবেশ করে না।

কায়-হরিণী এবং চিত্ত-হরিণের কল্পনা পরবর্ত্তী কালেও সহজিয়া ও বৈষ্ণব তান্ত্রিকদিগের রচনায় দেখা যায়। ১৬০৩ শকাব্দে অনুলিখিত নরোত্তমের দেহকড়চায়[৩] পাই—

সে প্রকৃতির দরশনে আনন্দিত মন।
মন হরিণ আশে করিল গমন ॥
ধনুরূপ হৈয়া থাকে নাহি জানে আন।
সেইরূপ নিরবধি করয়ে ধেয়ান ॥
সেইরূপ আসি তার হৃদয়ে পশিল।
হৃদয়ের মধ্যে সেই প্রকৃতি হইল ॥ ইত্যাদি।

২। তুলনীয়, আধুনিক "ঘাই-হরিণ"। মূলে কি 'ঘাঅ হরিনী' ছিল? শাস্ত্রী মহাশয়ের পাঠ স্পষ্টতঃই ভ্রান্ত, যদিও টীকায় এই পাঠের একটা সঙ্গত ব্যাখ্যার চেষ্টা আছে।

৩। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৪৫।

'অপণা মাংসে হরিণা বৈরী' এই প্রবচনটি পরবর্ত্তী কালে কবিকঙ্কণ প্রভৃতির কাব্যেও পাওয়া যায়।

আইএ অনুঅনা এ জগ রে, ভান্তিএঁ সো পড়িহাই।
রাজসাপ দেখি জো চমকই, সাচেঁ কিং তং বোড়ো খাই ॥
অকট জোইআ রে, মা কর হথা লোনা।
আইস সভাবেঁ জই জগ বুঝসি, তুটই বাসনা তোরা ॥
মরুমরীচি গন্ধবনইরী দাপন-পতিবিম্বু জইসা।
বাতাবৰ্ত্তেঁ সো দিঢ় ভইআ অপেঁ পাথর জইসা ॥
বাঁন্ধি সুআ জিম কেলি করই, খেলই বহুবিধ খেড়া।
বালুঅ-তেলেঁ সসরু-সিংগে আকাশ ফুলিলা ॥
রাউতু ভণই বট, ভুসুকু ভণই—বট সঅলা অইস সহাব।
জই সো মূঢ়া অচ্ছসি ভান্তী, পুচ্ছ তু সদ্‌গুরু-পাঅ ॥ ৪১ ॥

অর্থাৎ—আদিতে অনুৎপন্ন এই জগৎ ভ্রান্তিতে সেইরূপ প্রতিভাত হয়। রাজসাপ (অথবা রজ্জু-সর্প) দেখিয়া যে চমকিত হয়, সত্যই কি তাহাকে বোড়া খায়? ওরে মূর্খ যোগী, হাত নোনা করিও না; এই স্বভাবে জগৎকে যদি বুঝিতে পার তবে তোমার বাসনা টুটিবে। মরুমরীচিকা, গন্ধর্ব্বনগরী, দর্পণপ্রতিবিম্ব যেরূপ, বাত্যাবর্ত্তে দৃঢ় হইয়া জল পাথর হয় যেরূপ, বন্ধ্যার সুত যেমন কেলি করে, বহুবিধ খেলা খেলে—বালুকা-তৈল, শশশৃঙ্গ, পুষ্পিত আকাশ লইয়া। রাউত ভুসুকু বলে, ওরে বটু, সকলেরই স্বভাব এইরূপ। মূঢ়! যদি ভ্রান্তিতে থাক, তবে তুমি সদ্‌গুরুর পাদমূলে জিজ্ঞাসা কর।

বাজ-ণাব পাড়ী পঁউআ-খালেঁ বাহিউ। আদয় বঙ্গালে ক্লেশ লুড়িউ ॥
আজি ভুসুকু বঙ্গালী ভইলী। ণিঅ ঘরিণী চণ্ডালী লেলী ॥
দহিঅ পঞ্চ পাটন ইন্দিবিষয়া নাঠা। ণ জাণমি চিঅ মোর কহিঁ গই পইঠা ॥
সোণ রুঅ মোর কিম্পি ণ থাকিউ। নিঅ পরিবারে মহাসুহে থাকিউ [১] ॥
চউ কোড়ি ভাণ্ডার মোর লইআ শেষ। জীবন্তে মইলেঁ নাহি বিশেষ ॥৪৯॥

১। 'বুড়িউ' পাঠ হইবে কি? "মহাসুখরত্ননিমগ্নোহম্" টীকা।

অর্থাৎ—বজ্র নৌকা পাড়িয়া পদ্ম খালে বাহিত হইল; অদ্বয় বাঙ্গালে ক্লেশ লুণ্ঠন করিল। ভুসুকু, আজ তুই বাঙ্গালী হইলি, (যেহেতু) চণ্ডালীকে নিজ গৃহিণী করিয়া লইলি। পঞ্চ পাটন দগ্ধ, ও ইন্দ্রিয়বিষয় নষ্ট হইয়াছে। জানি না আমার চিত্ত কোথায় গিয়া প্রবিষ্ট হইয়াছে! সোনা রূপা আমার কিছুই থাকিল না; নিজ পবিবারে মহাসুখে রহিলাম। আমার চতুঃকোটি ভাণ্ডার শেষ করিয়া লইয়াছে, অতএব আর জীবন্ত ও মৃতের মধ্যে পার্থক্য নাই।

কাহ্নুপাদের বারটি চর্য্যা সংগৃহীত হইয়াছে। এতগুলি চর্য্যা আর কাহারও ভণিতায় পাওয়া যায় নাই। তবে সব চর্য্যাগুলি এক কবির রচনা নাও হইতে পারে। সিদ্ধাচার্য্যদিগের মধ্যে একাধিক কাহ্নুপাদ ছিলেন। একটি চর্য্যায় কবিব গুরু জালন্ধরিপাদের উল্লেখ পাই।[১] মাণিকচন্দ্র-ময়নামতীর গানে দেখি যে, জালন্ধরি শৈব তান্ত্রিক যোগী ছিলেন, ইহারই নামান্তব হাড়িপা। ইঁহার শিষ্য কানুপা বা কাহ্নুপাদ। কয়েকটি চর্য্যা হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কাহ্নুপাদ কাপালিক যোগী ছিলেন। চর্য্যাকারদিগের মধ্যে কাহ্নুপাদ বোধ হয় সর্ব্বকনিষ্ঠ ছিলেন। ইহার কতিপয় চর্য্যা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

নগর বাহিরেঁ ডোম্বি তোহরি কুড়িআ। ছোঁই ছোঁই যাইসি বাহ্মণা নাড়িআ॥
আলো ডোম্বি, তোএ সম করিব মো সাঙ্গ। নিঘিণ কাহ্নু কাপালি জোই লাঙ্গ॥
এক সো পদমা চৌষঠ্ঠী পাখুড়ী তহিঁ চড়ি নাচই ডোম্বী বাপুড়ী॥
হালো ডোম্বী, তো পুছমি সদভাবে। আইসসি যাসি ডোম্বি কাহরি নাবেঁ॥
তান্তি বিকণই ডোম্বি, অবর না চঙ্গেড়া। তোহর অন্তরে ছাড়ি নড়-পেড়া॥
তু লো ডোম্বী, হাউ কপালী। তোহর অন্তরে মোএঁ ঘলিলি হাড়েরি মালী।
সবোবর ভাঞ্জীঅ ডোম্বী খাই মোলাণ। মারমি ডোম্বি, লেমি পরাণ॥১০॥

অর্থাৎ—ডোমনী, নগর বাহিরে তোর কুঁড়ে, (আর তুই) নেড়া ব্রাহ্মণ (বটুকে) ছুঁইয়া ছুঁইয়া যাইস! ওলো ডোমনী, আমি তোর সঙ্গে সাঙ্গা করিব, (আমি) নির্ঘৃণ উলঙ্গ কাপালিক যোগী কাহ্নু। একটি সে পদ্ম, চৌষট্টি তার পাপড়ী; তাহাতে চড়িয়া ডোমনী আর কাপালিক নাচে।

১। "শাখি করিব জালন্ধরি পাএ" [৩৬]।

ওলো ডোমনী, তোকে আমি সদ্ভাবে জিজ্ঞাসা করি—ডোমনী, তুই কার নায়ে আসিস যাস ? ডোমনী তাঁত বেচে আর চাঙ্গারি ; তোর তরে আমি নটের পেটক (চুবড়ী) ত্যাগ করিয়াছি। ওলো, তুই ডোমনী, আর আমি কাপালিক ; তোর তরে আমি হাড়ের মালা ত্যাগ করিলাম। সরোবর ভাঙ্গিয়া ডোমনী মৃণাল খায়। ডোমনী, (তোকে) প্রহার করি, (তোর) প্রাণ লই।

তিনি ভুঅণ মই বাহিঅ হেলেঁ। হাঁউ সুতিলি মহাসুহলীলেঁ [১] ॥
কইসনি, হালো ডোম্বী, তোহরি ভাভরিআলী। অন্তে কুলীনজন, মাঝে কাবালী॥
তই লো ডোম্বী সঅল বিটালিউ। কাজ ন কারণ সসহর টালিউ ॥
কেহো কেহো তোহরে বিরুআ বোলই। বিদুজন-লোঅ তোরেঁ কণ্ঠ ন মেলঈ॥
কাহ্নে গাই—তু কামচণ্ডালী। ডোম্বিত আগলি নাহি ছিনালী ॥১৮॥

অর্থাৎ—তিন ভুবন আমার দ্বারা হেলায় বাহিত হইল ; আমি মহাসুখলীলায় (অথবা মহাসুখনীড়ে) শুইলাম। ওলো ডোমনী, তোর ছলাকলা কি রকম ? এক পাশে কুলীন ব্যক্তি আর মধ্যস্থলে কাপালিক। ওলো ডোমনী, তুই সকল নষ্ট করিলি ; কাজ নাই কারণ নাই, শশধরকে টলাইলি ! কেহ কেহ তোকে বিরূপ বলে, (কিন্তু) বিদ্বজ্জন সকলে তোর কণ্ঠ ছাড়ে না। কাহ্ন গায়—তুই কামচণ্ডালী ; তোর আগে (বাড়া) ছিনাল আর নাই।

জো মণ-গোঅর আলা জালা। আগম পোথী ইষ্টামালা ॥
ভণ কইসেঁ সহজ বোলবা জাই। কাঅবাকৃচিঅ জসু ন সমাই ॥
আলে গুরু উএসই সীস। বাকৃপথাতীত কাহিব কীস ॥
জে তই বোলী তে তবি টাল। গুরু বোধ সে সীসা কাল ॥
ভণই কাহ্নু জিণরঅণ বি কইসা। কালেঁ বোব সংবোহিঅ জইসা ॥৪০॥

অর্থাৎ—যাহা মনগোচর (তাহা) তুচ্ছ, (যেমন) আগম, পুঁথি, ইষ্টমালা। বল কিসে সহজ (বস্তুকে) বলা যায়, যাহাতে কায় বাক্ চিত্ত প্রবেশ লাভ করিতে পারে না ! বৃথাই গুরু শিষ্যকে উপদেশ দেয় ; বাক্পথাতীত (বস্তুকে) কিসে কহা যায় ? যাহারা তবুও বলে তাহারা তখন ভুল করে।

১। অথবা 'মহাসুখলীড়ে'।

গুরু বাক্যহীন মূর্খ, শিষ্য কালা। কাহ্নু ভণে, জিনরত্ন কীদৃশ? যেমন কালার দ্বারা বোবা সংবোধিত হয় (সেরূপ)।

নিম্নোদ্ধৃত ঢেণ্ঢণপাদের পদটি ধাঁধার সমষ্টি।

টালত মোর ঘর, নাহি পড়বেষী। হাঁড়ীত ভাত নাহি, নিতি আবেশী॥
বেঙ্গ সংসার বড়্ঢিল[১] জাই। দুহিল দুধু কি বেণ্টে সামাই॥
বলদ বিআএল, গবিআ বাঁঝে। পিটা দুহিএ এ তিনা সাঁঝে॥
জো সো বুধী, সো ধনি বুধী। জো যো চোর, সোই সাধী॥
নিতে নিতে শিআলা সীহে সম জুঝই। ঢেণ্ঢণ-পাএর গীত বিরলে বুঝই॥৩৩॥

অর্থাৎ—টালেতে আমার ঘর, পড়শী নাই; হাঁড়ীতে ভাত নাই, (তবু) নিত্যই অতিথি। বেঙ্গের সংসার বাড়িয়াই চলিয়াছে। দোহা দুধ কি বাঁটে (পুনরায়) প্রবেশ করে? বলদ বিয়াইল, (অথচ) গাই বাঁঝা, (সেই বলদের দুধ) এই তিন সন্ধ্যা পেটায় (অর্থাৎ কেঁড়েতে) দোহা হয়। সেই যে বুদ্ধি, সে বুদ্ধি ধন্য, সেই যে চোর, সেই সাধু। নিত্য নিত্য শৃগাল সিংহের সহিত যুদ্ধ করে। ঢেণ্ঢণপাদের (এই) গীত বিরলে (অর্থাৎ অল্প লোকে) বুঝিতে পারে।

শবরপাদের এই চর্য্যাটিতে বেশ একটু কবিকল্পনার পরিচয় পাওয়া যায়।

উঁচা উঁচা পাবত, তহিঁ বসই শবরী বালী।
মোরঙ্গি পীচ্ছ পরহিণ শবরী, গিবত গুঞ্জরী মালী॥
উমত শবরো পাগল শবরো, মা কর গুলী, গুহাড়া তোহরি।
নিঅ ঘরিণী ণামে সহজ সুন্দারী॥
নানা তরুবর মৌলিল রে, গঅণত লাগেলী ডালী।
একেলী শবরী এ বণ হিণ্ডই, কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারী॥
তিঅ ধাউ খাট পড়িলা, সবরো মহাসুখে সেজি ছাইলী।
সবরো ভুজঙ্গ, ণইরামণি দারী, পেহ্ম রাতি পোহাইলী॥

১। মূলে "বড় হিল"। 'বড় হিল' পাঠ করিলে অর্থ হইবে 'বড় হেলিয়া'; 'বড়হি লজাই' পাঠ ধরিলে 'বড়ই লজ্জা পায়' এইরূপ অর্থ হইতে পারে।

হিঅ তাঁবোলা, মহাসুহে কাপুর খাই।
সুন নৈরামণি কণ্ঠে লইআ, মহাসুহেঁ রাতি পোহাই ॥
গুরুবাক পুঞ্চআ, বিন্ধ ণিঅ মণেঁ বাণেঁ।
একে শরসন্ধানেঁ বিন্ধহ, বিন্ধহ পরম নিবাণেঁ ॥
উমত শবরো গরুআ রোষে।
গিরিবর-শিহর সন্ধি পইসন্তে, শবরো লোড়িব কইসে ॥৫০॥

অর্থাৎ—উঁচু উঁচু পর্ব্বত তথায় শবরী বালিকা বাস করে। শবরী ময়ূরাঙ্গ-পিচ্ছ পরিহিত, (তাহার) গ্রীবায় গুঞ্জার মালা। উন্মত্ত শবর, পাগল শবর, গোল করিও না, তোমার গোহারি (অর্থাৎ দোহাই)। (আমি) তোমার নিজ গৃহিণী, নামে সহজসুন্দরী। নানা তরুবর মুকুলিত হইল রে, (তাহার) ডাল গগনে লাগিল। কর্ণকুণ্ডলবজ্রধারিণী শবরী একেলা এ বন ঢুঁডিতেছে। ত্রৈধাতুক খাট পড়িল (বা পাড়া হইল); শবর, (তুই) মহাসুখে শয্যা বিছাইলি; ভুজঙ্গ (অর্থাৎ নায়ক বা নাগর), শবর, তুই দারিকা (অর্থাৎ নায়িকা বা নাগরী) নৈরামণিকে (লইয়া) প্রেমে রাত পোহাইলি।[১] হৃদয়তাম্বুলে কর্পূর (দিয়া) মহাসুখে খাওয়া হইল; শূন্য নৈরামণি কণ্ঠে লইয়া মহাসুখে রাত্রি পোহাইল। গুরুবাক্যরূপ ধনুতে চড়া দাও, নিজ মনকে বাণ (কর), এক শরসন্ধানে পরমনির্ব্বাণকে বিদ্ধ কর, বিদ্ধ কর। গুরুরোষে শবর উন্মত্ত; গিরিবর শিখর-সন্ধিতে প্রবেশ করিলে শবর ফিরিবে কি করিয়া?

চর্য্যাপদের টীকাকার কর্তৃক উদ্ধৃত মীননাথের দোহাটি এই—

কহন্তি গুরু পরমার্থের বাট। কর্ম্মকুরঙ্গ সমাধিকপাট।
কমল বিকসিল কহিহ ণ জমরা। কমল মধু পিবি[২] ধোকে ন ভমরা ॥পৃ ৩৮॥

অর্থাৎ—গুরু পরমার্থের বর্ত্ম কহিতেছেন; (ইহা) কর্ম্মরূপ কুরঙ্গের সমাধি-

১। অথবা—'শবর ভুজঙ্গ এবং দারিকা নৈরামণি প্রেমে রাত্রি পোহাইল।'

২। মূলে 'পিবিবি'।

কপাট। কমল ফুটিলে জোংড়া (অর্থাৎ শামুক) কহে না; কিন্তু কমলমধুপানে ভ্রমর ভুল করে না।

(পারিভাষিক শব্দে কণ্টকিত বলিয়া এবং ভাষার প্রাচীনত্ব ও পাঠ-বিকৃতির জন্য চর্য্যাপদগুলির সর্ব্বত্র অর্থ সুপরিস্ফুট নহে। তথাপি, স্থূল অর্থ যতটুকু জানা যায় তাহাতেই এই গীতিকবিতাগুলির বিশিষ্ট মাধুর্য্যের যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। চর্য্যাগুলিতে কবিকল্পনা অথবা আবেগ বিশেষ নাই। অনেক স্থলেই প্রচলিত প্রবাদ বাক্য অথবা ধাঁধা কবির একমাত্র উপজীব্য। কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, পরিমিত শব্দযোজনা এবং শ্বাসাঘাতযুক্ত দৃঢ়বন্ধ ছন্দ চর্য্যাগীতিগুলিকে অনন্যসাধারণ বৈচিত্র্যে মণ্ডিত এবং শ্রুতিসুখকর করিয়াছে। স্থানে স্থানে অল্প কথায় যে ছোট ছোট চিত্র আঁকা হইয়াছে তাহারও মনোহারিত্ব আছে।)

চর্য্যাপদগুলি রাঢ় অঞ্চলের ভাষায় রচিত হইয়াছিল। মনে হয়, এই গানগুলির প্রচার নিতান্ত অল্প ছিল না, এবং সম্ভবতঃ কতকটা সেই কারণেই এত পাঠান্তর ও পাঠবিকৃতি পাইতেছি। গানগুলির অধিকাংশই মাত্রাবৃত্ত পাদাকুলক ছন্দে রচিত, প্রতি চরণে ১৬ মাত্রা, এবং পয়ারের মত অষ্টম মাত্রার পর যতি পড়ে। এই ছন্দ একাধারে বাঙ্গালা আসামী ও উড়িয়া পয়ারের এবং হিন্দী চৌপাঈয়ের জনক। কয়েকটি চর্য্যা ভাঙ্গা ত্রিপদী ছন্দে রচিত।[১]

চর্য্যাগীতিগুলি যে যে রাগ-রাগিণীতে গীত হইত তাহাও উল্লিখিত হইয়াছে। যেমন—পটমঞ্জরী, গউড়া, মালশী গউড়া, অরু, গুঞ্জরী, কহ্নু গুঞ্জরী, দেবক্রী, দেশাখ, ভৈরবী, কামোদ, ধনসী, রামক্রী, বড়ারী, শবরী, মল্লারী, বঙ্গাল, ইন্দ্রতাল[২]।

১। চর্য্যাপদের ছন্দোবিচারের জন্য মৎপ্রণীত ভাষার ইতিবৃত্ত (বর্দ্ধমান সাহিত্য সভা) পৃঃ ১৫৩—৫৬ দ্রষ্টব্য।

২। ২৪ সংখ্যকচর্য্যায় তিব্বতী অনুবাদে এই রাগের উল্লেখ আছে।

খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ শতাব্দী

চতুর্থ পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালী সমাজের বিবর্ত্তন ও আধুনিক বাঙ্গালী জাতির উদ্ভব

[illegible]পদগুলির মধ্যে যেগুলি অর্ব্বাচীন তাহার মধ্যে কয়েকটি ত্রয়োদশ শতাব্দীর [illegible]ভাগের রচনা হওয়া আশ্চর্য্য নহে। এগুলির কথা ছাড়িয়া দিলে, খ্রীষ্টীয় [illegible]দশ শতাব্দীতে এবং তাহার পরবর্ত্তী প্রায় সার্দ্ধশতাব্দী-মধ্যে রচিত একছত্রও [illegible] লেখা পাওয়া যায় নাই। শুধু বাঙ্গালার কথা বলি কেন, এই সময়ে [illegible] এবং অনুলিখিত খুব অল্প সংস্কৃত গ্রন্থ ও পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। [illegible] সাহিত্যের ইতিহাসে খ্রীষ্টীয় ১২০০ হইতে ১৪৫০ সাল পর্য্যন্ত এই প্রায় [illegible] শত বৎসর কাল সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিহ্ন পদক্ষেপে চলিয়া গিয়াছে। বাঙ্গালা [illegible] এই সময়ের ইতিহাস অভূতপূর্ব্ব সংঘর্ষ দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভের কাহিনী মাত্র।

বাঙ্গালা দেশে মুসলমানদিগের আগমনের ঠিক পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আধিপত্য [illegible]ষ্ঠিত হইয়াছিল। পালবংশের রাজারা প্রথমতঃ বৌদ্ধ হইলেও শেষের [illegible] তাহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাশ্রিত হইয়াছিলেন। একথা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। [illegible]বংশের শেষ রাজা রামপালদেব সম্বন্ধে সেকশুভোদয়ায় একটি শ্লোক উদ্ধৃত [illegible]ছে। ইহা হইতে জানা যায় যে, ইনি জাহ্নবীগর্ভে প্রায়োপবেশন করিয়া [illegible] ধ্যান করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন।

> [illegible]শাকে যুগ্ম[ক]বেণু[1]-রন্ধ্র[বি]গতে কন্যাং গতে ভাস্করে
> কৃষ্ণে বাক্‌পতিবাসরে যমতিথৌ যামদ্বয়ে বাসরে।
> জাহ্নব্যাং জলমধ্যতস্ত্বনশনৈর্ধ্যাত্বা পদং চক্রিণো
> [illegible] পালান্বয়মৌলিমণ্ডনমণিঃ শ্রীরামপালো মৃতঃ ॥ পৃ ৬১ ॥

---

1 'রেণু' পাঠও ধরা চলে।

পালবংশের রাজ্যকালের শেষ হইতেই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণেরা সম্পূর্ণরূপে ব্রাহ্মণ্য-পন্থী হইয়াছিলেন। উচ্চজাতীয় ব্যক্তিরা ব্রাহ্মণ্য এবং বৌদ্ধ এই উভয় মতেরই আদর করিতেন। খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীতে দক্ষিণরাঢ়ের অধীশ্বর কায়স্থ পাণ্ডুদাস বৌদ্ধতান্ত্রিক পণ্ডিত ও সাধকদিগের জন্য সুপ্রসিদ্ধ পাণ্ডুভূমি বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। চতুর্দ্দশ শতাব্দী পর্য্যন্ত পাণ্ডুভূমি বিহার রাঢ়দেশে শিক্ষা ও সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান কেন্দ্র ছিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী কবির রচিত সংস্কৃত কবিতার একমাত্র নিদর্শন মিলিতেছে চট্টগ্রামে প্রাপ্ত দামোদরদেবের অনুশাসনে। এই তাম্রানুশাসন উৎকীর্ণ হয় ১১৫৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১২৪৩-৪৪ খ্রীষ্টাব্দে।

সেন-রাজাদিগের সময়েও জনসাধারণ প্রধানতঃ শৈব ও বৌদ্ধতান্ত্রিক মতাবলম্বী ছিল বলিয়া মনে হয়। আর সমাজের নিম্নস্তরের ব্যক্তিরা আচার ব্যবহার ও ধর্ম্মবিশ্বাসে একেবারে অনার্য্য ছিল। মধ্যস্তরের যে সকল জাতি ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের আশ্রয়ে আসিল, তাহারা "নবশাখ" অর্থাৎ নূতন শাখা রূপে গৃহীত হইল। আর যাহারা শৈব ও বৌদ্ধ তান্ত্রিক আচার ব্যবহার ও বিশ্বাস লইয়া রহিয়া গেল তাহারা অনাচরণীয় জাতি বলিয়া পরিগণিত হইল। কায়স্থের মত উচ্চ জাতির মধ্যেও খ্রীষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি এবং সম্ভবতঃ তাহার পরেও যে বৌদ্ধ শাস্ত্র ও তন্ত্রের চর্চ্চা হইত, তাহার প্রমাণ পাওয়া গিয়াছে।[১] ব্রাহ্মণদিগের আচারেও যথেষ্ট শৈথিল্য ছিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমে রায়মুকুট-উপাধিক বৃহস্পতি মহিন্তা তাঁহার স্মৃতিরত্নহার নামক স্মৃতিগ্রন্থে বর্ণ-সন্নিপাতাশৌচের ব্যবস্থা করিয়াছেন; অর্থাৎ "এক ব্রাহ্মণের যদি ভিন্ন ভিন্ন বর্ণে বিবাহ থাকিত এবং সেই ভিন্ন ভিন্ন বর্ণের স্ত্রীর সন্তান থাকিত, তাহা হইলে তাহাদের কিরূপ অশৌচ হইবে, তিনি তাহার ব্যবস্থা করিয়াছেন।"[২] সুতরাং

১। ১৪৯২ সংবতে অর্থাৎ ১৪৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বর্দ্ধমান জেলার বেণুগ্রামে (বর্ত্তমান বেড়ুগ্রাম?) মিত্র-উপাধিধারী জনৈক কায়স্থ ভদ্রলোক ও তাঁহার পুত্রদ্বয়ের জন্য বৌদ্ধ মহাযান মতের একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ বোধিচর্য্যাবতার অনুলিখিত হয়।

২। ব-সা-প-প ৩৮, পৃ ৬২-৬৩।

ইহা হইতে অনুমান হয় যে, বৃহস্পতির সময়েও ব্রাহ্মণেরা সময়ে সময়ে নিম্ন বর্ণের কন্যা পরিগ্রহণ করিতেন। এই প্রথা এখনও নেপালে চলিত আছে।

দ্বাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে বাঙ্গালাদেশে তুর্কী আক্রমণ সুরু হয়। তাহার পর হইতে দেড়শত বৎসর ধরিয়া বাঙ্গালাদেশে ধ্বংসের ও অরাজকতার তাণ্ডবলীলা চলিল। দেশের মধ্যে যেগুলি শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল সেই গুলি সর্ব্বাগ্রে বিধ্বস্ত হইল, এবং বুদ্ধি বিদ্যা ও কৌশলে যাঁহারা দেশের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ছিলেন তাঁহারা হয় রণক্ষেত্রে পতিত হইলেন নতুবা আততায়ীর হস্তে প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন। বাঙ্গালা দেশ এক হিসাবে চিরকাল ভারতবর্ষের বাহিরে ছিল। সুতরাং উত্তরাপথে তুর্কী অভিযান অনেক দিন হইতে সুরু হইলেও তাহা পল্লীবাসী সুখসুপ্ত বাঙ্গালীর কর্ণগোচর হয় নাই, অথবা ঈষৎ কর্ণগোচর হইলেও ভীতির সঞ্চার করে নাই। যেহেতু ইতিপূর্ব্বে ভারতবর্ষে গ্রীক, শক, হূণ প্রভৃতি বিদেশীর যে অভিযান হইয়া গিয়াছিল তাহার কোন ঢেউ বাঙ্গালা অবধি পৌঁছায় নাই। এই কারণে যখন মুহম্মদ বিন্-বখ্ত্যারের অধীনে মুষ্টিমেয় তুর্কী সৈন্য বাঙ্গালা দেশে উৎপাত আরম্ভ করিল তখন দেশের রাজশক্তি বা জনসাধারণ তাহার জন্য প্রস্তুত ছিল না। সেই জন্য এই আকস্মিক আঘাতে দেশের চিত্ত বিমূঢ় হইয়া গেল; সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া বিদেশী আক্রমণকারীকে সার্থকভাবে বাধা দিবার সামর্থ্য একেবারে লোপ পাইল। এই কারণে, সংখ্যায় যৎসামান্য হইলেও তুর্কী অভিযানকারীরা বিনা বাধায় উল্কাগতিতে সমস্ত দেশের উপর দিয়া ধ্বংসের বন্যা বহাইয়া দিল। বিদেশী বিধর্ম্মী তুর্কীর বাঙ্গালা-বিজয় অভিযানে সাফল্যের আরও একটি কারণ আছে। সেটি গুরুতর।

আর্য্যদিগের উপনিবেশ স্থাপনের পর হইতে বাঙ্গালা দেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে দুইটি স্তর রহিয়া যায়—আর্য্য এবং অনার্য্য। উভয় স্তরের মধ্যে বৈবাহিক মিলন-মিশ্রণ এবং আচার-বিচারে দানপ্রতিদান চলিতে থাকিলেও, জাতি হিসাবে ততটা না হউক, সংস্কৃতি এবং ভাবধারাতে এই দুই স্তরের পার্থক্য বরাবর বেশ সুস্পষ্ট ছিল। আর্য্যেরা যখন বাঙ্গালা দেশে প্রথম উপনিবিষ্ট হয় তখন তাহারা সংখ্যায় ভারী ছিল না। ক্রমশঃ অনার্য্যের সহিত বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে এবং

অনার্য্যের আর্য্যভাবালম্বনের হেতু আর্য্যেরা সংখ্যাবহুল হইয়া উঠিল বটে, তবে তাহাদের মধ্যেও আচারব্যবহার ও ভাবধারায় স্তরভেদ দেখা দিল। সংস্কৃতিবিশুদ্ধ আর্য্যেরা ছিল ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মপ্রবণ, আর সংস্কৃতিবিহীন আর্য্যেরা ছিল প্রায়শঃ বৌদ্ধ বা তান্ত্রিক ধর্ম্ম পরায়ণ। অপর দিকে অনার্য্যেরা ছিল আর্য্যেতর সংস্কার, ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচারব্যবহার লইয়া। অবশ্য এই আচারব্যবহার ও ধর্ম্মবিশ্বাস কতক পরিমাণে সংস্কৃতিবিহীন আর্য্যদিগের মধ্যে এবং কিঞ্চিৎ পরিমাণে সংস্কৃতিবিশুদ্ধ আর্য্যদিগের মধ্যেও যে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু ভাবধারায় অনার্য্যেরা ছিল আর্য্য হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্। আর্য্যেরা ছিল মনোধর্ম্মী অর্থাৎ চিন্তাশীল, আদর্শবাদী, তত্ত্বানুসন্ধিৎসু, সংযমনিষ্ঠ ও অধ্যাত্ম-পরায়ণ। আর অনার্য্যেরা ছিল প্রাণধর্ম্মী অর্থাৎ ক্রিয়াশীল, বাস্তববাদী, অজিজ্ঞাসু, ভোগলিপ্সু ও দৈবনিষ্ঠ। আর্য্য ও অনার্য্যের দেবতা যখন এক হইয়া গিয়াছে তখনও, সেই দেবচরিত্রে আর্য্য ও অনার্য্যের বিশিষ্ট ভাবধারায় ছাপ পাশাপাশি রহিয়া গিয়াছে। শিব যখন মনোধর্ম্মী আর্য্যের[১] দেবতা তখন তিনি যোগিশ্রেষ্ঠ, সতীপতি, উমাধব; আর যখন তিনি প্রাণধর্ম্মী অনার্য্যের দেবতা তখন তিনি ভোলানাথ, গঞ্জিকাধূস্তূরসেবী, নীচ পরনারীর রূপে আসক্ত হইয়া হীনকর্ম্মে নিযুক্ত। কৃষ্ণ যখন মনোধর্ম্মী আর্য্যের দেবতা তখন তিনি পূতনাবিনাশী, গোবর্দ্ধনধারী, কংসনিসূদন, মহাভারতনাটকের সূত্রধার; আর যখন তিনি প্রাণধর্ম্মী অনার্য্যের দেবতা তখন তিনি গোপীকান্ত, মাতুলানীর রূপে মুগ্ধ হইয়া আত্মবিস্মৃত। চণ্ডী যখন আর্য্যের দেবতা তখন তিনি শুম্ভনিশুম্ভ বধ করিতেছেন, কালকেতুকে রাজ্য প্রদান করিতেছেন, আর যখন তিনি অনার্য্যের দেবতা তখন তিনি ছলে বলে কৌশলে ধনপতির নিকট পূজা আদায় করিতেছেন, শিবকে জমি চষিতে পাঠাইতেছেন, সপত্নীকন্যা মনসার প্রতি ইতরজনোচিত ঈর্ষ্যা দেখাইতেছেন।

আর্য্য ও অনার্য্যের মধ্যে সংস্কৃতিগত, ধর্ম্মবিশ্বাসগত, আচারব্যবহারগত ও ভাবধারাগত এই যে স্তরভেদ ইহা বিলুপ্ত হইয়া অখণ্ড বাঙ্গালী জাতি গঠিত হইয়া

১। আদৌ জাতিগত হইলেও পরে স্থূলতঃ ভাবধারাগত বলিয়া এখানে আর্য্য ও অনার্য্য শব্দ শুধু জাতি হিসাবে লওয়া উচিত হইবে না।

উঠিবার পক্ষে একটি প্রধান বস্তুর অভাব ছিল, তাহা দ্বিতীয় পক্ষের সংঘাত। যেমন দুই পরমাণু হাইড্রোজেন এবং এক পরমাণু অক্সিজেন মিলিত হইয়া জলকণা হইতে গেলে প্রচণ্ড বিদ্যুৎশক্তির অপেক্ষা রাখে, তেমনি দুই জাতি বা ভাবধারা মিলিয়া একটি অখণ্ড জাতি বা ভাবধারায় পরিণত হইতে গেলে প্রচণ্ড বাহ্য বা আভ্যন্তর অথবা বাহ্য ও আভ্যন্তর সংঘাত ও শক্তির প্রয়োজন হয়। বাঙ্গালা দেশে আর্য্য ও অনার্য্য এই দুই স্তর পরস্পরের মিলনকল্পে তুর্কী অভিযান-রূপ প্রচণ্ড সংঘর্ষের অপেক্ষা করিতেছিল। ইহাই বাঙ্গালা দেশে তুর্কী অভিযানের সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ।

মুসলমান-শক্তির মধ্যস্থতায় আর্য্য ও অনার্য্যের মিলন হইয়া বাঙ্গালী জাতি তাহার বিশিষ্টরূপ পাইয়া জন্মগ্রহণ করিল। এই নবাবির্ভূত বাঙ্গালী জাতির মূর্ত্তিমান্ প্রতীক শ্রীচৈতন্য। ইহারই মধ্যে এবং ইহারই প্রভাবে বাঙ্গালী জাতি তাহার দোষগুণ ভালমন্দ সকল বৈশিষ্ট্য লইয়া ভারতবর্ষের মধ্যে অনন্যসাধারণ স্থান অধিকার করিয়াছে। জাতি হিসাবে সংহত রূপ ধারণ করিবার পক্ষে বাঙ্গালায় বাহ্য সংঘাত যোগাইয়াছিল তুর্কী অভিযান ও মুসলমান রাজত্ব, আর আভ্যন্তর শক্তি বিস্ফুরিত হইয়াছিল শ্রীচৈতন্যের চরিত্রের দ্বারা।

খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দী অবধি যাঁহাদের হস্তে সাহিত্যসৃষ্টি নির্ভর করিত, তাঁহারা ছিলেন প্রধানভাবে আর্য্যসংস্কৃতিসম্পন্ন। ব্রাহ্মণ্যপন্থী হউন অথবা শৈব বা বৌদ্ধ-তান্ত্রিকমতাবলম্বী হউন, যাঁহারা কবি ছিলেন (—তখনকার দিনে কাব্যই ছিল সাহিত্য, আর সাহিত্য ছিল কাব্য—) তাঁহারা উচ্চস্তরের ব্যক্তি, মনোধর্ম্মী আর্য্য। ইঁহারা ছিলেন রাজশক্তির আশ্রিত কিংবা কোন সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মসঙ্ঘের আচার্য্য বা অধিনায়ক। মুসলমান-শক্তির আঘাতে উভয়ই বিনষ্ট অথবা ক্ষমতাহীন হইয়া পড়ায় তুর্কী অভিযানের পর কিছুকাল ধরিয়া সাহিত্যসৃষ্টি অসম্ভব হইয়া পড়িল। দেশ অশান্তিপূর্ণ এবং খণ্ড খণ্ড রাজ্যে বিভক্ত, তাহার উপর উপদ্রব লাগিয়াই আছে; সুতরাং এই অবস্থায় কি করিয়া সাহিত্যসাধনা হইতে পারে? সাহিত্যসৃষ্টি দূরের কথা, জ্ঞানচর্চ্চাই একরূপ তিরোহিত হইয়াছিল। ১৩৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে শম্স্-দ্-দীন ইলিয়াস শাহ বাঙ্গালায় স্বাধীন সুলতান রাজ্য

সংস্থাপিত করিলে দেশ অনেকটা ঐক্যবদ্ধ হইল, এবং রাষ্ট্রনৈতিক অশান্তি যথেষ্ট পরিমাণে দূরীভূত হইয়া গেল। এই ইলিয়াস শাহী বংশের রাজ্যকাল হইতেই দেশে জ্ঞানচর্চ্চা ও সাহিত্যসৃষ্টির পুনরুজ্জীবন হইবার সম্ভাবনা জাগিল। কিন্তু তাহা হইলেও, পঞ্চদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে এই প্রচেষ্টা বিশেষ কার্য্যকরী হয় নাই। যাহা হউক, আবার সেই রাজশক্তির আনুকূল্যেই জ্ঞানচর্চ্চা ও সাহিত্যসৃষ্টির পথ সুগম হইল। কায়স্থবংশীয় দনুজমর্দ্দন-উপাধিক (?) রাজা কংস বা গণেশের পুত্র যদু ওরফে জলালু-দ্-দীন বিশেষ বিদ্যোৎসাহী ছিলেন। আর তাঁহার পিতা, যিনি দুই শত বৎসর পরে পুনর্ব্বার গৌড়সিংহাসনে হিন্দুরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, সেই রাজা গণেশ বহু বহু পণ্ডিত ও বিদ্বানের পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। কৃত্তিবাস যে পঞ্চগৌড়েশ্বরের নিকট সংবর্দ্ধনা লাভ করিয়াছিলেন তিনি রাজা গণেশ ব্যতীত আর কেহই নহেন, এইরূপ অনুমান নিতান্ত অযথার্থ নহে।

যদু বা জলালু-দ্-দীনের নিকট মহিন্তাগ্রামীণ বৃহস্পতি বিশেষ সংবর্দ্ধনা লাভ করিয়াছিলেন। "বৃহস্পতি 'গৌড়াবনীবাসবের' (জলাল উদ্দীন) নিকট হইতে ছয়টি উপাধি পাইয়াছিলেন। প্রথম আচার্য্য, তারপর কবিচক্রবর্ত্তী, পণ্ডিত-সার্ব্বভৌম, কবি-পণ্ডিতচূড়ামণি, মহাচার্য্য, রাজপণ্ডিত। কিন্তু রাজা যখন তাঁহাকে সর্ব্বশেষ 'রায়মুকুটমণি' এই উপাধি দেন, তখন খুব জাঁক করা হইয়াছিল। তাঁহাকে একগাছি হার দেওয়া হইয়াছিল—তাহাতে অনেক হীরামাণিক লাগান ছিল—তাহাতে তাহা ঝলমল করিতেছিল। তাঁহাকে যে কুণ্ডল দেওয়া হইয়াছিল, তাহাও ঝক্‌মক্ করিত। দুই হাতে 'রতনচূর' দেওয়া হইয়াছিল; তাহাতে দশ আঙ্গুলে দশটি আঙ্‌টি এবং তাহাতে হীরা লাগান ছিল। দুইটি ছাতা দেওয়া হইয়াছিল, অনেকগুলি ঘোড়া দেওয়া হইয়াছিল।"[১]

বৃহস্পতি স্মৃতিরত্নহার নামে এক স্মৃতির বই, অমরচন্দ্রিকা (পদচন্দ্রিকা বা পদার্থচন্দ্রিকা) নামে অমরকোষের একটীকা, এবং নির্ণয়বৃহস্পতি নামে শিশুপাল-বধের এক টীকা লিখিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত রঘুবংশ ও কুমারসম্ভবের টীকারও

১। ব-সা-প-প ৩৮, পৃ ৬০

সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। অমরকোষের টীকায় বৃহস্পতি নিজের খবর কিছু কিছু দিয়াছেন। ইহার পিতার নাম ছিল গোবিন্দ, মাতার নাম নীলমুখায়ী দেবী এবং পত্নীর নাম রমা। সন্তানদিগের মধ্যে বিশ্রাম ও রাম জ্যেষ্ঠ ছিলেন। শিশুপাল-বধের টীকার "মঙ্গলাচরণ হইতে বেশ বোধ হয়, রায়মুকুট বিষ্ণুভক্ত ছিলেন।"

বৃহস্পতির স্মৃতিরত্নহার হইতে তৎকালপ্রচলিত ব্রত-উৎসবাদির পরিচয় পাওয়া যায়। ইহাতে জন্মাষ্টমী, রামনবমী, রথ, দোল, কার্ত্তিকপূজা ও কালীপূজার উল্লেখ নাই। রাসও নাই, তাহার স্থলে আছে সুখরাত্রি। তখনও বর্ষার অন্তে শক্রোত্থান বা ইন্দ্রধ্বজ পূজা চলিত। ভারতবর্ষের কোন কোন অঞ্চলে এই পূজা এখনও প্রচলিত আছে। বৃহস্পতি দুই রকম দুর্গোৎসবের উল্লেখ করিয়াছেন, বড় দুর্গোৎসবে নবম্যাদিকল্পারম্ভ আর ছোট দুর্গোৎসবে ষষ্ঠ্যাদিকল্পারম্ভ। সন্ধিপূজার কথা নাই, কেবল "বড় দুর্গোৎসবে অষ্টমী পূজার দিন মধ্যরাত্রিতে ভদ্রকালী পূজার বিধান আছে। বিজয়ার দিন ক্রীড়াকৌতুকমঙ্গল এবং নীরাজনের কথা আছে।" সে সময়ে ব্রাহ্মণদিগের মধ্যে অসবর্ণ বিবাহ প্রচলিত ছিল। এবিষয়ের পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি।

মুসলমান-সংঘাতের আর একটি ফল হইল। বৌদ্ধতান্ত্রিক ধর্ম্ম লোপ পাইল বটে, কিন্তু তাহার অনেক দেবদেবী শাক্ততান্ত্রিক উপাসনার মধ্যে স্থান পাইল। বর্ত্তমান সময়ে এমন অনেক দেবদেবী এবং মূর্ত্তি পূজিত হইতেছে যাহা স্পষ্টতঃই ব্রাহ্মণ্যমতবহির্ভূত। অনেক সময় আবার ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ ও অনার্য্য দেবতা এক হইয়া নূতন দেবতায় পরিণত হইয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ ধর্ম্মঠাকুরের নাম করা যায়। ইনি একাধারে ব্রাহ্মণ্য দেবতা বিষ্ণু ও শিব, বৌদ্ধ স্তূপের প্রতীক, এবং নামহীন অনার্য্য দেবতা যাঁহার বাহন উলূক অথবা বানর। ধর্ম্ম-ঠাকুরের বিশেষ আদর দক্ষিণ রাঢ়ে। বর্ত্তমান সময়ে ইনি অনেক স্থলে বিষ্ণুরূপে অথবা শিবরূপে পূজিত হইয়া থাকেন, কিন্তু ধ্যানের মন্ত্র হইতে বোঝা যায় যে ইনি বৌদ্ধ-বজ্রযানের ব্রহ্ম 'শূন্য'ও বটেন। ধর্ম্মঠাকুরের বিবর্ত্তন যে মুসলমান-সংঘাতের পূর্ব্বে সংঘটিত হয় নাই তাহার প্রমাণ আছে। ধর্ম্মঠাকুর সম্বন্ধীয় যত কাব্য বা পূজাপদ্ধতি পাওয়া গিয়াছে (—এগুলির কোনটিই সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদের

পূর্ব্বে রচিত হয় নাই, এবং অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিরচিত—) সে সবগুলিতেই মুসলমানদিগের প্রতি ধর্ম্মের অনুগ্রহ বর্ণিত হইয়াছে অথবা ইঙ্গিত করা হইয়াছে। ব্রাহ্মণ্যপন্থীদিগের উপর মুসলমান অভিযানকারীদিগের অত্যাচারে যে সমাজের নিম্নস্তরে অবস্থিত বৌদ্ধ অথবা অনার্য্য মতাবলম্বীদিগের স্পষ্ট অথবা উহ্য সহানুভূতি ছিল, তাহা একটি ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিতে এবং সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মমঙ্গলে প্রাপ্ত 'নিরঞ্জনের রুস্মা' কবিতাটি হইতে জানিতে পারা যায়।

আর্য্যেতর বাঙ্গালীর ধর্ম্মবিশ্বাস অথবা অধ্যাত্মচর্চ্চা ঠিক কিরকম ছিল তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝিবার কোন উপায় নাই। তবে পরবর্ত্তী কালে রচিত মনসামঙ্গল, ধর্ম্মমঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল হইতে এবং গুহ্যতান্ত্রিকপন্থী তথাকথিত 'সহজিয়া', 'বাউল' ইত্যাদি সাধকদিগের কড়চা-গ্রন্থ হইতে কিছু কিছু আভাস পাওয়া যায়।

অনার্য্যের দেবতা ক্রূর, অযথা নিষ্ঠুর, ঈর্ষ্যা ও প্রতিহিংসা পরায়ণ, পূজা আদায় করিবার জন্য জঘন্য কার্য্যেও তৎপর। ইহার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ মনসামঙ্গলের মনসা। যেখানে আর্য্যেতর ধর্ম্মবিশ্বাসের ছাপ পড়িয়াছে সেখানে আর্য্যের দেবতাও হীনকার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছেন দেখা যায়, যেমন শৈব নাথপন্থী যোগিদিগের গোরক্ষ-বিজয় প্রভৃতি কাব্যে দেবী পার্ব্বতী।

বিশেষ বিশেষ স্থানে বা বৃক্ষাদিতে অথবা বিশেষ বিশেষ উৎপাতাদিতে দৈব উপস্থিতি বা দৈবকর্ত্তৃত্ব জ্ঞান এবং তজ্জনিত ভীতি আর্য্যেতর ধর্ম্মবিশ্বাস বা মনোভাবের অন্যতর বিশিষ্ট লক্ষণ। বিশেষ বিশেষ জন্তু বিশেষ বিশেষ দেবতার অনুগৃহীত এই বিশ্বাসও অনার্য্যের। এই মনোভাব হইতেই সমগ্র ভারতবর্ষে হনুমান্-দেবতা ও সর্প-দেবতা এবং বাঙ্গালায় ব্যাঘ্র-দেবতা (দক্ষিণরায়), কুম্ভীর-দেবতা (কালু রায়), বিড়াল-দেবতা (ষষ্ঠী), হংস-দেবতা (সুবচনী) ইত্যাদির উদ্ভব, এবং এই কারণে পল্লীর আনাচে-কানাচে নানাবিধ দেবতা উপদেবতা এবং অপদেবতার প্রাদুর্ভাব। তবে এই আর্য্যেতর মনোভাবের উপর আর্য্যসংস্কৃতির কিছু কিছু ছাপ যে না পড়িয়াছে, এমন নয় ; প্রাণিদেবতাগুলি প্রায়ই বাহন হইয়া দাঁড়াইয়াছে এবং পল্লীর মাঠে ঘাটে অলিতে গলিতে হয়ত পূর্ব্বে যেগুলি "বোঙ্গার" আবাসস্থান বলিয়া মোরগ বলি লাভ করিত, সেস্থানে প্রায়ই এখন আর্য্যের দেবতা

অধিষ্ঠিত হইয়া জনসাধারণকে ভক্তিনম্রতা শিখাইয়া চিত্তসংস্কারের হেতুস্বরূপ হইয়াছে। অপর দিকে অনেক অলৌকিক কর্ম্মকারী মহাপুরুষও দেবতায় পরিণত হইয়া শত সহস্র লোকের পূজা লাভ করিয়া আসিতেছেন।

মুসলমান-অভিযান যে আলোড়ন ও বিক্ষোভ জাগাইয়া তুলিল তাহাতে কোন কোন বিষয়ে ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি তলাইয়া গেল, এবং স্থানীয় অনার্য্য মনোভাব সুব্যক্তরূপে প্রসার লাভ করিল। মুসলমান-অভিযান না হইলেও ইহা ঘটিত, তবে আরও কিছু পরে। বাঙ্গালা দেশের যে আর্য্যেতর substratum তাহা একদিন না একদিন আত্মপ্রকাশ করিতই, কিন্তু মুসলমান-সংঘর্ষে তাহা কিছু আগেই ঘটিয়া গেল। আর্য্যেতর substratum-এর অভিব্যক্তির ফলে আর্য্যেতর ধর্ম্মবিশ্বাস ও সংস্কারাদি এবং তদাশ্রিত "সাহিত্য"—অর্থাৎ ছড়া, গান, পাঁচালী ইত্যাদি—জনসমাজে অধিকতর প্রচারিত হইল, এবং জনসমাজের রুচিও তদনুরূপ ভাবে গঠিত হইল। এইরূপে বাঙ্গালায় আর্য্যেতর অপৌরাণিক সাহিত্যের পত্তন হইল—মনসার ছড়া, ধর্ম্মের ছড়া, চণ্ডীর ছড়া, শিবের ছড়া, রাধাকৃষ্ণের ধামালী ইত্যাদি। এই সকল কাহিনীর মূলে যে একই (আর্য্যেতর?) মনোভাব কার্য্যকর ছিল, তাহার প্রমাণ পাই পরবর্ত্তী কালে বিভিন্ন সময়ে রচিত বা গ্রথিত বিভিন্ন শ্রেণীর পাঁচালীতে বা কড়চা গ্রন্থে একই ধরণের সৃষ্টিপত্তনের বর্ণনায়। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে, মাণিকদত্তের চণ্ডীমঙ্গলে, বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গলে এবং বিভিন্ন কবির রচিত ধর্ম্মমঙ্গলে একই সৃষ্টিপত্তন কাহিনী পাইতেছি। তেমনি সহজিয়া-বাউলপন্থীদের রচনায় অনুরূপ আর এক ধরণের সৃষ্টিপত্তন-কথা পাইতেছি। এই দুই কাহিনীই কোন পুরাণে নাই।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ

বাঙ্গালা সাহিত্যের উদ্ভব ও শাখাবিকাশ

ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল বলিয়া নিঃসন্দেহে অনুমান করা যাইতে পারে, এমন এক ছত্র রচনাও আমাদের হস্তগত হয় নাই। পরবর্ত্তী কালের সাহিত্য বিচার করিয়া আমরা শুধু এইটুকু বলিবার অধিকারী যে, এই সময়ে মনসার কাহিনী, চণ্ডীর কাহিনী ইত্যাদি লৌকিক এবং রামায়ণ কাহিনী ও রাধাকৃষ্ণের কাহিনী ইত্যাদি পৌরাণিক ছড়া বা পাঁচালী বাদ্য ও নৃত্যের সহিত গীত ও অভিনীত হইত। ধর্ম্মবিশ্বাস ও সংস্কারের সহিত সম্পৃক্ত নহে, অর্থাৎ সম্পূর্ণরূপে secular, এমন ছড়া বা গানও এই সময়ে চলিত ছিল, এরূপ অনুমান করিবার হেতু আছে।

আধুনিকপূর্ব্ব বাঙ্গালা সাহিত্য তাহার পরিপূর্ণ এবং বিশিষ্ট রূপ পায় ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের ফলে। ব্যক্তিবিশেষের চরিত্র শুধু জাতিকে বা তাহার ধর্ম্মবিশ্বাসকে নহে, তাহার মনোভাব ও সাহিত্যকেও যে গড়িয়া তুলিতে পারে, ইহার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত রহিয়াছে, প্রাগাধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে। শ্রীচৈতন্য যখন আবির্ভূত হন, তাহার কিছু পূর্ব্ব হইতেই হিন্দুসমাজ ও বাঙ্গালী জাতি তিন শত বৎসরের আলোড়ন ও বিক্ষোভ হইতে স্থিতি লাভ করিয়া সংহত মূর্ত্তি ধারণ করিবার পথে আসিয়াছে। শ্রীচৈতন্যের মধ্যে এই নবগঠিত বাঙ্গালী জাতি নিজ বিশিষ্ট স্বরূপ লাভ করিল। শ্রীচৈতন্যের চরিত্র-প্রভাবে বাঙ্গালীর সাহিত্যও মোড় ফিরিল। বাঙ্গালা সাহিত্য পুনরায় প্রধানতঃ গীতিকাব্যপ্রবণ হইল। এই গীতিকাব্যপ্রবণতা এখন পর্য্যন্তও বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হইয়া রহিয়াছে। আরও নূতনত্ব এই যে, বাঙ্গালী সাহিত্যস্রষ্টা অলৌকিক দেবকাহিনী ছাড়িয়া লৌকিক দেবোত্তর মানবের চরিত্র অঙ্কনে আগ্রহশীল হইল। উপরন্তু পূর্ব্বাপরপ্রচলিত পৌরাণিক কাহিনীগুলিরও রঙ বদলাইয়া গেল।

বাঙ্গালী ছিল অপদেবতার পূজারী ও উপদেবতার উপাসক; এখন হইল দেবতার লীলাসহচর ও দেবকল্প মহাপুরুষের ভক্ত। বাঙ্গালা হইতে কাব্যের স্তরে

এইবার এইভাবে আধুনিকপূর্ব্ব বাঙ্গালা সাহিত্যের স্থূলভাবে দিগ্‌দর্শন করা যাইতে পারে।

১। পৌরাণিক কাহিনী (আর্য্য ও আর্য্যেতর) পাঁচালী কাব্য

ক। রামায়ণ বা রামমঙ্গল ;

খ। কৃষ্ণায়ণ বা কৃষ্ণমঙ্গল (শ্রীমদ্ভাগবত, বিষ্ণুপুরাণ, হরিবংশ ইত্যাদির অনুবাদ সমেত) ;

গ। মহাভারত বা পাণ্ডববিজয় ;

ঘ। মনসামঙ্গল ;

ঙ। চণ্ডীমঙ্গল (মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীর অনুবাদ সমেত) ;

চ। ধর্ম্মমঙ্গল ;

ছ। শিবায়ন (পৌরাণিক কাহিনীর অনুবাদ সমেত) ;

জ। রায়মঙ্গল, ও ষষ্ঠীমঙ্গল, সূর্য্যমঙ্গল, সারদামঙ্গল, শীতলামঙ্গল, লক্ষ্মীমঙ্গল, সত্যপীরের পাঁচালী ইত্যাদি ব্রতকথা ;

ঝ। বিবিধ পৌরাণিক ক্ষুদ্র কাব্য, কবিতা ও ছড়া।

২। গীতি কাব্য

ক। রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক ;

খ। শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণবমহান্ত বিষয়ক ;

গ। দেবীবিষয়ক ;

ঘ। বিবিধ (প্রধানতঃ অধ্যাত্মবিষয়ক ছড়া ও গান)।

৩। শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণব মহান্ত চরিত কাব্য

ক। শ্রীচৈতন্যচরিত (নিত্যানন্দচরিত সমেত) ;

খ। অদ্বৈত-আচার্য্যচরিত ;

গ। অন্যান্য বৈষ্ণব চরিত ও ইতিহাস।

৪। বৈষ্ণব তত্ত্ব-কাব্য ও সন্দর্ভ

ক। মৌলিক (গোস্বামিসিদ্ধান্তসম্মত ও তজ্জাতীয়);

খ। অনুবাদ (প্রধানতঃ গোস্বামিগ্রন্থের) :

গ। পুরাণাশ্রিত তীর্থ-মাহাত্ম্য,

ঘ। 'বৈষ্ণব' তান্ত্রিকসাধনঘটিত।

৫। অপৌরাণিক আখ্যায়িকা কাব্য

ক। কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর;

খ। বিবিধ।

৬। শৈব নাথতন্ত্র কাব্য

ক। মীননাথ-গোরক্ষনাথ কাহিনী (গোরক্ষ-বিজয়);

খ। গোঁবিন্দচন্দ্র-ময়নামতীর পাঁচালী।

৭। লৌকিক (secular) কবিতা

ক। উপকথামূলক,

খ। ঐতিহাসিক;

গ। ব্যাবহারিক ছড়া; ইত্যাদি।

রামায়ণ বা রামমঙ্গল পাঁচালী কাব্যের প্রাচীনতম এবং শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হইতেছে কৃত্তিবাসের অমর কাব্য। খুব সম্ভব ইহা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত হইয়াছিল। এদিকে, উল্লেখযোগ্য আধুনিকতম রামমঙ্গল পাঁচালী পাইতেছি রঘুনন্দন গোস্বামীব রামরসায়ন কাব্য। এটি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত হইয়াছিল।

কৃষ্ণায়ণ কাব্য প্রথমতঃ দুই ধরণের ছিল—শ্রীমদ্ভাগবত অনুযায়ী কৃষ্ণলীলা কাব্য, আর বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত অপৌরাণিক ব্রজলীলাঘটিত পাঁচালী। এই দুই ধারারই প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যাইতেছে পঞ্চদশ শতাব্দীতে। গুণরাজ খান-উপাধিক মালাধর বসু রচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয় শ্রীমদ্ভাগবতের অনুসরণে লিখিত কাব্য। ইহার রচনাকাল ১৪৭৩ হইতে ১৪৮০ খ্রীষ্টাব্দ। বড়ু চণ্ডীদাস রচিত ও শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তন নামে পরিচিত কাব্য দ্বিতীয় ধারার অনুবর্ত্তী। এই কাব্যের রচনাকাল

ঠিক করিয়া জানিবার উপায় নাই। তবে কাব্যটির ভাব ও ভাষা ধরিয়া বিচার করিলে ইহা ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্দ্ধের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির রচনা বলিয়া বোধ হয়। আমরা কাব্যটিকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদের রচনা বলিয়া ধরিয়া লইয়াছি। পরবর্ত্তী (অর্থাৎ ষোড়শ শতাব্দী হইতে আরম্ভ করিয়া) প্রায় সকল কৃষ্ণায়ণ কাব্যে এই দুই ধারার মিলন ঘটিয়াছে। অর্থাৎ প্রায় সকল কবিই ভাগবতের পন্থা প্রধানতঃ অনুসরণ করিয়া তাহাতে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড এই দুই অপৌরাণিক লীলাকাহিনী সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। ক্বচিৎ দুই একজন কবি কেবল ভাগবতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। কৃষ্ণায়ণ কাব্যধারার শেষ কাব্য কোনখানি তাহা নিশ্চয় করিয়া বলা দুরূহ, কেন না উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদেও এইজাতীয় বিস্তর গ্রন্থ রচিত ও মুদ্রিত হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ কুশদেব পাল রচিত হরিবিলাসসার নামক ক্ষুদ্র কাব্যখানির নাম করিতে পারা যায়। গ্রন্থটি ১২৭৮ সালের তেইশে আশ্বিন তারিখে সম্পূর্ণ হইয়াছিল এবং ১২৭৯ সালে নৃত্যলাল শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। এই কাব্যটিতে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের যে সংক্ষিপ্ত বর্ণনা আছে তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বর্ণনার আশ্চর্য্য রকমের মিল আছে।

মহাভারত বা পাণ্ডববিজয় পাঁচালীর যে প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া গিয়াছে তাহার রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদের পূর্ব্বে নহে। এই কাব্যটি সুলতান হোসেন শাহের সেনাপতি পরাগল খানের আদেশে কবীন্দ্র নামক বা উপাধিক কবি রচনা করেন। এই ধারার শ্রেষ্ঠ কাব্য কাশীরাম দেবের ভারত-পাঁচালী সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রচিত হয়। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধেও একাধিক পাণ্ডববিজয় কাব্য রচিত হইয়াছিল।

মনসামঙ্গল কাব্যের প্রাচীনতম নিদর্শন কাব্য দুইখানিই (?) পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে রচিত। বিজয়গুপ্ত ১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে মনসামঙ্গল রচনায় হস্তক্ষেপ করেন, এইরূপ ইঙ্গিত দুই একটি পুঁথিতে পাওয়া যায়। কিন্তু এই তারিখে যে সন্দেহের অবকাশ আছে, তাহা পরে যথাস্থানে দেখান যাইতেছে। বিপ্রদাস পিপিলাই ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি দুইজন,

পূর্ব্ববঙ্গের বংশীদাস চক্রবর্ত্তী এবং পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমানন্দ। এই ধারার শেষ কাব্য রচিত হইতে বোধ হয় এখনও কিছু বিলম্ব আছে, যেহেতু বিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদেও পূর্ব্ববঙ্গে এই শ্রেণীর কাব্য রচিত হইয়াছে।

চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে মাধবাচার্য্যের কাব্যই প্রাচীনতম বলিয়া গণ্য হওয়া উচিত। ইহা ষোড়শ শতাব্দীর অষ্টম দশকে রচিত। মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের রচনাকাল জানা নাই, সুতরাং এই কাব্যটি আরও প্রাচীন কিনা ঠিক করিয়া বলা দুষ্কর। চণ্ডীমঙ্গলের শ্রেষ্ঠ কবি এবং প্রাগাধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে তাঁহার অপূর্ব্ব কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই ধারার কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদেও পূর্ব্ববঙ্গে রচিত হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দী হইতে দেবীমাহাত্ম্য কাব্যের অপর এক ধারার সৃষ্টি হয়। ইহা হইতেছে মার্কণ্ডেয়-পুরাণান্তর্গত দুর্গাসপ্তশতী অবলম্বনে রচিত পৌরাণিক কাব্য। পরবর্ত্তী কালে অনেক কবির কাব্যে এই দুই ধারার সমন্বয় হইয়াছে।

যে সকল ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য অদ্যাবধি পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন হইতেছে সীতারাম দাসের কাব্য। এটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকের রচনা। শ্যাম পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গলের পুঁথির লিপিকাল ১৬২৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দ। পুঁথিটি কবির স্বহস্তলিখিত কিনা জানা নাই। ধর্ম্মমঙ্গল ধারার কাব্যগুলি প্রায় সবই অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের রচনা। এই ধারার অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ঘনরাম চক্রবর্ত্তী। রূপরামের কাব্যও সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ-পাদের রচনা হইতে পারে। ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যগুলি এত আধুনিক হইলেও ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্য-কাব্য যে পঞ্চদশ শতাব্দীতে প্রচলিত ছিল, তাহা অনুমান করিবার হেতু আছে। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে, মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে, বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গলে এবং অন্যান্য কাব্যে প্রথমেই ধর্ম্মঠাকুরের বন্দনা ও তদনুযায়ী সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

শিবের পাঁচালী ও গান বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম ধারাগুলির অন্যতম। শ্রীচৈতন্যভাগবতে শিবের গানের উল্লেখ আছে। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের প্রথম অংশ শিব-সম্বন্ধীয় পাঁচালী মাত্র। পূরাপূরি শিবায়ন কাব্য যাহা পাওয়া

গিয়াছে তাহার মধ্যে প্রাচীনতম না হইলেও শ্রেষ্ঠতম হইতেছে রামেশ্বর ভট্টাচার্য্যের শিবায়ন। এই কাব্য ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

রায়মঙ্গল ও ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যের প্রাচীনতম কবি (—যতদূর এ পর্য্যন্ত সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—) হইতেছেন কৃষ্ণরাম দাস। এক্ষেত্রে কৃষ্ণরামের একজন অগ্রগামী ছিলেন—মাধবাচার্য্য। ইঁহার কাব্য পাওয়া যায় নাই। ইনি হয়ত সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে বর্ত্তমান ছিলেন। সূর্য্যমঙ্গলের প্রাচীনতম নিদর্শন রামজীবন বিদ্যাভূষণের আদিত্যচরিত কাব্য। ইহা ১৭০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। এই জাতীয় অন্যান্য অপর সকল কাব্যের কোন নিদর্শন অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই।

বিবিধ পৌরাণিক ছড়ার মধ্যে প্রাচীনতম পাইতেছি মনসামঙ্গল-রচয়িতা বংশীদাস চক্রবর্ত্তীর কন্যা চন্দ্রাবতী রচিত কথা-রামায়ণ। এই ছড়াটির প্রাচীন রূপ পাওয়া যায় নাই। দ্বিজ জনার্দ্দনের চণ্ডীমঙ্গলও ছড়ামাত্র। ইহার রচনা কাল জানা নাই।

যশোরাজ খান রচিত পদটিই বাঙ্গালা দেশে রচিত প্রথম ব্রজবুলি পদ। যশোরাজ খান একটি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, পদটি তাহারই অন্তর্গত। ভণিতায় কবি হোসেন শাহের নাম করিয়াছেন, সুতরাং পদটি ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল। ষোড়শ ও তৎপরবর্ত্তী শতাব্দীদ্বয়ে বহু বহু পদকর্ত্তা আবির্ভূত হইয়াছেন; তন্মধ্যে মুরারি গুপ্ত, গোবিন্দদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, নরোত্তমদাস, জগদানন্দ, শশিশেখর ইত্যাদি কবিগণ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বৈষ্ণব পদ রচিত হইয়াছে। বস্তুতঃ এই ধারাই রূপান্তরিত হইয়া বর্ত্তমান সময়ে বাঙ্গালা কাব্যসাহিত্যে মূল ধারারূপে প্রবাহিত হইতেছে।

শ্রীচৈতন্যবিষয়ক গীতিরচনার প্রবর্ত্তক হইতেছেন প্রধানতঃ দুইজন, নরহরি সরকার ঠাকুর ও মুরারি গুপ্ত। ইঁহারা উভয়েই শ্রীচৈতন্যের পারিষদ ছিলেন। শ্রীচৈতন্যবিষয়ক এবং বৈষ্ণবমহান্তবিষয়ক গীতিকবিতা ঊনবিংশ শতাব্দীতেও কিছু কিছু রচিত হইয়াছিল।

দেবীবিষয়ক গীতি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পাওয়া যায় না।

বিবিধ গীতির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে সেকশুভোদয়ায় প্রাপ্ত একটি গীত।[১] ইহা কোন দেবদেবীর মাহাত্ম্যবিষয়ক নহে। তবে ইহার মধ্যে কোন সাধনসঙ্কেত থাকিলেও থাকিতে পারে। মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলস্থিত ছেলে-ভুলানো গীতটিও এই পর্য্যায়ে পড়ে।[২] তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতেই নরনারীর প্রণয়ঘটিত গীতিকবিতার প্রাদুর্ভাব ঘটে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে এই জাতীয় গীতির বন্যাস্রোত প্রবাহিত হয়, এবং কবিগান ও হাফ্-আখড়াই ইত্যাদিতে তাহা অভাবনীয় রূপান্তর প্রাপ্ত হয়।

শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে এক অপূর্ব্ব পরিবর্ত্তন আসে। ইহার অন্যতম চিহ্ন হইতেছে দেবোপম নরের চরিত্র অবলম্বনে কাব্য রচনা। শ্রীচৈতন্যের জীবনী অবলম্বনে রচিত প্রথম কাব্য হইতেছে বৃন্দাবনদাসের শ্রীচৈতন্যভাগবত। কিন্তু এই জাতীয় কাব্যের শ্রেষ্ঠ এবং তাবৎ বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ হইতেছে কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত। ঈশান নাগরের অদ্বৈত-প্রকাশ ১৪৯০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী বৈষ্ণবমহান্তচরিত কাব্যের মধ্যে প্রথম হইতেছে নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাস এবং সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর। বৈষ্ণবচরিত-কাব্যের কনিষ্ঠতম হইতেছে লালদাস বা কৃষ্ণদাস বাবাজী রচিত ভক্তমাল। ইহা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল।

শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পারিষদ নরহরি সরকার ঠাকুর কয়েকখানি বৈষ্ণবসাধন-সম্বন্ধীয় পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এই পুস্তিকাগুলির নাম পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। তবে সরকার ঠাকুরের একতম শিষ্য লোচনদাস রচিত এই জাতীয় গ্রন্থ দুই একখানি পাওয়া গিয়াছে। রোত্তমদাসও সাধনঘটিত ক্ষুদ্র কাব্য কযেকখানা রচনা করিয়াছিলেন। কবিবল্লভ ত রসকদম্ব এই শ্রেণীর গ্রন্থের মধ্যে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থটি ১৫৯৯ রচিত হইয়াছিল। পরবর্ত্তী সময়ে রচিত এই শ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিবন্ধ ওয়া গিয়াছে।

১০৫-৬। ২। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় (তৃতীয় সংস্করণ), পৃঃ ২১১-১২।

শ্রীরূপ, শ্রীসনাতন ইত্যাদি বৃন্দাবনস্থ গোস্বামীদিগের রচিত বৈষ্ণব দর্শন, অলঙ্কার, রসতত্ত্ব ও লীলাগ্রন্থাদির ভাব ও ছায়ানুবাদ কার্য্য প্রধানতঃ শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যদিগের দ্বারাই আরব্ধ হয় ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর একবারে প্রথমে। এই কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন যতুনন্দনদাস। এই ধারার শেষ গ্রন্থ বোধ হয় শচীনন্দন গোস্বামী রচিত উজ্জ্বলচন্দ্রিকা; এই গ্রন্থ অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষে বিরচিত হয়।

কোন কোন শ্রীচৈতন্যজীবনী কাব্যে এবং অন্যান্য কয়েকটি তত্ত্বকাব্যে ও সন্দর্ভে তীর্থবিশেষের মাহাত্ম্য বর্ণিত হইলেও এই ধারার প্রথম গ্রন্থ হইতেছে কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরদাস রচিত জগৎমঙ্গল বা জগন্নাথমঙ্গল। এই গ্রন্থ সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত। প্রধানতঃ নীলাচল-মাহাত্ম্য এবং কাশীমাহাত্ম্যই বাঙ্গালী ভক্তকবিকে বিশেষভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে একাধিক কাশী-মাহাত্ম্য কাব্য পাওয়া গিয়াছে। ব্রজমণ্ডল-মাহাত্ম্যবিষয়ক কোন স্বতন্ত্র গ্রন্থ নাই, তবে ইহা নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকরে বিস্তৃতভাবে বর্ণিত আছে। ভক্তিরত্নাকরের এই অংশ এবং নবদ্বীপ-পরিক্রমা অংশ, তুইটি স্বতন্ত্র আকারে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল। স্থানীয় দেবদেবীর মাহাত্ম্যসূচক একাধিক ক্ষুদ্র কাব্যের বা গানের পুঁথি অনেক পাওয়া গিয়াছে।

সহজিয়া বাউল দরবেশ সাঁই ইত্যাদি বৈষ্ণব তান্ত্রিকদের সাধনঘটিত বহু বহু পুস্তিকা সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে এবং অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে অনেকগুলি কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং নরোত্তমদাস ঠাকুরের নামে চলিয়াছে। নরোত্তমদাসের নামাঙ্কিত দেহকড়চা নামক পুস্তিকার ১৬০৪ শকাব্দের লিপি পাওয়া গিয়াছে।

অপৌরাণিক আখ্যায়িকা কাব্যের মধ্যে প্রধান হইতেছে কালিকামঙ্গল বা বিদ্যাসুন্দর কাব্য। এই কাব্যে বিদ্যাসুন্দরের গল্পের সাহায্যে দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণিত হইলেও ইহা মূলতঃ এবং প্রধানতঃ প্রাকৃত নরনারীর প্রণয়কাব্য। এই ধারার প্রথম কবি হইতেছেন দ্বিজ শ্রীধর। ইনি গৌড়েশ্বর নসীরু-দ্-দীন নুসরৎ

শাহের পুত্র ফীরূজ শাহের আশ্রিত ছিলেন।[১] তাহার পর কৃষ্ণরাম দাসের নাম করিতে হয়। ইহার কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে রচিত হইয়াছিল। এই ধারার শ্রেষ্ঠ কবি হইতেছেন ভারতচন্দ্র। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম কবি।

শৈব নাথপন্থীদিগের রচিত প্রাচীন চর্য্যাপদের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইঁহাদিগের সিদ্ধা মীননাথ, গোরক্ষনাথ ইত্যাদির কাহিনী অবলম্বনে রচিত যে দুই একটি কাব্য পাওয়া গিয়াছে তাহা অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা। গোপীচাঁদের পাঁচালী বলিয়া যাহা পরিচিত সেই গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতী-হাড়িপা কাহিনীও এই ধারারই অন্তর্গত। গোবিন্দচন্দ্র-কাহিনী অবলম্বনে বাঙ্গালা ভাষায় রচিত একটি নাট্যকাব্য নেপালে পাওয়া গিয়াছে। এটি সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা। বাঙ্গালা দেশে রচিত এই জাতীয় কাব্যের মধ্যে দুর্ল্লভ মল্লিকের গীতই প্রাচীনতম।

লৌকিক অর্থাৎ দেবদেবীর মাহাত্ম্য কিংবা ধর্ম্ম বা সাধন ঘটিত নহে, এমন কাব্য প্রথম পাওয়া যাইতেছে আরাকান অঞ্চলের কতিপয় মুসলমান কবির লেখায়। দৌলত কাজীর সতী ময়না এই জাতীয় প্রথম কাব্য। কাব্যটি সপ্তদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদে রচিত হয়। রচনা সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই কবির মৃত্যু হয়, এবং আলাওল ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দের দিকে কাব্যটি সম্পূর্ণ করিয়া দেন। এই শ্রেণীর কাব্য সবই প্রায় উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে প্রচলিত উপকথা অবলম্বনে রচিত। ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা নামে যাহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে তাহা কতকটা এই ধারার ও কতকটা ঐতিহাসিক কবিতা ধারার অন্তর্গত।

ঐতিহাসিক কবিতার মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে কবি গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র-পুরাণ। মদনমোহনের গান, দামোদরের বন্যার গান ইত্যাদি ছড়াও সব এই ধারার অন্তর্গত।

ব্যাবহারিক ছড়ার মধ্যে ডাক ও খনার বচন এবং শুভঙ্করের আর্য্যার নাম করিতে পারা যায়। ডাক ও খনার বচন ভাবের দিক দিয়া পুরাণ হইলেও ভাষায় ইহা অর্ব্বাচীন। এই সব ছড়া বা প্রবচন কখনই সাহিত্যের মর্য্যাদা লাভ করে নাই।

১। ব-সা-প পঃ ৪৪, পৃ ২২-১৪।

পঞ্চদশ শতাব্দী

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ

গৌড় দরবার ও বাঙ্গালীর সাহিত্য

প্রাচীন কালে ভারতীয় সাহিত্য রাজা ও রাজসভার পৃষ্ঠপোষকতায়ই পুষ্টিলাভ করিয়াছিল। বাঙ্গালা দেশেও তাহার ব্যতিক্রম হয় নাই, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। মুসলমান-অভিযানের পর বিক্ষুব্ধ বাঙ্গালা দেশ ইলিয়াস শাহী স্বলতানদের সময়ে কিছু শান্তিলাভ করায় দেশে সাহিত্যসৃষ্টি-সম্ভাবনার উপযুক্ত আবহাওয়া দেখা দিল বটে, কিন্তু রাজশক্তির যথেষ্ট সহায়তার অভাব দূর না হওয়ায় যথার্থ সাহিত্যসৃষ্টি হয় নাই। চতুর্দ্দশ শতাব্দীর একেবারে শেষে যখন রাজা কংস বা গণেশ গৌড়-সিংহাসন অধিকার করিলেন তখন হইতে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পুনরভ্যুদয় ঘটিল। পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রাজা কংস এবং তৎপুত্র যদু (জলালু-দ্-দীন) কর্ত্তৃক কবিপণ্ডিতের সম্বর্দ্ধনা ও পৃষ্ঠপোষকতা না থাকিলে বাঙ্গালা সাহিত্যের যে কি অবস্থা হইত তাহা কল্পনা করা দুরূহ। গণেশ হিন্দু রাজা, তাঁহার পক্ষে হিন্দু কবি বা পণ্ডিতের পৃষ্ঠপোষকতা করা স্বাভাবিক। তৎপুত্র যদু পরে রাজনৈতিক অথবা অন্য কারণে মুসলমান হইয়া জলালু-দ্-দীন নাম গ্রহণ করিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার জাতীয় মনোবৃত্তি লুপ্ত হয় নাই। তিনিও এই বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে পিতৃপদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন। তাঁহার পরবর্ত্তী সকল রাজা বা স্বলতান মুসলমান ছিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গণেশ গৌড়-দরবারের যে রীতি নূতন করিয়া প্রবর্ত্তিত করিলেন তাহা শতাব্দীরও অধিক কাল ধরিয়া অক্ষুণ্ণ রহিয়া গেল ; বাঙ্গালী পণ্ডিত ও কবির সম্মান করা গৌড়-দরবারের বিশিষ্ট রীতি হইয়া দাঁড়াইল। স্বতরাং মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের উৎপত্তি এবং বিকাশের উৎস গৌড় এবং তত্রত্য রাজদরবারে খুঁজিতে হইবে। চিরকাল ধরিয়া ভারতীয় সংস্কৃতি বাঙ্গালা দেশে ভাগীরথীর পুণ্যস্রোত বাহিয়া আসিয়াছে, ভাগীরথীর তীরে তীরেই এই সংস্কৃতিবিস্তারের

স্বাভাবিক কেন্দ্র সংস্থাপিত হয়। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা প্রভাবশালী কেন্দ্র হয় গৌড এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চল, কেননা ইহাই ছিল রাজশক্তির পীঠভূমি।

মধ্যযুগের বাঙ্গালা সাহিত্যের আদি কবি হইতেছেন কৃত্তিবাস। এই কৃত্তিবাস রাজা কংস বা গণেশের সভায় বিশেষ সংবর্দ্ধনা লাভ করেন এবং তাঁহারই আজ্ঞায় রামায়ণ কাব্য রচনা করেন, এই অনুমান নিতান্ত ভিত্তিহীন নহে। কৃত্তিবাসের আত্মবিবরণী অংশে রাজসভার ও তথায় কবির সংবর্দ্ধনার মনোরম বাস্তব চিত্র পাওয়া যায়।

যদু (জলালু-দ্-দীন) কোন কবিকে সংবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন বলিয়া জানা নাই, তবে তিনিও যে পিতার মত বিদ্যোৎসাহী ছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। ইঁহার আশ্রিত পণ্ডিত রায়মুকুট বৃহস্পতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

মালাধর বসু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে বলিয়াছেন যে, গৌড়েশ্বর তাঁহাকে গুণরাজ খান এই নাম বা উপাধি দিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণবিজয় ১৪৭৩ ৮০ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত। সুতরাং এই সময়ের পূর্ব্বেকার সুলতান রুকুনু-দ্-দীন বারবক শাহ কবিকে ঐ উপাধি দিয়াছিলেন।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং পরবর্ত্তী শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে অলাউ-দ্-দীন মুজফ্ফর হুসৈন শাহ গৌড়ের তক্তে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ইনি কোনও কবি বা পণ্ডিতকে বিশেষ করিয়া সংবর্দ্ধনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় নাই বটে, কিন্তু বড় বড় অনেক কবি ও মনীষীকে নিজ সভায় উচ্চ পদ দিয়া অবান্তরভাবে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও সাহিত্যের পোষকতা করিয়াছিলেন। দণ্ডপাণি সুশাসক বলিয়া হউক, অথবা যে কোন কারণেই হউক, ইঁহার যশ অত্যল্প কাল মধ্যেই গৌডবঙ্গের সুদূর পল্লীতেও ব্যাপ্ত হইয়াছিল। সামসময়িক একাধিক কবি সুলতান হোসেন শাহের দোহাই দিয়াছেন। যশোরাজ খান নামক (বা উপাধিক) জনৈক কবি (—সম্ভবতঃ ইনি রাজকর্ম্মচারী ছিলেন—) স্বরচিত পদের ভণিতায় সগৌরবে হোসেন শাহের নাম করিয়া গিয়াছেন।

গৌড়ের সুলতানেরা মুসলমান হইলেও রাজকার্য্য প্রধানতঃ হিন্দুর হাতেই ছিল। বরেন্দ্র এবং রাঢ় ভূমির বহু ব্রাহ্মণ কায়স্থ ও বৈদ্য গৌড়-দরবারে উচ্চপদে

আরূঢ় থাকিতেন। প্রধানতঃ ইহাদেরই প্রতিপত্তি এবং পোষকতার সাহায্যে বাঙ্গালীর সংস্কৃতি ও সাহিত্য পঞ্চদশ শতাব্দীতে ও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে বিশেষ সমৃদ্ধি ও পুষ্টি লাভ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতেও সংস্কৃত কাব্যরচনা উচ্চ-শিক্ষিত এবং পণ্ডিতদিগের প্রথা ছিল। এই সময়ে গৌড়ে এবং গৌড়-দরবার সংসৃষ্ট সমাজে লিখিত সংস্কৃত কাব্যাদি কতকগুলি পাওয়া গিয়াছে।

রাঢীয় ব্রাহ্মণ চতুর্ভুজ ১৪১৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৯৩-১৪৯৪ খ্রীষ্টাব্দে রামকেলী গ্রামে হরিচরিত নামে কৃষ্ণলীলাত্মক এক সংস্কৃত মহাকাব্য রচনা করেন।[১] রামকেলী গৌড়ের উপকণ্ঠে অবস্থিত।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে উত্তরাপথে বাঙ্গালীর সংস্কৃতির এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের প্রসারে শ্রীচৈতন্যের প্রধান সহায়ক ছিলেন সনাতন এবং রূপ গোস্বামী। এই দুই ভাই রামকেলীতে বাস করিতেন, এবং ইঁহারা হোসেন শাহের অতি বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন। পদবলাৎ ইঁহাদের নাম ছিল যথাক্রমে দবীর-খাস (Private Secretary) এবং সাকর-মল্লিক (Chief Secretary)। পাণ্ডিত্যে ও বুদ্ধিমত্তায় দুই ভাইই অতিশয় বিশিষ্ট ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে কনীয়ান্ রূপ গোস্বামী দুর্লভ কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের সহিত মিলন ঘটিবার (আনুমানিক ১৫১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দের) পর ইঁহারা দুই ভাই কনিষ্ঠ ভ্রাতা অনুপম-বল্লভের সহিত গৃহত্যাগ করেন। ইঁহাদের পরবর্ত্তী জীবনের ইতিহাস সকলেরই সুপরিচিত। হোসেন শাহের অধীনে কার্য্য করিবার সময় (অর্থাৎ আনুমানিক ১৫১২-১৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে) রূপ গোস্বামী কতিপয় সংস্কৃত কাব্য ও গীতিকা রচনা করিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে উদ্ধবসন্দেশ এবং গীতাবলী বিশেষ উল্লেখযোগ্য। সংসার ত্যাগ করিবার পর শ্রীরূপ যে সকল কাব্য, নাটক ও সিদ্ধান্তগ্রন্থাদি রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কথা সর্ব্বজনবিদিত।

মেঘদূতের অনুকরণে রচিত এবং রচনাভঙ্গি কতকটা অপরিণত হইলেও উদ্ধব-সন্দেশের অনেকগুলি শ্লোক বাস্তবিকই উচ্চাঙ্গের। যেমন—

১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সঙ্কলিত Catalogue of Palm-leaf and Selected Paper Mss. belonging to the Darbar Library, Nepal, পৃঃ ১৩৪।

গোষ্ঠ হইতে কৃষ্ণের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হইয়াছে মনে করিয়া রাধা চঞ্চল হই উঠিয়াছেন। তাহাতে যে সখী তাঁহার প্রসাধন করিয়া দিতেছিল সে বলিতেছে উতলা হইও না, এখনও কৃষ্ণের প্রত্যাবর্ত্তনের সময় হয় নাই—

রেণুর্নায়ং প্রসরতি গবাং ধূমধারা কৃশানো-
বেণুর্নাসৌ গহনকুহরে কীচকো রোরবীতি।
পশ্যোন্মত্তে রবিরভিযযৌ নাধুনাপি প্রতীচীং
মা চাঞ্চল্যং কলয় কুচয়োঃ পত্রবল্লীং তনোমি ॥ ৩৬ ॥

অর্থাৎ—যাহাকে তুমি গোধূলি মনে করিতেছ তাহা গোক্ষুরোৎক্ষিপ্ত ধূলিপুঞ্জ নহে, উহা অগ্নির ধূমোদ্গার; যে শব্দ শুনিয়া তুমি কৃষ্ণের বেণুধ্বনি মনে করিতেছ উহা তাহা নহে, বেণুবনে সরন্ধ্র বেণু হইতে উত্থিত শব্দ। উন্মত্তে! দেখ, এখনও সূর্য্য পশ্চিমে ঢলে নাই! অতএব চঞ্চল হইও না, আমি কুচযুগে পত্রবল্লী আঁকিয়া দিই।

কৃষ্ণ গোষ্ঠ হইতে ফিরিতেছেন, এদিকে রাধা গুরুজনের উপস্থিতির জন্য লজ্জা গৃহদ্বারে আসিয়া দিবসান্তে কৃষ্ণকে একবার দেখিয়া লইবার ভরসাও পাইতেছেন না এই অবস্থায় মর্ম্মজ্ঞা সখী বলিতেছে—

মা মন্দাক্ষং কুরু গুরুজনাদ্ দেহলীং গেহমধ্যাদ্
এহি ক্লান্তা দিবসমখিলং হন্ত বিশ্লেষতোঽসি।
এষ স্মেরো মিলতি মৃদুলে বল্লবীচিত্তহারী
হারী গুঞ্জাবলিভিরলিভির্লীঢগন্ধো মুকুন্দঃ ॥ ৪০ ॥

অর্থাৎ—গুরুজনের উপস্থিতিতে লজ্জা করিও না; সমস্ত দিন কৃষ্ণকে না দেখিয়া খিন্ন হইয়া রহিয়াছ, অতএব গৃহমধ্য হইতে বাহির হইয়া দেহলীতে দাঁড়াও। মৃদুলে! ঐ দেখ, অলিলীঢ়গন্ধগুঞ্জামাল্যবান্ গোপীচিত্তহারী মুকুন্দ প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছেন।

অনেকদিন হইল কৃষ্ণ বৃন্দাবন ত্যাগ করিয়াছেন। যাইবার সময় বলিয়াছিলেন যে, অল্পকাল পরেই ফিরিবেন, কিন্তু সে কথা কৃষ্ণ রাখেন নাই। বিরহখিন্না বা বিলাপ করিতেছেন, সখী তাঁহাকে এইরূপ সান্ত্বনা দিতেছেন—

কারুণ্যাব্ধৌ ক্ষিপসি জগতীং হা কিমেভির্বিলাপৈ-
র্ধেহি স্থৈর্য্যং মনসি যদভূরধ্বগে বদ্ধরাগা।
স্মৃত্বা বাণীমপি যদি নিজাং স ব্রজং নাজিহীতে
ধূর্ত্তোহস্মাকং ত্রিজগতি ততস্তন্বি নির্দ্দোষতাভূৎ॥ ৮০॥

অর্থাৎ—আহা, কেন তুমি এইরূপ বিলাপ করিয়া সকলকে কাঁদাইতেছ? পথিককে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছিলে—এই ভাবিয়া মন স্থির কর। সে ধূর্ত্ত যদি নিজের কথা না রাখিয়া ব্রজে না আসে, তবে ত্রিজগতে আমাদের দোষহীনতাই প্রতিপন্ন হইল।

রূপগোস্বামিরচিত গীতিকাগুলি[১] সংস্কৃতে রচিত হইলেও ভাবে এবং ছন্দে এগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যেই পড়ে। ধ্বনি এবং ছন্দ উভয়ে মিলিয়া গানগুলিকে পরম উপভোগ্য করিয়াছে। পদগুলির ভণিতায় শ্লেষের সাহায্যে স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও গুরু সনাতনের নাম করা হইয়াছে। ভণিতা দেখিয়া অনেকে সনাতন গোস্বামীর রচনা বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন।

অভিসারোদ্যতা রাধার প্রতি সখীর উক্তি—

ত্বং কুচবল্লিতমৌক্তিকমালা
স্মিতসান্দ্রীকৃতশশিকরজালা॥
হরিমভিসর সুন্দরি সিতবেষা।
রাকা রজনিরজনি গুরুরেষা॥
পরিহিতমাহিষদধিরুচিসিচয়া।
বপুরর্পিতঘনচন্দননিচয়া॥
কর্ণকরম্বিতকৈরবহাসা।
কলিতসনাতনসঙ্গবিলাসা॥ ২৫॥

অর্থাৎ—দ্রুতনিঃশ্বাসে তোমার বক্ষের মুক্তামালা স্পন্দিত হইতেছে; তোমার স্মিতহাস্য যেন জ্যোৎস্নাকে ঘনীভূত করিয়া দিতেছে। সুন্দরি! তুমি ধবল বাস পরিধান করিয়াছ। এখন অবিলম্বে হরির প্রতি অভিসারে চল, পূর্ণিমার রাত্রি প্রায় গড়াইতে চলিল। তুমি মাহিষ দধির মত শ্বেত বক্ষোবাস পরিয়াছ, এবং সর্ব্বাঙ্গে

১ HBL, পৃঃ ৩৮১-৮৪॥

গাঢ় চন্দন লেপন করিয়াছ; তোমার কর্ণে শোভা পাইতেছে বিকশিত কুমুদ; তুমি সনাতন অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গ পাইবার লোভে বিলাস অবলম্বন করিয়াছ।

রূপ গোস্বামী যে মহাকবি ছিলেন, তাহার বিশেষ প্রমাণ পাওয়া যায় পরিণত-লেখনীনিঃসৃত নাটকদ্বয়ে[১]—বিদগ্ধমাধব ও ললিতমাধবে। এই নাটক দুইটির রচনা যথাক্রমে ১৫৩২ এবং ১৫৩৭ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হইয়াছিল। রূপ গোস্বামীর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য এবং সূক্ষ্ম রসজ্ঞানের ও তত্ত্বদৃষ্টির ছাপ রহিয়াছে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বলনীলমণি গ্রন্থদ্বয়ে[২]। এই দুই গ্রন্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের বেদ বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না।

শ্রীরূপ পদ্যাবলী[৩] নামে একটি সংস্কৃত কবিতাকোষ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। সদুক্তিকর্ণামৃতের মত ইহাতে প্রধানতঃ বাঙ্গালী কবিদিগের রচিত রাধাকৃষ্ণলীলা-বিষয়ক শ্লোক সংগৃহীত হইয়াছে। কতিপয় কবিতা শ্রীরূপের সামসময়িক অথবা অল্পকাল পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের রচনা। উদাহরণস্বরূপ মাধব চক্রবর্ত্তী, জগন্নাথ সেন, জগদানন্দ রায়, সর্ব্ব কবিশেখর, কেশব ভট্টাচার্য্য, যষ্ঠীবর দাস, রামচন্দ্র দাস, মুকুন্দ ভট্টাচার্য্য, কেশব ছত্রী এবং গোবিন্দ ভট্টের নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের কেহ কেহ গৌড়দরবারের কর্ম্মচারী ছিলেন। কতকগুলি কবিতা সত্যই চমৎকার। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী কবির রচনার নমুনা হিসাবে কয়েকটি শ্লোক নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

জগদানন্দ রায়ের একটি নৌকাবিলাসঘটিত শ্লোক কৃষ্ণের প্রতি গোপীদিগের উক্তি—

জীর্ণা তরিঃ সরিদতীব গভীরনীরা বালা বয়ং সকলমিত্থমনর্থহেতুঃ।
নিস্তারবীজমিদমেব কৃশোদরীণাং যন্মাধব ত্বমসি সম্প্রতি কর্ণধারঃ ॥ ২৭২[৪] ॥

১। বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র হইতে, এবং বোম্বাই নির্ণয়সাগর যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

২। বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

৩। বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র হইতে, এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক (শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে মহাশয়ের সম্পাদকতায়) প্রকাশিত।

৪। বহরমপুর রাধারমণযন্ত্র সংস্করণ।

অর্থাৎ—তরী জীর্ণ, নদীতে গভীর জল, আমরা বালিকা—এই সকলই বিপদের কথা। তবে অবলা আমাদের নিস্তারের একটু ক্ষীণ আশা এই যে, মাধব তুমিই এখন আমাদের কর্ণধার হইয়াছ।

সর্ব্ববিদ্যাবিনোদের এই শ্লোকে দূতী বা সহচরী সঙ্কেতে রাধাকে কৃষ্ণের লীলাস্থলীর সংবাদ জানাইতেছেন এবং প্রকারান্তরে কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিতেছেন—

পন্থাঃ ক্ষেমময়োঽস্ত তে পরিহর প্রত্যূহসম্ভাবনাম্
এতন্মাত্রমদর্শি সুন্দরি ময়া নেত্রপ্রণালীপথে।
নীরে নীলসরোজমুজ্জ্বলগুণং তীরে তমালাঙ্কুরঃ
কুঞ্জে কোঽপি কলিন্দশৈলদুহিতুঃ পুংস্কোকিলঃ খেলতি॥ ২৪৮॥

অর্থাৎ—তোমার পথ মঙ্গলময় হউক; বিঘ্নের লেশমাত্র আশঙ্কা করিও না। হে সুন্দরি! আমি এইমাত্র প্রত্যক্ষ করিয়া আসিয়াছি যে, কালিন্দীর নীরে একটি উজ্জ্বল নীলপদ্ম, তীরে একটি বাল তমালতরু এবং কুঞ্জে একটি পুংস্কোকিল বিরাজ করিতেছে।

নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটি কেশব ভট্টাচার্য্যের রচনা। উদ্ধবের দ্বারা রাধা মথুরায় কৃষ্ণকে এই অনুনয় বাণী প্রেরণ করিতেছেন—

আস্তাং তাবদ্ বচনরচনাভাজনত্বং বিদূরে
দূরে চাস্তাং তব তনুপরীরম্ভসম্ভাবনাপি।
ভূয়ো ভূয়ঃ প্রণতিভিরিদং কিন্তু যাচে বিধেয়া
স্মারং স্মারং স্বজনগণনে কাপি রেখা মমাপি॥ ৩৪৬॥

অর্থাৎ—সাক্ষাতে পরস্পর বাক্যালাপ করিবার অবকাশ দূরে থাক, তোমার অঙ্গস্পর্শ লাভের সম্ভাবনা আরও সুদূর হয় হউক! কেবল বার বার প্রণতি করিয়া তোমার নিকট এইটুকুমাত্র যাচ্ঞা করিতেছি—তুমি স্বজনগণনার কালে আমার নামেও একটি রেখাপাত করিও।

গোবিন্দভট্টের রচিত নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকটিতে রাধার জবানিতে কৃষ্ণের বেণুধ্বনির মোহিনী শক্তির বর্ণনা করা হইয়াছে—

সত্যং জল্পসি দুঃসহাঃ খলগিরঃ সত্যং কুলং নির্ম্মলং
সত্যং নিষ্করুণোঽপ্যয়ং সহচরঃ সত্যং সুদূরে সরিৎ।
তৎ সর্ব্বং সখি বিস্মরামি ঝটিতি শ্রোত্রাতিথির্জায়তে
চেদুন্মাদমুকুন্দমঞ্জুমুরলীনিঃস্বানরাগোদ্‌গতিঃ ॥ ১৮৫ ॥

অর্থাৎ—সখি! তুমি যথার্থই বলিতেছ যে খলবাক্য দুঃসহ, ইহাও সত্য যে আমার কুল নিষ্কলঙ্ক, ইহাও ঠিক যে আমার এই সহচর নিষ্ঠুর, এবং ইহাও যথার্থ যে যমুনাতীর সুদূর। তথাপি সখি! এ সকলই আমি ঝটিতি ভুলিয়া যাই, যেইমাত্র মুকুন্দের মধুর মুরলীনিঃসৃত উদ্দামরাগিণী আমার শ্রবণে প্রবেশ করে।

হোসেন শাহের জনৈক কর্ম্মচারী শ্রীখণ্ড-নিবাসী যশোরাজ খান একটি ব্রজবুলি পদে হোসেন শাহের নাম শ্রদ্ধার সহিত উল্লেখ করিয়াছেন, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। পদটির ভণিতা এই—

শ্রীযুত হুসন জগতভূষণ সো ইহ রস জান।
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগপুরন্দর ভণে যশোরাজ খান ॥[১]

হোসেন শাহের পুত্র নসীরু-দ্‌-দীন নুসরৎ শাহও কবির সমাদর করিতেন। তাঁহার এক কর্ম্মচারী, শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জন-বিদ্যাপতি, নিজের একটি ব্রজবুলি পদে সুলতানের প্রশংসা করিয়াছেন—

বিদ্যাপতি ভানি
অশেষ অনুমানি
সুলতান শাহ নসির মধুপ ভুলে কমলা বাণী ॥[২]

সম্প্রতি একটি বিদ্যাসুন্দর কাব্যের খণ্ডিত দুইটি পুঁথির কয়েকটি পত্র শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় চট্টগ্রামে আবিষ্কার করিয়াছেন।[৩] তাহাতে কবি শ্রীধর স্বীয় পৃষ্ঠপোষক যুবরাজ ফিরোজ ও তাঁহার পিতা নসির শাহের নাম করিয়াছেন—

নৃপতি নসির সাহা তনয় সুন্দর।
সর্ব্বকলা-নলিনীভোগী ত মধুকর ॥

১। পীতাম্বর দাস বিরচিত রসমঞ্জরীতে উদ্ধৃত; HBL, পৃঃ ২৪।
২। ব-সা-প-প ৪০, পৃঃ ২৮।
৩। ব-সা-প-প ৪৪, পৃঃ ২৩-২৪।

রাজা শ্রীপেরোজ সাহা বিনোদ সুজান।
দ্বিজ ছিরিধর কবি রাজা পরমাণ॥

শ্রীপেরোজ সাহা বিদিত যুবরাজ।
কহিল পঞ্চালী ছন্দে ছিরি কবিরাজ॥

এই সুলতান নসীরু-দ্-দীন নুসরৎ শাহ (১৫১৯-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ), ও তৎপুত্র [illegible]উদ্-দীন ফীরুজ শাহ। ফীরুজ শাহ শুধু কয়েক মাস রাজত্ব করিয়াছিলেন। [illegible]টি ১৫১৯ হইতে ১৫৩৩ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান [illegible] যাইতে পারে।

হোসেন শাহের এক সেনাপতি চট্টগ্রাম জয় করিয়া তথায় শাসনকর্ত্তারূপে [illegible] করেন। ইহার নাম লস্কর পরাগল খান। ইহার আদেশে কবীন্দ্র বাঙ্গালায় [illegible]ভারত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সেই কাব্য ইহার সভায় পঠিত হইত। [illegible]গলের পুত্র ছুটি খানের আদেশে শ্রীকর নন্দী অশ্বমেধ-পর্ব্বের বিস্তৃততর অনুবাদ [illegible]য়াছিলেন। পরাগলের বিদ্যোৎসাহিতার ফলে চট্টগ্রাম ও আরাকান অঞ্চলে [illegible]লা সাহিত্যের চর্চ্চা সেকালে যথেষ্ট বাড়িয়া যায়।

গৌড় যে রাধাকৃষ্ণলীলা সাহিত্যের প্রধান কেন্দ্রস্থল ছিল, তাহা উপরের [illegible]লোচনা হইতে ধারণা করা যাইবে। প্রকৃত পক্ষে, কি কৃষ্ণমঙ্গল কাব্য কি [illegible]কৃষ্ণবিষয়ক পদাবলী, উভয় ধারারই উৎস যে গৌড় তাহাতে সন্দেহ করিবার [illegible] অবকাশ নাই। এই অঞ্চলে যে মূর্ত্তি এবং চিত্র শিল্পেও এই বিষয়ের [illegible] হইত, তাহার প্রমাণ আছে। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানিতে পারি যে, [illegible] যখন প্রথমবার বৃন্দাবনগমনোদ্যোগ করিয়া রামকেলী হইতে ফিরিলেন, [illegible] রামকেলীর নিকটে কানাই-নাটশালা গ্রামে শিল্পে কৃষ্ণলীলাবিষয়ক [illegible] প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন।

প্রাতে চলি আইলা প্রভু কানাইর নাটশালা।
দেখিল সকল তাঁহা কৃষ্ণচিত্র[1]-লীলা॥২-১॥

[1] [illegible]ান্তর "চরিত্র"

সপ্তম পরিচ্ছেদ

কৃত্তিবাস

কৃত্তিবাসের রামায়ণের যে সব পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে কোন কোনটিতে কবির আত্মপরিচয়জ্ঞাপক এক আধটি পয়ার দেখা যায়। হারাধন দত্ত মহাশয় এক সুপ্রাচীন (?) পুঁথিতে[১] কৃত্তিবাসের বিস্তৃত আত্মপরিচয়টুকু পান। দুঃখের বিষয় এই পুঁথিটি লুপ্ত হইয়াছে। তবে আত্মপরিচয় অংশটি দত্ত মহাশয় টুকিয়া লইয়াছিলেন বলিয়া এই মূল্যবান্ অংশটি বিলুপ্ত হইতে পারে নাই। আত্মবিবরণ অংশটি নিম্নে সমগ্রভাবে উদ্ধৃত করা গেল।[২]

পূর্ব্বেতে আছিল বেদানুজ[৩] মহারাজা।
তাহার পাত্র আছিল নারসিংহ ওঝা॥
বঙ্গদেশে প্রমাদ হইল সকলে অস্থির।
বঙ্গদেশ ছাড়ি ওঝা আইলা গঙ্গাতীর॥
সুখভোগ ইচ্ছায় বিহরে গঙ্গাকূলে।
বসতি করিতে স্থান খুঁজে খুঁজে বুলে॥
গঙ্গাতীরে দাড়াইয়া চতুর্দ্দিকে চায়।
রাত্রিকাল হইল ওঝা শুতিল তথায়॥
পোহাইতে আছে যখন দণ্ডেক রজনী।
আচম্বিতে শুনিলেন কুকুরের[৪] ধ্বনি॥
কুকুরের[৪] ধ্বনি শুনি চারিদিকে চায়।
হেনকালে আকাশবাণী শুনিবারে পায়॥

১। পুঁথিটি ১৪৩২ শকাব্দে অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৫১০-১১ সালে অনুলিখিত বলিয়া কথিত। কিন্তু ভাষা দৃষ্টে পুঁথিটিকে নিতান্ত অর্ব্বাচীনই বলিতে হয়।

২। দত্ত মহাশয়ের নিকট পাইয়া দীনেশ চন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে সর্ব্বপ্রথম প্রকাশিত করেন। এখন প্রায় সকল মূল্যবান্ সংস্করণেই ইহা উদ্ধৃত হইয়া থাকে।

৩। প্রকৃত পাঠ সম্ভবতঃ হইবে 'যে দানুজ'। ৪। 'কুকুড়ার' হইবে কি?

মালী জাতি ছিল পূর্ব্বে মালঞ্চ এ থানা।
ফুলিয়া বলিয়া কৈল তাহার ঘোষণা॥
গ্রামরত্ন ফুলিয়া জগতে বাখানি।
দক্ষিণে পশ্চিমে বহে গঙ্গা তরঙ্গিণী॥
ফুলিয়া চাপিয়া হৈল তাঁহার বসতি।
ধনধান্যে পুত্রে পৌত্রে বাড়য় সন্ততি॥
গর্ব্বেশ্বর নামে পুত্র হৈল মহাশয়।
মুরারি সূর্য্য গোবিন্দ তাহার তনয়॥
জ্ঞানেতে কুলেতে ছিল মুরারি ভূষিত।
সাত পুত্র হৈল তার সংসারবিদিত॥
জ্যেষ্ঠ পুত্র হৈল তার নাম যে ভৈরব।
রাজার সভায় তার অধিক গৌরব॥
মহাপুরুষ মুরারি জগতে বাখানি।
ধর্ম্মচর্চ্চায় রত মহান্ত যে মানী॥
মদরহিত ওঝা সুন্দরমূরতি।
মার্কণ্ড ব্যাস সম শাস্ত্রে অবগতি॥
সুশীল ভগবান তথি বনমালী।
প্রথম বিভা কৈল ওঝা কুলেতে গাঙ্গুলি॥
দেশ যে সমস্ত ব্রাহ্মণের অধিকার।
বঙ্গভাগে ভুঞ্জে তিঁহ সুখের সংসার॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে গোসাঞি-প্রসাদে।
মুরারি ওঝার পুত্র সব বাড়য়ে সম্পদে॥
মাতার পতিব্রতার যশ জগতে বাখানি।
ছয় সহোদর হৈল এক যে ভগিনী॥
সংসারে সানন্দ সতত কৃত্তিবাস।
ভাই মৃত্যুঞ্জয় করে ষড় উপবাস॥

সহোদর শান্তি মাধব সর্ব্বলোকে ঘুষি।
শ্রীধর ভাই তার নিত্য উপবাসী ॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ নামেতে ভাস্কর।
আর এক বইন হৈল সতাই-উদর ॥[১]
মালিনী নামেতে মাতা বাপ বনমালী।
ছয় ভাই উপজিলাম সংসারে গুণশালী ॥
আপনার জন্মকথা কহিব যে পাছে।
মুখটি বংশের কথা আরো কৈতে আছে ॥
সূর্য্য-পণ্ডিতের পুত্র হৈল নাম বিভাকর।
সর্ব্বত্র জানিয়া পণ্ডিত বাপের সোসর ॥
সূর্য্যপুত্র নিশাপতি বড ঠাকুরাল।
সহস্রসংখ্যক লোক দ্বারেতে যাহার ॥
রাজা গৌড়েশ্বর দিল প্রসাদী এক ঘোড়া।
পাত্রমিত্র সকলে দিলেন খাসা জোড়া ॥
গোবিন্দ জয় আদিত্য ঠাকুর বসুন্ধর।
বিদ্যাপতি রুদ্র ওঝা তাঁহার কোঙর ॥
ভৈরবসুত গজপতি বড় ঠাকুরাল।
বারাণসী পর্য্যন্ত কীর্ত্তি ঘোষয়ে যাঁহার ॥

১। একটি পুঁথিতে এইটুকু পাওয়া যায়—

পিতা বনমালী মাতা মেনকার উদরে।
জন্ম লভিলা কৃত্তিবাস ছয় সহোদরে ॥
বলভদ্র চতুর্ভুজ অনন্ত ভাস্কর।
নিত্যানন্দ কৃত্তিবাস ছয় সহোদর ॥
পঞ্চ ভাই পণ্ডিত কৃত্তিবাস গুণশালী।
অনেক শাস্ত্র পড়্যা রচে শ্রীরাম পাঁচালী ॥
শুনিতে অমৃতধার লোকেত প্রকাশ।
ফুলিয়াতে বৈসেন পণ্ডিত কৃত্তিবাস ॥ [বা-প্রা-পু-বি ৩-১, পৃ ১৭-১৮।]

মুখটি বংশের পদ্ম শাস্ত্রে অবতার।
ব্রাহ্মণ সজ্জনে শিখে যাহার আচার ॥
কুলে শীলে ঠাকুরালে ব্রহ্মচর্য্য গুণে।
মুখটি বংশের যশ জগতে বাখানে ॥
আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥
শুভক্ষণে গর্ভ হৈতে পড়িনু ভূতলে।
উত্তম বস্ত্র দিয়া পিতা আমা লৈল কোলে ॥
দক্ষিণ যাইতে পিতামহের উল্লাস।
কৃত্তিবাস বলি নাম করিলা প্রকাশ ॥
এগার নিবড়ে যখন বারতে প্রবেশ।
হেনকালে পড়িতে গেলাম উত্তরদেশ ॥
বৃহস্পতিবারের উষা পোহালে শুক্রবার।
পাঠের নিমিত্ত গেলাম বড়-গঙ্গা পার ॥[১]
তথায় করিলাম আমি বিদ্যার উদ্ধার।
যথা যথা যাই তথা বিদ্যার বিচার ॥
সরস্বতী অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
নানা ছন্দ নানা ভাষা আপনা হৈতে স্ফুরে
বিদ্যা সাঙ্গ করিতে প্রথম হৈল মন।
গুরুকে দক্ষিণা দিয়া ঘরকে গমন ॥

১। একটি পুঁথিতে আছে—

পিতা বনমালী মাতা মানিাক উদরে।
জনম লভিল ওঝা ছয় সহোদরে ॥
ছোট গঙ্গা বড গঙ্গা বড বলিন্দা পার।
যথা তথা কর্য়া বেড়ায় বিদ্যার উদ্ধার ॥
রাড়া মধৈ বন্দিনু আচার্য্য চূড়ামণি।
যার ঠাই কৃত্তিবাস পড়িলা আপনি ॥ [বা প্রা পু-বি ৩-২, পৃ ৪১]।

'বলিন্দা' বোধ হয় 'বরেন্দ্র' হইবে এবং 'রাড়া মধৈ' 'রাঢ় মধ্যে' হওয়া সম্ভব।

ব্যাস বশিষ্ঠ যেন বাল্মীকি চ্যবন।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যা সমাপন॥
ব্রহ্মার সদৃশ গুরু বড় উদ্মাকার।
হেন গুরুর ঠাঞি আমার বিদ্যার উদ্ধার॥
গুরুর স্থানে মেলানি লইলাম মঙ্গলবার দিবসে
গুরু প্রশংসিলা মোরে অশেষবিশেষে॥
রাজপণ্ডিত হব মনে আশা করে।
পঞ্চ শ্লোক ভেটিলাম রাজা গৌড়েশ্বরে॥
দ্বারী হস্তে শ্লোক দিয়া রাজাকে জানালাম।
রাজাজ্ঞা অপেক্ষা করি দ্বারেতে রহিলাম॥
সপ্তঘটি বেলা যখন দেয়ালে পড়ে কাটি।
শীঘ্র ধাই আইল দ্বারী হাতে স্বর্ণ লাঠি॥
কার নাম ফুলিয়ার মুখটি কৃত্তিবাস।
রাজার আদেশ হৈল করহ সম্ভাষ॥
নয় দেউড়ী পার হয়ে গেলাম দরবারে।
সিংহসম দেখি রাজা সিংহাসন পরে॥
রাজার ডাহিনে আছে পাত্র জগদানন্দ।
তাহার পাশে বসিয়াছে ব্রাহ্মণ সুনন্দ॥
বামেতে কেদার খাঁ ডাহিনে নারায়ণ।
পাত্রমিত্র সহ রাজা পরিহাসে মন॥
গন্ধর্ব্ব রায় বসে আছে গন্ধর্ব্ব অবতার।
রাজসভা পূজিত[১] তেঁহ গৌরব অপার॥
তিন পাত্র দাঁড়াইয়া আছে রাজার পাশে।
পাত্রমিত্র লয়ে রাজা করে পরিহাসে॥

১। মূলে 'পূজিতে'।

ডাহিনে কেদার রায় বামেতে তরণী।
সুন্দর শ্রীবৎস্য আদি ধর্ম্মাধিকারিণী ॥
মুকুন্দ রাজার পণ্ডিত প্রধান সুন্দর।
জগদানন্দ রায় মহাপাত্রের কোঙর ॥
রাজার সভাখান যেন দেব-অবতার।
দেখিয়া আমার চিত্তে লাগে চমৎকার ॥
পাত্রেতে বেষ্টিত রাজা আছে বড় সুখে।
অনেক লোক দাঁড়াইয়া রাজার সম্মুখে ॥
চারিদিকে নাট্যগীত সর্ব্বলোকে হাসে।
চারিদিকে ধাওয়াধাই রাজার আওয়াসে ॥
আঙ্গিনায় পড়িয়াছে রাঙ্গা মাজুরি।
তার উপর পডিয়াছে নেতের পাছুড়ি ॥
পাটের চাঁদোয়া শোভে মাথার উপর।
মাঘ মাসে খরা পোহায় রাজা গৌড়েশ্বর ॥
দাণ্ডাইনু গিয়া আমি রাজবিদ্যমানে।
নিকটে যাইতে রাজা দিল হাতসানে ॥
রাজা আদেশ[১] কৈল পাত্র ডাকে উচ্চৈঃস্বরে।
রাজার সম্মুখে আমি গেলাম সত্বরে ॥
রাজার ঠাঁই দাঁড়াইলাম চারি হাত অন্তরে।
সাত শ্লোক পড়িলাম শুনে গৌড়েশ্বরে ॥
পঞ্চদেব অধিষ্ঠান আমার শরীরে।
সরস্বতী প্রসাদে শ্লোক মুখ হইতে স্ফুরে ॥
নানা ছন্দে শ্লোক আমি পড়িনু সভায়।
শ্লোক শুনি গৌড়েশ্বর আমা পানে চায় ॥

[১] মূলে 'রাজআদেশ'।

নানামতে নানা শ্লোক পড়িলাম রসাল।
খুসি হৈয়া মহারাজ দিলা পুষ্পমাল ॥
কেদার খাঁ শিরে ঢালে চন্দনের ছড়া।
রাজা গৌড়েশ্বর দিল পাটের পাছড়া ॥
রাজা গৌড়েশ্বর বলে কিবা দিব দান।
পাত্রমিত্র বলে রাজা যা হয় বিধান ॥
পঞ্চ গৌড় চাপিয়া গৌড়েশ্বর রাজা।
গৌড়েশ্বর পূজা কৈলে গুণের হয় পূজা ॥
পাত্র মিত্র সবে বলে শুন দ্বিজরাজে।
যাহা ইচ্ছা হয় তাহা চাহ মহারাজে ॥
কারো কিছু নাই লই করি পরিহার।
যথা যাই তথায় গৌরবমাত্র সার ॥
যত যত মহাপণ্ডিত আছয়ে সংসারে।
আমার কবিতা কেহ নিন্দিতে না পারে।
সন্তুষ্ট হইয়া রাজা দিলেন সন্তোক।
রামায়ণ রচিতে করিলা অনুরোধ ॥
প্রসাদ পাইয়া বারি হইলাম সত্বরে।
অপূর্ব্ব জ্ঞানে ধায় লোক আমা দেখিবারে
চন্দনে ভূষিত আমি লোক আনন্দিত।
সবে বলে ধন্য ধন্য ফুলিয়া-পণ্ডিত ॥
মুনিমধ্যে বাখানি বাল্মীকি মহামুনি।
পণ্ডিতের মধ্যে কৃত্তিবাস গুণী ॥
বাপ-মায়ের আশীর্ব্বাদে গুরু আজ্ঞা দান।
রাজাজ্ঞায় রচে গীত সপ্তকাণ্ড গান ॥
সাতকাণ্ড কথা হয় দেবের সৃজিত।
লোক বুঝাবার তরে কৃত্তিবাস পণ্ডিত ॥

রঘুবংশের কীর্ত্তি কেবা বর্ণিবারে পারে।
কৃত্তিবাস রচে গীত সরস্বতীর বরে ॥

আত্মবিবরণ হইতে জানা যাইতেছে যে, কৃত্তিবাসের পিতার নাম বনমালী, মাতার নাম মেনকা, পিতামহের নাম মুরারি ওঝা। ইনি বঙ্গদেশ হইতে আসিয়া গঙ্গাতীরে ফুলিয়ায় বসতি করেন। কৃত্তিবাসেরা ছয় বা সাত ভাই, এক সতাতো ভগিনী। বারো বৎসরের সময় কবি বিদেশে বিদ্যা শিক্ষা করিতে যান। বিদ্যায় ব্যুৎপন্ন হইয়া তিনি গৌড়েশ্বরের সাক্ষাৎ করেন। কৃত্তিবাসের কবিত্বে প্রীত হইয়া গৌড়েশ্বর তাঁহাকে সংবর্দ্ধিত করেন এবং রামায়ণ রচনা করিতে আদেশ দেন। তদনুসারে কৃত্তিবাস রামায়ণ রচনা করেন।

আত্মবিবরণে কৃত্তিবাস স্বীয় জন্ম মাস বার ও তিথির উল্লেখ করিয়াছেন, বৎসরের উল্লেখ করেন নাই—

আদিত্যবার শ্রীপঞ্চমী পূর্ণ মাঘ মাস।
তথি মধ্যে জন্ম লইলাম কৃত্তিবাস ॥

ইহা হইতে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় গণনা করিয়া কৃত্তিবাসের জন্ম তারিখ পাইয়াছিলেন[১]—১৩৫৪ শকাব্দ ২৯ শে মাঘ রবিবার, ইংরেজি হিসাবে ২৫ শে জানুয়ারী ১৪৩৩ খ্রীষ্টাব্দ। 'পূর্ণ' শব্দটি 'পুণ্য' শব্দের বিকৃতি ধরিয়া ইনি পুনরায় গণনা করিয়া পাইয়াছেন[২]—১৩৩৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দ, অথবা ১৩২০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৩৯৮ খ্রীষ্টাব্দ। কৃত্তিবাসের জন্মকাল ১৩২০ শকাব্দ ধরিলে গৌড়ের সিংহাসনে কংস বা গণেশকে পাওয়া যায়। অন্যথা কোন হিন্দু গৌড়েশ্বর পাওয়া যায় না।

কৃত্তিবাস গৌড়েশ্বরের যে পাত্র মিত্রের নাম করিয়াছেন তাহা হইতে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ ও শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়দ্বয়[৩] এবং আরও অনেকে গৌড়েশ্বর বলিতে তাহিরপুরের রাজা কংসনারায়ণকেই বুঝিয়াছেন।

১। ব-সা-প-প ২০, পৃ ৩১৫-১৭, প্রবাসী ১৩৩৬ দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ ৩৪৬।
২। ব-সা-প-প ৪০, পৃ ১৩-১৪।
৩। ঐ, পৃ ১১১-১২, DCBM, Vol. I, পৃ ॥৵।

কিন্তু শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, কংস-নারায়ণ ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।[১] কৃত্তিবাস ষোড়শ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন না, এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। অনেক পুরাণ পুঁথিতে ব্রজবুলিতে লিখিত 'রাম-রাস' অংশ পাওয়া যায়। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছেন যে, কৃত্তিবাস ১৪৬০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৩৮-৩৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার কাব্য রচনা করেন।[২] দুঃখের বিষয়, তিনি এই কথার কোন প্রমাণ দেন নাই। তবে এই স্পষ্ট উক্তি হইতে মনে হয়, ইহা কোন পুঁথিতে ছিল।

কৃত্তিবাসের রামায়ণের মধ্যে তাঁহার নাম ছাড়া আর কিছু অংশ অপরিবর্ত্তিত রহিয়া গিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কাব্যটি অসাধারণ লোকপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া অনতিবিলম্বেই পাঠবিকৃতি এবং প্রক্ষেপ সুরু হইয়াছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণের যে প্রাচীনতম পুঁথি পাওয়া গিয়াছে,[৩] তাহা শুধু উত্তরকাণ্ডের। ইহা ১৫০২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত হইয়াছিল। কৃত্তিবাসের রামায়ণের পুঁথি প্রায় সবই রামায়ণ-গায়কের পুঁথি ; সুতরাং এই সকল পুঁথিতে যে বিভিন্ন রামায়ণ-রচয়িতার অথবা গায়কের ভণিতা ঢুকিয়া যাইবে, তাহাতে বিস্ময়ের বিষয় কিছুই নাই। কৃত্তিবাসের কাব্যের মূলরূপ নির্দ্ধারণের জন্য শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় চেষ্টা করিতেছেন।[৪] ভট্টশালী মহাশয় যে প্রাচীনতর আদর্শ ঠিক করিয়াছেন, তাহাকে কাব্যের মূলরূপ বলা চলে না ; তাহা composite text মাত্র।

কৃত্তিবাসের কাব্য সম্বন্ধে এইটুকু বলিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে আরম্ভ করিয়া আজ অবধি ইহা সমগ্র বাঙ্গালার আবালবৃদ্ধবনিতাকে তাহাদের দুঃখে সুখে, উত্থানে পতনে, ভোগে ত্যাগে, কর্ম্মে অবসরে—সর্ব্ববিধ অবস্থায় সমান আনন্দ যোগাইয়া আসিতেছে। কাব্যের উৎকর্ষ এবং কবির সৌভাগ্য ইহা হইতে আর অধিক কি হইতে পারে?

১। ব-সা-প-প ৪১, পৃ ১৪-১৮।

২। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা (১৯৩৫ সংবৎ), পৃ ১৫।

৩। ব সা-প প্রকাশিত উত্তরকাণ্ড আংশিকভাবে এই পুঁথির সাহায্যে সম্পাদিত হইয়াছিল।

৪। মহাকবি কৃত্তিবাস রচিত রামায়ণ আদিকাণ্ড (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৬)।

অষ্টম পরিচ্ছেদ

মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়

গুণরাজ খান উপাধিক মালাধর বসু প্রণীত শ্রীকৃষ্ণবিজয় বা গোবিন্দবিজয় অথবা গোবিন্দমঙ্গল বাঙ্গালায় সনতারিখ-যুক্ত প্রাচীনতম পুস্তক।[১] কাব্যটির রচনাকাল ১৩৯৫-১৪০২ শকাব্দ অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৪৭৩-১৪৮১ সাল—

তের শ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈলা সমাপন॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয় বটতলা হইতে প্রথম প্রকাশিত হয়। তাহার পরে কেদারনাথ দত্ত ভক্তিবিনোদ মহাশয় ৪০১ শ্রীচৈতন্যাব্দে ইহার এক সংস্করণ প্রকাশ করেন।[২] ইনি ১৪০৫ শকাব্দে দেবানন্দ বসু লিখিত এক অনুলিপি ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু এই প্রাচীন পুঁথিটি জীর্ণ বিধায় ভক্তিবিনোদ মহাশয় ইহাকে বিশেষ কাজে লাগাইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া বোধ হয় না। যাহা হউক, এই সংস্করণটি একটি প্রাচীনতম পুঁথি অবলম্বন করিয়া সম্পাদিত বলিয়া বিশেষ প্রামাণিক মনে হয়। ইহার প্রামাণিকত্বের আর একটি প্রমাণ আছে। শ্রীকৃষ্ণবিজয় শ্রীমদ্ভাগবতের দশম ও একাদশ স্কন্ধের ভাবানুবাদ, সুতরাং ইহার মধ্যে দানলীলা এবং নৌকালীলা প্রভৃতি অপৌরাণিক লীলার স্থান নাই। ভক্তিবিনোদ মহাশয়ের সংস্করণে এই দুইটি লীলা নাই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের কোন কোন পুঁথিতে তাহা আছে। অতএব মনে হয় যে, এই সকল পুঁথিতে দানলীলা এবং নৌকালীলা অংশ দুইটি পরে প্রক্ষিপ্ত হইয়াছে।

গ্রন্থের মধ্যে কবি নিজের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। তাহা হইতে জানা যায় যে, ইঁহার পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম ইন্দুমতী, জাতি কায়স্থ, বাসস্থান

১। ব-সা-প-প ৩৮, পৃ ১৫৫-৭৬।

২। বর্ত্তমান আলোচনা এই সংস্করণ অবলম্বনে করা যাইতেছে।

বৰ্দ্ধমান জেলায় কুলীনগ্রামে। গৌড়েশ্বরের নিকট ইনি গুণরাজ খান উপাধি পাইয়াছিলেন। ইঁহার (একতম ?) পুত্র ছিলেন সত্যরাজ খান—

বাপ ভগীরথ মোর মাতা ইন্দুমতী।
যাঁহার পুণ্যে হইল মোর কৃষ্ণচন্দ্রে মতি॥
যক্ষ রক্ষ সৰ্ব্ব জনে করিয়া বিনয়।
মালাধর বসু কহে শ্রীকৃষ্ণবিজয়॥ পৃ ২॥

গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান॥
সত্যরাজ খান হয় হৃদয়নন্দন।
তারে আশীর্ব্বাদ কর যত সাধুজন॥
দন্তে তৃণ ধরি বলি সকলের ঠাঞী।
যদি দোষ থাকে গ্রন্থে ক্ষমা-ভিক্ষা চাই॥
কায়স্থকুলেতে জন্ম কুলীনগ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।
বদন ভরিয়ে হরি বল সর্ব্বজন॥ পৃ ২১৬-১৭॥

শ্রীকৃষ্ণবিজয় বিরচিত হইলে পর গুণী ব্যক্তির কাছে ইহার সমাদর অত্যল্প কালের মধ্যেই হইয়াছিল। মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের উল্লেখ করিয়া মালাধর বসুর পুত্র সত্যরাজ খানকে এবং পৌত্র (?) রামানন্দ বসুকে অভিনন্দিত করিয়াছিলেন—

কুলীনগ্রামীরে কহে সম্মান করিয়া।
প্রত্যব্দ আসিবে যাত্রায় পট্টডোরী লৈয়া॥
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়।
তাঁহা এক বাক্য তাঁর আছে প্রেমময়॥
"নন্দের নন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ।"
এই বাক্যে বিকাইনু তাঁর বংশের হাথ॥

তোমার কা কথা তোমার গ্রামের কুক্কুর।
সেহ মোর প্রিয় অন্যজন রহু দূর ॥[১]

উদ্ধৃত চরণটি শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের চতুর্থ চরণ।

কবি শ্রীমদ্ভাগবতের আক্ষরিক অনুবাদ করেন নাই, কেবল দশম এবং একাদশ স্কন্ধের গল্পাংশ আদ্যন্ত বর্ণনা করিয়াছেন। একাদশ স্কন্ধের তাত্ত্বিক অংশেরও তাৎপর্য্য কিছু কিছু দিয়াছেন। কাব্যটি অধ্যায় পরিচ্ছেদ ইত্যাদিতে বিভক্ত নহে। কেবল রাগরাগিণীর বিভাগ আছে। সাধারণতঃ একটি রাগের শেষে (বা একই রাগের অন্তর্গত বিভিন্ন আখ্যানের শেষে) কবির ভণিতা দেওয়া আছে। সেইখানেই কাব্যের আংশিক বিরাম।

শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের আরম্ভ এইরূপ—

প্রণমহোঁ[২] নারায়ণ অনাদিনিধন।
সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় যত তাহার কারণ ॥
এক ভাবে বন্দোঁ[৩] হরি যোড় করি হাত।
নন্দনন্দন কৃষ্ণ মোর প্রাণনাথ ॥
ব্রহ্মা মহেশ্বর বন্দোঁ সৃষ্টির সহায়।
গণপতি প্রণমহোঁ বিঘ্নহরতায় ॥
সর্ব্বদেবগণের বন্দিয়া চরণ।
কৃষ্ণের চরিত্র কিছু করিল রচন ॥
লক্ষ্মী সরস্বতী বন্দোঁ তাঁহার দুই নারী।
যাঁহার প্রসাদে সর্ব্বলোক পুরস্কার ॥
ত্রিভুবনেশ্বরী দেবী জগতজননী।
প্রকৃতিস্বরূপা দেবী সৃষ্টির পালনী ॥
(যাঁহার) পাদপদ্ম স্মরি ইন্দ্র ত্রিজগতের রাজা।
ব্রহ্মা আদি দেবগণে করে যাঁর পূজা ॥

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ২-১৫। ২। মুদ্রিত পাঠ সর্ব্বত্র 'প্রণমহ'।
৩। মুদ্রিত পাঠ সর্ব্বত্র 'বন্দ'।

শুম্ভ আদি অসুরের করিয়া নিধন।
দেব ঋষি রক্ষা কৈল চরাচরগণ॥
যাঁহার প্রসাদ মোরে হৈল আচম্বিত।
মুক্তি দাও করি বলি কৃষ্ণের চরিত॥
গোসাঞীর জন্মকর্ম্ম কে বলিতে পারে।
লোকহিত কারণে যতেক অবতারে॥
আকাশের তারা যদি একে একে গণি।
সমুদ্রের জল যদি ঘটে প্রমাণি॥
পৃথিবীর রেণু যদি করিয়ে গণন।
তবু কি বলিতে পারি কৃষ্ণের কারণ॥
বরিষার বৃষ্টিধারা গণিবারে পারি।
কৃষ্ণের চরিত তবু বলিবারে নারি॥
সংসার সাগর লোক করিবে তারণ।
ভাগবত অবতারি হিতের কারণ॥
ভাগবত শুনিল আমি পণ্ডিতের মুখে।
লৌকিকে কহিয়ে সার বুঝ মহাসুখে॥
ভাগবত-অর্থ যত পয়ারে বান্ধিয়া।
লোক নিস্তারিতে যাই পাঁচালী রচিয়া॥
ভাগবত শুনিতে অনেক অর্থ চাহি।
তেকারণ ভাগবত গীতচ্ছন্দে গাই॥
কলিকালে পাপচিত্ত হব সব নর।
পাঁচালীর রসে লোক হইব বিস্তর॥
গাইতে গাইতে লোক পাইব নিস্তার।
শুনিয়া নিষ্পাপ হব সকল সংসার॥
সাদরে শুনিহ লোক না করিহ হেলা।
ভবসিন্ধু তরিবারে এই হৈল ভেলা॥

ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ যে যার বাসনা।
যেই যাহা কৈল তাহা করায়ে ঘটনা॥
ইহা বুঝি লোক সব শুন সাবধানে।
যাইবে বৈকুণ্ঠপুরী চড়িয়া বিমানে॥
সংসারের সার গোসাঞী কমললোচন।
সবাকার বল গোসাঞী দেব নিরঞ্জন॥ ইত্যাদি।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের অগ্রদূত হিসাবে যে কয়জন মহাপুরুষ-ভক্তের আবির্ভাব হইয়াছিল তাহার মধ্যে মালাধর বসু অন্যতম। কবি প্রকৃত ভক্ত ছিলেন, আর যথার্থ কবিও ছিলেন। এই দুই অনন্যসাধারণ গুণের সমাবেশ হওয়াতে ঘটনাবহুল বর্ণনাত্মক কবিত্ববাহুল্যবৰ্জ্জিত কাব্যটি সরল ও স্বচ্ছন্দ ভাষায়, আড়ম্বরহীন পয়ার ছন্দের দ্রুততালের মধ্য দিয়া, কবির ভক্তহৃদয় ও সহজ কবিত্বের পরিচয় প্রদান করিয়া পাঠক বা শ্রোতার মন অতি অনায়াসে আকৃষ্ট করে। যেমন,—

অল্পধনলোভ লোকে এড়াইতে পারে।
কানু হেন ধন সখী ছাড়ি দিব কারে॥

কবি শ্রীমদ্ভাগবতের গল্পাংশ, এবং কিছু কিছু তত্ত্বাংশ, অনুবাদ করিয়াছেন। আক্ষরিক অনুবাদের চেষ্টা খুব অল্প স্থলেই দেখা যায়।[১] কাব্যটিতে পয়ার ছন্দেরই আধিক্য, অল্প কয়েক স্থলে শুধু দীর্ঘ ত্রিপদী ছন্দ পাওয়া যায়। গীত হইত বলিয়া প্রায় সর্ব্বত্রই রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে।[২]

কবির রচনার আরও কিছু পরিচয়স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের সমাপ্তি অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সব ঘটে থাকি সেহ সকল করায়।
কেহ তাঁরে নাহি দেখে তাঁহার মায়ায়॥
সূক্ষ্মরূপ ব্রহ্মপদ ভাবিতে না পারি।
সকল হৃদয়ে গোসাঞী রন তনু ধরি॥

১। ব সা-প প ৩৮; ১৬২-৬৩। ২। ঐ, পৃ ১৬৬।

গোসাঞীর তনু চিন্তি পাই ব্রহ্মজ্ঞানে।
একান্ত হইয়া প্রভুকে ভাব একমনে॥
সবাতে আছেন হরি এমন ভাবিহ।
আপনা হইতে ভিন্ন কাকে না দেখিহ॥
নিজ আত্মা পর আত্মা যেই তাঁরে জানে।
তার চিত্তে কভু নাহি ছাড়ে নারায়ণে॥
কর্ণধার বিনে যেন নৌকা নাহি যায়।
তেমনি প্রভুর মায়া সংসারে ভ্রমায়[১]॥
ইহা বুঝি পণ্ডিত ভাই স্থির কর মন।
একভাবে চিন্ত প্রভু কমললোচন॥
যত বুদ্ধি যত শক্তি যত মোর চিত।
তার মত রচিল কিছু কৃষ্ণের চরিত॥
যত কর্ম্ম কৈল প্রভু নররূপ ধরি।
চতুর্ম্মুখে ব্রহ্মা আদি বলিতে না পারি॥
ভক্ত অনুকম্পায় প্রভু ধরি নরকায়।
সে তনু চিন্তিয়া ভক্ত ব্রহ্মপদ পায়॥
অল্প বুদ্ধি অল্প মতি অল্প মোর জ্ঞান।
প্রভুর চরিত্র কিবা করিব বাখান॥
সাধারণ লোক তাহা বুঝিতে না পারে।
পাঁচালি প্রবন্ধে কৈল প্রভু অবতারে॥
বিষম বিষয়বশে সবার বন্ধন।
ইহাঁর আলাপে হয় সকল ভঞ্জন॥
একথা শুনিতে যাহার হয় মতি।
ইহা হৈতে তার হয় বৈকুণ্ঠে বসতি॥

১। মূলে ‘ভ্রময়’।

অহর্নিশি লোক সব আছে মিছা কাজে।
অবশ্য শুনিবে ইহা দিবসের মাঝে ॥
শুনিতে শুনিতে হব মন যে নির্ম্মল।
ঘরে বসি পাবে নর সর্ব্বতীর্থফল ॥
পুরাণ পড়িতে নাহি শূদ্রের অধিকার।
পাঁচালি পড়িয়া তর এ ভবসংসার ॥
তার আগে পড়হ যাহার শুদ্ধমতি।
শুনিতে শুনিতে তার কৃষ্ণে হবে মতি ॥
পাষণ্ড নিন্দুক জনে কভু না শুনাইহ।
যোড়হাতে বলি আমি বচন পালিহ ॥
স্ত্রীপুরুষশিশুগণে শুন একমনে।
শ্রীকৃষ্ণবিজয় কথা অতি সাবধানে ॥
বন্ধ্যা স্ত্রী শুনিলে হয় পুত্রবতী।
দারিদ্র্য[১] খণ্ডিবে যদি শুনে একমতি ॥
রোগ শোক নাশ হয় সর্ব্ব দুঃখ হরে।
বন্ধনমুক্ত হয় যদি থাকে কারাগারে ॥
তেরশ পঁচানই শকে গ্রন্থ আরম্ভন।
চতুর্দ্দশ দুই শকে হৈল সমাপন ॥
গুণ নাহি অধম মুঞি নাহি কোন জ্ঞান।
গৌড়েশ্বর দিলা নাম গুণরাজ খান ॥
সত্যরাজ খান হয় হৃদয় নন্দন।
তারে আশীর্ব্বাদ কর যত সাধুজন ॥
দন্তে তৃণ ধরি বলি সকলের ঠাঞী।
যদি দোষ থাকে গ্রন্থে ক্ষমা ভিক্ষা চাই ॥

[১] মুদ্রিত পাঠ 'দরিদ্র'

কায়স্থকুলেতে জন্ম কুলীনগ্রামে বাস।
স্বপ্নে আদেশ দিলেন প্রভু ব্যাস॥
তাঁর আজ্ঞামতে গ্রন্থ করিনু রচন।
বদন ভরিয়ে হরি বল সর্ব্বজন॥
ধর্ম্ম মোক্ষ দুই হবে ইহাকে শুনিলে।
ইহা বৈ ধন আর নাহি কলিকালে॥
তপ জপ যজ্ঞ দান যত ফল পাও।
তাহা হৈতে অধিক সুখ ঘরে বসি গাও॥
স্ত্রী পুরুষ শিশু সব শুন একমনে।
শ্রীকৃষ্ণবিজয় গুণরাজ খান ভণে॥

নবম পরিচ্ছেদ

মনসামঙ্গল কাব্য ঃ

বিজয় গুপ্ত, বিপ্রদাস পিপিলাই

মনসামাহাত্ম্য পাঁচালী পঞ্চদশ ও তৎপূর্ব্ব শতাব্দীতে বাঙ্গালা দেশে বিশেষ লোকপ্রিয় ছিল। নিম্নস্তরের জনসাধারণ খুব ধূমধাম করিয়া মনসার পূজা করিত, ইহা বৃন্দাবনদাস বলিয়া গিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীতে গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম্মের উচ্চতর আদর্শে এবং কতকটা তদনুপ্রাণিত সাহিত্যের আওতায় পড়িয়া মনসামঙ্গলের মত নিছক গ্রাম্যসাহিত্যের আদর পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ হ্রাস পায়। কিন্তু পূর্ব্ববঙ্গে, সর্পভীতি বাহুল্যের জন্য এবং কতকটা সংস্কৃতিহীনতার জন্যও বটে, মনসার কাহিনীর আদর পূর্ব্বাপর যথাবৎ রহিয়াছে।

অদ্যাবধি যে সকল মনসামঙ্গল-কবির রচনা বা উদ্দেশ পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে দুই চারিটি বাদে সকলেই পূর্ব্ববঙ্গের লোক। বিবিধ মনসামঙ্গল কাব্যের পুঁথিতে শতাধিক বিভিন্ন ভণিতা দেখা যায়। ইঁহারা যে সকলেই এক একটি করিয়া স্বতন্ত্র মনসামঙ্গল পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন, এমন কথা বলা যায় না। কেহ কেহ এক আধটি পালা মাত্র লিখিয়াছিলেন। আর ইঁহাদের অনেকেই শুধু গায়ক ছিলেন, গাহিবার সময় নিজ ভণিতা যোগ করিতেন। আবার কেহ বা শুধু লিপিকার ছিলেন, পুঁথি লিখিবার সময় নিজ নামে ভণিতা দিয়া কবিযশঃপ্রার্থিত্বের পরিচয় দিয়া গিয়াছেন, এমন হওয়াই সম্ভব।

মনসামঙ্গল কাহিনী স্থূলতঃ তিনভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগে শিবদুর্গার পৌরাণিক কাহিনী, মনসার জন্ম, চণ্ডীর সহিত মনসার বিবাদ, মনসার বিষদৃষ্টিতে শিবের মূর্চ্ছা ও মনসা কর্ত্তৃক পুনরুজ্জীবন, মনসার বিবাহ ইত্যাদি ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগে পড়ে হালিক, জালিক ও মুসলমান ইত্যাদির নিকট মনসার পূজা আদায় ব্যাপার। তৃতীয় ভাগই হইতেছে মূল আখ্যায়িকা—চণ্ডীর

উপাসক চন্দ্রধর বা চাঁদ বেনের নিকট হইতে মনসার পূজা আদায় চেষ্টা, এই কারণে বেনের ছয় পুত্র নাশ, লক্ষ্মীন্দ্র ও বিপুলার বিবাহ, বিবাহবাসরে সর্পদংশনে লক্ষ্মীন্দ্রের মৃত্যু এবং বিপুলার চেষ্টায় মনসার দয়ায় লক্ষ্মীন্দ্র ও তাহার ভ্রাতৃগণের পুনরুজ্জীবন, অবশেষে চাঁদ বেনের দ্বারা মনসার পূজা।[১]

মনসামঙ্গল কাহিনীর উৎপত্তি হয় পশ্চিম বঙ্গে, রাঢ়ে। সেই কারণে, পশ্চিম-বঙ্গীয় কবিদিগের কাব্যে চন্দ্রধরের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী প্রসিদ্ধ স্থান ও নদী প্রভৃতির যথাযথ উল্লেখ দেখা যায়। এই সকল স্থান ও নদীর সহিত পূর্ব্ববঙ্গীয় কবিদিগের একেবারেই পরিচয় ছিল না, কেবল দুই একটি অতি প্রসিদ্ধ স্থানের নাম মাত্র জানা ছিল। এই জন্যই পূর্ব্ববঙ্গীয় কবিলিখিত মনসামঙ্গল পাঁচালীতে চন্দ্রধরের বাণিজ্যযাত্রা ইত্যাদি প্রসঙ্গে নদী ও স্থানগুলির উল্লেখে বিস্তৃতবিবরণ অথবা যাথার্থ্য ও পৌর্ব্বাপর্য্য নাই।

মনসামঙ্গল প্রসঙ্গে একটা কথা বলিয়া রাখি। প্রাচীন বাঙ্গালায় বণিকেরা ধনী এবং প্রতিপত্তিশালী ছিলেন, এবং অধিকাংশ স্থলে ধর্ম্মবিশ্বাসে তাঁহারা ব্রাহ্মণাদি উচ্চবর্ণ হইতে স্বতন্ত্র মত পোষণ করিতেন ; কেহ কেহ বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীও ছিলেন। প্রধানতঃ এই সব কারণে, নূতন ধর্ম্মবিশ্বাস প্রচলিত করিতে গেলে বণিক্‌দিগের সাহায্য আবশ্যক হইত। সুতরাং অপৌরাণিক দেবদেবীঘটিত কাহিনীতে আমরা দেখিতেছি যে, দেবী বা দেবের কোপ পড়িতেছে বাণিজ্য-পরায়ণ বণিকের উপর, এবং তাহার নিকট পূজা আদায় করিয়াই দেবী বা দেবের কোপ নিবৃত্তি হইতেছে। এই ব্যাপার দেখা যাইতেছে মনসামঙ্গল পাঁচালীতে, চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালীতে এবং কোন কোন সত্যনারায়ণ পাঁচালীতে।

মনসামঙ্গলে দেখা যায় যে, মনসা ও তাঁহার সংমা চণ্ডীর মধ্যে দারুণ বিরোধ চলিতেছে। চণ্ডীর উপাসক বলিয়াই যেন চন্দ্রধরের নিকট পূজা আদায় করিবার জেদ মনসার বেশী। কিন্তু চণ্ডীমঙ্গলে এ বিরোধের লেশমাত্র উল্লেখ নাই, সেখানে মনসা বা পদ্মা জয়া বিজয়ার মত দেবীর সহচরী। ইহা হইতে দুইটি অনুমান করা যাইতে পারে। এক, চণ্ডীমঙ্গলকাহিনী মনসামঙ্গলকাহিনী হইতে

১। মৎপ্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যের কথা (পৃ ১৪-১৭) দ্রষ্টব্য।

প্রাচীনতর ; এবং দুই, মনসামঙ্গলকাহিনী পরে যে সমাজে উদ্ভূত বা গৃহীত হয় সে সমাজের সহিত চণ্ডীভক্ত গন্ধবণিক সমাজের বিরোধ ছিল। বাঙ্গালা দেশে আবহমানকাল ধরিয়া উচ্চবর্ণের মধ্যে চণ্ডীর উপাসনা প্রচলিত আছে, কিন্তু সর্প-দেবতা মনসার পূজা নিম্নস্তরের মধ্যেই প্রচলিত ছিল ও আছে। বর্ত্তমান সময়ে উত্তর-রাঢ়ে ও দক্ষিণ-রাঢ়ের উত্তরাংশে আগুরি প্রধান অঞ্চলে জগদ্গৌরী ইত্যাদি রূপে মনসা পূজা প্রচলিত আছে, কিন্তু এরূপ স্থলে মনসা আর সর্প-দেবতা নাই, তিনি চণ্ডীর সহিত প্রায় একীভূত হইয়া গিয়াছেন ; যেমন ধর্ম্মঠাকুর বর্ত্তমান সময়ে অধিকাংশ স্থলেই বিষ্ণু কিংবা শিবের সহিত অভিন্ন হইয়া পড়িয়াছেন। পশ্চিমবঙ্গে মনসামঙ্গলের গায়কেরা বাগদী প্রভৃতি জাতিরই হইয়া থাকে।

বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলের কোন সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া যায় নাই। যে সকল পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা প্রায় সবই গায়কের পুঁথি বলিয়া তাহাতে অনেক কবির রচনার মিশ্রণ ঘটিয়াছে। আর এই সকল পুঁথির কোনটিই বিশেষ প্রাচীন নহে। সুতরাং মুদ্রিত বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলকে আদ্যোপান্ত কবির রচনা বলিয়া গ্রহণ করিলে ভুল করা হইবে।

একটি পুঁথিতে এবং তদবলম্বিত (?) মুদ্রিত সংস্করণে[১] বিজয়গুপ্ত কর্ত্তৃক গীতরচনারম্ভকাল পাওয়া যায় ১৪১৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৪৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় আটখানি পুঁথির মধ্যে একখানিতে মাত্র এই তারিখ পাইয়াছিলেন[২]—

ঋতু শশী বেদ শশী শক পরিমিত।

দুইখানি পুঁথিতে পাইয়াছিলেন এই অর্থহীন পাঠান্তর—

ঋতু সিকে বেদ শশী পরিমিত শক।

অথবা,

ঋতু বসন্ত দেব নিশি পরিমিত।

১। প্যারীমোহন দাসগুপ্ত কর্ত্তৃক সংগৃহীত এবং শরৎকুমার সেনগুপ্ত সম্পাদিত (পঞ্চম সংস্করণ)। বর্ত্তমান আলোচনায় এই সংস্করণ অবলম্বিত হইয়াছে।

২। ব-সা-প-প ৩, পৃ ১২৯।

দুইখানি পুঁথিতে পাইয়াছিলেন—

ঋতু শূন্য বেদ শশী শক পরিমিত।
স্থলতান হোসেন সাহা নৃপতি তিলক ॥

বাকি তিনখানি পুঁথিতে কোনই কালজ্ঞাপক পয়ার পাওয়া যায় নাই।

"ঋতু শূন্য বেদ শশী" অর্থাৎ ১৪০৬ শকাব্দে হোসেন শাহাকে গৌড়-সিংহাসনে পাই না, স্থতরাং এই তারিখ নিতান্তই ভুল।

"ঋতু শশী বেদ শশী" অর্থাৎ ১৪১৬ শকাব্দে হোসেন শাহা গৌড়ের তক্তে বসিয়াছেন কি না বসিয়াছেন, অথচ তাঁহার যশ অমনি স্থদূর বরিশাল জেলাব ফুল্লশ্রী গ্রামে পৌছিল! ইহাও বিশেষ সন্দেহজনক মনে হইতেছে। আরও এক কথা "পরিমিত" শব্দের সহিত "তিলক" শব্দের অন্ত্যানুপ্রাস দুরূহ হইয়া পড়ে. স্থতরাং মূলে হয়ত ছিল—

ঋতু শশী বেদ শশী পরিমিত শক।
স্থলতান হোসেন সাহা নৃপতি তিলক ॥

মুদ্রিত গ্রন্থের সম্পাদক কোথায় এই পাঠ পাইলেন তাহা জানান নাই—

ঋতু শশী বেদ শশী শক পরিমিত।
স্থলতান হোসেন সাহা নৃপতি তিলক ॥

মুদ্রিত গ্রন্থের সম্পাদক আর একটি পাঠান্তর উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহাও সঙ্গত নহে, কেন না ইহা হইতে ১৪০০ শকাব্দ পাওয়া যাইতেছে—

ছায়া শূন্য বেদ শশী পরিমিত শক।

যাহা হউক, মোট কথা আমরা সকল পুঁথিতে কালজ্ঞাপক পয়ার পাই না. আর যেগুলিতে পাই তাহাতেও পাঠান্তরের প্রাচুর্য্য সন্দেহ আনয়ন করে, এবং এই পাঠান্তরগুলি একটি ছাড়া সবই অসঙ্গত। আর যেটি সঙ্গত, সেটিও সন্দেহহীন নহে। এতদবস্থায় বিজয়গুপ্তের রচনা বলিয়া পরিচিত মনসামঙ্গলকে অবিসংবাদিতরূপে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকের রচনা বলিতে বিশেষ সঙ্কোচ হইতেছে। এ বিষয়ে আরও পুঁথি-প্রমাণ না হইলে জোর করিয়া কিছু বলা চলিবে না।

বিজয় গুপ্ত ছিলেন জাতিতে বৈদ্য। পিতার নাম সনাতন, মাতার নাম রুক্মিণী। বাসস্থান ছিল বর্ত্তমান বাখরগঞ্জ জেলায়, গৈলার সংলগ্ন ফুল্লশ্রী গ্রামে।

সনাতন-তনয় রুক্মিণী-গর্ভজাত।
সেই বিজয় গুপ্তেরে রাখ জগন্নাথ॥
পশ্চিমে ঘাঘর নদী পূবে ঘণ্টেশ্বর।
মধ্যে ফুল্লশ্রী গ্রাম পণ্ডিত-নগর।
... ...
স্থানগুণে যেই জন্মে সেই গুণময়।
হেন ফুল্লশ্রী গ্রামে বসতি বিজয়॥

বিজয় গুপ্তের কাব্যরচনার ইতিহাস এইরূপ। একদা (১৬১৮ শকাব্দে ?) শ্রাবণ মাসে রবিবারে মনসাপঞ্চমীর রাত্রিতে দ্বিতীয় প্রহরে বিজয় গুপ্ত স্বপ্ন দেখিলেন যে, এক গৌরবর্ণা সুন্দরী ব্রাহ্মণনারী সর্পভূষা ধারণ করিয়া তাঁহার শিয়রে দাঁড়াইয়া গায়ে হাত দিয়া তাঁহাকে জাগাইতেছেন। ইনিই মনসা দেবী। দেবী বলিলেন যে, হরিদত্তের মনসামঙ্গল গীত কালক্রমে লোপ পাইয়াছে, এবং তাহার রচনাও তত সরস নহে, অতএব বিজয় গুপ্ত যেন মনসার গীত রচনা করেন, তাহাতে তাঁহার কল্যাণ হইবে। এইরূপ স্বপ্নাদেশ পাইয়া বিজয় গুপ্ত মনসামঙ্গল রচনা করেন [পৃ ৩-৫]।

বিজয় গুপ্তের কাব্যের যে সংস্করণটি লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে তাহার অধিকাংশ পদগুলিতে বিজয় গুপ্তের ভণিতা আছে বটে, কিন্তু এই ভণিতা সর্ব্বত্র অকৃত্রিম নহে। অনেক স্থলেই পুঁথির লেখক অন্য কবির ভণিতার স্থলে, এবং কখনো কখনো তাহার উপরও বিজয় গুপ্তের ভণিতা চাপাইয়া গিয়াছেন।

ভাষা প্রায় সর্ব্বত্রই অত্যন্ত আধুনিক। বিজয় গুপ্তের স্বপ্নদর্শন অংশে আগাগোড়া প্রথমপুরুষের প্রয়োগ দেখিয়া সন্দেহ জাগে যে, হয়ত এই অংশটিও বিজয় গুপ্তের নিজের রচনা নহে। কোন ভাল পুঁথি না পাইলে অথবা প্রচলিত পুঁথিগুলি লইয়া বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে কোন নির্ভরযোগ্য সংস্করণ তৈয়ারী না

হইলে বিজয় গুপ্ত এবং তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে কোন কথা জোর করিয়া বলা যাইতে পারে না।

বিজয় গুপ্তের কাব্যে কয়েকটি সুন্দর প্রবাদ বাক্য আছে। যেমন—

অতি কোপে করিলে কাজ ঠেকে অথান্তর।
অতি বড় গাঙ্গ হইলে ঝাঁটে পড়ে চর॥

যেই মুখে কণ্টক বসে সেই মুখে খসে॥

নিশ্চিন্তে খাইয়া বেড়াও হাঁড়ীতে না দেও ফুক।
পরের বলিতে তোমার চাঁদ হেন মুখ॥

বচনে সাগর বান্ধ পথ বাহ ছলে॥
ডোকর হারাইয়া যেন ডোকরে বাঘিনী॥[১]
পাতিল জুখিয়া যেন কুমারে গড়ে সরা॥

নিম্নের উদ্ধৃত অংশটি বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদিগকে স্মরণ করাইয়া দেয়—

জনমতুঃখিনী আমি তুঃখে গেল কাল।
যেই ডাল ধরি আমি ভাঙ্গে সেই ডাল॥
শীতল ভাবিয়া যদি পাষাণ লই কোলে।
পাষাণ আগুন হয় মোর কর্ম্মফলে॥
কারে কি বলিব মোর নিজ কর্ম্মফল।
দেবকন্যা হইয়া স্বর্গে না হইল স্থল॥
ডাকিবার লক্ষ্য নাই শুন গো জননী।
বিধাতা করিল মোরে জনমতুঃখিনী॥ পৃ ৫২॥

কাব্যটিতে স্থানে স্থানে বেশ সরসতা আছে। যেমন—

বুড়ী বলে আগো ঝী কেন কান্দ আর।
মরিল জামাই তোর পাবি আরবার॥

১। তুলনীয় "ডুম্বুর হারাইয়া যেন ফুকরে বাঘিনী" [কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, পৃ ৫২]

সবে তোর মাতা আমি আর কেহ নাই।
বিশ ফয়তা গেলে নিকা দিব আর ঠাঁই ॥
মার বাক্যে জোলা-ঝির জুড়াল হৃদয়।
কাঁন্দিয়া মায়ের স্থানে ধীরে ধীরে কয় ॥
নিশ্চয় কহিল মাতা শান্ত কর মন।
শুনি প্রাণ কাঁপে নিরামিষের কারণ ॥
খোদায় বঞ্চিল মোরে এই দিন হতে।
এই কয়দিন মুই বঞ্চিব কি মতে ॥
সাত দিন নহে মাতা সাতটি বৎসর।
কেমনে বঞ্চিব ঘরে আমি একেশ্বর ॥
নিরামিষ খাইলে নাহি বাঁচিবার আশ।
তাহাতে বাড়ীতে আছে কুকুড়ার বাস ॥[১] পৃ ৬৬ ॥

বিজয় গুপ্তের স্বপ্নদর্শন অংশে কানা হরিদত্তের উল্লেখ আছে। এই অংশ যদি অকৃত্রিম হয়, তবে বুঝিতে হইবে ইনি বিজয়গুপ্তের পূর্ব্বেকার লোক। ধর্ম্মমঙ্গলের ময়ূর ভট্টের মত, হয়ত ইনিই মনসামঙ্গল পাঁচালীর প্রবাদগত আদি কবি ছিলেন।

মূর্খে রচিল গীত না জানে মাহাত্ম্য।
প্রথমে রচিল গীত কানা হরিদত্ত ॥
হরিদত্তের গীত যত লোপ পাইল কালে।
যোড়া গাঁথা নাহি কিছু ভাবে মোরে ছলে ॥

বিজয়গুপ্তের ঠিক কত পূর্ব্বে হরিদত্ত মনসার গীত রচনা করিয়াছিলেন তাহা নির্দ্ধারণ করিবার উপায় নাই।

পুরুষোত্তমের একটি গীত হইতে জানা যায় যে, তিনি কানা হরিদত্তকে অনুসরণ করিয়া মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। পুরুষোত্তমেরও কাল জানা নাই।

১। পদটীতে কোন ভণিতা নাই।

কানা হরিদত্ত হরির কিঙ্কর,
মনসা হউক সহায়।
তার অনুবন্ধ লাচাড়ির ছন্দ
শ্রীপুরুষোত্তমে গায় ॥ পৃ ২৩৫ ॥

কোন কোন মনসামঙ্গলের পুঁথিতে হরিদত্ত ভণিতায় দুই একটি পদ বা গীত পাওয়া যায়। হরিদত্তের রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধ মনসার সর্পসজ্জা অংশটি বিপ্রদাসের কাব্যের আলোচনায় তুলনার জন্য উদ্ধৃত করিয়াছি।

বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির পুস্তকাগারে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের দুইখানি খণ্ডিত পুঁথি অনেক দিন হইতেই সংগৃহীত আছে।[১] যেকালে পুঁথি দুইখানি সংগৃহীত হয়, সেই সময় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বিপ্রদাসের কাব্যের উপর একটি মন্তব্য এশিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন। তাহার পর ১৩১৫ বঙ্গাব্দের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় [পৃঃ ৩৬-৩৭] রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "সপ্তগ্রাম" শীর্ষক প্রবন্ধে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলের উল্লেখ করেন এবং উহার কিঞ্চিৎ অংশও প্রবন্ধমধ্যে উদ্ধৃত করিয়া দেন। পরে শ্রীযুক্ত আব্‌দুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক ১৩২০ সালে প্রকাশিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ, প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যায় [পৃঃ ২২] বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল হইতে কবির পরিচয় ও রচনাকালজ্ঞাপক অংশ উদ্ধৃত করেন এবং অন্য একাধিক পুঁথির অস্তিত্বের সংবাদও দেন। এতৎসত্ত্বেও প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য লইয়া যাঁহারা অদ্যাবধি গবেষণা করিয়াছেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেরই কাছে কবি বিপ্রদাস ও তাঁহার এই সুপ্রাচীন কাব্যখানি সম্পূর্ণভাবে উপেক্ষিত, অনাদৃত অথবা অজ্ঞাত রহিয়া গিয়াছে। বর্ত্তমান আলোচনায় এই অজ্ঞাতপ্রায় সুপ্রাচীন কবির কাব্যের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।[২]

১। পুঁথি দুইখানির সংখ্যা যথাক্রমে ৩৫২৯ এবং ৩৫৩০। সম্প্রতি এই কাব্যের একটি সম্পূর্ণ পুঁথি দেখিবার আমার সুযোগ হইয়াছে। বর্দ্ধমান সাহিত্যসভার তরফ হইতে কাব্যটি প্রকাশ করিবার আয়োজন হইতেছে। ২। ব-সা-প-প ৪৩, পৃ ৬৪-৭৩।

১৪১৭ শকে অর্থাৎ ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে বিপ্রদাস মনসামঙ্গল রচনা করেন। তখন হোসেন শাহ গৌড়ের স্থলতান—

সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন শাহা গৌড়ের প্রধান ॥

বিপ্রদাসের পিতার নাম মুকুন্দ পণ্ডিত। কবিরা চারি সহোদর ছিলেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণ—সামবেদীয়, কৌথুম শাখা, বাৎস্য গোত্র, পঞ্চ প্রবর, পিপিলাই গাঁই। বহুদিন ধরিয়া ইঁহাদের বাদুড্যা (নাদুড্যা ?) বটগ্রামে বসতি। এ বিষয়ে কবির উক্তি এই—

মুকুন্দ-পণ্ডিতস্থত বিপ্রদাস নাম।
চিরকাল বসতি বাদুড্যা[১] বটগ্রাম ॥
বাৎস্য গোত্র পিপিলাই পঞ্চ প্রবর।
সাম বেদ কৌথুম শাখা চারি সহোদর ॥

বসিরহাট অঞ্চলে, কলিকাতা হইতে আনুমানিক সতের আঠার ক্রোশ দূরে, বাদুড়ে গ্রাম আছে এবং তাহার সন্নিকটে বড়গাঁ বা বটগ্রামও আছে, সন্ধান পাইয়াছি। কবি বারাসত-বসিরহাট অঞ্চলের লোক ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। এশিয়াটিক সোসাইটির দুইখানি পুঁথিই বারাসতের নিকটবর্ত্তী দত্তপুখরিয়া (আধুনিক দত্তপুকুর) গ্রামে অনুলিখিত হইয়াছিল। নিকটবর্ত্তী ছোট জাগুলিয়া গ্রামে লিখিত একটি সম্পূর্ণ পুঁথি আমি দেখিয়াছি। কয়েক বৎসর পূর্ব্বেও, ছোট জাগুলিয়া গ্রামে বিপ্রদাসের মনসামঙ্গল শ্রাবণ মাসের নাগ পঞ্চমীর দিন হইতে প্রায় নয় দিন ধরিয়া পাঠ করা হইত। জাগুলিয়া গ্রাম ও তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে মনসাপূজা এককালে খুব প্রচলিত ছিল, এইরূপ অনুমান হয়। বিপ্রদাসের মতে মনসার এক নাম "জাগুলি"।[২] ইহা হইতে "জাগুলিয়া" নামের উৎপত্তি হওয়া সম্ভব।

১। পাঠান্তর 'নাদুড্যা'।   ২। 'জাগিয়া জাগুলি নাম সীজবৃক্ষে স্থিতি'।

কাব্যরচনার হেতু ও কাল কবি এইরূপে জ্ঞাপন করিয়াছেন—

শুক্লা দশমী তিথি বৈশাখ মাসে।
শিয়রে বসিয়া পদ্মা কৈলা উপদেশে॥
পাঁচালী রচিতে পদ্মা করিলা আদেশ।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ॥
কবি গুরু ধীর জনে করি পরিহার।
রচিল পদ্মার গীত শাস্ত্র-অনুসার॥
সিন্ধু ইন্দু বেদ মহী শক পরিমাণ।
নৃপতি হুসেন সাহা গৌড়ের প্রধান[১]॥
হেন কালে রচিল পদ্মার ব্রতগীত।
শুনিয়া ত্রিবিধ লোক পরম পিরীত॥
পদ্মাবতীচরণসরোজমধুলোভে।
দ্বিজ বিপ্রদাস তথি ভৃঙ্গরূপে শোভে॥

কাব্যের গোড়ার দিকে মনসার সর্পসজ্জার বর্ণনা করা হইয়াছে। ইহাতে যে সাপের নামের ও নারীভূষণের তালিকা পাওয়া যায়, তাহা প্রাচীন বলিয়া মূল্যবান্।

জয় জয় বিষহরি[২] বিষধরিভূষণ।
সর্ব্ব-অঙ্গে শোভে দেবীর নাগ-আভরণ॥
সেবকে রক্ষিতে দেবী হইলা স্ববেশ।
চিরনিয়া নাগ লৈয়া কুরুনিলা কেশ॥
নাইনাড়া নাগে কৈল কবরী প্রতুল।
উদয়কাল নাগেতে খোপার পদ্ম ফুল॥
অলকাবলি চিত্রনাগ হইলা শোভন।
নীলমেঘতটে যেন উদয় তারাগণ॥

১। পাঠান্তর 'গৌড়ে(র) সুলক্ষণ'; 'সুলক্ষণ' সুলতান শব্দের বিকৃতি হওয়াই সম্ভব। ব-সা-প-প ৪৩, পৃ ৬৪ দ্রষ্টব্য।

২। মূলে 'বিষধরি'।

সিন্দুরিয়া নাগ হৈল সীমন্তে সিন্দুর।
উদয়গিরি সূর্য্য যেন করিছে মেতুর॥
ধুসরিয়া বোড়া দেবীর হৈল সুকুন্তলা[১]।
কুঁইয়া বোড়া হইল দেবীর অভিন্ন চপলা।
সর্ব্ব নামে নাগেতে মাথায় সিঁথিপাটী।
নীলমেঘতটে যেন বিজলী দিপতি॥
কালচিতি নাগে দেবীর ভুজযুগ সাজে।
কালিন্দীর হস্তী যেন স্বর্ণগিরি মাঝে॥
কালী নাগিনী হৈল নয়নে কজ্জল।
কুবলয়দলে যেন খঞ্জন যুগল॥
কনকচিতি নাগে দেবীর নাসিকা উজ্জ্বল।
কুণ্ডলিয়া নাগে হইল শ্রবণে কুণ্ডল॥
সুরঙ্গ সিন্দুর নাগে অধরের কান্তি।
ধবলিয়া চিতি হইল দশনের পাঁতি॥
এতেক উরগে যদি মস্তকে শোভন।
কলেবরে শোভেরে প্রবল নাগগণ॥
শ্বেতকর্ণ নাগেতে গলার কেয়াপাতি।
পীতগিরি বেড়ি যেন বহে ভাগীরথী॥
কণ্ঠে ভূষিত মণি-নাগের দিপতি।
উদয় শিখরে যেন স্বর্ণময় জ্যোতি॥
হালিয়া নাগ দেবীর হৃদয়ে শোভে হার।
সুমেরু শিখরে জেন বিজুলি সঞ্চার॥
কনকমৃণাল ভুজে বলয়া প্রকার।
রাজসর্প হৈল দেবীর তাড় অলঙ্কার॥

১। 'শকুন্তলা' পাঠান্তর।

শঙ্খনিয়া চিতি হৈল দুই ভুজে শঙ্খ।
বাহুটী কঙ্কণ হৈল আড়িয়াল বঙ্ক॥
বিঘতিয়া বোড়া হইল অঙ্গুলে অঙ্গুলি।
গন্ধচিতি নাগে দেবীর কুম্‌কুম্‌-কস্তুরি॥
মলয়জ নাগ চন্দন শোভে গায।
তাহার বিমল গন্ধ দশদিকে ধায়॥
মঙ্গলিয়া বোড়া দেবীর হৃদয়ে কাঁচলি।
নেতের আঁচলে হৈল নাগ ধনিয়াহুলি॥
উলুবোড়া নাগ দেবীর কাছিয়া চরণ।
বেত-আছড়া কটীধটী করিল বন্ধন॥
লাউডুগি নাগে দেবীর গাথিয়া বসন।
চরণে নূপুর শোভে নাগ-আভরণ॥
কালচিতি নাগে কৈল অঙ্গু[লে] অঙ্গুরি।
আর যত নাগগণ পায়ের পাসুলি॥
নাগ-আভরণে দেবী হইলা প্রচণ্ড।
কালনাগিনী তাঁর শিরে ধরে দণ্ড॥
দুইভিতে নাগদল ধরিল জোগান।
বাসুকি পঠেন কাছে শাস্ত্র পুরাণ॥
অনন্ত তক্ষক নৃত্য করেন আপনি।
শঙ্খ মহাশঙ্খ করেন জয়ধ্বনি॥
সেবকেরে বর দিতে উর মর্ত্ত্যপুরী।
দ্বিজ বিপ্রদাস বলে কর জোড় করি॥

অধিকাংশ প্রাচীন মনসামঙ্গলে মনসার সর্পসজ্জার বিবরণ নাই। কেবল কানা দত্তের লেখা বলিয়া প্রথিত একটু অংশে আছে। সেটুকু এই—

দুই হাতের শঙ্খ হইল গরল শঙ্খিনী।
কেশের জাদ হইল এ কাল-নাগিনী॥

স্থতলিয়া নাগে কৈল গলার স্থতলি।
দেবী বিচিত্র নাগে কৈল হৃদয়ে কাঁচুলি॥
সিতলিয়া নাগে কৈল সীঁথার সিন্দূর।
কাজলিয়া কৈল দেবীর কাজল প্রচুর॥
পদ্মনাগে কৈল দেবীর স্থন্দর কিঙ্কিণী।
বেত নাগ দিয়া কৈল কাঁকালি-কাঁচুলী॥
কনক নাগে কৈল কর্ণের চাকি বলি।
বিঘাতিয়া নাগে দেবীর পায়ের পাশুলি॥
হেমন্ত বসন্ত নাগে পৃষ্ঠের থোপনা।
সর্ব্বাঙ্গে নিকলে যার অগ্নি কণা কণা।
অমৃতনয়ান এড়ি বিষনয়ানে চায়।
চন্দ্র সূর্য্য দুই তারা আড়ে লুকায়॥[১]

তাহার পর বিপ্রদাসের কাব্যে মনসার বিবিধ নামের উল্লেখ ও উৎপত্তি দেওয়া হইয়াছে—

জনম পাতালপুরী অযোনিসম্ভবা।
নির্ম্মাণি জননী মহাদেব-তেজস্ভবা॥[২]
আপনা আপনি কৈলা জীবের সঞ্চার।
বাস্থকি দিলেক বিষ নাগ-অধিকার॥
উদ্ভবা পাতাল নাম পাতালকুমারী।
নাগদান পাইয়া নাম হৈল নাগেশ্বরী॥
কালিদহে পদ্মবনে হইল উৎপত্তি।
তথির কারণে নাম হৈল পদ্মাবতী॥
মনেতে জনম জানি দেব ত্রিপুরারি।
তথির কারণে নাম মনসা-কুমারী॥

১। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় (দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত), প্রথম খণ্ড, পৃ ১৭৪-১৭৫।
২। পাঠান্তর 'তেজস্তবা'।

নিরঞ্জনকায়-ভেদ সর্ব্বশাস্ত্র-জানী।
ব্রহ্মজ্ঞান পায়্যা নাম হইল ব্রহ্মাণী[১] ॥
মহাজ্ঞান দিলা যদি দেব শূলপাণি।
যোগেশ্বরী নাম আর পরমযোগিনী॥
চণ্ডীর বিবাদে নাম হইল মন্দাক্ষী।
চণ্ডী জিনি নাম হইল বিষপূর্ণ-আঁখি ॥
শুক্লপট্ট পরি যবে গেলা বনবাসে।
শ্বেতাম্বরী নাম আর সর্ব্বলোকে ঘোষে ॥
চণ্ডীর বিবাদে নাম হইল নির্ব্বাসিনী।
পর্ব্বতে পার্ব্বতী নাম পর্ব্বতবাসিনী ॥
জগৎকারুপত্নী নাম হইল জগদ্গৌরী।
পতির বিচ্ছেদে নাম পতিমন্দাদরী ॥[২]
জাগিয়া জাগুলি নাম সীজবৃক্ষে স্থিতি।
আমি কি বলিতে পারি আমার শকতি ॥

তাহার পর আত্মপরিচয় দিয়া, কথাবস্তু বিস্তার করিবার প্রারম্ভে কবি 'গ্রন্থানুবাদ' অর্থাৎ বিষয়বস্তুর সারাংশ বর্ণনা করিয়াছেন—

প্রথমে কহিব তত্ত্ব, শুন নর একচিত্ত—
মহাযজ্ঞ করে দেবগণে।
গঙ্গা হরের ঘরে, নিরঞ্জন আসি তাঁরে
যেন মতে দিলা দরশনে ॥
কালিদহে দেবরাজে নাগ ইন্দ্র রক্ষা কাজে
মনসা জন্মিল যেন মতে।
চণ্ডীর সহিত বাদ হৈল বড় পরমাদ,
নির্ব্বাসিলা সিজুয়া পর্ব্বতে[৩] ॥

১। পাঠান্তর 'ব্রাহ্মনি'। ২। ঐ 'মন্দোদরী'। ৩। ঐ 'নির্ব্বাসন দিলেন পর্ব্বতে'।

কহিব যজ্ঞের কথা— কপিলার বন্ধন যথা,
ব্যাঘ্র মন্বুরথে[১] মহারণ।
ব্রহ্মশাপ ইন্দ্রে হইল, লক্ষ্মী জলধি গেল,
ক্ষীরনদী করিল মথন॥
বিশ্বেশ্বর পশুপতি আসিয়া ত্বরিত অতি[২]
যেন মতে করাইলা চেতন।
বিষ বাঁটি দিলা নাগে, মনসার বিভা যোগে
জরৎকারু মুনি মহাজন॥
আস্তীক কুমার হৈল, নাগ ইন্দ্র রক্ষা পাইল,
জন্মেজয়-যজ্ঞ নাশ করি।
মায়া পাতি পদ্মা গিয়া রাখালের পূজা লৈয়া
বধ কৈলা হাসনের পুরী॥
ছন্ন লইল নিজস্থানে, হরিল চাঁদোর জ্ঞানে,
যেন মতে বধি ধনন্তরি।
ধনা মনা বধ করি, চাঁদোর ছ[য়] পুত্র মারি,
অনিরুদ্ধ উষা আনি হরি॥
নৃপতি-পাটনে যায়, লখাই বেহুলা হয়,
চাঁদ রাজা আইল নিজ দেশে।
উজানি নগর গিয়া লখাই বেহুলা বিয়া,
এড়িল লোহার গুপ্তবাসে॥
সূতার সঞ্চারে আসি লোহার মন্দিরে বসি
দংশিলেক কালনাগিনী।
মাজসে ভাসিয়া গেল, মৃত পতি জিয়াইল,
সুরপুরে করিল মেলানি॥

১৫। ঐ 'ব্রহ্ম মনরথে'। ১৬। ঐ 'আসিয়াত পদ্মাবতি'।

তাহা দেখি চাঁদো রাজা করিল পদ্মার পূজা,
লখাই বেহুলা স্বর্গবাসী।
সংক্ষেপে পদ্মার ব্রত কহিল মঙ্গলগীত,
বিস্তরে কহিব সপ্ত নিশি ॥
সম্পূর্ণ সঙ্গীতব্রত যেই শুনে একচিত
ধন পুত্র সিদ্ধ হয় আশ।
পদ্মাপদপঙ্কজে পুট-চাটু করি ভুজে
বিরচিল দ্বিজ বিপ্রদাস ॥

চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যযাত্রা প্রসঙ্গে যে যে স্থানের বর্ণনা আছে, তাহাতে যথেষ্ট নূতনত্ব আছে। অনেক পরিচিত স্থানের নাম আছে, তাহার মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য হইতেছে কলিকাতার নাম। কলিকাতার নাম এই সর্ব্বপ্রথম পাওয়া গেল। চানকের উল্লেখ আছে। জব চার্নকের নাম হইতে চানক নাম উদ্ভূত হইয়াছে এই কথা আধুনিক কালে কেহ কেহ বলিয়া থাকেন। Charnock (চার্নক) হইতে 'চানক' হওয়া অসম্ভব নহে, কিন্তু 'চানক' নামে একাধিক গ্রাম আছে। বর্দ্ধমান ও বীরভূম জেলার সীমান্তে 'চানক' নামে গ্রাম আছে। সুতরাং 'চার্নক' হইতেই 'চানক' হইয়াছে, এই অনুমান অযৌক্তিক। সপ্তগ্রামের যে বর্ণনা আছে, তাহা যে পঞ্চদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী কালের হইতে পারে না, ইহা রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে প্রদর্শন করিয়াছেন। অনেক অপরিচিত স্থান ও নদী প্রভৃতির উল্লেখও আছে। ইতিহাসের দিক দিয়া বর্ণনাটি মূল্যবান্, সুতরাং নিম্নে সমগ্রভাবে উদ্ধৃত হইল।

রাজঘাট রামেশ্বর[১] বাহিয়া এড়ায়।
ধর্ম্মখান বাহিয়া অজয় নদী পায় ॥
উজানি[২] বাহিয়া আসি হৈল উপনীত।
শিবানদী সাড়াই[৩] বাহিল ত্বরান্বিত ॥

১। ঐ 'বামেশ্বর'। ২। মূলে 'উজনি'। পরবর্ত্তী বর্ণনায় 'উজবনি'।
৩। পাঠান্তর 'সাথাই', পরে দ্রষ্টব্য।

উজানি কাটোয়া বাহি রহে ইন্দ্রঘাটে।
ইন্দ্রচরণ পূজে সেই নদীতটে ॥
ইন্দ্রাণী বাহিয়া নদীয়ায় উপনীত।
আঁবুয়া ফুলিয়া গিয়া চাপায় বুহিত ॥
রন্ধ[ন] ভোজন করি গোঁয়ায় রজনি।
বাহো বাহো বলিয়া ডাকে নৃপমণি ॥
বুহিত্র বাহিয়া সুখে চলিল প্রভাতে।
ফুলিয়া বাহিয়া গিয়া হৈল উপনীতে ॥
গুপ্তীপাড়া বাহিয়া মির্জ্জাপুর আইসে।
ত্রিবেণী লাগায় ডিঙ্গা বলে বিপ্রদাসে ॥

নাটক রাগ ॥

বুহিত্র চাপায়্যা কূলে চাঁদ অধিকারী [বু]লে—
দেখিব কেমন সপ্তগ্রাম।
তথা সপ্ত-ঋষি স্থান, সর্ব্বদেব অধিষ্ঠান,
শোক দুঃখ[১] সর্ব্বগুণধাম ॥
যতি হয়্যা একমতি ঋষি মুনি সবে তথি
তপ জপ করে নিরন্তর।
গঙ্গা আর সরস্বতী যমুনা বিশাল অতি,
অধিষ্ঠান উমা মাহেশ্বরী ॥
দেখিয়া ত্রিবেণী গঙ্গ চাঁদরাজ মনে রঙ্গ,
কূলেতে চাপায়্যা মধুকর।
আনন্দিত মহারাজ, করে নৃপ তীর্থকাজ,
ভক্তিভাবে পূজে মহেশ্বর ॥
তীর্থকার্য্য সমাপিয়া অন্তরে হরি[ষ] হয়্যা
উঠে রাজা ভ্রমিয়া নগর।

১। 'শোকহীন' বা 'দুঃখহীন' ইত্যাকার পাঠ সম্ভাব্য।

ছত্তিশ আশ্রমে লোক নাহি কোন দুঃখ শোক,
আনন্দে বঞ্চয়ে নিরন্তর ॥
বৈসে যত দ্বিজগণ সর্ব্বশাস্ত্রে বিচক্ষণ
তেজোময় যেন দিবাকর।
সর্ব্বতত্ত্ব জানে মর্ম্মে, বিশারদ গুরুধর্ম্মে,
জ্ঞানগুরু দেবের সোসর ॥
পুরুষ মদন যেন, রমণী সাবিত্রী হেন,
আভরণ সব স্বর্ণময়।
তার রূপ গুণ যত তাহা বা কহিব কত,
হেরিতে নিমিক বিলয়[১] ॥
অভিনব স্বরপুরী দেখি ঘর সারি সারি,
প্রতি ঘরে কনকের বারা।
নানা রত্ন অবিশাল জোতির্ম্ময় কাচ চাল,
রাজমুক্তা প্রলম্বিত ঝারা ॥
সভে দেবে ভক্তিমতি, প্রতি ঘরে নানা মূর্ত্তি,
রত্নময় সকল প্র[া]সাদে।
আনন্দে বাজায় বাদ্যি শঙ্খ ঘণ্টা মৃদঙ্গ আদি,
দেখি রাজা বড়ই প্রমোদে ॥
নিবসে যবন যত তাহা বা বলি[ব] কত—
মোঙ্গল পাঠান মোকাদীম।
সৈয়দ মোল্লা কাজি কেতাব কোরাণ রাজি,
দুই ওক্ত করে তছলিম ॥
মস্যিদ মোকাম ঘরে সেলাম বাজায় করে,
ফয়তা করয়ে নিত্য লোকে।
বন্দিয়া মনসা দেবী কহে[২] বিপ্রদাস কবি—
উদ্ধারিহ ভকত সেবকে ॥

১। 'নিমিষ নাহি লয়'? ইত্যাকার পাঠ সম্ভাব্য। ২। মূলে 'দ্বিজ'।

দিন দুই তথা রহি মেলিল বুহিত।
কুমারহাট গিয়া ডিঙ্গা হইল উপনীত॥
ডাহিনে হুগুলী রহে বামে ভাটপাড়া।
পশ্চিমে বাহিল বোরো পূর্ব্বে কাকীনাড়া॥
মুলাজোড়া গাড়ুলিয়া বাহিল সত্বর।
পশ্চিমে পাইকপাড়া রহে ভদ্রেশ্বর॥
চাঁপদানি ডাহিনে বামে ইছাপুর।
বাহ বাহ বলিয়া রাজা ডাকিছে প্রচুর॥
বামে বাকিবাজার বাহিয়া যায় রঙ্গে।
চাঁপাদানি[১] বাহি রাজা প্রবেশে দিগঙ্গে॥
পূজিল নিমাইতীর্থ করিয়া উত্তম।
নিমগাছে দেখে জবা অতি অনুপম॥
চানক বাহিয়া যায় বুড়লিয়ার দেশে।
তাহা রামলাল বাহি আকনা মাহেশে॥
খড়দহে শ্রীপাট করিয়া দণ্ডবত।
বাহ বাহ বলিয়া রাজা ডাকে অবিরত[২]॥
রিসিড়া ডাহিনে রহে বামে স্থকচর।
পশ্চিমে হরিষে রাজা বাহে কোননগর॥
ডাহিনে কোতরং বাহে কামারহাটী বামে।
পূর্ব্বেতে আড়িয়াদহ ঘুষুড়ি পশ্চিমে॥
চিতপুরে পূজে রাজা সর্ব্বমঙ্গলা।
নিশিদিশি বাহে ডিঙ্গা নাহি করে হেলা॥
তাহার পূর্ব্বকূল বাহিয়া এড়ায় কলিকাতা।
বেতড়ে চাপায় ডিঙ্গা চাঁদ মহারথা॥

১। মূলে 'চাপাচানি'। ২। ঐ 'আবিরত'।

পূজিল বেতাই-চণ্ডী চাঁদ দণ্ডধর।
হাসিতে [হাসিতে] সারি[১] গায় নায় নফর
নানা উপচারে কৈল রন্ধ[ন] ভোজন।
ধনগু বাহিয়া গেল ত্বরিতগমন॥
কালীঘাটে চাঁদ রাজা কালিকা পূজিয়া।
চুড়াঘাট বাহিয়া যায় জয়ধ্বনি দিয়া॥
ধনস্থান এড়াইল বড় কুতূহলে।
বাহিল বারুইপুর মহাকোলাহলে॥
হেন কালে মনসা ভাবেন মনে মন।
দ্বিজ বিপ্রদাস [কবি] করিল রচন॥
... ...
হুলিয়ার গাঙ্গে বাহি চলিল ত্বরিত।
ছত্রভোগ গিয়া রাজা চাপায় বুহিত॥
তীর্থকার্য্য চাঁদরাজ করিল তথায়।
বদরিকা কুণ্ডে জল লইল নৌকায়॥
তাহার মেলান রাজা বাহে হাথিয়াগড়।
শতমুখী বাহি রাজা যায় দড়বড়॥
চৌমুখি বাহিয়া রাজা হরষিতে যায়।
তথায় চাপায়্যা ডিঙ্গা যায় চাঁদরায়॥
শঙ্কর-মাধব[২] পূজে হইয়া এক মন।
তীর্থকার্য্য শ্রাদ্ধ কৈল পিত্রির তর্পণ॥
তাহার মেলান ডিঙ্গা সঙ্গমে প্রবেশে।
তীর্থকার্য্য কৈল রাজা পর[ম]-হরিষে॥
দরিয়া প্রবেশ হইল চাঁদোর মধুকর।
নিশিদিশি বাহে অষ্ট প্রহর সত্বর॥

১। মূলে 'সাড়ি'। ২। সঙ্কেতমাধব?

সাখাই বা সাড়াই নদীর কোন সন্ধান পাই নাই। "বরগ্রামের কিছু দক্ষিণে এখনও শিবা নদী আছে, কিন্তু গঙ্গা দূরে পড়ায় তাহার প্রভাব খর্ব্ব হইয়াছে ও তিনি এক্ষণে শিয়ালনালায় পরিণত হইয়াছেন।"[১] কোগ্রাম হইতে দুই চারি মাইল উত্তরপূর্ব্বে ধরমখান নামে একটি নাতিবৃহৎ পুষ্করিণী আছে। হয় ত ইহাই ধর্ম্মখান নদীর স্মৃতি বহন করিতেছে। 'আড়িয়ল খান' ইত্যাদি নদীর নামে যে 'খান' শব্দ পাওয়া যায়, তাহা 'খন্' ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। 'হুগুলী' রূপটি প্রাচীন, পোর্ত্তুগীসেরা লিখিত Ugulim। চন্দননগর (ফরাসডাঙ্গা) ও চুঁচুড়ার অনুল্লেখ প্রাচীনত্বদ্যোতক। 'নিমাইতীর্থ' বর্ত্তমান বৈদ্যবাটী; ইহার সহিত শ্রীচৈতন্যের কোন সংস্রব নাই। নিমগাছে জবা ফুল ফুটিত, সেই জন্য এই তীর্থের প্রসিদ্ধি ছিল। কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে আছে—

উপনীত হৈল গিয়া নিমাইতীর্থ ঘাটে।
নিমের বৃক্ষেতে যথা ওড়ফুল ফুটে॥"

এইরূপ আর একটি সংক্ষিপ্ততর বিবরণ আছে। তাহাও নিম্নে তুলিয়া দিতেছি।

পটমঞ্জরী॥

অবধান কর নৃপমণি।
মধুকরে অহর্নিশি সলিলে ভাসিয়া আসি,
দিগবিদিগ নাহি জানি॥
নানা দুঃখ ক্লেশ পাইয়া পূর্ণিত বুহিত লইয়া
অবিলম্বে আসি তব পুরী।
প্রথমে বাহিনু যান রামেশ্বর ধর্ম্মখান
অজয়া বিজয়া সুরেশ্বরী॥
উজবনি ক্রমে বাই শিবানদী শাখাই[২],
ওধানপুর বাই ইন্দ্রেশ্বর।
বাহিনু নদীয়া দিয়া, আঁবুয়া ফুলিয়া বায়্যা
ত্রিবেণী প্রবেশ মধুকর॥

১। ব-স-প-প ৪, পৃ ২৯৬। ২। পাঠান্তর 'সাড়াই'; পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

নানা নদী[1] বায়্যা আসি, কালিদহে পরবেশি,
তথা কানি পাতে অবতার।
আলিকে (?) নাগগণ, ত্রাস পায় সর্ব্বজন,
শুন মিতা বিক্রম আমার ॥

হেতালের বাড়ি ধরি ডাকিনু বিক্রম করি,
নাগগণ পলায় সকল।
ভাঙ্গিয়া মণ্ডপঘর ভরা দিনু মধুকর,
সাগরে দিলাম দরশন ॥

দরিয়ায় পরবেশি নাহি জানি দিবানিশি,
বাহি আমি অষ্ট প্রহর।
উড়িয়া বিহগ বুলে, ছুই ঘর মানুষ গিলে,
তাহা দেখি কাঁপে প্রাণেশ্বর ॥

কাঁকড়া জোকাই দিয়া শঙ্খ কড়িয়া বায়্যা
নানা দুঃখ বাহিনু সম্বল।
সিংহল প্রবেশ তথা পদ্মিনী জনমে যথা
সর্ব্বাংশে পুরুষ বিচক্ষণ ॥

এড়াইয়া বহু দেশ তব রাজ্য পরবেশ,
কহিলাম দুঃখের কাহিনী।
দ্বিজ বিপ্রদাস ভণে— করি এই নিবেদনে
অন্তকালে তরাইব ভবানী ॥

ওধানপুর বোধ হয় বর্ত্তমান উদ্ধারণপুর। 'উদ্ধারণপুর' হইতে 'ওধানপুর' হইতে পারে না। সম্ভবতঃ পরবর্ত্তী কালে 'ওধানপুর' 'উদ্ধারণপুর' এই রূপে শুদ্ধীকৃত হইয়াছে। 'ইন্দ্রেশ্বর' ইন্দ্রানীস্থিত দেবতা; তাহা হইতে ইহা স্থানের

১। মূলে 'গদ্ধি'।

নামও বুঝাইত। প্রথম বিবরণে 'ইন্দ্রানী' (< ইন্দ্রাবনী) নাম আছে। ইন্দ্রানীতে ইন্দ্রেশ্বর দেবতার উল্লেখ কবিকঙ্কণের কাব্যে আছে—

ডাহিনে ললিতপুর বাহিল ইন্দ্রানী।
ইন্দ্রেশ্বরের পূজা কৈল দিয়া পুষ্পপাণি॥

১২২৩ জৈনাব্দের (অর্থাৎ ১৩২৭ খ্রীষ্টাব্দের) একটি লিপিতে 'ইন্দ্রেশ্বর' এই স্থাননামের উল্লেখ আছে।[১]

বিপ্রদাস যখন তাঁহার কাব্য রচনা করেন, তখন ধর্ম্ম ঠাকুরের প্রতিপত্তি যথেষ্টই ছিল। অনাদ্য তখন দেবের দেব। স্বয়ং শিবও তাঁহার দর্শনলাভের প্রত্যাশায় বল্লুকার তীরে অশেষ ক্লেশ সহ্য করিয়া তপস্যায় নিরত থাকেন, তবুও দর্শনের সৌভাগ্য ঘটে না। এই প্রসঙ্গে মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে ধর্ম্মঠাকুর কর্ত্তৃক জগৎসৃষ্টির উপাখ্যান স্মরণীয়। শূন্যপুরাণের তারিখ কি, তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। সুতরাং বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে ধর্ম্মপূজার উল্লেখ যদিও প্রাচীনতম না হউক, তথাপি যে বিশেষ প্রাচীন, তাহা ঠিক। এই হিসাবে নিম্নে উদ্ধৃত মহাদেবের ধর্ম্মধ্যান ও ধর্ম্মের আগমন অংশটির ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

ধানশী রাগ।

হাথে লইয়া জাপ্যমাল জপ[২] করে চিরকাল,
পঞ্চমুখে করেন স্তবন।
ব্রহ্মমন্ত্রে বেদ বলে, মুখেতে আনল জ্বলে,
প্রকাশিত তিন লোচন॥
নানা পুষ্প লইয়া করে অনাদ্যের পূজা করে,
একচিত্ত ধ্যান অনুক্ষণ।
গলায় রুদ্রাক্ষমাল, বিভূতিভূষণ ভাল,
বলুকা দেখিতে নিরঞ্জন॥

১। ব-সা-প-প ৪, পৃ ২৯৫। ২। 'তপ' পাঠান্তর।

মুলমন্ত্র জপ করি ত্রিশূল ডম্বর ধরি
করিলা বিস্তর তপ ধ্যান।
কভু বা যুধুর্থ (?) খায়, ভর করি এক পায়
নিরবধি যোগেতে গেয়ান॥

উৰ্দ্ধবাহু করি ক্ষণে, ক্ষণে নাগশয়নে,
নিদাঘেতে আনলবেষ্টিত।
জলে রহি শীতকালে, শিরে ধারা বর্ষাকালে,
দ্বিজ বিপ্রদাস বিরচিত॥

ধবল ছত্র ধরি শিরে দণ্ড কমণ্ডলু করে
উলূকে করিয়া আরোহণ।
ধবল শ্যামলতর শোভে দিব্য কলেবর,
হরের আশ্রমে দরশন॥

ডাকিয়া শিবের তরে কহিয়া মধুর স্বরে,
গঙ্গা আছিলা সেই ঘরে।
অতি সুললিত বাণী অভ্যন্তরে গঙ্গা শুনি
উপসন্ন গোসাঁঞি-গোচরে॥

দেখি নিরঞ্জনকায় গঙ্গা চমকিত হয়,
কর-যোড়ে কৈল পরিহার।
ধৰ্ম্মের বদনে দেখি গঙ্গা ধবলমুখী
রথে ভর কৈল অবতার॥

অন্তরীক্ষে ধৰ্ম্মরায় গঙ্গে দিল পরিচয়—
জানাইহ হরের অগ্রেতে।
দ্বাদশ বৎসর হর আমা পূজে নিরন্তর,
আইলাম তাহারে দেখিতে॥

না দেখিল[১] ত্রিলোচন, আছিল অনন্যমন,
আমারে দেখিল দৃষ্টিবলে।
হোর[২] বলি সম্বিধান; দ্বিজ বিপ্রদাস গান,
গঙ্গা বলেন হেন কালে॥

পাঁচালী।

শুন প্রভু কৃপানাথ কর অবধান
তুমি সে কৈবল্যগুরু কারুণ্যনিদান॥
সংসার সৃজিয়া গোসাঞি ভার দিলা হরে।
তোমার সৃজন সৃষ্টি দিলা মহেশ্বরে॥
তোমারে দেখিতে হর অনেক সাধনা।
বলুকায় দুঃখ পায় ক্লেশ যাতনা॥
দ্বাদশ বৎসর হর বড় পায় দুঃখ।
তোমা না দেখিয়া হর না ধরিবে বুক॥
অস্থিচর্ম্মসারমাত্র হৈলা দেবরায়।
বারএক দেখা দেহ হইয়া সদয়॥
গঙ্গার উত্তর শুনি বলে নিরঞ্জন।
এই কথা কহিয় আইলে ত্রিলোচন॥
তোমারে দেখিলে হরে সেই দেখা মোরে।
শিরে জটা মেলি যেন লয় তোমা শিরে॥
তবে যদি অতি খেদ করে দেবরায়।
কালিদহে কমল তুলিতে যেন যায়॥
কালিদহে কমল তুলিব মায়াধর।
তবে কন্যারূপ মায়া দেখিবেক হর॥

১। 'দেখিনু' পাঠান্তর। ২। 'হর' পাঠান্তর

কহিয়া গেলেন প্রভু গঙ্গা হেটমাথা।
আমি কি বলিব হর এই মন চিন্তা॥
বসিলা ধবল খাটে হইয়া শ্বেতকায়।
ওথা তপ তেজিয়া আইলা দেবরায়॥
সাজি কমণ্ডুল থুইয়া দেব মহেশ্বরে।
ধবল-আকার গঙ্গা দেখিল মন্দিরে॥
দ্বিজ বিপ্রদাসে বলে সকরুণ বাণী।
দেখিয়া গঙ্গার রূপ বলে শূলপাণি॥

বিপ্রদাসের কবিত্বশক্তি ও লিপিকৌশল অবজ্ঞেয় নয়, আর ছন্দও দৃঢ়বন্ধ; একথা উদ্ধৃত অংশ হইতে প্রমাণিত হইবে।

দশম পরিচ্ছেদ

চণ্ডীদাস সমস্যা ও বড়ু চণ্ডীদাস

বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে চণ্ডীদাসের অবস্থা ভারতবর্ষের ইতিহাসে বিক্রমাদিত্যের অবস্থার অনুরূপ। উভয় নামেরই অন্তরালে প্রচুর সমস্যা ও রহস্য ঢাকা রহিয়াছে, এবং উভয়েরই আবির্ভাবকাল বিষয়ে ঐতিহাসিকগণের আদৌ ঐকমত্য নাই। সাধারণ শিক্ষিত বাঙ্গালীর কাছে চণ্ডীদাস বাঙ্গালার আদি অতএব শ্রেষ্ঠতম কবি। সুতরাং চণ্ডীদাস দ্বাদশ, ত্রয়োদশ অথবা চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন, এইরূপ অনুমান করিতে কাহারও বড় বাধে না।

কয়েক বৎসর পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চণ্ডীদাস বলিতে সাধারণ শিক্ষিত লোকে একটিমাত্র কবিকেই বুঝিত। কিন্তু ১৩১৬ সালে শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয় কর্ত্তৃক বড়ু চণ্ডীদাস রচিত কাব্যটি আবিষ্কৃত এবং ১৩২৩ সালে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামে প্রকাশিত হইলে পর একাধিক চণ্ডীদাসের অস্তিত্ব-স্বীকার অনিবার্য্য হইয়া পড়িল। বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যের আলোচনা করিবার পূর্ব্বে চণ্ডীদাসঘটিত সমস্যা ও রহস্যের কিছু আলোচনা করিব। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবং শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় এই সমস্যা লইয়া যথেষ্ট আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহাদের সম্পাদিত চণ্ডীদাস-পদাবলী প্রথম খণ্ড বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক ১৩৪১ সালে প্রকাশিত হইয়াছে; ইহাতে চণ্ডীদাসরহস্যগ্রন্থির জটিলতা কথঞ্চিৎ শিথিল হইয়াছে। তবে নূতন তথ্য আবিষ্কৃত না হইলে এই রহস্যের যবনিকা কখনই সম্পূর্ণভাবে উত্তোলিত হইবে না।

প্রথমে দেখা যাক, বাঙ্গালা ভাষায় কবি চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে প্রাচীনতম উল্লেখ কোথায় কোথায় আছে।

শ্রীসনাতন গোস্বামিকৃত শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের টীকা বৈষ্ণবতোষণীতে

"চণ্ডীদাসাদিদর্শিত দানখণ্ড নৌকাখণ্ডাদি" লীলার উল্লেখ আছে।[১] এই সঙ্গে জয়দেবেরও উল্লেখ থাকায় আপাততঃ মনে হইতে পারে যে, এই চণ্ডীদাস সংস্কৃত ভাষায় লিখিয়াছিলেন। এই মত একেবারে অমূলক না হইতেও পারে, প্রেমামৃত[২] নামে যে সংস্কৃত কাব্যটি একাধিক ব্যক্তির নামে প্রচলিত আছে, তাহাতেও এই সকল লীলা বর্ণিত হইয়াছে। এবং শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মধ্যে যে সকল সংস্কৃত শ্লোক আছে, তাহা এই জাতীয় একটি স্বতন্ত্র কাব্য হইতে গৃহীত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। এমন হওয়াও অসম্ভব নহে যে, চণ্ডীদাস নামে কোন কবি এই দুইটি কাব্যের অন্যতমের অথবা অনুরূপ কোন সংস্কৃত কাব্যের রচয়িতা ছিলেন। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন বিচার করিলে পূর্ব্বোক্ত অনুমান অনেকটা দুর্ব্বল প্রতিপন্ন হইবে। চণ্ডীদাসের রচিত কোন সংস্কৃত কাব্যের পুঁথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত বড়ু চণ্ডীদাসকে শ্রীসনাতন গোস্বামি-উল্লিখিত কবি বলিয়া গ্রহণ করা অযৌক্তিক নহে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছেন যে, মহাপ্রভু নীলাচলে অবস্থান কালে শেষ দশায় জয়দেবের গীতগোবিন্দ, বিল্বমঙ্গলের কৃষ্ণকর্ণামৃত, রামানন্দ রায়ের জগন্নাথবল্লভ নাটকের গীতি এবং চণ্ডীদাস ও বিদ্যাপতির গীতি স্বরূপদামোদর ও রামানন্দ রায়ের সাহায্যে আস্বাদন করিতেন। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল লইয়া মতভেদ থাকিলেও, গ্রন্থটি যে ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত হইয়াছিল তাহাতে বিশেষ সন্দেহ নাই।

জয়ানন্দও তাঁহার চৈতন্যমঙ্গল কাব্যে জয়দেব বিদ্যাপতির সহিত চণ্ডীদাসের নাম করিয়াছেন—

> জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
> শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ ॥ পৃ ৩ ॥

১। সনাতন গোস্বামীর বৈষ্ণবতোষণী ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের দিকে রচিত হইয়াছিল। উদ্ধৃত অংশটি মুল টীকাটিতে আছে অথবা জীবগোস্বামি-সঙ্কলিত লঘুতোষণীতে আছে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ হইতে পারি নাই।

২। HBL, পৃ ৩৯০, ৪৭৭ দ্রষ্টব্য।

জয়ানন্দের কাব্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

আনুমানিক ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাসে উল্লিখিত হইয়াছে যে, খেতরীতে এক বার্ষিক উৎসবে চণ্ডীদাসের পদ গীত হইয়াছিল—

সন্তোষ গোবিন্দ গোকুল সবে গায় গীত।
চণ্ডীদাসের কৃষ্ণলীলায় হরে সবার চিত ॥ ১৯ ॥

ইহার পর শতাধিক বৎসর ধরিয়া চণ্ডীদাসের কোনই উল্লেখ পাই না।[১] ইহা পাওয়া যায় একেবারে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দশকে সঙ্কলিত রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্রে। ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে সঙ্কলিত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে চণ্ডীদাসের কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই, ইহা গভীর বিস্ময়ের বিষয়।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে বাঙ্গালাদেশে চণ্ডীদাসের নাম ও মাহাত্ম্য বিশেষ করিয়া প্রচার হয়। ইহার জন্য তান্ত্রিক বৈষ্ণব নিবন্ধকেরাই দায়ী। ইঁহাদের হাতে অন্যান্য প্রাচীন কবি ও ভক্তের ন্যায় চণ্ডীদাসও "রসিক" ভক্ত অর্থাৎ বৈষ্ণব তান্ত্রিক সাধক হইয়া দাঁড়াইয়াছেন। এরূপ সাধক হইলে তাঁহার সাধনসঙ্গিনী চাই, অতএব তারা-রামতারা-রামীর আবির্ভাব। চণ্ডীদাসের রজকিনী সঙ্গিনীর সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয় নামক একটি বৈষ্ণব অলঙ্কার গ্রন্থে।[২] গ্রন্থটি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থকার সম্ভবতঃ সহজিয়া সাধক কবি তরুণীরমণ। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে আছে—

তারাখ্যরজকীসঙ্গী চণ্ডীদাসো দ্বিজোত্তমঃ।

এই তারাই ক্রমশঃ রামতারা হইয়া শেষে রামীতে পরিণত হইয়াছে। অষ্টাদশ

১। রামগোপাল দাসের রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীতে (রচনাসমাপ্তি কাল ১৫৯৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দ) বড়ু চণ্ডীদাসের পদ উদ্ধৃত থাকিলেও তাহা প্রক্ষিপ্ত বলিয়া সন্দেহের কারণ আছে [ব-সা-প-প ৩৭, পৃ ১১৮ দ্রষ্টব্য]।

২। কাশিমবাজার হইতে প্রকাশিত।

শতাব্দীতে ও উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত একাধিক পদে চণ্ডীদাস ও রামীর প্রেমকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

'চণ্ডীদাস'-ফ্যাশন প্রবর্ত্তিত হওয়ায় শুধু যে চণ্ডীদাস ভণিতায় নূতন পদ রচিত হইতে লাগিল এমন নহে, পুরাতন কবিদিগের উৎকৃষ্ট পদগুলি চণ্ডীদাস ভণিতায় রূপান্তরিত হইতে লাগিল। ইহার জন্য দায়ী অবশ্য কীর্ত্তনীয়ারাই বেশী। এই কারণেই নরহরি সরকার, লোচনদাস, জ্ঞানদাস, বলরামদাস, নিত্যানন্দদাস, রামগোপালদাস ইত্যাদি কবির ভাল ভাল পদ পরবর্ত্তী কালে পুঁথিতে ও কীর্ত্তনীয়ার মুখে চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে।

চণ্ডীদাস ভণিতায় প্রায় দুই হাজারের কাছাকাছি পদ পাওয়া যাইতেছে। ইহার মধ্যে যেগুলি অপরের ভণিতায় মিলিতেছে, সেগুলি বাদ দিলে যাহা অবশিষ্ট থাকে তাহার মধ্যে অল্প কয়েকটি ছাড়া প্রায় সবই এক বা একাধিক অক্ষম কবির অসংযত রচনা। যাঁহারা চণ্ডীদাসের নাম শুনিলেই গদগদ হইয়া যান তাঁহাদিগকে নীলরতন মুখোপাধ্যায় মহাশয় সঙ্কলিত চণ্ডীদাস পদাবলীর "এ কি মথুরা এ কি চতুরা" এই পদটি একবার পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে নিতান্ত বাজে মাল অনেক কিছুই আছে একথা অস্বীকার করিবার উপায় নাই, কিন্তু "দ্বিজ" বা "দীন" চণ্ডীদাস-ভণিতাযুক্ত অনেক পদের মত অবিমিশ্র জঞ্জাল অন্য কোন ভাষার প্রাচীন সাহিত্যে আছে বলিয়া অবগত নহি।

এখন এই যে এক বা একাধিক জাল বা নিকৃষ্ট চণ্ডীদাস, ইনি নরোত্তম দাসের শিষ্য ছিলেন কি ছিলেন না, ইঁহার উপাধি "দীন" ছিল কি "দ্বিজ" ছিল, কিংবা "দীন" "দ্বিজ" উভয়ই ছিল—ইহা লইয়া পণ্ডশ্রম করা বৃথা। নূতন পুঁথি অথবা কবির বা কবিগণের স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া না গেলে এই বিষয়ে কিছু বলার মূল্য নাই।

চণ্ডীদাসের বাসস্থান যে নান্নুর বা নানুর ছিল, তাহার প্রথম উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে চণ্ডীদাস ভণিতার কয়েকটি পদে এবং বিবর্ত্তবিলাস নামক অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত একটি সহজিয়া ধরণের বৈষ্ণব গ্রন্থে। বীরভূম জেলায় নানুর

বলিয়া যে গ্রাম এখন পরিচিত, তাহার স্থানীয় নাম নান্নুড়। রেনেল সাহেবের ১৭৭৯ খ্রীষ্টাব্দের ম্যাপে এই স্থানের নাম নানোর লিখিত হইয়াছে। নান্নুরে, বর্ত্তমান সময়ে, চণ্ডীদাসের নামবিজড়িত স্থানাদির যে ঐতিহ্য পাওয়া যাইতেছে তাহা কত পুরাতন বলিতে পারি না। তবে যে চতুর্ভুজা সরস্বতী প্রতিমা বাশুলী বলিয়া পূজিত হইতেছে, তাহা কিছুকাল পূর্ব্বে চণ্ডীদাসের ভিটা নামক স্তূপ খুঁড়িয়া পাওয়া গিয়াছিল।

বাঁকুড়া শহরের প্রায় চারি ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে ছাতনা নামে গ্রাম আছে। সেখানে বাশুলী দেবী বহুকাল হইতে পূজিত হইয়া আসিতেছেন। এই গ্রামের নিকটে নুনুর হাট বা মাঠ বলিয়া একটি স্থানও নাকি আছে! চণ্ডীদাসের একটি পদে নান্নুরের নিকটে শালতোড়া গ্রাম এবং তথায় নিত্যাদেবীর উল্লেখ আছে। ছাতনার চারি পাঁচ ক্রোশ পূর্ব্বে সালতড় নামে গ্রাম আছে, এবং তথায় নিত্যাদেবীর আলয়ও আছে।[১] ছাতনায় চণ্ডীদাস সম্পর্কীয় প্রবাদ নিতান্ত আধুনিক কালে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না।

ছাতনায় বাসলীমাহাত্ম্য নামে একটি ছোট সংস্কৃত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে এই গ্রন্থটি নাকি ১৩৮৭ শকাব্দে লিখিত! ইহার একটি শ্লোকে বলা হইয়াছে যে, চণ্ডীদাসের পিতার নাম নিত্যনিরঞ্জন, মাতার নাম বিন্ধ্যবাসিনী। ইঁহার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, নাম দেবীদাস। ইঁহারা ভরদ্বাজগোত্রীয় ব্রাহ্মণ ছিলেন।[২] এই পুঁথির যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইবার যথেষ্ট কারণ আছে। অনুরূপ একাধিক পুস্তক ছাতনা অথবা তন্নিকটবর্ত্তী স্থান হইতে পাওয়া গিয়াছে, এবং ভবিষ্যতেও যে পাওয়া যাইবে তাহারও যথেষ্ট ভরসা রহিয়াছে।[৩]

চণ্ডীদাস পদাবলী লইয়া যাঁহারা বিশেষ আলোচনা করিতে চাহেন তাঁহারা এই পুস্তকগুলি পড়িলে উপকৃত হইবেন—

১। ব-সা-প-প ৪২, পৃ ২৭। ২। ব-সা-প-প ৪২, পৃ ২৯।

৩। সম্প্রতি এই জাতীয় একটি অতি-আধুনিককালে লিখিত অথচ শতাধিক বর্ষ পূর্ব্বে রচিত বলিয়া প্রচারিত পুস্তকে নান্নুর ও ছাতনার প্রবাদের ঐক্য স্থাপনার চেষ্টা হইয়াছে। বইটির নাম চণ্ডীদাস চরিত, সম্পাদক শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায়, প্রকাশক প্রবাসী কার্য্যালয়, কলিকাতা।

চণ্ডীদাস, অক্ষয়চন্দ্র সরকার (১২৮৫ সাল) ; চণ্ডীদাস পদাবলী, প্রথম সংস্করণ, নীলরতন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ; ঐ, নূতন সংস্করণ, শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ; শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ সম্পাদিত ; চণ্ডীদাসচরিত, ব্রজসুন্দর সান্ন্যাল ; চণ্ডীদাস পদাবলী, রমণীমোহন মল্লিক সম্পাদিত ; পদকল্পতরু, পঞ্চমখণ্ড, সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ; গৌরপদ-তরঙ্গিণী (ভূমিকা), জগদ্বন্ধু ভদ্র সঙ্কলিত ; ঐ দ্বিতীয় সংস্করণ, শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত ; চণ্ডীদাস, শ্রীযুক্ত করালী কিঙ্কর সিংহ ; দীন চণ্ডীদাসের পদাবলী (দুই খণ্ড), শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু সম্পাদিত ; ইত্যাদি।

বাঁকুড়া জেলায় বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী কাঁকিল্যা গ্রামে শ্রীনিবাস-আচার্য্যের দৌহিত্রবংশীয় শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের গোয়ালঘরে অযত্নরক্ষিত এক গাদা পুঁথির সঙ্গে ১৩১৬ সালে বড়ু চণ্ডীদাসের কাব্যখানির পুঁথি পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামে এই পুঁথি ১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রথম প্রকাশিত হয় ; ১৩৪২ সালে দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে। বর্ত্তমান আলোচনায় আমরা এই দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ অবলম্বন করিয়াছি। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের আবিষ্কার ও সম্পাদন শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের অক্ষয়কীর্ত্তি।

পুঁথিখানি আদ্যন্ত খণ্ডিত, মধ্যেও কয়েকখানি পাতা নাই। পুঁথির মধ্যে একটি চিরকুট পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইতে অনুমান হয় যে, পুঁথিখানি বিষ্ণুপুরের রাজার গ্রন্থাগারে রক্ষিত ছিল। পুঁথিখানিতে তিন ধরণের হস্তাক্ষর দেখা যায় ; প্রথম হাতের লেখা বেশ প্রাচীন ধরণের, দ্বিতীয় হাতের লেখা প্রথম হাতের সূক্ষ্ম অনুকরণ, আর তৃতীয় হাতের লেখা অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন। শুধু ৬০ এবং ১১৫ সংখ্যক পাতা দ্বিতীয় হাতের লেখা এবং পরবর্ত্তীকালের যোজনা বলিয়া মনে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, একই পাতায় (২১৭, ২২২) প্রথম এবং তৃতীয়—অর্থাৎ প্রাচীন এবং অর্ব্বাচীন—দুই হাতের লেখা পাওয়া যাইতেছে। ইহা হইতে প্রমাণ হইতেছে যে, একই সময়ে এই দুই ধরণের লেখা চলিত, এবং লিপিপদ্ধতি দেখিয়া পুঁথির কাল নিরূপণ করিতে হইলে অর্ব্বাচীন লেখা বিচার করিয়াই করা

উচিত। একই সময়ে একই পুঁথিতে তিন রকম হাতের লেখা কেন রহিয়াছে, ইহার যে ব্যাখ্যা শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় দিয়াছেন তাহা বেশ সঙ্গত মনে হইতেছে। বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, "কেমনে একই পুথীতে ক ও গ লিপি আসিল, ইহা বুঝিবার নিমিত্ত আমি বাঁকুড়ায় লিখিত খান কয়েক পুথী দেখিয়াছি। আমার ধারণা হইয়াছে, রাজার মুন্‌সী ও ব্রাহ্মণপণ্ডিতে পুরাণা ছাঁদে লিখিতেন। তাঁহারা স্বভাবতঃ রক্ষণশীল। আমার বোধ হয়, কৃ-পুথীর ক-লিপি বিষ্ণুপুরের রাজার মুন্‌সীর। খ-লিপি তাঁহার সাহায্যকারীর। ইঁহার হাত তখনও পাকে নাই। গ-লিপি অন্য কর্ম্মচারীর। ইনি তৎকালপ্রচলিত অক্ষরে লিখিয়াছিলেন।"[১] শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথি যে কবির লেখা নহে, ইহার অন্যতম প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে এই বিভিন্ন হস্তলিপির অস্তিত্বে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথিতে লিপিকাল পাওয়া যায় নাই। শেষাংশ পাওয়া যায় নাই বলিয়া পুঁথির শেষে রচনা অথবা লিপিকাল দেওয়া ছিল কিনা তাহা জানিবারও উপায় নাই। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথির লিপিকাল জানিতে হইলে লিপিবিচার এবং ভাষাবিচার ছাড়া উপায় নাই। এই কালনির্দ্ধারণ অবশ্য অত্যন্ত আনুমানিক হইবে। কাব্যের রচনাকাল পুঁথির লিপিকালের পূর্ব্বে, কেন না পুঁথিটি নানাকারণে কবির লেখা হইতে পারে না। কিন্তু কত পূর্ব্বে তাহা ঠিক করিয়া বলা অসম্ভব।

পুঁথির লিপি বিচার করিয়া রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় স্থির করিয়াছিলেন যে, ইহা "১৩৮৫ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে, সম্ভবতঃ খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে লিখিত হইয়াছিল।"[২] সম্প্রতি শ্রীযুক্ত রাধাগোবিন্দ বসাক মহাশয় পুঁথির লিপি পরীক্ষা করিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, ইহা ১৪৫০ হইতে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথি যে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে লিখিত হইয়াছিল, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ অল্পই। বন্দ্যোপাধ্যায় ও বসাক মহাশয় উভয়ের কেহই

১। ব-সা-প-প ৪২, পৃ ২৪।

২। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভূমিকায় বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

বিষ্ণুপুর অঞ্চলের প্রাচীন পুঁথির সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথি মিলাইয়া দেখেন নাই। বিদ্যানিধি মহাশয় কতক পরিমাণে এই কাজ করিয়া অনুমান করিয়াছেন যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথি ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে লিখিত হইয়াছিল। প্রত্যন্ত প্রদেশের ভাষা এবং লিপিভঙ্গি দুইই কেন্দ্রীয় প্রদেশ হইতে প্রাচীনতর হইয়া থাকে; সুতরাং যে লেখা উত্তর বা দক্ষিণ রাঢ়ে ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে প্রচলিত ছিল তাহা পশ্চিম রাঢ়ের বিবিক্ত অঞ্চলে ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে প্রচলিত থাকিবে, তাহা অত্যন্ত স্বাভাবিক।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা বেশ প্রাচীন; মধ্যে মধ্যে যে দুই একটি অর্ব্বাচীন রূপ পাওয়া যায় তাহা পুঁথিলেখকের লেখনীপ্রসূত। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি যে, শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণগুলির প্রকৃত উচ্চারণ অটুট রহিয়াছে, কিন্তু দুই একস্থলে এই বর্ণ মহাপ্রাণহীন হইয়াছে।[১] বলা বাহুল্য, পুঁথি যখন লিখিত হয়, তখন নিশ্চয়ই ঘোষবৎ মহাপ্রাণ বর্ণ মহাপ্রাণহীন হইয়াছিল। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পয়ার কখনই চতুর্দ্দশ অক্ষরের অধিক নহে। যে কতিপয় স্থলে ইহার ব্যতিক্রম ঘটিয়াছে তাহা লিপিকার অথবা গায়ক প্রমাদপ্রসূত; ইহা অন্যত্র দেখাইয়াছি।[২] ত্রিপদীগুলি প্রায় সবই ছন্দোদুষ্ট; ইহাও লিপিকাল হইতে মূলকাব্যের প্রাচীনত্ব দ্যোতনা করে।

বৌদ্ধ চর্য্যাপদগুলি ছাড়া অদ্যাবধি বাঙ্গালা ভাষায় লেখা যাহা কিছু পাওয়া গিয়াছে, তাহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা প্রাচীনতম।[৩] তবে প্রত্যন্তের ভাষা বলিয়া শুধু প্রাচীনত্ব ধরিয়া কালনির্ণয় করিলে ঠিক হইবে না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাষা বিষ্ণুপুর অঞ্চলের ভাষা, দক্ষিণ-পশ্চিম রাঢ় প্রত্যন্তের ভাষা। ইহার ধ্বনিবৈশিষ্ট্য ঐ অঞ্চলের ভাষায় এখনও কতকটা পরিমাণে দেখা যায়। বিদ্যানিধি মহাশয় শুধু ভাষা নহে, বৃক্ষাদির বর্ণনা হইতেও অনুমান করিয়াছেন যে, কবি বিষ্ণুপুর-ছাতনা অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন।[৪]

১। ব-সা-প-প ৪২, পৃ ১২৫। ২। ঐ, পৃ ১২৩-২৪।

৩। ব-সা-প-প ৪২, পৃঃ ১২৩-৪৭। ৪। ব-সা-প-প ৪২, পৃ ২৪-২৮।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পদগুলির মধ্যে মধ্যে শ্লোক আছে ; এই শ্লোকগুলি কাহিনীর সূত্র যোগাইয়া পদগুলিকে সংহিতার আকার দিয়াছে। কিন্তু কোন কোন স্থলে গল্পাংশপ্রখ্যাপক শ্লোকের অভাব আছে ;[১] কোন কোন স্থলে শ্লোকের সহিত পরবর্ত্তী পদের সঙ্গতি নাই ;[২] অনেকস্থলে আবার শ্লোক দিবার কোন প্রয়োজনই ছিল না।[৩] সুতরাং ইহা হইতে স্পষ্ট বোঝা যাইতেছে যে, প্রথমতঃ পদগুলির সহিত শ্লোকগুলির বিশেষ সম্পর্ক ছিল না।[৪] শ্লোকগুলিতে ব্যবহৃত 'অভিমন্যু' এবং 'জরতী' শব্দ দুইটি একবারও পদগুলিতে ব্যবহৃত হয় নাই,—ইহাও পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধান্তের পরিপোষক।[৫]

বস্তুতঃ শ্লোকগুলি একটি স্বতন্ত্র সংস্কৃত কাব্য হইতে গৃহীত। এই কাব্যে পদগুলিতে বর্ণিত সব লীলাই ছিল ; তবে ছত্রখণ্ড লীলা ছিল কি না বলা যায় না, কারণ এই অংশের পরিপোষক কোন শ্লোক পাওয়া যায় নাই। সনাতন গোস্বামী এই সংস্কৃত কাব্যটির কথা মনে করিয়াছিলেন কি না, কে জানে। যিনিই এই কাব্য লিখিয়া থাকুন, তিনি যে উত্তম সংস্কৃতজ্ঞ, কবিত্বশক্তিসম্পন্ন এবং ছন্দোবিৎ ছিলেন তাহা শ্লোকগুলির কারুকার্য্য হইতে বুঝিতে বিলম্ব হয় না। কিছু উদাহরণ দিতেছি—

বিলেশয়বিষদ্বিষদ্‌বিষমরাগরাগাবলীশিখিজ্বলিতমানসো নিসরসো বশগোঽস্মি তে।
ততো বিতর রাধিকেঽধরসুধাং ময়ি দ্রুতং ভৃতসুখে সুখং মম সুখেতরবধৈষিণি॥
পৃ ৩৪॥

তক্রবিক্রয়ণবৃদ্ধয়া ধিয়া বঞ্চিতা পরিচয়েঽসি মামকে।
রাধিকেঽস্মি ননু গোপশাবকঃ কংসবংশদবদাবপাবকঃ॥ পৃ ৫৯॥

১। পৃ ২০, ২৫, ২৬, ৭২ ইত্যাদি ; কালিয়দমন খণ্ডে একটির বেশী শ্লোক নাই।

২। পৃ ৪, ৩৪, ৫৭, ৫৯, ৭৬, ৮২ (প্রথম শ্লোক, 'ভারিকঃ কৃতঃ' হইবে), ৯৪ (দ্বিতীয়), ১০১ (দ্বিতীয়), ১০৪, ১২৯, ১৩৬ (দ্বিতীয়), ১৬৪, ১৭৪, ১৮৪।

৩। পৃ ৯, ৬৪, ১৫৪, ১৮৩। ৪। ব-সা-প-প ৪২, পৃ ৪২; ৪৩।

৫। নিম্নোক্ত শ্লোক দুইটি বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে—

রাধায়া বচনং শ্রুত্বা জরত্যা প্রতিপাদিতম্।
জগাদ চতুরঃ কৃষ্ণঃ সতৃষ্ণো রাধিকামিদম্॥
কৃষ্ণস্য বচনং শ্রুত্বা রাধিকাধিমতী সতী।
বেপমানতনুস্তন্বী জগাদ জরতীমিদম্॥

রাধিকান্নুমতিমাপ্য মাধবঃ সম্বরারিশরদূনমানসঃ।
অদ্ভুতক্রমমুদারবিক্রমো বন্ধমেবমকরোদ্ রিপুক্রমম্ ॥ পৃ ৬১ ॥

অধিরজনিবিরামং রামরম্ভারিপূরুররমভজত রাধা মাধবান্বেষণায়।
অতনুমতনুবাণব্যূহদাহং বহন্তী তটমনু যমুনায়াঃ শূয়মানা সখীভিঃ ॥ পৃ ১১৯ ॥

অশরীরশরৈঃ ক্বশিতাঙ্গলতা বিততাধিযুতা গতসাততিঃ।
পরিচিন্ত্য চিরং চরিতানি হরেরভিমন্যুজনী জরতীমবদৎ ॥ পৃ ১৫৯ ॥

অধুনাপি কিমু সদয়ং হৃদয়ে কুরুষে [মনো]ঽন্যরমণীকরণে।
গততৃষ্ণ কৃষ্ণ তব হে বিরহে সুতনোস্তনোতি মদনঃ কদনম্ ॥ পৃ ১৭৬ ॥

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় সম্প্রতি সন্দেহ তুলিয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের পদগুলি সব এক কবির রচনা কি না। পদগুলির মধ্যে যে রচনারীতি ও ভাষার পার্থক্য আছে বা থাকিতে পারে, এ সম্বন্ধেও তিনি প্রথম আমাদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।[১]

বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, "বিরহখণ্ডের ভাষায় বিশেষ আছে। ঞ অনুনাসিক ইহার প্রধান লক্ষণ। অনন্তরার্থে ঞা, ইঞা এই খণ্ডে আছে, অপরাপর খণ্ডে আঁ, ইআঁ আছে। অন্য কয়েকটা শব্দের বানানেও বিশেষ আছে। শব্দের রূপেও প্রভেদ আছে। বোধ হয়, রাধাবিরহখণ্ড ছোট ছিল, এক গায়ন পালাটি বাড়াইয়াছিলেন। দুই গায়নের দুই পালা একত্র করিয়া কৃ-কীর বিরহখণ্ড হইয়াছে।" "বিরহখণ্ডের পদগুলির একটি দুইটি পড়িলে কবিত্বে মুগ্ধ হই, কিন্তু সব পড়িলে মনে হয়, এক কবির রচিত নয়, পদের ভাবে চমৎকারিত্ব খর্ব হয়।"[২]

বিদ্যানিধি মহাশয়ের অনুমান একেবারে ভিত্তিহীন নহে। বিরহখণ্ডের মধ্যে ভাল মন্দ উভয় প্রকার রচনা আছে; তাহা একই সময়ে একই কবির রচনা হইতে

১। ব-সা-প প ৪২, পৃ ৪১-৪৮।
২। ঐ, পৃ ৪৩।

পারে না। বস্তুতঃ রাধাবিরহের ভাষায় কিছু পার্থক্য যে নাই এমন নহে। -এ্যা (এ্যাঁ),- ইএ্যা (এ্যাঁ)-ভাগান্ত অসমাপিকা শুধু রাধাবিরহেই আছে, আর আছে বংশীখণ্ডের একটি পদে [পৃ ১৫৪]; কিন্তু এই পদটিও বিরহের বটে। অপর পক্ষে -আঁ, -ইআঁ -ভাগান্ত অসমাপিকা সর্ব্বত্রই পাওয়া যায়। এই ব্যাপার অসাধারণ বটে, এবং ইহা ভাষাঘটিত বিশেষত্ব, লিপিকারপ্রসূত নহে; কেননা একই লিপিকারের লেখনীতে প্রায় সমগ্র পুঁথিই লিখিত। রাধাবিরহ অংশে কতিপয় শব্দের অর্ব্বাচীন রূপ এবং প্রয়োগ দেখা যায়; যেমন—অশঙ্কেত (=সঙ্কেত), সাদ (=সাধ), কহে বা (কথার মাত্রা, বিশেষ্যের সহিত), সে তো, তোহাঁক, বন্দে (=বন্ধে), মল্লতোর (=মল্লতোড়), বঞ্চিমো (=বঞ্চিবোঁ)। কিন্তু শুধু এই কয়টি শব্দ হইতে কিছু সিদ্ধান্ত করা যায় না। কৃষ্ণকে শ্রীনন্দনন্দন, শ্রীনিবাস এবং শ্রীহরি বলিয়া সম্বোধন রাধাবিরহ অংশে এবং বংশীখণ্ডে আছে, অন্যত্র নাই।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মধ্যে কিছু কিছু যে অসঙ্গতি নাই এমন নহে, এবং তাহা সম্ভবতঃ একাধিক পালার মিশ্রণেই ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে। দানখণ্ড এবং রাধাবিরহ পর্য্যালোচনা করিলে উভয়ত্র দুইটি করিয়া পৃথক্ পালার সন্ধান পাওয়া যায়। দানখণ্ডের প্রথমেই কয়েকটি পদে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার অঙ্গে হস্তক্ষেপ করা উল্লিখিত হইয়াছে, কিন্তু দধি দুগ্ধাদি খাইবার ও নষ্ট করিবার কথা নাই; অথচ অপর কয়েকটি পদে অঙ্গস্পর্শের উল্লেখ নাই, দধি দুগ্ধাদি খাইবার ও অপচয় করিবার কথা আছে। সুতরাং মনে হয়, দানখণ্ডের দুইটি পালা ছিল। একটি পালায় ছিল—রাধিকাকে কৃষ্ণের নিকট ফেলিয়া বড়ায়ি সরিয়া গেল, আর কৃষ্ণ রাধাকে বশীভূত করিলেন; অন্য পালাটিতে ছিল—কৃষ্ণ রাধিকার দধি দুগ্ধ খাইয়াছিলেন, এবং সম্ভবতঃ বড়ায়ির মধ্যস্থতায় রাধাকে সেবারের মত ছাড়িয়া দিয়াছিলেন।

রাধাবিরহ অংশেও অন্ততঃ দুইটি স্বতন্ত্র পালার চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে। একটি পালার মতে—কৃষ্ণ রাধার সহিত দান, নৌকা ইত্যাদি উপলক্ষ্যে বিলাস করিয়াছিলেন, কিন্তু রাধিকা যশোদাকে কৃষ্ণের কীর্ত্তি বলিয়া দেওয়ায় কৃষ্ণ ক্রুদ্ধ হইয়া রাধার উপর বিরূপ হইয়াছিলেন। অপর পালাটিতে বিশেষ করিয়া তাম্বুল-

খণ্ডের ব্যাপারই পুনঃপুনঃ উল্লিখিত হইয়াছে; কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধিকার সহিত বিলাসাদির কোন উল্লেখ নাই; এবং ইহাতে দেখা যায়, রাধা কৃষ্ণের প্রতি যে অবিচার করিয়াছিলেন তাহা স্মরণ করিয়াই তাঁহার প্রতি কৃষ্ণ বিশেষ অনুরক্ত হইয়া উঠিয়াছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাধাবিরহে বংশীখণ্ডের কোনই উল্লেখ নাই। কৃষ্ণ রাধার উপর যে সকল দোষারোপ করিতেছেন অথবা রাধিকা সে সব স্বকৃত দোষের জন্য অনুতাপ করিতেছে, তাহার মধ্যে বংশীচৌর্য্যের কথা একবারও উঠে নাই। তবে কি বংশীখণ্ডেই একটি পালায় শেষ হইয়াছিল? রাধাবিরহ কি স্বতন্ত্র কাব্য? রাধাবিরহ 'খণ্ড' বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় নাই, ইহাও লক্ষণীয়।

দানখণ্ডের মধ্যে পর-পর দুইটি পদে কৃষ্ণের জবানীতে রাধার রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে [পৃ ৩২]। পদ দুইটি প্রায় একই ভাবের, সুতরাং একই কবির রচনা হইতে পারে না। দ্বিতীয়টি অপেক্ষাকৃত কাঁচা হাতের রচনা। ভাষা দৃষ্টেও দ্বিতীয় পদটি পরবর্ত্তী কবির রচনা বলিয়া মনে হয়। প্রথম পদে আছে "দেবাসুরেঁ মহোদধি মথিল তোহ্মারে," দ্বিতীয়টিতে আছে "দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে।" বিদ্যানিধি মহাশয় ঠিকই ধরিয়াছেন যে, দ্বিতীয় পদটির এই ছত্র প্রথমটির অপেক্ষা নিরেশ এবং অর্ব্বাচীন।[১] দ্বিতীয় পদের ভণিতা "গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী আয়ী" সন্দেহজনক।[২] পদ দুইটি নিম্নে পর-পর উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

নীল জলদ সম কুন্তলভারা।
বেকত বিজুলি শোভে চম্পকমালা॥
শিশত শোভএ তোর কাম সিন্দূর।
প্রঁভাত সমএ যেন উয়ি গেল সূর॥
ললাটে তিলক যেহ্ন নব শশিকলা।
কুণ্ডলমণ্ডিত চারু শ্রবণযুগলা॥

১। ব-সা-প-প ৪২, পৃ ২০। ২। এইরূপ ভণিতা তিন বার মাত্র পাওয়া গিয়াছে।

নাসা তিলফুল তোর আতী আনুপামা।
গণ্ডস্থল শোভিত কমলদল সমা॥
নয়নযুগল শোভে যেহেন খঞ্জনে।
ঈসত কটাক্ষে মোহে মুনিমনে॥
বিম্বফল জিণী তোর আধরের কলা।
মাণিক জিণিআঁ তোর দশন উজলা॥
কণ্ঠ কম্বুসম কুচ কোকযুগলা।
বাহু মৃণাল কর রাতা-উতপলা॥
কনক চম্পকসম শোভে কলেবরা।
মাঝা দেখি সিংহ গেল পর্ব্বতকুহরা॥
নাভি গভীর তোর প্রেয়াগ উপামা।
উরুযুগ রামকদলীতরুসমা॥
মন্থরগমনে যাসি ভাঁগিবার ডরে।
তা দেখিআঁ বনবাস লৈল করীবরে॥
অমরপুরত নাহিঁ হএ হেন রামা।
বিধি কৈল জঙ্গমে কনকপ্রতিমা॥
দেবাসুরেঁ মহোদধি মথিল তোহ্মারে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবরে॥

ষোল-কলা-সংপুন্ন চন্দ্রবদন।
বেকত আমৃত তোর মধুরবচন॥
কাঁচ-কনয়া যেহ্ন দেহের বরণ।
কণ্ঠ কম্বু মণিগণ শোভএ দশন॥
সুন্দরি রাধা ল সরূপ বোল মোরে।
দেবাসুর মহোদধি মথিল কি তোরে॥

কুণ্ডলে আদিত্য যেহ্ন রবির সংঘাত।
গজরাজগতি পরিমল পারিজাত॥
স্থরজনে মোহে পুরজনে নাহিঁ রাখ।
কালকূট বিষহরি জাগল কটাক্ষ॥
স্থররাজগজকুম্ভ কুচযুগল।
তেলানী-গভীর নাভি লাবণ্য জল॥
অমূল মণিনূপুর বাজের গমনে।
তাক স্থণী মোহো পাএ এ তীন ভুবনে॥
সকলগুণসংপুনী রাধা চন্দ্রাবলী।
তোর রূপ যৌবনে মোহিল বনমালী॥
রসহাসপরিহাসে তোষহ কাহ্নাঞিঁ।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী-আয়ী॥

পরবর্ত্তী পরিচ্ছেদে আরও কিছু কিছু বৈষম্য দেখান গিয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কবির যে ভণিতা আছে তাহা পাঁচ রকমের—(১) বাসলীর বন্দনা + বড়ু চণ্ডীদাস, (২) বাসলীর বন্দনা + চণ্ডীদাস, (৩) বড়ু চণ্ডীদাস, (৪) চণ্ডীদাস, এবং (৫) অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস বা অনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস। প্রথম শ্রেণীর ভণিতাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিকবার পাওয়া যায়; তাহার পর দ্বিতীয় এবং তৃতীয় শ্রেণীর ভণিতা প্রায় সমান সমান ভাবে পাওয়া যায়; চতুর্থ শ্রেণীর ভণিতা শুধু চারি বার পাওয়া গিয়াছে; এবং পঞ্চম শ্রেণীর ভণিতা মোটে সাত বার পাওয়া গিয়াছে—এক বার হ্রস্ব পয়ারে, আর ছয় বার ত্রিপদীতে। এই কয় প্রকারের ভণিতার সম্পূর্ণ তালিকা নিম্নে দেওয়া গেল।

প্রথম শ্রেণীর ভণিতা—

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগণে॥…বাসলীগণ॥

গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীবর॥…বাসলীবরে॥…দেবী-বাসলীবর॥ [পৃ ৭৪]

বাসলীচরণ শিরে বন্দীআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥
বাসলী বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলী ॥
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী আয়ী ॥ [পৃ ৩২] ; ···আই ॥ [পৃ ৬৪]
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥
বাসলী চরণ শিরে বন্দিআঁ ল বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস শিরে বন্দিআঁ ল দেবীবাসলীগণ ॥ [পৃ৬০] ; ···চরণে ॥ [পৃ ১৩৪]
······গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী শিরে বন্দিআঁ ॥
······গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিআঁ বাসলীচরণে ॥
······গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে বন্দিআঁ বাসলীচরণে ॥
গাইল বাসলী বন্দিআঁ বড়ু চণ্ডীদাসে ॥
······গাইল বড়ু চণ্ডীদাস দেবী বাসলীবরে ॥ [পৃ ১২৭, ১৪৭]
কাহ্নের বিলাপ বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ল পাআঁ দেবী বাসলীর বরে ॥ [পৃ ১৩৩]
······বড়ু চণ্ডীদাস গাএ বন্দিআঁ বাসলীচরণে ॥
······বড়ু চণ্ডীদাসে গো গাইল বাসলীবরে ॥ [পৃ ১৪৬]
দেবীবাসলীচরণ করি শিরে বন্দন গাইল বড়ু চণ্ডীদাস ॥ [পৃ ১৪৮]
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলীচরণে ॥ [পৃ ১৭৩]
বাসলীচরণ বন্দী গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ [পৃ ১৭৬ (বড়ু অতিরিক্ত)]

দ্বিতীয় শ্রেণীর ভণিতা—

বাসলী বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ···চণ্ডীদাসে ॥
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস ॥ ···চণ্ডীদাসে ॥
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ ॥
গাইল চণ্ডীদাস বাসলী-আই ॥ [পৃ ৪২]
গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥

বাসলীবরে চণ্ডীদাস গাএ ॥

বাসলী শিরে ধরি গাইল চণ্ডীদাসে ॥

গাইল চণ্ডীদাস বাসলীবরে ॥

গাইল চণ্ডীদাস বাসলীগতী ॥ [পৃ ১১৯]

.........গাইল চণ্ডীদাস বাসলীচরণে ॥ [পৃ ১৪০]

তৃতীয় শ্রেণীর ভণিতা—

গাইল বড় চণ্ডীদাস ॥ ...চণ্ডীদাস ॥

.........বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥

চতুর্থ শ্রেণীর ভণিতা—

.. চণ্ডীদাস গাএ ॥ [পৃ ১০৯]

......গাইল চণ্ডীদাসে ॥ [পৃ ১৩১, ১৩২, ১৪২, ১৭৪]

পঞ্চম শ্রেণীর ভণিতা—

মাথাএ বন্দিআঁ বাসলী-পাএ।

অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাএ ॥ [পৃ ২৬]

আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গাইল দেবী-বাসলীচরণে ॥ [পৃ ২৯]

গাইল অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে দেবী-বাসলীগণে ॥ [পৃ ২৯]

আনন্ত নামে বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল দেবী-বাসলীগণে ॥ [পৃ ৯৮]

বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে ॥ [পৃ ১৫০]

বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল আনন্ত বড়ু চণ্ডীদাসে ॥ [পৃ ১৫৬]

বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে ॥ [পৃ ১৫৮]

উপরে উদ্ধৃত ভণিতাগুলি বিচার করিলে দুইটি অনুমান অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। প্রথম, কবির নাম ছিল চণ্ডীদাস, ইনি দেবীর সেবক ছিলেন বলিয়া প্রায়ই বড়ু উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন; দ্বিতীয়, কবির নাম ছিল অনন্ত, ইনি বড়ু চণ্ডীদাস নামে পরিচিত ছিলেন অথবা বড়ু চণ্ডীদাস ইঁহার উপাধি ছিল।

বিদ্যানিধি মহাশয় বলেন, "অনন্ত নামক এক গায়নের সাতটি পদ কৃ-পুথীর অঙ্গীভূত হইয়াছে। "অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস গায়িল।" ইহার সোজা অর্থ, 'বড়ু চণ্ডীদাস' উপাধি হইয়া গিয়াছিল। নানা কবি সে উপাধি গ্রহণ করিয়া পদ রচিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম অনন্ত ছিল।"[১] বিদ্যানিধি মহাশয়ের উক্তি অযৌক্তিক নহে। দানখণ্ডের অন্তর্গত পদ তিনটি স্পষ্টতঃই প্রক্ষিপ্ত, কারণ আগের ও পরের পদের ভাবের ব্যতিক্রম এই তিনটি পদে হইয়াছে। বৃন্দাবনখণ্ডের পদটিও [পৃ ৯৭-৯৮] সন্দেহের অতীত নহে, পূর্ব্ববর্ত্তী পদের সহিত সামঞ্জস্য থাকিলেও পরবর্ত্তী পদের সহিত সামঞ্জস্যের কিছু অভাব আছে। বংশীখণ্ডের পদটির [পৃ ১৪৯-৫০] এবং রাধাবিরহের দ্বিতীয় পদটির [পৃ ১৫৮][২] ভণিতায় 'বড়ু' ও 'চণ্ডীদাস' পদের মধ্যে 'গাইল' পদ ঢুকিয়াছে—"আনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে", ইহা সন্দেহ উদ্রেক করে। রাধাবিরহের প্রথম পদটিতে ছন্দঃ হিসাবে 'আনন্ত' পদটি অতিরিক্ত, সুতরাং এখানে এটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়াই মনে হয়—

নটক সে গদাধরে অশেষ মুরুতী ধরে, কোণ চিহ্নে পাইবোঁ উদ্দেশে।
বাসলীচরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল (আনন্ত) বড়ু চণ্ডীদাসে ॥
পৃ ১৫৬ ॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের কবি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথি অপেক্ষাও যে প্রাচীনতর তাহার একতম প্রমাণ হইতেছে, পুঁথির সময়েই বড়ু চণ্ডীদাস ভণিতায় তাঁহারই পদ ভাঙ্গিয়া অথবা নূতন করিয়া পদলেখা চলিত হইয়াছিল, এবং এই প্রথা পরবর্ত্তী কালেও চলিয়া আসিয়াছে। শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রমোহন বসু বিষ্ণুপুর অঞ্চল হইতে প্রাপ্ত অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত যে দুইটি তাল শিখিবার খাতা আবিষ্কার করিয়াছেন[৩] তাহাতে বড়ু চণ্ডীদাসের চৌদ্দটি পদ আছে। এই পদগুলি প্রায় সবই শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে পূরা অথবা আংশিক ভাবে পাওয়া গিয়াছে, কেবল পাঁচটি পদ

১। ব-সা-প-প ৪২, পৃ ৪৬।

২। এই পদটিতে "চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ" আছে, অন্যত্র 'বন্দিআঁ শ্রীরামচরণে" ইত্যাদি।

৩। ব-সা-প-প ৩৯, পৃ ১৭৬-৯৪, ৪০, পৃ ৪৩-৫৪।

নূতন।[১] এই নূতন পদগুলির এক আধটি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের খণ্ডিত অংশে ছিল এমন অনুমান করা যাইতে পারে। তবে বাকি পদগুলি যে মূল বড়ু চণ্ডীদাসের পরবর্ত্তী কালের রচনা, তাহা ভাব ভাষা ও ভণিতা দৃষ্টে বুঝিতে বিলম্ব হয় না। যেমন—

আঁখি ঠারে অনুসারে ধনি কহে বড়াইরে ঘরে কি বলিব ত্বরুবারে।
এই খেনে রশে রশে কহে বড়ু চণ্ডীদাশে গাইল জে বাষুলির বরে ॥[২]

ইহা পাঠান্তর পাওয়া গিয়াছে—

আঁখি ঠার যনুসরে ধনি কহে বড়াএরে মরি কি বলিব ত্বরবারে।
এই খেনে বস্থে বস্থে কহে বটু চণ্ডিদাসে গাইল জে বাশুলির বরে ॥[৩]

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের পুঁথির লিপিকাল আনুমানিক ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি হওয়া সম্ভব, ইহা পূর্ব্বে বিচার করিয়া দেখিয়াছি। এখন প্রশ্ন উঠে, মূল কবি বড়ু চণ্ডীদাসের আবির্ভাবকাল কখন। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে জয়দেবের তিন চারিটি পদের অনুবাদ আছে। সুতরাং এই পদগুলি—মূল কবির লেখা হইলে—জয়দেবের পরে রচিত। কয়েকটি আরবী-ফারসী শব্দও ইহাতে আছে, সুতরাং—এই পদগুলি মূল কবির রচনা হইলে—কবি মুসলমান-অভিযানের অন্ততঃ ২০০ বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। কেননা এই সকল বিদেশী শব্দ ভাষায় সর্ব্বজনবোধ্য হইতে গেলে একটু বেশী সময়ই লাগে। এই সকল, এবং ভাষার প্রাচীনতা দেখিয়া বড়ু চণ্ডীদাসকে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধের লোক বলিলে অন্যায় ও অযৌক্তিক হয় না।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বর্ণিত কাহিনী কোন পুরাণে বা বৈষ্ণবসিদ্ধান্তগ্রন্থে নাই। এই কাহিনীগুলি বাঙ্গালা দেশে প্রচলিত লৌকিক-পুরাণজাতীয় গ্রন্থ হইতে নেওয়া

১। ব-সা প-প ৩৯, পৃ ১৮০ . ঐ, পৃ ১৮২-৮৩ = ব-সা-প-প ৪০, পৃ ৫২-৫৩, ৩৯, পৃ ১৮৭ = ৪০, ৪৭, ৩৯, পৃ ১৮৮-৮৯ = ৪০, পৃ ৪৫-৪৬, ৩৯, পৃ ১৯০ = ৪০, পৃ ৪৪।

২। ব সা-প-প ৩৯, পৃ ১৮৮-৮৯। এই পদের প্রথম চারি ছত্রের সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের একটি পদের [পৃ ৩০] প্রথম চারি ছত্রের মিল আছে।

৩। ব-স-প-প ৪০, পৃ ৪৫-৪৬।

হইতে পারে, অথবা আবহমানকাল লোকমুখে প্রচলিত গল্প বা ছড়া হইতে গৃহীত হইতে পারে।[১] এই উপলক্ষে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা কৃষ্ণদাসের উক্তি স্মরণীয়,

দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে।
অজ্ঞ নহি কিছু কহি হরিবংশ-মতে ॥[২]

ভারখণ্ডের কাহিনী রাধাপ্রেমামৃত বা প্রেমামৃত নামে একটি ছোট কোষকাব্যে পাওয়া গিয়াছে। তাম্বূল, পত্র ও বাণখণ্ডের কাহিনী অন্যত্র পাওয়া যায় নাই।[৩] দান ও নৌকাখণ্ড লীলার উল্লেখ মুরারি গুপ্তের কড়চাতেও পাওয়া যায়।[৪]

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে, শ্যামদাসের গোবিন্দমঙ্গলে এবং রামচন্দ্র মল্লিকের একটি পদেও রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী।[৫]

১। HBL, পৃ ৪৭৫-৭৭ দ্রষ্টব্য।

২। ব-সা-প প্রকাশিত, পৃ ১৩৭। বলা বাহুল্য হরিবংশ পুরাণে এই লীলা নাই।

৩। রাধাকৃষ্ণলীলাকাহিনীর ইতিহাস সম্বন্ধে HBL, ত্রয়োবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

৪। HBL, পৃ ৩৯১। ৫। ঐ, পৃ ৪১৪।

একাদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন-কাহিনী

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্যের আখ্যানবস্তু ও পরিচয় এখন দেওয়া যাইতেছে। উদ্ধৃত অংশে পরিচিত শব্দের বানান যথাসম্ভব চলিত-মত করা গেল।

[প্রথম দুই পাতা পাওয়া যায় নাই, এই অংশে অন্ততঃ চারিটি পদে বন্দনা অংশ সমাপ্ত হইয়াছিল।] কংসের অত্যাচারে সৃষ্টির বিনাশ হয় দেখিয়া দেবতারা প্রতিবিধানার্থ ব্রহ্মার নিকট গেলেন; ব্রহ্মা দেবতাদিগকে লইয়া ক্ষীরোদ সাগরের তীরে গিয়া শ্রীহরিকে স্তব করিলেন। স্তবে তুষ্ট হইয়া শ্রীহরি কাল এবং শাদা দুই গাছি কেশ দিয়া বলিলেন যে, বসুলের অর্থাৎ বসুদেবের ঔরসে এবং দেবকীর গর্ভে হলী অর্থাৎ বলরাম এবং বনমালী অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ রূপে অবতীর্ণ হইয়া তিনি কংসাসুরের বিনাশ করিবেন। দেবতারা খুসী হইয়া নিজস্থানে চলিয়া গেলেন এবং কাল প্রতীক্ষা করিতে লাগিলেন। এদিকে নারদ মুনি উল্লাসিত হইয়া কংসের নিকট আসিয়া নানারূপ অঙ্গভঙ্গি করিয়া কংসকে সাবধান করিয়া দিলেন,

> কোন সুখেঁ কংস তোর মুখে উঠে হাস।
> নাহি জান এবেঁ তোঁ আপনার নাশ॥
> যে হৈবেক দৈবকীর গর্ব্ভ অষ্টম।
> অতি মহাবল সেসি তোহ্মার যম॥
> কহিলোঁ মোঁ ই-সকল তোহ্মার ঠাএ।
> এবেঁ মনে গুণি কর জীবন-উপাএ॥

ইহা শুনিয়া কংস মন্ত্রীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া ঠিক করিল, এখন হইতে দেবকীর যত গর্ভ হইবে তাহা মারিয়া ফেলিতে হইবে। নারদ আসিয়া বসুদেবকে ইহা জানাইয়া সাবধান করিয়া দিলেন যে, দেবকীর অষ্টম গর্ভে নারায়ণের আবির্ভাব হইবে।

কংস দেবকীর পর-পর ছয় গর্ভ নষ্ট করিল। সপ্তম গর্ভ পাত হইয়া গিয়া রোহিণীর উদরে আশ্রয় করিল। তাহা হইতে বলশালী বলভদ্রের জন্ম হইল। অষ্টম গর্ভে শ্রীকৃষ্ণের জন্ম হইল। রাত্রিতে গোপনে বসুদেব কৃষ্ণকে নন্দের গৃহে রাখিয়া যশোদার নবজাত শিশু কন্যাকে লইয়া আসিলেন। কংস এই কন্যাকে শিলাপাটে আছাড়িয়া মারিল; কন্যা আকাশবাণী করিল, নন্দের গৃহে যে শিশু বাড়িতেছে সে তাহাকে বধ করিবে। এই কথা শুনিয়া কংস গোকুলে শ্রীকৃষ্ণকে মারিবার জন্য পূতনা, যমল-অর্জ্জুন এবং কেশী প্রভৃতি অসুর পাঠাইল। কৃষ্ণ সকলকেই বিনাশ করিয়া গোকুলে বাড়িতে লাগিলেন। অপূর্ব্বসুন্দর শরীরে পীতবসন ও নানাবিধ অলঙ্কার পরিয়া এবং হাতে বাঁশী লইয়া বৃন্দাবনে গোরু চরান তাঁহার প্রাত্যহিক কার্য্য হইল।

কৃষ্ণের সন্তুষ্টির জন্য দেবতাদিগের অনুরোধে লক্ষ্মী সাগর গোয়ালের গৃহে পদ্মার গর্ভে রাধারূপে জন্ম লইলেন। অপূর্ব্বসুন্দরী রাধা দিনে দিনে চন্দ্রকলার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে লাগিল। দৈবের চক্রান্তে নপুংসক আইহনের সহিত তাহার বিবাহ হইল। রাধার অনন্যসাধারণ রূপ এবং উদীয়মান যৌবন দেখিয়া আইহন মাতাকে বলিয়া স্বীয় পিতৃস্বসা রাধার মাতামহী (বা মাতামহীস্থানীয়া) সুবৃদ্ধা বড়ায়িকে রাধার সঙ্গিনী করিয়া দিল। [এইখানে জন্মখণ্ড অর্থাৎ প্রস্তাবনা শেষ হইল।]

বড়ায়ির তত্ত্বাবধানে রাধা সখীগণকে লইয়া বনপথ দিয়া মথুরা নগরীতে প্রত্যহ দধিদুগ্ধের পসার লইয়া বেচিতে যায়। একদিন মনের উল্লাসে সখীদিগের সহিত হাস্য পরিহাস করিতে করিতে বড়ায়িকে অজ্ঞাতসারে ফেলিয়া রাধা দ্রুত-পদে অগ্রসর হইয়া গেল। কতক দূর গিয়া তাহার খেয়াল হইল, বড়ায়ি পিছু পড়িয়া আছে। মাথায় হাত দিয়া রাধা এক বকুল-তলায় বসিয়া পড়িল। বড়ায়ি অন্য পথে রাধাকে খুঁজিতে খুঁজিতে নাতি কৃষ্ণকে গোরু চরাইতে দেখিয়া তাঁহার কাছে পথ কোনটি দেখাইয়া দিতে বলিল, এবং আরও বলিল যে সঙ্গে তাহার নাতিনী ছিল, তাহাকে পথে হারাইয়া ফেলিয়াছে। কৃষ্ণ বলিলেন, আমি তোমাকে

রাধার সহিত মিলাইয়া দিব, তুমি তাহার রূপ বর্ণনা কর। তখন বড়ায়ি এইরূপে রাধার রূপ বর্ণনা করিল,

কেশপাশেঁ শোভে তার স্থরঙ্গ সিন্দূর।
সজল জলদে যেহ্ন উইল নব সূর॥
কনককমলরুচি বিমল বদনে।
দেখি লাজে গেলা চান্দ দুই লাখ যোজনে॥
মুনিমনমোহিনী রমণী অনুপামা।
পদুমিনী আহ্মার নাতিনী রাধা নামা॥
ললিত-অলক-পাঁতি-কাঁতি দেখি লাজে।
তমালকলিকাকুল রহে বনমাঝে॥
আলস লোচন দেখি কাজলে উজল।
জলে বসি তপ করে নীল-উতপল॥
কণ্ঠদেশ দেখিআঁ শঙ্খত ভৈল লাজে।
সত্বরে পশিলা সাগরের জল মাঝে॥
কুচযুগ দেখি তার অতি মনোহরে।
অভিমান পাআঁ পাকা দাড়িম বিদরে॥
মাঝা খিনী গুরুতর বিপুল নিতম্বে।
মত্ত রাজহংস জিনি চলএ বিলম্বে॥
দিনে দিনে বাঢ়ে তার নহুলী যৌবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী-গণ॥

বড়ায়ির মুখে রাধার রূপবর্ণনা শুনিয়া কৃষ্ণ মুগ্ধ হইয়া একেবারে অধৈর্য্য হইয়া উঠিলেন, এবং বড়ায়িকে বলিলেন, একবার রাধার সহিত আমার মিলন করাইয়া দাও। বড়ায়ি বলিল, সে আর বেশী কথা কি?

পরাণ দিবাক পারোঁ তোহ্মার বচনে।
এ কাজ সাধিব আহ্মে করিআঁ যতনে॥

আযোড়-যোড়ন আহ্মে করিবাক পারি
সে কি রাধিকা ভৈল সীতা সতী নারী ॥
আহ্মার হাথত দেহ কিছু[1] ফুল পানে।
তাক লঅাঁ জাই আহ্মে রাধিকার থানে ॥
বিলম্ব না কর বোল রাধার উদ্দেশে।
আর কিছু দেহ কাহ্নাঈ উত্তম সন্দেশে ॥

কৃষ্ণ বড়ায়ির হাতে কর্পূরবাসিত তাম্বূল ও চাঁপা নাগেশ্বর ইত্যাদি ফুলের মালা দিয়া এই "সন্দেশ" রাধাকে বলিতে বলিলেন,

কর্পূরবাসিত রাধা খাহ তাম্বূল।
কাহ্নাঞিঁর বচনে তোহ্মে দেহ আনুকূল ॥
চঞ্চল নয়ন তোর সিসতে[2] সিন্দুর।
বাহুত বলয়া শোভে পাএত নূপুর ॥
চলিতেঁ চলিতেঁ তোর রুণুঝুণু বাজে।
মোর মুখে শুনি মোহ গেলা দেবরাজে ॥

শুভতিথি শুভবার শুভক্ষণ দেখিয়া বড়ায়ি দেবগণকে বন্দিয়া শ্রীরামচরণে প্রণাম করিয়া উপহার লইয়া বৃন্দাবনে গিয়া রাধিকার দর্শন পাইল। রাধিকাকে সাদর সম্ভাষণাদি করিয়া পাশে বসিয়া তাহাকে কৃষ্ণের উপহার দিল ও বার্ত্তা জানাইল। [অতঃপর একখানি পাতা নাই; এখানে রাধার প্রত্যাখানের কথা ছিল।] বড়ায়ি কৃষ্ণের নিকট ফিরিয়া আসিয়া বিফলতার কথা জানাইলে কৃষ্ণ আরও অনুনয় করিতে লাগিলেন, এবং পুনরায় বড়ায়িকে পূর্ব্ববৎ উপায়ন দিয়া পাঠাইলেন। বড়ায়ি পুনর্ব্বার রাধার কাছে আসিয়া কৃষ্ণের উপহার ও বার্ত্তা প্রদান করিল। রাধা ইহাতে বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল।

এ বোল শুনিআঁ নাগরী রাধা হানএ[3] সকল গাএ।
যত নানা ফুল পান করপূর সব পেলাইল পাএ ॥

১। মূলে সর্ব্বত্র 'কিছ'। ২। অর্থাৎ শীর্ষে। ৩। মুদ্রিত পাঠ 'হালএ'।

তখন বড়ায়ি বলিল, এমন কাজ করিতে নাই,

নান্দের নন্দন ভুবনবন্দন তোর দরশনে জীএ ॥

রাধা সদর্পে উত্তর করিল,

ঘরের স্বামী মোর সর্ব্বাঙ্গে সুন্দর আছে সুলক্ষণদেহা।
নান্দের ঘরের গরু-রাখোআল তা সমে কি মোর নেহা

তখন বড়ায়ি বলিল,

যে দেব স্মরণে পাপ বিমোচনে, দেখিল হএ মুকতি[১]।
সে দেব সনে নেহা বাঢ়াইলেঁ হএ বিষ্ণুপুরে স্থিতি ॥

উত্তরে রাধা বলিল,

ধিক জাউ নারীর জীবন দহে পসু[২] তার পতি।
পরপুরুষের নেহাএঁ যাহার বিষ্ণুপুরে [হএ[৩]] স্থিতি ॥

রাধা এইরূপে কৃষ্ণের প্রস্তাব উপেক্ষা করিল।

[ইহার পর রাধার জবানীতে যে পদটি (পৃ ১০) আছে তাহা প্রক্ষিপ্ত, অর্থাৎ মূল পালায় ছিল না ; কেন না, ইহার মর্ম্ম অনুনয়সূচক, পূর্ব্ববর্ত্তী পদের এবং পরবর্ত্তী রাধার উক্তির সহিত একেবারে মিল নাই। এই পদটি তাহার পরবর্ত্তী পদ—যাহাতে বড়ায়ি কৃষ্ণের কাছে রাধার প্রত্যাখ্যানকে অন্যভাবে বিবৃত করিতেছে —তাহার ব্যাখ্যা স্বরূপ রচিত।] বড়ায়ি আসিয়া কৃষ্ণকে বলিল, রাধা বলিতেছে যে সে এখন অপ্রাপ্তযৌবনা এবং কামকলানভিজ্ঞা ; পরে উপযুক্ত সময় হইলে, কৃষ্ণের কথা রাখিবে। কৃষ্ণ বলিলেন, আমি রাত্রিতে রাধাকে স্বপ্নে দেখিয়াছি, ফলে আমার চিত্ত এত উতলা হইয়াছে যে আমার জ্বর আসিয়াছে ; তুমি একবার রাধাদর্শন করাও ; আর একবার তুমি রাধার কাছে যাও।

বড়ায়ি রাধার কাছে আসিয়া সুর বদলাইয়া বলিল, কৃষ্ণ তোমাকে স্বপ্নে দেখিয়া বড়ই কাতর হইয়াছে, প্রাণ সংশয় ; দেখিতেছি, তুমি পুরুষবধের ভাগী

১। অর্থাৎ সাক্ষাৎ মুক্তি হয়। ২। অর্থাৎ পশুক, প্রবেশ করুক। ৩। মূলে নাই।

হইবে; একটি কথা দিলে যদি কৃষ্ণ আশা পায় তবে তাহা দিয়া কৃষ্ণের জীবন রাখিবে না কেন?

এই কথা শুনিয়া রাধা জ্বলিয়া গেল। বুড়ীকে যার পর নাই ভৎর্সনা করিয়া শেষে ক্রোধসংবরণ করিতে না পারিয়া তাহাকে এক চড় কসাইয়া দিল। বড়ায়ি কৃষ্ণের কাছে ফিরিয়া আসিয়া দুঃখ করিয়া বলিল,

কোপেঁ কভোঁ মোকে হাথেঁ না ছুইল[১] স্বামী।
গালিহো সাসুড়ী থানে না পাইল আহ্মি॥
তোহ্মার কারণে কাহ্নাঞিঁ এতেক বএসে।
বড় অপমান পাইলোঁ এবেঁ খাইবো বিষে॥

শেষে বড়ায়ি এই অপমানের প্রতিকার দাবী করিল। কৃষ্ণ প্রচুর দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন,

সকল গোঠ মেলাইবোঁ,
বড়ায়িক ক্ষীর যোগাইবো,
ঘরত রাখিআঁ বড়ায়ির সেবা করিবোঁ॥

ইহাতেও বড়ায়ি সন্তুষ্ট না হইয়া, রাধাকে জব্দ করিবার উপায় ঠাহরাইতে বলিল। কৃষ্ণ বলিলেন, দান চাহিবার ছলে আমি রাধার যথেষ্ট অপমান ও ক্ষতি করিব, তাহার পর তাহাকে বৃন্দাবনে ধরিয়া লইয়া যাইব, এবং শেষে মদন-বাণে হানিয়া মুনিবেশ ধরিয়া উদাসীন রহিব; তখন তুমি তাহার পাশে বসিয়া তাহাকে যথেচ্ছ উপহাস করিও।

কদমের তলে বসি যমুনার তীরে দান ছলেঁ রাখিবোঁ রাধারে।
লুড়িআঁ সব পসার খাইবোঁ দধি তাহার, কাঢ়ি লৈবোঁ সাতেসরী হারে॥
বাটেত সৃজিআঁ দান করি তার অপমান তোর মোর সাধিব মান॥ধ্রু॥

১। মূলে 'ছইল'।

ধরিহ মোর যুগতি, রাধার হআঁ সংহতি চলি জাইহ মথুরার হাটে।
আহ্মাক রুষ্টবচনে তোষিহ রাধার মনে আহ্মে যবেঁ রোধিব বাটে॥
ছাড়াইবোঁ তার ক্ষীর, কাঞ্চুলী করিবোঁ চীর, হাথ দিব তাহার তনে।
তোর অনুমতি লআঁ বলে রাধাক ধরিআঁ লআঁ যাইবোঁ মাঝ বৃন্দাবনে॥
পাছেত মদনবাণে হানিআঁ তাক পরাণে রহিবোঁ ধরি মুনিবেশে।
বসি তোহ্মে তার পাশে করিহলি উপহাসে— গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥[১]

বড়ায়ি মনোভাব গোপন করিয়া রাধার নিকট ফিরিয়া আসিল। তাহার পর সকলে মথুরার হাটে গিয়া দ্রব্যাদি বিক্রয় করিয়া ঘরে ফিরিল।

হেন মতে নিতি নিতি মথুরা নগরে।
দধি দুধ বিকণিআঁ রাধা আইসে ঘরে॥
কৌড়ী আনিআঁ দেএ সাসুড়ীর থানে।

কৃষ্ণের আর সুযোগ আসে না। শেষে অধৈর্য্য হইয়া বড়ায়িকে বলিলেন,

এতদিন গেল বড়ায়ি তোর আশোআসে।
রাধা চিন্তিআঁ মোর চৌখে নিন্দ নাইসে॥[২]
বচন আহ্মারে দিআঁ ভাণ্ডহ কেহ্নে।
এভোঁ না করাইলেঁ মোর রাধা দরশনে॥
রাধিকা লআঁ চল মথুরার হাটে।
মাহাদানী হআঁ আহ্মে রহি গিআঁ বাটে॥
কালি যাইব আহ্মে বড়ই বিহানী[৩]।
তোহ্মে সোঁঅরিহ বড়ায়ি আহ্মার বাণী॥
আজি রাতি সুত গিআঁ আইহনের ঘরে।
প্রভাত সময় হৈলেঁ চলিহ সত্বরে॥

১। পৃ ১৩। এই পদটিতে সম্ভবতঃ মূল পালার "অনুবাদ" রহিয়াছে।
২। অর্থাৎ রাধার কথা ভাবিয়া আমার চোখে ঘুম আসে না।
৩। অর্থাৎ খুব সকালে।

অন্তরে বাঢ়এ মোর দারুণ মদনে।
রহিতেঁ না পারেঁ। বিনি রাধা-দরশনে ॥
যতেক প্রবন্ধ সব জানহ আপনে।
কি বুলিব তোরে উপদেশবচনে ॥
রাধাক দেখিলেঁ আহ্মে চাহিব দানে।
খর শীতল আর বুলিব বচনে ॥
আহ্মাকে গঞ্জিহ বড়ায়ি নির্ভয়মনে।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলী-গণে ॥

বড়ায়ি তাহাই করিল। [এইখানে তাম্বূলখণ্ড শেষ হইল।]

প্রত্যূষে রাধা বেশভূষা করিয়া সখীগণ সঙ্গে বড়ায়িকে লইয়া দধি দুগ্ধ বেচিতে মথুরা চলিয়াছে। পথে যমুনার ঘাটের নিকটে কৃষ্ণ পথ রোধ করিয়া বড়ায়িকে জিজ্ঞাসা করিলেন, এই সব গোপবধূ লইয়া কোথায় চলিয়াছ? [এখানে দেড়খানি পাতা পাওয়া যায় নাই।] কৃষ্ণ বলিলেন, হয় আমার দান দাও, নহে তোমার যৌবন একবার উপভোগ করিতে দাও। রাধা বড়ায়িকে বলিল, একি কথা, আমার বয়স মোটে এগার; আর সখীদিগকে ছাড়িয়া আমাকেই বা একলা আটকায় কেন? উহার কথায়ও তো কোন ঠিক পাইতেছি না,

খনে চাহে মোরে মাহাদানে।
খনেকেঁ বোলএ আনচানে ॥

কৃষ্ণ বলিলেন, তোমরা ষোল শত গোপী তোমাদের পসরা নামাও, আর ভাঁড় পিছু ষোল পণ দান দিয়া মথুরা যাও।[১] রাধা বলিল, মথুরার পথে মহাদানী থাকে কখনও শুনি নাই। এইরূপ কথা কাটাকাটি হইতে হইতে [—এখানে আধখানি পাতা পাওয়া যায় নাই—] কৃষ্ণ বাহ্য কোপ দেখাইয়া রাধার অঞ্চল ধরিলেন।[১] রাধা কাঁদিয়া বড়ায়ির কাছে অনুযোগ করিল।

১। এটি কি দ্বিতীয় পালার পদ? দ্বিতীয় পালায় রাধার বয়স বার, এবং ইহাতে বড়ায়ি উপস্থিত ছিল না।

কৃষ্ণ রাধার নিকট প্রেম নিবেদন করিলেন, এবং ভয় দেখাইলেন,

দেবাসুর নর ঈশ্বর কাহ্নের না ভাঁগে আশে।

রাধা বড়ায়ির নিকট অনুযোগ করিল,[১]

যোল শত গোপী জাএ আপন ইছাএ।
দারুণ করম-দোষে আহ্মাকে রহাএ ॥
পরাণ-বড়ায়ি[২] মোর কর প্রতিকার।
তোর পরসাদেঁ ঘর জাওঁ একবার ॥
তার গোত মুণ্ডিলেক আহ্মার যৌবনে।
কিসকে বাখানে কাহ্ন মোর দুই তনে ॥
চিরকাল জীউ মোর স্বামী আইহন।
আনুপাম-বল বীর মতিএঁ গহন ॥

কৃষ্ণ বলিলেন, তোমার নব লক্ষ কড়ি দান বাকি পড়িয়াছে, তাহা দিতে হইবে; তবে তোমার স্নেহ পাইলে আমি ইহা ছাড়িয়া দিতে পারি—

আহ্মার বচন তোহ্মে শুন শশিমুখী।
নেহত লাগিআঁ শত পঞ্চাশ উপেখি ॥
এহা জানি মোকে দেহ আলিঙ্গনদানে।
আপন গৌরব রাধা রাখহ আপনে ॥

রাধা বলিল, আমি এখনি সংবাদ পাঠাইব; কংস এবং আইহন আসিয়া

করতেঁ তোহ্মা করিব চীর ॥

[ইহার পর (দ্বিতীয় পালার ?) এই পদে রাধা ও কৃষ্ণের উক্তিপ্রত্যুক্তি—]

[কৃ] বারহ বরিষেকের মোর মাহাদান।
শুন তোহ্মে আল রাধা পাঁজী-পরমাণ ॥
[রা] নিতি দধি বিকে জাওঁ মথুরার হাটে।
মিছাই কাহ্নাঞিঁ তোঁ আগোলসি বাটে ॥

১। এটি বোধ হয় প্রথম পালার পদ।
২। মূলে 'পরাণে বড়ায়ি'।

[কৃ] অতি বিতপনী রাধা পরিধান-পাট।
আলকে তিলক তোর শোভএ ললাট ॥

[রা] বড়ার বহুআরী আহ্মে বড়ার সভাএ।
কার কাঁচ-আলিতে না দেওঁ মোএঁ পাএ ॥

[কৃ] বারহ[১] বরিষের দান শুনহ মুগধী।
মোহোর করমেঁ তোহ্মা আনি দিল বিধি ॥

[রা] রাখোআল কাহ্নাঞিঁ তোর রাখোআল-মতি।
পাঁতরে একসরী পাইলেঁ নিমাথিতী ॥

[কৃ] রাখোআল হআঁ তোর কংসের গোসাঞিঁ।
ত্রিভুবনে আহ্মা সম আর বীর নাহিঁ ॥

[রা] কাহাক দেখাহ তোহ্মে এত বীরপনে।
টাকারের ঘাএ কংসে লইব পরাণে ॥

[কৃ] তোর কংসে মোর কিছু করিতেঁ না পারে।
তোহ্মারি সে রূপেঁ মোরে মারিবারে পারে ॥

[রা] না বোল না বোল কাহ্নাঞিঁ হেন পাপবাণী।
তোহ্মা ভালে জান আহ্মে আইহনের রাণী ॥

[কৃ] বারহ বরিষেকের দিআঁ যাহা দানে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী-গণে ॥

তাহার পরের পদে কৃষ্ণের উক্তি, এবং তাহার পরবর্ত্তী পদে রাধার প্রত্যুক্তি। তাহার পর আবার কৃষ্ণের উক্তি। ইহার পরের পদটি বড়ায়ির উদ্দেশে অথবা আপনার মনে রাধার খেদোক্তি। তাহার পর কৃষ্ণ কর্তৃক রাধার রূপ বর্ণনা। তাহার পর রাধাকৃষ্ণের উক্তিপ্রত্যুক্তি-সংবলিত পদ [পৃ ২৩]। তাহার পর কৃষ্ণের দম্ভোক্তি—

১। ছন্দের অনুরোধে 'বার' পড়িতে হইবে।

মেদিনী যোড়িলোঁ হালে। কৈলোঁ[১] ব্রহ্মার দণ্ড যোঁআলে ॥
গোআলী বান্ধিলোঁ বাসুকি দড়া। গিরি করিলোঁ গোবালী মোথড়া ॥
জাইবার বাসনা তেজ গোয়ালী। কাহ্নু মাহাদানী তোরে ল বালী ॥ ধ্রু ॥
বৃন্দাবন মোর থানে। বংশ বাজাওঁ গানে ॥
না কর তোঁ মন আনে। আহ্মে অসুর-দল[ন] কাহ্নে ॥

ইহার পর রাধার খেদ ও রোষোক্তি। তাহার পর কৃষ্ণের জবাব। রাধা বলিল, কৃষ্ণ নির্লজ্জ; দান চায় তো বুঝি, কিন্তু দান লইতে তো মন নাই!

দানের আন্তরে কাহ্নাঞিঁ বুলুক বচন।
দান লৈতেঁ নাহিঁ মন কিসকে যতন ॥

কৃষ্ণের উক্তি, রাধার প্রত্যুক্তি। তাহার পর রাধার প্রত্যেক অঙ্গ হিসাবে দান ধরিয়া কৃষ্ণ লম্বা ফর্দ্দ দিলেন।[২] রাধা সদর্পে উত্তর করিল,

কিসের দান কাহ্নাঞিঁ কিসের ঘাট।
কিসের আন্তরে কাহ্নাঞিঁ আগোলসি বাট ॥
মিছা খড়ি পাড় কাহ্নাঞিঁ কপট-নাটে।
কংসে শুনিলেঁ পড়ি যাইবেঁ টাটে ॥
কি মোর ঝগড় ভৈল মথুরার পথে।
পাঁজী-পুথী তোহ্মার চিরিবোঁ বাম হাথে ॥ ধ্রু ॥
রাখোআল কাহ্নাঞিঁ তোতে হেন বোল সাজে।
বড়ার বহুআরী আহ্মে পাইএ বড় লাজে ॥
এ সব চরিতেঁ তোঁ নাশিলি দুই লোকে।
কমণ মুগধেঁ বাটে দানী কৈলে তোকে ॥

১। মূলে 'কৌণোঁ'।

২। অনুরূপ ভাবের পদ পদাবলী সাহিত্যে পাওয়া যায়। পদটিতে "অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস" ভণিতা আছে। এটি সম্ভবতঃ প্রথম পালার পদ।

মিছে কেহ্নে চক্র কাহ্নাঞিঁ করহ বাখান।
কথাঁহো নাহিঁ শুনি দেহত বসে দান॥
ঘৃত ঘোল দধি দুধ পসারত জাএ।
এহাতে সি দান লইতেঁ তোহ্মার জুআএ॥
আইহন বীর তিন লোকেঁ ভালে জানি।
তোহ্মে কিনা চিহ্ন আহ্মে আইহনের রাণী॥
কি না লাভ-লোভেঁ কাহ্নাঞি না চিহ্ন এখন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী-গণ॥

দুইটি করিয়া চারিটি পদে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার রূপ বর্ণনা ও প্রেম প্রার্থনা, রাধার খেদ ও অনুনয়। কৃষ্ণ রাধার বিলাস বেশের বর্ণনা করিলে, রাধা বড়ায়ির নিকট খেদ করিল।[১] পুনরায় কৃষ্ণ কর্ত্তৃক রাধার রূপ বর্ণনা, এবং বড়ায়ির নিকট (?) রাধার প্রতিষেধোক্তি। তখন কৃষ্ণ একটু স্বর বদলাইয়া বলিলেন, কৃপণের ধনের মত নবযৌবন তুমি কাহার জন্য তুলিয়া রাখিতেছ? উপভোগ করিয়া ক্ষণস্থায়ী যৌবন সফল কর—

শুন ল সুন্দরি রাধা বচন আহ্মার।
নহুলী যৌবনে দেহ সরস শৃঙ্গার॥
তোমার যৌবন রাধা কৃপিণের ধন।
পোটলি বান্ধিআঁ রাখ নহুলী যৌবন॥
বিলাহ যৌবন রাধা মোর বোল শুন।
যাবত যৌবনে রাধা নাহিঁ লাগে ঘুণ॥ ধ্রু॥
আম্বু জাম্বু মুকুলিল ভরে নোআঁইল ডাল।
নহুলী যৌবন রাখিবি কত কাল॥
কোন বিশ্বকর্ম্মে নির্ম্মিল তুই তন।
আছু যুবজনের বৃদ্ধের জাএ মন॥

১। এই দুইটি পদে "অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস" ভণিতা আছে।

হেন স যৌবন রাধা সব আলপাউ।
যৌবন গড়িলেঁ তোর তনু হৈবে লাউ॥
তোহ্মার যৌবন রাধে পানির ফোটা।
চিরকাল না রহিবে থাকি জাইবে খোঁটা॥
এ তিন ভুবনে রাধা তোহ্মা কৈলোঁ সার।
মনে পরিভাবি দেহ সরস শৃঙ্গার॥
নহুলী যৌবনে রাধা দেহ আলিঙ্গন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী-গণ॥

রাধা কৃষ্ণকে কংস এবং ধর্ম্মের ভয় দেখাইল। তখন কৃষ্ণ পুরাণ হইতে উদাহরণ দেখাইয়া কহিলেন, পরদারে পাপ নাই। রাধা ইহার সমুচিত উত্তর দিল। ইহার পর দুইটি পদে রাধার রূপ বর্ণনা। [এই পদ দুইটি পূর্ব্ব পরিচ্ছেদে উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছি যে, দ্বিতীয়টি মূল পালায় ছিল না।] রাধা বিরক্তি ও ঘৃণা প্রকাশ করিল। তাহার পর কৃষ্ণের উক্তি, রাধার প্রত্যুক্তি। পরের পদটিতে [পৃ ৩৪] এক সঙ্গে কৃষ্ণরাধার উক্তিপ্রত্যুক্তি। তাহার পর রাধার রূপ বর্ণনা করিয়া বড়ায়িকে কৃষ্ণ বলিতেছেন,

বোল রাধারে, মানু সুরতি, তবেঁসি জীএ কাহ্নাঞিঁ॥

বড়ায়ির মুখে কৃষ্ণের কথা শুনিয়া রাধা অনুনয় করিয়া বলিল, একি কথা! তোমাকে আমার শাশুড়ী আমার রক্ষণাবেক্ষণে নিযুক্ত করিয়াছে, আর তোমার এমন ব্যবহার! এখনও তুমি যদি আমার হিত চাও, তবে কৃষ্ণের কথায় কান দিও না; এস আমরা এক পাশে চুপ করিয়া থাকি।

কৃষ্ণ পুনরায় অনুনয় আরম্ভ করিলেন। পরের দুইটি পদে রাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি [পৃ ৩৬]। পরের পদটি রাধার খেদোক্তি। আবার কৃষ্ণের অনুনয়। কৃষ্ণ নাকড়ি গাছের তলায় বসিয়া ক্ষীর কাড়িয়া খাইতেছে বলিয়া রাধা খেদ করিল।[১] তাহার পর কৃষ্ণের উক্তি। [এইখানে একটি পাতা পাওয়া যায় নাই।]

১। এটি কোন্ পালার পদ?

রাধা বড়ায়ির কাছে বিলাপ করিতে লাগিল,

পাখি জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ি পড়ি যাওঁ।
যথাঁ সে কাহ্নাঞিঁর মুখ দেখিতে না পাওঁ ॥
হেন মন করে বিষ খাআঁ মরি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পশিআঁ লুকাওঁ ॥
স্বরূপেঁ মরিব তবেঁ শুনহ বড়ায়ি।
পন্থে বল করে যবে আবাল কাহ্নাঞিঁ ॥
দধি খাএ ভাণ্ড ভাঁগে দুধে দেই পানি।
সমুন্ধ না মানে সে ভাগিনা-মাউলানী ॥

পরের পদটিতে কৃষ্ণরাধার উক্তিপ্রত্যুক্তি [পৃ ৩৮]। তাহার পর রাধার বিনয়—

উনমত নহ কাহ্নাঞিঁ মন কর থির।
মোর পাশ নাহিঁ জাএ আইহন বীর ॥
বলেঁ চুম যদি দিবেঁ দশনের ঘাত।
তবেঁ কোন ছলেঁ ঘর জাইবোঁ গোপীনাথ ॥
প্রণাম করিআ বোলোঁ দেব গদাধর।
একবার দয়া করি আহ্মা পরিহর ॥
কেহ্নে হেন কহ হআঁ গোআল জাতি।
পরনারীকে কেহ্নে করহ আরতি ॥
নান্দ গোপ শুনিলেঁ হৈবের কোন গতি।
মনে পরিভাবি কাহ্নাঞিঁ তেজহ বিমতি ॥
দানের আন্তরেঁ কাহ্নাঞিঁ নেহ[৬] মুতিম-হার।
নাহিঁ যাবোঁ কাহ্নাঞিঁ মথুরা আরবার ॥
ঘৃত দুধ নঠ মোর সকল পসার।
সাসুড়ী ননন্দ মোর অতি দুরুবার ॥

৬। ছন্দের অনুরোধে 'নে' পড়িতে হইবে।

প্রথম বয়সে মোঁ রাধিকা গোআলী।
না জানোঁ স্থরতি-ভাব শুন বনমালী॥
এড়হ্ বাগড় কাহ্নাঞিঁ জাইতেঁ দেহ ঘর
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী-বর॥

তাহার পর কৃষ্ণের অনুনয়—

বড় আশে আইলোঁ তোর ঠাই।
পাইল নিধি কে না বিহড়ায়ি॥[১]

পরের পদটিতে রাধা-কৃষ্ণের উক্তিপ্রত্যুক্তি [পৃ ৪০]। তাহার পর বড়ায়ির প্রতি রাধার খেদোক্তি। তাহার পর কৃষ্ণের দম্ভোক্তি। ইহার পরে বড়ায়ির প্রতি রাধার নির্ব্বেদোক্তি—

আন ডাক দিআঁ বড়ায়ি নাপিতের পো।
কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মুণ্ডায়িবোঁ মো॥
কানড়ী খোঁপা বড়ায়ি মোর দুই তন।
যা দেখিআঁ কাহ্নাঞিঁ করন্তি যতন॥
কি কৈলি কি কৈলি বিধি নিরমিআঁ নারী।
আপনার মাসেঁ হরিণী জগতের[২] বৈরী॥ ধ্রু॥
আলকে তিলক বড়ায়ি কাজল নয়নে।
এহা দেখি বেআকুল নান্দের নন্দনে॥
আর না পিন্ধিবোঁ বড়ায়ি স্থরঙ্গ পাটোল।
এই দেখি মাগে কাহ্নাঞিঁ বিরহের কোল॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি শিশের সিন্দুর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর॥

১। অর্থাৎ, প্রাপ্ত ধন কে বিগড়াইয়া দিল। ২। ছন্দের অনুরোধে 'জগত' পাঠ হইবে।

ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ বড়ায়ি সাতেসরী হার।
যা দেখিআঁ মাঙ্গে কাহ্নাঞিঁ নিবিড় শৃঙ্গার॥
হেন মন করে বড়ায়ি দহে পৈসি মরি।
পরার পুরুষ সমেঁ ধামালী না করি॥
ধামালী বুলিতেঁ কাহ্নে না দিহলি আশ।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাস॥

ইহার পরের পদে কৃষ্ণ-রাধার উক্তিপ্রত্যুক্তি। তাহার পর কৃষ্ণের উক্তি। রাধার প্রত্যুক্তি[১]—

কাল হাণ্ডির ভাত না খাওঁ,
কাল মেঘের ছায়া নাহিঁ জাওঁ,
কালিনী রাতি মোঁ প্রদীপ জ্বালিআঁ পোহাওঁ।
কাল গাইর ক্ষীর নাহিঁ খাওঁ,
কাল কাজল নয়নে না লওঁ,
কাল কাহ্নাঞিঁ তোকে বড় ডরাওঁ॥

কৃষ্ণ তখন কাল জিনিষের ব্যাখ্যা আরম্ভ করিলেন। রাধার প্রত্যুক্তি। কৃষ্ণ-রাধার উক্তিপ্রত্যুক্তি [পৃ ৪৪]। পূতনাবধ, শকটভঙ্গ, যমল-অর্জ্জুনবিনাশ, গোবর্দ্ধনধারণ ইত্যাদি বাল্যকীর্ত্তি এবং রামলীলার উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণের দম্ভোক্তি, বড়ায়ির প্রতি রাধার বিলাপ-উক্তি। তাহার পর কৃষ্ণ-রাধার উক্তিপ্রত্যুক্তি [পৃ ৪৫-৪৬]। কৃষ্ণের অনুনয়োক্তি, বড়ায়ির প্রতি রাধার খেদোক্তি। পরের পদে পূর্ব্বাবতারলীলা উল্লেখ করিয়া কৃষ্ণের দম্ভোক্তি, সঙ্গে সঙ্গে রাধার তীব্র ব্যঙ্গোক্তি [পৃ ৪৭]। কৃষ্ণ বলিলেন, আমি পূর্ব্বকাল হইতে তোমার স্বামী, চক্রপাণি। রাধা উত্তর করিল,

আপনে বোল তোহ্মে ত্রিদশপতি[২]।
এবেঁ কেহ্নে পরদারে মজে তোর মতি॥

১। পরবর্ত্তী পালার পদ ? ২। মূলে 'ত্রিদেশপতী'।

গরু রাখি বুল তোহ্মে মাঝ বৃন্দাবনে।
এবেঁ পাপ কাজে লাগি সাহ মাহাদানে॥

কৃষ্ণের উক্তি, রাধার প্রত্যুক্তি, কৃষ্ণ-রাধার উক্তিপ্রত্যুক্তি [পৃ ৪৯], রাধার উক্তি—

কি না ভৰ্ত্তা গেল মোর মথুরাক জাইতেঁ।
ভাণ্ড ভাঁগি দধি খাইল নান্দের পুতে॥

কৃষ্ণের প্রত্যুক্তি।

রাধা ভূমিতে লোটাইয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বিলাপ করিতে লাগিল। কৃষ্ণের অনুনয়; রাধা বড়ায়িকে গৃহে সংবাদ দিতে বলিল। কৃষ্ণ-রাধার উক্তি-প্রত্যুক্তি [পৃ ৫২]। রাধার উক্তি, কৃষ্ণের প্রত্যুক্তি। রাধার খেদোক্তি, আজ ঘরের বাহির হইবার সময় অমঙ্গল দেখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা অগ্রাহ্য করিয়া আসিয়াছি বলিয়া তাহার উচিত ফল পাইলাম। কৃষ্ণ রাধার আঁচল ধরিলেন, রাধা কাতর হইল,—বলিল, আমি নিতান্ত শিশু, আমাকে ছাড়িয়া দাও।

কৃষ্ণের উক্তি, বড়ায়ির প্রতি রাধার খেদোক্তি। তাহার পরের পদটি বড়ায়ি-রাধার উক্তিপ্রত্যুক্তি [পৃ ৫৫-৫৬]। [এই পদটি পড়িলে বুঝা যায় যে কৃষ্ণ সেখানে উপস্থিত নাই, বোধ হয় অপর দিনের ব্যাপার। এই পদটি এবং পরবর্ত্তী পদগুলি একটি স্বতন্ত্র (প্রথম ?) পালার অন্তর্গত।] বড়ায়ির প্রতি রাধার উক্তি, বড়ায়ির প্রত্যুক্তি।[১] রাধা এইবার বড়ায়িকে চিনিতে পারিয়াছে বটে, তবু মনোভাব গোপন করিয়া দক্ষতার সহিত বলিল,

তোহ্মে যবেঁ বোল বড়ায়ি হেন স্বতন্তরে।
আহ্মার নিস্তার তবেঁ নাহিঁক দুতরে॥
শুনিলেঁ আইহন মোরে করিব আপোষ।
তোহ্মে এক ভিতে হৈবেঁ আহ্মা লঁআ দোষ॥

১। যিনি সংস্কৃত শ্লোক বসাইয়াছিলেন তিনি ভুল করিয়া এই পদটিকে [পৃ ৫৬-৫৭] কৃষ্ণের উক্তি মনে করিয়াছিলেন। ভণিতার পয়ারে 'মোর' বড়ায়ির কথা, ইহা পরবর্ত্তী পদে রাধার উক্তি হইতে স্পষ্ট প্রতিপন্ন হয়।

এবেঁসি জানিলোঁ। তোর ভাল নহে মনে।
যবেঁ কাঢ়ায়িলি বাট দুসহ আরণে ॥ ধ্রু ॥
তোহ্মে বড়ায়ি বোলে-চালে হআঁ যাবি পার।
আহ্মেত করিব তথাঁ কৌন পরকার ॥
বল করি ছিণ্ডিবেক সাতেসরী হার।
দেখিআঁ বা কি বুলিব ঘরের গোআল ॥
অকারণে এহা পথে আনায়িলি মোরে।
মিছেঁ ছাটেঁ কাহ্নাঞিঁ ভাণ্ডাআঁ যাই ঘরে ॥
এবার ভাণ্ডাআঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁক জাইএ।
আরবার তবেঁ বড়ায়ি মথুরা না জাইএ ॥
তোঁ হেন বড়ায়ি ছিতে মোর হএ ডরে।
এ পুনি তোহ্মার লাজ বুঝহ অন্তরে ॥
এহা জানি যেহি যোগ্য সেহি থির কর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী-বর ॥

রাধা ও বড়ায়ি বনে বনে পলাইয়া যাইতে লাগিল। কিন্তু কৃষ্ণ আগে গিয়া রাস্তা আটক করিয়াছেন। কৃষ্ণকে দেখিয়া বড়ায়ি সরিয়া পড়িল; কৃষ্ণের হাতে পড়িয়া রাধা কাঁদিতে লাগিল, কৃষ্ণ তাঁহার চক্ষু মুছাইয়া সান্ত্বনা দিলেন ও পূর্ব্ব প্রার্থনা পেশ করিলেন। পুনরায় পূর্ব্ববৎ কথা-কাটাকাটি চলিতে লাগিল। অবশেষে রাধা দৈবের নির্ব্বন্ধ মনে করিয়া অনিচ্ছা সত্ত্বেও কৃষ্ণের নিকট আত্মসমর্পণ করিল। [এইখানে দানখণ্ড শেষ হইল। এই পালাটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ; এইটিকে অনেকটা মূল পালা বলা যাইতে পারে। দানখণ্ডের পদসংখ্যা সমগ্র কাব্যের পদসংখ্যার চতুর্থাংশেরও বেশী।]

রাধা মথুরাগমন বন্ধ করায় কৃষ্ণ অসুবিধায় পড়িয়াছেন। পুনরায় মিলন ঘটাইবার জন্য বড়ায়ির সহিত পরামর্শ করিয়া কৃষ্ণ নৌকা গড়িয়া যমুনায় খেয়ারী হইয়া রহিলেন। বড়ায়ি রাধাকে বলিল, মথুরায় চল; এবার ভয় নাই, অন্যপথে

যমুনা পার হইয়া যাইব। রাধা শ্বাশুড়ীর অনুমতি পাইয়া সখীগণ ও বড়ায়ি সঙ্গে মথুরা চলিল। যমুনার তীরে গিয়া দেখিল, একটি মাত্র ছোট নৌকা আছে। ছোট নৌকা দেখিয়া রাধার ভয় হইল, খেয়ারীকে বলিল, একে একে সকলকে পার কর। সকলকে পার করা হইলে রাধা বলিল, এইবার আমাকে ও বড়ায়িকে পার কর। খেয়ারী বলিল, এক সঙ্গে দুইজনকে পার করা চলিবে না। সুতরাং বড়ায়ি আগে পার হইল। রাধা নৌকায় চড়িয়া কৃষ্ণকে চিনিতে পারিল, কিন্তু তখন আর উপায় নাই। পরস্পর বাগ্‌যুদ্ধ চলিল। কৃষ্ণ বলিলেন, রাধা, পার হওয়া দুরূহ; তুমি যমুনা ও বায়ুর নিকট মানসিক কর। যমুনার মাঝখানে নৌকা আসিলে টলমল করিতে লাগিল। কৃষ্ণ বলিলেন, রাধা তোমার পসরা ও অলঙ্কারাদি ফেলিয়া দাও, তাহাতে নৌকার বোঝা কমিবে। রাধা তাহাই করিল। কৃষ্ণ নৌকাকে আরও টলমল করাইতে লাগিলেন, রাধা ভয় পাইয়া কৃষ্ণকে জড়াইয়া ধরিল। নৌকা ডুবিয়া গেল, রাধাকে আলিঙ্গন করিয়া কৃষ্ণ যমুনার জলে ভাসিতে লাগিলেন। তীরে উঠিলে বড়ায়ি রাধাকে মৃদু ভৎর্সনা করিল। রাধা সিয়ানা হইয়াছে, বলিল,

> তোক ছাড়ি বড়ায়ি কেমনে জায়িবোঁ ঘর।
> হেন চিন্তি চঢ়িলোঁ মো নাএর উপর ॥
> কথোদূর খেআইলে নাঅ চক্রপাণি।
> ঝাঝর নাঅ নৈল[১] চারি পাশে পানি ॥
> বড়ায়ি বড় ভয় পাইলোঁ যমুনার জলে।
> পার কৈল মোকে ভালে কাহ্নাঞি গোআলে ॥
> গাতর-ভরা রাধা পেলা আভরণে।
> পানি ফুটি মার আহ্মাক বুইল কাহ্নে ॥
> আচম্বিত খরতর বাহিলেক বাঅ।
> মাঝ-যমুনাত ডুবিআঁ গেল নাঅ ॥

১। মুদ্রিত পাঠ নৈল'।

ডুবিআঁ মরিতোঁ যবেঁ না থাকিত কাহ্নে।
আহ্মা লআঁ সান্তরিআঁ রাখিল পরাণে॥
এবার কাহ্নাঞিঁ বড় কৈল উপকার।
জরমেঁ সুঝিতেঁ নারো এ গুণ তাহার॥
আঅর বড়ায়ি মোর উপজিল ডরে।
পসার ডুবিল মোর জলের ভিতরে॥
কোন পরকারেঁ আজি জাইবোঁ নিজ ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী-বর॥

সখীরা নিজ নিজ পসার হইতে কিছু কিছু দিয়া রাধার পসার সাজাইয়া দিল। তাহার পর সকলে মথুরা গিয়া পসার বেচিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিল। [এইখানে নৌকাখণ্ডের সমাপ্তি। এই খণ্ডে পদসংখ্যা ত্রিশ।]

তাহার পর বহুদিন রাধিকার দর্শন নাই। রাধার শ্বাশুড়ী দণ্ডে দণ্ডে রাধিকাকে খুঁজে, সুতরাং বড়ায়ি আর রাধিকাকে গৃহের বাহিরে আনিতে পারে না। তখন কৃষ্ণ নূতন যুক্তি করিয়া বড়ায়িকে বলিলেন,

উপস্থিত ভৈল বড়ায়ি শরত সময়ে।
তড়পথেঁ এবেঁ লোক মথুরাক জাএ॥
এবেঁ তথাঁ কাহ্নাঞিঁর নাহিঁ অধিকার।
হেন বুলি রাধা নেহ যমুনার পার॥

বড়ায়ি বলিল, তাহা না হয় করিলাম, কিন্তু তুমি কি করিবে তাহা ঠিক করিয়া বল, তবে রাধাকে আনিতে পারি। কৃষ্ণ বলিলেন,

যমুনার পথে আহ্মে ভার সজাইআঁ।
থাকিব পথের মাঝে মজুরিআ হআঁ॥
রাধিকারে বুলিহ বিবিধ-পরকার।
সে যেহ্ন আহ্মাক বহাএ দধিভার॥

বড়ায়ি শুনিয়া রাজি হইল।

কৃষ্ণ বাঁক সাজাইয়া যমুনার পারে গিয়া বসিয়া রহিলেন। এদিকে বড়ায়ি আইহনের গৃহে গিয়া রাধাকে ভৎর্সনা করিয়া তাহার শাশুড়ীকে কহিল,

অনেক প্রকারেঁ মোএঁ বুইলোঁ রাধারে।
দধি দুধ লআঁ জায়িতেঁ মথুরা নগরে॥
হাটক না জাএ মোক বোলে ধিক বাণী।
রাজার কোঁঅরী ভৈলী আইহনের রাণী॥
দেখ আইহনের মা রাধার চরিতে।
গোআলের কাম ছাড়ি করে বিপরীতে॥
গোআলের কুলে রাধা জরম লভিআঁ।
দধি বিকে না জাএ থাকএ বসিআঁ॥

রাধার শ্বাশুড়ী রাধাকে বলিল, তুমি বড়ায়ির সঙ্গে যাও;

ঘরক থাকিতে চাহ কিসের আশে।

শ্বাশুড়ীর আদেশে ভয় পাইয়া রাধা পসার সাজাইয়া লইয়া বড়ায়ি ও সখীগণের সঙ্গে মথুরা চলিল। পথে কোন বাধা নাই। নির্ব্বিঘ্নে সকলে যমুনা পার হইল, কিন্তু শরতের রৌদ্রে ভার বহিয়া রাধা ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে। রাধা বড়ায়িকে বলিল, মজুরিয়া না হইলে চলিতে পারিব না। বড়ায়ি বলিল, মজুরিয়া বলিয়া হাঁক দাও, মজুরিয়া আসিবে; কিন্তু তাহাকে উচিত মজুরী দিতে হইবে। রাধা মজুরিয়া বলিয়া ডাক দিলে কৃষ্ণ হাজির হইলেন। [এইখানে আধখানি পাতা নাই।] কৃষ্ণ রাধার সঙ্গে যাইতে চাহেন, কিন্তু ভার বহিতে রাজি নহেন, কারণ তাহাতে লজ্জা হয়। রাধা ও কৃষ্ণের কথা-কাটাকাটি চলিল। শেষে কৃষ্ণ ভার বহিতে রাজি হইলে, রাধা কথা দিল,

মনসুখ ভৈলেঁ বোল ধরিবোঁ তোহ্মার।

বহিবার কালে কিছু দ্রব্য অপচয় হওয়াতে রাধা কৃষ্ণকে ভৎর্সনা করিল। কৃষ্ণ তাহাতে ক্ষুব্ধ হইয়া ভার নামাইয়া রাখিয়া বলিলেন, ভার বহিব না; রাধা আমার দান দেউক। [এইখানে আধখানি পাতা নাই।] রাধা বলিলেন, তুমি আমার যে-পরিমাণ দ্রব্য নষ্ট করিয়াছ, তাহাতেই তোমার দান শোধ হইয়াছে।

পরের পদে কৃষ্ণ-রাধার উক্তিপ্রত্যুক্তি [পৃ ৮৩]। তাহার পর কৃষ্ণের উক্তি। রাধা বলিল, তুমি স্বেচ্ছায় মজুরিয়া হইয়াছ; ভার না বহ না বহিবে, ঘর চলিয়া যাও। এই কথায় কৃষ্ণ সুর ফিরাইয়া ভার বহিতে রাজি হইলেন। রাধা সুযোগ বুঝিয়া বড়ায়ির পসারও কৃষ্ণের ভারে চাপাইয়া দিল। তাহার পর কৃষ্ণ-রাধার উক্তিপ্রত্যুক্তি [পৃ ৮৫]। কৃষ্ণ ক্ষোভে অপমানে গজগজ করিতে করিতে ভার লইয়া চলিলেন। মথুরার উপকণ্ঠে পৌছিয়া ভার নামাইয়া কৃষ্ণ বলিলেন,

ভার বহিল এবেঁ দেহ আলিঙ্গন।

[ইহার পরবর্ত্তী পদটিতে আছে, কৃষ্ণ ভার বহিতেছেন দেখিয়া সখী ও দেবগণ হাসিতে লাগিল। নারদ আসিয়া রাধাকে ভৎ'সনা করিলেন। এই পদটি হয় প্রক্ষিপ্ত, নয় স্থানভ্রষ্ট। ইহাতে একাধিক পদের মিশ্রণ ঘটিয়াছে বলিয়া অনুমান হয়। ইহার পর আধখানি পাতা পাওয়া যায় নাই।] রাধা বলিলেন, ভার বহ; আমার কথার খেলাপ হইবে না,

আসিতেঁ তোহ্মাক দিবোঁ কোল ॥

রাধার কথায় কৃষ্ণ খুসী হইয়া মথুরার হাটে ভার লইয়া গেলেন। পসার বেচিয়া রাধা গোকুলে ফিরিবার পথ ধরিল। কৃষ্ণও আশায় আশায় রাধার সঙ্গ ছাড়িলেন না। [এইখানে ভারখণ্ড সমাপ্ত। খণ্ডিত অংশ ছাড়া ইহাতে ঊনত্রিশটি পদ ও পদাংশ আছে।]

মথুরা হইতে ফিরিবার পথে রাধা শরতের রৌদ্রে ক্লান্ত হইয়া এক গাছের তলায় বসিয়া পড়িল। সখীরা সব চলিয়া যায় দেখিয়া তাহাদিগকে বলিয়া দিল, আমার শ্বাশুড়ীকে বলিও, রোদ পড়িলে আমি ঘর যাইব। শীতল বায়ুতে ক্লান্তি দূর হইলে রাধা তরলনয়নে চারি পাশে চাহিয়া

দেখিল কোপিল কাহ্নাঞি রহিলছে পাশে।

আর যায় কোথায়? "দেবের দেবরাজ আহ্মে বনমালী" বলিয়া কৃষ্ণ লম্বা ফিরিস্তি দাখিল করিলেন। রাধা বলিল, মজুরী নাও, অন্য কথা ছাড়। পরবর্ত্তী পদে দান লইয়া কৃষ্ণ-রাধার উক্তিপ্রত্যুক্তি [পৃ ৮৯]; রাধা বলিল,

ঝগড় না কর তোঁ এহা বাটে।
লাভেঁ মূলেঁ বিত্ত দানকে নাটে॥

শেষে রাধা বলিল,

ছত্র ধর কাহ্নাঞিঁ দিব সুরতি।
নহে মনে পরিহর আরতি॥

কৃষ্ণ উত্তর করিলেন

দান বিনি আজি কাহ্ন না জাএ।

রাধা বড়ায়ির নিকট নিজ সাফাই গাহিল [পৃ ৮৯-৯০]। কৃষ্ণ তখন রাধার রূপ-বর্ণনা জুড়িয়া দিলেন,

লাবণ্য জল তোর শিহাল কুন্তল।
বদন কমল শোভে আলক ভষল॥
নেত্র উতপল তোর নাসা নাল-দণ্ড।
গণ্ডযুগ শোভে মধুক অখণ্ড॥
সুন্দরি রাধা ল সরোবরময়ী।
দুসহ বিরহজ্বরে জরিলা কাহ্নাঞিঁ॥

রাধা একটু নরম হইয়া বলিল,

অনেক যতন করে মোরে চক্রপাণি।
কত না বুলিবোঁ তারে পরিহারবাণী॥
আপন মাথার ছত্র ধরু মোর মাথে।
তবেঁ মো শৃঙ্গার বড়ায়ি দিবোঁ জগন্নাথে॥

বড়ায়ি কৃষ্ণকে রাধার মাথায় ছাতা ধরিতে বলিল। কৃষ্ণ এখনও রাজি নন। পরবর্ত্তী পদে কৃষ্ণ-রাধার কথা-কাটাকাটি চলিল। [এইখানে এগারখানি পাতা পাওয়া যায় নাই, তাহাতে ছত্রখণ্ডের শেষ এবং পরবর্ত্তী বৃন্দাবনখণ্ডের আদি অংশ জানা যাইতেছে না।]

কৃষ্ণের কথায় বড়ায়ি আইহনের গৃহে আসিয়া ছল করিয়া রাধার সহিত বিজনে সাক্ষাৎ করিয়া কৃষ্ণের আর্ত্তি জানাইল এবং বলিল, বৃন্দাবনে কৃষ্ণ

মনোহর উদ্যান পাতিয়াছে, তথায় সাক্ষাৎ করিতে হইবে। রাধার মন কিছু নরম হইয়াছে, বলিল, শ্বাশুড়ী যাইতে দিবে কেন ? বড়ায়ি বলিল,

ব্রত ছল করি ফুল তুলিবাক তরেঁ।
বৃন্দাবন যাসি তোক কিছু নাহিঁ ডরে॥

রাধা বলিল, আইহনের মা ব্রতের ব্যাপার সব ভালই জানে, ওরূপ বলিলে হইবে না, তুমি বরং

মোর সব সখী-সাস্থড়ী থান গিআঁ।
হেন বোল তা সমাক কিছু ভরছিআঁ॥
বিকি নহে আইহনের মাএর কারণে।
তাক ভরছিলেঁ বহু-ঝি দহী-বিকনে॥

রাধার সখীগণের শ্বাশুড়ীর নিকট গিয়া বড়ায়ি এইরূপ বলাতে তাহারা আইহনের মায়ের উপর রুষ্ট হইয়া বলিল,

আপন আপন বহু হাটক পাঠায়িব।
তোহ্মার ঘরত অন্ন পানি না খাইব॥

ইহা শুনিয়া ভয় পাইয়া রাধাকে মথুরার হাটে পাঠাইতে সম্মত হইল। পরদিন প্রভাতে বড়ায়ি আসিয়া রাধাকে অভিসার-বেশে সজ্জিত হইয়া কৃষ্ণের সহিত মিলিতে বলিল। [এই পদটি (পৃ ৯৩-৯৪) জয়দেবের "রতিসুখসারে" ইত্যাদি পদের অনুবাদ।] রাধা সখীগণ ও বড়ায়ি সমভিব্যাহারে মাথায় পসরা লইয়া মথুরা চলিল। পথে যাইতে যাইতে বড়ায়ি বলিতে লাগিল, কৃষ্ণ এখন সুবুদ্ধি হইয়াছে; হাটদান বাটদান ঘাটদান ইত্যাদি অধিকার ত্যাগ করিয়া এখন সে বৃন্দাবনেই থাকে; কাহাকেও কটু কথা বলে না; বরং

হাটুআ লোকেরেঁ তোষে দিআঁ ফুল ফলে।
আগু বাঢ়ায়িআঁ থোএ যমুনার কূলে॥

এই কথা বলিতে বলিতে গোপীরা বৃন্দাবনের কাছে পৌছিল। বৃন্দাবনে নানা জাতি ফল ও ফুলের গাছ, তাহাতে অপূর্ব্ব শোভা হইয়াছে।[১] বড়ায়ির নিকট

[১] পৃ ৯৪-৯৬; এই পদটিতে বিবিধ বৃক্ষের নাম করা হইয়াছে।

বৃন্দাবনের কথা শুনিয়া রাধার ও গোপীদিগের বৃন্দাবনদর্শনে ইচ্ছা হইল, তাহারা বৃন্দাবনে প্রবেশ করিল। কৃষ্ণ আসিয়া রাধাকে বলিলেন, তোমার জন্যই এই বৃন্দাবন নির্ম্মাণ করিয়াছি; তুমি মাথার পসরা এক স্থানে রাখিয়া ফুল পর, ফল খাও, যাহা ইচ্ছা কর। রাধা বলিল, সখীরা সঙ্গে রহিয়াছে, উহারা তোমার আমার হাস্যপরিহাস দেখিলে শাশুড়ী ও স্বামীকে লাগাইয়া দিবে; তুমি ফুল-ফলের লোভ দেখাইয়া এদিকে ওদিকে সরাইয়া দাও। কৃষ্ণ বলিল, তুমি আমার মনের কথাটি বলিয়াছ; আজ তোমার সখীদিগকেও ছাড়িয়া দিব না,

ষোল সহস্র তোর সখিগণ।
সম্ভার তোষিব আহ্মে মন॥

কৃষ্ণের অনুমতি পাইয়া গোপীগণ কৃষ্ণকে লইয়া যথেষ্ট ফুল ফল তুলিতে লাগিল।[১] কৃষ্ণের সঙ্গ পাইয়া গোপীরা প্রেমে বিহ্বল হইল। কৃষ্ণ বহুমূর্ত্তি হইয়া গোপীদিগকে পরিতুষ্ট করিলেন, শেষে বহুমূর্ত্তি সংহরণ করিয়া রাধার নিকট গেলেন। গোপীরা কৃষ্ণকে না পাইয়া বিলাপ করিতে লাগিল। রাধা কৃষ্ণকে দেখিয়া অভিমানে প্রত্যাখ্যান করিল। কৃষ্ণ অনুনয় করিতে লাগিলেন। [এই পদটি (পৃ ১০০-০১) জয়দেবের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি" পদের অনুবাদ। ইহার পরে রাধার উক্তিসূচক অন্ততঃ একটি পদের অভাব রহিয়াছে।[২]] তাহার পর কৃষ্ণ সুর বদলাইয়া বলিলেন, আমার লক্ষ টাকার বৃন্দাবনে গাছপালা ফুল ফল ভাঙ্গিলে কেন? তাহার দাম দাও, নতুবা

কৌড়ীর আন্তরেঁ মোরে দেউ চুম্ব কোল॥

কৃষ্ণের কথায় কুপিত হইয়া রাধা বড়ায়িকে লইয়া পড়িল। তাহার পর রাধা সখীগণের দোষ দিল। কৃষ্ণ সুযোগ পাইয়া বৃন্দাবনের ক্ষতিতে অধিকতর ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। রাধা নিজের দোষ স্থালন করিতে চেষ্টা করিল। কৃষ্ণ সান্ত্বনা স্বীকার করিলেন না, বলিলেন,

১। পৃ ৯৭-৯৮, পদটিতে "অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস" ভণিতা আছে।

২। পরবর্ত্তী পদের ভণিতা-পয়ারের ' আকারণে বোলে রাধা মোরে আমুখর ' এই চরণ হইতেও তাহা অনুমান হয়। অথবা পূর্ব্ববর্ত্তী জয়দেবের অনুবাদ পদটিই হয়ত প্রক্ষিপ্ত।

যবেঁ তিরীবধে নাহিঁ থাকে ডর।
তবেঁ আজি মারিআঁ পাঠাওঁ যমঘর ॥

রাধা অনুনয় করিয়া বলিল, তোমার আদেশেই গোপীরা ফুল তুলিয়াছে, এখন আমাকে চুরিদোষ দিতেছ কেন? দেখ, আমার হাতে ফুল ফল কিছুই নাই, কেবল এই গুটিচারি ফুল আছে, এগুলি লইয়া তোমার মনের স্বস্তি কর; গোপীরা তোমার ফুল ফল চুরি করিয়াছে, আমি কি জানি? কৃষ্ণ তখন কবিত্ব করিয়া রাধার সর্ব্বাঙ্গের সহিত বিভিন্ন ফুলের তুলনা করিয়া বলিলেন,

দেখোঁ মো ফুল তোর শরীরে।

রাধা কাতর হইয়া বলিল,

সকল পুরুষ মাঝে তোহ্মে বড় নাগর, তোহ্মারে কে দিবেক উত্তর।
ছাড়হ অলঙ্গাল, না কর কচাল, এড়, যাওঁ মথুরা নগর ॥
বুঝিল বুঝিল তোহ্মার মতি। সম দেখ সকল যুবতী ॥ ধ্রু ॥

কিবা না করিল আহ্মে তোহ্মার এক বচনে লাজে দিআঁ তিলাঞ্জলি।
নিজ পতি না চাহিলোঁ, তোহ্মাক উপেখিলোঁ, সহিলোঁ সাসু-ননন্দ-গালী ॥
বিষম পুরুষজাতি কঠিনহৃদয় আতি, তাক নাহি কিছু পরকার।
ছার তিরী-জরম, শিরীষকুসুম মন, বড় মানে তিল[১] উপকার ॥
তোহ্মার নেহ সকল কমলিনীদলজল চঞ্চল দুইহো পড়িহাসে।
এড়হ আহ্মার[২] আশে, চলি জাহা নিজ বাসে— গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

কৃষ্ণ অনুনয় করিলেন। এতক্ষণে রাধার মান দূরে গেল, কৃষ্ণকে অনুযোগ করিয়া বলিল,

বিধি কৈল তোর মোর নেহে।
একই পরাণ এক দেহে ॥

১। মুদ্রিত পাঠ 'তিন'। ২। মুদ্রিত পাঠ 'আর'।

সে নেহ তিঅজ নাহিঁ সহে।
সে পুনি আহ্মার দোষ নহে॥

রাধা-কৃষ্ণের মিলন হইল। [এইখানে বৃন্দাবনখণ্ডের সমাপ্তি। প্রাপ্ত অংশে একটি পদাংশ সমেত তিরিশটি পদ আছে।]

গোপীগণের ও রাধার চিত্তরঞ্জন করিয়া কৃষ্ণ তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিলেন। তাহার পর জলকেলি করিতে কৃষ্ণের মন হইল। বৃন্দাবনের মধ্য দিয়া যমুনা নদী বহিত, তাহাতে এক দহ ছিল। সেই দহে কালিয় নাগ বাস করিত। তাহার বিষে জল বিষাক্ত হইয়াছিল। এই কালীদহে বিষাক্ত জল শোধন করিয়া তাহাতে জলকেলি করিবেন, কৃষ্ণের ইচ্ছা হইল। দহের তীরে এক কদম গাছ ছিল, কৃষ্ণ তাহাতে চড়িয়া জলে ঝাঁপ দিলেন। কৃষ্ণকে জল হইতে উঠিতে না দেখিয়া রাখাল বালকেরা কাতর হইয়া পড়িল। এমন সময়ে সেই পথ দিয়া রাধা ও গোপীরা মথুরা যাইতেছিল। রাখালগণকে বিকল দেখিয়া জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিল যে, কৃষ্ণ কালীদহে ঝাঁপ দিয়াছেন। শুনিয়া রাধা বিলাপ করিতে লাগিল। সংবাদ পাইয়া নন্দ যশোদা ও গোপেরা সেখানে ছুটিয়া আসিল এবং বিলাপ করিতে লাগিল। বলরাম মনে বুঝিলেন যে, কৃষ্ণ আত্মবিস্মৃত হইয়া মোহ পাইয়াছেন। কৃষ্ণকে আত্মজ্ঞান দিবার জন্য বলরাম দশাবতার স্তব করিতে লাগিলেন। তাহাতে

উঠিলা সত্বর নারায়ণ। বাহু-ফাল করিআঁ তখন॥
যেন তৃণ যাএ চণ্ডবাতে। নাগবন্ধ গেলা তেন মতেঁ॥

কালিয়-শিরে কৃষ্ণ নৃত্য আরম্ভ করিলেন, কালিয় সর্পের প্রাণ যায় যায় হইল। শেষে তাহার ভার্য্যা কৃষ্ণকে স্তব করিতে লাগিল। কৃষ্ণ সদয় হইয়া তাহাদিগকে অভয় দিয়া দক্ষিণ সাগরে গিয়া বাস করিতে বলিলেন। কৃষ্ণকে জল হইতে নির্ব্বিঘ্নে উঠিতে দেখিয়া গোপীরা আনন্দে অধীর হইয়া উঠিল। যশোদার স্তন হইতে দুগ্ধ ঝরিতে লাগিল। নন্দ যশোদাকে কৃষ্ণ প্রণাম করিলেন, অন্য সকলকে যথাযোগ্য সম্ভাষণ করিয়া রাধার দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া

কর যোড় করি বুলিল কাহ্নে। মোর ধরিবেহেঁ এক বচনে॥
এহার পানি খায়িতেঁ সব জনে। এ কারণে কৈলোঁ কালী-দমনে॥

সকলের নিকট অনুমতি লইয়া কৃষ্ণ কালীদহে ঘাট বাঁধাইয়া দিলেন। [এইখানে যমুনান্তর্গত-কালিয়দমনখণ্ড সমাপ্ত। ইহাতে দশটি মাত্র পদ আছে।]

একদিন রাধা সখীদিগকে ডাকিয়া যমুনায় জল আনিতে চলিল। কালীদহের কূলে গিয়া গোপীরা কৃষ্ণকে দেখিতে পাইল। কৃষ্ণকে দেখিয়া তাহারা আত্মবিস্মৃত হইয়া গেল। শেষে রাধা কৃষ্ণের নিকট গিয়া বলিল, একবার সরিয়া যাও, আমার সখীরা জল লইবে। রাধার সঙ্গে যেন কখনও পরিচয় নাই এই ভাবে কৃষ্ণ রাধার সহিত কথা-কাটাকাটি করিতে লাগিলেন [পৃ ১১১-১২]। রাধার নীরস কথায় কৃষ্ণ ভরসা না পাইয়া অনুযোগের সুর তুলিলেন,

বাহু তুলিলেঁ কেশবন্ধন ছলে।
ঘন ঘন বিকাশিলেঁ বদনকমলে॥
অঙ্গভঙ্গ কৈলেঁ কেহ্নে মোর বিদ্যমানে।
এবেঁ আলিঙ্গন দিআঁ রাখহ পরাণে॥
কিসকে ঘুচাইলে রাধা নেতের অঞ্চল।
দেখায়িলেঁ কুচভার করায়িলে বিকল॥
যমুনার তীরে রাধা কদমের তলে।
তরল করিলেঁ কেহ্নে নয়নযুগলে॥
আধ-মুখ ঢাকিলেঁ সরুঅ বসনে।
তে কারণে রাধা ধরিতেঁ নারোঁ মনে॥
যমুনা নদীর রাধা তুলিতেঁ পানি।
কেহ্নে ধীরেঁ ধীরেঁ বুইলে মধুরসবাণী॥
তোহ্মার কারণে রাধা রাখোঁ মো গোকুল।
তোহ্মে জান আহ্মার কাজের আদিমূল॥
বাতল হয়িলোঁ মো তোহ্মার দোষে।
তোরে করিতেঁ জুআএ মোর পরিতোষে॥
যমুনার তীরে থাকোঁ তোর পতিআশে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥

রাধা উত্তর দিল,

আউলাইল কুন্তল মোর সত্বরগমনে।
করযুগ তুলি তার করিলোঁ বন্ধনে ॥
শ্রমের কারণে হাস্তী হৈল ঘন-ঘনে।
গাঅ মোড়িএ কাহ্নাঞিঁ আলস্য-কারণে ॥
তোহ্মা দেখি যদি মোর বিচলিল মনে।
তবেঁ মোরে জীতে না জুআএ একখনে ॥
পবনে চলিল মোর হৃদয়বসনে।
দৈবযোগেঁ তাত তোর পড়িল নয়নে ॥
লাজ-ভয়েঁ ভৈল মোর তরল নয়নে।
সত্বরেঁ ঢাকিলোঁ মুখ দেহের বসনে ॥
যমুনা নদীর আহ্মে তুলিল পানি।
এহো দোষ নহে যেন বুয়িলো খরবাণী ॥
জীবার আন্তরে কাহ্নাঞিঁ রাখহ গোকুল।
পাপ-পামর তোর জানোঁ আদিমূল ॥
আপদ পাএ যাক না চিহ্নে আপনা।
এহা জানি তেজ কাহ্নাঞি নাগরপনা ॥
পাগল হৈলা কাহ্নাঞিঁ নিজ মতিমোষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে ॥

কৃষ্ণ তখন বড়ায়িকে সাক্ষী মানিলেন। বড়ায়ি কৃষ্ণের পক্ষ হইয়া রাধাকে কৃষ্ণের বশবর্ত্তী হইতে বলিল। রাধা কৃষ্ণের দোষ দিল। কৃষ্ণ দুঃখ করিয়া বলিলেন,

তোর মোর সুদৃঢ় নেহা। ভৈল একই পরাণ এক[১] দেহা ॥
কিছু নাহিঁ করোঁ অপরাধা। তভোঁ কোপ তোর এ বড় ধান্ধা ॥

তাহার পর রাধা-কৃষ্ণের উক্তিপ্রত্যুক্তি [পৃ ১১৪-১৫]। শেষে কৃষ্ণ সকলকে জল লইতে অনুমতি দিলেন। জল তুলিয়া রাধা কৃষ্ণের নিকট গিয়া চুপি চুপি কিছু

১। মূলে 'একই'।

শুনিবার জন্য কান পাতিল, কৃষ্ণ অমনি তাহার কপোলে চুম্বন করিলেন। রাধা ক্রুদ্ধ হইয়া দ্রুতপদে গৃহে চলিল। কৃষ্ণ অনুনয় করিতে করিতে সঙ্গে চলিলেন,

ধীরেঁ যাহা গোআলিনী শুন মোর বোল।
রহিআঁ রহিআঁ দেহ বিরহের কোল॥

রাধা বলিল, তোমার কি বিবেচনা নাই ? রাস্তায় ভালমন্দ কত লোক যাইতেছে, এ কথা শুনিলে কি মনে করিবে ; ঘরে দুর্জ্জন শাশুড়ী রহিয়াছে।

এইরূপ কথা বলিতে বলিতে রাধা গৃহে পৌঁছিল। কৃষ্ণ বড়ায়ির কাছে আসিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিতে লাগিলেন। বড়ায়ি আসিয়া রাধাকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল, তোমার কি এখনও বুদ্ধি হইল না ? কাহার পরামর্শে তুমি কৃষ্ণকে নিরাশ করিতেছ ?

কভোঁ না বুলিব আহ্মে তোর অনুচিত।
যেহো সখী দেখ তোর কেহো নহে হিত॥
আপন কাজক লাগি সবই বিকলী।
সহ্মেঞিঁ চাহেন্ত তোক রোষু বনমালী॥

সখীগণ লইয়া যমুনায় গিয়া কৃষ্ণকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিতে বড়ায়ি রাধাকে উপদেশ দিল। রাধা তাহাই করিল। তখন গ্রীষ্মকাল—

শীতল গম্ভীর জলে রহিতেঁ সুখাএ॥

কৃষ্ণ ও গোপীগণ কালীদহে জলকেলি করিতে নামিলেন। কৃষ্ণ জলে ডুব দিয়া রহিলেন। গোপীরা মনে করিল, কৃষ্ণ ডুবিয়া গিয়াছে। পরদিন প্রত্যাগমন করিয়া ভাল করিয়া অনুসন্ধান করিবে স্থির করিয়া তাহারা বিলাপ করিতে করিতে গৃহে ফিরিল। অমনি কৃষ্ণ জল হইতে উঠিলেন এবং সে রাত্রি বৃন্দাবনেই কাটাইলেন। পরদিন প্রভাতে রাধা সখীগণকে লইয়া কৃষ্ণকে খুঁজিতে আসিল। নাহিবার কাল নহে বলিয়া সকলেই এক বস্ত্রে আসিয়াছে। অতি প্রত্যূষ, নিকটে কেহ নাই মনে করিয়া তাহারা তীরে বস্ত্র রাখিয়া বিবসন হইয়া জলে নামিল। এদিকে কৃষ্ণ কদম্বতরুর পত্রান্তরাল হইতে নামিয়া আসিয়া বস্ত্রগুলি লইয়া পুনর্ব্বার গাছে চড়িলেন। কৃষ্ণ সকলকে ভৎর্সনা করিয়া শেষে বস্ত্র ফিরাইয়া দিলেন, কিন্তু রাধার

হার দিলেন না। [এইখানে সম্পাদকের মতে যমুনাখণ্ড শেষ হইল ; কিন্তু পুঁথিতে যমুনাখণ্ড বলিয়া আদ্যন্তে কোন উল্লেখ নাই। মূলে বোধ হয় ইহা পরবর্ত্তী যমুনান্তর্গত-হারখণ্ড পালার অন্তর্ভুক্ত ছিল।]

রাধা হারের জন্য বড়ায়িকে কৃষ্ণের নিকটে পাঠাইল। [এইখানে সাতখানি পাতা নাই।] রাধা কৃষ্ণের অত্যাচারের কথা যশোদাকে বলিয়া দিল। যশোদা কৃষ্ণকে ভৎর্সনা করিলেন। কৃষ্ণ বলিলেন, আমার দোষ নাই—

শুন মায় যশোদাঅ তোহ্মারে বুঝাওঁ।
ভাগে পুনি জিলাহোঁ এখুনী মরিতাহোঁ॥
কেহো ধরে ঘোড়াচুলে কেহো ধরে হাথে।
দধির পসার তুলিআঁ দেতি মাথে॥
আঅর না জায়িব মা বাছা রাখিবারে।
ষোল শত যুবতীএঁ আহ্মারে বল করে॥
যমুনার তীরে গোপীজন লআঁ রঙ্গে।
কেলি কৈল রাধা পরপুরুষের সঙ্গে॥
বুলিতেঁ চাহিলোঁ আসি রাধার দোষে।
আগেঁ আসি দোষে রাধা মোরে সেই রোষে॥
তোমার তনয় আহ্মে নান্দের নন্দন।
ধর্ম্ম ছাড়ি পাপত নাহিঁক মোর মন॥
বেআকুলী হআঁ রাধা মদনবিকারে।
দুই কান্ধ ফুলায়িল বহায়িআঁ দধিভারে॥
গরু রাখিবাক বুলোঁ যমুনার কূলে।
মামী মামী বুলিতেঁ আধিকেঁ বল করে॥
স্বরূপেঁ কহিলোঁ মা তোহ্মার পাএ।
বাসলী শিরে বন্দী চণ্ডীদাস গাএ॥

বড়ায়ি আসিয়া রাধাকে প্রবোধ দিয়া গৃহে লইয়া গেল, এবং আইহনকে বলিল, আজ রাধাকে লইয়া বহু ভাগ্যে গৃহে ফিরিয়াছি ; দামাল বলদে রাধাকে

তাড়া করিয়াছিল, রাধা ভয়ে কাঁটা বনে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল, তাই উহার বেশভূষা বিপর্য্যস্ত এবং সেই কারণে গৃহে ফিরিতে বিলম্ব হইল। আইহন বড়ায়ির প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিল। [এইখানে যমুনান্তর্গত-হারখণ্ড অথবা যমুনাখণ্ড শেষ হইল।]

যশোদাকে রাধা সকল কথা বলিয়া দেওয়াতে কৃষ্ণ বড় অপমান বোধ করিয়াছেন, তাই বড়ায়িকে বলিলেন, রাধাকে মারিয়া ফেলিতাম, কেবল তোমার খাতিরেই ছাড়িয়া দিলাম, আর আজ হইতে রাধিকার আশা ত্যাগ করিলাম। বড়ায়ি বলিল, রাধা বড় দুষ্ট, তাহাকে মদনবাণে বিদ্ধ কর, তবেই জব্দ হইবে। বড়ায়ির যুক্তিতে কৃষ্ণ সুবেশ করিয়া পুষ্পময় ধনুর্ব্বাণ লইয়া কদমতলায় বসিয়া রহিলেন। এদিকে বড়ায়ি গিয়া রাধাকে হাটে যাইতে বলিল। বড়ায়ির সঙ্গে রাধা মথুরা চলিল। যমুনা পার হইয়া বৃন্দাবনে আসিলে বড়ায়ি কৃষ্ণকে দেখিতে পাইল। কৃষ্ণের নিকট গিয়া বলিল, রাধাকে আনিয়াছি। বড়ায়ির দ্বারা কৃষ্ণ রাধাকে ক্ষমা চাহিতে বলিলেন। রাধা বলিল, ক্ষমা কিসের? কৃষ্ণ ধনুর্ব্বাণ লইয়া আসুক, তাহাকে আমি একটুকুও ভয় করি না। তাহার পর কৃষ্ণ-রাধার উক্তিপ্রত্যুক্তি [পৃ ১২৭-২৮]। কৃষ্ণ সত্যসত্যই মদনবাণ মারিতে উদ্যত জানিয়া রাধা কাকুতি করিল, কৃষ্ণ তাহার উত্তর দিলেন। তাহার পর রাধা বড়ায়িকে অনুনয় করিয়া বলিল,

> তোহ্মে যে বড়ায়ি হঅ কাহ্নাঞিঁর দূতী।
> বারেক কাহ্নের মোর করাহ পিরিতী॥
> এবার রাখহ বড়ায়ি আহ্মার পরাণ।
> লাখেকের মুদড়ী দিবোঁর হাথ-দান॥

কৃষ্ণ বাণ মারিলেন। রাধা পুষ্পশরাহত হইয়া মূর্চ্ছা গেল। বড়ায়ি কৃষ্ণকে বলিল, কেন এ কাজ করিলে? আমি তোমাকে পরিহাস করিয়া বলিয়াছিলাম মাত্র। কৃষ্ণ ভয় পাইলেন। বড়ায়ি কৃষ্ণকে স্ত্রীবধপাতক এবং কংস এই দ্বিবিধ ভয় দেখাইতে লাগিল। কৃষ্ণ বিশেষ কাতর হইয়া পড়িলেন। বড়ায়ি কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা

করিয়া বাঁধিয়া রাখিল। কৃষ্ণ বলিলেন, যথেষ্ট অপমান হইয়াছে, রাধাকে জিয়াইয়া দিতেছি, এখন

বন্ধন ঘুচাহ জুনি দেখে দেবগণে।

বড়ায়ি কৃষ্ণের বন্ধন খুলিয়া দিয়া রাধাকে শীঘ্র জিয়াইয়া দিতে বলিল। কৃষ্ণ মূর্চ্ছাপন্ন রাধাকে উদ্দেশ করিয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন[৩],

মাএর আগে কৈলি আহ্মার খাঁখার।
সব মরষিল রাধা জিঅ একবার ॥
মাহানিন্দ যাসি কেহ্নে শুন হে গোআলী।
চিআইআঁ সমতি দেহ রাধা চন্দ্রাবলী ॥
বারেক সুন্দরি রাধা শুন মোর বোল।
মিনতী করিআঁ বোলোঁ গাঅখানী তোল ॥
ছাড়িলোঁ মো মাহাদান তেজিলোঁ মো বাটে।
উঠ দধি বিচ নিআঁ মথুরার হাটে ॥

কৃষ্ণ রাধার অঙ্গ স্পর্শ করিলেন, রাধা চেতনা লাভ করিল। তালপাতার পাখায় রাধাকে বীজন করিয়া কৃষ্ণ তাহাকে যমুনার নির্ম্মল জল পান করাইলেন। পরে রাধার মন কাড়িয়া লইয়া বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া লুকাইয়া রহিলেন। রাধা বড়ায়িকে লইয়া বৃন্দাবন ঢুঁড়িয়া কৃষ্ণের সন্ধান পাইল। রাধা-কৃষ্ণের মিলন হইল। বড়ায়ি আসিয়া রাধাকে গৃহে লইয়া গেল। [এইখানে বাণখণ্ড সমাপ্ত হইল। এই খণ্ডে সাতাশটি পদ আছে।]

রাধা ও তাহার সখীগণ যমুনার ঘাটে স্নান করিতে যায়, আর কৃষ্ণ ঘাটের নিকটে বসিয়া নানা বাদ্য বাজাইতে থাকেন। রাধা ইহাতে ভুলিল না। তখন কৃষ্ণ এক অপূর্ব্ব বাঁশী গড়িলেন ;

সাতগুটি বিন্ধ তাত করি আনুপাম।
সুবর্ণের সাম্বী হিরার বান্ধিল কাম ॥
হরিষে পুরিআঁ কাহ্নাঞিঁ তাহাত ওঁকার
বাঁশীর শবদেঁ পারে জগ মোহিবার ॥

৩। চারিটি পদে।

বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধা ব্যাকুল হইয়া বড়ায়িকে সম্বোধন করিয়া বলিল,

কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি কালিনী-নই-কূলে।
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি এ গোঠ-গোকুলে॥
আকুল শরীর মোর বেআকুল মন।
বাঁশীর শবদেঁ মো আউলাইলোঁ রান্ধন॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি সে না কোন জনা।
দাসী হআঁ তার পাএ নিশিবোঁ আপনা॥
কে না বাঁশী বাএ বড়ায়ি চিত্তের হরিষে।
তার পাএ বড়ায়ি মোঁ কৈলোঁ কোন দোষে॥
আঝর ঝরএ মোর নয়নের পানী।
বাঁশীর শবদেঁ বড়ায়ি হারায়িলোঁ পরাণী॥
আকুল করিতেঁ কিবা আহ্মার মন।
বাজাএ সুসর বাঁশী নান্দের নন্দন॥
পাখি নহোঁ তার ঠাই উড়ি পড়ি জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥
বন পোড়ে আগ বড়ায়ি জগজনে জাণী।
মোর মন পোড়ে যেহ্ন কুম্ভারের পণী॥
আন্তর শুখাএ মোর কাহ্ন-অভিলাষে।
বাসলী শিরে বন্দী গাইল চণ্ডীদাসে॥

রাধা অত্যন্ত কাতর হইয়া বড়ায়িকে বলিল, কৃষ্ণকে আনিয়া আমার আশা পূর্ণ কর। বড়ায়ি বলিল, আমি বুড়া মানুষ, কি করিয়া ঘঁড়িয়াল-কুম্ভীরপূর্ণ যমুনায় পার হইব, আর বাঘ-ভালুকপূর্ণ ভয়ঙ্কর বৃন্দাবনেই বা তাহাকে খুঁজিয়া পাই কোথায়? রাধা বড়ায়িকে করুণভাবে অনুনয় করিতে লাগিল। বড়ায়ি বলিল, আগে যাহা হইয়াছে হইয়াছে, আবার পাপ করিতে চাহ কেন? রাধা

আরও কাতরতা প্রকাশ করিতে লাগিল।[১] অবশেষে বড়ায়ি সম্মত হইল। এমন সময় কৃষ্ণ বৃন্দাবনের মধ্য হইতে বংশীধ্বনি করিলেন। শুনিয়া রাধা হৃষ্ট হইয়া বড়ায়িকে পুনরায় অনুরোধ করিতে লাগিল। বড়ায়ি বলিল, কৃষ্ণ কোথায় আছে জানি না, কত ঘুরিব?

বুঢ়া মানুষক দয়া না করহ তোহ্মে॥

রাধা বলিল,

কাল কোকিল রএ[২] কাল বৃন্দাবনে।
এবেঁ কাল হৈল মোকে নান্দের নন্দনে॥
প্রাণ আকুল ভৈল বাঁশীর নাদে।
এবেঁ আসিআঁ কাহ্নাঞিঁ দরশন না দে॥
আহ্মা উপেখিআঁ গেলা নান্দের নন্দন।
তাহাত মজিল চিত না জাএ ধরণ॥
আগর-চন্দন বড়ায়ি শরীরে লেপিআঁ।
কেলি কৈল যেই বৃন্দাবনত পসিআঁ॥
নাগর কাহ্নাঞিঁ সমে বিবিধ বিধানে।
এবেঁ লআঁ চল বড়ায়ি সেই বৃন্দাবনে॥
বড়ার বৌহারী আহ্মে বড়ার ঝী।
কাহ্ন বিনি মোর রূপযৌবনে কী॥
এ রূপযৌবন লআঁ কথাঁ মোএঁ জাওঁ।
মেদনী বিদার দেউ পসিআঁ লুকাওঁ॥
মন্দপবন বহে কালিনী-নই-তীরে।
কাহ্নাঞিঁ সোঁঅরী মোর চিত নহে থিরে॥
এবেঁ আকুল কৈলে মোরে নান্দের নন্দনে।
গাইল বডু চণ্ডীদাস বাসলী-গণে॥

১। এইখানে বোধ হয় মূলে একাধিক পদ ছিল, কেন না তাহা না হইলে বড়ায়ির উক্তির ('কিসক মরিতে চাহ তোহ্মে' পৃ ১৩৯) যাথার্থ্য থাকে না।

২। অর্থাৎ রব করে।

বড়ায়ি বলিল, পূর্ব্বে নানা ভাবে কৃষ্ণের অপমান করিয়াছ, আর

এখন বোলহ রাধা আহ্মার মরণ।
এবেঁ কথাঁ পাইব আহ্মে নান্দের নন্দন॥
মোর বোল শুন রাহী ছাড় তার আশ।

রাধা বলিল, বাঁশীর নাদে আমার গৃহকর্ম্ম নষ্ট হইয়া যাইতেছে, তাহাকে না আনিলে তো আমার প্রাণ থাকিতেছে না। বড়ায়ি রাধাকে শ্লেষ করিতে লাগিল। রাধা বলিল, কাঁখে কলসী লইয়া যমুনার ধারে এই তো কত খুঁজিলাম, কিন্তু কৃষ্ণকে দেখিতে পাইলাম না; কৃষ্ণকে পাইবার মত কোন শুভলক্ষণও তো দেখিতেছি না।[১]

বড়ায়ি বলিল, অনেক তো খোঁজা হইল, সন্ধ্যা হইয়া আসিল, বাড়ী যাই চল;

বিরহে বিকল হআঁ তোহ্মার থানে।
আপনে মেলিব আসি নাগর কাহ্নে॥

উভয়ে গৃহে ফিরিল।

রাত্রিতে অকস্মাৎ কৃষ্ণ বংশীধ্বনি করিলেন। তখন আইহন ঘুমাইয়াছে।

উত্তরলী হয়িলী রাহী বাঁশীর নাদে।
বিরহেঁ বিকলী হআঁ গোয়ালিনী কান্দে॥
শ্রীনন্দনন্দন গোবিন্দ হে।
অনাথী নারীক সঙ্গে নে॥ ধ্রু॥

রাধা নাছ-দুয়ারে গেল, কিন্তু কোথায় কৃষ্ণ? সমস্ত রাত্রি এইরূপে উদ্বেগে কাটাইয়া প্রভাতে রাধা বিরহভরে মূর্চ্ছা গেল। বড়ায়ি আসিয়া মুখে জল দিয়া চেতন করাইল। সুস্থ হইলে যুক্তি দিল, চল যমুনার তীরে গিয়া কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করি:

নিন্দাউলী মন্ত্রে তাক নিন্দাইব আহ্মি।
তবেঁ তার বাঁশী লআঁ ঘর জাইহ তুহ্মি॥

১। ইহার পূর্ব্বে এক বা একাধিক পদ ছিল বলিয়া বোধ হয় [পৃ ১৪২]; এই পদটিতে -এ্যা অসমাপিকা আছে।

বড়ায়ির পরামর্শ অনুসারে রাধা কৃষ্ণের বাঁশী চুরি করিল। কৃষ্ণ বাঁশীর শোকে কাতর হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। রাধা বলিল, তুমি গোপীদিগের অপমান করিয়াছ, তাই তাহারা তোমার বাঁশী চুরি করিয়াছে, এখন

যোল শত যুবতীক কর যোড়-হাত।
তবেঁ বাঁশী পায়িবেঁ শুন জগন্নাথ ॥

কৃষ্ণ বুঝিলেন, রাধাই বাঁশী চুরি করিয়াছে। কৃষ্ণ ও রাধার তর্কাতর্কি চলিল।[১] রাধা কিছুতেই স্বীকার করিবে না, বলিল,

যবেঁ মো চুরি কৈলোঁ। হুআঁ নারী সতী।
তবে কালসাপ খাইএ আজিকার রাতি ॥
এখনে আছিল বাঁশী তোহ্মার এই ঠাএ।
আগু গেলী গোআলিনী সে বা লই জাএ ॥

তাহার পর কৃষ্ণ-রাধার উক্তিপ্রত্যুক্তি [পৃ ১৪৯]। কৃষ্ণের খেদোক্তি, রাধার উত্তর। বড়ায়ি কৃষ্ণকে উপদেশ দিল,

যোল শত রাধার সঙ্গিনী। তার থান চলহ আপুনি ॥
একেঁ একেঁ কর যোড়-হাথে। তবেঁ বাঁশী পাইবেঁ জগন্নাথে ॥

কৃষ্ণ বলিলেন, তাহাতেও যদি বাঁশী না দেয়, তবে লোকের উপহাসই পাইব। বড়ায়ি রাধার নিকট আসিয়া বাঁশীর শোকে কৃষ্ণের অবস্থা বর্ণন করিয়া বাঁশী ফিরাইয়া দিতে বলিল। রাধা কৃষ্ণকে বলিল, তোমার কথার ঠিক নাই, তুমি যদি বড়ায়ির নিকট সত্য করিয়া বল যে কদাচ আমার কথার অন্যথা করিবে না, তবে বাঁশীর খবর পাইবে। কৃষ্ণ বড়ায়ির নিকট সত্য করিলেন। রাধা বংশী প্রত্যর্পণ করিল। বাঁশী পাইয়া কৃষ্ণ হৃষ্ট হইয়া চলিয়া গেলেন ; পরে বড়ায়ি রাধাকে লইয়া গৃহে ফিরিল। [এইখানে বংশীখণ্ড সমাপ্ত। পদসংখ্যা একচল্লিশ।]

কিছুদিন কাটিয়া গেল, রাধা কৃষ্ণের দর্শন পাইতেছে না। চৈত্র মাস আসিল। রাধা বড়ায়ির নিকট বিলাপ করিতে লাগিল, সখীর কথায় সজলনলিনীদলে শুইলাম, কিন্তু দেখি যে তাহা হইতে অনল শীতল ; কৃষ্ণ আমাকে ডালি ভরিয়া ফুল পান

১। আট নয়টি পদে।

পাঠাইয়াছিল, আমি তাহা হাতেও ছুঁই নাই, উপরন্তু তোমাকে চড় মারিয়াছিলাম ; বোধ হয় তাহাতেই কৃষ্ণ বিরূপ হইয়াছে ; আমি সাগরসঙ্গমে গিয়া গায়ের মাংস কাটিয়া মকর-ভোজ দিব, তাহাতে আর পরজন্মে কৃষ্ণের সহিত বিচ্ছেদ হইবে না ; যেমন করিয়া পার, বড়ায়ি, কৃষ্ণকে আনিয়া দাও। [ইহার পরের পদটিও রাধার উক্তি (পৃ ১৫৫)। পরবর্ত্তী পদাবলী সাহিত্যে এই পদটি রূপান্তরিত ভাবে পাওয়া গিয়াছে। দুই রূপই পর-পর প্রদর্শিত হইল।]

দেখিলোঁ প্রথম নিশী সপন, শুন তোঁ বসী,
সব কথা কহিআরোঁ তোহ্মারে হে।
বসিআঁ কদমতলে সে কৃষ্ণ করিল কোলে,
চুম্বিল বদন আহ্মারে হে ॥
এ মোর নিফল জীবন এ বড়ায়ি ল।
সে কৃষ্ণ আনিআঁ দেহ মোরে হে ॥ ধ্রু ॥
লেপিয়া তনু চন্দনে বুলিআঁ তবেঁ বচনে
আড় বাঁশী বাএ মধুরে।
চাহিল মোরে সুরতী, না দিলোঁ মো আনুমতী
দেখিলোঁ মো দুঅজ পহরে ॥
তিঅজ পহর নিশী মোএঁ কাহ্নাঞিঁর কোলে বসী
নেহালিলোঁ[১] তাহার বদনে।
হসিত[২] বদন করী মন মোর নিল হরী,
বেআকুলী ভয়িলোঁ মদনে ॥
চউঠ পহরে কাহ্ন করিল আধর পান,
মোর ভৈল রতিরস-আশে।
দারুণ কোকিলনাদে ভাঁগিল আহ্মার নিন্দে—
গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

১। মুদ্রিত পাঠ 'নেহানিলোঁ'।
২। মুদ্রিত পাঠ 'ঈসত'। অথবা 'ঈষত হসিত করি' পাঠ কল্পনা করা যাইতে পারে।

প্রথম প্রহর নিশি সুস্বপন দেখি বসি,
সব কথা কহিয়ে তোমারে।
বসিয়া কদম্বতলে সে কানু করেছে কোলে
চুম্ব দিয়া বদন উপরে॥
অঙ্গে দিয়া চন্দন বলে মধুর বচন,
আর বায় বাঁশী সুমধুরে।
চাহিলেন সুরতি, নাহি দিল পাপমতি
দেখিল কৃষ্ণ দৌজি প্রহরে॥
তৃতীয় প্রহর নিশি মুই কৃষ্ণ কোলে বসি
নেহারিনু সে চাঁদ বদনে।
ঈষৎ হাসন করি প্রাণ মোর নিল হরি,
বিয়াকুল হইল মদনে॥
চতুর্থ প্রহরে কান করিল অধর পান,
মোর ভেল রতি আশোয়াসে।
দারুণ কোকিলনাদে ভাঙ্গিল আমার নিঁদে—
রস গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে॥

পুনরায় রাধার অনুনয়। বড়ায়ি বলিল, ফুল পান ফেলিয়া দিয়া অপমান করিয়াছিলে, এখন চুপ করিয়া থাক। রাধা খেদ করিতে লাগিল,

এ ধন যৌবন বড়ায়ি সবই অসার।
ছিণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ গজমুকুতার হার॥
মুছিআঁ পেলাইবোঁ মোয়ে সিসের সিন্দূর।
বাহুর বলয়া মো করিবোঁ শঙ্খচুর॥
দারুণী বড়ায়ি গো দেহ প্রাণদান।
আপনার দৈবদোষে হারায়িলোঁ কাহ্ন॥ ধ্রু॥
মুণ্ডিআঁ পেলাইবোঁ কেশ জাইবোঁ সাগর।
যোগিনীরূপ ধরি লইবোঁ দেশান্তর॥

যবেঁ কাহ্ন না মিলিহে করমের ফলে।
হাথে তুলিআ মো খাইবোঁ গরলে॥
কাহ্ন সমে সাধিতেঁ না পাইলোঁ রতিসিধি।
অঞ্চলের ধন মোর হরিলেক বিধি॥
এভোহোঁ বড়ায়ি মোর কর প্রতিকার।
আনিআঁ দিআর মোকে কাহ্ন একবার॥
মাথে শম্ভূ সম খোঁপা শিসতে সিন্দূর।
এহা দেখি কেহ্নে কাহ্ন গেলান্ত বিদূর॥
অনাথ করিআঁ মোক কাহ্নাঞিঁ পালাএ।
বাসলী শিরে বন্দি চণ্ডীদাস গাএ॥

বড়ায়ি বলিল, কৃষ্ণ অনেক মনস্তাপ পাইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া গিয়াছে, আর আসিবে বলিয়া মনে হয় না; আমি কোথায় বা খুঁজিব?[১] তাহার পর রাধা-বড়ায়ির উক্তিপ্রত্যুক্তি [পৃ ১৫৬-৫৭]। রাধা বড়ায়িকে শত পল সোনা দিয়া বলিল, কৃষ্ণকে তুমি এই সকল স্থানে খুঁজিও—বসুলের ঘর, যশোদার কোল, যমুনার কূল, গোকুলের গোচারণ-ভূমি, যমুনার ঘাট, বৃন্দাবন, গোপগণ-স্থান, সঙ্কেত-স্থান, গোপীগণের নিকট, ভাগীরথীকূল (!), সাগর গোপের ঘর, সর্ব্বলোকের নিকট। তাহাতে বড়ায়ি বলিল,

মোঞঁ ত সুন্দরী রাধা অতি বড় বুঢ়ী ল, বেড়ায়িতেঁ মোতে বল নাহিঁ।
মোঞঁ যে বোলোঁ উত্তর তাত আনুমতি কর, আপনেঞিঁ চাহত কাহ্নাঞিঁ॥
রাধা ল, না ঠেলিহ বচন আহ্মারে।
যে পথেঁ উদ্দেশ পাহা সে পথেঁ আপনে যাহা, তবে কাহ্নাঞিঁ মেলিব তোহ্মারে॥ ধ্রু॥
চাহিতেঁ চাহিতেঁ যবেঁ সে কাহ্নুর লাগ পাহ, তবেঁ তাক বুলিহ বিনয়ে।
আঅর বোলোঁ উপাএ, ধরিহ তাহার পাএ, তবেঁ তোকে হয়িবে সদয়ে॥

[১] এই পদে "অনন্ত বড়ু চণ্ডীদাস" ভণিতা আছে।

কাহ্নের উদ্দেশ করি ভ্রমিহ মথুরাপুরী, নানা গিরিকন্দর বনে।
বড় যতন করিআঁ চণ্ডীরে পূজা মানিআঁ তবেঁ তার পাইবেঁ দরশনে
চল তোঁ মথুরাপুরী, তথাঁ তোকে পাইবে হরি, না ছাড়িহ রাধা তার পাশে।
বাসলী-চরণ শিরে বন্দিআঁ। অনন্ত বড়ু গাইল চণ্ডীদাসে।

রাধা দধিদুগ্ধবিক্রয় ছলে মথুরায় কৃষ্ণ অন্বেষণে যাইতে মন করিল। তাহার পর রাধার অনুতাপ, কেন আমি

না লয়িলোঁ[১] কাহ্নাঞিঁর তাম্বূলে ॥

বড়ায়ি বলিল, চল বৃন্দাবনে কৃষ্ণকে খুঁজি গিয়া।[২] রাধার বিলাপ করিল,

যে কাহ্ন লাগিআঁ মো আন না চাহিলোঁ বড়ায়ি, না মানিলোঁ লঘু গুরু জনে।
হেন মনে পড়িহাসে, আহ্মা উপেখিআঁ রোষে আন লঞা বঞ্চে বৃন্দাবনে ॥
বড়ায়ি গো, কত দুখ কহিব কাহিনী।
দহ বুলি ঝাঁপ দিলোঁ, সে মোর শুখাইল ল, মোঞ নারী বড় অভাগিনী ॥ধ্রু॥
নান্দের নন্দন কাহ্ন, যশোদার পো আল, তার সমে নেহা বাঢ়ায়িলোঁ।
গুপতে রাখিতেঁ কাজ তাক মোঞ বিকাসিলোঁ, তাহার উচিত ফল পাইলোঁ॥
স্বামী মোর দুরুবার গোআল বিশাল, প্রতি বোল ননন্দ বাছে।
সব গোপীগণে মোরে কলঙ্ক তুলিআঁ দিল— রাধিকা কাহ্নাঞিঁর সঙ্গে আছে।
এত সব সহিলোঁ মো কাহ্নের নেহত লাগি বড়ায়ি, মোকে নেহ কাহ্নাঞিঁর পাশে।
বাসলী-চরণ শিরে বন্দিআঁ গাইল বড়ু চণ্ডীদাসে ॥

বড়ায়ি বৃন্দাবন যাইতে সম্মত হইল। কৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করিয়া রাধা খেদ করিতে লাগিল। বড়ায়ি বলিল, কদমতলায় চল দেখি। রাধা লাসবেশ করিয়া কদমতলায় কিশলয়শয্যা পাতিয়া কৃষ্ণের প্রতীক্ষায় রহিল,

১। মুদ্রিত পাঠ 'নয়িলোঁ'। ২। স্পষ্টতঃই ইহা অন্য পালার পদ।

তরুদল চালএ পবনে।
কাহ্নু আইসে হেন তাক মানে॥

কৃষ্ণ আর আসে না দেখিয়া রাধা খেদ করিতে লাগিল।[১] বড়ায়ি বলিল, কৃষ্ণ প্রভাতে বাঁশী বাজাইয়া বনের ভিতর গেল, চল দেখি গিয়া। উভয়ে বৃন্দাবনে প্রবেশ করিয়া কৃষ্ণকে গোরু চবাইতে দেখিল। দেখিয়া রাধা মূর্চ্ছা গেল। বড়ায়ি মুখে জল দিয়া রাধার চৈতন্য করাইল। রাধা কৃষ্ণের নিকট অতীত অপবাধের জন্য ক্ষমা ভিক্ষা করিতে লাগিল,

বিরহে বিকল গোসাঞিঁ তোহ্মে বনমালী।
যবেঁ আছিলাহোঁ আহ্মে অতিশয় বালী॥
পান ফুল না লইলোঁ মাইলোঁ তোর দূতী।
সেহো দোষ খণ্ড মোর মদনমুরুতি॥
আর যত দুখ দিলোঁ কদমের তলে।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্নু না জানিলোঁ ভোলেঁ॥
বারেঁ বারেঁ তোক যত বুঝিলোঁ অহঙ্কারে।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দেব দামোদরে॥
যেথা কিছু দুখ দিলোঁ পার হৈতেঁ নাএ।
সেহো দোষ খণ্ড কাহ্নু ধরো তোর পাএ॥
আর দুখ দিলোঁ তোক বহাইলো ভার।
সেহো দোষ জগন্নাথ খণ্ডহ আহ্মার॥
না শুনিলোঁ তোর বোল লআঁ জাইতেঁ[২] পানি।
সেহো দোষ খণ্ড মোর দেবচক্রপাণি॥
আনাথী নাবীক কত থাকে অভিমান।
আলিঙ্গন দিআঁ কাহ্নু রাখহ পরাণ॥

[১] পাঁচ পদে [পৃ ১৬২-৬৪]। [২] মুদ্রিত পাঠ 'বোল আঁজাইতে'।

নাহিঁ উপেখিহ মোরে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী-গণ ॥[১]

কৃষ্ণ বলিলেন, তুমি ভার বহাইয়া আমাকে যথেষ্ট লাঞ্ছনা দিয়াছ; তোমার উপর হইতে আমার মন নিবৃত্ত করিয়াছি, তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। রাধা ফুলতঞ্চর উপেক্ষায় দুঃখ জানাইয়া কাতরতা প্রকাশ করিল। কৃষ্ণ সাধু সাজিয়া বলিলেন,

নিকটে না আইস লোক বুলিব আবোল।
দূর থাকি বোল[২] রাধা শুন মোর বোল ॥
এবেসি জানিল ভৈল কলি-অবতার।
সব জন থাকিতে ভাগিনা চাহে জার ॥
কমন ঝগড় রাধা পাতসি তোঁ।
পরনারীহরণ না করোঁ মো ॥ ধ্রু ॥
উতপতি ভৈল তোর উত্তম কুলে।
আহ্মে ত ভাগিনা তোর দেবসমতুলে ॥
সমুচিত নহে রাধা তোহ্মা সমে[৩] কেলি।
মোর পানে আল রাধা তেজহ ধামালী ॥[৪]
দূতা দিঞাঁ পাঠায়িলোঁ গলায় গজমুতী।
তবে নাম পাড়ায়িলেঁ আহ্মে আবালি-সতী ॥
এবে কেহ্নে গোআলিনী পোড়ে তোর মন।
পোটলী বান্ধিঞাঁ রাখ নহুলী যৌবন ॥
বাপ নন্দ-ঘোষ মামা আইহন বীর।
মায় যশোদা পুষিলেক দিঞাঁ ক্ষীর ॥

১। পৃ ১৬৪-৬৫। পদটিতে বংশীচৌর্য্যের অনুল্লেখ লক্ষণীয়। সম্ভবতঃ এই পালায় বংশীচৌর্য্য ছিল না।   ২। মূলে ‘বোলো’।   ৩। মূলে ‘সহ্মে’।
৪। পাঠান্তর ‘কিসক পাতসি রাধা ডোম্ব-চাণ্ডালী ॥’

তে কারণে মামী তোহ্মা তেজে বনমালী।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বন্দিঞাঁ বাসলী ॥[১]

রাধা বলিল, আমার কুটুম্ব সহোদর কেহই নাই, তুমিই একমাত্র গতি; আমার উপর কায়মনে প্রসন্ন হও। কৃষ্ণ উত্তর করিলেন,

আহোনিশি যোগ ধেয়াই। মনপবন গগনে রহাই ॥
মূলকমলে কয়িলে মধুপান। এঁবে পাইঞা আহ্মে ব্রহ্মগেআন ॥
দূর অনুসর সুন্দরি রাহী। মিছা লোভ কর পায়িতেঁ কাহ্নাঞী ॥ ধ্রু ॥
ইড়া পিঙ্গলা সুসমনা সন্ধি। মন পবন তাত কৈল বন্দী ॥
দশমী-দুয়ারে দিলোঁ কপাট। এবে চড়িলোঁ মো সে যোগ-বাট ॥
গেআন-বাণেঁ ছেদিলোঁ মদনবাণ। তে আর না ভোলো তোহ্মার যৌবন ॥
এবে দেহে মোর নাহি বিকার। অসার দেখিলো সব সংসার ॥
রাধাক বুলিল নিঠুর বাণী। নাগরবর দেব চক্রপাণি ॥
ধেআনে থাকিল নিচলমনে। গায়িল বড়ু[২] চণ্ডীদাস বাসলী-গণে ॥[৩]

রাধা মিনতি করিতে লাগিল। কৃষ্ণ বলিলেন, আমি হরি নারায়ণ মুকুন্দ মুরারি, যুগে যুগে নানা অবতারলীলা করিয়াছি; পরদার কি আমি করিতে পারি? তুমি গৃহে ফিরিয়া যাও। রাধা বলিল,

নানা তপফলে তোহ্মা মোরে দিল বিধি।
কেহ্নে ঘর জাইতে মোকে বোল গুণনিধি ॥
তোহ্মে জবে যোগী হৈলা সকল তেজিঞাঁ।
থাকিব যোগিনী হঞা তোহাঁক সেবিঞাঁ ॥
না জাইবোঁ ঘর আর তোহ্মাক ছাড়িঞাঁ।
বড় দুখ পাইলোঁ তোর বিরহে পুড়িঞাঁ ॥ ধ্রু. ॥

১। পৃ ১৬৬। পদটি মূল্যবান্। ইহাতে যে গজমোতী পাঠানোর ইঙ্গিত করা হইয়াছে তাহা অন্য পাওয়া যায় নাই। দশম চরণের পাঠান্তর থাকায় পদটি প্রাচীনতর মনে হইতেছে।

২। ছন্দের অনুরোধে 'বড়ু' পরিত্যাগ করিতে হয়।

৩। পৃ ১৬৬-৬৭। তাম্বুলখণ্ডে 'রহিবোঁ ধরি মুনি-বেশে' [পৃ ১৩] দ্রষ্টব্য।

পরাণে না মার মোরে দেব গদাধরে।
তিরি-বধভয় কেহ্নে নাহিক তোহ্মারে ॥
স্বপনে গেয়ানে মনে তোহ্মাক চিন্তিলোঁ।
তার ফল ভাল কাহ্ণাঞি তোহ্মা হইতে পায়িলোঁ ॥
হেন মনে পরিভাব জগত-ঈশর।
আহ্মাক পরাণে মাইলে কি লাভ তোহ্মার ॥
অন্নগতী ভকতী আনাথী আহ্মি নারী।
তভোঁ কেহ্নে আহ্মা পরিহরহ মুরারি ॥
এতকাল আহ্মাক তেজিতেঁ এখোখণে।
শকতি না ভৈল তোর নেহার কারণে ॥
কোন লাজে বোল এবেঁ মোক জাইতে ঘর।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী-বর ॥

কৃষ্ণ পুনরায় ভারবহনের কথা উল্লেখ করিয়া ক্ষোভ প্রকাশ করিলেন। বা[illegible] কাতরোক্তি করিল। তাহার পর কৃষ্ণ নৌকাখণ্ড বাণখণ্ড ও দানখণ্ডের ব্যাপা[illegible] উল্লেখ করিয়া রাধার দোষ দিলে রাধা বিরহে নিজের অসহায় অবস্থা জানাইল। পুনরায় কৃষ্ণ ভারবহনের উল্লেখ করিলেন; রাধা ফুলতাম্বূল অগ্রাহ্য করার জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করিল। কৃষ্ণ বলিলেন, কেন বৃথা সাধিতেছ?

যতন না কর রাধা আইহনের রাণী।
পরিহার কৈল তোক দেব চক্রপাণি ॥
ব্রহ্মণে চিন্তনে কৈলোঁ নির্ম্মল কায়ে।
তোক দেখি আরবার মন না জাএ ॥
আহোনিশি করোঁ মো যোগ-ধেয়ান।
আর কভোঁ না ভুলে তোহ্মাতে দেব কাহ্ন ॥

রাধা বলিল, আমি তো তোমার বিরহে মরা; মৃতকে মারিলে তোমার কি মহাসিদ্ধি লাভ হইবে?

কাহ্ন তোর নেহে আপনাক বড় মানোঁ।
তোত উপজিব রোষ তাক না জানোঁ॥
পুরুবেঁ জানিতোঁ যবেঁ রুষিবেহেঁ তোহ্মে।
তবেঁ না কহিতোঁ কথা যশোদাক আহ্মে॥
শরণ পসিলোঁ কাহ্ন চরণে তোহ্মারে।
যে ফল করিবেঁ মোর কর অবিচারে॥

[ইহার পরে একটি পদ ছিল বলিয়া অনুমান হয় (পৃ ১৭২)।] রাধা বলিল, কেন আর মামী মামী বলিয়া আমাকে কষ্ট দিতেছ? বিরহের জ্বালায় মরিতেছি, চন্দ্রনয়নে চাহিয়া আমাকে জিয়াও। কৃষ্ণ তখনও ফুলতাম্বূল উপেক্ষার শোক ভুলিতে পারিতেছেন না, শেষে কতকটা নরম হইয়া বলিলেন, বড়ায়ি যদি আদেশ করে তবে আমি তোমার সঙ্গে মিলিতে পারি। [ইহার পরের পদটি বডায়ির প্রতি রাধার উক্তি বটে, তবে অন্য পালার বলিয়া মনে হয়।[১] ইহার পরের ছয়টি পদও এই পালার। মূল পালার পদ ১৭৬-৭৭ পৃষ্ঠায় "কাহ্নাঞিঁক বুইল" ইত্যাদি পদে আবার অনুসৃত হইয়াছে।] কৃষ্ণের সন্ধানে যাইতে রাধা বড়ায়িকে মিনতি করিলে, বড়ায়ি ফুলতাম্বূলের কথা উল্লেখ করিয়া রাধার দোষ দিয়া নিজের অক্ষমতা জানাইল। তখন নিতান্ত শিশু ছিলাম, এই বলিয়া রাধা দোষ স্বীকার করিয়া বড়ায়িকে কৃষ্ণের সন্ধানে যাইতে নির্ব্বন্ধ করিতে লাগিল। বডায়ি ইতস্ততঃ করিতে লাগিল [পৃ ১৭৪]। পরে দুইজনে বৃন্দাবনে গিয়া কৃষ্ণের খোঁজ করিল, কিন্তু পাইল না, তখন রাধা ক্রন্দন জুড়িল। এমন সময় সেখানে নারদ মুনি আসিয়া ধ্যানযোগে জানিয়া বলিলেন, কৃষ্ণ বৃন্দাবনে কদমতলায় কুসুমশয্যায় বসিয়া আছেন। নারদের কথায় রাধা কদমতলার নিকট গিয়া দূর হইতে কৃষ্ণের দেখা পাইল, এবং আনন্দের অতিশয্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পডিল। বড়ায়ি রাধার মুখে জল দিয়া চেতন করাইল। রাধা বডায়িকে দিয়া কৃষ্ণের নিকট নিজের আর্ত্তি জানাইল। বড়ায়ি কৃষ্ণের নিকট গিয়া রাধার বিরহের দশা বর্ণনা করিল [পৃ ১৭৫-৭৬]। [এই

১। পৃ ১৭৩, 'নিশি আন্ধিআরী' ইত্যাদি পদ।

পদটি জয়দেবের "স্তনবিনিহিতমপি হারমুদারম্" পদের অনুবাদ। পরবর্ত্তী পদের প্রথম চারি ছত্রও জয়দেবের "নিন্দতি চন্দনমিন্দুকিরণম্" পদের অনুবাদ। বড়ায়ি বলিল,

ঘর বন ভৈল তার জাল সখিগণে।
নিশাসে বাঢ়ে বিরহদারুণদহনে॥
বনের হরিণী যেন তরাসিলী[১] মনে।
দশ দিশ দেখে রাধা চকিতনয়নে॥

বড়ায়ি কৃষ্ণের মাথায় হাত বুলাইয়া হাতে ধরিয়া কাকুতি করিল। কৃষ্ণ মনে মনে হৃষ্ট হইয়া বলিলেন, বেশ, রাধা বেশভূষা করিয়া আসুক আর মধুর কথা বলুক। বড়ায়ি ফিরিয়া আসিয়া রাধাকে সাজাইয়া কৃষ্ণের কাছে পাঠাইয়া দিল। রাধা-কৃষ্ণের মিলন হইল। রাধা বলিল,

উরুখানী পাতি মোরে দেহ গোবিন্দ।
শ্রম বড় পায়িল আহ্মে সুতি জাওঁ নিন্দ॥

কৃষ্ণ কিশলয়ের শয্যা পাতিলেন। রাধা কৃষ্ণের উরুর উপর মাথা রাখিয়া ঘুমাইয়া পড়িল। কৃষ্ণ বড়ায়িকে বলিলেন, আমার বিশেষ অনুরোধ তুমি রাধাকে যত্নে রাখিও, আমি মথুরা চলিলাম। এই বলিয়া কৃষ্ণ আস্তে আস্তে রাধার শির হইতে উরু সরাইয়া লইয়া মথুরা চলিয়া গেলেন।

রাধা জাগিয়া দেখিল কৃষ্ণ নাই। তখন বড়ায়িকে সম্বোধন করিয়া বিলাপ করিতে লাগিল,

মো কেহ্নে জানিবোঁ হেন এড়িঞা পালাইবে কাহ্নু,
তবে কেহ্নে কাল-ঘুম যাইবোঁ।

শেষে মিনতি করিয়া বলিল, শ্রীমধুসূদনকে আনিয়া দাও। বড়ায়ি বলিল, কৃষ্ণ এই ছিল, কোথায় গেল ? তুমি এইখানে থাক, আমি খুঁজিয়া দেখি।

রাধা বড়ায়িকে বলিল, কৃষ্ণ আসিবে স্বপ্ন দেখিলাম, কিন্তু সারা রাত কাটিল

১। মুদ্রিত পাঠ 'তরাসিনী'।

[illegible] কৃষ্ণ তো আসিল না।[1] বড়ায়ি বলিল, আমি খুঁজিতে চলিলাম, তাহাকে [illegible]ব বল। যে যে স্থানে কৃষ্ণ থাকিতে পারে তাহার সন্ধান রাধা বড়ায়িকে [illegible] দিল। বড়ায়ি সেই সকল স্থান খুঁজিয়া কৃষ্ণকে না পাইয়া রাধার নিকট [illegible] আসিল। রাধা বড়ায়ির নিকট খেদ করিতে লাগিল,

[illegible] কাহ্নের উরে শুতিলোঁ দিঞাঁ শিয়রে, দারুণ নয়নে ভৈল নিন্দে।
[illegible]ঞিব দরশন যেহ্নেন ভৈল স্বপন. জাগিঞাঁ চাহোঁ নাহিক গোবিন্দে॥

বড়ায়ি বলিল, অনেকক্ষণ হইল বনের ভিতর আসিয়াছি, চল ঘরে যাই, [illegible] লোকে জানিয়া ফেলিবে। দুই জনে তখন গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

দিনেব পর দিন, মাসের পর মাস কাটিয়া যাইতেছে, কৃষ্ণের দর্শন নাই। [illegible]ব কাছে রাধার বিলাপেব অন্ত নাই।

ফুটিল কদমফুল[2] ভরে নোআঁইল ডাল।
এভোঁ গোকুলক নাইল বালগোপাল॥
কত না রাখিব কুচ নেতে ওহাড়িআঁ।
নিদয়হৃদয় কাহ্ন না গেলা বোলাইআঁ॥
শৈশবের নেহা বড়ায়ি কে না বিহড়াইল।
প্রাণনাথ কাহ্ন মোর এভোঁ ঘর নাইল॥ ধ্রু॥
মুছিআঁ পেলায়িবোঁ বড়ায়ি শিষের সিন্দূর।
বাহুর বলয়া মোর করিব শঙ্খচূর॥
কাহ্ন বিনি সব খন পোড়এ পরাণী।
বিষাইল কাণ্ডের ঘাএ যেহ্নেন হরিণী॥
পুনমতী সব গোআলিনী আছে সুখে।
কোন দোষেঁ বিধি মোক দিল এত দুখে॥
আহোনিশি কাহ্নাঞির গুণ সোঁঅরিআঁ।
বজরে গটিল[3] বুক না জাএ ফুটিআঁ॥

১। পৃ ১৭৯-৮০। এই পদটি এবং তাহার পরের তিনটি পদ অন্য পালার।

২। 'ফুল' ছন্দ অনুসারে অতিরিক্ত। ৩। 'গঢ়িল' হইবে।

জেঠ মাস গেল আষাঢ় পরবেশ।
শামল মেঘেঁ ছাইল দক্ষিণ প্রদেশ ॥
এভোঁ নাইল নিঠুর সে নান্দের নন্দন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী-গণ ॥

আষাঢ় মাসে নব মেঘ গরজএ।
মদন[১]-কদনে মোর নয়ন ঝুরএ ॥
পাখী জাতি নহোঁ বড়ায়ি উড়ি জাওঁ তথা।
মোর প্রাণনাথ কাহ্নাঞিঁ বসে যথাঁ ॥
কেমনে বঞ্চিবোঁ রে বারিষা চারি মাস।
এ ভর যৌবনে কাহ্ন করিলে নিরাশ ॥ ধ্রু ॥
শ্রাবণ মাসে ঘন ঘন বরিষে।
শেজাত সুতিআঁ একসরী নিন্দ না আইসে ॥
কত না সহিব রে কুসুমশরজ্বালা।
হেন কালে বড়ায়ি কাহ্ন সমে কর মেলা ॥
ভাদর মাসে আহোনিশি আন্ধকারে।
শিখি ভেক ডাহুক করে কোলাহলে ॥
তাত না দেখিবোঁ যবেঁ কাহ্নাঞিঁর মুখ।
চিন্তিতে চিন্তিতে মোর ফুটি[২] জায়িবে বুক ॥
আশিন মাসের শেষে নিবড়ে বারিষী।
মেঘ বহিআঁ গেলেঁ ফুটিবেক কাশী ॥
তবেঁ কাহ্ন বিনি হৈব নিফল জীবন।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী-গণ ॥

তাহার পর রাধা বড়ায়িকে কৃষ্ণ অন্বেষণে যাইতে বলিল; বড়ায়ি উত্তর দিল, কৃষ্ণ মথুরা গিয়াছে। শেষে বড়ায়ি মথুরা যাইতে স্বীকৃত হইল।[৩] বড়ায়িকে

১। মুদ্রিত পাঠ 'মদনে'। ২। মূলে 'ফুট'।
৩। একই পদে রাধা বড়ায়ির উক্তিপ্রত্যুক্তি [পৃ ১৮৩-৮৪]।

কৃষ্ণ বলিলেন, রাধা বড় দুষ্ট, আর তাহার মুখ দেখিব না। বড়ায়ি কহে,

বুঝিতেঁ না পারেঁা কাহ্নাঞিঁ তোহ্মার চরিত।
যাচিতেঁ উপেখহ তোহ্মে সে অমৃত॥
আর কভোঁ ধিক না বুলিব চন্দ্রাবলী।
মোর বোলে ভর করি আইস বনমালী॥
আসুখিনী চন্দ্রাবলী বিকলী বিরহে।
এবেঁ তাক তেজিতে উচিত তোর নহে॥ ধ্রু॥
মোর বোলেঁ তোহ্মে তার পাশক না আসিবেঁ[২]।
পাছে কলি[৩] কাহ্নাঞিঁ বিরহ দুখ পাইবেঁ॥
ভাত না খাইলি তবেঁ তাহার কারণে।
শাকর খাইতেঁ তোহ্মে আদরাহ কেহ্নে॥
ভাঁগিল সোনার ঘট যুড়িবাক পারি।
উত্তম জনের নেহা তেহেন মুরারি॥
যে পুনি আধম জন আন্তরে কপট।
তাহার সে নেহা যেহ্ন মাটির ঘট॥
রাধিকা থাকিলী বসি আপনার ঘরে।
তোহ্মে থাকিলা আসি মথুরা নগরে॥
আসি জাই করি মোর আকুল পরাণে।
গাইল বড়ু চণ্ডীদাস বাসলী-গণে॥

কৃষ্ণ বলিলেন, আমাকে আর অনুরোধ করিও না, রাধা যে ব্যবহার করিয়াছে, তাতে তোমার কথা কাটা ঘায়ে লেবুর রসের মত লাগিতেছে; 'আমি ধন জন সবই ত্যাগ করিতে পারি, কিন্তু দুঃসহবচনতাপ সহিতে পারি না; তাহা ছাড়া,

---

১। এখানে মূলে বড়ায়িব উক্তিসূচক পদ ছিল বলিয়া বোধ হয়।
২। ছন্দের অনুরোধে 'নাসিবেঁ' পাঠ হইবে। ৩। অর্থাৎ কিন্তু।

মথুরা আইলাহোঁ তেজি গোকুলের বাস।
মন কৈলোঁ করিবোঁ মো কংসের বিনাশ ॥

[পুঁথি এইখানেই খণ্ডিত হইয়াছে। এই অংশের নাম রাধাবিরহ, তাহ পালার শীর্ষে দেওয়া আছে]

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন পুঁথিতে যদিও একাধিক স্বতন্ত্র কাব্যের অল্পবিস্তর মিশ্রণ ঘটিয়া থাকে এবং অপর কবি কিংবা গায়কের রচিত পদ কিছু কিছু ঢুকিয়া থাকে, তাহাতে বিশেষ কিছু আসিয়া যায় না। আখ্যানবস্তুতে, চরিত্রচিত্রণে, ভাবে এবং ভাষায় সংহতি রহিয়াছে; সুতরাং প্রাপ্ত কাব্যটি যে মোটামুটি একটিমাত্র কবির রচনা তাহাতে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। চণ্ডীদাস এই নাম অথবা বড়ু চণ্ডীদাস এই উপাধির অন্তরালে আত্মগোপন করিয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন নামে প্রকাশিত এই নাটগীতি কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন তিনি মহাকবি, এবং অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত মহাকাব্যলক্ষণের কিছুই ইহাতে না থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন মহাকাব্য। ধরিতে গেলে পাত্র পাত্রী ইহাতে তিনটি মাত্র—কৃষ্ণ, বড়ায়ি, রাধা। তিনটি চরিত্রই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে; তন্মধ্যে রাধাচরিত্রের বিকাশ ও পরিণতিতে কবি যেরূপ অভূতপূর্ব্ব দক্ষতা ও চাতুর্য্যের পরিচয় দিয়াছেন তাহা প্রাগাধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যে দ্বিতীয়রহিত। তাম্বূলখণ্ডে যে "চন্দ্রাবলী রাহী"র সহিত প্রথম পরিচয় হইল, সে সংসারানভিজ্ঞা, রূঢ় অথচ সত্যভাষিণী, অশিক্ষিতা গোপবালিকা। কিন্তু কবি প্রত্যেক ঘটনায় অসামান্য কৌশলে এই মূঢ় বালিকা-চিত্তের উন্মেষ ও জাগরণ দেখাইয়া যখন পাঠককে শেষ পালায় লইয়া আসিলেন, তখন দেখি সেই গোপকন্যা কখন যে শাশ্বতরসিকচিত্তবলভীর প্রৌঢ়পারাবতী[১] শ্রীরাধায় পরিণত হইয়াছেন তাহা জানিতেও পারি নাই।

বিশ বৎসর হইয়া গেল শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাব্য প্রকাশিত হইয়াছে। কিন্তু আজিও শিক্ষিত বাঙ্গালীর কথা দূরে থাক, যাঁহারা সাধারণসাহিত্যরসিক এবং

১। তুলনীয় উদ্ধবসন্দেশে

ত্বং মচ্চেতোভবনবড়ভীপ্রৌঢ়পারাবতীং তাং।
রাধামন্তঃক্রমকবলিতাং সম্ভ্রমেণাজিহীথাঃ ॥ ১১৬।

[illegible] বৈষ্ণবপদাবলীভক্ত তাঁহাদেরও দৃষ্টি কাব্যটির প্রতি কিছু মাত্র আকৃষ্ট হয় নাই। কাব্যামোদী বাঙ্গালীর পক্ষে ইহা প্রশংসার কথা নহে। তবে এই অবহেলার একটু কারণও আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বানান একটু বিশেষ রকমের, এবং ইহার ভাষাও প্রাচীন বলিয়া কিছু দুর্বোধ বটে, কিন্তু অবোধ্য নহে। অনুনাসিকের সঙ্গীন-খোঁচা এড়াইয়া, মহাপ্রাণবর্ণের কণ্টক মাড়াইয়া, অপরিচিত শব্দের লতাগুল্ম ছাড়াইয়া যিনি এই কাব্যকুঞ্জে একবার প্রবেশ লাভ করিবেন, তিনি কৃতার্থ হইবেন। ইহা অতিশয়োক্তি নহে। কাব্যটির যেটুকু পরিচয় উপরে দিয়াছি সেটুকু পড়িলেও শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মাধুর্য্যের আস্বাদ পাওয়া যাইবে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ছন্দ বেশীভাগ পয়ার, আর এই পয়ারের ধ্বনিপ্রবাহ কাটা কাটা। ভাষাও তদনুরূপ সংহত ও স্পষ্ট। যখন ঝুমুর বা তদনুরূপ নাটগীতে এই উক্তিপ্রত্যুক্তিমূলক কাব্যটি গীত বা অভিনীত হইত তখন শ্রোতৃবর্গের মাতিয়া উঠিতে যে বিলম্ব হইত না, তাহা অনুমান করিতে বিশেষ কল্পনার আবশ্যক করে না।

আর এক কথা। আধুনিক রুচির হিসাবে শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে কিছু কিছু গ্রাম্যতা দোষ আছে। ইহার জন্য কবি দায়ী নহেন, দায়ী প্রাচীনকালে স্থান-বিশেষের সাহিত্য ও শিল্পরুচি। আর গ্রাম্যতা অল্পস্বল্প নাই কোথায়? কালিদাসের কাব্যে আছে, জয়দেবের গানে আছে।

ষোড়শ শতাব্দী

দ্বাদশ পরিচ্ছেদ

ষোড়শ শতাব্দীর ভূমিকা

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষে হোসেন শাহার রাজত্বকালে বাঙ্গালাদেশে রাজনৈতিক শান্তি স্থাপিত হইল। এই যুগের এবং বাঙ্গালার ইতিহাসের সর্ব্বপ্রধান ঘটনা শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব এই সময়েই ঘটে। শ্রীচৈতন্য ১৪০৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৪৮৬ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমায় জন্মগ্রহণ করেন, আর হোসেন শাহা ১৪৯৩ খ্রীষ্টাব্দে গৌড়সিংহাসন অধিকার করেন।

হিন্দুর, বিশেষ করিয়া হিন্দুয়ানীর উপর, অত্যাচার এদিকে সেদিকে চলিলেও রাজা মোটের উপর নিরপেক্ষই ছিলেন। ইহার প্রধান কারণ হইতেছে সনাতন, রূপ, কেশব ছত্রী প্রভৃতি হিন্দু রাজকর্ম্মচারীদিগের প্রভাব। গোঁড়া মুসলমান এবং মোল্লা বা কাজি ইত্যাদির মধ্যে হিন্দুবিদ্বেষ যে ছিল না এমন নহে।[১] কিন্তু জনসাধারণের মধ্যে ধর্ম্ম লইয়া বিদ্বিষ্ট মনোভাব বিশেষ ছিল না। হিন্দু ও মুসলমান নিজ নিজ বৃত্তি লইয়া যথাসম্ভব সদ্ভাবে বাস করিত। হিন্দুরা মুসলমান কর্ম্মচারী অথবা কারিগর নিযুক্ত করিতে দ্বিধা করিত না।[২]

১। তুলনীয় শ্রীচৈতন্যভাগবতে হরিদাসের প্রতি মুলুকপতির উক্তি,

> আমরা হিন্দুরে দেখি নাহি খাই ভাত।
> তাহা ছাড় হই তুমি মহাবংশ জাত॥ ১-১৪॥

জয়ানন্দ বলিয়াছেন,

> পিরল্যা গ্রামেতে বৈসে যতেক যবন। উচ্ছন্ন করিল নবদ্বীপের ব্রাহ্মণ॥
> বিষম পিরল্যা গ্রাম নবদ্বীপের কাছে। ব্রাহ্মণে যবনে বাদ যুগে যুগে আছে॥

২। গৌড়ের সুলতান হইবার পূর্ব্বে হুসেন খাঁ সৈয়দ্ গৌড়-অধিকারী সুবুদ্ধি রায়ের কর্ম্মচারী ছিলেন।

> পূর্ব্বে যবে সুবুদ্ধি রায় ছিলা গৌড়-অধিকারী। হুসেন খাঁ সৈয়দ করে তাঁহার চাকরী॥
> দিঘী খোদাইতে তারে মন্‌সীব কৈল। ছিদ্র পাঞা রায় তারে চাবুক মারিল॥
> পাছে যবে হুসেন খাঁ গৌড়ের রাজা হৈল। সুবুদ্ধি রায়েরে তেঁহো বহু বাড়াইল॥
>
> শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, ২-২৫॥

হিন্দুর বাড়ীতে মুসলমানেরা দর্জ্জির কাজ করিত:

> শ্রীবাসের বস্ত্র সিঁয়ে দরজী যবন। প্রভু তারে নিজরূপ করাইল দর্শন॥ ঐ, ১-১৭॥

সাহিত্যের মধ্য দিয়াও উভয় সম্প্রদায়ের মিলন ঘনাইয়া আসিতেছিল। রামায়ণকাহিনী হিন্দুর মত মুসলমানও আগ্রহ এবং শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ করিত। বৃন্দাবনদাস বলিয়াছেন,

যেন সীতা হারাইয়া শ্রীরঘুনন্দনে।
নির্ভরে শুনিলে তাহা কান্দয়ে যবনে ॥ ২-৪ ॥

যবনেও যার কীর্ত্তি শ্রদ্ধা করি শুনে।
ভজো হেন রাঘবেন্দ্র প্রভুর চরণে ॥ ৩-৪ ॥

হোসেন শাহার এক সেনাপতি পরাগল খাঁ চাটিগ্রামে কবীন্দ্রকে দিয়া মহাভারত পাঁচালী রচাইয়াছিলেন। তাঁহার পুত্র ছুটি খাঁও শ্রীকর নন্দীকে দিয়া অশ্বমেধ-পর্ব্ব অবলম্বনে পাঁচালী রচনা করাইয়াছিলেন।

হিন্দুর মধ্যেও ম্লেচ্ছাচারপরায়ণ কেহ কেহ ছিল; তাহারা সমাজে ঘৃণিত হইত। জয়ানন্দ বলিয়াছেন, জগাই মাধাই ম্লেচ্ছাচার করিত, ফারসী কাব্য মসনবি পড়িত।[১] মুসলমানদিগের মত কেহ কেহ দাড়ি রাখিত, "মোজা" অর্থাৎ জুতা পরিত এবং প্রয়োজন মত বন্দুকও ধরিত।[২]

দুর্গাপূজা সেকালে প্রায় ঘরে ঘরে হইত।[৩] অন্য ধর্ম্মোৎসবের মধ্যে প্রধান ছিল মঙ্গলচণ্ডীর ও বিষহরির অর্থাৎ মনসার পূজা এবং তদুপলক্ষ্যে রাত্রি জাগিয়া

১। মসনবি আবৃত্তি করে থাকে নলবনে।
মহাপাপী জগাই মাধাই দুই জনে ॥ পৃ ৫৬ ॥
মুদ্রিত পাঠ 'মনসরিয়া বৃত্তি করে'।

২। ব্রাহ্মণে রাখিব দাড়ি পারস্য পড়িবে। মোজা পাএ নড়ি হাথে কামান ধরিবে ॥
মসনবি আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর। ডাকা চুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তর ॥ পৃ ১৬

৩। মৃদঙ্গ মন্দিরা শঙ্খ আছে সর্ব্বঘরে।
দুর্গোৎসবকালে বাদ্য বাজাবার তরে ॥ শ্রীচৈতন্যভাগবত, ২-২৩ ॥

চণ্ডীমঙ্গল ও মনসামঙ্গল পাঁচালী শ্রবণ।[১] বিত্তশালী ব্যক্তিরা পুত্রাদির জন্ম ও বিবাহোৎসবে অপর্য্যাপ্ত অর্থব্যয় করিত। ষষ্ঠী বাসলী ক্ষেত্রপাল ইত্যাদি দেবতার পূজায় লোক রত ছিল।[২]

তখনকার দিনে সাহিত্যের অবস্থা—অর্থাৎ সাধারণ লোকেব সাহিত্যিক রুচি—কেমন ছিল সে বিষয়ে চৈতন্যভাগবতে এবং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে যাহা বলা হইয়াছে তাহা মূল্যবান্। রামায়ণকাহিনী, মঙ্গলচণ্ডী ও বিষহরির পাঁচালী এবং কৃষ্ণের বৃন্দাবনলীলাকাহিনী নৃত্য ও বাদ্য সহযোগে গীত হইত।

> পূর্ব্বে দশরথভাবে এক নটবর।
> রাম বনবাসী শুনি এড়েন কলেবর ॥ শ্রীচৈতন্যভাগবত, ১-৮ ॥

সেকালে কৃষ্ণলীলা কি ভাবে গীত বা অভিনীত হইত তাহার কিছু আভাস পাওয়া যায় চৈতন্যভাগবতে।[৩] শ্রীচৈতন্য তাঁহার মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে এই অভিনয়চেষ্টা করিয়াছিলেন। কালিয়দমন গীত, শিবের গীত, দুর্গা ও কৃষ্ণের গীত প্রতিদিনের কাজকর্ম্মের মধ্যে আনন্দের যোগান দিত। এ বিষয়ে বৃন্দাবনদাসের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

> একদিন বড় এক লোকের মন্দিরে।
> সর্পক্ষতডঙ্ক নাচে বিবিধ প্রকারে ॥
> মৃদঙ্গ মন্দিরা গীত তার মন্ত্র ঘোরে।
> ডঙ্ক বেড়ি সবেই গায়েন উচ্চৈঃস্বরে ॥

১। ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥
দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি। তাহারে সেবেন সবে মহাদম্ভ করি ॥
ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে। মদ্য মাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে ॥ ঐ, ৩-৪॥
পুত্রাদির মহোৎসবে ধন করে ব্যয়। ঐ, ২-২২॥
ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে ॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন। পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন ॥
ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়। এইমত জগতের ব্যর্থ কাল যায় ॥ঐ, ১-২॥
বাসলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে। মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষ পূজা করে ॥ ঐ, ১-২ ॥

২। পূর্ব্ব পৃষ্ঠার পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৩। মধ্যখণ্ডের অষ্টাদশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য। "ক্ষণে বলে চল বড়াই যাই বৃন্দাবনে" এই ছত্রটি বড়ু চণ্ডীদাসের লেখা স্মরণ করাইয়া দেয়।

দৈবগতি তথায় আইলা হরিদাস।
ডঙ্ক-নৃত্য দেখেন হইয়া এক পাশ॥
মনুষ্যশরীরে নাগরাজ মন্ত্রবলে।
অধিষ্ঠান হইয়া নাচয়ে কুতূহলে॥
কালীদহে করিলেন যে নাট্য ঈশ্বরে।
সেই গীত গায়েন কারুণ্য-উচ্চস্বরে॥
শুনি নিজ প্রভুর মহিমা হরিদাস।
পড়িলা মূর্চ্ছিত হই কোথা নাহি শ্বাস॥ ১-১৪॥

একদিন আসি এক শিবের গায়ন।
ডম্বুর বাজায় গায় শিবের কথন॥
আইল করিতে ভিক্ষা প্রভুর মন্দিরে।
গাইয়ে শিবের গীত বেড়ি নৃত্য করে॥২-৮॥

রমা-বেশে গদাধর নাচে মনোহর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর॥২-১৮॥

জগতজননীভাবে নাচে বিশ্বম্ভর।
সময়-উচিত গীত গায় অনুচর॥২-১৮॥

বৃন্দাবনদাস আরও বলিয়াছেন যে তখনকার দিনে লোকে পালরাজদিগের কীর্ত্তিগাথা আগ্রহের সহিত শুনিত।

যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিবারে সর্ব্বলোক আনন্দিত॥৩-৪॥

পাল-নৃপতিদিগের অনেকেই ধার্ম্মিক, ন্যায়নিষ্ঠ ও কীর্ত্তিমান্ পুরুষ ছিলেন এই কারণে তাঁহাদের বিশেষ বিশেষ কীর্ত্তি গীতিবদ্ধ হইয়া লোকের মুখে মুখে ফিরিত। মালদহ জেলায় খালিমপুরে প্রাপ্ত ধর্ম্মপালদেবের তাম্রশাসনে আছে যে তাঁহার কীর্ত্তিগাথা বনে উপবনে বালবৃদ্ধযুবকের মুখে সর্ব্বত্র প্রতিধ্বনিত হইত।

গোপৈঃ সীম্নি বনেচরৈর্বনভুবি গ্রামোপকণ্ঠে জনৈঃ
ক্রীড়দ্ভিঃ প্রতিচত্বরং শিশুগণৈঃ প্রত্যাপণং মানবৈঃ।
লীলাবেশ্মনি পঞ্জরোদরশুকৈরুদ্গীতমাত্মস্তবং
যস্যাকর্ণয়তস্ত্রপাবিবলিতানম্রং সদৈবাননম্॥

সেকশুভোদয়ায় [পৃ ২০-২১] রামপালদেব সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে। কোন স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার করাতে তিনি তাঁহার একমাত্র পুত্রকে শূলে দিয়াছিলেন। তাঁহার এই ন্যায়পরায়ণতা বহুদিন পর্য্যন্ত লোকসমাজে গীত হইত।

পুরা রামপালস্যৈকপুত্রস্তেন কদাচিদ্ যোষিদ্ ধর্ষিতা। জ্ঞাত্বা স রাজা স্বপুত্রং শূলেন যোজয়ামাস। অদ্যাপি তেষাং যশো গীয়তে লোকৈ রামপালো রাজা একমেব পুত্রমপরাধিনমনপরাধিনং বা শূলেন যোজয়ামাস।

চণ্ডীদাসের উল্লেখ চৈতন্যচরিতামৃতে এবং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আছে। বৃন্দাবনদাস চণ্ডীদাসের নাম করেন নাই, তবে দানখণ্ডের উল্লেখ করিয়াছেন।[১] চৈতন্যচরিতামৃতে মালাধর বসুর শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের উল্লেখ আছে।[২] জয়ানন্দ চণ্ডীদাস ও মালাধর বসুর সহিত কৃত্তিবাসেরও নাম করিয়াছেন।[৩]

ষোড়শ শতাব্দীকে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের স্বর্ণযুগ বলা যাইতে পারে। শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবে বাঙ্গালীর জীবনে এক অপূর্ব্ব প্রেরণ আসে; তাহারই প্রতিচ্ছায়া সামসময়িক সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়া নিতান্ত একটি প্রাদেশিক এবং গ্রাম্য সাহিত্যকে সর্ব্বজনীন সাহিত্যের পথে দাঁড় করাইয়া দেয়। শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বাঙ্গালী ঘরের কোণ ছাড়িয়া সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টিপথে দাঁড়াইল। পূর্ব্বে বাঙ্গালী যে সকল প্রদেশ হইতে শিক্ষা ও সংস্কৃতি লাভ করিয়াছিল, এখন বাঙ্গালী সেই সকল প্রদেশবাসীকে তাহার নিজের অপূর্ব্ব আধ্যাত্মিক অনুভূতির

১। দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
শুনি অবধূত সিংহ পরম সন্তোষ ॥৩-৫॥

২। অষ্টম পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি। পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি॥
শ্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয়ে। গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে॥
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥ পৃ ৩॥

অংশীদার করিয়া সমধিক মর্য্যাদা লাভ করিল। বাঙ্গালীর ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ঘটনা আর কি ঘটিয়াছে ?

এতদিন বাঙ্গালীর সাহিত্য ছিল ব্রতকথা উপকথা লইয়া, বড় জোর রাধা-কৃষ্ণের প্রণয়কেলি। কিন্তু শ্রীচৈতন্যের লোকোত্তর চরিত্র বাঙ্গালীর মনঃপ্রাণ অভিভূত করিয়া ফেলিল। ছেলে-ভুলানো ছড়া উপকথা ছাড়িয়া বাঙ্গালী কবির লেখনী সামসময়িক মহাপুরুষের পবিত্র জীবনকাহিনী লইয়া মাতিয়া উঠিল। শুধু বাঙ্গালা সাহিত্য কেন, সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের ইতিহাসের পক্ষে এ অতি অদ্ভুত ব্যাপার।

শ্রীচৈতন্য এবং তাঁহার পারিষদ নিত্যানন্দ, অদ্বৈত, সনাতন, রূপ ইত্যাদির চেষ্টা ও চরিত্র বলে এবং শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম দাস ঠাকুর ও শ্যামানন্দ প্রভৃতি মহান্তের ভাবোন্মাদনায় বাঙ্গালীর জীবন বৈষ্ণবভাবাবেগে রঙাইয়া উঠিল। ফলে বাঙ্গালা সাহিত্য একেবারে বৈষ্ণব বা ভক্তি সাহিত্য হইয়া দাঁড়াইল। এমন কি, যে সকল কাব্য বিশেষ করিয়া 'বৈষ্ণব' বিষয়বস্তুঘটিত নহে, তাহাতেও বৈষ্ণবীয় ভক্তমনোবৃত্তি ও কল্পনার ছাপ সুস্পষ্ট দেখা ছিল।

বাঙ্গালী জাতির ও সাহিত্যের এই বৈষ্ণবীভবন ভাল কি মন্দ, তাহা আমাদের বিচার্য্য বিষয় নহে। জগতে একান্তভাবে ভাল কিছুই নহে। আর শ্রীচৈতন্যের ধর্ম্ম ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয়; ইহাতে অধিকারিভেদ আছে। সুতরাং ব্যাপকভাবে এই উচ্চ আধ্যাত্মিক তত্ত্বকে বিশিষ্ট ধর্ম্মমতরূপে খাড়া করিয়া প্রচার করিতে গেলে যে বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা, অনতিবিলম্বে তাহাই ঘটিল। একে বাঙ্গালীর মন বরাবরই কোমল ও ভাবাতুর; সে মন চিরদিনের মত ভক্তি-প্রবণ এবং সেই হেতু যথেষ্ট দুর্ব্বল রহিয়া গেল।

সেকশুভোদয়ার কথা একাধিকবার উল্লেখ করিয়াছি, এবং ইহা হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়াছি। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালা গদ্য যে কিরূপ ছিল, সেকশুভোদয়াতে তাহার কিছু প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়। সেকশুভোদয়ার ভাষা অশুদ্ধ সংস্কৃত হইলেও ইহার কাঠামো এবং বাগ্‌ভঙ্গি বাঙ্গালা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

ইহাতে বাঙ্গালায় রচিত কয়েকটি ছড়া এবং একটি গীত আছে। ধর্ম্মসম্পৃক্ত ... এমন বাঙ্গালা রচনা প্রথম এইগুলিতেই পাইতেছি। যেমন,

রাম রাজা বর্ত্তে ইন্দ্র বর্ষে জল।
যে বৃক্ষ রোয়ে সে অবশ্য ধরে ফল॥
যে বৃক্ষ রোয়ে তার অবশ্য করিয়ে আশ।
যদি বা শীঘ্র ফলে তবে তু হয় ছয় মাস॥ পৃ ৬৫॥

যে গীতিকবিতাটি আছে, সেটি পুরাতন বাঙ্গালা লৌকিক গীতের একমাত্র নিদর্শন বলিয়া অত্যন্ত মূল্যবান্। কবিতাটি এখানে উদ্ধৃত করা গেল। এই সম্পর্কে যে গল্পটি আছে কৌতূহলী পাঠক তাহা পড়িয়া দেখিতে পারেন [পৃ ১০৪-০৬]।

ভাটীয়ালী-রাগেণ গীয়তে।

হঙ যুবতী পতিয়ে হীন। গঙ্গা সিনায়িবাক জাইয়ে দিন॥
দৈবনিয়োজিত হৈল আকাজ। বায়ু না ভাঙ্গ ছোট গাছ॥
ছাড়ি দেহ আজুঁ[১] মুঞি জাঙ ঘর। সাগরমধ্যে লোহার গড়॥ধ্রু॥
হাত যোড় করিঞা মাঙ্গো দান। বারেক মহাত্মা রাখ সম্মান॥
বড সে বিপাক আছে উপায়। সাজিয়া গেইলে বাঘে না খায়॥
পুনঃ পুনঃ পায়ে পড়িয়া মাঙ্গো দান। মধ্যে বহে স্বরেশ্বরী গাঙ্গ॥
শ্রীখণ্ডচন্দন অঙ্গে শীতল। রাত্রি হৈলে বহে অনল॥
পীন পয়োধর বাঢ়ে আর[২]। প্রাণ যায় না গেল বহিঞাঁ ভার॥
নয়ন বহিঞাঁ পড়ে নীর [নিতি[৩]]। জীয়ে ন প্রাণী পলায়ে ন ভীতি॥
আশেপাশে শ্বাস[৪] করে উপহাস। বিনা বায়ুতেঁ ভাঙ্গে তালের গাছ॥
ভাঙ্গিল তাল লুম্বিল রেখা। চল জাই[৫] সখি পলাইল শঙ্কা॥

১। মূলে 'কাজু'। ২। ঐ 'আগ'। ৩। মূলে নাই।
৪। মূলে 'খাস'। ৫। ঐ 'জাহ'।

ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণবগীতি কবিতা বা পদাবলী

গীতিকাব্যপ্রবণতা বাঙ্গালা সাহিত্যের বিশিষ্টতম ধর্ম্ম। জয়দেব গীতিকবি, চর্য্যাপদরচয়িতারাও গীতিকবি। চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে পালা-বদ্ধভাবে গীতিকাব্য রচিত হইত। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে অসংবদ্ধ গীতি-কবিতা রচনার প্রথা পুনঃ প্রবর্ত্তিত হয়। মৈথিল কবি বিদ্যাপতির পদ এই সময়ে শিক্ষিতসমাজে বিশেষ প্রচারিত হইয়াছিল। তাহারই অনুকরণে বাঙ্গালী ভাঙ্গা মৈথিল ভাষায় রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদরচনা করিতে স্বরু করিল। এই আধা-বাঙ্গালা আধা-মৈথিল রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক পদাবলীর ভাষা ব্রজবুলি নামে পরিচিত। এ বিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা মৎপ্রণীত A History of Brajabuli Literature পুস্তকের প্রথম অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্ববর্ত্তী প্রধান গীতিকবি ছিলেন দুইজন। একজন মহাকবি বড়ু চণ্ডীদাস। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ছাড়াও ইনি যে অসম্বদ্ধ গীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন তাহা একেবারে অস্বীকার করা চলে না। অপর কবি, বিদ্যাপতি, বাঙ্গালা দেশে জন্মগ্রহণ না করিলেও এবং বাঙ্গালা ভাষায় গান না লিখিলেও বাঙ্গালীরই কবি ছিলেন, বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে ইঁহার স্থান অক্ষয় হইয়া বিরাজ করিবে। বাঙ্গালীই ইঁহার কবিতার যথার্থ আস্বাদ গ্রহণ করিয়াছে, এবং বাঙ্গালী বৈষ্ণব মহান্তেরাই ইঁহার পদ গান করিয়া অনুকরণ করিয়া পদসংগ্রহে স্থান দিয়া ইঁহার কবিতাকে স্থায়িত্ব দান করিয়াছে। শ্রীচৈতন্য বিদ্যাপতির পদ মুগ্ধ হইয়া শুনিতেন—ইহাই বিদ্যাপতির কবিতাকে মহাকালের হস্ত হইতে কতকপরিমাণে রক্ষা করিয়াছে, একথা বলিলে আশা করি অতিশয়োক্তি হইবে না। আজকাল অবশ্য মিথিলাবাসীরা বুদ্ধিমান্ হইয়াছেন, তাঁহারা বাঙ্গালী কবি গোবিন্দদাস কবিরাজকেও আত্মসাৎ করিতে চান। কিন্তু ইঁহারা ভুলিয়া

লিখিয়াছেন যে, গ্রীয়ার্সন প্রাণপণ চেষ্টা করিয়া অল্প কয়েকটি পদ মাত্র মিথিলা হইতে সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন।

বিদ্যাপতির সম্বন্ধে অল্প কিছু বলা বোধ হয় এখানে অনুপযুক্ত হইবে না। মিথিলার শ্রেষ্ঠ এবং একমাত্র কবি বিদ্যাপতি চতুর্দ্দশ শতাব্দীর শেষে জন্মগ্রহণ করেন, এবং পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে তাঁহার মৃত্যু হয়। বিদ্যাপতির জন্ম ও মৃত্যুকাল ঠিক করিয়া জানিবার উপায় নাই। তবে ইনি স্বীয় পদের ভণিতায় যে সকল তীরভুক্তি-রাজের নাম করিয়াছেন তাহা হইতে ইঁহার বর্ত্তমানকাল মোটামুটি ধরা যায় পঞ্চদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ। রাজা শিবসিংহ বিদ্যাপতিকে বিসফী নামক গ্রাম ২৯৩ লক্ষ্মণাব্দে দান করিয়াছিলেন—এই মর্ম্মে যে অনু-শাসনখানি পাওয়া গিয়াছে, বিশেষজ্ঞগণ সেটি জাল বলিয়াই স্থির করিয়াছেন।

পদাবলী ছাড়া বিদ্যাপতি রচিত কয়েকটি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে; তাহার মধ্যে প্রধান হইতেছে অবহট্‌ঠ ভাষায় রচিত কীর্ত্তিলতা এবং সংস্কৃতে রচিত পুরুষপরীক্ষা।

বিদ্যাপতির কয়েকটি পদের ভণিতায় লছিমাদেবীর উল্লেখ আছে। ইহা শিবসিংহের মহিষীর নাম হইতে পারে, অথবা রাজলক্ষ্মীকে বুঝাইতে পারে। বাঙ্গালা দেশে সহজপন্থী সাধকেরা বিদ্যাপতিকে নব-রসিকের অন্যতম করিয়া লছিমাদেবীকে তাঁহার সাধনসঙ্গিনী বানাইয়াছেন। সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ে লছিমা রাজার ভার্য্যা নহেন, কন্যা।

লছিমা নৃপতেঃ কন্যা সক্তো বিদ্যাপতিস্ততঃ॥

যাহারা বিদ্যাপতির পদাবলী সংগ্রহ অথবা সঙ্কলন করিয়াছেন, তাঁহারা শুধু বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত পদগুলি লইয়াই ক্ষান্ত হন নাই, কবি বল্লভ, কবি শেখর, কবি কণ্ঠহার ইত্যাদির পদগুলিও বিদ্যাপতির বলিয়াই গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ বিদ্যাপতি যে এইসব ভণিতার পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন এমন প্রমাণ কিছু নাই, বরঞ্চ উল্‌টা প্রমাণ আছে যে এই পদগুলি স্বতন্ত্র কবির রচনা।[১]

---

[১] HBL, পৃ ১৪৬-৪৭, ১৬৩, ১৬৪-৬৬, ২০৭-০৯, ২০৯ ১০, ৪৯৩।

এমন কি বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত পদগুলি যে সবই মৈথিল বিদ্যাপতির রচিত এমন কথাও বলা এখন চলে না। ষোড়শ শতাব্দীতে শ্রীখণ্ডে কবিরঞ্জন নামে এক কবি ছিলেন; ইঁহার নামান্তর বা উপাধি ছিল "বিদ্যাপতি"।[১] বিদ্যাপতি ভণিতায় ইনি ভাল ভাল ব্রজবুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন। বিদ্যাপতি ভণিতাযুক্ত সে সকল বাঙ্গালা পদ পাওয়া গিয়াছে,[২] সেগুলি সম্ভবতঃ ইঁহারই রচিত।

পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদ কিংবা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদ হইতে ব্রজবুলিতে পদরচনার প্রথা বাঙ্গালা আসামী ও উড়িয়া ভাষায় প্রায় একই সঙ্গে প্রবর্ত্তিত হয়। বাঙ্গালা দেশে রচিত প্রাচীনতম পদটির ভণিতায় হোসেন শাহার উল্লেখ আছে, সুতরাং এটি ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল। আসামে শঙ্করদেব ব্রজবুলি পদরচনা প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। ইনি ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে দেহরক্ষা করেন। উড়িষ্যায় প্রাপ্ত প্রাচীনতম ব্রজবুলি পদ হইতেছে রামানন্দ রায় কর্ত্তৃক রচিত শ্রীচৈতন্যের আস্বাদিত এবং চৈতন্যচরিতামৃতে [২-৮] উদ্ধৃত সুবিখ্যাত "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল" ইত্যাদি পদ। এই পদটি ১৫০৪ হইতে ১৫১১ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল।[৩]

বাঙ্গালা দেশে ব্রজবুলিতে পদরচনা সবেগে চলিয়াছিল ষোড়শ সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়া। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেও প্রাগাধুনিক সাহিত্যধারার জের হিসাবে ব্রজবুলির চর্চ্চা হইত। পরে রবীন্দ্রনাথের হস্তে ইহার পুনঃপ্রবর্ত্তন ঘটে।

ব্রজবুলি তথা বাঙ্গালা বৈষ্ণব পদাবলী বিষয়ে বিশেষ আলোচনা মদীয় A History of Brajabuli Literature গ্রন্থে দ্রষ্টব্য। বর্ত্তমান পরিচ্ছেদে দিগ্‌দর্শন-মাত্র করা যাইতেছে। বৈষ্ণব গীতিকবিদিগের সম্পূর্ণ আলোচনা করিলে স্বতন্ত্র গ্রন্থ হইয়া দাঁড়াইবে।

শ্রীচৈতন্যবিষয়ে পদ রচনা ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদেই সুরু হয়। বৃন্দাবন-

১। HBL, পৃ ১০৭-০৮, ১৪৪-৪৬, ৪৯৫।

২। ব-সা-প-প ৪১, পৃ ৯৭-৯৮।

৩। HBL, পৃ ২৫, বঙ্গশ্রী ১৩৪১ আষাঢ়, পৃ ৭৯৯।

সেসব উক্তি যথার্থ হইলে বলিতে হয়, অদ্বৈত প্রভুর রচিত দুই ছত্রই এ বিষয়ে আদি রচনা।

আপনে অদ্বৈত চৈতন্যের গীত করি।
বলিয়া নাচেন প্রভু জগত নিস্তারি॥
শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণাসাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর॥
অদ্বৈতসিংহের শ্রীমুখের এই পদ।
ইহার কীর্ত্তনে বাড়ে সকল সম্পদ॥ ৩-৯॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদীতে প্রেমদাস বলিয়াছেন যে, বংশীবদনের একটি ব্রজবুলি পদ নীলাচলে মহাপ্রভুর সান্নিধ্যে গীত হইয়াছিল।[১] এ বিষয়ে ব্যাপকভাবে পদরচনায় বংশীবদন, নরহরি সরকার এবং বাসুদেব ঘোষই অগ্রণী।

শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভু এবং অদ্বৈত প্রভুর পারিষদ ও অনুচরবর্গের অনেকেই পদকর্ত্তা ছিলেন। এখানে ইঁহাদের শুধু নাম করা গেল। প্রধান প্রধান কবিদিগের সম্বন্ধে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত আলোচনা পরে করা যাইতেছে।

মুরারি গুপ্ত, নরহরি সরকার, বংশীবদন চট্ট, বাসুদেব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ আচার্য্য, বাসুদেব দত্ত, শিবানন্দ সেন, রামানন্দ বসু, চন্দ্রশেখর দাস, আচার্য্য চন্দ্র, পরমানন্দ গুপ্ত, পুরুষোত্তম দাস, বৃন্দাবন দাস, বলরাম দাস, পরমেশ্বর দাস, অনন্ত দাস, আত্মারাম দাস, কানুরাম দাস ইত্যাদি।

তিন প্রভুর পারিষদ ও অনুচরবৃন্দের ভক্ত বা শিষ্যের মধ্যেও অনেক গীতি-কবি উদ্ভূত হইয়াছিলেন। যথা, নয়নানন্দ মিশ্র, যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী, শিবানন্দ চক্রবর্ত্তী, উদ্ধবদাস, জগন্নাথদাস, লোচনদাস, কবিরঞ্জন, শেখর রায়, কবিবল্লভ, লক্ষ্মীকান্তদাস, জ্ঞানদাস, রামচন্দ্র গোস্বামী, চৈতন্যদাস, দেবকীনন্দনদাস, শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তমদাস ইত্যাদি।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ হইতে এই কবিদিগকে মোটামুটি তিন সম্প্রদায়ে বিভক্ত করা যাইতে পারে—(১) শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়, (২) শ্রীনিবাস আচার্য্যের

১। HBL, পৃ ৭০-৭১, ৪৯০।

সম্প্রদায়, (৩) নরোত্তমদাসের (খেতরীর) সম্প্রদায়। বলা বাহুল্য, রচনাভঙ্গিতে বা বিষয়বস্তুতে এই তিন সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনই পার্থক্য ছিল না। তবে প্রথমোক্ত সম্প্রদায়ের কোন কোন কবি একটু সহজিয়ামতের পক্ষপাতী ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন যে ব্রজবুলি পদটি পাওয়া গিয়াছে, তাহার ভণিতায় যশোরাজ খানের নাম আছে। ভণিতার ত্রিপদীটিতে গৌড়াধিপ 'হুসন'-এর নাম আছে। এই 'হুসন' সুলতান হোসেন শাহা ব্যতীত আর কেহ নহেন। সুতরাং পদটি হোসেন শাহার রাজত্বকালে লিখিত হইয়াছিল, সন্দেহ নাই। হোসেন শাহা ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। এই পদটিও তাহা হইলে খ্রীষ্টীয় ১৪৯৩ হইতে ১৫১৯ সালের মধ্যে লিখিত হইয়াছিল।

গৌড়েশ্বরের উল্লেখ হইতে বোঝা যায় যে, কবি গৌড়ের সুলতানের কর্ম্মচারী ছিলেন। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত রামগোপালদাসের রাধাকৃষ্ণ-রসকল্পবল্লী গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে, যশোরাজ খান শ্রীখণ্ডনিবাসী বৈদ্যজাতীয় ব্যক্তি ছিলেন।[১]

এই পদটি রামগোপালদাসের পুত্র পীতাম্বরদাস প্রণীত রসমঞ্জরী[২] গ্রন্থে উদ্ধৃত হইয়াছে। অন্য কোথাও পাওয়া যায় নাই। পদটি যশোরাজ খান-রচিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এক পয়োধর চন্দন-লেপিত,
আর পয়োধর গোর।
হিম-ধরাধর কনক-ভূধর
কোরে মিলল জোর॥
মাধব তুয়া দরশন কাজে।
আধ-পদচারি করত[৩] সুন্দরী
বাহির দেহলী মাঝে॥

১। ব-সা-প-প, ৩৭ পৃ ১১৭। ২। ব-সা-প কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৩১২)।
৩। পাঠান্তর 'করিঞা'।

ডাহিন লোচন কাজরে রঞ্জিত
ধবল রহল বাম।[১]
নীল ধবল কমল যুগলে[২]
চাঁদ পূজল কাম ॥[৩]
শ্রীযুত হুসন[৪] জগত-ভূষণ
সোই ইহ রস জান।[৫]
পঞ্চগৌড়েশ্বর ভোগ-পুরন্দর
ভণে যশোরাজ খান ॥

শ্রীচৈতন্যের একজন মুখ্য ভক্ত ছিলেন মুরারি গুপ্ত। ইনি সংস্কৃতে মহাপ্রভুর একখানি জীবনী লিখিয়াছিলেন। বইটির নাম শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইলেও ইহা মুরারি গুপ্তের কড়চা নামেই সমধিক প্রসিদ্ধ। এইটিই শ্রীচৈতন্যের জীবনী-গ্রন্থের মধ্যে প্রাচীনতম পুস্তক।

ইহার পূর্ব্বে মুরারি গুপ্ত বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলিতে কতকগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন।[৬] এইরূপ পদের সংখ্যা সাত আটটির বেশী হইবে না। ইহার মধ্যে দুইটি পদ অত্যন্ত চমৎকার, সে দুইটিকে বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কবিতা-গুলির অন্তর্ভুক্ত করিতে হয়। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পদ দুইটি যদিও পদ-কল্পতরুতে [৭৫১, ১৬৯৯] সংগৃহীত আছে তথাপি কি বৈষ্ণব সাহিত্যরসিক কি সাধারণ পাঠক কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই। নিম্নে পদ দুইটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রথম পদটি সখীদের প্রতি রাধার উক্তি, দ্বিতীয় পদটি প্রবাসস্থ কৃষ্ণের নিকট দূতীর উক্তি কিংবা রাধারই স্বগত উক্তি।

১। পাঠান্তর 'রহল কর বাম'। ২। পাঠান্তর 'কমল দুই চাঁদ'
৩। পাঠান্তর 'পূজল কত কোটি কাম'। ৪। মূলে 'হুসন'।
৫। পাঠান্তর 'সোহ এ রস জান'।
৬। কথং ত্বং কৃতবান্ বৈদ্য গীতমধ্যাত্মতৎপরম্।
জীবিতুং যদি বাঞ্ছাস্তি প্রেম্নি বা তে হরেঃ স্পৃহা ॥
তদা গীতং পরিত্যজ্য কুরু শ্লোকং হরেঃ স্বয়ম্।
তচ্ছ্রুত্বা প্রাহ তং দেবং বিনয়েন ভিষক্ সুধীঃ ॥
মুরারি গুপ্তের কড়চা, ২-৪-২২, ২৩।

সখি হে, ফিরিয়া আপন ঘরে যাও ।
জীয়ন্তে মরিয়া যে আপনা খাইয়াছে,
তারে তুমি কি আর বুঝাও ॥
নয়ন-পুতলী করি লইলোঁ মোহন রূপ,
হিয়ার মাঝারে করি প্রাণ ।
পিরীতি-আগুনি জ্বালি সকলি পোড়াইয়াছি
জাতি কুল শীল অভিমান ॥
না জানিয়া মূঢ়লোকে কি জানি কি বলে মোকে,
না করিয়ে শ্রবণগোচরে ।
স্রোত-বিথার জলে এ তনু ভাসাইয়াছি,
কি করিবে কুলের কুকুরে ॥
খাইতে শুইতে রইতে আন নাহি লয় চিতে,
বন্ধু বিনে আন নাহি ভায় ।
মুরারি গুপতে কহে, পিরীতি এমতি হৈলে
তার যশ তিন লোকে গায় ॥

নিম্নে উদ্ধৃত পদটি সত্যসত্যই অপূর্ব্ব। আমার মনে হয়, অর্থ-গৌরবের জন্যই এই চমৎকার পদটি সাহিত্যরসিকদিগের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে পারে নাই।

কি ছার পিরীতি কৈলা, জীয়ন্তে বধিয়া আইলা,
বাঁচিতে সংশয় ভেল রাই ।
শফরী সলিল বিন গোঙাইব কত দিন,
শুন শুন নিঠুর মাধাই ॥
ঘৃত দিয়া এক রতি জ্বালি আইলা যুগবাতি,[১]
সে কেমনে রহে অযোগানে ।
তাহে সে পবনে পুন নিভাইল বাসোঁ হেন,[২]
ঝাট আসি রাখহ পরাণে ॥

১। যে বাতি এক যুগ ধরিয়া জ্বলিবে, অর্থাৎ সুবৃহৎ প্রদীপ।
২। অর্থাৎ আমার এরূপ মনে হইতেছে।

বুঝিলাম উদ্দেশে সাক্ষাতে পিরীতি তোষে,
স্থান-ছাড়া বন্ধু বৈরী হয়।
তার সাক্ষী পদ্ম ভানু, জল ছাড়া তার তনু
শুখাইলে পিরীতি না রয়॥
যত সুখে বাঢ়াইলা তত দুখে পোড়াইলা,
করিলা কুমুদবন্ধু-ভাতি।[১]
গুপ্ত কহে, একমাসে দ্বিপক্ষ ছাড়িল দেশে,
নিদানে হইল কুহূ-রাতি॥[২]

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর শ্রীচৈতন্যের একজন প্রধান পারিষদ ছিলেন। গৌড় দেশে বৈষ্ণবধর্ম্মপ্রচারে ইঁহার যথেষ্ট কৃতিত্ব ছিল। ইনি একজন ভাল পদকর্ত্তাও ছিলেন। ইঁহার রচিত অনেকগুলি পদ পরবর্ত্তীকালে চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। নরহরি সরকারের ধর্ম্ম ও সাহিত্যিকপ্রচেষ্টা সম্বন্ধে অন্যত্র বিশদভাবে আলোচনা করিয়াছি।[৩]

পঞ্চদশ শতাব্দী হইতেই শ্রীখণ্ড বাঙ্গালাদেশে সাহিত্যচর্চ্চার একটি প্রধান কেন্দ্র হইয়া পড়িয়াছিল। শ্রীখণ্ডের সহিত গৌড়-দরবারের যোগাযোগ ছিল ঘনিষ্ঠ; শ্রীখণ্ডের বৈদ্য অধিবাসীদিগের অনেকেই গৌড়-দরবারের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। পঞ্চদশ শতাব্দীতে গৌড়-দরবারে বাঙ্গালা সাহিত্যিক বিশেষ সমাদর পাইতেন। আমি অনুমান করি, কৃষ্ণায়ণ কাব্য ও কবিতা রচনার প্রথা গৌড় হইতে উদ্ভূত হয়, অথবা গৌড় মারফৎ বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত হয়। পঞ্চদশ শতাব্দীতে গৌড়ের

১। অর্থাৎ কুমুদবন্ধুর কিনা চন্দ্রের দশা করিলে। চন্দ্র যেমন এক পক্ষ ধরিয়া বৃদ্ধি পায়, কিন্তু তার পরপক্ষেই আবার ক্ষয় পাইতে থাকে, সেইরূপ পূর্ব্বে তুমি আমাকে (রাধাকে) স্নেহ করিয়া বাড়াইয়া এখন বিরহে পোড়াইতেছ।

২। অর্থাৎ একমাসের মধ্যে চন্দ্র দেশ ছাড়িল, অর্থাৎ নিঃশেষে বিনষ্ট হইল, আর নিদানে রোগের সঙ্কটাবস্থায় অমাবস্যা আসিয়া উপস্থিত হইল। পীড়ার সঙ্কট অবস্থায় অমাবস্যা পড়িলে রোগীর জীবনের আশঙ্কা থাকে। এই উৎপ্রেক্ষাটি হইতে বুঝা যায় যে, কবি বৈদ্য ছিলেন।

৩। ব-সা-প-প ৪০, পৃ ১৫-৩৬।

সংস্পর্শে আসিয়া অনেকের কাব্য বা পদ রচনার দিকে মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। ইঁহাদের মধ্যে মালাধর বসু, যশোরাজ খান এবং কবিরঞ্জন প্রধান।

ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদ হইতে মুকুন্দদাস, নরহরি ও রঘুনন্দন এই তিনজনের প্রভাবে শ্রীখণ্ড গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের একটি বিশিষ্ট কেন্দ্র হইয়া দাঁড়ায়। শ্রীখণ্ডের মহান্তদিগের মতবাদে প্রথম হইতেই কিছু বিশিষ্টতা বা স্বাতন্ত্র্য ছিল।[১] নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয় শ্রীখণ্ডে গৌরনিত্যানন্দের বিগ্রহ স্থাপন করিয়াছিলেন; ইনি গৌরাঙ্গপূজার অন্যতম প্রবর্ত্তক। ইঁহার রচিত শার্দ্দূলবিক্রীড়িত ছন্দে গ্রথিত ঊনপঞ্চাশটি শ্লোক সমন্বিত গৌরাঙ্গাষ্টমালিকা নামে গৌরাঙ্গপূজা-বিষয়ক একটী পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[২]

শ্রীখণ্ড অঞ্চল এককালে শাক্ততান্ত্রিকপূজার পীঠস্থান ছিল। নরহরি ও রঘুনন্দনের সাধনায় কোনরূপ তান্ত্রিকতা বা গুহ্যসাধন ছিল বলিয়া মনে হয় না। কিন্তু স্থানমাহাত্ম্যে তাঁহার কোন কোন শিষ্য এবং অনুশিষ্যের সাধনা তান্ত্রিক মতবাদ ও সাধনার দ্বারা যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছিল। ইহারই ফলে এই অঞ্চলে শ্রীখণ্ডের শিষ্যদিগের লিখিত অনেকগুলি বৈষ্ণব সহজমতের নিবন্ধ ও পদ পাইতেছি।

নরহরি সরকার অনেকগুলি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক এবং গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ রচনা করিয়া ছিলেন। তাহা ছাড়া ইনি কয়েকটি সাধনবিষয়ক নিবন্ধ লিখিয়াছিলেন।[৩] এইগুলি সম্ভবতঃ সংস্কৃতে লিখিত হইয়াছিল।

নিম্নে উদ্ধৃত পদটি পদামৃতসমুদ্রে [পৃ ৪৪৫] এবং অন্ততঃ একটি পুঁথিতে নরহরির ভণিতায় আছে। পদটি পরবর্ত্তী কালের পুঁথি এবং গ্রন্থে চণ্ডীদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়। পদামৃতসমুদ্রে নরহরি চক্রবর্ত্তীর কোন পদ থাকিবার কথা নহে, এবং নাই-ও। সুতরাং প্রাচীনতম গ্রন্থের সাক্ষ্য অনুসারে ইহা নরহরি সরকার মহাশয়ের রচনা বটে।

কিনা হৈল সই মোরে কানুর পিরীতি।
আঁখি ঝুরে পুলকেতে প্রাণ কাঁদে নিতি॥

১। ১৩৪০ সালের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা বঙ্গশ্রী পত্রিকায় মৎ-লিখিত "নরহরি সরকার ও শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়" প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ২। ঐ, পৃ ৫৭৪-৭৫। ৩। HBL, পৃ ৩২।

খাইতে সোয়াথ নাই নিন্দ গেল দূরে।
নিরবধি প্রাণ মোর কানু লাগি ঝুরে॥
যে না জানে এই রস সেই আছে ভাল।
মরমে রহল মোর কানু-প্রেম-শেল॥
নবীন পাউষের মীন মরণ না জানে।
শ্যাম-অনুরাগে চিত ধৈরজ না মানে॥
আগমে পিরীতি মোর নিগমে ত সার।
কহে নরহরি মুঞি পড়িনু পাথার॥

নিম্নে উদ্ধৃত পদটি সংকীর্ত্তনামৃতে [৩৮১] আছে। এই গ্রন্থে নরহরি চক্রবর্ত্তীর কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই, সুতরাং পদটি নিঃসন্দিগ্ধরূপে সরকার-ঠাকুরের রচিত। পদটিতে চণ্ডীদাসের নামে প্রচলিত একটি পদের সুর বিলক্ষণ অনুভূত হয়।

সই কত না সহিব ইহা।
আমার বন্ধুয়া আন বাড়ী যায় আমার আঙ্গিনা দিয়া॥
যে দিনে দেখিব আপন নয়ানে, কহে কার সনে কথা।
কেশ ছিঁড়িব, বেশ দূরে থোব, ভাঙ্গিব আপন মাথা॥
যাহার লাগিঞা সব তেয়াগিনুঁ,[১] লোকে অপযশ কয়।[২]
এ ধন পরাণ লএ আন জন, তা না কি আমারে সয়॥
কহে নরহরি, শুন ল সুন্দরি, কারে না করিহ রোষ।
কানু গুণনিধি মিলাওল বিধি,[৩] আপন করম দোষ॥

গৌরাঙ্গবিষয়ক পদরচয়িতাদিগের মধ্যে নরহরি অন্যতম, এবং বোধ হয় প্রাচীনতম। এ বিষয়ে নিম্নলিখিত পদটির বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য আছে।[৪]

গৌরলীলা দরশনে ইচ্ছা বড় হয় মনে,
ভাষায় লিখিয়া সব রাখি।

১ মূলে 'তেয়াগিলাম'। ২। ঐ, 'গায়'। ৩। ঐ, 'বিধি মিলাওল'।
৪ গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃ ১১-১২।

মুঞি তো অতি অধম লিখিতে না জানি ক্রম,
কেমন করিয়া তাহা লিখি ॥
এ গ্রন্থ লিখিবে যে এখন জন্মে নাই সে,
জন্মিতে বিলম্ব আছে বহু।
ভাষায় রচনা হৈলে বুঝিবে লোক সকলে,
কবে বাঞ্ছা পুরাবেন পহু ॥
গৌরগদাধর-লীলা আদ্রব করয়ে শিলা,
কার সাধ্য করিবে বর্ণন।
সারদা লিখেন যদি নিরন্তর নিরবধি,
আর সদাশিব পঞ্চানন ॥
কিছু কিছু পদ লিখি, যদি ইহা কেহ দেখি
প্রকাশ করয়ে প্রভু-লীলা।
নরহরি পাবে সুখ, ঘুচিবে মনের দুখ,
গ্রন্থ গানে দরবিবে শিলা ॥

নরহরি এবং তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র রঘুনন্দনের শিষ্যানুশিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই উত্তম কবি ছিলেন, এবং ইঁহারা একটি স্বতন্ত্র ধারার প্রবর্তক ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।[১]

গোবিন্দ ঘোষ, মাধব ঘোষ এবং বাসুদেব ঘোষ, মহাপ্রভুর ভক্ত এই তিন ভাই পদকর্তা এবং সুকণ্ঠ গায়ক ছিলেন। তবে ইঁহাদের মধ্যে পদকর্তা হিসাবে বাসুদেবই বিখ্যাত। ইঁহার প্রচলিত পদগুলির সংখ্যা আশীর কাছাকাছি। অপর দুই ভাইয়ের রচিত পদের সংখ্যা দশ বারোটির বেশী হইবে না।

বাসুদেব ঘোষের সব পদগুলিই গৌরাঙ্গবিষয়ক। পদগুলিতে বাস্তব বর্ণনা থাকার জন্য সত্য সত্যই মর্ম্মস্পর্শী। বাসুদেবের রচিত গানগুলির সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী মহাশয় যথার্থই বলিয়াছেন,

১। ॥ ১৩৪০ জ্যৈষ্ঠ, পৃ ৫৭২-৭৭, ব-সা-প-প ৪০, পৃ ১৫-৩৬ দ্রষ্টব্য।

বাসুদেব গীতে করে প্রভুর বর্ণনে।
কাষ্ঠপাষাণ দ্রবে যাহার শ্রবণে ॥১-১১॥

নিম্নে উদ্ধৃত পদটিতে বাৎসল্যরসের একটি অপূর্ব্ব চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে।

শচীর আঙ্গিনায় নাচে বিশ্বম্ভর রায়।
হাসি হাসি ফিরি ফিরি মায়েরে লুকায় ॥
বয়নে বসন দিয়া বলে লুকাইনু।
শচী বলে বিশ্বম্ভর আমি না দেখিনু ॥
মায়ের অঞ্চল ধরি চঞ্চল চরণে।
নাচিয়া নাচিয়া যায় খঞ্জন-গমনে ॥
বাসুদেব ঘোষ কহে অপরূপ শোভা।
শিশুরূপ দেখি হয় জগ-মন লোভা ॥[১]

নিম্নে উদ্ধৃত গোবিন্দ ঘোষের পদটি অত্যন্ত করুণ ও মর্ম্মস্পর্শী।

হেদে রে নদীয়া-বাসী কার মুখ চাও।
বাহু পাশরিয়া গোরাচাঁদেরে ফিরাও ॥
তোসভারে কে আব করিবে নিজ কোরে।
কে যাচিয়া দিবে প্রেম দেখিয়া কাতরে ॥
কি শেল হিয়ায হায় কি শেল হিয়ায়।
পরাণ-পুতলী নবদ্বীপ ছাড়ি যায় ॥
আর না যাইব মোরা গৌরাঙ্গের পাশ।
আর না করিব মোরা কীর্ত্তনবিলাস ॥
কাঁদয়ে ভকতগণ বুক বিদরিয়া।
পাষাণ গোবিন্দ ঘোষ না যায় মিলিয়া ॥[২]

মালাধর বসুর পৌত্র (?) কুলীনগ্রাম-বাসী মহাপ্রভুর ভক্ত রামানন্দ বসুর রচিত কতকগুলি বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি পদ আছে। নিম্নে রামানন্দের রচিত একটি সুন্দর পদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১। পদকল্পতরু, সংখ্যা ১১৫১ ২। ঐ, ১৬২২।

তোমারে কহিয়ে সখি স্বপন-কাহিনী।
পাছে লোক মাঝে মোর হয় জানাজানি ॥
শাঙন মাসের দে রিমি ঝিমি বরিখে,
নিন্দে তনু নাহিক বসন।
শ্যাম-বরণ এক পুরুষ আসিয়া গো
মুখ ধরি করয়ে চুম্বন ॥
বলি সুমধুর বোল পুন পুন দেই কোল,
লাজে মুখ রহিলুঁ মোড়াই।
আপনা করয়ে পণ সবে মাগে প্রেমধন,
বলে—কিন, যাচিয়া বিকাই ॥
চমকি উঠিলুঁ জাগি, কাঁপিতে কাঁপিতে সখি
যে দেখিলুঁ সেহ নহে সতি[১]।
আকুল পরাণ মোর, দু-নয়নে বহে লোর,
কহিলে কে যায় পরতীতি।
কিবা সে মধুর বাণী অমিয়ার তরঙ্গিণী,
কত রঙ্গ-ভঙ্গিমা চালায় ॥
কহে বসু রামানন্দে, আনন্দে আছিল নিন্দে
কেন বিধি চিয়াইল তায় ॥[২]

এই পদটির একটি বিস্তৃততর সংস্করণ জ্ঞানদাসের[৩] এবং বলরামদাসের[৪] ভণিতায় পাওয়া যায়। কিন্তু পদ দুইটি তুলনা করিলে বোঝা যায় যে, রামানন্দের ভণিতাযুক্ত রূপটিই প্রাচীনতর এবং সুন্দরতর। জ্ঞানদাসের এবং বলরামদাসের পূর্ব্ববর্ত্তী কবি হইতেছেন রামানন্দ বসু। সুতরাং ইঁহার পদ যে পরবর্ত্তী কোন কবির হস্তে রূপান্তরিত হইবে, তাহাতে আশ্চর্য্যের বিষয় কি?

১। অর্থাৎ সত্য। ২। পাঠান্তর 'আনন্দে আছিলুঁ নিন্দে কি লাগি চিয়ায় বিধাতায়'। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১৪৫। ৩। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১৪৪।
৪। পদরত্নাকর ও অপ্রকাশিত-পদরত্নাবলী দ্রষ্টব্য।

নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী কুলিয়াপাহাড়-গ্রামনিবাসী ছকড়ি চট্ট ও চন্দ্রকলার পুত্র বংশীবদন মহাপ্রভু অপেক্ষা কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের পরে বংশীবদন কিছুকাল ধরিয়া (বোধ হয় বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর জীবৎকাল অবধি) শচীদেবী ও বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর অভিভাবক হিসাবে নবদ্বীপে থাকিতেন। পরবর্ত্তী কালে ইনি বিল্বগ্রামে বাস উঠাইয়া লইয়া যান।

বংশীবদন একজন ভাল পদকর্ত্তা ছিলেন। ইনি বংশী এবং বংশীবদন এই দুই ভণিতাই ব্যবহার করিতেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের এক শিষ্য বংশীদাসও পদকর্ত্তা ছিলেন, ইহার পদ কতকগুলি বংশীবদনের পদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তবে সূক্ষ্মভাবে পরীক্ষা করিলে দুই কবির পদ পৃথক্ করিয়া লওয়া দুষ্কর নহে। বংশীবদনের একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। বংশীবদনের প্রায় সব বাঙ্গালা পদই এইরূপ প্রাঞ্জল ভাষায় রচিত। পদটি শচীদেবীর উক্তি। ইহাতে প্রত্যক্ষদর্শীর মনোভাব জাজ্জ্বল্যমান রহিয়াছে।

আর না হেরিব প্রসর কপালে অলকা-তিলক-কাচ।
আর না হেরিব সোণার কমলে নয়ন-খঞ্জন-নাচ॥
আর না নাচিবে শ্রীবাস-মন্দিরে ভকত-চাতক লৈয়া।
আর কি নাচিবে আপনার ঘরে আমরা দেখিব চাইয়া॥
আর কি দু-ভাই নিমাই নিতাই নাচিবেন এক ঠাঞি।
নিমাই করিয়া ফুকরি সদাই নিমাই কোথাও নাই॥
নিদয় কেশব- ভারতী আসিয়া মাথায় পাড়িল বাজ।
গৌরাঙ্গ-সুন্দর না দেখি কেমনে রহিব নদীয়া-মাঝ॥
কেবা হেন জন আনিবে এখন আমার গৌর রায়।
শাশুড়ী-বধূর রোদন শুনিয়া বংশী গড়াগড়ি যায়॥[১]

ইহার রচিত একটি পদ মহাপ্রভুর সমক্ষে নীলাচলে গীত হইয়াছিল, এই কথা প্রেমদাস বলিয়াছেন।

১। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১৮৫৫।

শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকারের শিষ্য ত্রিলোচন, সুলোচন বা লোচনদাস একজন বড় কবি ছিলেন। ইঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল একটি সুন্দর কাব্যগ্রন্থ। পদকর্ত্তাদের মধ্যেও ইঁহার স্থান খুব উচ্চে। ইঁহার কবিত্বশক্তি কিরূপ প্রখর ছিল তাহ নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটি হইতে বোঝা যাইবে।

অমিয়া মথিয়া কেবা নবনী তুলিল গো,
তাহাতে গড়িল গোরা-দেহ।
জগত ছানিয়া কেবা রস নিঙ্গাড়িল গো,
এক কৈল সুধার সুলেহ॥

অখণ্ডপীযূষধারা কেবা আউটিল গো,
সোনার বরণ হৈল চিনি।
সে চিনি মারিয়া কেবা ফেনি তুলিল গো,
হেন বাসোঁ গোরা-অঙ্গখানি॥

অনুরাগ দধিখানি প্রেমের সাচন দিয়া
কে না পাতিয়াছে আঁখি দুটি।
তাহাতে অধিক মহু লহু লহু কথা গো,
হাসিয়া বোলয়ে গুটি গুটি॥

বিজুরী বাঁটিয়া কেবা গাখানি মাজিল গো,
চাঁদে মাজিল মুখখানি।
লাবণ্য বাঁটিয়া কেবা চিত্র নিরমাণ কৈল,
অপরূপ রূপের বলনি॥

সকলপূর্ণিমা-চাঁদে বিকল হইয়া কাঁদে
কর-পদ-পদুমের গন্ধে।
কুড়িটী নখের ছটা জগত আলা কৈল গো,
আঁখি পাইল জনমের অন্ধে॥

এমন বিনোদ রূপ কোথাও না দেখি গো,
অপরূপ প্রেমার বিনোদে।
পুরুষ প্রকৃতি-ভাবে কাঁদিয়া আকুল গো,
নারী কেমনে প্রাণ বাঁধে॥
সকল রসের সার বিশাল হৃদয়খানি
কে না গড়াইল রঙ দিয়া।
মদন বাঁটিয়া কেবা বদন গড়িল গো,
বিনি ভাবে মো মলুঁ কাঁদিয়া॥
ইন্দ্রের ধনুক আনি গোরার কপালে গো
কেবা দিল চন্দনের রেখা।
ও রূপ স্বরূপে যত কুলের কামিনী গো
দু হাথ করিতে চাহে পাখা॥
রঙ্গের মন্দিরখানি নানা রত্ন দিয়া গো
গড়াইল বড় অনুবন্ধে।
লীলার বিলাসকলা- ভাবে অভিলাষী গো,
মদন বেদনা ভাবি কান্দে॥
না চাহে আঁখির কোণে, সদাই সভার মনে
দেখিবারে আঁখি-পাখী ধায়।
আঁখির তিয়াস দেখি মুখের লালস গো,
আলসল জর-জর গায়॥
কুলবতী কুল ছাড়ে, পঙ্গু ধায় উভ-রড়ে,
গুণ গায় অসুর-পাষণ্ড।
ধূলায় লোটাঞা কাঁদে, কেহো থির নাহি বাঁধে,
গোরা-গুণ অমিয়া অখণ্ড॥
ধাও রে ধাও রে বলি প্রেমানন্দে কোলাকুলি,
কেহো নাচে অট্ট-অট্ট হাসে।

সুশীলা কুলের বহু সে বোলে—সকল যাউ
গোরা-গুণ-রূপের বাতাসে ॥
যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র কিবা মনে গণে রাত্রি দিবা,
গোরা-রূপে লাগি গেল ধাঁধা।
অখিল-ভুবনপতি ধূলায় লোটাঞা ক্ষিতি
সদাই সোঁঅরে রাধা রাধা ॥
লখিমী-বিলাস ছাড়ি প্রেম-অভিলাষী গো,
অনুরাগে রাঙ্গা দুটি আঁখি।
রাধার ধেয়ানে হিয়া বেকত না হয় গো,
এই গোরা-তনু তার সাখী ॥
দেখ রে দেখ রে লোক হেন প্রেমা অপরূপ,
ত্রিজগতনাথ-নাথ হৈয়া।
অকিঞ্চন জন সঙ্গে কি জানি কি ধন মাগে,
কি না সুখে বুলয়ে নাচিয়া ॥
জয় রে জয় রে জয় হেন প্রেমরসালয়
ভাঙ্গি বিলাইল গোরারায়।
নির্জীবে জীবন পাইল, পঙ্গু গিরি ডিঙ্গাইল,
আনন্দে লোচনদাসে গায় ॥[১]

লোচনের অনেকগুলি পদ চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত পদটি পদকল্পতরুর প্রায় সকল পুঁথিতেই এবং পদরত্নাকর, পদরসসার প্রভৃতি সংগ্রহগ্রন্থে লোচনের ভণিতায় পাওয়া যায়, তথাপি দুই একটি অর্ব্বাচীন পুঁথির জোরে এবং 'চণ্ডীদাস' নামের মোহে এই পদটি চণ্ডীদাসের নামে চালানো হইতেছে। ছন্দের এবং ভাবের দিক দিয়া বিচার করিলে ইহা লোচনের পদ বলিয়া স্পষ্ট বোঝা যায়। লোচনের ভণিতাটিও পদটির ভাব এবং ভাষার সহিত খাপ খায়।

১। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ২১২৯। পদটি শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গলের মধ্যখণ্ডে আছে।

সজনি, ও-ধনি কহ কে বটে।
গোরোচনা-গোরী নবীন কিশোরী নাহিতে দেখিলুঁ ঘাটে ॥
সিনিয়া উঠিতে নিতম্বতটীতে আউলাই চিকুর-রাশি।
কান্দিয়া আন্ধার কনক-চান্দার শরণ লইল আসি ॥
কিবা সে দুগুলি শঙ্খ ঝলমলি সরু সরু শশিকলা।
মাটিতে উদয় শুধু সুধাময়, দেখিয়া হইলুঁ ভোলা ॥
চলে নীল শাড়ী নিঙাড়ি নিঙাড়ি পরাণ সহিত মোর।
সেই হৈতে মোর হিয়া নহে থির মনমথ-জ্বরে ভোর ॥
এ দাস লোচন কহয়ে বচন, শুন হে নাগর-চান্দা।
সে যে বৃষভানু-রাজার নন্দিনী নাম বিনোদিনী রাধা ॥[১]

লোচন ধামালী পদের স্রষ্টিকর্ত্তা যদিও বা না হন, তিনি যে এই ছন্দের আদি কবি তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার রচিত ধামালী পদগুলির ভাষা বিশুদ্ধ কথ্য-ভাষা, এমন কি, অনেক সময় ইহা গ্রাম্যত্বের কাছ ঘেঁসিয়া গিয়াছে। নিম্নে লোচনের ধামালী পদের একটি উদাহরণ দিতেছি।

ব্রজপুরে রূপনগরে রসের নদী বয়।
তীর বহিয়া ঢেউ আসিয়া লাগিল গোরার গায় ॥
গৌর-অঙ্গে প্রেম-তরঙ্গে উঠিছে দিবারাতি।
জ্ঞানকর্ম্ম যোগধর্ম্ম তপ ছাড়িল যতি ॥
মনে মনে কতজনে দিচ্ছে রূপের দায়।
সে যে রূপ সুধাকূপ, ঠোর নাহিক পায় ॥
রূপ ভাবনা গলায় সোনা, ঘুচিবে মনের ধাঁধা।
রূপেব ধারা বাউল পারা বহিছে জগত-আঁধা ॥
রূপ-রসে জগত ভাসে এ চৌদ্দ ভুবনে।
খাইলে মজে, দেখিলে মজে, কহিলে কেবা জানে ॥

১। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ২১০। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় যতগুলি পুঁথি অবলম্বন করিয়া পরিষৎ-সংস্করণ পদকল্পতরু সম্পাদন করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে কেবল একটিতে চণ্ডীদাসের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে, অপর সবগুলিতেই লোচনের ভণিতা আছে।

বিষম সেবা লইয়া যেবা আপনা মারে যে।
লোচন বলে, অবহেলে গৌর পাবে সে ॥[১]

লোচনের অনেকগুলি সাধনসঙ্কেতজ্ঞাপক পদও চণ্ডীদাসের নামে চলিয়া গিয়াছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল এবং পদাবলী ছাড়াও লোচন দুই একটি নিবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন। রামানন্দ রায় প্রণীত জগন্নাথবল্লভ নাটকের শ্লোকগুলি বাঙ্গালা পদে রূপান্তরিত করেন।[২] দুর্ল্লভসার[৩] নামক সাধনতত্ত্ব ঘটিত নিবন্ধটি ইঁহার রচনা হওয়াই সম্ভব; ইহাতে যে আত্মপরিচয় আছে তাহাই যথাযথভাবে চৈতন্যমঙ্গলে পাওয়া যাইতেছে। লোচনদাসের চৈতন্যমঙ্গল সম্বন্ধে আলোচনা পরে করা যাইতেছে।

কবি অনন্তদাস অদ্বৈত আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। আচার্য্যের অপর এক শিষ্য ছিলেন অনন্ত আচার্য্য। তাঁহার রচিত একটি বাঙ্গালা পদ আছে।[৪] ইহা ছাড়া 'রায় অনন্ত' ভণিতাযুক্ত দুইটি পদ পাওয়া যায়।[৫] ইনি স্বতন্ত্র কবি হইবেন।

অনন্তদাস ভণিতায় একুশটি মাত্র ব্রজবুলি পদ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে নিম্নে উদ্ধৃত পদটিই শ্রেষ্ঠ। পদটি শ্রেষ্ঠ ব্রজবুলি পদগুলির অন্যতম।

বিকচ-সরোজ- ভান মুখমণ্ডল,
দিঠি-ভঙ্গিম নট-খঞ্জন-জোর।
কিয়ে মৃদু-মাধুরি হাস উগারই,
পী পী আনন্দে আঁখি পড়লহি ভোর ॥
বরণি না হয় রূপ বরণ চিকনিয়া।
কিয়ে ঘনপুঞ্জ, কিয়ে কুবলয়-দল,
কিয়ে কাজর, কিয়ে ইন্দ্রনীলমণিয়া ॥

১। বিবর্ত্তবিলাস।
২। HBL, পৃ ৬৪।
৩। প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী, বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।
৪। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ২২৮৫। ৫। ঐ, পদসংখ্যা ২৩২৮, ২৩৩৭।

অঙ্গদ বলয় হার মণি-কুণ্ডল
চরণে নূপুর কটি কিঙ্কিণী-কলনা।
অভরণ-বরণ- কিরণে অঙ্গ ঢর ঢর,
কালিন্দীজলে যৈছে চাঁদকি চলনা॥
কুঞ্চিত-কেশ, বেশ কুসুমাবলি,
শির-পর শোভে শিখি-চাঁদকি ছাঁদে।
অনন্তদাস-পঁহু- অপরূপ-লাবণি
সকল যুবতি-মন পড়ি গেও ফাঁদে॥[১]

বলরামদাস নামে একাধিক পদকর্ত্তা ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যে যিনি শ্রেষ্ঠ এবং প্রাচীনতম তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর শিষ্য "সঙ্গীতকারক" বলরামদাস বলিয়া দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায় উল্লিখিত হইয়াছেন। ইঁহার বাসস্থান ছিল বর্দ্ধমান জেলায় দোগাছিয়া গ্রামে। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন।

বলরামদাস বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদ লিখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ব্রজবুলি পদগুলি বাঙ্গালা পদের অপেক্ষা কাব্যাংশে হীন। বলরাম-দাস ভণিতায় কতকগুলি 'চিত্রগীত' বা 'চিত্রপদ' আছে। সেগুলিতে বিশেষ কিছু কবিত্বের পরিচয় নাই। সেগুলি পরবর্ত্তী কোন কবির রচনা হইতে পারে।

বাঙ্গালা বৈষ্ণব গীতিকবিদিগের মধ্যে বলরামদাস অতি উচ্চ স্থান অধিকার করেন। রূপানুরাগের ও রসোদ্গারের বর্ণনায় বলরাম অদ্বিতীয়। ইঁহার ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল। নিম্নে উদ্ধৃত পদটি বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা।

কিশোর বয়স কত বৈদগধি-ঠাম।
মূরতি মরকত-অভিনব-কাম॥
প্রতি অঙ্গ কোন বিধি নিরমিল কিসে।
দেখিতে দেখিতে কত অমিয়া বরিষে॥
মলুঁ মলুঁ কিবা রূপ দেখিলুঁ স্বপনে।
খাইতে শুইতে মোর লাগিয়াছে মনে॥

১। ঐ, ২৬৮।

অরুণ অধর মৃদু মন্দ মন্দ হাসে।
চঞ্চলনয়নকোণে জাতি কুল নাশে ॥
দেখিয়া বিদরে বুক দুটি ভুরু-ভঙ্গি।
আই আই কোথা ছিল সে নাগর রঙ্গী ॥
মন্থর চলনখানি আধ-আধ যায়।
পরাণ যেমন করে কি কহিব কায় ॥
পাষাণ মিলায়ে যায় গায়ের বাতাসে।
বলরামদাসে কয় অবশ পরশে ॥[১]

নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটি হইতে বলরামের ব্রজবুলি রচনার ও ছন্দে দক্ষতার নমুনা পাওয়া যাইবে।

মধুর সময় রজনি-শেষ, শোহই মধুর কানন-দেশ,
গগনে উয়ল মধুর মধুর বিধু নিরমল-কাঁতিয়া।
মধুর মাধবী-কেলিনিকুঞ্জ, ফুটল মধুর কুসুম-পুঞ্জ,
গাবই মধুর ভ্রমরা ভ্রমরী, মধুর মধুহি মাতিয়া ॥
আজু খেলত আনন্দে[২] ভোর মধুর যুবতি নব-কিশোর।
মধুর বরজ-রঙ্গিণী মেলি করত মধুর রভস-কেলি ॥
মধুর পবন বহই মন্দ, কূজয়ে কোকিল মধুর ছন্দ,
মধুর-রসহি শব্দ-সুভগ নদই বিহগ-পাঁতিয়া।
রবই মধুর শারী, কীর পঢ়ই ঐছন অমিয়া গীর,
নটই মধুর মউর, মউরী রটই মধুর-ভাতিয়া ॥
মধুর মিলন খেলন হাস, মধুর মধুর রস-বিলাস,
মদন হেরই ধরণী লুঠই বেদন ফুটই ছাতিয়া।
মধুর মধুর চরিতরীত বলরাম-চিতে ফুরউ নীত,
দুহুঁক মধুর চরণ-সেবন-ভাবনে জনম যাতিয়া ॥[৩]

১। ঐ, ১৪৬। ২। ছন্দের অনুরোধে 'আন্দে' অথবা 'নন্দে' পড়িতে হইবে।
৩। ঐ, ২৪৯৭।

ষোড়শ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে বলরামদাস বাৎসল্যরসের বর্ণনায় কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। নিম্নে বলরামের একটি বাৎসল্যঘটিত পদ উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া হইল।

শ্রীদাম সুদাম দাম শুন ওরে বলরাম,
মিনতি করিয়ে তো-সভারে।
বন কত অতি দূর, নব-তৃণ-কুশাঙ্কুর,
গোপাল লৈয়া না যাইহ দূরে॥
সখাগণ আগে পাছে গোপাল করিয়া মাঝে
ধীরে ধীরে করিহ গমন।
নব-তৃণাঙ্কুর-আগে রাঙ্গা পায়ে জানি লাগে,
প্রবোধ না মানে মোর মন॥
নিকটে গোধন রাখ্য, মা বল্যা শিঙ্গায় ডাক্য,
ঘরে থাকি শুনি যেন রব।
বিধি কৈলা গোপ জাতি, গোধন-পালন বৃত্তি,
তেঞি বনে পাঠাই যাদব॥
বলরামদাসের বাণী, শুন ওগো নন্দরাণী,
মনে কিছু না ভাবিহ ভয়।
চরণের বাধা লইয়া দিব মোরা যোগাইয়া,
তোমার আগে কহিল নিশ্চয়॥[১]

জ্ঞানদাস বর্দ্ধমান জেলার কাঁদড়া গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর কনিষ্ঠা ভার্য্যা জাহ্নবীদেবীর মন্ত্রশিষ্য ছিলেন। বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে জ্ঞানদাস অন্যতম। ইনি ব্রজবুলি পদই বেশী লিখিয়াছেন। পদকল্পতরু-ধৃত জ্ঞানদাসের ব্রজবুলি পদের সংখ্যা একশতেরও অধিক। ইঁহার বাঙ্গালা পদগুলি ব্রজবুলিতে লিখিত পদগুলির অপেক্ষা অনেকাংশে উৎকৃষ্ট।

১। ঐ, ১২১৮।

'রূপানুরাগ,' 'রসোদ্গার' এবং 'মাথুর' বিষয়ক পদগুলিতেই জ্ঞানদাসের কবিত্বের চরম নিদর্শন রহিয়াছে। নিম্নে জ্ঞানদাসের দুইটি সুপরিচিত বাঙ্গালা পদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

আলো মুঞি কেন গেলুঁ কালিন্দীর জলে।
চিত হরি কালিয়া-নাগর নিল ছলে॥
রূপের পাথারে আঁখি ডুবিয়া রহিল।
যৌবনের বনে মন হারাইয়া গেল॥
ঘরে যাইতে পথ মোর হইল অফুরান।
অন্তরে বিদরে হিয়া ফুকরে পরাণ॥
চন্দন-চাঁদের মাঝে মৃগমদ-ধাঁধা।
তার মাঝে হিয়ার পুতলী রৈল বাঁধা॥
কটি-পীতবসন রশন তাহে জড়া।
বিধি নিরমিল কুল-কলঙ্কের কোঁড়া॥
জাতি কুল শীল সব হেন বুঝি গেল।
ভুবন ভরিয়া মোর ঘোষণা রহিল॥
কুলবতী সতী হৈয়া দুকুলে দিলুঁ দুখ।
জ্ঞানদাস কহে দৃঢ় করি বাঁধ বুক॥[১]

রূপ লাগি আঁখি ঝুরে গুণে মন ভোর।
প্রতি অঙ্গ লাগি কাঁদে প্রতি অঙ্গ মোর॥
হিয়ার পরশ লাগি হিয়া মোর কাঁদে।
পরাণ পিরীতি লাগি থির নাহি বাঁধে॥
সই, কি আর বলিব।
যে পুনি কর্য্যাছি মনে সেই সে করিব॥
দেখিতে যে সুখ উঠে কি বলিব তা।
দরশ-পরশ লাগি আউলাইছে গা॥

১। ঐ, ১২৩।

হাসিতে খসিয়া পড়ে কত মধু-ধার ॥
লহু লহু হাসে পহু পিরীতির সার ॥
গুরু-গরবিত মাঝে রহি সখী সঙ্গে।
পুলকে পুরয়ে তনু শ্যাম-পরসঙ্গে ॥
পুলক ঢাকিতে করি কত পরকার।
নয়নের ধারা মোর বহে অনিবার ॥
ঘরের যতেক সভে করে কানাকানি।
জ্ঞান কহে লাজ-ঘরে ভেজাইলুঁ আগুনি ॥[১]

শ্রীচৈতন্যের অন্তরঙ্গ ভক্ত গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শিষ্য [illegible]নন্দ মিশ্র যতগুলি পদ লিখিয়াছেন সবগুলিই গৌরাঙ্গবিষয়ক। পদগুলির [illegible] এবং সুর-ঝঙ্কার অনবদ্য। নিম্নে নয়নানন্দের একটি বাঙ্গালা পদ উদ্ধৃত [illegible] দিতেছি।

গোরা মোর গুণের সাগর।
প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে নিরন্তর ॥
গোরা মোর অকলঙ্কশশী।
হরিনাম-সুধা তাহে ক্ষরে দিবানিশি ॥
গোরা মোর হিমাদ্রি-শিখর।
তাহা হৈতে প্রেম-গঙ্গা বহে নিরন্তর ॥
গোরা মোর প্রেমকল্পতরু।
যার পদ-ছায়ে জীব সুখে বাস করু ॥
গোরা মোর নবজলধর।
বরষি শীতল যাহে করে নারী-নর ॥
গোরা মোব আনন্দের খনি।
নয়নানন্দের প্রাণ যাহার নিছনি ॥[২]

ঐ, ৭৮৪। ২। গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃ ৩১।

পদকর্ত্তা জগন্নাথদাসের সময় ঠিক জানা যায় না। তবে তাঁহার গৌরাঙ্গ-বিষয়ক পদগুলি বিচার করিলে অনুমান হয় যে, তিনি মহাপ্রভুর ভক্ত অথবা অনুশিষ্য ছিলেন। মহাপ্রভুর ভক্তদিগের মধ্যে একাধিক জগন্নাথ ছিল। জগন্নাথ কবিত্বগুণে হীন ছিলেন না। নিম্নে উদ্ধৃত কবিতাটি বর্ণনার সৌন্দর্য্য এবং ছন্দের গৌরবে অতুলনীয়।

যমুনাক তীরে ধীরে চলু মাধব,
মন্দ মধুর বেণু বাওই রে।
ইন্দীবরনয়নী বরজবধূ কামিনী
সদন তেজিয়া বনে ধাওই রে॥
অসিত-অম্বুধর-অসিত-সরসিরুহ-
অতসী-কুসুম-অহিমকরসুতানীর-
ইন্দ্রনীলমণি-উদার-মরকত-
শ্রীনিন্দিত বপু-আভা রে॥
শিরে শিখণ্ডদল, নব গুঞ্জাফল,
নিরমল-মুকুতা-লম্বি নাসাতল,
নবকিসলয়-অবতংস, গোরোচনা-
অলকতিলক মুখশোভা রে॥
শ্রোণি পীতাম্বর, বেত্র বামকর,
কম্বুকণ্ঠে বনমালা মনোহর,
ধাতুরাগ-বৈচিত্র্য কলেবর,
চরণে চরণ-পরি শোভা রে।
গোধূলিধূসর বিশাল বক্ষথল
রঙ্গভূমি জিনি, বিলাসনটবর,
গোছাঁদন-রজু-বিনিহিতকন্ধর
রূপে ভুবন-মনলোভা রে॥

ব্রহ্ম পুরন্দর দিনমণি শঙ্কর
যো চরণাম্বুজ সেবে নিরন্তর,
সো হরি কৌতুক ব্রজবালক সাথে,
গোপনাগরী-অভিলাষা রে।
সো-পহুঁ-পদতল-পরাগ-ধূসর
মানস মম করু আশ নিরন্তর
অভিনবসংকবি-দাসজগন্নাথ
জননীজঠর-ভয়-নাশা রে ॥[১]

সদাশিব কবিরাজের পুত্র পুরুষোত্তমদাস। পিতা এবং পুত্র উভয়েই নিত্যানন্দ প্রভুর অনুচর ছিলেন। ইঁহাদের বাসস্থান ছিল কুমারহট্ট। বৈষ্ণব-বন্দনার কবি পদকর্ত্তা দেবকীনন্দনদাস এই পুরুষোত্তমের শিষ্য ছিলেন। পুরুষোত্তমের রচিত দশ বারোটি পদ আছে। সবগুলিই রাধাকৃষ্ণলীলাবিষয়ক। পদগুলি চলনসই পর্য্যায়ে পড়ে।

মহাপ্রভুর ভক্ত পরমানন্দ গুপ্ত একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। 'পরমানন্দদাস' ভণিতার পদগুলিকে সকলেই কবি-কর্ণপূরের লিখিত বলিয়া মনে করেন। কবি-কর্ণপূরের নাম ছিল পরমানন্দ সেন। কিন্তু তিনি নিজেই গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায়[২] পদকর্ত্তা পরমানন্দ গুপ্তের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। কবি-কর্ণপূর বাঙ্গালায় বা ব্রজবুলিতে কিছু লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। জয়ানন্দও শ্রীচৈতন্যমঙ্গলে[৩] পরমানন্দ গুপ্তের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। পরমানন্দের অধিকাংশ পদই গৌরাঙ্গবিষয়ক। রচনাগত বিশেষত্ব পদগুলিতে বিশেষ কিছুই নাই।

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের স্থান খুব উচ্চে। আনুমানিক ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে নরোত্তমের

[১] পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১৩২৩।
[২] পরমানন্দগুপ্তো যৎকৃতা কৃষ্ণস্তবাবলী ॥ ১৯৯ ॥
[৩] সংক্ষেপে করিলেন তেঁহ পরমানন্দগুপ্ত।
গৌরাঙ্গবিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত ॥ [পৃ ৩]

জন্ম হয়। ইঁহার পিতা কৃষ্ণানন্দ দত্ত আধুনিক রাজসাহী অঞ্চলের একজন রাজোপাধিক বড় জমিদার ছিলেন। নরোত্তমের মাতার নাম নারায়ণী। বোয়ালিয়া হইতে প্রায় ছয় ক্রোশ উত্তর-পশ্চিমে খেতরী বা খেতুরী গ্রামে ইঁহাদের নিবাস ছিল। অল্প বয়স হইতেই নরোত্তম ধর্ম্মপ্রবণ ছিলেন। পিতার মৃত্যু হইলে খুল্লতাতপুত্র সন্তোষ দত্তের হস্তে বিষয়কর্ম্মের ভার ন্যস্ত করিয়া ইনি বৃন্দাবন গমন করেন। নরোত্তমবিলাস গ্রন্থের মতে নরোত্তমের বৃন্দাবনগমনের সময় কৃষ্ণানন্দ জীবিত ছিলেন। বৃন্দাবনে গমন করিয়া নরোত্তম লোকনাথ গোস্বামীর শিষ্যত্ব লাভ করেন এবং শ্রীজীব গোস্বামীর নিকট ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। এই খানেই ইনি শ্রীনিবাস-আচার্য্য এবং শ্যামানন্দের সহিত মিলিত হন। এই মিলনের ফলে বাঙ্গালায় নূতন করিয়া বৈষ্ণবধর্ম্মের বন্যা আসিয়াছিল। রঘুনাথ-দাস গোস্বামীর মত নরোত্তম-দাসেরও চরিত্র দৃঢ়নিষ্ঠাযুক্ত সাধনভজন ও আধ্যাত্মিকতার কাহিনী। প্রেমবিলাস, কর্ণানন্দ, ভক্তিরত্নাকর, নরোত্তমবিলাস, অনুরাগবল্লী প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে ইঁহার জীবনীর অনেক কিছু পাওয়া যায়।

রসকীর্ত্তনের স্রষ্টা হিসাবে নরোত্তম চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। খ্রীষ্টীয় ১৫৮৩ সালের দিকে (—কেহ কেহ এই ঘটনাকে সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে লইয়া যাইতে চাহেন—) নরোত্তম ছয়টি বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। এই বিগ্রহগুলির প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে এক বিরাট মহোৎসব অনুষ্ঠিত হয়। ইহাই বিখ্যাত খেতরীর মহোৎসব। এই মহোৎসবটি বাঙ্গালায় বৈষ্ণবধর্ম্ম ও সাহিত্যের ইতিহাসে একটি প্রধান দিগ্‌দর্শনী। এই মহোৎসবেই রসকীর্ত্তনের সৃষ্টি হয়।

এথা সর্ব্বমহান্ত কহয়ে পরস্পরে।
প্রভুর অদ্ভুত সৃষ্টি নরোত্তম-দ্বারে॥
হেন প্রেমময় বাদ্য কভু না শুনিলুঁ।
এহেন গানের প্রথা কভু না দেখিলুঁ॥
নরোত্তম-কণ্ঠধ্বনি অমৃতের ধার।
যে পিয়ে তাহার তৃষ্ণা বাঢ়ে অনিবার॥[১]

১। নরোত্তমবিলাস, সপ্তম বিলাস।

নরোত্তমের প্রার্থনাপদগুলির জোড়া বাঙ্গালা সাহিত্যে নাই। এই পদগুলি ছাড়া তিনি কয়েকটি ছোট ছোট ধর্ম্ম ও সাধন সংক্রান্ত নিবন্ধ লিখিয়াছেন। সেগুলির নাম পাওয়া যায় বল্লভদাসের একটি পদে।[১] সহজিয়া ধর্ম্মমতসংক্রান্ত কতকগুলি পুস্তিকাও নরোত্তমদাস ঠাকুরের নামে চলে। এগুলিকে নরোত্তমের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা চলে না। দুই একটির মূলে নরোত্তমের রচনা থাকিতেও পারে, কিন্তু তাহার উপরে যে প্রলেপ পড়িয়াছে তাহাতে মূল লুপ্তপ্রায় হইয়া গিয়াছে।

প্রার্থনাপদগুলির কথা ছাড়িয়া দিলে প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাকে নরোত্তমের শ্রেষ্ঠ রচনা বলিতে হয়। প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা একশত উনিশটি ত্রিপদী শ্লোকাত্মক কবিতা। ভাষা এবং ছন্দঃ সরল ও হৃদয়গ্রাহী। ইহার মধ্যে বৈষ্ণবসাধনপদ্ধতির কতকগুলি মূল কথা বিশেষ কবিত্বের সহিত বর্ণিত হইয়াছে। এই কবিতাটি বহু বহু বৈষ্ণব সাধু ও গৃহী ভক্তের কণ্ঠহারস্বরূপ। নরোত্তমের বন্ধু রামচন্দ্র কবিরাজের স্মরণদর্পণের আদর্শে প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা রচিত হইয়াছিল। রামচন্দ্রের মৃত্যুর পর নরোত্তম প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা রচনা করিয়াছিলেন। ইহা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

তুমি ত দয়ার সিন্ধু, অধমজনার বন্ধু,
মোহে প্রভু কর অবধান।
পড়িনু অসৎভোলে, কামতিমিঙ্গিলে গিলে,
ওহে নাথ কর মোরে ত্রাণ॥
যাবৎ জনম মোর অপরাধে হৈনু ভোর,
নিষ্কপটে না ভজিনু তোমা।
তথাপি তুমি সে গতি, না ছাড়িহ প্রাণপতি,
আমা সম নাহিক অধমা॥

১। গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃ ৪৭৮-৪৭৯।

পতিতপাবন নাম ঘোষণা তোমার শ্যাম,
উপেখিলে নাহি মোর গতি।
যদি হই অপরাধী তথাপিহ তুমি গতি,
সত্য সত্য যেন সতীপতি॥
তুমি ত পরমদেবা, নাহি মোরে উপেখিবা,
শুন শুন প্রাণের ঈশ্বর।
যদি করু অপরাধ তথাপিহ তুমি নাথ,
সেবা দিয়া কর অনুচর॥
কামে মোর হত চিত, নাহি মানে নিজহিত,
মনের না ঘুচে দুর্ব্বাসনা।
মোরে নাথ অঙ্গীকরু ওহে বাঞ্ছাকল্পতরু,
করুণা দেখুক সর্ব্বজনা॥
মো সম পতিত নাই, ত্রিভুবনে দেখ চাই,
নরোত্তম-পাবন নাম ধর।
ঘুষুক সংসার নাম পতিতপাবন শ্যাম,
নিজদাস কর গিরিধর॥
নরোত্তম বড দুখী, নাথ মোরে কর সুখী
তোমার ভজন সঙ্কীর্ত্তনে।
অন্তরায় নাহি যায়, এই ত পরম ভয়
নিবেদন করি অনুক্ষণে॥

নরোত্তমের প্রার্থনাপদগুলি বিশেষভাবে বৈষ্ণব সাধকের জন্য লিখিত হইলেও এই পদগুলির মধ্যে যে আন্তরিকতা ও সর্ব্বজনীনতা আছে তাহা সকলকেই মুগ্ধ করে। সাধক কবির কাতর ব্যাকুলতা এই পদগুলির মধ্যে অনেক পরিমাণে বন্দী রহিয়া গিয়াছে। নিম্নে দুইটি প্রার্থনাপদ তুলিয়া দিতেছি।

গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলকশরীর।
হরি হরি বলিতে নয়নে বহে নীর॥

আর কবে নিতাইচাঁদ করুণা করিবে।
সংসারবাসনা মোর কবে তুচ্ছ হবে॥
বিষয় ছাড়িয়া কবে শুদ্ধ হবে মন।
কবে হাম হেরব শ্রীবৃন্দাবন॥
রূপ রঘুনাথ বলি হইবে আকুতি।
কবে হাম বুঝিব সে যুগল-পিরীতি॥
রূপ-রঘুনাথ-পদে রহু মোর আশ।
প্রার্থনা করয়ে সদা নরোত্তমদাস॥[১]

হে গোবিন্দ গোপীনাথ, কৃপা করি রাখ নিজপথে।
কাম ক্রোধ ছয়জনে লৈয়া ফিরে নানাস্থানে,
বিষয় ভুঞ্জায় নানা মতে॥

হইয়া মায়ার দাস করি নানা অভিলাষ,
তোমার স্মরণ গেল দূরে।
অর্থলাভ এই আশে কপট-বৈষ্ণব বেশে
ভ্রমিয়া বুলিয়ে ঘরে ঘরে॥

অনেক দুঃখের পরে লৈয়াছিলা ব্রজপুরে
কৃপাডোর গলায় বাঁধিয়া।
দৈবমায়া বলাৎকারে খসাইয়া সেই ডোরে
ভবকূপে দিলেক ডারিয়া॥

পুন যদি কৃপা কবি এ জনার কেশে ধরি
টানিয়া তোলহ ব্রজভূমে।
তবে সে দেখিয়ে ভাল, নহে বোল ফুরাইল—
কহে দীন দাস নরোত্তমে॥[২]

১ পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ৩০৪৬। ২ ঐ, ৩০২৩।

বল্লভদাসের এই পদে নরোত্তমের রচনার একটি তালিকা আছে—

চন্দ্রিকা পঞ্চম সাব তিন মণি সারাৎসার
গুরুশিষ্যসংবাদপটল।
ত্রিভুবনে অনুপাম প্রার্থনা গ্রন্থের নাম
হাটপত্তন মধুর কেবল ॥
রচিলা অসংখ্যপদ হৈয়া ভাবে গদগদ,
কবিত্বের সম্পদ সে সব।
যে বা শুনে যে বা পড়ে যে বা তাহা গান করে,
সেই জানে পদের গৌরব ॥[১]

"চন্দ্রিকা পঞ্চম" হইতেছে—প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা, সাধনভক্তিচন্দ্রিকা, সাধ্যপ্রেম-চন্দ্রিকা, সিদ্ধপ্রেমচন্দ্রিকা এবং চমৎকারচন্দ্রিকা। তিন মণি হইতেছে—সূর্যমণি, চন্দ্রমণি ও প্রেমভক্তিচিন্তামণি। গুরুশিষ্যসংবাদপটলের নামান্তর উপাসনাপটল।

নরোত্তমের অভিন্নহৃদয় বন্ধু, গোবিন্দদাস কবিরাজের জ্যেষ্ঠভ্রাতা, ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের প্রধান শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজ প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার মত একটি কবিতা লিখিয়াছিলেন, নাম স্মরণদর্পণ।[২] এইটিই প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার আদর্শ। নরোত্তম যখন প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা রচনা করেন তখন রামচন্দ্র ইহজগৎ পরিত্যাগ করিয়াছেন। নরোত্তম লিখিয়াছেন,

রামচন্দ্র কবিরাজ সেই সঙ্গে মোর কাজ,
তার সঙ্গ বিনা সব শূন্য।
যদি জন্ম হয় পুনঃ তার সঙ্গ হয় যেন,
তবে [হয়] নরোত্তম ধন্য ॥

স্মরণদর্পণ ছেয়াশীটি ত্রিপদী শ্লোকে রচিত। কবি স্বীয় সুহৃৎ নরোত্তমের নাম করিতে ভুলেন নাই—

১। গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃ ৪৭৯।
২। আলাটী ভক্তিপ্রভা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত (১৩৩১)।

সদা সঙ্গে নরোত্তম, নাহিক তাহার সম,
ত্রিভুবনে নাহি তার সীমা।
দুহে রাত্রি দিনে বসি অমিয় সাগরে ভাসি
আলাপন যুগল মহিমা ॥

মোহনমাধুরীদাস প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাকিরণ নামে নরোত্তমের প্রেমভক্তিচন্দ্রিকার একটি বিস্তৃত ব্যাখ্যা রচনা করেন।[১] ইহাতে গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ হইতে প্রমাণ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। গ্রন্থের সমাপ্তি এইরূপ—

জয় জয় শ্রীযুত ঠাকুর হরিদাস।
যার কৃপা হৈতে অনুরাগের প্রকাশ ॥
কৃপা করি তিহোঁ মোরে গ্রন্থ পঢ়াইল[২]।
কামগায়ত্রী কামবীজ পঞ্চনাম দিল ॥
আব করাইল তিহোঁ প্রণালী গ্রহণ।
মনের আরোপে তাহা করিতে সাধন ॥
সেই সূত্রে শ্রীগুরু-গৌরাঙ্গ-কৃপা কৈল।
কৃপামাত্রে সিদ্ধতত্ত্ব হৃদয়ে পশিল ॥
এই তত্ত্ববস্তু যে দিল আমায়।
জন্মে জন্মে বিক্রীত হইলাম তার পায় ॥
এই ত কহিল সব কৃপার মহিমা।
কৃপার পরশে মোরে দেখাইল সীমা ॥
শ্রীরূপমঞ্জরীপদে লইলাম স্মরণ।
মোহনমাধুরীদাস রচিল কিরণ ॥

ষোড়শ শতাব্দীতে গোবিন্দ নামে একাধিক পদকর্ত্তা ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের পার্ষদদিগের মধ্যে অন্ততঃ দুইজন 'গোবিন্দ' পদকর্ত্তা ছিলেন, গোবিন্দ ঘোষ এবং গোবিন্দ আচার্য্য। গোবিন্দ ঘোষের পদে 'গোবিন্দদাস' ভণিতা

---

১ ব-সা-প পুঁথি; বা প্রা-পু বি ৩৩, পৃ ১৫৮-৫৯।

২ মূলে 'পঠাইল'।

পাওয়া যায় না। গোবিন্দ আচার্য্য নিজের রচিত পদে কি ভণিতা দিতেন তাহা জানা যায় না, কারণ গোবিন্দ আচার্য্যের কোন সম্পূর্ণ পদ পাওয়া যায় না। আচার্য্য যদি 'গোবিন্দদাস' ভণিতা ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে তাঁহার পদগুলি অপর গোবিন্দদাসদিগের পদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষে গোবিন্দদাস নামে দুইজন বড় পদকর্ত্তা ছিলেন। দুইজনেই শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন; ইঁহাদের নাম গোবিন্দদাস কবিরাজ এবং গোবিন্দ দাস চক্রবর্ত্তী। ইঁহাদের সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করা যাইতেছে।

আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় দশকের শেষের দিকে গোবিন্দদাস কবিরাজের জন্ম হয়। ইঁহার পিতার নাম চিরঞ্জীব, মাতার নাম সুনন্দা মাতামহের নাম দামোদর। সঙ্গীতদামোদর গ্রন্থের রচয়িতা দামোদর একজন বিখ্যাত পণ্ডিত ও কবি ছিলেন। গোবিন্দের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন রামচন্দ্র কবিরাজ। মাতুলালয় শ্রীখণ্ডেই গোবিন্দদাসের জন্ম হয়। অল্পবয়সে পিতৃ বিয়োগ হওয়াতে দুই ভাই মাতামহাবাসে পরিবর্দ্ধিত হন। পরে পৈতৃক-স্থান কুমারনগর এবং আরও পরে তথা হইতে তেলিয়া-বুধরী গ্রামে যাইয়া বসবাস করেন। গোবিন্দের স্ত্রীর নাম মহামায়া এবং একমাত্র পুত্রের নাম দিব্যসিংহ। ষট্‌ত্রিংশ বর্ষের বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকায় আমি গোবিন্দদাসের জীবনী এবং কবিতা লইয়া বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি। কৌতূহলী পাঠক তাহা দেখিতে পারেন।

চিরঞ্জীব শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার শ্বশুর দামোদর ছিলেন ঘোর শাক্ত। মাতামহের প্রভাবে রামচন্দ্র এবং গোবিন্দ দুইজনেই প্রথমবয়সে শাক্তধর্ম্মের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাহার পর প্রায় শেষযৌবনে গোবিন্দ শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিকট বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করেন। রামচন্দ্র এবং গোবিন্দের বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ বিষয়ে যে বর্ণনা প্রেমবিলাস প্রভৃতিতে পাওয়া যায় তাহা উপন্যাসকাহিনীর ন্যায় কৌতূহলোদ্দীপক। বৈষ্ণব হইয়া গোবিন্দ গুরুর আদেশে রাধাকৃষ্ণলীলাগীতি রচনা করিতে লাগিলেন। বৈষ্ণব হওয়ার পূর্ব্বে

বুলি পদ লিখিতেন ; এইরূপ একটির ভণিতা-শ্লোক প্রেমবিলাসে উদ্ধৃত আছে। সৌভাগ্যের বিষয় সম্পূর্ণ পদটি শ্রীখণ্ড হইতে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত রসনির্য্যাস নামক একটি পদসংগ্রহের মধ্যে পাইযাছি।[১] পদটির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য থাকায় এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

হেমহিমগিরি তুই তনু-ছিরি,
আধনর-আধনারী।
আধ উজর আধ কাজর,
তিনই লোচনধারী॥
দেখ দেখ, তুহুঁ মিলিত এক গাত।
ভকত- [পূজিত] ভুবনবন্দিত
ভুবন মারতি তাত (?)॥
আধ-ফণিময় আধ-মণিময়
হৃদয়ে উজোর হার।
আধ-বাঘাম্বর আধ-পট্টাম্বর
পিন্ধন তুঁহু উজয়ার॥
না দেব কামিনী [না] দেব কামুক
কেবল প্রেমপরকাশ।
গৌরীশঙ্কর- চরণকিঙ্কর
কহই গোবিন্দদাস॥

গোবিন্দদাস বিশুদ্ধ বাঙ্গালায কোন পদ রচনা করিয়াছিলেন কিনা জানা নাই। গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত বাঙ্গালা পদগুলিকে গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তীর রচনা বলিয়া ধরা হইযা থাকে। ইহা বৈজ্ঞানিক প্রণালী নহে বটে, কিন্তু কবিদ্বয়ের নিজ নিজ পদসংগ্রহের পুঁথি আবিষ্কৃত না হওয়া পর্য্যন্ত ইহার অতিরিক্ত কিছু বলিলে হয়ত ভুল করা হইবে। গোবিন্দদাস কবিরাজের পদগুলির ভাষায় এমন

[১] বঙ্গশ্রী ১৩৪০ মাঘ, পৃ ১৩৮।

একটা বিশেষত্ব আছে যাহাতে পদগুলিকে সহজেই অন্য কবির রচনা হইতে পৃথক্ করা যায়। কবিরাজের পদগুলির ভাষা "বিশুদ্ধ" (অর্থাৎ যতদূর সম্ভব কম বাঙ্গালা-পদবর্জ্জিত) ব্রজবুলি, এবং তাহাতে তদ্ভব অপেক্ষা তৎসম এবং অর্দ্ধ-তৎসম পদেরই আধিক্য। ইহার লেখায় ছন্দের বৈচিত্র্য যথেষ্ট আছে। অনুপ্রাসের ও উপমারূপকাদি অর্থালঙ্কারের প্রয়োগ কবিরাজের মত আর কোন পদ-কর্ত্তাই করিতে পারেন নাই। শব্দের ঝঙ্কারে এবং পদের লালিত্যে গোবিন্দদাস কবিরাজের গীতিকবিতাগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যে অপ্রতিদ্বন্দ্বী। এই বিষয়ে মৈথিল কবি বিদ্যাপতির সহিত কবিরাজের বিশেষ মিল দেখা যায়। কবিরাজের প্রেরণা আসিয়াছিল বিদ্যাপতির কবিতা হইতে। কবিরাজের কবিতাগুলির ভাব অনেক ক্ষেত্রেই সংস্কৃত উদ্ভট কবিতা হইতে নেওয়া। ইহাতে পদগুলির মধ্যে অর্থসংহতি হইয়াছে, এবং পদাবলী সাহিত্যের একঘেয়েমি যথেষ্ট পরিমাণে কাটিয়া গিয়াছে। তবে বলরামদাস এবং জ্ঞানদাসের পদে যেরূপ আন্তরিকতা আছে, কবিরাজের অধিকাংশ পদের মধ্যে সেরূপ আন্তরিকতার অভাব পরিলক্ষিত হয়। কবিরাজের কাব্যের বিশিষ্ট মাধুর্য্য কি, তাহা কবিরাজেরই কথায় বলিতে পারা যায়,

রসনারোচন শ্রবণবিলাস।
রচই রুচির পদ গোবিন্দদাস॥

এইবার কবিরাজের কাব্যের পরিচয় দিতেছি। নিম্নে উদ্ধৃত পদ দুইটি শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনা।

নন্দনন্দন- চন্দ চন্দন- গন্ধনিন্দিত অঙ্গ
জলদসুন্দর, কম্বুকন্ধর, নিন্দি সিন্ধুর ভঙ্গ॥
প্রেম-আকুল- গোপ, গোকুল- কুলজকামিনীকান্ত[১]
কুসুমরঞ্জন- কুঞ্জমন্দির সন্ত॥
গণ্ডমণ্ডল- বলিতকুণ্ডল, উড়ে চূড়ে শিখণ্ড।
কেলিতাণ্ডব- তাল-পণ্ডিত, বাহুদণ্ডিতদণ্ড॥

১। 'কন্ত' পড়িতে হইবে।

[illegible]লোচন কলুষমোচন শ্রবণরোচন ভাষ।
[illegible] কমল চরণ কিশলয়-[১] নিলয় গোবিন্দদাস॥[২]

[illegible]ত চরণে রণিতমণিমঞ্জীর, আধ-আধ পদ- চলনি রসাল।
[illegible]নবঞ্চন বসন মনোরম- অলিকুলমিলিত- ললিতবনমাল॥
ভালে বনি আওত মদনমোহনিয়া।
[illegible] অঙ্গ অনঙ্গতরঙ্গিম, রঙ্গিমভঙ্গিম- নয়ন-নাচনিয়া॥
[illegible] ক্ষীণ পীন-উর অম্বর প্রাতর-অরুণ- কিরণমণি রাজ।
[illegible]করভ- করহি করবন্ধন মলয়জকঙ্কণ বলয় বিরাজ॥
[illegible]সুধাঝর মুরলীতরঙ্গিণী- বিগলিত রঙ্গিণী- হৃদয়দুকূল।
[illegible]ল নয়ন ভ্রমর জনু ভ্রমি ভ্রমি উড়ি পড়ত শ্রুতি- উতপলফুল॥
[illegible]চন তিলক, চূড়ে বনি চন্দ্রক, বেঢ়ল রমণীমন- মধুকরমাল।
[illegible]বিন্দদাস চিতে নিতি নিতি বিহরই ইহ নাগরবর তরুণতমাল॥[৩]

[illegible]ম্নে উদ্ধৃত পদটি সখীর উক্তি। কৃষ্ণের প্রতি প্রেমসঞ্চার হওয়াতে রাধার [illegible] অনির্বচনীয় দুঃখ তাহাই ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে।

শুনইতে কানু-মুরলীরবমাধুরী শ্রবণে নিবারলুঁ তোর।
হেরইতে রূপ নয়নযুগ ঝাঁপলুঁ তব মোহে রোখলি ভোর।
সুন্দরি, তৈখনে কহল মো তোয়।
ভবমহিতা সঞে নেহ বাঢ়ায়বি জনম গোঙায়বি রোয়॥
বিনু গুণ পরখি পরক রূপলালসে কাহে সোঁপলি নিজ দেহা।
দিনে দিনে খোয়সি ইহ রূপলাবণি জীবইতে ভেল সন্দেহা॥
যো তুহুঁ হৃদয়ে প্রেমতরু রোপলি শ্যামজলদরস-আশে।
সো অব নয়ননীর দেই সীঁচহ কহতহি গোবিন্দদাসে॥[৪]

১। ছন্দের অনুরোধে 'কিশল' পড়িতে হইবে।
২। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ২৪১৯। ৩। ঐ, ২৪২৪। ৪। ঐ, ৪৩৫

পদটি অমরুশতকের নিম্নলিখিত শ্লোক অবলম্বনে রচিত।

অনালোচ্য প্রেম্নঃ পরিণতিমনাদৃত্য সুহৃদ-
স্ত্বয়াকাণ্ডে মানঃ কিমিতি সরলে প্রেয়সি কৃতঃ।
সমাশ্লিষ্টা হ্যেতে বিরহদহনোদ্ভাস্বরশিখাঃ
স্বহস্তেনাঙ্গারাস্তদলমধুনারণ্যরুদিতৈঃ ॥

নিম্নে উদ্ধৃত পদটিতে রাধার বর্ষাভিসারের ছবি চমৎকারভাবে ফুটিয়াছে।

মন্দিরবাহির কঠিন কপাট। চলইতে শঙ্কিল পঙ্কিল বাট ॥
তহি অতি দুবতর বাদল-দোল। বারি কি বারই নীল নিচোল॥
সুন্দরি কৈছে করবি অভিসার। হরি রহ মানসসুরধুনী-পার ॥
ঘন ঘন ঝনঝন বজর নিপাত। শুনইতে শ্রবণমরম জরি যাত ॥
দশদিশ দামিনীদহন-বিথার। হেরইতে উচকই লোচন-তার।
ইথে যদি সুন্দরি তেজবি গেহ। প্রেমক লাগি উপেখবি দেহ ॥
গোবিন্দদাস কহ ইথে কি বিচার ছুটল বাণ কিয়ে যতনে নিবার

নিম্নের পদটিতে রাসারম্ভের বর্ণনা করা হইয়াছে।

শরদচন্দ পবন মন্দ, বিপিনে ভরল কুসুমগন্ধ,
ফুল্ল মল্লিকা মালতী যূথী মত্তমধুকর ভোরনি।
হেরত রাতি ঐছন ভাতি, শ্যাম মোহনমদনে মাতি,
মুরলী গান পঞ্চমতান কুলবতীচিত চোরণি ॥
শুনত গোপী প্রেম রোপি মনহি মনহি আপন সোঁপি,
তাঁহি চলত যাঁহি বোলত মুরলীক-কললোলনি।
বিসরি গেহ নিজহুঁ দেহ, এক নয়নে কাজররেহ,
বাঁহে রঞ্জিত কঙ্কণ একু একু কুণ্ডল-দোলনি ॥
শিথিলছন্দ নীবিক বন্ধ বেগে ধাওত যুবতিবৃন্দ,
খসত বসন রশন চোলি গলিতবেণি-লোলনি।

১। ঐ, ৯৮৭ ২। ঐ, ১২৫৫

ততহিঁ বেলি সখিনী মেলি কেহু কাহুক পথ না হেরি
ঐছে মিলল গোকুলচন্দ, গোবিন্দদাস গায়নি ॥[১]

কৃষ্ণের মিলনের জন্য রাধার ব্যাকুলতা নিম্নে উদ্ধৃত পদটিতে অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

যাহা পহুঁ অরুণচরণে চলি যাত। তাঁহা তাঁহা ধরণী হইয়ে মঝু গাত ॥
যো সরোবরে পহুঁ নিতি নিতি নাহ। হাম ভরি সলিল হোই তথিমাহ ॥
এ সখি বিরহ মরণ নিরদ্বন্দ্ব। ঐছে মিলই যব শ্যামরচন্দ ॥
যো দরপণে পহুঁ নিজমুখ চাহ। মঝু অঙ্গ জোতি হোই তথি মাহ ॥
যো বীজনে পহুঁ বীজই গাত। মঝু অঙ্গ তাহে হোই মৃদুবাত ॥
যাহা পহুঁ ভরমই জলধরশ্যাম। মঝু অঙ্গ গগন হোই তছু ঠাম ॥
গোবিন্দদাস কহ কাঞ্চনগোরি। সো মরকত তনু তোহে কিয়ে ছোড়ি ॥[২]

পদটি নিম্নোদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক অবলম্বনে রচিত।

পঞ্চত্বং তনুরেতু ভূতনিবহাঃ স্বাংশান্ বিশন্তু স্ফুটং
ধাতস্ত্বাং শিরসা প্রণম্য কুরু মামিত্যত্থ যাচে পুনঃ।
তদ্বাপীষু পয়স্তদীয়মুকুরে জ্যোতিস্তদীয়ালয়-
ব্যোম্নি ব্যোম তদীয়বর্ত্মনি ধরা তত্তালবৃন্তেঽনিলঃ ॥[৩]

অনেকগুলি পদে গোবিন্দদাস ভণিতায় স্বীয় বান্ধবদিগের নাম করিয়া গিয়াছেন। এইরূপ একটি চমৎকার পদ নিম্নে তুলিয়া দিলাম। পদটিতে সন্দেহ অলঙ্কারের সাহায্যে শ্রীকৃষ্ণের রূপ বর্ণনা করা হইয়াছে।

সুরপতিধনু কি শিখণ্ডক চূড়ে। মালতীঝুরি কি বলাকিনী উড়ে ॥
ভাল কি ঝাঁপল বিধু-আধখণ্ড। করিবরকর কিয়ে ও ভুজদণ্ড ॥
ও কিয়ে শ্যাম নটরাজ। জলদকলপতরু তরুণীসমাজ ॥
করকিশলয় কিয়ে অরুণবিকাশ। মুরলীখুরলি কিয়ে চাতকভাষ।
হাস কি ঝরয়ে অমিয়ামকরন্দ। হার কি তারকজ্যোতিক ছন্দ ॥

১। পদকল্পতরু, ১২৫৫। ২। ঐ, ১৯৫৩। ৩। সুভাষিতাবলী, ৩৫৫, পদ্যাবলী, ৩৪০।

পদতল কি থলকমলঘনরাগ। তাহে কলহংস কি নূপুর জাগ॥
গোবিন্দদাস কহয়ে মতিমন্ত। ভুলল যাহে দ্বিজ রায় বসন্ত॥[১]

নয়টি পদের ভণিতায় বিদ্যাপতির উল্লেখ আছে। পদামৃতসমুদ্র সঙ্কলয়িতা রাধামোহন ঠাকুরের মতে গোবিন্দদাস কবিরাজ বিদ্যাপতির কতকগুলি অসম্পূর্ণ পদ সম্পূর্ণ করিয়াছিলেন; সেই পদগুলিতে তিনি নিজের এব বিদ্যাপতির যুক্ত ভণিতা প্রয়োগ করিয়াছেন। রাধামোহন ঠাকুরের এই মত সর্ব্বাংশে যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না। আমার মনে হয় যে, গোবিন্দদাস কতকগুলি পদ বিদ্যাপতির পদের প্রত্যুত্তরস্বরূপ রচনা করিয়াছিলেন, এবং সেই গুলিতে তিনি বিদ্যাপতির নাম করিয়া গিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি, বিদ্যাপতির দুই একটি পদে "নিকরুণ মাধব" এই উক্তি আছে। সম্ভবতঃ এই জাতীয় উক্তিকেই লক্ষ্য করিয়া গোবিন্দদাস লিখিয়াছেন,

বিদ্যাপতি কহ নিকরুণ মাধব,
গোবিন্দদাস রসপূর॥

কবির বন্ধুস্থানীয় 'বিদ্যাপতি' উপাধিক কোন কবির অস্তিত্ব থাকাও অসম্ভব নহে। শ্রীখণ্ডের কবিরঞ্জনের 'বিদ্যাপতি' উপাধি ছিল।

গোবিন্দদাস কবিরাজ সঙ্গীতমাধব নামে একটি সংস্কৃত গীতিনাট্য বা গীতিকাব্য (গীতগোবিন্দের ধরণে ?) রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কাব্যটি অধুনা লোপ পাইয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে।

গোবিন্দদাসের সহিত বৃন্দাবনস্থ শ্রীজীব গোস্বামীর পত্র ব্যবহার হইত। এইরূপ একখানি পত্র ভক্তিরত্নাকরে উদ্ধৃত আছে। ইঁহার কবিত্বশক্তিতে মুগ্ধ হইয়া শ্রীজীব গোস্বামী ইঁহাকে "কবিরাজ" বা "কবীন্দ্র" উপাধি প্রদান করেন।

গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তীও শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন। ভগবৎ প্রেমিকতার জন্য ইনি 'ভাবক-চক্রবর্ত্তী' নামে আখ্যাত হইতেন। ইঁহার বাসস্থান

১। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১০৫০।

ছিল বোরাকুলি গ্রামে। ইহার পত্নীর নাম সুচরিতা, এবং তিন পুত্রের নাম যথাক্রমে রাজবল্লভ, রাধাবিনোদ এবং কিশোরীদাস।

রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীর রচয়িতা রামগোপালদাসের মতে, পদকল্পতরু-ধৃত [illegible] সংখ্যক পদটি চক্রবর্ত্তীর রচনা, এবং পদামৃতসমুদ্রের সঙ্কলয়িতা রাধামোহন-ঠাকুরের মতে, পদকল্পতরুধৃত ১৩৩, ২৬৭, ২৭৭ এবং ১৯৫৬ সংখ্যক পদগুলিও চক্রবর্ত্তীর রচিত। পদকল্পতরুর সঙ্কলয়িতা বৈষ্ণবদাসের মতে একটি "বারমাস্যা কবিতার" [১৮০২-১৮১৩] শেষ ছয়টি পদ গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তীর রচনা। চক্রবর্ত্তী বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি উভয় ভাষাতেই পদরচনা করিতেন। 'গোবিন্দদাস' এবং 'গোবিন্দদাসিয়া' ভণিতাযুক্ত বাঙ্গালা পদগুলি প্রায় সবই চক্রবর্ত্তীর লেখা বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। তবে এরূপ কতকগুলি পদ গোবিন্দ আচার্য্যের রচনা হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নয়। নিম্নে এইরূপ দুইটি সুন্দর পদ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। প্রথমটি কৃষ্ণের মথুরায় অবস্থিতি কালে রাধার বিরহ-বেদনার বর্ণনা; দ্বিতীয়টিতে শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শুনিয়া রাধার ও গোপীদের নিকুঞ্জে গমন বর্ণিত হইয়াছে।

পিয়ার ফুলের বনে পিয়াসী ভ্রমরা।
পিয়া বিনে মধু না খায় উড়ে বেড়ায় তারা॥
মো যদি জানিতাম পিয়া যাবে রে ছাড়িয়া।
পরাণে পরাণ দিয়া রাখিতাম বাঁধিয়া॥
কোন নিদারুণ বিধি মোর পিয়া নিল।
এ ছার পরাণ কেনে অবহুঁ রহিল॥
মরম ভিতর মোর রহি গেল দুখ।
নিচয় মরিব পিয়ার না দেখিয়া মুখ॥
এইখানে করিত কেলি নাগররাজ।
কেবা নিল কিবা হৈল কে পাড়িল বাজ॥

সে পিয়ার প্রেয়সী আমি আছি একাকিনী।
এ ছার শরীরে রহে নিলাজ পরাণী ॥
চরণে ধরিয়া কহে গোবিন্দদাসিয়া।
মুঞি অভাগিয়া আগে যাইব মরিয়া ॥[১]

শুনিয়া মধুর মুরলীতান সহিল নহিল রসের প্রাণ,
অন্তরে ভেদল মদন-বাণ, চলল নিকুঞ্জ মাঝে রে।
অঙ্গে পহির জলদবাস, বিধির অবধি লাসবিলাস,
প্রেম ঢলঢল ঈষত হাস, শ্যামমোহিনী সাজে রে ॥[২]
কুটিল কুন্তলে[৩] কবরী রাজ, রতনজড়িত খোপার সাজ,
কনকচম্পক[৪] মাঝহি মাঝ, মল্লিকা মালতী ঘেরিয়া।
জিনি সরোরুহ চরণদ্বন্দ্ব[৫], নখমণি তাহে বিধুকে নিন্দ,
রসের আবেশে গমন মন্দ, মদন কান্দয়ে হেরিঞা ॥
রচিঞা মঙ্গলকেলি-সুসাজ, চৌদিকে বেড়িঞা নাগরি রাজ[৬],
প্রবেশ করল নিকুঞ্জ মাঝ, মিললহু শ্যামরায় রে।
নয়নে নয়নে মিলল কাহ্নু, উপজল কত রসের বান,
ও রসসায়রে গোবিন্দ ডুবল[৭], কি দিব উপমা তায় রে ॥[৮]

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে রায় বসন্ত, কবিরঞ্জন এবং রায় শেখরের নাম করিতে হয়। কবিরঞ্জনের ভাল ভাল পদগুলি সব বিদ্যাপতির নামেই চলিতেছে। কবিরঞ্জন শ্রীখণ্ডের অধিবাসী এবং রঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন।

১। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ১৬৫৫।

২। পাঠান্তর 'মধুর মধুর কোমল হাস কঙ্কণ কিঙ্কিণী বাজে রে ॥'

৩। ঐ 'চাঁচর চিকুরে'। ৪। ঐ 'কুন্দ কনয়'। ৫। ঐ 'চরণচন্দ'।

৬। ঐ 'রচিঞা মণ্ডল কেলি সুসাজ, চৌদিক গোপিনি, মাঝে বাজার প্রবেশিল্যা কুঞ্জকানন মাঝ'।

৭। ঐ 'সে রসে হিলোলে গোবিন্দদাস'। ৮। সঙ্কীর্ত্তনামৃত, ৩২৯, ব-সা-প-প ৩৬, ১১১ ৩৬

উহার 'বিদ্যাপতি' উপাধি ছিল।[১] রায় বসন্ত নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। রায় শেখর ছিলেন রঘুনন্দনের শিষ্য। ইনি 'রায় শেখর', 'কবিশেখর', 'কবি শেখর রায়', 'শেখর রায়', 'শেখর', 'দুখিয়া শেখর', 'পাপিয়া শেখর', 'শেখরদাস' ইত্যাদি ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। ভাল, মন্দ এবং মাঝারি রকমের বিস্তর পদ রায় শেখর রচনা করিয়াছিলেন। গোপালবিজয় নামক একখানি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যও ইনি রচনা করিয়াছিলেন। শেখরের পরিচয় গোপালবিজয়ের আলোচনাপ্রসঙ্গে পরে দেওয়া হইতেছে। ব্রজবুলি কবিতা রচনার দক্ষতায় গোবিন্দদাসের পরেই কবিরঞ্জন এবং রায় শেখরের নাম করিতে হয়। রায় শেখরেরও অনেক ভাল ভাল ব্রজবুলি পদ বিদ্যাপতির নামে চলিয়া গিয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত সুবিখ্যাত পদটি পীতাম্বরদাসের অষ্টরসব্যাখ্যায় এবং পদরত্নাকরে শেখরের ভণিতাতেই পাওয়া গিয়াছে। বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে শেখরের ভণিতাযুক্ত ছত্রটিই সঙ্গততর পাঠ বলিয়া মনে হয়।

এ সখি, হামারি দুখের নাহি ওর।
এ ভর বাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর॥
ঝম্পি ঘন গরজন্তি সন্ততি, ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া।
কান্ত পাহুন, কাম দারুণ সঘনে খর শর হন্তিয়া॥
কুলিশ কত শত পাতমোদিত মউর নাচত মাতিয়া।
মত্ত দাদুরি ডাকে ডাহুকি, ফাটি যায়ত ছাতিয়া॥
তিমির ভরি ভরি ঘোর যামিনী, ন থির বিজুরিক পাঁতিয়া।
ভণয়ে শেখর, কৈছে নিরবহ[২] সো হরি বিনু ইহ রাতিয়া॥[৩]

শেখরের রচিত আর একটি উৎকৃষ্ট ব্রজবুলি পদ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কাজররুচিহর রয়নি বিশালা। তছু পর অভিসার করু ব্রজবালা॥
ঘর সঞে নিকসয়ে যৈছন চোর। নিশবদ পথগতি চললিহ থোর।

১। ব-সা-প-প, ৩৭ পৃ ৪৩। ২। 'বঞ্চব' পাঠান্তর।

৩। সাধারণ্যে প্রচলিত ভণিতা হইতেছে 'বিদ্যাপতি কহ কৈছে গোঙায়বি হরি বিনে দিন রাতিয়া' [পদকল্পতরু, ১৭৩৫]। এখানে দিনের কথা আসে না, শুদ্ধ রাত্রির উল্লেখই যুক্তিযুক্ত।

উনমত চিত অতি আরতি-বিথার। গুরুয়া নিতম্ব নবযৌবনভার ॥
কমলিনী মাঝা থিনি উচ কুচজোর। ধাধসে চলু কত ভাবে বিভোর ॥
রঙ্গিণী সঙ্গিনী নব নব জোরা ॥ নব-অনুরাগিণী নবরসে ভোরা ॥
অঙ্গক অভরণ বাসয়ে ভার। নূপুর কিঙ্কিণী তেজল হার ॥
লীলাকমল উপেখলি রামা। মন্থরগতি চলু ধরি সখী শ্যামা
যতনহি নিঃসরু নগর দুরন্তা। শেখর অভরণ ভেল বহন্তা ॥[১]

পূর্ব্বে খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর প্রধান প্রধান পদকর্ত্তাদের পরিচয় দিয়াছি; অপ্রধান পদকর্ত্তা, অর্থাৎ যাঁহারা অনধিক পাঁচ ছয়টি পদ রচনা করিয়াছিলেন (—অথবা যাঁহাদের ঐরূপ সংখ্যার পদ এ পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে—), তাঁহার সংখ্যায় সুপ্রচুর। এই সকল পদকর্ত্তাদের কোন কোন পদ অনেক ক্ষেত্রেই মুখ্য পদকর্ত্তাদের পদের তুলনায় হীন নহে। ইঁহাদের কথা সংক্ষেপে বলিতেছি।

মহাপ্রভুর সঙ্গী ও ভক্তদিগের মধ্যে অনেকেই কিছু না কিছু পদ রচনা করিয়াছিলেন। মুরারি গুপ্ত নরহরি সরকার, রামানন্দ বসু, বাসুদেব ঘোষ, মাধব ঘোষ, গোবিন্দ ঘোষ, বংশীবদন—ইঁহাদের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। বাসুদেব দত্তকে শ্রীচৈতন্য অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন। ইঁহার রচিত একটি ব্রজবুলি পদ পাওয়া গিয়াছে।[২] শিবানন্দ ভণিতাযুক্ত পদগুলির মধ্যে একটি মাত্র পদ[৩] শিবানন্দ সেনের রচিত বলিতে পারা যায়; বাকীগুলি প্রায় সবই গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শিবানন্দ আচার্য্য বা শিবানন্দ চক্রবর্ত্তীর রচনা বলিয়া বোধ হয়। গোবিন্দ আচার্য্য নামে মহাপ্রভুর এক ভক্ত বড় পদকর্ত্তা ছিলেন। দুইটি পয়ার শ্লোক শ্রীগোবিন্দ আচার্য্য ঠাকুরের রচনা বলিয়া রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীতে উল্লিখিত হইয়াছে।[৪] ইঁনি

১। পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ২৭০৬।

২। ক্ষণদাগীতচিন্তামণি, ২১৭। বটতলা সংস্করণে শুধু বাসুদেবের ভণিতা আছে। পদকল্পতরুতে [২৯২৫] পদটি গোবিন্দদাসের ভণিতায় পাওয়া যায়।

৩। গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃ ৩৮২।

৪। ব-সা-প-প ৩৭, পৃ ১১৫।

ধারাবাহিকভাবে বৃন্দাবনলীলাবিষয়ে পদ রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।[১] সম্ভবতঃ ইনি 'গোবিন্দদাস' অথবা 'গোবিন্দদাসিয়া' এই ভণিতা ব্যবহার করিতেন। এই কারণেই বোধ হয় ইহার পদ পরবর্ত্তী গোবিন্দদাস-দ্বয়ের পদের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। তথাপি সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে কতকগুলি পদ গোবিন্দ আচার্য্যের রচনা বলিয়া ধরা পড়ে। দুই একটি উদাহরণ দিতেছি। একটি গৌরচন্দ্রিকা পদের ভণিতা শ্লোকটি এইরূপ—

এমন দয়ালু দাতা আর না পাইব কোথা,
পাইয়া হেলায় হারাইল।
গোবিন্দদাসিয়া কয়, অনলে পুড়িনু নয়
সহজেই আত্মঘাতী হৈনু॥[২]

এখানে স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে যে, পদকর্ত্তা শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক ছিলেন এবং তিনি মহাপ্রভুর সংস্পর্শেও আসিয়াছিলেন। সুতরাং এই পদটি গোবিন্দদাস কবিরাজ কিংবা গোবিন্দদাস চক্রবর্ত্তীর রচনা হইতে পারে না। পদকল্পতরু, সংকীর্ত্তনামৃত এবং অন্যান্য পদসংগ্রহ গ্রন্থে গোবিন্দদাস ভণিতায় দানলীলা-সংক্রান্ত কতকগুলি পদ পাওয়া যায়। ইহার মধ্যে অল্প কয়েকটি পদে[৩] দেখা যায় যে, রাধাপ্রমুখ গোপীরা স্বর্ণঘটে করিয়া দাসীর সাহায্যে যজ্ঞার্থ ঘৃত লইয়া যাইতেছেন, এবং এই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ সুবলাদি সখাগণকে সঙ্গে লইয়া দানছলে রাধাকে অবরোধ করিয়াছেন। দানলীলার এইরূপ ব্যাখ্যা হইতে সহজেই বোঝা যায় যে, এই

১। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় কবি-কর্ণপূর লিখিয়াছেন,

পৌর্ণমাসী ব্রজে যাসীদ্ গোবিন্দানন্দকারিণী।
আচার্য্যশ্রীলগোবিন্দো গীতপদ্যাদিকারকঃ॥ ৪১॥

মাধবদাসের বৈষ্ণববন্দনায় আছে,

গোবিন্দ আচার্য্য পদ করিল বন্দন।
রাধাকৃষ্ণরহস্য যে করিল বর্ণন॥ পৃ ২০॥

দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায় আছে,

গোবিন্দ আচার্য্য বন্দো সর্ব্বগুণশালী।
যে করিল রাধাকৃষ্ণের বিচিত্র ধামালী॥

২। কীর্ত্তনগীতরত্নাবলী, ৮৮৪।

৩। যথা পদকল্পতরু, ১৩৭৩।

পদগুলি শ্রীরূপ গোস্বামীর দানকেলিকৌমুদী ইত্যাদি গ্রন্থের পরবর্ত্তী রচনা। অপর পদগুলি সংখ্যায় বেশী; সেগুলিতে দেখা যায় যে, রাধাপ্রমুখ গোপীরা দধি দুগ্ধ ঘৃত মাথায় করিয়া মথুরায় বিক্রয় করিবার জন্য লইয়া যাইতেছেন। দানলীলার এই রূপটিই প্রাচীনতর এবং সঙ্গত। যদিও এইরূপ ভাবের দানলীলার বর্ণনা ষোড়শ শতাব্দীর পরবর্ত্তী কালে রচিত বহু শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গ্রন্থে পাওয়া যায়, তথাপি একথা স্বীকার করিলে বিশেষ ভুল হইবে না যে, এইরূপ পদগুলি প্রায়শঃই ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত হইয়াছিল। গোবিন্দদাস ভণিতাযুক্ত এইরূপ একটি দানলীলার পদের সম্বন্ধে একটু মজার ব্যাপার আছে। পদকল্পতরুতে৭ [২৩৯৯] যে পাঠ মুদ্রিত আছে তাহার মধ্যে এই ছত্রটি আছে, "সঙ্গে সবে ঘৃতের পসার", পদরত্নাকর, সংকীর্ত্তনামৃত এবং পদামৃতসিন্ধু প্রভৃতি গ্রন্থে ঘৃতের স্থলে "দধির" পাঠ আছে এবং অতিরিক্ত এই পয়ারটিও আছে,

সবে[১] আছে ঘৃত দুগ্ধ দধি।
ইহাতে পাইবে কোন সিধি।

পদকল্পতরুতে ইচ্ছাপূর্ব্বক এই পয়ারটি বাদ দেওয়া হইয়াছে এবং 'দধির' এই পাঠ পরিবর্ত্তিত করা হইয়াছে। এই পদটি এবং এইজাতীয় কতকগুলি পদ গোবিন্দ আচার্য্যের রচনা বলিয়া মনে করি।

নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু এবং শ্রীগৌরাঙ্গের অন্যান্য পারিষদ এবং শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকগুলি ছোটখাট পদকর্ত্তা ছিলেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত-রচয়িতা বৃন্দাবনদাস কয়েকটি পদ লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু বৃন্দাবনদাস ভণিতার অনেকগুলি পদ পরবর্ত্তী কবির রচনা। একটি ভাল ব্রজবুলি পদ[২] বৃন্দাবন-দাসের লেখা বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। এই পদটি কিন্তু কীর্ত্তনগীত-রত্নাবলীতে গোবিন্দদাসের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। ঘনশ্যামদাসের একটি পদের সহিতও এই পদটির কিছু সাদৃশ্য আছে। চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন এক ব্যক্তি, নাম 'আচার্য্য চন্দ্র' নিত্যানন্দ প্রভুর পারিষদ ছিলেন।

১। 'তাহে' পাঠান্তর। ২। পদকল্পতরু, ৪৬৮।

ইহার রচিত একটি নিত্যানন্দবন্দনার পদ একাধিক পুঁথিতে পাইয়াছি। পরমেশ্বরদাস ভণিতায় একটি পদ বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদের একটি পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে। এই পদটির রচয়িতা নিত্যানন্দ প্রভুর ভক্ত পরমেশ্বরদাস বা পরমেশ্বরী দাস কি না বলা কঠিন। "দ্বিজ" হরিদাসের নামসঙ্কীর্ত্তন শীর্ষক শ্রীকৃষ্ণের অষ্টোত্তরশতনামসংবলিত কবিতাটি ছাড়াও কতকগুলি পদ প্রচলিত আছে। ইনি মহাপ্রভুর ভক্ত ছিলেন। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা মাধব আচার্য্য অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য ছিলেন। মাধবদাস ভণিতায় কোন পদ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে পাওয়া যায় নাই, সুতরাং ইনিই যে মাধবদাস ভণিতাযুক্ত পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতার নামও মাধব আচার্য্য। তিনি পদকর্ত্তা ছিলেন কিনা জানা নাই।

মাধবীদাস ভণিতাযুক্ত পদগুলিকে প্রায় সকলেই উড়িয়া মহিলা মাধবী মাহিতীর রচনা বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ইহা যুক্তিলেশহীন অনুমান মাত্র। মাধবীদাস ভণিতার একটি পদ[১] হইতে অনুমান হয় যে, পদকর্ত্তা মহাপ্রভুর বিশিষ্ট পারিষদ জগদানন্দ পণ্ডিতের শিষ্য ছিলেন। কয়েকটি পদের ভণিতায় 'মাধুবীদাস' এই পাঠান্তর পাওয়া যায়। পদকর্ত্তা কানুদাস সদাশিব কবিরাজের পৌত্র এবং পুরুষোত্তম গুপ্তের পুত্র ছিলেন। কানুদাসও নিত্যানন্দ প্রভুর ভক্ত এবং অনুচর ছিলেন।[২] পুরুষোত্তম গুপ্তের শিষ্য দেবকীনন্দন বৈষ্ণববন্দনার এবং বৈষ্ণব-অভিধানের রচয়িতা। ইনি কতিপয় পদও লিখিয়া গিয়াছেন। চৈতন্যদাস ভণিতায় যে পদগুলি পাওয়া গিয়াছে তাহার সবগুলি না হউক অন্ততঃ বেশীর ভাগ বংশীবদনের পুত্র চৈতন্যদাসের রচনা। 'শিবানন্দ', 'শিবাই' প্রভৃতি ভণিতার অধিকাংশ পদ গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য শিবানন্দ চক্রবর্ত্তীর রচনা। গদাধরদাসের শিষ্য যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী একজন বড় পদকর্ত্তা ছিলেন; ইহার পদগুলির অধিকাংশই পরবর্ত্তী কবি বৈদ্য যদুনন্দনের পদের সহিত মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। কবি-কর্ণপূরের এক শিষ্য ছিলেন উদ্ধবদাস, ইনিও একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। ইহার অধিকাশ পদ পরবর্ত্তী উদ্ধবদাসের পদের সহিত

১। ঐ, ১৮৫৩। ২। ঐ, ২৩২১ দ্রষ্টব্য।

মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। পরবর্ত্তী উদ্ধবদাস অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক। ইনি পদ-কল্পতরু-সঙ্কলয়িতা গোকুলানন্দ সেন ওরফে বৈষ্ণবদাসের বন্ধু ছিলেন। ইঁহার প্রকৃত নাম ছিল কৃষ্ণকান্ত মজুমদার। উভয় বন্ধুই হরি আচার্য্যের বংশধর রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন। 'আত্মারাম' বা 'আত্মারামদাস' ভণিতায় দুই একটি পদ পাওয়া যায়। এই আত্মারাম সম্ভবতঃ প্রেমবিলাস-রচয়িতা নিত্যানন্দদাসের পিতা ছিলেন। এই নিত্যানন্দদাসের রচিত কয়েকটি পদ কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধুতে পাওয়া গিয়াছে। ক্ষণদাগীতচিন্তামণি এবং পদকল্পতরুতে 'গুপ্তদাস' ভণিতায় একটি পদ আছে। পদটি নিত্যানন্দ-বন্দনা। অনুরূপ শেষচরণযুক্ত আর একটি পদ পাওয়া গিয়াছে। এই পদটি নিত্যানন্দ প্রভুর অন্যতম মুখ্য পারিষদ অভিরামদাসের বন্দনা। সুতরাং 'গুপ্তদাস' মুরারি গুপ্ত হইতে পারেন-না; ইনি অভিরামদাসের শিষ্য বা ভক্ত ছিলেন বলিয়াই বোধ হয়।

যদুনাথ ভণিতায় অনেকগুলি পদ পাওয়া গিযাছে। যদুনন্দন চক্রবর্ত্তী এবং বৈদ্য যদুনন্দন ইঁহারা উভয়েই ছন্দের অনুরোধে মধ্যে মধ্যে যদুনন্দনের স্থলে 'যদুনাথ' ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন; তথাপি ইহা স্বীকার করিতে হয় যে, যদুনাথ নামে একজন স্বতন্ত্র পদকর্ত্তা ছিলেন। কতকগুলি পদ দৃষ্টে ইঁহাকে ষোড়শ শতাব্দীর লোক বলিয়া মনে হয়। ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর অনুচর যদুনাথ কবিচন্দ্র ছিলেন বলিয়া বোধ হয় না, যেহেতু ইঁহার রচিত কোন নিত্যানন্দ-বন্দনা পাওয়া যায় নাই। কতকগুলি পদ কোন অর্ব্বাচীন যদুনাথের রচিত বলিয়া অনুমান হয়।

পদকল্পতরুতে চন্দ্রশেখর ভণিতায় যে তিনটি পদ আছে তাহা শশিশেখরের ভ্রাতা প্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা চন্দ্রশেখরের পূর্ব্ববর্ত্তী কোন কবির রচিত। পদ তিনটির মধ্যে দুইটি গৌরচন্দ্রিকা; এই দুইটি পদ পাঠ করিলে অনুমান হয় যে, কবি মহাপ্রভুর সমসাময়িক ছিলেন। মহাপ্রভুর মেসো চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন এই পদগুলি রচনা করিয়াছিলেন, ইহাই প্রচলিত ধারণা। আমার মনে হয়, এই পদকর্ত্তা নরহরি সরকার ঠাকুরের শিষ্য শ্রীখণ্ড-নিবাসী বৈদ্য চন্দ্রশেখর[১]

১। রামগোপালদাস প্রণীত শাখানির্ণয়, (শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত), পৃ ৬-৭ দ্রষ্টব্য।

ভিন্ন আর কেহই নহেন। পদকল্পতরু-ধৃত তৃতীয় পদটি হইতে স্পষ্টই জানা যায় যে, ইনি মহাপ্রভুর অন্যতম প্রধান পারিষদ চন্দ্রশেখর আচার্য্যরত্ন হইতে পারেন না। সঙ্কীর্ত্তনামৃতে চন্দ্রশেখর ভণিতায় যে দুইটি ব্রজবুলি পদ আছে, তাহাও এই শ্রীখণ্ডীয় চন্দ্রশেখরের রচনা বলিয়া অনুমান করি। পদকল্পতরুতে লক্ষ্মীকান্তদাস ভণিতায় একটি গৌরচন্দ্রিকা পদ আছে। ইনি নরহরি সরকার ঠাকুরের শাখা "লক্ষ্মীকান্ত ঠাকুর পূজারী"[১] বলিয়া বোধ হয়। পদকল্পতরু-স্থিত বিজয়ানন্দদাস ভণিতার পদটি মহাপ্রভুর আঁখরিয়া বিজয়দাসের রচনা বলিয়া সাধারণতঃ অনুমিত হইয়া থাকে। ইহা অসম্ভব বলিয়া মনে হয় না, কারণ ঐ গৌরচন্দ্রিকা পদটি পাঠ করিলে বোধ হয় যে, পদকর্ত্তা মহাপ্রভুকে দেখিয়াছিলেন। পদকল্পতরুতে গৌরীদাস ভণিতায় দুইটি মাত্র পদ পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে প্রথম পদটি কোন কোন পুঁথিতে গৌরদাস ভণিতায় এবং কীর্ত্তনানন্দে ভণিতাহীন-রূপে পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পদটি নিত্যানন্দ প্রভুর কোন অনুচরের রচনা বলিয়া বোধ হয়। ইনি গৌরীদাস পণ্ডিতও হইতে পারেন, গৌরীদাস কীর্ত্তনীয়াও হইতে পারেন। ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে শঙ্কর ঘোষ ভণিতায় একটি ব্রজবুলি এবং একটি বাঙ্গালা পদ পাওয়া যায়। ব্রজবুলি পদটি সংকীর্ত্তনামৃতে মুকুন্দদাস ভণিতায় দুইবার উদ্ধৃত করা হইয়াছে, আর বাঙ্গালা পদটি পদকল্পতরুতে বৃন্দাবনদাসের ভণিতায় পাওয়া গিয়াছে। পদ দুইটি যদি যথার্থই শঙ্কর ঘোষের হয়, তবে প্রমাণান্তরের অভাবে তাঁহাকে মহাপ্রভুর সমক্ষে যিনি শিবের গান গাহিয়া নৃত্য করিয়াছিলেন তাঁহার সহিত অভিন্ন প্রতিপন্ন করা অনুচিত নহে। 'দাস' স্থলে 'ঘোষ' ভণিতা হইতে বোঝা যায় যে, ইনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের লোক। ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে মহেশ বসু ভণিতার ব্রজবুলি পদটি পদরসসারে রামানন্দ বসুর ভণিতায় পাওয়া যায়।[২] পদটি যদি সত্যই মহেশ বসুর রচনা হয় তাহা হইলে 'বসু' এই পদবীযুক্ত ভণিতাদৃষ্টে বলা যাইতে পারে যে, ইনি ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে জীবিত ছিলেন। কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধুতে গোপীকান্ত বসু ভণিতায় একটি বাঙ্গালা পদ পাইয়াছি। ইনিও ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের লোক হইবেন।

১। ঐ, পৃ ৭। ২। অপ্রকাশিতপদরত্নাবলী, ৪১৩।

পদকল্পতরুতে কৃষ্ণদাস ভণিতার পদ তিনটি[১] এবং 'দীন কৃষ্ণদাস' ভণিতায় মিশ্র ব্রজভাষায় রচিত পদটি[২] কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর রচনা হইতে পারে। 'দীন কৃষ্ণদাস,' 'দুঃখী কৃষ্ণদাস' এবং 'দীন দুঃখী কৃষ্ণদাস' ভণিতার পদ তিনটি[৩] শ্যামানন্দের রচনা হওয়াই সম্ভব। শ্যামানন্দ গৌরীদাস পণ্ডিতের অনুশিষ্য, আর এই পদ তিনটিতে গৌরীদাসের প্রতি মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর অনুগ্রহ বর্ণনা করা হইয়াছে। গৌরীদাস পণ্ডিতের এক ভ্রাতার নাম ছিল কৃষ্ণদাস। তিনিও এই পদগুলির রচয়িতা হইতে পারেন। গোপাল ভট্ট রচিত তিনটি ব্রজভাষা পদ[৪] পদকল্পতরুতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের রচিত গুটিপাঁচেক পদ পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত পদটিতে লোচনদাসের প্রভাব থাকিলেও পদটিকে প্রশংসা করিতে হয়। কর্ণানন্দ এবং পদকল্পতরু ধৃত পাঠ মিলাইয়া নিম্নের পাঠ স্থির করা হইয়াছে; শ্লোকের পর্য্যায় দুইটি গ্রন্থে পৃথক্ রকম। কর্ণানন্দের পর্য্যায়ই গ্রহণ করা হইয়াছে।

বদনচাঁদ কোন কুন্দারে কুন্দিল গো,
কে না কুন্দিলে দুটি আঁখি।
দেখিতে দেখিতে মোর পরাণ যেমন করে,
সেই সে পরাণ তার সাথী॥
রতন কাঢ়িয়া অতি যতন করিয়া গো
কে না গড়িয়া দিল কানে।
মনের সহিতে মোর এ পাঁচ পরাণি গো,
যোগী হবে উহারি ধেয়ানে॥
নাসিকা উপরে শোভে এ গজমুকুতা গো,
সোনায় মড়িত তার পাশে।

১। পদকল্পতরু, ২৮৫৯, ২৮৬০। ২। ঐ, ১০৮৫। ৩। ঐ, ২৩৫৮-২৩৬০
৪। ঐ ১০৮৮, ২৮৩৩ ২৯৬৬।

বিজুরী জড়িত যেন চাঁদের কলিকা গো
মেঘের আড়ালে থাকি হাসে ॥[১]

মদন-ফাঁদ ও না চূড়ার টালনি গো,
উহা না শিখিয়া আইল কোথা।
এ বুক ভরিঞা মুঞি উহা না দেখিনু গো,
এই বড় মরমের ব্যথা ॥

অমিয়া মধুর বোল সুধা থানি থানি গো,
হাতের উপরে লাগি পাও।
তেমন করিয়া যদি বিধাতা গঢ়িত গো,
ভাঙ্গিয়া ভাঙ্গিয়া উহা খাও ॥

করভের কর জিনি বাহুর বলনি গো,
হিঙ্গুলে মড়িত তার আগে।
যৌবন বনের পাখী পিয়াসে মরয়ে গো,
উহারি পরশরস মাগে ॥

অমিয়া-মাখল কিবা চন্দন তিলক গো
কপালে সাজিয়া দিল কে।
নিরখিয়া চাঁদমুখ কেমনে ধরিব বুক,
পরাণে কেমনে জীয়ে সে ॥[২]

১। ইহার পরে কর্ণানন্দে এই দুই পংক্তি আছে,

সুন্দর কপালে শোভে সুন্দর তিলক গো,
তাহে শোভে অলকার পাঁতি।
হিয়ার ভিতরে মোর ঝলমল করে গো,
চান্দে যেন ভ্রমরের পাঁতি ॥

২ এই পংক্তিদ্বয় পদকল্পতরুতে নাই।

চরণে নূপুরধ্বনি খঞ্জনরব জিনি,
গমন মন্থর গজমাতা।
অমিয়া-রসের ভাসে ডুবল শ্রীনিবাসে,
প্রেমসিন্ধু গঢল বিধাতা ॥[১]

শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই পদকর্ত্তা ছিলেন। ইহাদের বিষয় পরে সপ্তদশ শতাব্দীর কবিদিগের প্রসঙ্গে আলোচনা করা যাইবে।

শ্রীচৈতন্যের জীবনী গ্রন্থগুলি বাঙ্গালা সাহিত্যের গতানুগতিকতাকে অতিক্রম করিয়া এক নবতর সৃষ্টিরূপে প্রকাশ পাইল। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্য বলিতে যাহা বুঝাইত তাহার উপজীব্য বিষয় ছিল পৌরাণিক ও ছদ্ম-পৌরাণিক কাহিনী এবং লোকসমাজে প্রচলিত সামান্য দেবদেবীর তুচ্ছ রাগদ্বেষ এবং সন্তুষ্টির আখ্যান। এইরূপ সঙ্কীর্ণ বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়া মানুষের শাশ্বত আশা আকাঙ্ক্ষার প্রকাশ হওয়া অসম্ভব ছিল। যোগীপাল-মহীপালের গীত আমরা পাই নাই, তথাপি একথা জোর করিয়া বলা যায় যে, পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত প্রকৃত ঐতিহাসিক বিষয় অবলম্বন করিয়া সাহিত্য বলিয়া গণ্য হইতে পারে এমন কোন কিছু রচিত হয় নাই। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতে গীতিকবিতায় এবং তৃতীয় বা চতুর্থ দশক হইতে জীবনীকাব্যে শুধু ঐতিহাসিক নহে, একজন সমসাময়িক ব্যক্তির চরিত্র সাহিত্যের উপজীব্য বিষয় হইয়া দাঁড়াইল। তৎকালীন বাঙ্গালা সাহিত্যের পক্ষে ইহা বিস্ময়কর এবং অভূতপূর্ব্ব ব্যাপার। শ্রীচৈতন্যের অলৌকিক ব্যক্তিত্বের মধ্যে সেই সময়ের শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বাঙ্গালীর মন তথা সাহিত্য এক বৃহত্তর মুক্তির আস্বাদ ও আনন্দ লাভ করিল। এইখানেই প্রকৃত প্রস্তাবে বাঙ্গালা সাহিত্যে আধুনিকতার বীজ উপ্ত হইল।

১। পদকল্পতরুতে এই পংক্তিদ্বয়ের পাঠ এই রকম,
নাচিয়া ঠমকে যায়, রহিয়া বহিয়া চায়,
চলে যেন গজরাজ মাতা।
শ্রীনিবাস দাস কয়, লখিলে লখিল নয়,
প্রেমসিন্ধু গঢল বিধাতা ॥
কর্ণানন্দ, ষষ্ঠ নির্যাস; পদকল্পতরু, ৭৯০।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশক হইতেই শ্রীচৈতন্যের চরিত্র অবলম্বনে গীতি-কবিতার রচনা স্থরু হয়। তাহার পরে জীবনীকাব্য রচনা হইতে আরম্ভ হয়। চৈতন্যের প্রথম জীবনীকাব্যটি সংস্কৃতে রচিত। ইহার নাম শ্রীশ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-চরিতামৃত, তবে সাধারণতঃ ইহা মুরারি গুপ্তের কড়চা নামেই প্রসিদ্ধ। ইহা আনুমানিক ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে রচিত হইয়াছিল। তাহার পরে যে সকল জীবনী রচিত হইয়াছিল তাহার প্রায় সবগুলিই বাঙ্গালায় লেখা। কেবল শ্রীচৈতন্যের জ্ঞাতিপুত্র প্রদ্যুম্ন মিশ্রের শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যোদয়াবলী এবং কবি-কর্ণপূরের শ্রীশ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক ও শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মহাকাব্য সংস্কৃতে রচিত। এখন প্রশ্ন হইতে পারে, এই জীবনীকাব্য রচনার রীতি বৈষ্ণব কবিরা কোথা হইতে শিখিলেন? কেহ কেহ ইহার মধ্যে বিদেশী প্রভাব দেখিয়াছেন; কিন্তু ঐরূপ সমালোচকদিগের মত সূক্ষ্ম দৃষ্টি সকলের নাই, অপিচ সাধারণ লোকে তথ্যযুক্তি নয়, আপ্ত-উক্তি চায় না। স্থতরাং এই কৈফিয়ৎ অচল। প্রকৃত প্রস্তাবে এই যে চরিতকাব্য-রীতি, ইহার মূলে সংস্কৃত সাহিত্যেরই প্রভাব রহিয়াছে। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দী হইতে সংস্কৃত ভাষায় ঐতিহাসিক ব্যক্তি বা মহাপুরুষদিগের জীবনী লইয়া কাব্যরচনার সূত্রপাত হয়। এই জাতীয় গ্রন্থের মধ্যে হর্ষচরিত, শঙ্করবিজয়, নবসাহসাঙ্কচরিত, রামচরিত ইত্যাদি গ্রন্থের নাম করিতে পারা যায়। এই জাতীয় কাব্যের অনুকরণে মুরারি গুপ্ত তাঁহার কড়চা রচনা করেন, এবং তাঁহার আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া বৃন্দাবনদাস এবং তাহার পরবর্ত্তী কবিরা বাঙ্গালায় চৈতন্যচরিত কাব্যধারার সৃষ্টি করিলেন। চৈতন্যচরিত কাব্যের মধ্যে শ্রীচৈতন্যের প্রধান প্রধান ভক্তদিগের জীবনী অবলম্বনে রচিত কাব্যগুলিও বুঝিতে হইবে। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম হইতেই এই আদর্শে গৌড়ীয় মহান্তদিগের—বিশেষ করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য এবং তাঁহার সহকর্ম্মী নরোত্তম দাস এবং শ্যামানন্দের—জীবনী ও মাহাত্ম্য বিষয়ে গ্রন্থ রচিত হইতে লাগিল। এই গ্রন্থগুলি আধুনিকপূর্ব্ব সাহিত্যে ইতিহাসের অভাব অনেকটা পূরণ করে।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের নিম্নলিখিত শিষ্যগণ পদকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া অনুমান

করিবার হেতু আছে। ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা প্রধান তাঁহাদের কথা পরে বলিব। গোবিন্দদাস-দ্বয়ের কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি; অপর সকলের মধ্যে উল্লেখ-যোগ্য হইতেছেন—

দ্বিজ হরিদাস, বল্লভদাস, রাধাবল্লভদাস, প্রসাদদাস, ব্রজানন্দ, শ্যামদাস, যদুনন্দনদাস, মথুরাদাস, গিরিধরদাস, গোকুলানন্দ, গোকুলদাস, বংশীদাস, মুরারি, তুলসীরামদাস, রঘুনাথদাস, বীর হাম্বীর ('চৈতন্যদাস'), জয়কৃষ্ণদাস, রামচন্দ্র কবিরাজ, দিব্যসিংহ, ঘনশ্যাম কবিরাজ, বল্লভীকান্ত, গোপীকান্ত ইত্যাদি।

নরোত্তমদাস ঠাকুরের এই শিষ্যগণ পদকর্ত্তা ছিলেন বলিয়া জানা গিয়াছে—

রায় বসন্ত, নৃসিংহ দেব, রাঘবেন্দ্র রায়, বল্লভদাস, জানকীবল্লভ, শিবরামদাস গোস্বামিদাস, বিহারিদাস ইত্যাদি।

শ্যামানন্দের অনুচর বা শিষ্যানুশিষ্যদিগের মধ্যে তিনটি মাত্র কবির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—রসিকানন্দ, কিশোরদাস ('কিশোরীদাস'), শ্যামপ্রিয়া।

চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ

পাণ্ডববিজয় বা ভারত-পাঁচালীঃ কবীন্দ্র, শ্রীকর নন্দী, রামচন্দ্র খান, "দ্বিজ" রঘুনাথ

মহাভারতকাহিনী-কাব্যের প্রাচীনতম কবি কবীন্দ্র ও শ্রেষ্ঠ কবি কাশীরাম এই কাব্যকে বিজয়পাণ্ডব (পাণ্ডববিজয়) কথা অথবা ভারত-পাঁচালী বলিয়াছেন। যেমন,

বিজয়পাণ্ডব-কথা অমৃতের ধার।

অথবা,

ভারতের পুণ্যকথা অমৃতলহরী।
কবীন্দ্রে রচিল গাথা ভারত-পাঁচালী॥

সকল কবিই যে মহাভারতের সম্পূর্ণ কাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন এমন নহে, অধিকাংশ কবি হয় অশ্বমেধ-পর্ব্ব অথবা অন্য একটি মাত্র পর্ব্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

যতদূর জানা যায়, কবীন্দ্র বিরচিত পাণ্ডববিজয় বা বিজয়পাণ্ডব-কথাই বাঙ্গালায় মহাভারতের প্রাচীনতম 'অনুবাদ'। অনুবাদ অর্থে গল্পাংশের 'অনুবাদ' বুঝিতে হইবে। উনবিংশ শতাব্দীর পূর্ব্বে সমগ্র মহাভারতের কোন বাঙ্গালা অনুবাদ রচিত হয় নাই। দৈবাৎ দুই একটি পুঁথিতে "কবীন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার" ইত্যাকার ভণিতা পাওয়া যায় বলিয়া অনেকে মনে করেন যে, কবির নাম ছিল পরমেশ্বর এবং তাঁহার উপাধি ছিল "কবীন্দ্র"। কিন্তু কোন প্রামাণিক পুঁথিতে "পরমেশ্বর" নাম পাওয়া যায় না। "কবীন্দ্র পরমযত্নে রচিল পয়ার" ইত্যাকার ভণিতা লিপিকারপ্রমাদে "কবীন্দ্র পরমেশ্বরে" পরিণত হইয়াছে, এই অনুমান করিবার পক্ষে সঙ্গত কারণ আছে। অথবা এমনও হইতে পারে যে, পরমেশ্বর নামক কোন গায়ক স্বীয় নাম কাব্যমধ্যে গ্রথিত করিয়া দিয়াছেন।

কবীন্দ্র মহাভারতের সমগ্র কাহিনীর অনুবাদ করিয়াছিলেন, স্ত্রীপর্ব্ব পর্যন্ত নহে। কবীন্দ্রের মহাভারত শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। কবীন্দ্রের কাব্য সংক্ষিপ্ত, কাশীরাম প্রভৃতির কাব্যের মত সুবৃহৎ নহে। সংক্ষেপে রচনা করিবার ইতিহাস কবি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন।

গৌড়ের সুলতান হোসেন শাহার অন্যতম প্রধান সেনাপতি (লস্কর) পরাগল খান চট্টগ্রাম ও ত্রিপুরায় যুদ্ধার্থে প্রেরিত হন। তথায় বিজয়ী হইয়া সুলতানের নিকট প্রচুর সম্মান ও খিলাত প্রাপ্ত হন এবং ঐ অঞ্চলেই রহিয়া যান। সভায় মহাভারতের কাহিনী শুনিতে শুনিতে একদিন পরাগল খানের ইচ্ছা হইল, তিনি সংক্ষেপে "মহাভারত পাঁচালী" শুনিবেন। পরাগলের আদেশ শিরোধার্য্য করিয়া কবীন্দ্র মহাভারত পাঁচালী রচনা করিলেন। ইহাই কাব্যরচনার ইতিহাস। হোসেন শাহা ১৫১৯ খ্রীষ্টাব্দ অবধি রাজত্ব করেন। সুতরাং কাব্যরচনার কাল ষোড়শ শতাব্দীর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় দশক ধরা যাইতে পারে।

কলিযুগ অবতার গুণের আধার।
পৃথিবী ভরিয়া যার যশের বিস্তার॥
সুলতান আলাপদীন প্রভু গৌড়েশ্বর॥
এ তিন ভুবনে যার যশের প্রসার॥
রাঙ্গা টোপর দিল সুবর্ণের তোড়া।
শয়ানে পালঙ্ক দিল এক শত ঘোড়া॥
শ্রীযুত লস্কর খাজা অতি সে সুমতি।
এ তিন ভুবনে তেঁহ অনাথের গতি॥
লস্কর পরাগল শুনন্ত কাহিনী।
যেন-মতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী॥
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর।
কেন-মতে ধর্ম্ম রইল বনের ভিতর॥
বৎসরেক আছিলন্ত অজ্ঞাত-বসতি।
কেন-মতে তারা সবে পাইল বসুমতী॥

এহি সব কথা কহ সংক্ষেপিয়া।
দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী রচিয়া॥
তাঁহার আদেশমাল্য মস্তকে করিয়া।
কবীন্দ্র পরমযত্নে পাঁচালী রচিয়া॥

একটি পুঁথিতে (লিপিকাল ১৬১০ শকাব্দ) আছে—

রাস্তি খান[১]-তনয় বহুলগুণনিধি।
পৃথিবীতে কল্পতরু নিরমিল বিধি॥
স্থলতান হোসন পঞ্চম গৌড়নাথ।
ত্রিপুরের ভার সমর্পিল যার হাঁথ॥
সোনার পালঙ্ক দিল এক শত ঘোড়া।
সম্ভোগ সহিতে দিল বিবিধ কাপড়া॥
তাহান আদেশ তবে শিরেতে ধরিয়া।
কবীন্দ্র কহিল কথা পাঁচালী রচিয়া॥[২]

অপব একটি পুঁথিতে আছে—

শ্রীযুত পরাগল খান মহামতি।
দারিদ্র্যভঞ্জন যেই অনাথের গতি॥
কুতূহল বহুল ভারত-কথা শুনি।
কেন-মতে পাণ্ডবে হারাইল রাজধানী॥
বনবাসে বঞ্চিলেক দ্বাদশ বৎসর।
কোন কোন কর্ম্ম কৈল বনের ভিতর॥
বৎসরেক কৈল কোথা অজ্ঞাত-বসতি।
কেমত পৌরুষে পাইলেক বসুমতী॥
এহি সব কথা কহ সংক্ষিপ্ত করিয়া।
দিনেকে শুনিতে পারি পাঁচালী রচিয়া॥

১। পরাগল খানের পিতা। ২। ব-সা-প-প ২৪, পৃ ১৬৬।
৩। ব-সা-প পুঁথি; লিপিকাল ১৬৩২ শকাব্দ।

তৃতীয় একটি পুঁথির সকল পর্ব্বেরই শেষে কবীন্দ্রের ভণিতা আছে।[১] যেমন,

বিজয়পাণ্ডব-কথা অমৃতের ধার।
ইহলোক পরলোক করয়ে উদ্ধার ॥
লস্কর পরাগল খান মহামতি।
কবীন্দ্র কহিল কথা আদ্য-পর্ব্ব ইতি ॥

লস্কর পরাগল খান দাতা কর্ণ সমান
দরিদ্র পূজয়ে নিতি নিতি।
তাহার আদেশ মাথে কবীন্দ্র করি জোড়-হাতে
সভা-পর্ব্ব সমাপ্ত [হইল] ইতি ॥

বিজয়পাণ্ডব নাম অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি ॥
লস্কর পরাগল খান গুণে মহামতি।
কবীন্দ্র কহিল বিরাট-পর্ব্ব সমাপ্তি ॥

গ্রন্থ সমাপ্তি এইরূপ—

বিজয়পাণ্ডব-কথা অমৃত লহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোক তরি ॥
ইহাকে শুনিতে লোক না করিহ হেলা।
কলিভবসাগর তরিতে এহ ভেলা ॥
স্বর্গারোহণ-কথা হৈল সমাধানে।
কবীন্দ্র কহিল কথা পরাগল-স্থানে ॥

ইহার অশ্বমেধ-পর্ব্বের আরম্ভে কোন পরিচয়াদি নাই।

কেহ কেহ এমন কথা বলিয়া থাকেন যে, কবীন্দ্র মহাভারত সম্পূর্ণ করিবার আগেই তাঁহার পৃষ্ঠপোষক পরাগল খানের মৃত্যু হয় এবং অবশিষ্টাংশ পরাগলের

১। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলের পুঁথি। লিপিকাল শকাব্দ ১৬২৬, সন ১১১০ সাল ৩১শে জ্যৈষ্ঠ। শ্রীযুক্ত ফণিভূষণ মুখোপাধ্যায়ের সৌজন্যে এই পুঁথিটি ব্যবহার করিতে পারিয়াছি।

পুত্র "ছুটি" খানের পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত হয়। এই অনুমানের পোষক কোনই যুক্তি নাই, বরঞ্চ বিপরীতে আছে। পাণ্ডববিজয়ের অধিকাংশ পর্ব্বের শেষে ভণিতাংশে পরাগল খানের উল্লেখ আছে। যেমন,

লস্কর পরাগল খান মহামতি।
কবীন্দ্র কহিল আদ্য-পর্ব্ব সমাপ্তি ॥

লস্কর পরাগল খান মহাদাতা কর্ণ সম
দরিদ্র ভুঞ্জায় নিত্য নিত্য।
তাহার আদেশ মাথে কবীন্দ্র করি জোড়-হাতে
সভা-পর্ব্ব কৈল বিরচিত॥

লস্কর পরাগল খান গুণের নিধান।
বন-পর্ব্ব কবীন্দ্র কহিল অবস্থান ॥

বিরাট-পর্ব্বের কথা এহি সমাধানে।
কবীন্দ্রে কহিল কথা পরাগল-স্থানে ॥

ভীষ্ম-পর্ব্বের কথা এহি সমাধান।
কবীন্দ্র কহিল কথা পরাগল-স্থান ॥

ইহলোকে সুখভোগ পরকালে স্বর্গলোক
ভারতের পুণ্য কথা শুনি।
শ্রীযুত নায়কচর লস্কর পরাগল
কবীন্দ্রে ত পুছে পুনি পুনি ॥

ভারতের পুণ্যকথা অমৃত সমান।
শুনিয়া হাসন্ত বীর পরাগল খান ॥

লস্কর পরাগল ধর্ম্ম অবতার।
কবীন্দ্র পরমেশ্বরে রচিল পয়ার ॥

শ্রীযুত নায়ক লস্কর পরাগল।
পাণ্ডববিজয় শুনি মনে কুতূহল ॥

একটি পুঁথির শেষে স্বয়ং পরাগলের ভণিতা দেওয়া আছে—

পরাগল খানে কহে গোবিন্দচরণ।
একমনে শুনিলে যায় বৈকুণ্ঠভুবন ॥[১]

পর্ব্বের মধ্যভাগেও কোন কোন স্থলে পরাগল খানের উল্লেখ আছে। যেমন,

শুনিয়া হাসন্ত বীর পরাগল খানে।
যুধিষ্ঠির যজ্ঞ করে পিতার কারণে ॥
কি কারণে দুর্য্যোধন ইচ্ছিল মরণে।
কি কারণে কুমন্ত্রণা কৈল রাজাগণে।
কবীন্দ্র কহিল শুন খান মহামতি।
যজ্ঞে পূর্ণা দিল যবে ধর্ম্ম নরপতি ॥

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের ২৬৯৭ সংখ্যক পুঁথিতে[২] স্বর্গারোহণ-পর্ব্বের পূর্ব্বে "ব্যাসাশ্রম পর্ব্ব" বলিয়া একটি নূতন পর্ব্ব সন্নিবিষ্ট আছে। নিম্নে উদ্ধৃত ভণিতাংশ দেখিলে ইহা কবীন্দ্রের রচনা বলিয়াই মনে হয়। প্রকাশিত কবীন্দ্র-মহাভারতে এই অংশ নাই।

লস্কর পরাগল আপনে পুচ্ছন্ত।
কোন বিধি করিলেন বিষ্ণুবংশ-অন্ত ॥
কহন্ত কবীন্দ্রে কথা গুণের সাগর।
যেন-মতে শরীর এড়িল গদাধর ॥
যেন-মতে মুনি দিলা বিষ্ণুবংশে শাপ।
রভস সংগ্রাম যেন আছিল কলাপ ॥
যেন-মতে সোমক-বিষ্ণু-বংশের নিধন।
সংবাদ আছিল যেন নরনারায়ণ ॥

১। সাহিত্য ১৩০৯, পৃ ৩৪। ২। পুঁথিটির লিপিকাল শকাব্দ, সন এবং খ্রীষ্টাব্দে দেওয়া আছে—শকাব্দ ১৭২১, সন ১২০৬, খ্রীষ্টাব্দ ১৭৯৬ "মাহে আবরিল"।

সংক্ষেপিয়া তাহাক কবীন্দ্রে কহে সার।
ভাগবতে বিস্তারিয়া কহিছে ইহার॥
তাহাক লিখিলে গ্রন্থ হয়ে গুরুতর।
এহা লাগিয়া সেহ কথা এড়িল সকল॥
ভারতের পুণ্য কথা অমৃতলহরী।
শুনন্ত ভকত জনে কর্ণঘট ভরি॥
লস্কর পরাগল গুণের সাগর।
যার কীর্ত্তি ঘোষন্ত পঞ্চম-গৌড়েশ্বর॥
তাহান আদেশ তবে শিরে আরোপিয়া।
কবীন্দ্র কহিল সব পয়ার রচিয়া॥
ভারতের পুণ্যকথা অমৃতের সার।
যাহাকে ভাবিলে লোক পাইবে নিস্তার॥

অপর একটি পুঁথিতে এই পর্ব্বগুলি পাই—আদি, সভা, বন, বিরাট, উদ্যোগ, ভীষ্ম, দ্রোণ, কর্ণ, শল্য, গদা, শক্তি, স্ত্রী, শান্তি, অভিষেক, মৌষল, অশ্বমেধ, আশ্চর্য্য, স্বর্গারোহণ।[১]

কবীন্দ্র-মহাভারতের নাম পাণ্ডববিজয় বা বিজয়পাণ্ডব। প্রায় প্রত্যেক পুঁথিতেই পর্ব্বের পুষ্পিকায় আছে "ইতি শ্রীমহাভারতে পাণ্ডববিজয়ে" অথবা "ইতি পাণ্ডববিজয়ে"। ১৬১০ শকাব্দের পুঁথিতে ১২৫ ক পৃষ্ঠায় এই শ্লোক দুইটি আছে—

ভারতামৃতসিদ্ধার্থং রসং বিজয়পাণ্ডবম্।
পায়ং পায়মতো নিত্যং মহাকীর্ত্তিপরান্বিতম্॥
শ্রীপরাগলখানস্য মহানুগ্রহগৌরবাৎ।
দেশ-ভাষামেবাবাপ্য কৌতুকাদকরোৎ কবিঃ॥

১। বগুড়া অঞ্চলের পুঁথি, লিপিকাল ১১৬১ সাল। [সাহিত্য ১৩০২, পৃ ৬৪১।] এই পুঁথির অশ্বমেধ-পর্ব্ব কবীন্দ্র রচিত নহে, শ্রীকর নন্দীর লেখা।

কবীন্দ্র-মহাভারতের বিশিষ্ট পুষ্পিকা এই—

বিজয়পাণ্ডব-কথা অমৃতলহরী।
শুনিলে অধর্ম্ম খণ্ডে পরলোকে তরি॥

অথবা—

বিজয়পাণ্ডব-কথা অমৃতের ধার।
ইহলোকে পরলোকে করে উপকার॥

কোন কোন পুঁথিতে ক্বচিৎ পরাগলের ভণিতা পাওয়া যায়; যথা—

লস্কর পরাগল ভুবনবিদিত।
করিলেক পাঁচালি লোকের হৈল হিত॥

পরাগল খানে কহে গোবিন্দচরণ।
এক মনে শুনিলে যায় বৈকুণ্ঠ ভুবন॥

কবীন্দ্রের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কাহারো কাহারো মতে কবির নাম ছিল শ্রীকর নন্দী, "কবীন্দ্র" বা "কবীন্দ্র-পরমেশ্বর" তাঁহার উপাধি মাত্র। কিন্তু শ্রীকর নন্দী স্বতন্ত্র ব্যক্তি ছিলেন, ইহা পরে আলোচনা করিতেছি। শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ শাস্ত্রীর মতে কবীন্দ্র কোচবিহারের রাজা নরনারায়ণের মন্ত্রী ছিলেন। নরনারায়ণ ১৫৪০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে সিংহাসনে আরোহণ করেন। কবীন্দ্রের নাম ছিল বাণীনাথ, "কবীন্দ্র" তাঁহার উপাধি। রাজমন্ত্রী হইয়াছিলেন বলিয়া ইনি "কবীন্দ্রপাত্র" বলিয়া পরিচিত ছিলেন।[১] কোচবিহার গোয়ালপাড়া অঞ্চলে প্রবাদও আছে যে, "গৌরীপুর রাজবংশের বর্ত্তমান রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া বাহাদুরের উর্দ্ধতন দ্বাদশ পুরুষ কবীন্দ্র পাত্র কর্ত্তৃক ঐ মহাভারতখানি লিখিত হইয়াছিল"।[২]

কবীন্দ্র-মহাভারতের সম্পাদকের উক্তির যাথার্থ্য যাচাই করিবার মত তেমন কিছু মালমসলা নাই। তবে কবি যে উত্তর বাঙ্গালার লোক তাহা ভাষাদৃষ্টে অবধারণ করা কঠিন নহে। কবীন্দ্র-মহাভারতের পুঁথি শুধু চট্টগ্রাম অঞ্চলে

১। ভূমিকা, পৃ ॥/০। ২। ঐ, পৃ/০।

নয়, ত্রিপুরা, গোয়ালপাড়া, কোচবিহার, রঙ্গপুর, বগুড়া, মুর্শিদাবাদ অঞ্চলেও পাওয়া গিয়াছে। উত্তরবঙ্গে কবীন্দ্র-মহাভারতের বিরাট-পর্ব্বের পাঠ এখনও হইয়া থাকে।[১]

পরাগল খান "দিনেকে" মহাভারতের পাঁচালী শুনিতে চাহিয়াছিলেন। তদনুসারে কবীন্দ্র কাব্যটি খুব সংক্ষিপ্ত করিয়া রচনা করেন। তথাপি কোন মুখ্য কাহিনী বাদ পড়ে নাই। ইহা কবির দক্ষতার নিদর্শন বটে। সংক্ষিপ্ত বলিয়া পাণ্ডববিজয় অত্যন্ত বর্ণনামূলক, এবং তজ্জন্যই ইহাতে পল্লবিত কবিত্বের অবকাশ ছিল না। কবিও তাহার জন্য বিশেষ মাথা ঘামান নাই। রচনার নমুনা হিসাবে দুর্য্যোধনের পতনে যুধিষ্ঠিরের বিলাপ অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম

কৃপার সাগর যুধিষ্ঠির মহাশয়।
দেখি মহা-শোকাকুল হৈল অতিশয়॥
ভীমকে বিস্তর পাছে বোলে ধর্ম্মরাজ।
এত বড় কুকর্ম্ম করিলা সভামাঝ॥
জানিবা পৃথিবীপতি রাজা দুর্য্যোধন।
বিশেষ আমার হয়ে ভাই জ্ঞাতিজন॥
কেনে তাক চরণে মারিলা কুলাধম।
মারিলাহা কুরুপতি যুদ্ধ-অনিয়ম॥
অন্যায় সমরে যদি না মারিলা হয়।
তবে কি জিনিত দুর্য্যোধনক নিশ্চয়॥
মূর্চ্ছিত হৈলে তুমি না কর সমর।
অন্যায় মারিলা তাক শুন রে বর্ব্বর॥
সসাগরা পৃথিবীর নৃপ অধিপতি।
কি কারণে সভাতে মারিলা তাকে লাথি

১ ঐ, পৃ ১।/০।

এহি বুলি ধর্ম্ম কান্দে করিয়া বিলাপ।
ধরণীত পড়িয়া রহিলা কেনে বাপ॥
প্রচণ্ড অনল কেনে হল প্রভাহীন।
যত রাজলক্ষণ তোমাতে আছে চিহ্ন॥
জলদ মুকুট মণি কিরণ পরায়।
এহেন শোভিত মণি ধরণী লোটায়॥
সসাগরা পৃথিবীর হৈলা অধিকারী।
ভূমিত পড়িয়া রৈলা সব পরিহরি॥
তোমাতে খুঁজিলো গ্রাম কৃষ্ণক পাঠায়া।
শকুনির বোলে গ্রাম না দিলা ছাড়িয়া॥
কুবুদ্ধি লাগিল ভাই না শুনিলা বোল।
গুরুবাক্য না শুনিলা মৃত্যু দিল কোল॥
কি বলিয়া প্রবোধিব গান্ধারী জননী।
কি বলিয়া প্রবোধিব শতেক রমণী॥
পুত্রশোকে অন্ধরাজা হৈবেক বিকল।
ভোকে ভাত না খাইব পিয়াসত জল॥
কান্দে সব রাজাগণ যুধিষ্ঠির সনে।
ভূমে গড়াগড়ি দেয় রাজা দুর্য্যোধনে॥
ভ্রাতৃপুত্রশোক মহা সহন না যায়।
ভাই ভাই বুলি রাজা কান্দে উচ্চরায়॥[১]

কবীন্দ্রের "বিজয়পাণ্ডব-কথা" অজ্ঞ লিপিকারদিগের হস্তে পড়িয়া "বিজয়পণ্ডিত কথা" হইয়াছে, এবং তাহা হইতেই বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতের উৎপত্তি। এই তথাকথিত বিজয়পণ্ডিতের মহাভারতের কতক অংশ নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদকতায় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে

১। কবীন্দ্র-মহাভারত, পৃ ১৭৩

পরাগল খানের পুত্র লস্কর "ছুটি" খান বা ছোট খানের আদেশে শ্রীকর নন্দী নামক কবি মহাভারতের অন্ততঃ অশ্বমেধ-পর্ব্বের 'অনুবাদ' করিয়াছিলেন। হুসেন হোসেন শাহার পুত্র নসীরু-দ্-দীন নুসরৎ শাহ গৌড়ের যুবরাজ অথবা [illegible] কাব্যরচনার ইতিহাস নিম্নে দেওয়া গেল। মুদ্রিত পুস্তক[১] ও বিভিন্ন পুঁথি মিলাইয়া এই পাঠ নির্দ্ধারিত হইয়াছে।

পৃথিবীর মধ্যে পুরী সেই এক ভাল।
অতিবৃষ্টি অনাবৃষ্টি নাহি কোন কাল ॥
যাহার সমীপে বহে দেবী ভাগীরথী।
বড়ই সুখদা পুরী মরণে মুকতি ॥
নসরত শাহা নামে তথি অধিরাজ।
রাম সম প্রজা পালে করে রাজ-কাজ ॥[২]
নৃপতি হুসন শাহ হয় ক্ষিতিপতি।
সাম দান দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী ॥
তান এক সেনাপতি লস্কর ছুটি খান।
ত্রিপুর গড়েত গিয়া কৈল সন্বিধান ॥[৩]
চাটিগ্রাম নগরের নিকট উত্তরে।
চন্দ্রশেখর নাম পর্ব্বত উপরে ॥
চরণা নগরী নাম[৪] পৈতৃক বসতি।
বিধিএ নির্ম্মিল তাকে কি কহিব অতি ॥[৫]

১। ব-সা-প প্রকাশিত (১৩১২)।

২। নসরত সাহা তাত অতি মহারাজা।
সামদান দণ্ডভেদে পালে সব প্রজা। [১৫৭৫ শকাব্দের পুঁথি।]

৩। 'ত্রিপুরার উপর করিল সন্বিধান' ঐ।

৪। 'চারলোল গিরি তার' ঐ।

৫। অতঃপর অতিরিক্ত পাঠ—

তাহার ঈশ্বর সেই ক্রমদীশ্বর নাম।
ভবানী সহিতে নিবসে অভিরাম ॥
[১৬৮৪ শকাব্দের পুঁথি।] এই পয়ারেরও পাঠান্তর আছে।

চারি বর্ণ বসে লোক সেনা-সন্বিহিত।
নানাগুণে প্রজা সব বসয়ে তথাত ॥
ফণী নামে নদীএ বেষ্টিত চারি ধার।
পূর্ব্বদিগে মহাগিরি পার নাহি তার[১] ॥
লস্কর পরাগল খানের তনয়।
সমরে নির্ভয় ছুটি খান মহাশয় ॥
আজানুলম্বিতবাহু কমললোচন।
বিশালনয়ন মত্তগজেন্দ্রগমন ॥
চতুঃষষ্টি কলার বসতি গুণনিধি।
পৃথিবীবিখ্যাত সে যে নির্ম্মাইল বিধি ॥
দাতা বলি কর্ণ সম অপারমহিমা।
শৌর্য্যে বীর্য্যে গাম্ভীর্য্যে নাহিক উপমা ॥
কপটের লেশ নাই প্রসন্নহৃদয়।
রাম সম পিতৃভক্ত খান মহাশয় ॥
বাপের বল্লভ পুত্র কুলের নন্দন।
কলিকাল-অবতরি বিপক্ষতপন ॥
তাহান যতেক গুণ শুনিয়া নরপতি।
সম্বাদিয়া আনিলেক কুতূহলমতি ॥
নৃপতি-অগ্রেতে তার বহুত সম্মান।
ঘোটক প্রসাদ [তবে] পাইল ছুটি খান ॥[২]
ত্রিপুর-নৃপতি যার ডরে এড়ে দেশ।
পর্ব্বতগহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ ॥

১। পাঠান্তর 'অধিক বিস্তার'।

২। অতঃপর অতিরিক্ত পাঠ—

লস্কর-বিষয় তথা পাইয়া মহামতি।
সাম দান দণ্ড ভেদে পালে বসুমতী। ১৫৮৫ ও ১৬৮৪ শকাব্দের পুঁথি।

গজ বাজী কর দিয়া করিল সম্মান।
মহাবন মধ্যে তার পুরীর নির্ম্মাণ॥
যদ্যপি অভয় দিল খান মহামতি।
তথাপি আতঙ্কে বৈসে ত্রিপুর-নৃপতি॥
আপন নৃপতি সন্তর্পিয়া [স]বিশেষে।
সুখে বসে লস্কর আপনার দেশে॥
দিনে দিনে বাড়ে তার রাজসম্মান।
যাবত পৃথিবী থাকে সন্ততি তাহান॥[১]
পণ্ডিতে মণ্ডিত সভা খান মহামতি।
একদিন বসিলেক বান্ধব-সংহতি॥
শুনন্ত ভারত তবে অতি পুণ্যকথা।
মহামুনি জৈমিনি কহিল সংহিতা॥
অশ্বমেধকথা শুনি প্রসন্নহৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥[২]
দেশ-ভাষে এহি কথা রচিল পয়ার।
সঞ্চারৌক কীর্ত্তি মোর জগৎ-সংসার॥
তাহান আদেশমাল্য মস্তকে ধরিয়া।
শ্রীকর নন্দীএ কহে পাঞ্চালী রচিয়া॥

এই শ্রীকর নন্দী (মতান্তরে শ্রীকরণ নন্দী) লইয়া মতভেদ আছে। কেহ বলেন, শ্রীকর নন্দী স্বতন্ত্র ব্যক্তি। ইনি অশ্বমেধ-পর্ব্ব রচনা করিয়া জুড়িয়া

[১] অতঃপর অতিরিক্ত পাঠ—
বহুকাল জীউক লস্কর মহাশয়।
মূর্খ পণ্ডিত বিদ্যা সভাকার হয়॥ ঐ।

[২] অতঃপর অতিরিক্ত পাঠ—
ব্যাস গীত ভারত শুনি চারুতর। তাহাতে কহিল জৈমিনি মুনিবর॥
সংস্কৃত ভারত না বুঝেন সর্ব্বজন। মোর নিবেদন কিছু শুন কবিগণ॥ ঐ

দিয়া কবীন্দ্র-বিরচিত "পরাগলী মহাভারত" সম্পূর্ণ করেন। অপরে বলেন, শ্রীকর নন্দী আর কবীন্দ্র একই ব্যক্তি। কবির নাম শ্রীকর নন্দী, এবং উপাধি কবীন্দ্র বা কবীন্দ্র-পরমেশ্বর।[১]

যাঁহারা শ্রীকর নন্দী এবং কবীন্দ্রের অভিন্নত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের অনুমানের সপক্ষে যুক্তি হইতেছে যে, একই পুঁথিতে কবীন্দ্র এবং শ্রীকর নন্দীর ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু একথা ভুলিলে চলিবে না যে, কুত্রাপি "কবীন্দ্র শ্রীকর নন্দী" এইরূপ যুক্ত ভণিতা পাওয়া যায় নাই। সুতরাং কবীন্দ্র যে উপাধি তাহা বলিবার কি হেতু আছে? অপরঞ্চ, ছুটি খানের পৃষ্ঠপোষকতায় অশ্বমেধ-পর্ব্ব রচিত হইলে পরাগল খানের পৃষ্ঠপোষকতায় স্বর্গারোহণ-পর্ব্ব কি করিয়া রচিত হইতে পারে?[২] ইহার সপক্ষে শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বলেন যে, শ্রীকর নন্দী সর্ব্বশেষে অশ্বমেধ পর্ব্ব রচনা করেন, তখন পরাগল জীবিত ছিলেন না।[৩] কিন্তু এই সকল যুক্ত্যাভাসের বিরুদ্ধে প্রবলতম প্রমাণ হইতেছে, শ্রীকর নন্দী এবং কবীন্দ্র-রচিত স্বতন্ত্র দুই অশ্বমেধ-পর্ব্বের অস্তিত্ব। কবীন্দ্রের অশ্বমেধ-পর্ব্ব হইতে শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধ-পর্ব্ব অনেক বড। কবীন্দ্রের অশ্বমেধ-পর্ব্বে আছে, ব্যাস যুধিষ্ঠিরকে অশ্বমেধ যজ্ঞ করিবার জন্য আদেশ করিয়া প্রস্থান করিলে শ্রীকৃষ্ণ আগমন করিলেন; তাঁহার উপস্থিতিতে ভীম অশ্ব আনিতে গমন করিলেন। শ্রীকর নন্দীর অশ্বমেধ-পর্ব্বে দেখিতে পাই, ভীমের যাত্রা করিবার সময় ব্যাস উপস্থিত ছিলেন। এইরূপ পার্থক্যের দিক দিয়া বিচার করিলে একটিকে অপরের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ না বলিয়া স্বতন্ত্র রচনাই বলিতে হয়।

অনুমান হয়, শ্রীকর নন্দীও পুরা ভারতপাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। এই মহাভারত কবীন্দ্রের কাব্য অপেক্ষা অনেক বড়। কবীন্দ্র 'জৈমিনি ভারত'

১। ব-সা-প-প ৩৪, পৃ ১৬১-১৬৮।

২। ব-সা-প ২৬৯৭ সংখ্যক পুঁথির স্বর্গারোহণ-পর্ব্বের পুষ্পিকায় আছে—

পুস্তক কারণে নাম হৈল ধরাতল। লস্কর পরাগল গুণের সাগর॥
তাহান আদেশমাল্য মাথে আরোপিয়া। শ্রীকর নন্দিয়ে কহে পাঁচালি রচিয়া॥

৩। ব-সা-প-প ৩৪, পৃ ১৬৭।

অবলম্বন করিয়াছিলেন, আর শ্রীকর "সঞ্জয় (বা বৈশম্পায়ন) ভারত" অবলম্বন করিয়াছিলেন। শ্রীকর নন্দীর মহাভারতই কালান্তরে ও লিপিকার-মাহাত্ম্যে "সঞ্জয় মহাভারতে" পরিণত হইয়াছে।

এই অনুমান যে ভিত্তিহীন নহে, তাহা শ্রীকর নন্দীর বাক্যেই প্রমাণিত হইতেছে। একদিন ছুটি খান সভায় বসিয়া মহামুনি জৈমিনি রচিত (এবং কবীন্দ্র অনূদিত) 'সংহিতা' (অর্থাৎ সংক্ষিপ্ত) মহাভারত শুনিতেছিলেন। অশ্বমেধ-পর্ব্ব শুনিয়া খান মহাশয় সন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন যে, তিনি শুনিয়াছেন ব্যাস-রচিত মহাভারত, যাহা হইতে জৈমিনি সারসংগ্রহ করিয়াছেন, তাহা আরও সুন্দর। এই কথা বলিয়া তিনি শ্রীকর নন্দীকে ব্যাস-মহাভারত দেশী ভাষায় রচনা করিতে আদেশ করিলেন, যাহাতে করিয়া (তাঁহার পিতার মত) তাঁহারও কীর্ত্তি জগতে সঞ্চারিত হয়।

পণ্ডিতে মণ্ডিত সভা খান মহামতি।
একদিন বসি আছে বান্ধব সংহতি॥
শুনন্ত ভারত পোথা অতি পুণ্যকথা।
মহামুনি জৈমিনির রচিত সংহিতা॥
অশ্বমেধ-কথা শুনি প্রসন্নহৃদয়।
সভাখণ্ডে আদেশিল খান মহাশয়॥
ব্যাসগীত ভারত শুনিল চারুতর।
যার হেতু জৈমিনিএ রচিল সকল॥
দেশি-ভাষা কহি কথা রচিয়া পয়ার।
সঞ্চরউ কীর্ত্তি মোর জগত সংসার॥[১]

যাঁহারা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়াছেন তাঁহাদের নিকট ইহা নূতন সংবাদ নহে যে, তথাকথিত পরাগলী মহাভারতের দুইটি রূপ প্রাচীন পুঁথিতে পাওয়া যায়—একটি সংক্ষিপ্ত, অপরটি বিস্তৃত। সংক্ষিপ্ত রূপটি বিজয় পণ্ডিতের

১। ১৬১০-১১ সালের পুঁথি (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ২০২৫)। পাঠান্তর পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য। ব-সা-প পুঁথি ২৬২১ দ্রষ্টব্য।

মহাভারতে এবং বিস্তৃততটি সঞ্জয়ের মহাভারতে পরিণত হইয়াছে। অনুমান হয়, প্রথমটি কবীন্দ্রের মহাভারত এবং দ্বিতীয়টি শ্রীকর নন্দীর মহাভারত। যেমন অধিকাংশ প্রাচীন কাব্যের পুঁথিতে হইয়া থাকে, তেমনি এই দুইটি কাব্যের মধ্যেও অনেক বিষয়ে, বিশেষ করিয়া ভণিতাংশে, পরস্পর অদল-বদল হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই কবীন্দ্রের মহাভারতে শ্রীকর নন্দীর ভণিতা এবং শ্রীকর নন্দীর মহাভারতে কবীন্দ্রের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে।

শ্রীকর নন্দীর মহাভারত সঞ্জয়-মহাভারতে পরিণত হইয়াছে, ইহা অবশ্য অনুমান মাত্র। তথাপি কবীন্দ্র-মহাভারত যে সঞ্জয়-মহাভারতের মূলে নাই তাহা নিঃসন্দেহে বলা চলে। সঞ্জয়-মহাভারতে অনেক নূতন আখ্যান আছে, এবং অনেক আখ্যানের বিস্তৃততর বিবরণ আছে। সঞ্জয়-মহাভারতের স্বতন্ত্রত্ব লইয়া প্রাচীনসাহিত্যামোদিদিগের মধ্যে প্রবল মতভেদ বর্ত্তমান আছে। শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় ভণিতার মধ্যে কেবল পৌরাণিক সঞ্জয়েরই অস্তিত্ব পাইয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, সঞ্জয় নামে বা ভণিতায় কোন বাঙ্গালী কবি ছিল না।[১] শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার সেন মহাশয় এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে আলোচনা করিয়াছেন।[২] সুধীর বাবু যে পুঁথি লইয়া আলোচনা করিয়াছেন, তাহার কতকগুলি ভণিতায় তিনি পৌরাণিক এবং অপৌরাণিক দুইজন সঞ্জয়ের সন্ধান পাইয়াছেন। বস্তুতঃ নিম্নোদ্ধৃত ভণিতা হইতে তাহাই সিদ্ধান্ত করিতে হয়।

সঞ্জএ গাঁথিল পোথা কহিল সঞ্জয়।

অর্থাৎ (পৌরাণিক) সঞ্জয় কর্ত্তৃক বিরচিত পুস্তক (অপৌরাণিক) সঞ্জয় (ভাষায়) বর্ণনা করিতেছে।

সঞ্জএ কহিল কথা বাখানে সঞ্জয়।

অর্থাৎ (পৌরাণিক) সঞ্জয় কর্ত্তৃক কথিত কাহিনী (অপৌরাণিক) সঞ্জয় (ভাষায়) ব্যাখ্যা করিতেছে।

১। ব-সা-প-প ৩৪, পৃ ১৭৪-২১২। ২। ঐ ৩৫, পৃ ১৩১-৪৩।

কিন্তু ইহাও অস্বীকার করা যায় না যে, কবি এই সকল স্থলে যেন ইচ্ছা করিয়াই ধাঁধার সৃষ্টি করিয়াছেন।

একটি পুঁথির এক ভণিতা এইরূপ—

ভরদ্বাজ উত্তম বংশ জন্ম সাধুকুলে।
সঞ্জএ ভারত-কথা কহে কুতূহলে॥

অনুরূপ ভণিতা অন্য একটি পুঁথিতেও পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই স্থলে যে পৌরাণিক সঞ্জয় উল্লিখিত হইতেছে না তাহা কে বলিল? তৃতীয় এক পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে—

দেব-অংশে উৎপত্তি ব্রাহ্মণকুমার।
সঞ্জয় রচিলা কৈল পাঁচালি প্রচার॥[1]

এখানে দেব-অংশে উৎপন্ন ব্রাহ্মণকুমার পৌরাণিক সঞ্জয় ভিন্ন আর কে হইতে পারে? এখানে ভাষার দিকে দৃষ্টি করিলে ব্যাপারটি বুঝা যাইবে। 'সঞ্জয় রচিলা' এবং অনুল্লিখিত ব্যক্তি 'কৈল পাঁচালি প্রচার'।

যিনিই হউন, একজন সংগ্রহকার যে জোড়াতাড়া দিয়া "সঞ্জয় মহাভারত" সৃষ্টি করিয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা অযৌক্তিক। এবং এই সংগ্রহকার যে পৌরাণিক সঞ্জয়ের অন্তরালে আত্মগোপন করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, তাহাও স্বীকর্ত্তব্য। এখন কথা হইতেছে, ইনি কে? এই সমস্যার সমাধানে একটুকু ইঙ্গিত পাওয়া যায় একটি মহাভারত পুঁথির ভণিতায়।[2] এই মহাভারতের পুঁথিতে একাধিক কবির ভণিতা আছে। তন্মধ্যে সঞ্জয়ের কতকগুলি ভণিতা মূল্যবান্। ভণিতাগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া বিচার করিতেছি।

হরিনারায়ণ দেব দীন হীনমতি।
সঞ্জয়াভিমানে কৈলা অপূর্ব্বভারতী॥
ব্যাসদেব হোতে মহাভারত-প্রচার।
সঞ্জয় রচিয়া কৈল পাঞ্চালি পয়ার॥

১। ঐ, পৃ ১৪২। ২। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৭২।

শ্লোক ভাঙ্গিয়া পোথা করিয়া পদের গাথা
ত্রিভুবনে তরিতে উপাএ।
দীনহীন মূঢ়মতি হরিনারায়ণ-গতি
শ্লোক ভাঙ্গি কহিল সঞ্জএ।

রচনা বিশেষত[ঃ] নানারসময়ে।
হরিনারায়ণ দেব বাখানে সঞ্জয়ে॥

এখানে দ্বিতীয় ভণিতাটিতে "হরিনারায়ণ দেব" দ্ব্যর্থবোধক; কিন্তু অপর দুইটি ভণিতায় হরিনারায়ণ দেব অসন্দিগ্ধভাবে কবির নাম বুঝাইতেছে। প্রথম ভণিতাটি হইতে আমরা আরও জানিতে পারি যে, কবি 'সঞ্জয়' এই উপনাম ('অভিমান'.) আশ্রয় করিয়াছিলেন। 'দেব' ব্রাহ্মণের উপাধি হয় না, সুতরা' হরিনারায়ণ দেব কবির নাম হইলে, কবিবর ব্রাহ্মণকুমার হইতে পারেন না। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের মতে কবি বৈদ্যবংশীয় এবং বিক্রমপুর-বাসী ছিলেন, কিন্তু কোথা হইতে যে এই সংবাদ পাওয়া গেল তাহা তিনি বলেন নাই।

রামচন্দ্র খানের অশ্বমেধ-পর্ব্ব কাব্যের দুইখানি পুঁথির সন্ধান পাওয়া যায়। একখানির লিপিকাল ১১৩৭ সাল অর্থাৎ ১৭৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দ,[১] অপরটির লিপিকাল ১৬৯০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৬৮-৬৯ খ্রীষ্টাব্দ।[২] প্রথম পুঁথিতে যে লিপিকাল দেওয়া আছে, ইহার পাঠ কিছু বিকৃত হইলেও ইহা হইতে সহজেই তারিখ বাহির করা যায়।

ইতি জৈমিনিভারতকথা সপ্তদশ।
শাকেন্দু বেদামুনিষে যুগান্তে পুরাণ॥[৩]

ইহা হইতে তিন রকম শুদ্ধ পাঠ কল্পনা করা যাইতে পারে—(১) "ইন্দু বেদ ইষু যুগ" অর্থাৎ ১৪৫২ অথবা ১৪৫৪[৪] শকাব্দ (১৫৩০-৩১ বা ১৫৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ), (২) "ইন্দু বেদ মুনি যুগ" অর্থাৎ ১৪৭২ অথবা ১৪৭৪ শকাব্দ (১৫৫০-৫১ বা

১। প্রদীপ ১৩০১, পৃ ৩৮৪-৮৭। ২। ব-সা-প-প ৬, পৃ ৬৫।

৩। দ্বিতীয় পুঁথির পাঠ—"জৈমিনি ভাগবতাঙ্গ সপ্তদশ শাকেন্দু বেদদানে নিধে যঃ।"

৪। 'যুগ' অর্থে ২ বা ৪ হইতে পারে।

১৫৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দ), এবং (৩) "ইন্দু বেদ মুনি ইষু" অর্থাৎ ১৪৭৫ শকাব্দ (১৫৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দ)। যাহাই হউক এই তিন পাঠ-কল্পনার যে কোনটি যথার্থ হইলে কবি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন ধরিতে হইবে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে এক গঙ্গাতীরবর্ত্তী জমিদার রামচন্দ্র খান হরিদাস ঠাকুর এবং নিত্যানন্দ প্রভুকে অবমান করিয়াছিলেন।[১] ইনিই কিংবা অপর এক রামচন্দ্র খান শ্রীচৈতন্যকে ছত্রভোগ পথে নীলাচল যাইতে সাহায্য করিয়াছিলেন।[২] প্রথম তারিখটি ঠিক হইলে এই রামচন্দ্র খানকে কবির সহিত অভিন্ন কল্পনা করিতে ইচ্ছা হয়।

দুইখানি পুঁথিরই শেষে কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় আছে। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এক বাস-দেশ (বাস-গ্রাম নহে) এবং মাতৃনাম ছাড়া অপর কোন বিষয়ে ঐক্য দেখা যাইতেছে না। প্রথম পুঁথিতে বলে, কবি ছিলেন কায়স্থ; তাঁহার পিতার নাম কাশীনাথ এবং বাসস্থান রাঢ়দেশে দণ্ড-সিমলিয়া গ্রামে। অপর পুঁথিতে বলে, জাতি ব্রাহ্মণ, পিতা মধুসূদন, বাসগ্রাম জঙ্গীপুর। কবিপরিচয় অংশ-দুইটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

রাঢ়া দেশে বসতি আছয়ে পুণ্য স্থানে।
দণ্ডসিমলিয়া ডাঙ্গা সর্ব্বলোকে জানে॥
কায়েত কুলেতে জন্ম দণ্ডত পদ্ধতি।
কাশীনাথ জনক জননী পুণ্যবতী॥
গুরুর কৃপাতে কিছু ভাল হৈল মন।
রামচন্দ্র খান কৈল পঞ্চালী (প্রবন্ধ) রচন॥
সপ্তদশ পর্ব্ব কথা সংস্কৃতে বন্ধ।
মূর্খ বুঝাইতে কৈল প্রাকৃতের ছন্দ॥

দ্বিতীয় পুঁথির পাঠ—

স্বদেশে বসতি ভাগীরথী স্থানে পুণ্যে।
জঙ্গিপুর সহর গ্রাম সর্ব্বলোকে জানে॥

১। শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ৩-৩। ২। শ্রীচৈতন্যভাগবত ৩-২।

ব্রাহ্মণ কুলেতে জন্ম লস্কর পদ্ধতি।
মধুস্থদন জনক জননী পুণ্যবতী॥
[গুরুর কৃপাতে কিছু ভাল] হৈল মন।
রামচন্দ্র খান কৈল কবিত্বরচন॥
সপ্তদশ পর্ব্ব কথা সংস্কৃত-বন্ধ।
মূর্খ বুঝাবারে কৈল পরাকৃত-ছন্দ॥

প্রথম পুঁথির পাঠই শুদ্ধতর বলিয়া মনে হয়। 'দগুত পদ্ধতি' এই পাঠের স্থলে দ্বিতীয় পুঁথির পাঠ 'লস্কর পদ্ধতি' গ্রহণীয়। বৈষ্ণবদ্বেষী রামচন্দ্র খানও গৌড়েব স্থলতানের উচ্চ কর্ম্মচারী ছিলেন। প্রথম পুঁথি হইতে জানা যায় যে, রাঢ়ে গঙ্গাব নিকটবর্ত্তী কঙ্ক-গ্রামে কবির গুরুস্থান ছিল।

কঙ্কগ্রাম স্থান আছে মধ্য-রাঢ়া দেশে।
গঙ্গার নিকটে গুরু সর্ব্বকাল বৈসে॥
সেহি গুরুর প্রসাদে ধর্ম্মেতে হয় মন।
অশ্বমেধ-কথা কহোঁ শমনদমন॥

পুঁথিতে দুই এক স্থলে অনন্তদাসের ভণিতা দেখা যায়। পুঁথি অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন হইলেও ভাষায় প্রাচীনত্ব দেখা যায়। যেমন, পরিনাতি (< প্রণপ্তৃক, অর্থাৎ প্রপৌত্র), উড়িবাক চায়, ঘোড়াক বাতাস করে, ভূমিত ইত্যাদি।

নিম্নোদ্ধৃত অংশটুকুর বাস্তব সরসতা বেশ উপভোগ্য।

মায়ের তরে যৌবনাশ্ব বোলে প্রিয়বাণী।
ধর্ম্মরাজার যজ্ঞস্থলে চলহ আপনি॥
গঙ্গাস্নান করিবে মাতা হবে বড় ধর্ম্ম।
গোবিন্দ দেখিবে মাতা হবে বড় কর্ম্ম॥
বুড়ি বোলে কিবা কার্য্য গোবিন্দ সেবিঞা।
কিবা কার্য্য গঙ্গাস্নানে যজ্ঞস্থানে গিঞা॥

ধর্ম্মকার্য্যে গৃহকার্য্য সব নষ্ট হৈব।
ধান্য গোধূম শস্য কেবা সম্বরিব॥
দধি দুগ্ধ ঘৃত তৈল সব নষ্ট হৈব।
বধূগণ দাসীগণ সব ভ্রষ্ট হৈব॥
সকল সম্পদ যাবে কথায় মন দেহ।
না পারোঁ যাইতে পুতা আর না বলিহ॥

"দ্বিজ" রঘুনাথের অশ্বমেধ-পঞ্চালিকা বা অশ্বমেধ-পাঁচালী ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত।[১] কাব্যটির যে অনুলিপি পাওয়া গিয়াছে তাহার প্রথম পত্রের দ্বিতীয় পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। এই অংশটিতে কবির পরিচয় ছিল বলিয়া অনুমান হয়। কবি বলিয়াছেন যে, তিনি কাব্যটি রচনা করিয়া উড়িষ্যার অধিপতি মুকুন্দদেবের সভায় আসিয়া তাঁহাকে শুনাইয়াছিলেন।

উৎকলের যত রাজা না কৈল যেই কর্ম্ম।
শ্রীযুত মুকুন্দদেব সাধিল সেই ধর্ম্ম॥
মুকুন্দ রাজার গুণ শুনিঞাঁ শ্রবণে।
বাঢ়িল বিনোদ বড় শ্রবণনয়নে॥
কোন গুণে মহারাজা হইব গোচর।
হৃদয়ে চিন্তিএ সার করহু অন্তর॥
... ...
অশ্বমেধ-পুণ্যকথা বিবিধ প্রসঙ্গ।
যাতে অশ্বরক্ষক কৃষ্ণ অর্জ্জুনের সঙ্গ॥
শ্রীভাগবতে শুনি কৈল প্রবন্ধ পাঞ্চালী।
শ্রীমহারাজা কিছু অবধান করি॥
[পুণ্য য]শ গুণ রাজ্যে ভোগ চিরকাল।
এহিতে শুনিলে ভক্তি বাঢ়ে তৎকাল॥

১। ব-সা-প-প ৫, পৃ ১৩৮-৪৪।

শ্রীরঘুনাথ বিপ্রকুলে উৎপত্তি।
আইলুঁ তোমার দেশে গুণ শুনি অতি॥
চিরকাল রাজ্য কর উৎকল মাঝে।
পাঞ্চালী রচিয়া আইলুঁ তোমার সমাজে॥
অশ্বমেধ-পাঞ্চালী সে করিঞা কৌতুকে।
আজ্ঞা দেহ আহ্মি পঢ়ি তোমার সভাতে॥
শুনিঞাঁ বিপ্রের বোল রাজা হরষিতে।
আজ্ঞা দিল ব্রাহ্মণকে পাঞ্চালী পড়িতে॥
তখন সে নারায়ণীকে করিল স্মরণ।
পদ-ছন্দে পঢ়েন্ত যত বীরের চরণ॥

গ্রন্থ মধ্যে সর্ব্বত্র এই ভণিতা আছে—

অশ্বমেধ-পুণ্যকথা অমৃতলহরী।
পিবন্ত ভকত জন কর্ণঘট ভরি॥
শ্রীযুত মুকুন্দদেব নৃপশিরোমণি।
পরম বৈষ্ণব দানে বলি কর্ণ জিনি॥
উৎকল-দেশনাথ যেন কল্পতরু।
প্রচণ্ডপ্রতাপ জ্ঞানে যেন সুরগুরু॥
ইন্দ্রদ্যুম্ন সম যার যশের মহিমা।
প্রজার পালক যার যশের নাহি সীমা॥
চিরদিন রাজ্য করি হৈল অকল্যাণ।
অশ্বমেধ-পর্ব্ব কথা রঘুনাথ ভাণ॥

"চিরদিন রাজ্য করি হৈল অকল্যাণ" ইহা হইতে বুঝি যে, কবি যখন মুকুন্দদেবের সভায় গমন করেন তখন তিনি রাজ্যভ্রষ্ট। ১৫৬৭ অথবা ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সুলয়্মান্ খাঁন্ কররাণী কর্ত্তৃক উড়িষ্যা বিজিত হয়। ইহার অল্প কিছু কাল পূর্ব্বে মুকুন্দদেব কোটসামা দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেন।[১] বোধ হয় কবি

১। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় প্রণীত বাঙ্গালার ইতিহাস ২, পৃ ৩৬৭-৬৮।

ইহাকেই অকল্যাণ বলিয়াছেন, কেন না যখন কালাপাহাড় উড়িষ্যা আক্রমণ করে তখন মুকুন্দদেব এই বিদ্রোহী সামন্তের সহিত যুদ্ধে নিহত হন। সে ১৫৬৭-৬৮ খ্রীষ্টাব্দের কথা।

যে পুঁথিখানি পাওয়া গিয়াছে তাহা বেশ প্রাচীন বলা চলে। অনুলিপি ১৫৪৬ শকাব্দার বা ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দের। পুঁথিটি পুরাতন মালদহের এক বর্ণক ব্রাহ্মণের গৃহে পাওয়া গিয়াছিল। পুঁথির পুষ্পিকা অংশ এইরূপ—

ইতি শ্রীমহাভারতে পঞ্চালিকা প্রবন্ধে শ্রীরঘুনাথ কৃতৌ অশ্বমেধ পর্ব্বং সমাপ্তেতি॥ শ্রীরস্তু শুভমস্তু শকাব্দা ১৫৪৬ শকে ১০৩১ সাল। তারিখ ১৩ মাহ শ্রাবণ। কৃষ্ণদশম্যাং তিথৌ বেলা প্রহর তিন উপরান্ত॥ রোজ সোমবার॥ ফতেয়পুর-গ্রামনিবাসীয় শ্রীগৌরীদাস সাহু পুস্তকমিতি॥ জানুকী গ্রামেন[১] লিখিতং সৌ-কুলে জন্ম ফতেপুরনিবাসীয় শ্রীগৌরীদাসস্য লিখিতমিতি॥ ভগ্ন-পৃষ্ঠকটিগ্রীবঃ স্তব্ধদৃষ্টিরধোমুখঃ। দুঃখেন লিখিতং গ্রন্থং শোধয়িষ্যন্তি পণ্ডিতাঃ॥ ভীমস্যাপি রণে ভঙ্গো মুনীনাঞ্চ মতিভ্রমঃ। শ্রীদুর্গাদেব্যৈ নমঃ। শ্রীমহাদেব্যৈ নমঃ॥ শ্রীগুরুদেবচরণেভ্যো নমঃ॥ পিতামাতা চরণেভ্যো নমঃ॥

পুঁথিটি প্রাচীন বলিয়া ইহার ভাষায় প্রাচীনত্বের ছাপ যথেষ্ট রহিয়াছে। কাশীরামদাসের প্রচলিত অশ্বমেধ-পর্ব্বের সহিত রঘুনাথের কাব্যের আশ্চর্য্যরকম মিল আছে। কবি সংস্কৃতে ব্যুৎপন্ন ছিলেন বলিযা অনুমান হয়।

[১] জানকীরামেন ?

পঞ্চদশ পরিচ্ছেদ

বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবত

বাঙ্গালায় রচিত প্রাচীনতম চৈতন্যচরিত কাব্য হইতেছে বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবত।[১] কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতে এবং অন্য কতিপয় গ্রন্থে বৃন্দাবনদাসের কাব্য চৈতন্যমঙ্গল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। এ সম্বন্ধে একটি প্রবাদ আছে যে, বৃন্দাবনদাসের এবং লোচনদাসের গ্রন্থের নাম একই হওয়াতে বৃন্দাবনদাসের মাতা নারায়ণী পুত্রের গ্রন্থের নাম বদলাইয়া চৈতন্য-ভাগবত রাখেন। এই প্রবাদের কোন ভিত্তি নাই। এ বিষয়ে প্রেমবিলাসে [১৯] যাহা আছে তাহাই যুক্তিযুক্ত বলিয়া মনে হয়।

চৈতন্যভাগবতের নাম চৈতন্যমঙ্গল ছিল।
বৃন্দাবনে মহান্তেরা ভাগবত আখ্যা দিল ॥

শ্রীবাস পণ্ডিতের অন্যতম ভ্রাতা শ্রীরামের কন্যা নারায়ণী। তাঁহারই পুত্র বৃন্দাবনদাস। বৃন্দাবনদাসের জন্মকাল বিষয়ে মতভেদ দৃষ্ট হয়। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম দশকের শেষ ভাগে অথবা দ্বিতীয় দশকের প্রারম্ভে বৃন্দাবনদাসের জন্ম হইয়াছিল, ধরা যাইতে পারে। অল্পবয়সে বৃন্দাবনদাস নিত্যানন্দ প্রভুর অনুচর হন। পরে বর্দ্ধমান জেলায় দেনুড় গ্রামে বসতি করেন। ইনি বিবাহ করেন নাই। বৃন্দাবনদাস খেতরীর মহোৎসবে উপস্থিত ছিলেন বলিয়া ভক্তি-রত্নাকরে উল্লিখিত হইয়াছে। আনুমানিক খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দী অষ্টম দশকের শেষের দিকে ইনি পরলোকগমন করেন।

বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন যে, তিনি নিত্যানন্দ-প্রভুর আদেশেই শ্রীচৈতন্যের জীবনী-রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন। চৈতন্যজীবনীর অধিকাংশ উপকরণই তিনি প্রধানতঃ নিত্যানন্দ-প্রভুর নিকট পাইয়াছিলেন।

১। শ্রীচৈতন্যভাগবতের প্রথম (?) মুদ্রণ হয় ১২৪৯ সালে (২০ ফাল্গুন ও ২০ চৈত্র) জ্ঞানরত্নাকর ও সারসংগ্রহ যন্ত্রে। সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন, প্রকাশক রাধাগোবিন্দ, রাধামাধব ও মধুসূদন শীল।

অন্যান্য চৈতন্য পরিষদের নিকটও অনেক বৃত্তান্ত শুনিয়াছিলেন। স্বকপোলকল্পিত ঘটনা ইহাতে কিছু নাই ; তবে কোন কোন ঘটনার ব্যাখ্যা বৃন্দাবনদাসের নিজস্ব হইতে পারে।

অন্তর্যামী নিত্যানন্দ বলিলা কৌতুকে।
চৈতন্যচরিত্র কিছু লিখিতে পুস্তকে ॥ ১-১ ইত্যাদি ॥
নিত্যানন্দ প্রভু মুখে বৈষ্ণবের তথ্য।
কিছু কিছু শুনিলাম সবার মাহাত্ম্য ॥ ২-২০॥
বেদগুহ্য চৈতন্যচরিত কেবা জানে।
তাই লিখি যাহা শুনিয়াছি ভক্ত-স্থানে ॥ ১-১ ॥
অদ্বৈতের শ্রীমুখের এ সকল কথা। ২-১০, ৩-৯॥

চৈতন্যভাগবতের রচনাকাল জানা নাই। কৃষ্ণদাস কবিরাজের চৈতন্য-চরিতামৃতে এবং জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থের উল্লেখ আছে। গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় কবি-কর্ণপূরের উক্তি হইতে স্পষ্ট বুঝা যায় যে, তখন চৈতন্যভাগবত বিখ্যাত গ্রন্থ।

বেদব্যাসো য এবাসীদ্দাসবৃন্দাবনোঽধুনা।
সখা যঃ কুসুমাপীড়ঃ কার্য্যতস্তং সমাবিশৎ ॥ ১০৯॥

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১৪৯৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয় ; সুতরাং চৈতন্যভাগবত ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের অন্ততঃ কিছুকাল পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের পূর্ব্বে গ্রন্থের পত্তন হইয়াছিল এবং নিত্যানন্দ-প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র গোস্বামীর জন্মের পূর্ব্বেই গ্রন্থ পরিসমাপ্ত হইয়াছিল। নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ এবং তাঁহার সন্তানদ্বয়ের ইতিহাস বৃন্দাবনদাসের রচিত বলিয়া প্রচলিত নিত্যানন্দবংশবিস্তার নামক একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ বর্ণিত আছে।[১] বইটি বৃন্দাবনদাসের লেখা হওয়া সম্ভব। চৈতন্যভাগবতের আকস্মিক সমাপ্তি দেখিয়া অনেকে মনে করেন যে, বইটি বৃদ্ধাবস্থায় রচিত হইয়াছিল এবং রচনা পরিসমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই বৃন্দাবনদাস পরলোকগমন করিয়াছিলেন। এই উক্তি

১। বটতলা হইতে প্রকাশিত।

সমীচীন বলিয়া মনে হয় না। বরঞ্চ ইহাই মনে হয় যে, মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভু বর্ত্তমান থাকার মধ্যেই গ্রন্থটির রচনা সম্পূর্ণ হইয়াছিল।

চৈতন্যভাগবত তিন খণ্ডে বিভক্ত—আদি, মধ্য, এবং অন্ত্য। আদিখণ্ডের পনেরো অধ্যায়ে মহাপ্রভুর গয়া গমন পর্য্যন্ত বর্ণিত হইয়াছে। মধ্যখণ্ডে সাতাইশ অধ্যায়; মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণেই মধ্যখণ্ডের সমাপ্তি। অন্ত্যখণ্ডে অধ্যায়সংখ্যা দশ; ইহাতে সন্ন্যাসের পর নীলাচলগমন এবং নীলাচলে বাস-কালীন কতিপয় ঘটনার উল্লেখ করা হইয়াছে মাত্র। মহাপ্রভুর দক্ষিণভ্রমণ এবং বৃন্দাবনগমনের কোন উল্লেখ নাই। কেবল আদিখণ্ডে সূত্রমধ্যে সেতুবন্ধে ও মথুরায় গমনের উল্লেখ আছে। অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় বৃন্দাবনদাসের পাটবাড়ীতে একখানি পুঁথি পান, তাহা বাহ্যতঃ চৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং চতুর্দ্দশ অধ্যায়। এই গ্রন্থের ১৬৫৮ শকাব্দে লিখিত একটি দ্বিতীয় অনুলিপিও ব্রহ্মচারী মহাশয়ের হস্তগত হয়। এই দুইটি পুঁথি অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় ৪২৪ শ্রীচৈতন্যাব্দে চৈতন্যভাগবতের এই "অপ্রকাশিত অধ্যায়ত্রয়" প্রকাশ করেন। এই তিনটি অধ্যায় যথার্থই বৃন্দাবনদাসের রচনা কিনা তাহার আলোচনা পরে করিতেছি।

চৈতন্যভাগবত বৃন্দাবনদাসের স্বতঃস্ফূর্ত্ত রচনা। শ্রীচৈতন্যের চরিত্র এবং নিত্যানন্দ প্রভুর মহিমা কবিকে এতদূর মুগ্ধ করিয়াছিল যে, এই সুবৃহৎ কাব্যটির মধ্যে কবির লেখনী কোথাও বাধাপ্রাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কাব্যটির মধ্যে কবিত্ব ফলাইবার বিন্দুমাত্র চেষ্টা দেখা যায় না, তথাপি চৈতন্যচরিত্রের অপরিসীম মাধুর্য্য এবং কবির অন্তর হইতে স্বতঃউৎসারিত অজস্র ভক্তিরস চৈতন্যভাগবতকে শ্রেষ্ঠ কাব্যের মর্য্যাদা দান করিয়াছে। চৈতন্যভাগবতের যে কোন স্থান পড়িলেই ভক্ত কবির আবেগ পাঠকের মনে সঞ্চারিত হইতে বিন্দুমাত্র বিলম্ব হয় না। এ বিষয়ে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যাহা বলিয়াছেন তাহা চৈতন্যভাগবতের ন্যায্য এবং উপযুক্ত প্রশংসা।

অরে মূঢ় লোক শুন চৈতন্যমঙ্গল।
চৈতন্যমহিমা যাতে জানিবে সকল ॥

কৃষ্ণলীলা ভাগবতে কহে বেদব্যাস।
চৈতন্যলীলায় ব্যাস বৃন্দাবনদাস ॥
বৃন্দাবনদাস কৈল চৈতন্যমঙ্গল।
যাহার শ্রবণে নাশে সর্ব্ব অমঙ্গল ॥
... ...
চৈতন্যমঙ্গল শুনে যদি পাষণ্ডী যবন।
সেহ মহাবৈষ্ণব হয় ততক্ষণ ॥
মনুষ্যে রচিতে নারে ঐছে গ্রন্থ ধন্য।
বৃন্দাবনদাস মুখে বক্তা শ্রীচৈতন্য ॥
বৃন্দাবনদাসপদে কোটি নমস্কার।
ঐছে গ্রন্থ করি তেঁহো তারিল সংসার ॥
নারায়ণী চৈতন্যের উচ্ছিষ্টভাজন।
তাঁর গর্ভে জন্মিলেন দাস বৃন্দাবন ॥
তাঁর কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিতবর্ণন।
যাহার শ্রবণে শুদ্ধ কৈল ত্রিভুবন ॥১-৮॥

শ্রীচৈতন্যের অবতারত্ব স্থাপনের জন্য বৃন্দাবনদাস কৃষ্ণলীলার সহিত চৈতন্য-লীলার সঙ্গতি দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং সেই উদ্দেশ্যে শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থ হইতে কতিপয় শ্লোকও উদ্ধার করিয়াছেন। তবে এইরূপ শ্লোকের সংখ্যা বেশী নহে। পাষণ্ডীদের প্রতি ঘৃণাসূচক উক্তি চৈতন্যভাগবতের মধ্যে মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার কারণও ছিল। প্রথম কারণ, সে সময়ে নিত্যানন্দ প্রভুর নিন্দুকের অভাব ছিল না; দ্বিতীয় কারণ, বৃন্দাবনদাসের জন্মঘটিত কিছু কুৎসা প্রচলিত ছিল বলিয়া মনে হয়। (কবিকে যে বেদব্যাসের সহিত তুলনা করা হইয়াছে, ইহার মধ্যে কি এতৎসম্বন্ধীয় কিছু প্রচ্ছন্ন ইঙ্গিত আছে?) ইহার জন্য হয়ত কবিকে সাধারণ জনসমাজে লাঞ্ছিতও হইতে হইয়াছিল। সেইজন্য কবির লেখনীতে যে মধ্যে মধ্যে তিক্ততা ফুটিয়া উঠিবে তাহাতে আশ্চর্য্য কি? তথাপি এই তিক্ততাকে কবি যথাসাধ্য মন্দীভূত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

চৈতন্যভাগবতের কাব্যাংশের কিছু পরিচয় দেওয়া আবশ্যক; কিরূপ স্বল্প আয়োজনে বৃন্দাবনদাস বর্ণনীয় বিষয়ে রং ফলাইয়াছেন তাহা নিম্নের বর্ণনা হইতে সহজেই বোধগম্য হইবে।

রন্ধন করিয়া শচী বোলে বিশ্বম্ভরে।
তোমার অগ্রজে গিয়া আনহ সত্বরে॥
মায়ের আদেশে প্রভু অদ্বৈতসভায়।
আইসেন অগ্রজেরে নিবার ছলায়॥
আসিয়া দেখেন প্রভু বৈষ্ণবমণ্ডল।
অন্যোন্যে কহে কৃষ্ণকথন মঙ্গল॥
... ...
প্রতি অঙ্গ নিরুপম লাবণ্যের সীমা।
কোটিচন্দ্র নহে এক নখের উপমা॥
দিগম্বর সর্ব্ব অঙ্গ ধূলায় ধূসর।
হাসিয়া অগ্রজ প্রতি করয়ে উত্তর॥
ভোজনে আইস ভাই ডাকয়ে জননী।
অগ্রজ বসন ধরি চলয়ে আপনি॥ ১-৬॥

প্রথমযৌবনে নিমাই পণ্ডিত পরম উদ্ধত ছিলেন। সেই সময়ের যে ছবি বৃন্দাবনদাস আঁকিয়াছেন তাহা পরম মনোরম। পথে ঘাটে চতুষ্পাঠীতে পড়ুয়া দেখিলেই প্রভু ব্যাকরণাদি শাস্ত্রের ফাঁকি জিজ্ঞাসা করিতেন। শ্রীবাস প্রভৃতি বিজ্ঞ বৈষ্ণবও বাদ যাইতেন না। প্রভুকে পথে দেখিলে ফাঁকি জিজ্ঞাসার ভয়ে ইহাঁরা সকলে পাশ কাটিয়া সরিয়া পড়িতেন।

যদি কেহ দেখে প্রভু আইসেন দূরে।
সবে পলায়েন ফাকি জিজ্ঞাসের ডরে॥
কৃষ্ণকথা শুনিতে সে সবে ভাল বাসে।
ফাকি বিনু প্রভু কৃষ্ণকথা না জিজ্ঞাসে॥

রাজপথে প্রভু আইসেন একদিন।
পড়ুয়ার সঙ্গে মহা-উদ্ধতের চিন॥
মুকুন্দ যায়েন গঙ্গা স্নান করিবারে।
প্রভু দেখি আড়ে পলাইল কত দূরে॥
দেখি প্রভু জিজ্ঞাসেন পড়ুয়ার[১] স্থানে।
এ বেটা আমারে দেখি পলাইল কেনে॥
পড়ুয়া সকলে[১] বোলে না জানি পণ্ডিত।
আর কোন কার্য্যে বা চলিলা কোন ভিত॥
প্রভু বলে জানিলাম যে লাগি পলায়।
বহির্ম্মুখসম্ভাষা করিতে না জুয়ায়॥
এ বেটা পড়য়ে যত বৈষ্ণবের শাস্ত্র।
পাঁজি বৃত্তি টীকা আমি বাখানিয়ে মাত্র॥
আমার সম্ভাষে নাহি কৃষ্ণের কথন।
অতএব আমা দেখি করে পলায়ন॥১-৯॥

মুকুন্দ দত্ত এবং মুরারি গুপ্ত এই দুইজনের উপরই নিমাই পণ্ডিতের অধিক আক্রোশ ছিল। নিমাই যে টোলে অধ্যয়ন করিতেন মুরারি গুপ্তও সেই টোলে পড়িতেন। অনেক পড়ুয়া নিমাইয়ের নিকট পাঠ বলিয়া লইত, মুরারি তাহা করিতেন না। ইহা লইয়া দুইজনে খটাখটি লাগিত। শেষ পর্য্যন্ত হার অবশ্য মুরারিরই হইত।

গৌরাঙ্গসুন্দর বেশ মদনমোহন।
ষোড়শবৎসর প্রভু প্রথমযৌবন॥
বৃহস্পতি জিনিয়া পাণ্ডিত্য-পরকাশ।
স্বতন্ত্র যে পুথি চিন্তে তানে করে হাস॥
প্রভু বোলে ইথে আছে কোন বড় জন।
আসিয়া খণ্ডুক দেখি আমার স্থাপন॥

১। অমৃতবাজার পত্রিকা সংস্করণের পাঠ 'গোবিন্দের,' 'গোবিন্দ বলেন আমি'।

সন্ধিকার্য্য না জানিয়া কোন কোন জনা।
আপনে চিন্তয়ে পুথি প্রবোধে আপনা ॥
অহঙ্কার করি লোক ভালে মূর্খ হয়।
যেবা জানে তার ঠাঞি পুথি না চিন্তয় ॥
শুনয়ে মুরারি গুপ্ত আটোপ-টঙ্কার।
না বলয়ে কিছু কার্য্য করে আপনার ॥
তথাপিও প্রভু তারে চালেন সদায়।
সেবক দেখিয়া বড় সুখী দ্বিজরায় ॥
প্রভু কহে বৈদ্য তুমি ইহা কেনে পড়।
লতা পাতা দিয়া গিয়া নাড়ী কর দঢ় ॥
ব্যাকরণ শাস্ত্র এই বিষম অবধি।
কফ পিত্ত অজীর্ণ ব্যবস্থা নাহি ইথি ॥
মনে মনে চিন্ত তুমি কে বুঝিবে ইহা।
ঘরে যাহ তুমি রোগী দঢ় কর গিয়া ॥
রুদ্র-অংশ মুরারি পরম খরতর।
তথাপি নহিল ক্রোধ দেখি বিশ্বম্ভর ॥
প্রত্যুত্তর দিলে কেনে বড় ত ঠাকুর।
সবারেই চাল দেখি গর্ব্বহ প্রচুর ॥
সূত্র বৃত্তি পাঁজি টীকা কত যে দুস্কর।
আমা জিজ্ঞাসিয়া কিবা না পাও উত্তর ॥
বিনা জিজ্ঞাসিয়া বল কি বুঝিস তুঞি ॥
ঠাকুর ব্রাহ্মণ তুমি কি বলিব মুঞি ॥
প্রভু বোলে ব্যাখ্যা কর আজি যে পড়িলা।
ব্যাখ্যা করে গুপ্ত প্রভু খণ্ডিতে লাগিলা ॥
গুপ্ত বোলে এক অর্থ প্রভু বোলে আর।
প্রভু ভৃত্যে কেহ কারে নারে জিনিবার ॥ ১-৯ ॥

এইরূপ human interest হিসাবে চৈতন্যভাগবত পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যে একক এবং অদ্বিতীয়। শ্রীচৈতন্যের বাল্য ও যৌবন লীলা এইরূপ সহজ সরল ভাষায় চিত্তাকর্ষক ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। চৈতন্যভাগবতের মধ্যে বর্ণিত ঘটনাগুলির মধ্যে শ্রীধরের কাহিনী বড়ই হৃদয়গ্রাহী। কৌতূহলী পাঠককে আদিখণ্ডের দশম অধ্যায় এবং মধ্যখণ্ডের নবম অধ্যায় হইতে শ্রীধরের কাহিনী পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

শ্রীচৈতন্য কাজীর আদেশ অমান্য করিয়া নগরসংকীর্ত্তনে বাহির হইয়াছেন। বৃন্দাবনদাস এইরূপে তাঁহার তৎকালীন রূপের বর্ণনা করিয়াছেন,

চতুর্দ্দিকে আপন বিগ্রহ ভক্তগণ।
বাহির হইলা প্রভু শ্রীশচীনন্দন॥
প্রভু মাত্র বাহির হইলা নৃত্যরসে।
হরি বলি সর্ব্বলোক মহানন্দে ভাসে॥
সংসারের তাপ হরে শ্রীমুখ দেখিয়া।
সর্ব্বলোক হরি বোলে আলগ হইয়া॥
জিনিয়া কন্দর্প কোটি লাবণ্যের সীমা।
হেন নাহি যাহা দিয়া করিব উপমা॥
তথাপিহ বলি তান কৃপা অনুসারে।
অন্যথা সে রূপ কহিবারে কেবা পারে॥
জ্যোতির্ম্ময় কনকবিগ্রহ বেদসার।
চন্দনে ভূষিত যেন চন্দ্রের আকার॥
চাঁচর চিকুরে শোভে মালতীর মালা।
মধুরমধুরহাসে জিনি সর্ব্বকলা॥
ললাটে চন্দন শোভে ফাগু বিন্দু সনে।
বাহু তুলি হরি বলে শ্রীচন্দ্রবদনে॥
আজানুলম্বিত মালা সর্ব্ব-অঙ্গে দোলে।
সর্ব্ব-অঙ্গ তিতে পদ্মনয়নের জলে॥

দুই মহাভুজ যেন কনকের স্তম্ভ।
পুলকের শোভা যেন কনককদম্ব॥
সুরঙ্গ অধর অতি সুন্দর দশন।
শ্রুতিমূলে শোভা করে ভ্রূযুগপত্তন॥
গজেন্দ্র জিনিয়া স্কন্ধ হৃদয় সুপীন।
তহি শোভে শুক্ল যজ্ঞসূত্র অতি ক্ষীণ॥
চরণারবিন্দে রমা তুলসীর স্থান।
পরমনির্ম্মল সূক্ষ্ম বাস পরিধান॥
উন্নত নাসিকা সিংহগ্রীব মনোহর।
সবা হইতে সুপীত সুদীর্ঘ কলেবর॥ ২-২৩॥

গৃহত্যাগ করিবার অব্যবহিত প্রাক্কালে মাতার সহিত মহাপ্রভুর সম্ভাষণের যে বর্ণনা বৃন্দাবনদাস দিয়াছেন তাহা মোটেই ঘোরাল বা সাড়ম্বর নহে। বর্ণনাটি অত্যন্ত সরল এবং সেইসঙ্গে নিরতিশয় করুণ এবং মর্ম্মস্পর্শী। পেশাদার কবি হইলে এইখানে একহাত লইবার যথেষ্ট সুযোগ ছিল।

আই জানিলেন মাত্র প্রভুর গমন।
দুয়ারে আসিয়া রহিলেন ততক্ষণ॥
জননীরে দেখি প্রভু ধরি তান কর।
বসিয়া কহেন বহু প্রবোধ উত্তর॥
বিস্তর করিলা তুমি আমার পালন।
পড়িলাম শুনিলাম তোমার কারণ॥
আপনার তিলার্দ্ধেক নাহি কৈলে সুখ।
আজন্ম আমারে তুমি রাখিলে সম্মুখ[১]॥
দণ্ডে দণ্ডে যত তুমি করিলা আমার।
আমি কোটি কল্পেও নারিব শোধিবার॥

১। পাঠান্তর 'বাড়াইলে ভোগ।'

তোমার প্রসাদে মা তাহার প্রতিকার।
আমি পুনঃ জন্ম জন্ম ঋণী সে তোমার॥
শুন মাতা ঈশ্বরের অধীন সংসার।
স্বতন্ত্র হইতে শক্তি নাহিক কাহার॥
সংযোগ বিয়োগ যত করে সেই নাথ।
তান ইচ্ছা বুঝিবারে শক্তি আছে কাত॥
দশ দিনান্তরে বা কি এখনেই আমি।
চলিবাঙ কোন চিন্তা না করিহ তুমি॥
ব্যবহারে পরমার্থ যতেক তোমার।
সকল আমাতে লাগে সব মোর ভার॥
বুকে হাতে দিয়া প্রভু বলে বার বার।
তোমার সকল ভার আমার আমার॥
যত কিছু বলে প্রভু শচী সব শুনে।
উত্তর না করে কান্দে অঝোর নয়নে॥
পৃথিবীস্বরূপা হৈল শচী জগন্মাতা।
কে বুঝিবে কৃষ্ণের অচিন্ত্যলীলাকথা॥
জননীর পদধূলি লই প্রভু শিরে।
প্রদক্ষিণ করি তবে চলিলা সত্বরে॥২-২৭॥

চৈতন্যভাগবতে নানাবিধ সমসাময়িক ঐতিহাসিক তথ্য ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত আছে। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম পাদের ও তৎপূর্ব্ববর্ত্তী কালের পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাস রচনার পক্ষে এই সকল বিভিন্ন প্রকার তথ্য অতিশয় মূল্যবান্। এই বিষয়ে আধুনিকপূর্ব্ব বাঙ্গালা সাহিত্যে চৈতন্যভাগবতের সমকক্ষ কিছুই নাই। চৈতন্যদেবের জন্মগ্রহণ করিবার সময় নবদ্বীপের যেরূপ সামাজিক ও নৈতিক অবস্থা ছিল তাহার চিত্র এইভাবে বৃন্দাবনদাস আঁকিয়াছেন—

নবদ্বীপ সম্পত্তি কে বর্ণিবারে পারে।
এক গঙ্গা ঘাটে লক্ষ লোক স্নান করে॥

ত্রিবিধ বৈসে এক জাতি লক্ষ লক্ষ।
সরস্বতীপ্রসাদে সবেই মহাদক্ষ॥
সবে মহা অধ্যাপক করি গর্ব্ব ধরে।
বালকেও ভট্টাচার্য্য সনে কক্ষা করে॥
নানা দেশ হৈতে লোক নবদ্বীপে যায়।
নবদ্বীপে পড়িলে সে বিদ্যারস পায়॥
অতএব পড়ুয়ার নাহি সমুচ্চয়।
লক্ষ কোটি অধ্যাপক নাহিক নিশ্চয়॥
রমাদৃষ্টিপাতে সর্ব্বলোক সুখে বসে।
ব্যর্থ কাল যায় মাত্র ব্যবহাররসে॥
কৃষ্ণনামভক্তিশূন্য সকল সংসার।
প্রথমকলিতে হৈল ভবিষ্য-আচার॥
ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এই মাত্র জানে।
মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥
দম্ভ করি বিষহরি পূজে কোন জন।
পুত্তলি করয়ে কেহ দিয়া বহুধন॥
ধন নষ্ট করে পুত্রকন্যার বিভায়।
এই মত জগতের ব্যর্থ কাল যায়॥

না বাখানে যুগধর্ম্ম কৃষ্ণের কীর্ত্তন।
দোষ বিনা গুণ কার না করে কথন॥
যেবা সব বিরক্ত তপস্বী অভিমানী।
তা সবার মুখেতেও নাহি হরিধ্বনি॥
অতি বড় সুকৃতি যে স্নানের সময়।
গোবিন্দ পুণ্ডরীকাক্ষ নাম উচ্চারয়॥

সকল সংসার মত্ত ব্যবহাররসে।
কৃষ্ণপূজা কৃষ্ণভক্তি কারো নাহি বাসে॥
বাসলী পূজয়ে কেহ নানা উপহারে।
মদ্য মাংস দিয়া কেহ যক্ষপূজা করে॥
নিরবধি নৃত্য গীত বাদ্য কোলাহল।
না শুনি কৃষ্ণের নাম পরম মঙ্গল॥

*　　*　　*

কেন বা কৃষ্ণের নৃত্য কেন বা কীর্ত্তন।
কারে বা বৈষ্ণব বলি কিবা সঙ্কীর্ত্তন॥
কিছু নাহি জানে লোকে ধন পুত্র আশে।
সকল পাষণ্ডী মেলি বৈষ্ণবেরে হাসে॥১-২॥

জগত প্রমত্ত ধনপুত্রবিদ্যারসে।
দেখিলে বৈষ্ণব মাত্র সবে উপহাসে॥
আর্য্যা তর্জ্জা পড়ে সব বৈষ্ণব দেখিয়া।
যতী সতী তপস্বীও যাইব মরিয়া॥
তারে বলি সুকৃতি যে দোলা ঘোড়া চড়ে।
দশ বিশ জন যার আগে পাছে নড়ে॥
এত যে গোসাঞি-ভাবে করয়ে ক্রন্দন।
তবু ত দারিদ্র্যদুঃখ না যায় খণ্ডন॥
ঘন ঘন হরি হরি বলি ছাড়ে ডাক্।
ক্রুদ্ধ হবে গোসাঞি যে পড়িবে॥১-৬॥

দেবতা জানেন সবে ষষ্ঠী বিষহরি।
তাহারে সেবেন সবে মহাদম্ভ করি॥
ধন বংশ বাড়ুক করিয়া কাম্য মনে।
মদ্যমাংসে দানব পূজয়ে কোন জনে॥

যোগীপাল ভোগীপাল মহীপালের গীত।
ইহা শুনিতে সে সর্ব্বলোক আনন্দিত ॥ ৩-৪ ॥

তখনকার দিনে বহির্ম্মুখ "পাষণ্ডী"রা বৈষ্ণবদিগের যেরূপ নিন্দাবাদ ও কুৎসা করিত তাহার বেশ বাস্তব বর্ণনা পাওয়া যায়।

এ বামুনগুলা রাজ্য করিবেক নাশ।
ইহা সবা হৈতে হবে দুর্ভিক্ষ প্রকাশ ॥
এ বামুনগুলা সব মাগিয়া খাইতে।
ভাবককীর্ত্তন করি নানা ছলা পাতে ॥
গোসাঞির শয়ন বরিষা চারি মাস।
ইহাতে কি জুয়ায় ডাকিতে বড় ডাক ॥
নিদ্রাভঙ্গ হৈলে ক্রুদ্ধ হইবে গোসাঞি।
দুর্ভিক্ষ করিব দেশে ইথে দ্বিধা নাই ॥
কেহ বলে যদি ধান্য কিছু মূল্য চড়ে।
তবে এগুলারে ধরি কিলাইমু ঘাড়ে ॥ ১-১৪ ॥

কেহ বলে কিসের কীর্ত্তন কেবা জানে।
এত পাক করে এই শ্রীবাসা বামুনে ॥
মাগিয়া খাইয়া বুলে এরা চারি ভাই।
হরি বলি ডাক ছাড়ে যেন মহা-বাই ॥
মনে মনে বলিলে কি পুণ্য নাহি হয়।
বড় করি ডাকিলে কি পুণ্য উপজয় ॥
কেহ বলে আরে ভাই পড়িল প্রমাদ।
শ্রীবাসের লাগি হইল দেশের উচ্ছাদ ॥
আজি মুঞি দেয়ানে শুনিল সব কথা।
রাজার আজ্ঞায় দুই নাও আইসে এথা ॥
শুনিলেন নদীয়ায় কীর্ত্তন বিশেষ।
ধরি আনিবারে হৈল রাজার আদেশ ॥

যে সে দিকে পলাইবে শ্রীবাস পণ্ডিত।
আমা সভা লৈয়া সর্ব্বনাশ উপস্থিত॥
তখনি বলিনু মুঞি হইয়া মুখর।
শ্রীবাসের ঘর পেলি গঙ্গার ভিতর॥
তখন না কৈলে ইহা পরিহাসজ্ঞানে।
সর্ব্বনাশ হয় এবে দেখ বিদ্যমানে॥
কেহ বলে আমরা সভের কিবা দায়।
শ্রীবাসে বান্ধিয়া দিব যে আসিয়া চায়॥ ২-২ ॥
কেহ বলে আরে ভাই মদিরা আনিয়া।
সভে রাত্রি করি খায় লোক লুকাইয়া॥
কেহ বলে ভাল ছিল নিমাই পণ্ডিত।
তার কেনে নারায়ণ কৈলে হেন চিত॥
কেহ বলে হেন বুঝি পূর্ব্ব অসংস্কার।
কেহ বলে সঙ্গদোষ হইল তাহার॥
নিয়ামক বাপ নাহি তাতে আছে বাই।
এতদিনে সঙ্গদোষে ঠেকিল নিমাঞি॥
কেহ বলে পাসরিল সব অধ্যয়ন।
মাসেক না চাহিলে হয় অবৈয়াকরণ॥
কেহ বলে আরে ভাই সব হেতু পাইল।
দ্বার দিয়া কীর্ত্তনের সন্দর্ভ জানিল॥
রাত্রি করি মন্ত্র পড়ি পঞ্চকন্যা আনে।
নানাবিধ দ্রব্য আইসে তাসভার সনে॥
ভক্ষ্য ভোজ্য গন্ধমাল্য নৈবেদ্য চন্দন।
খাই তাসভার সঙ্গে বিবিধ রমণ॥
ভিন্ন লোক দেখিলে না হয় তার সঙ্গ।
এতেকে দুয়ার দিয়া করে নানা রঙ্গ॥

কেহ বলে কালি হউ যাইব দিয়ানে।
কাঁকালি বাঁধিয়া সব নিব জনে জনে ॥ ২-৮ ॥

শ্রীচৈতন্যের মহিমা দর্শনে রাঢ়ে বঙ্গে অনেক চুনাপুঁটিও আপনাকে ঈশ্বর বলিয়া জাহির করিতে চেষ্টা করিয়াছিল। এই তথ্য কেবল চৈতন্যভাগবত হইতেই জানিতে পারা যায়।[১]

উদরভরণ লাগি পাপিষ্ঠ সকলে।
রঘুনাথ করি আপনারে কেহ বলে ॥
কোন পাপিগণ ছাড়ি কৃষ্ণসংকীর্ত্তন।
আপনাকে গাওয়ায় করিয়া নারায়ণ ॥
দেখিতেছি দিনে তিন অবস্থা যাহার।
কোন লাজে আপনাকে গাওয়ায় সে ছার ॥
রাঢ়ে আর এক মহা ব্রহ্মদৈত্য আছে।
অন্তরে রাক্ষস বিপ্রকাছ মাত্র কাছে ॥
সে পাপিষ্ঠ আপনারে বোলায় গোপাল।
অতএব তারে সবে বলেন শৃগাল ॥ ১-১২ ॥

সেই ভাগ্যে অদ্যাপিও সেই বঙ্গদেশে।
শ্রীচৈতন্যসংকীর্ত্তন করে স্ত্রীপুরুষে ॥
মধ্যে মধ্যে মাত্র কত পাপিগণ গিয়া।
লোক নষ্ট করে আপনারে লওয়াইয়া ॥
গর্দ্দভ শৃগাল তুল্য শিষ্যগণ লইয়া।
কেহ বলে আমি রঘুনাথ ভাব গিয়া ॥ ২-১৭ ॥

উদর ভরণ লাগি এবে পাপী সব।
লওয়ায় ঈশ্বর আমি মূল জরদ্গব ॥ ২-২৩ ॥

১। ভক্তিরত্নাকরে এই জাতীয় এক জয়গোপালের উল্লেখ আছে। ইনিই কি বৃন্দাবন-দাসের উল্লিখিত "গোপাল"?

এ যাবৎ যাঁহারা বৈষ্ণব সাহিত্য লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই অতিপ্রাকৃত ঘটনায় পূর্ণ বলিয়া চৈতন্যভাগবতের ঐতিহাসিকত্ব কমাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পরবর্ত্তীকালে রচিত দুই একখানি গ্রন্থে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের উল্লেখ আছে বলিয়াই অসংখ্য অসংলগ্ন ও ভুল কথায় পরিপূর্ণ সেই গ্রন্থগুলিকে প্রামাণিক বলিয়া প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। বস্তুতঃ চৈতন্যভাগবতে অতিপ্রাকৃত ঘটনার উল্লেখ অতি যৎসামান্য এবং তাহাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য ব্যাপার নয়। এই প্রকার সমালোচক এবং তথাকথিত অনেক উচ্চশিক্ষিত বাঙ্গালীও এখনকার দিনে ইহার অপেক্ষা প্রচণ্ডতর আজগবি ঘটনা (বিশেষতঃ নিজেদের ব্যক্তিগত এবং সমাজগত গুরুর সম্বন্ধে) অক্লেশে গলাধঃকরণ করিয়া থাকেন। বৃন্দাবনদাসের দোষ এইমাত্র যে তিনি শ্রীচৈতন্যকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। এই বিশ্বাসের জন্য তিনি অনেক ঘটনার বিশেষ বিশেষ ব্যাখ্যা দিয়াছেন বটে, কিন্তু কোথাও তথ্যকে বিকৃত করিবার চেষ্টা করেন নাই। নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু এবং মহাপ্রভুর অনেক পারিষদের নিকট হইতে বৃন্দাবনদাস শ্রীচৈতন্যের বাল্য ও যৌবনলীলার ঘটনাগুলি অবগত হইয়াছিলেন, সুতরাং চৈতন্যভাগবতের প্রামাণিকতা উড়াইয়া দেওয়া গায়ের জোরের অথবা মূঢ়তার কাজ। এদিক-ওদিকে তুচ্ছ দুই একটা ভুল থাকিলে তাহা ধর্ত্তব্যের মধ্যে গণ্য করা উচিত নহে।

চৈতন্যভাগবত পয়ার ছন্দে রচিত; দুই এক স্থলে ত্রিপদীর ব্যবহার করা হইয়াছে, কিন্তু তাহা গান হিসাবে দেওয়া হইয়াছে। এই সকল স্থলে এবং দুই একটি গানের টুকরা অংশে রাগ-রাগিণীর উল্লেখ আছে। মূলের কতিপয় অংশেও রাগ-রাগিণীর উল্লেখ দেখা যায়। চৈতন্যভাগবতে এই রাগরাগিণীগুলির উল্লেখ আছে—শ্রী, পটমঞ্জরী, মঙ্গল নট, ধানশী, কেদার, রামকিরি (রামকেলি), ভাটিয়ারী, মল্লার, কারুণ্য শারদা, পাহিড়া। ইহা হইতে মনে হয় যে অন্ততঃ আংশিক ভাবে কাব্যটি গান করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল। চৈতন্যভাগবতে যে সকল গান বা পদের অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার সব গুলিই বৃন্দাবনদাসের রচিত বলিয়া বোধ হয় না। এইরূপ পদের অংশ দুইটি এখানে তুলিয়া দিতেছি।

নাগ বলিয়া[১] চলি যায় সিন্ধু তরিবারে।
যশের সিন্ধু না দেয় কুল অধিক অধিক বাড়ে ॥
(কি আরে) রাম গোপালে বাদ লাগিয়াছে।
ব্রহ্মা রুদ্র সুর সিদ্ধ মুনীশ্বর আনন্দে দেখিতেছে॥ ১-১ ॥

বিজয় হইলা হরি নন্দঘোষের বালা।
হাতে মোহনবাঁশী গলে দোলে বনমালা ॥ ২-২৩ ॥

শ্রীচৈতন্য বর্ত্তমান থাকা কালে অদ্বৈত প্রভু চৈতন্যকীর্ত্তন প্রচলিত করেন। বৃন্দাবনদাসের উক্তি অনুসারে নিম্নে উদ্ধৃত পয়ার শ্লোকটি অদ্বৈত প্রভু নিজে রচনা করিয়া নীলাচলে গাহিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন।

শ্রীচৈতন্য নারায়ণ করুণাসাগর।
দুঃখিতের বন্ধু প্রভু মোরে দয়া কর ॥ ৩-৯ ॥

চৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ড দশ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। এই পরিসমাপ্তি বড়ই আকস্মিক। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয় দেন্নুড়ে বৃন্দাবনদাসের শ্রীপাট হইতে একখানি পুঁথি পাইয়াছিলেন যাহা আপাতদৃষ্টে চৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডের অতিরিক্ত তিন অধ্যায় (দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ) বলিয়া মনে হয়। পরে ইহার দ্বিতীয় একখানি পুঁথি কাইগ্রামের বসু মহাশয়দের গৃহে তিনি প্রাপ্ত হন। এই দ্বিতীয় পুঁথিখানির অনুলিপি দিল্লীতে ১৬৫৮ শকাব্দে বাঙ্গালা ১১৪৩ সালে ১৮ই শ্রাবণ তারিখে সম্পূর্ণ হয়। এই পুঁথি দুইটিকে অবলম্বন করিয়া ব্রহ্মচারী মহাশয় ৪২৪ চৈতন্যাব্দে কালনা হইতে চৈতন্যভাগবতের এই তথাকথিত অধ্যায়ত্রয় প্রকাশ করেন। ব্রহ্মচারী মহাশয় এই অংশটুকুকে যথার্থই বৃন্দাবনদাসের রচনা বলিয়া অনুমান করিয়াছিলেন। কিন্তু এই অনুমান যে যথার্থ নহে তাহা নিম্নলিখিত বর্ণনা হইতে স্বতঃই প্রতিপন্ন হইবে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যভাগবতের আকস্মিক পরিসমাপ্তি লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন,

---

১। অর্থাৎ বলবান্।

নিত্যানন্দলীলাবর্ণনে হইল আবেশ।
চৈতন্যের শেষলীলা রহিল অবশেষ॥ ১-৮॥

সুতরাং এই অধ্যায়ত্রয় যে তাঁহার অজ্ঞাত ছিল ইহা সুনিশ্চিত।

এই পুঁথির মধ্যে শ্রীচৈতন্যের জীবনীবিষয়ক অনেক মুখ্য মুখ্য ঘটনার এরূপ বিসদৃশ ব্যতিক্রম দেখা যায় যে, বৃন্দাবনদাসকে এই পুঁথির রচয়িতা বলিয়া গ্রহণ করিলে তাঁহার উপর অত্যন্ত অবিচার করা হইবে। এইরূপ কতিপয় ব্যাপার এখানে উল্লেখ করিতেছি। শ্রীচৈতন্য নীলাচল হইতে বৃন্দাবন যাইতেছেন। পথে রাঢ়দেশে কুলীনগ্রামে অনন্ত মিশ্রের গৃহে এক অহোরাত্র থাকিয়া কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। সেখান হইতে তিনি গেলেন শ্রীবাসের বাড়ী (কুমারহট্টে?)। তথা হইতে খড়দহ, এবং তাহার পর কাটোয়া। কাটোয়ায় শ্রীরাম আচার্য্যের গৃহে রাত্রিতে অবস্থান করিয়াছিলেন। পর দিন প্রভাতে রূপ সনাতন দুই ভাই আসিয়া মিলিত হইলেন।

হেন কালে রূপ সনাতন দুই ভাই।
পশ্চাতে আছিলা তারা আইলা তথাই॥
প্রভু বোলে আইস আইস রূপ সনাতন।
বৃন্দাবনের পথ ধর যাই বৃন্দাবন॥
রূপ হৈল আগে তাঁর পাছে ন্যাসিবেশ।
তার পাছে গদাধর সনাতন শেষ॥ পৃ ১৬॥

এইরূপে তিনি ব্রজভূমে পৌছিলেন, পৌছিয়া রূপ ও সনাতনের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া গদাধরকে সঙ্গে লইয়া মদনগোপাল, গোবিন্দদেব ও অন্যান্য দেবমূর্ত্তি দর্শন করিলেন। তাহার পর পাঁচ বৎসর যাবৎ ব্রজভূমি পরিক্রমা করিতে লাগিলেন।

এইমতে বার বন করিলা ভ্রমণ।
পাঁচ বৎসর মহাপ্রভু কৈল পর্য্যটন॥
চৌরাশী ক্রোশ ভ্রমণ করিলা গৌরহরি।
পাঁচ বৎসরেতে অন্ত কহিতে না পারি॥ পৃ ২৬॥

তাহার পর প্রভু নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন।

এই পুস্তিকাখানি যে আসল নহে মেকী, অর্থাৎ বৃন্দাবনদাসের রচনা নহে পরন্তু অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন কালের রচনা, তাহা প্রমাণ করিতে আর অধিক কষ্ট স্বীকার করিবার আবশ্যক নাই, উপরের বর্ণনাই যথেষ্ট। তবে পুস্তিকাটি অর্ব্বাচীন বলিয়া ইহাতে উক্ত সকল কথাই যে অযথার্থ হইতে হইবে তাহা বলা চলে না।

কুলীনগ্রামে মহাপ্রভু অনন্ত মিশ্রের গৃহে অহোরাত্র সঙ্কীর্ত্তন করিয়াছিলেন এবং তথায় তিনি তাঁহার অশ্রুসিক্ত কাঁথা রাখিয়া আসিয়াছিলেন, এই কথা সত্য হইতেও পারে।

রাঢ় মধ্যে ধন্য ধন্য নাম কুলীনগ্রাম।
ভক্তগোষ্ঠী সহিতে তথা করিলা বিশ্রাম॥
মিশ্র অনন্ত নাম দ্বিজবর ঘরে।
করিলা কীর্ত্তন অহোরাত্র তার পুরে॥
প্রেমের আবেশে প্রভুর তিতিল গুধড়ি।
রাখিয়া চলিল প্রাতে ব্রাহ্মণের বাড়ী॥
সেই বিপ্র ভাগ্যবান্ এত দয়া যাঁরে।
শ্রীঅঙ্গের কান্থা অদ্যাপিও যাঁর ঘরে॥ পৃ ১০-১১॥

কাটোয়াতে মহাপ্রভুর স্থিতি সম্বন্ধে ইহাতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা অন্যত্র পাওয়া যায় নাই। সুতরাং সেই অংশটুকু নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই শ্রীরাম কে?

সবে গদাধর প্রভুর সংহতি রহিলা।
কাটঞা নগরে প্রভু আসি উত্তরিলা॥
শ্রীরাম সীতার বাড়ী যেদিন[১] রহিলা।
শুনিয়া কাটঞার লোক হরষিত হৈলা॥
ভোজন করিলা প্রভু ছয় জন সঙ্গে।
বসিলা শ্রীরাম সঙ্গে কথার প্রসঙ্গে॥

১। সেদিন?

শ্রীরামেরে বোলে প্রভু শুনহ শ্রীরাম।
কোন বাণে রাবণের বধিলে পরাণ॥
হাসিয়া শ্রীরাম বোলে তুমি তারে নাশি।
বধিলা রাবণ পূর্ব্বে এখন সন্ন্যাসী॥
কংসেরে করিলা যেই নিধন মুরারি।
কলিতে হইলা সেই এবে দণ্ডধারী॥
যে জন বলি রাজারে রাখিল পাতালে।
কলিযুগে সেইজন প্রেম যাচি বুলে॥
মৎসরূপে যেইজন বেদ উদ্ধারিলা।
কলিযুগে সেইজন সন্ন্যাসী হইলা॥
রাবণ রাক্ষসে যে করিলেক নাশ।
সন্ন্যাস করিয়া সেই লুকাবার আশ॥
আজি সে বিদিত যেই হইল আমায়।
কিবা ভাগ্যোদয় মোর কহন না যায়॥
শুনিয়া রামের কথা গৌর ভগবান।
হাতে ধরি কোল দিয়া দিল প্রেমদান॥
প্রভুর পরশ পাইয়া শ্রীরাম উদার।
অনায়াসে পাইলেন প্রেমের ভাণ্ডার॥
হাসিয়া শ্রীরামে বোলে শুন গুপ্তধন।
রাধানাথ ঠাকুরের শুনাহ কীর্ত্তন॥
শুনিয়া বোলে তেঁহ সংপ্রদা নাহি মনে।
তোমার ঠাকুরে গীত শোনাব কেমনে॥
এত বলি হুঙ্কার করিল হরিধ্বনি।
নারদ তম্বুর দোঁহে আইলা আপনি॥
প্রভু বোলে দোঁহে আইলা করিবারে হিত।
কৃষ্ণতান গান কর আনন্দ সহিত॥

শুনিয়া প্রভুর আজ্ঞা নারদ তম্বুর।
বিরহধ্যানগীত গান শব্দ প্রচুর ॥
বাজে বীণা মৃদঙ্গ পাখোয়াজ করতাল।
সভে শুনে গীতবাদ্য বড়ই রসাল ॥
দেখিতে না পায় কেবা গীতবাদ্য করে।
শব্দ শুনি সর্ব্বলোক মূর্চ্ছা হই পড়ে ॥
অনাহূত গীতবাদ্য নাহি দেখি ছায়া।
শ্রীরামে জানিল এই গৌরাঙ্গের মায়া ॥
এইমতে কৃপা করি শ্রীরামে চৈতন্য।
করিল কাটঞা পুরী সর্ব্বলোকে ধন্য ॥
শ্রীরাম আচার্য্য ঘরে প্রভুর যে লেহা।
কৃষ্ণভক্তি হয় যেইজন শুনে ইহা ॥ পৃ ১২-১৫ ॥

পুস্তিকাটিতে মদনগোপালের মাহাত্ম্যের উপর একটু জোর দেওয়া হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়। বৃন্দাবনে

মদনগোপাল আগে দরশন করি।
গোবিন্দদেব দরশন কৈলা গৌরহরি ॥

তাহার পর,

এথা সে যখন প্রভু হৈলা অন্তর্ধান।
ন্যাসীরূপে গেলা মদনগোপালের স্থান ॥
অধিকারী সকল দেখিল তানে যাইতে।
পুনঃ কোথা গেলা প্রভু না পারে লখিতে ॥ পৃ ২৯ ॥

পুস্তিকাটির রচয়িতা কি মদনগোপালের সেবক অথবা সেবকের শিষ্য এবং গদাধরদাসের শাখাভুক্ত ছিলেন ?

গদাধরের সঙ্গে মহাপ্রভু যখন ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা করেন সেই প্রসঙ্গে কৃষ্ণলীলার কিঞ্চিৎ উল্লেখ এই পুঁথিতে পাওয়া যায়। দানলীলা সম্বন্ধে যেটুকু বলা হইয়াছে তাহা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বর্ণিত দানখণ্ডের কথা বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়। এই প্রসঙ্গের অংশগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

ক্রোশ পাঁচ ছয় আছে যমুনার তীর।
বাহু ছাড়ি গদাধর হইলা অস্থির॥
দধি নিবে ঘোল নিবে ডাকে পরিত্রাই।
শুনিঞা যতেক লোক আইসে ধাঞাধাঞি॥

*　　*　　*　　*

বড়াই বড়াই বলি ক্ষণে ক্ষণে ডাকে।
মুঝে নাহি ছোড়ে নন্দলাল কোন পাকে॥
দহি মেরো খায় মটকি ডার দিএ।
ঐছ নগরকা বিচ কৈছে লোক জিয়ে॥
উতারে কাঁচলি হার ছিঁড়এ হামারি।
ছোড়ে লাজ কংস পাশ কহুঁগে গোহারি॥
ছোড় ছোড় পিন্ধন নিচোল পাছে ফাটে।
তুঁঝে দান দিব সব ভূপকো নিকটে॥
দেখহ বড়ায়ি হাম কাহ্নু সাথ নাহি লাগে।
ঝুট দানী বাটোয়ার আলিঙ্গন মাঁগে॥ পৃ ২০

আলিঙ্গন পাঞা গদাধর প্রেমে নাচে।
দধি নিবে দধি নিবে ঘন ঘন যাচে॥
গদাধর বোলে বড়াই আইস বংশীবটে।
এ পথে আইলে বিকে পড়িবে সঙ্কটে॥

...　　...　　...

গদাধর বোলে এইখানে তুমি সেই।
ছিঁড়িলে কাঁচলী যে খাইলে দুধ দই॥
এইখানে বড়াইর বসন ধরিয়া।
তাহার গলার মালা লইলে ছিঁড়িয়া॥
সকল গোপিনী মিলি সাধিল তোমারে।
দিলে দধি দুগ্ধ নৌকা ডুবিল ওপারে॥ পৃ ২৫॥

গদাধর বোলে শুন গুপ্ত-দানী রায়।
কাঁদাইয়া গোপী দান সাধিলা যথায়॥
মিছা করি দান সাধি রাখিতা গোপিনী।
সেইস্থান প্রিয় তব আমি ভাল জানি॥ পৃ ২৬॥

এই বর্ণনা হইতে আমরা অনুমান করিতে পারি যে এই পুস্তিকার রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অথবা তদনুরূপ কোন কাব্য-কাহিনীর সহিত পরিচিত ছিলেন। চৈতন্যভাগবতে দানখণ্ড গানের যে সংক্ষিপ্ত উল্লেখ আছে তাহা ঠিক শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে বর্ণিত দানলীলার অনুযায়ী বলিয়া মনে হয় না।

হুঙ্কার করিয়া নিত্যানন্দচন্দ্র রায়।
করিতে লাগিলা নৃত্য গোপাললীলায়॥
দানখণ্ড গায়েন মাধবানন্দ ঘোষ।
শুনি অবধূতসিংহ পরমসন্তোষ॥ ৩-৫॥

চৈতন্যভাগবতে উল্লিখিত দানলীলার নায়ক প্রেমিক কৃষ্ণ নহেন, তিনি বালগোপাল—এইরূপ বোধ হয়।

ষোড়শ পরিচ্ছেদ

চৈতন্যমঙ্গল ঃ লোচনদাস

লোচনদাসের শ্রীশ্রীচৈতন্যমঙ্গল[১] বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতের পরে রচিত। স্বীয় কাব্যে লোচন বৃন্দাবনদাস ও তাঁহার গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।[২] লোচনদাস আনুমানিক ১৫২৩ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং আনুমানিক ১৫৮৯ খ্রীষ্টাব্দে তিরোধান করেন। বর্দ্ধমান জেলায় মঙ্গলকোটের নিকটবর্ত্তী কোগ্রাম কবির জন্মভূমি। ইঁহার পিতার নাম কমলাকর এবং মাতার নাম সদানন্দী। মাতামহ পুরুষোত্তম গুপ্তের নিকট কবি বাল্যে শিক্ষালাভ করেন। নরহরি সরকার ঠাকুর ছিলেন কবির গুরু। চৈতন্যমঙ্গলের সমাপ্তিভাগে কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

চারিখণ্ড পুঁথি সায় করিল প্রকাশ।
বৈদ্যকুলে জন্ম মোর কোগ্রাম নিবাস॥
মাতা মোর পুণ্যবতী সদানন্দী নাম।
যাহার উদরে জন্মি করি কৃষ্ণ-কাম॥
কমলাকরদাস নাম পিতা জন্মদাতা।
যাহার প্রসাদে কহি গোরা-গুণগাথা॥
সংসারেতে জন্ম দিল সেই মাতা পিতা।
মাতামহকুল তার শুন কিছু কথা॥
মাতৃকুল পিতৃকুল বৈসে এক গ্রামে।
ধন্য মাতামহী সে অভয়াদাসী নামে॥
মাতামহের নাম শ্রীপুরুষোত্তম গুপ্ত।
নানা তীর্থপূত তেঁহ তপস্যায় তৃপ্ত॥

১। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩২৫)।

২। শ্রীবৃন্দাবনদাস বন্দিব এক চিতে।
জগত মোহিত যার ভাগবত গীতে॥ পৃ ২।

পিতৃকুলে মাতৃকুলে আমি মাত্র পুত্র।
সহোদর নাহি মাতামহের যে সূত্র ॥
যথাতথা যাই সে দুর্ল্লীল করে মোরে।
দুর্ল্লীল লাগিয়া কেহো পঢ়াইতে নারে ॥
মারিয়া ধরিয়া মোরে শিখাইল আখর।
ধন্য পুরুষোত্তম গুপ্ত চরিত্র তাহার ॥
তাহার চরণে মুঞি করোঁ নমস্কার।
চৈতন্যচরিত্র লিখি প্রসাদে তাহার ॥
মাতৃকুলে পিতৃকুলে কহিল মো কথা।
নরহরিদাস মোর প্রেমভক্তি দাতা ॥
তাহার প্রসাদে যেবা শুনিল প্রকাশ।
আনন্দে গাইল গুণ এ লোচনদাস ॥

দুর্ল্লভসারেও এই পরিচয় পাওয়া যায়।

কবি অল্পবয়সেই গুরুর আশ্রয় গ্রহণ করেন বলিয়া অনুমান হয়। চৈতন্য-মঙ্গলের একস্থানে কবি বলিয়াছেন,

নরহরিদাসের দয়াময় দেহে।
পাতকী দেখিয়া দয়া অবাধ সিনেহে ॥
দুরন্ত পাতকী অন্ধ অতি দুরাচারে।
অনাথ দেখিয়া দয়া করিল আমারে ॥ পৃ ৩০ ॥

রামগোপালদাসের শাখানির্ণয়ে লোচনদাস সম্বন্ধে একটি নূতন কথা পাওয়া যায়।

গুরুর অর্থে বিকাইল ফিরিঙ্গির হাথ ॥

সম্ভবতঃ ফিরিঙ্গিদের সহিত নরহরিদাসের কারবার ছিল। কোন গোলমাল হওয়াতে হয়ত পর্ত্তুগীসেরা কবিকে আটক করিয়া রাখিয়াছিল।

লোচনদাসের কাব্য মুখ্যভাবে গীত হইবার জন্য রচিত হইয়াছিল, ইহা

কবির উক্তি হইতে[১] এবং প্রচুর রাগ-রাগিণীর[২] উল্লেখ হইতেও বোঝা যায়। চৈতন্যভাগবতের মত চৈতন্যমঙ্গল অধ্যায়াদিতে বিভক্ত নহে, কেবল সূত্রখণ্ড, আদিখণ্ড, মধ্যখণ্ড এবং শেষখণ্ড এই চারি স্থূল ভাগে বিভক্ত। ইহাতেও বোধ হয় যে কাব্যটি প্রধানতঃ গান করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল। পৌরাণিক 'মঙ্গল' কাব্যের সহিত এই কাব্যটির কিছু সামান্য মিল দেখিতে পাওয়া যায়। চৈতন্যমঙ্গলের প্রথম কবিতাটিতে গণেশ, হরগৌরী, সরস্বতী ও দেবগণের বন্দনা আছে, তাহার পর গুরুজনের, বিষ্ণুভক্তের ও গুরুর বন্দনা।)

(লোচনের কাব্য মুরারি গুপ্তের কড়চা অনুসারে রচিত।[৩] সেই কারণে গৌরাঙ্গচরিত বিষয়ে ইহাতে নূতন কথা বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। যে যে বিষয়গুলি নূতন, মনে হয় সেগুলি কবিকপোলকল্পিত। উদাহরণ হিসাবে সন্ন্যাস-গ্রহণের প্রাক্কালে বিষ্ণুপ্রিয়াসম্ভাষণ অংশটি বলা যাইতে পারে। মুরারি

১। যথা, করুণা ভরল সব হেম গোরা গা।
বন্দিয়া গাইব সে শীতল রাঙা পা॥
সকল ভকত লঞা বৈসহ আসরে।
সে পদ শীতল বা লাগুক কলেবরে॥ পৃ ২॥

২। চৈতন্যমঙ্গলে এই রাগ-রাগিণীগুলির উল্লেখ আছে—পঠমঞ্জরী, কেদার, বড়ারি, মারহাটিয়া, ধানশী, শ্রী, ভাটীয়ারী, বিভাস, পাহিড়া, সিন্ধুড়া, মল্লার, মঙ্গল গুর্জ্জরী, তুড়ী, রামকেলি, কামোদ, করুশ্রী, পূরবী, সিন্ধুড়া, শ্যামগড়া, আহিরী, সুহই, ললিত।

৩। সেই সে মুরারি গুপ্ত বৈসে নদীয়ায়॥
... ...
শ্লোকবন্ধে কৈল পুঁথি গৌরাঙ্গচরিত।
দামোদর-সংবাদ মুরারি-মুখোদিত॥
শুনিঞা আমার মনে বাঢ়িল পিরিত।
পাঁচালি প্রবন্ধে কহোঁ গৌরাঙ্গচরিত॥ পৃ ৩।

কহিল মুরারি গুপ্ত শ্লোকপরবন্ধে।
যে কিছু শুনিল সেই দোঁহার প্রসাদে॥
শুনিঞা মাধুরীলোভে চিত্ত উতরোলে।
নিজদোষ না দেখিয়া মন ভোর ভোলে॥
যে কিছু কহিল নিজবুদ্ধি অনুরূপ।
পাঁচালীপ্রবন্ধে কহোঁ মো ছার মুরুখ॥ পৃ ১৬১॥

গুপ্তের কড়চা সংক্ষিপ্ত গ্রন্থ, লোচন তাহাকে বিস্তারিত করিয়াছেন। নরহরি-দাসের নিকটও কবি কিছু কিছু চৈতন্যচরিত্র শ্রবণ করিয়াছিলেন।[১]

চৈতন্যভাগবতের তুলনায় চৈতন্যমঙ্গল বিষয়বস্তুর বর্ণনায় কিছু উন বটে, তবে পল্লবিত কবিত্বাংশে লোচনের কাব্য বৃন্দাবনদাসের কাব্য অপেক্ষা যে শ্রেষ্ঠ তাহা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে। বৃন্দাবনদাসের রচনা মুখ্যতঃ বর্ণনাত্মক আর লোচনের রচনা প্রধানতঃ রসাত্মক। এই কারণে লোচনের কাব্যে ত্রিপদী-ছন্দ পয়ারের সহিত তুল্যভাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৃন্দাবনদাসের কাব্যে ত্রিপদীর ব্যবহার খুবই অল্প এবং তাহাতে বৃন্দাবনদাস বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। চৈতন্যচরিতচিত্রণে লোচন কিরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহার কিছু উদাহরণ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

শুক্লাম্বরের গৃহে প্রভুর ভাবাবেশ—

তবে বিশ্বম্ভর পহুঁ প্রেমে গরগর।
আছয়ে ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী শুক্লাম্বর॥
তার ঘরে কান্দে প্রভু প্রেমায় বিভোর।
নয়নে গলয়ে অশ্রুধারা নিরন্তর॥
নাসিকায় বহে শ্লেষ্মা অতি নিরন্তর।
নিরবধি ফেলে তাহা বিপ্র শুক্লাম্বর॥
ভূমেতে লুটাঞা কাঁদে রজনী দিবস।
সন্ধ্যার সময়ে প্রশ্ন করয়ে বিবশ॥
দিবসে পুছয়ে প্রভু কত রাত্রি যায়।
সব জন কহে দিবা রাত্রি নাহি হয়॥
তবে সেই মত প্রভু প্রেমাতে বিবশ।
রোদন করয়ে পুন আনন্দে অবশ॥

১। তাহার প্রাসাদে যেবা শুনিল প্রকাশ।
আনন্দে গাইল গুণ এ লোচনদাস॥ পৃ ১৯০॥

প্রহরেক রাত্রি গেলে দিন বলি পুছে।
দিন নাহি হয় কহে কাছে যত আছে॥
প্রেমায় বিভোর নাহি জানে দিবারাতি।
কারো মুখে কৃষ্ণনাম শুনি পড়ে ক্ষিতি॥
কৃষ্ণগুণনামগীত কেহো যদি গায়।
শুনিঞা তখনি কান্দে ভূমেতে লুটায়॥
ক্ষণে দণ্ডবত করি করে পরণাম।
ক্ষণে উচ্চস্বর করি গায় কৃষ্ণনাম॥
সকরুণ কণ্ঠ ক্ষণে কম্পকলেবর।
পুলকিত অঙ্গ জিনি কদম্বকেশর॥
নিরন্তর পরবশ ক্ষণেকে প্রবোধে।
সেইক্ষণে স্নানদান জন-অনুরোধে॥ পৃ ৮৬॥

মহাপ্রভু সন্ন্যাস করিয়া অদ্বৈত প্রভুর গৃহে কয়দিন থাকিয়া নীলাচলে যাইতে উদ্যত হইয়াছেন। সেই সময়ে ভক্তগণের ব্যাকুলতা লোচনদাস সহজ কবিত্বের সহিত বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীনিবাস হরিদাস মুরারি মুকুন্দ।
প্রভুরে কহিতে কিছু করে অনুবন্ধ॥
স্বতন্ত্র ঠাকুর তুমি মো সব অধীন।
দীন দুরাচার পাপী তাহে ভক্তিহীন॥
কি বলিতে পারি প্রভু করিলা সন্ন্যাস।
এখন ছাড়িয়া যাহ নিজ সব দাস॥
একেশ্বর কেমনে হাঁটিয়া যাবে পথে।
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অন্ন চাহিবে কাহাতে॥
শচীর দুলাল তুমি দুর্ল্লীল চরিত।
দুখানি চরণ বিষ্ণুপ্রিয়ার সেবিত॥

ভক্তজননয়ন-অমিয়া-দিঠি-পাতে।
এ দেহ প্রেমার তরু বাঢ়ে হাথে হাথে ॥
অনেক আছিল প্রেমফল-প্রতিআশে।
সন্ন্যাস করিয়া শূন্য করাইলে আশে ॥
পাপিষ্ঠ শরীরে প্রাণ না যায় ছাড়িয়া।
ঘরে চলি যায় তোরে বিদায় করিয়া ॥
এখনে চলিয়া যাব মো সব অধম।
তোর ধর্ম্ম নহে তুমি পতিতপাবন ॥
করুণা-কর্দ্দমে তনু গঢ়িয়াছে বিধি।
বিনোদবিলাসলীলা দিয়া নানাবিধি ॥
কেবল পরমপ্রেমা তাহে জীবন্যাস।
ত্রৈলোক্য-অদ্ভুত রূপ করিয়া প্রকাশ ॥
উপমা দিবার নাহি ত্রৈলোক্য ভিতর।
তোমার নিষ্ঠুর বাণী জগত কাতর ॥
এমত করিতে প্রভু না জুয়ায় তোরে।
আপনে রুইয়া বৃক্ষ কাট কেনে মূলে ॥
যে যায় তাহারে লহ সংহতি করিয়া।
নহে বা মরিব সভে আগুনে পুড়িয়া ॥
হের দেখ তোর মাতা শচী অনাথিনী।
সহিতে না পারি উহার বিননিঞা-বাণী ॥
বিষ্ণুপ্রিয়ার কান্দনাতে পৃথিবী বিদরে।
শূন্য হৈল নবদ্বীপ নগর বাজারে ॥
শূন্য যেন লাগে সর্ব্ব বৈষ্ণবের ঘর।
সভারে সভার বাড়ী যোজন অন্তর ॥ পৃ ১৪৮-৪৯ ॥

মহাপ্রভু সকলকে এই বলিয়া প্রবোধ দিলেন—

কিবা বিষ্ণুপ্রিয়া কিবা মোর মাতা শচী।
যে ভজয়ে কৃষ্ণ তার কোলে আমি আছি॥

ভক্তগণকে এবং মাতাকে প্রবোধ দিয়া প্রভু সত্বর গমনে চলিলেন। অদ্বৈত মহাপ্রভুর পশ্চাৎ পশ্চাৎ চলিলেন।

অদ্বৈত আচার্য্য প্রভুর সঙ্গে চলি যায়।
দণ্ড দুই গিয়া প্রভু পাছু পানে চায়॥
দাঁড়াইলা মহাপ্রভু আচার্য্য-বিলম্বে।
উত্তরিলা আচার্য্য কাঁকালি-অবলম্বে॥
বয়ান বিরস ঘর্ম্ম বিন্দু বিন্দু তায়।
কাতর অন্তরে কিছু প্রভুরে শুধায়॥
তুমি পরদেশে যাবে এই মোর দুখ।
তাহাতেই আর এক পোড়ে মোর বুক।
আপন অন্তর কথা কহিল গোচর।
নিশ্চয় কহিবে প্রভু ইহার উত্তর॥
তোর নিজ জন যত তোমার বিচ্ছেদে।
কান্দয়ে কাতর হঞা পদ-অরবিন্দে॥
আমার পাপিষ্ঠ হিয়া না দরবে কেনে।
এ কাঠ-কঠিন অশ্রু নাহিক নয়ানে॥
আমার অধিক আর দুরাচার কহি।
তোমার বিচ্ছেদে হিয়ায় প্রেমা উঠে নাহি॥
এ বোল শুনিঞা প্রভু হাসি কৈল কোলে।
কহিব ইহার তত্ত্ব শুন মোর বোলে॥
তোমার প্রেমায় আমি ছাড়িতে না পারি।
তেকারণে তোর প্রেমা গাঁঠিতে সম্বরি॥

ইহা বলি আউলাইলা বসনের গ্রন্থি।
প্রেমায় বিভোর সে আচার্য্য মনে চিন্তি ॥ পৃ ১৪৯-৫০ ॥

(চৈতন্যমঙ্গলেও মহাপ্রভুর শেষ জীবনের কথা কিছুই নাই। বৃন্দাবন হইতে ফিরিয়া প্রতাপরুদ্র রাজার উপর অনুগ্রহপ্রদর্শনের পরই প্রকৃতপ্রস্তাবে কাব্যের পরিসমাপ্তি হইয়াছে।)

লোচনের নামে কতকগুলি বৈষ্ণবধর্ম্মতত্ত্ববিষয়ক ও সহজিয়াতত্ত্বসম্বন্ধীয় পুস্তিকা পাওয়া যায়। তাহার মধ্যে কেবল দুর্ল্লভসার[১] গ্রন্থটিই লোচনদাসের রচিত বলিয়া নিশ্চিত হইয়াছে। ইহাতে কবি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা চৈতন্যমঙ্গল-স্থিত বর্ণনার সহিত অভিন্ন। বৈষ্ণবধর্ম্মতত্ত্ব বিশেষতঃ রাগানুগাপদ্ধতি বিষয়ে আলোচনা দুর্ল্লভসারে আছে। লোচনের ধর্ম্মমত বিষয়ে অন্যত্র[২] বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিয়াছি, বাহুল্যভয়ে সেকথা এখানে লিখিলাম না। পদাবলীর আলোচনা প্রসঙ্গে লোচনের কবিত্ব শক্তির বিচার করা গিয়াছে।

১। বটতলা ও বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

২। নরহরি সরকারের প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

সপ্তদশ পরিচ্ছেদ

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজ

চৈতন্যজীবনীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুলিখিত এবং প্রামাণ্য গ্রন্থ হইতেছে চৈতন্যচরিতামৃত। মহাপ্রভুর শেষ দ্বাদশ বৎসরের চরিতকথা কেবল এই গ্রন্থেই পাওয়া যায়। শ্রীচৈতন্যের প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব মতের দার্শনিক তথ্য ও বিশ্লেষণ এই গ্রন্থে সুনিপুণভাবে সুললিতক্রমে লিখিত হইয়াছে। গ্রন্থকার যেমন অগাধ পণ্ডিত অথচ পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তাঁহার রচনাও সেই পরিমাণে গভীর অথচ সরল হইয়াছে। ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙ্গালা ভাষায় এইরূপ একখানি উচ্চাঙ্গের দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করিতে হইলে যে কতটা ক্ষমতার প্রয়োজন তাহা এই গ্রন্থখানি না পড়িলে কেহ ধারণা করিতে পারিবেন না। চৈতন্যচরিতামৃত অবিসংবাদিতভাবে পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। যথার্থ বলিতে কি, সমগ্র বাঙ্গালা সাহিত্যের মধ্যে যদি একখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থের নাম করিতে হয় তাহা এই চৈতন্যচরিতামৃত।

অনেকের ধারণা চৈতন্যচরিতামৃত বইটির ভাষা কটমট এবং যৎপরোনাস্তি দুর্বোধ। যাঁহারা এই কথা বলেন, হয় তাঁহারা বইখানি জীবনে কখনও দেখেন নাই, নতুবা বলিতে হইবে যে দার্শনিক আলোচনা তাঁহাদের ভাল লাগে না। বিষয়ের কাঠিন্যকে ইঁহারা ভাষার কাঠিন্য মনে করিয়া ভুল করেন। আর একদল সমালোচক আছেন, যাঁহারা বলেন যে কৃষ্ণদাস কবিরাজ তাঁহার বই মিশ্র বাংলা এবং হিন্দীতে রচনা করিয়াছিলেন। ইহার উত্তরে বলিতে পারি, দীর্ঘকাল বৃন্দাবনবাসহেতু কবিরাজের কলমের মুখে ক্বচিৎ দুই একটা[1] হিন্দী শব্দ বা প্রয়োগ আসিয়া গিয়াছে; কিন্তু তাই বলিয়া যাঁহারা বলেন যে, চৈতন্যচরিতামৃতের ভাষা মিশ্র হিন্দী, তাঁহারা পরের মুখেই ঝাল খান। পুরাতন বাঙ্গালা ভাষার

১। যেমন, 'নাহি কাঁহা-সো বিরোধ'।

অনভিজ্ঞতা হেতু অধুনা-অপ্রচলিত বাঙ্গালা শব্দকে অনেকে আবার হিন্দী শব্দ বলিয়া ভ্রম করিয়া থাকেন।

চৈতন্যচরিতামৃতের তারিখ লইয়া প্রবল মতভেদ আছে। অনেক পুঁথিতে এবং প্রায় সবগুলি মুদ্রিত সংস্করণে গ্রন্থের সর্ব্বশেষে এই রচনাকালজ্ঞাপক শ্লোকটি পাওয়া যায়—

শাকে সিন্ধ্বগ্নিবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যেঽহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥

অর্থাৎ ১৫৩৭ শকাব্দে (১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দে) জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণাপঞ্চমীতে রবিবারে বৃন্দাবন মধ্যে এই গ্রন্থ পূর্ণতাপ্রাপ্ত হইল।

এই শ্লোকটির যে পাঠান্তর কতকগুলি পুঁথিতে পাওয়া যায়, তাহাতে এই তারিখ ৩৪ বৎসর পিছাইয়া যায়।

শাকেঽগ্নিবিন্দুবাণেন্দৌ জ্যৈষ্ঠে বৃন্দাবনান্তরে।
সূর্য্যোঽহ্ন্যসিতপঞ্চম্যাং গ্রন্থোঽয়ং পূর্ণতাং গতঃ॥[১]

কিন্তু গণনা করিয়া দেখা গিয়াছে যে, ১৫০৩ শকাব্দে জ্যৈষ্ঠ মাসের কৃষ্ণা পঞ্চমী রবিবারে পড়ে নাই, সুতরাং এই তারিখটিতে ভুল আছে।

কিন্তু ১৫৩৭ শকাব্দও নেওয়া চলে না। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনে আসিয়া সনাতন এবং রূপ গোস্বামীর নিকট শিক্ষালাভ করিয়াছিলেন এবং বোধ হয় তাঁহাদেরই ইঙ্গিতে রঘুনাথদাস গোস্বামীর আনুগত্য গ্রহণ করেন। সনাতন গোস্বামী ১৫৫৪ খ্রীষ্টাব্দের দিকে তিরোধান করেন, তাহা হইলে কবিরাজ অন্ততঃ ১৫৫০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে বৃন্দাবনে আগমন করেন। কবিরাজ যে প্রৌঢ়াবস্থায় বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন, ইহা এক রকম সর্ব্ববাদিসম্মত। সুতরাং ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দ চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল ধরিলে কবির বয়স যুক্তিসঙ্গত বার্দ্ধক্যেরও সীমা ছাড়াইয়া যায়। ইহা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে, কবি নিজেই বলিয়াছেন,

---

১। ব্যাসাচার্য্য কর্তৃক লিখিত ও বিষ্ণুপুর রাজবাটীতে রক্ষিত পুঁথিতেও নাকি এই পাঠ আছে [ব-সা-প-প ৪, পৃ ১৮৩ পাদটীকা]।

আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তভু লিখি এ বড় বিস্ময় ॥ ২-২ ॥
আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুত্তলী সমান ॥
বৃদ্ধ জরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির ॥
নানারোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রি দিনে মরি ॥ ৩-২০ ॥

চৈতন্যচরিতামৃত রচনার কালে বৃন্দাবনদাস জীবিত ছিলেন, কেন না কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবনদাসের প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"তাঁর আজ্ঞা লয়ে লিখি যাহাতে কল্যাণ।" ইহাও প্রাচীনত্বের দ্যোতক।

গ্রন্থরচনাকালে কবিরাজ গোস্বামী প্রৌঢ়ত্বের কোঠা পার হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই, কিন্তু উপরে উদ্ধৃত উক্তি যে অনেকটা কৃষ্ণদাসের স্বভাবসিদ্ধ বিনয় প্রসূত তাহাও অস্বীকার করিতে পারি না। গ্রন্থটি রচনা করিতে পাঁচ-সাত বৎসর লাগিয়াছিল এরূপ অনুমান করিলে বিশেষ অন্যায় হইবে না। গ্রন্থরচনায় হস্তক্ষেপ করিবার সময় কবিরাজ গোস্বামী বার্দ্ধক্যের অজুহাত দেখান নাই, সুতরাং তখন তিনি সক্ষম ছিলেন বলিতে হইবে। সুতরাং এক পীড়া ছাড়া ইতিমধ্যে বার্দ্ধক্যের ভরে "বৃদ্ধ জরাতুর" এবং "অন্ধ বধির" হওয়া যায় না। সুতরাং সাধারণতঃ চৈতন্যচরিতামৃত রচনার যে তারিখ ধরা হয়—আনুমানিক ১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দ—তাহা অনেকটা এই হিসাবে ঠিক বলিয়া মনে হয়।

চৈতন্যচরিতামৃতে কবিরাজ গোস্বামী জীব গোস্বামীর গোপালচম্পূ কাব্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে অনেকে অনুমান করেন যে, যেহেতু গোপাল-চম্পূ রচনা ১৫৯২ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হইয়াছিল, সেই হেতু চৈতন্যচরিতামৃত উক্ত তারিখের পরে রচিত হয়। ইহার বিরুদ্ধে দুইটি যুক্তি আছে। প্রথমতঃ

গোস্বামীদিগের গ্রন্থের শেষে যে পুষ্পিকা শ্লোক দেওয়া থাকে তাহার মধ্যে অনেক গলদ আছে, এবং এইরূপ অধিকাংশ শ্লোক প্রক্ষিপ্ত। একটি উদাহরণ দিতেছি। রূপ গোস্বামীর দানকেলিকৌমুদী ভাণিকার অনেক পুঁথির শেষে যে শ্লোকটি[১] আছে তাহা হইতে ইহার রচনাকাল পাওয়া যায় ১৪৭১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৪৯ খ্রীষ্টাব্দ। অথচ এই ভাণিকা হইতে শ্লোক ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। এদিকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর রচনাকাল হইতেছে ১৫৪১ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং এইসকল পুষ্পিকা-শ্লোক যে কতদূর প্রামাণ্য, তাহা জানা গেল।

প্রকৃতপ্রস্তাবে এই পুষ্পিকাগুলি প্রায়ই মূলগ্রন্থের কোন প্রাচীন অনুলিপির তারিখ। সুতরাং অনুমান হয় যে, 'শাকে সিন্ধগ্নি' ইত্যাদি পুষ্পিকা-শ্লোকটি চৈতন্যচরিতামৃতের কোন প্রাচীন অনুলিপির সমাপ্তির তারিখ। পরে এই আদর্শ হইতে যে সকল পুঁথি অনুলিখিত হইয়াছিল তাহার সবগুলিতে এই শ্লোকটি লিখিত হইয়াছিল। দানকেলিকৌমুদীর পুষ্পিকা-শ্লোকটির ইতিহাসও এইরূপ হইবে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করিতে পারা যায় যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর অপর দুইটি রচনায়, গোবিন্দলীলামৃত মহাকাব্যে এবং কৃষ্ণকর্ণামৃতের টীকা সারঙ্গরঙ্গদায় কোনরূপ তারিখ-জ্ঞাপক পুষ্পিকাশ্লোক নাই।

গোপালচম্পূ সমাপ্তির তারিখ সত্য ধরিয়া লইলেও তাহা অবিসংবাদিতভাবে চৈতন্যচরিতামৃতের পরবর্ত্তিত্ব প্রমাণ করে না। চৈতন্যচরিতামৃতে গোপালচম্পূর নাম আছে বলিয়াই যে উহা পরবর্ত্তী রচনা তাহা জোর করিয়া বলিতে পারা যায় না। গোপালচম্পূ সুবৃহৎ গ্রন্থ, ইহা সমাপ্ত করিতে বহুবর্ষ লাগিয়াছিল। হয়ত জীব গোস্বামী বইটি আরম্ভ করিয়া কিছুকাল ফেলিয়া রাখিয়াছিলেন। গ্রন্থরচনার আরম্ভের কথা কবিরাজ গোস্বামীর জানা থাকায় তিনি তাহা জীবগোস্বামীর রচনাবলীর মধ্যে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন।

১। গতে মনুশতে শাকে চন্দ্রস্বরসমন্বিতে।
নন্দীশ্বরে নিবসতা ভাণিকেয়ং বিনির্ম্মিতা।

১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত নিত্যানন্দদাসের প্রেমবিলাসে[১] এবং ১৬০৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত যদুনন্দনদাসের কর্ণানন্দে চৈতন্যচরিতামৃতের বিশেষভাবে উল্লেখ আছে। তবে যাঁহারা ১৬১৫ খ্রীষ্টাব্দের পক্ষপাতী তাঁহারা এই দুইটি বইকে জাল বলিয়া এই সাক্ষ্য উড়াইয়া দেন।

ফলতঃ চৈতন্যচরিতামৃতের রচনাকাল অজ্ঞাত। (মোটামুটি এই কথা বলিতে পারা যায় যে, খ্রীষ্টীয় ষোড়শ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষে অথবা চতুর্থ পাদের মধ্যে বইখানি রচিত হইয়াছিল।) ইহার অতিরিক্ত কিছুই বলিবার মত উপকরণ এখনও আমাদের হস্তগত হয় নাই।

(কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর জীবনী সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে এই তথ্যগুলি পাওয়া যায়। নৈহাটির নিকটে ঝামটপুর গ্রামে কবির বাস ছিল। কৃষ্ণদাসের এক ভাই ছিল। কবি একদিন নিত্যানন্দ প্রভুকে স্বপ্নে দর্শন করিয়া তাঁহার আদেশ মত ব্রজভূমে বাস করেন। তথায় তিনি সনাতন এবং রূপ গোস্বামীর অনুগ্রহ লাভ করেন এবং রঘুনাথদাস গোস্বামীর শিষ্য হন।)

অবধূত গোসাঞির এক ভৃত্য প্রেমধাম।
মীনকেতন রামদাস হয় তার নাম॥
আমার আলয়ে অহোরাত্র-সঙ্কীর্ত্তন।
তাহাতে আইল তেহোঁ পাঞা নিমন্ত্রণ॥

*   *   *

উৎসবান্তে গেলা তেঁহো করিয়া প্রসাদ।
মোর ভ্রাতা সনে তার কিছু হৈল বাদ॥

*   *   *

ভাইকে ভৎর্সিনু মুঞি লঞা এই গুণ।
সেই রাত্রে প্রভু মোরে দিল দরশন॥
নৈহাটি নিকটে ঝামটপুর নামে গ্রাম।
তাঁহা স্বপ্নে দেখা দিলা নিত্যানন্দ রাম॥

[১] বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র (দ্বিতীয় সংস্করণ), অষ্টাদশ বিলাস, পৃ ২৭১-২৭২।

কি দেখিনু কি শুনিনু করিয়ে বিচার।
প্রভু আজ্ঞা হৈল বৃন্দাবন যাইবার॥
সেইক্ষণে বৃন্দাবনে করিনু গমন।
প্রভুর কৃপাতে সুখে আইনু বৃন্দাবন॥
জয় জয় নিত্যানন্দ নিত্যানন্দ রায়।
যাঁহা হৈতে পাইনু রূপসনাতনাশ্রয়॥
যাঁহা হৈতে পাইনু রঘুনাথ মহাশয়।
যাঁহা হৈতে পাইনু শ্রীস্বরূপ-আশ্রয়॥
সনাতন কৃপায় পাইনু ভক্তির সিদ্ধান্ত।
শ্রীরূপকৃপায় পাইনু ভক্তিরসপ্রান্ত॥ ১-৫ ॥

প্রেমবিলাসের মতে কৃষ্ণদাস স্বপ্নে নহে সাক্ষাতে নিত্যানন্দ প্রভুর দর্শন পাইয়াছিলেন। কবিরাজের সম্বন্ধে প্রেমবিলাস কিছু কিছু নূতন কথা আছে।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ যবে গৌড় দেশে।
কৃষ্ণের ভজন করে আনন্দ আবেশে॥
একদিন ঝামটপুর নামে এক গ্রাম।
দর্শন দিলেন নিত্যানন্দ গুণধাম॥
নিজ সহচর সঙ্গে বেশ মনোহর।
রূপ দেখি কৃষ্ণদাস আনন্দ-অন্তর॥
প্রণাম করিয়া বহু করিল স্তবন।
আজ্ঞা হৈল সর্ব্বসিদ্ধি যাও বৃন্দাবন॥
নিজ গ্রন্থে লিখে প্রভুর শিষ্য আপনাকে।
না জানয়ে দীনহীন কৃপা কৈল মোকে॥
পুনর্ব্বার বৃন্দাবন করিল গমন।
আশ্রয় করিল রঘুনাথের চরণ॥

কেন হেন লিখে কেন করয়ে আশ্রয়।
সেই বুঝে যার মহা-অনুভব হয়॥
সিদ্ধব্যবহার এই অনন্ত নির্ম্মল।
ভাবাশ্রয় করিলে স্ফূর্ত্তি হয়ে যে সকল॥
সেই গুণে কৈল কৃপা রূপসনাতন।
এই মত অভিমত করিল বর্ণন॥

জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয়ের মতে কৃষ্ণদাস ১৪১৮ শকাব্দে (১৪৯৬ খ্রীষ্টাব্দে) জন্মগ্রহণ করেন, এবং ১৫০৪ শকাব্দে (১৫৮২ খ্রীষ্টাব্দে) ইঁহার তিরোধান হয়। ইনি জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। পিতার নাম ভগীরথ, মাতার নাম সুনন্দা, এবং ভ্রাতার নাম শ্যামদাস।[১] এই উক্তির প্রমাণস্বরূপ ভদ্রমহাশয় ভক্তদিগ্দর্শনীর উল্লেখ করিয়াছেন। বইটি আধুনিক সন্দেহ নাই।

জীব গোস্বামী শ্রীনিবাস আচার্য্যের মারফৎ গৌড়ে যে সকল বৈষ্ণবগ্রন্থ পাঠাইয়াছিলেন, তাহার মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃতও ছিল। পুঁথি লুটের সংবাদ পাইয়া কাতরহৃদয়ে বৃদ্ধ কবিরাজ গোস্বামী প্রাণত্যাগ করেন। এই কথা প্রেমবিলাসে ও ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতিতে আছে। তবে এই লুট বীর হাম্বীরের রাজ্যকালে অথবা তাহার পূর্ব্বে ঘটিয়াছিল, অথবা একেবারেই ঘটিয়াছিল কিনা, তাহা লইয়া সন্দেহ আছে।

সংস্কৃত সাহিত্যে ও শাস্ত্রে কৃষ্ণদাসের অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। এই বিষয়ে সনাতন রূপ এবং জীব গোস্বামী ছাড়া তাঁহার কোন সমকক্ষ বৈষ্ণব মহান্তদিগের মধ্যে ছিল না। কবিরাজের পাণ্ডিত্য বুঝিবার জন্য গোবিন্দলীলামৃত অথবা সারঙ্গরঙ্গদা পড়িবার আবশ্যক করে না, চৈতন্যচরিতামৃত দেখিলেই হইল। পাণ্ডিত্যের অবধি অথচ বিনয়ের খনি ছিলেন কবিরাজ। তাঁহার এই পরম বৈষ্ণবোচিত বিনয় ও আত্মলোপের জন্য চৈতন্যচরিতামৃতের মত দুরূহ গ্রন্থেও কোথায়ও এতটুকুমাত্র পাণ্ডিত্যের উগ্রতা প্রকাশ পায় নাই। তিনি চৈতন্য-চরিত লিখিতেছেন বলিয়া তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি বৃন্দাবনদাস পাছে অসন্তুষ্ট হন,

১। গৌরপদতরঙ্গিণী উপক্রমণিকা, পৃ ৫৭-৬০।

তাহার জন্য কি সশঙ্ক নম্রতা! এমন কি পাছে চৈতন্যভাগবতের আদর কমিয়া যায় এই জন্য কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর বাল্যলীলা বর্ণনাই করিলেন না, অসম্পূর্ণতা দোষ পরিহার করার জন্য কেবল সূত্ররূপে উল্লেখ করিয়া সারিয়া লইয়াছেন। যে সকল ঘটনা বৃন্দাবনদাস উল্লেখ করেন নাই কেবল সেই সেই ঘটনা বিস্তৃতভাবে দিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যের চরিত্র সম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহা অনেকটা নূতন বলিয়া ঠেকিতে পারে। সুতরাং তাঁহারা পাছে ঐ সকলের ঐতিহাসিকত্বে সন্দেহ করেন এই জন্য কবিরাজ সর্ব্বদাই ত্রস্ত। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া আমার বক্তব্যের উদাহরণ দিতেছি।

বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ॥
চৈতন্যলীলাতে ব্যাস বৃন্দাবনদাস।
তাঁর কৃপা বিনা অন্যে না হয় প্রকাশ॥
মূর্খ নীচ ক্ষুদ্র মুঞি বিষয় লালস।
বৈষ্ণবাজ্ঞা বলে করি এতেক সাহস॥ ১-৮॥

ছোট বড় ভক্তগণ বন্দো সভার শ্রীচরণ,
সভে মোরে করহ সন্তোষ।
স্বরূপ গোসাঞির মত রূপ রঘুনাথ জানে যত,
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ॥ ২-২॥

চৈতন্যলীলামৃতসিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি তেঁহো কৈল পান॥
তাঁর ঝারীশেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা।
আমি অতি ক্ষুদ্রজীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পীয়ে সমুদ্রের পানী॥
তৈছে আমি এক কণ ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥ ৩-২০॥

বৃন্দাবনের বৈষ্ণব মহান্তেরা প্রত্যহ চৈতন্যভাগবত শ্রবণ করিতেন। চৈতন্য-ভাগবতে মহাপ্রভুর শেষলীলার কোন বিবরণ না থাকায়, তাঁহারা তাহা শুনিবার জন্য অত্যন্ত ব্যগ্র হইয়াছিলেন। একদিন তাঁহারা শ্রীচৈতন্যের শেষলীলা বর্ণনা করিবার জন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজকে অনুরোধ করিলেন। যাঁহাদের আদেশ ও অনুরোধে কবিরাজ গোস্বামী চৈতন্যচরিত রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, স্বীয় গ্রন্থে তাঁহাদের উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন [১-৮]। এই মহান্তদিগের অনেকেই মহাপ্রভুর সমসাময়িক অনুচর বা ভক্ত ছিলেন।

মোরে আজ্ঞা করিলা সভে করুণা করিয়া।
তা সভার বোলে লিখি নির্ল্লজ্জ হইয়া॥
বৈষ্ণবের আজ্ঞা পাঞা চিন্তিত-অন্তরে।
মদনগোপালে গেলাঙ আজ্ঞা মাগিবারে॥

* * *

প্রভুর চরণে যদি আজ্ঞা মাগিল।
প্রভুকণ্ঠ হৈতে মালা খসিয়া পড়িল॥

* * *

আজ্ঞা পাইঞা মোর হইল আনন্দ।
তাহাই করিনু এই গ্রন্থের আরম্ভ॥

বৃন্দাবনদাসও বোধ হয় তখন বৃন্দাবনে উপস্থিত ছিলেন। কেননা কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন,

বৃন্দাবনদাসের পাদপদ্ম করি ধ্যান।
তাঁর আজ্ঞা লঞা লিখি যাহাতে কল্যাণ॥ ১-৮

অথবা এমনও হইতে পারে যে, গ্রন্থারম্ভের পর কবিরাজ গোস্বামী বৃন্দাবন-দাসকে পত্র বা লোক দ্বারা জানাইয়া গ্রন্থরচনায় তাঁহার অনুমতি লইয়াছিলেন। যাহা হউক গ্রন্থরচনার কালে বৃন্দাবনদাস যে জীবিত ছিলেন তাহা নিঃসন্দেহ। এখানে একটি কথা বলিয়া রাখি যে, চৈতন্যচরিতামৃতে চৈতন্যভাগবত ছাড়া বাঙ্গালা ভাষায় রচিত অপর কোন চৈতন্যচরিত গ্রন্থের উল্লেখ নাই।

যোগ্যতম ব্যক্তির উপরেই বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণব মহান্তেরা শ্রীচৈতন্যের শেষ-লীলা বর্ণনা করিবার ভার ন্যস্ত করিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্যে রসজ্ঞতায় কবিত্ব-শক্তিতে কৃষ্ণদাসের তুল্য ব্যক্তি খুব কমই ছিল। তাহার উপর তিনি রঘুনাথদাস গোস্বামীর নিকট হইতে মহাপ্রভুর শেষলীলার এমন অনেক বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়াছিলেন যাহা সাধারণ লোকের অগোচর ছিল। রঘুনাথ স্বরূপ-দামোদরের শিষ্যরূপে মহাপ্রভুর নিকটে থাকিয়া তাঁহার শেষ কয় বৎসরের ঘটনা প্রায় সবই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন এবং প্রধান প্রধান ঘটনাগুলি সূত্রের মত শিখরিণীছন্দে রচিত কয়েকটি শ্লোকে লিপিবদ্ধও করিয়াছিলেন। এই শ্লোকগুলিকে উপজীব্য করিয়া এবং দাসগোস্বামীর নিকট অপরাপর ঘটনা শুনিয়া কবিরাজ মহাপ্রভুর শেষলীলার বর্ণনা করিয়াছেন। মহাপ্রভুর পশ্চিমভ্রমণ ও অন্যান্য কতিপয় ঘটনা তিনি শ্রীরূপ গোস্বামীর নিকট অবগত হন।

স্বরূপ-দামোদর কড়চা হিসাবে যে কয়টি শ্লোক রচনা করিয়াছিলেন, কৃষ্ণদাস সেগুলিরও সদ্ব্যবহার করিয়াছেন। প্রকৃত প্রস্তাবে কবিরাজের উল্লেখ হইতেই প্রধানতঃ স্বরূপ-দামোদরের কড়চা নামক রচনার অস্তিত্ব জানা যায়, এবং কবিরাজ গোস্বামী যে কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন প্রধানতঃ সেই কয়টি শ্লোকই কালের কবল হইতে রক্ষা পাইয়াছে।

তথ্যের দিকে কবিরাজের অত্যন্ত ঝোঁক ছিল। সেই জন্য বিশেষ বিশেষ ঘটনার বর্ণনা করিয়া শেষে তাহার প্রমাণ হিসাবে গ্রন্থ অথবা ব্যক্তির নাম উল্লেখ করিয়াছেন। যথা,

চৈতন্যলীলারত্নসার স্বরূপের ভাণ্ডার,
তেঁহো থুইলা রঘুনাথের কণ্ঠে।
তাহা কিছু যে শুনিল তাহা ইহা বিবরিল,
ভক্তগণে দিল এই ভেটে॥
... ...
স্বরূপ গোসাঞির মত রূপ রঘুনাথ জানে যত
তাহা লিখি নাহি মোর দোষ॥ ২-২ ॥

দামোদর-স্বরূপের কড়চা অনুসারে।
রামানন্দ-মিলনলীলা করিল প্রচারে ॥ ২-৮ ॥
স্বরূপ-গোসাঞি কড়চায় যে লীলা লিখিল।
রঘুনাথদাস মুখে যে সব শুনিল ॥
সেই সব লীলা লিখি সংক্ষেপ করিয়া।
চৈতন্যকৃপায় লিখিল ক্ষুদ্রজীব হঞা ॥ ৩-৩ ॥

চৈতন্যচরিতামৃত তিন খণ্ডে বিভক্ত—আদিলীলা, মধ্যলীলা এবং অন্ত্যলীলা। প্রত্যেক লীলা আবার কয়েকটি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। গ্রন্থটি গান করিবার উদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই, শুধু পড়িবার উদ্দেশ্যে রচিত হইয়াছিল, সে কারণ ইহাতে কোন রাগ-রাগিণীর উল্লেখ নাই। ত্রিপদী এবং পয়ার এই দুই ছন্দেই গ্রন্থটি বিরচিত, তাহার মধ্যে ত্রিপদী অংশগুলির মধ্যে কবিত্বের পরিচয় বেশী আছে। কেহ যদি গান করে এই জন্য ত্রিপদী অংশগুলির পূর্ব্বে "যথা রাগঃ" এই নির্দ্দেশ দেওয়া আছে।

আদিলীলায় সর্ব্বসমেত সতেরটি পরিচ্ছেদ আছে। প্রথম পরিচ্ছেদে মঙ্গলাচরণ, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে চৈতন্যতত্ত্বনিরূপণ, তৃতীয় এবং চতুর্থ পরিচ্ছেদে চৈতন্যাবতারের কারণ ও প্রয়োজন কথন, পঞ্চমে নিত্যানন্দতত্ত্বনিরূপণ, ষষ্ঠে অদ্বৈততত্ত্বনিরূপণ, সপ্তমে পঞ্চতত্ত্বনিরূপণ ও কাশীতে প্রকাশানন্দের সহিত বেদান্তবিচার, অষ্টমে গ্রন্থরচনার বিবরণ, নবম হইতে দ্বাদশ পরিচ্ছেদে ভক্তিকল্পবৃক্ষ বর্ণন ও মূল এবং স্কন্ধ শাখা নিরূপণ। এই বারোটি পরিচ্ছেদ হইল মুখবন্ধ। তাহার পর ত্রয়োদশ লইতে সপ্তদশ পর্য্যন্ত পাঁচটি পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর চব্বিশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত নবদ্বীপলীলার বর্ণন।

মধ্যলীলায় পরিচ্ছেদ সংখ্যা পঁচিশ। বৃন্দাবন হইতে নীলাচল প্রত্যাগমনের পর মধ্যলীলার পরিসমাপ্তি হইয়াছে। ইহার পর মহাপ্রভু আর নীলাচল পরিত্যাগ করেন নাই। এই সপ্তদশ-অষ্টাদশ বর্ষের স্থূল ঘটনাগুলি ও মহাপ্রভুর দিব্যোন্মাদ অবস্থা অন্ত্যলীলায় বিবৃত হইয়াছে। অন্ত্যলীলায় পরিচ্ছেদ সংখ্যা বিশ। মহাপ্রভুর তিরোধানের কোন উল্লেখ ইহাতে নাই। প্রত্যেক লীলার

শেষে কবিরাজ গোস্বামী বিভিন্ন পরিচ্ছেদের 'অনুবাদ' অর্থাৎ সূচী দিয়া গিয়াছেন। এই বিশেষত্ব পুরাতন বাঙ্গালা সাহিত্যের অন্যত্র দুর্লভ।)

আদিলীলায় মহাপ্রভুর যে বাল্য, কৈশোর ও প্রথম যৌবনের কাহিনী বলা হইয়াছে তাহা যৎপরোনাস্তি সংক্ষিপ্ত। বিস্তৃত করিয়া বর্ণনা করিলে বৃন্দাবনদাসের গ্রন্থ অনাদৃত হইতে পারে এই আশঙ্কায় কৃষ্ণদাস শ্রীচৈতন্যের নবদ্বীপলীলার উপযুক্ত বর্ণনা করেন নাই। অথচ একেবারে বাদ দিলে গ্রন্থের অঙ্গহানি হয়, সেই জন্য প্রধান প্রধান ঘটনাগুলিই কেবল সূত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।[১] তবে দুইটি লীলা যাহা বৃন্দাবনদাস সংক্ষেপে সারিয়া লইয়াছেন তাহা কবিরাজ গোস্বামী বিস্তৃতভাবেই বর্ণনা করিয়াছেন। একটি হইতেছে গঙ্গাতীরে দিগ্বিজয়ীর সহিত বিচার[২], অপরটি হইতেছে নগরসঙ্কীর্ত্তন উপলক্ষ্যে কাজী-দলন।

(আদিলীলা শেষ করিবার সময়েই কবিরাজ গোস্বামীর মনে ভয় হইয়াছিল যে হয়ত তিনি গ্রন্থ শেষ করিয়া যাইতে পারিবেন না, অথচ তাঁহার লেখার এক প্রকার মুখ্য উদ্দেশ্যই হইতেছে মহাপ্রভুর শেষলীলার বর্ণন। এই আশঙ্কায় পড়িয়া কৃষ্ণদাস মধ্যলীলার প্রথম পরিচ্ছেদে মধ্যলীলার ঘটনাগুলি সূত্ররূপে লিখিয়াই দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে অনপেক্ষিতভাবে শেষলীলার সূত্রাকারে বর্ণনা দিয়া গেলেন।

শেষলীলার সূত্রগণ কৈল কিছু বর্ণন,
ইহা বিস্তারিতে চিত্ত হয়।
থাকে যদি আয়ুঃশেষ, বিস্তারিব লীলাশেষ,
যদি মহাপ্রভুর কৃপা হয়॥

১। বালালীলাসূত্র এই কৈল অনুক্রম।
ইহা বিস্তারিয়াছেন দাস বৃন্দাবন॥
অতএব এই লীলা সংক্ষেপে সূত্র কৈল।
পুনরুক্তি হয় বিস্তারিয়া না কহিল॥ ১-১৪॥

পৌগণ্ডবয়সে লীলা বহুত-প্রকার।
বৃন্দাবনদাস তাহা করিয়াছেন বিস্তার॥
অতএব দিঙ্মাত্র ইঁহা দেখাইল।
চৈতন্যমঙ্গলে লোকে সর্ব্বলোকে খ্যাত হইল॥ ১-১৫॥

২। এ সব লীলা বর্ণিয়াছেন বৃন্দাবনদাস। যে কিছু বিশেষ ইঁহা করিল প্রকাশ॥ ১-১৬॥

আমি বৃদ্ধ জরাতুর, লিখিতে কাঁপয়ে কর,
মনে কিছু স্মরণ না হয়।
না দেখিয়ে নয়নে, না শুনিয়ে শ্রবণে,
তভু লিখি এ বড় বিস্ময়॥
এই অন্ত্যলীলাসার সূত্রমধ্যে বিস্তার
করি কিছু করিল বর্ণন।
ইহা মধ্যে মরি যবে বর্ণিতে না পারি তবে,
এই লীলা ভক্তগণধন॥
সংক্ষেপে এই সূত্র কৈল, যেই ইহাঁ না লিখিল
আগে তাহা করিব বিস্তার।
যদি তত দিন জীয়ে মহাপ্রভুর কৃপা হয়ে,
ইচ্ছা ভরি করিব বিচার॥

মধ্যলীলার তৃতীয় পরিচ্ছেদে মহাপ্রভুর সন্ন্যাসগ্রহণের কথা অতি সংক্ষেপ করিয়া বলা হইয়াছে, তাহার পর শান্তিপুরে আগমন ও অদ্বৈতপ্রভুর গৃহে মহোৎসবের বিস্তৃত বর্ণনা দেওয়া হইয়াছে। সন্ন্যাস করিয়া মহাপ্রভুর রাঢ়দেশ ভ্রমণ ও শান্তিপুরে আগমনের যে বৃত্তান্ত চৈতন্যভাগবতে দেওয়া আছে তাহার সহিত চৈতন্যচরিতামৃতে প্রদত্ত বর্ণনার কিছু কিছু অনৈক্য আছে। কৃষ্ণদাস যখন ইচ্ছা করিয়াই বৃন্দাবনদাসের বর্ণনা হইতে স্বাতন্ত্র্য দেখাইয়াছেন তখন মনে হয় যে কবিরাজ গোস্বামীর বর্ণনা যথার্থ। সত্য বলিয়া দৃঢ় বিশ্বাস না থাকিলে কৃষ্ণদাস কখনই বৃন্দাবনদাসের বর্ণনার আনুগত্য ত্যাগ করিতেন না। শান্তিপুর হইতে মহাপ্রভুর নীলাচলে গমনের বৃত্তান্ত বৃন্দাবনদাস বিস্তৃত ভাবে দেখাইয়াছেন বলিয়া কবিরাজ এই বিষয়ে বৃন্দাবনদাসের উপর বরাত দিয়া ক্ষান্ত হইয়াছেন। চৈতন্যভাগবতে এই পর্য্যন্ত মহাপ্রভুর চরিত বিষয়ে ধারাবাহিক বর্ণনা আছে, তাহার পর নীলাচলে অবস্থানকালের দুই একটি ঘটনামাত্র ইতস্ততঃ ভাবে দেওয়া আছে। অতএব নীলাচলে পৌঁছান হইতেই কৃষ্ণদাস স্বাধীন পথে চৈতন্যচরিত রচনায় অগ্রসর হইলেন।

চৈতন্যচরিতামৃত চৈতন্যচরিতকাব্যমাত্র নহে। জীবনী বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে ইহাতে চৈতন্যপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম ও তত্ত্বের স্থূল, সূক্ষ্ম, অতিসূক্ষ্ম বিবরণ, বিচার ও বিশ্লেষণ আছে। তত্ত্ববিচার গ্রন্থটির বাহ্যাংশ নহে; চৈতন্যলীলা, বৈষ্ণব নীতি, দর্শন ও রসতত্ত্ব ইহার মধ্যে অঙ্গাঙ্গিরূপে অচ্ছেদ্যভাবে বিবৃত ও বিচারিত হইয়াছে। বৈষ্ণব দর্শন ও রসতত্ত্ব কৃষ্ণলীলাকাহিনীর সহিত ওতপ্রোত, সুতরাং ইহাতে কৃষ্ণলীলা যে অনেক পরিমাণে মুখ্যভাবে বিচারিত হইয়াছে তাহাতে অনেকে বিস্ময় বোধ করিলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে তাহাতে বিস্ময়ের হেতু নাই।

কৃষ্ণলীলামৃতান্বিত চৈতন্যচরিতামৃত
কহে কিছু দীন কৃষ্ণদাস।

অনেকে মনে করিয়া থাকেন যে, কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের লীলার সহিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার ঐক্য দেখাইবার জন্যই চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিয়াছিলেন। এই ধারণা সম্পূর্ণরূপে ভ্রমাত্মক। শ্রীচৈতন্য শুধু শ্রীকৃষ্ণের অবতার নহেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীরাধা উভয়ের ঐক্যাবতার। স্বরূপ-দামোদর প্রভৃতির মতে শ্রীচৈতন্যের অবতারগ্রহণের মুখ্য উদ্দেশ্যই হইতেছে "শ্রীরাধার ভাব কান্তি অঙ্গীকার" করিয়া আত্মানন্দ উপভোগ করা। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের বিবিধ চেষ্টিতের সহিত তুলনা করিতে হইলে বিরহিণী শ্রীরাধার বিজৃম্ভিতের সহিত তুলনা করিতে হয়। কবিরাজ গোস্বামীও তাহাই করিয়াছেন, এবং তাহাই তাঁহার গ্রন্থের অন্যতম প্রধান প্রতিপাদ্য বিষয়।

চৈতন্যচরিত হিসাবে কি ঐতিহাসিকত্ব, কি রসজ্ঞতা, কি দার্শনিক তত্ত্ববিচার সব দিক্ দিয়াই চৈতন্যচরিতামৃত শ্রেষ্ঠতম গ্রন্থ। কৃষ্ণদাস কবিরাজ বৃন্দাবনদাসের মত শুধু ভক্তির আবেশে চৈতন্যচরিত লিখেন নাই। তাঁহার বিচারবুদ্ধির সবটুকু দিয়াই তিনি চৈতন্যলীলার বিশ্লেষণ করিয়াছেন। অবশ্য শ্রীচৈতন্যের উপর তাঁহার ভগবদ্‌বুদ্ধি ত ছিলই। তাহা না থাকিলে চৈতন্যচরিত রচনা ব্যর্থশ্রম হইত। শ্রীচৈতন্যের যে শেষদশা তাহা বৃন্দাবনদাস প্রভৃতির ধারণার অগোচর ছিল বলিয়া বোধ হয় মহাপ্রভুর শেষ কয় বৎসরের দিব্যোন্মাদ অবস্থার বিষয়ে সম্পূর্ণরূপে নীরব রহিয়া গিয়াছেন। সে "ভ্রমময় চেষ্টা সদা প্রলাপময় বাদ," ইহার

মর্ম্ম জানাইতে এক কৃষ্ণদাস কবিরাজই সাহস করিয়াছিলেন এবং তাহাতে সফল-কাম হইয়াছিলেন, এই কার্য্য অন্য কাহারও সাধ্যাতীত ছিল। ইহাতেই জানিতে পারি কবিরাজ গোস্বামীর অনন্যসাধারণ মনস্বিতা।

শ্রীচৈতন্য নিজ প্রবর্ত্তিত ভক্তিপথের কোন ব্যাখ্যান লিখিয়া যান নাই। তাঁহার রচিত আট শ্লোকে এবিষয়ে তাঁহার উক্তি নিবদ্ধ আছে। এই আট শ্লোক শিক্ষাষ্টক নামে প্রসিদ্ধ। যদি কেহ তাঁহার নিকট কোন উপদেশ চাহিত তাহা হইলে তিনি নৈতিক জীবন যাপন বিষয়ে গোটাকতক স্থূল উপদেশ দিতেন আর ভক্তিভরে ভগবানের নাম লইতে বলিতেন। দুই একজন অন্তরঙ্গ ভক্তের নিকট তিনি বৈষ্ণব তত্ত্বাদির আলোচনা করিতেন। প্রচারক না হইয়াও তিনি শুদ্ধ স্বীয় অতিলৌকিক চরিত্রমাধুর্য্যের দ্বারাই ভক্তবৃন্দ ও জনসাধারণের চিত্তকে উন্মেষিত ও আকৃষ্ট করিতে পারিয়াছিলেন। বৈষ্ণব দর্শনের ও রসতত্ত্বের বিশিষ্ট মতবাদগুলিকে লিপিবদ্ধ করা অথবা প্রচার বিষয়ে তিনি দুই একটি অন্তরঙ্গ ভক্তের উপরই ভার দিয়াছিলেন। ইহাঁদের মধ্যে স্বরূপ-দামোদর, সনাতন গোস্বামী এবং রূপ গোস্বামী প্রধান। স্বরূপ-দামোদর কয়েকটি শ্লোকে রচিত একখানি কড়চা প্রণয়ন করেন। চৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত কয়েকটি শ্লোক এবং কবি-কর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় উদ্ধৃত দুই একটি শ্লোক ছাড়া এই কড়চাটির বিষয় আর কিছুই জানা যায় না। তবে এই বিষয়ে স্বরূপের সব চেয়ে বড় কাজ হইতেছে রঘুনাথদাসকে শিক্ষাদান। আর এই রঘুনাথদাসের নিকট হইতেই কৃষ্ণদাস মহাপ্রভুর অনুমোদিত ও স্বরূপের উপদিষ্ট রাগানুগাপদ্ধতি ও রসতত্ত্বের সম্বন্ধে বিশেষ উপদেশ লাভ করেন। এই উপদেশ এই জ্ঞান চতুর্থ কোন ব্যক্তি পাইয়াছিল কি না সন্দেহ। সনাতন গোস্বামীর অপেক্ষা রূপগোস্বামীই চৈতন্য-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের তত্ত্ব ও দর্শনের ব্যাখ্যাতা ও শাস্ত্রকৃৎ হিসাবে বেশী কৃতিত্ব দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার রচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বলনীলমণি বৈষ্ণবরসশাস্ত্রের বেদ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। ইঁহাদের ভ্রাতুষ্পুত্র জীব গোস্বামী বৈষ্ণবদর্শনের ব্যাখ্যায় খুল্লতাত ও গুরু রূপ গোস্বামীকেও ছাড়াইয়া গিয়াছেন। এই যে গোস্বামীদের "তিন লাখ বত্রিশ হাজার গ্রন্থ", ইহার সার

সংগ্রহ করিয়া কৃষ্ণদাস কবিরাজ অত্যন্ত বিচক্ষণতা ও নিপুণতার সহিত স্বীয় গ্রন্থে উদ্ধৃত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীচৈতন্যপ্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মের নৈতিক, তাত্ত্বিক, দার্শনিক এবং আধ্যাত্মিক সকল বিষয়েরই স্থূল এবং সূক্ষ্ম মর্ম্ম চৈতন্যচরিতামৃতে অশেষ দক্ষতা ও পরম রসজ্ঞতার সহিত সরলভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

দুরূহ তত্ত্বালোচনার সাগরে কৃষ্ণদাস কবিরাজ যে কিরূপ অবলীলাক্রমে পয়ার-ত্রিপদীর পাড়ি জমাইয়াছেন তাহা চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ না করিলে অনুমান করিতে পারা যায় না। কৃষ্ণদাস কবিরাজের হস্তে ষোড়শ শতাব্দীর বাঙ্গালায় যে কাব্য অবলীলাক্রমে সাধিত হইয়াছে তাহা বর্ত্তমান শতাব্দীর উন্নততর ভাষাতেও সরলতর রূপে ব্যাখ্যাত হইতে পারে বলিয়া মনে করি না। অযথা কথা না বাড়াইয়া সংক্ষেপ করিয়া অথচ কবিত্বের সহিত তথ্য ও তত্ত্ব ব্যাখ্যান কার্য্যে কৃষ্ণদাস যে সফলতা লাভ করিয়াছেন তাহা শুধু প্রাচীন সাহিত্যের ক্ষেত্রে নহে বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আবহমান ইতিহাসের বক্ষে জয়স্তম্ভরূপে চিরকাল বিরাজ করিবে।

জ্যামিতির ভাষার মত সরল সহজ স্পষ্ট ভাষায় চৈতন্যচরিতামৃতের দার্শনিক ও তাত্ত্বিক অংশ রচিত। কবিরাজ গোস্বামীর তত্ত্বব্যাখ্যাপদ্ধতির উদাহরণ স্বরূপ কিছু কিছু অংশ নিম্নে তুলিয়া দিলাম। যাঁহারা বইখানি পড়েন নাই তাঁহারা হয়ত ইহা হইতে মূল গ্রন্থ পড়িবার প্রেরণা লাভ করিতে পারেন।

পূর্ব্বপক্ষ কহে তোমার ভাল ত ব্যাখান।
পরব্যোমনারায়ণ স্বয়ং-ভগবান॥
তিঁহো আসি কৃষ্ণরূপে করেন অবতার।
এই অর্থ শ্লোকে দেখি কি আর বিচার॥
তারে কহে কেনে কর কুতর্কানুমান।
শাস্ত্রবিরুদ্ধার্থ কভু না হয় প্রমাণ॥
অনুবাদ না কহিয়া না কহি বিধেয়।
আগে অনুবাদ কহি পশ্চাৎ বিধেয়॥
বিধেয় কহিয়ে তারে যে বস্তু অজ্ঞাত।
অনুবাদ কহি তারে যেই বস্তু জ্ঞাত॥

যৈছে কহি এই বিপ্র পরম পণ্ডিত।
বিপ্র অনুবাদ ইহার বিধেয় পাণ্ডিত্য॥
বিপ্রত্ব বিখ্যাত আর পাণ্ডিত্য অজ্ঞাত।
অতএব বিপ্র আগে পাণ্ডিত্য পশ্চাত॥
তৈছে ইঁহা অবতার সব হৈল জ্ঞাত।
কার অবতার এই বস্তু অবিজ্ঞাত॥
এতে শব্দে অবতারের আগে অনুবাদ।
পুরুষের অংশ পাছে বিধেয়-সংবাদ॥
তৈছে কৃষ্ণ অবতার-ভিতরে হৈল জ্ঞাত।
তাহার বিশেষ জ্ঞান সেই অবিজ্ঞাত॥
অতএব কৃষ্ণ শব্দ আগে অনুবাদ।
স্বয়ং-ভগবত্ত্ব পাছে বিধেয়-সংবাদ॥
কৃষ্ণের স্বয়ং-ভগবত্ত্ব ইহা হৈল সাধ্য।
স্বয়ং-ভগবানের কৃষ্ণত্ব হৈল বাধ্য॥
কৃষ্ণ যদি অংশ হৈত অংশী নারায়ণ।
তবে বিপরীত হৈত সূতের বচন॥
নারায়ণ অংশী যেই স্বয়ং-ভগবান্।
তেঁহ শ্রীকৃষ্ণ ঐছে করিত ব্যাখান॥
ভ্রম প্রমাদ বিপ্রলিপ্সা করণাপাটব।
আর্ষবিজ্ঞবাক্যে নাহি দোষ এই সব॥
বিরুদ্ধার্থ কহ তুমি কহিতে কর রোষ।
তোমার অর্থে অবিমৃষ্টবিধেয়াংশ দোষ॥
যার ভগবত্তা হৈতে অন্যের ভগবত্তা।
স্বয়ং-ভগবান শব্দের তাহাতেই সত্তা॥
দীপ হৈতে যৈছে বহু দীপের জ্বলন।
মূল এক দীপ তাঁহা করিয়ে গণন॥

তৈছে সব অবতারের কৃষ্ণ সে কারণ।
আর এক শ্লোক শুন কুব্যাখ্যাখণ্ডন॥ ১-২॥

এবে শুন ভক্তিফল প্রেমপ্রয়োজন।
যাহার শ্রবণে হয় ভক্তিরসজ্ঞান॥
কৃষ্ণে গাঢ় রতি হৈলে প্রেম অভিধান।
কৃষ্ণভক্তিরসের এই স্থায়িভাব নাম॥
এই দুই ভাবের স্বরূপ তটস্থ লক্ষণ।
প্রেমের লক্ষণ এবে শুন সনাতন॥

কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়
তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণ কীর্ত্তন।
সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়।
নিষ্ঠা হইতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর।
আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণপ্রীত্যঙ্কুর॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে প্রেম নাম।
সেই প্রেম প্রয়োজন সর্ব্বানন্দধাম॥
যাহার হৃদয়ে এই ভাবাঙ্কুর হয়।
তাহাতে এতেক চিহ্ন সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥
এই নব প্রীত্যঙ্কুর যার চিত্তে হয়।
প্রাকৃতক্ষোভে তার ক্ষোভ নাহি হয়॥
কৃষ্ণের সম্বন্ধ বিনা কাল নাহি যায়।
ভুক্তি সিদ্ধি ইন্দ্রিয়ার্থ তারে নাহি ভায়॥
সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে।
কৃষ্ণ কৃপা করিবেন দৃঢ় করি জানে॥

সমুৎকণ্ঠা হয় সদা লালসা প্রধান।
নামগানে সদা রুচি লয় কৃষ্ণনাম ॥
কৃষ্ণগুণাখ্যানে হয় সর্ব্বদা আসক্তি।
কৃষ্ণলীলাস্থানে করে সর্ব্বদা বসতি ॥
কৃষ্ণে রতির চিহ্ন এই কৈল বিবরণ।
কৃষ্ণপ্রেমের চিহ্ন এবে শুন সনাতন ॥
যার চিত্তে কৃষ্ণপ্রেমা করয়ে উদয়।
তার বাক্য ক্রিয়া মুদ্রা বিজ্ঞে বুঝয় ॥ ২-১৩ ॥

বিষয়বস্তুর কাঠিন্যের জন্য চৈতন্যচরিতামৃতের তাত্ত্বিক অংশে দুই একটি স্থলে অন্ত্যানুপ্রাস সুবিধা মত হয় নাই এবং কতিপয় স্থলে পয়ারেও প্রয়োজনাতিরিক্ত অক্ষর ব্যবহৃত হইয়াছে। এইরূপ ছন্দোদোষের সংখ্যা সামান্যই।

চৈতন্যচরিতামৃতে, বিশেষ করিয়া তাত্ত্বিক অংশে, বিবিধ গ্রন্থ হইতে প্রচুর পরিমাণে শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। পাছে ইহাকে কেহ পাণ্ডিত্যপ্রকাশ মনে করে অথবা ইহাতে গ্রন্থটি সাধারণ পাঠকের নিকট দুর্বোধ্য হইতে পারে এই আশঙ্কা গ্রন্থরচনাকালে কবিরাজের মনে উদিত হইয়াছিল। তথাপি কেন যে এত শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহার জবাবাদিহি কবিরাজ গোস্বামী নিজেই করিয়া গিয়াছেন,

যদি কেহ হেন কহে, গ্রন্থ হৈল শ্লোকময়ে,
ইতর জন নারিবে বুঝিতে।
প্রভুর যেই আচরণ, সেই করি বর্ণন,
সর্ব্বচিত্ত নারি আরাধিতে ॥
নাহি কাঁহা সো বিরোধ, নাহি কাঁহা অনুরোধ,
সহজ বস্তু করি বিবেচন।
যদি হয় রাগদ্বেষ, তাঁহা হয় আবেশ,
সহজ বস্তু না যায় লিখন ॥

যেবা নাহি বুঝে কেহো, শুনিতে শুনিতে সেহো,
কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত।
কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি,
শুনিলেই হৈবে বড় হিত॥
ভাগবত শ্লোকময়, টীকা তার সংস্কৃত হয়,
তভু কৈছে বুঝে ত্রিভুবন।
ইঁহা শ্লোক দুইচারি, তার ব্যাখ্যা ভাষা করি,
কেন না বুঝিবে সর্ব্বজন॥ ২-২ ॥

উপরে উদ্ধৃত অংশটুকু হইতে মনে হয় যেন কবিরাজ গোস্বামীর এই গ্রন্থ রচনা কোন্ কোন বৈষ্ণব মহান্তের অভিপ্রেত ছিল না। পরবর্ত্তী কালে রচিত বৈষ্ণব-সহজিয়া মতের কোন কোন গ্রন্থে[১] চৈতন্যচরিতামৃতের প্রতি জীব গোস্বামীর বিরাগ বিষয়ে দুই একটি কাহিনী পাওয়া যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে এই কাহিনীগুলির আসল উদ্দেশ্য হইতেছে চৈতন্যচরিতামৃতের অলৌকিক মাহাত্ম্য জাহির করা। সুতরাং এই সকল কাহিনীর উপর একান্ত আস্থা স্থাপন করা যায় না।

চৈতন্যচরিতামৃতে পল্লবিত কবিত্বের স্থান যদি কিছু থাকে তাহা স্বল্প। গ্রন্থরচনা করিবার সময় যখনই কবিরাজের মনে আবেগের সঞ্চার হইয়াছে তখনই তিনি ত্রিপদী ছন্দের আশ্রয় লইয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃতের ত্রিপদী অংশগুলির মধ্যে যে সহজ সরল কবিত্বের প্রসাদ ও উদাত্ত গুণ অভিব্যক্ত হইয়াছে তাহা বাঙ্গালা সাহিত্যে একান্ত দুর্ল্লভ। পরবর্ত্তী কবিদিগের মধ্যে একমাত্র যদুনন্দনদাসই কৃষ্ণদাসের এই ত্রিপদী ছন্দের কবিত্ব ও প্রকাশভঙ্গী কতকটা পরিমাণে আয়ত্ত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। চৈতন্যচরিতামৃত হইতে ত্রিপদী অংশের কিছু উদাহরণ নিম্নে দেওয়া গেল। ইহা হইতে কৃষ্ণদাস কবিরাজের কবিত্বশক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে।

১। বিবর্ত্তবিলাস ইত্যাদি।

অকৈতব কৃষ্ণপ্রেম, যেন জাম্বুনদ হেম,
সেই প্রেমা নৃলোকে না হয়।
যদি হয় তার যোগ, না হয় তার বিয়োগ,
বিয়োগ হৈলে কেহ না জীয়য়॥
এত কহি শচীসুত শ্লোক পঢ়ে অদ্ভুত,
শুনে দোঁহে একমন হৈয়া।
আপন হৃদয় কাজ কহিতে বাসিয়ে লাজ,
তবু কহি লাজ-বীজ খাইয়া॥
দূরে শুদ্ধপ্রেমগন্ধ, কপট প্রেমের বন্ধ,
সেহ মোর কৃষ্ণ নাহি পায়।
তবে যে করি ক্রন্দন, স্বসৌভাগ্যপ্রখ্যাপন
করি, ইহা জানিহ নিশ্চয়॥
যাতে বংশীধ্বনিসুখ না দেখি সে চাঁদমুখ,
যদ্যপি সে নাহি আলম্বন।
নিজদেহে করি প্রীতি, কেবল কামের রীতি,
প্রাণকীটের করিয়ে ধারণ॥
কৃষ্ণপ্রেম সুনির্ম্মল, যেন শুদ্ধ গঙ্গাজল,
সেই প্রেমা অমৃতের সিন্ধু।
নির্ম্মল সে অনুরাগে না লুকায় অন্য দাগে,
শুক্লবস্ত্রে যৈছে মসীবিন্দু॥
শুদ্ধপ্রেম সুখসিন্ধু, পাই তার এক বিন্দু,
সেই বিন্দু জগত ডুবায়।
কহিবার যোগ্য নহে, তথাপি বাউলে কহে,
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায়॥
এই মত দিনে দিনে স্বরূপ রামানন্দ সনে
নিজভাব করেন বিদিত।

বাহ্যে বিষজ্বালা হয়, ভিতরে আনন্দময়,
কৃষ্ণপ্রেমার অদ্ভুত চরিত ॥
এই প্রেমার আস্বাদন তপ্ত-ইক্ষুচর্ব্বণ,
মুখ জ্বলে না যায় ত্যজন।
সেই প্রেমা যার মনে, তার বিক্রম সেই জানে,
বিষামৃতে একত্র মিলন ॥ ২-২ ॥

গ্রন্থের উপসংহারে কৃষ্ণদাস যে আন্তরিক বিনয় জ্ঞাপন করিয়াছেন তাহা সত্য সত্যই মনকে স্পর্শ করে। বৃদ্ধ কবিরাজ পাণ্ডিত্যের আধার হইয়াও যেরূপ আত্মনিগ্রহ বা পরিহার করিয়াছেন তাহা অন্য কেহ করিলে হয়ত হাস্যরসের উপাদান হইত। কিন্তু কবিরাজের বর্ণনা পড়িলে তাঁহার বিশ্বাসের গভীরতা ও যথার্থতা সম্বন্ধে সন্দেহের অবকাশমাত্র থাকে না।

প্রভুর গম্ভীর লীলা না পারি বুঝিতে।
বুদ্ধিপ্রবেশ নাহি তাতে না পারি বর্ণিতে ॥
সব শ্রোতা বৈষ্ণবের বন্দিয়া চরণ।
চৈতন্যচরিতবর্ণন কৈল সমাপন ॥
আকাশ অনন্ত তাতে যৈছে পক্ষিগণ।
যার যত শক্তি তত করে আরোহণ ॥
ঐছে মহাপ্রভুর লীলার নাহি ওর-পার।
জীব হঞা কেবা সম্যক্ পারে বর্ণিবার ॥
যাবৎ বুদ্ধ্যের গতি তাবৎ বর্ণিল।
সমুদ্রের মধ্যে যেন এক কণ ছুঁইল ॥
নিত্যানন্দকৃপাপাত্র বৃন্দাবনদাস।
চৈতন্যলীলার তেঁহো হয় আদি ব্যাস ॥
তাঁর আগে যদ্যপি সব লীলার ভাণ্ডার।
তথাপি অল্প বর্ণিয়া ছাড়িলেন আর ॥

চৈতন্যলীলামৃতসিন্ধু দুগ্ধাব্ধি সমান।
তৃষ্ণানুরূপ ঝারী ভরি তেঁহো কৈল পান॥
তাঁর ঝারী-শেষামৃত কিছু মোরে দিলা।
ততেকে ভরিল পেট তৃষ্ণা মোর গেলা॥
আমি অতি ক্ষুদ্র জীব পক্ষী রাঙ্গাটুনি।
সে যৈছে তৃষ্ণায় পিয়ে সমুদ্রের পানী॥
তৈছে এক কণ আমি ছুঁইল লীলার।
এই দৃষ্টান্তে জানিহ প্রভুর লীলার বিস্তার॥
আমি লিখি এহো মিথ্যা করি অভিমান।
আমার শরীর কাষ্ঠপুত্তলী সমান॥
বৃদ্ধাজরাতুর আমি অন্ধ বধির।
হস্ত হালে মনোবুদ্ধি নহে মোর স্থির॥
নানা রোগগ্রস্ত চলিতে বসিতে না পারি।
পঞ্চরোগের পীড়ায় ব্যাকুল রাত্রিদিনে মরি।

... ...

শ্রীমদনগোপাল মোরে লেখায় আজ্ঞা করি।
কহিতে না জুয়ায় তবু রহিতে না পারি॥
না কহিলে হয় মোর কৃতঘ্নতা দোষ।
দম্ভ করি বলি শ্রোতা না করিহ রোষ॥
তোমা সভার চরণধূলি করিনু বন্দন।
তাতে চৈতন্যলীলা হৈল যে কিছু লিখন॥

... ...

সভার চরণকৃপা গুরু উপাধ্যায়ী।
মোর[১] বাণী শিষ্যা তারে বহুত নাচাই॥
শিষ্যার শ্রম দেখি গুরু নাচন[২] রাখিল।
কৃপা না নাচায় বাণী বসিয়া রহিল॥

১। পাঠান্তর 'তাঁর'। ২। পাঠান্তর 'নাচাই'।

অনিপুণা বাণী আপনে নাচিতে না জানে।
যত নাচাইল তত নাচি করিল বিশ্রামে ॥
সব শ্রোতাগণের করি চরণ বন্দন।
যা সভার চরণ কৃপা শুভের কারণ ॥
চৈতন্যচরিতামৃত যেই জন শুনে।
তাঁহার চরণ ধুঞা করি মুঞি পানে ॥
শ্রোতার পদরেণু করোঁ মস্তকে ভূষণ।
তোমরা এ অমৃত পীলে সফল হয় শ্রম ॥
শ্রীরূপরঘুনাথপদে যার আশ।
চৈতন্যচরিতামৃত কহে কৃষ্ণদাস ॥

শ্রীনিবাস আচার্য্যের মারফৎ গৌড়ে যে সকল বৈষ্ণব গ্রন্থ প্রচারার্থ প্রেরিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে চৈতন্যচরিতামৃতও ছিল। পথিমধ্যে বিষ্ণুপুরের নিকটে গ্রন্থবোঝাই সিন্দুকগুলি লুট হয়। এই সংবাদ পাইয়া কবিরাজ গোস্বামী মর্ম্মাহত হইয়া দেহত্যাগ করেন। এই কথা প্রেমবিলাসে আছে। হয়ত এটা কাহিনী মাত্র, তথাপি এ কথা স্বচ্ছন্দে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতের মত গ্রন্থের অপঘাত ঘটিলে গ্রন্থকারের মৃত্যুতুল্য বোধ হওয়াই স্বাভাবিক। অপর প্রবাদ অনুসারে এই ঘটনার কিছুকাল পরে রঘুনাথদাস গোস্বামীর তিরোধান ঘটিলে কবিরাজ গোস্বামী দেহ রক্ষা করেন। যদুনন্দন-দাস কর্ণানন্দে এই দুই প্রবাদের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। চৈতন্যচরিতামৃত পাঠ করিলে মনে হয় যে, গ্রন্থরচনার কালে রঘুনাথদাস বর্ত্তমান ছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত বৈষ্ণব দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় সংস্কৃত ভাষায় চৈতন্যচরিতামৃতের একটি টীকা রচনা করেন। বাঙ্গালা গ্রন্থের সংস্কৃত টীকা—ইহা হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, বৈষ্ণবসমাজে এই মহাগ্রন্থের কিরূপ আদর হইয়াছিল।

অষ্টাদশ পরিচ্ছেদ

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল, 'গোবিন্দদাসের কড়চা', ও অন্যান্য পুস্তিকা

অন্যান্য চৈতন্যজীবনী কাব্য হইতে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের[১] কিছু স্বাতন্ত্র্য আছে। জয়ানন্দের কাব্য বিশেষ করিয়া জনসাধারণের রুচির উপযোগী করিয়াই রচিত হইয়াছিল, ইহা মনে যে করিবার যথেষ্ট কারণ আছে। এই কারণে শিক্ষিত ভক্ত বৈষ্ণবের নিকট কাব্যটি কোন আদর না পাওয়ায় লুপ্তপ্রায় হইয়া পড়িয়াছিল। অপরাপর চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলির মধ্যে কেবল লোচনের চৈতন্যমঙ্গলের সহিত জয়ানন্দের কাব্যের কতকটা সাদৃশ্য দেখা যায়। উভয় কাব্যেই কোন পরিচ্ছেদ-বিভাগ নাই, উভয় কাব্যেরই মঙ্গলাচরণে দেবদেবীর বন্দনা আছে, এবং উভয় কাব্যই একান্তভাবে গান করিবার উদ্দেশ্যে বিরচিত হইয়াছিল। তবে লোচনের কাব্য বিদগ্ধের কৃতি, আর জয়ানন্দের কাব্য অবিদগ্ধের লেখনীপ্রসূত। জয়ানন্দের কাব্যে কোনরূপ বাঁধুনী বা পারিপাট্যের প্রয়াস একেবারেই লক্ষিত হয় না, অথচ ইহাতে বৃন্দাবনদাসের কাব্যের মত ভাবাবেগও দেখা যায় না। এই সব কারণে জয়ানন্দের কাব্যের প্রসার ও স্থায়ী আদর হয় নাই। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের প্রায় সমস্ত পুঁথিই বিষ্ণুপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে কাব্যটি বিশেষ করিয়া এই অঞ্চলেই প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

জয়ানন্দের কাব্য নয় খণ্ডে বিভক্ত—আদিখণ্ড, নদীয়াখণ্ড, বৈরাগ্যখণ্ড, সন্ন্যাসখণ্ড, উৎকলখণ্ড, প্রকাশখণ্ড, তীর্থখণ্ড, বিজয়খণ্ড এবং উত্তরখণ্ড। ইহাতে এই রাগ-রাগিণীগুলির উল্লেখ আছে; পঠমঞ্জরী, শ্রী, করুণাশ্রী, পাহিড়া, ধানশী,

১। ব-সা-প-প ৪, পৃ ১৯৬-২২৬। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল নগেন্দ্রনাথ বসু ও কালিদাস নাথ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৩১২ সালে বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। মুদ্রিত পুস্তকটিতে বিস্তর ভ্রমপ্রমাদ আছে। একটি বিশুদ্ধ সংস্করণ প্রকাশিত হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়।

মায়ূর ধানশী, সুহই, সুহই সিন্ধুড়া, সিন্ধুড়া, কামোদ, মঙ্গল, মঙ্গল গুজ্জরী, গুজ্জরী, বরাড়ী, বিভাস, ভাটিয়ারী, কেদার, মল্লার, মারহাটি, বেলোয়ার এবং তুড়ী।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে শ্রীচৈতন্যের চরিতকথা অনেকটা অসংলগ্ন ও বিপর্য্যস্ত-ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। নবদ্বীপলীলার বর্ণনায় তবু কিছু সঙ্গতি আছে, কিন্তু পরবর্ত্তী বর্ণনায় ধারাবাহিকতার ও সঙ্গতির বড়ই অভাব। তাহা ছাড়া এই অংশের মধ্যে ধ্রুবচরিত্র, জড়ভরতের আখ্যান, ইন্দ্রদ্যুম্নচরিত, অজামীলের উপাখ্যান ইত্যাদি জনপ্রিয় পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। জয়ানন্দেব কাব্যের সম্পূর্ণ পুঁথি অপেক্ষা এই পৌরাণিক কাহিনীঘটিত খণ্ডাংশগুলি অনেক বেশী পরিমাণে পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে মনে হয় যে, কাব্যটির মূলীভূত বিষয় অপেক্ষা এই পৌরাণিক কাহিনীর বর্ণনাগুলির আদর বেশী ছিল।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য লইয়া যাঁহারা আলোচনা করিয়াছেন এবং করিয়া থাকেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকেই জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের ঐতিহাসিকতায় সবিশেষ আস্থাবান্। ইঁহারা কিন্তু কেহই জয়ানন্দের উক্তির যথার্থতা বিচার করিয়া দেখেন নাই। যেহেতু ইহাতে শ্রীচৈতন্যের তিরোভাবের উল্লেখ আছে, সেই হেতু ইহার সব উক্তিই তুল্যরূপে যথার্থ, এই মনোভাবের বশবর্ত্তী হইয়া ইঁহারা জয়ানন্দের কাব্যের ঐতিহাসিক মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। অথচ নিরপেক্ষভাবে বিচার করিলে দেখা যায় যে, শ্রীচৈতন্যের জীবনী বিষয়ে জয়ানন্দ এমন অনেক কথাই বলিয়াছেন যাহা স্পষ্টতঃ ভ্রমাত্মক। বর্ত্তমান অলোচনায় জয়ানন্দের তাবৎ ভ্রান্ত উক্তির সমালোচনা নিষ্প্রয়োজন বলিয়া দুই চারিটি মাত্র উদাহরণ প্রদর্শন করিতেছি।

অদ্বৈত প্রভু শ্রীচৈতন্যের মাতা শচীদেবীর মন্ত্রদাতা গুরু ছিলেন, ইহা সর্ব্ববাদি-সম্মত। অথচ জয়ানন্দ বলিতেছেন,

আই ঠাকুরাণী বন্দোঁ চৈতন্যের মাতা।
পণ্ডিত গোসাঞি জাঁর দীক্ষামন্ত্রদাতা ॥[১]

১। পৃ ২। এখানে 'আচার্য্য গোসাঞি' পাঠ কল্পনা করিলে কোনই অসঙ্গতি থাকে না, হয়ত মূলে উহাই পাঠ ছিল।

শ্রীচৈতন্য চব্বিশ বৎসর বয়সে সন্ন্যাস অবলম্বন করেন এবং তীর্থভ্রমণাদি লইয়া সর্ব্বশুদ্ধ কিঞ্চিদধিক তেইশ বৎসর কাল নীলাচলে অবস্থিতি করেন, ইহাও অবিসংবাদিত। জয়ানন্দ কিন্তু বলেন—

চতুর্থে সন্ন্যাসখণ্ড শুন একচিত্তে।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম সন্ন্যাস যেমতে॥
বয়সে অল্প গৌরচন্দ্র বিংশতি বৎসর।
মহাবৈরাগ্য শুদ্ধহেমকলেবর॥ পৃ ৮৪॥
মহানদী পার হঞা গেলা নীলাচল।
নীলাচলে রহিলা অষ্টাবিংশতি বৎসর॥ পৃ১৩৭॥

গয়াতে শ্রীচৈতন্য ঈশ্বর পুরীর সহিত মিলিত হন এবং তাঁহার নিকট মন্ত্রদীক্ষা গ্রহণ করেন। মাধবেন্দ্র পুরীর সহিত শ্রীচৈতন্যের কদাপি সাক্ষাৎ হয় নাই; শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কিংবা অত্যল্পকাল পরে মাধবেন্দ্রের তিরোধান ঘটে। জয়ানন্দ এখানে ঈশ্বর পুরী এবং তাঁহার গুরু মাধবেন্দ্র পুরীর মধ্যে গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন।

শুক্লবর্ণ মুনীন্দ্র হইল কল্প সাধি।
গৌরাঙ্গ দেখিয়া মুনীন্দ্রের ভাঙ্গিল সমাধি॥ পৃ ৩৪॥
বুঢ়ী বলে আমা উদ্ধারিলা পাদোদকে।
মাধবেন্দ্রপুরী তোমা ষড়ভুজ দেখে॥ ঐ॥
পাপজ্বর খণ্ডাইল বিপ্রপাদোদকে।
মুনীন্দ্র মাধবেন্দ্রপুরী মঠে ষড়্‌ভুজ দেখে॥ পৃ ১৪৬॥

সন্ন্যাস করিয়া মহাপ্রভু যখন শান্তিপুর হইতে নীলাচলে গমন করেন তখন নিত্যানন্দ প্রভু তাঁহার অন্যতম সঙ্গী ছিলেন, এ বিষয়ে অপর সকল জীবনীকার একমত, এবং এ বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছুমাত্র হেতু নাই। অতএব জয়ানন্দের নিম্নোদ্ধৃত উক্তি যে সম্পূর্ণরূপে অজ্ঞানতাপ্রসূত তাহাতে সন্দেহ নাই।

তুমি আগে রহ গিয়া জগন্নাথ-ক্ষেত্রে।
আমি সর্ব্বপারিষদে যাব তোমার পত্রে॥

নিত্যানন্দ মহাপ্রভু শ্রীরামদাস সঙ্গে।
পরমেশ্বর সুন্দরানন্দ গেলা নিজ রঙ্গে॥
জগন্নাথের আজ্ঞায় রহিলা সমুদ্রকূলে।
খেনে মণিকোটাএ খেনে জগন্নাথ-দেউলে॥ পৃ ৯০॥
বক্রেশ্বর যাইতে পুন নিবর্ত্ত হইল।
দ্বাদশ দিবস শান্তিপুরেতে রহিল॥
নিত্যানন্দ আগে পলাইলা নীলাচলে।
নিভৃতে রহিল কেহ দেখিতে না পারে॥ পৃ ১৪৮॥

কাব্যের উপক্রমণিকাভাগে জয়ানন্দ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবি ও চৈতন্যজীবনী-রচয়িতাদিগের উল্লেখ করিয়াছেন। এই কবি-তালিকাটি একেবারে মূল্যহীন নহে বলিয়া এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

রামায়ণ করিল বাল্মীকি মহাকবি।
পাঁচালী করিল কৃত্তিবাস অনুভবি॥
শ্রীভাগবত কৈল ব্যাস মহাশয়ে।
গুণরাজ খান কৈল শ্রীকৃষ্ণবিজয়ে॥
জয়দেব বিদ্যাপতি আর চণ্ডীদাস।
শ্রীকৃষ্ণচরিত্র তারা করিল প্রকাশ॥
সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য ব্যাস-অবতার।
চৈতন্যচরিত্র আগে করিল প্রচার॥
চৈতন্যসহস্রনাম শ্লোকপ্রবন্ধে।
সার্ব্বভৌম রচিল কেবল প্রেমানন্দে॥
শ্রীপরমানন্দ পুরী গোসাঞী মহাশয়।
সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ গোবিন্দবিজয়॥
আদিখণ্ড মধ্যখণ্ড শেষখণ্ড করি।
বৃন্দাবনদাস প্রচারিলা সর্ব্বোপরি॥

গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
সঙ্গীতপ্রবন্ধে তাঁর পদে পদে ধ্বনি॥
সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ পরমানন্দ গুপ্ত।
গৌরাঙ্গবিজয়গীত শুনিতে অদ্ভুত॥
গোপাল বসু করিলেন সঙ্গীতপ্রবন্ধে।
চৈতন্যমঙ্গল তাঁরা চামর বিছন্দে॥
ইবে শব্দ চামর সঙ্গীত বাদ্য রসে।
জয়ানন্দ চৈতন্যমঙ্গল গাএ শেষে॥ পৃ ৩॥

মুরারি গুপ্তের এবং কবিকর্ণপুরের অনুল্লেখ পরম আশ্চর্য্যের বিষয়। পরমানন্দ পুরী রচিত শ্লোকপ্রবন্ধে (অর্থাৎ সংস্কৃতে) অথবা পাঁচালীপ্রবন্ধে রচিত কোন গোবিন্দবিজয় গ্রন্থ অথবা পদ ইত্যাদি অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। গোপাল বসুর সম্বন্ধেও তাহাই। গৌরীদাস পণ্ডিত এবং পরমানন্দ গুপ্ত রচিত গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ অনেকগুলি বর্ত্তমান আছে। অবশ্য জয়ানন্দের এই সকল উক্তি শুধু শোনা কথার উপর নির্ভর, এমন হওয়াও কিছুমাত্র অসম্ভব নহে। জয়ানন্দ বৃন্দাবন-দাসের উল্লেখ করিয়াছেন বটে কিন্তু চৈতন্যভাগবতের সহিত তাঁহার যে বিশেষ পরিচয় ছিল, এমন বিশ্বাস করিবার কিছুমাত্র হেতু নাই। শোনা কথার উপর এবং নিজের কল্পনার উপর যে জয়ানন্দ অতিমাত্রায় নির্ভর করিয়াছিলেন তাহার কিছু প্রমাণ দেখাইতেছি।

একদিন নবদ্বীপে শচী ঠাকুরাণী।
গদাধর জগদানন্দ কোলে করি আনি॥ পৃ ২৭॥
গদাধর জগদানন্দ গৌরাঙ্গ-মন্দিরে।
প্রতিদিন গৌরাঙ্গের সঙ্গ সেবা করে॥ ঐ॥

বৈষ্ণবসমাজে গদাধর শ্রীরাধা এবং রুক্মিণীর আর জগদানন্দ সত্যভামার অবতার বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন, ইহা হইতেই বোধ হয় উপরি-উদ্ধৃত উক্তির উৎপত্তি। জগদানন্দের কথা বলিতে পারি না, তবে গদাধর মহাপ্রভুর সমবয়স্ক ছিলেন।

জয়ানন্দ বলিয়াছেন যে মহাপ্রভু রাজমহিষীকে গলার মালা দিয়াছিলেন।

রাজার শতেক স্ত্রী নাম চন্দ্রকলা।
গৌরচন্দ্র দিলা তাঁরে গলার দিব্যমালা ॥ পৃ ১০৩ ॥

শ্রীচৈতন্যের চরিত্র বিষয়ে জয়ানন্দের ধারণা অত্যন্ত প্রাকৃতজনোচিত ছিল, নতুবা তিনি চৈতন্যমাহাত্ম্য বাড়াইবার জন্য এমন কাহিনীর অবতারণা করিতেন না।

জয়ানন্দের মতে সন্ন্যাসের পর শ্রীচৈতন্য "কাচমণি বেতড়া ডাহিনে থুইয়া" কুলীনগ্রাম হইয়া নীলাচলে পৌঁছিলেন। কুলীনগ্রামে তখন হরিদাস ঠাকুর ছিলেন। অথচ পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, হরিদাস ঠাকুর শান্তিপুরে রহিয়া গেলেন। কুলীনগ্রামে তিনি হঠাৎ আসেন কি করিয়া! স্পষ্টতঃই জয়ানন্দ এখানে জনপ্রবাদের অনুসরণ করিয়া ভ্রান্ত হইয়াছেন। বস্তুতঃ মহাপ্রভু যে কুলীনগ্রামে একবার আগমন করিয়াছিলেন এরূপ একটা জনশ্রুতি ছিল। চৈতন্যভাগবতের তথাকথিত অপ্রকাশিত অধ্যায়ত্রয়ে এই বিষয়ে উল্লেখ আছে।[১] জয়ানন্দ বলেন, মহাপ্রভুর কুলীনগ্রামে আগমন উপলক্ষ্যে গুণরাজ খানের পুত্র মহোৎসব করিয়াছিলেন; অপ্রকাশিত অধ্যায়ত্রয়ে আছে, মহাপ্রভু অনন্ত মিশ্রের গৃহে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। অন্যান্য চৈতন্যজীবনীগ্রন্থে মহাপ্রভুর কুলীনগ্রামে আগমন বিষয়ে কোনই উল্লেখ নাই। প্রথমবারে মহাপ্রভু যে ছত্রভোগ-পথে নীলাচল গিয়াছিলেন, ইহাও সুপ্রসিদ্ধ।

প্রথমবার বৃন্দাবন যাইবার পথে শ্রীচৈতন্য কানাই-নাটশালা হইতে ফিরিয়া শান্তিপুরে আসেন। এই প্রসঙ্গে জয়ানন্দ বলেন, মহাপ্রভু বর্দ্ধমান হইয়া আমাইপুরা গ্রামে কবির পিতৃগৃহে বিশ্রাম করিয়া শান্তিপুরে পৌঁছান। কানাই-নাটশালা হইতে শান্তিপুর ফিরিবার সোজা রাস্তা হইতেছে গঙ্গাবক্ষ বা গঙ্গাতীরপথ। অন্যান্য চৈতন্যজীবনীতে সেই পথের কথাই বলা হইয়াছে। তাহা হইলে কবি কি আত্মমর্য্যাদাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে মহাপ্রভুকে আমাইপুরা ঘুরাইয়া শান্তিপুরে লইয়া

১। ষোড়শ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

গিয়াছেন ? সম্ভবতঃ এই কারণেই গোবিন্দদাসের কড়চা-রচয়িতা সন্ন্যাসগ্রহণের পর শ্রীচৈতন্যকে শান্তিপুর হইতে বর্দ্ধমানের পথে নীলাচলে লইয়া গিয়াছেন।

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে মহাপ্রভুর তিরোভাবের কথা আছে। শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্বপুরুষদিগের সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন কথাও ইহাতে আছে।

পিতামহ জনার্দ্দন মিশ্র মহাশয়।
প্রপিতামহ রাজগুরু মিশ্র ধনঞ্জয়॥
দিগ্বিজয়ী রামকৃষ্ণ বৃদ্ধ প্রপিতামহ।
তার পিতা বিরুপাক্ষ কবীন্দ্রবিগ্রহ॥
তাঁর পিতা ক্ষীরচন্দ্র সে অভিনব ব্যাস।
দিব্য রথে আইলা সভে দেখিতে সন্ন্যাস॥ পৃ ৮৭-৮৮॥

চৈতন্য গোসাঞিঃর পূর্ব্বপুরুষ
আছিলা জাজপুরে।
শ্রীহট্টদেশেরে পালাঞা গেল
রাজা ভ্রমরের ডরে॥ পৃ ৯৬॥

সেকালের সামাজিক রীতিনীতি সম্বন্ধেও কিছু কিছু নূতন কথা জয়ানন্দের কাব্যে পাওয়া যায়। ব্রাহ্মণদিগের মধ্যেও বৈদেশিক ভাষা ও সাহিত্যের চর্চ্চা এবং বৈদেশিক পরিচ্ছদ পরিধান একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। জগাই মাধাই মসনবি আবৃত্তি করিত।

মসনবি আবৃত্তি করে[১] থাকে নলবনে।
মহাপাপী জগাই মাধাই দুই জনে॥ পৃ ৫৬॥

কলিকালের আচারবর্ণনার মধ্যে আছে—

ব্রাহ্মণে রাখিব দাড়ি পারস্য পড়িবে।
মোজা-পাএ নড়ি-হাথে কামান ধরিবে॥
মসনবি[২] আবৃত্তি করিবে দ্বিজবর।
ডাকা চুরি ঘাটি সাধিবেক নিরন্তর॥ পৃ ১৩৯॥

১। মুদ্রিত পাঠ 'মনসরিয়া বৃত্তি করে।' ২। ঐ 'মনসরি।'

জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে কবিত্বের বালাই বড় বেশী কিছু নাই। তবে প্রকাশভঙ্গি মাঝে মাঝে বেশ সুন্দর। কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল।

শিশু শ্রীচৈতন্যের রূপ—

গলায়ে বাবলা পিঠে পাটের থোপনি।
হামাগুড়ি দিঞা বুলে দ্বিজশিরোমণি॥
কুন্দকলিকা দুটি দন্ত উঠিল।
পাকা তেলাকুচা যেন অধরে ফুটিল॥
টাড় মগর হার চরণে মগরা।
রাঙা লাঠি সোনার কাঠি রূপের পসরা॥
দেখিঞা মোহন-ছান্দ চান্দ রহি চাহে।
মদন-লাখকোটি রূপে মূর্চ্ছা যাএ॥
দেখি মিশ্র পুরন্দর আনমনে নাঞি।
খাইতে শুইতে ডাকে বাপু রে নিমাঞি॥
খণে করে করতালি হাসি হাসি নাচে।
কাকুর চুম্বন লৈয়া মা বাপেরে যাচে॥
খনে গড়ি দিঞা কান্দে ধূলায় ধূসর।
দেখিঞা আনন্দে শচী মিশ্র পুরন্দর॥
মায়ের পরাণ-ধন বাপের গোসাঞি।
ঘরের ঠাকুর মোর বাপুরে নিমাঞি॥
নদীয়ার যত লোক তার তুমি আঁখি।
এ বোল স্বরূপ তাহে জয়ানন্দ সাখী॥ পৃ১৪-১৫॥

পতিতপাবন তোমার নামখানি জাগে।
পতিত জগাই মাধাই প্রেমভক্তি মাগে॥ পৃ ৫৭॥

সম্পদ বিপদ যত সব কর্ম্মফল।
আন গাছে নাহি লাগে আনের বাকল॥

এক তরু হৈতে ভিন ফল নাহি ধরে।
আন তরু আন ফল ধরিতে না পারে॥
কালসূত্রে বন্ধ জীব কর্ম্ম করায়ে কালে।
অগাধ জলের মৎস্য বন্দী হয়ে জালে॥
শিশু সব ক্রীড়া করে সতত ধূলায়।
খেলা দোলা ভাঙ্গিঞা মন্দিরে চলি যায়॥
পুনরপি সেই শিশু ধূলাক্রীড়া করে।
ধূলার মন্দির ভাঙ্গি চলিলা মন্দিরে॥
এই মত কত কত জনম মরণ।
অসার্থক যাতায়াত জীবের সাধন॥
সাধিতে সাধিতে কৃষ্ণ যারে কৃপা করে।
সে জন কৃষ্ণের হিয়ে কর্ম্মদেহ ধরে॥ পৃ ৬০॥

জয়ানন্দ এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

জয়ানন্দের বাপ সুবুদ্ধি মিশ্র গোসাঞি।
পরমভাগবত উপমা দিতে নাঞি॥ পৃ ৩॥

শুক্লা দ্বাদশী তিথি বৈশাখ মাসে।
জয়ানন্দের জন্ম হইল সে দিবসে॥
গুহিআ নাম ছিল মায়ের মড়াছিআ-বাদে।
জয়ানন্দ নাম হৈল চৈতন্যপ্রসাদে॥
মা রোদনী ঋষি নিত্যানন্দের দাসী।
যার গর্ভে জন্মিঞা চৈতন্যানন্দে ভাসি॥
খুড়া জেঠা পাষণ্ড চৈতন্যে অল্পভক্তি।
মহাপাষণ্ড তবো ধরে মহাশক্তি॥
বাণীনাথ মিশ্র ষট্‌রাত্রি উপবাসে।
দুর্ব্বাসা ভারতী ব্যাস জগত-প্রকাশে॥

যার পুত্র মহানন্দ বিদ্যাভূষণ।
সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ সর্ব্বসুলক্ষণ॥
তার ভাই ইন্দ্রিয়ানন্দ কবীন্দ্র ভারতী।
অল্পকালে শরীর ছাড়িল পৃথিবীতে॥
জেঠা বৈষ্ণব মিশ্র সর্ব্বতীর্থপূত।
ছোট খুড়া রামানন্দ মিশ্র ভাগবত॥
বন্দিঘাটী বংশে রঘুনাথ-উপাসক।
তার মধ্যে জয়ানন্দ চৈতন্যভাবক॥ পৃ ৮৪॥

শ্রীচৈতন্য যখন সুবুদ্ধি মিশ্রের গৃহে আগমন করেন তখন তিনি সুবুদ্ধি মিশ্রের শিশুপুত্রের 'গুইয়া' নাম পরিবর্ত্তন করিয়া 'জয়ানন্দ' রাখেন।

বর্দ্ধমান সন্নিকটে ক্ষুদ্র এক গ্রাম বটে,
আমাইপুরা তার নাম।
তাহে সে সুবুদ্ধিমিশ্র গোসাঞির পূর্ব্বশিষ্য,
তার ঘরে করিলা বিশ্রাম॥
তাহার নন্দন গুআ জয়ানন্দ নাম থুঞা,
রোদনী রান্ধিল তার লঞা।
রোদনী-ভোজন করি চলিলা নদীয়াপুরী,
বায়ড়ায় উত্তরিল গিঞা॥ পৃ ১৪০॥

মহাপ্রভুর শাখার মধ্যে এক সুবুদ্ধি মিশ্রের নাম চৈতন্যচরিতামৃতে আছে। জয়ানন্দের পিতা ইনিই কিনা বলা যায় না। 'চিন্তিয়া চৈতন্যগদাধরপদদ্বন্দ্ব। আনন্দে নদীয়াখণ্ড গায় জয়ানন্দ॥' ইত্যাদি পুষ্পিকা হইতে মনে হয় যে, জয়ানন্দের পিতা গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শাখাভুক্ত ছিলেন। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে সুবুদ্ধি মিশ্রের সম্বন্ধে 'পূর্ব্বে গোসাঞির শিষ্য', 'গোসাঞির পূর্ব্ব শিষ্য' বলা হইয়াছে। এখানে 'গোসাঞি' সম্ভবতঃ শ্রীচৈতন্যকে না বুঝাইয়া গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীকে বুঝাইতেছে। শ্রীচৈতন্য কাহাকেও শিষ্য করেন নাই। 'পূর্ব্বে

গোসাঞির শিষ্য' স্থলে 'পণ্ডিত গোসাঞির শিষ্য' পাঠ কল্পনা করা যাইতে পারে। কবি যে স্বয়ং গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর অনুগ্রহ পাইয়াছিলেন তাহাও উল্লেখ করিয়াছেন,

বীরভদ্র গোসাঞির প্রসাদমালা পাঞা।
শ্রীঅভিরাম গোসাঞির কেবল বল পাঞা॥
গদাধর পণ্ডিত গোসাঞির আজ্ঞা শিরে ধরি।
শ্রীচৈতন্যমঙ্গল কিছু গীত প্রচারি॥ পৃ ৩॥

অভিরাম গোসাঞির পাদোদকপ্রসাদে।
পণ্ডিত গোসাঞির আজ্ঞা চৈতন্য-আশীর্ব্বাদে॥
বাপ সুবুদ্ধিমিশ্র তপস্যার ফলে।
জয়ানন্দের মন হইল চৈতন্যমঙ্গলে॥ পৃ ৮৪॥

কবি এক স্থলে নিজেকে 'অভিরাম গোসাঞির দাস' বলিয়াছেন।[১] ইনিই কি জয়ানন্দের দীক্ষাগুরু ছিলেন? জয়ানন্দ বীরভদ্র গোস্বামীর প্রসাদমালা পাইয়াছিলেন। তখন বীরভদ্র গোস্বামীর সন্তানসন্ততি হইয়াছিল।

শ্রীনিত্যানন্দ নিবাস করিলা খড়দহে।
মহাকুল যোগেশ্বর বংশ যাহে রহে॥ পৃ ১৫১॥

ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদের কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল।

চৈতন্যমঙ্গলে জয়ানন্দ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের মধ্যে গৌরীদাস পণ্ডিত-রচিত গৌরাঙ্গবিষয়ক সঙ্গীতের, পরমানন্দ গুপ্ত রচিত গৌরাঙ্গবিজয় গীতের এবং গোপাল বসু রচিত চৈতন্যমঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন।

গৌরীদাস পণ্ডিতের কবিত্ব সুশ্রেণী।
সঙ্গীতপ্রবন্ধে তাঁর পদে পদে ধ্বনি॥
সংক্ষেপে করিলেন তিঁহ পরমানন্দ গুপ্ত।
গৌরাঙ্গবিজয় গীত শুনিতে অদ্ভুত॥

গোপাল বসু করিলেন সঙ্গীতপ্রবন্ধে।
চৈতন্যমঙ্গল তাঁরা চামর-বিছন্দে ॥ পৃ ৩ ॥

গৌরীদাস পণ্ডিতের রচিত একটিমাত্র নিত্যানন্দবিষয়ক পদ পাওয়া গিয়াছে।[১] পরমানন্দ গুপ্তের রচিত অনেকগুলি গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ পাওয়া গিয়াছে।[২] গোপাল বসু সম্বন্ধে অতিরিক্ত আর কিছুই জানা নাই।

প্রেমদাস স্বরচিত বংশীশিক্ষায় বংশীবদন চট্টের পৌত্র শচীনন্দন বিরচিত গৌরাঙ্গবিজয় গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

তিন পুত্র কৃত তিন সন্দর্ভ দেখিয়া।
গৌরাঙ্গবিজয় শচী বর্ণে হৃষ্ট হইয়া ॥ পৃ ২৩২।

শচীনন্দনের গৌরাঙ্গবিজয়ের কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। তবে পদকল্পতরু-ধৃত শচীনন্দনের ভণিতাযুক্ত বিষ্ণুপ্রিয়ার বারমাসী পদটী এবং শান্তিপুর হইতে শ্রীচৈতন্যের নীলাচল-গমন বিষয়ক পদটী এই গৌরাঙ্গবিজয়ের অন্তর্গত ছিল বলিয়া মনে হয়।[৩]

গোবিন্দদাসের কড়চা নামে প্রকাশিত গ্রন্থখানি শ্রীচৈতন্যের জীবনের কয়েক বর্ষের একখানি প্রামাণ্য জীবনী বলিয়া সাধারণতঃ গৃহীত হইয়া থাকে। শান্তিপুরনিবাসী জয়গোপাল গোস্বামী মহাশয় এই গ্রন্থটি সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরী হইতে ১৮৯৫ খৃষ্টাব্দে প্রকাশ করেন।[৪] প্রকাশিত হইবামাত্র গ্রন্থটি লইয়া বৈষ্ণব ও পুবাতন বাঙ্গালাসাহিত্যরসিকদিগের মধ্যে তীব্র মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছিল। সেই মতভেদ এখনও বিলুপ্ত হয় নাই। এক পক্ষ বলেন যে, গ্রন্থখানি যথার্থই

১। পদকল্পতরু ২৩১৩; HBL, পৃ ৩৯৭-৯৮।
২। HBL, পৃ ৬১-৬২, ৩৭৬, ৪৬৬।
৩। পদকল্পতরু ১৭৬৫-৭৬, ২২৩৭, HBL, পৃ ২০৬।
৪। গোবিন্দদাসের কড়চার এক অভিনব সংস্করণ দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। এই সংস্করণে দীনেশ বাবু এক প্রকাণ্ড ভূমিকা যোগ করিয়া পূর্ব্বপক্ষের সমর্থন করিয়াছেন। বর্ত্তমান আলোচনায় এই দ্বিতীয় সংস্করণের পাঠ অবলম্বিত হইয়াছে। সম্প্রতি প্রকাশিত 'গোবিন্দদাসের কড়চা রহস্য' পুস্তকে শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ মহাশয় দীনেশবাবুর যুক্তি সমুচিতভাবে খণ্ডন করিয়াছেন।

মহাপ্রভুর কোন অনুচর গোবিন্দ কর্ম্মকারের লেখা, অপর পক্ষ বলেন বইখানি জাল, অর্থাৎ মহাপ্রভুর কোন অনুচরের লেখা নহে।

পূর্ব্বপক্ষ স্পষ্টতঃ স্বীকার করেন যে, জয়গোপাল গোস্বামী পুস্তকটিতে সম্পাদক হিসাবে কিছু কিছু হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তাঁহারা আরও স্বীকার করেন যে, গ্রন্থটির প্রথম অংশ [পৃ ২২ পর্য্যন্ত] সম্পাদনকালে মূল পুঁথির অনুলিপি হারাইয়া গিয়াছিল, সুতরাং এই অংশে তাঁহার হস্তক্ষেপ কিছু গাঢ়তর।[১] কিন্তু একটা কথা এখানে জিজ্ঞাস্য আছে। গোস্বামী মহাশয় যদি "অনেক স্থানে পাঠোদ্ধার করিতে না পারিয়া নিজে শব্দ যোজনা করিয়াছেন, কোন কোন জায়গায় কীটদষ্ট ছত্রটি বুঝিতে না পারিয়া সেই ছত্র নিজে পূরণ করিয়া দিয়াছেন", তাহা হইলে মধ্যে মধ্যে কীটদষ্ট ছত্রাংশ রাখিয়া দিয়াছেন কেন?[২] এই ছত্রাংশগুলি তো সহজেই পূরণ করা যাইত!

গোবিন্দদাসের কড়চার ভাষা বিস্তৃতভাবে পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে, শুধুই যে কতকগুলি কীটদষ্ট ছত্র পূরণ এবং দুই একটি প্রাচীন শব্দে অদল-বদল হইয়াছে তাহা নহে, গ্রন্থটির ভাষা—গ্রন্থটি যদি সত্য সত্যই প্রাচীন হয়—এরূপ আমূলভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়াছে যে, উহার মধ্যে প্রাচীনত্ব বিন্দুমাত্রও দেখা যায় না। মধ্যে মধ্যে তথাকথিত প্রাচীনত্বের যে চেষ্টা আছে তাহা যাঁহারা পুরাতন বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা সহজেই ধরিতে পারিবেন। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি—পেখিয়া, পোকুর, লহি, মুহি, পিয়ে পিয়ে খাই পানা ইত্যাদি।

ভাষার আধুনিকত্ব সম্বন্ধে কতকগুলি উদাহরণ দিতেছি। এগুলি যদৃচ্ছাক্রমে উদ্ধৃত হইয়াছে।

> একই জেলের মুখে পরিচয় পাইয়া।
> একে একে সকলেরে লইনু চিনিয়া॥ পৃ ৩॥
> অধমের নামটি গোবিন্দদাস হয়। পৃ ৪॥

---

১ ভূমিকা, পৃ ১০, ২২, ২৯, ৩৩, ৭৫।
২ পৃ ৬, ১২, ১৫, ২৮ ইত্যাদি।

প্রভুর বিয়োগ উহু কেমনে সহিব ॥ পৃ ৬ ॥
বৈষ্ণবগণের আহা উড়িল পরাণী ॥ ঐ ॥
এমন কেশের শোভা দেখিনি নয়নে ॥ পৃ ১১ ॥
নারীগণ বলে নাপিত একাজ কারো না।
এমন চুলের গোছা মুড়ায়ে ফেলো না ॥ ঐ ॥
কাঁদিতে কাঁদিতে তবে কমলকুমারী।
ফিরে গেল তীর্থ হলো পথের ভিকারী ॥
কভু হাসি কভু কান্না পাগলের মত। পৃ ৩০ ॥
গলে দিয়া প্রেম ফাঁসি নারী জোরে টানে।
সেই টানে বোকা কর্ত্তা মরেন পরাণে ॥ পৃ ৩৪ ॥
পর্ব্বতসমান বালি হয়ে স্তূপাকার।
ঈশ্বরের গুণ যেন করিছে বিস্তার ॥ পৃ ৪২।
ফিরে না চাইল ব্যাঘ্র মোদিগের প্রতি ॥ পৃ ৪৮ ॥
নানাবিধ ফুল ফুটে করিয়াছে আলা।
প্রকৃতির গলে যেন দুলিতেছে মালা ॥ পৃ ৫০ ॥
খুনাখুনি করিবারে প্রস্তুত হইল ॥ পৃ ৫৮ ॥
দেখিলাম তার মধ্যে বাঙ্গালি দুজনে। পৃ ৬৩ ॥
আহা মরি ভগ্নশেষ রয়েছে পড়িয়া। পৃ ৬৮ ॥
দেখা যাইতেছে তাঁর শরীরে পঞ্জর ॥ পৃ ৭৯ ॥
আপনি চলুন অগ্রে রায় ইহা বলে।
কিছু দিন পরে মুহি যাব নীলাচলে ॥ পৃ ৮১ ॥

গোবিন্দদাসের কড়চার কথাবস্তুর আলোচনার পূর্ব্বে 'গ্রন্থকার' গোবিন্দদাসের পরিচয় কি পাওয়া যায় এবং তাহা কতদূর বিচারসহ তাহা দেখা যাউক। গোবিন্দের পিতার নাম শ্যামাদাস, মাতার নাম মাধবী এবং পত্নীর নাম শশিমুখী। ইহাঁরা জাতিতে "অস্ত্রহাতা বেড়ি"-গড়া কামার, বাসস্থান বর্দ্ধমানে কাঞ্চননগরে। একদিন পত্নীর সহিত বিবাদে "নির্গুণে মুরখ" বলিয়া

গালি খাইয়া পরদিন (?) ভোর বেলায় অভিমানে গৃহত্যাগ করিলেন। গোবিন্দদাস স্বভাব-ঐতিহাসিক, ইংরেজীতে যাহাকে বলে born historian তাই। সুতরাং গৃহত্যাগের সালটি দিয়াছেন "চৌদ্দশ ত্রিশ শক", তবে মাস এবং তারিখটি চাপিয়া গিয়াছেন। ইহার পর অন্য অনেক ক্ষেত্রে মাস ও তারিখ দিয়াছেন কিন্তু সালের উল্লেখ আর কুত্রাপি করেন নাই।

বস্তুতঃ যদিও গোবিন্দদাস বলিয়াছেন, "অস্ত্র হাতা বেড়ি গড়ি জাতিতে-কাঁমার" এবং যদিও শশিমুখী তাঁহাকে "নিগুর্ণে মুরখ" বলিয়া গালি দিয়াছিলেন কিন্তু গ্রন্থটি পাঠ করিলে স্বীকার করিতে হয় যে, গোবিন্দদাস উচ্চশিক্ষিত ব্যক্তি ছিলেন।[১]

যাহা হউক গোবিন্দদাস কাটোয়ায় পৌঁছিয়া তথায় শ্রীচৈতন্যের নাম শুনিয়া নবদ্বীপে ছুটিয়া গিয়া প্রভুর ভৃত্য হইলেন। তাহার পর প্রভুর সহিত নীলাচলে আসিলেন এবং প্রভুর সহিত দক্ষিণাপথ ভ্রমণ করিয়া পুনরায় নীলাচলে ফিরিয়া আসিলেন। তখন প্রভু তাঁহার হাতে পত্র দিয়া তাঁহাকে শান্তিপুরে অদ্বৈত আচার্য্যের নিকট প্রেরণ করিলেন। ইহার পর গ্রন্থ খণ্ডিত। মহাপ্রভুর ভৃত্য হওয়ার পর হইতে শেষ পর্য্যন্ত ঘটনাগুলি গোবিন্দদাস এই কড়চা আকারে লিপিবদ্ধ করেন। দাক্ষিণাত্যভ্রমণ ছাড়া অন্যান্য ঘটনাগুলি যৎসামান্যভাবে বর্ণিত হইয়াছে। দক্ষিণভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণন করাই গোবিন্দদাসের মুখ্য উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। যদিও প্রথম হইতেই গোবিন্দদাস বলিতেছেন—"করচা করিয়া রাখি শক্তি অনুসারে।" এটি বড়ই সন্দেহজনক ব্যাপার।

গোবিন্দদাসের কড়চা পড়িলে মনে হয় যে, প্রথম হইতেই গোবিন্দদাসের ভাবনা ছিল যে, তাঁহাকে ঐতিহাসিকের কাজ করিতে হইবে এবং প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া শ্রীচৈতন্যের অন্যান্য জীবনীগ্রন্থের ভ্রমনিরাস করিবার ভার তাঁহারই উপর পড়িবে। এই জন্য তিনি পুনঃ পুনঃ বলিয়া গিয়াছেন,

১। শ্রীচৈতন্যের মুখে বড় বড় বেদান্তাদির তত্ত্বকথা গোবিন্দদাস আমাদের শুনাইয়াছেন। তাহার মধ্যে 'প্রমেয়,' 'দ্বৈতাদ্বৈতবাদ,' 'অবয়বী' ইত্যাদি শব্দের অসদ্ভাব নাই।

যে সব আশ্চর্য্য লীলা পাই দেখিবারে।
করচা করিয়া রাখি শক্তি অনুসারে॥
যেই লীলা দেখিলাম আপন নয়নে।
করচা করিয়া রাখি অতি সঙ্গোপনে॥

এখন দেখা যাউক এই গোবিন্দদাসের অন্যত্র কোন উল্লেখ আছে কিনা। শ্রীচৈতন্যের জীবনীর মধ্যে এক জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলেই গোবিন্দদাস কর্ম্মকারের উল্লেখ পাওয়া যায় বলিয়া অনেকে মনে করিয়া থাকেন। জয়ানন্দ বলিয়াছেন,

মুকুন্দ দত্ত বৈদ্য গোবিন্দ কর্ম্মকার।
মোর সঙ্গে আইসহ কাটোআ গঙ্গাপার॥ পৃ ৮৩॥

কর্ম্মকার অর্থে শুধু 'কামার' নহে, 'কর্ম্ম করে যে' অর্থাৎ ভৃত্যও বোঝায়। গোবিন্দ ঘোষ মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের ও নীলাচলগমনের সঙ্গী ছিলেন। অর্দ্ধ হরিতকী সঞ্চয়ের জন্য মহাপ্রভু তাঁহাকে ফিরাইয়া দেন। এখানে এই গোবিন্দ ঘোষকে যে উল্লেখ করা হইতেছে না, তাহা কে বলিল? জয়ানন্দ ইঁহাকে এক স্থানে 'গোবিন্দানন্দ' বলিয়াছেন [পৃ ৮৭]।

গৌরপদতরঙ্গিণীতে উদ্ধৃত 'বলরাম' ভণিতায় একটি পদ আছে—

নীলাচল উদ্ধারিয়া গোবিন্দেরে সঙ্গে লৈয়া
দক্ষিণ দেশেতে যাব আমি।

ইহা হইতে কিছুই প্রমাণ হয় না। ইনি গোবিন্দ কর্ম্মকার নহেন, ঈশ্বর পুরীর এবং পরে শ্রীচৈতন্যের সেবক। বলরাম নামে পাঁচ ছয়টি পদকর্ত্তার আবির্ভাব হইয়াছিল। পদটি কোন বলরামদাসের?

প্রেমদাসের চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদীর একটি পুঁথি হইতে পয়ার উদ্ধৃত করিয়া[১] দীনেশবাবু বলিয়াছেন যে, ইহাতে "লিখিত আছে মহাপ্রভুর দাক্ষিণাত্যভ্রমণ

১। নামপৃষ্ঠার পরপৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। পয়ারটি এই—
শুনি শ্রীগোবিন্দ আনন্দিত হঞা।
অদ্বৈতের স্থানে চলে মনেতে চিন্তিঞা।

হইতে প্রত্যাগমনের পর গোবিন্দদাস নামে এক ব্যক্তি শ্রীখণ্ডে উপস্থিত হন ......তৎপরে শিবানন্দ সেনের সঙ্গে পুনরায় পুরীতে প্রত্যাগমন করেন।"[১] দীনেশ বাবুর contextটুকু—অর্থাৎ গোবিন্দদাসের পুরী হইতে বঙ্গদেশে আগমন এবং প্রত্যাগমন—সম্পূর্ণরূপে স্বকপোলকল্পিত। এ বিষয়ে চৈতন্যচন্দ্রোদয়-কৌমুদীতে যাহা বলা হইয়াছে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

এই মত ভক্তগণ রহে নীলাচলে।
গৌড়ের বৈষ্ণব সব সোৎকণ্ঠ-অন্তরে॥
গুণ্ডিচা-যাত্রার কাল প্রত্যাসন্ন হৈল।
নীলাচল যাইতে সবেই মনঃ কৈল॥
হেনকালে বৈষ্ণব গোবিন্দদাস নাম।
উত্তররাঢ়েতে হৈতে গেলা খণ্ডগ্রাম॥
নরহরিদাস আদি যত ভক্তগণ।
তেহোঁ আসি তা সভার বন্দিল চরণ॥
নরহরি তাঁহারে করিয়া আলিঙ্গন।
জিজ্ঞাসিল কোথা বাড়ী কি কার্য্যে গমন॥
গোবিন্দ বলেন ঘর উত্তররাঢ়েতে।
ইচ্ছা হয় মোর শ্রীপুরুষোত্তম যাইতে॥
প্রতি বর্ষে তোমরা চলহ নীলগিরি।
তোমা সবা সঙ্গে যাব এই চিত্তে করি॥
নরহরি বলে বড় ভাগ্য সে তোমার।
নীলাচলে দেখিবারে চৈতন্যাবতার॥
কিন্তু তুমি শান্তিপুরে চল পুরঃসর।
যেখানে আছেন শ্রীল অদ্বৈত ঈশ্বর॥

১। ভূমিকা, পৃ ৭২-৭৩। কৌতূহলী পাঠককে সমস্ত অনুচ্ছেদটি পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করিতেছি।

গৌড়ের বৈষ্ণব সব তাঁর সঙ্গে চলে।
শিবানন্দ সেন পথে সমাধান করে॥
দেখ যাঞা তা সভার কতেক বিলম্ব।
পাছে যাব আমরা শ্রীঅদ্বৈতের সঙ্গ॥
শুনি শ্রীগোবিন্দদাস আনন্দিত হইয়া।
অদ্বৈতের স্থানে চলে মনেতে চিন্তিঞা॥ পৃ ৩৩১-৩২॥

চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদীর মূল যে কবি-কর্ণপুরের চৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক, তাহাতেও এই কথাই আছে, তবে নামটি নাই, শুধু বৈদেশিক বলা হইয়াছে।

গন্ধর্ব্বনামা। ত্বং কুতোঽসি।
বৈদেশিকঃ। অহমুত্তররাঢ়াতঃ।
গন্ধর্ব্বনামা। কথমেকাকী।
বৈদেশিকঃ। নরহরিদাসাদিভিরহং প্রেষিতঃ।
গন্ধর্ব্বনামা। কিমর্থম্।
বৈদেশিকঃ। কদাসৌ পুরুষোত্তমং গন্তেতি জ্ঞাতুম্।[১]

উপরের আলোচনা হইতে এই ফল দাঁড়াইতেছে। (১) ভাষা ধরিয়া বিচার করিলে গোবিন্দদাসের কড়চার রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর ঊর্দ্ধে যাইতে পারে না। (২) বস্তু ধরিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাই যে, গ্রন্থটি শ্রীচৈতন্যের কোন অনুচরের রচনা হইতে পারে না। ইহাতে ছোট বড় নানা ভ্রান্তি ও অসঙ্গতি আছে। যে সকল কথা বলিতে গেলে পুঁথি বাড়িয়া যায়।[২] গ্রন্থকারের নিকট চৈতন্যচরিতামৃত যে অপরিচিত ছিল না এবং গ্রন্থকার যে কৃষ্ণদাস

১। দশম অঙ্ক, বিষ্কম্ভক। নির্ণয়সাগর সংস্করণ, পৃ ১৮০-১৮১।

২। যে নাপিত মহাপ্রভুকে সন্ন্যাসের কালে মুণ্ডন করিয়াছিল তাহার নাম বলা হইয়াছে 'দেবা' [পৃ ১১], অথচ জয়ানন্দের মতে তাহার নাম 'কলাধর' [পৃ ৮৯]; আর বাসুদেব ঘোষও রসিকানন্দের মতে তাহার নাম 'মধু' [গৌরপদতরঙ্গিণী, পৃ ৩৬৯, ৩৭১]। আর একটি উদাহরণ মহাপ্রভুকে বর্দ্ধমানের পথে নীলাচলে লইয়া যাওয়া। জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলের আলোচনা-প্রসঙ্গে এ সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছি। খঞ্জ ভগবানাচার্য্যকে গ্রন্থকার বরাবরই খঞ্জন আচার্য্য বলিয়াছেন। কোন কড়চা-কারের পক্ষে এ ভুল মার্জ্জনীয় নহে।

কবিরাজের গ্রন্থের সহিত ঐক্য বাঁচাইয়া চলিতেছেন তাহাতে কোন ভুল নাই।[১]

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, "করচা করিয়া রাখি শক্তি অনুসারে" এই প্রতিজ্ঞা সত্ত্বেও দাক্ষিণাত্যভ্রমণ ছাড়া অন্যত্র কড়চা-সুলভ নিখুঁত বর্ণনা কিছুই দেন নাই। সন্ন্যাসগ্রহণের পর শান্তিপুর গমন, তথা হইতে নীলাচল গমন এবং তথায় কিয়ৎকাল অবস্থিতি, ইহাও কোন্ তুচ্ছ ব্যাপার? এ বিষয়ে গোবিন্দদাস ডায়েরিতে ফাঁক দিয়াছিলেন কেন? সুতরাং মনে হয় দাক্ষিণাত্যভ্রমণ বর্ণনাই গ্রন্থকারের মূল উদ্দেশ্য। এখন দেখা যাক, এই দাক্ষিণাত্যভ্রমণের মৌলিকত্ব কোথায়।

গোবিন্দদাসের করচায় বর্ণিত মহাপ্রভুর দক্ষিণভ্রমণের একটা মোটামুটি সঙ্গত ও বিস্তৃত বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহাতে বিশেষত্ব কিছু নাই। বিশেষত্ব হইতেছে তীর্থযাত্রী শ্রীচৈতন্যের চরিত্রচিত্রণে। কড়চা হইতে দেখিতে পাই, শ্রীচৈতন্য প্রচারকবৃত্তি অবলম্বন করিয়াছেন; যে শ্রীচৈতন্য বিষয়ী এবং নারী হইতে সর্ব্বদা সুদূরে থাকিতেন, তিনি স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া রাজাদিগের নিকট ধর্ম্মব্যাখ্যা করিতেছেন এবং বারনারীদের বৈষ্ণবী করিতেছেন। ইহার রহস্য কি গুরুগিরির কৈফিয়ৎ?

গোবিন্দদাসের কড়চার রচয়িতা যিনিই হউন এবং গ্রন্থখানি যে শতাব্দীতে লেখা হউক, বইটিতে সরল কবিত্বপূর্ণ মনোগ্রাহী বর্ণনা অনেক আছে। নিম্নে সামান্য কিছু উদাহরণ দিতেছি।

বিশুদ্ধ প্রেমের তত্ত্ব শুন মন দিয়া।
যার অল্প হিল্লোলে জুড়ায় দগ্ধ হিয়া॥
যুবতীর আর্ত্তি যথা যুবক দেখিয়া।
সেইরূপ আর্ত্তি আর না দেখি ভাবিয়া॥

১। দক্ষিণযাত্রায় তুমি যাবে অতি দূর।
সঙ্গে যাক কৃষ্ণদাস ব্রাহ্মণঠাকুর॥ পৃ ২১॥

প্রভু বলে ভক্তি কর তর্ক বহুদূর।
ভক্তিতে মিলায় কৃষ্ণ ওই ত বিচার॥ পৃ ৪৭॥

তব বক্ষে স্বর্ণপাঞ্চালিকা আছে লেখা।
যার তেজে কালরূপ নাহি যায় দেখা॥ পৃ ৮৫॥ ইত্যাদি।

এ কারণ ভক্তগণ ভজে যদুপতি।
পত্নীভাবে তাঁর প্রতি স্থির করি মতি ॥
আত্মারামের জন্য যার আর্ত্তি হয়।
তার কি মনের মধ্যে কামভাব রয়।
আলোর নিয়ড়ে যথা তম নাহি রয়।
কৃষ্ণের সমীপে তথা কামভস্ম হয় ॥
কেবল প্রেমের আর্ত্তি থাকে বিদ্যমান।
এই ত বলিয়া দিনু প্রেমের সন্ধান ॥
এমন প্রেমের লাগি কর হানাপানা।
কৃতার্থ হইবে যাবে সংসারবাসনা ॥ পৃ ১০ ॥

বৈষ্ণববন্দনা ও বৈষ্ণবমহান্তগণাখ্যান জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রচনাগুলি জীবনী-কাব্যের মধ্যেই পড়ে, যদিও সেগুলি প্রায়ই নামের তালিকামাত্র। তবে এই রচনাগুলির একটি বিশেষ উপযোগিতা আছে। বৈষ্ণবমহান্ত বা পদকর্ত্তৃদিগের কালনির্ণয়ে এই গণাখ্যানগুলি মূল্যবান্ উপাদান যোগাইয়া থাকে।

বৈষ্ণববন্দনাগুলির মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে দেবকীনন্দনের এবং মাধবদাসের বা মাধব আচার্য্যের। উভয়েই শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক এবং শ্রীচৈতন্যপারিষদের শিষ্য ছিলেন। দেবকীনন্দনের পুস্তিকার বহু বহু সংস্করণ হইয়াছে এবং হইতেছে। মাধবদাসের পুস্তিকা শিবচন্দ্র শীল কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৩১৭ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায় বীরভদ্রের পুত্রত্রয় গোপীজনবল্লভ, রামচন্দ্র এবং রামচন্দ্রের উল্লেখ আছে। এই অংশ প্রক্ষিপ্ত না হইলে বুঝিতে হইবে, পুস্তিকাটি ষোড়শ শতাব্দীর শেষের দিকে রচিত হইয়াছিল। দেবকীনন্দন একজন ভাল পদকর্ত্তা ছিলেন।

মহাপ্রভুর পারিষদদিগের মধ্যে একাধিক মাধব ছিলেন। তন্মধ্যে কোন মাধব যে বৈষ্ণববন্দনা লিখিয়াছিলেন তাহা বলা দুষ্কর। মাধবের কবিতা দেবকীনন্দনের রচনার পূর্ব্ববর্ত্তী বলিয়াই বোধ হয়।

ঊনবিংশ পরিচ্ছেদ

অদ্বৈত প্রভুর ও সীতা দেবীর জীবনী

অদ্বৈত প্রভুর জীবনী বিষয়ক গ্রন্থ কয়েকখানিই পাওয়া যায়, তন্মধ্যে অন্ততঃ 'তিনখানি ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিরচিত হইয়াছিল। নিত্যানন্দ প্রভুর জীবনী বিষয়ক কোন স্বতন্ত্র কাব্য পাওয়া যায় নাই, ইহা আপাতবিস্ময়ের কারণ বটে। কিন্তু চৈতন্যভাগবত প্রভৃতি শ্রীচৈতন্যজীবনী গ্রন্থে নিত্যানন্দ প্রভুর সম্বন্ধে প্রায় সকল জ্ঞাতব্য তথ্যই যথোপযুক্তভাবে বর্ণিত আছে, সেই হেতু স্বতন্ত্র-ভাবে নিত্যানন্দপ্রভুর জীবনীগ্রন্থের আবশ্যকতা অনুভূত হয় নাই। আরও একটা কারণ আছে। নিত্যানন্দ প্রভুর তাবৎ প্রচেষ্টা মহাপ্রভুর কীর্ত্তিকলাপের সহিত অঙ্গাঙ্গীভূত ছিল। একথা অবশ্য অদ্বৈত প্রভুর শেষ বয়সের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য বটে, তবে শ্রীচৈতন্য আবির্ভূত হইবার পূর্ব্বে অদ্বৈত প্রভুর বয়স পঞ্চাশেরও উপর হইয়াছিল। এই সময়ের ইতিহাস চৈতন্যজীবনীর বিষয়ীভূত নহে, সুতরাং বিশেষ করিয়া এই কারণেই অদ্বৈতজীবনীর প্রয়োজন ছিল।

শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়ের রাজা দিব্যসিংহ পরিণতবয়সে পুত্রের উপর রাজ্যভার অর্পণ করিয়া শান্তিপুরে চলিয়া আসেন এবং অদ্বৈত প্রভুর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তখন তাঁহার নাম হইল কৃষ্ণদাস। সংস্কৃত ভাষায় বাল্যলীলাসূত্র নামে ইনি অদ্বৈত প্রভুর প্রথম বয়সের একটি জীবনী রচনা করেন। অদ্বৈত প্রভুর জীবনীর মধ্যে এইটিই প্রাচীনতম। ত্রিহুতবাসী ভক্তসন্ন্যাসী বিষ্ণুপুরী শ্রীমদ্ভাগবত হইতে প্রায় চারিশত শ্লোক সঙ্কলন করিয়া বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী' নামে সংগ্রহগ্রন্থ রচনা করেন। এই সঙ্কলনটি কৃষ্ণদাস বাঙ্গালা পয়ারে রূপান্তরিত করেন। কৃষ্ণদাসের এই অনুবাদ সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই, একটি পুঁথির কয়েকটি

১। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত (৪১৯ চৈতন্যাব্দ)।

খণ্ডিত পত্র মাত্র পাওয়া গিয়াছ।[১] বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলীরচনার ইতিহাস সম্বন্ধে কৃষ্ণদাস এই কথা বলিয়াছেন,

শ্রীবিষ্ণুপুরী ঠাকুর ভকত-সন্ন্যাসী।
জীব নিস্তারিলা কৃষ্ণ-ভকতি প্রকাশি॥
বিচারি বিচারি ভাগবত-পয়োনিধি।
বিষ্ণুভক্তিরত্নাবলী প্রকাশিলা নিধি॥
প্রতি অধ্যায় বিচারিয়া দ্বাদশ স্কন্ধ।
সার শ্লোক উদ্ধারিয়া করিলা প্রবন্ধ॥
নানাবিধ শ্লোক ব্যাখ্যা করি সাধু।
তাপিত জীবের তরে সিঞ্চিলেক মধু॥
অষ্টাদশ সহস্র শ্লোক ভাগবত।
তা হইতে উদ্ধার করিলা শ্লোক চারি শত॥
বিষ্ণুপুরী ঠাকুর রচিলা রত্নাবলী।
কৃষ্ণদাস গাইলেক অদ্ভুত পাঁচালী॥

ঈশান নাগরের অদ্বৈতপ্রকাশ[২] শ্রীহট্টের অন্তর্গত লাউড়ে ১৪৯০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। ঈশান নাগরের বয়স যখন পাঁচ তখন তাঁহার মাতা তাঁহাকে লইয়া শান্তিপুরে অদ্বৈত প্রভুর গৃহে উপনীত হন। সেদিন আচার্য্যের গৃহে তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের হাতে-খড়ির উৎসব। তাহার পর মাতাপুত্র অদ্বৈত প্রভুর গৃহেই রহিয়া গেলেন। তিরোধানের কিছুকাল পূর্ব্বে অদ্বৈত প্রভু স্বীয় জন্মভূমি লাউড়ে গৌরাঙ্গের নাম প্রচার করিবার জন্য ঈশানকে অনুজ্ঞা দিয়া গিয়াছিলেন। আচার্য্যের অন্তর্দ্ধানের পর সীতা দেবী ঈশানকে লাউড়ে গিয়া বিবাহাদি করিয়া গৃহস্থাশ্রম অবলম্বন করিতে আদেশ

১। ব-সা-প-প ৬, পৃ ১৬৬।

২। এই গ্রন্থের প্রথম পরিচয় প্রকাশ করেন শ্রীযুক্ত অচ্যুত চরণ তত্ত্বনিধি মহাশয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় [তৃতীয় ভাগ, পৃ ২৪৯-৫৪]। অমৃতবাজার পত্রিকা কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

করেন। ঈশানও জগদানন্দের সহিত পূর্ব্বদেশে আসিয়া বিবাহ করেন এবং পরে অদ্বৈতজীবনী কাব্যটি রচনা করেন। ঈশান এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

যেই দিনে শ্রীঅচ্যুত বিদ্যারম্ভ কৈলা।
সেই দিন মোর মাতা শান্তিপুরে আইলা॥
শ্রীঅদ্বৈতপদে আসি লইয়া শরণ।
পঞ্চম বৎসর মোর বয়স তখন॥
প্রভু দয়া করি মায়ে দিলা কৃষ্ণমন্ত্র।
মোরে হরিনাম দিঞা করিলা পবিত্র॥
মোরে পাঞা সীতা দেবী স্নেহ প্রকাশিলা।
আপন তনয় সম পোষণ করিলা॥
শ্রীগুরুর আজ্ঞাবহা ছিলা মোর মাতা।
কিছু কিছু মোর মনে পড়ে সেই কথা॥ ১১॥
একদিন প্রভু মোরে কহে সংগোপনে।
গৌরাঙ্গ-বিচ্ছেদ আর না সহে পরাণে॥

মোর অগোচরে দুঃখ না ভাবিহ মনে।
গৌরনাম প্রচারিহ মোর জন্মস্থানে॥ ২২॥
তবে প্রভুর অন্তর্দ্ধানে সীতা ঠাকুরাণী।
কি ভাবি এই আদেশিলা কিছু নাহি জানি॥
অরে ঈশানদাস তোরে করি বড় স্নেহ।
মোর তুষ্টি হয় তুই করিলে বিবাহ॥
মুঞি কহিলাঙ মাতা বুঝি আজ্ঞা কর।
এই আজ্ঞা পালিতে নাহিক সাধ্য মোর॥
সপ্ততি বৎসর প্রায় মোর বয়ঃক্রম।
ইথে কোন দ্বিজ কন্যা করিবে অর্পণ॥

মাতা কহে কৃষ্ণ সদা ভক্তবাঞ্ছা পূরে।
তেঞি ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু নাম ধরে॥
পূর্ব্বদেশে যাহ শ্রীজগদানন্দ সনে।
বিয়া করাইবে ইঁহো করিয়া যতনে॥
... ...
শিরে ধরি এই সীতামাতার আদেশ।
জগদানন্দ রায় সঙ্গে আইনু পূর্ব্বদেশ॥
বংশরক্ষা করি প্রভুর আজ্ঞা পালিবারে।
ঝাট চলি আইনু মুঞি শ্রীধাম লাউড়ে॥
ইহাঁ রহি এই গ্রন্থ করিনু লিখন।
গুরু-আজ্ঞা মাত্র মুঞি করিনু রক্ষণ॥ ঐ॥

চৌদ্দশত নবতি শকাব্দ পরিমাণে।
লীলাগ্রন্থ সাঙ্গ কৈনু শ্রীলাউড় ধামে॥ ঐ॥

অদ্বৈতপ্রকাশ বৃহৎ গ্রন্থ নহে; ইহা বাইশটি নাতিক্ষুদ্র অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। গ্রন্থ বৃহৎ না হইলেও প্রামাণিকতায় ইহা চৈতন্যজীবনী কাব্যগুলির অপেক্ষা কোন অংশে খাটতো নহেই, পরন্তু লোচন জয়ানন্দাদির গ্রন্থ হইতে উৎকৃষ্ট। তাবৎ চৈতন্য ও চৈতন্যপারিষদ জীবনীগ্রন্থের মধ্যে অদ্বৈতপ্রকাশের একাধিক অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব আছে, তাহাতে এই গ্রন্থের মূল্য বাড়িয়া গিয়াছে। প্রথমতঃ এই গ্রন্থেই রচনার তারিখ অবিসন্দিগ্ধভাবে দেওয়া আছে, দ্বিতীয়তঃ বাঙ্গালায় যাঁহারা মহাপ্রভুর ও তাঁহার ভক্তের জীবনী লিখিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে এক ঈশান নাগর ব্যতিরেকে আর কেহই যে শ্রীচৈতন্যের সঙ্গসুখ অনুভব ও তাঁহার লীলাবলী চাক্ষুষ দর্শন করিবার সৌভাগ্য লাভ করিতে পারিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ নাই। এই কারণে অদ্বৈতপ্রকাশকে চৈতন্যজীবনীগুলির অন্যতম বলা যায়। প্রকৃত প্রস্তাবে ইহাতে এমন কিছু কিছু ঘটনার উল্লেখ আছে, যাহা অন্যত্র নাই।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর মত ঈশান নাগরের সজাগ ঐতিহাসিক দৃষ্টি ছিল। যে সকল লীলা তিনি বর্ণনা করিয়াছেন তাহা কাহার নিকট শ্রুত তাহা

উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। তিনি নিজে যাহা যাহা দেখিয়াছিলেন তাহাও অনেকক্ষেত্রে উল্লেখ করিয়াছেন।

পুরীরাজের গুণ লীলা সাগরের সম।
শ্রীমুখে অদ্বৈত প্রভু করিলা বর্ণন ॥ ৫ ॥
কহিনু নিগূঢ় তত্ত্বের কিঞ্চিৎ আভাস।
দয়া করি মাতা যাহা করিলা প্রকাশ ॥ ৮ ॥
শ্রীঅচ্যুত কহে মোরে এই শুভাখ্যান।
তার সূত্র লবমাত্র করিনু ব্যাখ্যান ॥ ১৩ ॥
শ্রীপাদ নিত্যানন্দ প্রভুর মুখাব্জনিঃসৃত।
এই লীলারসামৃত পিয়া হৈনু পূত ॥ ১৫ ॥
যে পড়িনু যে শুনিনু কৃষ্ণদাস মুখে।
পদ্মনাভ শ্যামদাস যে কহিল মোকে ॥
পাপচক্ষে যে লীলা মুঞি করিনু দর্শন।
প্রভু আজ্ঞামতে তাহা করিনু গ্রন্থন ॥ ২২ ॥

অদ্বৈতপ্রকাশের মধ্যে পাণ্ডিত্যপ্রয়াস অথবা কবিত্বপ্রচেষ্টা বা কবিসুলভ আড়ম্বর কিছুই নাই। ভাষাও অলঙ্কারবর্জ্জিত, সরল। ঈশান ক্ষমতাশালী লেখক ছিলেন; কি তত্ত্বকথায়, কি সাধারণ বর্ণনায় সর্ব্বত্রই লিখনভঙ্গীর বিশিষ্টতা ও মাধুর্য্য বিদ্যমান। নিম্নে উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে ঈশানের লিপিচাতুর্য্যের পরিচয় পাওয়া যাইবে।

ফুলিয়াতে হরিদাস যখন হরিনামকীর্ত্তনে মগ্ন ছিলেন তখন তাঁহার হিন্দুয়ানির প্রতি তত্রস্থ কাজীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। হরিদাসকে বাঁধিয়া আনিবার জন্য অনুচরদিগকে আজ্ঞা দেওয়া হয়।

তবে হরিদাস ধরি নিগ্রহ করিঞা।
দরবারে আনিলেক হাতে দড়ি দিঞা ॥
হরিদাসে দেখি কহে যবনের পতি।
কাহে হিন্দুয়ানি কর হঞা উত্তমজাতি ॥

স্বধর্ম্ম ছাড়িয়া যে করে মহাযোগ।
দেহান্তে নিশ্চয় তার হইব দোযোগ॥
যদি ভেস্ত-প্রাপ্তিবাঞ্ছা থাকে তোর মনে।
কলমা পড়িয়া কর পাপের দমনে॥
শুনি হরিদাস কহে সুগম্ভীরস্বরে।
যুক্তিমূলক যেই শাস্ত্র শ্রেষ্ঠ কহি তারে॥
যুক্তিযুক্তশাস্ত্র-অনুগামী যেই হয়।
সর্ব্ববর্ণে সেই শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রে ইহা কয়॥
যবনের শাস্ত্র হয় যুক্তিবিরুদ্ধাভাস।
সেই শাস্ত্রচরী যবনরূপেতে প্রকাশ॥
... ...
সর্ব্বস্বরূপ পরব্রহ্ম অনাদিবিগ্রহ।
ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ শুদ্ধসত্ত্বময়দেহ॥
যে শাস্ত্রে তাঁহারে কহে নিরাকার নিরীহ।
তেন শাস্ত্র পঠনে বাঢ়য়ে মায়ামোহ॥
বস্তুতত্ত্বে ঈশ্বরে জীবেতে নাহি ভেদ।
অগ্নির সত্তা যৈছে সর্ব্ব দীপেতে অভেদ॥
তথাপি মূল অগ্নির যৈছে হয় প্রাধান্যতা।
তৈছে সর্ব্বেশ্বর হরি সকলের ধাতা॥
হরিকে ভজিলে জীবের মায়া লোপ হয়।
সেই লোভে মুঞি কৈলোঁ হরিপদাশ্রয়॥ ৯॥

উদ্ধৃত অংশে কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতের প্রভাব সুপষ্ট। গ্রন্থ মধ্যে এইজাতীয় হস্তক্ষেপ কিছু কিছু আছে।

নীলাচলে ঈশান একদিন মহাপ্রভুর পাদসংবাহনের সৌভাগ্যলাভ করিয়াছিলেন সেই উপলক্ষ্যে ঈশান শ্রীচৈতন্যের নিকট কিছু উপদেশ লাভ করেন।

তবে মুঞি কীট হর্ষে কহিনু চৈতন্যে। দয়া করি কহ কিছু এই ভক্তিশূন্যে॥

সহাস্যে মধুরভাষে গৌরাঙ্গ কহিলা। শুনহ ঈশান শাস্ত্র যাহা প্রকাশিলা ॥
সাধুস্থানে করিবে সদ্ধর্ম্মের শিক্ষণ। সর্ব্বধর্ম্মশ্রেষ্ঠ হরিনামসঙ্কীর্ত্তন ॥
তপ জপ হৈতে নামের মহিমা প্রচুর। নাম লৈলে সর্ব্ব অপরাধ যায় দূর ॥
প্রকৃতিসম্ভাষা উদাসীনের ধর্ম্মনাশ। নানা দেবসেবীর কৃষ্ণে না হয় বিশ্বাস ॥ ১৮ ॥

মহাপ্রভুর তিরোধান অন্তরে অনুভব করিয়া প্রায় শতবর্ষবয়স্ক সুবৃদ্ধ অদ্বৈত প্রভুর মনে যে বিকার উপস্থিত হইয়াছিল, তাহা ঈশান অতি স্বল্পাক্ষরে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহার মধ্যে বাৎসল্যরসের করুণতা অপূর্ব্বভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

হেথা মোর প্রভু অলৌকিকভাবাবেশে। মহাপ্রভুর অপ্রকট বুঝিলা মানসে ॥
দিব্যোন্মাদ হৈল প্রভুর নাহি বাহ্যজ্ঞান। নিমাঞি নিমাঞি বুলি করয়ে আহ্বান ॥
ক্ষণে কহে আয় রে নিমাই পুস্তক লইয়া। গৃহকৃত্য আছে ঝাট যাও পড়াইয়া ॥

ক্ষণে কহে তোর জারি-জুরি মুঞি জানি।
কার ভাবে গৌর হৈলি কহ দেখি শুনি ॥
ক্ষণে কহে নিমাঞি তুহুঁ রহ মোর ঘরে।
শচী মায়ের দুঃখ হৈব গেলে দেশান্তরে ॥ ২১ ॥

ঈশান নাগরের বৈষ্ণবোচিত দৈন্যোক্তি কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর লেখাকে বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দেয়।

যাহা দেখি তাহা লিখি না বুঝিনু মর্ম্ম।
হৈছে শুক গীত গায় শিক্ষণের ধর্ম্ম ॥ ২১ ॥

সওয়া শত বর্ষ প্রভু রহি ধরাধামে। অনন্ত অর্ব্বুদ লীলা কৈলা যথাক্রমে ॥
সে লীলা অমিয়সিন্ধু দুর্গম্য দুষ্পার। অনন্ত না পায় অন্ত মুঞি কোন ছার ॥
আত্মশোধিবারে এই দুঃসাহস কৈলু। লীলাসিন্ধুর একবিন্দু ছুঁইতে নারিনু ॥

বিদ্যা বুদ্ধি নাহি মোর কৈছে গ্রন্থ লিখি।
কি লিখিতে কি লিখিনু ধরম তার সাখী ॥ ২২ ॥
মুঞি অতি বৃদ্ধ মোর নাহি কিছু জ্ঞান।
শ্রীচৈতন্যপদে গ্রন্থ কৈনু সম্প্রদান ॥ ২২ ॥

হরিচরণদাস নামে অদ্বৈত প্রভুর অথবা তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র অচ্যুতানন্দের এক শিষ্য অদ্বৈত প্রভুর একখানি জীবনী লিখিয়াছিলেন। গ্রন্থটির নাম অদ্বৈতমঙ্গল।[১] অচ্যুতানন্দের ও অন্যান্য ভক্তের আদেশে হরিচরণদাস এই জীবনীকাব্যটি রচনা করেন।

আমি ক্ষুদ্র জীব হইয়া কি বর্ণিতে পারি ইহা,
শ্রীঅচ্যুতানন্দ-আজ্ঞা মানি।
প্রভুর পুত্র যব শিষ্য আদি যত সব
তাহে আমি ক্ষুদ্র অভিমানি॥

কাব্যটি পাঁচ অবস্থায় এবং তেইশ সংখ্যায় বিভক্ত। প্রথম অবস্থায় চারি সংখ্যা, দ্বিতীয় অবস্থায় দুই সংখ্যা, তৃতীয় ও চতুর্থ অবস্থায় চারি চারি সংখ্যা, আর পঞ্চম অবস্থায় নয় সংখ্যা। 'অবস্থা' ও 'সংখ্যা' এই বিভাগ নূতন বটে। পাঁচ অবস্থায় যথাক্রমে বাল্য, পৌগণ্ড, কৈশোর, যৌবন ও বার্দ্ধক্য বয়সের লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

হরিচরণদাস বিজয়পুরীর নিকট অদ্বৈত প্রভুর বাল্যচরিত অবগত হন। কবি অদ্বৈত প্রভুকে বৃদ্ধাবস্থায় দেখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার ভাবনা হইল যে আচার্য্যের বাল্যচরিত না জানিয়া কি করিয়া তিনি জীবনীরচনায় হস্তক্ষেপ করেন। এই সমস্যার সমাধান কি করিয়া ঘটিল তাহা কবি এইরূপে বর্ণনা করিয়াছেন,

জন্মলীলা দেখিছে কেবা শুনিব কার স্থানে।
মনেতে ভাবনা করি প্রভুপদধ্যানে॥
পুত্রভৃত্য লইয়া প্রভু আছেন সভা করি।
ইতিমধ্যে আইলা তথা বিজয় নাম পুরী॥

১। ব-সা-প-প ৩, পৃ ২২৫-২৬৭। একটি পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাগারে আছে। এইপুঁথি অবলম্বনে বর্ত্তমান আলোচনা করা যাইতেছে। পুঁথিটি ১৭১৩ শকে অনুলিখিত। ব্রজসুন্দর সান্ন্যালের সম্পাদকতায় ১৩০৮ সালে প্রকাশিত অদ্বৈতমঙ্গলের একখণ্ড দেখিয়াছি। এই খণ্ডটিতে প্রথম তিন পরিচ্ছেদ মাত্র আছে। বাকী খণ্ডগুলি সম্ভবতঃ প্রকাশিত হয় নাই। মুদ্রিত পুস্তকে 'সংখ্যা' বিভাগ নাই।

বৃদ্ধ সন্ন্যাসী সেহি মুখে কৃষ্ণ নাম।
কাঞ্চনশরীর হয় দিব্য তেজোধাম॥
গোসাঞি দেখিয়া প্রভু সম্ভ্রমে উঠিয়া।
সম্ভাষা করিয়া তথা চরণে পড়িয়া॥
সভার অগ্রেতে পুরী কহিতে লাগিলা।
প্রভুর ইঙ্গিত জানি বস্তুত কহিলা॥
ছিলট্ট দেশেতে হয় নবগ্রাম নাম।
বিমল নির্ম্মল হয় আত্মারাম-ধাম॥
* * *
সেহি গ্রামবাসী আমি ছিলাম পূর্ব্বাশ্রমে।
মহানন্দের পুরোহিত পিতা গুরুতুল্য মানে॥
নাভা দেবী ভাঞিঁ মোরে বোলে সর্ব্বকাল।
আমিহ ভগিনীপ্রায় করিএ তাহার॥
সেহি সম্বন্ধে মামা কহে প্রভু যে আচার্য্য।
আমি পূর্ব্বাপর জানি সব ইহার কার্য্য॥
একান্ত করিয়া শুন সবে মন দিয়া।
অদ্বৈতজন্ম এবে কহি বিবরিয়া॥

এখানে 'প্রভু' শব্দে আচার্য্য প্রভুকে বুঝাইতেছে। সম্ভবতঃ হরিচরণদাস আচার্য্য প্রভুর বর্ত্তমানকালে কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন। কবি-কর্ণপূরের গ্রন্থ ছাড়া হরিচরণদাস আর কোন চৈতন্যজীবনী গ্রন্থের উল্লেখ করেন নাই।

এক মহাপ্রভু আর প্রভু দুইজন। অদ্বৈতচরিত্র কিছু করিব বর্ণন॥
শ্রীচৈতন্যলীলা বর্ণিলা কবি-কর্ণপূর। তাহে নিত্যানন্দলীলা রসের প্রচুর॥
অদ্বৈতপ্রভুর আদি অন্ত্যলীলা কিছু। বর্ণন করিব সর্ব্ব করি আগু পিছু॥

অদ্বৈতমঙ্গলের মধ্যে গ্রন্থকারের আর কিছু পরিচয় মিলে না। তবে অদ্বৈত প্রভুর বাল্যলীলা বিষয়ে কিছু কিছু নূতন সংবাদ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বলিতে পারি, অদ্বৈতপ্রভুর জ্যেষ্ঠ চারি জন ভ্রাতা সন্ন্যাস গ্রহণ করিয়াছিলেন।

চারিপুত্র সন্ন্যাস করি গেলা তীর্থপর্য্যটনে।
পুন না আইলা তারা কুবেরভুবনে॥

গ্রন্থের শেষে হরিচরণদাস এইরূপ 'অনুবাদ' দিয়াছেন[১]—

প্রথম সংখ্যায় হয় গুর্ব্বাদিবর্ণন। কৃষ্ণলীলা-অনুক্রম বস্তুনিরূপণ॥
দ্বিতীয় সংখ্যায় পঞ্চ অবস্থার সূত্র। বিজয় পুরী আগমন পরম পবিত্র॥
তৃতীয় সংখ্যায় বিজয় পুরীর সংবাদ। শ্রীভাগবত-অর্থ প্রভুর আস্বাদ॥
প্রেমে গদগদ পুরী দুর্ব্বাসা সাক্ষাৎ। শ্রীমাধবেন্দ্র-সতীর্থ হয় যে সাক্ষাৎ॥
চতুর্থ সংখ্যাতে প্রভুর জন্ম কহিলা বিজয় পুরী।
রাজপুত্রকে কৃপা কৈল শান্তিপুর-বিহারী॥
প্রথম অবস্থা চারি সংখ্যায় লিখিলা। বিজয় পুরী সংবাদ তাহাতে জানিলা॥
পঞ্চম সংখ্যায় রাজদণ্ড বর্ণন করিল। শ্রীহট্ট দেশের রাজা বৈষ্ণব হইল॥
এহি রাজা ছিল বৈষ্ণবদ্বেষী বড়। বৈরাগী হইয়া প্রভুর কৃপা দঢ়॥
শ্রীবৃন্দাবনে সিদ্ধিবট প্রাপ্তি হৈল তার। তাহার ভাগ্যের কথা কি লিখিব আর॥
ষষ্ঠ সংখ্যায় প্রভুর শান্তিপুরগমন। শ্রীহট্ট দেশ ছাড়িয়া আইলা ততক্ষণ॥
শাস্ত্র অধ্যয়ন আরম্ভ … …। শাস্ত্রে বিখ্যাত প্রভু কভু নহে ভঙ্গ॥
এই দুই সংখ্যা দ্বিতীয় অবস্থা বর্ণন। পৌগণ্ডলীলার ক্রম জানিল সর্ব্বজন॥
দুই অবস্থায় হৈল চতুঃসংখ্যা লিখন। এবে কৈশোর অবস্থা শুন সর্ব্বজন॥
সপ্তম সংখ্যায় প্রভুর শ্রীবৃন্দাবনগমন। মাতা পিতার পরলোক তাহাতে বর্ণন।
বৈদিক ক্রিয়া গয়াপিণ্ড যতেক বিধান। সকল করিয়া প্রভুর বৃন্দাবনভ্রমণ॥
অষ্টম সংখ্যায় শ্রীমদনগোপাল প্রকট। সূর্য্যঘাট কুঞ্জ প্রকট তাহার নিকট॥
শ্রীমদনগোপাল প্রকটি আজ্ঞা তার হৈল। প্রকট করিয়া গোপাল সত্য করিল॥
পূর্ব্বরাগস্বরূপ তবে মদনমোহন। বিস্তারি কহিলা প্রভু তাহার কারণ॥
গোপাল-আজ্ঞায় প্রভু আসিলা শান্তিপুরে শান্তিপুরে তপস্যা করেন প্রচুরে॥
নবম সংখ্যায় শ্রীমাধবেন্দ্র সংবাদ। দীক্ষাবিধান প্রভুর তাহাতে বিখ্যাত।
শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র রহিলা শান্তিপুর। গোবর্দ্ধনে গোপাল প্রকট রসপূর॥

১। ব-স-প-প ৩, পৃ ২৬০-৬৪।

দোঁহার দ্বারে দোঁহা প্রকট হইলা ॥ দোঁহার আনন্দ বড় প্রেম উথলিলা ॥
দশম সংখ্যায় দিগ্‌বিজয়ি-বিজয়। অদ্বৈত নাম প্রকট তাহাতে যে হয় ॥
প্রভু কৃপায় দিগ্‌বিজয়ী হইলা প্রধান। প্রভুর স্বরূপ দেখিল করিয়া বিধান ॥
চতুর্ভুজ দেখিয়া স্তুতি অনেক করিলা। প্রভুর কৃপার পাত্র বিশেষ হইলা ॥
এই চারি সংখ্যায় কৈশোরলীলা বর্ণন। তৃতীয় অবস্থা প্রভুর যে লিখন ॥
তিন অবস্থায় সংখ্যা হইল দশ। এবে কহি চতুর্থ অবস্থা নির্দ্দেশ ॥

একাদশ সংখ্যায় কৃষ্ণদাস ব্রহ্মচারী।
স্বরূপ কহিলা তারে শান্তিপুর-বিহারী ॥

কৃষ্ণদাস প্রভুর বড় কৃপাপাত্র। তাহার লিখনে জানিল সব তত্ত্ব ॥

অজান্ত (?) পর্য্যন্ত প্রভুর সেবা যে করিলা।
বৃন্দাবনের সঙ্গী তেঁহো শান্তিপুর আইলা ॥

দ্বাদশ সংখ্যায় দেব মোহ পাইয়া। ব্রহ্মার নিকটে গেলা সঙ্কোচিত হইয়া।
অপ্সরায় মোহিতে নারিল প্রভুরে। ব্রহ্মার আজ্ঞায় দেব আসি পূজা করে ॥
ব্রহ্মা আসি হরিদাস-জন্ম লভিলা। হরিদাসের ঐশ্বর্য্য প্রভু বিস্তার করিলা ॥
ত্রয়োদশ সংখ্যায় প্রভুর অন্তর্দশা বর্ণিল। যাহাতে জানিল কুঞ্জ-সেবা হইল ॥
রাধাকৃষ্ণ দোহা সেবা বিরলে করি। অভিপ্রায় জানাইল প্রেম আচরি ॥
শ্যামদাসের পূর্ব্বে যে অবস্থা কহিল। প্রভুর কৃপায় তাহা একান্ত হইল ॥
কীর্ত্তন করিয়া সুখ দেন শ্যামদাস। আর কত শাখা বর্ণিল আভাস ॥
চতুর্দ্দশ সংখ্যায় শ্রীনাথ সংবাদ। রূপ সনাতন দোঁহাকে প্রভুর প্রসাদ ॥
দোঁহার দ্বারে যে কার্য্য করিবেন প্রভু ক্রম করি করিলা সব অপেক্ষা মহাপ্রভু ॥
এহি চারি সংখ্যায় যৌবনলীলা। চতুর্থ অবস্থা যাহারে কহিলা ॥
চারি অবস্থায় চতুর্দ্দশ সংখ্যার গণন। ক্রম করি জানিবেন সবে দিয়া এক মন ॥
পঞ্চদশ সংখ্যায় প্রভুর বিরহ বর্ণন। সীতার পরিণয় হইল অপূর্ব্ব কথন ॥
তাহার কনিষ্ঠ শ্রী ঠাকুরাণী। পিতা আনিয়া প্রভুকে দিল আপনি।

শিষ্য প্রসাদ পাএ গুরু সঙ্গে বসি। কেশ খসিল প্রভুর অন্ন পরিবেশি ॥
দুই হস্তে পরিবেশি আনি হাতে ধরি। আর দুই হস্তে চুল বান্ধিল প্রচারি ॥
চতুর্ভুজে প্রকাশ দেখাই[য়া] সবে। চমৎকার পাইল সবে ··· ··· ॥
ষোড়শ সংখ্যায় সীতাদেবীর দীক্ষা। সর্ব্বতত্ত্ব কহিলা প্রভু করাইল শিক্ষা ॥
আপনার স্বরূপ জানাইলা সীতার স্বরূপ। সীতা ঠাকুরাণীর শিষ্য সীতার অনুরূপ।
সপ্তদশ সংখ্যায় বর্ণিল নিত্যানন্দজন্ম। বলদেব নিত্যানন্দ জানাইল মর্ম্ম ॥
দৈত্যকে কৃপা করি নিত্যানন্দ রায়। গঙ্গার মাহাত্ম্য দেখাইল সবায় ॥
অষ্টাদশ সংখ্যায় লিখি মহাপ্রভুর জন্ম। অদ্বৈত হুঙ্কারে সব কাঁপিল ব্রহ্মাণ্ড ॥
হুঙ্কার করিয়া আনিয়া ব্রজেন্দ্রনন্দন। রাধাকৃষ্ণ দোঁহা এক শচীর নন্দন ॥
তাহারে সেব্য করি আপনে সেবিলা। মহাপ্রভুর আজ্ঞায় শচীকে দীক্ষা দিলা
ঊনবিংশতি সংখ্যায় প্রভু জললীলা করিলা। রাধিকার জ্যেষ্ঠ সখী সীতাকে জানাইলা ॥
রাধিকার পক্ষ প্রভু কনিষ্ঠ সখী হৈয়া। নিত্যলীলা যবে সখী জানাইলা ॥
কামদেবের সৌভাগ্য প্রভুর কৃপাপাত্র। অষ্টক করিয়া প্রভুকে বর্ণিল যে তত্ত্ব ॥
বিংশতি সংখ্যায় প্রভুর বদন প্রকট। সীতাকে দেখাইলা মহাপ্রভু বড়ই সঙ্কট ॥
মহাপ্রভুর লাগিয়া দুগ্ধ রাখিয়াছিলা সীতা। অচ্যুতানন্দ খাইল দুগ্ধ হইয়া বিস্মৃতা ॥
চাপড় মারিলা সীতা অচ্যুতের গায়। মহাপ্রভুর গায় সেহি দাগ লাগি রয় ॥
দোঁহার শরীর এক দেখাইবা তাকে। পৌগণ্ডলীলা শান্তিপুর দেখাইলা সবাকে ॥
একবিংশতি সংখ্যায় অদ্বৈত বর্ণিল। চৈতন্য-দণ্ডপাত্র আপনে হইল ॥
দণ্ড দিয়া মহাপ্রভু লজ্জিত হইলা। অদ্বৈতের ঐশ্বর্য্য গৌরীদাস দেখিলা ॥
সেহি জন অদ্বৈতের সেহি মোর প্রাণ। মহাপ্রভুর আজ্ঞা সত্য সত্য জান ॥
দ্বাবিংশতি সংখ্যায় অদ্বৈত গৃহে ভোজন। সীতার ঐশ্বর্য্য মহাপ্রভুর প্রচারণ ॥
একলে সীতা অনেক প্রকাশ হইলা। সবাকে পরিবেশে প্রভু ঈষদ্ জানিলা ॥
অদ্বৈত-ভাণ্ডার অক্ষয় মহাপ্রভু কহিলা। ভোজনবিলাস তিন প্রভু অনেক করিল।
ত্রয়োবিংশতি সংখ্যায় দানলীলা শান্তিপুর। তিন প্রভু দেখাইলা রসের প্রচুর ॥
পূর্ব্ব মত উঘাড়িয়া দেখাইলা তাকে। শান্তিপুর এহি লীলা বন্দিলা লোকে ॥
পঞ্চম অবস্থা প্রভুর নব সংখ্যায় বর্ণিল। সর্ব্বতত্ত্ব বিংশতি সংখ্যায় লিখিলা ॥

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ অদ্বৈত সীতা। শ্রীগুরু বৈষ্ণব ভাগবত গীতা।
শ্রীশান্তিপুরনাথপাদপদ্ম করি আশ। অদ্বৈতমঙ্গল কহে হরিচরণদাস॥

নবদ্বীপ বর্ণনা এইরূপ—

জম্বুদ্বীপ মধ্যে হয় নবদ্বীপ গ্রাম। শ্রীবৃন্দাবন প্রায় গুণবন্ত ধাম॥
তথা যমুনা বেষ্টিত অর্দ্ধচন্দ্র। তথা বহে গঙ্গা যে সেহি প্রায় ছন্দ॥
গঙ্গা যমুনা দোহে আছে একে স্থাই। কভু এক যায় তথাই॥
বড় বড় ব্রাহ্মণ দেশে দেশে আসি। নবদ্বীপ বাস করে হইয়া তপস্বী॥
মহাদেব ক্ষেত্রপাল লিঙ্গরূপে রহে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য সবে পূজে তাহে॥

শান্তিপুরের বর্ণনা—

শান্তিপুর গ্রাম বন্দিএ যতনে। তাহাতে প্রভুর লীলা হয় রাত্র দিনে॥
চারি ক্রোশ শান্তিপুর গঙ্গা দুই পাশে। বন্দনের শ্রেণী সব গঙ্গাতে ভাল ভাসে॥
নারিকেল দুই পাশে জঙ্গল সারি সারি। অনুত্তম বৃক্ষ মধ্যে তাহাতে আচরি॥
খাজুর তলাতে হয় ছায়া মনোহর। রত্নে রুচির যেন হয় কলেবর॥
বিপ্র সব বসি করে প্রভুর বেষ্টিত। বড় বড় তপস্বী প্রাচীন বিদিত॥
গ্রীষ্মকালেতে সব শান্তিপুর নিকটে। সন্ধ্যার সময় সবে বৈসে গঙ্গার তটে॥

তিন প্রভুতে মিলিয়া শান্তিপুরে দানলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন। এই কাহিনীটিই হরিচরণদাসের গ্রন্থে বর্ণিত শেষ লীলা। তাহার পরেই গ্রন্থের অনুবাদ অর্থাৎ contents দিয়া অদ্বৈতমঙ্গলের পরিসমাপ্তি হইয়াছে। মহাপ্রভু শান্তিপুরে দানলীলার অভিনয় করিয়াছিলেন বলিয়া অন্যত্র কোথাও উল্লেখ করা হয় নাই। নবদ্বীপে চন্দ্রশেখর আচার্য্যের গৃহে শ্রীচৈতন্য একদা দানলীলার অভিনয়ে রাধিকার ভূমিকা লইয়া নামিয়াছিলেন। কিন্তু অভিনয় কিছু দূর অগ্রসর হইতে না হইতেই প্রেমাবেশের মত্ততায় তাঁহার মনে রুক্মিণীর ভাব আসিয়া পড়ে, সুতরাং দানলীলার অভিনয় আর সম্পূর্ণ হইতে পারে নাই। এই অভিনয়ের ব্যাপার চৈতন্যভাগবত, চৈতন্যচরিতামৃত, চৈতন্যচন্দ্রোদয় প্রভৃতি প্রায় সকল চৈতন্যজীবনীগ্রন্থেই উল্লিখিত হইয়াছে। নবদ্বীপের অভিনয়ে শ্রীকৃষ্ণের ভূমিকায় অদ্বৈত প্রভু এবং বড়াইয়ের ভূমিকায় নিত্যানন্দ প্রভু অবতীর্ণ

হইয়াছিলেন, আর শ্রীচৈতন্য স্বয়ং রাধার ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরিচরণ-দাসের বর্ণিত অভিনয়েও ঠিক তাহাই।

এই দানলীলার বর্ণনাটি খাঁটি দানলীলা নহে, ইহাকে দানলীলাযুক্ত নৌকা-বিলাসলীলা বলা যাইতে পারে। শ্রীরূপ গোস্বামীর দানকেলিকৌমুদী উল্লিখিত দানলীলার সহিত ইহার বিশেষ কিছু সঙ্গতি নাই। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত অন্যতম দানলীলাকাহিনী হিসাবে হরিচরণদাসের বর্ণনার কিছু মূল্য আছে। অদ্বৈতমঙ্গল একরকম অপ্রকাশিত বলিয়া এই দানলীলা অংশটি দীর্ঘ হইলেও এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। যে পুঁথি অবলম্বনে এই আলোচনা করা যাইতেছে তাহা স্পষ্টতঃ একটি সুপ্রাচীন পুঁথির অর্ব্বাচীন অনুলিপি মাত্র; লিপিকার অনেকস্থলেই মূল পুঁথির প্রকৃত পাঠ উদ্ধার করিতে পারেন নাই। মধ্যে মধ্যে এত বাদ পড়িয়াছে যে, তাহাতে মনে হয় মূল পুঁথি কীটদষ্ট অথবা অন্যরূপে অসম্পূর্ণ ছিল।

একদিন শান্তিপুরে তিন প্রভু বসি। পূর্ব্ব ভাবিয়া দানলীলা যে প্রকাশি॥
শান্তিপুরের শোভা দেখিয়া তিন প্রভু। গোকুলনগরজ্ঞান বোলে মহাপ্রভু॥
অদ্বৈত প্রভু হইলা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপ। মহাপ্রভু হইলা রাধিকার রূপ॥
নিত্যানন্দ প্রভুকে করিলা বড়াই বুড়ী। শ্রীবাস আদি সখী এ হইলা বড়ি॥
সখা হইলা কমলাকান্ত আর কত জন। গৌরীদাস নরহরি সুবল মধুমঙ্গল॥
এহি সব সখা হইয়া নটবর বেশ। গাবী লইয়া চরায় গোচারণ দেশ॥
সখী সঙ্গে রাধিকা বেশভূষণ পরিয়া। পসার সাজাইয়া লইলা সখীমাথে দিয়া॥
ললিতা বিশাখা তাহে হৈল অগ্রগণ্য। আর সব সখী বেষ্টিত পশ্চাৎ অরণ্য॥
শত শত সঙ্গে রহে সেহি সব লোক। দেখিয়া বিস্মিত হইল গেল সব শোক॥
শান্তিপুরের শোভা কহন না যায়। গঙ্গা যমুনা রহে মহাশোভা হয়॥
সেহি গঙ্গাতীরে এক বৃদ্ধ নৌকা আনি সিন্দূর চন্দন দিয়া পূজে নৌকাখানি॥
তাহার তীরেতে হয় কদম্ববৃক্ষ এক। বৃক্ষের তলাতে কৈল যে পৃথক্॥
সিন্দূরচন্দনে ঘট বেদীর উপর। মালা বেষ্টিত কৈল তাহার চৌতর॥
সখা সব লইয়া কৃষ্ণ গেলা সেই খানে। শিঙ্গা বেণু মুরলীর ধ্বনিআ কাণে॥

গাবী সব চরিতে গেলা গঙ্গাতীরবনে। কদম্বতলাতে কৃষ্ণ সব সখাগণে॥
লগুড়ে লগুড়ে খেলা কৈল কতক্ষণ। হেনকালে দেখে দূরে রাধিকার গণ॥
খেলা ছাড়ি কদম্বতলাতে দাঁড়াইল। রাধিকারে মাঝে আগে বড়াই সাজাইল॥
সখি সঙ্গে রাই আইসে পসার সাজাইয়া বিজুরি চমকে যৈছে নবঘন দেখিয়া॥
ত্রিভঙ্গ হইয়া মুরলী পূরে কদম্বতলাএ। সখা সঙ্গে আশপাশ মন্দ বেণু বায়ে॥
হেন কালে বড়াই আইলা রাধিকা সমাজে। পথ আগরিয়া যাএ যত সখা রাজে॥
কোথাকার এহি তোমরা হও কেবা। কহ নিশ্চয় করি পসারে আছে যেবা॥
বড়াই কহে গোপী আমরা মথুরার সাজ। দধি দুগ্ধ ছানা ক্ষীর বিকির সমাজ॥
সুবল কহে এহি ঘাটে কেনে তুমি আইলা। এ ঘাটে নূতন রাজা দান লাগাইলা॥
তাহাতে তোমার সঙ্গে যুবতী অনেক। ইহার যেমত দান পৃথক লাগিবেক॥
ঘাটের সরদার এহোঁ নবঘনশ্যাম। আমরা হইএ ইহার অঙ্গ অনুপাম।
ঘাটি চুকাইয়া চল পার করি দিব। নহে ত পসার আজি লুটিয়া খাইব॥
সখাব বচন শুনি হাসিতে হাসিতে। বসিলা বড়াই বুড়ী কাশিতে কাশিতে॥
তবে কৃষ্ণ সম্মুখে আইলা মুরলী বেত্র হাথে। রাধিকার পানে চাহি কহে সখী সাথে॥
শুনহ যুবতী তোমরা আমার বচন। এথা দান দিয়া চল নৌকার সদন॥
তোমা সভাকার দান লাগিবেক ভারি। প্রচুর লইব দান তবে পার করি॥
ললিতা সম্মুখে আসি [তবে ত] কহিলা। কি দান লইব এবে কহ নন্দবালা॥
নিতি নিতি আসি যাই আমরা বিকিতে। কভু নাহি জানি আমরা এমত চরিতে॥
সব অধিকার ছাড়ি হইলা ঘাটিআল। ইহাতে পালিবা লোক করিয়া সামাল॥
চারি চারি কড়া কড়ি পাইবা প্রতি জনে। পসারে আট কৌড়ি অনেক যতনে॥
ইহাতে অপযশ কর রাজপুত্র হইয়া। বিলম্ব না কর দেও পার করিয়া॥
এ বোল শুনিয়া কৃষ্ণ সাটোপ করিয়া। রাধিকারে কহে বলি সমুখে জানাইয়া॥
সহজ ঘাটের দান শুন গোআলিনী। চারি চারি মনুষ্যে লাগে রজত মুদ্রা জানি॥
দুই পসারে দান মুদ্রা এক হয়। দ্বিগুণ চাহিয়ে এবে শুন সখীচয়॥
তাহাতে যুবতী তোমরা পুষ্টনিতম্বিনী। কুচ যুগ ভারি বড় এহি গোয়ালিনী॥

দুই কাহন কৌড়ী দান এক এক যুবতী। মুখ দেখাইতে কৌড়ী বাড়াইতে নাহি।
জীর্ণ নৌকাখানি মোর যমুনা তরঙ্গ। এক এক করি পার করিব এহি গঙ্গ॥
তত কাল দেও দান বিলম্ব না কর। নহে মৃগনয়নী থুইয়া তোমরা চল॥
ইহার অলঙ্কার যত শরীরে ত হয়। ভারতে ইহার বুঝি নৌকা ডুবায়॥
দেখ দেখ এহি হার বোঝা বড় হয়। ছল করি ভঙ্গি করি কৌতুক বাড়ায়।
তবে রাধা হাতে * *। বড়াই বুড়ীর আগে তর্জ্জন আচারি॥

আগ বড়াই, ঠেকিল বিষম দানীর হাতে॥

কেনে আনিল আমাকে, কি জানি আমার কথা,
এহি দানী হয় বড় দুষ্ট।
আমরা অবলা নারী, করে নানা চাতুরী,
হাসি হাসি কহে বাত মিষ্ট॥
আগ বড়াই, এ পথে বসিল দানী কবে॥
এ মত জানহ যদি ঘরে বসি বেচিত দধি,
মথুরাতে আছে কিবা কাজ।
দধি কটু হইয়া যায়, দুগ্ধ নষ্ট বড় দায়,
বিলম্বে নাহি এবে ব্যাজ॥
বিষম [দানীর হাথে] ঠেকাইলা তুমি সাথে,
উচ্চকুচ মাগে বহু দান।
নিতম্ব দেখিয়া বড় তেরছা নয়ান দড়,
দ্বিগুণ করে তার মান॥
তেরছা নয়ানে চাহে, চঞ্চল নয়ানে কহে,
কিবা আছে ইহার মনে জানি।
দানী হইয়া ঘরে রহে এত কভু দানী নহে,
আসিয়া আঁচল ধরি টানি॥
চারি কৌড়ী পায় যায় দশ পণ চাহে তায়,
পসারে কহে [ত] দ্বিগুণী।

অবিচার যত করে সঙ্গী তার হাসি মরে
এই বড় মনে ভয় মানি ॥
ভাঙ্গা নৌকা ঘাটে দেখি .... লিখি,
[এক]বারে পার নহে সভারে।
একে একে পার করে, বিচার সবে করে,
সঙ্গী তার হাসি হাসি মরে ॥
শুন গো বড়াই তুমি, পরে যাইব আমি,
তোমারে সঁপি দানীর হাতে।
যেমন আনিলা তুলি তোমার যোগ্য হয় জানি,
এহি মোর হএ মনোরথে ॥
বড়াই হাসিয়া বোলে, ভয় কর কেনে মনে,
আমি আছে তোমার সহায়।
নন্দের নন্দন এহি, নতুন দানী হএ সেহি,
তোমারে দেখিতে করে ভয় ॥
তোমারে আগেত ধরি পিছে যাবে সহচরী,
তার পরে পসার উঠিবে।
লগুড় হাতে ত করি আমি সব পাছে হেরি,
চিন্তা না করিয় কিছু এবে ॥
এ বড় সঙ্কট পসার নাহিএ বট,
দান কই মাগে অধিকাই।
তুমি যদি ফিরি চাহ দণ্ড তবে নাহি দেও,
ভাবিয়া দেখ না মনে যাই ॥
শুন-সিয়া ললিতা সখী, হাসিয়া কহে না দেখি,
বড়াই কহিল পরমাণে।
হরিচরণদাসে কহে, বড়াইর মন এহি নএ
কানাই করে সেই অনুমানে ॥

বড়াইর বচন শুনি নন্দের কুমার। আসি নমস্কার করে পরম আদর ॥
বড়াইর আজ্ঞা লঙ্ঘ সঙ্কট হইবে। পসার লুটা যাবে আর বস্ত্র হরিবে ॥
শুনগো বড়াই তুমি যাও সখী লৈয়া। পার করিয়া দিয়ে এক এক করিয়া ॥
এহি যুবতী হয় মৃগনয়ানী। নিতম্ব পুষ্ট বড় কুচের বলনি ॥
ইহার ভারে ডুবিবেক নৌকার সব নারী। ইহারে রাখিয়া যাও দানে বন্ধ ধরি।
আমি [রহিব] ইহার পহরী হইয়া। চিন্তা না করিয় কিছু মনেতে ভাবিয়া ॥
এতেক বচন শুনি সখী সঙ্গে রাই। ঘুরি চল সবে যাই ওপার না যাই ॥
তবে সখা লৈয়া কৃষ্ণ চৌদিগ বেড়িলা। কিসের পসার দেখি পসার ধরিলা ॥
পসার ধরিয়া নৌকাএ চড়াইলা। নৌকাএ যুবতী সভারে বসাইলা ॥
জানু-জলে যাই নৌকা ডুবিতে লাগিল। দধি দুগ্ধ সব খাএ পসার লুটিল ॥
তবে জলে জলবিহার করিলা অনেক। সখাসখী একত্র হইয়া এক ॥
তিন প্রভু এক হইয়া প্রেম উথলিল। প্রেমে অচৈতন্য হইয়া জলেতে পড়িল ॥
ভক্তবৃন্দ সব তিন প্রভু উঠাইয়া লৈয়া। তীরে বসিলা সবে স্নান ত করিয়া ॥
শ্রীনিবাস নরহরি আর শ্যামদাস। মুরারি মুকুন্দ আর বৈদ্য কৃষ্ণদাস ॥
সবে কীর্ত্তন করে গোকুলের দান। দান ছলে প্রেম হইল নহে অসমান।
কতক্ষণে তিনের অন্তর্বাহ্য দশা। গলাগালি ধরি কান্দে মুখে নাহি ভাষা ॥
চল দাদা যাই মোরা সেই বৃন্দাবনে। পরস্পরে তিনজনে করএ রোদনে ॥
ভক্ত সবে প্রভুর বাক্য শুনি হইল বিমন। অপ্রকট করিবা প্রভু লএ সভার মন ॥
ভক্তের জীবন তিনের বাহ্যদশা হইল। হুঙ্কার বলিয়া অদ্বৈত গর্জ্জিয়া উঠিল ॥
মহাপ্রভু নৃত্য করিলা নিত্যানন্দ সাথ। হরি হরি বোলে অদ্বৈত মাথে দিয়া হাথ ॥
অনেক নৃত্য হইল শ্রম হইল বড়। শ্রম দেখি শ্যামদাস চরণে পড়িল ॥
নৃত্যসম্বরণ করি সবে চলি আইলা। অনেক শুশ্রূষা করি শ্রম দূর করিলা।
এহি যে লিখন প্রভুর শান্তিপুরলীলা। মথুরাবিরহ হৈল অন্তর-বিভোলা ॥
প্রভুর যতেক লীলা তার এক কণ। প্রভুর নন্দনের আজ্ঞাএ লিখন যতন ॥[১]

১। ব-সা-প পুঁথি ২৬৬, পৃষ্ঠাঙ্ক ৯৪-৯৮

নরহরিদাস রচিত অদ্বৈতবিলাসের একটী খণ্ডিত পুঁথি আছে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে।[১] প্রাপ্ত অংশে শুধু বাল্যলীলা আছে। ভণিতা এইরূপ—

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম আশা করি।
অদ্বৈতবিলাস কহে দাস নরহরি॥

নরহরির অদ্বৈতবিলাস বীরেশ্বর প্রামাণিক কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছিল।[২] এই মুদ্রিত গ্রন্থ দেখিতে পাই নাই।

অদ্বৈত প্রভুর ভার্য্যা সীতাদেবীর জীবনীবিষয়ে একটি ক্ষুদ্র গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন লোকনাথদাস। ইনি অদ্বৈত প্রভুর শিষ্য লোকনাথ চক্রবর্ত্তী কিনা তাহা বলা সুকঠিন। তবে গ্রন্থকার যে অদ্বৈত প্রভুর অথবা সীতাদেবীর শিষ্যানুশিষ্য ছিলেন তাহাতে সন্দেহ করিবার হেতু নাই। গ্রন্থটির নাম শ্রীসীতাচরিত্র।[৩]

এই নিতান্ত স্বল্পকায় গ্রন্থটিতে জ্ঞাতব্য বিষয় বড় কিছুই নাই।০ শচীদেবীর পরিচারক ঈশানের বিষয়ে কিছু নূতন জ্ঞাতব্য কথা আছে, আর আছে সীতাদেবীর দুই শিষ্য বা শিষ্যা নন্দিনী ও জঙ্গলীর ইতিহাস ও মাহাত্ম্য বর্ণন। সীতাচরিত্রে বৃন্দাবনদাস ও তাঁহার গ্রন্থের একাধিকবার উল্লেখ আছে।[৪] গ্রন্থারম্ভ শ্লোকটি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে গৃহীত। এই শ্লোকটির অনুবাদ দিয়াই মূল গ্রন্থের সূচনা হইয়াছে। ইহা ছাড়াও কবিরাজ গোস্বামীর এবং চৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থের উল্লেখও এক স্থানে পাওয়া যাইতেছে।[৫] সুতরাং গ্রন্থটির রচনাকাল ষোড়শ শতাব্দীর অষ্টম দশকের পূর্ব্বে নহে, সম্ভবতঃ দুই, তিন বা ততোধিক দশক পরেই হইবে। গ্রন্থের শেষে আছে—

১। পুঁথি ২৬৫, বা-প্রা-পু-বি ৩-৩, পৃ ৬৪-৬৫। ২। সাহিত্য ১৩১১, পৃ ২৩৫।

৩। ব-সা-প-প ৪, পৃ ১৭৬-১৮৩। ভক্তিপ্রভা কার্য্যালয় আলাটী হইতে প্রকাশিত (১৩৩৩)।

৪। এই ত প্রস্তাব আছে অনেক প্রকার।
লিখিয়াছেন বৃন্দাবন ব্যাস-অবতার॥ পৃ ৮॥
এই মতে চৈতন্যের চরিত্র বিস্তার।
লিখিয়াছেন বৃন্দাবন ব্যাস-অবতার॥ পৃ ১১॥
এই মত প্রস্তাব আছে অনেক প্রকার।
লিখিয়াছেন বৃন্দাবন ব্যাস-অবতার॥ পৃ ১৬॥

৫। ইহার অশেষ যত কবিরাজ ঠাকুর।
চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছে প্রচুর॥ পৃ ১০॥

ত্রয়োদশাধ্যায় গ্রন্থ হৈল সমাধিত।
শ্রীসীতার চরিত্র লিখিল লোকনাথ ॥

অথচ ইহাতে কোন অধ্যায়াদি বিভাগ পাওয়া যায় না। কবির ভণিতায় এক একটি অধ্যায়ের শেষ হইয়াছে মনে করিলেও প্রকাশিত পুস্তকটিতে দশ এগারোটির বেশী 'অধ্যায়' মিলিতেছে না। প্রকাশিত পুস্তকটি অসম্পূর্ণ মনে করা ছাড়া গত্যন্তর নাই। সীতাচরিত্রে কতকগুলি সংস্কৃত শ্লোক আছে, তাহা গ্রন্থকারের রচনা হওয়াই সম্ভব। ত্রিপদী অংশগুলি পদের মত; এ-গুলি "যথা রাগ" এই নির্দ্দেশ দিয়া আরম্ভ করা হইয়াছে। একটি ত্রিপদীর ভণিতাংশে আছে—

কহে লোকনাথদাস শ্রীচৈতন্যপদে আশ,
কৃপা করি দেহ ব্রজে বাস ॥ পৃ ১৩ ॥

ইহা হইতে নিঃসন্দিগ্ধরূপে জানা যাইতেছে যে সীতাচরিত্রের মত পুস্তক লোকনাথ গোস্বামীর লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে না। ইহা গ্রন্থটির দুই চারি পাতা পড়িলেই স্পষ্ট বোঝা যায়, তথাপি কেন যে সম্পাদক মহাশয় লোকনাথ গোস্বামীকেই সীতাচরিত্রের রচয়িতা বলিয়া ধরিয়াছেন তাহা অনুধাবন করা গেল না। গ্রন্থটির ভণিতা সর্ব্বত্র এক রকম নহে। যথা—

অদ্বৈতপদারবিন্দ সদা করি আশ।
সীতাচরিত্র কহে লোকনাথদাস ॥

অদ্বৈতচৈতন্যপাদপদ্ম করি আশ।
সীতার চরিত্র কহে লোকনাথদাস ॥

কহে লোকনাথদাস সীতার চরণে আশ,
মিলিবে চৈতন্য ব্রজপুরে।

কহে লোকনাথদাস শ্রীচৈতন্যপদে আশ,
কৃপা করি দেহ ব্রজে বাস ॥

অদ্বৈত সীতার পাদপদ্ম করি আশ।
সীতার চরিত্র কহে লোকনাথদাস ॥

শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দপদে যার আশ।
শ্রীসীতাচরিত্র কহে লোকনাথ দাস ॥

জঙ্গলী দেবীর মাহাত্ম্য বর্ণনা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

পাণ্ডুয়া মোকাম হইতে আইলা ফকীর।
শুনিয়া জঙ্গলী দেবীর এরূপ জাহির ॥
দেওয়ান আইলা তথা ব্যাঘ্রোপরে চড়ি।
অনেক ফকির সঙ্গে ধরি রাঙ্গা ছড়ি ॥
এথানে জঙ্গলী দেবী জানিলেন মনে।
হাসিয়া কহেন দেবী হরিপ্রিয়া স্থানে ॥
শুন হরিপ্রিয়া বাছা পাণ্ডুয়া হইতে।
মন দৃঢ়াইতে দেওয়ান আসিবে ত্বরিতে ॥
হরিপ্রিয়া বলে কিছু নাহিক বিচার।
সীতার চরণ তবে আছয়ে আমার ॥
আচম্বিতে বৈকালে আইল দেওয়ান।
খাদিম বলেন নারী আনহ বিছান ॥
দেওয়ানের সঙ্গে আছে ফকির বিস্তর।
ভাণ্ডারের চেষ্টা গিয়া করহ সত্বর ॥
তবে ত জঙ্গলীপ্রিয়া মায়া বিস্তারিল।
আচম্বিতে পারিষদ বিছানা আনিল ॥
যথেষ্ট বিছানা দিল কি কহিব তার।
জনমিয়া হেন দ্রব্য নাহি দেখি আর ॥
তবেত দেওয়ান কহে জঙ্গলীর স্থানে।
ধর সওয়ারির ব্যাঘ্র বসিব আসনে ॥
জঙ্গলী কহেন বাছা শুন হরিপ্রিয়া।
রাখহ ব্যাঘ্রেরে তুমি কর্ণেতে ধরিয়া ॥

নাম্বিল দেওয়ান ব্যাঘ্র হরিপ্রিয়া ধরি।
মারেন দ্বাদশ পাক অতি উচ্চ করি ॥
বিস্মিত হইল দেওয়ান ভাবে মনে মন।
হিন্দু মাঝে বুঝি আছ তুমি একজন ॥
যোড় হস্ত করি বলে আজ্ঞা দেহ মোরে।
জানিলাম যাই তবে পাণ্ডুয়া নগরে ॥ পৃ ২২-২৩ ॥

নন্দিনী ও জঙ্গলী পূরুষ ছিলেন; সাধনার জোরে ইঁহাদের স্ত্রীত্ব প্রাপ্তি ঘটে, অথবা সাধনার জন্যই ইঁহারা স্ত্রীবেশে থাকিতেন—ইহা প্রতিপন্ন করা সীতাচরিত্র-রচয়িতার অন্যতম উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়।

কুলিয়া গ্রামবাসী মাধবেন্দ্র আচার্য্যের পুত্র, সীতা দেবীর শিষ্য বিষ্ণুদাস আচার্য্য এইজাতীয় একখানি গ্রন্থ রচনা করেন, নাম সীতাগুণকদম্ব।[১] ইহাতে অদ্বৈত আচার্য্য ও সীতা দেবীর বিষয়ে কিছু কিছু নূতন তথ্য আছে। ইহাতেও নন্দিনী ও জঙ্গলীর মাহাত্ম্যখ্যাপন আছে। লোচনদাসের ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রভাব গ্রন্থটির মধ্যে সুস্পষ্ট রহিয়াছে। বিষ্ণুদাস কুলিয়া হইতে উঠিয়া গিয়া ঝামট-পুরের অনতিদূরে মাণিক্যডিহি গ্রামে বাস করেন।

১। বঙ্গশ্রী ১৩৪৪ অগ্রহায়ণ, পৃ ৭৩২-৩৩।

বিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণায়ণ কাব্য ঃ ভাগবতাচার্য্য, মাধব আচার্য্য, কৃষ্ণদাস, কবিশেখর

শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মত রঘুনাথ পণ্ডিত ভাগবতাচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী[১] কাব্যখানিও শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ বটে, তবে মালাধরের কাব্যের মত শুধু শেষ তিন স্কন্ধের অনুবাদ মাত্র নহে, সমগ্র দ্বাদশ স্কন্ধের অনুবাদ। শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের মত প্রেম-তরঙ্গিণীর শেষ তিন স্কন্ধ মর্ম্মানুবাদ নহে, আক্ষরিক অনুবাদ। প্রথম হইতে নবম স্কন্ধ মর্ম্মানুবাদ বটে। দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্কন্ধে মূলের অধ্যায়সংখ্যা যথাযথ রাখা হইয়াছে, কিন্তু অপর স্কন্ধগুলির অধ্যায় সংখ্যা যথেষ্ট পরিমাণে কমাইয়া দেওয়া হইয়াছে। যথা, প্রথম স্কন্ধে মূলে উনিশ অধ্যায়ের স্থলে কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে পাই তিনটি মাত্র অধ্যায়; এইরূপে দ্বিতীয় স্কন্ধে দশ অধ্যায়ের স্থলে দুই অধ্যায়, তৃতীয় স্কন্ধে তেত্রিশ অধ্যায়ের স্থলে আট অধ্যায়, চতুর্থ স্কন্ধে একত্রিশ অধ্যায়ের স্থলে আট অধ্যায়, পঞ্চম স্কন্ধে ছাব্বিশ অধ্যায়ের স্থলে আট অধ্যায়, ষষ্ঠ স্কন্ধে উনিশ অধ্যায়ের স্থলে তিন অধ্যায়, সপ্তম স্কন্ধে পনের অধ্যায়ের স্থলে পাঁচ অধ্যায়, অষ্টম স্কন্ধে চব্বিশ অধ্যায়ের স্থলে পাঁচ অধ্যায়, এবং নবম স্কন্ধে চব্বিশ অধ্যায়ের স্থলে চার অধ্যায়। দশম, একাদশ এবং দ্বাদশ স্কন্ধে অধ্যায় সংখ্যা যথাক্রমে নব্বুই, একত্রিশ এবং তের।

কবি-কর্ণপুরের গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় [২০৩] কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর উল্লেখ আছে।

নির্ম্মিতা পুস্তিকা যেন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী।
শ্রীমদ্‌ভাগবতাচার্য্যো গৌরাঙ্গাত্যন্তবল্লভঃ ॥

১। শ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষদ কর্ত্তৃক ১৩১২ সালে প্রকাশিত হয়, এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ১৩১৭ সালে প্রকাশিত হয়। বঙ্গবাসী সংস্করণটি ভাল বলিয়া এই আলোচনায় অবলম্বিত হইয়াছে।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ১৪৯৮ শকে অর্থাৎ ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দে বিরচিত হইয়াছিল। সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী খ্রীষ্টীয় ১৫৭৬ সালের পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল।

কবি রঘুনাথ পণ্ডিতের নিবাস ছিল বরাহনগর। শ্রীমদ্ভাগবতে ইঁহার বিশেষ অধিকার ছিল। গৌড় হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার পথে মহাপ্রভু বরাহনগরে রঘুনাথের গৃহে রাত্রিবাস করেন। রঘুনাথের ভাগবতপাঠে শ্রীচৈতন্য মুগ্ধ হইয়া তাঁহার নাম ভাগবতাচার্য্য রাখেন। ভাগবতাচার্য্য গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতে [১-১২] ইঁহাকে গদাধর পণ্ডিতের শাখামধ্যে ধরিয়াছেন। কবিও নিজে বলিয়াছেন,

পণ্ডিত গোসাঞি শ্রীযুত গদাধর নামে। যাহার মহিমা ঘোষে এ তিন ভূবনে॥
ক্ষিতিতলে কৃপায়ে কেবল অবতার। অশেষ পাতকী জীব করিতে উদ্ধার॥
বৈকুণ্ঠনায়ক কৃষ্ণচৈতন্যমূরতি। তাঁহার অভিন্নদেহ সহজে শকতি॥
মোর ইষ্টদেব গুরু সে দুইচরণ। দেহমনবাক্যে মোর সেই সে শরণ॥
তাহার চরণে রহু সতত প্রণতি। কৃষ্ণগুণ ভাষাতে বর্ণিব যথামতি॥ ১-১॥

ভণিতার মধ্যেও অনেক স্থলে কবি গুরুর নাম করিয়াছেন। ইহা ছাড়া কবির আর কিছু পরিচয় কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী হইতে পাওয়া যায় না।

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী গান করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল, ইহা যে শুধু রাগ-রাগিণীর উল্লেখ হইতেই অনুমান করা যায় তাহা নহে। অনেক শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের পুঁথিতে ভাগবতাচার্য্যের ভণিতা মধ্যে মধ্যে পাওয়া যায়। এগুলি গায়কের পুঁথি, তাহারা একাধিক কাব্য হইতে গান সংগ্রহ করিয়া পালা বাঁধিতেন। সম্পূর্ণ কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী গীত হইত বলিয়া মনে হয় না, কারণ ইহার রচনা গভীর, তাহার মধ্যে লঘু রচনা প্রক্ষেপ করিয়া জনসাধারণের চিত্ত রঞ্জিত করিবার কোন প্রচেষ্টা দৃষ্ট হয় না।

সাধারণ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের মত কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী লঘু কাব্য নহে। ইহাতে সাধারণ শ্রোতার চিত্ত আকৃষ্ট হইবার মত বিশেষ কিছুই নাই। শ্রীমদ্ভাগবত শুধু ভক্তিকে জাগরিত করে না, বুদ্ধিকেও উদ্বুদ্ধ করে; ইহা তাহারই অনুবাদ।

সুতরাং কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর রচনা গম্ভীর ও ওজস্বী না হইয়া পারে না। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে ভাগবতাচার্য্য কোনরূপ মৌলিক কবিত্বক্ষমতা প্রদর্শন করিতে পারেন নাই, ইহা সত্য। কিন্তু তাহাতে কিছুই আসিয়া যায় না। প্রাচীন অনেক 'মৌলিক' কবি ভাগবতাচার্য্যের মত ভাষাজ্ঞান ও সূক্ষ্ম ছন্দবোধ পাইলে বর্ত্তাইয়া যাইতেন। কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী সুবৃহৎ কাব্য হইলেও ইহাতে পয়ায়ের মধ্যে অক্ষরাধিক্য অথবা অক্ষররাহিত্যের দরুণ ছন্দঃপতন কুত্রাপি হয় নাই।

পদলালিত্য বেশ মধ্যে মধ্যে সুন্দর। যেমন,—

পাপিনী পুতনা সে যে নানা মায়া জানে। মায়ায় যুবতীবেশ ধরিলা আপনে॥
কেশপাশবিনিহিতফুল্লমল্লীমালা। পৃথুশ্রোণীকুচভরগমনমন্থরা॥
ক্ষীণকটিতট পট্টবাসপরিধানা। কুণ্ডলমণ্ডিতগণ্ড মুদিতবচনা॥
ভুরু-ভঙ্গবিলসিতমুনিমনোহরা। বিলোল-অলকাবলী কুঞ্চিতকুন্তলা॥
অলসবিলসগতি কমল ঢুলায়। চকিতচপল-দিঠী নন্দ-ঘরে যায়॥ ১০-৬॥

ভাগবতাচার্য্যের অনুবাদদক্ষতার কিছু পরিচয় দিতেছি।

তোমার চরিত্র কথা অমৃতের ধারা। এ ঘোর সংসার দুঃখ সন্তাপ নিবারা॥
পুরাণ পুরুষগণে গায় নিরন্তর। শুনিলে তুরিত যায় শ্রবণমঙ্গল॥
মহাজন জনে কৈল জগতে বিস্তার। কেবল চরিতকথা কহিলে নিস্তার॥
হেন পুণ্য গুণকথা কহে যেবা জনে। সর্ব্বদানপুণ্যফল লভে সেই ক্ষণে॥
অমৃতমধুরভাষা মন্দমধু হাস। কুটিলকটাক্ষপাত লীলাপরিহাস॥
ললিতচঞ্চললীলাচলনচপল। এ সব তোমার লীলা স্মরণমঙ্গল॥
আমি সব মুগ্ধ হৈলুঁ দেখি এই লীলা। দরশন দিয়া প্রাণ রাখ নন্দবালা॥

* * * *

দিবসে বেড়াহ যদি কানন-অটনে। এক ক্রটি যুগসম হেন লয় মনে॥
না দেখিলে কত কত বাঢ়য়ে বিষাদ। চান্দমুখ দেখি যদি সে বড় প্রমাদ॥
নয়ন ভরিয়া যদি দেখিব আনন। তাথে বিধি জড়মতি কৈল বিড়ম্বন॥
আঁখির নিমিষ দিল আর লোমাবলি। মনের সন্তোষে মুখ চাহিতে না পারি॥
১০-৩১

ইহার সহিত তুলনা করিবার জন্য মূল উদ্ধৃত করা গেল।

তব কথামৃতং তপ্তজীবনং কবিভিরীড়িতং কল্মষাপহম্।
শ্রবণমঙ্গলং শ্রীমদাততং ভুবি গৃণন্তি তে ভূরিদা জনাঃ॥
প্রহসিতং প্রিয় প্রেমবীক্ষণং বিহরণঞ্চ তে ধ্যানমঙ্গলম্।
রহসি সংবিদো যা হৃদিস্পৃশঃ কুহক নো মনঃ ক্ষোভয়ন্তি হি॥

* * *

অটতি যদ্ ভবানহ্নি কাননং ক্রটির্যুগায়তে ত্বামপশ্যতাম্।
কুটিলকুন্তলং শ্রীমুখঞ্চ তে জড় উদীক্ষতাং পক্ষ্মকৃদ্ দৃশাম্॥

দশম স্কন্ধের নিম্নোদ্ধৃত অবতারবন্দনাটি কবির নিজস্ব। জয়দেবের পদের ভাব ইহার মধ্যে কিছু আছে।

জয় জয় নন্দসুত ব্রজকুলপতি জয় জয় যদুনাথ ত্রিভুবনগতি॥
জয় জয় জগতনিবাস হৃষীকেশ। জয় জয় ভক্তকুলনলিনীদিনেশ॥
জয় জয় ব্রহ্মাদিবন্দিতপাদপদ্ম। জয় জয় দিব্য অবতার নবসদ্ম॥
জয় জয় কমলালালিতপদদ্বন্দ্ব। জয় জয় মুনীন্দ্রমানসসুখানন্দ॥
জয় জয় গুণনিধি জয় দয়াময়। জয় জয় ভকতবৎসল রসময়॥
জয় জয় যদুকুলকমলভাস্কর। জয় জয় ব্রজবধূকঞ্জশশধর॥
জয় জয় মহাভয়দুরিতভঞ্জন। জয় জয় পরচণ্ড পাষণ্ডখণ্ডন॥
জয় জয় অসুরকুঞ্জরমহাসিংহ। জয় জয় ব্রজবধূমুখপদ্মভৃঙ্গ॥
জয় জয় যোগেন্দ্রমানসপরহংস। জয় ভক্তভবপথপরিশ্রমধ্বংস॥
জয় জয় জগতমঙ্গল গুণধাম। শ্রুতিবাণী-অগোচর গুণগণশম॥
জয় জয় জগৎনিবাস লক্ষ্মীকান্ত। জয় জয় নিজজনবৎসল মহান্ত॥
জয় জয় মহামৎস্য আদি-অবতার। জয় কূর্ম্মরূপ ক্ষীরজলধিবিহার॥
জয় যজ্ঞ-অবতার বরাহমূরতি। জয় দিব্য নরসিংহ অনন্তশকতি॥
জয় দিব্যপরাক্রম অদ্ভুতবামন। জয় ভৃগুপতি ক্ষত্রিকুলবিনাশন।
জয় জয় রঘুপতি রাম অবতার। জয় হলধর রাম বিপক্ষবিদার॥
জয় বুদ্ধ-অবতার অসুরমোহন। জয় কল্কিরূপ ম্লেচ্ছকুলবিনাশন॥

জয় পূর্ণব্রহ্ম কৃষ্ণ বিচিত্রবিহার। জয় জগন্নাথ নীলাচল-অবতার ॥
জয় জয় শ্রীগৌরাঙ্গ চৈতন্যমূরতি। প্রেমভক্তিদাতা প্রভু ভকতের গতি ॥

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীতে প্রায়শঃ এই ভণিতাটি প্রযুক্ত হইয়াছে—

ধীরশিরোমণি শ্রীগদাধর জান।
ভাগবত-আচার্য্যের মধুরসগান ॥

অন্যবিধ ভণিতার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

চৈতন্যপদারবিন্দমকরন্দরসে।
প্রেমতরঙ্গিণী কহি মুদিতমানসে ॥

ভাগবত-আচার্য্যের মধুর ভারতী।
চৈতন্যপদারবিন্দগদাধরগতি ॥

মাধব আচার্য্যের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল[১] কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর প্রায় সামসময়িক রচনা। তবে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলকে শ্রীমদ্ভাগবতের শেষ তিন স্কন্ধের ঠিক অনুবাদ বলা চলে না। ইহাতে ভাগবতোক্ত শ্রীকৃষ্ণচরিতের গল্পাংশ বর্ণিত হইয়াছে, এই মাত্র বলা চলে। কবি প্রয়োজন মত অন্য পুরাণাদিরও সাহায্য লইয়াছেন। সে কথা কবি স্বীকারও করিয়াছেন।

রাজরাজ-অভিষেক নাহি ভাগবতে।
বিস্তারি কহিব তাহা হরিবংশ-মতে ॥ পৃ ১৭৪ ॥
পারিজাতহরণ ঈষৎ ভাগবতে।
বিস্তারি কহিব বিষ্ণুপুরাণের মতে ॥ পৃ ২১২ ॥

দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের কাহিনী কোন পুরাণেই উল্লিখিত হয় নাই। তাহাও ইহাতে বর্ণিত হইয়াছে। রাধা, চন্দ্রাবলী এবং বড়াইয়ের উল্লেখও ইহাতে আছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ললিতাদি সখীর ব্যক্তিগত উল্লেখ নাই। শঙ্খচূড়বধের প্রসঙ্গে কতকগুলি গোপীর উল্লেখ আছে,[২] তাহার মধ্যেও ললিতা এবং বিশাখার নাম নাই।

১। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৩৩)।

২। পৃ ১১৮-১২০। এই গোপীদের উল্লেখ আছে—রাই (রাধা), চন্দ্রাবলী, শশিকলা, লীলা, সানন্দা, লীলাবতী, শুচি, প্রেমবতী, বিলাসিনী, স্বর্ণপ্রভা, হরিপ্রিয়া।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল হইতে কবি মাধবের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। কেবল এই মাত্র জানা যায় যে তিনি মহাপ্রভুর "দাসের দাস" অর্থাৎ কোন পারিষদের শিষ্য ছিলেন।

সব-অবতার-শেষ কলি পরবেশ। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র গুপ্তযতিবেশ॥
প্রেমভকতিরস করেন প্রকাশ। কহে দ্বিজ মাধব তার দাসের দাস॥ পৃ ১॥

কলিযুগে চৈতন্য প্রকাশ।
দ্বিজ মাধব কহে তার দাসের দাস॥ পৃ ১১॥

"ছাআলের বোলে ভাই না করিহ হেলা" [পৃঃ ২], এই উক্তি হইতে মনে হয় শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কবির প্রথম বয়সের রচনা।

মহাপ্রভুর এক ভক্ত যে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল লিখিয়াছিলেন, ইহার প্রমাণ আছে দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায়—

মাধব আচার্য্য বন্দ কবিত্ব শীতল।
যাঁহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥

গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় এবং চৈতন্যচরিতামৃতে মহাপ্রভুর শাখাবর্ণনায় এক মাধবাচার্য্যের উল্লেখ আছে। নিত্যানন্দ প্রভুর শাখায় যে মাধবাচার্য্যের উল্লেখ আছে, তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতা মাধব আচার্য্য। দেবকীনন্দনের বৈষ্ণবাভিধানে এক মাধবাচার্য্যের এবং এক মাধবানন্দাচার্য্যের উল্লেখ আছে। ইঁহাদের একতম সম্ভবতঃ নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতা হইবেন।

প্রেমবিলাসের মতে কবি মাধব আচার্য্য বা মাধব মিশ্র হইতেছেন বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর ভ্রাতুষ্পুত্র। মাধবের পিতার নাম কালিদাস এবং মাতার নাম বিধুমুখী। মাধব শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়া তাহা শ্রীচৈতন্যের পদে সমর্পণ করেন। মহাপ্রভুর আজ্ঞামত মাধব অদ্বৈত প্রভুর নিকট দীক্ষা গ্রহণ করেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের শ্রীদশমস্কন্ধ। গীতিবর্ণনাতে তিঁহ করি নানা ছন্দ॥
রাখিল গ্রন্থের নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল। শ্রীচৈতন্যপদে তাহা সমর্পণ কৈল॥
শ্রীঅদ্বৈত প্রভু মহাপ্রভুর আজ্ঞামতে। মাধবের কর্ণে মন্ত্র লাগিল কহিতে॥[১]

১। প্রেমবিলাস, বহরমপুর সংস্করণ (১৩১৮ সাল), পৃ ৩১৬।

বেশী বয়সে মাধব বৃন্দাবনে গমন করেন।

শ্রীরূপের পদে গিয়া আত্ম সমর্পিল। ভজনের তত্ত্ব যত সকল জানিল॥
সন্ন্যাস করিয়া তিঁহ রহি বৃন্দাবন। ব্রজের মধুর ভাব করয়ে ভজন॥[১]

খেতরীর উৎসবে মাধব শ্রীঅচ্যুতের সহিত আগমন করিয়াছিলেন। পরে বৃন্দাবনে প্রত্যাগমন করেন। প্রেমবিলাসে ইহাও উল্লিখিত হইয়াছে যে, নরোত্তম ঠাকুরের গৃহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রত্যহ গীত হইত।

প্রথমে করয়ে গান চৈতন্যমঙ্গল।
তারপর হয় গান শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥[২]

প্রেমবিলাসের কথা অনেকে উড়াইয়া দিয়া থাকেন। যাঁহারা অবিশ্বাস করেন, তাঁহারা অবিশ্বাসের কোন হেতু অথবা প্রেমবিলাসের উক্তির কোন বিরুদ্ধ প্রমাণ দেখাইতে পারেন নাই। সুতরাং এরূপ অবস্থায় প্রেমবিলাসের উক্তির উপর কতকটা নির্ভর না করিয়া উপায় নাই।

আবার অনেকে বলেন,[৩] যে মাধব ১৫০১ শকাব্দে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন সেই সপ্তগ্রাম-ত্রিবেণীনিবাসী দ্বিজবর পরাশরের পুত্র মাধবই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের রচয়িতা, কালিদাসাত্মজ মাধব কোন শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করেন নাই। কিন্তু একাধিক মাধব যে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, ইহাও অস্বীকার করিবার উপায় নাই।

বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে যে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল প্রকাশিত হইয়াছে তাহার মধ্যেই একাধিক মাধবের রচনা আছে। ইহার মধ্যে ভাগবতাচার্য্য[৪] এবং পূর্ণানন্দের[৫] রচনাও অল্প যে কিছু ঢুকিয়া গিয়াছে তাহা গায়কের সংগৃহীত পালার অন্তর্গত ছিল বলিয়া বোধ হয়। তবে গ্রন্থটির অধিকাংশই যে প্রাচীনতর মাধবের রচনা, ইহা বলিবার পক্ষে অনেক যুক্তি আছে। প্রথম যুক্তি এই, কাব্যরচনার কালে শ্রীচৈতন্য বর্ত্তমান ছিলেন ইহা কবির উক্তি হইতে অনুমান হয়। যেমন,

সুরধুনীতীরে বিশেষ নবদ্বীপ।
যথায় চৈতন্যচন্দ্র অদ্বৈত-সমীপ॥ পৃ ২॥

১। ঐ, পৃ ৩১৭। ২। ঐ, পৃ ৩১৮। ৩। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল, ভূমিকা, পৃ ২-৩
৪। পৃ ৪২, ৪৯, ৫১। ৫। পৃ ১৩৩, ১৭৩।

এখানে অদ্বৈতপ্রভুর উল্লেখ অনুধাবনযোগ্য।

কলিযুগে চৈতন্য সেই অবতার।
দ্বিজ মাধব কহে কিঙ্কর তাহার ॥ পৃ ১৫ ॥

চৈতন্যচরণধূলি শিরে ধরি কুতূহলী
দ্বিজ মাধব রস ভাষে ॥ পৃ ২৬০ ॥

চৈতন্যচরণ শিরে করিয়া আনন্দে।
দ্বিজ মাধব কহে এ কথা গোবিন্দে ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু সন্ন্যাসী বিহরে।
যাহার প্রসাদে লোক তরয়ে সংসারে ॥
শুন শুন আরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥ পৃ ২৮২ ॥

দ্বিতীয় যুক্তি এই, ইহাতে ললিতা ও বিশাখার উল্লেখ নাই। অপর মাধবেব রচনায় আছে। তৃতীয় যুক্তি এই, দ্বিতীয় বা পরবর্ত্তী মাধবের ভাষা প্রথম মাধবের ভাষা অপেক্ষা অর্ব্বাচীনতর।

দুই মাধবের ভণিতাপ্রণালী বিশেষ লক্ষ্য করিতে হইবে। প্রথম বা প্রাচীনতর মাধবের বিশিষ্ট ভণিতা হইতেছে—

শুন শুন আরে ভাই হয়্যা একচিত।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ মাধব রচিত ॥

আর দ্বিতীয় মাধবের বিশিষ্ট ভণিতা হইতেছে—

চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্রচরণকমল।
দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

এই দ্বিতীয় ভণিতা "দ্বিজ মাধব" বিরচিত গঙ্গামঙ্গলে[১] বহুবার ব্যবহৃত হইয়াছে—

চৈতন্যচন্দ্রচরণকমল।
দ্বিজ মাধবে কহে গঙ্গামঙ্গল ॥

১। পৃ ২৮২।
২। ব-সা-প প্রকাশিত (১৩২৩)। মূল পুঁথি খণ্ডিত বলিয়া পুস্তকটি অস°

চৈতন্যচন্দ্রচরণকমলের সুবহুবার উল্লেখ থাকিলেও গঙ্গামঙ্গলের কুত্রাপি কবি আপনাকে চৈতন্যকিঙ্কর অথবা তাঁহার দাসের দাস ইত্যাকার কিছু বলেন নাই। কাব্যের শেষ ভাগে এরূপ উক্তি কিছু ছিল কি না বলিতে পারি না।

উপরে উল্লিখিত ভণিতা দুইটি দুই কবির বিশিষ্টতার চিহ্নস্বরূপ গ্রহণ করিলে কবিদ্বয়ের কাব্যের যৎকিঞ্চিৎ তুলনামূলক আলোচনা করা যাইতে পারে। নিম্নে যদুবংশের ব্রহ্মশাপ অংশটি দুই কবির রচনা হইতে উদ্ধৃত করিয়া দিয়া দুই কবির স্বাতন্ত্র্য দেখান যাইতেছে।

স্বধামে যেরূপে হরি করিলা গমন। সংক্ষেপে রচিব তাহা শুন ভক্তগণ॥
একদিন নির্জ্জনে বসিয়া নারায়ণ। অনুমান করিয়া ভাবেন মনে মন॥
বিনাশ করিলুঁ আমি দুষ্ট রাজগণ। তথাপি হইল নাহি ভূভারহরণ॥
* * *
নিজবংশবধ করা স্বয়ং অনুচিত। ছলক্রমে মায়া করি করিব বিহিত॥
এইরূপে ভগবান ভাবিয়া নিশ্চয়। ব্রহ্মশাপ ছলে কৈল যদুকুলক্ষয়॥
একদিন মুনিগণ কৃষ্ণের আহ্বানে। দ্বারকা আইল কোন যজ্ঞের কারণে॥
*
উপহাস করি যত যাদবনন্দনে। প্রণাম করিয়া কহে সেই মুনিগণে
স্ত্রীবেশে করায়্যা শাম্বে জাম্বুবতীসুতে। অবিলম্বে বালকেরা জিজ্ঞাসে বিনীতে
গর্ভবতী এই নারী শুন মুনিগণ। জিজ্ঞাসিতে নাহি পারে লাজের কারণ
কি সন্ততি প্রসবিবে বল কৃপা করি। কপট বিনয়ে কহে ভয় পরিহরি॥
শুনিয়া এতেক বাক্য মুনি ধ্যান কৈল তত্ত্ব জানি মুনিগণে কোপ উপজিল॥
ক্রুদ্ধ হয়্যা বলে সভে শুনহ বচন। এখনি প্রসব হবে অরিষ্টলক্ষণ॥
জন্মিব মুষল এক সকলে দেখিব। সে মুষল হৈতে যদুকুল ধ্বংস হব॥
এতেক বলিতে খসি পড়িল মুষল। দেখিয়া কম্পিত হইল কুমার সকল॥
* * *
মহাভয়ে উগ্রসেন বলে সভাকারে। মুষল করিয়া হাতে যাহ প্রভাসেরে॥
ঘসিয়া করহ ক্ষয় পাষাণ উপরে। শেষ হৈলে তাহা ফেল সমুদ্রভিতরে॥
রাজার বচন শুনি যত শিশুগণ। মুষল লইয়া তথা করিল গমন॥
ক্ষয় কৈল মুষলেরে পাষাণ উপরে। অল্প মাত্র শেষ ফেলে সমুদ্রভিতরে॥

মুষলঘর্ষণচূর্ণ পড়িল যথায়। নলখাগড়ার বন জন্মিল তথায় ॥
সমুদ্রের জলে যাহা করিল ক্ষেপণ। সেই লোহা এক মৎস্য করিল ভক্ষণ ॥
মৎস্যবর ধরি জেল্যা নগরে আনিল। মৎস্যেরে কাটিতে লৌহ উদরে পাইল
দেখিয়া লুব্ধক লৌহ মাগিয়া লইল। শরের আগেতে তাহা ফলা করি দিল ॥
জরা ব্যাধ সেই বাণ করিয়া যতন। তূণের ভিতরে রাখে মৃগের কারণ ॥
শুন শুন অরে ভাই হয়্যা একচিত। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজমাধব রচিত ॥[১]

ওথা স্বর্গে ব্রহ্মা তবে মনেতে চিন্তিল ভারাবতরণে হরি পৃথিবীতে গেল।
মারিয়া ত দুষ্ট দৈত্য দেবকার্য্য করি। আপনা পাসরি ক্ষিতি রহিলা শ্রীহরি ॥
অনুমান করিয়া ব্রহ্মা সর্ব্বদেব লৈয়া। গেলা ত দ্বারকাপুরী রথেতে চড়িয়া ॥
* * *
হাসিয়া সম্মুখ-হয়্যা বলেন নারায়ণ। বসিতে আসন দিলা কমললোচন ॥
যত সব কহিলে আমি করিয়াছি মনে। নিকট বৈকুণ্ঠপুরী করিব গমনে ॥
দর্পেতে মারিয়া দৈত্য যত কিছু কৈল। সেহ কিছু নহে অধিক ভূমিভার হৈল ॥
আমার এ বংশেতে জন্মিল যত বীর। তেঞি কম্পমান ক্ষিতি কেমনে হবে স্থির
* * *
পাঠাইয়া দেবগণে চিন্তে নারায়ণ। ব্রহ্মশাপ লক্ষ্য করি বংশের নিধন ॥
হেনকালে মুনিগণ স্বচ্ছন্দগমনে। দ্বারকা আছেন কৃষ্ণ করি দরশনে ॥
অন্তর্য্যামী ভগবান সকল জানিল। বাহির হইতে নিজ অভ্যন্তরে গেল ॥

অভ্যন্তরে গিয়া না দেখিল গোবিন্দাই। মায়া-স্ত্রী-বেশ-ধারী আইলা তথাই
শাম্ব নামে কুমারের স্ত্রীবেশ করি। লৌহপাত্র উদরে দিয়া গর্ভ হেন ধরি
মিনতি বচন বলি মুনিপাশে গিয়া। বড় দুঃখ পায় নারী গর্ভ ধরিয়া।
কি বালক প্রসব হৈব বল সত্য করি। মধুর ভাষায় বলে শঙ্কা পরিহরি ॥
শুনিয়া এতেক বাণী মুনি ধ্যান কৈল। তত্ত্ব জানিয়া মুনি ক্রোধ বাড়াইল ॥
জানিল সকল তত্ত্ব শুন পুত্রগণ। এখনি প্রসব হৈল অরিষ্টলক্ষণ ॥
জন্মিবে উত্তম বংশ সভাই দেখিবে। সেই বংশ হৈতে তোমার বংশক্ষয় হবে।
এতেক বলিতে খসি পড়িল মুষল। দেখিয়া কম্পিত হৈল কুমার সকল ॥
*

১। পৃ ৩৫৬-৩৫৭ (পরিশিষ্ট)।

ক্ষণেক রহিয়া কৃষ্ণ বলে সর্ব্বজনে। মুষলহাতে প্রভাসেরে যাহ পুত্রগণে ॥
ঘসিয়া ত কর ক্ষয় পাষাণ-উপরে। শেষ হইলে ফেলিহ প্রভাসের জলে ॥
কৃষ্ণের বচন শুনি যত যদুগণ। মুষল লয়্যা প্রভাসেরে গেল সর্ব্বজন ॥
ঘসিয়া ত ক্ষয় করে পাষাণ উপরে। অল্পমাত্র শেষ ফেলে সমুদ্র ভিতর ॥
গোসাঞিের মায়া কিছু বুঝন ন যায়। লৌহ স্কন্ধে খাগড়াবন জন্মিল তথায় ॥
সেই শেষ লৌহ মাত্র সমুদ্রে ফেলিল। বিষম বোদালি তাহা পাইয়া ভক্ষিল ॥
মারিয়া ত মৎস্যজীবী বেচিতে লাগিল। মৎস্য কিনি ব্যাধপত্নী ঘরেতে আনিল ॥
কুটিতে পাইল লৌহ মৎস্যের উদরে। ফলি গড়াইয়া দিল কাণ্ডের উপরে।
ঘরে নিয়া থুইল তাহা মৃগ মারিবারে। নিত্য মৃগ মারি বুলে অরণ্য ভিতরে ॥

* * *

চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্রচরণকমল। দ্বিজ মাধব কহে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥

পৃ ৩২৭-৩২৯ ॥

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ গ্রন্থাগারের ২৭৭ সংখ্যক পুঁথির নাম ভাগবতসার।[১] এই কাব্যখানি মূলতঃ প্রথম মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের সহিত অভিন্ন হইলেও ইহার মধ্যে দ্বিতীয় মাধবের রচনা কিছু কিছু প্রবেশ করিয়াছে। প্রথম মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ভাগবতসার নামে বটতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল ; এই গ্রন্থখানির সহিত পুঁথিখানির যথেষ্ট সঙ্গতি আছে। উভয়ত্রই বিশিষ্ট ভণিতা হইতেছে—

শুন শুন ওরে ভাই হয়্যা একচিত।
ভাগবতসার দ্বিজ মাধব রচিত ॥

এই ভণিতার সহিত আমাদের অনুমিত প্রথম মাধবের ভণিতার সহিত একটুমাত্র তফাৎ হইতেছে 'শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল' স্থলে 'ভাগবতসার' নামের প্রয়োগ। এমন হইতে পারে যে, পূর্ব্বাবধি দুইটি নামই প্রচলিত ছিল ; উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে যে, মালাধর বসুর কাব্য শ্রীকৃষ্ণবিজয় এবং গোবিন্দবিজয় এই দুই নামেই প্রচলিত ছিল। তবে আমার মনে হয় যে, ভাগবতসার নামটি অর্ব্বাচীন কালে কোন কথকের দেওয়া। বঙ্গবাসী সংস্করণে অবলম্বিত প্রাচীন পুঁথির সর্ব্বত্রই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল নাম পাওয়া যায়।

পুঁথির প্রারম্ভে নিম্নোদ্ধৃত অংশ অতিরিক্ত আছে।

গৌরী রাগ ॥

খর্ব্ব স্থূলোদর গজেন্দ্রমুখধর,
হেরিতে মোহিত অখিলে।
গলিতমকরন্দ লুবধ-অলিবৃন্দ
বিলোল গণ্ডযুগলে ॥
বন্দহ অদ্ভুত শৈলসুতাসুত
লম্বোদর গজরায়।
দন্তে বিদারিত বৈরীর শোণিত,
সিন্দূরে মণ্ডিত কায় ॥
সকল শুভ কাজে অমরপুরী মাঝে
সিদ্ধিদাতা অতিশয়।
শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্ম- রচিতসুখসদ্ম
দ্বিজ মাধব রস কয় ॥

দুইটি গণেশবন্দনা থাকার সন্দেহ হইতেছে যে, উপরি-উদ্ধৃত অংশটুকু প্রক্ষিপ্ত। হয়ত এইটি দ্বিতীয় মাধবের কাব্যের গণেশবন্দনা ছিল।

বটতলা সংস্করণে এবং পুঁথিতে উপক্রমণিকা অংশে কিছু কিছু অতিরিক্ত আছে। তাহার মধ্যে এই কয় ছত্র উল্লেখযোগ্য—

পরাশর নামে দ্বিজকুলে অবতার। মাধব তাহার পুত্র বিদিত সংসার ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণমাত্র ভরসা আমার। রচিব ভাষায় গ্রন্থ ভাগবতসার ॥

পুঁথিটির মধ্যে তিন স্থলে উল্লিখিত আছে যে, শম্ভুচন্দ্র বসুর অনুরোধে কাব্যটি রচিত হইয়াছিল—

দ্বিজ শ্রীমাধব কয় হরিলীলা সুধাময়
পান কর সদা ভক্তগণ।
শম্ভুচন্দ্র বসু মতে এই গ্রন্থ প্রকাশিতে
মূলমতে করিল রচন ॥

এই অংশটি লিপিকারের প্রক্ষেপ না হইলে দ্বিতীয় মাধবের রচনা বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

উপক্রমণিকাভাগে বঙ্গবাসী সংস্করণে যে কিছু অতিরিক্ত অংশ আছে, তাহা প্রাচীনত্বজ্ঞাপক। যথা—

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলগীত মধুর সঙ্গীত।
নাচাড়ি শিকলি রূপে কহিব বিদিত॥

পয়ার অর্থে "শিকলি" শব্দটি কৃত্তিবাসের উত্তরকাণ্ডের প্রাচীনতম পুঁথিতে (১৫৮০ খ্রীষ্টাব্দে) পাই।

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের সরস পাঁচালি।
রামায়ণ গাইল অদ্ভুত শিকলি॥

'বঙ্গবাসী' সংস্করণে [পৃ ২] এবং পুঁথিতে যথাক্রমে আছে—

স্বপনে পাইনু মুঞি কৃষ্ণ-উপদেশ।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ॥
রচিতে স্বপনে পাইয়াছি উপদেশ।
সেই সে ভরসা আর না জানি বিশেষ॥

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের অপর একটি পুঁথিতে এইরূপ পাঠ আছে—

বিশেষে পাইল আমি চৈতন্য-আদেশ। সেই ভরসায় আর না জানি বিশেষ॥[১]

এই পাঠান্তরটি বড়ই মূল্যবান্।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যাংশে খুব উৎকৃষ্ট নহে। ইহা কবির কাঁচা লেখা বলিয়াই অনুমান হয়। তবুও মাঝে মাঝে বর্ণনা বেশ মনোরম। কতকগুলি ব্রজবুলি পদ ইহার মধ্যে আছে, সেগুলি বিশেষত্ববর্জ্জিত। নিম্নে উদ্ধৃত নৌকাখণ্ডের পদটিকে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের একটি শ্রেষ্ঠ অংশ বলা যাইতে পারে। বঙ্গবাসী সংস্করণ, বটতলা সংস্করণ এবং কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু এই তিন স্থলে উদ্ধৃত পাঠ মিলাইয়া নিম্নের পাঠ স্থির করা হইল।

১। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩০৭।

আমার সুন্দর নায় যে আসিয়া দিবে পায়[১]
হাসিয়া গণিবে[২] ষোল পণ।
তোমার[৩] নিতম্ব কুচ অতি গুরুতর উচ,
একেলায়[৪] ভরা দশ জন॥
তেঞি বলি যুক্তিসার, নহিলে কে করে পার,
শুন সব ব্রজগোপীগণ।
আমার বচন ধরি যে আছে ফুরাও কড়ি,
তবে পারে করহ গমন।[৫]
লাখের[৬] পসরা তোর নাএ পার হবে মোর,
ইহাতে পাইব আর[৭] কি।
বুঝিয়া উচিত[৮] বল, পিছে যেন নহে কল[৯],
এই জীবিকায় আমি জী॥[১০]
তুমি ত যুবতী মায়্যা, আমিও[১১] যুবক নায়্যা,
হাস[১২] পরিহাসে গেল দিন।
ও পারে মানুষ[১৩] ডাকে, খেয়া নিয়া[১৪] মিছা পাকে,
এতক্ষণে হৈত ভরা[১৫] তিন॥

১। 'যেবা আসি দেয় পা' বঙ্গবাসী, 'যেবা আসিয়া দেয় পায়' কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু। ২। 'গণয়ে' বঙ্গবাসী, কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু। ৩। 'এ সব' বটতলা। ৪। 'এ নায়ের' বঙ্গবাসী, কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু।

৫। এই ত্রিপদীটি কেবল বটতলা সংস্করণে আছে। বঙ্গবাসী সংস্করণে ইহার স্থলে এই বিকৃত ত্রিপদীটি আছে—

হেদেলো গো আলার মায়্যা
বুঝিল বড়ই তুমি ঢাঁট।
দান ফুরাইয়া হেদেলো গোয়ালিনি
নাএ চড়সিয়া ঝাট॥

৬। 'কাখের' বটতলা। ৭। 'আমি' কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু। ৮। 'আপনি বুঝিয়া' ঐ। ৯। 'ফল' বঙ্গবাসী, 'কলহ' কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু। ১০। 'শোন সব গোয়ালার ঝি' কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু। ১১। 'আমি ত' বঙ্গবাসী, কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু। ১২। 'হাস্য' বটতলা। ১৩। 'মনুষ্য' ঐ। ১৪। 'কামাই' বটতলা, কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু। ১৫। 'খেয়া' ঐ, ঐ।

ক্ষীর ননী দুগ্ধ দই[১] আগে[২] আন কিছু খাই,
না বাহিতে গায়ে করি বল ।[৩]
দ্বিজ শ্রীমাধব[৪] কয়, রসিক যাদব রায়[৫]
কপটে করয়ে বাকৃছল ॥[৬]

মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল বা ভাগবতসারের কোন পদ পদকল্পতরু প্রভৃতি প্রাচীন পদসংগ্রহ গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই। আধুনিক কালে সঙ্কলিত দুই একটি পদসংগ্রহ গ্রন্থে 'দ্বিজ মাধব', 'মাধব' অথবা 'মাধবদাস' ভণিতায় শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার কয়েকটি পদ পাওয়া যায়। এগুলির অধিকাংশই শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে নাই। সেই কারণে অনুমান হয় যে, এই পদগুলি দ্বিতীয় অথবা অপর এক মাধবের রচনা। এই পদগুলির কোন কোনটির মধ্যে, ললিতাদি সখীর উল্লেখ লক্ষণীয়। প্রথম মাধবের কাব্যে ললিতা ও বিশাখার নাম উল্লিখিত হয় নাই, একথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি, দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় মাধবের রচিত তিনটি পদ এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

কৃষ্ণের আদেশ পাঞা ইন্দ্রযজ্ঞ নিবারিয়া
নন্দ আদি যত গোপীগণ।
নানা উপহার লৈয়া সকলে একত্র হৈয়া
আইলেন যথা গোবর্দ্ধন ॥
সহস্র সহস্র জন রান্ধে অন্ন ব্যঞ্জন,
একঠাঁই লইয়া করে রাশি।
দধি দুগ্ধ সরোবর, রোটী বাশি থরে থর,
হরিষে নাচয়ে ব্রজবাসী ॥

১। 'ক্ষীর নবনীত চাই' বটতলা। ২। 'অগ্রে' ঐ। ৩। 'নৌকা বাহিতে হউক বল' বঙ্গবাসী; কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধুতে এই ছত্রের পাঠ—

এখন এক বোল বলুক রাই, আগে দেয় কিছু খাই,
না বাহিতে গায় হউক বল।

৪। 'মাধব' বঙ্গবাসী, কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু। ৫। 'করুণাময়' বটতলা। ৬। 'মিছা পাকে হারাবে সকল' বঙ্গবাসী, 'নায় কর স্বকাজ সফল' কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু।

শ্রীকৃষ্ণের অভিমত পাক কৈল বহুমত,
সূপান্ন পায়স শিখরিণী।
ব্যঞ্জনের যত রূপ পর্ব্বত সমান স্তূপ,
অন্ন-কোটী করিলা সাজনি ॥
নানা বাদ্য বাজে কত, নর্ত্তকী নাচয়ে শত,
সহস্র সহস্র লোকে গায়।
যত গোপগোপীগণ অলঙ্কৃত সব জন,
আনন্দে অবধি নাহি পায় ॥
ধেনু বৎস সাজাইয়া কত স্বর্ণমুদ্রা লইয়া
ব্রাহ্মণেরে দেয় নন্দ রায়।
মহামহোৎসব রোল, কে কার শুনয়ে বোল,
এ মাধব দেখিয়া বেড়ায় ॥[১]

উপরি-উদ্ধৃত পদটির সহিত প্রথম মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে গোবর্দ্ধনপূজার তুলনা করা যায়।

নাহি গ্রাম নাহি ভূম নাহি বাড়ী ঘর।
পর্ব্বত অরণ্যে বসি কারে মোর ডর ॥
যার আশীর্ব্বাদে আছি সর্ব্বত্র অভয়।
যথায় নিবসি যেথা জীবন উপায় ॥
ব্রাহ্মণ গোধন শৈল এ তিন প্রকার।
সকল সম্ভারে যজ্ঞ আরম্ভ তাহার ॥
বিবিধ রন্ধন কর আমার পিরীত।
হিঙ্গু মরিচ সূপ ঘৃত সম্ভারিত ॥ পৃ ৮৪ ॥

দ্বিতীয় ও তৃতীয় পদটি নৌকালীলার—

ললিতা সখী হসিতমুখী কহয়ে নায়্যার ঠাঞি।
বোল না কেন তোমার মন, কতেক বেতন চাই ॥

১। কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু, শাস্ত্রপ্রকাশ কার্য্যালয় কলিকাতা হইতে প্রকাশিত (১৩১৯), পৃ ৫১-৫২।

আমরা হইয়ে রাজার ঝিয়ারী, যদি মরিযাদা পাই।
ঝাড়িলে হাথ হবে কৃতার্থ, কিসের কাতর রাই॥
কহয়ে নেয়ে, বুঝাহ রাইয়ে, কথা কহেন একবার।
পার করি দিব, বেতন না লব, এই সে কহিল সার॥
শুনি নায়্যার কথা কহিছে ললিতা, তোমার নাহিক বোধ।
উহার চরণে তোমার পরাণে দিলে কি পাইবে শোধ॥
রাজার ঝিয়ারী আয়ানের নারী রাধিকা যাহার নাম।
ঘাটী মাঝি সনে কহিবে কেমনে, তাহারি ঐছন কাম॥
নায়্যা, তোমার সাহস বড।
বাঙন হইয়া চাঁদ ধরিবারে কেমনে সাহস কর॥
না করিহ রোল, দিব কিছু ঘোল, তোমার সোহাগ বড।
ডুকডা ডুকড়া করিয়ে তুলিলে অনেক হইবে জড়॥
শুনিয়া এ বোল হয়ে উতরোল রাই বিনোদিনী হিয়া।
মাধব রচন, খেয়ারীর মন তোষহ বচন দিয়া॥[1]

যমুনার মাঝে আসি কাঁপাইল নায়।
কেরোয়াল ছাড়ি কৃষ্ণ মুরলী বাজায়॥
এক ভিত হয়্যা নাচে দেয় করতালী।
বাহ বাহ বলি হাসে দেব বনমালী॥
তা দেখিয়া গোপীগণের ভয়ে প্রাণ কাঁপে।
রক্ষা কর রক্ষা কর উচ্চস্বরে ডাকে॥
আকুল হইয়া দ্বিজ মাধবেতে গায়।
ভাল সময় পায়্যা নায়্যা মুরলী বাজায়॥[2]

পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, গঙ্গামঙ্গলের সহিত দ্বিতীয় শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের ভণিতাংশে আশ্চর্য্যরকম মিল আছে। তাহা ছাড়া শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে যে কয়টি

১। অপ্রকাশিতপদরত্নাবলী, পৃ ১৪৩, কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু, পৃ ৮৪।
২। অপ্রকাশিতপদরত্নাবলী, পৃ ১৫৪।

ব্রজবুলি পদ আছে, তাহার ভাষার সহিত গঙ্গামঙ্গল-স্থিত ব্রজবুলি পদের ভাষারও মিল আছে। সুতরাং এই দুইটি কাব্যের কবি যে অভিন্ন তাহা বলিবার পক্ষে অল্পস্বল্প হেতু আছে। যাদব-নন্দন কৃষ্ণদাস একখানি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল[১] রচনা করিয়াছিলেন। ইহাতে তিনি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতে দেখি যে তিনি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা (মাধব) আচার্য্য গোসাঞিঃর শিষ্য ভ্রাতুষ্পুত্র এবং 'ভৃত্য' ছিলেন। এই যাদব-নন্দন কৃষ্ণদাসকে কালিদাসাত্মজ মাধব মিশ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র বলা হয়। কিন্তু কৃষ্ণদাস কুত্রাপি আচার্য্যকে স্বীয় খুল্লতাত কিংবা জ্যেষ্ঠতাত বলেন নাই। দ্বিতীয়তঃ যাদব মিশ্র এবং মাধব মিশ্র ইঁহারা নবদ্বীপবাসী ছিলেন। অথচ কৃষ্ণদাস বলিতেছেন "জাহ্নবী-পশ্চিমকূলে বসতি আমার"। কৃষ্ণদাস আরও বলিতেছেন—

আমার প্রভু শ্রীমতী ঈশ্বরী। দীক্ষামন্ত্র দিলা প্রভু মোর কর্ণে ধরি॥ পৃ ৩৮৪॥

এখানে প্রথম চরণে স্পষ্টতঃ তিন অক্ষর ঘাটতি পড়িতেছে। আমার অনুমান মত প্রথম চরণটি হইবে—

আমার প্রভুর প্রভু শ্রীমতী ঈশ্বরী।

এই পাঠকল্পনা যদি সত্য হয় তাহা হইলে বলিতে হইবে, দ্বিতীয় মাধবাচার্য্য জাহ্নবীদেবীর শিষ্য ছিলেন। এবং এই অনুমান সত্য হইলে বলিতে হইবে, দ্বিতীয় মাধবাচার্য্য আর কেহই নহেন, তিনি নিত্যানন্দ প্রভুর জামাতা, গঙ্গাদেবীর পতি। এই মাধব গঙ্গার পশ্চিমকূলে জিরাটে বসতি করেন। এই উপলক্ষ্যে আরও একটু কল্পনার বা অনুমানের অবকাশ আছে। দেবকীনন্দন বৈষ্ণববন্দনায় বলিয়াছেন—

প্রেমানন্দময় বন্দোঁ আচার্য্য মাধব। ভক্তি বলে হৈলা গঙ্গা দেবীর বল্লভ॥

এখানে "ভক্তিবলে" এই শব্দের সার্থকতা কি? ইহা কি 'গঙ্গাভক্তিবলে' বুঝাইতেছে? তাহা হইলে কি ইনিই গঙ্গামঙ্গল লিখিয়াছিলেন বুঝিতে হইবে?

কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের ভণিতায় এইস্থলে আছে—

শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দচরণকমল। কৃষ্ণদাস বিরচিল শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥[২]

১। ব-সা-প প্রকাশিত (১৩৩৩)। ২। পৃ ১০৪, ৩৮৭

ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে, কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দ প্রভুর শাখাভুক্ত ছিলেন।

শারদাচরিত বা চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা মাধবকে অনেকে গঙ্গামঙ্গল রচয়িতা মাধবের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। এই দুই মাধব সম্ভবতঃ সমসাময়িক ছিলেন। গঙ্গামঙ্গলের গণেশবন্দনার সহিত শারদাচরিতের গণেশবন্দনায় যৎকিঞ্চিৎ মিল আছে। ইহা ছাড়া এই অনুমানের পোষক আর কোনও যুক্তি গঙ্গামঙ্গলের ভণিতায় নাই। অধিকাংশ স্থলেই কবির নাম পাইতেছি মাধবানন্দ। অথচ এই নাম শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে পাই না। যাঁহারা দুই কবিকে অভিন্ন মনে করেন, আশা করি তাঁহারা কথাটা ভাবিয়া দেখিবেন।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা কৃষ্ণদাস নিজের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

মাতা অতি পতিব্রতা পদ্মাবতী নাম।
পিতা সে যাদবানন্দ অতি গুণবান॥
তর্ক বর্ক পিতা মোর কিছুই না জানে।
সভাকে উত্তম জ্ঞানে দাস-অভিমানে॥
জাহ্নবী পশ্চিম-কূলে বসতি আমার।
বর্ণিতে কৃষ্ণের তত্ত্ব নহে অধিকার॥
আচার্য্য গোসাঞির স্থানে করি ভৃত্য কার্য্য।
দেখিঞা করিল দয়া মাধব আচার্য্য॥
না পড়িল না শুনিল হিয়া পরকাশ।
বুঝিয়া রাখিল মোর নাম কৃষ্ণদাস॥ পৃ ৩৮৫॥

ইহা হইতে জানা যায় যে 'কৃষ্ণদাস' কবির গুরুদত্ত নাম। গুরুসূত্রে কবি নিত্যানন্দ প্রভুর শাখাভুক্ত ছিলেন তাহা অনুমান করিবার কিঞ্চিৎ হেতু আছে। বন্দনায় মহাপ্রভু ও নিত্যানন্দ প্রভুর একত্র উল্লেখ আছে—

নবদ্বীপচন্দ্র বন্দ নিতাই চৈতন্য।
কৃতপাপী তরাইতে আর কেবা অন্য॥ পৃ ৫॥

ভণিতায় দুই স্থলে শ্রীচৈতন্য এবং নিত্যানন্দের উল্লেখ আছে—

শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ চরণকমল।
কৃষ্ণদাস বিরচিল শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥ পৃ ১০৪ ॥
শ্রীচৈতন্য নিত্যানন্দ পদ (যুগ) করি আশ।
মাধবচরিত গান গায় কৃষ্ণদাস ॥ পৃ ৩৮৭ ॥

আমার অনুমান যথার্থ হইলে বলিতে হইবে, কবির গুরু মাধব আচার্য্য নিত্যানন্দ প্রভুর দ্বিতীয়া পত্নী জাহ্নবী দেবীর শিষ্য ছিলেন।

আমার [প্রভুর] প্রভু শ্রীমতী ঈশ্বরী।
দীক্ষামন্ত্র দিলা প্রভু মোর কর্ণে ধরি ॥ পৃ ৩৮৪ ॥

কবির গুরু মাধব আচার্য্য একখানি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে কবির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি—

মাধব আচার্য্য বন্দো কবিত্বশীতল।
যাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ॥[১]
পূর্ব্বে গ্রন্থ লিখিয়াছে আচার্য্য গোসাঞি।
মনে অনুমানি সেই অনুসারে যাই ॥
লিখিতে না পারি মনে সদাই তরাস।
না জানি আচার্য্য মোর করে সর্ব্বনাশ ॥
আচার্য্য দেখিয়া গ্রন্থ করিল বাখান।
রস পাইয়া গান করে[২] অমৃত সমান ॥
দক্ষিণে তোমার গ্রন্থ হইবে প্রচার।
এথাতে গাইতে গ্রন্থ রহিল আমার ॥ পৃ ৫-৬ ॥

প্রথম মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে নিত্যানন্দ প্রভুর উল্লেখ নাই, সুতরাং এই মাধব আচার্য্য দ্বিতীয় মাধব হইবেন। দ্বিতীয় মাধবের বিশিষ্ট ভণিতার অনুরূপ ভণিতা কৃষ্ণদাসের কাব্যে দুই এক স্থলে দেখা যায়।

১। এই পয়ারটি দেবকীনন্দনের বৈষ্ণববন্দনায়ও দেখা যায়।
২। 'শুনি' মুদ্রিত পুস্তক, 'করে' রতন-লাইব্রেরী পুঁথি ১৫৪।

চিন্তিঞা চৈতন্যচান্দের চরণকমল।
কৃষ্ণদাস বিরচিল শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥ পৃ ১২৮॥

ভণিতায় কবি অনেক স্থলেই দ্ব্যর্থের সাহায্যে গুরু এবং গোবিন্দের বন্দনা একসঙ্গে করিয়াছেন। যথা—

মাধবচরণে করি নিবেদনে
বিরচিল কৃষ্ণদাস॥

কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই। কবিব উক্তি হইতে স্পষ্ট জানা যায় যে তখন বৃন্দাবনে গোস্বামিগণের পূর্ণ প্রতিপত্তি। কবি বন্দনায় রূপ এবং রঘুনাথ গোস্বামীর নাম করিয়াছেন; অন্যত্র রাধাকুণ্ড, শ্যামকুণ্ডের উল্লেখ আছে।

অদ্বৈত স্বরূপ বন্দো রায় রামানন্দ। রূপ রঘুনাথ বন্দো করিয়া আনন্দ॥ পৃ ৫॥
রাধাকুণ্ড শ্যামকুণ্ড শোভে মনোহর। কুণ্ডতীরে বৃক্ষগণ দেখিতে সুন্দর॥ পৃ ১৭৭॥

পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের মধ্যে কেবল বৃন্দাবনদাস এবং স্বীয় গুরু মাধব আচার্য্যের উল্লেখ আছে;

বৃন্দাবনদাস বন্দো হইঞা সম্মত। যাহার রচিত গীত চৈতন্যভাগবত॥
মাধব আচার্য্য বন্দো কবিত্বশীতল। যাহার রচিত গীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল॥ পৃ ২৫॥

কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে রচিত কৃষ্ণায়ণ কাব্য। শ্রীমদ্ভাগবতে নাই এমন কিছু কিছু কাহিনীও ইহার মধ্যে স্থান পাইয়াছে। দানখণ্ড, নৌকাখণ্ড, ভারখণ্ড, বংশীচৌর্য্য প্রভৃতি লীলাকাহিনী কোন পুরাণে বর্ণিত হয় নাই। তাহাও ইহাতে আছে। কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন—

দানখণ্ড নৌকাখণ্ড নাহি ভাগবতে।
অজ্ঞ নহি কিছু কহি হরিবংশমতে॥ পৃ ১৩৭॥
আর অপরূপ কথা অমৃতের ভাণ্ড।
না লিখিল বেদব্যাস এই নৌকাখণ্ড॥
হরিবংশে লিখিঞাছে করিয়া বিস্তার॥ পৃ ১৫০॥

খিল হরিবংশে এই কাহিনীগুলি নাই। কৃষ্ণদাসের উক্তি যদি অজ্ঞানপ্রসূত না হয়, তবে এক ভাষা হরিবংশ ছিল বলিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ভবানন্দের কাব্যের নামও যে হরিবংশ এই কথা স্মর্ত্তব্য।

রাজা জিজ্ঞাসয়ে কথা কহে মহামুনি।
পারিজাতহরণ কথা কহ দেখি শুনি ॥ পৃ ৩২৭ ॥

পারিজাতহরণ কাহিনী অবশ্য হরিবংশে আছে। কবি মহাভারত হইতে দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ ও সুভদ্রাহরণ কাহিনী এবং উঞ্ছবৃত্তিকথা লইয়াছেন।

এবে শুন সর্ব্বজন করি নিবেদন। যেন মতে দ্রৌপদীর হরিল বসন ॥
এ সব রসের কথা নাহি ভাগবতে। বিস্তারি কহিল কিছু ভারতের মতে ॥ পৃ ৩৪৩ ॥
কথার প্রসঙ্গে কথা হয় সেই কালে। কহিল ভারতকথা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে ॥ পৃ ৩৫২ ॥

মহাভারত হইতে গৃহীত দ্রৌপদীর বস্ত্রহরণ এবং সুভদ্রাহরণ কাহিনীতে কিছু কিছু নূতন কথাও পাওয়া যায়। দ্রৌপদীকে ধৃতরাষ্ট্রের বরদানের পর দুর্য্যোধনের গৃহে অগ্নি লাগায় দুর্য্যোধনের অন্তঃপুরস্থ মহিলারা অগ্নিভয়ে বিবস্ত্র হইয়া সভামধ্য দিয়া পলাইয়াছিলেন।

বর পাইঞা ঘর গেলা দ্রুপদনন্দিনী। দুর্য্যোধনের ঘরে উঠিল আগুনি ॥
খাট পাট পোড়ে আর রত্নসিংহাসন। অবশেষ পোড়ে রাজরাণীর বসন ॥
ছাড়িল বসন সভে অগ্নির জ্বালায়। নগ্ন হইঞা সভা দিঞা রমণী পলায় ॥
কর্ণ ভীষ্ম আদি বীর আছিল সভাতে। বিবস্ত্র রমণী দেখি রহে হেটমাথে ॥

কৃষ্ণদাসের মতে অর্জ্জুন সুভদ্রাকে দেখিয়া প্রথমে পছন্দ করেন নাই, সুভদ্রাই অর্জ্জুনের প্রেমে পড়িয়াছিলেন। তাহাতে সত্যভামা—তুকতাকের সাহায্যে অর্জ্জুনকে সুভদ্রার প্রতি আকৃষ্ট করেন।

দেবী বোলে মায়াবতি শুনহ বচন। ভুলিল সুভদ্রা দেবী দেখিঞা অর্জ্জুন ॥
বিভা দিতে গিয়াছিলাঙ অর্জ্জুনের ঘরে। না করিল বিভা সেই অর্জ্জুন নৃপবরে ॥
এত শুনি মায়াবতী জপে ব্রহ্মজ্ঞান। সিন্দূর কজ্জল দিয়া করিঞা নির্ম্মাণ ॥
ভয় না করিহ দেবী দেখিঞা অর্জ্জুন। পরশ করিলে দ্বার খসিবে অখন ॥
মায়ার বচনে দেবী সুভদ্রা আসিঞা। মন্দিরে প্রবেশ করে দ্বার ঘুচাইঞা ॥

তরস্ত হইল বীর হাতে খড়্গ করি। উঠিতে দেখিল দেবী সুভদ্রা সুন্দরী ॥
পূর্ণিমার পূর্ণচন্দ্র দেখিঞা বদন। কন্দর্প জিনিল তনু বাড়িল মদন ॥
দেখিঞা অর্জ্জুন বীর পড়ি গেল ভোলে। ছটপট করে দেবী অর্জ্জুনের কোলে ॥
দেবী বলে আজি মোর কৈলে সর্ব্বনাশ। করিলা আমার এবে জাতিকুলনাশ ॥
দেবী আস্ফালন করে অর্জ্জুনের পাশে। মুখে বস্ত্র দিঞা দেবী সত্যভামা হাসে ॥
পৃ ৩৬০-৬১ ॥

মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল হইতে কৃষ্ণদাসের কাব্যের আকার অনেক ছোট। যাহাতে গ্রন্থবাহুল্য না হয় সে দিকে কবির সজাগ দৃষ্টি ছিল।

নাম নিতে লাগে ডর, গ্রন্থ বাড়ে বহুতর,
তেঞি ইহা না কৈল বিস্তার ॥ পৃ ২৮৩ ॥
অন্য অন্য গ্রন্থে ইহা বিস্তারি কহিল।
কহিতে পুস্তক বাড়ে সংক্ষেপে রচিল ॥ পৃ ৩৬৫ ॥

কৃষ্ণদাসের কাব্য মাধবের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল হইতে কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট হইলেও ইহার বিশেষ কিছু প্রসার হয় নাই। এই কারণেই কাব্যটির পুঁথি বেশি পাওয়া যায় না। মুদ্রিত পুস্তকের রাগরাগিণীর উল্লেখ প্রায়ই নাই, কেবল ছয় স্থলে মাত্র আছে—কর্ণাট, গৌরী (=গৌড়ী), বড়ারি, শ্রী, সারঙ্গ, করুণা। মুদ্রিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলে গোবিন্দদাসের পদ একটি রহিয়া গিয়াছে [পৃ ২৩০-৩১]। গ্রন্থের শেষে কবি একটি 'অনুবাদ' অর্থাৎ সূচী দিয়াছেন। ব্রজবুলি পদ দুই একটির অধিক নাই। এই সকল সখী এবং লীলাসহায়িকার উল্লেখ আছে [পৃ ১৩৮, ১৭৭] —চন্দ্রাবলী, মঞ্জুলালী, ললিতা, বিশাখা, কুন্দলতা, ইন্দুমুখী, বিন্দুমুখী, মাধবী, কমলা, সুদেবী, সুচিত্রা, সুশীলা, হেমা, ক্ষেমা, যূথী, শ্যামা, রঞ্জনা, খঞ্জনা, রূপমঞ্জী, রসপুঞ্জী, সুলোচনা, রঙ্গা, অনসূয়া, হরিপ্রিয়া, তুলসী, মল্লিকা, তারা, উমা, সত্যভামা, সুবর্ণকলিকা, পৌর্ণমাসী, বীরা, বৃন্দা।

কৃষ্ণদাসের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল একখানি উৎকৃষ্ট কাব্য। কবির চলিত ভাষার উপর দখল ছিল অসাধারণ। কাব্যটির মধ্যে অর্থান্তরন্যাস হিসাবে ব্যবহৃত প্রবচন ও সূক্তি মন্দ নহে। কতিপয় উদাহরণ দিতেছি।

কৃষ্ণ না দেখিয়া কান্দে যশোদা রোহিণী।
ডুম্বুর হারাইয়া যেন ফুকরে বাঘিনী॥ পৃ ৫২॥

ধাইঞা যাইঞা নন্দরাণী কোলে নিল পুত্র।
ঘটভরা ধন যেন পাইল দরিদ্র॥ পৃ ৫৩॥

নিরখএ চাদমুখ বালকের ভানে[১]।
কল্পতরু ফল মাগে সাকোটের স্থানে॥ পৃ ৭৯॥

নলিনীর বন যেন উড়াইল ঝড়ে।
কাটিল কদলী যেন আছাড়িঞা পড়ে॥ পৃ ১০৪॥

কাটিল কদলী যেন ডালে মূলে পড়ে।
আছাড় খাইয়া যেন পড়এ পাথারে॥ পৃ ২১৭॥

এতেক বলিঞা কৃষ্ণ দিলেন বিদায়।
শুকাইল আশানদী গ্রীষ্মের[২] বাএ॥ ১৩৫॥

অক্রুর গাঁথিয়া দিল বিরহের মালা[৩]।
কত না জপিবে গোপী বিরহের মালা॥ ২০৫॥

অন্তরে দুস্থিত দেবী সয়াস্ত না পায়।
মন-বন পোড়ে যেন উথলিল বায়॥ ২৫৬॥

কৃষ্ণদাসের কবিত্বশক্তির পরিচয় হিসাবে নবজাত কৃষ্ণের রূপবর্ণনাটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

চেতন পাইঞা রাণী কোলে দেখে পুত্রখানি,
আনন্দ-সাগর মাঝে ভাসে।
দেখিল বালক তনু নীল সে কমল জনু,
তিমিরে তিমিরপুঞ্জ নাশে॥

১। 'ভালে' মুদ্রিত পাঠ। ২। 'গিরিসের' পাঠ হওয়া উচিত। ৩। 'শলা'?

জিনি রাঙা উৎপল শোভে কর পদতল,
উদিত কমল মুখচান্দে।
হেরিঞা বালক পানে ধারা বহে দুনয়ানে,
কি জানি কি লাগি প্রাণ কান্দে॥
ও চান্দবদন দেখি পালটিতে নারি আঁখি,
নিরখি ধৈরজ মাহি মানে।
তোমরা দেখহ আসি, উদয় কৈরাছে শশী,
নন্দকে ডাকএ হাত-সানে॥
জনম সাফল কর, বালক দেখহ তোর,
নিরমল বদনকমল।
জিনি পাকা বিম্বফল আঁখি কর পদতল,
আঁধারে করিছে ঝলমল॥
জিনিঞা বান্ধলি ফুল অধরের দুটি কুল,
রহে যেন অন্তরে লাগিঞা।
রসে ঢরঢর আঁখি, তারক ভ্রমর পাখী,
প্রাণ হরি লইল চাহিঞা॥
তড়িত বিজুরী কিবা নব মেঘে যেন শোভা,
ভুরুযুগ কামের কামান।
জিনি ইন্দ্রনীল মণি মাজিঞাছে মুখখানি,
বিরলে করিল নিরমাণ॥ পৃ ৩১-৩২॥

কৃষ্ণদাস মালঝাঁপ পয়ারের বিশেষ ভক্ত ছিলেন। দানখণ্ড অংশ হইতে মালঝাঁপের উদাহরণ দিতেছি।

পাকা চুলে নানা ফুলে বাঁধিল কবরী।
দোবসন পীন স্তন বাঁধে উচ্চ করি॥
হাতে নড়ি যায় বুড়ী যুবতীর আগে।
গজপতি জিনি গতি চলে মহাবেগে॥

আইস পথে মোর সাথে হেট করি মাথা।
কারু সনে কোন জনে না কহিহ কথা ॥
তো সভাকে যদি দেখে আসি নন্দলাল।
পথে পাঞা সভা লৈঞা পড়িবে জঞ্জাল ॥
রাধা বোলে, তরুতলে কিবা দেখি সখি।
হাতে বাঁশী মুখে হাসি রাঙ্গা দুটি আঁখি ॥
নীপতটে মেঘ বটে নামিয়াছে যেন।
বরিষণে গোপীগণে ভাসাইবে হেন ॥ পৃ ১৩৮-৩৯ ॥

কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর রচয়িতা রঘুনাথ ভাগবতাচার্য্যের এক শিষ্য বলিয়া উল্লিখিত রামকান্ত শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বন করিয়া একটি শ্রীকৃষ্ণরচিত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া কেহ কেহ অনুমান করেন। এই কাব্যের একটি মাত্র পাণ্ডুলিপির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।[১] রামকান্ত রাজসাহী জেলার গুড়নই গ্রামস্থ মৈত্রকুলোদ্ভব ব্রাহ্মণ ছিলেন ; পরে ইনি রঙ্গপুর জেলার ব্রাহ্মণীকুণ্ডা গ্রামে বাস করেন। রামকান্তের লিখিত বলিয়া কথিত কাব্যের অল্প কিছু নিদর্শন নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

ফুল ফলে নম্র হইয়া কৈলা পরণাম।
সাধু সাধু বলি হরি কৈলা কি বাখান ॥
কৃষ্ণ-দরশন-চিহ্ন দেখিল বিদিতে।
কলিকা ভাঙ্গিয়া কৃষ্ণ গেলা এহি পথে ॥
অভাগিনী গোপনারী করিয়ে জিজ্ঞাসে।
স্বরূপে কহিবে তুমি কৃষ্ণ-উপদেশে ॥
এহি মতে তরুলতা পুছিয়া বেড়ায়।
বৃন্দাবনে ফিরে গোপী পাগলিনী প্রায় ॥

১। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়, দীনেশচন্দ্র সেন সঙ্কলিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত (১৯১৪) প্রথম খণ্ড, পৃ ৮০৬।

ধরিতে না পারে চিত্ত না রহে জীবন।
উপায় করিয়া প্রাণ রাখে কত জন॥
কত কত কর্ম্ম কৃষ্ণ কৈল অবতারে।
গোপীগণ যেই যেই লীলারূপ ধরে॥
রঘুনাথ পণ্ডিতে রচিল রসময়।
শুনিলে দুরিত খণ্ডে হরে ভব-ভয়॥
গুরুপদে করি মতি দীন হীন ভ্রান্ত।
বিংশতি অধ্যায় রাস লিখে রামকান্ত॥

ভণিতার পূর্ব্ববর্ত্তী পয়ারটি শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর ভণিতারই অনুরূপ। যথা—

ভাগবত-আচার্য্য রচিত রসময়।
শুনিলে দুরিত হরে খণ্ডে ভবভয়॥

বস্তুতঃ বঙ্গসাহিত্যপরিচয়ে রামকান্তের কাব্যের নিদর্শনরূপে যেটুকু অংশ উদ্ধৃত করা হইয়াছে তাহা ভাগবতাচার্য্যের কাব্যেরই অংশ মাত্র, স্বতন্ত্র রচনা নহে। কৌতূহলী পাঠক বঙ্গসাহিত্যপরিচয়ের ৮০৬-৮০৮ পৃষ্ঠার সহিত কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর ত্রিংশ অধ্যায় মিলাইয়া দেখিতে পারেন। প্রকৃত পক্ষে রামকান্ত ভাগবতাচার্য্যের কাব্যের একটি পুঁথির লিপিকার মাত্র।

গুরুপদে করি মতি দীন হীন ভ্রান্ত।
বিংশতি অধ্যায় রাস লিখে রামকান্ত॥

এখানে 'বিংশতি' শব্দটি 'ত্রিংশ' বা 'ত্রিংশতি' শব্দের ভ্রান্ত পাঠ মাত্র। উদ্ধৃত অংশটি রাসলীলার বটে এবং শ্রীশ্রীকৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণীর ত্রিংশ অধ্যায়ও বটে। লিপিকার কর্ত্তৃক প্রক্ষিপ্ত পয়ারটি হইতে রামকান্ত যে ভাগবতার্য্যের শিষ্য ছিলেন এরূপ অনুমানও যুক্তিসঙ্গত হইবে না।

কবিশেখরের গোপালবিজয় অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য হইতে কিছু স্বতন্ত্র। গোপালবিজয় মূলতঃ বর্ণনামূলক কাব্য, অপরাপর শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের মত গীতিমূলক নহে গোপালবিজয়ের সুদীর্ঘ পদগুলির অধিকাংশই পয়ারছন্দে বিরচিত,

ক্বচিৎ ত্রিপদীতে। বাঙ্গালা রামায়ণ ও মহাভারতের সাদৃশ্যে গোপালবিজয়কে যথার্থ 'কৃষ্ণায়ণ' বলা যাইতে পারে।

গোপালবিজয় কাব্যের খণ্ডাংশের পুঁথিই বেশী পাওয়া গিয়াছে। সম্পূর্ণ পুঁথি নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৬৩ সংখ্যক পুঁথিটি সম্পূর্ণ পুঁথি হইতে পারে। ইহাতে কৃষ্ণের বৃন্দাবনত্যাগ পর্য্যন্ত লীলাকাহিনীর বর্ণনা আছে। ইহার পরও কৃষ্ণচরিত বর্ণিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না, কেননা তাহা হইলে কবি স্বীয় কাব্যের 'গোপাল'-বিজয় নামকরণ করিতেন না। যাহা হউক অন্য পুঁথি পাওয়া না গেলে এই অনুমানের মীমাংসা হইবে না।

কাব্যটিতে কবি কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়া গিয়াছেন। কবির পিতার নাম চতুর্ভুজ, মাতা হরাবতী, জন্ম 'সিংহ বংশে'। কবির প্রকৃত নাম দৈবকীনন্দন, উপাধি বা নামান্তর কবিশেখর বা কবিশেখর রায়। গোপালবিজয় কবির চতুর্থ রচনা। প্রথমে রচনা করেন গোপালচরিত মহাকাব্য, তাহার পর 'গোপালের কীর্ত্তনামৃত'—ইহা সম্ভবতঃ ব্রজলীলাবিষয়ক পদসমষ্টি বুঝাইতেছে,—তাহার পর গোপীনাথবিজয় নাটক, সর্ব্বশেষে গোপালবিজয়। গোপালচরিত মহাকাব্য এবং গোপীনাথবিজয় নাটক সংস্কৃতে রচিত, সন্দেহ নাই।

তবে মহাকাব্য কৈল গোপালচরিত। তবে কৈল গোপালের কীর্ত্তনামৃত ॥
গোপীনাথবিজয় নাটক কৈল আর। তমু গোপবেশে মন না পুরে আমার ॥
তবেই পাঁচালী করি গোপালবিজয়ে। বৈষ্ণবজনের রেণু করিয়া হৃদয়ে ॥
সিংহবংশে জন্ম নাম দৈবকীনন্দন। শ্রীকবিশেখর নাম বলে সর্ব্বজন ॥
বাপ শ্রীচতুর্ভুজ মা হরাবতী। কৃষ্ণ যার প্রাণধন কুলশীলজাতি ॥[১]

কাব্যের রচনাকালের উল্লেখ নাই কাব্যমধ্যে শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার পরিকর-দিগের কোন উল্লেখ না থাকিলেও কবির বৈষ্ণবোচিত বিনয় প্রকাশ হইতে এবং অন্যান্য উক্তি হইতে কবি যে শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী তাহা বুঝিতে কষ্ট হয় না। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রচিত রামগোপালদাসের রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীতে গোপালবিজয় কাব্য হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে।[২]

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি, পত্রাঙ্ক ২খ। ২। ব-সা-প-প ৩৭, পৃ ১১৩।

গোপালবিজয় কাব্যের ভণিতায় অধিকাংশ স্থলেই কবিশেখর নাম পাই, ক্বচিৎ দুই এক স্থলে 'শেখর' এবং 'রায় শেখর' পাওয়া যায়।[১] সুপ্রসিদ্ধ পদকর্ত্তা কবিশেখর রায় বা রায়শেখর শ্রীখণ্ডের শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্য ছিলেন। একাধিক শাখানির্ণয় গ্রন্থে শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের শাখার মধ্যে কবিশেখর রায়ের নাম করা হইয়াছে।

ততঃ সদ্‌গুণযুক্তশ্রীকবিশেখররায়কঃ।
চিত্রানি গীতপদ্যানি গীয়ন্তে যস্য সঙ্গনৈঃ ॥[২]

এই কবি আর গোপালবিজয় কাব্যের কবি এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু গোপালবিজয়ে শ্রীরঘুনন্দনের নাম নাই। তবে কি শ্রীরঘুনন্দনের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই কাব্যটি রচিত হইয়াছিল?

শ্রীমদ্‌ভাগবতে উল্লিখিত শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলার প্রায় সব কাহিনীই গোপাল-বিজয়ে বর্ণিত হইয়াছে, উপরন্তু দানলীলা ও নৌকাবিলাসের বর্ণনাও আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত দানলীলা বর্ণনাটি গোপালবিজয়ের অন্যতম মুখ্য কাহিনী। বংশীখণ্ড শীর্ষকে যে লীলাকাহিনীর উল্লেখ আছে তাহার সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বংশীখণ্ড কাহিনীর অথবা শ্রীরূপ গোস্বামিপ্রোক্ত বংশীচৌর্য্য কাহিনীর কোন মিল নাই। রাসলীলার প্রারম্ভে শ্রীকৃষ্ণ যে বংশীধ্বনি করিয়া গোপীদিগকে বৃন্দাবনে আকর্ষণ করিয়া আনিয়াছিলেন সেই ব্যাপারই গোপালবিজয়ে 'বংশীখণ্ড' বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। রাসের বর্ণনার পর অক্রূরের আগমন এবং শ্রীকৃষ্ণের মথুরাযাত্রা।

১। শেখরে সে কহে গোপাল বিজয়ে,
শুনিতে আতি রসাল।
সব বেদসারে বুঝাহ সংসারে,
তর সুখে কলিকাল ॥
মন্দসুবর্ণে কভু যোড় নাহি রহে।
রায় শেখর তাহে দেখিল কথা কহে ॥

২। প্রদীপ ১৩১২, পৃ ৫৬। দ্রষ্টব্য—রামগোপাল দাস রচিত শাখানির্ণয়, পৃ ১৫, পদকল্পতরু, পদসংখ্যা ২১৮৯।

গোপালবিজয়ের প্রারম্ভে দুইটি বা তিনটি সংস্কৃত শ্লোক আছে। আলোচ্য পুঁথিতে শ্লোক দুইটি এরূপ দুষ্ট যে সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার অসম্ভব। প্রথম শ্লোকের শেষ পদ হইতেছে— "স ভক্তজনজীবনো জয়তি দৈবকীনন্দনঃ ॥" দ্বিতীয় শ্লোকটি বা শ্লোক দুইটির পাঠ এইরূপ—"সজ্জনচরণরজোঽলঙ্করণঃ গঙ্গাজলনির্ম্মলান্তকরণঃ সৎকারপণ্ডিতচিত্তহরণঃ। লিখিতং শ্রীকবিশেখরেণ এতাং প্রতিপদসময়ং পদসমুপেতাং নিরবধিমধুরে প্রকৃতরসিকালীং শ্রীগোপালবিজয়পঞ্চালীং।" এখানে সম্ভবতঃ লিপিকার দুইটি শ্লোক গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছেন। কবি যে স্বীয় কাব্যকে 'গোপালবিজয়পঞ্চালী' বলিয়াছেন ইহা লক্ষণীয়।

কাব্যের মুখবন্ধ এইরূপ—

গৌরী রাগ।

জয় জয় গোপাল গোবিন্দ ॥ ধ্রু।

একে একে দেবতার কত নিব নাম। নারায়ণচরণে আমার পরণাম ॥
এক সুবর্ণে যেন নানা অলঙ্কার। তেন নারায়ণ সব-দেব-অবতার ॥
প্রসঙ্গে কহিব বেদপুরাণের সার। পণ্ডিত মুরুখে সব বুঝিহ বিচার ॥
ব্রহ্মা-আদি তৃণ-অন্ত যত কিছু দেখ। নারায়ণময় সব যেন পরতেখ ॥
যেন সব নদনদী সমুদ্রকে যায়। তেন সব-দেব-পূজা নারায়ণে পায় ॥
আচারবিচারে বেদবেদান্তে না পাই। অনুভবে ভাবিতে আছয়ে সব ঠাঞি ॥
সেই নারায়ণ চিদানন্দ নন্দসুতে। শুনিতে শুনিতে মনে বাসি অদভুতে ॥
কি কহিব আর যত অংশ অবতারে। দুষ্ট মারি সৃষ্টি রাখিল বারে বারে ॥
সে সব প্রভুর যদি অবতার হয়। তা সব বর্ণিতে তনুমন নাহি লয় ॥
এক গোপরূপে যত করিল বিলাস। তাহাই কহিতে মনে অধিক উল্লাস ॥
ভালমন্দ হউ কিছু না লব বিচার। যে কিছু বর্ণিয়া দিব নন্দের কুমার ॥
পূরবে আছয়ে বেদ পুরাণ ভাগবতে। কবি বর্ণিআছে যত যার যেবা মতে ॥
পণ্ডিতেই তা সব শুনিঞা পায় সুখে। শাস্ত্রের মরম কত জানিব মুরুখে ॥
মুরুখের ঠাঞি সব শ্লোক বিফল। বানরের হাতে যেন ঝুনা নারিকেল ॥
জ্ঞান না থাকিলে সব বুঝএ পাষণ্ড। বিনি দন্তে কি করিব সেই ইক্ষুদণ্ড ॥

সহজেই কলিকালে মুরুখ অপার। পণ্ডিতজনের হব বিরলপ্রচার ॥
কলিতে বিদ্যায় দুন্থ বাঢ়য়ে অহঙ্কার। পুথিতে অভ্যাস করে ধন অর্জ্জিবার ॥
সব পর ভাবিয়া আপন নাম করে। নানা পরকারে পোষে নিজ পরিবারে ॥
হেন মত কলিকালে পণ্ডিতের ব্যবহারে। নরদেহ ধরি যেন বুলে অহঙ্কারে ॥
লোক রঞ্জিবারে করে আচারবিচার। মনশুদ্ধি নাহিক আটোপমাত্র সার ॥
কলিকালে লোকের বুঝিতে নারি চিত্ত। কিবা সে মুরুখ আর কিবা সে পণ্ডিত।
কেহ কেহ অভ্যাসে দড়াতে বাট বহে। কেহ কেহ অভ্যাসে অশেষ শাস্ত্র কহে।
অভ্যাস করিলে যদি পণ্ডিত বোলাই। কেবা নহে পণ্ডিত আনহ মোর ঠাঞি।
সেই সে পণ্ডিত যে বন্ধনমোক্ষ জানে। ইহা বই মুরুখ বুঝহ অনুমানে।
একেতে অধিকার নাহি ভাষার বিচার। বুঝিয়া মরম অর্থ কি করি ব্যবহার ॥
লৌকিক বলিয়া না করিহ উপহাসে। লৌকিক মন্ত্রে কি সাপের বিষ নাশে ॥
তেন কলিবিষ নাশে লৌকিককীর্ত্তনে। নামদেব কবির নিকট পরণামে ॥
পণ্ডিত সব যত পড়ে ভাগবত পুরাণে। কেবা না বুঝয়ে লোক লৌকিক আখ্যানে ॥
সে অর্থ বুঝিতে ফল পাই বা না পাই। সেই সব বিচার বুঝহ তার ঠাঞি ॥
যে জন পণ্ডিত বলি ধরে অহঙ্কারে। পুরাণ ভাগবত তবে আছে ভারে ভারে ॥
যে জনার অধিক নাহিক ব্যুৎপত্তি। গোপালচরণে তার থাকুক ভকতি ॥
ভাষাদোষ না বাছে ভাবনামাত্র জানে। রসের বচন দুই রহিয়া বাখানে ॥
কিবা মোর হেন যারা আছে গুণবন্ধে। তার লাগি কবিত্ব পাঁচালী পরবন্ধে ॥
ভাবকের পরায়ণ যোগীর সর্ব্বস্ব। রসিকজনের যেন মূর্ত্তিমান রস ॥
ইহলোকে পরলোকে হিত-উপদেশ। গোপালদেবের কেলি কৌতুক বিশেষ ॥
বিষয়ীর প্রাণধন বৈরাগীর ফল। বৈষ্ণবজনের ভাণ্ড সবার সম্বল ॥
পদ দুই শুনিলে মরম নাহি পাই। কি রস চিনির কণা জিহ্বায়ে গোসাই ॥
বসিক জনেই জানে রসের চাতুরী। জিহ্বা বিনে কোন অঙ্গ না লয়ে মাধুরী ॥
যাকে যার অভিরুচি সে হি তারে ভায়ে। পল্লব ছাড়িয়া উষ্ট্র কণ্টক চিবায়ে ॥
সব কালে সম্পদে কোথাও নাহি যায়ে। সকল মধুর কেহ কিছু নাহি পায়ে ॥
সব ভাল ফুলে মালা নাহি গাঁথে মালী। সর্ব্বক্ষণ মধুরে না কুহলে কোইলী ॥

সকল মধুরে এক ঠাঞি নাহি সিধি। অমৃত উপারি বিষ উগরে পয়োধি ॥
হেন মতে দোষ গুণ দেখিয়া সংসারে। দোষ আচ্ছাদিয়া গুণ করিবে প্রচারে ॥
আর একখানি দোষ না লবে আমার। পুরাণের অতিরেক লেখিব আপার ॥
অবিচারে আপাত না দিহ দোষ ভার। স্বপনে কহিয়া দিল নন্দের কুমার ॥

ইহার পর আত্মপরিচয়, এবং তাহার পরে মথুরাপুরীর বিস্তৃত বর্ণনা। তাহার পর কংসভয়ে দেবতাদিগের নারায়ণের শরণগ্রহণ বর্ণনা করিয়া কথাবস্তুর পত্তন হইয়াছে।

সখিগণ সমভিব্যাহারে রাধা মদনপূজায় চলিয়াছেন। সঙ্গে অভিভাবিকা হইয়া চলিয়াছে বড়াই, মূর্ত্তিমান্ হাস্যরসের বেশে। সুদূর অতীতের বাঙ্গালা দেশে পল্লীগ্রামের অতিবৃদ্ধা সধবা নারীর বর্ণনা হিসাবে এটুকু চমৎকার।

না বলিতে সব আগু চলিল বড়াই। তার রূপ গুণের কি কব বড়াঞি ॥
ধবলকেশের মাঝে সিন্দূর উজলে। ফুটিল কাশীর বন জলন্ত অনলে ॥
পরমযতনে যদি সর্ব্বাঙ্গ নেহালী। কোথায় না দেখি কাঁচ লোম এক পাড়ি ॥
কোঠরের পেঁচা যেন চঞ্চল নয়নে। ধোবার উনান যেন নাকের পাতনে ॥
পুরাণ গড়ুই যেন শ্যামল অধরে। রসুনের গোঁজা যেন দশনশিখরে ॥
সদাই সে মুখানিতে বন্দী আছে হাসি। ছুতা হাঁড়ী মুখে যেন চুন যাএ ভাসি ॥
আকার দেখিয়া লোক ঠাড়জব করে। কথাএ মরিল কাম জিআবারে পারে ॥
বৃদ্ধ বানরী সম নামু পাএ ধরে। উঠ সম মাঝা খিন চলন সুন্দরে ॥
তাহে নীল পাট শাড়ি পরে বেড়া দিয়া। যেন অন্ধকারে রহে পিশাচী বেড়িয়া ॥
চলিতে সর্ব্বাঙ্গ ঢুলে ঠাই ঠাই কাশি। তা দেখি চিতার মড়াএ উঠে হাসি ॥
হেন রূপে আগু যাএ প্রাণের বড়াই। হেন মূর্ত্তিমান হাস্য ভূমিতে বেড়াই ॥

কৃষ্ণ রাধাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। তিনি এক গোপনারীকে পাকড়াইলেন রাধাকে মিলাইয়া দিবার জন্য। গোপী বলিল রাধার মাতামহী বড়াইকে ধরিতে।

আছএ বড়াই নামে তার বৃদ্ধমাতা। সে যে করে তা খণ্ডিতে নারয়ে বিধাতা ॥
তারে মানাইতে যবে পার কোন পাকে। সফল করহ তোমার মনে থাকে ॥
আশয় তাহার বুঝি রাধিকার ঠাএ। কহিয়া তোমার গুণ জানিব হিয়াএ ॥
যবে তার কিছু বুঝি সরস বেভার। তবে মো মাগিয়া লব সব মোর ভার ॥

কৃষ্ণ বলিলেন, বড়াইকে তিনি চিনেন না। তখন গোপী দূর হইতে বড়াইকে দেখাইয়া ভয়ে আড়ালে লুকাইল। দলবল সহ বড়াই আসিলে কৃষ্ণ রাধার পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলেন। বড়াই বলিল,

আইহন বীরের নারী রাধিকা সুন্দরী। কাম পূজিবারে যাএ সব সখী মেলি ॥

বড়াইয়ের পরামর্শে কৃষ্ণ দানছলে রাধাকে আটকাইলেন। নিম্নে দানখণ্ড হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।[১]

এত বলি সব গোপী গেলা কৃষ্ণ পাশে। তা দেখি কানাঞি মুখে হাঁত দিয়া হাসে ॥
কি মিছা যুগতি কর গোয়ালার নারী[২]। বোধ না পাইলে লাগ না ছাড়ে মুরারি[৩] ॥
যবে দান দিতে নার এক বোল ধর। রাধা এড়ি বিকে যাহ মথুরা নগর ॥
প্রতীত নিমিত্ত রাধা থাকু মোর কাছে। বোল দিয়া রাধা লৈয়া ঘরে যাবে পাছে ॥
এ বোল শুনিঞা দূরে হাসিল বড়াই। ছুতা হাণ্ডি মুখে যেন চুন বাহিরাএ ॥
ভালই যুগতি বৈলে উদার কানাঞি। ভালে তোর বাপের মুখেতে লাজ নাঞি ॥
রাহুর নিকটে চাঁদ রহে কতক্ষণে। সিংহের সমুখে কেবা সমর্পে হরিণে ॥
মত্ত হাথি-হাথে কেবা থাপে ফুলমালে। ঘৃত কে আবুধ রাখে জ্বলন্ত আনলে ॥
ত্রিভুবনে নির্ব্বুদ্ধি হেন কেবা আছে। রাধিকা এড়িঞা যাব কানাঞির কাছে ॥
চোর চাহে আন্ধার ধাউর চাহে গোলে। ছিনার চাহে নিভৃতে আছে বেদ-বোলে[৪] ॥
প্রতীত নিমিত্ত যদি[৫] বল বনমালী। আমি তোর ঠাঞি থাকি যাউক গোআলী[৬] ॥

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি এবং বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পুঁথিশালার ৩১২ সংখ্যক পুঁথি অবলম্বন করা হইয়াছে। পরিষদের পুঁথিটি খণ্ডিত, তবে সুপ্রাচীন। বা·প্রা·পু·বি ৩-৩, পৃ ১০৮-১০৯।

২। পাঠান্তর 'গোয়ালসুন্দরী'। ৩। ঐ 'বোধ নাহি পালো আমি ছাড়িতে না পারি'।

৪। চোর চাহে অন্ধকার ধাকড় চাহে গোল।
মুকুতার গ্রীহি সুত চাহে বেদবোল ॥ ঐ।

৫। ঐ 'অপ্রতীত লাগি জবে'। ৬। ঐ 'জাউ সব নারি'।

এ বোল শুনিঞা তবে হাসে দামোদর। রুষিয়া রাধিকা কিছু কহিল উত্তর ॥
পাগল বড়াই কিবা বলিব তোমাএ। ভালে সে বয়স গেলে দোষ না পালাএ ॥
এক বোল ভাল নাহি বলে বনমালী। আরে তুমি না বুঝিয়া পাতহ ঢামালী ॥
যে যাবে সে যাউ বিকে মোর নাহি সাধে। পসরা যে নিবে নেয় ঘর যাও রাধে[১] ॥
এত বলি রাধা যবে গেলা কথোদূরে। বুড়ি আদি সভাকারে রাখি তরুমূলে ॥
পাএ বেঢ়ি কিবা দিঞা মণ্ডলী মাঝে। সব গোপী রাখিয়া চলিল দেবরাজে ॥
কহে কবিশেখর রাধার চতুরালী। যা শুনিলে সুখী হএ দেব বনমালী ॥
যাবৎ রাধিকা নাহি হয় আঁখি আড়ে। তাবৎ কানাঞি যে ধৈরজ নাহি ছাড়ে ॥
লাঁফ দুএ আগুলিল রাধিকা তরুণী। সিংহ আগুলিল যেন বনের হরিণী ॥
কাতর নয়নে রাই চাহে চারি পানে। সমুখে দেখিএ একা নন্দের নন্দনে[২] ॥
কৃষ্ণ দেখি রাধিকা কাঁপএ থরহরি। মলয়পবনে যেন কলার বালুড়ি ॥
কৃষ্ণ বলে আল রাই না চিন আপনা। আমা নহে করি যাহ কাহার সামনা ॥
রাখিল তোমারে হের যমুনার তীরে। দেখি কি করিতে পারে আইহন[৩] বীরে ॥
ধরিল আঁচল হের ছাড়িয়া না দিব। উচিত যে দান হএ এইখানে নিব ॥
এতেক উত্তর যবে বৈল শ্রীহরি[৪]। বলিতে লাগিল কিছু রাধিকা গোআলী ॥
না ধর আঁচল হের নিলজ কানাঞি। নাহিক অধর্ম্ম ভয় লোক ভয় নাঞি ॥
আপনার কুবুদ্ধি ছাড়হ নাহি মোরে। আন লোক দেখিলে কি বলিব তোমারে ॥
যে তোমার দেখিএ নিলজ ব্যবহার। হাসিতে হাসিতে মোর করিলে খাঁথার ॥
মদনে আঁধল আর বোল নাহি শুন। আপাতমধুর দেখি পাছু নাহি গুণ ॥
অবলাএ বল কত করহ কানাঞি। ভাগ্যপুণ্যে নাহি পড় মানুষের ঠাঞি ॥
কংস নাম শুনিলে পালাহ সাত বাড়ি। গোআলার বহু দেখি পাতহ ঢামালি[৫] ॥
ছাড়হ ছাড়হ কানু কেহ জানি দেখে। কাঁচলি না ধর জানি লাগে নখরেখে ॥
সম্ভ্রমে না ধর কানু টুটে জানি হার। বলে না পারিলে হয় হেন কি বেভার ॥

১। ঐ 'পসরা যে নিবেক নেউগ কাজ নাহি বাদে'।
২। ঐ 'চারি দিগে কেহ নাহি সমুখে নারায়ণে'। ৩। ঐ 'সেই আআন'।
৪। ঐ 'এত বলি কৃষ্ণ পাতে অশেষ ঢামালি'। ৫। ঐ 'বাগাড়ি'।

যশোদা দোহাই যবে আর মোরে ছোহ। মোর গাএ কত আর নখ চিহ্ন দেহ[১] ॥
আমি কুলবতী নারী তাথে একাকিনী। তুমি যত বড় ভাল সব লোকে জানি ॥
নিকটে যমুনাবন অতি ঘোরতর। লোক গতাগতি নাহি অতি তেপান্তর ॥
দিন অবসান হৈল ঘর অতি দূর। ঘরে সে বিষম বড় শ্বাশুড়ী শ্বশুর ॥
সঙ্গে সখীগণ যত সব হৈব বৈরী। ছাড়হ কানাঞি প্রাণ রাখ এক বেরি ॥
তোরে কি বলিব মোরে বিধি নিদারুণা[২]। বড়ায়ির সঙ্গে আসি খাইলুঁ আপনা ॥
ইবে সে[৩] কোথারে গেলি পুড়িলি বড়াই। খড়ে অগ্নি জড় করি রহ[৪] আন ঠাঞি ॥
যবে পুন এবার উবরি[৫] ঘর যাই। বলিতে[৬] জানিব যত কহিল বড়াই ॥
এত অবসরে ওথা চতুর[৭] বড়াই। সব সখী এড়িয়া আপনে আইসে ঠাই ॥
সর্ব্বকাল জানিএ কানাঞি আছিধর। রাধা আনিবারে বুড়ি গেল তেপান্তর ॥
বিলম্ব দেখিয়া বুঝি ভাল নহে কাজে। গোকুল ভরিয়া পাছে রহি যায় লাজে ॥
এতেক বুঝিয়া বুড়ি চলিল সত্বরে। রাধা কৃষ্ণ দোঁখ আর কদম্বের তলে ॥
বুড়িকে দেখিয়া রাধা দ্বিগুণ পাইল বলে। তভু কৃষ্ণ নাহি ছাড়ে নেতের আঁচলে ॥
ভুজ যুগ চাপি ধরে দুই পয়োধরে। সঙ্কোচ হইয়া রাধা রহে কথোদূরে ॥
বড়াই দেখিয়া রাধা কাতরবচনে। গদগদস্বরে কিছু কহে ঘনে ঘনে ॥
দেখ হের বড়ায়ি তুমি কানুর ব্যবহারে। আঁচলে ধরিয়া পথে রহাএ আমারে ॥
আর সব গোপীজনে কিছু নাহি বলে। সভা এড়ি কানু আসি মোরে ধরে বলে ॥
একখানি কথা কানু কহিআ না দেই। দান বলি রাখে পুন দান নাহি নেই ॥
বুঝহ বুঝহ বড়ায়ি কানুর গেয়ান। কাহার-নারীর হেন করি অপমান ॥
এ বোল বলিয়া রাই কান্দে ঝর ঝরে। তা দেখি দয়াএ কানু ছাড়িল আঁচলে ॥
গোপালবিজয় নর শুন একমনে। কহে কবিশেখর অমৃত-বরিষণে ॥

বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সহিত যাঁহার কিছুমাত্র পরিচয় আছে তিনি উপরি উদ্ধৃত গোপালবিজয়ের অংশ শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের ভাবসাম্য ও রচনারীতির ঐক্য

১। ঐ 'গোর গাএ নখরেখ জানি মোর খেহ'। ২। ঐ 'তুমি কি করিবে মোরে বিধি নিকরুণা'।
৩। ঐ 'এখনে সে'। ৪। ঐ 'রহিলি'। ৫। ঐ 'নেউটী'। ৬। ঐ 'কহিতে'।
৭। ঐ 'কানাঞির চতুরালি দেখিয়া'।

অবশ্যই লক্ষ্য করিবেন। বড়ু চণ্ডীদাসের কৃষ্ণের মত কবিশেখরের কৃষ্ণও রাধিকার উপর বলপ্রয়োগ করিয়া অনুতপ্ত হইয়াছিলেন। গোপালবিজয়েও যে শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মত রাধার নামান্তর চন্দ্রাবলী তাহা নিম্নে উদ্ধৃত অংশে দৃষ্ট হইবে।

রাধার বচন শুনি রসিক গোপালে। দুঃসহ মদনবাণে করিল পাগলে॥
রাধার বচন কানু ভাবে মনে মনে। বিষাইল কাণ্ডে যেন ঝুমিল হরিণে॥
তবে কৃষ্ণ বড়াইকে আনিল হাথ-সানে। কহিল মরম কথা বিবিধ বিধানে॥
কি লাগি বড়াই রাধা মনে দুঃখ মানে। সুখে বিকে যাউ আমি নাহি চাহি দানে॥
পুরুষ-বচন রাখু দেউ জীউদান। হাসি দেউ কানুরে অধরমধুপান॥
দানছলে যত কিছু বৈল কোপবাণী। তা সব নাগরমনে দাস হেন মানি॥
চল যাই বড়াই বুঝাহ চন্দ্রাবলী। আশ দিয়া দাস বলি রাখু বনমালী॥

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত গোপালবিজয়েও যশোদা কৃষ্ণের ব্যবহার জানিতে পারিয়া কৃষ্ণকে ভর্ৎসনা করেন।

কথোদিন যশোদা জানিল বেবহারে। কানাঞিকে ভরছিল নানা পরকারে॥
দেখিল শুনিল বোল লআইল নহে। আঁখিএ দেখিলে সাখী সম্মুখে না কহে॥

ব্রজলীলার এবং কাব্যেরও উপসংহারভাগ এইরূপ—

অক্রূর সাক্ষাতে গোপী জোড় করি হাথ। সভারে হইয়া যাহ রাখি প্রাণনাথ॥
মোর প্রভু দিয়া যাহ নন্দ আদি লঞা॥ অনাথী গোপীরে কিন গলে দড়ি দিঞা॥
বিনয়-বেভারে যদি নাহি শুন বোল। কার প্রাণ নিবেক নেউক প্রভু মোর॥
রথের চাকাতে গোপী রহিল পড়িয়া। কে চালাবে চালাউ রথ গোপিনী বধিয়া॥
এত বলি গোপী যবে যায় অতি রাগে। তখন করুণাময় ডাকে কর-আগে॥
হের শুন রাধা আদি পরমবল্লভা। আমি কত দিনকে যাইব কংসসভা॥
দিনেক লাগিয়া কেন কর অমঙ্গলে। হাসিয়া বিদায় কর আসিএ কুশলে॥
এত শুনি সব গোপী স্বরবন্ধে কান্দে। পরাণ ফাটিতে চাহে বুক নাহি বান্ধে॥
তখন রসিক গুরু ছিণ্ডি বনমালা। একে একে ফুল দিয়া তোষে ব্রজবালা॥
রস বুঝি পায় যবে চালাইল রথে। তখন রাধিকা কিছু কহে পথে পথে॥

আমা ছাড়ি কোথা যাহ প্রাণের কানাঞি। তোমা লাগি ঘর [দ্বার] সকল হারাই
তুমি যে এমন হবে তাহা না জানিল। ই-কুল উ-কুল দুই কুল হারাইল॥
তোমা লাগি এদিগে ছাড়িলা সব জনে। তুমি বা ছাড়িবে যদি জীব বা কেমনে॥
দেখিলে নিমিষ যে বিঘিন করি জানি। বিরহের মাঝে পেল্যা গেলে চক্রপাণি॥
সে জন কেমনে জীব দূর-পরবাসে। কোন ছার জিউ রাখি দরশন-আশে॥
এত বলি গোপী যবে গেল কথোদূরে। তথন হাসিয়া কহে নাগরশেখরে॥
আর কত দুর বা আইস অনুসরে। ননীকে অধিক তনু রৌদ্রে জানি গলে।
অনুসরি রৌদ্রে যবে এত দুঃখ মান। নেউটিতে বিরহ-আনল নাহি জান॥
রবির কিরণ যবে না সহে শরীরে। তাহাক পেলিয়া যাহ বিরহ-আনলে॥
এত শুনি নিশ্বাস ছাড়িয়া কৃষ্ণ যাএ। সব পুরজন মেলি গোপীরে রহাএ॥
এথা কৃষ্ণ রথে চড়ি মথুরা নগরে। দেখিয়া সকল লোক আনন্দ-অন্তরে॥
বৃন্দাবন ভরি সব রসের বাদলে।[১] তাহে প্রেমতরঙ্গেতে অধিক উথলে॥
কৃষ্ণ নবজলধর রসে পরিপূর। সকল গোপীর হিয়াশোষ হৈল দূর॥
ভকতি-ঔষধ দানে পাই জিউদান। ভবতাপে জুড়াইল জগত পরাণ॥
হেন সুখবাদলে যাউক সবকাল। অশেষ ধরমশাস্ত্র বাড়ুক সকাল॥
তপস্বীর তপ কৃষ্ণ ফলু ভালমতে। পুণ্যের দুর্ভিক্ষ নহু সুখে রহু সত্ত্বে॥
ভাবকময়ূর ইথি নাচু পাক ফিরি। কালসাপে খাউ আর দুর্জ্জন পাঙরি॥
গোপালবিজয় কথা কহিল আলাপে। অনুসারে জানিবে পুরাণ আলাপে॥
কহে কবিশেখর করিয়া পুটাঞ্জলি। হাসিয়া না পেলাহ লৌকিক ভাষা বলি

কবিশেখর যে উত্তম কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন, উদ্ধৃত অংশগুলি পাঠ করিলে তাহাতে সংশয় থাকিবে না। ভাষা যেমন সরল, পয়ার ছন্দও তেমনি সাবলীল। যতিভঙ্গ (যেমন শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে) অথবা অক্ষরাধিক্য একেবারেই নাই। উপমা প্রভৃতি পাণ্ডিত্যবর্জ্জিত অথচ অত্যন্ত হৃদয়গ্রাহী। যেমন—

যাকে যার অভিরুচি সে হি তাকে ভায়ে। পল্লব ছাড়িয়া উষ্ট্র কণ্টক চিবায়ে॥

১। তুলনীয়—বৃন্দাবন ভরি রসের বাদর কবিশেখর ইহ রস গায়॥ কীর্ত্তনানন্দ, পৃ ২৬১।

রাহুর নিকটে চাঁদ রহে কতক্ষণে। সিংহের সমুখে কেবা সমর্পে হরিণে॥
মত্ত হাথি-হাথে কেবা থাপে ফুলমালে। ঘৃত কে আবুধ রাখে জ্বলন্ত অনলে॥
ইবে সে কোথারে গেলি পুড়িলি বড়াই। খড়ে অগ্নি জড় করি রহ আন ঠাঞি॥
প্রেমের অধীন কৃষ্ণ পরখিল প্রেম। কষ্টি পাথরে যেন কষি নিল হেম॥
গোপালবিজয়ে মাঝে এই বোল দড়। বিনি দরবিলে[১] ধাতু নাহি হয় যোড়॥
ইত্যাদি।

অর্ব্বাচীন পুঁথির মধ্যেও গোপালবিজয়ের ভাষার প্রাচীনত্ব অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথির লিপিকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ব্বে নহে। তথাপি ইহাতে পাইতেছি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত আদ্য অ-কারের স্থলে আ-কার। যথা—আবুধ, আনল, আপার, আতি, আপমান ইত্যাদি। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের মত ইহাতে 'আইহন'ই পাওয়া যাইতেছে। ভাষায় প্রাচীনত্বের অপর কিছু চিহ্ন দেখাইতেছি।

'যেন সব নদ নদী সমুদ্রকে যায়।' 'কথায় না দেখি কাঁচ লোম এক পাড়ি॥'
'ছাড়হ ছাড়হ কানু কেহ জানি দেখে।' 'কাঁচলি না ধর পাছে লাগে নখরেখে'॥
'বিষাইল কাণ্ডে যেন ঝুমিল হরিণে।' 'দেখিল শুনিল বোল লআইল নহে॥'
'ন্নুনীকে অধিক তনু রৌদ্রে জানি গলে॥' ইত্যাদি।

গোপালবিজয়ের একটি উক্তি হইতে মনে হয় যে, সে সময়ে পণ্ডিতসমাজে সংস্কৃতে রচিত না হইলে কাব্যের বিশেষ সমাদর হইত না।

কহে কবিশেখর করিয়া পুটাঞ্জলি।
হাসিয়া না পেলাহ লৌকিকভাষা বলি॥

কবিশেখর বা রায় শেখর অজস্র পদ করিয়াছিলেন। ইঁহার পদগুলিতে রাধাকৃষ্ণের অষ্টপ্রহরের বৃন্দাবনলীলা বর্ণিত হইয়াছে। এ বিষয়ে কবি স্পষ্টতঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃতের অনুসরণ করিয়াছেন। গোপালবিজয়ের স্থানে স্থানে চৈতন্যচরিতামৃতের প্রতিধ্বনি শোনা যায়। যেমন—

১। পাঠান্তর 'বিনি না দ্রবিলে'।

যাকে যার অভিরুচি সেহি তারে ভায়ে।
পল্লব ছাড়িয়া উষ্ট্র কণ্টক চিবায়ে॥

কবিশেখরের অষ্টপ্রহরীয় লীলার পদগুলি দণ্ডাত্মিকা লীলাকাহিনী বলিয়া পরিচিত। কবি দণ্ড হিসাবে এই ভাবে লীলা বর্ণনা করিয়াছেন—

প্রভাত। পৌর্ণমাসীর আগমন, রাধার কারুণ্যামৃতস্নান ইত্যাদি (১-৩); কৃষ্ণের ভোজন (৪); রাধার ভোজন (৫); গোষ্ঠগমন, অনুরাগ ইত্যাদি (৬-৭); রাধার গৃহগমন (৮); রাধার কৃষ্ণোদ্দেশ, গমনোৎকণ্ঠা (৯); দিবাভিসার-ভাবোন্মাদ (১০); মিলনোৎকণ্ঠা (১১); কৃষ্ণের উৎকণ্ঠা, কৃত্যচাতুর্য্য (১২); রসপ্রসঙ্গ (১৩); মিলন (১৪); হিন্দোললীলা, বনভ্রমণ (১৫); বংশীচৌর্য্য (১৬); সূর্য্যপূজা (১৭); পাশকক্রীড়া (১৮); বনভোজন (১৯); কুঞ্জে নিদ্রালীলা (২০-২১); ইচ্ছাচাতুর্য্য (২২); চাতুর্য্য, মৈত্র, ঔদাস্য (২৩); মোদন (২৪); মাদন (২৫); সংক্ষিপ্ত বিলাস (২৬); কুঞ্জত্যাগ, রাধার গৃহাগমন ইত্যাদি (২৭); পকান্নরচনা, লাবণ্যামৃতস্নান (২৮); গোপীদিগের উৎকণ্ঠা (২৯); উত্তরগোষ্ঠ, প্রেমোন্মাদ (৩০)।

সন্ধ্যা। কৃষ্ণের রাজসভায় গমন, গীতবাদ্যাদি শ্রবণ, ভোজন (১-৪); গোপী-দিগের ভোজন (৫); শয্যারচনা, সরণিসন্ধান, গোপীদিগের অভিসার (৬-১০); কৃষ্ণের অভিসার (১১); মিলন (১২); বনভ্রমণ (১৩); সঙ্গীতরাস (১৪); নৃত্যরাস (১৫), রতিবৈচিত্র্য (১৬); সখীশিল্প (১৭); আলিকলা (১৮); নায়ক-শিল্প (১৯); সম্ভোগ (২০-২৩); রসোল্লাস (২৪); স্বাধীনভর্ত্তৃকা (২৫); মদালস্য (২৬); শুকোৎকণ্ঠা (২৭); সখ্যুৎকণ্ঠা (২৮); শয্যোত্থান (২৯); কক্ষটীবিতর্ক, গৃহাগমন (৩০)।

একবিংশ পরিচ্ছেদ

মাধবাচার্য্যের গঙ্গামঙ্গল

শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্ত্তৃক সম্পাদিত এবং ১৩২৩ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত গঙ্গামঙ্গল কাব্য[১] চণ্ডীমঙ্গল রচয়িতা মাধবাচার্য্যের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে। উভয় কাব্যেরই গণেশবন্দনা অংশে কিছু মিলও আছে। গঙ্গামঙ্গলে কবির কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ভণিতা এইরূপ—

চিন্তিয়া চৈতন্যচন্দ্র চরণকমল।
দ্বিজ মাধব কহে গঙ্গামঙ্গল॥
শুনহ ভকতজন হইয়া একচিত্ত।
চৈতন্যচরণে দ্বিজ মাধব রচিত॥

এই সব ভণিতা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের ভণিতার অনুরূপ এবং কবি ব্রজবুলির যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা হইতে ধারণা হয় যে কবি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের রচয়িতা একতম মাধব ব্যতীত আর কেহ নহেন।

গঙ্গামঙ্গলের বিষয়বস্তুর বিস্তৃত সূচী নিম্নে দেওয়া গেল।

গণেশবন্দনা, শৌনক কর্ত্তৃক গঙ্গার মহিমা বর্ণন, গঙ্গার তিন রূপ, গোলোকের বর্ণনা, গোলোকে দেবগণের গমন, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক বিষ্ণুর স্তব, বিষ্ণু সমক্ষে শিবের গান, বিষ্ণুর দ্রবীভবন, বিষ্ণুকে ভাবসংবরণ করিতে মহামায়ার অনুরোধ, সকলের প্রেমানন্দ, দ্রবময় বিষ্ণুকে অর্থাৎ গঙ্গাকে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক কমণ্ডলুতে ধারণ, তাহা বর্দ্ধিত হইয়া ব্রহ্মলোকে স্থিতি, ব্রহ্মপুরীর বর্ণনা, বলি কর্ত্তৃক অদিতির কুণ্ডল হরণ, দেবাসুরের যুদ্ধ, দেবগণের পরাভব, কশ্যপের প্রতি ইন্দ্রের উক্তি, কশ্যপের কথায় অদিতির তপস্যা, অসুরগণ কর্ত্তৃক অদিতির তপোভঙ্গের চেষ্টা, অদিতির তপঃপ্রভাবে তপোভঙ্গকারিগণের বিনাশ, অদিতির নিকট বিষ্ণুর আবির্ভাব, অদিতি কর্ত্তৃক বিষ্ণুর স্তব, বিষ্ণু কর্ত্তৃক অদিতিকে বরদান, অদিতির গর্ভসঞ্চার,

---

১। কাব্যটির একমাত্র পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। পুঁথিটি শেষে খণ্ডিত। হয়ত শেষভাগে কবির আত্মপরিচয় ছিল।

বামনরূপী বিষ্ণুর জন্ম, তাঁহার জাতকর্ম্ম, রূপবর্ণনা, বাল্য সংস্কার, বলির যজ্ঞস্থলে গমন, বলির নিকট দান প্রার্থনা, বলির স্বীকৃতি, ত্রিপাদভূমি ভিক্ষা, শুক্রাচার্য্যের নিষেধ, শুক্রকর্ত্তৃক কমণ্ডলুর জলশোষণ করিয়া দানে বাধা উৎপাদন, বামনের আদেশে জলপাত্রে কুশ দিয়া শোষণ, কুশের অগ্রভাগে শুক্রের একচক্ষুনাশ, বামনের দান গ্রহণ, বলির পাতাল গমন। ত্রিবিক্রমরূপী বিষ্ণুর নখাঘাতে বিষ্ণুর কারুণ্য জল ব্রহ্মলোক হইতে দেবলোক তপোলোক ধ্রুবলোক ইত্যাদিতে পতন, ব্রহ্মা কর্ত্তৃক গঙ্গার স্তব, গঙ্গার রূপবর্ণনা[১], গঙ্গার সুরপুরীতে স্থিতি, বলি কর্ত্তৃক বিষ্ণুর স্তব।

সূর্য্যবংশের রাজা বাহুর কথা, সগর রাজার জন্ম, সগর কর্ত্তৃক অশ্বমেধ অনুষ্ঠান, ইন্দ্রকর্ত্তৃক যজ্ঞীয় অশ্ব অপহরণ, সগরপুত্রগণ কর্ত্তৃক কপিলমুনির লাঞ্ছনা, কপিলের শাপে সগরপুত্রদিগের ভস্মীভবন, রাজা রাণীর শোক, সগরের পৌত্র অংশুমান্ কর্ত্তৃক কপিলের নিকট প্রার্থনা, কপিলের বর—ভগীরথ কর্ত্তৃক সগরপুত্রদিগের উদ্ধার, ভগীরথের জন্ম, বিবিধ পাপ ও তদ্ধেতু নরকভোগ বর্ণনা, বিবিধ পুণ্যকর্ম্ম ও তদ্ধেতু স্বর্গবাস বর্ণন, নারদের নরক ও স্বর্গ দর্শন, নারদ কর্ত্তৃক ভগীরথকে পূর্ব্বপুরুষদিগের উদ্ধারের উপায় কথন, নারদের উপদেশে ভগীরথ কর্ত্তৃক ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের আরাধনা, গঙ্গা আনয়নে তিন দেবের সম্মতি, গঙ্গা আনিতে ভগীরথের সুমেরুশিখরে গমন, ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গার স্তব, গঙ্গার প্রসন্নতা কিন্তু পৃথিবীতে যাইতে অসম্মতি, শেষে বিষ্ণু শিবের অনুরোধে সম্মতি, শিব কর্ত্তৃক সুমেরু হইতে প্রবহমান গঙ্গাধারাকে জটায় ধারণ, গঙ্গার পৃথিবীগমনে দেবতাদের দুঃখ, তজ্জন্য স্বর্গে মন্দাকিনীরূপে স্থিতি, শিব কর্ত্তৃক গঙ্গাকে শুদ্ধ হইবার উপায়কথন, শিবের জটা হইতে গঙ্গার অবতরণ প্রচেষ্টা, শিবের নৃত্য, শিব কর্ত্তৃক গঙ্গাকে পরীক্ষা, গঙ্গার রূপ বর্ণনা, গঙ্গাকে হরজটায় লুক্কায়িত দেখিয়া ভগীরথের দুঃখ, ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গার স্তব, ভগীরথ কর্ত্তৃক শিবের স্তব, গঙ্গার নির্ব্বন্ধে শিবের অনুমতি,[২] গঙ্গার বিচ্ছেদ আশঙ্কায় শিবের উক্তি, এক অংশে হরজটায় অবস্থিতি

১। পৃ ৫৮-৫৯। পদটি ব্রজবুলিতে রচিত।

২। বিন্ধ্য পর্ব্বতের পাশে কাশী মহাস্থান দিয়া প্রবাহিত হইতে হইবে এই সর্ত্তে।

করিতে গঙ্গার স্বীকৃতি, গঙ্গার অবতরণ, শঙ্খধ্বনি করিয়া ভগীরথের অগ্রগমন, হিমালয়ে পৌঁছিয়া বাধা, গঙ্গার উপদেশে ভগীরথ কর্ত্তৃক ইন্দ্রের নিকট হিমালয় পর্ব্বত ভাঙ্গিবার জন্য ঐরাবতের সাহায্য প্রার্থনা, ইন্দ্রের অনুমতি, ঐরাবত কর্ত্তৃক গঙ্গার পাণিপ্রার্থনা, ঐরাবত কর্ত্তৃক পাহাড় ভাঙ্গা, গঙ্গার নিকট ঐরাবতের পরাভব, ঐরাবত কর্ত্তৃক গঙ্গাস্তব, ইন্দ্র কর্ত্তৃক গঙ্গার স্তব, গঙ্গার অগ্রগমন, গঙ্গার সহিত যমুনা ও সরস্বতীর মিলন, কাশীর নিকট দিয়া গঙ্গার গমন, কাশীর বর্ণনা, শিবের রূপ, গঙ্গার স্রোতে কুশ কুসুম দূর্ব্বা ভাসিয়া যাওয়ায় জহ্নুমুনির কোপ এবং গঙ্গাকে গণ্ডুষ করিয়া পান, মুনির নিকট ভগীরথের ক্রন্দন, মুনির কন্যাস্বরূপ হইতে গঙ্গার সম্মতি, মুনির জানুদেশ হইতে গঙ্গার নির্গমন, গঙ্গার পূর্ব্বদেশে আগমন, গঙ্গার দক্ষিণমুখে আবর্ত্তন, ত্রিমুনি স্থানে আগমন, মুনিদিগকে লঙ্ঘনের ভয়ে গঙ্গার ত্রিধারায় ধাবন, শতমুখী হইয়া গঙ্গার সাগরে প্রবেশ, সগরসন্তান-দিগের উদ্ধার, ভগীরথের আনন্দনৃত্য, গঙ্গার পাতালে ভোগবতীরূপে প্রবেশ, গঙ্গার স্বরূপধারণ, সগরপুত্রগণ কর্ত্তৃক গঙ্গার স্তব, মুনিগণ কর্ত্তৃক গঙ্গার বন্দনা, গঙ্গার সাগরসঙ্গমতিথি বারুণীর মাহাত্ম্য, গঙ্গাজল ও মৃত্তিকার মাহাত্ম্য, গঙ্গাতীরের মাহাত্ম্য, গঙ্গাকে প্রণাম করিয়া ভগীরথের স্বীয় রাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন, মুনি-ঋষি কর্ত্তৃক ভগীরথকে গঙ্গানয়ন বৃত্তান্ত জিজ্ঞাসা, ভগীরথের উত্তর, সাগরের সহিত গঙ্গার বিবাহ, সকল তীর্থের গঙ্গাদর্শনে আগমন, গঙ্গার নিকট পৃথিবীর আর্ত্তি, গঙ্গার অভয় দান।

একাদশীর পারণার জন্য সৌদাস রাজার নিকট বশিষ্ঠের আগমন, রাজা কর্ত্তৃক আমিষ অন্ন প্রদান, মুনির শাপে রাজার রাক্ষস হওয়া, দ্বাদশ বৎসর পরে গঙ্গাজলস্পর্শে মুক্তি মুনি কর্ত্তৃক এই অনুগ্রহ দান, রাক্ষস কর্ত্তৃক এক মুনি-ভক্ষণ, রাক্ষসের শাপে মুনিপত্নীর রাক্ষসী হইয়া রাক্ষসের পত্নী হওয়া, এক মুনির সঙ্গে দর্শন, তাঁহার কাছে গঙ্গাজল থাকায় তাহাকে খাইতে না পারা, গঙ্গাজলস্পর্শে উদ্ধার। [ইহার পর পুঁথি খণ্ডিত। তবে আর কোন বড় কাহিনী ছিল বলিয়া বোধ হয় না।]

রচনার নমুনার স্বরূপ একটি গঙ্গার স্তব উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

ভগবতি গঙ্গে তরলতরঙ্গে গহনগম্ভীরগতিরঙ্গে।
বিষ্ণুকায়জল পরমহি নির্ম্মল কলিকলুষ সব ভঙ্গে॥
সিদ্ধ অমরবর কিন্নর অপ্‌সর চৌদিকে গণপরিবারা।
সুরমুনি-ঋষিগণ স্তুতি করে অনুদিন পরম ভকতি পরিহারা॥
কোটী কোটী ধনুর্দ্ধর রক্ষক তোমার চর দুই কূলে ধরিছে যোগানে।
তোমার অভক্ত জন তাহা করে নিবারণ আনিয়া মিলাএ নিজ জনে॥
দূরে থাকি যেই জন স্মরএ তোমার গুণ, কোটী জন্মের পাতক বিনাশে।
যেবা নিকটে রহে তোমার মহিমা কহে নিরবধি ভকতি উদ্দেশে॥
দিবি ভূমি রসাতল বহিছে নির্ম্মল জল ত্রিভুবনে বিজয়ী পতাকে।
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব পরশিয়া তিন দেব পড়িয়া রহিল তিন লোকে॥
সুরলোকে মন্দাকিনী পৃথিবীতে নন্দিনী পাতালে হইয়া ভোগবতী।
তিন লোক উদ্ধারিতে অখিল জীবের হিতে দ্রবরূপে আইলা ভাগীরথী॥
তিন লোকে এক পথ কেবা জানে মহত্ত্ব সুরপতিমনে অভিলাষা।
তুয়া পদ দরশন ভাবই অনুদিন মাধব এহ রস (করে) আশা॥

পৃ ১৮৯-৯০॥

আরও তিন চারিখানি গঙ্গামঙ্গল পাওয়া গিয়াছে। সেগুলিকে ষোড়শ শতাব্দীর রচনা বলিবার পক্ষে কোন হেতু নাই। মাধবাচার্য্যের গঙ্গামঙ্গলের ভাষা কতকটা প্রাচীন বটে।

এক মাধবাচার্য্য বিরচিত ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের পাঁচালীর উল্লেখ রায়মঙ্গলে কৃষ্ণরাম দাস করিয়াছেন। এই কাব্যটি পাওয়া যায় নাই। এই মাধবাচার্য্য কে তাহা নির্দ্ধারণ করিবার কোন উপায় নাই।

দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদ

চণ্ডীমঙ্গল কাব্য ঃ মাণিক দত্ত, মাধবাচার্য্য, মুকুন্দরাম, "দ্বিজ" জনার্দ্দন

দেবীমাহাত্ম্য বিষয়ক কাব্যের মধ্যে চণ্ডীমঙ্গলগুলিই প্রাচীনতর। ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা অন্ততঃ তিনখানি চণ্ডীমঙ্গলের এখনও প্রচলন আছে। ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বের লেখা কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের অস্তিত্ব না থাকিলেও মনসামঙ্গল কাব্যের মত উহাও যে পঞ্চদশ শতাব্দী এবং তাহার পূর্ব্বে বাঙ্গালা সাহিত্যের একটা বিশিষ্ট অঙ্গ ছিল তাহা শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে বৃন্দাবনদাসের উক্তি হইতে জানা যায়।

ধর্ম্মকর্ম্ম লোক সবে এইমাত্র জানে। মঙ্গলচণ্ডীর গীতে করে জাগরণে॥ ১-২॥
প্রভুরে দেখিয়া বলে নিমাই পণ্ডিত। করাইবা সম্পূর্ণ মঙ্গলচণ্ডীর গীত॥
গায়েন সব ভাল মুঞি দেখিবারে চাঙ। সকল আনিয়া দিব যথা যেই পাঙ॥ ২-১৩॥

রাত্রিকালে গীত হইত বলিয়া চণ্ডীমঙ্গল কাব্য জাগরণ নামেও কথিত হইত। পূর্ব্ববঙ্গীয় পুঁথিতে চণ্ডীমঙ্গল স্থলে জাগরণ নামই বেশী পাওয়া যায়।

ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত বলিয়া জ্ঞাত ও অনুমিত যে কয়খানি চণ্ডীমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে তাহার রচয়িতা হইতেছেন, যথাক্রমে মাণিক দত্ত, মাধবাচার্য্য এবং মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণ। ইহার মধ্যে মাধবাচার্য্যের কাব্যে রচনার তারিখ দেওয়া আছে। মুকুন্দরামের কাব্যে রচনার তারিখ দেওয়া না থাকিলেও তাহা স্থূলভাবে অবধারণ করা যায়। কিন্তু মাণিক দত্তের কাব্যরচনার কাল জানিবার কোনই উপায় নাই। সম্পূর্ণ পুঁথিও পাওয়া যাইতেছে না। সুতরাং মাণিক দত্তের কাল নির্দ্ধারণ সম্পূর্ণরূপে আনুমানিক। কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীর পূর্ব্বেকার হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নহে।

স্বর্গীয় রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীযুক্ত হরিদাস পালিত মহাশয়দ্বয় মাণিক দত্তের পুঁথি লইয়া কিছু আলোচনা করিয়াছিলেন, তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রবন্ধ আকারে বাহির হইয়াছিল।[১] হরিদাস বাবু মাণিক দত্তের দুইখানি পুঁথি দেখিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে একখানির লিপিকাল ১১৮১ সাল।[২] স্বর্গীয় রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এবং হরিদাস বাবুর প্রবন্ধই বর্ত্তমান কালে মাণিক দত্ত লইয়া আলোচনা করিবার একমাত্র উপাদান। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় তাঁহার সঙ্কলিত বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে মাণিক দত্তের চণ্ডী-মঙ্গল হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছেন। কিন্তু তিনি কোথা হইতে যে ঐ অংশটুকু পাইলেন তাহা জানান নাই। ঐ অংশটি যথাযথভাবে রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রবন্ধে আছে, সুতরাং দীনেশ বাবু যে চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে অংশটি গ্রহণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের উদ্ধৃত অংশে কিছু কিছু পাঠভ্রম ও একটু-আধটু ছাড় আছে, তাহার সংশোধন ও পূরণ হরিদাস বাবুর প্রবন্ধে পাওয়া যায়। দীনেশ বাবু বোধ হয় হরিদাস বাবুর প্রবন্ধ দেখেন নাই, দেখিলে অন্ততঃ ছাড় অংশটি পূরণ করিয়া দিতেন।

দীনেশ বাবুর মতে মাণিক দত্ত "সম্ভবতঃ ত্রয়োদশ শতাব্দীর লোক"।[৩] আবার হরিদাস বাবু বলেন, মাণিক দত্ত মুকুন্দরাম চক্রবর্ত্তী কবিকঙ্কণের নিকট ঋণী।[৪] এদিকে দেখি, কবিকঙ্কণের কাব্যের পুঁথিতে মাণিক দত্তের উল্লেখ রহিয়াছে।

জয়দেব বিদ্যাপতি বন্দোঁ কালিদাস। আদিকবি বাল্মীকি বন্দিলুঁ মুনি ব্যাস॥
মাণিক দত্তেরে আমি করিয়ে বিনয়। যাহা হৈতে হৈল গীতপথ পরিচয়॥ পৃ ৬॥

মাণিক দত্তের কাব্যের এক পুঁথিতে আছে—

মাণিক দত্ত রচিঞা মাণিকদত্ত কৈল।
রঘুর রচনা কবিকঙ্কণ হইল॥

১। ব-সা-প-প ১১, পৃ ৩৩-৩৯, ১৭, পৃ ২৪৭-৫৬।

২। সম্প্রতি একটি পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক সংগৃহীত হইয়াছে। এটী সম্ভবতঃ হরিদাস বাবুর আলোচিত পুঁথি।

৩। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় ১, পৃ ৩০০। ৪। ব-সা-প-প ১৭, পৃ ২৫০।

হরিদাস বাবু বলেন, রাঘব ও রঘু নামে মাণিক দত্তের দুই দোহার ছিল। তিনি আরও অনুমান করেন যে, রঘু হয়ত মাণিক দত্তের কাব্যে স্বীয় রচনা কিছু কিছু যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। উপরে উদ্ধৃত পয়ার শ্লোকটি নিঃসন্দিগ্ধরূপে পরবর্ত্তী কালের প্রক্ষেপ। মুকুন্দরামের কাব্যের ভণিতাংশে মধ্যে মধ্যে কবির ছাত্র ও পৃষ্ঠপোষক রাজা রঘুনাথের নাম আছে; অনভিজ্ঞ গায়ক অথবা লিপিকার হয় ত ইহাকে কবির নাম বলিয়া ভ্রম করিয়া এই কাণ্ড করিয়া বসিয়াছে। সত্য বটে মুকুন্দরামের কাব্যের বন্দনা অংশে মাণিক দত্তের উল্লেখের পরেই আছে

বন্দিলুঁ গীতের গুরু শ্রীকবিকঙ্কণ। প্রণাম করিয়া পিতা মাতার চরণ ॥

এখানে স্পষ্টতঃ বুঝা যাইতেছে—অবশ্য এই অংশটি প্রক্ষিপ্ত না হইলে—যে, 'কবিকঙ্কণ' মুকুন্দরামের সঙ্গীতবিদ্যার গুরু ছিলেন। আর মাণিক দত্তের কাব্য হইতে মুকুন্দরাম বিষয়বস্তু ("গীতপথ") পাইয়াছিলেন। অতএব মাণিক দত্ত যে মুকুন্দরামের পূর্ব্ববর্ত্তী তাহা নিতান্ত অসঙ্গত অনুমান নহে। মাণিক দত্তের কাব্যের প্রথম অংশে ধর্ম্মমঙ্গল অনুযায়ী সৃষ্টিপ্রক্রিয়া বর্ণিত হইয়াছে। এই ধর্ম্মপূজার প্রভাব কতকটা পরিমাণে কাব্যটির প্রাচীনত্ব সূচিত করিতেছে। বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলেও এইরূপ ধর্ম্মপূজার প্রভাব দেখিতে পাই।

রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী এবং হরিদাস বাবু যে পুঁথি লইয়া আলোচনা করিয়াছিলেন তাহা মালদহ অঞ্চলেরই। পূর্ব্বে মালদহ অঞ্চলে মাণিক দত্তের কাব্য খুব চলিত। কবিও স্থানীয় লোক ছিলেন। তিনি গৌড়ের নিকটবর্ত্তী নদী, গ্রামাদি ও দেবতার উল্লেখ করিয়াছেন। ভাষার মধ্যেও স্থানীয় বিশেষত্ব বিদ্যমান। কবি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে তাঁহার বাসস্থান ছিল "ফুলুরা নগর" (আধুনিক ফুলবাড়ী, হরিদাস বাবুর মতে)। কবি অন্ধ এবং খঞ্জ ছিলেন, পরে দেবীর দয়াতে তাঁহার দৈহিক বিকৃতি দূর হয় এবং কবিত্ব ও সঙ্গীতশক্তি লাভ হয়। কবি দেবী-উপাসক বলিয়া কলিঙ্গরাজ (!) ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে কারাগারে নিক্ষেপ করেন। দেবী তাঁহাকে কারাগার হইতে উদ্ধার করেন। অতঃপর রাজা মাণিক দত্তের অনুরাগী ও দেবীর প্রতি ভক্তিমান্

হইলেন। এই গতানুগতিক বর্ণনা অবশ্য আমরা আনুপূর্ব্বিক সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি না।

নিম্নে উদ্ধৃত সৃষ্টিপ্রক্রিয়া অংশটি চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের এবং হরিদাস বাবুর ধৃত পাঠ মিলাইয়া নির্দ্ধারিত হইল।

অনাদ্যের উৎপত্তি জগৎসংসারে। হস্তপদ নাহি ধর্ম্মের ভ্রমে নৈরাকারে।
আপনে ধর্ম্ম গোসাঞি গোলোক ধেয়াইল। গোলোক ধেয়াইতে ধর্ম্মের মুণ্ড সৃজিল।
আপনে ধর্ম্ম গোসাঞি শূন্য ধেয়াইল। শূন্য ধিয়াইতে ধর্ম্মের শরীর হইল॥
জন্ম হৈল ধর্ম্ম গোসাঞি যুহিত[১] ধেয়াইল। যুহিত ধিয়াইতে ধর্ম্মের দুই চক্ষু হইল॥
জন্ম হৈল ধর্ম্ম গোসাঞি গুণে অনুপমা। পৃথিবী সৃজিয়া তেঁহো রাখিবে মহিমা॥
বিশ্ব জিনিয়া তবে সিন্ধু উথলিল। মুখের অমৃত ধর্ম্মের খসিঞা পড়িল॥
হস্তপদ পৃথিবীতে জল উপজিল। জলের আসন গোঁসাঞি জলেতে বৈসল॥
জলে ভর করিঞা ভাসেন নিরঞ্জন। ভাসিতে ধর্ম্ম গোঁসাঞি পাইল ঠেসন॥
ভাসিতে ধর্ম্ম গোঁসাঞি পাইল ঠেসন। চৌদ্দ যুগ বহিয়া গেল ততক্ষণ॥
ধর্ম্ম-ঠেসন হইতে উলূক জন্মিল। জোড় হস্ত করি উলূক সম্মুখে দাঁড়াইল॥
হাসিঞা কহেন কথা ত্রিদশের রায়। কহ কহ উলূক কত যুগ যায়॥
যত যুগ গেল তবে ব্রহ্মার উদ্ধারণে। তখনে আছিলাঙ আমি মন্ত্র-ধিয়ানে॥
মন্ত্র-ধিয়ানে আমি ভাল পাইলাঙ বর। চৌদ্দ যুগের কথা শুন আমার গোচর॥
চৌদ্দ যুগের কথা তুমি শুন নৈরাকার ই তিন ভুবনে পাতকী নাহি আর॥
সম্মুখে রচিল গোঁসাই পদ্মফুল। তাহাতে বসিঞা গোঁসাই জপে আদ্য মূল॥
নানা পত্র বাহ্য গেল এ তিন ভুবন। পাতাল ভুবন লাগি করিল গমন॥
দ্বাদশ বৎসর মৃত্তিকায় লাগি পাইল। হস্ত করি মৃত্তিকা শরীরে বুলাইল॥
বাটুল-প্রমাণ মৃত্তিকা হস্তেত করিঞা। শূন্যাকারে ধর্ম্ম গোঁসাই উঠিল ভাসিঞা॥
পুনরপি আসিঞা পদ্মেত কৈল ভর। মনে মনে চিন্তে গোঁসাই ধর্ম্ম নৈরাকার॥
মনে মনে চিন্তে তবে ধর্ম্ম-অধিপতি। কার উপর স্থাপিব নির্ম্মাণ বসুমতী॥
আপনে ধর্ম্ম গোঁসাই গজমূর্ত্তি হইল। গজের উপরি বসুমতীকে স্থাপিল॥

১। < জ্যোতি ?

গজ সহিতে নারে পৃথিবীর ভার। গজ সহিতে পৃথিবী যায় রসাতল ॥
আপনে ধর্ম্ম গোঁসাই কূর্ম্মরূপ হৈল। কূর্ম্মের উপরে [তবে] পৃথিবী রাখিল॥
কূর্ম্ম সহিতে নারে পৃথিবীর ভার। গজকূর্ম্মে পৃথিবী যায় রসাতল ॥
টানিঞা ছিড়িল গলার কনক-পৈতা। একগোটা নাগ হইল সহস্রেক মাথা ॥
নাগের নাম বাসুকি থুইল নিরঞ্জন। তাহাকে ধরিতে আজ্ঞা ই তিন ভুবন ॥[১]
যাও যাও বাসুকি হউক চিরাই। আমি যাকে জন্ম দিব তাকে দিহ ঠাই ॥[২]
গান করে দেবীর ব্রত সুখী সর্ব্বজয়া। যে ঘটে অবতার করিবে মহামায়া ॥
দেবীর চরণে মাণিক দত্তে গায়। নায়কের তরে দুর্গা হবে বরদায় ॥

নিম্নে উদ্ধৃত হেঁয়ালী অংশটি কৌতুকাবহ। ভাষা অবশ্য কতকটা আধুনিকতাপ্রাপ্ত।

আমারে বোলে ডান রে বুড়িরে বোল ডান। কার খাইনু ভাতারপুত কার করিনু হান ॥
ডান নইরে ডান নই হইএ মুখদোষী। দ্বারে বোসে খাইনু মুঞি চৌদ্দঘর পড়সি।
ডাইন বলিঞা মোরে বোলে বারবার। দ্বারে বোসে খাই মুঞি বুঢ়া পোদ্দার ॥
উত্তর দেশে গেনু খাইঞা আইনু কাঙ্গাল। দুয়ারে বসিয়া খাইনু তিন লক্ষ বাঙ্গাল ॥
ডাইন বোলিঞা মোরে বোলে বারবার। আজিকা হইনু ডান তোমা খাইবার ॥[৩]

মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলের পরিচয় এইটুকুমাত্র পাওয়া গিয়াছে। এই স্বল্প পরিচয় হইতেই বোধ হইতেছে যে কাব্যটি যথেষ্ট বিশেষত্বশালী।

মাধব আচার্য্যের চণ্ডীমঙ্গল কাব্য "ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা" অর্থাৎ ১৫০১ শকাব্দে (১৫৭৯ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত হইয়াছিল।[৪] কবি কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয়ও দিয়া

১। তুলনীয় বিষ্ণুপালের মনসামঙ্গলে—
কান্ধের ছিড়িঞা ফেলে কনক পইতা। একগোটা নাগের হইল সহস্রগোটা মাথা।
নাগের নাম বাসুকি থুইল নিরঞ্জন। তায় সমপিলা প্রভুর ই তিন ভুবন ॥

২। তুলনীয় ঐ—
আস্ত আস্ত বসুমতি হইঅ চিরাই। আমি যাকে জন্ম দিব তুমি দিহ ঠাঞি।

৩। ব-সা-প প ১১, পৃ ৩৮।

৪। চট্টগ্রাম হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল; কিন্তু আমি উহা দেখিতে পাই নাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দুইটি নিতান্ত আধুনিক প্রতিলিপি রক্ষিত আছে।

গিয়াছেন। তাহা এই—আকবর বাদশাহের রাজ্যমধ্যে সপ্তগ্রাম ও ত্রিবেণীর নিকটবর্ত্তী গঙ্গাতটবাসী দ্বিজবর পরাশর কবির পিতা ছিলেন।

পঞ্চগৌড় নামে স্থান পৃথিবীর সার। একাব্বর নামে রাজা অর্জ্জুন-অবতার॥
অপার প্রতাপী রাজা বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি। কলিযুগে রামতুল্য প্রজা পালে ক্ষিতি॥
সেই পঞ্চগৌড়মধ্যে সপ্তগ্রাম স্থল। ত্রিবেণীতে গঙ্গাদেবী ত্রিধারে বহে জল॥
সেই মহানদীতটবাসী পরাশর। যাগ যজ্ঞে জপে তপে শ্রেষ্ঠ দ্বিজবর॥
মর্য্যাদায় মহোদধি দানে কল্পতরু। আচারে বিচারে বুদ্ধ্যে সম সুরগুরু॥
তাহার তনুজ আমি মাধব-আচার্য্য। ভক্তিভাবে বিরচিনু দেবীর মাহাত্ম্য॥
আমার আসরে যত অশুদ্ধ গায়ে গান। তার দোষ ক্ষমা কর কর অবধান॥
শ্রুতি তালভঙ্গ দোষ না নিবা আমার। তোমার চরণে মাগি এই পরিহার॥
ইন্দু বিন্দু বাণ ধাতা শক নিয়োজিত। দ্বিজ মাধবে গায় সারদাচরিত॥

দীনেশ বাবুর মতে, কবি ময়মনসিংহ জেলায় বাস উঠাইয়া লইয়া যান; ইঁহার পিতামহের নাম ছিল ধরণীধর বিশারদ এবং ইঁহার পুত্রের নাম ছিল জয়রামচন্দ্র গোস্বামী। কিন্তু কোথা হইতে যে এই সংবাদ পাওয়া গেল, তাহা দীনেশ বাবু বলেন নাই।

চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা মাধবকে অনেকে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা মাধবের সহিত অভিন্ন বলিয়া মনে করেন। শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা মাধবাচার্য্য দুইজন ছিলেন, তাহার মধ্যে একজন শ্রীচৈতন্যের পারিষদ ছিলেন। অপর মাধবের পিতার নামও ছিল পরাশর, এবং ইনিও সম্ভবতঃ ত্রিবেণীতে অথবা ত্রিবেণীর কাছাকাছি কোন স্থানে বাস করিতেন।[১] ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা মাধবই একখানি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

উপাখ্যানভাগে মাধবের চণ্ডীমঙ্গলের সহিত মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের সম্পূর্ণ ঐক্য আছে। মাধবের কাব্যের পরিচয় হিসাবে নিম্নে উদ্ধৃত ভাঁড়ুদত্তের প্রবঞ্চনা ও অপমান-কাহিনীর অংশ হইতে ইহা পরিলক্ষিত হইবে। ইহা হইতে আরও

১। বিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

দেখা যাইবে যে, ভাড়ুদত্তের চরিত্রবর্ণনায় মুকুন্দরামের মত সংযম মাধবাচার্য্য দেখাইতে পারেন নাই।

কর্ণাট রাগ।

নগরে প্রজার ঘর হৈল সারি সারি। নেতের পতাকা উড়ে বাড়ির উপরি॥
নগরে বসতি করে যত প্রজালোকে। দুর্গার প্রসাদে কারু নাহি রোগশোকে॥
রাজবিঘ্ন নাহি তাতে নাহি দস্যুভীত। দুর্গার প্রসাদে লোক থাকে হরষিত॥
রাজদ্বারে বাদ্য যত বাজে সন্ধ্যাকালে। আসিয়া পশ্চিমা আন (?) সাধয়ে ছাওয়ালে॥
দুঃখী দরিদ্র তাতে এক নাহি জানি। কনককলসী ভরি প্রজা খাএ পানী॥
নগরে বসিল প্রজা হইয়া হরষিত। ঘরে ভাত নাহি ভাঁড়ু দৈবের লিখিত॥
ভাঁড়ু দত্তে বোলে শুন তপন দত্তের মা। ক্ষুধার কারণে মোর পোড়ে সর্ব্ব গা॥
কালুকার অন্ন যদি এক মুষ্টি পাম। বেলান্তে নিশ্চিন্ত হৈয়া দিবানেতে যাম॥
যেনমাত্র ভাঁড়ু দত্তে কৈলে হেন বাণী। ক্রোধ করিয়া তারে কহিছে রমণী॥
যেন মত কহ লোকে বলিবেক বাউল। কালি কৈলা উপবাস আজ্জি কোথা চাউল॥
স্ত্রীর বচনে ভাঁড়ু ভাবে মনে মনে। আজুকার অন্ন আত্মা মিলিব কেমনে॥
ভাঙ্গা কড়ি ছয় বুড়ি গামছা বান্ধিয়া। ছাওআলের মাথাএ বোঝা দিলেক তুলিয়া॥
কড়ি বুড়ি নাই ভাঁড়ু বাক্যমাত্র সার। ত্বরাএ পাইল গিয়া নগরবাজার॥
দনাই নামে চালুয়া পসার দিয়া আছে। ধীরে ধীরে ভাঁড়ু দত্ত গেল তার কাছে॥
ভাঁড়ু দত্তে বোলে দনাই চাউল দেহ মোরে। তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাইমু তোরে॥
দনাঞি বোলে ভাঁড়ু দত্ত চাউল নাহি এথা। বারে বারে চাউল খাও কহি মিথ্যা কথা॥
তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া আগে মজুত দেহ কড়ি। আজু দিয়া পাঠাইব চাউল লইবা বাড়ি॥
ভাঁড়ু দত্তে বোলে দনাই কহিএ তোমারে। ধনের গর্ব্বে মন্দ কথা বোলসি আহ্মারে॥

ঘরের ভিতরে ধন রাখ গোফা গোফা। গিরির মাথা চুল নাঞি নাবার মাথাএ সে খোপা ॥[১]
ভাল মোর অধিকার আছএ নগরে[২]। কালুকা পাইমু তোরে হস্তের উপরে ॥
ভাঁড়ুর বচনে দনা[৩] কাঁপে থর থর। আস্তে ব্যাস্তে উঠিয়া চাপিয়া ধরে কর ॥
পরিহাস কৈলাম ভাই করি দড়াদড়ি। চাউল নিয়া খাও তুহ্মি কড়ি দিহ বাড়ি ॥
এতেক শুনিয়া ভাঁড়ু বসিল চাপিয়া। সের অষ্টাদশ চাউল লইল মাপিয়া ॥
চাউল লইয়া হইল তবে ভাঁড়ুর গমন। পুঁড়ার পসারে গিয়া দিল দরশন ॥
ভাঁড়ু দত্তে বোলে পুঁড়া কহি নিজ কাজ। বাছিয়া বাছিয়া মোরে দেহত আনাজ ॥
নিত্য নিত্য জোগাও আনাজ দেহ মোরে। তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাইমু তোরে ॥
সাত পাঁচ বুলি তারে বোলে ভাই ভাই। শাক খাইব নমুনা লইল তার ঠাঞি ॥
আনাজ লইয়া হইল ভাঁড়ুর গমন। নোনের পসারে গিয়া দিল দরশন ॥
মুলুকি[৪] মুলুকি বলি গেল তার কাছে। কালুকার মজুত নোন তোহ্মা স্থানে আছে ॥
বিশ্বাস বোলাইয়া বীরবরের গোচর। যতেক মজুত কড়ি বোলএ সত্বর[৫] ॥
যতেক মুলুকিগণে ভোলাইবা ভোলে। বাছাই মুলুকি সবে তথায় নোন তোলে ॥
বাছাই মুলুকি তথা নোন তোলে তথনে। নোনের আড়াঙ্গ করিছে স্থানে স্থানে ॥
তে কারণে তোহ্মার নোন কেহ নাহি কিনি। তোহ্মার ভাগ্যে সেই স্থানে আইলাম আপনি ॥
অশেষ বিশেষ আহ্মি কহিলাম পুনি। প্রকারে বুঝাইয়া শান্ত কৈল বীরমণি ॥
মুলুকি বোলে ভাঁড়ু দত্ত কৈলা উপকার। কিছু নোন লইয়া যাও আপনে খাইবার ॥
লবণ লইয়া হইল ভাঁড়ুর গমন। তেলের পসারে গিয়া দিল দরশন ॥

১। পাঠান্তর 'গিরির মাথে চুল নাঞি বাইবনের মাথাএ সে খোপা'।
২। ঐ 'ভালহি নরপতি মোর আছএ নগরে'। ৩। ঐ 'ধনা'।
৪। ঐ 'মনকি' বা 'মলকি'। ৫। ঐ 'জথেক মলকি সব বোলইছে সর্ত্তর'।

কি তৈল কি তৈল বুলি হাত জাবড়াএ। আপনার গোঁফে দিল ছাওআলের মাথাএ ॥
ভাঁড়ু দত্তে বোলে তেলি তৈল দেহ মোরে। তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া যাইমু তোরে ॥
ক্রোধ না কর ভাঁড়ু মোর দিগে চাহ। এক পাবা তৈল দিমু বাড়ি লৈয়া যাহ ॥
তৈল লইয়া হইল ভাঁড়ুর গমন। পানের পসারে গিয়া দিল দরশন ॥
ভাঁড়ু দত্তে বোলে বারুই কহি তোর ঠাই। গুরুকীর্ত্তন কালু কাজে পান কিছু চাহি[১] ॥
বারুই বোলে ভাঁড়ু দত্ত আইলা এথাএ। এক বিড়া পান নেহ কড়ির নাহি দায় ॥
পান লইয়া হইল ভাঁড়ুর গমন। গুআর পসারে গিয়া দিল দরশন ॥
ভাঁড়ু দত্তে বোলে পসারির গুআ দেহ মোরে। তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া কড়ি দিয়া জাইমু তোরে ॥
পসারি বোলে ভাঁড়ু দত্ত গুআ নাহি এথা। বারে বারে খাও গুআ কহি মিথ্যা কথা ॥
তঙ্কা ভাঙ্গাইয়া আগে মজুত দেহ[২] কড়ি। আজু দিয়া পাঠাইব গুআ পাইবা বাড়ি ॥
ভাঁড়ু বোলে তোর বাক্য লাগিল তরাস। গুআর কড়ি হোতে ফাঙ্গা পাইমু[৩] একমাস ॥
সেইখানে বসি আছে গোবিন্দ পালিত। কি কৈলা কি কৈলা ভাঁড়ু বাক্য বিচলিত ॥
ভাঁড়ু দত্তে বোলে প্রজা বার্ত্তা নাহি পাও। সুখে অন্ন জল খাও সুখে নিদ্রা যাও ॥
মহাবীর স্থানে খেলিছে দণ্ডধর। একত্রে পাঠাইয়া দেহ গুজরাটের কর ॥
পত্র পড়ি চাহি বোলে ব্যাধনন্দন। বোলে কোন মতে হৈব গুজরাটের ধন ॥
হেনকালে বসিছিলাম বীরের এক ধারে। যতেক ফাঙ্গার ভার দিলেক আহ্মারে ॥

১। ঐ 'পাঁচস বিরা পান চাহী'। ২। ঐ 'মজুতে আন'। ৩। ঐ 'ফাঙ্গাতে পার হৈল'।

যত কথা কহে বীর আন্ধা করি ঝড়া। গাড়ু কম্বল দিল পাটের পাছোড়া॥
কালুকা প্রভাতে পাইক পাঠাব থরে থরে[১]। তুলিয়া দিবেক টান গাছের উপরে॥
থর ধর কাঁপ দেখি কোপ গেল হোর। পুত্র থাকিতে যেন বাপ আটখোর॥[২]
ভাঁড়ুর বচনে প্রজা কাঁপে থরথর। আস্তে ব্যস্তে উঠিয়া ভাঁড়ুর ধরে কর॥
পরিহাস করিলাম করি দড়াদড়ি। গুআ নিয়া খাও তুহ্মি নাহি দিও কড়ি॥
গুআ লইয়া হইল যে ভাঁড়ুর গমন। কাপড়ুয়া হাটে গিয়া দিল দরশন॥
মধ্য নগরে ভাঁড়ু প্রজারে করে বল। চিঁড়া মিঠা লৈল ভাঁড়ু সন্দেশ বহুতর॥
বেসাতি করএ ভাঁড়ু কারুয়ে না দেয় কড়ি। পসার দিয়া বসি আছে ঘোষের মাও বুঢ়ী॥
তের বুঢ়ীর দধি ভাঁড়ু হস্তে করি লইল। সেই দধি লই ভাঁড়ু সত্বরে চলিল॥
ভাঁড়ু দত্তের বোলে শুন ঘোষের মাও বুঢ়ী। দধিখান লইয়া যাই কাড়ু লইও বাড়ি॥
[বুঢ়ী বোলে] পরিচারক নাহি দোহাইতে গাই। গুখিয়া দ্রব্য নহে তোরে ধারে দিয়া যাই॥
কথার ছেঁছড় তুহ্মি দধি খাইতে চাহ। আপনার মাথা খাও দধি এড়ি যাহ॥
ভাঁড়ু দত্তে বোলে বুঢ়ী কি বুলিব তোরে। ধনের গরবে এত বোলিস আহ্মারে॥
তোর পুত্র শ্যাম ঘোষ তে কারণে সহি। অন্য জন হইলে এহার কথা কহি॥
চোরা গাই লৈয়া বুঢ়ী তোহ্মার বসত। এহার বাদী হইয়াছে গ্রামের রায়ত॥
ভাঁড়ুর বচনে বৃদ্ধা অন্তরে কাঁপিল। করেতে ধরিয়া তাকে কহিতে লাগিল॥
পরিহাস কৈল বাপু কহি দড়াদড়ি। খাও নিয়া দধি তুহ্মি কালি দিহ কড়ি॥
দধিখান লইয়া হইল ভাঁড়ুর গমন। মৎস্যের পসারে গিয়া দিল দরশন॥
মাছোনী বসিছে মৎস্যের পসার লৈয়া কোলে। পসার হোতে মৎস্য ভাঁড়ু বাছি বাছি তোলে[৩]॥
মৎস্য ধরিয়া ডোমনীএ পাড়ে টানাটানি। কড়ি না দিয়া মৎস্য লইয়া যাও কেনি॥
ভাঁড়ু দত্তে বোলে ডোম বলিএ তোহ্মারে। এতকাল মৎস্য বেচ কর দেহ কারে॥
ডোমনীএ বোলে ভাঁড়ু তুমি হও কে[৪]। করের লাগি ধরিবেক জোআতি হএ যে॥

১। ঐ 'সভার তরে'। ২। কোন কোন পুঁথিতে এই পয়ারটি নাই।
৩। পাঠান্তর 'পসারের মৎস্য ধরি ভাঁড়-দত্তে তোলে'। ৪। 'তুই তার কে'।

এই মুখে তুহ্মি আহ্মার মৎস্য খাইবা। মোর সঙ্গে এখনে বীরের স্থানে যাইবা॥
গালাগালি বাজিল বহুল হুড়াহুড়ি। কোমরে থাকিয়া তার পড়ে[১] ভাঙ্গা কড়ি
ভাঙ্গা কড়ি পড়ে ভাঁড়ু বহু লাজ পাএ। মৎস্য এড়িয়া ভাঁড়ু উঠিয়া পলাএ॥
সারদার চরণসরোজমধুলোভে। দ্বিজ মাধবে তথি অলি হইয়া শোভে॥

সেইদিন ভাঁড়ু দত্ত বঞ্চিলা মন্দিরে। প্রভাতে উঠিয়া যায় দেয়ান করিবারে॥
সেই দিন মহাবীর মিলিল সভাত। মধ্যস্থানে বৈসে ভাঁড়ু আচ্ছাদি সবাত॥
সেই দিগে কালকেতু পাতিছিল মন। তখনে না বোলে কিছু সভার কারণ॥
পুষ্প চন্দন দিল প্রজাগণের তরে। দেয়ান ভাঙ্গিয়া প্রজা গেল নিজ ঘরে॥
আগে চন্দন পাইলেক মণ্ডল বুঢ়ন। তাহা দেখি ভাঁড়ু দত্তের পুড়ি উঠে মন
অন্তরে পোড়এ ইহা সহিতেঁ না পারে। স্ফুটভাষী হইয়া কহে সভার ভিতরে॥
ঠাকুর যে অল্প জাতি কি বুলিমু তোরে। তুহ্মি কি জানিবা বীর আহ্মার ব্যবহারে॥
দত্তকুল অল্প জাতি তোহ্মার গেআন। ভাঁড়ু দত্ত থাকিতে চন্দন পাএ আন॥
যখনে আছিল ঘর নগর গোলাটে। মাংসের পসরা লইয়া ফুলরা যাইত হাটে॥
এখনে পরের ধন পাইয়া ঠাকুরাল। হেন জান সেই ধন তোহ্মার হৈল কাল॥
আহ্মারে দেখিয়া তুহ্মি কর অল্প জ্ঞান। এই পুরী মজাইতে চলিনু দেয়ান॥
মহাবীর বোলে মোর ধারে আছে কে। নির্জ্জাস করিয়া কিছু ভাঁড়ুর তরে দে[২]॥
ভাঁড়ু দত্ত ধরে পাইক করি ধরাধরি[৩] চোয়াড় চাপড় মারে উপাড়ে গোঁপ দাড়ি[৪]॥

কিলের কারণে ভাঁড়ু ফাটি যায় বুক। ভূমিতে পড়িয়া দেখে মণ্ডলের মুখ॥
মণ্ডলে বোলএ বাপু করি নিবেদন। লাঘব হইল ভাঁড়ু রাখহ জীবন॥
মণ্ডলের বাক্যে ভাঁড়ু এড়ান পাইল। ঝাড়িয়া গায়ের ধূলা বাড়িতে চলিল॥
বাড়ির নিকটে গিয়া ডাকয়ে রমণী। ত্বরায় আনিয়া দেহ এক হাঁড়ি পানী॥
প্রভুর বচন শুনি রমণী অস্থির। ভাঙ্গা বাহাসে করি আনি দিল নীর॥

১। ঐ 'কচ্ছ হোতে ভাঁড়দত্তের পড়ে'। ২। 'আমারে কুরূপ দেখি মনে'।
৩। ঐ 'নিঃঝাস করিয়া ভারুর গালে চোয়ার দে'।
৪। ঐ 'ভারু লইআ বিরের পাইকে করে ধরাধরি'। ৫। ঐ 'চাপর মারি উখারিল দাড়ি'।

ভাঁড়ু দত্ত দেখিয়া যে রমণী ফাঁফাএ। দেয়ানেতে গেলা তুহ্মি ধূলা কেনে গায়ে॥
ভাঁড়ু দত্তে বোলে প্রিয়া শুনরে কর্কশা। মহাবীরের সঙ্গে আজি খেলাইছি পাশা॥
ক্রমে ক্রমে মহাবীরে হারিল দশ পাড়ি। রসের রসিক হৈয়া কৈলা ধূলাধূলি॥
ধূলাধূলি করিয়া যে বহু পাইনু রদ। মহাবীরের গায়ে দিছি এমন ধাধস॥
কি বোলিতে পারি প্রিয়া বীরের মহত্ত্ব। তাহার পিরীতে বশ্য হৈল ভাঁড়ু দত্ত॥
মিথ্যাবাক্যে রমণীরে করিয়া প্রতীত। বাড়ির গোধার জলে ডুব দিলেক ত্বরিত॥
দেয়ানেরে যায় ভাঁড়ু মনে নাহি হেলা। চুরি করি লইলেক ফুল কাঁচকলা॥
বীরের খাসি লৈয়া ভাঁড়ু দেয়ানেতে যায়। তারকপুর সিঙ্গাপুর ত্বরায় এড়ায়[১]॥
বিনোদপুর এড়াইয়া চণ্ডীর হাট। উপনীত হৈল গিয়া যথা রাজপাট॥
ভেট সজ্জ থুইয়া ভাঁড়ু যায় এক ভাগে। দণ্ড প্রণাম কৈলা ভূপতির আগে॥
সারদার চরণসরোজমধুলোভে। দ্বিজ মাধবে তথি অলি হৈয়া শোভে॥[২]

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভক্তিরস ও অদ্ভুত রসের একঘেয়েমির মধ্যে ভাঁড়ুদত্তের এই চরিত্রবর্ণনা আতিশয্য দোষযুক্ত হইলেও মোটের উপর ভালই লাগে।

মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল বা অভয়ামঙ্গল প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতম কাব্যের অন্যতম। বৈষ্ণব পদাবলী ও চরিতকাব্যগুলির কথা বাদ দিলে ষোড়শ শতাব্দীর সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য রচনা হইতেছে মুকুন্দরামের কাব্য। প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য বৈষ্ণব গীতকাব্য ও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যসমূহের বৈচিত্র্যহীন একতানের মধ্যে মুকুন্দরামের বর্ণিত ফুল্লরা, খুল্লনা ও ভাঁড়ু দত্তের চরিত্র স্বরবৈচিত্র্য আনয়ন করে। অনেকটা এই কারণেই আধুনিক কালে শিক্ষিত সমাজে মুকুন্দরামের কিছু খ্যাতি দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কাউয়েল (Cowell) সাহেব মুকুন্দরামের কাব্যের কিছু কিছু অংশ ইংরেজি পদ্যে অনুবাদ করিয়াছিলেন। চণ্ডীমঙ্গলের কাব্যরসে মুগ্ধ হইয়া কাউয়েল মুকুন্দরামকে ইংরেজ কবি চসারের (Chaucer) সঙ্গে তুলনা করিয়াছিলেন। ইহাও মুকুন্দরামের খ্যাতির কতকটা কারণ বটে।

১। ঐ 'আপনার পুরি এরি চণ্ডির হাট পাএ'। ২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩১৮ ও ৬১১৭ সংখ্যক পুঁথি অবলম্বনে।

চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের বাঁধা খাতে কবিত্ব ফলাইবার অবকাশ অতিশয় সঙ্কীর্ণ। তৎসত্ত্বেও মুকুন্দরাম স্বীয় কাব্যে যে বৈশিষ্ট্য দেখাইয়াছেন তাহা উচ্চশ্রেণীর প্রতিভাসম্পন্ন কবির পক্ষেই সম্ভব। মুকুন্দরামের কবিপ্রতিভার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য হইতেছে কবিসুলভ সহৃদয়তার সহিত সূক্ষ্ম পর্য্যবেক্ষণশীলতা ও রসবোধের সমন্বয়। কি আত্মকাহিনীতে, কি দরিদ্রদম্পতির গৃহস্থালীর বর্ণনায়, কি স্বামীস্ত্রীর কলহে অথবা সাতসতীনের কোন্দলে, কি ভাঁড়ু দত্তের শঠতার বর্ণনায়, কি বাঙ্গাল মাঝির হাহুতাশে, সর্ব্বত্রই কবির সূক্ষ্মপর্য্যবেক্ষণশক্তি ও সহৃদয়তার অনন্যসুলভ ছাপ দেদীপ্যমান। কবি জীবনে অনেক দুঃখ ভোগ করিয়াছিলেন, কিন্তু তজ্জন্য তাঁহার লেখনী কুত্রাপি নিষ্ঠুর হয় নাই। স্থানে স্থানে বেশ ব্যাঙ্গোক্তি (irony, sarcasm) করিয়াছেন, কিন্তু তাহা জ্বালাহীন। মোটকথা শ্রেষ্ঠ উপন্যাসিকের প্রতিভা লইয়া মুকুন্দরাম আবির্ভূত হইয়াছিলেন। এবং এ বিষয়ে তিনি আধুনিক-পূর্ব্ব বাঙ্গালা সাহিত্যিকগণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিবিহীন।

এখন মুকুন্দরামের কাব্যের রচনা কাল লইয়া আলোচনা করি। কোন কোন পুঁথিতে এবং বটতলা সংস্করণে এই রচনাকালজ্ঞাপক পয়ারটি পাওয়া যায়—

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বনিতা॥[১]

এখানে রস অর্থে ছয় ধরিলে কালসঙ্গতি হয় না, নয় ধরিলে হয়। ১৪৯৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৭৭-৭৮ খ্রীষ্টাব্দে কবির স্বপ্নাদেশ পাওয়া কিছুমাত্র অসঙ্গত নয়।[২]

আত্মকাহিনী অংশ হইতে জানিতে পারি যে কাব্যরচনাকালে মানসিংহ বঙ্গ বিহার উড়িষ্যার সুবাদার ছিলেন। মানসিংহ কর্ত্তৃক উড়িষ্যা জয় ১৫৯৩ খ্রীষ্টাব্দের দিকে হইয়াছিল। চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি ক্ষুদ্র পুঁথিতে একটি চৌতিশা পাওয়া গিয়াছে। কোন ভণিতা নাই, তবে পুঁথিতে আছে কবিকঙ্কণের চৌতিশা। চৌতিশার পাঠ মুদ্রিত পুস্তকের পাঠের সঙ্গে মিলে না। চৌতিশাটির শেষে রচনা-কাল দেওয়া আছে।

১। বঙ্গবাসী সংস্করণ, পৃ ৩১৩।
২। প্রদীপ ১৩১২, পৃ ২৯৯-৩০১ দ্রষ্টব্য।

চাপ্য ইন্দু বাণ সিন্ধু শক নিয়োজিত।
পঞ্চবিংশ মেষ অংশে চৌতিশা পূর্ণিত ॥[১]

এখানে প্রথম ছত্রে স্পষ্টতঃ সিন্ধু স্থলে ইন্দু পাঠ ধরিতে হইবে। তাহা হইলে আমরা পাই ১৫১৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে। এই সাল গ্রন্থ-রচনার তারিখ হইতে কোনই বাধা নাই। অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় বলিয়াছেন যে রঘুনাথ রায়ের রাজ্যকাল হইতেছে ১৪৯৫-১৫২৫ শকাব্দ অর্থাৎ ১৫৭৩-১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা যথার্থ হইলে, কাব্যটির রচনাকালের শেষ সীমা হয় ১৬০৩ খ্রীষ্টাব্দ।

কাব্যের প্রারম্ভে কবি কাব্যরচনার হেতু উপলক্ষ্যে কিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় দিয়াছেন। তাহা হইতে জানিতে পারি যে, ছয় সাত পুরুষ ধরিয়া কবির বাস ছিল রত্নানু নদের তীরে দামুন্যা বা দামিন্যা গ্রামে। এই গ্রাম বর্ত্তমানে বর্দ্ধমান রায়না থানার একেবারে দক্ষিণ প্রান্তে। ইহার অব্যবহিত উত্তরে গোতান গ্রাম। (মুকুন্দরাম যে চণ্ডীবাটী গ্রামের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা এখন গোতান গ্রামের দক্ষিণ পাড়া। এখানে এখনও শ্রীমন্তা নামে পুকুর আছে।) মামুদ সরিপ নামক ডিহিদারের অত্যাচারে উৎপীড়িত হইয়া কবি সপরিবারে দেশত্যাগ করিয়া ব্রাহ্মণভূমের অন্তর্গত আড়রা বা আরড়া গ্রামের জমিদার বাঁকুড়া বায়ের আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই গ্রাম এখন মেদিনীপুর জেলার ঘাটাল থানার অন্তর্গত। মুকুন্দরামের পাণ্ডিত্যে ও কবিত্বে মুগ্ধ হইয়া বাঁকুড়া রায় তাঁহাকে পুত্র রঘুনাথ রায়ের শিক্ষকতায় নিযুক্ত করিলেন। পরে এই রঘুনাথ রায়ের অনুরোধেই কবি চণ্ডীমঙ্গল রচনা করেন। ভণিতা অংশ হইতে কবির বংশ-পরিচয় ও সন্তানাদির নাম পাওয়া যায়, তাহা পরে আলোচনা করিতেছি।

শুধু আত্মচরিত বা কবিচরিত বলিয়া নহে, বর্ণনভঙ্গির লালিত্যের জন্য এবং রসোজ্জ্বল বাস্তববর্ণনা হিসাবে আত্মকাহিনী অংশটি অপূর্ব্ব অনবদ্য। ছয় সাত পুরুষের ভিটায় এতকাল স্বচ্ছন্দে থাকিয়া শেষ পাঠান রাজা দাউদ খাঁ কররানীর অশান্তিপূর্ণ রাজ্যকালে নির্ম্মম ডিহিদারের অনির্ব্বচনীয় অত্যাচার যখন অসহ্য

১। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৩-১৪।

হইয়া উঠিল তখন দেশত্যাগ ছাড়া নিঃস্ব কবির আর উপায়ান্তর রহিল না। দেশ ত্যাগ করিয়া যাইবার পথে যে মনোবেদনা ও নির্য্যাতন তাহা আরও গুরুতর। কিন্তু পথিমধ্যে সামান্য গৃহস্থের স্বল্প উপকারের গভীর কৃতজ্ঞতায় কবির চিত্তপট যে স্নিগ্ধ করুণ আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল তাহার আভাস দুঃখতাপের তীব্রতা-মাত্রহীন এই কাহিনীটিতে বিচিত্ররূপে প্রতিফলিত হইয়াছে। এই ছত্রের মধ্যেই মুকুন্দরামের প্রতিভার শ্রেষ্ঠ তুলিকাস্পর্শ দেখিতে পাইতেছি। এই আত্মকাহিনী-টুকুর স্বল্পপরিসর পটভূমিকায় অসামান্য প্রতাপপ্রচণ্ড মামুদ সরিপ হইতে সামান্য যদুকুণ্ড তেলি সকলের চরিত্রই নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্যে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে। সুপরিচিত হইলেও আত্মকাহিনী অংশটি এখানে সমগ্রভাবে উদ্ধৃত করিবার লোভসংবরণ করিতে পারিলাম না। বিভিন্ন মুদ্রিত সংস্করণ ও পুঁথি অবলম্বনে নিম্নোদ্ধৃত পাঠ নির্দ্ধারিত হইয়াছে। উল্লেখযোগ্য পাঠান্তর পাদটীকায় দেওয়া গেল।

শুন ভাই সভাজন কবিত্বের বিবরণ, এই গীত হৈল যেন মতে।
উরিয়া মায়ের বেশে কবির শিয়র-দেশে চণ্ডিকা বসিলা আচম্বিতে॥
সহর সেলিমাবাজ, তাহাতে সজ্জনরাজ নিবসে নিয়োগী গোপীনাথ।
তাঁহার তালুকে বসি দামিন্যায় চাষ চষি, নিবাস পুরুষ ছয় সাত॥
ধন্য রাজা মানসিংহ বিষ্ণুপদাম্বুজভৃঙ্গ গৌড়-বঙ্গ-উৎকল-অধীপ।
অধর্ম্মী রাজার[১] কালে প্রজার পাপের ফলে ডিহিদার মামুদ সরিপ॥
উজির হইল রায়জাদা বেপারি ক্ষত্রিয়[২] খেদা ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব জনে অরি।
মাপে কোণে দিয়া দড়া, পনর কাঠায় কুড়া, নাহি মানে প্রজার গোহারি॥
সরাকার হইল কাল, খিল ভূমি লিখে লাল, বিনি উপকারে খায় ধুতি[৩]।
পোদ্দার হইল যম, টাকা আড়াই আনা কম, পাই লভ্য লয় দিন প্রতি॥
ডিহিদার আরোজ[৪]-খোজ, কড়ি দিলে নাহি রোজ, ধান্য গরু কেহ নাহি কিনে।
প্রভু গোপীনাথ নন্দী বিপাকে হইলা বন্দী, হেতু কিছু নাহি পরিত্রাণে॥

১। "সে মানসিংহের"। ২। "বেপারিরে দেয়"।
৩। "ক্ষতি"। ৪। "অবোধ"।

পেয়াদা সবার কাছে[১], প্রজারা পলায় পাছে দুয়ার চাপিয়া[২] দেয় থানা।
প্রজা হইল ব্যাকুলি বেচে ঘরের কুড়ালি, টাকাকের বস্তু দশ আনা॥
সহায় শ্রীমন্ত খাঁ চণ্ডীবাটী যার গাঁ, যুক্তি কৈল মুনিব[৩] খাঁর সনে।
দামুন্যা ছাড়িয়া যাই সঙ্গে রমানাথ[৪] ভাই, পথে চণ্ডী দিলা দরশনে॥
তেলিয়া গাঁয়ে[৫] উপনীত, রূপরায় নিল বিত্ত, যদু কুণ্ডু তেলি কৈল রক্ষা।
দিয়া আপনার ঘর নিবারণ কৈল ডর দিবস তিনের দিল ভিক্ষা॥
বহিয়া[৬] গোড়াই[৭] নদী সদাই সোঙরি বিধি কেঁউটায়[৮] হইলুঁ উপনীত।
দারুকেশ্বর তরি পাইল মাতুলপুরী,[৯] গঙ্গাদাস বড় কৈলা হিত॥
নারায়ণ পরাশর এড়াইল দামোদর,[১০] উপনীত তেউটা[১১] নগরে।
তৈল বিনা কৈল স্নান, করিলুঁ উদক পান, শিশু কাঁদে ওদনের তরে॥
আশ্রয়[১২] পুখরি-আড়া, নৈবেদ্য শালুক-নাড়া, পূজা কৈনু কুমুদ প্রসূনে।
ক্ষুধা ভয় পরিশ্রমে নিদ্রা যাই সেই ধামে, চণ্ডী দেখা দিলেন স্বপনে॥
হাতে লৈয়া পত্রমসী আপনি কলমে বসি নানাছন্দে লিখেন কবিত্ব।
যেই মন্ত্র দিলা দীক্ষা সেই মন্ত্র করি শিক্ষা, মহামন্ত্র জপি নিত্য নিত্য॥
দেবী চণ্ডী মহামায়া দিলেন চরণ-ছায়া, আজ্ঞা দিলা রচিতে সঙ্গীত।
চণ্ডীর আদেশ পাই শিলাই তরিয়া[১৩] যাই, আড়রায় হইলুঁ উপনীত॥
আড়রা[১৪] ব্রাহ্মণভূমি ব্রাহ্মণ যাহার স্বামী, নরপতি ব্যাসের সমান।
পড়িয়া কবিত্ব বাণী সম্ভাষিনু নৃপমণি, দশ আড়া মাপি দিলা ধান॥
সুধন্য বাঁকুড়া রায় ভাঙ্গিল সকল দায়, সুতপাঠে[১৫] কৈল নিয়োজিত।
তাঁর সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত গুরু করি করিল পূজিত॥
সঙ্গে দামোদর[১৬] নন্দী যে জানে স্বপন-সন্ধি অনুদিন করয়ে যতন।
নিত্য দেন অনুমতি রঘুনাথ নরপতি, গায়নেরে দিলেন ভূষণ॥

১। "জাঁদা রহে প্রতি নাছে।" ২। "জাঁতিয়া"। ৩। "গরিব," "গম্ভির"। ৪। "রামানন্দ"। ৫। "ভেটনায়," "ভালিরায়"। ৬। "বহিলুঁ"। ৭। "মুড়াই"। ৮। "ভেউট্যায়," "ভেঙটিয়ায়"। ৯। "পাওল পুরী," "বাতন গিরি"। ১০। "পার হৈলুঁ আমোদর"। ১১। "কুচট্যা," "গুছিতা"। ১২। "আশ্রম"। ১৩। "চাহিয়া"। ১৪। "আরড়া"। ১৫। "শিশু পাছে," "সুত পাশে"। ১৬। "দামাল," "ডামাল"।

বীরমাধবের স্থত রূপে গুণে অদভুত, বীর বাঁকুড়া ভাগ্যবান্।
তাঁর স্থত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত, শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

দামিন্যায় কবির পৈতৃক দেবতা সিংহবাহিনীর পুরোহিতদিগের নিকট একখানি অসম্পূর্ণ পুঁথি ছিল। এই পুঁথির কথা সর্ব্বপ্রথম অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় প্রকাশ করেন।[১] এই পুঁথিতে এবং কাইতি গ্রামে প্রাপ্ত ১১৮৩ সালে অনুলিখিত এক পুঁথিতে একটি স্বতন্ত্র আত্মপরিচয় দেখা যায়। দামিন্যার পুঁথিটিকে কবির স্বহস্তলিখিত পুঁথি মনে করিয়া উহাকেই মূল ধরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্করণের পাঠ ধার্য্য হইয়াছে। এই সংস্করণে ভূমিকায় এক স্থানে [পৃ ৭] বলা হইয়াছে যে পুঁথিটি তালপত্রে লিখিত, কিন্তু কয় পাতা পরেই আছে [পৃ ১২] যে পুঁথিটি ভূর্জ্জপত্রে লিখিত। প্রকৃত কথা হইতেছে যে, পুঁথিটি তেরেট পাতায় লিখিত ছিল। পুঁথিটির মধ্যে এক খণ্ড চিরকুট পাওয়া গিয়াছিল, তাহা ১০৪৭ সালে বারা খাঁ কর্ত্তৃক কবির পুত্র শিবরামকে কয় বিঘা নিষ্কর ভূমি প্রদানের দলিল। ইহা হইতে পুঁথিটিরও প্রাচীনত্ব স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে। প্রকৃতপ্রস্তাবে কিন্তু দেখা যায় যে, এই পুঁথির পাঠ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্ব্বাচীন ও ভ্রান্তিমূলক। তাহা ছাড়া পুঁথিটি অসম্পূর্ণ। স্থতরাং ইহা কবির স্বহস্তলিখিত মনে করা কঠিন। কাইতির পুঁথিও নিতান্ত অর্ব্বাচীন। এখন এই দ্বিতীয় আত্মকাহিনীটি উদ্ধৃত করিয়া ইহার প্রামাণ্য বিচার করিব।

কুলে শীলে নিরবদ্য কায়স্থ ব্রাহ্মণ বৈদ্য দামুন্যায় সজ্জনের স্থান[২]।
অতিশয় গুণ-বাড়া স্থধন্য দক্ষিণ পাড়া,[৩] স্থপণ্ডিত স্থকবি সমান॥
ধন্য ধন্য কলিকালে রত্নানু নদের কূলে অবতার করিলা শঙ্কর।
ধরি চক্রাদিত্য নাম দামুন্যা করিলা ধাম, তীর্থ কৈলা সেই সে নগর॥
বুঝিয়া তোমার তত্ত্ব দেউল দিল বৃষদত্ত,[৪] কতকাল তথায় বিহার।
কে বুঝে তোমার মায়া, স্থরকুল তেয়াগিয়া বরদান[৫] করিলা সঞ্চার॥

১। প্রদীপ ১৩১২, পৃ ২৯১-৩৩২ ; ব-সা-প-প ১৩, পৃ ১১৫-২৭ ; ব-সা-প-প ১৩, কার্য্যবিবরণী, পৃ ৪৯। ২। পাঠান্তর 'দামিন্যাতি সজ্জন প্রধান।'
৩। ঐ 'রাড়া' অর্থাৎ রাঢ়। ৪। ঐ 'ধূসদত্ত'। ৫। ঐ 'চলদলে'।

গঙ্গা সম সুনির্ম্মল তোমার চরণজল পান কৈনু শিশুকাল হৈতে।
সেই ত পুণ্যের ফলে কবি হই শিশুকালে রচিলাঙ তোমার সঙ্গীতে॥
হরি নন্দী ভাগ্যবান্ শিবে দিলা ভূমি[১]-দান, মাধব ওঝা ধামাদিকরণী[২]।
দামুন্যার লোক যত শিবের চরণে রত, সেই পুরী হরের ধরণী॥
পাষণ্ডকুলের অরি যশোমন্ত[৩] অধিকারী, কল্পতরু নাগ উমাপতি।
অশেষ পুণ্যের কন্দ নাগ ঋষি সর্ব্বানন্দ, সেই পুরী সজ্জন-বসতি॥
কাঁটাদিয়া বন্দ্যঘাটী বেদান্তনিগমপাঠী ঈশান পণ্ডিত মহাশয়।
ধন্য ধন্য পুরবাসী বন্দ্য সে বাঙ্গালপাশী লোকনাথ মিশ্র ধনঞ্জয়॥
কাঞ্জড়ি ফুলের সার মহামিশ্র অলঙ্কার শব্দকোষ কাব্যের নিধান।
কয়্যড়ি কুলের রাজা সুকৃতি তপন ওঝা তস্য সুত উমাপতি নাম॥
তনয় মাধব শর্ম্মা সুকৃতি সুকৃতকর্ম্মা তার নয় তনয় সোদর।
উদ্ধরণ পুরন্দর নিত্যানন্দ সুরেশ্বর বাসুদেব মহেশ সাগর॥
সর্ব্বেশ্বর[৪] অনুজাত মহামিশ্র জগন্নাথ একভাবে সেবিলা শঙ্কর।
বিশেষ পুণ্যের ধাম সুধন্য হৃদয় নাম[৫] কবিচন্দ্র তার বংশধর॥
অনুজ মুকুন্দশর্ম্মা সুকবি সুকৃতকর্ম্মা নানা শাস্ত্রে নিশ্চয় বিদ্বান্।
শিবরাম বংশধর, কৃপা কর মহেশ্বর, রক্ষ পুত্র পৌত্রে ত্রিনয়ান॥[৬]

প্রথম আত্মকাহিনীটি যে খাঁটি তাহা যাহার বিন্দুমাত্রও রসবোধ ও সাহিত্য-জ্ঞান আছে তাহার পক্ষে বুঝিতে এতটুকুও বিলম্ব হইবে না। দ্বিতীয় কবিতাটির বিষয়ে সংশয়ের প্রচুর কারণ রহিয়াছে। পরবর্ত্তীকালে যখন কবি ও তাহার বংশধরগণের স্বগ্রামে কিছু প্রতিপত্তি হইয়াছে তখন সম্ভবতঃ দেশস্থ ব্রাহ্মণ ও ধনী ব্যক্তিদিগের স্তুতিবাদের প্রয়োজন হইয়াছিল। সেই প্রয়োজনের তাগিদেই এই দ্বিতীয় আত্মকাহিনীটির উৎপত্তি। এটি দামিন্যানিবাসী কোন চণ্ডীমঙ্গল গায়কের রচনা হওয়াও কিছুমাত্র বিচিত্র নহে। আর যদি এটি যথার্থই মুকুন্দরামের

১। ঐ 'জমি'। ২। ঐ 'ধনাধিকারিণী'। ৩। ঐ
৪। ঐ 'গর্ভেশ্বর'। ৫। ঐ 'গুণীরাজ মিশ্র নাম'।
৬। প্রদীপ ১৩১২, পৃ ২৯১, ২৯২-৩; ব-সা-প-প ১৩, পৃ ১২৪-২৬।

রচনা হয়, তবে বলিব, কবি প্রৌঢ় অথবা বৃদ্ধবয়সে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে এটি রচনা করেন, তখন কবির পৌত্রও জন্মিয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গলের মধ্যে পুত্রকন্যাদির উল্লেখ আছে কিন্তু পৌত্রের উল্লেখ একেবারেই নাই। সুতরাং এটি চণ্ডীমঙ্গল রচনার পরে রচিত হইয়াছিল।

ভণিতা হইতে মুকুন্দরাম সম্বন্ধে এই সব কথা জানা যায়। কবির পিতামহের নাম জগন্নাথ মিশ্র, রাঢ়ীয় শ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণ, কয়ড়ি গাঞি। ইনি মৎস্য মাংস ত্যাগ করিয়া কবিত্বলাভের আশায় অনেক দিন ধরিয়া দশাক্ষর মন্ত্র জপ করিয়া গোপালের পূজা করিয়াছিলেন। কবির পিতার নাম হৃদয় মিশ্র; ইনি গুণিরাজ-মিশ্র বলিয়াও বহুবার উল্লিখিত হইয়াছেন, সুতরাং "গুণিরাজ" ইঁহার উপাধি ছিল বলিয়া বোধ হয়।

মহামিশ্র জগন্নাথ   হৃদয় মিশ্রের তাত,   কবিচন্দ্র হৃদয়নন্দন।
তাহার অনুজ ভাই   চণ্ডীর আদেশ পাই   বিরচিল শ্রীকবিকঙ্কণ॥
কয়্যড়ি কুলেতে জাত   মহামিশ্র জগন্নাথ   একভাবে পূজিল গোপাল।
কবিত্ব মাঙ্গিয়া বর   মন্ত্র জপি দশাক্ষর   মীন মাংস ছাড়ি বহুকাল॥
গুণিরাজ মিশ্র-সুত   সঙ্গীতকলায় রত   বিচারিয়া অনেক পুরাণ।
দামিন্যা নগরবাসী   সঙ্গীতের অভিলাষী   শ্রীকবিকঙ্কণ রস গান॥

ভণিতা হইতে জানিতে পারি, কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম (উপাধি?) ছিল কবিচন্দ্র। আর আত্মপরিচয় হইতে জানিতে পারি যে, কবির সঙ্গে ভাই রমানাথ (পাঠান্তর 'রামানন্দ') ছিলেন। ইনি কি কবির অনুজ? না, ইনিই কবিচন্দ্র?

ভণিতায় কতিপয় স্থলে শিবরাম, চিত্রলেখা, যশোদা ও মহেশের জন্য দেবীর দয়া ভিক্ষা করা হইয়াছে। মধ্যে মধ্যে শুধু শিবরামের জন্য দয়া ভিক্ষা করা হইয়াছে।

উর গো কবির কামে,   কৃপা কর শিবরামে
চিত্রলেখা যশোদা মহেশে॥
করগো করুণাময়ী শিবরামে দয়া॥

প্রবাদ অনুসারে কবির পুত্রের নাম শিবরাম, পুত্রবধূর নাম চিত্রলেখা, কন্যার নাম যশোদা এবং জামাতার নাম মহেশ (পাঠান্তর 'মহীশ')।

কোন কোন পুঁথিতে "দৈবকীনন্দনে ভণে" ইত্যাকার ভণিতা পাওয়া যায়।[১] দৈবকীনন্দন কোন স্বতন্ত্র কবি না হইলে বুঝিব যে, কবির মাতার নাম ছিল দৈবকী।

সম্ভবতঃ কবি শিশুকাল হইতে গ্রামদেবতা রামাদিত্যের সেবাপরায়ণ ছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্করণের উপজীব্য পুঁথিতে গ্রামদেবতার নাম চক্রাদিত্য।

দামিন্যা নগরবাসী প্রভু রামাদিত্য।
শিশুকাল হৈতে তায় সেবা করি নিত্য ॥ পৃ ১৭৬[২] ॥

কবির পৃষ্ঠপোষক বীর-বাঁকুড়া রায় ব্রাহ্মণভূমের অধীশ্বর ছিলেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণ, পালধি গাঞি। ইঁহার পিতার নাম ছিল বীরমাধব, শ্বশুরের নাম দুলাল সিংহ, ভার্য্যার নাম দনা দেবী এবং পুত্রের নাম রঘুনাথ। রঘুনাথের রাজ্যকাল ১৪৯৫ হইতে ১৫২৫ শকাব্দ।

বীরমাধবের সুত রূপে গুণে অদভুত বীর-বাঁকুড়া ভাগ্যবান।
তার সুত রঘুনাথ রাজগুণে অবদাত, শ্রীকবিকঙ্কণে রসগান ॥ পৃ ৭ ॥
দুলাল সিংহের সুতা দনা দেবী পাটমাতা কুলে শীলে গুণে অবদাত।
তার সুত নৃপরত্ন করিল বহুত যত্ন বৈরিশূন্য দেব রঘুনাথ ॥ পৃ ১৪১।

কবি আড়রাতে বসিয়া ভূতপূর্ব্ব ছাত্র ও তদানীন্তন পৃষ্ঠপোষক রাজা রঘুনাথের আদেশে কাব্যটি রচনা করেন। তখন বাঁকুড়া রায় জীবিত নাই। কবি ভণিতার মধ্যে বহুবার রঘুনাথের জন্য দেবীর দয়া প্রার্থনা করিয়াছেন।

পালধি বংশেতে জাত দ্বিজরাজ রঘুনাথ, সভাসদ শ্রীকবিকঙ্কণ।
চণ্ডীপদ ভাবি চিত রচিল মুকুন্দ গীত রাজা রঘুনাথের কৌতুকে ॥

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, পৃ ১৪-১৫।
২। বর্ত্তমান আলোচনা প্রধানতঃ বঙ্গবাসী (তৃতীয়) সংস্করণ অবলম্বনে করা হইয়াছে।

রচিয়া ত্রিপদী ছন্দ গান করিল মুকুন্দ সুখে থাকি আড়রা নগরে ॥
করিয়া চণ্ডিকা ধ্যান শ্রীকবিকঙ্কণে গান রঘুনাথ দিল অনুমতি ॥

কবিকঙ্কণ উপাধি সম্ভবতঃ চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতা অথবা চণ্ডীমঙ্গলের বড় গায়কেরা ব্যবহার করিতেন। অন্ততঃ এই উপাধি মুকুন্দরাম ছাড়াও অন্য চণ্ডীমঙ্গল-রচয়িতার ছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয় মুকুন্দরামের বংশতালিকা সংগ্রহ করিয়া প্রকাশিত করিয়াছেন।[১]

এইবার মুকুন্দরামের কাব্যের বিস্তৃত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

বন্দনা ও আত্মপরিচয় ইত্যাদি উপক্রমণিকা অংশ ছাড়া চণ্ডীমঙ্গল কাব্য তিন আখ্যানভাগে বিভক্ত। প্রথম ভাগ শিব-সতী ও শিব-পার্ব্বতীর পৌরাণিক কাহিনী, এটিকে শিবায়নখণ্ড বলা চলে। তাহার পর কালকেতু-ফুল্লরার কাহিনী এটিকে গোধিকাখণ্ড বলা যায়। শেষে ধনপতি-খুল্লনা-শ্রীমন্ত (বা শ্রীপতি) কাহিনী, ইহাকে কমলে-কামিনীখণ্ড বলিতে পারা যায়। এই তিন খণ্ড আখ্যানাত্মক চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

উপক্রমণিকা ও শিবায়ন কাহিনী—গণেশ বন্দনা, সূর্য্যবন্দনা[২], মহাদেব-বন্দনা[৩], সরস্বতীবন্দনা, শ্রীচৈতন্যবন্দনা, শ্রীরামবন্দনা[৪], লক্ষ্মীবন্দনা, চণ্ডীবন্দনা[৩], শুকদেববন্দনা[৫], দিগ্‌বন্দনা[৩]; গ্রন্থ-উৎপত্তির কারণ (আত্মকথা); মঙ্গলবারের পালা আরম্ভ[৩], হরগৌরীর দ্যূতক্রীড়া[১]; প্রার্থনা। আদিদেবের সৃষ্টি চিন্তা, আদিদেবের দেহ হইতে আদিদেবীর উৎপত্তি, আদিদেবীর বর্ণনা। আদিদেব হইতে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব এই তিন দেবের, মহৎতত্ত্বাদির, ব্রহ্মার মানসপুত্রাদির উৎপত্তি। প্রলয় জলধি হইতে মহাবরাহ কর্ত্তৃক পৃথিবীর উদ্ধার। মনুর প্রজা সৃষ্টি, সতীর সহিত শিবের বিবাহ। ভৃগুমুনির তদুপলক্ষে দক্ষের শিবনিন্দা,

১। ব-সা-প-প ১৩, পৃ ১২৮।
২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণেই আছে।
৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এবং বঙ্গবাসী কার্য্যালয়ের পাঠ বিভিন্ন।
৪। বঙ্গবাসী সংস্করণে আছে। ৫। সকল পুঁথিতে নাই।

দক্ষের প্রতি নন্দীর শাপ। দক্ষের যজ্ঞোদ্যোগ। বিনা নিমন্ত্রণে সতীর পিত্রালয়ে গমন। সতী অনুযোগ করিয়া পিতাকে বলিলেন,

শুন বাপা তোমারে করিয়ে অভিমান। এবে কেন সতী ঝিয়ে টুটিল সম্মান॥
ধর্ম্ম আদি তোমার যতেক বন্ধুজন। সভাকে আসিতে যজ্ঞে দিলে নিমন্ত্রণ॥
শিবে নিমন্ত্রণ নাহি দিলে কি কারণে। সম্পদে মাতিয়া বাপ না দেখ নয়নে॥
ব্রহ্মা যাঁর বাঞ্ছিত করেন পদধূলি। ইন্দ্র আদি দেব যারে করে পুটাঞ্জলি॥
অন্য জামাতেরে দিলে বস্ত্র অলঙ্কার। শিবপক্ষে ভাল নহে তব ব্যবহার॥
দারুণ কর্ম্মের ফলে আমি তোর ঝি। না করিলে ভাল কর্ম্ম আমি কব কি॥ পৃ ১৩॥

দক্ষ বলিল, শিবের যে ভেক তাহা ভদ্রসমাজের যোগ্য নহে, তদুপরি

আমি ত ব্রহ্মার সুত ত্রিভুবনে সুবিদিত মোর প্রতি তার ব্যবহার।
ভৃগুর যজ্ঞের স্থানে দেবগণ বিদ্যমানে আমারে না করে নমস্কার॥
শুন ঝিয়ে সত্যবাণী, ইথে যদি শিবে আনি অবশ্য হইবে যজ্ঞনাশ।
দেখিয়া শিবের গুণ আর যত দেবগণ একস্থানে না করেন বাস। পৃ ১৪॥

পিতৃমুখে পতিনিন্দা শুনিয়া সতী দেহত্যাগ করিলেন। শিবানুচর কর্ত্তৃক যজ্ঞভঙ্গ, দক্ষের ছাগমুণ্ড লাভ, সতীদেহস্কন্ধে শিবের ভ্রমণ, সিদ্ধপীঠসকলের উৎপত্তি। হিমালয়ে শিবের তপস্যা। ব্রহ্মা কর্ত্তৃক শিবের স্তব—

সৃজিয়া অমর নর করিয়া আপন পর মহা-অন্ধকারে দিলা মেলা।
ভাঙ্গিয়া গড়িয়া দেখ, গড়িয়া ভাঙ্গিয়া রাখ, বালকে যেমন করে খেলা॥

ব্রহ্মার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া শিব দক্ষালয়ে গমন করিয়া যজ্ঞের ফল পূর্ণ করিলেন। হিমালয় গৃহে গৌরীর জন্ম ও বৃদ্ধি, নারদ কর্ত্তৃক গৌরীর বর নির্দ্দেশ, তারকাসুর-বধের জন্য দেবতাদিগের উদ্যোগ, ইন্দ্র ও ব্রহ্মার যুক্তি, মদনভস্ম, রতিবিলাপ, দৈববাণী কর্ত্তৃক রতির প্রবোধ, গৌরীর তপস্যা, শিব কর্ত্তৃক গৌরীর পরীক্ষা, হরগৌরীর বিবাহ উদ্যোগ। গৌরীর বর আসিয়াছে দেখিতে নারীদিগের গমন—

শিশু কাঁদে মাই দিতে নাহি করে মো। কোন আইয়ো আইসে তার হাথে কাঁখে পো ॥
চড়িয়া জাঙ্গলে আইয়ো দিল বাহু নাড়া। আঁখির কটাক্ষে ভাঙ্গিয়া আইল পাড়া ॥ ২৫ ॥

জামাতার কুৎসিত বেশ দেখিয়া মেনকার চক্ষু হইতে ঝর ঝর জল পড়িতে লাগিল। সমবেত নারীরাও কাণাকাণি করিতে লাগিল

চক্ষু খাউক কন্যার পিতা চক্ষে পড়ুক ছানি ॥
হেন বরে বিভা দিল কি দেখি সম্পদ।
বাপ হয়্যা মূঢ়মতি কন্যা কৈল বধ ॥

শেষে গৌরীর প্রার্থনায় শিব মদনমোহন বেশ ধারণ করিলেন। নারীগণ তাহা দেখিয়া নিজ নিজ পতিনিন্দা করিল। হরগৌরীর বিবাহ। প্রভাতে নেশার জন্য শিবের ভিক্ষায় গমন। গণেশ ও কার্তিকেয়ের জন্মবিবরণ। হরগৌরীর পাশাখেলা। শিব ঘরজামাই হইল বলিয়া মেনকা গৌরীকে ভর্ৎসনা করিল,

তোমা ঝি হৈতে মোর মজিল গিরিয়াল। ঘরে জামাই রাখিয়া পুষিব কত কাল ॥
প্রভাতে খেজাড়ি মাঙ্গে কার্তিক গণাই। চারি কড়ার সম্ভাবনা তোর ঘরে নাই ॥
দরিদ্র তোমার পতি পরে বাঘছাল। সবে ধন বুড়া বৃষ গলে হাড়মাল ॥ পৃ ২৯ ॥

গৌরী উত্তর করিলেন,

জামাতারে পিতা মোর দিল ভূমিদান। তাহে হয় মাষ মসূরী তিল কাপাস ধান ॥
বান্ধিয়া বাড়িয়া মাগো কত দেহ খোঁটা। আজি হতে তোমার ঘরে পুতিলাম কাঁটা ॥
মৈনাক তনয় লৈয়া সুখে থাক ঘরে। কভু না সহিব খোঁটা যাব অন্যান্তরে ॥[২]

হরগৌরীর কৈলাস গমন। শিবের ভিক্ষা। পরদিন শিবের ফরমাস হইল বিবিধ ব্যঞ্জন রাঁধিবার, তাহাতে ক্রুদ্ধ হইয়া দেবী বলিলেন,

রন্ধনের তরে ভাল কহিলে গোঁসাই। প্রথমে যে পাতে দিব সেই ঘরে নাই ॥
কালিকার ভিক্ষায় নাথ উধার শুধিলুঁ। অবশেষে ছিল যাহা রন্ধন করিলুঁ ॥
আছিল ভিক্ষার কালি পালি দশ ধান। গণেশের মুষাতে তাহা কৈল জলপান ॥
আজিকার মত যদি বান্ধা দাও শূল। তবে সে আনিতে নাথ পারি হে তণ্ডুল ॥

শূল বাঁধা দিবার কথায় শিবের ক্রোধ হইল, তিনি বলিলেন,

আমি ছাড়িব ঘর যাব দেশান্তর, কি মোর ঘর-করণে।
হয়ে স্বতন্তর তুমি কর ঘর লয়ে গুহ গজাননে॥
ঘরে যত আনি লেখা নাহি জানি, ডেরী অন্ন নাহি থাকে।
কতেক ইন্দুর ধায় দূর দূর গণার মূষার পাকে॥
দেশে দেশে ফিরি কত ভিক্ষা করি, ক্ষুধায় অন্ন নাহি মিলে।
গৃহিণী দুর্জ্জন, ঘর হৈল বন, বাস করি তরুমূলে॥
গুহার ময়ূর খাইতে বড় শূর সর্প খেদাড়িয়া খায়।
হেন নয় মোরে এই পাপ ঘরে রহিতে নাহি জুয়ায়॥
করুণা করিয়া বাঘা বুলে ধায়্যা দেখিয়া তাহার চাহনী।
বলদ দুর্ব্বল করে টলমল নাহি খায় ঘাঁস পানী॥
আন বাঘছাল শিঙ্গা হাড়মাল ডুম্বুর বিভূতি ঝুলি।
আইস হে নন্দী আমার সঙ্গী, ঘরে না রহিব শূলী॥ পৃ ৩১॥

এইরূপে খেদ করিয়া শিব বৃষ আরোহণ পূর্ব্বক চলিয়া গেলেন। দেবীও বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন পদ্মা দেবীকে বলিলেন, বিলাপ করিয়া কাজ নাই, শীঘ্রই আপনার পূজা পৃথিবীতে প্রচারিত হইবে। এই বলিয়া পদ্মা ভবিষ্যৎপূজার ইতিহাস যাহা বর্ণনা করিল তাহা চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর "অনুবাদ" বটে। দেবীর আদেশে বিশ্বকর্ম্মা হনূমানের সাহায্যে কলিঙ্গনগরে কংস নদীর তীরে দেবীর দেউল ও তৎসংলগ্ন সরোবর এবং উদ্যান নির্ম্মাণ করিল।

হনূমান অভয়ার লয়ে অনুমতি।
পাষাণে রচিত কৈল পূজার পদ্ধতি॥

দেবী কলিঙ্গরাজকে স্বপ্ন দিলেন। স্বপ্ন পাইয়া রাজা মন্দিরে দেবীর পূজা প্রবর্ত্তন করিল। রাজার স্তবে সন্তুষ্ট হইয়া দেবী তাহাকে বর দিয়া কৈলাসে চলিয়া গেলেন বটে, কিন্তু অংশরূপে তথায় থাকিয়া নিত্য পূজা গ্রহণ করিতে লাগিলেন। বিন্ধ্য-পর্ব্বতবাসী সব পশু কৈলাসগামিনী দেবীর দর্শন পাইয়া দেবীকে প্রণাম করিল।

উর্দ্ধমুখে পশুগণে করয়ে গোহারি। কৃপা করি মোর পূজা লহ মহেশ্বরী॥

অপরাধ বিনা পশু সদাই সশঙ্ক। বর দিয়া ভগবতী কর নিরাতঙ্ক॥
পশুগণে সদয় হইলা ভগবতী। আত্মপূজা বিধানে দিলেন অনুমতি॥
আজ্ঞা পায়্যা পশুগণ হরিষে আকুল। বনে বনে ফিরিয়া আনিল বনফুল॥
আম জাম শেয়াফুল কালচির ফল। নৈবেদ্য দিলেন পাদ্য কংস নদীর জল॥
প্রদক্ষিণ নমস্কার কৈল বারে বার। আশীর্ব্বাদ ভদ্রকালী করিলা অপার॥
বাঘে না খাইবে মৃগ কেশরী বারণে। তুরঙ্গ মহিষ যে সাম্ভাহ এক স্থানে॥
অবিরোধে দুঁহে থাক শশারু খটাশ। স্মরণ করিলে দুঃখ করিব বিনাশ॥ পৃ ৩৫।

দেবী সিংহকে রাজা করিলেন। তরক্ষু ছত্রধর হইল, শরভ পুরোহিত, শার্দ্দূল ভল্লুক, কোক বন্যবরাহ ও গণ্ডার পঞ্চপাত্র, ঘোড়া বাহন, কপি বাদ্যকর, চমরী বীজনকারী, ফেরু রায়বার, নকুল বৈদ্য। দেবী আরও বলিলেন,

পশুর হাজরা মহ্য খাইবে প্রজার শস্য, তুমি হবে রাজার দুয়ারী।
নিশায় জাগিয়া থাক্য প্রহরে প্রহরে ডাক্য শিয়াল হও কোটাল প্রহরী॥
নীলকণ্ঠ বারতান বারশিঙ্গা চোলকান পাঁজা মিত্থা কারফরমা।
আমার পূজার ফলে থাক সবে কুতূহলে, বাঘে আর না খাইবে তোমা॥
উট গাধা ক্ষেতি খাবে রাজার নফর হবে, সম্পদে বিপদে তোর ভার।
আর যত পশুগণ সবে হবে প্রজাগণ, মণ্ডল হইবে কালসার॥ পৃ ৩৬॥

দেবী যখন কলিঙ্গের দেশে তখন শিব স্বর্গমর্ত্ত্য পাতালে স্বীয় পূজা প্রচার করিয়া ফেলিয়াছেন। ইন্দ্র শিব পূজা করে, আর তার পুত্র নীলাম্বর পুষ্প জোগায়। দেবী আসিয়া শিবকে বলিলেন,

আট দিন মোর পূজা মরত ভিতরে। তিন দিবসের কথা লয়্যা নীলাম্বরে॥
নীলাম্বব শাপ দিয়া যদি লহ ক্ষিতি। তবে সে প্রচার হয় পূজার পদ্ধতি॥

শিব উত্তর করিলেন,

তিলমাত্র নীলাম্বরের নাহি দেখি পাপ। কেমন প্রকারে আমি দিব তারে শাপ॥
যদি মহী ইচ্ছা করে ইন্দ্রের কোঙার। তবে অভিশাপ দিব কি দোষ তোমার॥

শিবের অঙ্গীকার পাইয়া দেবী নারদকে ইন্দ্রের সভায় পাঠাইলেন। ইন্দ্র নারদের নিকট দেশের বার্ত্তা জিজ্ঞাসা করিলে নারদ বলিল, অসুরেরা আড়ম্বর

করিয়া শিব পূজা করিতেছে, তাহাতে মনে হয় যে তাহারা তোমার রাজ্য অধিকার করিতে সঙ্কল্প করিয়াছে, অতএব তুমিও অনন্যচিত্তে শিবপূজা কর। ইন্দ্র তাহাই করিতে সংকল্প করিল। পুষ্প চয়নের ভার পড়িল নীলাম্বরের উপর। দেবীর মায়ায় নীলাম্বর নন্দনকানন পুষ্পশূন্য দেখিল। দুঃখিতচিত্তে নীলাম্বর এক গাছের তলায় বসিয়া নিজের অদৃষ্ট চিন্তা করিতে করিতে দেখিল, এক ব্যাধ মৃগের পিছনে ছুটিয়াছে। দেখিয়া নীলাম্বরের মনে হইল, এই ব্যাধের জীবন ত মন্দ নহে। শেষে কিছু ফুল পাইয়া নীলাম্বর গৃহে ফিরিল। একটি ফুলের ভিতর পিপীড়া ছিল, সেই পিপীড়া শিবের মাথায় দংশন করায় শিব নীলাম্বরকে শাপ দিলেন,

বসুমতী চল ঝাট হও গিয়া ব্যাধ ॥

নীলাম্বর তখন শিবের স্তব করিয়া অনুযোগ করিল,

সুর নর নাগ দেবা করয়ে তোমার সেবা, কেহ নাহি অধোগতি হয়।
না দেখি এমন দৃষ্টি, চাঁদ হৈতে বিষবৃষ্টি, চন্দন প্রসবে ধনঞ্জয় ॥
অভিমত ইচ্ছা করি সেবিলাম কাম-অরি, ফল তাহে হৈল প্রতিকূল।
নির্ব্বন্ধ দৈবের দোষে ভরা দিলাম লাভ-আশে, হরি হরি হারাইলাম মূল ॥
বেচিল তোমার পায় নীলাম্বর নিজ কায়, যেন ইচ্ছা করহ তেমন।
কৃপা কর দেববর্গ, না চাহি নরক স্বর্গ, তোমার চরণে রহু মন ॥ পৃ ৪১ ॥

শিব মনে মনে দুঃখিত এবং লজ্জিত হইলেন এবং সান্ত্বনা দিলেন,

হইয়া চণ্ডিকা ভক্ত চারি মাসে হবে মুক্ত,
আসিবে আপন নিকেতন ॥

তাহার পর নীলাম্বরের মৃত্যু, ইন্দ্র কর্ত্তৃক শিবের স্তব, নীলাম্বর পত্নী ছায়ার সহমরণ। এইখানে প্রথম খণ্ড শেষ।

তাহার পর কালকেতুর কাহিনী। বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে দেবী কর্ত্তৃক ধর্ম্মকেতু ব্যাধের পত্নী নিদয়াকে পুত্রলাভের ঔষধ প্রদান, নিদয়ার গর্ভ, সাধভক্ষণের ইচ্ছা।

প্রাণনাথ, কাল গর্ভ হৈল কোন ফলে।

অরুচি করিল বল, ওদন ব্যঞ্জন জল, পেটে ক্ষুধা মুখে নাহি চলে ॥

গর্ভের দেখিয়া ভর মনে মোর লাগে ডর, ক্ষুধা তৃষ্ণা নাহি দিন দশ।
আপনার মত পাই তবে গ্রাস কত খাই, পোড়া মাছে জামীরের রস ॥
নিধানী করিয়া খই তাহাতে মাহিষ দই, কুল করঞ্জা প্রাণ হেন বাসি।
যদি পাই মিঠা ঘোল, পাকা চালিতার ঝোল, প্রাণ পাই পাইলে আমসী ॥
আমার সাধের সীমা হেলঞ্চা কলমী গিমা, বোদালি আনিয়া কর পাক।
ঘন কাটি খর জ্বালে সাঁতলিবে কটু তেলে, দিবে তাতে পলতার শাক ॥
পুঁই-ডগা মুখী-কচু ফুলবড়ী তাহে কিছু, তাতে দিবে মরিচের ঝাল।
হরিদ্রা রঞ্জিত কাঞ্জী উদর পূরিয়া ভুঞ্জি, প্রাণ পাই পাইলে পাঁকাল ॥
লোণ কিছু দিয়া বাঢ়া নকুল গোধিকা পোড়া, হংস ডিমে কিছু তোল বড়া।
কিছু ভাজ রাইখড়া, চিঙ্গড়ির তোল বড়া, শজারু কর শিক-পোড়া ॥
সদাই ন্যাকার উঠে, দিনে দিনে বল টুটে, বদনে সদাই উঠে জল।
মূলা বাগ্যন সীম তাহে দিয়া রান্ধ নীম, আর দিও উড়ুম্বর ফল ॥

তাহার পর কালকেতুর জন্ম, নামকরণাদি ও যৌবনপ্রাপ্তি। সঞ্জয়কেতুর কন্যা ফুল্লরার সহিত কালকেতুর বিবাহ। ধর্ম্মকেতু ও নিদয়ার বারাণসী গমন। কালকেতুর মৃগয়া, ফুল্লরা কর্ত্তৃক মৃগয়াজাত বস্তু বিক্রয়, কালকেতুর প্রাত্যহিক ভোজন। কালকেতু মৃগধ্বংস করায় পশুরাজ সিংহের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ। পশুদিগের পরাজয় ও দেবীর দেউলে গিয়া দুঃখ নিবেদন।

কান্দে সিংহ আদি পশু স্মঙরি অভয়া। অপরাধ বিনা মাতা দূর কৈলা দয়া ॥
ভালে টীকা দিয়া মাতা কৈলে পশুরাজ। করিব তোমার সেবা রাজ্যে নাহি কাজ ॥

প্রাণের দোসর ভাই গেল পরলোক। উদরের জ্বালা আর সোদরের শোক ॥
তাহে গলে দড়ি দিয়া বান্ধে দুই তোক গড়াগড়ি দিয়া কান্দে রায়বার কোক ॥

উই চারা খাই পশু নামেতে ভালুক। নেউগী চৌধুরী নহি না করি তালুক ॥
সাত পুত্র বীর মাইল বান্ধি জাল পাশে। সবংশে মজিলুঁ মাতা তোমার আশ্বাসে
প্রতিদিন মহাভয় বীরের তরাসে। মাগু মৈল পুত্র মৈল দুই নাতি পোষে।

কান্দয়ে ভল্লুক শিরে করি আত্মঘাতী। জরাকালে হৈল মোর এতেক দুর্গতি ॥

... ...

কানন করয়ে আলো কপালের ছান্দে। ম্মোঙরি তাহার তনু প্রাণ মোর কান্দে ॥
বড় নাম বড় গ্রাম বড় কলেবর। লুকাইতে নাহি ঠাঁই বীরের গোচব ॥
কি করিব কোথা যাব কোথা গেলে তরি। আপনার দস্ত দুটা আপনার বৈরী ॥

হুক হুক করি কান্দে বানর মর্কট। নিবাসে নাহিক কাজ বীর সনে হঠ ॥
বৃদ্ধ পিতামহ ছিল রাম সেনাপতি। সাগর লঙ্ঘিয়া হৈল সে গণে পদাতি ॥

বারশিঙ্গা তুলারু ঘোড়ারু চোলকান। ধরণী লোটায়্যা কান্দে করি অভিমান ॥
কেন হেন জন্ম বিধি কৈল পাপ বংশে। হরিণ জগত-বৈরী আপনার মাংসে ॥
হেকচি করিয়া কান্দে শজারু শশারু। দুঃখ না ঘুচিল মোর সেবি কল্পতরু ॥
গাঢ়ের ভিতর থাকি লুকি ভাল জানি। কি করি উপায় বীর গাঢ়ে ঢালে পানী ॥
চারি পুত্র মৈল মোর আর দুটি ঝি। মাও মৈল বুড়া কালে জীয়া কাজ কি ॥

পৃ ৫৩-৫৪ ॥

দেবী পশুদিগকে আশ্বাস দিয়া বনমধ্যে স্বুবর্ণ-গোধিকা রূপ ধারণ করিয়া রহিলেন। কালকেতু সেদিন মৃগয়ায় কিছু না পাইয়া স্বুবর্ণ-গোধিকা দেখিয়া বাঁধিয়া লইয়া চলিল। গৃহে আসিয়া ফুল্লরাকে না দেখিতে পাইয়া গোধিকাকে বাঁধিয়া রাখিয়া কালকেতু ফুল্লরার অন্বেষণে গেল। দেবী এদিকে ষোড়শবর্ষীয়া স্বন্দরী কন্যার রূপ ধরিয়া বসিয়া রহিলেন। বিশ্বকর্ম্মা তাঁহার জন্য কাঁচুলী তৈয়ার করিয়া দিল, তাহাতে শ্রীকৃষ্ণলীলা ও বিবিধ চিত্র অঙ্কিত ছিল। ফুল্লরার সহিত পথে কালকেতুর দেখা হইল, সেদিন বাসি মাংস কিছুই বিক্রয় হয় নাই। তখন কালকেতু পসার লইয়া নিজে বিক্রয় করিতে গেল আর তাহার কথায় ফুল্লরা তাহার সখীর গৃহে গেল।

সৈয়াড়ি ভেট দিয়া রামা কৈল নমস্কার। দুই সই কোলাকোলি হৈল পুনর্ব্বার ॥
আশ্বাসিয়া আইস আইস বলে তার সই। এতদিন দেখা নাই গিয়াছিলে কই ॥

বিধাতা করিল মোরে দরিদ্রের কান্তা। চারি প্রহর দিন করি উদরের চিন্তা॥
শিরে তৈল দিয়া তার বান্ধিল কবরী। সরস সিন্দূর ভালে দিল সহচরী॥
আঁচল ভরিয়া সই দিল খই মুড়ি। বসিতে আসন দিল চৌখণ্ডিয়া পীড়ি॥
ফুল্লরা দু-কাঠা চাল মাঙ্গিল উধার। কালি সই দিব বলি কৈল অঙ্গীকার॥
আইস পরাণের সই বইস ভগিনী। মোর মাথার গোটা চারি দেখহ উকুনী॥ পৃ ৬১॥

সখীর নিকটে চাল ধার করিয়া গৃহে আসিয়া ফুল্লরা চমৎকৃত হইয়া গেল। প্রণাম করিয়া দেবীর পরিচয় জিজ্ঞাসা করায় দেবী বলিলেন,

ইলাবৃতে ঘর মোর জাতিতে ব্রাহ্মণী। শিশুকাল হৈতে আমি ভ্রমি একাকিনী॥
বন্দ্যবংশে জন্ম স্বামী বাপেরা ঘোষাল। সাত সতা গৃহে বাস বিষম জঞ্জাল॥
তুমি গো ফুল্লরা যদি দেহ অনুমতি। এই স্থানে কত দিন করিব বসতি॥

দেবীর কথায় ফুল্লরার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল।

হৃদে বিষ মুখে মধু জিজ্ঞাসে ফুল্লরা।
দূর হৈল ক্ষুধা তৃষ্ণা রন্ধনের ত্বরা॥

ফুল্লরা বলিল, তুমিত পরমসুন্দরী, কেন ঘর ছাড়িলে বল? যদি শ্বাশুড়ী ননদের সহিত ঝগড়া করিয়া আসিয়া থাক তবে বল, আমি তোমাদের সঙ্গে যাইয়া মিটাইয়া দিয়া আসি। দেবী বলিলেন, স্বামীর দারিদ্র্য ও কদাচার এবং সপত্নীর সৌভাগ্য সহ্য করিতে না পারিয়া চলিয়া আসিয়াছি; আমি তোমাদের গৃহে থাকিয়া তোমাদের ঐশ্বর্য্য বাড়াইব, তোমরা শুধু আমাকে ভক্তি করিও। ফুল্লরা তখন দেবীকে ঐতিহাসিক দৃষ্টান্ত সহযোগে পতিভক্তি বিষয়ে উপদেশ দিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিল। দেবী চুপ করিয়া রহিলেন, ফুল্লরা দ্বিগুণ ব্যাকুলতার সহিত উপদেশ ঝাড়িতে লাগিল। শেষে থাকিতে না পারিয়া দেবী মিষ্ট মিষ্ট করিয়া শুনাইয়া দিলেন,

কুলের বহুড়ী আমি কুলের নন্দিনী। আপনার ভালমন্দ আপনি সে জানি॥
মোর উপদেশে বা তোমার কিবা কাজ। আপনি সে রক্ষা করি আপনার লাজ॥
আছিলাম একাকিনী বসিয়া কাননে। আনিল তোমার পতি বান্ধি নিজগুণে॥

হয় নয় জিজ্ঞাসা করহ যায়্যা বীরে। যদি বীর বলে এবে যাব স্থানান্তরে ॥
আইলাম তোমার ঘর হিত করিবারে। কত না নিষ্ঠুর বাণী বল বারে বারে ॥

পৃ ৬৮ ॥

ফুল্লরা তখন দেবীকে ভাগাইবার জন্য সবিস্তারে নিজের হার মানিয়া দুঃখকথা বর্ণন করিল। দেবী বলিলেন, আর চিন্তা নাই,

আজি হৈতে মোর ধনে আছে তোর অংশ ॥

পরাজিত হইয়া ফুল্লরা কাঁদিতে কাঁদিতে ছুটিল স্বামীর কাছে গোলাহাটে। কালকেতু ব্যাপার দেখিয়া হতবুদ্ধি হইয়া জিজ্ঞাসা করিল,

শাশুড়ী ননদী নাহি নাহি তোর সতা।
কার সনে দ্বন্দ্ব কর্য়া চক্ষু কৈলি রাতা ॥

ফুল্লরা উত্তর করিল,

সতা সতী নাহি প্রভু তুমি মোর সতা। এবে ফুল্লরারে হৈল বিমুখ বিধাতা ॥

... ...

পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে। কাহার ষোড়শী কন্যা আনিয়াছ ঘরে ॥

কালকেতু সক্রোধে বলিল,

পরস্ত্রী দেখিয়ে যেন নিদয়া জননী ॥
বেকত করিয়া রামা কহ সত্যভাষা।
মিথ্যা হৈলে চিয়াড়ে কাটিব তোর নাসা ॥

ফুল্লরা উত্তর করিল,

সত্য মিথ্যা বচনে আপনি ধর্ম্ম সাখী।
তিন দিবসের চাঁদ দুয়ারে বসি দেখি ॥

উভয়ে গৃহে চলিল।

দূর হৈতে দেখে বীর আপনার বাসে।
তিমির ফেটেছে যেন তপন-তরাসে ॥

কালকেতু দেবীকে প্রণাম করিয়া বলিল,

ব্যাধ গোহিংসক রাঢ়, চৌদিকে পশুর হাড়, মশান-সমান এই ভূমি।

বলি গো উচিত বাণী, ঘরে চল ঠাকুরাণী, দেবের সমান মূর্ত্তি তুমি ॥
... ...
পুরাণবসন-ভাতি অবলাজনার জাতি, রক্ষা পায় অনেক যতনে।
যথা তথা অবস্থিতি দোঁহাকার একগতি, হিত বিচারিয়া দেখ মনে ॥

দেবী মৌন হইয়া রহিলেন দেখিয়া কালকেতু ক্রুদ্ধ হইয়া শরসন্ধান করিল। কিন্তু শর হাতে আটকাইয়া গেল। তখন দেবী স্বরূপ প্রকাশ করিয়া মহিষ-মর্দ্দিনীরূপ ধারণ করিলেন। কালকেতুর প্রার্থনায় দেবী পুনরায় কন্যা মূর্ত্তি ধরিলেন। কালকেতু স্তব করিল। সন্তুষ্ট হইয়া

বীর হস্তে দিল দেবী মাণিক অঙ্গুরী। লইতে নিষেধ করে ফুল্লরা সুন্দরী ॥
এক গোটা অঙ্গুরীতে হবে কোন কাম। সারিতে নারিবে প্রভু ধনের দুর্নাম ॥
এই অঙ্গুরীর মূল্য শত কোটি টাকা। ফুল্লরা শুনিয়া মূল্য মুখ করে বাঁকা ॥

ফুল্লরার অভিপ্রায় বুঝিয়া দেবী দাড়িম গাছের তলায় পোঁতা সাতঘড়া ধন কালকেতুকে পাওয়াইয়া দিলেন।

আগু আগু মহাবীর করিল গমন। পশ্চাতে চলিলা মাতা লয়্যা তার ধন
মনে মনে মহাবীর করেন যুকতি। ধনঘড়া লয়ে পাছে পালায় পার্ব্বতী ॥

সাত ঘড়া ধন কুটীরজাত হইলে

চণ্ডিকা বলেন শুন ব্যাধের নন্দন। নগরের মধ্যে দেহ আমার ভবন ॥
পূজিহ মঙ্গলবারে করি দ্রব্যজাত। গুজরাট নগরে কালু তুমি হবে নাথ ॥

কালকেতু বলিল,

অতি নীচ কুলে জন্ম জাতিতে চোয়াড়। কেহ না পরশ করে লোকে বলে রাঢ় ॥
পুরোধা আমার কেবা হইবে ব্রাহ্মণ। নীচ কি উত্তম হয় পাল্যে বহু ধন ॥

দেবী বলিলেন,

পবিত্র হইলে তুমি আমা দরশনে। নিবেক তোমার দান উত্তম ব্রাহ্মণে ॥
হের আইস কালকেতু মন্ত্র দিয়ে কানে। ঘুচিল তোমার পাপ আমা দরশনে ॥

দেবী কৈলাসে চলিয়া গেলেন। সাত ঘড়া ধন গুপ্ত রাখিয়া পরদিন প্রভাতে কালু অঙ্গুরী ভাঙ্গাইতে চলিল। মুরারি শীল বেনে ঠকাইতে চেষ্টা করিল কিন্তু

দেবীর স্বপ্নাদেশে ও আকাশ বাণীতে অঙ্গুরীর যথার্থ মূল্য প্রদান করিল। কালু রাজ্যস্থাপনের উপযুক্ত দ্রব্যাদি ক্রয় করিল এবং বেরুনিয়া আনাইয়া জঙ্গল কাটাইয়া গুজরাট নগরের পত্তন করিল।

প্রথমে দেবীর দেউল নির্ম্মিত হইল তাহার পর অন্য গৃহাদি। কিন্তু কেহই বাস করিতে আসে না, তখন কালকেতু দেবীর শরণাপন্ন হইল। দেবী কলিঙ্গের লোকদিগকে গুজরাটে বাস করিবার স্বপ্নাদেশ দিলেন এবং সমুদ্রের ও ইন্দ্রের সাহায্যে কলিঙ্গে প্রবল বর্ষণ করাইয়া বান ডাকাইলেন। তখন বুলান মণ্ডল প্রমুখ প্রজারা কলিঙ্গ হইতে উঠিয়া আসিয়া গুজরাটে বাস করিল, তাহার পর আসিল ভাঁড়ু দত্ত। কালকেতু যথাযোগ্য সম্মান করিয়া তাহাদিগকে বাস করাইল। তাহার পর মুসলমান, ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, কায়স্থ, বণিক, নবশাখ ও ইতরজাতির আগমন হইল। কালকেতু হাট বসাইল। ভাঁড়ু দত্ত হাটে গিয়া জবরদস্তি করিয়া দ্রব্যাদি লয় শুনিয়া কালকেতু ভাঁড়ুকে জবাবদিহি করিল। তাহাতে ভাঁড়ু কালকেতুকে শাসাইয়া কলিঙ্গরাজের নিকট গিয়া তাহাকে কালুর বিরুদ্ধে উত্তেজিত করিল। কালকেতুর রাজ্যে কলিঙ্গরাজের চর আসিয়া তাহার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া গেল। কলিঙ্গরাজের সহিত কালকেতুর যুদ্ধ বাধিল। ভাঁড়ুর কথায় ভুলিয়া ফুল্লরা কালুকে ধানের গোলায় লুকাইয়া থাকিতে বলিল। ভাঁড়ু কালুকে ধরাইয়া দিল। কালু একাকী কিছুক্ষণ যুদ্ধ করিয়া অবশেষে বন্দী হইল। বন্দীশালায় কালকেতু কাতর হইয়া চৌতিশ অক্ষরে দেবীর স্তব করিল। দেবী আসিয়া কালকেতুর বন্ধনমোচন করিলেন এবং কলিঙ্গরাজকে স্বপ্ন দিলেন। কলিঙ্গরাজ ভীত হইয়া কালকেতুর সম্বর্দ্ধনা করিল এবং তাহাকে গুজরাটের রাজা করিয়া দিল। দেবীর কৃপায় যুদ্ধে মৃত সৈনিকগণ পুনরুজ্জীবিত হইল। কালকেতু রাজা হইয়া প্রজাদিগকে যথাযোগ্য সম্মান করিল। ভাঁড়ু দত্ত আবাব ঘনাইয়া ঘনাইয়া আসিল এবং বাহাদুরী করিতে লাগিল।

ভেট লয়্যা কাঁচকলা শাক বেগুন কচু মূলা ভাঁড়ু দত্ত করিল পয়ান।
বুঝিয়া কার্য্যের তত্ত্ব নিবেদয়ে ভাঁড়ু দত্ত পশ্চাতে করিয়া অবজ্ঞান॥

ভাঁড়ু দত্ত করয়ে জোহার।

প্রণাম করিয়া বীরে ভাঁড়ু নিবেদন করে, খুড়া দেখি ঘুচিল আন্ধার ॥
আছিলে গুপতবেশে, প্রকাশ করাল্য দেশে, সম্ভাষা করালুঁ নৃপমণি।
টীকা দিয়া নরপতি ধরিল ধবল ছাতি, ভূঞা রাজা মাঝে তোমা গণি ॥
কোথা বীর পাইল ধন ঘুষিত সকল জন, পরিবাদ ছিল লোক মাঝে।
প্রকাশ করালুঁ আমি, বড় সুখ পাইলে তুমি, খ্যাত হৈলে নৃপতিসমাজে ॥
যখন দুপর নিশা কৈলুঁ রাজসম্ভাষা, অনেক বুঝালুঁ নরপতি।
ধরিয়া রাজার পায় খণ্ডালুঁ সকল দায়, খুড়ী সে জানয়ে মোর মতি ॥
যে জন আপন হয় সেহ কভু পর নয়, আপন জানিবে ভাঁড়ু দত্তে।
রাজার সভাতে বাণী আমি সে বলিতে জানি, ভাঁড়ু দত্ত বিদিত জগতে ॥
খুড়া তুমি হৈলে বন্দী অনুক্ষণ আমি কান্দি, বহূ তোমার নাহি খায় ভাত।
দেখিয়া তোমার মুখ পাসরিলুঁ সব দুখ, দশদিগ হৈল অবদাত ॥
হইয়া লোকের চূড়া সিংহাসনে বৈস খুড়া, আমাকে রাজ্যের লাগে ভার।
থাকহ পুরাণ শুনি, রাজ্য জানে আমি জানি, নফরে করহ ব্যবহার ॥ পৃ ১০৮ ॥

কালকেতু ভাঁড়ুর স্বরূপ চিনিয়াছে, বলিল,

যখন আছিল পূর্ব্বে মাগু পোয়ে অন্নাভাবে অকালে কুড়ায়্যা খাইল হাটে
জগতে নাহিক জ্ঞাতি, কুলের নাহিক স্থিতি, কায়স্থ বলাসি গুজরাটে ॥
হয়্যা তুই রাজপুত বলাসি কায়স্থসুত, নীচ হয়্যা উচ্চ অভিলাষ।
সেবকের যোগ্য নও, কুটুম্ব করিয়া কও, কুলের মহিমা কৈলি নাশ ॥
পৃ ১০৮-০৯ ॥

ভাঁড়ুকে অশেষ অপমান করিয়া কালকেতু শেষে তাহার ঘরবাড়ী প্রত্যর্পণ করিল। কালকেতুর পুত্রসন্তান জন্মিল। শাপান্তে কালকেতু সস্ত্রীক পুষ্পক-রথে চড়িয়া সুরপুরে প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

খুল্লনার কাহিনী। অতঃপর স্ত্রীলোকের নিকট পূজা লইবার দেবীর ইচ্ছা হইল। ফলে ইন্দ্রের নর্ত্তকী রত্নমালাকে যথারীতি তালভঙ্গ হওয়ার দরুন শাপ দিয়া পৃথিবীতে পাঠান হইল। ইছানী নগরবাসী সাধু লক্ষপতির ঔরসে এবং তৎপত্নী

রম্ভাবতীর গর্ভে রত্নমালা জন্মগ্রহণ করিল, নাম হইল খুল্লনা। খুল্লনার বিবাহ-বয়স হইলে লক্ষপতি জনার্দ্দন ওঝাকে পাত্রের সন্ধানে প্রেরণ করিল। ইতিমধ্যে পারাবতক্রীড়া উপলক্ষ্যে উজানী নগরবাসী ধনপতি সাধুও খুল্লনাকে দেখিয়া তাহার রূপলাবণ্যে আকৃষ্ট হইয়াছিল। জনার্দ্দনও নানাস্থান ঘুরিয়া শেষে ধনপতিকে জানাইল,

শুন লক্ষপতি সদাগর।
যত আছে বন্ধুগণে একে একে দিয়ে গণ্যে, খুল্লনার যোগ্য নাহি বর ॥
যেথা চাঁদ সদাগর তার নাতি আছে বর, ঘর যার চম্পক নগরী।
তার সনে কৈলে কাজ সভাতে পাইবে লাজ, জাতিনাশ কৈল বিষহরি ॥
বর্দ্ধমানে ধুস দত্ত, যার বংশে সোম দত্ত মহাকুল বেন্যার প্রধান।
বাশুলীর প্রতিদ্বন্দ্বী, দ্বাদশ বৎসর বন্দী, বিশালাক্ষী কৈল অপমান ॥
মহাস্থান সাতগাঁ তাতে বৈসে রাম দাঁ, তার শুন কুলের বাখান।
বাসা দিয়া লয় কড়ি, মড়ায় পূর্ণিত বাড়ী, ঘর তার শ্মশানসমান ॥
হরি দত্ত বোড়শূলে তোমা সব নহে কুলে, রাজা যার কৈল অপমান।
ফতেপুরে রাম কুণ্ড সেহ বেটা লুণে ভণ্ড, সেহ নহে তোমার সমান ॥
করজনার হরি লা নাহি পোষে বাপ মা, প্রভাতে না করি তার নাম।
ভালুকীর সোম চন্দ, সে জনা কপটছন্দ, দীক্ষাপথে শূন্য তার ধাম ॥
যে যে বেনে আছে যথা জানিয়ে সভার কথা, সভে হয় দোষের আকর।
গঙ্গার দুকুল কাছে যতেক বণিক আছে খুল্লনার যোগ্য নাহি বর ॥
তোমার কন্যার মত বর ধনপতি দত্ত, কুলে শীলে রূপে গুণবান্।

পৃ ১১৭-১১৮ ॥

ধনপতির এক পত্নী বর্ত্তমান আছে শুনিয়া লক্ষপতির তত মনঃপূত হইল না, শেষে তাহার বিদ্যাবুদ্ধি কুলমর্য্যাদা শুনিয়া রাজি হইল। রম্ভাবতী এই সম্বন্ধের কথা শুনিয়া স্বামীকে ভৎর্সনা করিয়া বলিল,

প্রাণনাথ, কেন দিলে হেন অনুমতি।
হিতাহিত নাহি জ্ঞান, না নিবে কন্যার পণ, কেন ঝিয়ে করিব দুর্গতি ॥

পড়ি শুনি হৈলে পশু, ব্যয় করি নিজ বস্তু কন্যা দিবে দারুণ সতীনে।

... ...

নাহিক মধুর কথা, যে ঘরে লহনা সতা হয় যেন ভুখিল বাঘিনী।
বিচারে হইয়া অন্ধ পদগলে দিয়া বন্ধ ভেট দিবে খুল্লনাহরিণী॥

যাহা হউক বিবাহ হইয়া গেল।

উজ্জয়িনীর রাজা এক জোড়া শারীশুক পাইয়াছেন, তাহারা শাপভ্রষ্ট দেবতা। শুক বেশ পণ্ডিত, রাজার কাছে তত্ত্বকথা কহিত। এই পক্ষিদ্বয়ের উপযুক্ত স্বর্ণপিঞ্জর আনিতে রাজা ধনপতিকে গৌড়ে পাঠাইলেন। এদিকে লহনা দাসী দুর্ব্বলা ও সখী লীলাবতীর পরামর্শে খুল্লনাকে যন্ত্রণা দিতে লাগিল। শেষে তাহাকে ছাগল চরাইতে নিযুক্ত করিল; ছাগল চরাইতে খুল্লনা অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে লাগিল। একদিন গ্রীষ্মকালের দুপুরে খুল্লনা গাছের তলায় শুইয়া ঘুমাইয়া পড়িল। দেবী আসিয়া তাহার একটি ছাগল লুকাইয়া রাখিয়া রম্ভাবতীর মূর্ত্তিতে খুল্লনাকে স্বপ্ন দিলেন,

কত দুঃখ আছে ঝিয়ে তোমার কপালে। সর্ব্বশী ছাগল তোমার খাইল শৃগালে॥
তোর দুঃখ দেখিয়া পাঞ্জরে বিন্ধে ঘুণ। আজি লহনা তোকে করিবেক খুন॥

এইরূপ স্বপ্ন দিয়া দেবী তাঁহার অষ্ট বিদ্যাধরীকে নিকটস্থ সরোবরতীরে মঙ্গলচণ্ডীর পূজায় নিযুক্ত করিলেন।

ঘুম ভাঙ্গিলে খুল্লনা মায়ের উদ্দেশে বিলাপ করিতে করিতে ব্যাকুল হইয়া ছাগল খুঁজিতে লাগিল। খুঁজিতে খুঁজিতে ব্রতপরায়ণা বিদ্যাধরীদিগের সাক্ষাৎ পাইল। তাহাদের উপদেশে খুল্লনা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিল। দেবী তাহার ছাগল ফিরাইয়া দিলেন ও পুত্রবর দিলেন। ওদিকে লহনা স্বপ্ন দেখিল যেন দেবী তাঁহাকে ভর্‌ৎসনা করিতেছেন খুল্লনার প্রতি দুর্ব্যবহারের জন্য। ভয় পাইয়া লহনা খুল্লনাকে ঘরে ফিরাইয়া আনিতে চলিল। খুল্লনাও ফিরিতেছিল, পথে দুই সতীনে দেখা হইল। লহনা ও খুল্লনার মিলন ঘটিল।

সাধু গৌড়ে ব্যসনে মত্ত, দেশে ফিরিবার তাড়া নাই। একদা রাত্রিতে দেবী ও পদ্মাবতী যথাক্রমে লহনা ও খুল্লনার মূর্ত্তি ধরিয়া স্বপ্নে ধনপতির শিয়রে বসিয়া

গঞ্জিয়া বলেন সদাগরে।

পরস্ত্রীতে লুব্ধ হয়্যা	পাসরিলে নিজ জায়া,	সুখে আছ গৌড় নগরে ॥
আইলা ভূপের কাজে,	রহিলা পাসরি ব্যাজে	বেশ্যা জনের অভিলাষে।
মিথ্যা কর শিবপূজা,	তোর নিন্দা করে রাজা,	মুখ না দেখাবে নিজ দেশে ॥

পৃ ১৫১ ॥

স্বপ্ন দেখিয়া ধনপতি শীঘ্রই উজানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তাহার পর ধনপতির গার্হস্থ্যজীবনের কথা। খুল্লনার গর্ভে শাপভ্রষ্ট মালাধরের আবির্ভাব হইল। ধনপতি ধুমধাম করিয়া পিতৃশ্রাদ্ধ করিল। সভায় হরিবংশ ও রামায়ণ পাঠ হইল। জ্ঞাতিমধ্যে খুল্লনার কলঙ্ক রটনা ও জতুগৃহ পরীক্ষায় কলঙ্কভঞ্জন হইল। চন্দনাদি আনিতে ধনপতির প্রতি রাজা পুনরায় বাণিজ্যযাত্রার আদেশ দিলেন। লহনা খুল্লনার নিকট বিদায় লইয়া ধনপতি ডিঙ্গাবহর লইয়া বাণিজ্যযাত্রায় বাহির হইল। যাইবার পূর্ব্বে লহনা ধনপতিকে লাগাইল যে খুল্লনা ডাকিনীদেবতার পূজা করে। ধনপতি ক্রুদ্ধ হইয়া

লজ্ঘিয়া দেবীর ঘট ধরে তার চুলে ॥
ভূমিতে দেবীর ঝারি গড়াগড়ি যায়।
নিকট হইয়া সাধু ঠেলে বাম পায় ॥

দেবী ক্রুদ্ধ হইলেন, পরে খুল্লনার স্তবে প্রসন্ন হইলেন।

যাত্রার কালে ধনপতি অমঙ্গল দেখিল বটে, কিন্তু গ্রাহ্য না করিয়া শিবস্মরণ করিয়া যাত্রা করিল। অজয় বহিয়া ভাগীরথীতে সাধুর ভিঙ্গা পড়িল। নানা সহর গ্রাম পারাইয়া সাধুর ডিঙ্গা সমুদ্রসঙ্গমে পড়িল। সেখানে সাধুর ছয়টি ডিঙ্গা ডুবিয়া গেল। অনেক কষ্ট ভোগ করিয়া সাধু কালীদহে আসিল। সেখানে ধনপতি অদ্ভুত দৃশ্য দেখিল, কমলের উপর এক অপূর্ব্ব কামিনী!

ধরি রামা বাম করে　　　সংহারয়ে করিবরে,
উগারিয়া করয়ে সংহার ॥

ধনপতি কর্ণধার প্রভৃতিকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে তাহারা এই দৃশ্য দেখে নাই। যাহা হউক ধনপতি সিংহলে পৌছিল। সেখানে ধনপতি বেশ

লাভের বাণিজ্য করিল। শেষে একদিন রাজাকে কমলে-কামিনীর কথা বলিল। রাজা অবিশ্বাস প্রকাশ করায় ধনপতি প্রতিজ্ঞা করিল,

দেখাইতে নারি কঞ্জ-কামিনী-বারণ। লুঠ করি লহ মোর বুহিতের ধন ॥
দ্বাদশ বৎসর বন্দী থাকি কারাগারে। যদি দেখাইতে নারি কামিনী-কুঞ্জরে ॥

রাজাও প্রতিজ্ঞা করিলেন, তোমার কথা সত্য হইলে

অর্দ্ধ রাজ্য দিব আর অর্দ্ধেক সিংহাসন ॥

ধনপতি কমলে-কামিনী দেখাইতে না পারিয়া অন্ধকারায় বন্দী হইয়া রহিল।

এদিকে খুল্লনা পুত্রসন্তান প্রসব করিয়াছে। পুত্রের নাম শ্রীমন্ত। শ্রীমন্ত বড় হইল। কিন্তু ধনপতি আর ফিরে না। অন্যান্য ছেলেরা শ্রীমন্তের জন্ম বিষয়ে কুৎসিত ইঙ্গিত করিতে লাগিল। তখন শ্রীমন্ত পিতার সন্ধানে বাণিজ্যযাত্রা করিল। খুল্লনা চণ্ডীপূজা করিল এবং দেবীর ভরসায় পুত্রকে বিদায় দিল। পিতার গমনপথ ধরিয়া শ্রীমন্তও চলিল। সাগরসঙ্গমে গিয়া শ্রীমন্ত কর্ণধারের নিকট গঙ্গাবতরণ কাহিনী শুনিল। নীলাচলে গিয়া জগন্নাথ দর্শন করিল, এবং সেতুবন্ধে গিয়া কর্ণধারের নিকট রামায়ণ ও সেতুভঙ্গ কাহিনী শুনিল। কালীদহে পৌঁছিয়া শ্রীমন্ত কমলে-কামিনী দেখিল, অপর কেহই দেখিল না। শ্রীমন্ত সিংহলে পৌঁছিল। কোটাল তাহাকে ডাকাত বলিয়া ধরিল, এবং বলিল,

তুমি যদি বট সাধু ওহে সদাগর।
সোনার টোপর ফেল জলের উপর ॥

শ্রীমন্ত অপক্কবুদ্ধি বালক, জলে টোপর ফেলিয়া দিল। দেবী সেই টোপর লইয়া খুল্লনাকে দিয়া আশ্বস্ত করিয়া আসিলেন। শ্রীমন্ত যথাসময়ে রাজসভায় গেল ও যথারীতি বাণিজ্য করিল। শেষে কমলে-কামিনীর কথায় পূর্ব্বের মত প্রতিজ্ঞা করা হইল। শ্রীমন্ত পরাজিত হইয়া কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইল। বধ্যস্থলে নীত হইয়া অনেক মিনতি করিয়া শ্রীমন্ত কোটালের অনুমতি লইয়া দূর্ব্বাতণ্ডুল দিয়া মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিয়া চৌত্রিশ অক্ষরে দেবীর স্তব করিল। দেবী উৎকণ্ঠিত হইলেন এবং দেবগণের সহিত সিংহলরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিতে মনস্থ করিলেন। তৎপরে দেবী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর বেশে কোটালের নিকট আসিয়া বলিলেন,

নাতিটী হয়েছি হারা, দেখিলুঁ তাহার পারা, আইলুঁ তোমার সন্নিধান।
চিহ্নিলুঁ আপন নাতি, কোটাল পেয়েছ কতি, বাপের পুণ্যেতে কর দান॥
শিশুমতি মোর নাতি, নহে ঢঙ্গ ঢাঙ্গাতি, নহে খণ্ড বাটপাড় চোর।
কৃপণের যেন কড়ি, অন্ধের যেমন লড়ি, দান দিয়া প্রাণ রাখ মোর॥
পাইলুঁ অনেক ক্লেশ, ভ্রমিলুঁ অনেক দেশ, অঙ্গ বঙ্গ কলিঙ্গ উৎকল।
ত্রিগর্ত্ত আগরা দিল্লী, চাহিলুঁ অনেক পল্লী অবশেষে আইলাম সিংহল॥
পিতা মোর কুলে বন্দ্য, কুলে শীলে নহে নিন্দ্য, স্বামী ঘোষাল পঞ্চানন।
তপস্যা করিয়া আমি দরিদ্র পাইলুঁ স্বামী, বুড়া বৃষ সবে যার ধন॥
অবনীতে নাহি ঠাই, সমুদ্রে ডুবিল ভাই, প্রাণনাথ কৈল বিষ পান।
দারুণ দৈবের দোষে দুই পুত্র নাহি পোষে, কত দুখ করিব বাখান॥
তুমি হও পুণ্যবান, রাজা তোমার করুক মান, বাঢ়ুক তোমার পরমাই।
দিশা লাগে পথে যাত্যে, ছিরা দেহ মোর সাথে, আশীষ করিয়া ঘরে যাই॥

পৃ ২৫৯॥

কোটাল কিছুতে শুনে না, সে রাজার চাকর। তখন দেবী শ্রীমন্তকে কোলে করিয়া বসিলেন। তাহাতে কোটালের মন নরম হইল, কিন্তু তাহার ভাই তাহাকে প্রহার করিতে উত্তেজিত করিতে লাগিল। কোটাল শ্রীমন্তকে মারিতে উদ্যোগ করিলে দেবীর সহিত তাহার যুদ্ধ বাধিল। পরাজিত হইয়া কোটাল রাজার নিকট সব কথা নিবেদন করিল। সিংহলরাজ সজ্জা করিয়া দেবীর সহিত যুদ্ধ করিতে গেলেন। দৈত্য দানা ভূতপ্রেত প্রভৃতি দেবীসৈন্যের সহিত যুদ্ধে রাজসৈন্য বিধ্বস্ত হইয়া গেল। তখন রাজা দেবীর শরণাপন্ন হইলেন। রাজার স্তবে দেবী প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে সর্ব্বসমক্ষে কমলে-কামিনী দেখাইলেন ও হনূমানকে দিয়া বিশল্যকরণী ঔষধ আনিয়া মৃত সৈনিকদিগকে পুনরুজ্জীবিত করাইলেন। দেবী শ্রীমন্তকে সিংহলে এক বৎসর থাকিয়া রাজ-কন্যাকে বিবাহ করিয়া উজানী যাইতে এবং তথায় দেবীর ব্রতকথা প্রচার করিতে বলিলেন। তাহার পর পিতাপুত্রের মিলন হইল। শ্রীমন্ত পিতাকে চণ্ডীর পূজা করিতে বলিলে ধনপতি বলিল,

মাইয়া দেবতা আমি পূজা নাহি করি।
শিব না ছাড়িব আমি প্রাণে যদি মরি॥

শ্রীমন্ত পিতাকে বলিল, রাজা আমাকে তাঁহার কন্যা সমর্পণ করিবেন। ধনপতি সিংহল দেশের অনাচার উল্লেখ করিয়া বিবাহ করিতে নিষেধ করিল,

সিংহলের ভোগ যত বিশেষ কহিব কত, ভোগ কৈলে আপনি মশানে।
তোর পরমায়ুবলে মোর শিবপূজাফলে জীয়ে আছ পরমকল্যাণে॥
গোত্রে আমি দুর্ব্বা ঋষি, মোর কুল সবে ঘোষি, দেশে করাইব সাত বিয়া।
সিংহলিয়া দুরাচার, ভারতভূমির পার, চারি মাস দঢ় কর হিয়া॥

পৃ ২৮২॥

বিবাহ হইয়া গেল। পিতা পুত্র যাহাতে শীঘ্র দেশে ফিরিয়া যায় তজ্জন্য দেবী খুল্লনার মূর্ত্তিতে শ্রীমন্তকে স্বপ্ন দিয়া বলিলেন,

মজি আমি শোকসিন্ধু, ভূপতি তোমার বন্ধু, শ্বাশুড়ী তোমার পাটরাণী।
শ্যালক তোর যুবরাজ, সাধিলে আপন কাজ, পাসরিলে অভাগী খুল্লনী॥
পাইয়া রাজার ধন হরষিত তোর মন, বিদেশে রহিলে প্রিয়পতি।
বিলম্ব দেখিয়া তোর নৃপতি করিল জোর, লুঠ কৈল এ ঘর বসতি॥
নৃপে নিল ধন ঘর, আশ্রম লইল পর, দু-সতিনে সূতা বেচি হাটে।
পরের ভানিয়া ধান দু-সতিনে রাখি প্রাণ, তুমি নিদ্রা যাও হেম-খাটে॥

পৃ ২৮৪॥

স্বপ্ন দেখিয়া শ্রীমন্ত কাতর হইল। শ্বশুর শ্বাশুড়ী শ্যালকাদির সহিত যথাযোগ্য বিদায়সম্ভাষণ করিয়া শ্রীমন্ত পিতাকে ও পত্নীকে লইয়া দেশে যাত্রা করিল। পথে সমুদ্রসঙ্গমে শ্রীমন্ত দেবীর নিকট প্রার্থনা করিয়া পিতার নষ্ট ছয় ডিঙ্গা উদ্ধার করিল। দেশে ফিরিয়া পিতাপুত্র রাজার নিকট কমলে-কামিনীর কথা বলিলে রাজা তাহাকে দেখাইতে বলিল। প্রতিজ্ঞা হইল, শ্রীমন্ত যদি কমলে-কামিনী দেখাইতে পারে তবে তাহার সহিত রাজকন্যা জয়াবতীর বিবাহ হইবে আর যদি না দেখাইতে পারে তবে উত্তর মশানে তাহার প্রাণদণ্ড হইবে। মিথ্যাবাদী মনে করিয়া রাজা যখন শ্রীমন্তকে উত্তর মশানে বধ করিবার উদ্যোগ করিতে-

ছিলেন তখন শ্রীমন্তের স্তবে দেবী আবির্ভূত হইলেন এবং মায়াময় কালীদহ সৃষ্টি করিয়া কমলে-কামিনী দেখাইলেন। জয়াবতীর সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ হইল।

ধনপতি মৃত্তিকা-শঙ্কর পূজিবার কালে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তি দেখিয়া বুঝিতে পারিল, শিব আর দেবী ভিন্ন নহেন। তখন ধনপতি দেবীর পূজা করিল। সপত্নী দর্শনে সিংহলরাজকন্যা সুশীলার অভিমান হইলে শ্রীমন্ত তাহাকে সান্ত্বনা দিল। দেবী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীর রূপে আসিয়া সপত্নীক শ্রীমন্তকে যৌতুক দিলেন। শ্রীমন্ত তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিল। সকলে মিলিয়া দেবীর পূজা করিল। দেবীর বরে ধনপতির সুন্দর রূপ হইল। তাহার পর দেবীর জবানী অষ্টমঙ্গলাতে উপাখ্যানের "অনুবাদ" এবং দেবী কর্ত্তৃক কলিকালের দোষগুণকীর্ত্তন ও হরিনামের মাহাত্ম্যকথন। তাহার পর কালক্রমে খুল্লনা, শ্রীমন্ত, সুশীলা ও জয়াবতী পুষ্পকরথে চড়িয়া স্বর্গগমন করিল। পথে যমদূত তাহাদিগকে লইতে আসায় শিবদূতের সহিত তাহাদের যুদ্ধ ও পরাজয় ঘটিল। দেবীর নিকট যম তাহার দূতদিগের অপরাধের নিমিত্ত ক্ষমাপ্রার্থনা করিল। তাহার পর দেবী শিবের নিকট খুল্লনা-শ্রীমন্ত কাহিনীর সমগ্র বৃত্তান্ত কহিলেন। সর্ব্বশেষে কবির প্রার্থনা।

ত্রয়োবিংশ পরিচ্ছেদ

মনসামঙ্গল : বংশীদাস, চন্দ্রাবতী, নারায়ণ দেব

ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া নিঃসন্দেহে স্থির করা যায় এমন কোন মনসামঙ্গল রচয়িতার নাম করা যায় না। তবে বংশীদাস বা বংশীবদন চক্রবর্ত্তীর কাব্য সাধারণতঃ ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া গৃহীত হইয়া থাকে। এই অনুমানের পোষকতা পাওয়া যায় একটি সংস্করণে উদ্ধৃত এই কালজ্ঞাপক পয়ারে—

জলধির বামেত ভুবন মাঝে দ্বার।
শকে রচে দ্বিজ বংশী পুরাণ পদ্মার॥[১]

কিন্তু এই পয়ারের অকৃত্রিমত্বের বিরুদ্ধেও বলিবার আছে। প্রথমতঃ এই পয়ার কোন্ কোন্ এবং কবেকার পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে তাহা জানা নাই। দ্বিতীয়তঃ "জলধির (৭) বামেত ভুবন (১৪) মাঝে দ্বার (৯)"—অর্থাৎ ১৪৯৭ শকাব্দ বা ১৫৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দে—এই রকম ধরণের কালজ্ঞাপনা অন্যত্র দেখা যায় নাই। তৃতীয়তঃ ১৩১৩ সালে বংশীদাসের যে নিকটতম অধস্তন পুরুষ বর্ত্তমান ছিলেন তিনি কবি হইতে সপ্তমস্থানীয়।[২] সুতরাং বংশীদাসের বর্ত্তমানকাল ষোড়শ শতাব্দী হওয়া সন্দেহের বিষয়। যাহা হউক, সন্দেহের সুবিধা দিয়া আমরা বংশীদাসকে ষোড়শ শতাব্দীর কবিগণের মধ্যেই গণনা করিলাম।

আধুনিক ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত পাটবাড়ী (পাটুয়ারী) গ্রামে বংশীদাসের নিবাস ছিল। কবির পিতামহ হৃদয়ানন্দ, পিতা যাদবানন্দ, মাতা অঞ্জনা। ইঁহারা ছিলেন রাঢ়ীয় ব্রাহ্মণ, বন্দ্যঘটীয় গাঁই। কবির এক পূর্ব্বপুরুষ চক্রপাণি রাঢ দেশ হইতে আসিয়া ব্রহ্মপুত্রের তীরে বাস করেন। কাব্য মধ্যে এইরূপ কবিপরিচয় পাওয়া যায়—

১। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত রামনাথ চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত (কলিকাত, ১৩১৮), পৃ ১৪।
২। ব-সা-প-প ১৩, পৃ ২৯।

বন্দ্যঘটি গাঁই গোত্রে রাঢ়ীর প্রধান ॥
রাঢ় হইতে আইলেন লৌহিত্যের পাশ। পৃ ১৩ ॥
যাদবানন্দের সুত দ্বিজ বংশীদাস।
পাঁচালীপ্রবন্ধে কথা করিলা প্রকাশ ॥
পরগণা দর্জ্জীবাজু পাটোয়ারী গ্রাম।
ফুলেশ্বরী নদীতটে বিরচিত ধাম ॥[১]

বন্দ্যঘটী গাঞি বন্দোঁ[২] যাহার প্রধান। শাণ্ডিল্যগোত্র বন্দোঁ যাহার বাখান ॥
গৌতমমুনির শাখা তৃতীয় প্রবর। দাম উঝার ধার (?) সামবেদ পর ॥
বংশী দ্বিজ পূর্ব্ব গোসাঞি গুরু চক্রপাণি। ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ত্রিকালজ্ঞ জ্ঞানী ॥
বাঢ়া হতে আসিলেক লৌহিত্যের পাশ। পাতুয়াড়ি দর্জ্জিবাজু গ্রামের নিবাস ॥
সম্বন্ধ করিল রত্নাবতী ঠাকুরাণী। যার পুত্র কাশীদাস হৈল মহাজ্ঞানী ॥
তান পুত্র পুরুষোত্তম প্রাজ্ঞ মহাশয়। এক প্রজাপতি করি সর্ব্বলোক কয় ॥
ভূমিষ্ঠে কুলে শীলে সম্বন্ধ অতিশয়। হৃদয়ানন্দ হইলেক তাহার তনয় ॥
তান পুত্র যাদবানন্দ অতি শুদ্ধাশয়। দ্বিজ বংশীদাস হৈল তাহান তনয় ॥[৩]

বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতী যে পিতৃপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে কবি সম্বন্ধে অনেক তথ্য জানা যায়।[৪] কবির মাতার নাম অঞ্জনা, পত্নীর নাম সুলোচনা। বংশীদাস সুদরিদ্র ছিলেন, মনসার গীত গাহিয়া অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেন।

ধারাস্রোতে ফুলেশ্বরী নদী বহে যায়। বসতি যাদবানন্দ করেন তথায় ॥
ভট্টাচার্য্য বংশে জন্ম অঞ্জনা ঘরণী। বাঁশের পালার ঘর ছনের ছাউনি ॥
ঘট বসাইয়া সদা পূজে মনসায়। কোপ করি সেই হেতু লক্ষ্মী ছেড়ে যায় ॥
... ...
দ্বিজ বংশী পুত্র হৈল মনসার বরে। ভাসান গাহিয়া যিনি বিখ্যাত সংসারে ॥

১। শ্রীযুক্ত রজনীমোহন চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত (১৩৪৬) পদ্মপুরাণ বা মনসামঙ্গল, পৃ ১৭৪।
২। মূলে সর্ব্বত্র 'বন্দু'।
৩। ব-সা-প-প ১৩, পৃ ২৮-২৯।
৪। এই বিবরণ সর্ব্বাংশে অকৃত্রিম নাও হইতে পারে।

ঘরে নাই ধান চাল চালে নাই ছানি। আকর ভেদিয়া পড়ে উচ্ছিলার পানি॥
ভাসান গাহিয়া পিতা বেড়ান নগরে। চাল কড়ি যাহা পান আনি দেন ঘরে॥
বাড়াতে দারিদ্র্যের জ্বালা কষ্টের কাহিনী। তার ঘরে জন্ম নৈল চন্দ্র অভাগিনী॥
সদাই মনসাপদ পূজে ভক্তিভরে। চাল কড়ি পান কিছু মনসার বরে॥

* * * * * *

সুলোচনা মাতা বন্দি দ্বিজ বংশী পিতা। যার কাছে শুনিয়াছি পুরাণের কথা॥
মনসা দেবীরে বন্দি করি করযোড়। যাহার প্রসাদে হল সর্ব্বদুঃখ দূর॥
শিব শিবা বন্দি গাই ফুলেশ্বরী নদী। যার জলে তৃষ্ণা দূরে যায় নিরবধি॥

* * * * * *

বিধিমতে প্রণাম করি সকলের পায়। পিতার আদেশে চন্দ্রা রামায়ণ গায়॥[১]

ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত একটি গাথায় বংশীদাস সম্বন্ধে একটি গল্প পাওয়া যাইতেছে।[২] কেনারাম বলিয়া এক ব্রাহ্মণসন্তান দস্যুবৃত্তি করিত। একদিন বংশীদাস দূরগ্রামে মনসার ভাসান গাহিয়া ফিরিবার কালে কেনারামের হাতে পড়ে। কেনারামের আদেশে উলুখাগড়ার বনে বংশীদাস মনসামঙ্গল গান করেন। গান শুনিয়া কেনারামের মন গলিয়া যায়। সে দস্যুবৃত্তি ত্যাগ করিয়া বংশীদাসের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে ও মনসামঙ্গল-গায়ক হয়। গাথাটি বংশীদাসের কন্যার রচনা বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। শেষে ভণিতা এইপ্রকার—

কেনারাম গায় গীত ঝরে বৃক্ষের পাতা।
পয়ার প্রবন্ধে কহে দ্বিজ বংশী-সুতা॥

এই গাথাটিতে মনসামঙ্গলের একটি সংক্ষিপ্তরূপ অন্তর্ভুক্ত আছে। ইহাতে বংশীদাসের ছাড়া নারায়ণ দেব এবং অপর দুই একটি নূতন ভণিতাও পাওয়া যাইতেছে।[৩]

১। সৌরভ, দ্বিতীয় বর্ষ (শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে লিখিত মহিলা কবি চন্দ্রাবতী প্রবন্ধ), বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ১০৫-০৬।

২। দীনেশচন্দ্র সেন কর্তৃক সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক ১৯২৩ সালে প্রকাশিত মৈমনসিংহ-গীতিকা, প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা, দস্যু কেনারামের পালা, পৃ ১৮২-২২৬।

৩। ঐ পৃ ২০৯, ২১১, ২১২, ২১৬, ২১৭, ২১৯।

বংশীদাসের পদ্মাপুরাণ-কাহিনীর একটি সূচী দিতেছি। ইহা হইলে মনসা-মঙ্গল কাব্যের সাধারণ কাঠামো কতকটা বোঝা যাইবে।

গণেশবন্দনা, দশাবতারবন্দনা, সর্ব্বদেবদেবীবন্দনা, সৃষ্টিবর্ণনা, লক্ষ্মীর জন্ম, দক্ষযজ্ঞ, সতীর দেহত্যাগ, শিবের বৈরাগ্য, মদনভস্ম, শিবের শাপপ্রাপ্তি, উমার জন্ম, উমার তপস্যা, উমার বিবাহ, উমার দ্বিতীয়বার তপস্যা, গণেশের জন্ম, কার্ত্তিকের জন্ম, ডোমনীবেশে দেবীকর্ত্তৃক শিবকে ছলনা, নেতার জন্ম, পদ্মার জন্ম, পদ্মার বিষে শিবের মূর্চ্ছা, পদ্মাকর্ত্তৃক শিবকে পুনরুজ্জীবন, হালুয়াদিগের নিকট হইতে পদ্মার পূজা আদায়, জালিকদিগের নিকট হইতে পূজা আদায়, মুসলমানদিগের নিকট হইতে পূজা আদায়, চণ্ডীর সহিত পদ্মার বিবাদ, গঙ্গা ও চণ্ডীর কোন্দল, পদ্মার বিবাহ, নেতার বিবাহ, পদ্মার ব্রহ্মশাপ, আস্তীকের জন্ম, জরৎকারু ও আস্তীকের গৃহত্যাগ, নেতার সহিত পদ্মার কালীদহতীরে বাস, চন্দ্রধরের জন্ম, চন্দ্রধরের বিবাহ ও পুত্রলাভ, চন্দ্রধরের পুত্রদিগের বিবাহ, চন্দ্রধরের ঐশ্বর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাহার নিকট পদ্মার পূজা আদায়ের ইচ্ছা, চম্পকনগরে পদ্মার পূজা প্রচার, চন্দ্রধর কর্ত্তৃক পদ্মার পূজাভঙ্গ, পদ্মার সহিত চন্দ্রধরের বিবাদ, পদ্মার ক্ষোভ, চন্দ্রধরের নিকট হইতে পদ্মাকর্ত্তৃক মহাজ্ঞান হরণ, পরীক্ষিতের কাহিনী, জনমেজয়ের সর্পযজ্ঞ, পদ্মাকর্ত্তৃক ধন্বন্তরিকে অপসারণ, চন্দ্রধরের ছয়পুত্রের সর্পদংশনে মৃত্যু, চন্দ্রধরের বাণিজ্যগমনের আয়োজন, পদ্মার ইন্দ্রসভায় গমন, পৃথিবীতে স্বীয় মাহাত্ম্য ও পূজাপ্রচারের উদ্দেশ্যে পদ্মা-কর্ত্তৃক ইন্দ্রের নিকট উষা ও অনিরুদ্ধের মানবজন্ম প্রার্থনা, উষার শাপপ্রাপ্তি, চন্দ্রধরের সফরে যাত্রা, চন্দ্রধর কর্ত্তৃক পদ্মার পুরীভঙ্গ, পদ্মাকর্ত্তৃক দক্ষিণ সমুদ্রে বিবিধ উৎপাত সৃষ্টি, রাক্ষসদিগের হাতে চন্দ্রধরের লাঞ্ছনা ও মুক্তি, চন্দ্রধরের দক্ষিণ পাটনে আগমন, স্বপ্ন পাইয়া দক্ষিণ পাটনের রাজা চন্দ্রকেতুর চন্দ্রধরের বিপক্ষভাব অবলম্বন, দক্ষিণ পাটনের রীতিনীতি বর্ণনা, পাটনবাসীদিগের নারিকেল ও তাম্বুলভক্ষণে লাঞ্ছনা, চন্দ্রধরের কারাবাস, লক্ষ্মীন্ধরের জন্ম, বিপুলার জন্ম, চণ্ডীর দয়ায় চন্দ্রধরের কারামুক্তি, রাজসভায় চন্দ্রধরের সম্মানলাভ, নারিকেলের জন্মকথা, বাঙ্গালা দেশের অকিঞ্চিৎকর দ্রব্যের বদলে চন্দ্রধরের স্বর্ণরৌপ্যাদি লাভ, রাজা

ও সভাসদ্‌দিগের চটের কাপড় পরা, রাজা ও সভাসদ্‌দিগের প্রতি চন্দ্রধরের শ্লেষোক্তি, চন্দ্রধরের গৃহযাত্রা, চন্দ্রধর কর্ত্তৃক পদ্মার পূজা প্রত্যাখ্যান, চন্দ্রধরের তরী সকল ডুবাইবার জন্য শিবের নিকট মনসার আজ্ঞাপ্রার্থনা, চন্দ্রধরেব বিপুলকায় তরী ডুবাইবার উপযুক্ত জল না থাকায় সমুদ্রের জল বৃদ্ধি করিবার জন্য ইন্দ্রের নিকট পদ্মার প্রার্থনা, সমস্ত নদনদীর সমুদ্রে গমন, চণ্ডীকর্ত্তৃক চন্দ্রধরের তরীরক্ষণ, শিবকর্ত্তৃক চণ্ডীকে চন্দ্রধরের তরীরক্ষাকার্য্য হইতে অপসারণ, চন্দ্রধরের তরীনিমজ্জন, সমুদ্রে পতিত চন্দ্রধরের কথঞ্চিৎ প্রাণরক্ষণ, বিবস্ত্র চন্দ্রধরের তীরে উত্থান, স্নানরত নারীগণ কর্ত্তৃক চন্দ্রধরের লাঞ্ছনা, ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক চন্দ্রধরকে বস্ত্রখণ্ড প্রদান, পদ্মার মায়ায় চন্দ্রধরের বিবিধ উৎকট লাঞ্ছনা, চন্দ্রধরের গৃহে আগমন এবং দাসী ও পুত্রবধূদিগের হস্তে লাঞ্ছনা, পত্নীকর্ত্তৃক পরিজ্ঞান, পুত্র লক্ষ্মীন্ধরের সহিত পরিচয়, লক্ষ্মীন্ধরের বিবাহ সম্বন্ধ, বিপুলার শাপপ্রাপ্তি, চন্দ্রধর কর্ত্তৃক বিপুলার পরীক্ষা, বিপুলার সহিত লক্ষ্মীন্ধরের বিবাহ, লৌহমঞ্জুষা নির্ম্মাণ, লক্ষ্মীন্ধরের সর্পদংশনে মৃত্যু, লক্ষ্মীন্ধরের মৃতদেহ লইয়া বিপুলার ভেলায় যাত্রা, আত্মীয়স্বজন কর্ত্তৃক বিপুলাকে নিবৃত্ত করিবার বিবিধ চেষ্টা, বিপুলাকর্ত্তৃক লক্ষ্মীন্ধরের গলিত শবরক্ষা, নেতা ও পদ্মাকর্ত্তৃক বিপুলাকে ছলিবার চেষ্টা, গোদাকর্ত্তৃক বিপুলাকে প্রলোভন দর্শন ও বলপ্রকাশের চেষ্টা, বিপুলার কৈলাসেব ঘাটে আগমন, পদব্রজে বিপুলার স্বর্গে প্রবেশ, বিপুলার নৃত্যে শিব ও চণ্ডীর সন্তোষ, শিবকর্ত্তৃক পদ্মাকে দেবসভায় আহ্বান, পদ্মার অনাগমনে নারদকর্ত্তৃক পদ্মাকে আনয়ন, দেবসভায় বিপুলার নৃত্য, দেবসভায় বিপুলা ও পদ্মার অর্থী ও প্রত্যর্থীভাব অবলম্বন, বৃহস্পতির মধ্যস্থতা, পদ্মার রোষত্যাগ, চন্দ্রধরের মৃতপুত্র-দিগের পুনরুজ্জীবন এবং নষ্টধন প্রাপ্তি, অবশেষে চণ্ডীর আদেশে চন্দ্রধর কর্ত্তৃক বিষহরির পূজা।

এইবার বংশীদাসের কাব্য ও কবিত্বের কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। বংশীদাস কুত্রাপি পাণ্ডিত্যপ্রদর্শন করিবার চেষ্টা করেন নাই। তথাপি তিনি যে সংস্কৃতভাষাভিজ্ঞ ছিলেন তাহার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। ভাষার সারল্য এবং অনাড়ম্বর বর্ণনাভঙ্গিই বংশীদাসের রচনার প্রধান বিশেষত্ব।

বন্দনা অংশের এই কয়েকটি ছত্রে তত্ত্বকথা বেশ সহজ উপমার সাহায্যে বর্ণিত হইয়াছে।[১]

প্রথমে বন্দিনু দেবদেব নিরঞ্জন।
পূর্ণ ব্রহ্ম নিরাকার অনাদিনিধন॥
নির্গুণ সগুণ কিছু নাহি রূপরেখা।
আছে হেন শব্দ কারো সনে নাহি দেখা॥
সকল ঘটের মধ্যে আত্মারূপে আছে।
ব্রহ্মা আদি কীট যত পতঙ্গ জন্মিছে॥

তাহাতে সকল হয় কেন নাহি ছাড়া। কলার ছোপায় যেন একত্রেতে জড়া॥
একই প্রদীপ যেন জ্বলে দীপ্যমান। তাহাতে অনেক দশা লাগে স্থানে স্থান
অনন্ত অর্ব্বুদ যেন নাহি লেখা জোখা। একত্র হইলে পুনঃ সেই এক শিখা॥
একই ঘাটের জল যেন ভরি ঘটে। নানামতে ভরিলেও তবু নাহি টুটে॥
একই পৃথিবী বৃক্ষ নানামতে লিখি। একই আকাশে জল নানামত দেখি॥
একই ছাঁচের মধ্যে বিম্ব উঠে নানা। রঙ্গভঙ্গ নানারূপ নাহিক গণনা॥
একই বিত্থায় যেন ঘটে নানামতে। নানা অলঙ্কার ভাঙ্গি করয়ে একত্রে॥
পুনঃ পুনঃ প্রণমহ সেই নারায়ণ। তারপর প্রণমহ গৌরীর চরণ॥

ডোমনীবেশে চণ্ডীর মহাদেবকে ছলনা অংশ হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

মনেতে ভাবিয়া মায়া করিলা সুস্থির। বিজয়া হইল নদী অগাধ গম্ভীর॥
জয়া পুনঃ নৌকা হৈয়া সেই জলে ভাসে। নৌকা আগে বৈসে চণ্ডী ডোমনীর বেশে॥
পিতলের অলঙ্কারে করিয়া সাজন। রাঙ্গাপাট দিয়া কেশ বান্ধিল লোটন॥
সিন্দুরের বিন্দু যে কপালে শোভে ভাল। নায়ের আগে বৈসে চণ্ডী হাতে করি হাল॥

১। নিম্নে উদ্ধৃত অংশগুলি ঢাকা হইতে শ্রীযুক্ত মণিমোহন দাস কর্তৃক ১৩২২ সালে প্রকাশিত সংস্করণ হইতে গৃহীত হইয়াছে।

গলায় বেড়িয়া দিছে মালতীর মালা। নিরবধি গুয়া খায় করে হাস্যলীলা॥
দেড় প্রহর আছে বেলা আড়াই প্রহর বাদে। আসিয়া মিলিল শিব ভবানীর কান্ধে॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি মায়া এড়ান না যায়। আপনি ঠেকিলা শিব সেই ত মায়ায়॥
দেখিল অগাধ নদী অতি খরযুত। নৌকার উপর দেখে ডোমনী অদ্ভুত॥
ডাকিয়া শঙ্কর বলে নৌকা আন ঘাটে। দূরেতে যাইতে চাই পার কর ঝাটে॥
তাঁরে দেখি মহামায়া আড়-আঁখি চায়। নানান ভঙ্গিমা করি বৈঠা তুলি বায়॥
বচনচাতুরী করে থাকিয়া ভাসানে। মোহিল শিবের মন কটাক্ষের বাণে॥
শিব বলে ডোমনী সত্বরে কর পার। যাইব কমলবনে পুষ্প আনিবার॥
ঘরেতে এড়িয়া এনু পরম রূপসী। তাহার আকৃতি তোমা চিনি হেন বাসি॥

এহেন যৌবনকালে ঘাটের খেয়ানী। কার স্ত্রী কার কন্যা কহ সুবদনি॥
ডোমনী বলে বাপ গিরিরাজ পাটনী। স্বরূপাই নাম মোর জাতিয়ে ডোমনী॥
আমার ডোমনা হয় রসিক নাগর। ক্ষণেক বিলম্ব আছে আসিতে তাহার॥
নিরবধি ভাঙ্গ খেয়ে সদাই বেড়ায়। বিনা উপার্জ্জনে নিত্য ভক্ষণ করায়॥
দেখিয়া এতেক দুঃখ উঠে অবিশ্রাম। থাকিতে এতেক কার্য্য নাহি করে কাম।
ভাঙ্গ খায় মিন্‌সা সদা করেন কারণ। ছোট বড় সকল যতেক.বিদ্যমান॥
বুড়া দেখি মোর মিন্‌সা খেদাই ঘর হতে এসব কারণে আমি আছি খেয়া দিতে।
সে জনের যত কথা কহিতে অন্ত নাই। ঠাকুর সকলে জানে আমি স্বরূপাই॥
কতজন দেখিয়াছি ভ্রমিতে তপস্বী। ব্রহ্মচারী উদাসীন যতেক সন্ন্যাসী॥
আগে কিছু কড়ি দেহ মদ আনি কিনি। তার পাছে করি পার খাইয়া বারুণী॥
খেয়া না দিয়া কিমতে পার হৈতে চাও। খেয়া-কড়ি বুঝাইয়া তবে উঠ নাও॥
শিব বল্লে খেয়া-কড়ি কোন প্রয়োজন। নিকটে অধিক আছে বহুমূল্য ধন॥
ঘাটেতে লাগাইয়া নাও পার কর মোকে। তবে সে ইনাম পাবা সঙ্গে যাহা থাকে॥
ইহা শুনি মহামায়া হাসিয়া কৌতুকে। কূলেতে লাগাইলা নাও শিবের সম্মুখে।
দেখিয়া ভবানীরূপ দেব পঞ্চানন। থাপা দিয়া ধরিলেক গায়ের বসন॥
না ছোঁও না ছোঁও আমি হই ডোমনারী। তুমি ভাল জটাধারী ভাল ব্রহ্মচারী॥

ডোমের ঘরণী আমি ছুঁইলে জাতিনাশ। আমার কাপড় এড়ি হও একপাশ॥
পৃ ৬০-৬১॥

দক্ষিণ পাটনের অধিবাসীদের আকৃতির ও রীতিনীতির বর্ণনা বেশ কৌতুকাবহ।

দেখিয়া রাজার সভা চাঁদ ভাবে মনে। সকল নির্ব্বোধ হেন বুঝি অনুমানে॥
এক এক জন দেখি দীঘল ডাগর। রাঙ্গা রাঙ্গা চক্ষু কর্ণ রাঙ্গা ওষ্ঠাধর॥
মা বাপ মৈলে তারা রাখে শুখাইয়া। বেয়াইর বাপের শ্রাদ্ধ করে ক্লেশ পাইয়া॥
মৈলে পুত্র কিছু নহে ভাগিনা অধিকারী। সর্ব্বস্ব বাটিয়া নেয় বেধার বরগিরি॥
সহোদর ভাই অংশ না পায় তেহাই[১]। মৈলে মুখানল করে শালার বেয়াই॥
ভাগিনা ভাগিনী আর ভাগিনা-বৌয়ারী। এ সকলে মিলিয়া করয়ে হুড়াহুড়ি॥
ভাগিনাবধূ গীত গায় মামাশ্বশুর নাচে। জামাইয়ে পাখোয়াজ বাজায় শ্বাশুড়ীর কাছে।
গুরু-গর্ব্বিত পাইলে মারে ঘন ঠেলা। কোন আঙ্গুলে মারিলাম কহ দেখি শালা॥
খুড়ত শ্বশুর পাইলে কান মুছড়িয়া। হাততালি দিয়া বলে আইলা রে ভাঁড়িয়া॥
বিয়া কৈলে যৌতুক পায় মামী শ্বাশুড়ীরে। কন্যা যাবৎ যোগ্যা না হয় শ্বাশুড়ী ঘর করে॥
শালার বধূ দেখি তারা অধিক লজ্জিত। শালীর পদে দণ্ডবৎ হইয়া ভূমিত॥
এই মত দেখি তার দেশের আচার। মনে মনে চন্দ্রধর কৌতুক অপার॥

নারিকেলের জন্মকথা বলিয়া চন্দ্রধর রাজাকে সন্তুষ্ট করিতেছে।

চান্দ বলে নারিকেলের শুন জন্মকথা। যেমতে নারিকেল জন্মিয়াছে যথা॥
বিশ্বামিত্র নামে হয় গাধির নন্দন। অনেক তপস্যা করে হইতে ব্রাহ্মণ॥
ব্রাহ্মণ হইতে পুনী পাইলেক বর। অনেক বৎসর তপ করে নিরন্তর॥
তথাপিও অধোমুখে ব্রহ্মারে করে ধ্যান। তার ডরে ইন্দ্র আদি দেব কম্পমান।
তুষ্ট হইয়া ব্রহ্মা আইল বর দিতে তারে। ব্রাহ্মণ হইলা তুমি যাহ নিজ ঘরে॥
বিশ্বামিত্র বলে যদি হইনু ব্রাহ্মণ। মনের বাঞ্ছিত সিদ্ধি হইব এইক্ষণ॥
এই মত বলি ব্রহ্মা নিজ স্থানে যায়। বিশ্বামিত্র নারিকেল সৃজিল আজ্ঞায়॥

১। মূলে 'রেহাই'।

মনুষ্যের মুণ্ড হেন বড় বড় ফল। চাড়ার ভিতরে জল অমৃত কেবল॥
এই মতে সৃজিলেক বিশ্বামিত্র মুনি। যেমন ইহার গাছ কহি শুন আমি॥
পৃথিবীতে জন্মিল কৃষ্ণ কংস বধিবারে। অবতার হইলা হরি বসুদেব ঘরে॥
গোকুলে নন্দের ঘরে জন্মিল কানাই। ষোল শত শিশু সঙ্গে চরাইল গাই॥
কালিন্দীর হ্রদে তথা কালী নাগ বৈসে। জল খাইতে নারে তার কালকূট বিষে॥
তাতে এক শিশু মৈল সেই জল খাইয়া। সেই কোপে নারায়ণ চলিলেক ধাইয়া॥
উপরে না উড়ে পক্ষী নাগের নিশ্বাসে। ইহা দেখি নারায়ণ কোপ করি রোষে॥
কালিন্দীতে ঝাঁপ দিয়া কালী নাগ ধরি। তথা হইতে খেদাইলা দেবতা শ্রীহরি॥
সেই হইতে কালী নাগ সাগরেতে গেল। সেই বিষে শ্রীকৃষ্ণের শরীর কাল হৈল॥
কালী নাগের শ্বাসে টুটে কালিন্দীর জল। কেহ তারে খাইতে নারে হৈল দাম দল॥
অগম্য হইল তাতে কচু আর তারা। তারি মধ্যে জন্মিলেক নারিকেল চারা।
মূলে তার ফল পাত ওপরে শিকড়। মৌ-আলু গোটার মত ধরে নারিকেল॥
আনিয়া দিতে পারি নারিকেলের চারা। ঢেকিয়া লতের মত নারিকেলের পাড়া॥
রাজা বলে চিনিলাম না কহিও কথা। চিনিলাম মহাবৃক্ষ মানের মত পাতা॥

পৃ ১৯১-৯২॥

চন্দ্রধর রাজসভায় মহামূল্য বলিয়া চটের কাপড় বিক্রয় করিতেছে। রাজা আদি সকলে চটের কাপড় পড়িয়া কষ্ট ভোগ করিতেছে বটে, কিন্তু মনে সান্ত্বনা যে মহার্ঘ্য বস্ত্র পরিধান করিয়াছে। চন্দ্রধর কিন্তু রাজা ও সভাসদ্‌দিগের মূর্খতার উপর কটাক্ষ করিতে ছাড়িতেছে না। এই অংশটির অনাবিল হাস্যরস বেশ উপভোগ্য।

দুলাই কাণ্ডারী জানে বাণিজ্যের ভাও। তরী হতে খসাইল ভুটী ভরা তাও।
দীঘল পসার যত বড় বড় গড়া। চিত্র বিচিত্র যত রাঙ্গা পাটের ডোরা॥
রাঙ্গা পাটের থোপ ফুল সারি সারি। চটের চান্দোয়া খসায় চটের মশারি॥
চটের দুলিচা খসায় চটের বিছানা। চটের তাম্বু বিছায় চটের সাহেবানা॥
চটের পালঙ্গ খসায় চটের বন্দিস। চটের ইজাববন্দ চটের বালিস॥

চট পিন্ধিয়া রাজা বসিল সভায়। চটের কামড়ে রাজার গাও চুলকায় ॥

*　　*　　*

হরষিতে চট রাজা পিন্ধিল আপনে। তার পাছে পিন্ধিলেক পাত্রমিত্রগণে ॥
খুঁয়ার ধুতি তবে পিন্ধে পুরোহিত। শণ পাট পবিত্র বড় শাস্ত্রেতে বিদিত ॥
মহাদেবীগণে পিন্ধে চটের ডুরাখানি চটের পাছড়া আর চটের উড়ানি ॥
চটের কামড়ে গাও খাজোয়ায় বড়। চন্দ্রধরে বলে মিতা খানিক হৈবা দড় ॥
তোমার দেশের লোনাপানি খাইছ বিস্তর। দুষ্ট রক্ত যত মারিয়া করে দূর ॥
কামড় খাইয়া অষ্ট চারিদিন থাক। রোগ পীড়া ব্যাধি যত না রহিবে এক
পাত্র মিত্রে বলে আমি অনুমানে জানি। চুষিয়া খাইবে যত গায়ের লোণাপানি ॥

*　　*

চান্দ বলে মিত্র তুমি বড় ভাগ্যবান। পাত্র মিত্র যত তোমার দেবতা সমান ॥
আপনি মহাশয় দেবতাচরিত্র। আমার দেশেতে হৈত হালের নিশ্চিন্ত ॥
তোমার সমান আমার দেশের দেবতা। তাহার যতেক গুণ শুন কহি কথা ॥
সাক্ষাতে বিষ্ণু-অংশ দেবতাচরিত্র। পঞ্চগব্য পঞ্চামৃত ভুবনপবিত্র ॥
বনের তৃণ খায় লোক পরিতোষে। যে জনে তাহারে সেবে লক্ষ্মী তথা বৈসে ॥
সংসার পবিত্র হয় পড়ি পদধূলি। গো-দেবতা করি আমরা তারে বলি ॥
সেই দেবতার লক্ষণ আছে তোমার ঠাই। সবে মাত্র মিতা তোমার লেজ শিঙ্গা নাই ॥
এই দুইখান যদি থাকিত তোমার। যে মারিত গোবধ প্রায়শ্চিত্ত তার ॥

চান্দ বলে মিতা তোমার বুদ্ধি অপার। আমার দেশে হৈলে পারি হাল চষিবার ॥

পৃ ১৯৭-৯৯ ॥

বিবস্ত্র চন্দ্রধর কোনক্রমে প্রাণ লইয়া তীরে উঠিয়াছে। সেখানে কতকগুলি স্ত্রীলোক স্নান করিতেছিল, তাহারা চন্দ্রধরকে দেখিয়া দানব মনে করিয়া পলাইয়া নগরে খবর দিল। চন্দ্রধর নারীদের পরিত্যক্ত বস্ত্র হইতে একখানি লইয়া পরিধান করিল। ইতিমধ্যে নগরিয়া লোক তাহাকে নির্ঘাত মারিয়া বস্ত্র

কাড়িয়া লইয়া খেদাড়িয়া দিল। এমন সময় চন্দ্রধর দেখিল, এক ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ স্নান করিতে আসিতেছে। তাঁহার নিকট তিনি বস্ত্র প্রার্থনা করিলেন। বংশীদাস অল্প কথায় ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক ঔদার্য্য সুন্দরভাবে ফুটাইয়া তুলিয়াছেন।

হেন কালে আইল দ্বিজ স্নান করিবারে। ব্রাহ্মণ দেখিয়া চান্দ চলে ধীরে ধীরে॥
করযোড় করি চান্দ কৈল নমস্কার। একখানি বস্ত্র পাইলে পারি পরিবার॥
ভিক্ষুক ব্রাহ্মণ জানে যাচকের ব্যথা। একখানি বস্ত্র পিন্ধন কান্ধে মাত্র পৈতা॥
তথাপি ব্রাহ্মণ জাতি দয়ার নিধান। পরিধান বস্ত্র চিরি দিল অর্দ্ধখান॥

মনসামঙ্গল কাব্যের উৎপত্তি পশ্চিমবঙ্গে, রাঢ়ে। সেই কারণে পশ্চিমবঙ্গীয় কবির কাব্যে চন্দ্রধরের বাণিজ্যযাত্রার প্রসঙ্গে ভাগীরথীর তীরবর্ত্তী স্থানের যথাযথ উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্ব্ববঙ্গীয় কবিদের নিকট ভাগীরথীতীরবর্ত্তী অঞ্চলের মোটেই পরিচয় ছিল না, কেবল দুই একটি স্থানের নাম মাত্র জানা ছিল। সেই কারণে তাঁহাদের কাব্যে চন্দ্রধরের বাণিজ্যযাত্রার বিস্তৃত ও সঙ্গত বর্ণনা নাই। সেই হেতু বংশীদাসের কাব্যেও দেখি শ্রীপুর নগরের পর পলাশবাড়ী, তাহার পর বিজয়ানগর, গোপালপুর, কামারহাটী, তাহার পর ত্রিবেণীর নিকটেই চম্পকনগর, তাহাও আবার সমুদ্রের তীরে। এই তো চন্দ্রধরের ফিরিবার বেলা। আর যাইবার কালে,

নিজ রাজ্য ছাড়াইল হাস্যপরিহাসে। কামারহাটী ছাড়াইল আঁখির নিমেষে॥
মধ্যপুর কুলাচল দক্ষিণে থুইয়া। দুর্জ্জয় প্রতাপগড়া ছাড়াইল বাহিয়া॥
গোপালপুর ছাড়াইল রামের নগর। জহ্নুতীর্থ বাহিয়া পড়ে কালীদহ সাগর॥
দক্ষিণে গন্ধর্ব্বপুর বামে বীরকুনা। মঞ্চসরা বাহিয়া ধরে মন্দারের থানা॥
পেছুলদা বামেতে যায় তাড়াতাড়ি। সম্মুখে নগর দেখে বামে বিষ্ণুপুরী॥

পৃ ১৬৪॥

বংশীদাসের কাব্যে দুই একটি ছোট ছোট পদ আছে, সেগুলি করুণরসযুক্ত এবং হৃদয়গ্রাহী। হয় ত সেগুলি বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর রচনা। একটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বেহুলারে কোলে করি সুমিত্রাঞে সুন্দরী
কান্দে মায়ে সকরুণ হৈয়া।
মোর ঘরে আছিলা যেন স্বপ্নের কৌতুক হেন,
কাল তোরে জামাইয়ে যাইবে লৈয়া ॥

* * *

বেহুলা বলয়ে, মাও কি লাগিয়া চিন্তা পাও,
কন্যা আমি দৈবে পরাধিনী।
ভাল মন্দ যত হৈবে আমারে সহিতে যাইবে,
তুমি থাক জন্ম-এয়োরাণী ॥
সাত ভাই সুখে রৌক, রাজার কল্যাণ হৌক,
আমার লাগি না কর ক্রন্দন।
কপালে লিখিছে যারে কে তারে খণ্ডাইতে পারে,
বলে দ্বিজ বংশীবদন ॥ পৃ ২৫০-৫১ ॥

বংশীদাসের কন্যা চন্দ্রাবতীর রচিত বলিয়া একটি রামায়ণ গাথা বা ছড়া ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত আছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত পূর্ব্ববঙ্গগীতিকায় এই ছড়ার একটি খণ্ডিত এবং সংস্কৃত আধুনিক রূপ মুদ্রিত হইয়াছে।[১] গল্পাংশে এই ছড়াটির কিছু বিশেষত্ব আছে। প্রকাশিত গাথাখণ্ডটি তিন অংশে বিভক্ত। প্রথম অংশে রাবণ কর্তৃক লঙ্কা নির্ম্মাণ, স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল জয়, মুনিগণের লাঞ্ছনা, মুনিগণের বক্ষ হইতে কুশাগ্র করিয়া বিন্দু বিন্দু রক্ত লইয়া তাহা কৌটায় রক্ষণ ও বিষ বলিয়া মন্দোদরীকে অর্পণ, দেবরমণী লইয়া বিলাস, তৎশ্রবণে মন্দোদরীর ঈর্ষ্যা এবং কৌটার রক্ত বিষ বলিয়া ভক্ষণ, ফলে গর্ভসঞ্চার ও ডিম্ব প্রসব, দৈববাণী, সোনার কৌটায় রাখিয়া ডিম্ব সমুদ্রে নিক্ষেপ, মাধব জালিয়া কর্ত্তৃক কৌটা প্রাপ্তি, মাধব ও তৎপত্নী সতার সৌভাগ্য, স্বপ্নাদেশে কৌটাটি জনকের মহিষীকে অর্পণ, ডিম্ব হইতে সীতার জন্ম; দশরথের অনপত্যতা, যজ্ঞের নিষ্ফলতা, মুনিকর্ত্তৃক ফল প্রদান, তাহা খাইয়া কৌশল্যার

১। চতুর্থ খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা, চন্দ্রাবতীর রামায়ণ, পৃ ২৩৫-৬৭।

গর্ভ, রামের জন্ম ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে। দ্বিতীয় অংশে সখীদিগের নিকট সীতা-কর্ত্তৃক বনবাসের সুখদুঃখ কথন ও বারমাসী বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় অংশে আছে সীতা ও রামের পাশা খেলা, ভরতের কনিষ্ঠা ভগিনী কুকুয়ার অনুরোধে সীতা কর্ত্তৃক পাখায় রাবণের জলমধ্যে দৃষ্ট প্রতিবিম্ব অঙ্কন, সীতার নিদ্রাবেশ, কুকুয়া কর্ত্তৃক রামের নিকট সীতার বিরুদ্ধে অভিযোগ, রামের ক্রোধ।

পূর্ব্বে উদ্ধৃত আত্মপরিচয় অংশটি রামায়ণ গাথারই অন্তর্গত, তবে এটুকু পূর্ব্ববঙ্গগীতিকায় নাই।

ছড়াটি যদিও আধুনিক না হয়, ইহার সংগ্রহীতা অথবা সংস্কর্ত্তা যে মধুসূদন দত্তের পরবর্ত্তী কালের লেখক তাহা দ্বিতীয় অংশের পঞ্চবটী বনবাসের সুখকাহিনীর বর্ণনায় পরিস্ফুট হইয়াছে। নিম্নে উদ্ধৃত অংশটি মেঘনাদবধ চতুর্থ সর্গ হইতে রূপান্তরিত হইয়াছে মাত্র।

আমি কি গো জানি সখি কালসর্প বেশে। এমনি করিয়া সীতায় ছলিবে রাক্ষসে॥
প্রণাম করিনু আমি পড়িয়া ভূতলে। উড়িয়া[১] গরুড় পক্ষী সর্প যেমন গেলে॥
রথেতে তুলিল মোরে দুষ্ট লঙ্কাপতি। দেবগণে ডাকি কহি দুঃখের ভারতী॥
অঙ্গের আভরণ খুলি মারিনু রাক্ষসে। পর্ব্বতে মারিলে ঢিল কিবা যায় আসে॥
কতক্ষণ পরে আমি হইলাম অচেতন। এখনো স্মরিলে কথা হারাই চেতন॥[২]

পরম বিস্ময়ের বিষয় এই যে পূর্ব্ববঙ্গগীতিকার প্রবীণ ও বিচক্ষণ সম্পাদক মহাশয় বিশ্বাস করিয়াছেন যে মধুসূদনই চন্দ্রাবতীর নিকট ঋণী! তিনি একাধিক স্থানে লিখিয়াছেন, "আমার ধারণা, মাইকেল নিশ্চয়ই চন্দ্রাবতীর গান শুনিয়াছিলেন;"[৩] "আমার বিশ্বাস মাইকেল মৈমনসিংহের কবির রামায়ণটি কোন স্থানে শুনিয়া মহিলা কবির দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছিলেন।"[৪]

চন্দ্রাবতীর জীবনের দুঃখকাহিনী বিষয়ে একটি গাথা ময়মনসিংহ অঞ্চলে প্রচলিত আছে।[৫] ইহাতে আছে যে চন্দ্রাবতীর স্বগ্রামবাসী ব্রাহ্মণ যুবা জয়ানন্দের

১। এই অংশের রচয়িতা বা সংস্কর্ত্তা মূলের 'উরিয়া' শব্দের অর্থ বুঝিতে পারেন নাই।

২। পূর্ব্ববঙ্গগীতিকা, চতুর্থ খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ ২৫৯। ৩। ঐ. পৃ ২৫৯ পাদটীকা।

৪। ঐ, পৃ ৫২৬। ৫। মৈমনসিংহ-গীতিকা, প্রথম খণ্ড দ্বিতীয় সংখ্যা, নয়ানচাঁদ ঘোষ রচিত চন্দ্রাবতী পালা, পৃ ৯৭-১১২।

সহিত তাহার বিবাহের ঠিক হয়। উভয়ে সহপাঠী ও ক্রীড়াসঙ্গী ছিল, সুতরাং পরস্পরের মনে প্রণয়সঞ্চার হইয়াছিল। বিবাহ স্থির হইয়াছে, এমন সময় জয়ানন্দ এক মুসলমান রমণীর প্রেমে পড়িয়া মুসলমান হইয়া যায়। চন্দ্রাবতী আর বিবাহ করিল না।

পূর্ব্বে উল্লিখিত দস্যু কেনারামের গাথাটি চন্দ্রাবতীর রচনা বলিয়া কথিত হইয়া থাকে। ইহাতে "দ্বিজবংশীসুতা" ভণিতাও আছে। তবে রূপ অত্যন্ত আধুনিক। ময়মনসিংহ অঞ্চলের আর একটি পালা চন্দ্রাবতীর রচনা বলিয়া চলিতেছে।[১] ইহার অকৃত্রিমতা বিষয়ে যথেষ্ট সন্দেহ আছে। শুধু উপক্রমণিকার বন্দনা পদটিতে চন্দ্রাবতীর ভণিতা রহিয়াছে।

নারায়ণদেবের পদ্মাপুরাণে[২] রচনাকাল দেওয়া নাই। ইহার কাল জানিবার অন্য উপায়ও নাই। কবি যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে ইনি জাতিতে কায়স্থ, মৌগদল্য গোত্র, গুণাকর গাঞি। ইহার পূর্ব্বপুরুষ রাঢদেশ হইতে আসিয়া বোরগ্রামে বসতি করিয়াছিলেন। এই বোরগ্রাম এখন ময়মনসিংহ জেলায় কিশোরগঞ্জ মহকুমায় অবস্থিত। নারায়ণ দেবের পিতার নাম নরসিংহ দেব, পিতামহের নাম উদ্ধব বা উদ্ধারণ, বৃদ্ধ পিতামহের নাম ধনপতি, মাতার নাম রুক্মিণী এবং মাতামহের নাম প্রভাকর। কোন কোন পুঁথিতে দেখা যায়, পিতামহ ধনপতি আর বৃদ্ধ পিতামহ উদ্ধারণ।

নারায়ণ দেবে কয় জন্ম-মুগধ।
বিপ্র পণ্ডিত নহি ভট্ট বিশারদ॥
শূদ্র কুলে জন্ম মোর সংকায়স্থ ঘর।
মৌগদল্য[৩] গোত্র মোর গাঁঞি[৪] গুণাকর॥

১। ঐ, মলুয়া পালা, পৃ ৪১-৯৬।

২। বেণীমাধব দে কর্ত্তৃক বটতলা হইতে এবং ময়মনসিংহ চারুপ্রেস হইতে প্রকাশিত (১৩১৪)। উভয় সংস্করণেই অপর কবির ভণিতা প্রচুর পাওয়া যাইতেছে। ব-সা-প-প ১৩, পৃ ২৫ হইতে; ব-সা-প-প ৬, পৃ ৮০-৯৭, ৭, পৃ ৬১-৭৬, ৮, পৃ ১১৩-১৪২ দ্রষ্টব্য।

৩। মূলে 'মদগুল্যা', 'মধুকুল্য'। ৪। মূলে 'গায়ন'।

পিতামহ উদ্ধব মোর নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥
পূর্ব্বপুরুষ মোর অতি শুদ্ধমতি।
রাঢ় ত্যজিয়া বোর গ্রামেতে বসতি॥[১]
বৃদ্ধ পিতামহ মোর [হয়] ধনপতি।
পিতামহ হয় মোর অতি শুদ্ধমতি॥
উদ্ধবতনয় হয় নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী মোর মাতা॥[২]
বৃদ্ধ পিতামহ মোর দেব উদ্ধারণ।
রাঢ় দেশ ছাড়িয়া যে আসিলা আপন॥[৩]

জনমি কায়স্থ কুলে লৌহিত্যনদের কুলে
রাঢ় ছাড়ি কৈনু আগমন।
বোরগাঁও পুণ্যভূমি বসতি করিনু আমি
দশদিকে শোভা অতুলন॥[৪]

বহু স্থলে ভণিতায় আছে—

নারায়ণ দেবে কয় নরসিংহসুতে।

একটি পুঁথির একটি ভণিতা হইতে মনে হইতে পারে যে কবির নাম ছিল রামনারায়ণ দেব।

সুকবিবল্লভ রাম দেব নারায়ণ।
একটি লাচাড়ী কহি শুন দিয়া মন॥[৩]

সব পুঁথিতেই পুনঃ পুনঃ পাওয়া যায়।

সুকবিবল্লভ হয়ে দেব নারায়ণ।

১। ব-সা-প-প ১৩, পৃ ২৮-২৯, ব সা-প-প ৩, পৃ ৭২-৭৩।
২। ব-সা-প-প ৬, পৃ ৯২, ব-সা-প-প ১৩, পৃ ২৮-২৯।
৩। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১২২ পাদটীকা।
৪। শ্রীযুক্ত রজনীমোহন চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত পদ্মপুরাণ, পৃ ১৯৯।

ইহা হইতে অনুমান হয়, নারায়ণ সুকবিবল্লভ উপাধি পাইয়াছিলেন

নারায়ণ দেবের জন্ম হইল বঙ্গদেশ।
নরসিংহ দেব পুত্র বিজ্ঞতা বিশেষ॥
কায়স্থ পণ্ডিত বড় বিদ্যাবিশারদ।
সুকবিবল্লভ খ্যাতি সর্ব্বগুণযুত॥[১]

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত পুস্তকে এই বিবরণ আছে—

নারায়ণ দেব কহে রচিয়া পয়ার।
মিশ্র শ্রীপতি নহে পাণ্ডিত্য অপার॥
মধুকুল্য গোত্র হল গাঞি গুণাকর।
ক্ষত্রকুলে জন্ম সংকায়স্থের ঘর॥
নরহরি-তনয় যে নরসিংহ পিতা।
মাতামহ প্রভাকর রুক্মিণী দেবী মাতা॥
লেখক যামিনীকান্ত দাস ভাগ্যবান।
পদ্মা যারে লিখিতে সময় কৈলা দান॥ পৃ ৫॥

আত্মকথা অতিরিক্ত এইটুকু মাত্র পাওয়া যায়—

নারায়ণ দেবের জন্ম হৈল বঙ্গদেশ।
নরসিংহ দেব পুত্র বিজ্ঞতা বিশেষ॥
কায়স্থ পণ্ডিত বড় বিদ্যাবিশারদ।
সুকবিবল্লভ খ্যাতি সর্ব্বগুণযুত॥
বারহ[২] বৎসর কালে দেখিলাম[৩] স্বপন।
মহাজন সহিত পথেতে[৪] দরশন॥
শিশুরূপেতে গোঁসাই হাতে করি বাঁশী।[৫]
আলিঙ্গন দেন মোকে বড় সুখে হাসি॥[৬]

১। ব-সা-প-প ৬, পৃ ৮৪। ২। পাঠ 'বারয়'। পাঠান্তর 'চৌদ্দ' শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৯৯।
৩। পাঠান্তর 'দেখিল'। ৪। ঐ 'মহাপরিশ্রম মনে হৈল'।
৫। ঐ 'শিশুকালে গোপরূপে হাতে লৈয়া বাঁশী।' ৬। ঐ 'আলিঙ্গন দিয়া বলে যায় মুখে হাসি॥

কবিত্বের[১] আশা মোর সেই সে কারণ।
প্রণাম করিনু মুঞি ভজিব চরণ ॥[২] পৃ ১-২ ॥

কাব্যটি ষোল "করণ" বা পালায় বিভক্ত ছিল।

ষোল করণে আছিলেক পদ্মাপুরাণ।
পয়ার করিয়া কবি করিলা বাখান ॥ পৃ ৪৮৫-৮৬ ॥

মুদ্রিত পুস্তকে নারায়ণ দেবের ছাড়া এই সব কবির (এবং গায়কের) ভণিতা পাওয়া যায়—

বংশীদাস, "দ্বিজ" মনোহর, "বৈদ্য" জগন্নাথ, "দাস" হরিদত্ত [পৃ ৭৮], জগন্নাথ পণ্ডিত [পৃ ৯৬], "বিপ্র" জগন্নাথ [পৃ ৯৬], "বিপ্র" জানকীনাথ, চন্দ্রবতী [পৃ ১৩৩, ১৩৫], শিবানন্দ [পৃ ৩৫১], "গাঞান" চন্দ্রবতী বা চন্দ্রপতি [পৃ ৩৬৭ ইত্যাদি]।

এক নারায়ণ দেব রচিত কালিকা-পুরাণ পাওয়া গিয়াছে। তাহা পরে আলোচিত হইয়াছে।

১। ঐ 'গোবিন্দের'।

২। ঐ 'তৎপরে পথ মোরে দেখাইল স্বপন।
কবিত্বের আশা আমার সেহিত কারণ।'

চতুর্ব্বিংশ পরিচ্ছেদ

বিবিধ কৃষ্ণায়ণ কাব্য ও নিবন্ধ ঃ শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর, কবিবল্লভ

শ্রীকৃষ্ণবিলাস'[১] রচয়িতা শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর কাশীরাম দেবের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন। কাশীরামের ভারত-পাচালী সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে রচিত হয়, সুতরাং তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার কাব্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষ দশকে রচিত হইয়াছিল এরূপ অনুমান অসঙ্গত নহে। ইঁহাদের কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধরদাস সপ্তদশ শতকের পঞ্চম দশকে স্বীয় জগন্নাথমঙ্গল রচনা করেন। কাশীরাম ও গদাধরের কথা পরে আলোচনা করিব।

গদাধর স্বীয় কাব্যে আত্মপরিচয় উপলক্ষ্যে এই কথা বলিয়াছেন—

কমলাকান্তের হৈল এ তিন কোঙর। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর॥
দ্বিতীয়ে শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান। রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারতপুরাণ॥
তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধরদাস। জগৎমঙ্গল কথা করিল প্রকাশ॥

জগন্নাথমঙ্গলের কোন কোন পুঁথিতে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রচিত কাব্যের উল্লেখ দেখা যায়।

প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
রচিল কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর

কৃষ্ণদাস কবির প্রকৃত নাম, শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর গুরুপ্রদত্ত নাম। কবির গুরু ছিলেন গোপালদাস নামে জনৈক ব্রাহ্মণ। কবি সম্ভবতঃ উদাসীনভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। কবি এইটুকুমাত্র আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

[গুরু]রূপী ভৃগুর চরণে পরণাম। যার গুণে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর হৈল নাম॥

১। কাব্যটির প্রথম পরিচয় দেন রাখালদাস কাব্যতীর্থ [ব-সা-প-প সপ্তম খণ্ড]। ১৩২৬ সালে কাব্যটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। প্রকাশিত গ্রন্থ খণ্ডিত ও অসম্পূর্ণ পুঁথি অবলম্বনে সম্পাদিত হইয়াছে।

যার গুণে গোবিন্দভজনে হৈল আশ। যার গুণে কৈল হরিদাসের সম্ভাষ॥
গোবিন্দের গুণে গুরু করিল আদেশ। শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর বলি করিল আবেশ॥
বিপ্রকুলে জন্ম নাম শ্রীগোপালদাস। আজন্ম ভরিয়া কৈল গুরুতে বিশ্বাস॥
অকুমারব্রতে দেহ করিয়া শোধন। অন্তে সুরধুনী মধ্যে পাইল নারায়ণ॥
সর্ব্ব কবিগণে আমি করি পরিহার। আপনার গুণে দোষ না লবে কাহার॥[১]

কবি শ্রীমদ্‌ভাগবতোক্ত পন্থায় কৃষ্ণচরিত্রকাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে দানখণ্ড নৌকাখণ্ড ইত্যাদি অপৌরাণিক লীলা নাই। প্রথমে কশ্যপ অদিতির তপস্যা ও বরলাভ এবং বলি-বামন উপাখ্যান। তাহার পরই শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণন আরম্ভ হইয়াছে। কাব্যটি একান্তভাবে বর্ণনাত্মক, সুতরাং কবিত্বের পরিচয় বিশেষ কিছুই নাই। বন্দনায় শ্রীচৈতন্যের অনুল্লেখ বিস্ময়কর। ভণিতার নমুনা—

শ্রীকৃষ্ণবিলাসরস সর্ব্বপরাৎপর। রচিল পরমভক্তি শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর॥
শ্রীনন্দনন্দন পদে রহুক মোর মন। যুগে যুগে পাই যেন অভয়চরণ॥

কবিবল্লভের রসকদম্ব[২] হইতেছে কাব্যাকারে গ্রথিত একখানি বৈষ্ণবসিদ্ধান্ত গ্রন্থ। রচয়িতার নাম কবিবল্লভ। কবির পিতার নাম রাজবল্লভ এবং মাতাব নাম বৈষ্ণবী। বাসস্থান ছিল করতোয়া তীরে মহাস্থানের নিকটে আরোড়া গ্রামে।

পিতা রাজবল্লভ বৈষ্ণবী মোর মাতা। জন্মাঞা গোচর কৈল সংসারের ব্যথা॥
... ...
করতোয়াতীর মহাস্থানের সমীপে। আরোড়া গ্রামেতে জন্ম বসতি স্বরূপে॥

কবির গুরু ছিলেন উদ্ধবদাস। ইনি গদাধর পণ্ডিতের শিষ্য উদ্ধবদাস হইবেন।

১। বা প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৭১। মুদ্রিত পুস্তকে এতৎস্থলে আছে—

ব্রাহ্মণকুমার গুরু অতি দয়াবান্। কর্ণে মন্ত্র দিয়া মোরে কৈল পরিত্রাণ॥
সেইখানে শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর নাম থুয়্যা। আজ্ঞা কৈলে শ্রীনন্দনন্দন ভজ গিয়া॥
সে গুরু কৃপাতে দূর করি মহাদম্ভ। অনুভূতি হরিকথা করিল আরম্ভ॥ পৃ ১॥

২। শ্রীযুক্ত তারকেশ্বর ভট্টাচার্য্য এবং শ্রীযুক্ত আশুতোষ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৩২)। ভূমিকাটি পাণ্ডিত্যপূর্ণ। এইরূপ সুসম্পাদিত বাঙ্গালা গ্রন্থ অতি অল্পই এযাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে।

কারণ কবি যেরূপ ভাবে গদাধরের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে গদাধর পরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলিয়াই মনে হয়।

চৈতন্যে করুক নিত্য চৈতন্যসঞ্চয়। নিত্যানন্দে আনন্দ করুক অতিশয়॥
অদ্বৈতে অদ্বৈত যেন করে প্রেমসঙ্গ গদাধরে ধরে যেন রসের তরঙ্গ॥
চৈতন্যের প্রিয় যত বৈষ্ণব স্বজনে। তা সভাতে চিত্ত যেন রহে অনুক্ষণে॥
শ্রীযুত উদ্ধবদাস জ্ঞানচক্ষুদাতা। সে পদকমলে মন রহুক সর্ব্বথা॥ পৃ ৩॥
ঈশ্বর চৈতন্য প্রেমভক্তিরসধাম। ভবদুঃখবিমোচনে নিত্যানন্দ নাম॥
অদ্বৈত ঠাকুর গদাধর মহাশয়। জগতে ভাসাঞা দিল প্রেমের নির্ণয়॥
নিজ গুরু ঠাকুর উদ্ধবদাস নাম। তাহার প্রসাদে হইল সংসার সুভান॥ পৃ ৮৩॥

১৫২০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুনী পূর্ণিমা বৃহস্পতিবার দিবসে রসকদম্ব রচনা সমাপ্ত হয়।

ফাল্গুনী ফাল্গুন ফাগু পৌর্ণমাসী দিনে বিংশতি অংশক গুরুবার শুভক্ষণে॥
বিংশতি অধিক পঞ্চদশ শত শক। তখনে রচিল রসকদম্ব পুস্তক॥ পৃ ৯৮॥

কবির এক বন্ধু ছিলেন মুকুট রায়। মুকুট রায় শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর মহাশয়ের শিষ্য ছিলেন। এই মুকুট রায়ের আগ্রহে কবিবল্লভ রসকদম্ব রচনা করেন।

কৃপার ঠাকুর নরহরি দাস নামে। সে পদ মুকুট রায় ভজিল যতনে॥
দ্বিজকুলে জন্ম সেই বন্ধু মহাশয়। অনুরোধে জানাইল প্রবন্ধাতিশয়॥
তাহার উদ্যোগে কিছু লেখিল কারণ। যন্ত্রযোগে শব্দ যেন বোলে যন্ত্রিগণ॥ পৃ ৮৩॥

শ্রীবৃন্দাবনে শ্রীরূপ এবং শ্রীসনাতন গোস্বামী বনমালিদাসের নিকট যে সকল সিদ্ধান্ত বিবৃত করিয়াছিলেন তাহা কবি বনমালিদাসের নিকট অবগত হন। এই সিদ্ধান্ত অবলম্বনে এবং শ্রীকৃষ্ণসংহিতা নামক গ্রন্থ এবং অন্যান্য পুরাণাদি অবলম্বনে কবি রসকদম্ব রচনা করেন। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা নামে এখন এই জাতীয় কোন গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

বৃন্দাবনে রূপ সনাতন মহাশয়। বনমালিদাস স্থানে কহিল নিশ্চয়॥
তাহাতে শুনিল নিত্যলীলার আরম্ভ। পয়ারে লিখিল তত্ত্ব সরসকদম্ব॥

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা তত্ত্ব করিঞা প্রধান। পুরাণসংগ্রহ আর করিঞা প্রমাণ॥
সঙ্গোপন রস কেহো কেহো উপভোগী। প্রাকৃতে লেখিল রস সর্ব্ব জীব লাগি॥
পৃ ৮৩॥

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা দেখি করিল আরম্ভ। পয়ারে লেখিল তত্ত্ব সরসকদম্ব॥ পৃ ৩॥

শ্রীকৃষ্ণসংহিতা সম্বন্ধে কবি যে উক্তি করিয়াছেন তাহা দেখিলে মনে হয়, ইহা কোন গ্রন্থবিশেষ নহে, পরন্তু বৈষ্ণবীয় সাধনসম্বন্ধীয় সিদ্ধান্তবিশেষ।

এ সব প্রসঙ্গ পূর্ব্বে দারুকে শুনিল। পরিণামকালে গর্গ মুনিকে কহিল॥
গর্গ স্থানে শুনি সূত আদি মুনিগণে। লেখিল প্রবন্ধ করি ভজনকারণে॥
ক্রমে ক্রমে প্রচারিল বিদর্ভনগরে। শ্রীকৃষ্ণসংহিতা হেন জানিল সকলে॥ পৃ ৮২॥

রসকদম্ব দ্বাবিংশতি অধ্যায়ে প্রায় দুই হাজার পয়ার শ্লোকে গ্রথিত। ইহার মধ্যে দীর্ঘ এবং হ্রস্ব ত্রিপদী ছন্দের শ্লোক কিছু কিছু আছে। কবি নিজেই বলিয়াছেন—

চতুর্দ্দশ অক্ষরে লেখিল ক্ষুদ্র ছন্দ। ছাব্বিশ বিংশতি দীর্ঘ মধ্যম নিবন্ধ॥ পৃ ৩॥
রচিল সহস্রপদী পুস্তক সুন্দর। দুই শতাধিক ছয় অযুত অক্ষর॥ পৃ ৮৪॥

গ্রন্থটিতে দুই শত ছয় অযুত অক্ষর আছে কি না গণনা করিয়া দেখি নাই। তবে চতুষ্পদী পয়ার ছন্দে সহস্র শ্লোক আছে বটে।

রসকদম্বের দ্বাবিংশতি অধ্যায়ের এক একটি অধ্যায়ে এক একটি "রস" বর্ণিত হইয়াছে। এই "রস" দ্বারা অবশ্য অলঙ্কারশাস্ত্রে অথবা বৈষ্ণবশাস্ত্রে উল্লিখিত রস ছাড়াও আরও অনেক কিছু বুঝাইতেছে। কবি কথিত বাইশটি রস এই— আদি রস (বন্দনা), সূত্র রস (কৃষ্ণলীলাসূত্র বর্ণনা), ভৈরব রস (দ্বারকার ঐশ্বর্য্যবর্ণনা), হাস্যরস (রুক্মিণীর সহিত কৃষ্ণের পরিহাস), প্রেম রস ১ (কৃষ্ণ ও রুক্মিণীর প্রেমভাব বর্ণনা), অদ্ভুত রস (সৃষ্টি ও ভৌগোলিক সংস্থান বর্ণনা), শিক্ষা রস (কর্ম্মফল বিচার), স্তুতি রস (কৃষ্ণের লীলাতত্ত্ব বর্ণনা), ভেদ রস (জীবের উত্তমাধম অবস্থার হেতু বিচার), শৃঙ্গার রস (নিত্য বৃন্দাবনের বর্ণনা), প্রেম রস ২ (বৃন্দাবন লীলা ও গোপীপ্রেমের উৎকর্ষ বর্ণনা), শান্তি রস (সাধকের পন্থা বর্ণনা), ভাব রস (ভক্তি বিচার), ভজন রস (অবতারতত্ত্ব ও প্রতিমাপূজা

তত্ত্ব বিচার), বীভৎস রস (সাংসারিক ক্লেশাদি বিচার), আস্থা রস (শ্রুতিগণের গোপীরূপে ভজনা), ভক্তি রস (কৃষ্ণের রৈবতক উপস্থিতিতে নারদের ভক্তি বর্ণনা), ভীত রস (পাপের ফল ও নরক বর্ণনা), বিস্ময় রস (কৃষ্ণের দ্বারকায় অবর্ত্তমানে তত্রত্য কৃষ্ণের ষোড়শ সহস্র ভার্য্যার কৃষ্ণপ্রীতি সন্দর্শনে নারদের বিস্ময়), করুণ রস (নারদ সত্যভামাকে কৃষ্ণের ঔদাসীন্য দেখাইয়া তাঁহার দুঃখ জন্মাইলেন), বীর রস (পারিজাত তরুর নিমিত্ত কৃষ্ণের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ), এবং দীক্ষা রস (কৃষ্ণের রুক্মিণী ও সত্যভামাকে কিশোর রসের মন্ত্র দীক্ষা দিলেন)।

এক একটি রসের প্রারম্ভে এক একটি বিশেষ রাগ বা রাগিণীর উল্লেখ আছে। মুদ্রিত পুস্তকে (এবং তদবলম্বিত পুঁথিগুলিতেও বোধ হয় ভ্রমক্রমে) পঞ্চম, অষ্টম, দশম ও পঞ্চদশ অধ্যায়ের শীর্ষে কোন রাগ বা রাগিণীর উল্লেখ নাই। রসকদম্বে যথাক্রমে এই রাগ-রাগিণীগুলির উল্লেখ আছে—আহীর, ললিত, পঠমঞ্জরী, রামকেলি, সুহই, মল্লার, বরাড়ী, আশোয়ারী, পাহাড়িয়া, সারঙ্গ, বিনোয়া, নট, গান্ধার, ভাটিয়াল, তুড়ি, কানাড়া, গৌরী, কেদার।

রসকদম্বের মধ্যে যে যৎকিঞ্চিৎ সূত্রাকার আখ্যায়িকা আছে তাহার কাঠামো এইরূপ। কৃষ্ণ রুক্মিণীকে পরিহাস করাতে রুক্মিণী ব্যথা পাইলেন। তখন কৃষ্ণ তাঁহাকে লইয়া সান্ত্বনা দিবার জন্য বিমানে চড়িয়া রৈবতকে যাত্রা করিলেন। পথিমধ্যে রুক্মিণীর প্রশ্নের উত্তরচ্ছলে কৃষ্ণ প্রতিপাদ্য বিষয় সকল বলিয়া যাইতেছেন। এই হইতেছে চতুর্থ হইতে ষোড়শ অধ্যায়ের কথা। তাহার পর রৈবতকে পৌঁছিলে নারদ কৃষ্ণকে একটি পারিজাত পুষ্প উপহার দিলেন, কৃষ্ণ সেটি রুক্মিণীকে দিলেন। ইহার পর পারিজাতহরণের ব্যাপার। গ্রন্থের প্রতিপাদ্য সকল বিষয়ই কৃষ্ণের উক্তি।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে শুদ্ধ তত্ত্বকথাসম্বলিত অল্প যে কয়খানি মৌলিক গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল, রসকদম্ব তাহার মধ্যে অন্যতম। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের কথা ছাড়িয়া দিলে এ বিষয়ে রসকদম্ব দ্বিতীয়রহিত। কবি যে শুধু পণ্ডিত ও তত্ত্ববেত্তা ছিলেন তাহা নহে, ভাষার উপর তাঁহার অসাধারণ অধিকার ছিল। কোথাও

কবিত্বের আড়ম্বর না করিয়া যতদূর সম্ভব স্বল্পাক্ষরে অথচ স্পষ্ট ও পরিষ্কার করিয়া বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের সারমর্ম্ম সহজভাবে বুঝাইয়াছেন। তত্ত্বকথার মধ্যে প্রাকৃত-জনোচিত ঘটনা, গল্প বা উক্তি প্রভৃতি থাকিলে লোকে পাছে অগ্রাহ্য করে, সেইজন্য কবি পাঠককে সাবধান করিয়াছেন।

প্রাকৃত কারণে লোক অনুভব কহে।
বিচারিলে মহাতত্ত্ব গ্রাম্যকথা নহে॥

গ্রন্থের নাম কেন "রসকদম্ব" হইল তাহার উত্তরে কবি বলিতেছেন—

শৃঙ্গারবিগ্রহ সর্ব্ব রস বিস্তারিল।
তে কারণে নাম রসকদম্ব রাখিল॥

কবি যে পণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন, তাহা লেখক, পাঠক, শ্রোতা ও গায়কের প্রতি উক্তি হইতে বোঝা যায়।

লেখক পাঠক শ্রোতা গাহক সকলে। ভাব বিচারিবে প্রতি অক্ষরে অক্ষরে॥
শুনিলে প্রবন্ধ যদি বিচার না করি। অন্তরে প্রবেশ তবে না হয়ে মাধুরী॥
অল্প অক্ষরে অর্থ অনেক সন্ধান। পূর্ব্বপক্ষ বিচারিতে নহে সমাধান।
তে কারণে দঢ়াঞা কহিল নিজ মনে। পূর্ব্বপক্ষ যে করে সন্ধান সেই জানে॥
পৃ ৩॥

উপমাদির প্রয়োগে কবি যথেষ্ট বৈচিত্র্য ও দক্ষতা দেখাইয়াছেন। সর্ব্বধর্ম্মে সমদৃষ্টি এবং আত্মদৈন্য হইতে কবির উচ্চ-হৃদয়ের পরিচয় পাই।

উত্তম মধ্যম আর প্রাকৃত শকতি। মনুষ্য শরীরে এই বুদ্ধি তিন জাতি॥
উত্তমে না লয় দোষ গুণমাত্র ভোগে। শম্বুক ছাড়িঞা হংস সুখী পদ্মযোগে॥
দোষ গুণ সমভাব মধ্যম বিচারে। সর্ব্ব দ্রব্য তুল্য[১] যেন বণিকের ঘরে॥
দোষে সুখ গুণে দুখ খলে ত প্রকাশে। পল্লব ছাড়িঞা উট কণ্টক বিলসে॥
অতএব ভাবরস সুদৃঢ় জানিব। ভাব হৈতে প্রেমযোগে সুকর্ম্ম সাধিব॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব শক্তি অভিন্ন স্বভাব। অন্যোন্যে সকলে করে সর্ব্ব দেহে ভাব॥
ইহাতে পৃথক বুদ্ধি যেহি জন করে।[২] মস্তক ভূষিঞা যেন শরীর প্রহারে॥

১। মূলে 'মূল্য'। ২। পাঠান্তর 'ভাব হৈতে পৃথক বুদ্ধি যেবা জনে করে।'

শ্রীকৃষ্ণনগরে আছে মহা মহাধনী। পসার সাজিঞা তারা লেয় ভক্তিমণি॥
প্রণাম করিয়া কহি পণ্ডিতচরণে। কৃষ্ণের প্রসাদ গুণ স্থাপিব যতনে॥
হীনের পরশে গঙ্গা নহে অপবিত্র। কবিদোষে দোষী নহে কৃষ্ণের চরিত্র॥
শ্রীকৃষ্ণনগরে আছে মহা মহাধনী। ভক্তিমূল্য দিঞা তারা কিনে ভক্তিমণি॥
দুয়ারে দুয়ারে লঞা সাধুগণ ফিরে। আর্ত্তিমূল্য যাচিঞা বিকায় প্রতি ঘরে॥
দরিদ্র অবল খঞ্জ অন্ধহীন জনে। শ্রদ্ধাপণে সেই ভক্তি কিনে বিনি ধনে॥
তিক্ত মিষ্ট কটু কষা ক্ষার আম্ল নহে নিত্য নিত্য নব স্বাদ জন্মে নিজ[১] দেহে।
রাজায়ে নিবারে নারে না পোড়ে আনলে। জ্ঞাতিগণে না হিংসয়ে না দেখে তস্করে॥
নাড়িতে বহিতে কিছু নহে পরিশ্রম। বিলাইতে অক্ষয় ভোগিতে অনুপম॥
অনায়াসে হেন দ্রব্য পাঞা সর্ব্বজনে। অচৈতন্ত হারায় আলিস্য অভিমানে॥ পৃ ২-৩॥

পতিবিষয়ে নববধূর মনোভাব ও ক্রিয়াকলাপের বর্ণনায় কবি অসামান্য সূক্ষ্মদৃষ্টি ও সহৃদয়তার পরিচয় দিয়াছেন।

নবীন রমণীগণ নাহি জানে রস।
ক্ষণমাত্রে কোন যোগে নহে পতিবশ॥
সর্ব্ব সঙ্গে হাসে খেলে থাকে নানা সুখে।
পতিকে দেখিলে মাত্র রহে অধোমুখে॥
কন্দল পিরীতি কথা সর্ব্ব সঙ্গে কহে।
পতি কিছু জিজ্ঞাসিলে মৌন হৈয়া রহে॥
সহজে পুরুষ নবনারীর কারণে।
দেখিতে শুনিতে বাঞ্ছা করে ক্ষণে ক্ষণে॥
গৃহমধ্যে থাকে পত্নী ধৈর্য্য কথা কহে।
কোন ছলে তার পতি আঙ্গিনাতে রহে॥
দেখিতে না পায় কভু চাহে চারিদিগে।
না শুনে বচন কভু কর্ণ পাতি থাকে॥

১। 'নর'।

ব্যাজ লক্ষ্যে কার সঙ্গে দীর্ঘ কথা কহে।
কারণে রহিত তভু নানা ছলে রহে ॥
বৃদ্ধা দাসী শিশু দাস পত্নী সঙ্গে থাকে।
যত্ন করি তার কথা পুছে তা সভাকে ॥
যথা তথা ভাল দ্রব্য পায় কোন মতে।
আপনে না ভোগে দেয় তার সখীর হাতে ॥
সখী যদি পতিদ্রব্য হেন তাকে কহে।
হস্তে হোঁ না ছোয় তাহা নয়ানে না চাহে ॥
মিষ্ট দ্রব্য তিক্ত বাসে কণ্টক কুসুমে।
অন্য স্থলে চলে সখী বচন না শুনে ॥
সুখে স্বামী নানা বেশ রচিয়া আপনে।
যেখানে দেখিতে পায় রহে সেই খানে ॥

দৈবযোগে পতি যদি দেখে সেই নারী। বিষময় করি ঢাকে নয়ানপুতুলী
এই মত দিবস পর্য্যন্ত দুঃখে ফিরে। রজনী হইতে বাঞ্ছা নিরবধি করে ॥
সন্ধ্যাযোগ বুঝিঞা সত্বরে কিছু ভুঞ্জে। নিদ্রাছল কারণে আপনে শয্যা রচে ॥
তার নারী প্রবোধিঞা আনে দাসীগণ। শয্যাতে বসিয়া করে বিমুখে শয়ন ॥
নিজ ভুজে শির তার হৃদয় বিলাস। জাগিতে হোঁ নিদ্রাছলে ছাড়ে দীর্ঘশ্বাস ॥
পতি যদি পত্নী অঙ্গে নিজ কর ঢালে। তার কর ধরি তবে তৃণবৎ পেলে ॥
নিজ ভুজ ফিরাইতে যদি ইচ্ছা করে। পাষাণ অধিক তবে নাড়িতে না পারে ॥
বসনে শরীর ঢাকে না পন্ধে চন্দন। মুখ মেলি নাহি করে তাম্বূল ভক্ষণ ॥
অশ্রু বিনে কান্দে যদি অতিশয় পুছে। অজল্প জল্পায় যাহা আপনে না বুঝে ॥
মুখ নিরখিতে পুন চাপে দুই আখি। পরিহাস কথা শুনি হয় বক্রমুখী ॥
ভাব বুঝি পতি যদি দূর হঞা রয়। উঠিয়া পলাবে হেন মনে করে ভয় ॥
ক্ষণে উঠে ক্ষণে বৈসে কখন শয়ন। অল্প মাত্র নিদ্রা সর্ব্বরাত্রি জাগর পৃ ১২-১৩।

বৃদ্ধের লাঞ্ছনা—

বৃদ্ধ হৈলে পতি তার হয় অভাজন। নিরবধি সহে পত্নী পুত্রের তর্জ্জন

ধান্যের বায়স খেদে গাভীর সেবা করে। শিশু পৌত্র[১] দৌহিত্র পালিঞা থাকে ঘরে॥
পত্নীপুত্রে বোলে বৃদ্ধ জীয়ে অকারণ। সকলে বাঞ্ছয়ে সদা বৃদ্ধের মরণ॥
অসুস্থ অবল দেখি সবে মন্দ বলে। না মরে কারণ সভে নিত্য তিরস্করে।
সুরীতে না হয় [তার]ভক্ষণ শয়ন। মরণ অধিক দুঃখ বৃদ্ধের জীবন॥
বৃদ্ধ মৈলে তার নারী বোলে পুত্রস্থানে। অল্প ব্যয়ে তার কর্ম্ম কর সমাধানে॥
সে মৈল তাহার হেতু ছাড় উপবাস। ক্রন্দন অসুখ না করহ ধননাশ॥
পুত্রগণ কর্ম্ম করে মায়ের বচনে। তা সভার এই গতি হয় কালক্রমে॥ পৃ ১৩॥

গোলোকের রীতিবর্ণনায় কবি ব্রহ্মসংহিতা হইতে কিছু সাহায্য পাইয়াছেন, তথাপি ইহা কবির কতকটা নিজস্ব বর্ণনা বটে।

সর্ব্ব বৃক্ষ কল্পদ্রুম নানা গুণ ধরে। ফল ফুল মকরন্দ গন্ধ শোভা করে॥
অযাচক যাচক কাহাকে নাহি জানে। বাঞ্ছা বিনে পূর্ণ করে নানা রস দানে॥
নব নব সুখ সব শরীরে উদয়। মানসে বিস্তর ভোগ না বুঝি নির্ণয়॥
রমণী রসিক যাতে অখণ্ড যৌবন। বিনি পাঠে সর্ব্বশাস্ত্র জানে সর্ব্বজন॥
প্রেমরস সুখরস মূর্ত্তিমন্ত দেখি। অখণ্ড আনন্দ সর্ব্বজীব মহাসুখী॥
কার্য্য বিনে করণ সর্ব্বত্র উপাদান। স্বাদু গন্ধ রূপবতী সর্ব্বমূর্ত্তিমান॥
গীতচ্ছন্দে কথা যাতে নৃত্যচ্ছন্দে গতি। সহজ কথনে যাতে বেদের উৎপত্তি॥
না ভোগিলে সর্ব্ব রস ভোগে সর্ব্বজন। না দেখিঞা সর্ব্ব রূপ করে নিরীক্ষণ॥
না বোলিলে সর্ব্ব কথা বুঝে অনুমানে। না শুনিলে সর্ব্ব ধ্বনি শুনে সর্ব্বজনে॥
না জানিঞা জানে সর্ব্ব না রমিঞা রমে। মনের সকল কর্ম্ম পূরে বিনি শ্রমে॥ পৃ ২৬॥

দ্বারকায় এত সুন্দরী সুশিক্ষিতা মহিষী থাকিতে কেন যে কৃষ্ণের চিত্ত গোপীদের মত অশিক্ষিত গ্রাম্য নারীর প্রতি অনুক্ষণ ধাবিত হইতে পারে, তাহা রুক্মিণী ভাবিয়া না পাইয়া কৃষ্ণকে জিজ্ঞাসা করিলেন,

সম্প্রতি দ্বারকাপুরী ষোলয় সহস্র নারী
রাজকন্যা পরম পণ্ডিতা।
কুল শীল রূপ গুণে অনুপামা সর্ব্বজনে
সরসরভসে সুচরিতা॥

নয়ানকমলপথে রাখিলে আপন চিত্তে,
মতি গতি সর্ব্ব কর্ম্ম করে।
তিলেক না দেখে যদি না শুনে বচন নিধি,
অনুরাগে প্রাণ দাহে মরে॥
হেন অনুরাগে ছাড়ি কপট দেবার্চ্চা করি
ধ্যানযোগে থাক তুমি বনে।
সহজে সে ভিন্ন নারী সেহো বন অনুচরী,
যতনে ভজহ কি কারণে॥
প্রিয় কথা নাহি জানে পতি হেন নাহি মানে
নিরবধি গ্রাম্য কথা কহে।
বৃক্ষ মূলে ঘর যার, বনপুষ্প অলঙ্কার,
সে জন কেমনে তোমা মোহে॥
কেলি যার কুঞ্জতল, বনের কুসুম দল,
পরিহাস কন্দল সমান।
রচিতে না জানে রতি, গুরুকুলে ঘন মতি
তাতে কেনে এমত সন্ধান॥
নিত্য স্থান কেলি বাণী শুনিতে অপূর্ব্ব মানি,
তার তুল্য বাসহ গোকুলে।
এ মোর বিস্ময় বড় অনন্তে জানিলে দঢ়
বুঝিয়া কহিবে নিরাকুলে॥

ইহার উত্তরে কৃষ্ণ গোপীপ্রেম বর্ণনা করিলেন।

জগতে সম্বন্ধ যত বেদে কহে নানা মত,
সে সব জানিব মনে দঢ়।
তাহাতে জানিব লাভ পুরুষ প্রকৃতি ভাব,
ইহাধিক নাহি আর বড়॥

তার মধ্যে গুপ্ত রস কেবল প্রেমের বশ,
সর্ব্বলোকে করে সঙ্গোপন।
ছাড়িয়া মন্দির পুরী গুরুকুলে করে চুরি,
বিরলে বাঢ়ায় প্রেমধন॥
সহজে সে গ্রাম্য জাতি সহজ চরিত্র আতি,
চাতুরী আহার্য্য নাহি জানে।
তাহাতে কুলজাধর্ম্ম বিরলে বিলসে কর্ম্ম,
পতি অহঙ্কার নাহি মানে॥
তাতে রহে অনুরাগ, মনে সহে দুঃখ ভাগ,
প্রেমশয্যা তরুতলে সীমা।
রূপে করে অহঙ্কার, যৌবনে কি রূপ ভার,
প্রেম নহে যৌবনগরিমা॥
গৃহ কর্ম্মে বাহ্য দেহা, মনে ভোগে নব লেহা,
কন্দলের ছলে দুঃখ কহে।
সহজে প্রকট রসে রসিকের নহে তোষে,
গুপ্ত প্রেমে প্রাণ মন মোহে॥
নিকুঞ্জ মন্দির পাঞা তাহাতে বিরল ছায়া,
কুসুমসৌরভে বায়ু দোলে।
কোকিলে পঞ্চম গায়, মাতল ভ্রমরে ধায়,
সচকিতে প্রীত লাগি বুলে॥
এ সব সুখের ওর কহিতে শুনিতে মোর
তনুমন প্রাণে দুঃখভাব।
এ সব অপূর্ব্ব ভাষা শুনিতে পরম আশা,
শুনিলে বাঢ়য়ে বহু লাভ॥
আত্মারাম রূপ ধরি নানারূপ কেলি করি,
খণ্ডনে স্থাপনে কর্ত্তা আমি।

শিবে কি বিষের তেজে, আনলে সকল ভুঞ্জে,
তেজবান্ কিছু না বাখানি ॥
উত্তম মধ্যম যত যে জন যে কার্য্যে রত
তাহা কেহ ছাড়িতে না পারে।
হেন ত আনন্দধাম কেলি-বৃন্দাবন নাম
তার ভাবে পূরিল অন্তরে ॥
গোপীগণ প্রেমখানি স্মরিতে নারিল মানি
প্রেমপুঞ্জ বাঢ়ে আর্ত্তিযোগে।
মনে কর অনুমান, যে করে অমৃতপান
অন্য মধু তারা নাহি ভোগে ॥
পিরীতি আরতি রতি সম্ভোগ বিয়োগ গতি
তোমাকে কহিল আদিরসে।
কৃষ্ণের প্রবোধ বোলে রুক্মিণী পড়িলা ভোলে,
শ্রীকবিবল্লভ কিছু ভাষে ॥ পৃ ৪৪-৪৬ ॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং উজ্জ্বলনীলমণি অবলম্বনে বাঙ্গালা ভাষায় যে সকল বৈষ্ণব রসশাস্ত্র রচিত হইয়াছিল তাহার মধ্যে নন্দকিশোর দাসের রসকলিকা[১] প্রাচীনতম।

রসকলিকা ষোড়শ 'দল' বা অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। প্রথম দলে নায়কগুণবর্ণনা, দ্বিতীয়ে নায়িকানিরূপণ, তৃতীয়ে নায়িকাস্বভাবভেদবিচার, চতুর্থে দৌত্যপ্রকরণ, পঞ্চমে উদ্দীপনবিভাববর্ণন, ষষ্ঠে অনুভাববিবরণ, সপ্তমে সাত্ত্বিকবিবরণ, অষ্টমে ব্যভিচারিভাববর্ণন, নবমে অষ্টবিধরতিবিবরণ, দশমে মোহনদশাবর্ণন, একাদশে স্থায়িভাববিবরণ, দ্বাদশে বিপ্রলম্ভবিবরণ, ত্রয়োদশে সম্ভোগচতুষ্টয়বর্ণন, চতুর্দ্দশে পুষ্পত্রোটন ও বংশীচৌর্য্য লীলাবিবরণ, পঞ্চদশে দানলীলাবর্ণন এবং ষোড়শে সম্ভোগলীলাবর্ণন।

রসকলিকার অন্যতম বিশেষত্ব হইতেছে, শ্রীচৈতন্যের জীবনী হইতে রসশাস্ত্রের

১। নামান্তর "রসপুষ্পকলিকা", ব-সা-প-প ৮, পৃ ১৮৭।

বিচারে দৃষ্টান্ত প্রদর্শন। গ্রন্থে বহু সংস্কৃত শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি গ্রন্থকারের স্বরচিত।[১]

রসকলিকার ভণিতা এইরূপ—

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে করি আশ।
নায়কবর্ণনা কহে নন্দকিশোরদাস॥

নন্দকিশোর ষোড়শ শতাব্দীতে শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। এই অনুমানের হেতু ইনি নিত্যানন্দ প্রভুর অনুচর অভিরামদাসের শিষ্য ছিলেন। অন্ততঃ অভিরামদাস রচিত শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শাখানির্ণয় হইতে তাহাই অনুমান হয়।

চুনাখালীবাসী দাস নন্দকিশোর।

১০৯১ সালে অর্থাৎ ১৬৮৪ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত একটি পুঁথিতে নন্দকিশোর ভণিতায় একটি নিত্যানন্দ প্রভুর বন্দনা পদ পাওয়া গিয়াছে।[২] পদটি রসকলিকা-রচয়িতা নন্দকিশোরের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে।

পাঁচটি বন্দনাশ্লোকের পর এইরূপে গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে—

প্রথমে বন্দিব গুরু [ভক্ত]বাঞ্ছাকল্পতরু
অতিশয়দীনজনবন্ধু।
অজ্ঞানতিমির নাশে, দিব্য নেত্র পরকাশে,
সেই প্রভু করুণার সিন্ধু॥
মো অতি অধম ছার, মোরে কৈলে অঙ্গীকার,
সেহো তাঁর করুণা প্রবল।
কৃপা করি সব মত জানাইলা রসতত্ত্ব
রাধাকৃষ্ণলীলাদি সকল॥
মুঞি অতিশয় দীন সারাসারজ্ঞানহীন,
হৃদয় মলিন অতিশয়।
গুরুকৃপা পরচণ্ড সব মলা করি খণ্ড
স্নিগ্ধাকার করিল হৃদয়॥

১। বা-প্রা পু-বি ৩-৩, পৃ ১৩৬-১৩৮। ২। HBL, পৃ ৩০৭-৮।

ব্রজেন্দ্রনন্দন হরি রাধাভাব অঙ্গীকরি
নবদ্বীপে হৈলা অবতীর্ণ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য নাম প্রেমধন করি দান
আস্বাদিল নিজ ভাব পূর্ণ॥
নিত্যানন্দচাঁদ বন্দি গৌরপ্রেমরসানন্দী
বলদেব রোহিণীতনয়।
অবতীর্ণ মহীতলে, প্রেম প্রচারিয়া বুলে,
কীর্ত্তন-আনন্দ রসময়॥
তবে বন্দো মহাশয় সদাশিব কৃপাময়
ভক্তরূপে অদ্বৈত আচায্য।
যেহোঁ নিজ ভক্তি বলে কৃষ্ণ আনি ক্ষিতিতলে
সাধিল আপন যত কার্য্য॥
বন্দো প্রভুর ভক্তগণ শ্রীবাসাদি যত জন
গদাধর আদি ভাগবত।
বন্দো স্বরূপ রামানন্দ কেবল প্রেমের কন্দ
চৈতন্যপার্ষদ আর যত॥
দুই প্রভু অবতরি নিজগণ সঙ্গে করি
বিলসএ নদীয়া নগরে।
প্রেমরস পরকাশে, আনন্দসায়রে ভাসে,
নিত্যানন্দ সঙ্গে যুক্তি করে॥
শুন প্রাণ নিত্যানন্দ, তুমি সে আনন্দকন্দ,
শুন মোর এক নিবেদন।
গৌড়দেশে প্রেমধন দান কর অনুক্ষণ,
প্রকাশ করহ সঙ্কীর্ত্তন॥
গৌড়দেশে নিত্যানন্দে সমর্পিয়া নিজানন্দে,
বৃন্দাবনে রূপ সনাতনে।
আপনে উৎকল দেশে করে প্রেম পরকাশে,
রহে স্বরূপ রামানন্দ সনে॥

ওথা সনাতন রূপ প্রভু-আজ্ঞা পাঞা ভূপ
লুপ্ততীর্থ প্রকাশ করিলা।
ভক্তিতত্ত্ব রসতত্ত্ব প্রকাশিলা নানামত,
লক্ষগ্রন্থনিরূপণ কৈলা॥
বিদগ্ধমাধব আর উজ্জ্বলনীলমণি সার,
এই দুই রসের সাগর।
নামামৃত আছে ইথে, শুনি সাধুমুখাদিতে,
আস্বাদিতে লোভ বাঢে মোর॥
শ্রীরূপ শ্রীসনাতন বন্দোঁ দোঁহার চরণ,
দোঁহে মোরে হও কৃপাবান্।
নাহি কিছু অধ্যয়নে, হ্রস্বদীর্ঘজ্ঞানহীনে;
তভু চেষ্টা বাঢ়ে অনুক্ষণ।
খর্ব্ব হঞা চাঁদ যেন ধরিবারে করে মন,
তেন বাঞ্ছা হএ ত আমার।
যদি দয়া করি সভে, পড়িয়াছি অতি লোভে,
নিবেদন করোঁ বারবার॥
কহিতে শৃঙ্গাররসে মনে হয় অভিলাষে,
শুভদৃষ্ট্যে দয়া কর মোরে।
নায়কনায়িকাগুণ আর ভাবনিরূপণ
রসপ্রেমদশাদি-বিস্তারে॥
উজ্জ্বলগ্রন্থ অনুসার বিদগ্ধমাধব আর
সাধু পদ্য উক্তি যে প্রকার।
এ রসকলিকা নাম ঐ গ্রন্থের আখ্যান
দৈন্যরূপ করিব প্রচার॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণব পদ সেই মোর সুসম্পদ,
তাহা বিনু অন্যে নাহি আশ।

সে চরণ বল হৈতে মঙ্গলাচরণরীতে
কহে দীন নন্দকিশোরদাস ॥

প্রত্যেক "দল" বা অধ্যায়ের শীর্ষে এই পয়ার শ্লোকটি আছে—

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ। জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ ॥

এই পয়ারটি শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকে স্মরণ করাইয়া দিতেছে। গ্রন্থের মধ্যে অন্যান্য স্থলেও কৃষ্ণদাস কবিরাজের প্রভাব আছে বলিয়া মনে হয়। গ্রন্থকাব শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সহিত পরিচিত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

রসকলিকায় কয়েকটি বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি পদ সম্পূর্ণ ও আংশিক ভাবে উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার মধ্যে দুইটি নন্দকিশোর ভণিতায়। এই দুইটি গ্রন্থকারের রচিত বলিয়াই মনে হয়। শ্রীরাম ভণিতায় একটি পদ আছে। কবিরঞ্জনেব একটি এবং গোবিন্দদাসের সাতটি সম্পূর্ণ এবং তিন চারিটি অসম্পূর্ণ পদ আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত এই পদাংশটিও আছে—

সেই পরাণনাথ পাইলুঁ।
যাহা লাগি মদনদহনে জরি গেলুঁ ॥ ধ্রু ॥

রসকলিকায় শেষভাগে যে বংশীচৌর্য্যাদিলীলা বর্ণিত আছে তাহা শ্রীরূপ গোস্বামীর গ্রন্থাদি অবলম্বনে বিরচিত।

গ্রন্থের সমাপ্তি এইরূপ—

রসশিরোমণি রাধাকৃষ্ণ দুই জন। দোঁহার বিলাস কিছু করিল বর্ণন ॥
আমি অজ্ঞ দুরাচার বড়ই অধম। অসৎ ধারণে সদা মনের গমন ॥
বৈষ্ণব গোসাঞি মুখে অনেক শুনিল। সকল স্মরণ নাহি কিছু মনে ছিল ॥
অভিলাষ ক্রমে হৈল এ গ্রন্থ রচন। দোষ না লইবে কেহো মুঞি অজ্ঞ জন ॥
যদি কোন রস ক্রমবিপর্য্যয় হয়। সে রস বৈষ্ণব সব করিবে নির্ণয় ॥
আমি মূঢ় দুরাচার অতি বড হীন। রস কিছু নাহি বুঝি অতি অপ্রবীণ ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্মে করি আশ। এ রসকলিকা নন্দকিশোর প্রকাশ ॥

লোচনদাস জগন্নাথবল্লভ নাটকের অনুবাদ করেন, একথা পূর্ব্বে বলা হইযাছে। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ ভাগে অকিঞ্চনদাস নাটকটির একটি অনুবাদ করেন।

অকিঞ্চনদাসের গ্রন্থের একখানি পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার আছে [পুঁথি সংখ্যা ১৫১২]।

লোচন টানা অনুবাদ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহার লক্ষ্য বেশি ছিল শ্লোক-গুলির উপর। অকিঞ্চনদাস অঙ্ক ধরিয়া অনুবাদ করিয়াছিলেন, সুতরাং এই হিসাবে এবং নাটকের ধারাবাহিকতা হিসাবে অকিঞ্চনের অনুবাদ অধিকতর মূলানুযায়ী। কিন্তু লোচনের কবিত্ব শক্তি অকিঞ্চনদাসের ছিল না। সেই জন্য কাব্যাংশে অকিঞ্চনের গ্রন্থ মূল্যহীন।

প্রত্যেক অঙ্কের শেষে অকিঞ্চন এই ধরণের ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন—

প্রথমে বেণুধ্বনি করিল প্রকাশ।
নাটকের ভাষা কহে অকিঞ্চনদাস॥

কাব্যের বন্দনা অংশ কিছু উদ্ধৃত করিতেছি।

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু স্বয়ং ভগবান। তাঁর পাদপদ্মে মোর অনন্ত প্রণাম॥
জয় জয় নিত্যানন্দ স্বরূপপ্রকাশ। কৃপা করি মো অধমে কর নিজ দাস॥
অদ্বৈত আচার্য্য প্রভু ভক্তশিরোমণি। যাহার প্রসাদে ধন্য হইল ধরণী॥
শিরের উপর বন্দো তাঁহার চরণ। কৃপা কর মো অধমে লইনু শরণ॥
জয় জয় গদাধর পণ্ডিত গোসাঞি। প্রভুর অন্তরঙ্গ বলি সর্ব্বজনে গাই॥
চৈতন্যের ভক্ত যত পরিষদগণ। অগণ্য অনন্ত যত কে করু গণন॥
তা সভার পদ বন্দো দন্তে তৃণ ধরি। নিজগুণে কৃপা কর দাসে অঙ্গীকরি॥
জয় সনাতন রূপ ভট্ট রঘুনাথ। শ্রীজীব গোপাল ভট্ট দাস রঘুনাথ॥
ইহা সভার পদধূলি বন্দো শিরোপরি চরণমাধুরী তাহা কি বলিতে পারি॥
এ সভার পদধূলি যে লয় শরণ। অনায়াসে হয় তার বাঞ্ছিতপূরণ॥
একত্রে করিনু সেই ছয়ের বন্দন। আমার প্রভুর প্রভু হয় এক জন॥
পূর্ব্বে তিন মধ্যে তার করিনু বন্দন। পুনরপি বন্দো তাঁর যুগল চরণ॥

ইহা হইতে জানিতে পারি যে কবি ছয় গোস্বামীর একতমের প্রশিষ্য। অকিঞ্চন শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন কি ?

শ্যামানন্দদাস রচিত উপাসনাসারসংগ্রহ নামক বৈষ্ণবতত্ত্ব গ্রন্থের একটি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[১] গ্রন্থকার যে ভাবে শ্রীজীব গোস্বামীর নাম করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে শ্রীনিবাস আচার্য্যের সুবিখ্যাত সহকর্ম্মী শ্যামানন্দ বলিয়াই বোধ হয়। কবি বলিয়াছেন—

সেই শ্রীজীব গোসাঞি প্রভু যে আমার। কত দিনে কৃপা করি করিবেন কিঙ্কর
নাহি জানি ছন্দোবন্ধ না জানি শ্লোকার্থ। গোসাঞির চরণপদ্ম এই ভরসা মাত্র

পুঁথির আরম্ভ এই প্রকার—

জয় জয় শ্রীজীব গোস্বামী প্রভু মোরে। করহ করুণা প্রভু তবে বাঞ্ছা পূরে॥
আপনার গণ মধ্যে গণনা করিবে। কিঙ্কর করিয়া আপন সঙ্গেতে রাখিবে
কত দিনে হেন দশা আমার হইব। শ্রীরূপের কৃপাধন আমি সে পাইব॥
শ্রীরূপচরণপদ্ম শিরোপর ধরি। আরম্ভিল গ্রন্থ ভরসা চরণমাধুরী॥

গ্রন্থের শেষে ভণিতা এই—

শ্রীমজ্জীব গোস্বামীর পাদপদ্ম-আশ।
উপাসনাসার কহে শ্যামানন্দদাস॥

১। ব-সা-প-প ৬, পৃ ২৫২।

সপ্তদশ শতাব্দী

পঞ্চবিংশ পরিচ্ছেদ

সপ্তদশ শতাব্দীর ভূমিকা

ষোড়শ শতাব্দীর জের সপ্তদশ শতাব্দী অবধি সমানভাবে চলিয়াছিল। কেবল শ্রীচৈতন্যজীবনীর পরিবর্ত্তে কয়খানি বৈষ্ণবমহান্ত জীবনী পাইতেছি। পদাবলী রচনা পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহের সহিত চলিয়াছিল। ভারতপাঁচালী ও রামায়ণ-পাঁচালী অনেকগুলিই এই শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল। পশ্চিমবঙ্গে বিরচিত দুই তিনখানি মনসামঙ্গল কাব্য পাইতেছি ; এই জাতীয় গানের পালা পূর্ব্ববঙ্গেও অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল।

গোস্বামিগ্রন্থের অনুবাদ কার্য্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষ হইতে আরম্ভ হইলেও এই শতাব্দীর প্রারম্ভেই তাহা বিশেষ ফলপ্রদ হয়। একটির বেশী পদাবলী-সংগ্রহ গ্রন্থ এই শতাব্দীতে সংকলিত হয় নাই বটে, কিন্তু তাহার অনুকল্পে কয়েকটি বৈষ্ণব তত্ত্ব ও অলঙ্কারের বই পাইতেছি যাহাতে রূপ গোস্বামিপ্রোক্ত রসক্রমাদি অনুসারে বিভিন্ন কবির রচিত পদ সংগৃহীত হইয়াছে। শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায়ের দ্বারাই এই কায্য বিশেষভাবে সম্পাদিত হয়। কড়চা-জাতীয় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বৈষ্ণবতত্ত্ব নিবন্ধ এই শতাব্দীতে অজস্র রচিত হয়, তন্মধ্যে কতকগুলি স্পষ্টই তান্ত্রিক মতের বা গুহ্যসাধনা পদ্ধতির।

উত্তর ও পূর্ব্ববঙ্গে মার্কণ্ডেয় পুরাণান্তর্গত দুর্গা-সপ্তশতী অবলম্বনে রচিত দেবীমাহাত্ম্য কাব্য অনেকগুলি পাইতেছি। দক্ষিণরাঢ়ের প্রান্ত দেশে রচিত কয়েকটি জগন্নাথমঙ্গল কাব্যও পাওয়া যাইতেছে।

দেবদেবী অবলম্বনে ব্রতকথার ধরণে রচিত কয়েকটি পাঁচালী কাব্য এই শতাব্দীর শেষ ভাগ হইতেই পাওয়া যাইতেছে। যেমন, ষষ্ঠীমঙ্গল, রায়মঙ্গল ইত্যাদি।

প্রাগাধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বড় ধারার প্রবর্ত্তন হয় এই শতাব্দীর

মধ্যভাগ হইতে। ধর্ম্মঠাকুরের মাহাত্ম্যজ্ঞাপক ছড়া পূর্ব্বাপর প্রচলিত থাকিলেও, সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ দশকের পূর্ব্বে রচিত বলিয়া জানা গিয়াছে এমন দুই তিনটি মাত্র ধর্ম্মমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে।

নাথপন্থী শৈব যোগিদিগের মধ্যে প্রচলিত গোরক্ষমাহাত্ম্য কাব্য অথবা গোবিন্দচন্দ্র-ময়নামতী পাঁচালী কাব্য এই শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিল বলিয়া অনুমান করিবার হেতু আছে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে চট্টগ্রাম অঞ্চলে রাজানুগ্রহে বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা সুরু হয়। এই ধারা ঐ অঞ্চলে সপ্তদশ শতাব্দীতেও চলিয়াছিল। রোসাঙ্গের রাজা ও রাজামাত্যেরা তাঁহাদের অনুচরের নিকট মনোমুগ্ধকর কাহিনী শুনিতেন। এই কাহিনীকথকদিগের মধ্যে অন্ততঃ দুইটি উৎকৃষ্ট কবি পাইতেছি—দৌলৎ কাজী ও আলাওল। দৌলৎ কাজী বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রাচীনতম মুসলমান কবি; লৌকিককাহিনী কাব্য রচনার ধারা তিনিই প্রবর্ত্তন করেন। তাঁহারই পন্থা আলাওল অনুসরণ করিয়াছিলেন।

সপ্তদশ শতাব্দীতে অত্যন্ত ব্যাপকভাবে সাহিত্যচর্চ্চা হইলেও এই শতাব্দীতে পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দীর মত কোন প্রথম শ্রেণীর কবির আবির্ভাব হয় নাই। পদ-কর্ত্তাদিগের মধ্যে যদুনন্দনদাস এবং জগদানন্দ বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভে কাশীরাম দাস ভারতপাঁচালী লিখিয়া অমর হইয়াছেন। উত্তরবঙ্গে অদ্ভুতাচার্য্য রামায়ণ লিখিয়া বিলক্ষণ যশস্বী হইয়াছিলেন। ক্ষমানন্দের মনসামঙ্গল পশ্চিমবঙ্গে এখনও জনপ্রিয় রহিয়াছে।

এই শতাব্দীর শেষভাগে তান্ত্রিক বৈষ্ণবদিগের কড়চা গ্রন্থে[১] এবং ধর্ম্ম ঠাকুরের কোন কোন পদ্ধতি গ্রন্থে[২] গদ্য রচনার প্রচেষ্টা দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু ইহা ঠিক গদ্য নহে, ইহাকে ভাঙ্গা মন্ত্র অথবা ছড়া বলাই সঙ্গত।[৩] কিন্তু এই শতাব্দীতেই প্রকৃত গদ্য রচনার চেষ্টা হইয়াছিল পোর্ত্তুগীস্ পাদ্রীদিগের দ্বারা।

১। নরোত্তম রচিত দেহকড়চা। (১৬০৪ শকাব্দের পুঁথি) ব-সা-প-প চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত।
২। শূন্য পুরাণ, নগেন্দ্র নাথ বসু সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত (১৩১৪)।
৩। মৎপ্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য, পৃ ৫ দ্রষ্টব্য।

বাঙ্গালাদেশে পোর্ত্তুগীস্‌দিগের আগমন ঘটে ষোড়শ শতাব্দীর শেষে। বাণিজ্যব্যপদেশে আসিলেও ইহাদের কার্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছিল গঙ্গাধৌত দক্ষিণ ও দক্ষিণপূর্ব্ব বঙ্গে বৃত্তিজলদস্যু করা। ইহাদের ব্যবসায় এবং তজ্জন্য অত্যাচার যে কাটোয়া অবধি পৌছাইয়াছিল সে কথা রামগোপাল দাসের উক্তি হইতে জানা যায়। রামগোপাল দাস শাখানির্ণয়ে বলিয়াছেন যে, লোচনদাস তাঁহার গুরু নরহরি সরকার ঠাকুরের জন্য ফিরিঙ্গীর নিকট বন্দী হইয়াছিলেন। কবিকঙ্কণও নিম্নবঙ্গে পোর্ত্তুগীস্ আর্মাদা বা জলদস্যুর অত্যাচারের কথা বলিয়াছেন,

ফিরাঙ্গীর দেশখান বাহে কর্ণধারে।
রাত্রিতে বাহিয়া যায় হার্মাদের ডরে॥

পোর্ত্তুগীসেরা বাণিজ্য এবং দস্যুতা করিয়াই ক্ষান্ত রহিল না, স্বদেশ হইতে পাদ্রী আনাইয়া খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম প্রচার করিতে লাগিল। ধর্ম্মপ্রচারের স্ববিধার জন্য পোর্ত্তুগীস্ পাদ্রীরা বাঙ্গালা ভাষা উত্তমরূপে শিখিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্ম গ্রন্থাদি বাঙ্গালা ভাষায় রচনা বা অনুবাদ করিতে আরম্ভ করে। পোর্ত্তুগীস্ পাদ্রীদের রচিত খ্রীষ্টানী বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারা ষোড়শ শতাব্দীর একান্ত শেষ হইতে সুরু হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি অব্যাহত ভাবে চলিয়াছিল।[১] ভূষণার এক রাজা বা জমিদার পুত্রকে খ্রীষ্টীয় ১৬৬৩ সালে মগেরা বন্দী করে। এক পোর্ত্তুগীস্ পাদ্রী টাকা দিয়া তাঁহাকে মুক্ত করিয়া খ্রীষ্টান ধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। তখন ইহার নাম হয় দোম্ আন্তনিও (Dom Antonio)। খ্রীষ্টান ধর্ম্মের প্রাধান্য জানাইতে ইনি বাঙ্গালায় একটি বই লেখেন। বইটি এক খ্রীষ্টান পাদ্রী ও এক ব্রাহ্মণের মধ্যে স্ব স্ব ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্নোত্তরমালা রূপে রচিত। মূল পাণ্ডুলিপি পর্ত্তুগালের এভোরা নগরে আছে। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ে সম্পাদকতায় বইটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের প্রথম পরিচয় সেন মহাশয় উপাসনা পত্রিকায়[২] প্রকাশ করিয়াছিলেন। যাহা অদ্যাবধি

১। ঐ, পৃ ৫-৬। ২। ১৩৩৯ কার্ত্তিক সংখ্যা। মৎ প্রণীত বাঙ্গালা সাহিত্যে গদ্য পুস্তকে এই গ্রন্থের কিছু পরিচয় দেওয়া হইয়াছে [পৃ ৬-৯]।

আমাদের হস্তগত হইয়াছে তাহার মধ্যে দোম্ আন্তনিও প্রণীত পুস্তকটিই বাঙ্গালা ভাষায় লিখিত প্রাচীনতম গদ্য পুস্তক।

সঙ্গীতকলায় বাঙ্গালার শ্রেষ্ঠ দান রসকীর্ত্তন পদ্ধতি ষোড়শ শতাব্দীর শেষে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে প্রবর্ত্তিত হয়। ইহার কৃতিত্ব সম্পূর্ণভাবে নরোত্তমদাস এবং তাঁহার সহযোগী মার্দ্দঙ্গিক দেবীদাসের হইলেও[১] শ্রীচৈতন্যই ইহার সূত্রপাত করিয়া যান। নরোত্তম প্রবর্ত্তিত পদ্ধতি খেতরী গ্রাম যে পরগণায় অবস্থিত তাহার নাম অনুসারে গড়ানহাটী বা গরানহাটী নামে প্রসিদ্ধ। সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিপ্রদাস রাণীহাটী বা রেণিটী পদ্ধতি প্রবর্ত্তন করেন। তাহার পর আসে মনোহরশাহী পদ্ধতি। এখনকার দিনে প্রধানতঃ ইহাই চলিতেছে।

১। প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর ইত্যাদিতে খেতরী উৎসবের বর্ণনা দ্রষ্টব্য

ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ

বৈষ্ণবমহান্তচরিত : প্রেমবিলাস, প্রেমামৃত, কর্ণানন্দ, বংশীবিলাস, রসিকমঙ্গল

প্রেমবিলাস রচয়িতা নিত্যানন্দদাসের প্রকৃত নাম বলরাম দাস। পিতার নাম আত্মারাম দাস, মাতার নাম সৌদামিনী। ইঁহারা বৈদ্য জাতীয়; বাসস্থান শ্রীখণ্ড। কবি ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুর কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবা দেবীর মন্ত্রশিষ্য। জাহ্নবা দেবী ইঁহার নাম বদলাইয়া নিত্যানন্দদাস নাম রাখেন।

মোর দীক্ষাগুরু হয় জাহ্নবা ঈশ্বরী। যে কৃপা করিলা মোরে কহিতে না পারি॥
বীরচন্দ্র প্রভু মোর শিক্ষাগুরু হয়। আমারে করুণা তেঁহো কৈলা অতিশয়॥
মাতা সৌদামিনী পিতা আত্মারাম দাস। অম্বষ্ঠকুলেতে জন্ম শ্রীখণ্ডেতে বাস॥
স্বপ্ন দেখি খড়দহে কৈনু আগমন। ঈশ্বরী করিলা মোরে কৃপায় ভাজন॥
বলরাম দাস নাম পূর্ব্বে মোর ছিলা। এবে নিত্যানন্দদাস শ্রীমুখে রাখিলা॥ ২০॥

প্রেমবিলাস ১৫২২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০০ খ্রীষ্টাব্দে ফাল্গুন মাসের কৃষ্ণা ত্রয়োদশীতে সম্পূর্ণ হয় এইরূপ উক্তি কোন কোন পুঁথিতে আছে। এই তারিখ অযথার্থ হইবার কোন কারণ নাই।

পনর শত বাইশ যখন শকাব্দের আসিল। ফাল্গুন মাস আসিয়া উপস্থিত হৈল॥
কৃষ্ণা ত্রয়োদশী তিথি মনের উল্লাস। পূর্ণ করিল গ্রন্থ শ্রীপ্রেমবিলাস॥[১]

শ্রীচৈতন্যপ্রবাদেন পক্ষদ্বিতিথিসম্মিতে।
শাকে প্রেমবিলাসোঽয়ং ফাল্গুনে পূর্ণতাং গতঃ॥[২]

প্রেমবিলাসের পরিচ্ছেদের নাম 'বিলাস'। মূল গ্রন্থ কয়টি বিলাসে বিভক্ত ছিল তাহা লইয়া মতভেদ আছে। অধিকাংশ পুঁথিতে বিংশ বিলাস অবধি আছে।

১। যশোদানন্দন তালুকদারের সংস্করণ, চতুর্ব্বিংশ বিলাস।
২। ঐ, অর্দ্ধ বিলাস।

কোন কোন পুঁথিতে পঞ্চদশ বা ষোড়শ বিলাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। আবার কোন কোন পুঁথিতে দ্বাবিংশ, চতুর্ব্বিংশ বা সার্দ্ধচতুর্ব্বিংশ বিলাস পর্য্যন্ত পাওয়া যায়। বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র হইতে যে প্রেমবিলাস প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে বিংশ বিলাস অবধি আছে। শ্রীযুক্ত যশোদানন্দন তালুকদার কর্ত্তৃক ১৩২০ সালে কলিকাতা হইতে যে সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে তাহা সার্দ্ধ চতুর্ব্বিংশ বিলাসে সম্পূর্ণ। যাহা হউক বিংশ বিলাস পর্য্যন্ত যে মোটামুটি অকৃত্রিম তাহা প্রায় সকলেই স্বীকার করেন। এই বিলাসের শেষে কবি আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহাতেও মনে হয়, এইখানেই প্রেমবিলাসের প্রকৃত সমাপ্তি। কিন্তু তাহা হইলেও বাকী বিলাসগুলি একেবারে বাজে নহে। সত্য বটে চতুর্ব্বিংশ বিলাসে অনেক পরবর্ত্তী ব্যাপার আছে, যেমন রাঢী ও বারেন্দ্র ব্রাহ্মণদিগের কৌলিন্য ও শ্রেণীবিভাগ ইত্যাদি। তৎসত্ত্বে ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, এই বিলাসে এবং অপর তিন বিলাসে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য নিহিত আছে। শ্রীশ্রীচৈতন্য-ভাগবত, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও প্রেমবিলাসের রচনার যে তারিখ দেওয়া আছে তাহা যথার্থ মনে করিবার পক্ষে যথেষ্ট যুক্তি আছে। অর্দ্ধ বিলাসটি "অনুবাদ" অর্থাৎ সূচীপত্র মাত্র ; ইহাতে শ্রীজীব গোস্বামীর এবং শ্রীনিবাস আচার্য্যের মধ্যে যে পত্রবিনিময় হইত তাহার দুই চারিটিও অনুবাদ সহ উদ্ধৃত হইয়াছে।

আমার মনে হয় এই পরিশিষ্ট চারি বিলাস কবির অধুনালুপ্ত গ্রন্থ বীরচন্দ্র-চরিত হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। কিংবা এই অংশটিই মূলে বীরচন্দ্রচরিত হইতে পারে। প্রকৃত পক্ষে চতুর্ব্বিংশ বিলাসে একাধিকবার বীরচন্দ্রচরিতের উল্লেখ আছে।

এই সব প্রসঙ্গ আমি অতি বিস্তারিয়া।
বীরচন্দ্রচরিতে রাখিল লিখিয়া ॥
বীরচন্দ্রচরিতে অতি বিস্তারিয়া।
বিবাহ বর্ণিল আমি আনন্দিত হঞা ॥

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে ও সপ্তদশের প্রথমে গৌড়ে বৈষ্ণব ধর্ম্মের দ্বিতীয়-বার বন্যা নামে। শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ প্রভুর প্রচারে কোন বিশিষ্ট মতবাদ বা

sectarianism ছিল না। তিন প্রভুর শিক্ষা বা উপদেশে সর্ব্বজনীনতা ছিল। তাহাদের যে বিশিষ্টতা তাহা ছিল ব্যক্তিগত সাধনপ্রণালীতে। কিন্তু শ্রীনিবাস আচার্য্য নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্যামানন্দ এই তিন মহান্ত এবং তাঁহাদের পশ্চাতে শ্রীমতী জাহ্নবা ঠাকুরাণী এবং বীরচন্দ্র গোস্বামী—এই পাঁচ জনের চেষ্টায় বঙ্গদেশে "বৈষ্ণব ধর্ম্ম" প্রবর্ত্তিত হইল। যেমন নূতন ধর্ম্মে হইয়া থাকে তেমনিই আপামর সাধারণের মধ্যে দীক্ষা কার্য্য চলিতে লাগিল। এই "বৈষ্ণব ধর্ম্ম" প্রচারের ইতিহাস প্রেমবিলাসের মধ্যে যথাসম্ভব যথাযথভাবে পাওয়া যায়। প্রেমবিলাস এক হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস গ্রন্থ। সেই হেতু গ্রন্থটির মূল্য এবং মর্য্যাদা যথেষ্ট আছে।

শুধু শ্রীনিবাস আচার্য্য আদির নহে, প্রেমবিলাসে তিন প্রভু, ছয় গোস্বামী এবং অন্যান্য বৈষ্ণবমহান্তদিগের জীবনীর বহু বহু মূল্যবান্ উপাদান ইহার মধ্যে আছে।

গ্রন্থে বর্ণিত অনেক ব্যাপার কবি চাক্ষুষ দেখিয়াছেন, এবং অনেক ব্যাপার জাহ্নবা দেবী ও বীরচন্দ্র প্রভুর প্রমুখাৎ শুনিয়াছেন।

শ্রীগৌরাঙ্গের শক্তি ধরে মোর ঠাকুরাণী।
লিখিয়াছি যত শ্রীমুখের আজ্ঞা শুনি॥

ঊনবিংশ বিলাসের শেষে কবি লিখিয়াছেন যে, বীরচন্দ্র প্রভুর বৃন্দাবনগমনাদি ঘটনা তিনি বীরচন্দ্রচরিতে বিস্তারিত ভাবে লিখিয়াছেন।

ইথে সূত্রমাত্র আমি বর্ণন করিল।
বীরচন্দ্রচরিতে তাহা বিস্তার লিখিল॥

শ্রীল বীরচন্দ্র প্রভুর বৈরাগ্যের রীতি।
প্রভুর চরিতে আমি লিখিলাম কতি॥

সুতরাং প্রেমবিলাস বীরচন্দ্রচরিতের পর রচিত হয়।

নিত্যানন্দদাসের সরণী অবলম্বন করিয়া গুরুচরণদাস প্রেমামৃত[১] গ্রন্থ রচনা করেন। শ্রীনিবাস আচার্য্যের দ্বিতীয়া পত্নী গৌরপ্রিয়া বা গৌরাঙ্গপ্রিয়া দেবীর আদেশে গ্রন্থটি রচিত হয়। কবি ইহার শিষ্য ছিলেন।

১। ব-সা-প-প ৪, পৃ ২৬৩-৬৪ দ্রষ্টব্য।

আমার ঈশ্বরীর হয় গৌরপ্রিয়া নাম।
কৃপা করি তেঁহ মোরে দিলা আজ্ঞা দান ॥
আমার প্রভুর লীলা গান কর তুমি।
গ্রন্থমতক্রমে কহ আজ্ঞা দিল আমি ॥
… …
নিত্যানন্দদাসের পদধূলি শিরে নিল।
যাঁর গ্রন্থমতে লীলার অনুসার পাইল ॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
প্রেমামৃত গায় সুখে গুরুচরণদাস ॥

জাহ্নবার আজ্ঞাবলে নিত্যানন্দদাস কৈলে
শেষ লীলার বিস্তারবর্ণন।
তাঁর সূত্রমত লঞা গুরুপদস্পর্শ পাঞা
গায় কিছু এ গুরুচরণ ॥

প্রেমামৃত আদি মধ্য ও শেষ এই তিন লীলায় বিভক্ত। আদি লীলায় বৃন্দাবনগমন পর্যন্ত, মধ্যলীলায় গ্রন্থ-চুরি পর্যন্ত এবং শেষ লীলায় গোবিন্দগতি বা গতিগোবিন্দের জন্ম পর্যন্ত আছে।

যদুনন্দনদাস রচিত কর্ণানন্দ[১] বা কর্ণানন্দরস প্রেমবিলাসের উপসংহার বলা যাইতে পারে। কিছু কিছু বিষয় দুই গ্রন্থেই এক, এই কারণে কেহ কেহ কর্ণানন্দের অকৃত্রিমতায় সন্দেহ করেন। যদুনন্দনদাস ছিলেন জাতিতে বৈদ্য। নিবাস কাটোয়ার অনতিদূরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে মালিহাটী গ্রামে। ইনি ছিলেন শ্রীনিবাস আচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য।

বুঁধইপাড়াতে গুরুস্থানে অবস্থানকালীন যদুনন্দন ১৫২৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০৭ সালে বৈশাখী পূর্ণিমার দিনে গ্রন্থ সম্পূর্ণ করেন। হেমলতা দেবী গ্রন্থের নামকরণ করেন।

বুঁধইপাড়াতে রহি শ্রীমতী নিকটে। সদাই আনন্দে ভাসি জাহ্নবীর তটে ॥

১। বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র। দ্বিতীয় সংস্করণ।।

পঞ্চদশ শত আর বৎসর ঊনত্রিশে। বৈশাখ মাসেতে আর পূর্ণিমা দিবসে।
নিজ প্রভুর পাদপদ্ম মস্তকে করিয়া। সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ শুন মন দিয়া॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভুর দাসের অনুদাস। তাঁর দাসের দাস এই যদুনন্দনদাস।
গ্রন্থ শুনি ঠাকুরাণীর মনের আনন্দ। শ্রীমুখে রাখিল নাম গ্রন্থ কর্ণানন্দ॥ ৬॥

কর্ণানন্দ সাতটি নির্য্যাসে সমাপ্ত। প্রথম নির্য্যাসে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শাখা বর্ণন, দ্বিতীয় নির্য্যাসে আচার্য্যের উপশাখা অর্থাৎ আচার্য্যের শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজের হেমলতা দেবীর এবং গতিগোবিন্দের শাখা বর্ণন, তৃতীয় নির্য্যাসে আচার্য্যের শ্রেষ্ঠতম শিষ্য রামচন্দ্র কবিরাজের মহিমা বর্ণন, চতুর্থ নির্য্যাসে বীরহাম্বীরের প্রতি রামচন্দ্র কবিরাজের উপদেশ ও শিক্ষা বর্ণন, পঞ্চম নির্য্যাসে শ্রীজীব গোস্বামীর পত্রিকা প্রেরণ এবং গোপালভট্ট গোস্বামীর সহিত মিলন, ষষ্ঠ নির্য্যাসে শ্রীনিবাস আচার্য্যের মাহাত্ম্য বর্ণন এবং অষ্ট কবিরাজ ও ছয় চক্রবর্ত্তীর বিবরণ, এবং সপ্তম নির্য্যাসে রঘুনাথদাস গোস্বামীর দেহত্যাগ বিষয়ে সংশয়চ্ছেদন।

প্রেমবিলাসে বর্ণিত ঘটনা গ্রন্থকার যখনই উল্লেখ করিযাছেন তখনই অতি সংক্ষেপে সারিযাছেন।

যে প্রকারে গৌড়দেশে গমন করিলা। প্রেমবিলাস গ্রন্থ মাঝে বিস্তারি বর্ণিলা॥
লিখিলেন সেই গ্রন্থ জাহ্নবা-আদেশে। গ্রন্থ প্রকাশিলা তাহা নিত্যানন্দদাসে॥ ৬॥

যাহারা মনে করেন যে, কর্ণানন্দ প্রেমবিলাসের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ মাত্র এবং অতএব নিতান্ত অর্ব্বাচীন তাঁহারা ভ্রান্ত। ইহাতে অনেক কিছু নূতন আছে। আর হেমলতা দেবী প্রভৃতি আচার্য্যের প্রধান প্রধান শিষ্যদিগের শাখাবর্ণন যে আবশ্যক ছিল তাহা নিত্যানন্দদাসও উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। এই অভাব পূরণের জন্য এবং আচার্য্যের শিষ্যদিগের সাধনপ্রণালীর কতকটা আভাষ দিবার জন্য কর্ণানন্দ রচিত হইয়াছিল।

জ্যেষ্ঠা হেমলতা মধ্যমা কৃষ্ণপ্রিয়া হয়।
কাঞ্চনলতিকা কন্যা কনিষ্ঠা কহয়॥

ইহাদের শাখা উপশাখা হবে যত।
ভাগ্যবন্ত জনে তাহা করিবে বেকত ॥ ২০ ॥

গ্রন্থের ভণিতা এইরূপ—

আচার্য্য প্রভুর কন্যা শ্রীল হেমলতা।
প্রেমকল্পবল্লী কিবা নিরমিল ধাতা ॥
সে দুই চরণপদ্ম হৃদয়ে বিলাস।
কর্ণানন্দরস কহে যদুনন্দনদাস ॥

যদুনন্দনের অপর রচনার পরিচয় পরে দেওয়া যাইতেছে।

শ্রীচৈতন্যের অনুচর বংশীবদন চট্ট শ্রীকৃষ্ণের বংশীর অবতার বলিয়া বৈষ্ণব গোস্বামিগণ কর্ত্তৃক উক্ত হইয়াছেন। বংশীবদনের জ্যেষ্ঠ পৌত্র রামচন্দ্র বা রামাইকে নিত্যানন্দ প্রভুর কনিষ্ঠা পত্নী জাহ্নবা দেবী পুত্র ও শিষ্যরূপে গ্রহণ করেন। রামচন্দ্রের ভ্রাতুষ্পুত্র এবং শিষ্য রাজবল্লভ বংশীবিলাস[১] বা মুরলীবিলাস[২] গ্রন্থে স্বীয় গুরু ও জ্যেষ্ঠতাতের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। গ্রন্থটিতে লিপিকাল নাই। তবে বংশীবদন পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ দশকে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, সুতরাং রাজবল্লভ ষোড়শ শতাব্দীর একেবারে শেষে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে গ্রন্থটি রচনা করিয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। প্রেমদাস বংশীশিক্ষায় রাজবল্লভ-রচিত বংশীবিলাসের উল্লেখ করিয়াছেন।

রাজবল্লভের বংশপরিচয় এইরূপ—ছকড়ি চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র বংশীবদন, তৎপুত্র চৈতন্যদাস ও নিতাই, চৈতন্যদাসের পুত্র রামচন্দ্র (রামাই) ও শচীনন্দন, শচীনন্দনের পুত্র রাজবল্লভ।

মুদ্রিত মুরলীবিলাস একুশ পরিচ্ছেদে পরিসমাপ্ত। নিম্নে পরিচ্ছেদ ধরিয়া বিস্তৃত বিষয়সূচী দেওয়া গেল।

১। বংশীশিক্ষা-রচয়িতা প্রেমদাস বইটিকে "বংশীবিলাস" বলিয়াছেন, এবং ইহা হইতে একটি পদও উদ্ধৃত করিয়াছেন [পৃ ১৯৭-৯৮]।

২। নীলকান্ত গোস্বামী ও বিনোদবিহারী গোস্বামী কর্ত্তৃক ব্যাখ্যাত ও সংশোধিত, সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক শ্রীপাট বাঘনাপাড়া হইতে প্রকাশিত (চৈতন্যাব্দ ৪০৯)। প্রকাশিত পুস্তকটিতে আধুনিক হস্তক্ষেপের চিহ্ন যথেষ্ট বিদ্যমান আছে।

প্রথম পরিচ্ছেদে—বন্দনা, রামচন্দ্রের মাহাত্ম্য : বাঘ তাড়াইয়া বাঘনাপাড়া গ্রামে পত্তন, মাঘ মাসের মধ্যরাত্রে বারশত নেড়াকে কচি আম আর ইলিস মাছের ঝোল খাওয়ান ; অপ্রকটের পূর্ব্বে বংশীবদন কর্ত্তৃক তাঁহার পুত্রবধূর গর্ভে পুনরায় আবির্ভূত হইবেন এই বরদান, শ্রীকৃষ্ণের বংশীর মহিমা, শ্রীরাধা ও অষ্ট সখীর ব্রজধামে আবির্ভাব, শ্রীকৃষ্ণের মুরলীপ্রাপ্তি। দ্বিতীয় পরিচ্ছেদে—রাধাকৃষ্ণ-রসতত্ত্ব, বংশীমহিমা, শ্রীচৈতন্যাবতারহেতু, বংশীবদনরূপে শ্রীকৃষ্ণের বংশীর অবতার, বংশীবদনের পিতামাতার পরিচয়, বংশীবদনের জন্ম। তৃতীয় পরিচ্ছেদে—বংশী-বদনের নামকরণ, বাল্যলীলা, বিবাহ, শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস ও নীলাচল গমন, বংশীবদনের পিতা ছকড়ি চট্টের তিরোধান, বংশীবদনের দুই পুত্রের বিবাহ, শ্রীচৈতন্যের তিরোভাব শুনিয়া বংশীবদনের তিরোভাব, চৈতন্যদাসের স্ত্রীর গর্ভে আবির্ভূত হইবেন বলিয়া বরদান, জাহ্নবা দেবীর আগমন ও চৈতন্যদাসের নিকট পুত্রভিক্ষা, রামচন্দ্রের জন্ম। চতুর্থ পরিচ্ছেদে—রামচন্দ্রের শৈশব ও কৈশোর, শচীনন্দনের জন্ম, জাহ্নবা দেবী ও চৈতন্যদাসের তত্ত্বালোচনা, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আগমন, চৈতন্যদাসের নিকট জাহ্নবাদেবীর রামচন্দ্রকে ভিক্ষা, জাহ্নবা দেবী কর্ত্তৃক রামচন্দ্রকে ও শচীনন্দনকে দীক্ষাদান, পিতামাতার নিকট বিদায় লইয়া রামচন্দ্রের জাহ্নবী দেবীর সহিত খড়দহ যাত্রা, পথে গঙ্গাতীরে জনৈক ধনী বণিক্ কর্ত্তৃক বৈষ্ণব ভোজন, জাহ্নবা দেবীর অনুসন্ধানে বীরচন্দ্রের বহির্গমন, পথে উভয়ের মিলন। পঞ্চম পরিচ্ছেদে—পথে সেই গ্রামে স্থিতি, জাহ্নবা দেবী কর্ত্তৃক রন্ধন ও ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব ভোজন, খড়দহে আগমন, শ্রীপাট খড়দহের বর্ণনা। ষষ্ঠ হইতে অষ্টম পরিচ্ছেদে—খড়দহে দিনকৃত্য বর্ণনা, জাহ্নবা দেবী কর্ত্তৃক রামচন্দ্রকে বৈষ্ণব রসতত্ত্ব শিক্ষাদান, বৃন্দাবনমাহাত্ম্য, গৌরগণোদ্দেশ, শ্রীগৌরাঙ্গের রূপ বর্ণনা। নবম পরিচ্ছেদে—শ্রীগৌরাঙ্গের হুঙ্কারে শ্রীকৃষ্ণের বংশীর বংশীবদনরূপে অবতার, বংশীবদনের অপ্রকটের পূর্ব্বে পুত্রবধূকে বরদান, রামচন্দ্র-রূপে জন্মগ্রহণ করিবার হেতু, রামচন্দ্রকে বৃন্দাবন যাইতে আদেশ, শ্রীরাধার সখীবৃন্দের অন্যতম অনঙ্গমঞ্জরীর জাহ্নবারূপে অবতার, জাহ্নবা দেবী কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের রাগমঞ্জরী নামকরণ, মাঘ হইতে বৈশাখ মাস পর্য্যন্ত খড়দহে স্থিতি,

রামচন্দ্রের গৌড়দেশ ভ্রমণ করিয়া বৈষ্ণব মহান্ত দর্শনের আকাঙ্ক্ষা, রামচন্দ্রের পিতামাতার কাতরতা হেতু রামচন্দ্রকে গৃহে ফিরিয়া বিবাহ করিতে উপদেশ, রামচন্দ্রের অস্বীকৃতি, গৌড়ভ্রমণে অনুমতি, বীরচন্দ্র কর্তৃক যাত্রার আয়োজন, বীরচন্দ্র ও রামচন্দ্রের তত্ত্বালোচনা। দশম পরিচ্ছেদে—বনমালী দাস ফৌজদার ও পরমেশ্বরদাসের সঙ্গে রামচন্দ্রের গৌড় ভ্রমণে যাত্রা, পাণিহাটীতে রাঘব পণ্ডিতের সহিত মিলন, গঙ্গা পার হইয়া পথে কৃষ্ণদাস চৌধুরী কর্তৃক মহোৎসব, পরমেশ্বরের সহিত রামচন্দ্রের কথোপকথন, রেমুনায় ক্ষীরচোর-গোপীনাথ দর্শন, সাক্ষীগোপাল দর্শন, নীলাচলে আগমন, জগন্নাথ দর্শন, পণ্ডিত গোসাঞির সহিত মিলন, তাঁহার কুটীরে ভোজন ও বিশ্রাম। একাদশ পরিচ্ছেদে —পণ্ডিত গোস্বামীর সঙ্গে শ্রীচৈতন্যের লীলাস্থল দর্শন, কাশীমিশ্রের সহিত মিলন, তাঁহার গৃহে ভোজন ও স্থিতি, গোপীনাথ দর্শন, গুণ্ডিচা দর্শন, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবর দর্শন, হরিদাসের সদন দর্শন, রামানন্দ রায়ের সহিত মিলন ও তাঁহার নিকট "পহিলহি রাগ নয়নভঙ্গ ভেল" এই পদের অর্থ শ্রবণ, রায় কর্তৃক বৃন্দাবন যাইতে উপদেশ, স্বরূপ গোস্বামীর কড়চা লিখিয়া লওন, গদাধর পণ্ডিত স্থানে শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন, বর্ষা চারি মাস থাকিয়া রথযাত্রাদি দর্শন। দ্বাদশ পরিচ্ছেদে—স্বদেশ যাত্রা, নবদ্বীপে আগমন, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর দর্শন, পিতামাতা ও ভ্রাতার সহিত মিলন, খড়দহে মহাপ্রসাদ পাঠান, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর নিকট নীলাচলভ্রমণ কাহিনী বর্ণন, পিতামাতা কর্তৃক বিবাহের উদ্যোগ, রামচন্দ্রের অস্বীকৃতি, পিতার সহিত কথোপকথন, জাহ্নবা দেবীর নিকট গমন করিতে পিতা ও মাতার নিকট অনুমতি প্রার্থনা, শচীনন্দনের বিবাহ দিতে মাতাপিতাকে অনুরোধ, বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা, খড়দহ যাত্রা, পথে শান্তিপুরে সীতাদেবী অচ্যুতানন্দ ইত্যাদির সহিত মিলন। ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদে—শান্তিপুরে দশ দিন থাকিয়া অম্বিকা গমন, গৌরীদাস কর্তৃক চৈতন্যনিতাই বিগ্রহপ্রতিষ্ঠা কাহিনী, গৌরীদাস পণ্ডিতের সহিত মিলন, অম্বিকায় দুই দিন অবস্থান, খানাকুল যাত্রা, পরমেশ্বরদাস কর্তৃক অভিরাম গোপালের পূর্ব্বকথা বর্ণন, শ্রীদামের খানাকুলে আবির্ভাব, তাঁহার মহিমা, নিত্যানন্দ প্রভু কর্তৃক অভিরাম গোপাল নাম প্রদান, অভিরামের সহিত রামচন্দ্রের

মিলন, দিন তুই চারি থাকিয়া শ্রীখণ্ডে গমন, তথায় নরহরি দাস ঠাকুর ও রঘুনন্দনের সহিত মিলন, তথায় দিন তুই থাকিয়া অন্যস্থানে গমন, এইরূপে তুই মাস গৌড় ভ্রমণ করিয়া মাঘ মাসে খড়দহে প্রত্যাবর্ত্তন। চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদে—গৌড় ভ্রমণে প্রাপ্ত অর্থাদি যথাযোগ্য বণ্টন, সন্ধ্যায় শ্যামসুন্দর মন্দিরে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক পদকীর্ত্তন, সকলের নিকট নীলাচল ও গৌড় ভ্রমণ বর্ণনা, জাহ্নবা দেবী কর্ত্তৃক বীরচন্দ্রের নিকট রামচন্দ্র ও উদ্ধারণ দত্তের সহিত বৃন্দাবন গমন করিবার সম্মতি প্রার্থনা, বীরচন্দ্রকে সঙ্গে যাইতে নিষেধ, রামচন্দ্র ও উদ্ধারণ দত্তের সহিত জাহ্নবা দেবীর মাঘ মাসে বৃন্দাবন যাত্রা, যাত্রার প্রাক্‌কালে বীরচন্দ্রকে উপদেশ প্রদান। পঞ্চদশ পরিচ্ছেদে—রাজপত্রী লেখাইয়া লইবার জন্য বীরচন্দ্রের গৌড় পর্য্যন্ত অনুগমন, উদ্ধারণের জিম্মায় রাজপত্রী ও রামচন্দ্রের হস্তে পাথেয় প্রদান, জাহ্নবা দেবী রামচন্দ্রাদির গয়া গমন ও তিন দিন স্থিতি, কাশী গমন, চন্দ্রশেখরের সহিত মিলন ও তিন দিন স্থিতি, প্রয়াগ গমন, অযোধ্যা পরিভ্রমণ, রামলীলাতত্ত্ব, রামচন্দ্রের রাস বর্ণন, অযোধ্যায় চারি দিন স্থিতি, পঞ্চম দিনে সরযূতে স্নান, মথুরা গমন, রাত্রি যাপন করিয়া পরদিন শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থলী ও লীলা স্থানাদি দর্শন, জাহ্নবা দেবীর আগমন বার্ত্তা পাইয়া তাঁহাকে বৃন্দাবনে আনিবার জন্য গোস্বামিগণ কর্ত্তৃক শ্রীজীবকে প্রেরণ, বিশ্রাম ঘাটে শ্রীজীবের সহিত মিলন, বৃন্দাবনে শ্রীরূপের সদনে আগমন। ষোড়শ পরিচ্ছেদে—শ্রীরূপ ইত্যাদি বৈষ্ণববৃন্দের সহিত মিলন, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক শ্রীরূপের প্রশংসা, শ্রীসনাতন ও শ্রীদাস গোস্বামীর সহিত মিলন, শ্রীগোবিন্দ দর্শন, শ্রীরূপের কুটীরে জাহ্নবা দেবীর রন্ধন, শ্রীরাধাগোবিন্দে নিবেদন এবং প্রসাদ গ্রহণ, উপস্থিত বৈষ্ণবদিগের নাম, রঘুনাথ দাসের ভাগবত পাঠ, শ্রীরূপের অনুরোধে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক ভাগবত ব্যাখ্যা, গোবিন্দের আরতি দর্শন, তুই চারি দিবস পরে শ্রীসনাতনের সঙ্গে দ্বাদশ-আদিত্যে তাঁহার কুটীরে গমন শ্রীমদনগোপাল দর্শন, জাহ্নবা দেবীর রন্ধন, শ্রীমদনগোপালে নিবেদন এবং প্রসাদ ভক্ষণ, জাহ্নবী দেবী কর্ত্তৃক সন্ধ্যায় শ্রীমদনগোপালের আরতি, শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপ কর্ত্তৃক গোবিন্দ, গোপীনাথ ও মদনগোপাল বিগ্রহ প্রাপ্তির বিবরণ, শ্রীরাধারমণ কুঞ্জে গমন ও শ্রীগোপাল ভট্টের সহিত মিলন, সেখানে রন্ধনাদি

বৃন্দাবন পরিদর্শন, দুই মাস পরে শ্রীসনাতন ও শ্রীরূপের সঙ্গে কাম্যবনে গোপীনাথ দর্শন, তথায় জাহ্নবা দেবী কর্ত্তৃক রন্ধন শ্রীগোপীনাথকে নিবেদন ও প্রসাদ গ্রহণ, সন্ধ্যায় প্রদক্ষিণ করিবার কালে শ্রীগোপীনাথ কর্ত্তৃক জাহ্নবা দেবীর বস্ত্রাঞ্চল আকর্ষণ। সপ্তদশ পরিচ্ছেদে—শ্রীগোপীনাথের মন্দিরে জাহ্নবা দেবীর তিরোভাব, শ্রীরূপ কর্ত্তৃক জাহ্নবাষ্টক পাঠ, শ্রীসনাতন ও অন্যান্য বৈষ্ণবমহান্ত কর্ত্তৃক জাহ্নবা দেবীর উদ্দেশে স্তুতিনতি, সাতদিন ধরিয়া মহোৎসব, উদ্ধারণ দত্তের মারফৎ বীরচন্দ্রকে সংবাদ প্রেরণ, উদ্ধারণের খড়দহে আগমন ও সংবাদজ্ঞাপন এবং ভ্রমণ কাহিনী বর্ণন, সকলের কাতরতা, বীরচন্দ্রের পত্নী সুভদ্রা দেবী কর্ত্তৃক শত শ্লোকাত্মক অনঙ্গকদম্বাবলী রচনা, ইহার সংক্ষিপ্তসার। অষ্টাদশ পরিচ্ছেদে—রামচন্দ্রের কাম্যবনে স্থিতি, জাহ্নবা দেবী কর্ত্তৃক স্বপ্নে গৌড়ে ফিরিতে আদেশ, স্বপ্নে নিত্যানন্দ প্রভুকে ও পুনরায় জাহ্নবা দেবীকে দর্শন, যমুনায় কৃষ্ণ বলরাম মূর্ত্তিদ্বয় প্রাপ্তি, শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতনের উপদেশ, শ্রীদাস গোস্বামী ও শ্রীগোপাল ভট্ট গোস্বামীর নিকট গমন, কাম্যবনে গোস্বামিদিগের আগমন, সকলের নিকট বিদায় লইয়া মূর্ত্তি দুইটি কাপড়ের ভিতর লুকাইয়া লইয়া গৌড যাত্রা, চিত্রকূট পথে প্রয়াগে আগমন, তথা হইতে বারাণসী, হাজীপুর এবং অবশেষে কণ্টক নগর (কাটোয়া)। উনবিংশ পরিচ্ছেদে—কাটোয়া ছাড়াইয়া কতক দূর অগ্রসর হইয়া এক অরণ্য, তথায় স্থিতি, ব্যাঘ্রের আগমন, ব্যাঘ্রকে উপদেশ, ব্যাঘ্রের মুক্তি, তথায় বাঘনাপাড়া গ্রামের পত্তন, বিগ্রহদ্বয় প্রতিষ্ঠা, মহোৎসব, রামচন্দ্রের খ্যাতি প্রতিপত্তি, স্বপ্নে মহেশপার্ব্বতীর দর্শন, দেবীর আদেশে বার্ষিক (শারদীয়া ?) পূজা স্থাপন ও শিবলিঙ্গ প্রতিষ্ঠা, জনৈক বৈষ্ণবের নিকট বীরচন্দ্র কর্ত্তৃক রামচন্দ্রের কীর্ত্তি শ্রবণ, রামচন্দ্রকে পরীক্ষা করিবার জন্য বীরচন্দ্র কর্ত্তৃক তাঁহার নিকট শীতকালের রাত্রে বার শত নাড়া প্রেরণ, তাহাদের কথামত মাঘ মাসের রাত্রি দ্বিপ্রহরে ইলিশ মাছ ও কচি আমের ঝোল খাওয়ান, বীরচন্দ্রের নিকট প্রত্যাগমন করিয়া নাড়াদিগের রামচন্দ্রকে প্রশংসা ও রামচন্দ্রের লিখিত পত্র প্রদান, রামচন্দ্রের লজ্জায় দেখা না করিবার কারণ বুঝিয়া বীরচন্দ্রের বাঘনাপাড়া যাত্রা, পথে শান্তিপুরে একদিন বিশ্রাম, রামচন্দ্রের সহিত

মিলন। বিংশ পরিচ্ছেদে—বীরচন্দ্রের নিকট রামচন্দ্রের বৃন্দাবনভ্রমণ বর্ণন, রাত্রিতে পুনরায় সেই আলাপ, রামচন্দ্র কর্তৃক আনীত পুস্তকচতুষ্টয়ের মধ্যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গ্রন্থ প্রদর্শন, রামচন্দ্র কর্ত্তৃক ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ব্যাখ্যা, তথায় দেড় মাস থাকিয়া সেই গ্রন্থ আস্বাদন, রামচন্দ্রের বৃন্দাবন ত্যাগের বর্ণন, তাঁহার হস্তে শ্রীরূপ ও শ্রীসনাতন কর্ত্তৃক চারি গ্রন্থ প্রচারার্থ গৌড়দেশে প্রেরণ, বীরচন্দ্রের খড়দহ প্রত্যাবর্ত্তন, শচীনন্দনের নিকট রামচন্দ্র কর্ত্তৃক বৈষ্ণব প্রেরণ, রাজবল্লভাদির সহিত শচীনন্দনের বাঘনাপাড়া আগমন। শচীনন্দন কর্ত্তৃক মাতাপিতৃবিয়োগ সংবাদ জ্ঞাপন, শচীনন্দনের উপর বিগ্রহ সেবার ভার অর্পণ, মহোৎসব। ভ্রাতৃদ্বয়ের পরস্পর কথোপকথন, রাজবল্লভকে তথায় রাখিয়া শচীনন্দনের নবদ্বীপে প্রত্যাবর্ত্তন, রাজবল্লভের দীক্ষা ও শিক্ষা, মীনকেতন ও মাধবদাস কায়স্থ দ্বারা ব্রজধাম হইতে শ্রীরাধা ও রেবতী মূর্ত্তি আনয়ন, মূর্ত্তিদ্বয় প্রতিষ্ঠা উপলক্ষ্যে মহোৎসব, বীরচন্দ্র, অচ্যুতানন্দ, অভিরাম গোপাল, রঘুনন্দন, গৌরীদাস প্রভৃতির বাঘনাপাড়া আগমন, আগত বৈষ্ণবদিগের পরিচর্য্যা, সাত দিন ধরিয়া মহোৎসব। একবিংশ পরিচ্ছেদে—গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি গুরু রামচন্দ্রের নিকট রাগানুগাভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা, গ্রন্থানুবাদ, সাধুপ্রশংসা, রামচন্দ্রের শাখা বর্ণন, রামচন্দ্রের শেষ দশায় ভক্তিবিহ্বলতা, মহোৎসব আরম্ভ করিতে রাজবল্লভের প্রতি রামচন্দ্রের আদেশ, রামচন্দ্রের তিরোভাব।

মুরলীবিলাস শ্রেণীর মহান্তচরিতমাহাত্ম্য গ্রন্থে অলৌকিক ঘটনা ইত্যাদির অবতারণা থাকিবেই, তৎসত্ত্বেও এই সকল গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য একেবারে উড়াইয়া দেওয়া চলে না। মুরলীবিলাসও যোড়শ শতাব্দীর বৈষ্ণব ইতিহাসের পক্ষে বিশেষ মূল্যবান্। প্রেমবিলাস, ভক্তিরত্নাকর ইত্যাদির মত ইহাতেও অবশ্য পরলোকগত মহান্ত অনেক সময় জীবিত বলিয়া অথবা জীবিতের মত বর্ণিত হইয়াছে। এই জন্য সকল গ্রন্থের উক্তি বিশেষ করিয়া যাচাইয়া লইতে হয়। মুরলীবিলাস হইতে আমরা যে দুই একটি নূতন কথা জানিতে পারি তাহা এখানে নির্দ্দেশ করিয়া দিলাম। গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্ম্মের ইতিহাসে ইহা নূতন আলোকপাত করিতে পারে।

অভিরাম গোপালের পত্নী মালিনীকে লোকে ম্লেচ্ছ বা নীচ জাতীয়া মনে করিত। ইঁহাকে অনাথ দেখিয়া অভিরাম পথ হইয়া কুড়াইয়া নিজের সঙ্গিনী করিয়া লয়েন। অভিরামের আসল নাম ছিল অন্য ; নিত্যানন্দ প্রভু ইঁহার নাম অভিরাম গোপাল রাখেন।

শ্রীমতী মালিনী খেলে শিশুর সংহতি। তাঁরে দেখি চিনি ডাকি লইলা সুমতি ॥
তিঁহ পাছে চলি যান আগেতে শ্রীদাম। নদী পার হৈয়া আইলা খানাকুল গ্রাম ॥
... ...
মালিনী সহিত আসি কদম্বের তলে। তিন দিন রহে তবু কিছু নাহি বলে ॥
... ...
সর্ব্বলোকে বলে হেন নাহি দেখি কভু। কোথা হইতে উপনীত হৈলা মহাপ্রভু ॥
যবনদুহিতা বলি মালিনী মানিনু। এহ কোন দেবকন্যা প্রত্যক্ষে দেখিনু ॥
... ...
দেখিয়া সন্তুষ্ট প্রভু তাঁহারে ডাকিয়া। অভিরাম গোপাল নাম দিলেন হাসিয়া ॥
পৃ ২৩৬-৩৭ ॥

বীরচন্দ্রের পত্নীর নাম সুভদ্রা দেবী। জাহ্নবা দেবীর তিরোধানের কথা শুনিয়া ইনি শতশ্লোকাত্মক অনঙ্গকদম্বাবলী নামে জাহ্নবা দেবীর স্তোত্র রচনা করেন। ইহা হইতে একটি শ্লোক মুরলীবিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে। শ্লোকটি এই—

বন্দেঽহং তব পাদপদ্মযুগলং মৎপ্রাণদেহাস্পদং
সত্যং ব্রূমি কৃপাময়ি ত্বদপরং তুচ্ছং ত্রিলোক্যাস্পদম্।
শ্রীলশ্রীচরণারবিন্দমধুপো মন্মানসং নেচ্ছতি
হা মাতঃ করুণালয়ে তব পদে দাস্যং কদা যাস্যতি ॥ পৃ ৩২৩ ॥

কবিতাটির মর্ম্মার্থ অল্পকথায় রাজবল্লভ বর্ণনা করিয়াছেন।

এই মত বহুবিধ প্রলাপ কহিলা। শ্রীমতী সুভদ্রা দেবী স্বাক্ষরে লিখিলা ॥
অনঙ্গকদম্বাবলী শুভসংজ্ঞা যাঁর। শুনিয়া মধুর প্রেমতত্ত্বের ভাণ্ডার ॥
একশত শ্লোকে বস্তুতত্ত্বনিরূপণ। অজ্ঞ জীব তাহা কাঁহা করে নির্দ্ধারণ ॥
সংক্ষেপ করিয়া কহি মন বুঝাইয়া। অবজ্ঞা না করি সবে শুন মন দিয়া ॥
পৃ ৩২৩-২৪ ॥

বিশেষ ঐতিহাসিক মূল্য থাকায় মুরলীবিলাস হইতে রামচন্দ্রের শাখাবর্ণন অংশটি সমগ্রভাবে উদ্ধৃত করিয়া দেওয়া গেল।

ঠাকুর রামের শাখা করিয়ে গণন। সংক্ষেপে লিখিয়ে তাহা শুন সর্ব্বজন॥
পুরী হৈতে যবে খড়দহেতে আইলা। সঙ্গে দুই ভৃত্য আইলা সেবার লাগিয়া॥
সেই দুই শিষ্য করি সঙ্গেতে রাখিলা। প্রভু সঙ্গে সেই দুই বৃন্দাবনে গেলা॥
বিপ্রকুলে জন্ম এক নাম হরিদাস। ঠাকুরের কুটুম্ব পড়ুয়া সঙ্গে বাস॥
আর এক শূদ্র কায়স্থকুলে জন্ম। কৃষ্ণদাস নাম তার জানে প্রভুমর্ম্ম॥
এই দুই শাখা বড় প্রভু-অন্তরঙ্গ। যাঁহার প্রসাদে জানি এ সব প্রসঙ্গ॥
যারে সমর্পিয়া প্রভু দিলেন আমারে। যাঁর আজ্ঞাবলে গ্রন্থ লিখিয়ে বিচারে॥

তথাহি কবীন্দ্রস্য কাব্যে

শ্রীরাজবল্লভো দেবষ্ঠক্কুরো হরিরেব চ। বড়ুশ্রীগোকুলানন্দো বৈরাগী চ তথা মতঃ॥
ঠক্কুরো হরিদাসশ্চ কৃষ্ণদাসস্তথৈব চ। রামচন্দ্রশ্চ রামস্য শাখা হ্যষ্টৌ প্রকীর্ত্তিতাঃ॥
এই ত কহিনু তাঁর শাখার নির্ণয়। বিশেষ করিয়া সবা দিই পরিচয়॥
সঙ্গেতে রহেন সদা দুই উদাসীন। সদা সেবাকার্য্যে রত মায়াগন্ধহীন॥
তৃতীয়ে আমিহ এক দিই তাঁর দায়। গুরুধর্ম্ম নাহি পালি ফিরিয়ে মায়ায়॥
চতুর্থে ঠাকুর হরি মহাভাগ্যবান্। বিপ্রবংশোদ্ভব যিঁহ পরম বিদ্বান্॥
যিঁহ দীক্ষাকালে বসি তিলক করিতে। গুরু আজ্ঞা উঠি আইলা অর্দ্ধতিলকেতে॥
উপাসনা করি শেষে নিবেদন কৈল। আজ্ঞা বলে সে তিলক অমনি রহিল॥
বহুদিন সেবা করি রহি প্রভু পাশ। প্রভু আজ্ঞা মতে শেষে পাণিগড়ে বাস॥
তার শাখা প্রশাখার কত লব নাম। পঞ্চমে ঠাকুর বড়ু মহাভাগ্যবান্॥
শিষ্য হৈয়া ঠাকুরের বহু সেবা কৈলা। আজ্ঞাক্রমে মুনসবপুরে নিবসিলা॥
বহু শাখা শিষ্য তাঁর কত লব নাম। ষষ্ঠেতে গোকুলানন্দ সর্ব্বগুণধাম॥
আকুমারব্রতচারী মহিমা অপার। আশ্চর্য্য ভজন অলৌকিক ব্যবহার॥
প্রভুর সঙ্গেতে রহি কৈল বহু সেবা। প্রভু আজ্ঞা কৈল তাঁরে ব্রজেতে যাইবা॥
একদিন পরিক্রমা করিতে আপনি। প্রত্যাদেশ কৈলা শ্রীবিনোদবিনোদিনী॥

সে শ্রীবিগ্রহ লই আইলা প্রভু পাশ। পুনঃ আজ্ঞা হৈল কর সেবা পরকাশ।
ভ্রমিয়া বেড়ায় তিঁহ মূর্ত্তি লয়ে সাথে। মল্লভূমে কাঁটাবনী নিবসে তাহাতে ॥
সদা কৃষ্ণসেবারত লীলাদি চিন্তন। কৃষ্ণনামপ্রেম দিয়া তারিল ভুবন ॥
সংক্ষেপে কহিনু গোকুলানন্দ-মহত্ত্ব। সপ্তম শাখার এবে শুন কহি তত্ত্ব ॥
ধামাসে নিবাস বিপ্রকুলে জন্ম তাঁর। রামচন্দ্র নামে খ্যাত অতি সুকুমার ॥
গঙ্গাস্নানে আসি কৈলা প্রভুরে দর্শন। দোঁহারে হেরিয়ে দুঁহু হরিলেক মন ॥
দীক্ষামন্ত্র দিলা প্রভু তাঁরে সমাদরি। ঠাকুরের সঙ্গে আইলা সর্ব্বকর্ম্ম ছাড়ি
ধর্ম্মশিক্ষা সেবা কার্য্য কৈল কতদিন। প্রভু আজ্ঞা দিলা নাহি হও উদাসীন।
তব পিতামাতা তোমা লয়ে যেতে চায়। ঘরে গিয়া বিভা কর ভজ কৃষ্ণ-পায় ॥
রামচন্দ্র কহে মায়া বান্ধিলে গলাতে। ভজন যজন সব যাক অধঃপাতে ॥
ঠাকুর কহেন হেন কহ কি বলিয়া। ইহার প্রমাণ কহি শুন মন দিয়া ॥

তথাহি

পুঙ্খানুপুঙ্খবিষয়েষ্বনুতৎপরোঽপি
ধীরো ন মুহ্যতি মুকুন্দপদারবিন্দম্।
সঙ্গীতনৃত্যযতিতালবশং গতাপি
মৌলিস্থকুম্ভপরিরক্ষণধীর্নটীব ॥

নানাবিধ বিষয়েতে করিয়া মনন। মুকুন্দপদারবিন্দে বুদ্ধিমন্ত মন ॥
নটী যেন কুম্ভশিরে করয়ে নর্ত্তন। বাদ্যতালে নাচে কিন্তু কুম্ভে তার মন
শ্লোক শুনি রামচন্দ্র চরণ ধরিয়া। রোদন করিল বহু ধরণী লোটাঞা ॥
ঠাকুর কহেন বাপু না কর রোদন। প্রসন্ন হউন সদা শ্রীনন্দনন্দন ॥
অতি যত্ন কবি কৃষ্ণে কর আরাধন। জন্মিবে তোমার বংশে কৃষ্ণভক্তগণ ॥
বর শুনি রামচন্দ্র করিয়া প্রণাম। নিজালয়ে যাত্রা কৈল পিতা আগুয়ান ॥
সদাই বিষণ্ণমতি অভীষ্টবিয়োগ। কতদিনে পিতা মাতা গত পরলোক ॥
কৃত কর্ম্ম করি পরে হৈল উদাসীন ভাবিতে ভাবিতে যাত্রা করিল পশ্চিম ॥
দামোদর পার হৈয়া আইল মল্লভূমে। ক্রমে ক্রমে আসি উত্তরিল তপোবনে ॥
সেই বনে ছিল পূর্ণানন্দ ব্রহ্মচারী। রামের মাতুল সবে বলিল আদরি ॥

পূর্ণানন্দ রামচন্দ্রে করাইল বিভা। তথা প্রকাশিলা কত শক্তির প্রতিভা॥
শ্রীকৃষ্ণবৈষ্ণব সেবা তথা আরম্ভিলা। শাখা সূত্র করি কত জীব নিস্তারিলা॥
এই ত কহিনু রামচন্দ্র-বিবরণ। অষ্টম শাখার এবে কহিব লক্ষণ॥
ঠাকুর বৈরাগী গুরুভক্তিপরায়ণ। পরম উদার সর্ব্বশাস্ত্রবিচক্ষণ॥
প্রভুর আজ্ঞায় যিঁহ কৃষ্ণনাম দিয়া। তারিল অনেক জীব ভক্তি আচরিয়া॥
এই অষ্ট শাখা শ্রেষ্ঠ করিল গণন। এই মতে প্রশাখাতে ভরিল ভুবন॥
সংক্ষেপে লিখিনু ভক্ত মহিমা অপার। সবারে বন্দহোঁ গুরু সবাই আমার॥
গুরুর কৃপাতে ইথে কিছু ভেদ নাই। পাত্রাপাত্রভেদ তরতম নাহি পাই॥
পৃ ৪২২-২৮॥

রাজবল্লভ তাঁহার গ্রন্থে যে রাধাকৃষ্ণলীলারসতত্ত্ব বর্ণনা করিয়াছেন তাহা স্পষ্টতঃ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত অনুসারে। এই গ্রন্থ কবির উত্তমরূপে পড়া ছিল। মুরলী-বিলাসের একস্থলে চৈতন্যচরিতামৃতের উল্লেখও করা হইয়াছে।

এসব নিগূঢ় কথা সর্ব্বত্র না পাই।
চৈতন্যচরিতামৃতে লিখিলেন তাই॥ পৃ ৩০॥

মুরলীবিলাসের ভাষা সরল, কবিত্ব চলনসই। কবির ভণিতা এইরূপ—

জাহ্নবা-রামাই-পাদপদ্মে অভিলাষ।
এ রাজবল্লভ গায় মুরলীবিলাস॥

মুরলীবিলাসে রাজবল্লভ রচিত তিনটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।[১] প্রথম পদ দুইটি গৌরপদতরঙ্গিণীতে সঙ্কলিত হইয়াছে।[২] ইহাতে একটি হরিদাস ভণিতাযুক্ত এবং একটি ভণিতাহীন পদও উদ্ধৃত হইয়াছে।[৩]

শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গতিগোবিন্দ প্রণীত বীররত্নাবলী[৪] নামে একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ আছে। মুখবন্ধ ব্যতিরেকে গ্রন্থটি চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত। বক্তব্য বিষয় হইতেছে, নিত্যানন্দ প্রভুর পুত্র বীরচন্দ্র কর্ত্তৃক বিষ্ণুপুরে গুপ্তবৃন্দাবন নামে বৃন্দাবনের অনুকরণে কুঞ্জমন্দিরাদি স্থাপন এবং বীরহাম্বীরকে শিক্ষা প্রদান।

১। পৃ ৪০-৪২, ৫১-৫৩, ৪০৩। ২। HBL, পৃ ৪২৭। ৩। পৃ ৪০২, ৪০১।
৪। বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্ত্তৃক বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী মধ্যে প্রকাশিত। প্রকাশিত সংস্করণটিতে ছাড়বাদ থাকা অসম্ভব নহে।

গ্রন্থের ভণিতা এইরূপ—

মহাপ্রভু বীরচন্দ্রামূল্যপদদ্বন্দ্বে।
শ্রীনিবাসসুত কহে এ গতিগোবিন্দে॥

প্রেমদাস বংশীলীলামৃত বলিয়া একখানি গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন। গ্রন্থখানি কাহার রচিত এবং বাঙ্গালায় রচিত কিনা তাহা জানা যায় না।

শ্রীবংশীবিলাস আর শ্রীশ্রীবংশীলীলামৃত। রামের কড়চা আর কেশবসঙ্গীত॥
গৌরাঙ্গবিজয় আদি গ্রন্থ অনুসার। পদাবলী সাধুবাক্য করিয়া বিচার।
শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষাগ্রন্থ করিয়া বর্ণন। রসরাজভক্তে ভেট করিনু অর্পণ॥[১]

ধারন্দা বা ধারেন্দা নিবাসী গোপীজনবল্লভ দাস শ্যামানন্দের প্রধান শিষ্য রসিকানন্দ বা রসিক মুরারির একটি জীবনী কাব্য রচনা করেন, গ্রন্থটির নাম রসিকমঙ্গল।[২] গ্রন্থরচনার তারিখ, বার, তিথি ইত্যাদি সব দেওয়া আছে, কিন্তু বৎসরের উল্লেখ নাই।[৩] গ্রন্থ রচনা করিতে কবির দুই বৎসর আট মাস লাগিয়াছিল।[৪] গোপীজনবল্লভ দাস রসিকানন্দের শিষ্য ছিলেন, বাক্যকালে ইনি শ্যামানন্দেরও সেবা করিয়াছিলেন। রসিকের জন্ম ১৫১২ শকাব্দে ও মৃত্যু ৬২ বৎসর ৪ মাস বয়সে ১৫৭৪ শকাব্দে।[৫] শ্যামানন্দের মৃত্যু হয় ১৫৫২ শকাব্দে।[৬] রসিকের মৃত্যুর কিছুকাল পরেই কবি রসিকমঙ্গল রচনা করিয়া থাকিবেন। রসিকানন্দের খুল্লতাত তুলসী ঠাকুর এবং বেঢ়াপালের রসিকশেখর—প্রধানতঃ ইঁহাদেরই আদেশে আলোচ্য গ্রন্থটি রচিত হয় [পৃ ৭]।

গোপীজনবল্লভের জন্মস্থান ধারন্দা গ্রাম বর্ত্তমানে মেদিনীপুর জেলায়, তখন ইহা উড়িষ্যার অন্তর্গত বলিয়া পরিগণিত হইত। কবির পিতা রসময়, দুই খুল্লতাত বংশী ও মথুরাদাস। কবিরা পাঁচ ভাই ছিলেন—গোপীজনবল্লভ, হরিচরণ,

১। বংশীশিক্ষা, পৃ ২৩৫। ২। সারদাপ্রসাদ মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত, কলিকাতা ৪নং জগন্নাথ সুরের লেন নব কাব্য-প্রকাশ যন্ত্রে হরিচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত।

৩। গ্রন্থারম্ভ "নয় অঙ্ক বসন্ত পঞ্চমী মক্র (=মকর) মাসে" এবং গ্রন্থ সমাপ্তি "বার অঙ্ক কইল্যা বসন্ত শুক্ল পক্ষে" [পৃ ১৮৭]। ৪। "অষ্ট মাসে দুই বৎসর সে ভাবনা।"

৫। "শকাব্দ পনর শ বার আছয়ে পরমাণ॥ কৃষ্ণ অমাবস্যা তুলা আঠার দিবসে।" ইত্যাদি [পৃ ১৭]। ৬। "পনরশ বায়ান্ন শকাব্দ সে প্রমাণ।" [পৃ ১৮১]।

মাধব, রসিকানন্দ ও কিশোর। ইঁহারা জাতিতে ছিলেন গোপ। সকলেই ইঁহারা রসিকের শিষ্য হইয়াছিলেন। কবির মাতামহ ভীম শ্রীকর ধারন্দাগ্রামের অতি দুর্দ্দান্ত জমিদার ছিলেন। ইনিও রসিকের মাহাত্ম্যে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার শিষ্য হন [পৃ ৭২-৭৩]।

বাঙ্গালা দেশের দক্ষিণ ও দক্ষিণপশ্চিম প্রত্যন্তে বৈষ্ণব ধর্ম্মের প্রচারের ইতিহাসের যথেষ্ট উপাদান রসিকমঙ্গলে সংগৃহীত আছে। তবে ইহাতে যে প্রচুর অলৌকিকত্বের কাহিনী থাকিবে তাহাতে বৈচিত্র্য নাই। রসিকানন্দ অনেকগুলি মুসলমানকে শিষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়, তাহাদের মধ্যে প্রধান হইতেছে মেদিনীপুরের শাসনকর্ত্তা আহম্মদ বেগ [পৃ ১১৯-২১]। শাহ্ সুজার নিকটও রসিকানন্দ কেরামতি দেখাইয়াছিলেন এইরূপ বলা হইয়াছে [পৃ ১৭৮]। বিস্ময়কর হইতেছে শ্যামানন্দের প্রসঙ্গে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের একেবারে অনুল্লেখ। অথচ প্রেমবিলাস ভক্তিরত্নাকর প্রভৃতিতে দেখি শ্যামানন্দের সহিত শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা!

রসিকমঙ্গলে দুইটি প্রাচীন পদের টুকরা উদ্ধৃত হইয়াছে। মূল্যবান্ মনে করিয়া এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

আমার মনের কথা শুন লো সজনি।
শ্যামনাগর পড়ে মনে দিবস রজনী॥ পৃ ২৯॥
একেত কালিয়া কানু তিনু ঠাঁই বাঁকা॥ পৃ ৭৩॥

শেষোক্ত পদাংশটি গাহিয়াছিলেন তুলসীদাস। ইনি এবং ইঁহার পিতা গোপালদাস হৃদয়ানন্দের শিষ্য অর্থাৎ শ্যামানন্দের গুরু ভাই ছিলেন। ইঁহারা ছিলেন গঙ্গাতীরবাসী। পিতাপুত্র শ্যামানন্দ-রসিকের দেশে রসকীর্ত্তন প্রবর্ত্তন করেন [পৃ ৭৩]।

রসিকমঙ্গল চারি "বিভাগে" বিভক্ত। প্রত্যেক বিভাগে ষোলটি করিয়া "লহরী" আছে। নিম্নে গ্রন্থের লহরী ধরিয়া সূচী দেওয়া গেল।

পূর্ব্ব বিভাগ—প্রথম লহরীতে বৈষ্ণববন্দনা, দ্বিতীয়ে শ্যামানন্দের জন্ম ও তীর্থভ্রমাণাদি বিবরণ, তৃতীয়ে রোহিণী গ্রামের শোভাবর্ণন, চতুর্থে রসিকা-

নন্দ প্রসঙ্গ, পঞ্চমে রসিকানন্দের বাল্যলীলা, ষষ্ঠে রসিকানন্দের অন্নপ্রাশন, সপ্তমে রসিকানন্দের কর্ণবেধ ও দয়ালদাসী ঠাকুরাণীর আগমন, অষ্টমে ভাগবত অনুক্রমে বাল্যলীলা, নবমে বিদ্যাভ্যাস, দশমে হরিহর দুবের নিকট শিক্ষা ও বৈরাগ্যচেষ্টা, একাদশে রসিকানন্দের বিবাহোদ্যোগ, দ্বাদশে বিবাহ, ত্রয়োদশে রসিকানন্দের বৈরাগ্য, চতুর্দ্দশে শ্যামানন্দ-বিরহে রসিকানন্দের কাতরতা, পঞ্চদশে শ্যামানন্দ ও রসিকানন্দের মিলন, ষোড়শে উপাস্যনির্ণয়।

দক্ষিণ বিভাগ—প্রথমে দামোদর গোস্বামীর শিষ্যত্ব গ্রহণ, দ্বিতীয়ে রসিকানন্দের ব্রজে গমন ও তথায় শ্যামানন্দের ঐশ্বর্য্য দর্শন, তৃতীয়ে গোপীবল্লভপুর প্রকাশ, চতুর্থে তুলসীদাসের সহিত মিলন, পঞ্চমে ভীম শ্রীকরের বৈষ্ণবদীক্ষা গ্রহণ, ষষ্ঠে ঠাকুরাণী প্রকাশ এবং যুগলমিলন দর্শনে প্রেমোদয়, সপ্তমে চতুঃষষ্টি ভক্তি-অঙ্গ সাধনা, অষ্টমে গুরুর প্রতি অলৌকিক ভক্তি প্রদর্শন, নবমে বলরামপুরে সাধুসেবার নিমিত্ত যবনের হাতে নিগ্রহভোগ, দশমে বড়কোলা গ্রামে দোলযাত্রা মহোৎসব, একাদশে মেদিনীপুর আলমগঞ্জে মহোৎসব, শ্যামানন্দের দারপরিগ্রহ এবং রসিকানন্দ কর্ত্তৃক স্বীয় স্ত্রীকে অভিশাপ প্রদান, দ্বাদশে রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জ ও তাঁহার দুই ভ্রাতার শিষ্যত্ব গ্রহণ, ত্রয়োদশে ষড়্‌দর্শন বিচার, চতুর্দ্দশে সাংখ্যতত্ত্বে বৈরাগ্যস্থাপন, পঞ্চদশে জীবহত্যানিবারণ ও ভগবানের রূপ বর্ণন, ষোড়শে কৃষ্ণকথা শ্রবণকালে রাজা বৈদ্যনাথ ভঞ্জের অন্যমনস্কতা হেতু রসিকানন্দ কর্ত্তৃক নিগ্রহ।

পশ্চিম বিভাগে—প্রথমে গোপীবল্লভপুরে রাসযাত্রা মহোৎসবের উদ্যোগ দ্বিতীয়ে রাসযাত্রা বর্ণন, তৃতীয়ে রাসের অনুকরণ, চতুর্থে রসিকানন্দের পায়ে গোখুরা সর্প দংশন, পঞ্চমে দধিকর্দ্দম উৎসব, ষষ্ঠে আহ্‌মদ বেগের নিগ্রহ, সপ্তমে রসিকানন্দের প্রভাবদর্শনার্থ গমন ও হস্তিপ্রেরণ, অষ্টমে হস্তিবশ ও তাহার কর্ণে মন্ত্রদান, নবমে পটাশপুর গ্রামে রাজা গজপতির নিকট বংশীবাদন, দশমে পথভ্রান্ত বৈষ্ণবগণের সহিত রসিকানন্দের বনপ্রবেশ, ক্ষুধাতুর বৈষ্ণবগণের নিদ্রা, তৎকালে রসিকানন্দের নিকট মত্তহস্তীর আগমন ও তণ্ডুল দান এবং তদ্দ্বারা বৈষ্ণব-ভোজন, একাদশে গোপীবল্লভপুরে গোবিন্দজীউ প্রকাশ, দ্বাদশে শ্যামানন্দের

বায়ুরোগ শান্তির জন্য হিমসাগর তৈল আনয়ন, ত্রয়োদশে শ্যামানন্দের বৃন্দাবনে তিরোভাব, চতুর্দ্দশে শ্যামানন্দের প্রধান প্রধান শিষ্যগণের নাম, পঞ্চদশে শ্যামানন্দের ভৃত্য শিষ্যগণের নাম, ষোড়শে গোবিন্দপুরে দ্বাদশ মহোৎসব।

উত্তর বিভাগ—প্রথমে শ্যামানন্দের শিষ্য কিশোর দাস ও চিন্তামণি দাসের দেহত্যাগ, দ্বিতীয়ে শ্যামানন্দের ভার্য্যাত্রয়কে একত্র থাকিবার জন্য শ্যামানন্দের আদেশ, তৃতীয়ে উদণ্ড ভূঞার নিকট হইতে বৃন্দাবনচন্দ্র বিগ্রহ আনয়ন ও রসিকানন্দের ময়না হিজলী প্রভৃতি স্থান ভ্রমণ, চতুর্থে শ্যামপ্রিয়া, যমুনা ও গৌরাঙ্গদাসী শ্যামানন্দের এই তিন পত্নীর কলহ, পঞ্চমে পত্রে ভাগবতের গুপ্ত রহস্য শুনিয়া দুষ্টগণের দুরভিসন্ধি ত্যাগ এবং ধলভূমরাজের প্রতি রসিকানন্দের অভিশাপ, ষষ্ঠে গোপীবল্লভপুরে মহোৎসব, সপ্তমে রাসযাত্রায় ঝড়বৃষ্টি নিবারণ, অষ্টমে নীলাচল যাত্রা এবং পথিমধ্যে রসিকানন্দের প্রভাবে গৃহদাহনির্ব্বাপন, নবমে নদীপার কালে নৌকা জলমগ্ন হওয়ায় স্রোতে ভাগবত ভাসিয়া যাওয়ার কথা, দশমে জগন্নাথদেবের রথ টানিবার জন্য দৈববাণী, একাদশে পাদশাহের আদেশে কুড়িটা হস্তী আনয়ন এবং তজ্জন্য রসিকানন্দের প্রতি পাদশাহের বিশ্বাস, দ্বাদশে ব্যাঘ্রের কর্ণে হরিনাম দান, ত্রয়োদশে কোল অধিপতি কর্ত্তৃক রসিকানন্দের প্রতাপ দর্শন, চতুর্দ্দশে বৃন্দাবন গমনার্থ রসিকানন্দের প্রতি স্বপ্নাদেশ, পঞ্চদশে রেমুণায় ক্ষীরচোরা গোপীনাথের নিকট সমাধি করিবার আদেশ, ষোড়শে বৃন্দাবন প্রাপ্তি।

শ্রীচৈতন্যের অন্যতম পারিষদ জগদীশ পণ্ডিতের জীবনীকাব্য জগদীশচরিত্র-বিজয়ের[১] রচয়িতার নাম আনন্দদাস। শিষ্যপরম্পরায় কবি জগদীশ পণ্ডিত হইতে পঞ্চম পুরুষ অধস্তন। জগদীশ পণ্ডিতের শিষ্য রঘুনাথ মিশ্র, তাঁহার শিষ্য ভাগবতানন্দ নামান্তর শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহার শিষ্য প্রেমানন্দ, তাঁহার শিষ্য রাধাচরণ, তাঁহার শিষ্য আনন্দদাস। ভাগবতানন্দের স্বপ্নাদেশে গ্রন্থটি রচিত হয়।

প্রভু ভাগবতানন্দ ভবের আনন্দকন্দ, ভবভয় করহ মোচন।
পড়ি ভব-পারাবারে ডাকিতেছি বারে বারে, এইবার করহ রক্ষণ॥

১। ১৭৩৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮১৫-১৬ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত। ব-সা-প-প ২, পৃ ১৯৮; ৪, পৃ ২৫২-৫৩।

গৌরাঙ্গের আজ্ঞামতে অবতরি অবনীতে বহু পাপী করিলে উদ্ধার।
মো হেন অধম জনে দেখা দিলে আসি স্বপ্নে, পুনঃ কি দর্শন পাব আর॥
তাহাতে যে আজ্ঞা হৈল সেই মত গ্রন্থ কৈল দীন হীন এ আনন্দদাস।
আর কিছু নাহি চাই, গৌর গুণ সদা গাই, পূর্ণ কর এই অভিলাষ॥

গ্রন্থের মধ্যে অনেকগুলি সংস্কৃত শ্লোক আছে।

জগদীশচরিত্রবিজয়ের রচনাকাল দেওয়া নাই; তবে শিষ্যপরম্পরা হিসাব করিলে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কাছাকাছি গ্রন্থটি রচনা হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে।

শ্রীনিবাস আচার্য্যাদির ক্রিয়াকলাপ বিষয়ে চতুর্থ গ্রন্থ হইতেছে মনোহরদাস বিরচিত অনুরাগবল্লী[১]। গ্রন্থখানির রচনা বৃন্দাবনধামে ১৭৫৩ সম্বতে ১৬১৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৭ খ্রীষ্টাব্দে চৈত্র মাসের শুক্লাদশমীর শেষে সম্পূর্ণ হয়।

রামবাণাশ্বচন্দ্রাদিমিতে সংবৎসরে গতে।
বৃন্দাবনান্তরে পূর্ণা যাতানুরাগবল্লিকা॥
বসুচন্দ্রকলাযুক্তে শাকে চৈত্রে সিতেঽমলে।
বৃন্দাবনে দশম্যন্তে পূর্ণানুরাগবল্লিকা॥

গ্রন্থকারের গুরুদত্তনাম মনোহরদাস, ইহাঁর প্রকৃত নাম কি জানা নাই। ইহার গুরু ছিলেন রামশরণ চট্টরাজ। রামশরণ শ্রীনিবাস আচার্য্যের একতম শিষ্য কৃষ্ণদাস চট্টরাজের পুত্র এবং অন্যতম শিষ্য রামচরণ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য। মনোহর কাটোয়ার নিকটবর্ত্তী বেগুনকোলা গ্রামে গুরুবাড়ীতে বাস করিতেন। পরে গুরুর আদেশে তাঁহার অন্তর্ধানের অব্যবহিত পূর্ব্বে বৃন্দাবনে আসিয়া বাস করেন।

অনন্ত পরিবার তাঁর সর্ব্ব সদ্‌গুণধাম। তার মধ্যে এক শ্রীগোপালভট্ট নাম॥
ইঁহার অনেক শিষ্য কহিল না হয়। এক লিখি শ্রীনিবাস আচার্য্য মহাশয়॥
ইঁহার যতেক শিষ্য কহিতে না শকি। এক শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী লিখি॥
ইঁহার অনেক হয় শিষ্যের সমাজ। তার মধ্যে এক শ্রীরামশরণ চট্টরাজ॥
শ্রীআচার্য্যের ঠাকুরের সেবক প্রধান। শ্রীকৃষ্ণদাস চট্টরাজ ঠাকুর নাম॥

১। শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি ঘোষ সম্পাদিত ও প্রকাশিত (তৃতীয় সংস্করণ শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪৪৫)।

তার পুত্র হন ইঁহ পরম সুশান্ত। তাঁহার চরণ মোর শরণ একান্ত ॥
তিঁহো মোর গুরু তাঁর পদপ্রাপ্তি আশ। তাঁর দত্ত নাম মোর মনোহরদাস ॥
কাটোয়া নিকট বাগ্যনকোলা পাটবাড়ী। সেখানে বসতি আর সর্ব্ব বাড়ী ছাড়ি ॥
তেহ কৃপা কৈল মো অধমে যেন মতে। যেরূপ করুণা তাঁর আছিল জীবেতে ॥
যেরূপ করিল সংকীর্ত্তনের বিলাস। যেমত তাঁহাতে কৃষ্ণকথার প্রকাশ ॥
রূপ গুণ বদান্যতা বৈষ্ণবতা তাঁর। দেখিতে শুনিতে লোকে লাগে চমৎকার ॥
ইহা বর্ণিবারে যদি সংক্ষেপে চাহিয়ে। স্বতন্ত্র পুস্তক এক তথাপিহ হয়ে ॥
তাথে মোরে বৃন্দাবনে বিদায় যেমতে। দিলা তাহা কহি কিছু অতি অপরূপে ॥ ৮ ॥

অনুরাগবল্লী পুস্তক বৃহৎ নহে, কর্ণানন্দেরই মত। গ্রন্থটি আট মঞ্জরীতে বিভক্ত। প্রথম ছয় মঞ্জরীতে গোপালভট্ট গোস্বামী, শ্রীনিবাস আচার্য্য, নরোত্তম ঠাকুর এবং শ্যামানন্দের কথা আছে। সপ্তম মঞ্জরীতে শ্রীনিবাস আচার্য্যের শাখা বর্ণন। অষ্টম মঞ্জরীতে চারি সম্প্রদায়ের বৈষ্ণবদিগের বিবরণ, স্বীয় গুরুর স্তব এবং যৎকিঞ্চিৎ আত্মপরিচয় আছে। মনোহরদাস যে উত্তমরূপে সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন তাহা তাঁহার রচিত শার্দ্দূলবিক্রীড়িতচ্ছন্দে রচিত এগারটি শ্লোকে গ্রথিত তাঁহার গুরুর শোচক-স্তব পড়িলেই বোঝা যাইবে। গ্রন্থমধ্যে অনেকগুলি প্রমাণ শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। নূতন কথাও কিছু কিছু আছে। গ্রন্থকারের রচিত পদ অন্যত্র পাওয়া গিয়াছে।[১]

ষোড়শ শতাব্দীর শেষে অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে কিংবা তাহারও পরে কবি-কর্ণপুর রচিত গৌরগণোদ্দেশদীপিকার একাধিক অনুবাদ রচিত হইয়াছিল। নিম্নে দুইজন অনুবাদকের কথা বলিতেছি।

মাহাতা গ্রামবাসী "দ্বিজ" শ্রীরূপচরণ গদাধর পণ্ডিতের পরিকর ছিলেন, এই অনুমান ভণিতাদৃষ্টে করা যাইতে পারে।

কর্ণপুর ঠাকুর কৈল গৌরগণোদ্দেশ। সংস্কৃত গ্রন্থ হয় নাহি ভাষা লেশ ॥
মূর্খ হঞা যদি কেহ বুঝিতে না পারে। এই লাগি তার ভাষা কহিয়ে সাদরে ॥
... ...

১। HBL, পৃ ২৫৫।

মাহাতা গ্রামেতে বাস জন্ম দ্বিজকুলে। শ্রীরূপচরণ নাম কহি কুতূহলে ॥
জন্মে জন্মে এই আমি করিয়ে আরতি। গদাধর-গৌরাঙ্গে রহু মোর মতি ॥[১]

রূপচরণ নামে একজন পদকর্ত্তা ছিলেন।[২]

দেবনাথ দাস শ্রীখণ্ড-সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। ইঁহার গৌরগণাখ্যান পুস্তিকার সমাপ্তি এইরূপ—

শ্রীমুকুন্দ শ্রীনরহরি শ্রীরঘুনন্দন। ইহা সভার পাদপদ্ম মোর নিজ ধন ॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম করি নিতি ধ্যান। সমাপ্ত করিল গ্রন্থ গৌরগণাখ্যান ॥
শ্রীনরহরিপাদপদ্ম করি ধ্যান। দেবনাথ দাস কহে গৌরগণাখ্যান ॥[৩]

পুস্তিকাটি সাতটি ছোট ছোট "উদ্দেশ" অর্থাৎ অধ্যায়ে বিভক্ত। এক দেবনাথ দাস রচিত ভ্রমরগীতার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৪] দুই কবি অভিন্ন হইতে পারেন।

শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের এক অধস্তন পুরুষ হৃদয়ানন্দ দাস কবি-কর্ণপূরের গৌর-গণোদ্দেশদীপিকার একটি অনুবাদ করেন।[৫] ইঁহার নাম ছাড়া অন্য কিছু জানা যায় না। ভণিতা এইরূপ—

শ্রীগুরুচরণকঞ্জযুগে যার আশ।
গণোদ্দেশ কহয়ে হৃদয়ানন্দ দাস ॥

কবিকর্ণপূরের সরণী অনুসরণ করিয়া সপ্তদশ শতাব্দীতে (এবং সম্ভবতঃ তাহার পরেও) কতকগুলি বৈষ্ণবমহান্তের শাখানির্ণয় বা গণাখ্যান জাতীয় পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল। নিম্নে এই পুস্তিকাগুলির বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। ইহার মধ্যে শেষের তিনখানি অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা হইতেও পারে।

জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় সঙ্কলিত গৌরপদতরঙ্গিণীর উপক্রমণিকায়[৬] রসিকানন্দ রচিত শাখানির্ণয় গ্রন্থের উল্লেখ আছে। ইহাতে শ্যামানন্দের শিষ্যদিগের বিবরণ আছে এবং ইহার রচয়িতা শ্যামানন্দের বিখ্যাত শিষ্য রসিকানন্দ এইরূপ অনুমান করিতেছি।

নরহরি সরকার ঠাকুরের এক শিষ্য ছিলেন গৌরাঙ্গ ঘোষাল। ইঁহার পুত্র

১। ব-সা-প-প ৬, পৃ ১২৮। ২। HBL, পৃ ৪৩৫। ৩। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩১২।
৪। ব-সা-প-প ৬, পৃ ৬৩। ৫। ঐ, পৃ ২২৮। ৬। প্রথম সংস্করণ, পৃ ১৬১।

শ্রীরাম ঘোষালের শিষ্য রসিকদাস রচিত শাখাবর্ণনের পুঁথি শ্রীখণ্ড হইতে পাওয়া গিয়াছে।[১] ইহাতে নরহরি ও রঘুনন্দনের শিষ্যগণের বিবরণ আছে। পূর্ব্বোক্ত গ্রন্থের সহিত কি ইহা অভিন্ন ?

রামগোপাল দাসের শাখানির্ণয়ে[২] শ্রীখণ্ড ও কাটোয়া অঞ্চলের ভক্তদিগের সম্বন্ধে অনেক নূতন কথা আছে। যেমন, লোচনদাস "গুরুর অর্থে বিকাইল ফিরিঙ্গীর হাথ।"

চন্দ্রশেখর দাস সম্বন্ধে এই সংবাদ পাইতেছি—

চন্দ্রশেখর নামে বৈদ্য আছিল খণ্ডেতে।
যার বসত-বাটী খণ্ড ক্ষেত্রের তলাতে ॥
রসিকরায় বিগ্রহ তার সেবা অতিশয়।
স্বর্ণ-ঠাকুর বলি মোগল বেঢ়িল আলয় ॥
বক্ষে রাখিলা ঠাকুর তবু না ছাড়িলা।
চন্দ্রশেখরের মুণ্ড মোগলে কাটিলা ॥ পৃ ৬-৭ ॥

এই ব্যাপার ১৫৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে বাঙ্গালাদেশে প্রথম মোগল অভিযানের সময় ঘটিয়াছিল বলিয়া বোধ হয়।

রামগোপাল দাস খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বর্ত্তমান ছিলেন। ১৫৯৫ শকে অর্থাৎ ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে ইনি রাধাকৃষ্ণ রসকল্পবল্লী রচনা করেন।

জয়কৃষ্ণ দাসের ভুবনমঙ্গলগীত[৩] ১০১টি পয়ার শ্লোকে গ্রথিত। ইহাতে শ্রীচৈতন্যের পারিষদদিগের জন্মস্থান নিরূপিত হইয়াছে। কবি অভিরাম গোস্বামীর পাটের শিষ্য ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। বোধ হইতেছে, ইনিই ১৬০৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রসকল্পলতা রচনা করিয়াছিলেন।[৪] ভণিতা এইরূপ—

কৃষ্ণপাদপদ্মভৃঙ্গ জয়কৃষ্ণ দাস। ভুবনমঙ্গলগীত করিলা প্রকাশ ॥

অভিরাম দাস রচিত পাটপর্য্যটন এবং শ্রীঅভিরামঠাকুরের শাখানির্ণয়[৫] দুইটি

১। ব-সা-প-প ৬, পৃ ২৬২। ২। শ্রীখণ্ড হইতে প্রকাশিত (শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৪)।
৩। শিবচন্দ্র শীল কর্তৃক প্রকাশিত (ব-সা প-প ১৭, পৃ ২২১-২৩০)। ৪। HBL, পৃ ৪৯৭-৯৮।
৫। অম্বিকানাথ ব্রহ্মচারী কর্তৃক প্রকাশিত (ব-সা-প-প ১৮, পৃ ১০৭-১১২)।

কবিতা মাত্র। পাটপর্য্যটন অংশে ৫৬টি পয়ার শ্লোক আছে। ইহাতে তিন প্রভু ও তাঁহাদের পারিষদদিগের জন্মস্থানের নাম আছে। শ্রীঅভিরাম ঠাকুরের শাখানির্ণয় অংশটি সতেরোটি মাত্র পয়ার শ্লোকে রচিত। এই অংশে অভিরাম-গোস্বামীর প্রধান প্রধান শিষ্য ও তাঁহাদের বাসস্থানের নাম আছে।

পাটপর্য্যটন অংশে অভিরাম দাস পাটনির্ণয় গ্রন্থের উল্লেখ করিয়াছেন।

পাটপর্য্যটন গ্রন্থে আছয়ে বিস্তার। তা দেখি এই চুম্বক হইল নির্দ্ধার ॥
পাটপর্য্যটন এই সমাপ্ত হইল। অভিরাম দাস ইহা গ্রন্থিত করিল ॥

দ্বিতীয় অংশের ভণিতা এইরূপ—

শ্রীরত্নেশ্বরপাদপদ্ম করি ধ্যান।
সংক্ষেপে রচনা কৈল দাস অভিরাম ॥

দ্বাদশপাটনির্ণয় বলিয়া একটি ১১০ পয়ার শ্লোকে গ্রথিত একটি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।[১] রচয়িতার নাম নীলাচলচন্দ্র দাস। ভণিতা এইরূপ—

শ্রীরূপসনাতনপাদপদ্ম করি আশ।
কিছু না জানি বর্ণন করে নীলাচল দাস ॥

ইহাই কি অভিরামদাস উল্লিখিত পাটনির্ণয় গ্রন্থ ?

রাইচরণ দাসের অভিরামবন্দনায়[২] অভিরাম ঠাকুর ও জাহ্নবা দেবীর জীবনী সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। ইহার শ্লোক সংখ্যা আনুমানিক ৪২০। পুঁথিটিতে "দ্বিজ" রামপ্রসাদের পদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

১। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩১৮। ২। ঐ, পৃ ২৯৯-৩০০।

সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদ

ভারত-পাঁচালী ঃ কাশীরাম

বাঙ্গালা দেশের সমধিক সুপরিচিত কবি কাশীরাম ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদে জন্মগ্রহণ করেন। কাশীরামের পিতা, পিতামহ ও প্রপিতামহের নাম যথাক্রমে কমলাকান্ত, সুধাকর ও প্রিয়ঙ্কর। ইঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম শ্রীকৃষ্ণদাস বা শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর এবং কনিষ্ঠ ভ্রাতার নাম গদাধর। ইঁহারা দেব-উপাধিক কায়স্থ। বাসস্থান বর্দ্ধমান জেলায় কাটোয়া মহকুমার অন্তর্গত ইন্দ্রাণী বা ইন্দ্রাবনী পরগণায় সিঙ্গিগ্রাম। এইটুকুমাত্র খবর কাশীরামের কাব্য হইতে পাওয়া যায়।

ইন্দ্রাণী নামেতে দেশ বাস সিঙ্গি[১] গ্রাম। প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নাম॥
তৎপুত্র কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস-পিতা। কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥
পাচালী প্রকাশি কহে কাশীরাম দাস। অলি হব কৃষ্ণপদে মনে অভিলাষ॥[২]

ভণিতায়—

কমলাকান্তের সুত হেতু সুজনের প্রীত
বিরচিল কাশীরাম দাস॥
মহাভারতের কথা অমৃত-অর্ণবে।
পাঁচালীপ্রবন্ধে কহে কাশীরাম দেবে॥

১। মুদ্রিত পুস্তকে প্রায়ই 'সিদ্ধি' পাঠ পাওয়া যায়।

২। দে ব্রাদার্স প্রকাশিত মহাভারত (দ্বাদশ সংস্করণ), পৃ ১১১২। এই সংস্করণটি মূল্যবান, যেহেতু ইহা প্রাচীন পুঁথি অবলম্বনে সম্পাদিত হইয়াছে। বিষ্ণুপুরে প্রাপ্ত একটি আদিপর্ব্বের পুঁথিতে ভণিতায় [ব-সা প-প ১৯, পৃ ১২৭] এই আছে—

ইন্দ্রাণী নামেতে গ্রাম পূর্ব্বাপরস্থিতি।
দ্বাদশ তীর্থেতে যথা দেবী ভাগীরথী॥
কায়স্থকুলেতে জন্ম বাস সিংহগ্রামে।
প্রিয়ঙ্কর দাস পুত্র সুধাকর নামে॥
তস্য সুত কমলাকান্ত কৃষ্ণদাস-পিতা।
কৃষ্ণদাসানুজ গদাধর-জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা॥

অরণ্যপর্ব্বের কথা অতি সুখমোক্ষদাতা রচিলেন মহামুনি ব্যাস।
রচিল পাঁচালী ছন্দে মনের আবেশানন্দে কৃষ্ণদাসানুজ কাশীদাস ॥
ধন্য হল কায়স্থ কুলেতে কাশীদাস। তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ ॥
পাঁচালী প্রবন্ধে কহে কাশীরাম দাস। অবহেলে কৃষ্ণপদে মম অভিলাষ ॥
মস্তকে বন্দিয়া ব্রাহ্মণের পদরজ।
কহে কাশীরামদাস গদাধরাগ্রজ ॥ ইত্যাদি।

কোন কোন পুঁথিতে ও সংস্করণে প্রাপ্ত একটি ভণিতা হইতে অনুমান হয় যে, হরিহরপুর গ্রামবাসী মুখটি উপাধিক পুরুষোত্তমের পুত্র অভিরাম কবির গুরু কিংবা অধ্যাপক ছিলেন। ভণিতাটি এই—

হরিহরপুর গ্রাম সর্ব্বগুণধাম। পুরুষোত্তমনন্দন মুখটি অভিরাম ॥
কাশীদাস বিরচিল তাঁর আশীর্ব্বাদে। সদা চিত্ত রহে যেন দ্বিজপাদপদ্মে ॥[১]

কাশীরামেরা তিন ভাইই কবি ছিলেন। ইহাদের জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণদাস বা শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর রচিত শ্রীকৃষ্ণবিলাস কাব্য সম্বন্ধে পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি। কনিষ্ঠ ভ্রাতা গদাধর জগন্নাথমঙ্গল বা জগৎমঙ্গল নামে এক নীলাচলমাহাত্ম্য কাব্য রচনা করেন।[২] এই কাব্যে তিনি পূর্ব্বপুরুষদিগের পরিচয় সমেত এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

ভাগীরথীতটে বাটী ইন্দ্রায়নী নাম। তার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত গণি সিঙ্গি গ্রাম ॥
অগ্রদ্বীপ গোপীনাথরায়-পদতলে। নিবাস আমার সেই চরণকমলে ॥
তাহাতে শাণ্ডিল্যগোত্রে দেব দৈত্যারি। দামোদর পুত্র তার সদা সেবে হরি ॥
ভুবরাজ শুভরাজ তাহার নন্দন। ভুবরাজ পুত্র হৈল মীনকেতন ॥
তাহার নন্দন হৈল নাম ধনঞ্জয়। তাহা হৈতে হইল এই তিনটি তনয় ॥
রঘুপতি[৩] ধনপতি দেব নরপতি। রঘুপতি[১]-পঞ্চপুত্র প্রতিষ্ঠিতমতি ॥
প্রিয়ঙ্কর সুরেশ্বর কেশবসুন্দর। চতুর্থে শ্রীমুখ দেব পঞ্চমে শ্রীধর ॥[৪]

১। দে ব্রাদার্সের সংস্করণ, পৃ ৬৪৬। ২। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।
৩। পাঠান্তর 'বসুপতি'।
৪। ঐ 'প্রসন্ন রঘু দেবেশ্বর কেশব সুন্দর। চতুর্থে শ্রীরঘুদেব পঞ্চমে শ্রীধর ॥'

প্রিয়ঙ্কর হৈতে হৈল এ পঞ্চ উদ্ভব। যদু সুধাকর মধু শ্রীরাম রাঘব ॥[১]
সুধাকর-নন্দন এ তিন পরকাশ।[২] শ্রীমন্ত কমলাকান্ত দেব চণ্ডীদাস ॥
দেব শ্রীকমলাকান্ত তেজিয়া নিবাস। জগন্নাথ দেখিয়া সে ওড্রে কৈল বাস ॥
কমলাকান্তের হল্য এ তিন কোঙর। প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর ॥
দ্বিতীয়ে শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবান্। রচিল পাঁচালী ছন্দে ভারতপুরাণ।
তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস। জগৎমঙ্গল কথা করিল প্রকাশ ॥

কমলাকান্ত জগন্নাথ দেখিতে গিয়া উড়িষ্যাতেই থাকিয়া যান। গদাধর দাস তাহার কাব্য সেই দেশেই রচনা করিয়াছিলেন। অনুমান হয় কাশীরাম তাঁহার ভারত-পাঁচালীর শেষার্দ্ধ উড়িষ্যাতেই রচনা করিয়াছিলেন। এই অনুমানের হেতু হইতেছে যে, কাশীরামের কাব্যের শেষের দিকেই (বিরাট পর্ব্বের পর) ভণিতায় পুনঃ পুনঃ জগন্নাথের উল্লেখ ও বন্দনা রহিয়াছে, পূর্ব্ববর্ত্তী চারি পর্ব্বে নাই। যথা—

কাশীরামদাসের প্রভু নীলশৈলারূঢ়।
দক্ষিণে অনুজাগ্রজ সম্মুখে গরুড় ॥

যেই প্রভু নীলগিরি নীলকণ্ঠধারী। নমো ব্রহ্ম-অবতার দারুরূপধারী।
দারুরূপে পূর্ণব্রহ্ম নীলাচলে বাস। তাঁহার চরণ চিন্তি কহে কাশীদাস ॥
জয় প্রভু জগন্নাথ জয় চক্রধারী। তোমার মহিমাগুণ কি বর্ণিতে পারি ॥
শিষ্ট জন পাল তুমি দুষ্টেরে সংহার। এই হেতু জগন্নাথ নাম যে তোমার ॥
দারুরূপে পূর্ণব্রহ্ম নীলাচলে বাস। জগজ্জনহিতে তব অতুল প্রকাশ ॥
অনুক্ষণ তাঁহার চরণে রহু নতি। কাশীরামদাস কহে মধুর ভারতী ॥ ইত্যাদি।

১। পাঠান্তর 'অনু সুধাকর মধু রাম যে রাঘব ॥' [ব সা প প ৬, পৃ ৫৭]।
২। ঐ 'ভূমীন্দ্র কমলাকান্ত এ তিন কুমার ॥
প্রথমে শ্রীকৃষ্ণদাস শ্রীকৃষ্ণকিঙ্কর।
রচিলা কৃষ্ণের গুণ অতি মনোহর ॥
দ্বিতীয় শ্রীকাশীদাস ভক্ত ভগবানে।
রচিলা পাঁচালী ছন্দে ভারতপুরাণে ॥
জগৎমঙ্গল কথা করিলা প্রকাশ।
তৃতীয় কনিষ্ঠ দীন গদাধর দাস ॥'

একটি প্রবাদ আছে—

আদি সভা বন বিরাটের কত দূর।
ইহা রচি কাশীদাস গেল স্বর্গপুর॥
ধন্য হইল কায়স্থকুলেতে কাশীদাস।
তিন পর্ব্ব ভারত যে করিল প্রকাশ॥[১]

এই প্রবাদের মূলে কিছু সত্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কাশীরাম যে সাড়ে তিন পর্ব্ব নহে সমগ্র গ্রন্থই রচনা করিয়াছিলেন, ইহাতে সন্দেহ করিবার কোন হেতু নাই। হয়ত, বিরাট পর্ব্বের কতকটা রচনা করিয়া কাশীরাম পিতার সহিত সিঙ্গিগ্রাম ত্যাগ করিয়া নীলাচলে অথবা তন্নিকটবর্ত্তী দক্ষিণদেশে চলিয়া যান, এবং তাহা হইতেই এই প্রবাদের উৎপত্তি হইয়াছে।

আরও একটি প্রবাদ আছে, কাশীরামের পুত্র নন্দরাম দাস পিতার অনুমতি লইয়া কাব্যটি সম্পূর্ণ করেন।

দ্বিজপদরজ লয়্যা কাশীর নন্দন।
জনকের আজ্ঞামত করিল বচন॥[২]

এই উক্তির যাথার্থ্য বিশেষ সন্দেহজনক, কারণ মহাভারতের অধিকাংশ পুঁথিতেই নন্দরাম দাসের সঙ্গে সঙ্গে নন্দরাম ঘোষ ভণিতাও পাওয়া যায়। এই নন্দরাম ঘোষ রচিত একটি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যেরও সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর একেবারে প্রথমেই কাশীরাম তাঁহার কাব্য রচনা আরম্ভ করেন। একটি পুঁথিতে বিরাট-পর্ব্ব সমাপ্তির কাল পাওয়া যাইতেছে ১৫২৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দ।

চন্দ্র পক্ষ বাণ ঋতু শক সুনিশ্চয়।
বিরাট হইল সাঙ্গ কাশীদাস কয়॥[৩]

১। "অষ্টাদশ পর্ব্ব অনুবাদের উপসংহার" (১৭৮৮ শকাব্দ), কালীপ্রসন্ন সিংহ।

২। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত (ব-সা-প), দ্বিতীয় খণ্ড, মুখবন্ধ, পৃ ২৵০। যে পুঁথিতে এই পয়ারটি পাওয়া গিয়াছে তাহার লিপিকাল ১১৮২ সাল (সম্ভবতঃ মল্লাব্দ)।

৩। ব-সা-প-প ৭, পৃ ১২৩।

বিষ্ণুপুরে প্রাপ্ত ১৬৮৬ শকাব্দে ১০৭০ মল্লাব্দে "মল্লমহীমহেন্দ্র মল্লাবনিনাথ শ্রীশ্রীরাধাদামোদরসিংহদেব অনুগ্রহপ্রতাপালয়" রাজত্বকালে অনুলিখিত একটি আদিপর্ব্বের পুঁথিতে এই রচনাকালজ্ঞাপক পয়ার পাওয়া গিয়াছে—

শকাব্দ বিধুমুখ রহিলা তিন গুণে।
রুক্মিণীনন্দন অঙ্কে জলনিধি সনে॥[১]

ইহা হইতে শ্রীযুক্ত যোগেশ চন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় ১৫২৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে পাইয়াছেন।[২] এই তারিখ সম্বন্ধে অবিশ্বাসের কারণ নাই।

অন্যত্র পাওয়া যায়—

সুধাময় এ ভারত ব্যাসবিরচিত।
ফাল্গুনের বিংশ দিনে সমাপ্ত বিহিত॥[৩]

ইহাতে অবশ্য বৎসরের উল্লেখ নাই।

কাশীরামের কাব্যের কোন কোন পুঁথিতে ক্বচিৎ দ্বৈপায়নদাস এবং "কাশীর নন্দন" ভণিতা পাওয়া যায়। দ্বৈপায়নদাস কোন কবির নাম-ভণিতা বলিয়া বোধ হয় না।

কাশীর নন্দন কহে রচিয়া পয়ার।
অবহেলে শুনে যেন সকল সংসার॥[৪]

কাশীরামের কাব্যেও ভেজাল ঢুকিয়াছে, তবে কৃত্তিবাসের মত অত নহে। কাশীরামের ভাষার উপর প্রায় সকল প্রকাশক ও সম্পাদক কিছু না কিছু হস্তক্ষেপ করিয়াছেন। তথাপি কাশীরামের কাব্যের পুঁথি প্রচুর পাওয়া যায় বলিয়া পরিশ্রম করিলে শুদ্ধ পাঠ নিরূপণ করা অসাধ্য হইবে না। শিক্ষিত বাঙ্গালীর এই একটি প্রধান অবশ্য কর্ত্তব্য এখনও অসম্পন্ন রহিয়াছে।

কৃত্তিবাসের মত কাশীরামও বাঙ্গালীর জাতীয় কবি। এই দুই কবির মত কোন কবিই এতকাল ধরিয়া এত লোকের শ্রবণমনের পরিতৃপ্তি দান করিয়া আসিতে পারে নাই। বাঙ্গালীর জাতীয় মনোভাব গঠনেও এই দুই কবির কৃতিত্ব অসাধারণ।

১। ব-সা-প-প ১৯, পৃ ১২৭।   ২। প্রবাসী ১৩৩৬ পৌষ, পৃ ৩৪৭।
৩। গৌরীকান্ত তর্কবাগীশের সংস্করণ হইতে কালীপ্রসন্ন সিংহ কর্ত্তৃক উদ্ধৃত।
৪। DCBM ৩, পৃ ৭৭৮।

কাশীরাম বৈষ্ণবভাবাপন্ন ছিলেন। ইহা যুগধর্ম্মও বটে, এবং তাঁহার বংশ-ধর্ম্মও বটে। তথাপি কবির মনে অনুদারতার স্থান ছিল না। তিনি প্রায় সকল দেবদেবীর নিকটেই ভক্তিনম্র প্রণতি জানাইয়া কৃষ্ণভক্তি মাগিয়া গিয়াছেন। ইহা নিম্নোদ্ধৃত ভণিতাগুলি হইতে প্রতিপন্ন হইবে।

ভারত-অমৃত পীয়ে অনুব্রত শ্রুতিযুগে সাধুজন।
কালীপদযুগে কাশীদাস মাগে দাসার্থে নন্দনন্দন॥

মস্তকে করিয়া চন্দ্রচূড়পদধূলি
কাশীরাম দাস কহে রচিয়া পাঁচালী॥
চন্দ্রচূড়পদদ্বয় করিয়া ভাবনা।
কাশীরাম দেব করে পয়ার রচনা॥ ইত্যাদি।

কাশীরামের কাব্য অত্যন্ত সুপরিচিত বলিয়া রচনার কোন নিদর্শন দিবার প্রয়োজন নাই। কাশীরামের কবিত্ব সম্বন্ধে মধুসূদনের কথায় বলি,

মহাভারতের কথা অমৃত সমান ;
হে কাশী, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্।

বিশারদ রচিত বন ও বিরাট পর্ব্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[১] সম্ভবতঃ ইনি সমগ্র ভারত-পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। বিরাট-পর্ব্বের রচনাসমাপ্তির কাল ১৫৩৩ বা ১৫৩৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬১২ বা ১৬১৩ খ্রীষ্টাব্দ, চৈত্রমাস বৃহস্পতিবার।

বেদ বহ্নি বাণ চন্দ্র শাকের প্রমাণে।
চৈত্র গুরু দিনে পদ বিশারদে ভণে॥

একটি পুঁথির লিপিকাল হইতেছে ১৫৫৪ শকাব্দ।[২]

ভারত-পাঁচালীর অপর এক প্রাচীন কবি নিত্যানন্দ ঘোষের সময় জানা নাই। কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন, এইরূপ অনুমান করি।

পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র ১৮০৬-০৭ খ্রীষ্টাব্দে লিখিত স্বীয় গৌরীমঙ্গল কাব্যে বলিয়াছেন—

১। সাহিত্য ১৩১৮, পৃ ৯১৪, ব-সা-প-প ২, পৃ ১৯৭। বিরাটপর্ব্বের পুঁথিটি ১২১৫ সালের অনুলিপি। সম্ভবতঃ এই পুঁথিরই কিয়দংশ বঙ্গসাহিত্য-পরিচয়ে উদ্ধৃত হইয়াছে। প্রাপ্ত পুঁথির শ্লোক সংখ্যা ১৭১৭। ২। সাহিত্য ১৩১৮, পৃ ৯১৪।

অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস।
নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ ॥

ইহা হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন যে, নিত্যানন্দ ঘোষ কাশীরামের পূর্ব্বে মহাভারত কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। নিত্যানন্দ সম্বন্ধে নাম ছাড়া আর কিছুই জানা নাই। তবে ইহার রচিত ভারত-পাঁচালীর বিভিন্ন পর্ব্বের পুঁথি যথেষ্টই পাওয়া গিয়াছে।[১] কবির ভণিতা এইরূপ—

শুন শুন অরে ভাই হয়ে এক মন।
নিত্যানন্দ ঘোষ কহে ভারত কথন ॥

নিত্যানন্দ ঘোষে বলে মুকতি হইব হেলে
ভজ কৃষ্ণচরণ ভকতি ॥ ইত্যাদি।

"দ্বিজ" হরিদাস রচিত অশ্বমেধ-পর্ব্বের ১১০৬ সালে (সম্ভবতঃ মল্লাব্দে) অনুলিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[২] তাহা হইতে জানা যায় যে কবি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য প্রশিষ্য অথবা অনুশিষ্য ছিলেন। সমাপ্তি-ভণিতা এইরূপ—

শ্রীকৃষ্ণচরণপদ্ম প্রেম রস তায়। ঠাকুর শ্রীনিবাস জন্ম জন্ম পায় ॥
অভিমত সিদ্ধ মোরে কর শ্রীনিবাস ॥ তোমার চরণে কহে দ্বিজ হরিদাস ॥

পুঁথির আরম্ভ শ্রীচৈতন্যবন্দনায়।

জয় রে জয় রে জয় হরিগুণ-কিরিতন
বিলসই পরম আনন্দে ॥ ধ্রু ॥
বন্দো শচীসুত প্রভু শ্রীচৈতন্য রায়।
সঙ্গে নিত্যানন্দ জীবে হরিভক্তি পায় ॥ ইত্যাদি।

এক "দ্বিজ" হরিদাস রচিত মুকুন্দমঙ্গল নামে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে।

কৃষ্ণানন্দ বসু রচিত শান্তি-পর্ব্বের ১০৯৯ সালে অনুলিখিত এক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৩] কৃষ্ণানন্দ বসুর (?) পুত্র অনন্ত মিশ্র রচিত জৈমিনিভারত বা অশ্বমেধ-

১। DCBM ৩, পৃ ৭৬০-৭৭। পুঁথিগুলি সবই বিষ্ণুপুর অঞ্চলের এবং অর্ব্বাচীন।

২। DCBM ৩, পৃ ৭৯০-৯১। ৩। নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ প্রকাশিত বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত দ্বিতীয় খণ্ড, মুখবন্ধ পৃ ।৵০ দ্রষ্টব্য। পুঁথিটি কোথাকার জানা নাই, বাঁকুড়া-বিষ্ণুপুর অঞ্চলের হইলে সন মল্লাব্দ হইবে।

পর্ব্বের ১৬১১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৯-১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত এক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[১] তাহাতে কবি বলিতেছেন—

বাপ কৃষ্ণানন্দ বসু সংজ্ঞা জননী। কৃষ্ণপরায়ণ চিত্তে রচিয়া বাখানি॥
দুই লোক স্তব্ধ হয় শুনিলে কথন। মিশ্র অনন্তে কহে কৃষ্ণের বচন॥

বসু সন্তানের মিশ্র উপাধি কেমন কেমন লাগে। সম্ভবতঃ কৃষ্ণানন্দ মিশ্র হইবে। চৈতন্যভাগবতের অপ্রকাশিত অধ্যায়ত্রয়ে যে কুলীনগ্রামবাসী অনন্ত মিশ্রের কথা বর্ণিত হইয়াছে ইনিই কি সেই ব্যক্তি? এক "দ্বিজ" কৃষ্ণরামের অশ্বমেধ-পর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে।[২]

কৃষ্ণানন্দ বসুর ভণিতা এইরূপ—

মস্তকে বন্দিয়া চন্দ্রচূড়পদদ্বন্দ্ব।
পয়ার প্রবন্ধে কহে বসু কৃষ্ণানন্দ॥

ঘনশ্যাম দাস বিরচিত ভারত-পাঁচালী কাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৩] অনুরূপ ভণিতা হইতে মনে হয় যে ইনি ও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা ঘনশ্যাম অভিন্ন। ঘনশ্যাম দাস কতকগুলি (আত্মীয়ের ?) নাম করিয়াছেন, যথা—হরিদাস সেন, গোবিন্দ সেনের পুত্র, বুদ্ধিমন্ত খান, দুর্ব্বাসা সেন। পুঁথিটি পাত্রসায়র অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। লিপিকাল সন ১০৪০ (মল্লাব্দ হইবে)। কবি কি গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র, দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যামদাস কবিরাজ?

শ্রীনাথ "ব্রাহ্মণ" রচিত ভারত-পাঁচালীর আদি, বিরাট ভীষ্ম ও দ্রোণ পর্ব্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৪] কবি কোচবিহারের লোক ছিলেন; ভাষাতেও তাহার ছাপ রহিয়াছে। শ্রীনাথ মহারাজা প্রাণনারায়ণের আজ্ঞায় কাব্যটি (শুধু দ্রোণ-পর্ব্ব কি ?) রচনা করিয়াছিলেন। প্রাণনারায়ণ ১০৮৭ সালের অর্থাৎ ১৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে রাজত্ব করিতেন। সুতরাং কবি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন।

দ্রোণ-পর্ব্বের পুঁথি হইতে কবির এইটুকু আত্মপরিচয় সংগ্রহ করা যাইতেছে।

১। ব সা-প-প চতুর্থ খণ্ড, বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় ১, পৃ ৭৩১-৩৪।
২। ব-সা-প-প ৫, পৃ ২৮৫-৮৬। ৩। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় ১, পৃ ৬৩৩-৪০।
৪। ব-সা-প-প ২, পৃ ১৯৮-৯৯, ঐ পঞ্চমবর্ষের কার্য্যবিবরণ, পৃ ৩০-১।

প্রাণনারায়ণ দেব আজ্ঞা পরমাণে। দ্রোণ-পর্ব্ব কথা বিরচিত স্ববন্ধনে॥
ব্যাসদেব-দৈববাণী আছয় প্রচুর। ভাষাবদ্ধ হৈলে তাঞে অধিকে মধুর॥
এ কারণে বিদগ্ধ জনের প্রিয়কর। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণে পদ ভণে মনোহর॥
.. ..
মল্ল মহীপালের কনিষ্ঠ সহোদর। শুক্লধ্বজ নামে দেব ভোগে পুরন্দর॥
তাহার পদক মহামান্য ভবানন্দ। কামরূপদ্বিজকুলকুমুদিনীচন্দ্র॥
নামত পণ্ডিত রায় তাহার তনয়। রঘুদেব নৃপতির পাত্র মহাশয়॥
তাহার কনিষ্ঠ রামেশ্বর শুদ্ধমতি। শ্রীনাথ হৈলেন জ্যেষ্ঠ তাহার সন্ততি॥
পযার করিতে প্রাণ ভূপে আজ্ঞা দিল। দ্রোণ-পর্ব্ব ভারতের পদ বিরচিল॥

মহারাজা প্রাণনারায়ণের অপর এক সভাকবি "দ্বিজ" রামেশ্বরও মহাভারত অবলম্বনে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। "দ্বিজ" রামেশ্বরের পুত্র কৃষ্ণ মিশ্র প্রহ্লাদচরিত্র কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[১] শ্রীনাথ "ব্রাহ্মণ" যে "দ্বিজ" রামেশ্বরের পুত্র নহেন, এমন কথাও জোর করিয়া বলা যায় না।

ভীষ্ম-পর্ব্বের একটি পুঁথির ভণিতা হইতে মনে হয় যে হয়ত শ্রীনাথের উপাধি ছিল রাম সরস্বতী।

জয় জয় জগৎজনক কৃষ্ণ বাপ। যাহার কৃপাতে মুছে সংসারের তাপ॥
হেনয় কৃষ্ণের পদে করো প্রণিপাত। হউক নির্ম্মল মতি ভজু চরণত॥
অগতির গতি প্রভু দেব নিরঞ্জন। ব্রহ্মা হরে চিন্তে যার অরুণচরণ॥
তছু পদ শিরে ধরি রাম সরস্বতী। শ্রীনাথ ব্রাহ্মণে ভণে এড়ি আন মতি॥[২]

বন্দ্যঘটীয় লক্ষ্মণ রচিত মহাভারতের বিভিন্ন পর্ব্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইনি যদি রামায়ণ কাব্য রচয়িতা "দ্বিজ" লক্ষ্মণের সহিত অভিন্ন হন তবে ইঁহার বর্ত্তমানকাল সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে হইবে না।

মণ্ডল-উপাধিক চন্দনদাস দত্তের প্রমীলার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ পালার পুঁথির লিপিকাল হইতেছে ১০২৭ সাল (মল্লাব্দ?)।[৩] ইনি আগুরি-বংশীয় ছিলেন; নিবাস আকুরোল।

১। সাহিত্য ১৩, পৃ ৮৩৮। ২। র-সা-প-প ২, পৃ ১৯৮-৯৯। ৩। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় ১, পৃ ৬৯৪।

অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদ

বিবিধ বৈষ্ণব গ্রন্থ : অনুবাদ এবং মৌলিক

ষোড়শ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে বাঙ্গালা দেশে শ্রীরূপ প্রভৃতি বৃন্দাবনস্থ গোস্বামীদিগের গ্রন্থ শ্রীনিবাস আচার্য্যাদির দ্বারা প্রচার হইতে থাকে। মূল গ্রন্থ অল্প লোকেরই অধিগম্য ছিল, সেই কারণে অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা বোধ করিয়া শ্রীনিবাস আচার্য্য তাঁহার এক প্রধান অনুচরকে এই কার্য্যে নিযুক্ত করেন। সেই সঙ্গে অপরেও কিছু কিছু অনুবাদ কার্য্যে লাগিয়া যান।

যদুনন্দন দাস শ্রীনিবাস আচার্য্যের জ্যেষ্ঠা কন্যা হেমলতা দেবীর শিষ্য হইলেও শ্রীনিবাস আচার্য্যকে গুরু বলিয়া মানিতেন। যেমন,

শ্রীযুত শ্রীপ্রভু মোর আচার্য্য ঠাকুর। গৌড়ে রাধাকৃষ্ণলীলার ভাণ্ডার প্রচুর॥
রাধাকৃষ্ণপ্রেমময়ী তাঁহার নন্দিনী। শ্রীল শ্রীহেমলতা নাম ঠাকুরাণী॥
তিঁহো পাদধূলি দিল আমার মস্তকে। সেই সে ভরসা মোর হঞাছে অধিকে॥[১]

শ্রীচৈতন্যদাসের দাস ঠাকুর শ্রীশ্রীনিবাস
আচার্য্য আর শ্রীল হেমলতা।
তার পাদপদ্ম আশ এ যদুনন্দন দাস
অম্বষ্ঠ প্রাকৃতে কহে কথা॥[২]

মনে হয় যদুনন্দন প্রথমে শ্রীনিবাস আচার্য্যের অনুচর ছিলেন, পরে আচার্য্যের আদেশে তাঁহার কন্যার আশ্রয়ে যান।

যদুনন্দন জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। বাসস্থান মালিহাটী। ১৫২৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬০৭ খ্রীষ্টাব্দে ইনি কর্ণানন্দ রচনা করেন।[৩] কর্ণানন্দ এবং পদাবলী ব্যতিরেকে যদুনন্দনের চারিটি রচনা পাওয়া যাইতেছে। (১) শ্রীরূপ গোস্বামীর বিদগ্ধমাধব

১। রাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব, ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩৩৫, বা-প্রা-পু-বি ৩-৩, পৃ ৯৬।
২। গোবিন্দলীলামৃত। ৩। ষড়্‌বিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

নাটক অবলম্বনে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণলীলারসকদম্ব বা সংক্ষেপে রসকদম্ব[১] কাব্য, (২) শ্রীরূপ গোস্বামীর দানকেলিকৌমুদী ভাণিকা অবলম্বনে দানলীলাচন্দ্রামৃত[২] কাব্য, (৩) কৃষ্ণদাস কবিরাজের গোবিন্দলীলামৃত মহাকাব্য অবলম্বনে গোবিন্দলীলামৃত[৩] কাব্য, এবং (৪) মূল কৃষ্ণকর্ণামৃত এবং কৃষ্ণদাস কবিরাজের সারঙ্গরঙ্গদা টীকা অবলম্বনে কৃষ্ণকর্ণামৃত[৪] কাব্য।

কর্ণানন্দ এবং কৃষ্ণকর্ণামৃত ব্যতীত অন্য গ্রন্থগুলিতে যদুনন্দন, যদু এবং যদুনাথ এই ত্রিবিধ ভণিতা ব্যবহৃত হইয়াছে। "যদুনাথ" ভণিতা কেবল ছন্দের অনুরোধেই ব্যবহৃত হইয়াছে।[৫]

ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের কবিদের মধ্যে যদুনন্দনের স্থান অতি উচ্চে। পদরচনায় যেরূপ অনুবাদ কার্য্যেও ইনি তুল্যরূপ দক্ষতা দেখাইয়াছেন। ইঁহার রচনাকে ঠিক অনুবাদ বলা চলে না। স্থানে স্থানে আক্ষরিক অনুবাদ থাকিলেও মোটামুটি এগুলিকে সংস্কৃত ছায়াবলম্বনে রচিত কাব্য বলাই সঙ্গত। যদুনন্দনের ত্রিপদী ছন্দে রচনা অতি চমৎকার, ঠিক মনে হয় যেন কৃষ্ণদাস কবিরাজের লেখা পড়িতেছি। কিছু উদাহরণ দিতেছি।

নাদঃ কদম্ববিটপান্তরিতো বিসর্পন্ কো নাম কর্ণপদবীমবিশন্ন জানে।
হা হা কুলীনগৃহিণীগণগর্হণীয়াং যেনাদ্য কামপি দশাং সখি লম্ভিতাস্মি ॥

বিদগ্ধমাধবের এই শ্লোক অবলম্বনে যদুনন্দন লিখিয়াছেন,

কদম্বের বন হৈতে কিবা শব্দ আচম্বিতে
আসিঞা পশিল মোর কানে।
অমৃত নিছিয়া পেলি সুমাধুর্য্যপদাবলী,
কি জানি কেমন করে মনে ॥

১। প্রকাশক শরচ্চন্দ্র শীল (১৩২৭)। আরও সংস্করণ আছে।
২। কেশবচন্দ্র দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৩২৫)।
৩। প্রকাশক মহেশচন্দ্র শীল (১২৭৪)। পরে আরও সংস্করণ বাহির হইয়াছে।
৪। বহরমপুর রাধারমণযন্ত্র হইতে মূল কৃষ্ণকর্ণামৃতের সহিত প্রকাশিত।
৫। HBL, পৃ ২২০-২২১ দ্রষ্টব্য।

সখি হে, নিশ্চয় করিয়া কহি তোরে।
হা হা কুলরমণীর গ্রহণ করিতে ধীর
যাতে কোন দশা কৈল মোরে॥

শুনিয়া ললিতা কহে, অন্য কোন শব্দ নহে,
মোহন মুরলীধ্বনি এহ।
সে শব্দ শুনিঞা কেনে হৈলে তুমি বিমোহনে,
রহ তুমি চিত্তে বাঁধি থেহ॥

রাই কহে, কেবা হেন মুরলী বাজায় যেন
বিষামৃতে মিশাল করিঞা।
হিম নহে, তভু তনু কাঁপাইছে হিমে জনু
প্রতি তনু শীতল করিঞা॥

অস্ত্র নহে, মনে ফুটে কাটারিতে যেন কাটে,
ছেদন না করে হিয়া মোর।
তাপ নহে, উষ্ণ অতি পোড়ায়ে আমার মতি,
বিচারিতে না পাইয়ে ওর॥

এতেক কহিয়া ধনী উদ্বেগ বাড়িল জানি,
নারে চিত্ত প্রবোধ করিতে॥
কহে, শুন আরে সখি, তুমি মিথ্যা কৈলে দেখি,
মুরলীর নহে হেন রীতে॥

কোন সুনাগর এই মোহমন্ত্র পড়ে যেই
হরিতে তোমার[১] ধৈর্য্য যত।
দেখিয়া ঐ সব রীত চমক লাগিল চীত,
দাস যদুনন্দনের মত॥

১। আমার?

গোবিন্দলীলামৃতের অষ্টম সর্গের তিন হইতে আট পর্য্যন্ত এই ছয়টি শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত ছন্দের শ্লোক যদুনন্দন কর্ত্তৃক এইরূপে ভাষান্তরিত হইয়াছে—

সৌন্দর্য্য অমৃতসিন্ধু, তাহার তরঙ্গবিন্দু
তরুণীর চিত্তাদ্রি ডুবায়।
কৃষ্ণরম্যনর্ম্মকথা শুধু সুধাময় গাথা,
তরুণীর কর্ণানন্দময় ॥

সখি হে, কহ এবে কি করি উপায়।
কৃষ্ণাঙ্গমাধুরীছান্দে সর্ব্বেন্দ্রিয়গণ বান্ধে,
বলে পঞ্চেন্দ্রিয় আকর্ষয় ॥

কোটিচন্দ্রসুশীতল অঙ্গ ক্ষিতিতাপহর,
গন্ধসুধা জগৎপ্লাবিত।
অধর অমৃতসার, কি কহিব সখি আর,
বিচারিতে সব বিপরীত ॥

নবীন জলদদ্যুতি, বসন বিজুলি-ভাঁতি,
ত্রিভঙ্গিম বন্যবেশ তায়।
মুখ পদ্ম জিনি চান্দ, নয়ন কমলছান্দ,
মোর নেত্র সেই আকর্ষয় ॥

মেঘ জিনি কণ্ঠধ্বনি, নূপুর কিঙ্কিণী মণি,
মুরলী-মধুরধ্বনি তায়।
সনর্ম্ম বচন-ভাঁতি রমাদির মোহে মতি,
কর্ণস্পৃহা তাহাতে বাঢ়ায় ॥

কৃষ্ণের অঙ্গের গন্ধ মৃগমদ করে অন্ধ,
কুঙ্কুম চন্দন দিল তায়।
অগুরু কর্পূর তাতে যাহাতে যুবতী মাতে,
মোর নাসা সেই আকর্ষয় ॥

বক্ষঃস্থল পরিসর, ইন্দ্রনীলমণিবর
কপাট জিনিয়া তার শোভা।
সুবাহু অর্গলছন্দ, কোটীন্দুশীতল অঙ্গ,
আকর্ষয়ে সেই বক্ষ-লোভা॥
কৃষ্ণাধর অমৃতময়, যার হয় ভাগ্যোদয়
তার লব সেই জন পায়।
কৃষ্ণচর্ব্ব্য পান-শেষ জিনিয়া অমৃতদেশ,
জিহ্বা মোর সেই আকর্ষয়॥
রাধার উৎকণ্ঠাবাণী বিশাখিকা তাহা শুনি
কৃষ্ণসঙ্গ-উপায় চিন্তিতে।
হেন কালে শুন কথা, তুলসী আইলা তথা
গন্ধপুষ্প গুঞ্জার সহিতে॥
কৃষ্ণমাল্যপুষ্প লঞা তুলসী আনন্দ পাঞা
আইলা অতি ত্বরিতগমনে।
তারে প্রফুল্লিত দেখি রাই মনে হইলা সুখী,
কহে দাস এ যদুনন্দনে॥

যদুনন্দন অনেকগুলি উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিয়াছিলেন।

হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য অপর এক যদুনাথ (বা যদুনন্দন) সংগ্রহতোষণী নামক এক বৈষ্ণব সহজসাধন বিষয়ক গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[১] এই যদুনাথ ছিলেন ব্রাহ্মণ, ইঁহার বাসস্থান ছিল কাটোয়ার নিকটে বেগুনকোলা, জন্মস্থান পালিগ্রাম। সংগ্রহতোষণীর যদুনাথ এইরূপ আত্মপরিচয় ও গ্রন্থরচনার হেতু দিয়াছেন[২]—

শ্রীহেমলতার শিষ্য আমি বিপ্রকুলে জন্ম। কণ্টক নগরে বাস কহিলাম মর্ম্ম॥
পালিগ্রামে জন্ম হয় যদুনাথ নাম। ভক্তির অযোগ্য হই সদা অভিমান॥

১। HBL, পৃ ২২-৩০। ২। বীরভূমবিবরণ ৩, পৃ ৩৮-৩৯।

শিবপ্রসাদ পিতা মোর মাতা ব্রহ্মময়ী। আচার্য্য প্রভুর পরিবার যদুনাথ কহি ॥

... ...

ঠাকুরের ঠাকুর মোর শ্রীনিবাস আচার্য্য। তিঁহো কৈলা বৃন্দাবনে গোপালভট্টে পূজ্য ॥

কৃপা করি শ্রীজীব গোঁসাই বহু গ্রন্থ দিল। তার মধ্যে সংগ্রহ গ্রন্থ সত্বরে ধরিল ॥
সংগ্রহ ছেদন ইথি সূত্র বৃত্তি মানি। শ্লোকময় সমস্কার[1] বুঝিতে না জানি ॥
হেন গ্রন্থ আচার্য্য প্রভু আমাকে সমর্পণ। নয় পত্র গ্রন্থ ইথে ষড়্ দরশন ॥
প্রভু মোরে পড়াইল নিভৃতে বসিয়ে। পয়ার করহ যদু উপাসনা দিয়ে ॥
হেন আজ্ঞায় হেমলতার চরণপ্রত্যাশ। সংগ্রহ পয়ার লেখেন যদুনাথ দাস ॥

... ...

তথাপিহ পুনঃ পুনঃ লিখিতে প্রকাশ। হেমলতা যার ইষ্ট বেগুনকোলায় বাস ॥

সংগ্রহতোষণীতে বিল্বমঙ্গল, জয়দেব, চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি এবং রায় শেখর এই পাঁচজন রসিক ভক্তের পরকীয়া-সাধনের কথা আছে।

রামগোপাল দাস রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীতে স্বীয় জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা মদন রায় সম্বন্ধে বলিয়াছেন "গোবিন্দলীলামৃত ভাষা কৈল পদাবলী"। ইনি কি গোবিন্দলীলামৃতের অনুবাদ করিয়াছিলেন?

শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের সপ্তচত্বারিংশ অধ্যায়ের ১২-২১ এই দশটি শ্লোক ভ্রমরগীতা নামে প্রসিদ্ধ। শ্লোকগুলি একটি ভ্রমরকে উপলক্ষ্য করিয়া দূর-প্রবাসী কৃষ্ণের প্রতি এক বিরহিণী গোপীর উক্তি। শ্লোক কয়টি শ্রীরূপ গোস্বামী উজ্জ্বলনীলমণিতে সুন্দর রূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এই ব্যাখ্যা সমেত শ্লোকগুলিকে অবলম্বন করিয়া একাধিক কবি কাব্য রচনা করিয়াছেন। এই কাব্যগুলির মধ্যে যদুনাথ দাসের ভ্রমরগীতাই সমধিক প্রসিদ্ধ।[2]

যদুনাথের ভ্রমরগীতা পাঁচ অধ্যায়ে সমাপ্ত। কবি কাব্যের নাম দিয়াছেন মাথুরবর্ণনা। মনে হয়, ইহা কবি প্রণীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-জাতীয় কাব্যের অংশমাত্র। সমাপ্তি এইরূপ—

১। সংস্কৃত? ২। ব-সা-প পুঁথি ২৯২-২৯৪, বা-প্রা পু-বি ৩-৩, পৃ ৯১-৯৩।

এইরূপে ভ্রমর চলিয়া গেল বনে। বিরহ সম্বরি গোপী গেল নিজস্থানে ॥
শ্রদ্ধা করি যেবা ইহা করয়ে শ্রবণ। অনুরাগে পায় রাধাকৃষ্ণের চরণ ॥
শ্রীরাধাগোবিন্দপদ মনে করি আশ। মাথুরবর্ণনা কহে যদুনাথ দাস ॥

দেবনাথ দাস[১] এবং রূপনাথ দাস[২] কৃত ভ্রমরগীতা কাব্যের পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। রূপনাথ দাসের কাব্যের শ্লোকসংখ্যা ১৫০।

বংশীদাস নামে এক কবি শ্রীরূপ গোস্বামি-বিরচিত নিকুঞ্জরহস্যস্তবের অনুবাদ করেন তেত্রিশটি ব্রজবুলি পদে।[৩] কবি কি শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য ছিলেন ?

শ্রীরূপ গোস্বামীর উদ্ধবসন্দেশ বা উদ্ধবদূত এবং হংসদূত কাব্য একাধিক কবির উপজীব্য হইয়াছিল। "দ্বিজ" নরসিংহের উদ্ধবসংবাদ[৪] তৎকৃত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল বলিয়া বোধ হয়।

[শ্রী]কৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ নরসিংহ ভণে।
দশম স্কন্ধের কথা উদ্ধবগমনে ॥

রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি হংসদূত কাব্যের পুঁথিতে নরসিংহ, যদুনাথ এবং লুটীরাম এই তিন জনের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে।[৫]

মাধব গুণাকরের উদ্ধবদূতের শ্লোকসংখ্যা ৭৮০। ইনি বর্দ্ধমানের রাজা গজসিংহের (?) সভাসদ্ ছিলেন। ইহার পিতা কবিচন্দ্র, পিতামহ কবিশেখর, ইহারা ব্রাহ্মণ। বাসস্থান ছিল বর্দ্ধমানের নিকটে তাড়িত বা তালিত গ্রাম।

তাড়িত নামেতে গ্রাম অতি অনুপাম। কবিশেখরের পুত্র কবিচন্দ্র নাম ॥
তার পুত্র মাধব নামেতে গুণাকর। পরম পণ্ডিত ছিল সর্ব্বগুণধর ॥
গজসিংহ নামে রাজা ছিল বর্দ্ধমানে। তার সভাসদ্ ছিল দ্বিজ সর্ব্বগুণে ॥
উদ্ধবদূত গ্রন্থ করিল রচন। তাহা শুনি মুগ্ধ হয় যত সভাজন ॥[৬]

বিষ্ণুরাম নন্দী প্রণীত এক উদ্ধবগীতা কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।[৭]

১। ব-সা-প-প ৬, পৃ ৬৩। ২। ব সা প-প ৪, পৃ ৩১৫-২৬।
৩। HBL, পৃ ১৮৯। ৪। বা-প্রা-পু-বি ৩-৩, পৃ ১০১।
৫। ব-সা-প প ১৬, পৃ ১৯১। ৬। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩০১।
৭। আরতি ১৩০৮ দ্বিতীয় বর্ষ অষ্টম সংখ্যা, বা-প্রা-পু-বি ১ ১, পৃ ১৫৬।

বাঙ্গালা হংসদূত কাব্যের রচয়িতা নরসিংহ উদ্ধবদূতের রচয়িতা হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে হয়। শেষোক্ত কবি ব্রাহ্মণ ছিলেন, নিজেকে "দ্বিজ" বলিয়াছেন। আর প্রথম কবির নাম নরসিংহ দাস রূপেই পাওয়া যাইতেছে।[১] সুতরাং ইনি ব্রাহ্মণ ছিলেন না বলিয়াই বোধ হয়।

নরসিংহ দাসের হংসদূত বিংশতি অধ্যায়ে সমাপ্ত। ভণিতা এইরূপ—

হংসকে করিঞা দূত পাঠাই অবশেষে।
হংসদূত কথা কহে নরসিংহ দাসে॥

শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ মনে করি আশ।
ভাষাচ্ছন্দে কৈল পুঁথি নরসিংহ দাস॥

হংসদূত ইতিহাস গোপীর বচন।
নরসিংহ দাস কহে শুন জগজন॥ ইত্যাদি।

এক নরসিংহ দাস রচিত ২৫০ শ্লোকে গ্রথিত দর্পণচন্দ্রিকা[২] পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার গুরুর নাম মুকুন্দ।

শ্রীমুকুন্দ পাদপদ্মে সদা যার আশ। দর্পণচন্দ্রিকা কহে নরসিংহ দাস॥

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিলাপকুসুমাঞ্জলি অবলম্বনে দুইটি কাব্য পাওয়া গিয়াছে। রাধাবল্লভ দাসের বিলাপকুসুমাঞ্জলি[৩] সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে রচিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়। ইনি শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য ছিলেন।[৪]

কৃষ্ণচন্দ্র দাসের অনুবাদের নাম বিলাপবিবৃতিমালা। ইহা ১৭১৫ শকে অর্থাৎ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। ইঁহার জ্যেষ্ঠ প্রপিতামহ রতিকান্ত ঠাকুর, গুরু লালবিহারী। ইঁহারা শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের বংশ।[৫]

রঘুনাথ দাস গোস্বামীর মুক্তাচরিত্র অবলম্বনে নারায়ণদাস একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যটি ছয়টি স্তবকে বিভক্ত। কাব্যটির শ্লোকসংখ্যা প্রায়

১। বা-প্রা-পু-বি ৩-৩, পৃ ৯৭-১০০। ২। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩১৮।
৩। বা-প্রা-পু বি ৩ ৩, পৃ ১৩৮, ১৫৯-৬০। ৪। HBL, পৃ ১৬৬।
৫। ব-সা-প-প ২, পৃ ২০২।

২০০০। কাব্যের রচনাকাল-জ্ঞাপক যে পয়ার আছে তাহার দুইটি পুঁথিতে বিভিন্ন পাঠ পাওয়া গিয়াছে। প্রথম পাঠে স্পষ্টতঃ কিছু কিছু ভুল রহিয়াছে।

ঋতু বেদ রস চন্দ্র গগন বিদিতে।
মুক্তাচরিত্র ভাষা হইল উদিতে ॥[১]

ঋতু বেদ অম্বু চন্দ্র গণনা সঙ্কেতে।
মুক্তাচরিত্র ভাষা হইল বিদিতে ॥[২]

প্রথম পাঠ ধরিলে ১৬৪৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দ এবং দ্বিতীয় পাঠ ধরিলে ১৫৪৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬২৪ খ্রীষ্টাব্দ পাওয়া যায়। দ্বিতীয় পাঠই সঙ্গততর, কেন না কবির উক্তি অনুধাবন করিলে মনে হয় যে তিনি শ্রীনিবাস আচার্য্যের পৌত্র জগদানন্দের শিষ্য ছিলেন।

জয় জয় প্রভু মোর আচার্য্য শ্রীনিবাস। গৌড়দেশে প্রেম বলে যে কৈল প্রকাশ ॥
শ্রীরূপের গ্রন্থ সব রত্নচিন্তামণি। বৃন্দাবন হৈতে যত্নে আনিলা আপনি ॥
গৌড়দেশে এই রত্ন সভাকারে দিল। প্রেমধনে মহাধনী জগতে করিল ॥
সাধ্যসাধন তত্ত্ব না জানি জিজ্ঞাসা। রসসম্পদ চিত্তে এই সে ভরসা ॥
প্রভু শ্রীজগদানন্দ-পাদপদ্ম আশ। মুক্তাচরিত্র কহে নারায়ণদাস ॥

নীলাচল-মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যে কয়টি কাব্য বা নিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে গদাধর দাসের জগন্নাথমঙ্গল বা সংক্ষেপে জগৎমঙ্গল[৩] প্রাচীনতম এবং শ্রেষ্ঠতম। এখানে জয়ানন্দ ইত্যাদির কথা ধরিতেছি না, কারণ তাঁহাদের রচিত নীলাচল-মাহাত্ম্যের পুঁথিগুলি চৈতন্যমঙ্গল ইত্যাদি বৃহত্তর গ্রন্থের অংশ মাত্র। গদাধর কাশীরাম দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা, ইঁহাদের এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, নাম কৃষ্ণদাস। ইঁহাদের বিস্তৃত পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি।

গদাধর ১৫৬৪ শকাব্দে ১০৫০ সালে (উড়িষ্যার হিসাবে) অর্থাৎ ১৬৪২ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন। গ্রন্থরচনা কাল ও সূত্র কবির কথায় দিতেছি।

১। ব-প্রা-পু-বি ৩-৩, পৃ ১৫৬। পুঁথিটি ১১০৩ সালের (মল্লাব্দ ?)।
২। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩৩১। ৩। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত (১৩১০)।

চতুঃষষ্টি শকাব্দ সহস্র পঞ্চ শত। সহস্র পঞ্চাশ সন দেখা লিখা মত॥
নরসিংহ দেব নামে উৎকলের পতি। পরম বৈষ্ণব জগন্নাথ ভজে নিতি॥

রাজচক্রবর্ত্তী সাহ জাঁহা দিল্লিপতি। ধর্ম্মন্যায়ে তোষণ করিল বসুমতী॥
রাজ্যের হইল পতি সন পঞ্চদশ। মহান্ প্রতাপী হয় বৈরিজয়যশ॥
উৎকলে উত্তম গণি কটক নগর। মাখনপুরেতে গ্রাম তাহার ভিতর॥
বিষয়ীর বাড়ী স্থিতি সেই বরস্থান। দুর্গাদাস চক্রবর্ত্তী পড়িল পুরাণ॥
শুনিয়া পুরাণ বড় ইচ্ছা হৈল মনে। পাঁচালীর মত রচি শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনে॥
নাহি সন্ধিজ্ঞান না পড়িল ব্যাকরণ। কেবল মূর্খের মত করিল রচন॥
পণ্ডিত যে জন দোষ ইহা না লইবে। যদি বা অশুদ্ধ হরিপ্রসঙ্গ জানিবে॥

জগন্নাথমঙ্গল চতুঃপঞ্চাশ পরিচ্ছেদে সমাপ্ত। কবি স্কন্দপুরাণের অন্তর্গত উৎকলখণ্ড অনুসরণ করিয়াছেন।

স্কন্দপুরাণেতে শুনি উৎকলখণ্ডেতে। গদাধর দাস কহে পাঁচালীর মতে॥

জগন্নাথ নামে সুধা- গানেতে প্রচুর ক্ষুধা,
এই মোর সদা অভিলাষ।
কমলাকান্তের সুত স্কন্দপুরাণের মত
গীতে গায় গদাধর দাস॥

কাব্যটি বর্ণনাত্মক বলিয়া অধিক পরিচয় দেওয়া গেল না। ভণিতা এইরূপ—

জগন্নাথপাদপদ্ম সদা অভিলাষ।
জগৎমঙ্গল কহে গদাধর দাস॥

গদাধর দাসের মত সকল কবিই যদি সুবিস্তৃত ভাবে বংশ ও আত্মপরিচয় দিতেন, তবে বাঙ্গালা দেশে সাহিত্যের ইতিহাস লেখা অনেক সুগম হইত।

"দ্বিজ" মুকুন্দ বা মুকুন্দ ভারতীর জগন্নাথবিজয়[১] বা জগন্নাথমাহাত্ম্য[২] বা

[১] বা-প্রা-পু-বি ৩-৩, পৃ ৮৪-৮৬; ব-সা-প-প ৭, পৃ ২১৬-২২৯।
[২] বা-প্রা-পু বি ৩-৩, পৃ ৮৬-৮৭।

জগন্নাথচরিত্র[১] বা ব্রহ্মপুরাণ[২] সপ্তদশ অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। সকল পুঁথিতে অধ্যায় বিভাগ নাই। কবি বলেন, তিনি ব্রহ্মপুরাণ হইতে উপাদান প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

ব্রহ্মপুরাণের কথা শুনিঞা শ্রবণে। পাঁচালী প্রবন্ধে তাহা রচিব বিধানে॥

কবি জগন্নাথকে বৌদ্ধমূর্ত্তি বলিয়াছেন।

তবে ত্রিজগৎনাথ বৌদ্ধ রূপ ধরে। প্রবেশ করিল সেহি দেউলের ভিতরে॥
মুক্তিপদ পাইব লোক কীর্ত্তিয়ে তোমার। লোকপরিত্রাণ হেতু বৌদ্ধ-অবতার॥
ক্ষেত্রের মাহাত্ম্য রাজা কহিব তোমারে। আমি যাথে বিরাজিত বৌদ্ধ-অবতারে॥

ভণিতায় কবির নাম "দ্বিজ" মুকুন্দ এবং মুকুন্দ ভারতী উভয় রূপেই পাওয়া যায়।

নানা উৎপাত হইল দ্বারিকা নগরে। দ্বিজ মুকুন্দ ভণে বৌদ্ধ-অবতারে॥
জগন্নাথবিজয় কথা শুন এক মনে। ভারতী মুকুন্দ ভণে শ্রীকৃষ্ণচরণে॥

"দ্বিজ" দয়ারামের জগন্নাথমাহাত্ম্য[৩] ক্ষুদ্র নিবন্ধ। ইহাতে একুশটি পদ আছে। উৎকলখণ্ড অবলম্বনে নিবন্ধটি রচিত।

"দ্বিজ" মুকুন্দ ও "দ্বিজ" দয়ারামের কাল জানা নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর লোক হওয়া অসম্ভব নহে মনে করিয়া গদাধর দাসের কাব্যের সহিত এই দুইটি নিবন্ধের আলোচনাও করা গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত জগন্নাথমাহাত্ম্য কাব্য বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইবে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে শ্রীরূপ গোস্বামী প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব রসালঙ্কার বিষয়ক কতকগুলি নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল। এই জাতীয় গ্রন্থ নন্দকিশোর দাসের রসকলিকা বা রস-পুষ্পকলিকার পরিচয় পূর্ব্বে দিয়াছি। এখন সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত নিবন্ধ-গুলির কথা বলিব। পদসংগ্রহ গ্রন্থের পূর্ব্বতন রূপ হিসাবেও এই নিবন্ধগুলির যথেষ্ট মূল্য আছে।

১। ঐ, পৃ ৮৭-৮৮। ২। ঐ, পৃ ৮৯-৯০।
৩। ১৩১৩ সালের ২৪শে মাঘ সংখ্যার শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া পত্রিকায় কাঙ্গালচন্দ্র নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত; বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ২০।

গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র, দিব্যসিংহের পুত্র ঘনশ্যামদাস শ্রীনিবাস আচার্য্যের পুত্র গোবিন্দগতি বা গতিগোবিন্দের শিষ্য ছিলেন। ইনি একজন বড় পদকর্ত্তা ছিলেন। ইনি গোবিন্দরতিমঞ্জরী[১] বলিয়া সংস্কৃতে একটি ব্রজলীলাত্মক বৈষ্ণব রসালঙ্কার বিষয়ক নিবন্ধ রচনা করেন। ইহাতে স্বরচিত প্রায় ৫০টি পদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালী কবির সংস্কৃত কাব্য রচনার সুন্দর নিদর্শন এই গোবিন্দরতিমঞ্জরী। কাব্যাত্মক নিবন্ধটি পাঁচ স্তবকে বিভক্ত। স্তবকগুলির নাম যথাক্রমে গোবিন্দরত্যঙ্কুর, গোবিন্দরতিপল্লব, গোবিন্দরতিকোরক, গোবিন্দরতিপ্রসূন, গোবিন্দরত্যামোদ।

প্রথম তিনটি শ্লোকে গুরুবন্দনা। তন্মধ্যে প্রথম শ্লোকটি এই—

স শ্রেয়ানিহ দিব্যসদ্‌গুণযুষামদ্বৈত নাম প্রভু-
র্নিত্যানন্দরসপ্রবর্ষকঘনশ্যামান্তরুল্লাসকঃ।
গান্ধর্ব্বীয়কলাবিলাসবসতির্গানপ্রবীণঃ স্বয়ং
শ্রীগোবিন্দগতিঃ প্রভুর্নবনবপ্রেম্নাং জয়ত্যাশ্রয়ঃ॥ ১॥

তাহার পর তিনটি শ্লোকে ও একটি পদে শ্রীচৈতন্যের বন্দনা। তন্মধ্যে দ্বিতীয় শ্লোকটি এই—

সিন্ধুবিন্দুমপি প্রযচ্ছতি নহি স্বৈরী ন ধারাধরঃ
সঙ্কল্পেন বিনা দদাতি ন কদাপ্যল্পঞ্চ কল্পদ্রুমঃ।
স্বচ্ছন্দোঽপি বিধুঃ সুধাবিতরণে রাত্রিন্দিবাপেক্ষতে
ধত্তে কোঽপি ন দৃশ্যতে ত্রিভুবনে শ্রীগৌরচন্দ্রোপমাম্॥ ৫॥

তৎপরে দুই শ্লোকে ও এক পদে নিত্যানন্দ প্রভুর বন্দনা। তাহার পর দুই শ্লোকে শ্রীরূপ সনাতন শ্রীজীব ও গোবিন্দদাস কবিরাজের কাব্য প্রশংসা। তন্মধ্যে প্রথম শ্লোকটি এই—

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ৩৫২। বেণীমাধব দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত সংস্করণে কিছু ছাড়বাদ আছে।

তাবদ্ গীতিসপদ্যগদ্যরচনাং কর্ত্তুং স্পৃহা জায়তে
গর্ব্বস্তাবদহো অহং কবিরিতি প্রায়েণ খর্ব্বো ন হি।
শ্রীমদ্রূপসনাতনানুকথনং শ্রীজীবগোস্বামিনঃ
শ্রীগোবিন্দকবের্বিচিত্রকবিতা যাবন্ন কর্ণং ব্রজেৎ ॥ ৯ ॥

তাহার পর নিজের কাব্যরচনাপ্রচেষ্টার কথা—

তেষামঙ্ঘ্রিমহোপলাধিমুকুটং যঃ কিঞ্চিদারভতে
তস্যাভীপ্সিতসিদ্ধিরাশু কৃপয়া তৈরেব নিষ্পাদ্যতে।
ইত্যালোচ্য বিমুচ্য ভীতিরভিতঃ সানন্দমত্রোদ্যতঃ
শ্রীবৃন্দাবনকেলিবর্ণনবিধৌ শ্রীদিব্যসিংহাত্মজঃ ॥ ১১ ॥

তাহার পর আরও কয়েকটি শ্লোকে হরিলীলার প্রশংসা করিয়া প্রথম স্তবকের সমাপ্তি। প্রত্যেক স্তবকের প্রথমে ও শেষে বন্দনা বা আশীর্ব্বাদাত্মক শ্লোক আছে।

ঘনশ্যামদাস যে সংস্কৃত বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলিতে কবিতা রচনায় বিলক্ষণ দক্ষ ছিলেন তাহার অসন্দিগ্ধ পরিচয় আলোচ্য কাব্য বা নিবন্ধটিতে পাওয়া যায়।

ঘনশ্যামদাসের ভণিতাযুক্ত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল এবং ভারত-পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে। ঘনশ্যাম কবিরাজই এই কাব্যদ্বয়ের রচয়িতা কিনা তাহা ঠিক করিয়া বলা যায় না।

রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী[১] প্রণেতা রামগোপাল দাস বা গোপাল দাস বৈদ্যবংশীয়, বাস শ্রীখণ্ডে। ইনি ছিলেন শ্রীখণ্ডের রতিকান্ত ঠাকুরের শিষ্য। পিতার নাম শ্যাম রায়, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মদন রায়, পুত্রের নাম পীতাম্বর। নিজ পরিচয় গ্রন্থকার এইরূপ দিয়াছেন—

একমাত্র (?) জন্ম খণ্ডে বৈদ্যবংশে।
দুই চারি উপর পুরুষ বৈষ্ণব প্রশংসে॥

শ্রীখণ্ডের সম্প্রদায় একবার যখন নীলাচলে শ্রীচৈতন্যদর্শনে গিয়াছিলেন তখন তাঁহাদের মধ্যে চক্রপাণি আর মহানন্দ নামে দুই ভাই ছিল। তাহারা শ্রীচৈতন্যের কৃপালাভ করিয়া ধন্য হয়। চক্রপাণি হইতেছে রামগোপালের বৃদ্ধ প্রপিতামহ।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় পুঁথি ৪০৫১, ব-সা-প প ৩৭, পৃ ৯৯-১২৪, HBL, পৃ ৭-৮, প্রদীপ ১৩১২, পৃ ১৬২-৬৭।

চিরঞ্জীব সুলোচনের কথা আছয়ে বর্ণন। চক্রপাণি মহানন্দ আর তঁহি দুই জন॥
নীলাচলে গেলা দোঁহে মহাপ্রভুর গোচর। রঘুনন্দনের সেবক কৃপা করিল বিস্তর॥
দুই ভাইয়ের শিরে চরণ ঠেকাইল। কৃষ্ণসেবা করিতে দুই জনে আজ্ঞা দিল॥
মহানন্দে কহিল ইঁহো অকিঞ্চন বৈষ্ণব। চক্রপাণিকে কহিলেন ইহার হইবে বৈভব॥
সেই আজ্ঞাতে দুই ভ্রাতা খণ্ডকে আইলা। সরকার ঠাকুর কৃপা অনেক করিলা॥
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র ঠাকুর দিল সেবা করিতে। দুই ভ্রাতার সেবাধর্ম্ম ঘোষে জগতে॥
চক্রপাণির পুত্র চতুর্ধুরী নিত্যানন্দ। বৃন্দাবনচন্দ্রসেবা পরম আনন্দ॥
তাহার তনয় এক চতুর্ধুরী গঙ্গারাম। তাহার জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যাম রায় নাম॥
তাহার তনয় শ্রেষ্ঠ মদন রায় নাম। বৈষ্ণবসেবাতে হয়ে অতি অনুপাম॥
গোবিন্দলীলামৃত ভাষা কৈল পদাবলী। সদা বাঞ্ছেন তিঁহো বৈষ্ণবপদধূলি॥
তাহার অনুজ গোপাল মোর নাম। দুষ্টশীল কুলাঙ্গার বিষয়তৃষ্ণকাম॥
অল্পকালে পিতৃবিয়োগ না হইল অধ্যয়ন মাতা চন্দ্রাবলী নাম করিল পালন॥
মাতামহ মহাবংশ গৌরাঙ্গদাস মহাশয়। প্রমাতামহ মধুসূদন বৈষ্ণব-আশয়॥
কৃষ্ণসঙ্কীর্ত্তনে তিঁহ করেন বায়ন। যাহে নৃত্য করেন শ্রীশ্রীরঘুনন্দন॥

রামগোপাল স্বীয় গুরুবংশের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

জয় জয় শ্রীমুকুন্দদাস নরহরি। জয় রঘুনন্দন কন্দর্পমাধুরী॥
জয় পূর্ণানন্দ কৃপাময় ঠাকুর কাহ্নাই। ত্রিভুবনে যাহার বংশীর তুলনা দিতে নাই॥
জয় শ্রীরায় ঠাকুর মদনমোহন নাম। তাহার তনয় পঞ্চ সর্ব্বগুণধাম॥
তাহার বংশে মোর ইষ্ট ঠাকুর শ্রীরতিকান্ত। রাধাকৃষ্ণপ্রেমদাতা পরম নিতান্ত॥
জয় জয় গুরুদেব শ্রীরতিপতি। তাহার চরণে মোর অসংখ্য প্রণতি॥
জয় জয় ঠাকুরপুত্র শ্রীশচীনন্দন। জয় প্রাণবল্লভ ঠাকুরের চরণ॥
জয় কনিষ্ঠ ঠাকুরপুত্র যাদবেন্দ্র নাম। এই তিন ঠাকুরপুত্র সর্ব্বগুণে অনুপাম॥
ঠাকুরের কনিষ্ঠ ঠাকুর ঘনশ্যাম। তাঁহার তনয় ঠাকুর পুরুষোত্তম নাম॥
শ্রীরঘুনন্দনের বংশাবলী অনেক বিস্তার অখিল ভুবনে কৈলে প্রেমপ্রচার॥

রামগোপাল স্বীয় শিক্ষাগুরুগণের এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

শ্রীব্রজদেবীদাস ঠাকুর অনেক কহিল মহিমা।
... ...
শ্রীরূপ ঘটক ঠাকুর কহিল গ্রন্থসন্ধান।
রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য করাল্য অধ্যয়ন ॥
শ্রীগিরিধর চক্রবর্ত্তীর সঙ্গে অনেক কথা জানি।
জয়রামদাস ঠাকুর স্থানে স্তব কতক শুনি ॥
গৌরগতি দাস জানাইল বৈষ্ণববন্দনা।
পিতৃব্য রাধাকৃষ্ণ দাস কৈল প্রভুকে সমর্পণা ॥
[শ্রী]খণ্ড জাজিগ্রাম আর শুদপুর।
সভা সঙ্গে ওলা মেলা হইল প্রচুর ॥
... ...
শ্রীমুকুন্দদাস গোস্বামী আর অধিকারী।
সভার স্থানে কথা শুনি দুই চারি ॥

রতিপতি ঠাকুর দেহত্যাগের অল্প কিছুদিন পূর্ব্বে রামগোপালকে রাধাকৃষ্ণ-লীলারসতত্ত্ব বিষয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। তাহাই কবিকে এই গ্রন্থ রচনায় প্রেরণা দিয়াছিল।

পরম দয়াল প্রভু করুণাপ্রচুর। অদোষদর্শী প্রভু আমার ঠাকুর ॥
শেষকালে ঠাকুর মোরে করুণা করিয়া। পঞ্চ দিবস [তত্ত্ব] কহিল বিবরিঞা ॥
রাধাকৃষ্ণ-উজ্জ্বললীলামাধুর্য্য অতিশয়ে। রাগনিষ্ঠা প্রেমসেবা মাধুর্য্য অতিশয়ে ॥
এই সকল কথা প্রভু কহিল অল্লাক্ষরে। অল্প মেধা মোর নহিল অন্তরে ॥
সঙ্কীর্ত্তন করিয়া প্রভু গেলা আতৌহাটে[১]। মহাপ্রভু সন্নিধি গঙ্গার নিকটে ॥
বৃন্দাবন নীলাচল করেন স্মরণ। রাধাকৃষ্ণ চৈতন্য কহেন গদগদ বচন ॥
জ্যৈষ্ঠ মাসে শুক্লা পঞ্চমী দিবসে। অপ্রকট প্রভু লোকে এই কথা ঘোষে ॥
আমি যে প্রকট রূপ দেখি নিরন্তর। জন্মে জন্মে দুই ভাইয়ের কিঙ্করের কিঙ্কর ॥

১। অর্থাৎ আতাইহাট।

শ্রীনিবাস আচার্য্যের এক শিষ্যের কথায় রামগোপাল গ্রন্থটি রচনা করেন।

জাজিগ্রামে মহাশয় শ্রীআচার্য্য ঠাকুর। রাধাকৃষ্ণ-উজ্জ্বলরসলীলাপরিপূর ॥
তাহার প্রিয় শ্রীরামচরণ চক্রবর্ত্তী ঠাকুর নাম। বসতি গঙ্গার পার ফরিদপুর গ্রাম ॥
এক সেবকে তিঁহো রাধাকৃষ্ণ মন্ত্র দিলা। আমাকে তাঁহাকে তিঁহো সমর্পণ করিলা ॥
ইহা পঞ্চতত্ত্ব যত আদি লীলা। আপনে কহিয় আমাকে কহিলা ॥
সেই উপরোধে ভাষা কহি দুই চারি। কৃষ্ণকথা গাঁথিলে হয় অবশ্য মাধুরী ॥

রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী ১৫৯৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৭৩ খ্রীষ্টাব্দে কার্ত্তিক মাসে বুধবারে দীপান্বিতা অমাবস্যায় সমাপ্ত হইয়াছিল। বৈশাখ মাসে গ্রন্থ আরম্ভ হইয়াছিল।

আরম্ভ করিল গ্রন্থ প্রথম বৈশাখে। বাণ অঙ্ক শর ব্রহ্ম নরপতি শকে ॥
সপ্তমাস অবলম্বন কার্ত্তিকে সম্পূর্ণ। বুধযুক্ত কুহূ তিথি দীপযাত্রা প্রত্যাসন্ন ॥
শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্রের সেবা মধ্যাহ্ন-আরতি। পুস্তক হইলে কইলাঙ দণ্ডবৎ নতি ॥
কেতুগ্রামে আরম্ভ সম্পূর্ণ বৈদ্যখণ্ডে। বৈষ্ণব গোসাঞি দর্শন পাইল সেই দণ্ডে

কোন কোন পুঁথিতে "বাণ অঙ্গ শর ব্রহ্ম" পাঠ পাওয়া যায়।[১] তাহা হইলে ১৫৬৫ অথবা ১৫৮৫ শকাব্দ হয়। কিন্তু এই দুই সালে বার তিথি ইত্যাদি মিলে না। 'অঙ্ক' পাঠে ঠিক মিলিয়া যায়। বাঁকুড়ার এক পুঁথির ভণিতায় আছে—

সন হাজার উনাশী যাবনী বৎসর।
গ্রন্থ রচিল গোপাল দাস ভিষক্‌বর ॥

১০৭৯ সাল ১৫৯৫ শকাব্দই বটে।

রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীর অধ্যায়ের নাম "কোরক"। দ্বাদশ কোরকে গ্রন্থ সম্পূর্ণ। গ্রন্থশেষে কবি এই "অনুবাদ" দিয়াছেন—

প্রথম কোরকে কহিলাম মঙ্গলাচরণ। দ্বিতীয় কোরকে কহিলাঙ নায়কবর্ণন ॥
তৃতীয় কোরকে কহিল নায়িকাপরিবার। চতুর্থ কোরকে কহিলাঙ ভাবের বিচার ॥

১। ব-সা-প-প ৪২, পৃ ৩৬।

পঞ্চম কোরকে কহিলাম নায়িকাবর্ণন। ষষ্ঠমে বিপ্রলম্ভের দিগ্‌দর্শন ॥
সপ্তমে কহিলাঙ ভক্তি-অনুরাগ। অষ্টমে কহিল নায়িকাবিভাগ ॥
নবমে কহিল সম্ভোগবিবরণ। দশমে কহিল তাহার বিশেষ বচন ॥
একাদশ কোরকে নানা লীলা কৈল। দ্বাদশ [কোরকে] গ্রন্থ সম্পূর্ণ হইল ॥

রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীতে বহু কবির পদ উদ্ধৃত করা আছে।[১] তন্মধ্যে কতকগুলি গ্রন্থকারের নিজস্ব। রামগোপাল দাস বা গোপাল দাস একজন ভাল পদকর্ত্তা ছিলেন।[২]

রামগোপাল দাসের শাখানির্ণয় পুস্তিকার আলোচনা পূর্ব্বে করা গিয়াছে। ইহার রচিত আর একটি নিবন্ধের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, নাম চৈতন্যতত্ত্বসার।[৩] পুঁথির লিপিকাল ১০৮১ সাল। ইহা মল্লাব্দ না হইলে গ্রন্থকারের সমসাময়িক হইবে। গ্রন্থকার যে শ্রীখণ্ডের রামগোপাল দাস তাহা ভণিতা হইতে জানিতে পারা যায়।

শ্রীমধুমতীচরণে যার অভিলাষ।

রামগোপাল দাসের পুত্র পীতাম্বর পিতার আজ্ঞায় রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীর অষ্টম কোরক অর্থাৎ নায়িকাবিভাগ অবলম্বন করিয়া একটি ক্ষুদ্র নিবন্ধ লেখেন। বইটির নাম রসমঞ্জরী।[৪] রামগোপালের গুরু রতিপতি ঠাকুরের পুত্র শচীনন্দন ঠাকুর পীতাম্বরের গুরু। এইরূপে গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে—

বন্দোঁ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যপ্রিয় গদাধর। বন্দোঁ নিত্যানন্দচন্দ্র অদ্বৈত ঈশ্বর ॥
বন্দোঁ আর নরহরি শ্রীরঘুনন্দন। বন্দোঁ গুরু বৈষ্ণব আর মহাজন ॥
শ্রীশচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার। শ্রীখণ্ড মহাস্থানে বসতি যাঁহার ॥
... ...
রসকল্পবল্লী গ্রন্থে অষ্টম কোরকে। তাহা সূক্ষ্ম করি[তে] পিতা আজ্ঞা দিল মোকে ॥

১। HBL, পৃ ৮, ব সা-প-প ৩৭, পৃ ১১৬।
২। HBL, পৃ ১৪৫। ৩। ব-সা-প প ৬, পৃ ৫৬।
৪। নগেন্দ্রনাথ বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও ব-সা প কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৩০৬)। HBL পৃ ৮, ২৪৭; ব সা প পুঁথি ১৯৯; বা-প্রা-পু-বি ৩ ২, পৃ ১৬৯-৭০।

তাহার কড়চায় সব আছয়ে বর্ণন। গ্রন্থবিস্তার হেতু তেঁহো না কৈল লিখন ॥
সেই অষ্ট দলের কতক মঞ্জরী পাইল। শ্রীরসমঞ্জরী বলি গ্রন্থ জানাইল ॥

রসমঞ্জরীতে আটটি অধ্যায় আছে। এক একটি অধ্যায়ে অভিসারিকা আদি এক এক প্রকার নায়িকার লক্ষণ ও প্রকারভেদ বর্ণিত আছে। নিবন্ধটিতে কয়েকটি পদকর্ত্তার পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার মধ্যে পিতার পদ এবং পীতাম্বরের নিজের পদও একটি আছে। সর্ব্বাপেক্ষা মূল্যবান্ হইতেছে যশোরাজ খানের পদটি। এইটি প্রাচীনতম ব্রজবুলি পদের মধ্যে একটি। সঙ্গীতদামোদর, সঙ্গীত-শেখর, কাব্যসন্তোষ ইত্যাদি কতিপয় গ্রন্থ হইতে প্রমাণশ্লোকাদি উদ্ধৃত হইয়াছে।

পীতাম্বর দাস রচিত এইজাতীয় একটি দ্বিতীয় নিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে, নাম অষ্টরসব্যাখ্যা।[১] ইহাতে প্রায় নয় দশটি কবির পদ উদ্ধৃত হইয়াছে, কিন্তু নিবন্ধকারের স্বরচিত পদ একটিও নাই। ভণিতা এই—

শচীনন্দন প্রভু ঠাকুর আমার।
শ্রীখণ্ড মহাপাটে বসতি যাহার ॥

মনোহর রায় প্রণীত দিনমণিচন্দ্রোদয়[২] সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত বৈষ্ণব তত্ত্বনিবন্ধের মধ্যে একটি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। মনোহর গ্রন্থটির মধ্যে আত্মপরিচয় যাহা দিয়াছেন তাহা হইতে জানিতে পারা যায় যে, রামানন্দ রায়ের অন্যতম ভ্রাতা বাণীনাথ ছিলেন ইঁহার প্রপিতামহ। বাণীনাথের পৌত্র গোবিন্দানন্দ কটকে বসবাস করেন। নিত্যানন্দ এবং মনোহর এই দুই পুত্র রাখিয়া গোবিন্দানন্দ পরলোক গমন করিলে তাঁহাদের ভূসম্পত্তি উড়িয়া রাজা অধিকার করিয়া লয়েন। শুধু সাতখানি গ্রাম অবশিষ্ট রহিল। দেশে মাতাকে রাখিয়া নিত্যানন্দ ভাগ্যান্বেষণে উত্তর দেশে চলিয়া আসিলেন। পরে তিনি লোক পাঠাইয়া কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে বর্দ্ধমানে লইয়া আসিলেন। দুই ভ্রাতা বিদেশে থাকিতে তাঁহাদের

১। HBL, পৃ ২৪৮, ৪৯৬।
২। বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্ত্তৃক বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী মধ্যে প্রকাশিত

মাতা স্বর্গগত হন। মনোহর তখন বালক। একদিন তিনি পথে গৌরহরি বাউলকে দেখিয়া তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার সঙ্গে কেন্দুবিল্ব হইয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান। তথায় একবৎসর থাকিয়া নবদ্বীপে আসিয়া গৌরহরি বাউলের সঙ্গে মিলিত হন। পরে তাঁহার আদেশে গৃহে ফিরিয়া গৃহদেবতা গোপীনাথের সেবায় রত হন।

বাণীনাথ পট্টনায়ক মহাশয়। রামানন্দ-ভ্রাতা তিঁহ মোর জ্ঞান হয়॥
বাণীনাথের হইল দুইটী তনয়। গোকুলানন্দ হরিহর রায় মহাশয়॥
তাহার তনয় এক গোবিন্দানন্দ হৈল। মহাবিদ্যাবান্ তিঁহ এই ত কহিল॥
তার দুই পুত্র নিত্যানন্দ মনোহর। গ্রাম ছাড়ি পিতা আইলা কটক নগর॥
কটকে করিলা তিঁহ এক রাজধানী। অল্পকাল কিছু নয় জোয়ারের পানী॥
দুই পুত্র রাখি পিতা হইল অন্তর্ধান। সকল লইল উড়িয়া রাজা করিয়া শাসন॥
কিঞ্চিৎ রাখিল নিজ গ্রাম সাতখানি। আর সব লইল রাজা করিয়া সনানি॥
দুঃখিত হইয়া ভ্রাতা সব ছাড়িয়া আসিল। বিদ্যাননগর[১] গ্রামে পরিজন রাখিল॥
মাতার চরণে ভ্রাতা বিদায় মাগিয়া। আইলেন উত্তরদেশে বিষয় লাগিয়া॥
আমিও বালক ভাল মন্দ নাহি জানি। কতদিনে সমাচার পাঠাল আপনি॥
বর্দ্ধমান পরগণা কহিল লিখনে। আনাইল ভ্রাতা মোরে করিয়া যতনে॥
সেই হইতে রহি দুয়ে আনন্দ-হরিষে। মাতার অন্তর্ধান তথা শুনিনু বিশেষে॥
উদ্বেগ হইয়া ভ্রাতা বিষয় ছাড়িয়া। রহিলা বিমুখে তিঁহ মনে দুঃখ পায়া॥

অন্যত্র—

ভ্রাতা মোর জ্যেষ্ঠ শ্রীল নিত্যানন্দ দাস। তাহার কনিষ্ঠ মুঞি মনোহর দাস॥
পিতৃহীন দুই ভাই থাকি সে বিষয়ে। কেহ নাহি আর মোদের এ ভবসংসারে॥
পূর্ব্বে ছিলা দক্ষিণ দেশে জাজপুর গ্রাম। বামাই আনন্দকোলে (?) জন্ম নিজধাম॥
দক্ষিণে নিবাস হয় আইনু গৌড়দেশে। বর্দ্ধমানে রহি দুয়ে বিষয়কর্ম্মরসে॥
হেনকালে গৌরহরি আইল বর্দ্ধমান। বৃক্ষতলে দাঁড়াইল দিতে দরশন॥
বিষয় করিয়া বাঁধে স্নানেতে চলিলা। হেন কালে বৃক্ষতলে তাহারে দেখিলা॥
তেঁহ কহে কেবা তুমি করহ প্রণাম। কহিলাম আমি তাঁরে বিষয়ী অজ্ঞান॥

১। বিদ্যানগর?

দিনমণিচন্দ্রোদয়ের অধ্যায়ের নাম সূত্র। সর্ব্বশুদ্ধ একুশটি সূত্র আছে গ্রন্থের শেষে মনোহর এইরূপ "অনুবাদ" দিয়াছেন—

প্রথম সূত্রেতে কৈনু সামান্যবিশেষ। দ্বিতীয় সূত্রেতে কৈনু কতক নির্দ্দেশ ॥
তৃতীয় সূত্রেতে কৈনু নিত্যবিবরণ। চতুর্থ সূত্রেতে রাসলীলা অনুক্ষণ ॥
পঞ্চমেতে জীবতত্ত্ব কহিনু আভাস। ষষ্ঠেতে কহিনু রাসবিধির প্রকাশ ॥
সপ্তমেতে যোগতত্ত্ব করিনু বিচার। অষ্টমেতে বর্ণাশ্রম তাহাতে প্রচার ॥
নবমেতে নামামৃত সূত্র যে কহিল। লীলা আদি নানাবিধ তাহাতে বর্ণিল ॥
দশমেতে বিবর্ত্তবিলাস হয় সার। একাদশে আদিতত্ত্ব রসের বিচার ॥
দ্বাদশেতে ব্রহ্মনিরূপণ স্বল্প কৈনু। ত্রয়োদশে শাস্ত্র আদি তত্ত্ব বিচারিনু ॥
চতুর্দ্দশে সাধনতত্ত্ব কিঞ্চিৎ কহিনু। পঞ্চদশে বৃন্দাবনেশ্বরীর কথা কৈনু ॥
ষোড়শেতে নিত্যানন্দমাহাত্ম্য কহিনু। সপ্তদশে প্রেমপ্রয়োজন কিছু কৈনু ॥
অষ্টাদশে স্বরতলীলাতত্ত্বের বিচার। ঊনবিংশ সূত্রে কৈনু উদ্গার প্রচার ॥
বিংশেতে নিজ কার্য্য আপন প্রাবল্য। একবিংশে নিজগোষ্ঠী বিচার করিল।
শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরীর পদতরী-আশে। দিনমণিচন্দ্রোদয় মনোহর ভাষে ॥

দিনমণিচন্দ্রোদয়কে এক হিসাবে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। রচনা বেশ জোরাল। তবে কাব্য হিসাবে একান্তভাবে মুল্যহীন।

যাহারা ধর্ম্মাচরণের সঙ্গে বিষয় ও ইন্দ্রিয় ভোগ করে তাহাদিগকে লক্ষ্য করিয়া মনোহর বলিতেছেন,

বিষয়বাসনা বিনে যে নারে থাকিতে। কি লাগি সে চাহে নিত্যলোকেতে যাইতে ॥
কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে কামরস পায়। কামের স্বরূপ পানে কালের উদয় ॥
তার পদে পরণাম কিছু কার্য্য নহে। বিষয়ীর কথা কর্ণে নাহি দিব ঠাঁই ॥
বিষয় লাগিয়া করে শ্রীকৃষ্ণভজন। কভু নাহি পায় সেই ব্রজের শরণ ॥
ঈশ্বরের সম যেবা হইবারে চায়। এ কূল ও কূল তার দুই কূল যায় ॥
প্রভু যে করিল লীলা আমি সে করিব। ইহা যদি কহে কেহ আপনা বুঝিব ॥
কামের আনন্দে কহে প্রভু ভজি মোরা। কোথা যাবে কোন খানে দিশা হবে হারা ॥

ধর্ম্ম নানা প্রকার, তাহা হইলে কর্ত্তব্য কি ? এই প্রশ্নের মনোহর দাস যে উত্তর দিয়াছেন তাহার বর্ণনাভঙ্গি যেমন সরল তেমনই সুন্দর।

আমি ক্ষুদ্র জীব মোর কত বড় শক্তি। আমি কি করিতে পারি সে সকল ভক্তি॥
নানা শাস্ত্র নানা ধর্ম্ম আছয়ে সংসারে। মোর শক্তি নাহি হয় এ সব আচরে॥
রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম এই নাহি হয়। টানাটানি করি কত মন শুদ্ধ নয়॥
আমি কোন ছার ধর্ম্ম আচরণ করি। থাকুক ধর্ম্মের দায় মর্ম্ম বুঝিতে নারি॥
ধর্ম্ম যারে বলে তিনি ব্রহ্মাণ্ড বেড়িয়া। স্থাবর জঙ্গম আদি দেখ বিচারিয়া॥
রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম মর্ম্ম মোর প্রাণ। যে হও সে হও মোর এইমাত্র জ্ঞান॥
অনঙ্গমঞ্জরী পদে থাকুক মোর মন। করিব মনের কার্য্য যে পাই দর্শন॥
হৃদয়ে উদয় যেই সেই কার্য্য সার। তাহা বিনে অন্য ধর্ম্ম কর্ম্ম কিবা আর॥

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইতে বহু বহু ক্ষুদ্র বৈষ্ণবসাধনঘটিত পুস্তিকা রচিত হইতে থাকে। এই সকল পুস্তিকার অধিকাংশই তান্ত্রিক (সহজিয়া বাউল আদি) সাধন ঘটিত। অধিকাংশ স্থলে প্রকৃত রচয়িতা বৈষ্ণব গোস্বামীর বা মহান্তের সর্ব্বজনপরিচিত নামের ও মাহাত্ম্যের অন্তরালে আত্মগোপন করিয়াছেন। এইসকল নিবন্ধ শ্রীজীব গোস্বামী কৃষ্ণদাস কবিরাজ নরোত্তমদাস মুকুন্দদাস ইত্যাদি গোস্বামী ও মহান্তদিগের নামেই চলিতেছে। এইজাতীয় নিবন্ধের প্রাচীনতম পুঁথি পাইতেছি ১৬০৩ শকাব্দের অর্থাৎ ১৬৮১-৮২ সালের। এটির নাম দেহকড়চা, রচয়িতার নাম দেওয়া আছে নরোত্তমদাস।[১] ক্ষুদ্র নিবন্ধটি ভাঙ্গা গদ্যে রচিত, কয়েক ছত্র পয়ারও আছে।

বৃন্দাবন দাসের তত্ত্ববিলাস[২] সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের রচনা। একখানি পুঁথির লিপিকাল দেওয়া আছে ১৬১৯ শকাব্দ ১০০৭ সাল।[৩] সাল মল্লাব্দ হইবে; তাহা হইলেও শকাব্দের সঙ্গে কয়েক বৎসরের তফাৎ রহিয়া যায়।

১। ব-সা প-প চতুর্থ খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছে।
২। বৈষ্ণবচরণ বসাক কর্তৃক বৈষ্ণব-গ্রন্থাবলী মধ্যে এবং বসুমতী কার্য্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
৩। বা-প্রা-পু-বি ৩-৩, পৃ ১২০।

কবির গুরুর নাম ছিল কৃষ্ণচরণ।

শ্রীযুত কৃষ্ণচরণ ঠাকুর মহাশয়।
আপনার গুণে মোর হইলা সদয় ॥[১]

শ্রীকৃষ্ণচরণ ঠাকুর মোর প্রভু।
ইহজন্মে সাধন নাহি সাধ্যাছিল কভু ॥[২]

বৃন্দাবন দাস নামিত ভক্তিচিন্তামণি[৩], তত্ত্বনিরূপণ[৪], ভাবাবেশ[৫], লীলামৃত-সার[৬], আনন্দলহরী[৭], গোলোকসংহিতা[৮], পাষণ্ডদলন[৯] প্রভৃতি নিবন্ধ পাওয়া যাইতেছে। এই সবগুলি একই কবির রচনা নাও হইতে পারে। সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৃন্দাবন দাস নাম বিশেষ অসুলভ ছিল না।

বৃন্দাবন দাস রচিত বৈষ্ণববন্দনার ১৬০৩ শকাব্দায় ১০৮৮ সালে অর্থাৎ ১৬৮১-৮২ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[১০]

কৃষ্ণরাম দাসের ভজনমালিকা[১১] সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিরচিত হইয়াছিল। কবি শ্রীখণ্ডের শিষ্য। ইঁহার গুরুর নাম শ্রীহরিচরণ। নরহরি সরকার ঠাকুর ইঁহার পরাৎপর গুরু ছিলেন।

নরহরি মধুমতী গৌরাঙ্গপিরীতি অতি স্থিতি যার শ্রীখণ্ড ধাম ॥
সেই পহুঁ পরাৎপর গুরুদেবগুরু মোর, তছু পদে কোটী পরণাম ॥
তাঁহার কৃপার পাত্র ঠাকুর গোপাল মাত্র, ক্ষিতি মাঝে খ্যাতি অতিশয়।
স্মরণ নাহিক কভু, কর্ণে মোর প্রভু প্রভু, তেঁহ সে পরম গুরু হয়।
ইষ্টদেব শ্রীহরি- চরণ আখ্যান ধরি অবতরি ধরণী ভিতর।
.. ..
তৃণগুচ্ছ ধরি দন্তে নিবেদন তুয়া পদে, কহে দীন দাস কৃষ্ণরাম ॥

১। বা-প্রা-পু-বি ৩-৩, পৃ ১১৫। ২। ঐ, পৃ ১২০।
৩। বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত, বা-প্রা-পু-বি ২-১, পৃ ১৭৮, ৩-৩, পৃ ১১২, ১১৫।
৪। বা-প্রা-পু-বি ৩-৩, পৃ১১০-১১। ৫। ঐ, পৃ ১১৭। ৬। ঐ, পৃ ১১৯।
৭। ঐ, পৃ ১৫৩। ৮। ঐ, পৃ ১৫১। ব-সা প প দশম খণ্ডে মুদ্রিত।
৯। বা-প্রা-পু বি ৩-৩, পৃ ১৫৪। ১০। ব সা-প-প ৬, পৃ-২৫৪। ১১। ঐ, পৃ ২৫৩-৫৪।

ঊনত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য

গোবিন্দমঙ্গল[১] রচয়িতা দুঃখী শ্যামদাসের পিতার নাম শ্রীমুখ, মাতার নাম ভবানী। এতদতিরিক্ত কিছু পরিচয় শ্যামদাসের কাব্য হইতে পাওয়া যায় না।

শ্রীমুখ জনমদাতা, স্থমতি ভবানী মাতা,
যাঁর পুণ্যে নিরমিল তনু।
দুর্ল্লভ জগৎরঙ্গ দেখি শুনি সাধুসঙ্গ,
শিরে বন্দো পিতৃপদরেণু॥

"মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত কেদারকুণ্ড পরগণার মধ্যে হরিহরপুর নামে এক গ্রাম আছে। এই গ্রাম মেদিনীপুর নগর হইতে প্রায় ৮ ক্রোশ পূর্ব্ববর্ত্তী। এই গ্রামে দুঃখী শ্যামদাসের বাস ছিল। ইনি ভরদ্বাজ-গোত্রীয় দে-বংশীয় কায়স্থ।"[২] সম্পাদক মহাশয় অনুমান করেন দুঃখী শ্যামদাস এখন হইতে প্রায় ২২৫ বৎসর পূর্ব্বেকার লোক। কাব্যের ভাষা ও ভাব দৃষ্টে অনুমান হয় কবির পক্ষে ষোড়শ শতাব্দীব শেষ ভাগের লোক হওয়া কিছু আশ্চর্য্য নহে, বরং তাহাই অধিকতর সম্ভব।[৩] পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে, কাশীরাম দেবের এক খুল্লপ্রপিতা-মহের নাম শ্রীমুখ। হরিহরপুরে কাশীরামের গুরু বাড়ী ছিল। যদি শ্যামদাস এই শ্রীমুখের পুত্র হন তবে সম্ভবতঃ কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীর গোড়ার দিকে লেখা হইয়াছিল।

বঙ্গবাসী সংস্করণে চৈতন্যবন্দনা নাই, কিন্তু ইহা অনেক পুঁথিতে পাওয়া যায়।[৪] সে যাহা হউক, কবি যে শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী না হইলেও অন্ততঃ সমসাময়িক তাহা তাঁহার কাব্যের ভাব হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয়।

১। ঈশানচন্দ্র বসু কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গবাসী কার্যালয় হইতে প্রকাশিত (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১৭)। গ্রন্থটির একাধিক বটতলা সংস্করণ হইয়াছে।

২। বঙ্গবাসী সংস্করণের ভূমিকা, পৃ [৪]। ৩। ঐ, পৃ [৫]-[৬] দ্রষ্টব্য।

৪। ঐ, পৃ [৩]।

গোবিন্দমঙ্গল শ্রীমদ্ভাগবত অনুসরণ করিয়া রচিত। তদতিরিক্ত ইহাতে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড কাহিনীও সন্নিবিষ্ট আছে। এই অপৌরাণিক কাহিনীদ্বয়ের বর্ণনার সহিত শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের বর্ণনার চমৎকার সাদৃশ্য আছে।

কাব্যটিতে পাণ্ডিত্যের চেষ্টা নাই। কিন্তু কবিত্বের পরিচয় যথেষ্টই আছে। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল। উদ্ধবের প্রতি রাধিকার খেদোক্তি—

কি লাগিয়া মোরে মনে করিবে কানাই। আর কিবা বৃন্দাবনে বিনোদিনী রাই॥
নয়ন-নিমিখে কত যুগ বহি যায়। অবিচ্ছেদ পিরীতি এমন দুখ তায়।
তার লাগি জাতিকুলে দিয়া জলাঞ্জলি। তবে প্রভু বিস্মরণ রাধা চন্দ্রাবলী॥
কহিও উদ্ধব সে বন্ধুর রাঙ্গা পায়। দুঃখী শ্যাম কহে গোপী পাবে শ্যামরায়॥

অনুরাগভরে রাধা বিনোদিনী কয়। মর্ম্মদুঃখ শুনহ উদ্ধব মহাশয়॥
তুমি যে কহিলে কানু সদা স্মরে মোরে। সে সব চাতুরী জানিলাম দৃষ্টান্তরে॥
আসিব বলিয়া গেলা সত্য এ বচন। পুনরপি বন্ধুয়া না আইল বৃন্দাবন॥
তার নব-অনুরাগ আগুনের ঘর। কহিতে তোমারে যত দগধে অন্তর॥
একদিন যাই আমি যমুনার জলে। দেখিল নাগর কানু কদম্বের তলে॥
মোরে দেখি রহে পথে বাহু পসারিয়া। আলিঙ্গন দিতে আসে ঈষৎ হাসিয়া॥
তার রসলাবণ্য দেখিয়া ত্রিভঙ্গিমা। হাতে হাতে মজাইনু নাগরীগরিমা॥
মোর লাগি রহে কানু পথে দেখিবারে। না খায় সে অন্ন পানী না দেখি আমারে॥

তার লাগি তেয়াগিনু কুলভয়-লাজ। ভাবে বশ হইয়া ভজিনু ব্রজরাজ॥
রাধার বল্লভ কৃষ্ণ ঘোষে জগজ্জনে। আমার জীবন কৃষ্ণ কেবা নাহি জানে॥

তোমারে কহিব সে কৃষ্ণের রসলীলা। দুঃখী শ্যাম কহে কৃষ্ণ ভবজলে ভেলা॥ পৃ ১৭০॥

উদ্ধবের বারমাসী অংশটি চমৎকার। ইহার কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

পৌষে প্রবল শীত পবন প্রবলে। পাতিয়া পঙ্কজপত্র শুতি মহীতলে॥
প্রভুর পিরীতি প্রেম মনে মনে গণি। প্রতি বোলে পুড়ে মোরে পাপ ননদিনী॥
উদ্ধব, পিয়া গুণনিধি। পাইনু পরশমণি বিড়ম্বিল বিধি॥
চৈত্রেতে চাতক পক্ষী ডাকে মন্দমধু। সচেতন না রহে অঙ্গ না দেখিয়া বঁধু॥
চিত্ত নিবারিব কত বিরহব্যথায়। চিতা যেন দহে দেহ বসন্তের বায়॥
উদ্ধব, চিত্ত ছুলছুল করে। চঞ্চল চড়ুই যেন পড়িয়া পিঞ্জরে॥
বৈশাখে বিষের বাণে মলয়ের বায়। বিরহী বিকল করে কোকিলের রায়॥
বাসা ভাঙ্গি বল্লকী করিব তোরে দূর। বন্ধুরে আনিয়া দেহ গিয়া মধুপুর॥
উদ্ধব হে, বিস্মরণ নয়। বুকেতে বিষের শেল বাহির না হয়॥
জ্যৈষ্ঠেতে যমুনা জলে যাদব সংহতি। জলকেলি করে রঙ্গে যতেক যুবতী॥
জল ফেলি মারে গোপী গোপালের গায়। যৌবন চুম্বন ধন যাচে যদুরায়॥
উদ্ধব, যত দুঃখ উঠে মনে। জীয়ন্ত থাকিতে মরা গোবিন্দ বিহনে॥
আষাঢ়ে আঙ্গিনা রসে আছিনু শুতিয়া। আমার শিয়রে আসি শ্যাম বিনোদিয়া॥
আলিঙ্গন দেই মুখে বুলাইয়া হাত। উঠিয়া আকুল হৈনু কোথা প্রাণনাথ॥
উদ্ধব, অনেক যন্ত্রণা। অধিক আশের দোষে এত বিড়ম্বনা॥

পৃ ১৭৫॥

কাব্যটিতে কয়েকটি ব্রজবুলি পদ আছে।

শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের সঙ্গে গোবিন্দমঙ্গলের ভাবে ও ভাষায় বিলক্ষণ মিল আছে। এখানেও "রাধা চন্দ্রাবলী"[১], "কালা কানু",[২] "আয়ান খুরের ধার"[৩] "হিয়া···মেলে চির",[৪] এখানেও—

পাপ ননদিনী ভয়ে না ছাড়ি নিশ্বাস।
শার্দ্দূলসমাজে যেন কুরঙ্গিণী বাস॥

ভবানন্দের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের নাম হরিবংশ। কাব্যটি সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ত্তৃক

১। পৃ ৯৪, ৯৯, ১৭০। ২। পৃ ৬৮। ৩। পৃ ৯১। ৪। পৃ ১৭৪।

সুসম্পাদিত হইয়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক ১৩৩৯ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। কবির সম্বন্ধে এই মাত্র জানা যায় যে, তাঁহার পিতার নাম শিবানন্দ।

শ্লোক ভাঙ্গিয়া রচিলেক পদবন্ধ।
শিবানন্দ-সুত অধম ভবানন্দ॥

যে কয়খানি পুঁথি অবলম্বনে কাব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে সেগুলি উত্তর এবং উত্তরপূর্ব্ব বঙ্গে পাওয়া গিয়াছে, এবং ভাষাতেও এই অঞ্চলের বিশেষত্ব রহিয়াছে। সুতরাং কবি উত্তর বা উত্তরপূর্ব্ব বঙ্গের লোক হইতে পারেন। যোগেন্দ্রচন্দ্র ঘোষ মহাশয় অনুমান করেন, ভবানন্দ শ্রীহট্টের লোক।[১] প্রাচীনতম পুঁথিটি ১০৯৬ সালের অনুলিপি, অতএব কবি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদের পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন ধরিতে হয়। তবে কত পূর্ব্বে, তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা শক্ত। সম্পাদক মহাশয়ের মতে ১০৯৬ সালের "অন্যূন একশত বৎসর পূর্ব্বে হরিবংশ কাব্য রচিত হইয়াছিল।"[২] কবি যে শ্রীচৈতন্যের পরবর্ত্তী তাহাতে সন্দেহ নাই। কাব্যের ভাষা ষোড়শ শতাব্দীর উপযুক্ত প্রাচীন নহে।

যদিও ভবানন্দ বলিয়াছেন—

সত্যবতী-সুত ব্যাস নারায়ণ-অংশ। সংক্ষেপে রচিল পুণ্যশ্লোক হরিবংশ॥
সেই শ্লোক বাখান করিয়া পদবন্ধে। লোকে বুঝিবার বোলে দীন ভবানন্দে॥ পৃ ৬॥

তথাপি প্রথম দুই চারি পৃষ্ঠার পর হইতেই দেখা যাইবে, ইহা সম্পূর্ণরূপে স্বতন্ত্র শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য, সংস্কৃত হরিবংশের অনুবাদ নহে। কাব্যটি না পড়িয়া শুধু ভবানন্দের মুখবন্ধ দেখিয়া অনেকেই কাব্যটিকে খিল হরিবংশের বঙ্গানুবাদ মনে করিয়াছেন।

কাব্যটি অনেক বিষয়ে অন্যান্য শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য হইতে স্বতন্ত্র। এখানে রাধার নামান্তর তিলোত্তমা, সখীর নাম শ্রীমতী, বড়াই রাধার মাতামহী, রাধার ননদিনী যশোদার ভগিনীর নাম মহোদা, রাধার মাতার নাম বিমলা। শ্রীকৃষ্ণ-কীর্ত্তনের সহিত হরিবংশের ভাব অপেক্ষা ভাষার সঙ্গতি অধিক দেখিতে পাওয়া

১। ব-সা-প-প ৪২, পৃ ১৫৬-৫৭। ২। ভূমিকা, পৃ ৪৮/০।

যায়। মধ্যে মধ্যে কবিত্বের পরিচয় বেশ আছে, কিন্তু কাব্যটির ভাব প্রায়ই এত গ্রাম্য যে সাহিত্য হিসাবে ইহা অপাঠ্য হইয়া পড়িয়াছে। সম্পাদক মহাশয় ভবানন্দকে "পূর্ব্ববঙ্গের মহাকবি" বলিয়াছেন; ইহা বিপজ্জনক ব্যাজস্তুতি।

ভবানন্দের কাব্যে শতাধিক বাঙ্গালা ও ব্রজবুলি পদ আছে। এই পদগুলির মধ্যে বৈষ্ণব পদকর্ত্তাদের ভাব সুপরিস্ফুট। চণ্ডীদাস জ্ঞানদাস ইত্যাদি প্রাচীন পদকর্ত্তাদের পরে ভবানন্দ আবির্ভূত হইয়াছিলেন সন্দেহ নাই।

দুই চারি ছত্র করিয়া তুলিয়া ভবানন্দের কবিত্বশক্তির পরিচয় দিতেছি।

দুই কুলে গোয়াল জাতি কেবা কিনা বোলে। তেহুঁ মোর প্রাণ পোড়ে তোমা না দেখিলে॥

ঘর কৈলু বাহির বাহির কৈলু ঘর। পর কৈলু আপনা আপনা কৈলু পর॥
রাত্রি কৈলু দিবস দিবস কৈলু রাতি। অঙ্কুরে ভাঙ্গিব জানি যোগের পিরীতি॥
যে ভিন্ন না জানি তারে ভজিলে কি ভয়। ভবানন্দ বোলে ইহা দড়াইলে হয়॥ পৃ ৮০॥
এমত না জানি বন্ধু এমত না জানি। দেখিতে না দেখি যেন মৃগ-ব্যাধ-খানি॥
মোর নাম ধরি বাঁশী নিরবধি ডাকে। তবে কিনা দেহ দেখা যদি মনে থাকে॥
না জানি কি হৈত হয় যদি হৈতা গোরা। কালা হৈয়া প্রাণ নৈল কাঁচা-ননীচোরা॥
বাঁশী নয় বাঁশী নয় মন:মাহনিয়া। পাষাণ দরবে যার সুনাদ শুনিয়া॥ পৃ ৯৬॥
বিহানের কথাখানি বিআলে না রয়। জানিলে বা প্রেম কেনে বাঢ়াইল হয়॥ পৃ ১২৭॥

গোবিন্দবিজয়ের কবি অভিরাম দাসের কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। ইঁহার কালও নিশ্চয় করিয়া জানিবার উপায় নাই। তবে কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী-রচিত ভাগবতামৃতে অভিরাম দাসের কাব্য হইতে কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। কবিচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক। অতএব বলা যায় যে, অভিরাম দাস অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের অন্ততঃ কিছুকাল পূর্ব্বে তাঁহার কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবি যে নিত্যানন্দ প্রভুর অনুচর দ্বাদশ গোপালের অন্যতম অভিরাম দাস নহেন, তাহা তাঁহাকর্ত্তৃক দ্বাদশ গোপালের উল্লেখ হইতে জানা যায়।

গোবিন্দবিজয় কাব্যের আরম্ভ এইরূপ–

গৌরাঙ্গচাঁদের গুণ গাও গাও শুনি। ধন্য রে নদীয়া গ্রাম ধন্য সুরধুনী ॥
ধন্য কলিযুগে এমনি অবতার। হরিনাম দিয়া কৈল জীবের উদ্ধার ॥
আপনি কাঁদিয়া গোরা কাঁদাইল জীবে। কঠিন পাষাণ আদি যার গুণে দ্রবে ॥
অকিঞ্চনদীনবন্ধু দয়ার ঠাকুর। হেন কৃষ্ণগুণে অভিরাম রহে দূর ॥
প্রণমহোঁ নারায়ণ ত্রিজগৎনাথ। শিরসি লুটাইয়া ভূমে করি যোড়হাথ ॥
বৈকুণ্ঠবল্লভ[১] তিন ভুবনের পতি। যারে ব্রহ্মা বরুণেন্দ্র রুদ্র করে স্তুতি ॥
নারদাদি সনাতন সনকাদি শুকে। যার গুণ সামবেদে সভে গায় সুখে ॥
মণিমণ্ডপের মধ্যে কল্পতরুমূলে। ত্রিভঙ্গভঙ্গিমঠাম বংশী করতলে ॥
এমন ঠাকুর বন্দোঁ দণ্ডবৎকায়। যার নাম স্মরণে শমনে নাহি দায় ॥
কমলা সারদা বন্দোঁ দুই ঠাকুরাণী। যাহা হৈতে সুখভোগ ভুঞ্জি[২] সভে শুনি ॥
বন্দহুঁ আনন্দ হৈয়া গৌরীর নন্দনে। ব্রহ্মা যার গুণ গান বেদান্তদর্শনে ॥
পুরুষ দেবেশ যোগে পরমনিধান। বিশ্বের কারণ হেতু বিঘ্নহব নাম ॥
হেন বিঘ্নরাজ বন্দোঁ দণ্ডবৎ হইয়া। সর্ব্বত্র মঙ্গল হয় যার গুণ গাইয়া ॥
ত্রিজগৎহেতু[৩] বন্দোঁ শঙ্করঘরণী। অবনত হইয়া কায় করি পুটপাণি ॥
যোগেন্দ্র ঈশ্বর বন্দোঁ শম্ভু ভূতনাথ। হরিহর একাত্মা[৪] অভেদ সাক্ষাৎ ॥
সর্ব্বভূতনাথ শিব বন্দোঁ নিজ মাথে। প্রণমহোঁ ষড়ানন ভূমিনিপতিতে ॥
নত শির হৈয়া বন্দোঁ কৃষ্ণদ্বৈপায়ন। পরাশরসুত সত্যবতীর নন্দন ॥
সপ্তদশ অবতারে ব্যাসরূপ হৈয়া। ত্রিলোক পবিত্র কৈল পুরাণ শুনাঞা ॥
পরমবন্দনালয় কবীন্দ্র জনার। হেন কৃষ্ণ বেদব্যাস বন্দোঁ বারবার ॥
শুকদেব ঠাকুর বন্দোঁ ব্যাসের তনয়। শিরসি লোটাইয়া ভূমে করিয়া বিনয় ॥
নিগমকল্পতরু গলিতাদি ফলে। যার মুখে অমৃত হইলা প্রবিমলে[৫] ॥
এমন অমৃতধারা ভারতের গ্রন্থ। পিয় রে ভাবক[৬] ভাই হইয়া[৭] অবিশ্রান্ত ॥

১। পাঠান্তর 'দুর্লব বৈকুণ্ঠ'। ২। ঐ 'বঞ্চি'। ৩। ঐ 'ত্রিজগজননি'।
৪। ঐ 'একার্থক'। ৫। ঐ 'ভূমিমলে'। ভূমিতলে?
৬। ঐ 'ভকত'। ৭। ঐ 'গুণ'।

এমন পুরাণ গ্রন্থ যে জন না শুনে। যে না আরাধিল কৃষ্ণ পুরুষ পুরাণে ॥
ব্রাহ্মণের মুখে যেবা না কৈল হবন। নরের অধম সেই বৃথায় জনম ॥
সর্ব্বত্রে আদৌ বন্দোঁ গুরুর চরণ। অজ্ঞান-অন্ধকে দিল জ্ঞানের অঞ্জন ॥
জ্ঞানাঞ্জনে উন্মীলিত কৈল[১] দুই পুরে। হেন ব্রহ্মা গুরু বিষ্ণু সাক্ষাৎ শঙ্করে ॥
কোটী কোটী দণ্ডবৎ গুরুর চরণে। গুরুর মহিমা কথ্য না হয় কথনে ॥
পিতৃ মাতৃ প্রণমহোঁ দণ্ডবৎ ক্ষিতি। যাহা হৈতে জন্মিঞা দেখিলাঙ[২] বসুমতী ॥
বাপমায়ের ঋণী পুত্র যতদিন জীয়ে। যার স্তনামৃত পুত্র একবার পীয়ে ॥
বিশেষ বৈষ্ণব বিপ্র বন্দহুঁ[৩] মাথায়। যাহার মহিমা অন্ত কথনে না যায় ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যদি বৈষ্ণব হয়। গঙ্গাজলে তুলসী মিশ্রিত ফলোদয় ॥[৪]
বৃন্দাবন দ্বারকা বন্দিব হরিদ্বার। গোকুল মথুরা বন্দোঁ ভুবনের সার ॥
যথি কৃষ্ণ[৫] বিহরিলা ভূভারহরণে। হেন মহা মহাক্ষেত্র বন্দোঁ পরণামে ॥
নীলাচলক্ষেত্র বন্দোঁ প্রভু জগন্নাথ। শিরসি লোটাইয়া ভূমি করি যোড়হাথ ॥
ধন্য ক্ষেত্র নবদ্বীপ সপ্তদ্বীপসার। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ হৈলা চৈতন্য-অবতার ॥
বন্দিব চৈতন্য ভগবান্ গদাধর। দ্বাদশ গোপাল বন্দোঁ মহান্ত সকল ॥
শুন রে ভকত ভাই করি নিবেদন। মানব-জনম বৃথা যায় অকারণ ॥
যত ক্ষিতি তলে প্রভু কৈল অবতার। অবতার শিরোমণি শ্রীনন্দকুমার ॥
এমন ঠাকুর ভজ কৃষ্ণ ভগবান্। কাল যায় ভাঁড়াইয়া[৬] হও সাবধান ॥
অধম মুরুখ বড় অভিরাম দাস। কৃষ্ণভক্তসঙ্গ হৈতে মনে বড় আশ ॥[৭]

গোবিন্দবিজয়ের রাসপঞ্চাধ্যায় হইতে কিছু কিছু অংশ কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর ভাগবতামৃতে উদ্ধৃত হইয়াছে।[৮]

১। পাঠান্তর 'হইল'। ২। ঐ 'দেখিলু'। ৩। ঐ 'বন্দিব'।

৪। ইহার পর ১২১৩ সংখ্যক পুঁথিতে একটি অতিরিক্ত পয়ার আছে। সেটি প্রক্ষিপ্ত বলিয়া অনুমান করি। ৫। পাঠান্তর 'লক্ষ্মী'। ৬। ঐ 'বয়্যা জায় ভাই'।

৭। ব-সা-প পুঁথি ১২১৩, ১২১৪ অবলম্বনে।

৮। ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল, শ্রীযুক্ত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত (১৩৪১), পৃ ১৯৯, ২০০, ২০১, ২০৩, ২০৫, ২০৬, ২০৮, ২০৯, ২১১, ২১৯।

মণিহরণ পালার পরই গোবিন্দবিজয় সমাপ্ত হইয়াছে। অন্ততঃ একখানি পুঁথির ভণিতা হইতে তাহাই মনে হয়।

গোবিন্দপদারবিন্দে অভিরাম গায়।
গোবিন্দবিজয় গীত এতদূরে সায় ॥[১]

কবির ভণিতা প্রায়ই এইরূপ—

গোবিন্দপদারবিন্দমকরন্দ পানে।
লুবধ ভ্রমর অভিরাম দাস ভণে ॥

চাণুর মুষ্টীক দুই পড়িল নির্ব্বাণ।
গোবিন্দবিজয় গীত গায় অভিরাম ॥

গোবিন্দপদারবিন্দমধুলুব্ধমতি।
অকিঞ্চন[২] অভিরাম দাসের ভারতী ॥ ইত্যাদি।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে ভবানীদাস ঘোষ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের একাধিক পালা রচনা করিয়াছিলেন। ইহার বিস্তৃত বিবরণ পরে দ্রষ্টব্য।

"দ্বিজ" হরিদাস রচিত মুকুন্দমঙ্গলের ১০০৫ মল্লাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৯-১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৩] সপ্তবিংশ পরিচ্ছেদে যে অশ্বমেধ-পর্ব্ব রচয়িতা "দ্বিজ" হরিদাসের কথা বলা হইয়াছে, তিনি আর এই কবি অভিন্ন বলিয়া মনে হয়। কাব্যের আরম্ভ এইরূপ—

বন্দনা করিব রাধাকৃষ্ণপাদপদ্ম। সংকৃতি জনের অতি মনোহর সদ্ম ॥
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বন্দোঁ অকিঞ্চনরূপে। ডুবাইল আচণ্ডাল প্রেমরসকূপে ॥
শ্রীশ্রীগুরুপাদপদ্ম বন্দিয়ে সানন্দে। আক্ষে সিদ্ধাঞ্জন দিয়া উদ্ধারিল অন্ধে ॥
মূর্খ জড় অধীর বধির গুণহীন। উদ্ধারিল প্রভু মোর অতিশয় দীন ॥
হেন প্রভুচরণে সে দূরে রহু মন। যে পদকৃপায় বন্ধ হইলা শমন ॥
বৈষ্ণব ঠাকুর তবে করিল বন্দন। যাহার কৃপায় ভব তরে জীবজন ॥
করিয়াছি বড় আশা হয়্যা অল্পমতি। জ্ঞানের নাহিক লেশ কি মোর শকতি ॥

১। পুঁথি ১২১৩। ২। পাঠান্তর 'গোবিন্দবিজয়'।
৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিতে ৬০ পত্র আছে, অসম্পূর্ণ।

ভাগবত দশম স্কন্ধের পদ্যাবলী। ভাষায় লিখিতে বড় করিয়ে বিকলি ॥
আপনে রচিয়া শ্যাম করাহ লিখন। তুমি মোর ধন প্রাণ তুমি যে কারণ ॥
তুমি ধ্যান জ্ঞান আর ধরম করম। তোমার গোচর সব আমার মরম ॥
আরম্ভ করিএ যদি আজ্ঞা হয় মোরে। মুঞি পড়িআছি প্রভু অন্ধকার ঘোরে ॥
প্রবর্ত্ত হইয়া শ্যাম লেখাহ স্বরীতে। মিনতি করিয়ে পূর্ণ করহ তুরিতে ॥
ধরণী লোটায়্যা বলে দীন হরিদাস। সম্পূর্ণ করহ প্রভু চিরকাল-আশ ॥

ভণিতা এইরূপ—

হরিদাস বলে শুন মুকুন্দমঙ্গল।
কলিযুগে এ শরীর করাহ সফল ॥

"বিপ্র" পরশুরাম প্রণীত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের খণ্ডিত পুঁথি যথেষ্ট সুলভ, সম্পূর্ণ পুঁথি একান্ত দুর্লভ। একটিমাত্র সম্পূর্ণ পুঁথির সন্ধান মিলিয়াছে।[১] বন্দনা অংশে শ্রীচৈতন্য, নিত্যানন্দ প্রভু, অদ্বৈত প্রভু, সনাতন গোস্বামী, দামোদর, হরিদাস, নরহরি সরকার এবং অভিরাম দাস উল্লিখিত হইয়াছেন। ইহাতে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড লীলাকাহিনীর বর্ণনা আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের মত এখানেও রাধা চন্দ্রাবলী।

শ্রীযুক্ত হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সাহিত্যরত্ন মহাশয় বলেন, "বিপ্র পরশুরামের 'কৃষ্ণ-মঙ্গল' ও 'মাধব-সঙ্গীত' প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। কবির নিবাস ছিল 'চম্পক নগরী,' ইনি দ্বাদশকল্যগ্রামে কুমার শ্যামশিখরের আশ্রয়ে থাকিয়া মাধব-সঙ্গীত গ্রন্থ রচনা করেন। কবির পিতার নাম মধুসূদন রায়, কবি মনোহর দাসের শিষ্যত্ব স্বীকারে ভেকাশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন।"[২]

ক্ষেত্রী-অবতংশ মহারাজ বংশ
কুমার শিখর শ্যাম।
যার দেশে বসি সঙ্গীত বিলাসী
রচিত পরশুরাম ॥

১। বিচিত্রা ১৩৩৯, পৃ ৬৮৮; ২। বীরভূমবিবরণ ৩, পৃ ১৬৩।

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা পরশুরামের কৌলিক উপাধি "চক্রবর্ত্তী"। সুতরাং ইনি মাধবসঙ্গীত রচয়িতা রায়-উপাধিক পরশুরাম হইতে স্বতন্ত্র হইবেন।

চক্রবর্ত্তী পরশুরাম গাইল কৌতুকে।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল পুঁথি শুন সর্ব্বলোকে ॥[১]

পরশুরামের কাব্যের ভণিতা এইরূপ—

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত অতি সুধারাশি।
গান দ্বিজ পরশুরাম কৃষ্ণ-অভিলাষী ॥

ভাগবতে কৃষ্ণকথা সর্ব্বপাপনাশা।
দ্বিজ পরশুরাম গান গোপালভরসা ॥ ইত্যাদি।

"দ্বিজ" বংশীদাসের ভাগবত বা কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্যের পুঁথি উত্তর বঙ্গে পাওয়া গিয়াছে।[২] ইনি মনসামঙ্গল রচয়িতা বংশীদাস হইতে পারেন।

রাধাদাস রচিত কৃষ্ণলীলার বিভিন্ন আখ্যানের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৩] ইহার পূরা নাম ছিল রাধাবল্লভ দাস। যদুনাথ দাসের সুবলমিলন পালার বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইহার রচিত অনেকগুলি পদ চলিত আছে।

১। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৬৯। ২। আরতি ১৩০৮ অষ্টম সংখ্যা।
৩। HBL, পৃ ১৭১-১৭৪।

ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

পদাবলী

পূর্ব্বে বলিয়াছি যে শ্রীখণ্ডের পরিকর এবং শ্রীনিবাস আচার্য্য ও নরোত্তমের শিষ্যদিগের মধ্যে অনেকেই পদকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহারা ষোড়শ শতাব্দীর শেষ এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা প্রধান তাঁহাদিগের গীতিকবিতার আলোচনা করিয়াছি। সপ্তদশ শতাব্দীতে যথেষ্ট পদ-কর্ত্তা পাওয়া যায়, কিন্তু দুই একটি ছাড়া তাঁহাদের কাহাকেও প্রকৃত কবি বলা যায় না। যে কয়টি কবির পদাবলীতে কিছু মাত্র বিশেষত্ব আছে তাঁহাদের বিষয়ে কিছু আলোচনা করিতেছি। এই সময়ের কবিদিগের বিস্তৃত আলোচনা মদীয় A History of Brajabuli Literature গ্রন্থের নবম, দশম, অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ অধ্যায়ে দ্রষ্টব্য।

হেমলতা ঠাকুরাণীর শিষ্য যদুনন্দনের গ্রন্থগুলির আলোচনা অষ্টাবিংশ পরিচ্ছেদে করা গিয়াছে। ইঁহার কবিত্বের পরিচয় সেই গ্রন্থগুলি সম্পর্কে দিয়াছি। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তা বলিয়া যদুনন্দন দাবী করিতে পারেন। ইঁহার একটি ব্রজবুলি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ইন্দীবরবর- উদর-সহোদর- মেদুরমদহরদেহ।
জাম্বুনদমদ- বৃন্দবিমোহিত অম্বরবরপরিধেয় ॥
সজনী, কে নব নাগররাজ।
মোহন মুরলী- খুরলি-রুচিরানন দাহন কুলবতী-লাজ ॥
মোতিমসার হার উর-অম্বর নখতরদামক ভান।
করিকর-গরব- কবল-কর সুন্দর সুবলন বাহু সুঠাম ॥
মদগজরাজ লাজ গতি মন্থর জগ ভরি ভরই অনঙ্গ।
যদুনন্দন ভণ, সো নন্দনন্দন চন্দনশীতল অঙ্গ ॥[১]

১। পদামৃতসমুদ্র (রাধারমণ যন্ত্র বহরমপুর), পৃ ৩৮, HBL, পৃ ২২৭।

পদটি পদ্যাবলীধৃত ১৬ সংখ্যক শ্লোকের ভাবাবলম্বনে রচিত হইয়াছে—

ইন্দীবরোদরসহোদরমেদুশ্রীর্বাসোদ্রবৎকনকবৃন্দনিভং দধানঃ॥

আমুক্তমৌক্তিকমনোহরহারবক্ষাঃ কোঽয়ং যুবা জগদনঙ্গময়ং করোতি॥

একটি ব্রজবুলি পদে যত্নন্দনের ও বিদ্যাপতির যুক্ত ভণিতা দেখা যাইতেছে। ইনিই কি বাঙ্গালী "ছোট" বিদ্যাপতি, কবিরঞ্জন? পদটি এই—

কি কহব রে সখি তখনক লাজ। সপনে আপনে পিয়া আওল সমাজ॥
করে কর ধরি পিয়া পুছত বাত। হঠে হাম তাক ছোড়ায়ল হাত॥
ফারল মল্লতোরল হার।[১] কহহি কহব তাই করএ বিহার॥
ভণয়ে বিদ্যাপতি ইহ রস গায়। ইহ অবশেষ যত্নন্দন গায়॥

ঘনশ্যাম কবিরাজের গোবিন্দরতিমঞ্জরীর কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। যেমন সংস্কৃত কবিতা তেমনি ব্রজবুলি পদ রচনা উভয়ত্র ইনি সমান সিদ্ধহস্ত ছিলেন। নিম্নে ঘনশ্যামের একটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। পদটি রাধাকৃষ্ণের উক্তি-প্রত্যুক্তি সমন্বিত সঙ্কেতাভিসার বিষয়ক।

[রাধা] কো ইহ পুন পুন করত হুঙ্কার।
[কৃষ্ণ] হরি হাম
[রাধা] জানি না কর পরচার॥
পরিহরি সো গিরিকন্দর মাঝ।
মন্দিরে কাহে আওব মৃগরাজ॥
[কৃষ্ণ] সো হরি নহোঁ, মধুসূদন নাম।
[রাধা] চলু কমলালয় মধুকরী ঠাম॥
[কৃষ্ণ] এ ধনি সো নহে, হাম ঘনশ্যাম।
[রাধা] তনু বিনু গুণ কিয়ে কহে নিজ নাম॥
[কৃষ্ণ] শ্যামমূরতি হাম তুহুঁ কি না জান।
[রাধা] তারাপতি ভয়ে বুঝি অনুমান॥

১। অথবা 'ফারল মল্ল তোরল হার।'

ঘর মাহা রত্নদীপ উজিয়ার।
কৈছনে পৈঠব ঘন-আঁধিয়ার॥
[কৃষ্ণ] রাধারমণ হাম কহি পরচার।
[রাধা] রাকারজনী নহ ঘন আঁধিয়ার॥
পরিচয় পদ যব সব ভেল আন।
তবহিঁ পরাভব মানল কান॥
তৈখনে উপজল মনমথস্থর।
অব ঘনশ্যাম মনোরথ পূর॥[১]

পদটি নিম্নে উদ্ধৃত সংস্কৃত শ্লোক অবলম্বনে রচিত। মূল শ্লোকটিও ঘনশ্যামের রচনা। পদ এবং শ্লোক দুইটিই গোবিন্দরতিমঞ্জরীতে আছে।

কোঽয়ং হুঙ্কুরুতে হরির্গিরিগুহাং হিত্বাত্র হর্ম্যে কুতঃ
কান্তেঽহং মধুসূদনস্তদিহ কিং পদ্মালয়ং গচ্ছতু।
কৃষ্ণোঽস্মীতি গুণোঽতনুর্বদতি কিং ন শ্যামমূর্ত্তিঃ প্রিয়ে
সোমাভাপরিখেদিতঃ কিমিতি সুস্মেরো হরিঃ পাতু বঃ॥

রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী-প্রণেতা রামগোপাল দাসও একজন বড় পদকর্ত্তা ছিলেন। ইঁহার পদের ভণিতা প্রায় 'গোপালদাস' নামেই পাওয়া যায়। ইঁহার পরিচয় পূর্ব্বে দেওয়া গিয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন জগদানন্দ। ইনি শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের বংশধর। ইঁহার পিতা শ্রীখণ্ড ছাড়িয়া রাণীগঞ্জের নিকটে আগরডিহিতে বাস করেন। জগদানন্দ স্বয়ং নিকটবর্ত্তী জোফলাই গ্রামে উঠিয়া গিয়া বাস করেন।[২]

ভাবের গভীরতায় নহে, কিন্তু ধ্বনিঝঙ্কারে ও শব্দচিত্ররচনায় জগদানন্দ গোবিন্দদাস কবিরাজের কতকটা প্রতিদ্বন্দ্বী। তবে জগদানন্দের কাব্যপ্রতিভা শব্দঝঙ্কারের উপরে উঠিতে পারে নাই; গোবিন্দদাসের কবিতায় শব্দঝঙ্কার এবং অর্থগৌরব উভয়ের বিচিত্র সম্মেলন ঘটিয়াছে। শব্দের উপর জগদানন্দের অধিকার

১। পদকল্পতরু ৩৫০; HBL, পৃ ২১৭-১৮। ২। HBL, পৃ ২৩৫-৪১ দ্রষ্টব্য।

ছিল অসামান্য। কবিগণের মিল খুঁজিবার সুবিধা করিবার জন্য ইনি ভাষা-শব্দার্ণব নামে একটি সমধ্বন্যন্ত শব্দকোষ রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। এই অসমাপ্ত গ্রন্থের কিয়দংশ এবং জগদানন্দের ছত্রিশটি পদ কালিদাস নাথ মহাশয় শ্রীজগদানন্দ-পদাবলী নামে ১৩০৬ সালে প্রকাশ করেন।

জগদানন্দের দুইটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মঞ্জু বিকচ-কুসুম-পুঞ্জ, মধুপ-শবদ গুঞ্জ গুঞ্জ,
কুঞ্জরগতিগঞ্জিগমন মঞ্জুল কুলনারী।
ঘনগঞ্জন চিকুরপুঞ্জ মালতী ফুলমালে রঞ্জ,
অঞ্জনযুত কঞ্জনয়নী খঞ্জনগতি হারি॥
কাঞ্চনরুচিরুচির অঙ্গ, অঙ্গে অঙ্গে ভরু অনঙ্গ,
কিঙ্কিণী করকঙ্কণ মৃদু ঝঙ্কত মনোহারী।
নাচত যুগ ভুরু-ভুজঙ্গ কালিদমনদমন রঙ্গ,
সঙ্গিনী সব রঙ্গে পহিরে রঙ্গিল নীল সারী॥
দশন কুন্দকুসুমনিন্দু, বদন জিতল শরদ-ইন্দু,
বিন্দু বিন্দু ছরম-ঘরমে প্রেমসিন্ধু প্যারী।
ললিতাধরে মিলিত হাস, দেহদীপতি তিমির নাশ,
নিরখি রূপ রসিক ভূপ ভূলল গিরিধারী॥
অমরাবতী যুবতিবৃন্দ হেরি হেরি রূপ পড়ল ধন্দ,
মন্দ মন্দ হসনা নন্দ- নন্দন সুখকারী।
মণিমাণিক নখ বিরাজ, কনকনূপুর মধুর বাজ,
জগদানন্দ থল-জলরুহ- চরণক বলিহারি॥[১]
উদিতারুণ হসিত নলিন, মুদিত কুমুদ চান্দ মলিন,
হতশায়ক দুখদায়ক রতিনায়ক ভাগে।
শৃতল থল-জলরুহদল তড়িতজড়িত জলধরতুল
মুখ-ঝামর ধনী শ্যামর নিশি প্রাতর ভাগে॥

১। শ্রীজগদানন্দ পদাবলী পৃ ২১-২৩, কীর্ত্তনগীতরত্নাবলী পৃ ৪৯, HBL, পৃ ২৩৭-৩৮

বিগতবসনভূষণ-সাজ অচেতনে রহু নিলজরাজ
গিরিধারিম বহু-গারিম রহু কারিম দাগে।
বদন জিতল শারদ ইন্দু, ছরম-ঘরম বিন্দু বিন্দু,
নিশি জাগরী রসসাগরী বরনাগরী আগে॥
ফুকরত শুকসারিক বহু, কোকিলকুল কুহরই মুহু,
দেখ ভাবিনী গজগামিনী নহি কামিনী জাগে।
কহ সহচরী শ্রবণ-ওর, পরিহরি ধনী হরিক কোর
কিএ দোষব তব তোষব যব রোষব রাগে॥
কি হেরসি হাসি শয়নরঙ্গ বর নিরমল কুলকলঙ্ক
যশধামিনী রুচিদামিনী কুলকামিনী লাগে।
সাজে কবরীভূষণ বাস জগদানন্দ নবীনদাস
করু চেতন শুনি কেতন চলু বেতন মাগে॥[১]

জগদানন্দ রচিত তিনটি চিত্রগীত (acrostic) পাওয়া গিয়াছে, তন্মধ্যে একটি পদকল্পতরুতে আছে।[২] জগদানন্দ নামে একাধিক পদকর্ত্তা ছিলেন। নিম্নোদ্ধৃত পদটি অন্য কবির হওয়া অসম্ভব নহে।[৩]

শুন গো মরম সই, মর্ম্মকথা তোরে কই, সাঁঝের বেলা গিয়াছিলাম জলে।
নন্দের নন্দন কানু করে লইয়া মোহনবেণু দাঁড়াইয়া ছিল কদমতলে॥
না চাহিলাম তরুমূলে, ভরমে নামিলাম জলে, ভরি জল কলসী হেলায়ে।
কলসীতে বারি পূরি কূলে উঠি সহচরি কদমতলা দেখিলাম হেরিয়ে॥[৪]
সজনী গো, কেন গেলাম যমুনার জলে।
নন্দের দুলাল চাঁদ পাতিয়া রূপের ফাঁদ ব্যাধছলে কদম্বের তলে॥ ধ্রু॥
দিয়া হাস্যসুধা চার অঙ্গছটা আটা তার, আঁখিপাখী তাহাতে পড়িল।
মনমৃগী সেই কালে পড়িল রূপের জালে, শুধু[৫] দেহপিঞ্জর রহিল॥[৬]

১। কীর্ত্তনগীতরত্নাবলী, পৃ ১৫৩। ২। IIBL, পৃ ২৩৫। ৩। ঐ, পৃ ২৩৯
৪। এই চারি ছত্র শুধু কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধুতেই আছে। ৫। পাঠান্তর 'শুধু'।
৬। ঐ 'বাঁশি ফাঁসি গলায় লাগিল'

চিত্তশালে ধৈর্য্য হাতী[১] বাঁধা ছিল দিবারাতি, ক্ষিপ্ত হৈল কটাক্ষ-অঙ্কুশে।
দন্তের শিকল কাটি চারিদিকে গেল ছুটি, পলাইয়ে গেল কোন দেশে॥
লজ্জা শীল হেমাগার, গুরুগৌরব সিংহদ্বার, ধরমকপাট ছিল তায়।
বংশীরববজ্রাঘাতে পড়ি গেল অকস্মাতে, সমভূমি করিল আমায়॥
কালিয়া-ত্রিভঙ্গবাণে কুলমান কৈল খানে[২], ঘুচিল[৩] উঠিল ব্রজবাস।
প্রাণ শেষে আছে বাকি, তাহা বুঝি[৪] যায় দেখি, ভণয়ে[৫] জগদানন্দ দাস॥[৬]

সপ্তদশ শতাব্দীর অনেক পদকর্ত্তা (—ইঁহাদের কেহ কেহ পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দীর ব্যক্তিও হইতে পারেন—) দুই চারিটি করিয়া পদ লিখিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে দুই চারিজনের পদ উচ্চশ্রেণীর। উদাহরণ স্বরূপ "নৃপ" উদয়াদিত্য, রামচন্দ্র মল্লিক ও বিপ্রদাস ঘোষের নাম করিতে পারা যায়।

"নৃপ" উদয়াদিত্যের এই ভণিতাহীন পদটি রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীতে উদ্ধৃত হইয়াছে—

শ্যাম বন্ধুরে মোর যে জন ভাঙ্গায়। এহেন দুখিনী রাধার বধ লাগে তায়॥
কুলের কামিনী করি সিরজিলে বিধি। দেখিতে না পাই রূপ শ্যাম গুণনিধি॥
বাহির না হই আমি গুরুজনার ডরে। দারুণ ননদী বাণী কাড়ে নানা ছলে॥
না মরিয়ে ননদিনী খাউ দুটি আঁখি। এ ভর-দুপুরে যেন শ্যামরূপ দেখি॥[৭]

অপর পদটি পাওয়া যায় পদকল্পলতিকায়।

কি বলিতে জানো মুঞি কি বলিতে পারি। একে গুণহীন আরে পরবশ নারী॥
তোমার লাগিয়া মোর যত গুরুজন। সকল হইল বৈরী কেহ নয় আপন॥
বাঘের মাঝে যেন হরিণীর বাস। তার মাঝে দীঘল ছাড়িতে নারি শ্বাস॥
উদয়-আদিত্যে কহে মনে ঐ ভয় উঠে। তোমার পিরীতিখানি তিলেক পাছে টুটে॥[৮]

১। পাঠান্তর 'গর্ব্বশালে মত্ত হাতী'। ২। ঐ 'কোন স্থানে'।
৩। ঐ 'ডুবিল'। ৪। ঐ 'তাও পাছে'। ৫। ঐ 'ভাবয়ে'।
৬। শ্রীজগদানন্দ-পদাবলী, পৃ ৪৯; কৃষ্ণপদামৃতসিন্ধু, পৃ ১৩৮, অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী ৩১০, HBL, পৃ ২৩৯-৪৯।
৭। HBL, পৃ ৪২৪ ৪৫। ৮। HBL, পৃ ৪২৫।

চণ্ডীদাসের পদ বলিতে আমাদের সংস্কারে যাহা বোঝায় (অর্থাৎ রাধার বিরহের আর্ত্তি) তাহার ধ্বনি এই পদ দুইটির মধ্যে সুস্পষ্ট ধ্বনিত হইতেছে।

রামচন্দ্র মল্লিকের নিম্নোদ্ধৃত পদ দুইটি শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতাগুলির অন্যতম।

রাধে, তুমি মোরে না বাসিহ ভিন।

রভসে বিরস বাণী না বলিহ চন্দ্রাবলী, আমি তোমার প্রেমের অধীন॥
বিনতি করিয়া কই, আমি আর কার নই, তোমার তোমার বিনোদিনী।
অশোধল তুয়া ধার শুধিতে নারিল আর, রহিলাঙ হইয়া তোমার ঋণী॥
ও মুখ পঙ্কজ তোর, মন মধুকর মোর, না বলিহ বিরস বচন।
প্রাণসঞ্জীবনী তুমি, তৃষিত চাতক আমি, তুমি প্রিয়া মোর নবঘন॥
স্বরূপে কহিলাঙ রাই, বিকাইলাঙ তুয়া ঠাঞি অভিনব যৌবনী নারী।
রামচন্দ্র মল্লিকে কয়, অতিপ্রেম অতিশয় বিরস সহয়ে না পারি॥[১]

তথাকথিত চণ্ডীদাস-গন্ধযুক্ত এই পদটি রামচন্দ্র মল্লিকের হওয়া অসম্ভব নহে—

কাহারে কহিব মনের কথা, কেবা যায় পরতীত।
হিয়ার মাঝারে মরম বেদন, সদাই চমকে চিত॥
গুরুজন আগে বসিতে না পাই, সদা ছল ছল আঁখি।
পুলকে আকুল দিগ নেহারিতে সব শ্যামময় দেখি॥
সখীর সঙ্গে যদি জলেরে যাই, সে কথা কহিল নয়।
যমুনার জল, মুকত কবরী, ইথে কি পরাণ রয়॥
কুলের ধরম রাখিতে নারিলুঁ, কহিল সভার আগে॥
রামচন্দ্র কহে, শ্যাম নাগর সদাই মরম জাগে॥[২]

'যমুনার জল, মুকত কবরী, ইথে কি পরাণ রয়'—এই উক্তি মহাকবির লেখনীমুখেই বাহির হইতে পারে।

বাৎসল্যঘটিত উৎকৃষ্ট পদগুলির মধ্যে বিপ্রদাস ঘোষের নিম্নোদ্ধৃত পদটি অন্যতম। কীর্ত্তনগানের রাণীহাটী (রেণেটী) পদ্ধতির প্রবর্ত্তক ছিলেন বিপ্রদাস, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।

---

১ HBL, পৃ ৪১৪। ২। HBL, পৃ ২০৩-০৪।

আগো মা, আজি আমি চরাব বাছুর।

পরাইয়া দেহ ধড়া, মন্ত্র পড়ি বান্ধ চূড়া, চরণেতে পরাহ নূপুর।
অলকা তিলক ভালে, বনমালা দেহ গলে, শিঙ্গা বেত্র বেণু দেহ হাথে।
শ্রীদাম সুদাম দাম সুবলাদি বলরাম সভাই দাঁড়াইয়া আছে পথে॥
বিশাল অর্জ্জুন জান কিঙ্কিণী অংশুমান্ সাজিয়া সভাই গোঠে যায়।
গোপালের কথা শুনি সজল নয়নে রাণী অচেতনে ধরণী লোটায়॥
চঞ্চল বাছুরি সনে কেমনে ধাইবা বনে কোমল দুখানি রাঙ্গা পায়।
ঘোষ বিপ্রদাসে বলে, এ বয়সে গোঠে গেলে প্রাণ না ধরিতে পারে মায়॥[১]

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিখ্যাত বৈষ্ণব দার্শনিক ও মহান্ত বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী 'হরিবল্লভ' ভণিতায় অনেকগুলি ব্রজবুলি পদরচনা করিয়াছিলেন।[২] ইঁহার রচিত সারার্থদর্শিনী নামে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা ১৬২৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দে সমাপ্ত হয়।

ঋত্বক্ষিষট্‌ভূমিমিতে শাকে রাধাসরস্তটে।
শুক্লষষ্ঠ্যাং সিতে মাঘে টীকেয়ং পূর্ণতামগাৎ॥

ইহার পূর্ব্বেই তিনি ক্ষণদাগীতচিন্তামণি নামে একটি পদসঙ্কলন গ্রন্থ আরম্ভ করেন। এই গ্রন্থের তিনি শুধু পূর্ব্ববিভাগ মাত্র রচনা করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থে অন্যান্য অনেক কবির সহিত তাঁহার নিজের পদগুলিও আছে।

ক্ষণদাগীতচিন্তামণি প্রথম পদসংগ্রহ গ্রন্থ। ইহাতে প্রায় ৪৫ জন কবি রচিত ৩০৯ টি পদ[৩] ত্রিশটি 'ক্ষণদা" অর্থাৎ উৎসবরজনীতে বিভক্ত। প্রত্যেক ক্ষণদার প্রথমেই একটি গৌরচন্দ্র ও একটি নিত্যানন্দচন্দ্র বিষয়ক পদ আছে।

এই শতাব্দীতে কয়েকটি মুসলমান পদকর্ত্তা পাইতেছি। ইঁহাদের মধ্যে সৈয়দ সুলতানই বিশিষ্ট। ইঁহার সম্বন্ধে পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

১। পদকল্পতরু ১১৭৫; HBL, পৃ ৪২৮। ২। HBL, পৃ ২৫৮-২৬০।
৩। ইহা ছাড়া ছয়টি পদ পুনরুক্ত হইয়াছে। HBL, পৃ ২৫৯ দ্রষ্টব্য।

একত্রিংশ পরিচ্ছেদ

মনসামঙ্গল : ক্ষমানন্দ, বিষ্ণু পাল, কালিদাস

মনসামঙ্গল পাঁচালীর শ্রেষ্ঠ কবি ক্ষমানন্দ (বা ক্ষেমানন্দ) সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। ইহা জানা যায় তাঁহার আত্মপরিচয়ে প্রদত্ত বারা খাঁর উল্লেখ হইতে। বারা খাঁ ১৬৪০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে সেলিমাবাদ সরকারের শাসনকর্ত্তা ছিলেন।[১] ক্ষমানন্দের কাব্য প্রথম মুদ্রিত হয় ১৭৭০ শকাব্দে।[২] ক্ষমানন্দ ভণিতায় প্রায়ই নিজেকে "কেতকাদাস" অর্থাৎ মনসার দাস বলিয়াছেন। কেতকাদাস শব্দের প্রকৃত অর্থ না বুঝিয়া অনেকে কাব্যটিকে ক্ষমানন্দ ও কেতকাদাস দুই জন কবির রচনা বলিয়া ভুল করিয়াছেন।

ক্ষমানন্দ দক্ষিণরাঢ়ের লোক। বাসস্থান দামোদর নদের পূর্ব্বতীরবর্ত্তী সেলিমাবাদ সরকারে কাঁথড়া (?) গ্রামে। ভণিতা হইতে জানা যায় যে, কবি ছিলেন জাতিতে কায়স্থ। ইঁহার এক ভাই ছিল, নাম অভিরাম।

কেতকার বাণী, রক্ষ ঠাকুরাণী
কায়স্থ যতেক আছে॥

তুমি যারে কর দয়া সে জানে বিষ্ণুর মায়া,
সেই বৈসে পণ্ডিতসমাজে।
কে জানে তোমার মায়া, অভিরামে কর দয়া,
ক্ষমানন্দ তুয়া পদ ভজে॥

১। ১০৪৭ সালে অর্থাৎ ১৬৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে বারা খাঁ মুকুন্দরামের পুত্র শিবরামকে ২০ বিঘা জমি দান করিয়াছিলেন।

২। পরে বহু সংস্করণ হইয়াছে। অধুনা প্রচলিত বটতলা সংস্করণগুলি পূর্ণাঙ্গ নহে; এগুলিতে শুধু কাব্যের শেষাংশ বেহুলা লখিন্দর কাহিনীটুকু আছে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য্য, এম্‌ এ, মহাশয় ক্ষমানন্দের কাব্যের অভিনব সংস্করণ প্রস্তুত করিয়াছেন। ইহা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক মুদ্রিত হইতেছে। যতীন্দ্র বাবুর সৌজন্যে তাঁহার সংস্করণ হইতে অংশ কিছু ব্যবহার করিতে পারিয়াছি। বর্ত্তমান আলোচনায় পুঁথি ছাড়া আমি প্রিয়নাথ দত্ত প্রকাশিত (কলিকাতা, ১৩২১) সংস্করণ ব্যবহার করিয়াছি।

দক্ষিণরাঢ়ের কবিদিগের মত ক্ষমানন্দ আত্মপরিচয় উপলক্ষে বিস্তৃত গ্রন্থোৎপত্তি-বিবরণ দিয়াছেন। এই বিবরণের প্রথমাংশ স্পষ্টতঃ মুকুন্দরামের লেখা স্মরণ করাইয়া দেয় আর শেষাংশ মাণিক গাঙ্গুলীর। মুকুন্দরাম ক্ষমানন্দ রূপরাম মাণিক গাঙ্গুলী প্রভৃতি দক্ষিণরাঢ়ের কবিগণের গ্রন্থোৎপত্তিবিবরণগুলি যেমন বাস্তব তেমনি মনোরম। ক্ষমানন্দের বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

শুন ভাই পূর্ব্ব কথা, দেবী হৈল বরদাতা সহায়পূর্ব্বক বিষহরি।
বলভদ্র মহাশয় চন্দ্রহাসের তনয়, তাহার তালুকে ঘর করি॥
তাহার রাজত্ব শেষ, চলি গেল স্বর্গদেশ তিন পুত্রে দিয়া অধিকার।
শ্রীযুত আস্কর্ণ রায় পুত্রের অধিক তায়[১], রণে বনে বিজয়ী সংসার॥
তিন পুত্র অল্প বয়, প্রসাদ গুরু মহাশয় তালুকের করে লেখাপড়া।
তাহার কলম বশে[২] প্রজা নাহি চাষ চষে, শমননগর হৈল কাঁথড়া॥
রণে পড়ে বারা খাঁ, বিপাকে ছাড়িল গাঁ যুক্তি করি জননী জনক।[৩]
দিন কত ছাড়ি যাই তবে সে নিস্তার পাই, দেয়ানে হইল বড় ঠক॥[৪]
শ্রীযুত আস্কর্ণ রায়ে অনুমতি দিল তায়ে, যুক্তি দিল পালাবার তরে।
শুনহ মণ্ডল তুমি উপদেশ বলি আমি, গ্রাম ছাড় রাত্রির ভিতরে॥[৫]
প্রসাদ তাহার পাত্র, ইঙ্গিত পাইবা মাত্র পলাইবে শঙ্কর মণ্ডল।[৬]
প্রসাদ হরিষ হয়্যা যুক্তি দিলা আশ্বাসিয়া, ধান্য কিছু না দিলা সম্বল॥
নিজগ্রাম ছাড়ি যাই, জগন্নাথপুর পাই প্রাতঃকাল নিশি অবসান।
তথায়েত নীলাম্বর উত্তরিতে দিল ঘর, হাঁড়ি চাল সিধা গুয়া পান॥
রাজা বিষ্ণুদাসের ভাই তাঁহারে ভেটিতে যাই, নাম তার ভারামল্ল [খান]।
তিনি দিলেন ফুল পান আর তিন খান গ্রাম লিখাপড়া বসতির স্থান॥
এই মত কত দিন আমার [অদৃষ্ট হীন] কপালে কি লিখিল বিধাতা।
শুন পুত্র ক্ষমানন্দ, কতেক করিব দ্বন্দ্ব, খড় কাটিবারে বলে মাতা॥

১। পাঠান্তর 'পুণ্যের অবধি তায়'। ২। ঐ 'তালুকে বৈসে'।
৩। ঐ 'যুক্তি করেন জনে জন'। ৪। ঐ 'সকলের তবে ভাল জান'।
৫। ঐ 'তার যুক্তি শুনি বাণী পলায়ে অনেক প্রাণী, বড়ই প্রমাদ হৈল পুরে॥'
৬। এই ছত্র এবং পরবর্ত্তী কয়েক ছত্র অনেক পুঁথিতে নাই।

মনে ভাবি সবিস্ময়, বেলা আছে দণ্ড ছয়, সঙ্গে লয়্যা অভিরাম ভাই।
অবসান হৈল বেলা গ্রামের উত্তর জলা খড় কাটিবারে তথা যাই ॥
তথায় ছাওয়াল পাঁচে খোলা দিয়ে জল সিঁচে, মৎস্য ধরে পঙ্কেতে ভূষিত।[১]
আমার কৌতুক বড়, ছাওয়াল পাঁচেতে[২] জড়, সেইখানে হইলাম উপনীত
আগে আমি কহি গিয়া, মৎস্য ধর আমা লৈয়া, তারা বলে ইহা নাহি হয়।
যত মৎস্য ধর্য্যাছিল[৩] সকল কাড়িয়া লৈল, অল্পবুদ্ধি মনে নাহি ভয় ॥
গালাগালি দিল তারা, মৎস্য ছিল হাঁড়ি ভরা সকল নিলেক ক্ষমানন্দ।
যতেক শিশুতে মেলি দেয় তারা গালাগালি, পথ আগুলিয়া করে দ্বন্দ্ব ॥
মৎস্য লৈয়া অভিরাম চলিল আপন ধাম, যত শিশু গেল নিজ পুরে।
আমি হৈলাম একেশ্বর, প্রাণে না করিলাম ডর, রহিলাম খড় কাটিবারে ॥
সন্ধ্যাকাল হৈল যদি খড় না মিলায় বিধি, কপালে লিখিল ইহা লাগি।
আচম্বিতে আইল ঝড়, পগারে গড়ায় খড়, সমুখে দেখিলাম মুচি-মাগী ॥
মুচিনীর বেশ ধরি বলেন দেবী বিষহরি, কাপড় কিনিতে আছে টাকা।
এতেক কহিয়া মোরে কপট চাতুরী করে, যত্নে একাইয়া দেই টাকা ॥
চরণে পিপীড়া খায়, ক্ষমানন্দ ফির্য়া চায়, সম্মুখে মুচিনী অদর্শন।
মুচিনীরে না দেখিয়া মনেতে বিস্ময় হয়্যা ভাবি মনে এই কোন জন।[৪]
বেষ্টিত ভুজঙ্গঠাটে অবতরি মাঝ মাঠে, দেখি মোর মুখে উঠে ধূলা।
পাইলাম মনস্তাপ, দেখিলাম অনেক সাপ, আমারে বেড়িল কতগুলা ॥
যে রূপ দেখিলা নেতে মানা কৈল প্রকাশিতে, কহিলে না হয় তোর ভাল।
ওরে পুত্র ক্ষমানন্দ, কবিত্বে কর প্রবন্ধ, আমার মঙ্গল গাইয়া বুল ॥

ক্ষমানন্দের কাব্যে বেহুলার যাত্রাপথে যে সকল স্থানের উল্লেখ আছে, তাহা প্রায় সবই বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে বাঁকা ও তাহার শাখা (অধুনা মজা) বেহুলা নদীর ধারে অদ্যাপি বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১। পাঠান্তর 'হৈয়া হরষিত'। ২। ঐ 'ছাওয়ালগণ যথা'। ৩। মূলে 'ধরেছিল'। স্পষ্টতঃই পুঁথি অর্ব্বাচীন।

৪। এই দুই ছত্র সব পুঁথিতে নাই।

মনসার কৃপায় যায় মনের আনন্দে। চাঁপাতলা এড়াইয়া গেল কুঙরবন্দে॥
এ দিন[১] বেহুলা ভাসে তুবরাজপুর। নবখণ্ড এড়াইয়া গেল বহু দূর॥
প্রাণহীন পতি তার কোলে লখিন্দর। ভাসিয়া ভাসিয়া পাইল বাঁকা দামোদর॥
কুঝাটি[২] গোবিন্দপুরে বর্দ্ধমানে ভাসি। গাঙ্গপুরে বেহুলা উত্তরিল আসি॥
বিষহরি বিনোদিনী মায়া কৈল তায়। গাঙ্গপুরে বেহুলার মান্দাস এলায়॥

বাঁশের গজাল যত তাহা গেল ছাড়্যা। খান খান হয়ে ভাসে যত কলা-গাড়্যা[৩]
আলো গঙ্গাপুর যান করিয়া পশ্চাৎ। দে-পুরে মান্দাস ভাসে রজনী প্রভাত।
দে-পুরে দ্বিগুণ তনু হৈল অতিকায়। নখাই সড়িত হইল দেবীর কৃপায়॥
ফুলিল শরীর তার বিপরীত গন্ধ। বেহুলা বলেন তারে সুধা মকরন্দ॥
অবিরত নেত্রজল নিবারিতে নারি। নেয়াদার[৪] ঘাটে ভাসে বেহুলা সুন্দরী॥
উলিয়া নর্ম্মদা জলে বেহুলা নাচনী। স্নান করি জপ করে আস্তিকজননী॥
মৃন্ময়ী বিষহরি কেজুয়ায় কমলা। তিন দিন তার পূজা করিল বেহুলা॥
কেজুয়ায় আকাশবাণী হৈল আচম্বিতে। এখানে বসিয়া রামা লাগিল জপিতে॥
সুরপুরে তোর পতি পাবে প্রাণদান। কেজুয়ায় বলে কত সবে মড়া ঘ্রাণ॥
কেজুয়ায় করিয়া পূজা জগাতি কমলা। ভাসিল আদমপুরে[৫] সুন্দরী বেহুলা॥
গোদা যথা মৎস্য ধরে ঘাটেতে বসিয়া। তথায় বেহুলা আইল ভাসিয়া ভাসিয়া।

গোদাঘাট পশ্চাৎ করিয়া সীমন্তিনী। জলেতে ভাসিয়া যায় দিবস রজনী।

ভাসিয়া কুকুরঘাটা বেহুলা যুবতী। সেই ঘাটে দান সাধে ঘাটের জগাতি॥
সে ঘাটে ভাসিয়া যায় কলার মান্দাস। জগাতি যুবতী দেখি করে উপহাস॥
হাসনহাটিতে যথা হাসনের হাট। বেহুলা পশ্চাৎ কৈল হাসনের ঘাট॥
প্রত্যক্ষ উজান জল নারিকেলডাঙ্গায়। মৃন্ময়ী বিষহরি ঠাকুরাণী তায়॥
কলার মান্দাস চাপি আইল তথায়। বেহুলা দেবীকে পূজে নারিকেলডাঙ্গায়॥

১। পাঠান্তর 'ত্রিদিন'। ২। ঐ 'ওঝটি'। ৩। ঐ 'কোলাবেড়ে'। ৪। ঐ 'নর্ম্মদার'।
৫। 'আমদাপুরে'।

মনেতে মনসা তারে করিল কল্যাণ। ছাড়ি নারিকেলডাঙ্গা বৈদ্যপুরে যান॥

... ...

বৈদ্যপুরে ভাসিয়া আইল পিড়তলী॥ গহরপুর[১] ভাসিয়া গঙ্গার জলে মিলি॥

... ...

তিন দিন ত্রিবেণী ত্রিধারা যথা বহে। তথায় বেহুলা আসে ক্ষমানন্দে কহে॥

ক্ষমানন্দ যে সকল দেবদেবীর বন্দনা করিয়াছেন তাহা হইতেও জানা যায় যে তিনি দক্ষিণরাঢ়ের লোক ছিলেন।

ক্ষমানন্দের কাব্যের একটি স্বচী পাওয়া যায় কাব্যের শেষে অষ্টমঙ্গলা অংশে। মনসা দেবীর উক্তি এই অংশটি নিম্নে প্রদত্ত হইল।

বলে দেবী বিশ্বমাতা, শুন স্বমঙ্গল[২] কথা আমার পূজার ইতিহাস।
যেই জন একমনে এ সব কাহিনী শুনে তাহার আপদ হয় নাশ॥
যখন না ছিল মহী তার পূর্ব্ব কথা কহি ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান।
প্রলয় যুগান্তকালে পৃথিবী ডুবিল জলে, একমাত্র ছিলেন ভগবান্॥
আত্মরূপ সনাতন স্বজিলেন ত্রিভুবন, শক্তিরূপ আর মহাশয়।
প্রলয়পদ্মের ফুলে মহেশ্বর বীর্য্য টলে, অধোমুখে পদ্মনাভ রয়॥
থাকিয়া[৩] পাতালপুরী পরাৎপর নাম ধরি মনরূপে মনজকুমারী।
বাপে ঝিয়ে পরিচয় শুনি হর মৃত্যুঞ্জয় আমা লৈয়া গেল নিজ পুরী।
সতাই সহিত দ্বন্দ্ব, লোচন হইল অন্ধ, বাপ থুইল লয়্যা বনবাসে।
বলে দেবী ঠাকুরাণী সিজু-বননিবাসিনী, চিরকাল ছিলাম হতাশে॥
কামধেনু সত্যযুগে থাকিতেন স্বরলোকে, পালন করিল স্বরপতি।
বিধি বিড়ম্বিল তায়, কৈলাসে ত্বরিতে যায় যথা হরগৌরীর বসতি॥
পাবন[৪] তুলসী তথা অতি স্বকোমল পাতা কপিলা খাইল অতি লোভে।
তুলসীছেদন দেখি মহাদেব হৈল দুঃখী, কপিলারে শাপ দিল কোপে।
কামধেনু গোলোকের শাপ হৈল মহেশের, এই হেতু আইল ভূমণ্ডলে।

১। আধুনিক পীরতলি। ২। পাঠান্তর 'অষ্টমঙ্গল'। ৩। ঐ 'জন্মিয়া'।
৪। ঐ 'পবন', 'পরাণ'।

মন্মথ মহাকায় বনে হারাইয়া যায়, তৃষ্ণায় শোষিত জলনিধি।
পুনঃ কপিলার পয় সমুদ্র পূরণ হয়, তথা গেলেন হরি হর বিধি ॥
মন্দর করিয়া দণ্ড কূর্ম্ম করিয়া ভাণ্ড তাহাতে বাসুকী হৈল ডোর।
দেব দৈত্য সর্ব্বজনে মন্থনের দড়ি টানে, মহাশব্দ হইল সঘোর ॥
ক্ষীরোদ মন্থন করে, উপজে নানা প্রকারে, যোগ্যজনে কৈল সমর্পণ।
এ তিন ভুবন জিনি উঠে লক্ষ্মী ঠাকুরাণী, তাহে মত্ত হৈল নারায়ণ ॥
চন্দ্র গেলেন চন্দ্রলোক, ধন্বন্তরি হরে শোক, দেবতা করিল সুধাপান।
ঐরাবত পারিজাত হর্ষে নিলা শচীনাথ, বিষ পাইয়া চলিল ঈশান ॥
দেবী সনে মহেশ্বরী মহেশের বিষ হরি অহিকুলে দিল হলাহল।
মন্থন করিল নিধি, মনসার পূজাবিধি চন্দ্র বেণের বাড়াল্য অনল ॥
কর্ম্ম মাত্র সদাগর বিল্বপত্রে পূজে হর, সদাগর ডুবিল ধনঞ্জয়।
সৃষ্টিকর্ত্তা মহাশয় যার যেই মনে হয় সেই কালে করিল নির্ণয় ॥
মহামুনি জরৎকার পতি হৈল মনসার, তার পুত্র হয় আস্তীক মুনি।
আস্তীক মুনির মাই, পাতালে বাসুকি ভাই, নাম দেবীর ত্রৈলোক্যতারিণী ॥
রাখাল পূজিল বনে, দূতমুখে তাহা শুনে কোপে জ্বলে হাসন হোসেন।
মজাতে হাসন[১]-পুরী কোপে জ্বলে বিষহরি, পলাইল সকল যবন ॥
নিচনির[২] ঝালু[৩] রাজা করে মনসার পূজা, তাহা দেখি চন্দ্র অধিকারী ॥
ক্রোধে জ্বলে অধিকারী, ভাঙ্গিল মনসার ঝারি[৪], দেবী সনে বিসংবাদ করি ॥
বেশ্যার রূপ লৈয়া সাধুর ভবনে গিয়া হরিয়া লইল মহাজ্ঞান।
পুনঃ গিয়া ত্বরাত্বরি জ্ঞান দিল বিষহরি, আর সাধু হৈল সিয়ান ॥
মনসা দেবীর কথা শ্রীহরিবংশেতে গাথা, ইতিহাস বলিব তাহার।
ঊষা অনিরুদ্ধ গিয়া বেহুলা নখাই হৈয়া ব্রতকথা করিল প্রচার ॥
দৈবের নিবন্ধ ছিল, দুই জনে বিভা হৈল, বাসরে শুইল নখিন্দর।
মনসার মনস্তাপে তারে খাইল কালসাপে, বেহুলা ভাসিল দেশান্তর ॥

১। পাঠান্তর 'হোসেন'। ২। মূলে 'নিচনীর', 'নছিনির'। ৩। পাঠান্তর 'নছিনির বাস'। ৪। মূলে 'বারি'।

মৃদঙ্গ মন্দিরা লয়্যা দেবতা সভায় গিয়া নাচে কন্যা বেহুলা নাচনী
দেবী হৈল পরিতোষ, ক্ষমিয়া সকল দোষ নখিন্দর পাইল পরাণী ॥
সাত ডিঙ্গ ডুবেছিল, তাহে চৌদ্দ ডিঙ্গা হৈল, আর জীল ছয়টি ভাশুর।
এত দিনে অধিকারী পূজে মনসার ঝারি চাঁদ বেণে বেহুলা-শ্বশুর ॥
ভুজঙ্গজননী কয়, কিবা দিব পরিচয়, অবশেষে দেখান যেরূপে।
মোর পিতা স্মরহর[১] অখিলভুবনেশ্বর, ব্রহ্মাণ্ড যাহার লোমকূপে ॥
আকাশ পাতাল ভূমি নিস্তারকারণ তুমি, শক্তিরূপে সবাকার মাতা।
মহেশ্বর মহেশ্বরী মনরূপা সুকুমারী লক্ষ্মীরূপে নারায়ণ যথা ॥
তুমি দেবী আদ্যাশক্তি পূজা লৈতে ধর মূর্ত্তি নাম গুণ করি নানা ভেদ।
ব্রহ্মা বিহঙ্গমপৃষ্ঠে বিধাতার সন্নিকটে যেখানে পড়েন চারি বেদ ॥
সুরপুরে আমি আছি হইয়া ইন্দ্রের শচী মহিমাকারিণী মায়াধারী।
সত্ত্ব রজঃ তমোগুণে বিধাতার গুণ জানে, কালেক বৈ নাহি দুই নারী[২]
উরিয়া হাসনহাটি মিলিলেক বৈদ্যবাটি, বহে জল প্রত্যক্ষ উজান।
স্বর্গ হৈতে পৃথিবীতে মনুষ্যের পূজা লৈতে নারিকেলডাঙ্গায় অধিষ্ঠান ॥
সহজে উত্তর দেশে মনসাকুমারী বৈসে, কমলপুরে আমার বিশ্রাম।
সর্পাঘাতে যত মরে তাহা জীয়াইতে পারে, মহিমা বড়ই বড় মান ॥
রম্যস্থলে কেজুয়া[৩] তথা মৃন্ময়ী পূজিয়া তথায় আমার অধিষ্ঠান।
দ্বারকানিবাসী গ্রাম গঙ্গার নিকটে ধাম, তথা করি গঙ্গাস্নান ॥
মঙ্গলগ্রামে অবতরী দেবী জয় বিষহরি ভক্তিভাবে পূজে সুর নরে।
সকল ভুবন মাঝে মনসাকুমারী পূজে, অন্য পূজা চম্পক নগরে ॥
সর্ব্বলোকে জয়যুক্ত সাঙ্গ হৈল তারি ব্রত, কল্যাণ করিল বিষহরি।
অষ্টমঙ্গলা সায়, ক্ষমানন্দ দাসে কয়, সর্ব্বলোক বল হরি হরি ॥

চরিত্রচিত্রণে এবং ভাষার মাধুর্য্যে ক্ষমানন্দের কাব্য তাবৎ মনসামঙ্গলের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। এই কারণে পশ্চিমবঙ্গে ক্ষমানন্দের পাঁচালীর একাধিপত্য। রাঢ়ের দক্ষিণ অঞ্চলে, বিশেষ করিয়া নিম্ন শ্রেণীর মধ্যে, ক্ষমানন্দের কাব্যের প্রতিপত্তি

১। মূলে 'সুখহর', 'সুরহর'। ২। পাঠান্তর 'অরি'। ৩। মূলে 'সেজুয়া'।

কৃত্তিবাস এবং কাশীরামের কাব্য হইতেও অনেক বেশী। ধর্ম্মমঙ্গল গান লুপ্তপ্রায়, চণ্ডীমঙ্গল গান দৈবাৎ শোনা যায়, শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গান ভক্তসমাজে ও দেবালয়েই হইয়া থাকে, কিন্তু রামায়ণ গান এবং মনসার ভাসান গান এখনও পল্লীবাসীর নিকট সমান আগ্রহ ও আনন্দের বিষয় হইয়া রহিয়াছে।

ক্ষমানন্দের কাব্যের আরও কিছু পরিচয় দিতেছি। কাব্যটিতে মুকুন্দরামের প্রভাব যথেষ্ট রহিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীতে দক্ষিণরাঢ়ের লোকাচারের কিছু কিছু পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়, এই কারণে ইহার ঐতিহাসিক মূল্যও সামান্য নহে।

দেবসভায় বেহুলার নৃত্যবর্ণনায় সেকালের নটীনৃত্যের প্রতিচ্ছবি পাওয়া যায়।

দেবতা সভায় গিয়া মৃদঙ্গ মন্দিরা লৈয়া নৃত্য করে বেহুলা নাচনী।
যতেক দেবতা দেখি, যেন নৃত্য করে শিখী, গায় যেন কোকিলের ধ্বনি ॥
ঘন ঘন তাল রাখে, অঞ্চলে বয়ান ঢাকে, হাসি হাসি বদন দেখায়।
মুখে গায় মিষ্ট বোল, খদির কাষ্ঠের খোল, তাথই তাথই ঘন গায় ॥
আগুতে পাছুতে গিয়া নাচে ঘন পাক দিয়া, চরণেতে বাজিছে ঘজ্ঘুর।
নবীন কোকিল যেন অহরহ ঘন ঘন মুখে গায় বচন মধুর ॥
এক পাশে থাকি নেত দেখে নৃত্য অবিরত, ভাল নাচে বেহুলা নাচনী।
মুখে মৃদু মৃদু হাসি, ক্ষণে রহে উঠি বসি, হেন দেখি ইন্দ্রের নাচনী ॥
করে কাংস্য করতাল, বলে ধনী ভাল ভাল, কটিতে কিঙ্কিণী ঘন বাজে।
আসিয়া ইন্দ্রের কাছে বেহুলা নাচনী নাচে প্রাণপতি জীয়াইবে কাজে ॥
থাকি থাকি পদ ফেলে, মরাল গমনে চলে, মুখ জিনি পূর্ণিমার শশী।
খদির কাষ্ঠের খোল, বেহুলার মিষ্ট বোল, মোহ গেল যত স্বর্গবাসী ॥
এক দৃষ্টে দেবগণ সবে করে নিরীক্ষণ, বেহুলা নাচেন সুরপুরে।
নাহি হয় তালভঙ্গ, মনে বড় বাড়ে রঙ্গ, প্রমত্ত ময়ূর যেন ফিরে ॥[১]
রঙ্গে ভঙ্গে হস্ত নাড়ে, ত্রিভঙ্গ হইয়া পড়ে, এইরূপে গায় বিনোদিনী।
নৃত্যগীতে মন মোহে, যতেক দেবতা কহে, ভাল নাচে বেহুলা নাচনী ॥

১। পাঠান্তর 'ভ্রমরু মধুর ফিরে ফিরে।'

দেবতা সভায় শিব জিজ্ঞাসেন দিয়া দিব্য বেহুলার পূর্ব্বপরিচয়।
কেন নাচ সীমন্তিনী, তুমি বল মোরে ধনী, সত্য কহ না করিহ ভয়॥
এ কথা শুনিয়া রামা নৃত্যগীতে দেয় ক্ষমা, দেবতাসভায় কয় কথা।
মনসামঙ্গল গীত ক্ষমানন্দ বিরচিত, নায়কেরে হও[১] বরদাতা॥

বেহুলা নখিন্দরকে লইয়া উভয়ে যথাক্রমে যোগিনী ও যোগী বেশ ধরিয়া ফিরিবার পথে পিত্রালয়ে দেখা করিতে চলিল।

বেহুলা প্রভুর বোলে নানা আভরণ ফেলে, করে বালা যোগিনীর বেশ।
রক্ত বস্ত্র কটি পরে, শ্রবণে কুণ্ডল ধরে, জটা কৈল মস্তকের কেশ॥
ধবল বসন পাতি, অঙ্গেতে শোভে বিভূতি, ত্যজিয়া গলায় সাতনরী।
বিভূতি মাখিয়া গায় ছলিবারে তার মায় যোগিনী হইল সুন্দরী॥
যাইতে বাপের দেশ হইয়া যোগিনী বেশ নখিন্দর যায় তার সাথে।
শঙ্খের কুণ্ডল কাণে যোগী[২] হয়ে দুই জনে মায়ারূপে থাল কৈল হাতে॥
চৌদ্দ ডিঙ্গা ঘাটে থুইয়া যোগী যোগিনী হৈয়া চলিল বেহুলা নখিন্দর।
রূপ জিনি তিলোত্তমা, রক্ত বস্ত্র পরে রামা, আচ্ছাদিল অঙ্গ মনোহর॥
গলায় রুদ্রাক্ষমালা স্কন্ধে ঝুলি হাতে থালা, নখিন্দর চলে তার আগে।
বেহুলা যায় পিছু পিছু, লজ্জায় না বলে কিছু, মায়ারূপে দোঁহে ভিক্ষা মাগে॥

এই বেশে তাহারা নিছনী নগরে গিয়া

সবাকার বাড়ী গিয়া শিঙ্গাধ্বনি করে। শিব শিব বাণী মুখে সঘনে নিঃসরে॥
বেহুলা নখাই ভিক্ষা মাগে বাড়ী বাড়ী। থালের উপরে কেহ দেয় চাল কড়ি॥
থালে দিতে চাল কড়ি উড়ে আচম্বিতে।[৩] বুঝিতে না পারে কেহ বলে নানা মতে॥

এইরূপ ঘুরিতে ঘুরিতে তাহারা বেহুলার পিত্রালয়ে পৌছিল।

দুপ্রহর বেলা যখন গগনমণ্ডলে। যোগী আর যোগিনী তারা প্রবেশে মহলে॥
সত্য জানি বলি হয় শিঙ্গার যে ধ্বনি। ঘর হৈতে শুনে তাহা অমলা বেণেনী॥
সুবর্ণের থালায় দিলে চাল কড়ি। নখাই অন্তরে হৈল দেখিয়া শ্বাশুড়ী॥

১। পাঠান্তর 'হবে'। ২। ঐ 'যোগিনী'।
৩। এইরূপ পশ্চাৎ গোবিন্দচন্দ্রের গীতে দ্রষ্টব্য।

নখাই বিমুখ হৈল পরম লজ্জায়। বেহুলা ঈষৎ হাসে পীযূষের প্রায় ॥
চাল কড়ি দেয় রামা যোগিনীর থালে। আচম্বিতে উড়ে তাহা দেবী অনুকূলে ॥

অমলা চিনি চিনি করিয়া বলিল,

তোমা দেখিয়া শোকে কান্দে মোর প্রাণ। মোর কন্যা এক ছিল তোমার সমান ॥
না বলিয়া কোথা গেল মড়া লৈয়া কোলে। যোগিনী জাগালে শোক বেহুলা বদলে ॥
তখন বেহুলা আত্মপরিচয় দিল।

ডোমনী বেশে বেহুলা শ্বাশুড়ীর নিকট "লক্ষের বিয়নী" বিক্রয় করিতে আসিয়াছে। চিনিতে না পারিয়া

সনকা কহিল তারে তোর কিবা নাম। কোথাকার ডোমিনী[১] তুমি থাক কোন গ্রাম ॥
ডোমিনী তাহারে কহে প্রবঞ্চনাকথা। বেহুলা ডোমিনী নাম সায় ডোম পিতা ॥
চাঁদ ডোম শ্বশুর নখাই ডোম পতি। অতি হীনকুলে জন্ম মোরা ডোম জাতি ॥
ধুচনী চুবড়ী বুনি আর বুনি কুলা। সেচুনী ব্যজনী বুনি আর বুনি ডালা ॥
বুনিয়া নগরে বেচি জাতি অনুসারে। নখাই আমার ডোম আছে নিজ ঘরে ॥
আমার ব্যজনীখানি লক্ষ টাকা মূল। চাঁদ ঝলমল করে কনকের কুল[২] ॥
ব্যজনে বসন্ত আসে বন্দিনীর বায়। নিদ্রাকালেতে লাগে সুশীতল গায় ॥
যে জন সুজন বড় হয়ত রসিক। ব্যজনী কিনিবে দিয়া লক্ষের অধিক ॥
বেহুলা নখাই নামে পূর্ব্ব শোক জাগে সনকা ক্রন্দন করে ডোমিনীর আগে ॥

ক্ষমানন্দ নাম অথবা ছদ্মনাম যুক্ত আর একটি কবির রচিত সংক্ষিপ্ত বেহুলা-লখিন্দর পাঁচালীর পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। পুঁথিখানি দেবনাগরী অক্ষরে ১২২৪ সালে অনুলিখিত। লেখক পুরুলিয়ার নিকটবর্ত্তী ডিম্‌ডিহা গ্রামবাসী ছিলেন। পুঁথিখানি শ্রীযুক্ত বসন্ত রঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ মহাশয়ের সম্পাদকতায় বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ১৩১৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছে।

রায় মহাশয় এই কাব্যটিকে ক্ষমানন্দের মূল কাব্য বলিয়া মনে করেন। কিন্তু

১। পাঠান্তর সর্ব্বত্র 'ডোমনী'। ২। ঐ 'তুল্য'।

এই কবি যে মানভূম অঞ্চলের লোক তাহা বুঝিতে মোটেই বিলম্ব হয় না। ভাষার কথা ছাড়িয়া দিলাম; কয়েকটি পাত্র পাত্রীর নাম এবং আচারব্যবহারও মানভূম অঞ্চলেরই বটে।

কাব্যটি আকারে নিতান্ত ক্ষুদ্র, নয়টী দীর্ঘ পদের সমষ্টি মাত্র। শুধু একটি পদ ত্রিপদীতে রচিত, বাকি সব পয়ারে। কুত্রাপি কেতকাদাস ভণিতা নাই, সর্ব্বত্র ক্ষেমানন্দ। অনেক স্থলে কবি নিজেকে শিশু বলিয়াছেন।

ক্ষেমানন্দ শিশু বলে করিয়ে মিনতি।
আসরে করহ খেলা দেবী পদ্মাবতী॥

কয়েকটি পদে ভণিতা নাই।

পূর্ব্ববর্ণিত ক্ষমানন্দের মনসামঙ্গলের সহিত এই দ্বিতীয় (ক্ষমানন্দ বা) ক্ষেমানন্দের মনসামঙ্গলের কোনই সম্পর্ক নাই। ইহা একেবারে স্বতন্ত্র কাব্য। কাব্যটি নানাদিক দিয়া বিশেষত্বযুক্ত বলিয়া ইহার বিস্তৃত বিবরণ দিতেছি।

শিশু কৃষ্ণের লীলাবর্ণনায় গ্রন্থের আরম্ভ, তাহার পর রামভজন উপদেশ ও সংসারের অসারত্বখ্যাপন, তাহার পর এইরূপ বন্দনা—

বন্দিব শ্রীগণপতি শিবের নন্দন। একদন্ত স্থূলতনু মূষিকবাহন॥
বন্দো প্রভু রঘুনাথ কমললোচন॥ চন্দ্র সূর্য্য বন্দি আর বরুণ পবন॥
সাবধান হয়ে বন্দো গঙ্গা ভাগীরথী। যাহার পরশে ভাই হয় মোক্ষগতি॥
বন্দো শিব ভোলানাথ করি নমস্কার। কালকূট বিষ যেই করিল সংহার॥
স্বর্গে ইন্দ্ররাজ বন্দো পাতালে বাসুকি। গরুড় অরুণ বন্দো হইয়ে কৌতুকী॥
গয়ায় গদাধর বন্দো প্রয়াগে মাধব। অযোধ্যাতে রাম বন্দো গোকুলে যাদব॥
বন্দিব শ্রীনত্যার-চান্দ বড় প্রীত-আশে। যার গুণে হরিনাম হইল প্রকাশে॥
অড়োষ্যাতে বন্দো ঠাকুর জগন্নাথ। এমন কোথায় শুনি নাঞি বাজারে বিকায় ভাত॥
নীলাচলের পথে যাত্যে বড় লাগে দুঃখ। সব দুঃখ দূরে যাবে দেখ্যে চান্দমুখ॥
আঠার-নালাতে যাত্যে থাঞে বেতের বাড়ি। বেতের বাডি থাঞে পাপী যায় গড়াগড়ি॥

জগন্নাথের মুখ দেখি দুঃখ পাসরিল। কুলাচলে যাঞে যাত্রী গড়াগড়ি দিল ॥
ধন্য রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন বলে বারে বার। যার গুণে মহাপাপীর হইল উদ্ধার ॥
আস্য মা মনসা দেবী ঘটে কর ভর। তোমার মঙ্গল গাইবেক অধম পামর ॥
আমার আসরে আস্তে দেবী মা মনসা। গায়ে দিবে বল মাতা তোমারি যে আশা ॥
আমার আসর ছাড়ে অন্যের আসরে যাও। দোহাই মা শিবের গণেশের মাথা খাও ॥
মনসা বসিল আসি আমার আসরে। কার্ত্তিক গণেশ আইল দুই সহোদরে ॥
বন্দো উমা কাত্যায়নী করিয়ে ভকতি। সাবধানে হঞা বন্দো দেবী সরস্বতী ॥
গ্রাম গ্রামের যত দেবী কোর্য়ে একতাল। শ্রীগুরুচরণে ভক্তি রহুক সর্ব্বকাল ॥
শিক্ষাগুরু দীক্ষাগুরু করি নমস্কার। যাহার প্রসাদে জ্ঞান হবে সবাকার ॥
সব গুরু বন্দো ভাই হেঁট কর্য়ে মাথা। ঘরের গুরু বন্দিব আপন পিতামাতা ॥
রোহিণী[১] যোগিনী বন্দো যক্ষ প্রেত ভূত। কার নাম জানি নাঞি আছহ বহুত ॥

তাহার পর মূল কথারম্ভ। চম্পা নগরবাসী চাঁদ সদাগরের সহিত মনসার বিবাদ বাধিল।

দেবী বলে চান্দ বাণ্যা আমার বাক্য ধর। কড়ার না পুষ্প জলে মনসার সেবা কর ॥
এতেক শুনিয়া চান্দ কোপ কৈল মনে। চেঙ্গমুড়ী কাণী আমি পূজিব কেমনে ॥
চান্দ বলে মোর দেব প্রভু ভোলানাথ। আর কোন দেবী নাঞি করি প্রণিপাত ॥

মনসার সহিত এইরূপ বিবাদ করিয়া চাঁদ ছয় পুত্র লইয়া সিংহলে বাণিজ্যে চলিল।

যখন বাণিজ্যে যায় চান্দ সদাগর।
পাঁচ মাস গর্ভে তখন বালা লখিন্দর ॥

বাণিজ্য করিয়া সাধু দেশের দিকে ফিরিল। চাঁদকে ছলিতে মনসা ব্রাহ্মণীর মূর্ত্তি ধরিয়া আসিয়া ভিক্ষা চাহিল। চাঁদ তাঁহাকে মনসা বলিয়া বুঝিতে পারিয়া মনে মনে হাসিল।

১। 'রুক্মিণী' হইবে?

চান্দ বলে নৌকায় ভাণ্ডারী আছে কেহ।
এক কড়া কড়ি ইহারে ফেল্যে দেহ ॥

মনসার কোপে ছয় পুত্র সমেত ছয় নৌকা ডুবিয়া গেল। চাঁদ মনের দুঃখে জলে ঝাঁপ দিল, কিন্তু

অগম দরিয়ার জল একহাঁঠু হৈল ॥

অগত্যা চাঁদ নৌকায় উঠিল। ফিরিবার পথে চম্পা নগরবাসী রাম সদাগরের সহিত সাক্ষাৎ হইল। রামের নিকট চাঁদ শুনিল যে তাহার কনিষ্ঠ পুত্র, বাণিজ্য যাত্রার কালে যে গর্ভে ছিল, সে বার বৎসরের হইয়াছে। রাম সদাগর সিংহল মুখে চলিল, চাঁদ দেশের দিকে ফিরিল। পথে উজানী নগরে নৌকা রাখিয়া চাঁদ সাহ সদাগরের নিকট গেল এবং সাহের বার বৎসর বয়স্কা কন্যা বেহুলার সহিত লখিন্দরের সম্বন্ধ স্থির করিয়া চম্পানগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া লখিন্দরের বিবাহোদ্যোগ করিতে লাগিল।

হেনকালে মনসা মা স্বর্গে কহে কোপে।
লখিন্দরে বাসঘরে খাবে কালসাপে ॥

চাঁদ শুনিয়া উজানীতে লোহার বাসর ঘর গড়াইতে লোক নিযুক্ত করিল। যথাসময়ে বিবাহ হইল, বরকন্যা লোহার মন্দিরে বাসর যাপন করিতে গেল। বাসরে বেহুলা রাঁধিয়া লখিন্দরকে খাওয়াইল এবং নিজে অবশেষ পাইল। মনসার আদেশে বিশ্বকর্ম্মা লোহার মন্দিরে ছিদ্র করিয়া দিল। তাহার পর পাত্র ধোবিন বা নিতাই ধোবিন[১] পরামর্শ দেওয়ায় মনসা ইন্দ্রের নিকট চারি মেঘ চাহিয়া লইয়া খুব ঝড় ও শিলাবৃষ্টি করাইল। তাহাতে মন্দিররক্ষিগণ পলাইয়া গেল। এমন কি চাঁদও হিন্তালের নড়ি লইয়া দাঁড়াইয়া রহিতে পারিল না। এই অবসরে একে একে অনেকগুলি সাপ ঢুকিয়া পড়িল, কিন্তু বেহুলার সদ্ব্যবহারে এবং চিনি দুগ্ধ পাইয়া অত্যাচার করিতে পারিল না। শেষে বেহুলা নিদ্রিত হইলে কালীনাগ প্রবেশ করিল।

বাসরে সামাঞে নাগ ভাবে মনে মন। লখিন্দরের রূপ দেখি করয়ে ক্রন্দন ॥

১। অর্থাৎ, নেতা ধোবিনী।

লখাই চাহিতে বেহুলা বড়ই সুন্দর। রূপে গুণে আলা করে লোহার বাসর ॥
চান্দ সদাগর-সুত বড়ই সুন্দর। শিরে কেশ বাণিয়ার হাঁড়িয়া-চামর ॥
গরুড় প্রহরী জাগে ময়ূর প্রহরী শিঅরে বসিয়া জাগে ওঝা ধন্বন্তরি ॥
শিঅর ছাড়িয়া নাগ পা-তলে দাণ্ডাল্য। নিন্দের আলিসে বাণ্যা দণ্ডে লাথি মাল্য ॥
চন্দ্র সূর্য্য বাপ্পা হে তোমরা থাক সাক্ষী। মিনি দোষে বাণ্যার ছায়াল দণ্ডে মাল্য লাথি ॥
সাক্ষী ত রাখিয়ে নাগ কামড় জুড়িল। সোনার বরণ লখা কালিয়ে হইল ॥

বেহুলার নিদ্রাভঙ্গ হইল। তাহার পর বেহুলার বিলাপ। চাঁদ বেহুলাকে ভৎর্সনা করিল,

উচ্চকপালী বেহুলা লো চিরুণ-চিরুণ-দাঁতী।
বাসরে খাইলে স্বামী না পোহাল্য রাতি ॥

বেহুলা উত্তরে বলিল, যাহা আমার কর্ম্মে ছিল তাহা হইল, কিন্তু

ভাল হৈল চান্দ শ্বশুর দোষ দিলে মোরে।
আর ছয় পুত্র তোমার কোন রোগে মরে ॥

কলার মান্দাসে লখিন্দরের মৃতদেহ লইয়া বেহুলা গাঙ্গুড়ির জলে ভাসিল। শ্বেত কাকের মুখে বেহুলার মাতা চুহিলা বেণ্যানী খবর পাইল। কাকের মারফৎ বেহুলাকে পিতা সাহ বেণ্যা পত্র দিল। বেহুলার আঠার ভাই নদীতীরে বালীচরের ঘাটে গিয়া বেহুলাকে ফিরিবার জন্য নির্ব্বন্ধ করিতে লাগিল। বেহুলা ফিরিল না। কিছুদূর যাইবার পর ভাকুর মৎস্য লখিন্দরের পায়ের আঙ্গুল কাটিয়া লইল। বেহুলা মৎস্যকে শাপ দিল। তাহার পর বেহুলা শিবা ডোমের হাতে পড়িল, শেষে ডালি ভস্ম করিয়া নিজের প্রতাপ দেখাইয়া তাহার হাত হইতে মুক্তি পাইল। কিছুদূর গিয়া পাত্র ধোবিনের সহিত দেখা হইল। ধোবিন বেহুলাকে মনসার নিকট লইয়া গেল। মনসা অভিমান করিয়া বলিলেন,

মোর সাধ্য নাঞি কন্যা বাঁচাত্যে তাহারে। চেঙ্গমুড়ী কাণী বলে তোমার শ্বশুরে ॥
আমি কোন দেবতা আমারে মানে কে। যথা মন কন্যা তুমি যাহ সে তথাকে ॥

বেহুলার নির্ব্বন্ধে এবং ধোবিনের আগ্রহে দেবী রাজী হইল। লখিন্দর

পুনর্জীবিত হইল। দেবীর আদেশে জালু মালু দুই ভাই ভাকুর মৎস্য ধরিয়া তাহার উদর হইতে লখিন্দরের অঙ্গুলি বাহির করিল। লখিন্দরের পায়ে অঙ্গুলি জোড়া লাগিয়া গেল। লখিন্দরের সাত ভাই পুনর্জীবিত হইল। সকলে চম্পানগরে ফিরিয়া আসিল। সঙ্গে দেবীও আসিলেন। এদিকে চাঁদ মনসাকে পূজা করিতে রাজি হইল না।

চান্দ বলে কি বলিলে আমার নন্দন। চেঙ্গমুড়ীর কেমনে সে পূজিব চরণ॥
যদি মোর সর্ব্বনাশ পুনর্ব্বার হয়। তথাপি না পূজি আমি কহিল নিশ্চয়॥
দূর কর ওরে বাছা বলিএ তোমারে। উহাকে দেখিয়ে ক্রোধ দহিছে শরীরে॥

ইহা শুনিয়া মনসা ক্রুদ্ধ হইলেন।

দেবী বলে শুন বেউলা কহিএ তোমায়। অপমান করিতে বেউলা আনিলে আমায়॥
বেহুলা বলিল মাতা না কর ক্রোধমন। অবশ্য সেবিব শ্বশুর তোমার চরণ॥

তাহার পর বেহুলা লখিন্দর এবং তাহার ছয় ভাই সকলে মিলিয়া চাঁদের পায়ে ধরিয়া মনসাকে পূজিতে বলিল। চাঁদ কিছুতেই রাজি নহে, বলিল,

শুন শুন লখিন্দর বলিএ তোমায়। প্রায় বুঝি অপমান করাবে উহায়॥
ঘরকে পাঠাও উহায় কিছু দেহ কড়ি। নতুবা থাইবে আজি হেন্তালের বাড়ি॥
শিবকে ছাড়িয়ে উহার পূজিব চরণ। এমন কুৎসিত আশা করে কোন জন॥

দেবী ক্রোধ করিয়া চলিয়া যান আর কি! লখিন্দর ও বেহুলা পায়ে ধরিয়া তাঁহাকে রাখিল। পুত্রেরা পিতার পায়ে লুটাইতে লাগিল, তবুও চাঁদ অটল। শেষে

সনকা বলিল বাণ্যা কঠিন তোমার মন। ধূলাতে ধূসর পড়্যে আমার নন্দন॥
পুষ্প জল দেবীকে দাও আমি কহি বাণী। মরা পুত্র চান্দ বাণ্যা পাইলে আপুনি॥

তখন চাঁদ আর কি করে? মনে মনে ভাবিল,

অনেক উপায় ছুঁড়ী করিল আপনি।
ছেল্যার উপরোধে আমি দিব পুষ্প পানী॥

চাঁদ দুই শিবলিঙ্গ কোলে করিয়া স্নান করিতে গেল, স্নান করিয়া শিবপূজা করিল।

শিবের সেবা করি তবে আনন্দিত মন। চান্দ বলে পূজি এবে চেঙ্গমুড়ীর চরণ॥

পূর্ব্বদিগে মনসার করিল আসন। পশ্চিমমুখেতে চান্দ বসিলা তখন ॥
জয় ভেবী বল্যে বেণ্যা দেই পুষ্প পানী। তা দেখিয়ে হাসে মাতা জগৎজননী ॥
দৈবের নির্ব্বন্ধ ভাই কে করে খণ্ডনে। ভেবী বলিতে দেবী বাইরায় চান্দের বদনে ॥
পুষ্প জল ধূপ দীপ দিল সদাগর। তুষ্ট হঞে মনসা মা তারে দিল বর ॥
পূজিতে পূজিতে চান্দের দিব্যজ্ঞান হৈল পশ্চিমমুখ তেজ্যে চান্দের পূর্ব্বমুখ হল্য ॥
মনসায় পূজিয়ে চাঁদের আনন্দিত মন। প্রণাম করিল চান্দ অতি বিলক্ষণ ॥

এই ক্ষুদ্র কাব্যটির স্বল্পপরিসর বেষ্টনীর মধ্যে চরিত্র কয়টি স্পষ্ট হইয়া ফুটিয়াছে, বিশেষ করিয়া চাঁদ সদাগরের চরিত্র। চাঁদের নির্ভীক অদম্য পুরুষত্বের নিকট দেবীর মাহাত্ম্য নিতান্ত নিষ্প্রভ হইয়াছে। কাব্যটি কোন্ সময়ে রচিত বলিতে পারি না, তবে চাঁদের চরিত্র হইতে মনে হয়, যে ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা হওয়া অসম্ভব নহে। এই ক্ষুদ্র পাঁচালীটি বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে একটি বিশেষ স্থান অধিকার করিয়া থাকিবে।

বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গলের পুঁথি বীরভূম (?) জেলায় সেহাড়া গ্রামে পাওয়া গিয়াছে।[১] পুঁথিটি এখন বঙ্গীয় রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।[২] ইহাতে বিষ্ণু পালের কোন পরিচয় পাওয়া যায় নাই। পুঁথিটি খণ্ডিত, হয়ত শেষে গ্রন্থরচনাকাল ইত্যাদি দেওয়া ছিল। পুঁথিটির ভাষা এবং রচনাভঙ্গি কতকটা আধুনিক বটে, কিন্তু মধ্যে মধ্যে বেশ পুরাতন শব্দ ও বাগ্‌ভঙ্গি রহিয়াছে। গ্রন্থারম্ভে ধর্ম্ম ঠাকুর কর্ত্তৃক সৃষ্টিবর্ণনা পড়িলে মনে হয় যে, বইটি মূলে হয়ত ষোড়শ শতাব্দীতে কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত হইয়াছিল। এইরূপ বর্ণনা পাই বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে এবং মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে। লিপিকার অনেক স্থলেই গোলমাল করিয়াছে। ছাড়বাদও অল্প নহে। পুঁথির মধ্যে একাধিক লিপিকারের হস্তলিপি আছে।

১। বীরভূমি ১৩০৭, পৃ ২৬৭। ২। পুঁথি ৪৯৯৩।

গ্রন্থের আরম্ভভাগ নিম্নে দেওয়া গেল।

বন্দো দেব গণপতি বিনয়ে ভকতি-স্তুতি,
তুমি দেব হরের নন্দন।
দিব্য বস্ত্র পরিধান, সদাই মন্ত্র ধ্যান,
আগে পূজা করে দেবগণে॥
(দেব) কে জানে তোমার মর্ম্ম, পার্ব্বতীর উদরে জন্ম
মুণ্ডচ্ছেদ শূন্য[১] দরশনে।
অম্বিকা ভাবয়ে দুখ, হনু আনে গজমুখ,
জিয়াইলে মন্ত্রের আহ্বানে[২]॥
গণেশ ঘটে আরোহণ দিঞা গন্ধ চন্দন
কুঙ্কুম কস্তুরী (লেপে) বিধিমতে।
ব্যাঘ্রচর্ম্ম পরিধান, ইন্দুর যাহার বাহন,
শঙ্খ পদ্ম[৩] শোভে চারি হাথে॥
আতপ তণ্ডুল চাহি চিনি ফেনি[৪] আর গাহি
নারেঙ্গ সারেঙ্গ শর্করা।
ধূপ দীপ পাঞ্জলা নৈবেদ্য সন্দেশ কলা
প্রথমে নৈবেদ্য মনোহরা॥
হেম জিনি দাসে গায় তুয়া পদ মহাকায়
গণেশের নাভি গম্ভীর॥[৫]

জলে হইতে হৈল আদ্য[৬] পুরুষের জনম। তার পুত্র হৈলা প্রভু অনাদ্য[৭] ধরম॥
শূন্যেতে আসন প্রভুর শূন্যেতে বৈসন। শূন্যে ভরা কর্যা প্রভু ভ্রমে নিরঞ্জন॥
শূন্যেতে থাকিঞা প্রভু পাতিঞাছ মায়া। আপনে সৃজিলা[৮] প্রভু আপনার কায়া॥
চাপড় হানিঞা জিনে জলের বিম্বুক। তায় ভরা কৈলা দেখ অনাদ্য নামে সিন্ধু

১। মূলে 'সন্নি'। এইরূপ পরেও। ২। ঐ 'মন্তবাহুর্ব্বানে'। ৩। ঐ 'ব্রাহ্ম'
৪। ঐ 'ফিনি'। ৫। এখানে অন্ততঃ একটি চরণ ছাড় পড়িয়াছে।
৬। মূলে 'আর্দ্দি'। ৭। ঐ 'অনার্দ্দি'। এইরূপ পরেও। ৮। ঐ 'সর্জ্জিলা'।

বিন্দু হৈলা বিম্বুক সহিতে নারে ভর। ভাঙ্গিল পানীর বিম্বু উথলিল জল ॥
চক্ষের ময়লা[১] প্রভু নিছিঞা ফেলিল। তাহাতে আসিঞা পক্ষ উলূক[২] জন্মিল ॥
কহরে উলূক [পক্ষ] কত যুগ[৩] যায়। এতেক শুনিঞা কিছু উলূক শুধায় ॥
চৌদ্দ চৌ যুগ জাগে এই ব্রহ্ম-গেয়ানে। সত্য যুগ আইল সৃষ্টি কর নিরঞ্জনে ॥
কাঁধের[৪] ছিড়িঞা ফেলে কনক-পইতা। এক[৫] গোটী নাগের হৈল সহস্র গোটা মাথা ॥
নাগের নাম বাসুকি থুইলা নিরঞ্জন। তায় সমর্পিল প্রভু এ তিন ভুবন ॥
অঙ্গের ময়লা পাইলা তিল প্রমাণ। বাসুকির চক্রে (হতে) পৃথিবী হৈলা নব খান ॥
নবখানা পৃথিবী সৃজিলা পশুপতি। একটী[৬] কন্যা হৈলা নাম বসুমতী ॥
আইস আইস বসুমতী হইও চিরাই[৭]। আমি যাকে[৮] জন্ম দিব তুমি দিহ ঠাঞি ॥
বব পাঞা বসুমতী বসিল ধেয়ানে। মনসার বরে কবি বিষ্ণু পালে ভণে ॥

বাচাল ॥

জলেতে ভাসেন প্রভু দোসর কেহু নাঞি। ভাসিতে ভাসিতে প্রভু তুলে রাখে হাঞি ॥
হাঞিবাটী চণ্ডিকা জন্মিলা তথাই। চণ্ডিকা জন্মিলা রে রাতুল দুটী পায় ॥
বাপ বল্যে চণ্ডিকা সম্ভাষিতে যায়।[৯] ... ...
বুকে হাথ[১০] [দিল] তার নাহি রঙ্গরসে। স্ত্রী নয় পুরুষ নয় চণ্ডিকা বোলায় কিসে ॥
বজ্রনখে কর‍্যা তার আখি-ছেদ কৈল। পরম সুন্দরী কন্যা তাহাতে জন্মিল ॥
কন্যাকে দেখিঞা ধর্ম্ম ধরিতে নারে মন। খসিল অনাদ্যের চন্দ্র ছিতে ততক্ষণ ॥
চন্দ্র খসিল রে দুর্গার স্থানে থুইল। তুসাগত (?) হঞা চণ্ডিকা আভ্যন্তর কৈল ॥
... ... [৯]প্রথম গণ্ডুষে হৈল ব্রহ্মা গদাধর ॥
দ্বিতীয় গণ্ডুষে জন্মিলা নারায়ণ। তৃতীয় গণ্ডুষে জন্মিলা দেব ত্রিলোচন ॥

১। পাঠ 'মলয়া'। এইরূপ পরেও। ২। ঐ 'উল্লুক'। এইরূপ পরেও। ৩। ঐ 'জোগ'।
৪। পাঠ 'কান্দের'। ৫। ঐ 'একে'। ৬। ছন্দের অনুরোধে 'একগোটী' হইবে।
৭। পাঠ 'হইঅ্য স্থীরাই'। ৮। ঐ 'জাখে'। ৯। এখানে অন্ততঃ এক চরণ ছাড় পড়িয়াছে।
১০। পাঠ 'হাড়'।

চতুর্থ গণ্ডুষে কন্যা নাম কুণ্ডলিনী। বায়ু নাম ধরে কন্যা আদি কুণ্ডলিনী॥
জরা মুনির পুত্র নাম বীণারঙ্গ। সেই কন্যা বিভা কৈল মনের আনন্দ
কন্যার সনে থাক্যে মুনির বহুত পিরীতি। বিধির ঘটনে কন্যা হৈল গর্ভবতী॥
দশ মাস দশ দিন প্রসহ্ন সময়। প্রসবিল সুন্দরী কন্যা সুন্দর তনয়॥
অশ্বমেধ যজ্ঞে দিঞা দুই দান। গুণিঞা গাথিঞা কশ্যপ থুইল নাম॥
সৃষ্টি সৃজন হৈল দেখ স্বর্গপুরী যাই। পরম সুন্দরী কন্যা থুব কার ঠাঞি॥
ব্রহ্মাকে যাচিতে গেল বাপ বল্যে বলিল। বিষ্ণুকে যাচিতে গেল কর্ণে হাথ দিল।
শিবকে যাচিতে গেল অঙ্গীকার কৈল।[১]
শতেকবার মরে দুর্গা জীয়ে শতেকবার। শতেক খানি হাড়ে শিব গলাতে পরে মাল॥
মরিঞা মরিঞা [নাম] হৈল সনাতনী। হৈমন্তের ঘরে জন্ম নিলা অভয়া ভবানী॥
গান কবি বিষ্ণু পাল বিষহরির বর। দুবরা পৃথিবীখানি গেল রসাতল॥

বরবেশী লক্ষ্মীধরকে দেখিয়া নারীগণ নিজ নিজ পতির নিন্দা করিতেছে। এই অংশটি দ্বিতীয় হাতের লেখা। ভাষা অর্ব্বাচীন, এবং ইহাতে বীরভূমের কথ্য ভাষার ছাপ সুস্পষ্ট।

এক যুবতী বলে দিদি হোর জাগ তু। কেমন বটে লখাই বালা দেখে আসি মু॥
সেহ বলে বেউলার বর হইল ভাল। আমার কপালে বিধি কিবা লিখেছিল॥
. ...
আর যুবতী বলে দিদি হোর জাগো তু। কেমন বটে লখাই বালা দেখে আসি মু॥
সেহ বলে বেউলার বর হইল ভাল। কালার কপালে পড়ে মোর প্রাণটা গেল॥
সন্ধ্যাবেলায় কই প্রভুকে দুখসুখের কথা। শুনিতে না পায় সেই ঘন নাড়ে মাথা॥
ইত্যাদি।

মনসামঙ্গল রচয়িতা কালিদাস বর্দ্ধমান ও বীরভূমের সীমান্ত অঞ্চলের অধিবাসী ছিলেন, এইরূপ অনুমান হয়। ইহার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে বর্দ্ধমান জেলায় কানাভাঙ্গা গ্রামে। পুঁথি ১২২০ সালে অনুলিখিত।[২] কালিদাস নিজের পরিচয় কিছুতেই দেন নাই, কেবল "গৌড়দেশ যার বাস" এইটুকু মাত্র বলিয়াছেন।

১। এখানে অন্ততঃ এক ছত্র ছাড় আছে। ২। ব-সা-প-প ৮, পৃ ৫৪, ১৯, পৃ ১৩৯-১৪৬।

কবি নিজের পরিচয় দেন নাই বটে, কিন্তু কাব্যরচনার কাল বহু স্থলে উল্লেখ করিয়াছেন। কাব্যটি ১৬১৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৭-৯৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

অঙ্ক মৃগাঙ্ক রস মৃগাঙ্ক গণনা।
এই শকে এই কাব্য করিল রচনা॥

গ্রহ বিধু ঋতু শশী শকের গণনা।
এই শকে এই কাব্য করিল রচনা॥

গ্রহ বিধু রস ক্ষৌণী শক নরপতে গণি,
এই শকে হৈল কাব্যমণি।
গ্রহ বিধু রস শশী শক নরপতে ঘুষি,
এই অব্দে এ কাব্য প্রকাশি॥

কার্ত্তিক নামে এক ব্রাহ্মণের অনুরোধে কালিদাস মনসামঙ্গল রচনা করেন।

কার্ত্তিক ব্রাহ্মণ নাম অজন্যাজন্যকা কাম[1]
কাব্যরস করিল যতনে।
দ্বিজসুত-উপরোধে চিন্তিয়া মনসাপদে
কবি কালিদাস [ইহা] ভণে॥

কবির ইষ্টদেবতা কিংবা গুরু ছিলেন গোলোকনাথ।

গোলোকনাথের পদপঙ্কজস্মরণে।
মনসামঙ্গল কবি কালিদাস ভণে॥

কাব্যটি ১৩৩ অধ্যায়ে বিভক্ত। আরম্ভ এইরূপ—

কৃষ্ণের আদেশ পেয়ে দেবগণ গেলা ধেয়ে,
উপনীত কৈলাসশিখর।
সেই সে শিখরখান ভুবনদুর্ল্লভ স্থান,
স্বর্গগঙ্গা বহিছে নির্ম্মল॥
পারিজাত তরুবর, নানা পুষ্প বহুতর,
সৌরভে আমোদ কৈল তথি।

১ গ্রাম?

প্রমথ কিন্নরগণে গাহিছে পঞ্চম তানে,
আনন্দে বিহরে পশুপতি ॥
করপুট করি দেবে পশুপতিপদ সেবে,
প্রসন্ন হইলা শূলপাণি।
সঙ্গে করি দেবগণ সিন্ধুতটে ত্রিলোচন
কালকূট দেখি অনুমানি ॥
করেতে করিয়া হর তুলি নিল হলাহল,
খ্যাতি-স্তুতি দিল নাগগণে।
অঞ্জলি করিয়া নিল, বদনে ফেলিয়া দিল,
পান করি বসিল ধেয়ানে ॥
গোলোকনাথের পদ ধ্যান করি অবিরত
হৃদিগত তম করি নাশ।
মনসামঙ্গল নাম কাব্য রসে অনুপাম
বিরচিল কবি কালিদাস ॥

দ্বাত্রিংশ পরিচ্ছেদ

বিবিধ দেবীমাহাত্ম্য কাব্য

গোবিন্দ দাসের কালিকামঙ্গল[১] সুবৃহৎ কাব্য। কবি ছিলেন আত্রেয়-গোত্রীয় কায়স্থ, বাসস্থান ছিল চাটিগ্রামের অন্তর্গত দিয়াঙ্গ বা দেবগ্রাম, আধুনিক আনোয়ারা গ্রামে। কাব্যের যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহা হইতে ইহার অধিক কিছু পরিচয় জানা যায় না।

আত্র গোত্র দাস কুল, জন্ম মোর আদি মূল,
চিরকাল নিবাস দিআঙ্গে।

পুঁথিটির লিপিকাল হইতেছে ১১১৬ মঘী সন অর্থাৎ ১৭৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দ। কেহ কেহ নিম্নে উদ্ধৃত পয়ার তুলিয়া বলেন যে কাব্যটি ১৫৩৪ শকাব্দে রচিত হইয়াছিল।

অক্ষর বাণ শশী শক পরিমিত।
এই কালে রচিত কালিকা চণ্ডীর গীত॥[২]

কিন্তু এই শ্লোক কোথা হইতে পাওয়া গেল তাহা কেহই বলেন নাই। গোবিন্দ দাসের কাব্যের রচনাশৈলী ও ছন্দঃ মোটেই প্রাচীনত্বদ্যোতক নহে, ভারতচন্দ্রের ধরণের। কবি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন। কাব্যে বিক্রমাদিত্যের কাহিনী বর্ণিত হওয়ায় এই সময়ই সমর্থিত হইতেছে। যাহা হউক, আমরা সন্দেহের সুবিধা দিয়া কবিকে সপ্তদশ শতাব্দীর ইতিহাসের অন্তর্ভুক্ত করিয়া লইলাম।

কবির ভণিতা এইরূপ—

কালিকাচরণ যার ভরসা কেবল।
রচিল গোবিন্দ দাসে কালিকামঙ্গল॥

১। প্রদীপ ১৩১০, পৃ ৩৬৮-৭৪, ব-সা-প-প ৯, পৃ ১২৫-২৬।
২। বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ৬৩,৬৪।

কালিকামঙ্গল চারি অংশে বিভক্ত—(১) দেবরাজ্য, বৃত্রাসুরবধ, এবং দেবী-মাহাত্ম্যপ্রচার, (২) মার্কণ্ডেয়-চণ্ডীপ্রোক্ত সুরথ-সমাধি কাহিনী, (৩) বিক্রমাদিত্যের উপাখ্যান, এবং (৪) বিদ্যাসুন্দর-কাহিনী বা অষ্টমঙ্গলা।

গোবিন্দ দাসের কাব্যে বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানে স্থান ও ব্যক্তির নামে কিছু কিছু স্বাতন্ত্র্য দেখা যায়। ইহাতে বীরসিংহের রাজধানীর নাম রত্নপুর, সুন্দরের পিতা মাতার নাম যথাক্রমে গুণিসার ও কলাবতী, জন্মস্থান গৌড় রাজ্যের অন্তর্গত কাঞ্চননগর, মালিনীর নাম রম্ভা বা সুলোচনা। চোর-ধরার ব্যাপার নিধিরামের ও রামপ্রসাদের বর্ণনার অনুরূপ।

গোবিন্দ দাস ভক্ত মানুষ ছিলেন। কবির যে ভাষায় কিছু দখল ছিল নিম্নে উদ্ধৃত তত্ত্বকথামূলক অংশটি পড়িলে উপলব্ধি হইবে।

চন্দ্র বেড়িয়া যেন আকাশের তারা। তেন হি ঈশ্বরী কালী বিষয়ী আত্মারা॥
প্রতিবিম্ব দেখি যেন দবপণ তারা। সংসারের যত দেখ সেই ত শরীরা॥
সমুদ্রের জল যেন নদ নদী ভরে। সেই জল পুনরপি মিশায়ে সাগরে॥
কর্ম্মদরি[১] বন্ধনে ঘুচয়ে অনুখন। সুকৃত দুষ্কৃত ভোগ ভুঞ্জে সর্ব্বজন॥
সংযোগ বিয়োগ যত কর্ম্মসূত্রে করে বাজিকরের বাজি যেন বহুরূপ ধরে॥
স্রোত জলে যেন লৈয়া যায় যথা তথা। আবর্ত্তে ঘুরাইয়া নিয়া করয়ে একতা॥
কোথায় ইন্দ্রের পুরী কোথায় শিবলোকে। একত্র বসিয়ে দেখ পরম কৌতুকে॥
জ্ঞানযোগ কথা এই পরম কারণ। মনের আনন্দে সিদ্ধি পায়ে যোগিগণ॥
শুন শুন দেবগণ শুন প্রজাপতি। সেই দেবী মহাকালী পুরুষ প্রকৃতি॥
বুদ্ধিযোগে জ্ঞান কথা গুরুমুখে শুনি। মন গুরু মন শিষ্য বুঝহ সন্ধানি॥
অকারে উকারে আর মকারে মিলন। সংযোগেতে প্রাণ রহে পরম কারণ॥
পৃথিবী সংযোগে দেখ নিজে হয় তরু সংযোগপরতে দেখ বর্ণ হয় গুরু॥

গোবিন্দ দাস মীননাথের কাহিনী-উল্লেখ করিয়াছেন। এই অংশটি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

মীননাথ নামে ছিল এক মহাযোগী। ভাব জানিতে তেঁহ হইলেন বৈরাগী

১। দড়ি?

তৈল না দেন অঙ্গে বিভূতিভূষণ। শিরে লম্বিত জটা না পিন্ধে বসন॥
থাল হাতে লইয়া যোগী ঘরে ঘরে বুলে। শ্মশানে মশানে বৈসে বনে তরুতলে॥
বষা আতপ হিম সর্ব্ব সহমানে। প্রাণায়ামে ছিল পূর্ণব্রহ্মসন্ধানে॥
নিরশন ব্রতে হৈল পরম সাধক। মহামায়া কৃপা [তার] হৈল নিরর্থক॥
শতেক কামিনী লৈয়া কদলীর বনে। অতি রসে তনু ক্ষীণ হইল দিনে দিনে॥
জ্ঞান ভক্তি যোগসিদ্ধি যাহা হৈতে হয়। তারে না ভজিয়া তার হইল সংশয়॥
গোরক্ষনাথ পরম যোগী মীননাথের শিষ্য নানা যত্ন করিলেক গুরুর উদ্দেশ্য॥
মৃত্যুপথে যাত্রা ভয়ে দেখিয়া আশক্য। গুরুর উদ্দেশ তবে করিলা গোরক্ষ॥
মহাকালীর পাদপদ্ম করিয়া ভাবনা। যোগবলে মীননাথে করিল চেতনা॥
দেবীর প্রসাদে তার মন হৈল স্থির। সেই মীননাথ দেখ দিব্যশরীর॥

কালিকামঙ্গলে অনেকগুলি গান সন্নিবিষ্ট আছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি ব্রজবুলিতে রচিত।

নিম্নে উদ্ধৃত গানের ছন্দঃ ভারতচন্দ্রের কাব্যে পাই।

নৌমি নন্দিকেশ ঈশ, কণ্ঠে কালকূট বিষ,
নীলকণ্ঠ নাম রাম দেবদেববন্দনী।
অর্দ্ধ অঙ্গ গৌরী সঙ্গ, মৌলি কেলি চতুরঙ্গ,
অঙ্গভঙ্গ অতি রঙ্গ শোহে জহ্নুনন্দিনী॥ ইত্যাদি।

নিম্নে উদ্ধৃত পদটি মন্দ নয়। সুন্দর গৃহগমনোদ্যত হইলে বিদ্যা গানটি গাহিয়াছিলেন।

সজনি সই, প্রাণবন্ধু যাইবেন মধুপুরে।
ছাড়িব গোকুলবাস, জীবনের কিবা আশ, বধভাগী হইল অক্রূর॥
এই সেই বৃন্দাবন, কেলি কৈলা অনুক্ষণ, বসিয়া গাঁথিল পুষ্পমালা।
যত সখিগণ এই, প্রাণসুন্দর কই, কত না সহিব দেখ জ্বালা॥
আর না দেখিব কানু, আর না শুনিব বেণু, আর না করিব লাস বেশ।
এমন ব্যথিত থাকে বন্ধুরে বুঝাইয়া রাখে, বিধি বিনু নাহি উপদেশ॥
ছাড়িব গোকুলচন্দ্র, প্রাণে না জীবেক নন্দ, মরিবেক রোহিণী যশোদা।

গোপীর মরণ দৈবে, অনুমান করি সবে, সবের আগে মরিবেক রাধা ॥
মথুরার নারী যত হর আরাধিল কত, জিনিতে কামের ফুলধনু ।
দাস গোবিন্দ বাণী, বন্ধুর গমন শুনি যমুনায় ছাড়িব গিয়া তনু ॥

চাটিগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত কোন কোন পদ্মাপুরাণের পুঁথির ভণিতায় গোবিন্দ দাস ভণিতা দেখা যায়। সম্ভবতঃ কবি একখানি মনসামঙ্গলও রচনা করিয়াছিলেন।

নারায়ণ দেব রচিত কালিকাপুরাণের খণ্ডিত পুঁথি[1] পাওয়া গিয়াছে। প্রাপ্ত অংশে হরগৌরী কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই কবি মনসামঙ্গল রচয়িতা নারায়ণ দেব হইলে কাব্যটি ষোড়শ শতাব্দীর রচনা হওয়া সম্ভব। ভণিতা এইরূপ—

বিভায় কৌতুক কাব্য কালিকাপুরাণে।
হরগৌরী বন্দি গাহে সুকবি নারায়ণে ॥

সুরস সঙ্গীত পুরাণে লিখিত
(সুকবি) নারায়ণ দেবে ভণে ॥

পুঁথি মধ্যে জয়দেব দাস এবং বলরাম দাস এই দুই নামের ভণিতাও দুই একবার পাওয়া যায়।

"দ্বিজ" কমললোচনের কাব্য চণ্ডিকাবিজয় বা চণ্ডিকামঙ্গল[2] মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী অবলম্বনে রচিত। কবি সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বিদ্যমান ছিলেন, কারণ তিনি দিল্লীশ্বরসুতের জাগীরে বাস করিতেন। শাহ্ শুজা ১৬৩৯ হইতে ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঙ্গালার সুবাদার ছিলেন, সুতরাং কবি এই সময়ের লোক।

রঙ্গপুর জেলায় আন্দুয়া পরগনায় ঘাগট নদীর তীরে চরখাবাড়ী গ্রামে কবির বাস ছিল। কবির পিতার নাম যদুনাথ। ইঁহারা ব্রাহ্মণ ছিলেন।

ঘোড়াঘাট সরকার, আন্দুয়া পরগনা তার, দিল্লীশ্বরসুতের জাগীর।
চতুর্দ্ধারী মুসলমান, পুরাণের নাহি মান, বৈসে দ্বিজ ঘর্ঘটের তীর ॥
চরখাবাড়ীতে ঘর, যদুনাথ বংশধর নাম শ্রীকমললোচন।

১। ব-সা প পুথি ৯০৬। ২। ব-সা-প প্রকাশিত (১৩১৬), ব-সা-প-প ১৩, পৃ ১৬৫-৬৬

অম্বিকার কৃপালেশে চণ্ডিকাবিজয় ভাষে শিরে ধরি শ্রীনাথের চরণ ॥
পৃ ৩১৮ ॥

শুদ্ধ সদাচার দ্বিজ যদুনাথ নাম। কমললোচন তার সুতের আখ্যান ॥
দোহাকার গতি মতি অম্বিকাচরণে। চণ্ডিকাবিজয় ভণে কমললোচনে ॥ পৃ ৩১৫ ॥

শুদ্ধমতি অতি যদুনাথ দ্বিজবর। কমললোচন নাম তার পুত্রবর ॥
সহস্রারে ধ্যান করি শ্রীনাথচরণে। চণ্ডিকাবিজয় গীত করিল রচনে ॥ পৃ ১৮৮ ॥

কাব্যরচনার কালে কবির পুত্রাদি জন্মিয়াছিল, তাহা নিম্নের ভণিতা হইতে জানা যাইতেছে।

কমললোচন দ্বিজে অভয়ার পদাম্বুজে
দারাসুতে প্রাণ সমর্পিল। পৃ ৬৭ ॥

কাব্যটিতে যদুনাথের রচনাও কিছু কিছু আছে বলিয়া মনে হয়। কারণ যদুনাথের ভণিতা মধ্যে মধ্যে রহিয়াছে।

দ্বিজ যদুনাথ বাণী ভবভয়ানলে।
রাখহ করুণাময়ী ও পদকমলে ॥ পৃ ২৪৮ ॥

নিম্নে উদ্ধৃত ব্রজবুলি পদটি যদুনাথের রচনা। পাঠের বিপর্যয় যথেষ্ট রহিয়াছে।

আজি কি পেখনু সমন্বিত হর-গৌরী। সফল ভয়ো রে নঞান-যুগ মেরি ॥
চাঁচর বেণী বিরাজিত কাঁহু। কাঁহু পর লম্বিত বিনোদ জরাউ ॥
পারিজাতমালা গলে গিরিবালা। গিরিগণ্ডে দোলত সেহি অক্ষমালা ॥
মলয়জ পঙ্ক প্রলেপ অঙ্গ চারু। চিতাধূলিভূষণ ত্রিজগৎ-গুরু ॥
লোহি লোহিতাম্বর অরুণ জিনি শোহা। বাঘাম্বর কাঁহু দনুজদল-মোহা ॥
হর গৌরী নিরখে গৌরী সারং লোকাইওঁ। যদুনাথ উভয়চরণ বলি যাইও ॥
পৃ ৩৭৩-৭৪ ॥

কবি বলিয়াছেন যে তিনি দেবীর আদেশে কাব্য রচনা করেন।

এমত দুর্গাকে সেবে কমললোচনে। সদয় হইলা মাতা আপনার গুণে ॥
আদেশিয়া লিখাইলা নিজ সংকীর্ত্তন। সদা পদছায়া দিবে লয়াছি শরণ ॥

মার্কণ্ড-পুরাণ দেবি তোমার স্তবন। পদবন্ধ কৈল লোক বুঝিতে কারণ॥
সার্বর্ণিক মন্বন্তরে মহিমা তোমার। জগজন তরাইতে করিলে প্রচার॥
সমাপ্ত হইল গীত দুর্গার চরণে। রাঙ্গা পদ পাব এহি আশা আছে মনে॥
প্রাণ সমর্পণ করি দুর্গার চরণে। চণ্ডিকাবিজয় ভণে কমললোচনে॥

পৃ ৪১১-১২॥

চণ্ডিকাবিজয় ১৪৬ টি "অধ্যায়" বা পদে বিভক্ত। কাব্যটিতে কবির ভক্তির যে পরিচয় পাইতেছি কবিত্বশক্তির পরিচয় তদনুপাতে বিশেষ কিছুই পাওয় যাইতেছে না।

ভবানীপ্রসাদ রায়ের দুর্গামঙ্গল[১] সম্ভবতঃ ১০৭১ সালে অর্থাৎ ১৬৬৪-৬৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।[২]

কবির পিতার নাম নয়নকৃষ্ণ রায়। ইহারা ছিলেন বৈদ্য, কৌলিক উপাধি কর। বাসস্থান ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত আটীয়া পরগনার মধ্যবর্ত্তী কাঁটালিয়া গ্রাম। কবি জন্মান্ধ ছিলেন এবং শৈশবেই মাতাপিতৃহীন হইয়াছিলেন। জ্ঞাতি-বিরোধে কবি আজীবন দুঃখ পাইয়াছিলেন।

ভবানীপ্রসাদ এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

নিবাস কাঁটালিয়া গ্রাম বৈদ্যকুলে জাত। দুর্গার মঙ্গল বোলে ভবানীপ্রসাদ॥
. . . . . .
জন্মকাল হইতে কালী করিলা দুঃখিত। চক্ষুহীন করি বিধি করিলা লিখিত॥
. . . . . .
জ্ঞাতিভ্রাতা আছে আমার নামে কাশীনাথ। তাহার তনয় দুই কি কহিব সংবাদ॥
জ্ঞাতি-ভাই করি তেহ করেন আপ্যায়িত। তাহার তনয়গুণ কহিতে অদ্ভুত॥
কনিষ্ঠ পুত্রের গুণ ভুবনবিদিত। পরদ্রব্য পরনারী সদাই পিরীত॥
বিদ্যা উপার্জ্জনে তার নাহি কোন লেশ। পিতা পিতামহ নাম করিলা প্রকাশ॥
দীর্ঘটানে সদা তেঁহ থাকেন মগন। জ্ঞাতি বন্ধু সহ তার নাহিক রমণ॥
তাহার চরিত্রগুণ কি কহিব কথা। খুড়া প্রতি করে তেঁহ সদাই বৈরতা॥

পৃ ২০০-০১॥

১। ব-সা-প প্রকাশিত (১৩২১), ব-সা-প-প ৩, পৃ ১৩৭-৪৮।
২। ব-সা-প-প ৩, পৃ ১৪০, দুর্গামঙ্গল, পৃ ২৯৪।

অন্যত্র—

ভবানীপ্রসাদ রায় ভাবিয়া আকুল। চক্ষুহীন কৈলা বিধি নাহি পাই কূল॥
কাঁটালিয়া গ্রামে কর বংশে উৎপত্তি। নয়নকৃষ্ণ রায় নামে তাহার সন্ততি॥
তাহাতে ভরসা কালী চরণ তোমার। বন্ধুহীন হইয়াছি করহ উদ্ধার॥

পৃ ১৫৪॥

দুর্গামঙ্গল স্থূলতঃ মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী অবলম্বনে রচিত হইলেও ইহাতে রামচন্দ্রের দুর্গোৎসবাদি প্রভৃতি অন্য কাহিনীও অল্পস্বল্প বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থের আরম্ভে কবি এই সূচী দিয়াছেন—

যেরূপে আরম্ভে পূজা অকালে আশ্বিনে। মন দিয়া সেহি কথা শুন সর্ব্বজনে॥
যে মতে আসিলা দেবী বাপের নিবাস। ই তিনি ভুবনে হৈল পূজার প্রকাশ॥
সৃষ্টির পত্তন মধুকৈটভবিনাশ। মৈষাসুরবধ দেবীর মাহাত্ম্যে প্রকাশ॥
রক্তবীজবধ শুম্ভনিশুম্ভনিধন। দেবতার স্তুতিবাণী সুরথমোক্ষণ॥
যেন মতে রামচন্দ্র সমুদ্রের তীরে। দশভুজারূপে পূজা করিলা চণ্ডীরে॥
নিদ্রা হৈতে ভগবতীকে চৈতন্য করিয়া। লঙ্কাজয়ী হৈল রাম তোমাকে সেবিয়া॥
গিরিপুরী হৈতে দেবী চলিলা কৈলাস। যেরূপে রহিলা দেবী শিবের নিবাস॥
ই সব মাহাত্ম্য কিছু করিব প্রকাশ। পৃ ৪-৫॥

কবিত্বের পরিচয় বিশেষ কিছু না থাকিলেও এবং অন্ত্যানুপ্রাসে মধ্যে মধ্যে দোষ থাকিলেও কবির আন্তরিকতা ও ভক্তিপ্রবণতা দুর্গামঙ্গলকে বৈশিষ্ট্য দান করিয়াছে। ভবানীপ্রসাদ জন্মান্ধ ছিলেন; ইহা বিবেচনা করিলে তাঁহার কৃতিত্ব অসাধারণ বলিতে হইবে।

আক্ষরিক অনুবাদও কতটা সরল অথচ মূলের ভাবানুগত হইতে পারে তাহা নিম্নে উদ্ধৃত অংশ হইতে বোধগম্য হইবে।

যেহি দেবী বুদ্ধিরূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥
যেহি দেবী লজ্জারূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥
যেহি দেবী ক্ষুধারূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥
যেহি দেবী তৃষ্ণারূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥

যেহি দেবী দয়ারূপে সর্ব্বভূতে থাকে। নমস্কার নমস্কার নমস্কার তাকে॥

পৃ ১২১॥

দেবীর প্রতি দেবতাদিগের স্তুতি বেশ চমৎকারভাবে অনূদিত হইয়াছে।

চরাচরগতি তুমি জগৎআধার। প্রসন্ন হইয়া কর জগৎনিস্তার॥

... ...

সকলের বল বীর্য্য অনন্তরূপিণী। বিশ্ববীজরূপে তুমি মায়াপ্রকাশিনী॥
সকল সংসার মোহে তোমার মায়ায়। সংসারে প্রসন্না দেবী হও মহামায়॥
তোমার মায়ায় মোহে প্রাণী যত ইতি। সকল বিদ্যার মূল তুমি ভগবতী॥
ভেদাভেদরূপে তুমি আনন্দরূপিণী। তুমি পরে সংসারেতে অন্য নাহি জানি॥
তোমা না চিনিয়া লোক অন্য পথে ধায়। এ সব তোমার মায়া বুঝন না যায়॥
তুমি বিনা পৃথিবীতে কিছু সত্য নয়। অনিত্য সংসার সব নিত্য কেহ নয়॥
বুদ্ধিরূপে সকল জীবের হৃদে বাস। স্বর্গ অপবর্গ আদি তোমাতে বিলাস॥
সুখ মোক্ষ গণে জীব ইচ্ছায় তোমার। নারায়ণি তোমার চরণে নমস্কার॥
নিমিষ পলেতে হয় মুহূর্ত্ত প্রমাণ। কলা কাষ্ঠা আদি হয় দণ্ডের প্রমাণ॥
ই সবার মূল তুমি পরিমাণ আর॥ ভূত ভবিষ্যৎ সর্ব্ব ইচ্ছায় তোমার॥
বিশ্বের পরম শক্তি আনন্দরূপিণী। প্রণাম করিয়ে পদে তুমি নারায়ণী॥

পৃ ২১৯-২০॥

রূপনারায়ণ ঘোষের দুর্গামঙ্গল[১] মার্কণ্ডেয়-পুরাণ অবলম্বনে রচিত। কবি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমিত হয়।[২] কবির নিবাস ছিল ময়মনসিংহ জেলা আটিয়া পরগনায় আদাজান গ্রামে।

কবি বেশ শিক্ষিত সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। ইহা নিম্নলিখিত অংশটি হইতে প্রতিপন্ন হইবে।

দেবীর মাহাত্ম্য শুনি চপলহৃদয়। পারি বা না পারি কিছু বলিব নিশ্চয়॥
গুণের মহিমা তার কে পারে বর্ণিতে। দুস্তর সাগর চাহি উড়ুপে তরিতে॥

১। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৭৩-৭৯।

২। রসিকচন্দ্র বসু মহাশয় যাঁহার নিকট পুঁথি পাইয়াছিলেন তিনি কবির অধস্তন অষ্টম পুরুষ।

প্রাংশুগম্য মহাফল লোভের কারণ। হাতে পাইতে ইচ্ছা করয়ে বামন ॥
পরন্তু ভরসা এক মনে ধরিতেছে। বজ্রবিদ্ধ মণিতে সূত্রের গতি আছে ॥

কাব্যরচনার এই হেতু কবি নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

পক্ষা সব কহে কথা জৈমিনি শুনয়। সে কথা গাঁথিলা শ্লোকে ব্যাস মহাশয় ॥
মহামুনি ব্যাসদেব তাঁহার বচন। সংস্কৃত কারণে না বুঝে সর্ব্বজন ॥
সতত চণ্ডীর কথা শুনিতে অভিলাষ। ই হেতু পাঁচালী করি করিল প্রকাশ ॥
সেহি পুণ্যময় কথা শুনিতে সন্তোষ। পয়ারে কহিল রূপনারায়ণ ঘোষ ॥

কবি মধ্যে মধ্যে ব্রজবুলির প্রয়োগও করিয়াছেন।

জনার্দ্দনের মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী[১] ক্ষুদ্র কাব্য মাত্র। কবির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। শেষের ভণিতা এইরূপ—

মঙ্গলচণ্ডীর দাস কহে জনার্দ্দন।
পাঁচালী প্রবন্ধে জান অদ্ভুত কথন ॥

কাব্যটি ব্রতকথা বলিয়া ইহাতে কালকেতুর উপাখ্যান নাই, শুধু ধনপতির কাহিনী আছে। ধনপতির দুই পত্নী ; প্রথমার চক্রান্তে দ্বিতীয়া ছাগল চরাইতে যায় এবং একটি ছাগল হারাইয়া যায়। ছাগল খুঁজিতে খুঁজিতে খুলনা দেখিল যে এক স্থানে কতকগুলি ব্রাহ্মণ মঙ্গলচণ্ডিকা ব্রত করিতেছে। সেই ব্রাহ্মণদিগের উপদেশে খুলনা মঙ্গলচণ্ডীর পূজা করিয়া ছাগলটি পায়। তাহার পর ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা ইত্যাদি।

কাব্যের আরম্ভ এইরূপ—

আদিদেব নারায়ণ শঙ্কর চরণ। বন্দিয়া মঙ্গলচণ্ডী করিল স্মরণ ॥
মঙ্গলচণ্ডিকাপদে কোটি নমস্কার। মহামায়ারূপে দেবী ধরিছে সংসার
সর্ব্বাঙ্গসুন্দরী দেবী গৌরবর্ণ ধড়া[২]। পট্ট বস্ত্র পরিধান সুবর্ণমেখলা ॥
মণিময় সুরচিত মুকুট শোভে শিরে। কনককুণ্ডল তার কর্ণে শোভা করে ॥

১। ব-সা-প-প তৃতীয় খণ্ডে [পৃ ৩০-৩৬] প্রকাশিত।
২। পাঠ 'ধরা'।

গ্রীবায় শোভা করে গজমুক্তার হার। স্থানে স্থানে শোভা করে দিব্য অলঙ্কার॥
অভয়া বরদা দেবী সকরুণমন। অনুগত জনে রক্ষা করে সর্ব্বক্ষণ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর দেব সুরপতি। চরণে পড়িয়া যার নিত্য করে স্তুতি॥
সহস্র বয়ানে গুণ কহিতে না পারে। কি করিতে পারি আমি মনুষ্যশরীরে॥

"দ্বিজ" হরিরামের চণ্ডীমঙ্গলে কালকেতু-ফুল্লরা ও ধনপতি-খুল্লনা উভয় আখ্যানই আছে। কবি বাস করিতেন ঘাটালের অন্তর্গত চিতুয়া ও বরদা[বাটী] পরগনার অধীশ্বর শোভাসিংহের আশ্রয়ে। শোভাসিংহের মৃত্যু হয় ১৬৯৬ খ্রীষ্টাব্দে।

অদ্রিজামঙ্গল কাম বিরচিল হরিরাম,
শোভাসিংহে রক্ষিবে অম্বিকা॥[১]

১। বঙ্গসাহিত্য-পরিচয় ১, পৃ ৬২০। পুঁথির লিপিকাল ১০৮০ সাল (মল্লাব্দ ?)।

ত্রয়স্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

লৌকিক কাহিনীঃ আরাকানের ও চট্টগ্রামের মুসলমান কবি

লৌকিক—অর্থাৎ ধর্ম্মের বা কোন দেবদেবীর সহিত সংপৃক্ত নহে এমন—প্রণয়ঘটিত ও নীতি-উপদেশপূর্ণ উপাখ্যান লইয়া কাব্যরচনার ধারা প্রবর্ত্তিত হয় সপ্তদশ শতাব্দীতে। এই সকল কাহিনী হয় সংস্কৃত হইতে নতুবা ফারসী বা হিন্দী হইতে অথবা বাঙ্গালাদেশে কিংবা অন্য প্রদেশে প্রচলিত গল্প উপাখ্যান হইতে গৃহীত হইয়াছে। বিদ্যাসুন্দর কাহিনী এইজাতীয়ই বটে, তবে ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দীতে বাঙ্গালা কাব্যের বিষয়ীভূত হয়। কিন্তু প্রথম হইতেই এই কাহিনীর সঙ্গে দেবীমাহাত্ম্য জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল, এই জন্য ইহাকে সম্পূর্ণরূপে লৌকিক ধারার অন্তর্ভুক্ত বলা অসঙ্গত হইবে।

বিশুদ্ধ লৌকিক কাহিনী লইয়া কাব্যরচনা আরম্ভ করেন আরাকান রাজসভার মুসলমান কবিরা। সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন এমন দুই তিন জন কবির কাব্য ও পরিচয় পাওয়া গিয়াছে। নিম্নে ইঁহাদের বিষয়ে আলোচনা করিতেছি।

শুধু লৌকিক কাহিনীর ধারার প্রবর্ত্তক বলিয়া নহে, যতদূর জানা গিয়াছে প্রাচীনতম মুসলমান কবি বলিয়া দৌলৎ কাজীর নাম স্মরণীয়। দুঃখের বিষয়, ইঁনি যে কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহা শেষ করিয়া যাইতে পারেন নাই; তাহা সম্পূর্ণ করিবার সৌভাগ্য হইয়াছিল সর্ব্বাধিক পরিচিত মুসলমান কবি আলাওলের।

দৌলৎ কাজীর কাব্যের নাম সতী ময়নাবতী বা লোরচন্দ্রাণী।[১] কবি

১। সাহিত্য ১৩০৮, পৃ ৬৫৩-৬১, বা-প্রা-পু-বি ১-১, ৫০-৫৪, ২৪৩-৪৮, বা-প্রা-পু বি ১-২, পৃ ৫৬, শ্রীযুক্ত মুহম্মদ এনামুল্ হক্ এবং আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদ মহাশয়দ্বয় প্রণীত আরকান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য (১৯৩৫), পৃ ১৩২-৩৮। মুদ্রিত সংস্করণ প্রায় অপাঠ্য।

আরাকান-রাজ থিরি-থু-ধম্মা বা শ্রীসুধর্ম্মার সেনাপতি আশরফ খাঁর আদেশে কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন। শ্রীসুধর্ম্মার রাজ্যকাল ১৬২২ হইতে ১৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ। সুতরাং এই সময়ে দৌলৎ কাজী বর্ত্তমান ছিলেন। এ বিষয়ে কবির উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কর্ণফুলী নদীপূর্ব্বে আছে এক পুরী। রোসাঙ্গ নগরী নাম স্বর্গ-অবতারী॥
তাহাতে মগধ[1] বংশ ক্রমবুদ্ধিসার। নাম শ্রীসুধর্ম্মা রাজা ধর্ম্ম-অবতার॥
প্রতাপে প্রভাতভানু বিখ্যাত ভুবন। পুত্রের সমান করে প্রজার পালন॥

ধর্ম্মরাজ-পাত্র শ্রীআশরফ খান হানিফী মোজাব[2] ধরে চিস্তিয়া খান্দান[3]॥
... .
পরদেশী স্বদেশী নাহিক আত্মপর। দীঘী সরোবর দিলা অতি বহুতর॥
নৃপতিবল্লভ সেই আশরফ খান। নানা দেশে গেল তার প্রতিষ্ঠা-বাখান॥
... ...
হেন রাজা যার প্রতি মহাদয়া করে। মহামন্ত্রী লস্কর উজীর নাম ধরে॥
বিবিধ প্রকারে দিলা বসনভূষণ। বিবিধ প্রকারে কৈলা রাজ্যের পালন॥
ছত্র সমে দিল রাজা সুবর্ণ পদক। রত্নময় টুপি দিলা অপূর্ব্ব যে টোপ॥
দশ হস্তী প্রধান যে দিলা বডা বড়া। দাস দাসী সঙ্গে দিলা নেতের কাপড়া॥
আশরফ খান যদি হইলা সেনাপতি। ভূপতির সাক্ষাতে থাকন্ত নিতি নিতি॥
সুধর্ম্মার মনে হৈল আনন্দ অপার। সসৈন্যসামন্ত চলে বিপিনবিহার॥
... ...
দুই সারি নৌকার ভূষণ নানা রঙ্গে। আরোহিলা নৃপ খান আশরফ সঙ্গে॥
... ...
খেলিতে খেলিতে রাজা গেল কুঞ্জবনে। সঙ্গে আশরফ খান রাজপুত্র সনে॥
চতুর্দ্দিগে পাত্রগণ মধ্যে নৃপবর। তারকাবেষ্টিত যেন চন্দ্রিমা সুন্দর॥
বনপাশে নগর এক দ্বারাবতী নাম। কৃষ্ণের দ্বারিকা যেন অতি অনুপাম॥
তথাত রচিয়া সভা রহিলা নৃপতি। মন্ত্রগঠন যেন সভার আকৃতি॥

১। অর্থাৎ মগ। আরবী মধ্‌হব, ফরাসী মজ্‌হব, অর্থাৎ ধর্ম্মসম্প্রদায়
৩। অর্থাৎ সুফীমতের চিস্তি প্রবর্ত্তিত শিষ্যপরম্পরা।

দ্বারাবতী উজ্জ্বল করিল ধর্ম্মরাজ। দ্বারিকাতে শোভে যেন গোবিন্দসমাজ॥
সৈন্যসমুদিত রাজা আখেট করিয়া। চারি মাস রহে তথা বন বিহারিয়া॥
তার মধ্যে পাত্র আশরফ মহামতি। আপনা ভুবনে আইলা রাজার সংহতি॥
নানা জাতি সৈন্য সবে ধরিল যোগান। সভাতে বসিলা পাত্র আশরফ খান॥
সৈয়দ শেখ আর মোগল পাঠান। স্বদেশী বৈদেশী বহুতর হিন্দুয়ান॥
ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শূদ্র বহুতর। সারি সারি বসিলেক মনুষ্য সকল॥
.. ..
শ্রীযুক্ত আশরফ পণ্ডিত প্রধান। ষোলকলাপূর্ণ যেন চন্দ্রিমা সমান।
নীতি বিদ্যা কাব্য শাস্ত্র নানা রসময়। পঠিতে শুনিতে নিত্য আনন্দহৃদয়॥
হেনমতে সভা করি বসি থাকে নিতে। কহন্ত আনন্দচিত্তে কিতাব রচিতে॥
আরবী ফারসী নানা উত্তম উপদেশ। বিবিধ প্রসঙ্গ কথা আছিল বিশেষ॥
গুণিগণ গোহারিও[1] খোট্টা বহুতর। সহজে মহন্ত সভা লোক বহুতর॥
শেষে পুনি কহিলেক কৌতুক মহামতি। শুনিয়া সতীর কথা রাজার আরতি॥
ভাবতে পুরাণে সত্যে সত্যে সে বাখান। চন্দনতিলক সত্য উগে সর্ব্ব স্থান॥

ঠেঠা ছোপাইয়া দোহা কহিলা সদনে।[2] না বুঝে গোহারি ভাষা কোন কোন জনে॥
দেশী ভাষে কহ তাকে পাঞ্চালীর ছন্দ। সকলে শুনিয়া যেন বুঝয়ে সানন্দ॥
তবে কাজী দৌলতে সে বুঝিয়া আরতি। পাঞ্চালীর ছন্দে কহে ময়নার ভারতী॥[3]

সতী ময়নাবতী তিন খণ্ডে বিভক্ত। দ্বিতীয় খণ্ডে ময়নাবতীর বারমাসী কবিতার এগার মাসের বর্ণনা লিখিয়া কাজী দেহান্তরিত হন।

১। এই শ্রেণীর সাহিত্যে হিন্দী ভাষাকে বহুস্থলে "গোহারি" ভাষা বলা হইয়াছে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অনুমান করেন যে ইহা "গবাঁরী" (গাঁওয়ারী অর্থাৎ গেঁয়ো) শব্দ হইতে আসিয়াছে। পশ্চিমের ভদ্র মুসলমান সমাজের শিক্ষা ও সংস্কৃতির ভাষা ছিল ফারসী, প্রচলিত দেশভাষা হিন্দীর বিভিন্ন প্রকারভেদের নাম গবাঁরী বা গ্রাম্য হওয়া খুবই সম্ভব। "খোট্টা" শব্দেরও মৌলিক অর্থ 'গ্রাম্য'।

২। অর্থ সম্ভবতঃ—"ঠেঠ ভাষায় রচিত রচিত চৌপাই ও দোহা তাহার নিকট বলিল।" শুদ্ধ এবং জানপদ হিন্দীকে সাধারণতঃ "ঠেঠ হিন্দী" বলা হয়। সাধারণ হিন্দী কবিতায় চৌপাই এবং দোহা ছন্দ বেশী ব্যবহৃত হয়। এই পয়ারের অর্থে চট্টোপাধ্যায় মহাশয় করিয়া দিয়াছেন।

৩। বা প্রা-পু বি ১-১, পৃ ২৪৪-৪৫।

শ্রীমন্ত দৌলত কাজী গেল মৃত পদ
বাকী রহিল জ্যৈষ্ঠ এক মাস ॥[১]

দ্বিতীয় খণ্ডের শেষাংশ এবং তৃতীয় খণ্ড আলাওল শ্রীচন্দ্র সুবর্ম্মার মন্ত্রী সুলেমানের অনুরোধে ১৬৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন। এ কথা পরে বলিতেছি।

সতী ময়নাবতী কাব্যের আখ্যানভাগ এইরূপ—

লোর নামক বা লোর দেশের রাজপুত্র বা রাজার সহিত ময়নাবতী নামক এক অপূর্ব্বসুন্দরী রাজকন্যার বিবাহ হয়। কিছুকাল পরে ময়নাবতীর প্রতি লোরের আকর্ষণ কিছু কমিয়া যায়। এমন সময় এক যোগী আসিয়া লোরকে কহিল যে গোহারী দেশের রাজা মোহরার এক অতিশয় সুন্দরী কন্যা আছে, তাহার নাম চন্দ্রাণী; চন্দ্রাণীর সহিত এক বামন বীরের বিবাহ হইয়াছে, কিন্তু সে নপুংসক;

চন্দ্রাণীর তোমার মিলন মনোরম।
বিদ্যা সঙ্গে সুন্দরের যেন সমাগম ॥

যোগীর কথায় লোর গোহারীতে গেল। লোর ও চন্দ্রাণী পরস্পরকে দেখিয়া মুগ্ধ হইল, তাহাদের মিলন ঘটিল। অবাধমিলনে বাধা ঘটিবার সম্ভাবনা ঘটায় উভয়ে পলায়ন করিল, বামনও পশ্চাদ্ধাবন করিল। বনমধ্যে লোর ও বামনের যুদ্ধ হইল, বামন পরাজিত ও নিহত হইল। এদিকে চন্দ্রাণী সর্পদংশনে অচৈতন্য হইয়া পড়িল। চন্দ্রাণীর পিতা মোহরা আসিয়া পড়িল, তাহাদিগকে রাজধানীতে লইয়া গিয়া বিবাহ দিল এবং লোরের হস্তে রাজ্যভার অর্পণ করিল।

তাহার পর দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথমে ময়নাবতীর বিরহ অবস্থা বর্ণিত হইয়াছে। ময়নাবতী স্বামীর কল্যাণে শিবদুর্গার আরাধনায় নিরন্তর নিযুক্ত আছেন, এদিকে নরেন্দ্র নামক জনৈক প্রতিবেশী রাজার পুত্র ছাতন[২] ময়নাবতীর রূপের কথা

১। ঐ, পৃ ২৪৫। ২। এক পুঁথির মতে ছাতন বণিক্-কুমার।

শুনিয়া আকৃষ্ট হইল। ময়নাবতীকে বশ করিবার জন্য ছাতন এক দূতী নিযুক্ত করিল। কিন্তু বৃথা, ময়নাবতী পরে তাহার উদ্দেশ্য বুঝিয়া তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল।

তাহার পর তৃতীয় খণ্ড। সখীর পরামর্শে ময়নাবতী শুকপক্ষিসমেত এক ব্রাহ্মণকে লোরের নিকট পাঠাইল। ব্রাহ্মণ কৌশল করিয়া লোরের মনে পূর্ব্বকথা জাগাইয়া দিল। লোর পুত্রকে গোহারীতে রাজা করিয়া দিয়া চন্দ্রাণীকে লইয়া ময়নাবতীর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই খণ্ডে অদৃষ্টের অখণ্ডনীয়তা সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান আছে।[১] এই উপাখ্যানটিই অন্য নামে রাজমিদাস রচিত একটি কাব্যে পাওয়া যাইতেছে।[২]

দৌলৎ কাজীর কবিত্ব বিশেষ উপভোগ্য। মুসলমান কবিদিগের মধ্যে তিনি যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আসন দাবী করিতে পারেন তাহাতে সন্দেহ নাই। কি বাঙ্গালা, কি ব্রজবুলি উভয়বিধ রচনাতেই তিনি সমান দক্ষতা দেখাইয়াছেন। ময়নাবতী ও মালিনী দূতীর উক্তিপ্রত্যুক্তি সমন্বিত বারমাসী অংশের কয়েকটি পদ উদ্ধৃত করিয়া দৌলৎ কাজীর কবিত্ব শক্তির পরিচয় দিতেছি।

প্রথম আষাঢ়ে বিরহিণীর দুঃখ বর্ণনা করিয়া মালিনী ময়নাবতীকে "সুজন নাগরের" সহিত মিলিত হইতে বলিতেছে। ইহাতে রাধাকৃষ্ণলীলা কাব্যের ছাপ সুস্পষ্ট।

তোর দুঃখ দেখি মুঞি মরি যাম, বোলে ছুরি (?) দেও বাণী।
মালতী ভোমরা যেন সমাগম, চারু ছৈলা[৩] দেওঁ[৪] আনি॥ ধ্রু॥
দেখ ময়নাবতী প্রথম আষাঢ়, চৌদিকে সাজে গম্ভীর।
বধূজনপ্রেম ভাবিতে পন্থিক আইসএ নিজ মন্দির॥
যায় ঘরে কান্ত, সব সোহাগিনী পূরএ মনোরথ কাম।
দুর্লভ বরিষা তামসী-রজনী, নির্জ্জন সঙ্কেত ঠাম॥
দারুণ ডাউক দাদুরী ময়ূর চাতকে নিনাদে ঘন।

১। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ২৪৮। ২। ঐ, পৃ ১৩৭-৩৮।
৩। অর্থাৎ সুন্দর বা নায়ক ; প্রাকৃত 'ছইল্ল' সংস্কৃত 'ছবিল'। ৪। মূলে 'দেও' সর্ব্বত্র।

তা ধ্বনি শুণিতে শ্রবণে বিরহিণী ছোহএ মনে মদন ॥
যাবতে বয়েস কেলিকলারস পূরএ মনোরথ জানি।
হঠ-পরিপাট মান উপরোধ চাতুরী তেজ কামিনী ॥
বৃদ্ধ হৈলে নারী যুবকের বৈরী, ফিরি তাকে না পুছারি।
যাইব যৌবন নিশির স্বপন, জীবন দিবস চারি ॥
হরি মধুপতি মান রসবতী, মতি-ভোর তোর ছাঞি[১]।
অবধি অন্তর ফিরি না পুছল, আর তোর কি বড়াই ॥
শুনহ উকতি, করহুঁ ভকতি, মানহ সুরতি রাই।
নাগর সুজন মিলাইয়া দেওঁ, রাধার কোলে কানাই ॥
কহেন্ত দৌলত, সতী সৎপথ না ত্যজে যাবত[২] প্রাণ।
লস্কর নায়ক রস-বাণিজার[৩] শ্রীযুত আশরফ খান ॥[৪]

ময়নাবতী উত্তর দিল,

আএ[৫] ধাঞি[৬] কুজনি[৭] কি মোক শুনাঅসি, বেদ-উকতি নহে পাঠ।
লাখ উপাএ মেটিতে কো পারএ যো বিধিলিখন ললাট ॥।

মালিনী, বোলসি অনুচিত বাণী।

ধরম ন ছোঅতি, তেজিআ সৎমতি লোর-প্রেম করাআসি হানি ॥ ধ্রু।
মোহোর সুনাঅর গুণের সায়র, মধুর মূরতি বেশ।
সো মধু তেজিয়ে কৈছে বিখ পানাও ভাল ধাঞি[৬] কহ উপদেশ ॥
তুহি বর পাপিনী পাপ শুনাঅসি, ধরম করাঅসি বাম।
পাতক ঘাতক ধাঞি মোর চিন্তসি, জাতিকুল করহ নির্নাম ॥
দুরন্ত দুরতি দূতীপনা দূর কর, চিন্তহ মোহোর কল্যাণ।
কাজী দৌলতে ভণে, দাতা মনোভব মনে শ্রীযুত আশরফ খান ॥[৮]

শ্রাবণ মাসের চমৎকার বিরহবর্ণনা পদটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

মালিনী কি কহব বেদন-ওর। লোর বিনে বামহি বিধি ভেল মোর ॥

১। অর্থাৎ ভ্রান্তমতি তোমার স্বামী। ২। পাঠ 'যাতে'। ৩। অর্থাৎ রসবাণিজ্যকার।
৪। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৫৩। ৫। অর্থাৎ আসিয়া। ৬। অর্থাৎ 'হে ধাত্রী'।
৭। অর্থাৎ কু-জন অথবা কুচনী, কুট্নী। ৮। আর্‌কান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ ২৪।

শাঙন গগন সঘন ঝরে নীর। তবে মোর না জুড়ায় এ তাপ শরীর॥
মদন-অসিক জিনি বিজলীর রেহা। থরকএ যামিনী কম্পয় মোর দেহা।
না বোল না বোল ধাই অনুচিত বোল আন পুরুষ নহে লোর-সমতুল॥
লাখ পুরুষ নহে লোরের স্বরূপ। কোথায় গোময়-কীট কোথায় মধুপ॥
গরল সদৃশ পরপুরুষের সঙ্গ। দংশিয়া পলায় যেন এ কালভুজঙ্গ॥
তাহা সনে পালএ যে প্রেমের অঙ্কুর থির নহে[১] জাতি পিরীতি দুহুঁ কুল॥
তেঞি ঋতু মানিএ আওএ লোর। ন তু জীবন যে মরণ-সম মোর॥
তছু পএ সাজএ শাওন রস-আশ। অবিরত কান্তা ন ছোড়ে কান্ত-পাশ॥
বিরহ পীড়াবি ধনী জপয়তি নাহা। লস্কর নায়কমণি রসগুণ-গাহা॥[২]

সৈয়দ আলাওল[৩] পণ্ডিত একাধিক রোসাঙ্গ-রাজের ও রাজমন্ত্রীর অনুগ্রহ-ভাজন ছিলেন। আলাওল মুসলমান কবিদিগের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা সুপরিচিত। ইনি অনেকগুলি কাব্য লিখিয়াছিলেন, কিন্তু তন্মধ্যে পদ্মাবতী পাঁচালীর আদর সর্ব্বাধিক। পদ্মাবতী পাঁচালী এবং আলাওলের ও অন্য মুসলমান কবির অপরাপর কাব্য বটতলা হইতে বহুবার ছাপা হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহার পাঠ এত অশুদ্ধ যে তাহা লইয়া কাজ চলে না। যাহারা পুঁথি পড়িয়াছিল তাহারা অধিকাংশ স্থল, যেখানে কিছু গোলমাল আছে তাহা বোঝে নাই এবং যাহারা মুদ্রণ করিয়াছিল তাহারা একবর্ণও না বুঝিয়া "সবল কাবল ভূষি ভূষি সে কাবল" করিয়া ছাড়িয়াছে। এই সকল কাব্যের, বিশেষ করিয়া দৌলৎ কাজীর কাব্যের এবং আলাওলের কাব্যগুলির শুদ্ধ সুসম্পাদিত সংস্করণ হওয়া অতীব বাঞ্ছনীয়। যতদিন তাহা না হয় ততদিন এই কবিদ্বয়ের কাব্যরস যথার্থভাবে বিচার করা যাইবে না।

আলাওলের মত এতগুলি কাব্য বাঙ্গালার কোন প্রাচীন কবি রচনা করেন নাই। আলাওল এই কাব্যগুলি রচনা করিয়াছিলেন—

১। পাঠ 'ন রহে'। ২। পাঠান্তর 'আসরফ নায়ক সব গুণ গাহা।' বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৫৩, আরকান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ ২৪-২৫। উভয় পাঠ মিলাইয়া উপরের পাঠ ঠিক করা গেল। দ্বিতীয় পুস্তকে ১৩-১৮ চরণ অধিক রহিয়াছে।

৩। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে আরবী অল্-অব্বল্ (অর্থ, 'আদিম, প্রথম') শব্দ হইতে আলাওল নামের উৎপত্তি হইয়াছে।

১। পদ্মাবতী—২। সতী ময়নাবতী বা লোরচন্দ্রাণীর শেষাংশ, ৩। সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল, ৪। সপ্ত পয়কর, ৫। তোহ্‌ফা, এবং ৬। সেকন্দর-নামা। ইহা ছাড়াও কয়েকটি কাব্য আলাওলের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।[১] আলাওল অনেকগুলি বৈষ্ণব পদও রচনা করিয়াছিলেন।

আলাওলের কাব্যগুলির আলোচনা করিবার পূর্ব্বে আলাওলের বংশপরিচয় ও জীবনবৃত্তান্ত দেওয়া যাইতেছে।

ফতেহাবাদ পরগনায়[২] জালালপুর গ্রাম কবির জন্মস্থান ও পিতৃভূমি। আলাওলের পিতা তথাকার ভূস্বামী মজলিস্ কুতবের অমাত্য ছিলেন। স্থানান্তরে যাইবার কালে পিতাপুত্রে জলদস্যুর হাতে পড়েন; পিতা নিহত হন, পুত্র আরাকানে চলিয়া আসেন। আরাকানের নৌসেনাপতি আঙ্গলেসের বিরুদ্ধতায় কবি রাজসভায় সদস্যপদ পাইলেন না, অবশেষে রাজার অশ্বারোহী সৈনিক হইলেন। রোসাঙ্গে অল্পকাল মধ্যেই গুণী পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়া আলাওলের খাতির জমিল। এই সময়ে রোসাঙ্গের রাজা ছিলেন 'সাদ উমংদার' অর্থাৎ থদো মিন্তার, ইঁহার রাজ্যকাল ১৬৪৫ হইতে ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ। রাজার অন্যতম ওমরাহ্ বা মন্ত্রী মাগন ঠাকুরের সহিত কবির বিশেষ সৌহার্দ্দ হয় এবং তাঁহার অনুরোধে পদ্মাবতী কাব্য রচনা করেন। দ্বিতীয় কাব্য সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল রচনা আরম্ভ করিবার কিছুকাল পরেই ১৬৫৯ কিংবা ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে মাগন ঠাকুর পরলোকগত হন। এই সময়ে শাহ্ শুজা আওরঙ্গজেবের ভয়ে আরাকানের রাজা শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা বা থিরি সান্দ থুধম্মার আশ্রয় গ্রহণ করেন; তাঁহার সহিতও কবির ঘনিষ্টতা হয়। ১৬৬০ খ্রীষ্টাব্দে শাহ্ শুজা রোসাঙ্গ-রাজের কোপে পড়িয়া নিহত হন, এবং মীর্‌জা নামক এক ব্যক্তির প্ররোচনায় কবিও কারাগারে আবদ্ধ হন। কিন্তু ৫০ দিন পরে মুক্তিলাভ করেন। কারাগার হইতে বাহির হইয়া কবি অত্যন্ত দুর্দ্দশায় পড়িলেন। একাদশ বৎসর পরে তাঁহার দশা ফিরিল। তিনি রোসাঙ্গের কাজী সৈয়দ মসুদ শাহের অনুগ্রহভাজন হইয়া তাঁহার নিকট সূফী সম্প্রদায়ের কাদেরী

১। ব-সা-প-প ৩৩, পৃ ৭০। ২। ফরিদপুর জেলাভুক্ত, বর্ত্তমানে পদ্মাগর্ভে বিলীন।

মতে দীক্ষিত হইলেন। তাহার পর তিনি পুনরায় রাজানুগ্রহ লাভ করেন এবং সয়ফল মুলুক বদিউজ্জমাল কাব্য সম্পূর্ণ করিয়া সেকন্দর-নামা রচনা কবেন।

মল্লুক ফতেহাবাদ গৌরবে প্রধান। তথাতে জালালপুর অতিপুণ্যস্থান॥
আলাওল-জন্মস্মৃতি আছয়ে তথায়। দেখিবার তরে প্রাণ কাঁদে উভরায়॥[১]
এবে অবধান কর গুণী মহামতি। আপ্ত-বৃত্তান্ত কহি পুস্তক-উৎপত্তি॥
গ্রাম মধ্যে প্রধান ফতেয়াবাদ ভূম। বৈসে সদা সাধু লোক হর্ষ মনোরম॥
অনেক দানেশমন্দ[২] খলিফা সুজান। বহুত আলেম গুরু আছে সেই স্থান॥
হিন্দুকুলে মহাভাগ আছে ভট্টাচার্য্য। ভাগীরথী গঙ্গাধারা বহে মধ্যে রাজ্য॥
রাজ্যেশ্বর মজলিস কুতুব মহাশয়। আমি ক্ষুদ্রমতি তান অমাত্যতনয়॥
কার্য্যহেতু পন্থক্রমে আছে কর্ম্মলেখা। দুষ্ট হার্মাদ[৩] সঙ্গে হই গেল দেখা॥
বহু যুদ্ধ করিয়া শহীদ হৈল বাপ। রণক্ষেত্রে রোসাঙ্গ আইল মহাতাপ[৪]॥
না পাইল সদ-পদ[৫] আছে আঙ্গলেস। রাজ-আস্ওয়ার হৈনু আমি এই দেশ॥
রোসাঙ্গেতে মোসলমান যতেক আছেন্ত। তালিব আলিম[৬] বলি আদর করেন্ত
বহু মহন্তের পুত্র মহা মহা নর। পাঠ গীত সঙ্গত[৭] শিখাইনু বহুতর॥
বহুল মহন্ত লোক কৈল গুরুভাব। সকলের কৃপা হন্তে ছিল বহুলাভ॥
মোর বাক্য এথা প্রচারিল সব ঠামে। বহু গ্রন্থ রচিনু মহন্ত সব নামে॥
এই মতে সুখে গোয়াইনু কত কাল। বৃদ্ধ বয়সে অবশেষে হইল জঞ্জাল॥
সেই কথা শুন এবে যত মহামতি। কি দশা ঘটিল মোর ললাটের প্রতি
শাহা শুজা সঙ্গে যদি আইনু দৈবগতি। হতবুদ্ধি[৮] পাত্র সবে দিল হতমতি[৯]॥
আপনার দোষ হন্তে পাই অবসাদ। এক পাপী আমারেও দিল মিথ্যাবাদ॥
কারাগারে পৈনু আমি না পাই বিচার। যত ইতি বসতি হইল ছারখার॥
শাল[১০]-শেষে মৈল যেই দিল অপবাদ। অস্থানে পড়িয়া পাইল বহুল প্রমাদ॥

১। পদ্মাবতী (হবিবি প্রেস, ১৩৩৮), ব-সা-প-প ৩৩, পৃ ৭৫ পাদটীকা।
২। অর্থাৎ জ্ঞানবান্। ৩। অর্থাৎ পোর্ত্তুগীস্ জলদস্যু ; পোর্ত্তুগীস্ 'আর্মাদা' হইতে।
৪। পাঠান্তর 'মহাপাপ'। ৫। অর্থাৎ সদস্যপদ, পাঠান্তর 'সৎপদ'।
৬। অথাৎ জ্ঞানের সাধক, ছাত্র। ৭। পাঠান্তর 'সঙ্গেতে'। ৮। ঐ 'কুটবুদ্ধি'।
৯। ঐ 'কুমতি'। ১০। অর্থাৎ শল্য বা শূলের অগ্রে।

মন্দকীর্ত্তি ভিক্ষাবৃত্তি জীবন কর্কশ। পুত্র দারা সঙ্গে অঙ্গ হৈল পরবশ
গুণহেতু মহাজনে করএ আদর। ভিক্ষা করি দেয় পুত্র দারা নিজ কর॥
সৈয়দ মস্থদ শাহা রোসাঙ্গের কাজী। জ্ঞান অল্প আছে বলি মোরে হৈল রাজী।
দয়ালচরিত্র পীর অতুলমহত্ত্ব। কৃপা করি দিলেন কাদেরী খেলাফত[১]॥
যদ্যপি অশক্ত আমি লৈতে এই ভার। পরশ-পরশে তাম্র[২] হয় হেমাকার॥
আপন দুঃখের কথা কহিতে অনেক। সমুখে পুস্তক-কথা আছে অতিরেক॥
এই মতে একাদশ অব্দ বহি গেল। পুনরপি ভাগ্যোদয় প্রকাশিত হইল।
শ্রীযুক্ত মজলিস অতুল্যমহন্ত। মজলিস পাইয়া যদি হইল শ্রীমন্ত॥
আসলেতে শ্রীচন্দ্র স্থধর্ম্মা নাম হয়। নব মজলিস বলি সর্ব্বলোকে কয়॥
অতুল্য মহন্ত তাঁন স্থনাম হইল। মজলিস পাইয়া তিনি শ্রীমন্ত কহাল॥
জ্ঞানী গুণী ধনী সব সভায় আসেন্ত। মম কথা মজলিসে সকলে কহেন্ত॥
স্থনাম শুনিয়া গুণী হৈল কৃপামন্ত। কৃপা তাঁন পাই হৈনু অতুল্য মহন্ত॥
মধুর বচন মোর শুনিবার সাধ। আদরে আনিয়া আমা দিলেক প্রসাদ॥
অন্নে বস্ত্রে তুষিয়া পোষেন্ত নিরন্তর। তান দানে স্থসমে শোধম রাজকর॥
বহু গুণমন্ত আছে তাহান সভাএ। তথাপিও মোর বাক্য মনে অতি ভাএ॥
অতঃপর মম প্রতি করিল আদেশ। মম নামে গ্রন্থ রচ কহিনু বিশেষ॥
মহন্ত আদেশ পাই ভাবিলাম সার। সেকন্দর-নামা সম গ্রন্থ নাহি আর॥
দারা-সেকন্দর-নামা অতুল্য কেতাব। অতুল্য মহন্ত নামে রচিব তা সব॥
তবে আমি নিবেদিল হৈল বৃদ্ধকাল। বিশেষ রাজার দায় অধিক জঞ্জাল॥
নীরস হইল অঙ্গ না প্রকাশে মতি। তাহা শুনি মজলিসে দয়া হৈল অতি॥
ভক্ষ্যবস্ত্র রাজদায় নিয়ম করিয়া। আর নানাবিধি দানে মন সন্তোষিয়া॥
স্থির করি আমারে করিল অঙ্গীকার। ভাঙ্গিয়া বয়েত ছন্দ রচিতে পয়ার॥
সমুদ্রে সঞ্চার যেন গ্রন্থের গুথন। বিশেষ ফারসী ভাষে বয়েত ভাঙ্গন॥
মহন্ত নেজামী[৩] পদ ইঙ্গিত আকার। বিশেষত পঞ্চ ভাষা কিতাব মাঝার॥

১। স্থফী মতের কাদেরী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্ব।
২। অর্থাৎ স্পর্শমণির স্পর্শে। ৩। ফারসী কবি।

আরবী ফারসী পোস্ত নছরানী[১] ইহুদী। পহলবি সঙ্গে পঞ্চ ভাষ রত্নাবধি ॥
আমি ক্ষুদ্রবুদ্ধি তায় রচিতে অশক্ত। কেবল রচন মজলিস ভাগ্য লক্ষ্য ॥
ভাগ্যধর উপরে ঈশ্বরকৃপা অতি। লঙ্ঘিতে তাঁহার আজ্ঞা কি মোর শকতি ॥
অন্নদাতা ভয়ত্রাতা দুই মতে বাপ। না রাখিলে তান বাক্য গুরুতর পাপ ॥
তে কারণে সভা আগে করি অঙ্গীকার। ভাঙ্গিয়া বয়েত ছন্দ রচিতে পয়ার ॥[২]

ফতেহাবাদ হইতে রোসাঙ্গে আগমনের কথা কবি মতী ময়নাবতী কাব্যেও বলিয়াছেন।

আলাওলের প্রথম কাব্য পদ্মাবতী পাঁচালী রোসাঙ্গ-রাজ সাদ উমংদার বা খদো মিন্তারের রাজ্যকালে (১৬৪৫-১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ) রাজমন্ত্রী মাগন ঠাকুরের অনুরোধে বিরচিত হয় এই কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।[৩] কাব্যটী ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে মালিক মুহম্মদ জায়সী কর্ত্তৃক হিন্দী ভাষায় বিরচিত পদুমাবৎ কাব্য অবলম্বনে রচিত। চিতোরের রাণী পদ্মাবতী ও দিল্লীশ্বর আলাউদ্দীনের কাহিনী অবলম্বনে আধ্যাত্মিক রূপক হিসাবে জায়সী পদুমাবৎ কাব্য রচনা করেন। আলাওল এই কাহিনীকে লইয়াছেন এবং তাহার সঙ্গে আরও অনেক আখ্যায়িকা জুড়িয়া দিয়াছেন। পদ্মাবতী কাব্যের মূল আখ্যানের সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল।

চিতোরের রাজা ছিলেন রত্নসেন, তাঁহার মহিষী নাগমতী। ক্রীত একটি শুকপক্ষীর মুখে সিংহলরাজের কন্যা পদ্মাবতীর রূপলাবণ্য শুনিয়া রাজা যোগিবেশে সিংহলে গমন করেন এবং অনেক কষ্টের পর শেষে পদ্মাবতীকে বিবাহ করিতে সমর্থ হন। রাজা সেইখানেই রহিয়া গেলেন। কিছুকাল পরে আর একটি পক্ষীর মুখে নাগমতীর বিরহদুঃখের কথা শুনিয়া চিতোরে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। কিছুকাল পরে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া রাঘবচেতন নামক ব্রাহ্মণকে রাজ্য হইতে দূরীভূত করিয়া দেন। পদ্মাবতী সেই ব্রাহ্মণকে স্বহস্তের একগাছি কঙ্কণ দিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ দিল্লীতে আসিয়া সুলতান আলাউদ্দীনকে সেই কাঁকণগাছি দেখাইয়া তাহার

১। নসৃরাণী অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় বা ইউরোপীয়। পারস্যে প্রাচীন ইসলামী যুগের কথা ধরিলে নসৃরাণী বলিলে পূর্ব্ব ইউরোপের ভাষা গ্রীক ধরিতে হইবে।

২। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৭২-৭৫, ব-সা-প-প ৩৩, পৃ ৭৩-৭৮।

৩। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ২৪৬; ব-সা-প-প ৩৩, পৃ ৮১, ৮৪।

ঘোড়াটি চাহিলেন। ব্রাহ্মণের মুখে পদ্মাবতীর সৌন্দর্য্য শুনিয়া স্থলতান মুগ্ধ হইলেন এবং দূত দ্বারা পদ্মাবতীকে চাহিয়া পাঠাইলেন। বলা বাহুল্য রত্নসেন সে প্রস্তাব পরম ঘৃণার সহিত অগ্রাহ্য করেন। ফলে যুদ্ধ বাধিল; রত্নসেন পরাস্ত হইলেন এবং দিল্লীতে কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই রাজা তাঁহার দুই অনুচরের কৌশলে কারাগার হইতে পলায়ন করিয়া স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। কিছুকাল পরে দেওপাল নামক অপর আর এক রাজার সহিত রত্নসেনের যুদ্ধ হইল, রত্নসেন আহত হইয়া সাত মাস পরে দেহত্যাগ করিলেন। দুই রাণী সহমৃতা হইল। এদিকে আলাউদ্দীন পুনরায় চিতোর আক্রমণ করিলেন। তখন পদ্মাবতী সহমরণে। স্থলতান ধূমায়মান চিতাকে প্রণাম করিয়া দিল্লীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

জায়সীর পদুমাবৎ কাব্য হইতে আলাওলের পদ্মাবতীর স্থূল পার্থক্যগুলি নিম্নে প্রদর্শিত হইল।[১] কাব্যের প্রথমে আলাওল 'অনুবাদ' অর্থাৎ কথাবস্তুর সংক্ষিপ্তসার দিয়াছেন, ইহা জায়সীর মূল গ্রন্থে নাই। মূলের সপ্ত সাগরের বর্ণনা বাঙ্গালা কাব্যটিতে নাই। বিবাহের বর্ণনাও উভয়ত্র পৃথক্। হিন্দীতে সাগরের কন্যার নাম লক্ষ্মী, বাঙ্গালায় পদ্মাবতী। হিন্দীতে রাণী পদ্মাবতী লক্ষ্মীর কন্যা, বাঙ্গালায় সাগরকন্যার সখী। শেষাংশে পার্থক্য স্থপরিস্ফুট। হিন্দী কাব্যে পাই অলাউ-দ্-দীন কর্ত্তৃক হিন্দুবিজয়, দেবপালের সহিত যুদ্ধে রত্নসেনের মৃত্যু এবং মুসলমান-দিগের হস্তে গোরা ও বাদলের (—বাঙ্গালায় ইঁহারা ভাই—) নিধন। আলাওলের কাব্যের পরিণতি অনেকটা অন্যরকম। সেখানে হিন্দুদিগের পরাজয় নাই, উপরন্তু প্রশংসা আছে।

পদ্মাবতী রচনার পর আলাওল শ্রীচন্দ্র স্থধর্ম্মার মহাপাত্র স্থলেমানের অনুরোধে দৌলৎ কাজীর অসমাপ্ত কাব্য সতী ময়নাবতী বা লোরচন্দ্রাণী সমাপ্ত করেন।

আশরফ-আজ্ঞাএ দৌলৎ কাজী ধীর। রচিল চন্দ্রাণীর কথা অতি স্থরুচির[২] ॥
শেষ খণ্ডে ময়নার কথা করিল প্রকাশ। দূতীর সংবাদ প্রত্যুত্তর বারমাস ॥

১। শ্রীমান্ কালিদাস মুখোপাধ্যায়, এম্-এ লিখিত মন্তব্য হইতে।
২। পাঠ 'স্থরচিত'।

স্থচারু পয়ার মেলে নানা ছন্দ গীত। একাদশ মাস সাঙ্গ হৈল বিরচিত ॥
আশরফে আগু বারমাস আরম্ভিল। বৈশাখ সমাপ্ত জ্যৈষ্ঠ অসাঙ্গ রহিল ॥
তবে কাজী দৌলৎ স্বর্গেত হৈল লীন খণ্ড কাব্য পুস্তক আছিল চিরদিন ॥
... ...
এ সকল কথা শেষ অসাঙ্গ রহিল। স্থধর্ম্মের শেষে তিন নৃপ চলি গেল ॥
তবে পুনি রাজ্যের হইল ভাগ্যোদয়। শ্রীচন্দ্র স্থধর্ম্মা সে নৃপতি মহাশয় ॥

তান মহাপাত্র শ্রীমন্ত স্থলেমান নানা বিদ্যা শাস্ত্র গুণে শত অবধান ॥
প্রসঙ্গ হইল লোরচন্দ্রাণীর কথা। অসাঙ্গ রহিল এই কাব্য রসগাথা ॥
... ...
এতেক ভাবিয়া স্থলতান মহামতি। হরষিতে আদেশ করিল আমা প্রতি।
... ...
এই খণ্ড পুস্তক পুরাও মোর নামে। ভুগ্ধ মধু দোঁহ আনি মিলাও এক ঠামে ॥
... ...
মহন্ত আরতি সে শুনি আলাওল। অঙ্গীকার কৈল ভাবি ঈশ্বরের বল ॥
... ...
শ্রীমন্ত স্থলেমান সত্যরত্নাকর। শুনিতে সতীর কথা হরিষ অন্তর ॥
আদেশকুস্থম তান শিরেতে ধরিয়া। হীন আলাওলে কহে পাঞ্চালী রচিয়া ॥[১]

সতী ময়নাবতী সম্পূর্ণ করিবার তারিখ হিজরী ১০৭০ মঘী ১০২০ সাল অর্থাৎ ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ।

মুসলমানী শক সংখ্যা শুন দিয়া মন। অল্প ভাবিলে পাইবা বুদ্ধিমন্ত জন ॥
সিন্ধু শূন্য দেখিয়া আপন দুই দিকে। স্থত কলানিধিরে রাখিলা বামভাগে ॥
মগধির[২] সনের শুনহ বিবরণ। যুগ শূন্য মধ্যে যুগ বামে মৃগাসন ॥
সমাপ্তি হইল পাঞ্চালিকা অনুপাম। গুরুর চরণে মোর সহস্র প্রণাম ॥[৩]

তাহার পর কবি মাগন ঠাকুরের আদেশে সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল (সৈফ়-ল্-মুল্‌ক্ বদিউ-জ্-জ়মাল) কাব্য আরম্ভ করেন। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে কিংবা তাহার পর বৎসর মাগন পরলোক গমন করায় কবি কাব্যরচনা স্থগিত রাখেন, এবং দীর্ঘ নয় বৎসর পরে সৈয়দ মুসা বা সৈয়দ মসুদ শাহার অনুরোধে কাব্যটি সমাপ্ত করেন।

১। বা-প্রা-পু-বি ১১, পৃ ২৪৬। ২। অর্থাৎ মঘী সনের।
৩। ব-সা-প-প ৩৩, পৃ ৬৬, বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ২৪৭।

এবে অবধান কর সাধু-গুণবন্ত। যেইরূপে রহস্য পুস্তক আদি অন্ত।
মহাদেবীর মুখ্য পাত্র শ্রীযুত মাগন। সয়ফুল মুলুক কথা করাইল রচন॥
সাঙ্গ না হইতে পুস্তক পাইল পরলোক। কত কাল মোর মনে আছিল সে শোক॥
তার পাছে শাহা শুজা নৃপকুলঈশ্বর। দৈবপরিপাকে আইল রোসাঙ্গ সহর॥
রোসাঙ্গ-নৃপতি সঙ্গে করি বিসংবাদ। আপনার দোষ হেতু পাইল অবসাদ॥
যতেক মুসলমান তার সঙ্গে হইল। নৃপতির শাস্তি পাইয়া সর্ব্বলোক মৈল॥
মীর্জা নামে এক পাপী সত্যধর্ম্মভ্রষ্ট। শাল-অগ্রে উঠিল বহু লোক করি নষ্ট॥
যার সঙ্গে ছিল তার তিল মন্দভাব। অপবাদে নষ্ট করি পাইল নরকলাভ

আমারেহ অপবাদ দিল পাপ ছারে। না পাই বিচার পড়িলুম কারাগারে॥
বহুল যন্ত্রণা দুঃখ পাইলুম কর্কশ। গর্ভবাস প্রায় ছিলুম পঞ্চাশ দিবস॥
আয়ু ছিল শেষ আমায় রাখিল বিধাতাএ। সব ভিক্ষা জীব রক্ষা ক্লেশে দিন যাএ॥
এহি মতে বহি গেল নবম বৎসর। খণ্ড কাব্য রহিল পুস্তক মনোহর॥
সৈয়দ মুসা নামে এক পুরুষ মহত্ত্ব। অভিন্নমদন রূপ মহাগুণবন্ত॥

একদিন আমারে আপনা আলয়ে। বহু যত্ন করিয়া কহিল মহাশয়ে॥
পুস্তকের আজ্ঞাকারী শ্রীযুত মাগন। আছিল তোমার শিষ্য মোর বন্ধুজন॥
খণ্ডকাব্য রহিল পুস্তক মনোহর। সমাপ্ত হইলে রস অতি মনোহর॥
আমার গৌরব মান তাহার বচন। সন্তোষিয়া তোষ যত পাঠকের মন॥
ভাবিয়া উত্তর দিলুম শুন সদমএ (?)। বৃদ্ধকালে গ্রন্থকর্ম্ম উচিত না হএ॥
রচিলুম বহুল গ্রন্থ নানা আলঝাল। রহিতে ঈশ্বরভাবে যুক্ত এহি কাল॥
বিশেষ অস্থানে পড়ি চিন্তাযুক্ত মন। আশা-ঠেক[১] ভিক্ষামাত্র যাহার জীবন।
হেন কালে কষ্ট কর্ম্ম আদেশ করহ। বিকলতা আমার মনের না ভাবহ॥
তবে আমা গঞ্জিয়া কহিল গুণমণি। অন্যজন নহে তুমি আলাওল গুণী॥
যাহার বচনে লোকে পাএ উপদেশ। তাহার মৌনতা যুক্ত না হএ বিশেষ॥

১। অর্থাৎ 'লাঠি ভর (দিয়া)'। পাঠ 'আসাথেক'।

তুমি না রচিলে খণ্ড কাব্য রহে পোথা। এরূপ রচিতে আর কেবা আছে এথা॥
তিনমতে কাব্য সাঙ্গ করিতে উচিত। প্রথমে বচন মাত্র মাগন বিদিত॥
দিয়জে কুমাররাজ রহিল বন্ধনে। পড়িলে পুস্তক দুঃখ উপজএ মনে॥
তৃতীয়ে আমার প্রেম রাখিতে জুআএ। এড়াইতে নারিবা রচিবা সর্ব্বথাএ॥
মহন্ত জনের আজ্ঞা লঙ্ঘিতে না পারি। প্রবেশিলুম গ্রন্থকর্ম্মে করতারে স্মরি॥[১]

সৈফু-ল্-মুল্ক্ বদিউ-জ্-জমালের কাহিনী আরব্য উপন্যাসের মারফৎ সর্ব্বজন-পরিচিত বলিয়া এখানে আর দেওয়া গেল না।

আলাওলের চতুর্থ রচনা হইতেছে সপ্ত পয়কর বা হপ্ত পয়কর কাব্য। ইহা শাহ শুজার রোসাঙ্গ আগমনের পরে এবং তাঁহার হত্যার পূর্ব্বে রচিত বলিয়া মনে হয়। কারণ ইহাতে শুজার আগমনের কথা মাত্র আছে।[২]

দিল্লীশ্বরবংশ আসি যাহার শরণে পশি,
তার সম কাহার মহিমা।

শ্রীযুক্ত মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ মহাশয় অনুমান করেন যে ইহা কবির সর্ব্বশেষ রচনা।[৩]

হপ্ত পয়কর কাব্যটি রোসাঙ্গরাজ শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা বা থিরি সান্দ থুধর্ম্মার সেনাপতি সৈয়দ মুহম্মদের আদেশে রচিত হয়।

শ্রীমন্ত রোসাঙ্গ স্থল, নাহি তাহে বলাবল, হেম রত্নে জড়িত বেষ্টিত।
বৈসে সাধু সংলোক, সতত আনন্দভোগ, শস্য মৎস্য সদাএ পূর্ণিত॥
তাহে নৃপ অনুপাম, শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মা নাম, খলনাশ দুঃখিতের গতি।
পুত্রবৎ প্রজাপাল, বিপক্ষ জনের কাল, ধর্ম্মশীল মহাছত্রপতি॥
... ...
হেন মহা রাজ্যেশ্বর অখণ্ড সম্পদ। তান মুখ্য সেনাপতি সৈয়দ মহাম্মদ॥
... ...
আমিহ সভাতে তান থাকি অবিরত। অন্ন বস্ত্র দানে আমা পোষেন্ত সতত॥

১। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১২১-২২। ২। আর্‌কান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ ৫১।
৩। ব-সা-প-প ৩৩, পৃ ৬৮।

আমা প্রতি কৈলা আজ্ঞা হরষিত মনে। উত্তম প্রসঙ্গ এক কহিতে কারণে॥
সপ্ত পয়কর কথা অতি মনোহর। মনোগত প্রকাশিলুম তাহান গোচর॥[১]

নিজামী রচিত ফারসী কাব্য সপ্ত পৈকর আলাওলের উপজীব্য। কাহিনীটি মূলতঃ এই—

নোমান নামক রাজার পুত্র ছিল বহ্‌রাম। জ্যোতিষীর কথায় রাজা পুত্রকে বিদেশে রাখিয়াছিলেন। এক শিল্পী রাজপুত্রের জন্য সাতরঙ্গের সাতটি "টঙ্গী" বা উচ্চ মঞ্চগৃহ নির্ম্মাণ করিয়া রাখিয়াছিল। এদিকে রাজপুত্র বিদেশে থাকা কালে রাজার মৃত্যু হইলে মন্ত্রী সিংহাসন অধিকার করে। রাজপুত্র সংবাদ পাইয়া আসিয়া মন্ত্রীর নিকট রাজ্য কাড়িয়া লয়েন। পিতৃরাজ্য উদ্ধার করিয়া বহ্‌রাম পার্শ্ববর্ত্তী সাত রাজাকে পরাজিত করিয়া তাহাদের সাতটি কন্যাকে বিবাহ করে এবং রাজকন্যাদিগকে এক একটি টঙ্গীতে বাস করিতে দেয়। এই সাত রাজকন্যার নিকট বহ্‌রাম সাতদিনে সাতটি গল্প শুনিয়াছিলেন। সেই সাতটি গল্পের সমষ্টিই সপ্ত পয়কর।

আলাওলের পঞ্চম রচনা তয়ফা বা তোহ্‌ফা মুসলমান ধর্ম্মানুষ্ঠান ও কৃত্যবিষয়ক গ্রন্থ। ইউসুফ গদা কর্ত্তৃক ফারসী ভাষায় রচিত তোহ্‌ফা গ্রন্থ অবলম্বনে আলাওল এই ধর্ম্মকাব্য রচনা করেন। ইউসুফ গদার মূল ফারসী গ্রন্থ হিজরী ৭৯৫ সালে রচিত হয়, আর তাহার ২৭৮ বৎসর পরে অর্থাৎ ১০৭৩ হিজরীতে (১৬৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে) আলাওলের অনুবাদ সমাপ্ত হয়। এই কথা আলাওল বলিয়া গিয়াছেন।[২]

সিন্ধু শত গ্রহ দশ সন বাণাধিক। রচিলা ইউসুফ গদা তোহ্‌ফা মাণিক।
দুই শত অষ্টোত্তর সত্তর রহিল। আলিমে পাইল মর্ম্ম আমে না পাইল॥[৩]

এই গ্রন্থটি রোসাঙ্গরাজের মহাপাত্র সুলেমানের অনুরোধে রচিত হয়। এই সুলেমানেরই অনুরোধে পরে কবি সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমাল সমাপ্ত করিয়াছিলেন, তাহা আমরা পূর্ব্বে দেখিয়াছি। তোহ্‌ফাতে কবি যে আত্মকথা অল্পস্বল্প দিয়াছেন তাহা হৃদয়গ্রাহী।

১। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৮৪-৮৪। ২। ব-সা-প-প ৩৩, পৃ ৬৬। ৩। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ঃ

সুধন্য রোসাঙ্গ দেশ, নাই মন্দ পাপ লেশ, শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্ম তাতে রাজা।
অধিক মহিমা যার দৈবের নির্ব্বন্ধ তার, নৃপকুলে আসি করে পূজা॥
তান পাত্র দিব্যজ্ঞান শ্রীযুত সুলেমান শুভক্ষণে সৃজিলা বিধাতা।
নানা শাস্ত্র অবধান দত্য[১] সত্য শান্তিমান গুণবন্ত গুণিগণ জ্ঞাতা॥

...

আলেম সকল তথা নানা কেতাবের কথা সর্ব্ব অর্থ বাখানি কহিতে।
তোহ্ফা কেতাব-বাণী মনেতে কৌতুক মানি মোকে আজ্ঞা কৈলা হরষিতে॥
দেখ এই সু-কেতাব পড়িতে অনেক লাভ, কেহ বুঝে কেহ হয় ধন্ধ।
যদি হয় দেশী ভাষা পুরএ মনের আশা, রচ তাকে পয়ারপ্রবন্ধ॥
হইলে মহৎ-আজ্ঞা না আইসে কার শঙ্কা, অন্নদাতা সমান পিতার।
তান আজ্ঞা লক্ষ্য করি হৃদয়ে সাহস ধরি রচিতে করিনু অঙ্গীকার॥
মুই আলাওল হীন, দৈববশ অনুদিন, বিধি বিড়ম্বিল বৃদ্ধকালে।
পাইতে ঈশ্বরমর্ম্ম না করিলুম কোন কর্ম্ম, বৃথা জন্ম গোয়াইলুম কালে॥
আজু কালু হৈব ভাল এই মতে গেল কাল, না পুরিল মনের বাঞ্ছিত।
আছে প্রভু কৃপাময়, সে পুনি অন্যথা নয়, ধর্ম্মলক্ষ্যে নিবারন্তে চিত॥
তাকে বলি সাধু ব্যক্তি শেষে রহে যার কীর্ত্তি, তার মৃত্যু জীবন সমান।
হীন আলাওল ভণে, শ্রীযুত সুলেমান[২] পুণ্যকীর্ত্তি রসের সুজান॥[৩]

আলাওলের শেষ রচনা হইতেছে সেকন্দর-নামা। এটি নিজামী কর্ত্তৃক ফারসী ভাষায় রচিত ইস্‌কন্দর-নামা কাব্যের অনুবাদ। ইহার বিষয়বস্তু হইতেছে গ্রীকবীর মাকিদন-রাজ আলেক্‌সান্দরের বিজয়-অভিযান ও তদ্‌ঘটিত যুদ্ধবিগ্রহ বর্ণনা। সেকন্দর-নামা কাব্য আলাওল শ্রীচন্দ্র সুধর্ম্মার আদেশে শুজার মৃত্যুর ১১ বৎসর পরে অর্থাৎ ১৬৭১ খ্রীষ্টাব্দে রচনা করেন। কবি তখন সুবৃদ্ধ। এই কাব্যরচনার ইতিহাস কবির জীবনবৃত্তান্ত অংশে পূর্ব্বে দিয়াছি।

এই ছয়টি কাব্য ছাড়া কবি আরও কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। পদ্মাবতী কাব্যের রচনাকাল যদি ১৬৫২ খ্রীষ্টাব্দ হয় এবং পরবর্ত্তী রচনা সতী

১। 'দান্ত' হইবে? ২। পাঠ সর্ব্বত্র 'সোলেমান'। ৩। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ২৯।

ময়নাবতীর শেষাংশ লিখিবার তারিখ ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দ হয় তাহা হইলে মধ্যে সাত বৎসরে লেখা আর কাব্যাদি কই? কবির লেখনী যেরূপ উর্ব্বরা ছিল তাহাতে তিনি যে এই সাত বৎসর চুপ করিয়া ছিলেন তাহা বোধ হয় না। সয়ফুল মুলুক বদিউজ্জমালের শেষাংশে কবি নিজেই বলিয়াছেন "রচিলুম বহুল গ্রন্থ নানা আলঝাল।" মৌলবী আবদুল গফুর সিদ্দিকী বলেন যে তিনি আলাওল রচিত ইউসুফ জোলায়খা, লায়লা-মজনুন, শিরি-খোসরো-নামা এবং আজিজ্‌কুমার-রসবতী কাব্যেরও সন্ধান পাইয়াছেন।[১] শেষোক্তটি ছাড়া বাকি তিনখানি আলাওলের রচনা বলিয়া অনুমান করিতে বাধা নাই, বিশেষ করিয়া লায়লা-মজনুন্‌ এবং শিরি-খোস্‌রো-নামা, কারণ এই দুইটি কাব্য মূলে ফারসী ভাষায় নিজামী কর্ত্তৃক রচিত। নিজামীর পাঁচটি কাব্য "খাম্‌স্‌" আলাওল অনুবাদ করিয়াছিলেন এইরূপ অনুমান করা অসঙ্গত নহে। আলাওল অনেকগুলি বৈষ্ণবপদ রচনা করিয়াছিলেন।[২]

কোরেশী মাগন ঠাকুর বিরচিত চন্দ্রাবতী কাব্যের এক খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৩] এনামুল হক এবং আবদুলকরিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয়দ্বয় এই কোরেশী মাগনকে রোসাঙ্গ-রাজামাত্য, আলাওলের আশ্রয়দাতা মাগন ঠাকুর বলিয়া মনে করেন।[৪] চন্দ্রাবতী কাব্যের বিষয়বস্তু আরব্য উপন্যাস কাহিনীজাতীয়।

এই পরিচ্ছেদে আর একটি মুসলমান কবির কথা আলোচনা করিব। সৈয়দ সুলতান নামক কবির নামে বহু বৈষ্ণব পদ এবং মুসলমান ধর্ম্মসম্বন্ধীয় গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে। এই কবিকে এনামুল হক মহাশয় পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ এবং ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভের লোক বলিয়া মনে করেন।[৫] শ্রীযুক্ত এনামুল হকের মতে সুলতানের শেষ রচনা শবে মেয়েরাজ ৯০৬ হিজরী অর্থাৎ ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল, "সুতরাং তাঁহার জ্ঞানপ্রদীপ ও নবীবংশ খ্রীষ্টীয় ১৫০০ অব্দের পূর্ব্বে অর্থাৎ পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষ পাদে রচিত হইয়াছিল।"[৬]

১। ব-সা-প-প ৩৩, পৃ ৭০, এনামুল হক এবং আবদুল করিম মহাশয়দ্বয় "শিরি-খুশরু" কাব্যের সন্ধান পাইয়াছেন [আর্‌কান রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ ৪৯]।

২। HBL, পৃ ৪৬৪। ৩। আর্‌কান-রাজসভায় বাঙ্গালা সাহিত্য, পৃ ২২৯-৪৩।

৪। ঐ, পৃ ৩১-৩৩। ৫। ব-সা-প-প ৪১, পৃ ৩৮-৫৪। ৬। ঐ, পৃ ৩৯।

কিন্তু হক সাহেব ভাবিয়া দেখেন নাই, তাহা হয় কি করিয়া। কবি নিজেই বলিয়াছেন, তিনি চট্টগ্রামে পরাগলপুরে বাস করিতেন এবং তাঁহার সময়ে পরাগল খানের আদেশে কবীন্দ্র বিরচিত ভারতকথা হিন্দু মুসলমানে ঘরে ঘরে পড়িয়া থাকে।[১] সুতরাং তিনি যে পরাগল খান এবং কবীন্দ্রের অনেক পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাহা সাধারণ যুক্তিতেই উপলব্ধি হয়। আর কবীন্দ্রের ভারত-পাঁচালী বা পাণ্ডববিজয়কথা আনুমানিক ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হয় নাই।[২] অতএব রচনাকালের অন্ততঃ বিশ বৎসর পূর্ব্বে তাহা ঘরে ঘরে পঠিত হওয়া আমাদের জ্ঞানে অসম্ভব।

শবে মেয়েরাজের রচনা কালজ্ঞাপক পয়ার যাহা পাওয়া গিয়াছে তাহা এই—

গ্রহ সত রস জোগে অব্দ গোঙাইল।
দেশী ভাসে এই কথা কেহ না কহিল ॥[৩]

ইহা হইতে ৯০৬ বাহির করিলে, 'জোগে' শব্দের মানে হয় কি ? 'জোগে' নিশ্চয়ই 'যুগ'। সুতরাং শুদ্ধ পাঠ হইবে

দশ শত রস যুগে অব্দ গোঙাইল।

অর্থাৎ ১০৬২ বা ১০৬৪ হিজরী (১৬৫২-৫৩ বা ১৬৫৪-৫৫ খ্রীষ্টাব্দ) হইবে। কবি যে সপ্তদশ শতাব্দীতে বিদ্যমান ছিলেন একথা নূতন নহে।[৪] কবির ভাষার বিশুদ্ধি হইতেও অনুমান করা যাইতে পারে যে তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বের লোক ছিলেন।

জ্ঞানপ্রদীপ বা জ্ঞানচৌতিশা তান্ত্রিক যোগ সম্বন্ধীয় গ্রন্থ। নবীবংশে মুসলমানী মতে সৃষ্টিতত্ত্ব নবীদিগের আবির্ভাব ইত্যাদি ইস্‌লামীয় পৌরাণিক

১। এবে পুস্তকের কথা কহিতে জুআএ। প্রকাশ্য সকল কথা মনে নাহি ভাএ ॥
লস্কর পরাগল খান আজ্ঞা শিরে ধরি। কবীন্দ্র ভারতকথা কহিল বিচারি ॥
হিন্দু মুসলমান তাহা ঘরে ঘরে পড়ে। খোদা রসুলের কথা কেহ না কহিল ॥
... ...
লস্করের পুরখানি আলিম-বসতি। মুঞি মূর্খ আছি এক সৈয়দ সন্ততি ॥
ঐ পৃ ৪০।

২। চতুর্দ্দশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৩। ব-সা-প-প ৪১, পৃ ৪০। ৪। ঐ, পৃ ৪০ পাদটীকা।

কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। মহম্মদের কাহিনী কবি শ্রীকৃষ্ণচরিত্রের ছাঁচে ফেলিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কবির উদারতা ছিল, তিনি হিন্দুধর্ম্মের সহিত সমন্বয় করিবার উদ্দেশ্যে ব্রহ্মা বিষ্ণু শিব এবং শ্রীকৃষ্ণকেও নবী বলিয়া মানিয়াছেন।[১] শবে মেয়েরাজ নবীবংশেরই শেষাংশ।

সূফী সাধক সৈয়দ সুলতানের কবিত্বের ও আধ্যাত্মিক ব্যাকুলতার যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া যায় তাঁহার রচিত সাধন এবং মনঃশিক্ষা ঘটিত পদগুলিতে। কয়েকটি পদ চর্য্যা-গীতির ন্যায় সাঙ্কেতিক ভাষায় রচিত। যেমন,

কাহে কাহে ধনি বাগ বানায়া। দুনিআ মিছা ধান্ধা মায়া লাগায়া ॥ ধ্রু ॥
তুহ্মি আহ্মার গুরুজী আহ্মি তোর চেলা। তোর দরশন বিনু ফিরিএ একেলা ॥
হুঙ্কারে মারোঙ্গোঁ তীর দূরে গিয়া লাগে। ফিরি লাগে তীর কামানেরি আগে ॥
সোনাকর চিড়িয়া রূপাকর বাটা।[২] সখি গেঁও সব সবে উরি গেঁও হাটা (?) ॥
কহে সুলতানে এ ধর[৩] খাথারা। যাইব মনুরা সব ফানারা ॥[৪]

অথবা,

হাম ভিখারী পরমদেব দাতা। পিউ পেআছি ধেয়ানে মদমাতা ॥ ধ্রু ॥
খিতি সিংহাসন বাসন মেরি। অষ্ট শশীর মৌর চামর ধারি ॥
শ্রীনব দণ্ড ছত্র আকার। চান্দ সুরুজ দোঁহ শোভএ তার ॥
দুই ছুজা জছ (?) পাএ হাহ্মারি। তাহে কি বোলসি কাজ অনুসারি ॥
অজপা পঞ্চ শবদ ঘরি ভালে। শ্রীহটনগরে বাজএ একতালে ॥
কহে সৈয়দ সুলতানে মনে হাঙ্কারি। পহু দাতা সুলতান পরম ভিখারী ॥

শ্রীকৃষ্ণের রূপবর্ণনাত্মক নিম্নোদ্ধৃত পদটি চমৎকার।

কত কত মোহন-মোহিনী জান ॥ ধ্রু ॥

কুটিলকুন্তল-ফান্দ বেড়িয়াছে মুখচান্দ গোপীগণে বাড়াইতে আশ।
যেহেন নির্ম্মল শশী ঢাকিছে জলদে আসি, দেখা দিলে তিমির বিনাশ ॥

১। ঐ, পৃ ৪৯-৫০। ২। পাঠ 'সোনা কর ছিড়িআ রূপ কর বাটা।'
৩। সম্ভবতঃ শুদ্ধ পাঠ 'ঘর' কিংবা 'ধরা' হইবে। ৪। ব-সা-প-প ৪১, পৃ ৫২।

সুগন্ধি তিমির কেশ রহিছে মোহন বেশ, মুখচান্দ রহিছে ছাপাএ ॥
একবারে অনুপাম, নিশি দিশি এক[১] ঠাম, লক্ষিবারে লক্ষণ ন যাএ ॥
কিবা রাত্র কিবা দিন নহে রূপ ভিন্নাভিন, এ চান্দ সুরুজ নহে তার।
সৈয়দ সুলতানে কহু, সেই সে আম্মার পহু, দেখা না দে বিদিত সভার ॥[২]

মহম্মদ খান রচিত মুক্তাল হোসেন[৩] (মক্‌তু-ল্‌-হুসৈন) কারবালার যুদ্ধকাহিনী অবলম্বনে রচিত আরবী কাব্যের অনুবাদ। ইহাতে নবীবংশের কাহিনী আলোচিত হইয়াছে। ইহার একটি পুঁথির লিপিকাল সন ১১১৮ মথী। এই পুঁথিটিতে যে রচনাকালজ্ঞাপক অংশ পাওয়া যাইতেছে তাহার পাঠ অশুদ্ধ বলিয়া সম্পূর্ণ অর্থবোধ হয় না। তবে এইটুকু মনে হয় যে কাব্যটি সম্ভবতঃ ১০৫৬ হিজরীতে অর্থাৎ ১৬৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। কিন্তু সম্পূর্ণ পাঠোদ্ধার না হইলে জোর করিয়া কিছু বলা শক্ত।

মুসলমানি তেরিখের দশ শত ভেল। শতের অর্দ্ধেক পাছে ঋতু বহি গেল ॥
হিন্দুয়ানি তেরিখের শুন বিবরণ। বাণ বাহো সম অর্দ্ধ আর বাণ শত ॥
বিংশ তিন তুন করি চাহ দিয়া দধি। পাঞ্চালিকা পূর্ণ হৈল সে অব্দ অবধি ॥
সুরগুরু শেষ নিদগ্ধ (?) গুরু আগে। মিত্র হই কুমুদিনী প্রীতিবর মাগে ॥
হইয়া নক্ষত্ররূপ উয়ি গেল শশী। দশদিগে প্রসন্ন পাতকী-তম নাশি।
মাধবী মাসের সপ্ত দিবস গইল। সেই রাত্রি পাঞ্চালিকা সমাপ্ত হইল ॥[৪]

কবির পিতা ছিলেন মুবারিজ খান, খুল্লতাত বিরহিম খান, পিতামহ জালাল খান, প্রপিতামহ নসরৎ খান, গুরু শাহা সুলতান। কাব্যের শেষে কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

ভাবে ভবকল্পতরু মাহি আসোয়ার। তান বংশে নসরৎ খান গুণসার ॥
তান সুত গুণযুত শ্রীযুত জালাল[৫]। নারীমুখপদ্মভৃঙ্গ বিক্রমে বিশাল ॥
তান সুত অসীমমহিমা গুণবান্‌। বান্ধবপালক পহু বিরহিম খান ॥
তাহান অনুজ ধীর রূপে পঞ্চবাণ। সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ মুবারিজ খান ॥

১। পাঠ 'একহি'। ২। ব-সা-প-প ৪১, পৃ ৫৪। ৩। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৭১, ১৫৭-৬১, ১৭৯-৮০৪, ঐ ১-২, পৃ ৯৮। ৪। বা-প্রা-পু-বি- ১ ১, পৃ ১৬১। ৫। পাঠ 'জালাল', 'জামাল'।

তান পুত্র অল্পজ্ঞান খান মহম্মদ। অল্পবুদ্ধি বিরচিল পাঞ্চালিকা পদ॥
মুক্তাল হোসন কথা অমৃতের ধার। শুনি গুণিগণ মনে আনন্দ অপার॥[১]

অন্যত্র আছে—

আমীর হোসন বংশে জন্ম গুণনিধি। সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ নবরসোদধি॥
শ্যাম নবজলধরসুন্দরশরীর। দানে কল্পতরু যুধিষ্ঠিরসম স্থির॥
সুন্দর অধিক মুখ কমললোচন। মন্দ মন্দ মধু হাসি অমৃত সমান॥
শাহা সুলতান পীর কৃপার সাগর। সেবকবৎসল প্রভু গুণে রত্নাকর॥
তাহান আদেশমাল্য শিরেতে ধরিয়া। মহম্মদ খানে কহে পাঞ্চালী রচিয়া॥

কবি বিস্তার করিয়া নিজ পিতৃকুল মাতৃকুল উভয় বংশেরই বিবরণ দিয়াছেন। চট্টগ্রাম অঞ্চলে মুসলমান অধিকারের ইতিহাসের পক্ষে কবিপ্রদত্ত বংশপরিচিতি মূল্যবান্ মনে হইতেছে। মাতামহবংশ এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

কায়মনে প্রণাম করিএ বারে বার। কদল খান গাজী জান ভুবনের সার
যার রণে পড়িল অসংখ্য রিপুগণ। ভয়ে কেহ মজ্জিলেক সমুদ্র গহন॥
একবারে হইল সহসা প্রাণহীন। রিপু জিনি চাটিগ্রাম কৈলা নিজাধীন।
বৃক্ষতলে বসিলেক কাফিরের গণ। সেই বৃক্ষ ছেদি সবে করিল নিধন॥
তান একাদশ মিত্র করিএ প্রণাম। পুস্তক বাড়এ না লেখিল তান নাম॥
তান এক মিত্রে বধিলেক চাটেশ্বরী। মুসলমান কৈল সব চাটিগ্রাম পুরী॥
তাহান প্রেমের সখা অতি গুণবান্। সএখ[২] সফর্দ্দিন পীর ত্রিভুবন জান॥
... ...
প্রণমহো তান সুত গুণের সাগর। কুলগুরু কাজী সে আলাম নাম-ধর॥
মহাশক্ত মীর কাজী তাহান নন্দন। একমনে প্রণমহো সে দুই চরণ॥
তান সুত গুণযুত খান কাজী নাম। তান পদ পরে মোর সহস্র সেলাম॥
তাহান নন্দন জান সর্ব্বগুণালয়ে। করতার[৩] ভাবে মগ্ন যাহার হৃদয়ে॥
সএখ হামিদ পীর জান ত্রিভুবন। কায় মনে প্রণমিএ সে দুই চরণ॥
তান সু-তনয় পীর বুদ্ধি সুরগুরু। ভিক্ষুক লোকের প্রতি ভবকল্পতরু॥

১। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৭৯।
২। অর্থাৎ শেখ। ৩। অর্থাৎ কর্ত্তার, ঈশ্বরের।

যার কেরামতে ভরি গেল ত্রিভুবন। বাবা ফরিদের পদে করিএ বন্দন ॥
তাহান ঔরসোদ্ভব ভুবনের সার। দশদিগে এই কীর্ত্তি হইল যাহার ॥
থেনেকে মক্কাতে চলি যায় সেই জন। তথা গিয়া সেবন্ত নৈরূপ নিরঞ্জন ॥
তিলেকে আসিয়া পুনি চাটিগ্রাম দেশে যথাবিধি করতায়[১] সেবন্ত বিশেষে ॥
হামিদ আলাম পীর ভুবনের পতি। তান দুই পদ বন্দম করিয়া ভকতি ॥
তাহান ঔরসোদ্ভব কুলের কেতন। সর্ব্বশাস্ত্রে বিশারদ অতি বিতর্পন[২] ॥
বধিয়া সে অরিজন করিয়া সংগ্রাম। আপনাহে স্বর্গবাস হৈল পরিণাম ॥
শাহা নষুবাদ্দিন[৩] পীর মর্য্যাদাসাগর। চরণ-রাজীব প্রণমহো বহুতর ॥
তাহান ঔরস বিবি মাণিক্য ধরিল। সর্ব্ব সুলক্ষণ শিশু তাত উপজিল ॥

পীর সক্র (?) নামে জানে ভুবনের সার। মাতা সঙ্গে তাহানে প্রণামি বারে বার ॥
তাহান কনিষ্ঠে যে পূজিতে ত্রিভুবন। পূর্ণচন্দ্রাধিকমুখ কমললোচন ॥
গৌরাঙ্গ কাঞ্চনকান্তি উচ্চ-নাসাদণ্ড। দীর্ঘবাহু হেমলতা বিক্রমে প্রচণ্ড ॥
গৌড়রাজ অধিপতি যাকে প্রশংসিল। ভিক্ষুক জনের পতি যাহাক বুঝিল ॥
চাটিগ্রাম-পতি জান নসরৎ খান। আপনার প্রিয় সুতা দিল যার স্থান ॥
বার বাঙ্গালার পতি ইশা খান বীর। দক্ষিণ কূলের রাজা আদম সুধীর ॥
স্নেহভাবে যাহারে পূজন্ত নিতি নিতি। যাহার প্রশংসা কৈল মগধির[৪] পতি ॥
সদর্জ্জা (?) করিয়া যার ভুবনে বাখান। পরম পণ্ডিত সে যে রসের নিধান ॥
পীর থাকে যাকে যাকে বোলে[৫] সর্ব্বজন। এক মনে [চিন্তে] সে যে আলেখ নিরঞ্জন ॥
খেমাকন (?) দয়াশীল মধুর-বচন। শাহা আবদন ওহাবকে করম বন্দন ॥
সাহা তিক্ষাবিতালি (?) বোলে[৬] সর্ব্বজন। বারে বারে প্রণামিএ সে দুই চরণ ॥
তাহান নন্দন শ্যাম সুন্দর শরীর। পূর্ণিমার চন্দ্র মুখ সর্ব্বশাস্ত্রে ধীর ॥
গুণবান মৃত্যুঞ্জয় নবরসোদধি। বহুল প্রকার যারে সৃজিলেক বিধি ॥
... ... অঙ্গে বঙ্গে কলিঙ্গে[৭] পূজএ সম্পদ ॥

১। অর্থাৎ কর্ত্তাকে। ২। তুলনীয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন 'অতি বিতপনী রাধা পরিধান পাট।'
৩। নসীরু-দ্ দীন ? ৪। অর্থাৎ মগের। ৫। পাঠ 'পির যাকে জাকে জাকে কোলে'।
৬। পাঠ 'কোলে'। ৭। পাঠ 'এঙ্গে লঙ্গে'।

কোরেশী বংশের জান প্রসিদ্ধের হেতু। মহাশয় মাতামহ কুল-জয়কেতু ॥
ধবল গজের পরে[১] যাহাকে বাখানে। যাহা হস্তে পাইল পদ রোসাঙ্গির[২] গণে ॥
শাহা মোহাম্মদ পীর করম বন্দন। উদ্ধারহ মাতামহ পশিলুঁ শরণ ॥
মহম্মদ খানে কহে মনে করি সার। তুমি বিনে সহায় নরক হৈব পার ॥[৩]

উপরে উক্ত বর্ণনা হইতে কবির মাতামহবংশ সম্বন্ধে জানিতে পারি যে কবির মাতামহ শাহ মহম্মদ পীর, তস্য পিতা শাহ আবদুল (বা আবেদিন) ওহাব যাহার সহিত নসরৎ খানের কন্যার বিবাহ হইয়াছিল, তস্য মাতা মাণিক্য বিবি, তস্য পিতা শাহ নসীরুদ্দীন পীর, তস্য পিতা হামিদ আলাম পীর, তস্য পিতা বাবা ফরিদ, তস্য পিতা শেখ হামিদ পীর, তস্য পিতা কাজি খান, তস্য পিতা মহাশক্ত মীর কাজি, তস্য পিতা আলাম কাজি, তস্য পিতা শেখ সরফুদ্দীন পীর, তস্য সখা কদল খান গাজী যিনি চট্টগ্রামে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন।

তাহার পর মহম্মদ খান পিতৃবংশের এই পরিচয় দিয়াছেন—

তবে পিতামহগণ প্রণমিএ এক মন, পিতামহ মাহি আসোয়ার ॥
সিদ্দিক বংশের জন্ম, উমর সদৃশ ধর্ম্ম, লজ্জাএ ওস্‌মান সমসর ॥
জ্ঞানেত সদৃশ আলি, দানেত হাতিম ঝুলি, হামজা সদৃশ বলবান।
দীক্ষাগুরু কল্পতরু, সর্ব্ব অস্ত্র শাস্ত্রে গুরু, জন্ম হইল আরবের স্থান ॥
হাজি খালিল পীর ওর চাহি পৃথিবীর ফিরিয়া আসিতে আরবার।
সহরিষে তান সঙ্গে পৃথিবী ভ্রমিতে রঙ্গে চলি ভেল[৪] মাহি আসোয়ার ॥
আসিতে খালিল পীর সেহাজি সমুদ্রতীর সিংহচর্ম্মে কৈলা আরোহণ।
আল্লার ফর্মান [তাই], এক মৎস্য আইল ধাই, পৃষ্ঠ পাতি দিল ততক্ষণ ॥
আল্লার অস্তর করি সে মৎস্যের পৃষ্ঠে চড়ি চলি ভেল মাহি আসোয়ার।
গহন সমুদ্র তীর চলি আইল দুই পীর চাটিগ্রাম দেশের মাঝার ॥
একাদশ মিত্র সঙ্গে কদল খান গাজী রঙ্গে দুই মিত্র বাড়ি লই গেলা।

১। পাঠ 'খরে'। ২। পাঠ 'রসাঙ্গির'। ৩। বা প্রা পু বি ১-১, পৃ ১৫৮-৫৯।
৪। তুলনীয় শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন 'চলি ভৈলী' (স্ত্রীলিঙ্গে)।

হাজি খালিলকে দেখি বদর আলাম সুখী, অন্যে অন্যে [তবে] আশ্বসিলা।
মাহি আসোয়ার তবে সে দেশে ভ্রমন্ত যবে দেখিলেন্ত আচার্য্য-নন্দিনী।
রূপে বিদ্যাধর জিনি সুধাহাসি মধুবাণী নয়ান অমল কমলিনী॥
দেখি মাহি আসোয়ার বিপ্র স্থানে সে কন্যার মাগিলেন্ত বিবাহ করিতে।
আচার্য্য না দিল যবে ব্যাঘ্র আরোহিয়া তবে বিপ্র-দ্বার আইলা ত্বরিতে॥
ভয়ে ধাএ বিপ্রগণ, আচার্য্য ভাবিয়া মন দান কৈলা আপনা নন্দিনী।
কত কাল ক্রীড়া করি ফিরি দেশে গেলা চলি, পুত্র প্রসবিলা যশস্বিনী॥
তালিম তাহান নাম, অস্ত্রে শাস্ত্রে অনুপাম, দানে যেন দ্বিতীয় হাতিম।
. . . . .
তান পদ শিরে ধরি পাঞ্চালী রচনা করি তাহান নন্দন গুণনিধি।
সিদ্দিক তাহান নাম, অস্ত্রে শাস্ত্রে অনুপাম, বদনকমল কলানিধি॥
. . . .
তান পুত্র জ্ঞানে গুরু দানে কর্ণ মানে কুরু রাস্তি খান রূপে পঞ্চবাণ॥
চাটিগ্রাম দেশপতি স্বর্গে যেন শচীপতি, তাহানে প্রণামি বারে বার।
তাহান নন্দন বলি রসোদধি বলে হলী দানে হরিশ্চন্দ্র সমসর॥
. . . .
কামিনীমোহন বর অভিনব পঞ্চশর মিন খান রূপে অনুপাম॥
তান পুত্র গুণবান . . . যার কীর্ত্তি গৌড় দেশ ভরি।
. . . .
গাভুর খান গুণনিধি থির ধীর রসোদধি, তাহানে প্রণমি বহুতর॥
করিয়া বিষম রণ জিনিলা ত্রিপুরাগণ লীলাএ পাঠানগণ জিনি।
শত্রু সব করি ক্ষয় বাহুবলে লভি জয় বাপ হস্তে কৈল রাজধানী
লইয়া পণ্ডিতগণ শাস্ত্রকথা অনুক্ষণ রঙ্গ ঢঙ্গ কৌতুক অপার।
হাম খান মুছানন্দ, হাস্য বাণী মকরন্দ, তাহানে প্রণমি বারে বার॥
. . .
তাহান নন্দনবর
. . .
প্রজার পালক রাম বাপ হস্তে অনুপাম বাহুবলে শাসিলেক ক্ষিতি।
বান্ধবজনের প্রাণ প্রভু নসরৎ খান, তান পদের করম প্রণতি॥
প্রণামি তাহান পদ রচিয়া পঞ্চালী সদ তান পুত্র বলাই জেউধ (?)।

চাটিগ্রাম দেশকান্ত পৃথিবী যিনি ধৈর্য্যমন্ত গাণ্ডীবে অর্জ্জুন সম যোধ ॥
প্রশংসন্ত সর্ব্বদেশ, কীর্ত্তি গাহে সবিশেষ, মহিষ মারেন্ত এক শরে।
ভুজাবন্ত বীর্য্যবন্ত, অনন্ত কি কৈব অন্ত, একশরে শার্দ্দূল সংহারে ॥
... ... প্রজাক পালন্ত প্রীতি রাখি।

এহি যে জালাল খান স্বর শশী পঞ্চবাণ রূপে জিনি গেল বিদ্যাধর।
তাহান নন্দন বলি ...
মেঘ সব বাক্য যান শ্রীবিরহিম খান, তাহানে প্রণামি বহুতর।
তাহান অনুজবর পার্থ সম ধনুর্দ্ধর বলে ভীম ধৈর্য্যে যুধিষ্ঠির

নিরন্তর নিরঞ্জন ভাবে যেই একমন, তিল এক নাহিক বিশ্রাম।

প্রভু মুবারিজ খান, কমলচরণ তান প্রণমিয়ে সহস্রেক বার।
... ...
তান সুত অল্প জ্ঞান মহম্মদ খান নাম পঞ্চালী রচিলা শিশুবুদ্ধি ॥[১]

ইহা হইতে জানা যায় যে কবির পিতার নাম মুবারিজ খান, তস্য জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা বিরহিম খান, তস্য পিতা জালাল খান, তস্য পিতা নসরত খান, তস্য পিতা গাভুর খান[২], তস্য পিতা মিন খান[৩], তস্য পিতা রাস্তি খান, তস্য পিতা সিদ্দিক, তস্য পিতা তালিম, তস্য পিতা আবর দেশাগত এবং তত্র প্রত্যাগত মাহি আসোয়ার, মাতা আচার্য্য-কন্যা আছে।

অন্যত্র—

সিদ্দিক বংশেত জন্ম, উমর সদৃশ ধর্ম্ম, পিতামহ মাহি সোয়ার।
তান বংশ কল্পতরু দানে শুক্র জ্ঞানে গুরু নসরৎ খান গুণসার ॥
তান সুত গুণসার শ্রীযুত জালাল বর পাঞ্চালী রচিল শিশুবুদ্ধি।[৪]
শাহা সুলতান পীর সুজান। কেলিকলারসে পঞ্চবাণ ॥
তান পাদপদ্মে করি জোর হার। খান মহম্মদ কহে সুরস পয়ার ॥[৪]

১। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৫৯-৬০।
২। ইনিই কি ছুটি খান ?
৩। ইনিই কি পরাগল খান ?
৪। বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ৯৮।

পিতৃবংশ এবং মাতৃবংশ পর্য্যালোচনা করিলে দেখা যায় যে কবি সম্ভবতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন। ইহাও সম্ভব যে কবি পরাগল খানের বংশধর ছিলেন।

বাঙ্গালা ভাষার উপরে কবির বেশ দখল ছিল এবং পৌরাণিক কাহিনী তাঁহার বিশেষভাবে জানা ছিল, ইহার পরিচয় উপরে উদ্ধৃত অংশে সুস্পষ্ট।

কাব্যের আরম্ভ এই প্রকার—

প্রণমহো নিরঞ্জন সংসারের সার। বিশ্বরূপী সর্ব্বস্থানে গোপতে প্রচার॥
এক হন্তে দুই হই হৈল তিন গুণ। ভাবক ভাবিনী ভাব মগ্ন সুনিপুণ॥
ভাবক ভাবিনী যদি দরশন ভেল। অনন্ত অলেখ মূর্ত্তি উপজিয়া গেল॥
এক ভেল অনেক[১] অলেখ ভেল এক। কহিতে অকথ্য কথা কেবা কহিবেক॥
সেই প্রভু প্রণমহো হই এক মন। অনাদি অনন্ত সেই প্রভু নিরঞ্জন॥[২]

১। পাঠ 'অলেখ'।

২। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৫৭-৫৮।

চতুস্ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

কৃষ্ণরাম দাস

সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে যে সকল কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন তাহার মধ্যে কবিত্বশক্তিতে না হউক বিষয়বস্তুর অভিনবত্বে কৃষ্ণরাম দাস অগ্রগণ্য। ইনি জাতিতে ছিলেন কায়স্থ, বাসস্থান কলিকাতার প্রায় চারিক্রোশ উত্তরে নিমিতা বা নিমিতে (বর্ত্তমান নিম্‌তা বা নিম্‌তে) গ্রাম। পিতার নাম ভগবতীদাস।

নিমিতে গ্রামেতে বাস, নাম ভগবতীদাস, কায়স্থকুলেতে উতপতি।
হইয়া যে একচিত রচিলা রায়ের গীত কৃষ্ণরাম তাহার সন্ততি ॥[১]

রায়মঙ্গলের একস্থানে কবি যে ভাবে নীলকণ্ঠ দাসের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ইহা অনুমান করা অসঙ্গত নহে যে ইনি কবির পুত্র ছিলেন।

কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের আদেশে।
কৃপা করি রাখ প্রভু নীলকণ্ঠ দাসে ॥

কৃষ্ণরামের রচিত তিনটি কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—(১) ষষ্ঠীমঙ্গল, (২) কালিকামঙ্গল, এবং (৩) রায়মঙ্গল।

ষষ্ঠীমঙ্গল ১৬০১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহার দুইটি আদ্যন্তখণ্ডিত পুঁথি বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির গ্রন্থাগারে আছে। পুঁথি দুইটির একটি হইতে কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।[২] এই অংশে লিপিকাল জ্ঞাপক পয়ারটি পাওয়া যাইতেছে।

একে একে ভ্রমণ করিল দেশে দেশে। দেখিল দেবীর পূজা অশেষ বিশেষে ॥
দরিদ্র রমণী যত যেমন যুকতি। উপবাস করি রয় কেবল ভকতি ॥
সপ্তগ্রাম [ভূমি] যে ধরণী নাহি তুল। চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথী কূল ॥
নিরবধি যজ্ঞদান পুণ্যবান্ লোক। অকাল মরণ নাহি [নাহি] দুঃখ শোক ॥

১। রায়মঙ্গল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ১৭৯৮। ২। পুঁথি ৫৬৭৪।

শক্রজিৎ[১] রাজার নাম তার অধিকারী। বিবরিয়ে যত গুণ বলিতে না পারি॥
নির্ম্মল যশের শশী প্রতাপের তপন। জিনিয়া অমরাপুরী তাহার ভবন॥
বুড় বামনীর বেশে সহচরী নিলে[২]। রাজার পুরীতে নিয়ে প্রবেশ করিলে॥
কাঁকেতে চুপড়ি তাহে তুলসীর পাত। গঙ্গা মিত্তিকে খানি ফুল কত জাত॥
হাতে সিগে (?) বেত নড়ি বুড়ি মায়াধর। ধীরে ধীরে উত্তরিল রাণীর গোচর॥
যাইতে আটক তায় না করে দরানি[৩]। সখী দিল বসিতে আসন একখানি॥
কবি কৃষ্ণরাম বলে ষষ্ঠীর মঙ্গল। মহী শূন্য ঋতু চন্দ্র শক সংবৎসর॥

কৃষ্ণরাম বর্ণিত ষষ্ঠীমঙ্গল কাহিনী নারীসমাজে প্রচলিত গল্প অবলম্বনে রচিত। কাহিনীটি সংক্ষেপে দিতেছি।

সপ্তগ্রামের রাজা শক্রজিতের রাণীর নিকট বৃদ্ধা ব্রাহ্মণীবেশে ষষ্ঠীদেবী পূজা আদায় করিবার উদ্দেশ্যে আগমন করিলেন, এবং বলিলেন "আমার বাস বর্দ্ধমানে। আমার সাত পুত্র ও চারি কন্যা। গঙ্গাস্নান করিতে এখানে আসিয়াছি। অদ্য অরুণষষ্ঠী, তোমার এখানে ষষ্ঠীপূজা করিব।" রাণীর প্রশ্নে দেবী ষষ্ঠীপূজার মাহাত্ম্যবর্ণনায় একটি উপাখ্যান বলিলেন,—সায় বেনের স্ত্রী ষষ্ঠীর বরে সাত পুত্র লাভ করিয়াছিলেন। একদিন সদাগরের কনিষ্ঠা পুত্রবধূ ষষ্ঠীপূজার নৈবেদ্য খাইয়া ফেলে এবং মিথ্যা করিয়া শাশুড়ীকে বলে যে কাল বিডালে নৈবেদ্য খাইয়া গিয়াছে। কাল বিড়াল ষষ্ঠীদেবীর বাহন। ছোট বউ গর্ভবতী ছিল, পরে যথাকালে পুত্রসন্তান প্রসব করিল। রাত্রিতে প্রসূতির অজ্ঞাতসারে শিশুকে কাল বিড়ালে অপহরণ করিল। এইরূপে ছোট বউয়ের ক্রমে ক্রমে ছয় শিশু অপহৃত হইল। সপ্তম বারে বধূ বনে গিয়া প্রসব করিল এবং শিশুকে কোলে করিয়া বসিয়া রহিল। একটু তন্দ্রা আসায় সেই অবসরে কাল বিড়াল শিশুকে লইয়া গেল, অমনি বধূর তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। দেখিল, একটা কাল বিড়ালে তাহার শিশুকে লইয়া যাইতেছে, তখন সে ছুটিল কিন্তু হুচোট খাইয়া পড়িয়া গেল, তাহার বস্ত্র ছিন্নভিন্ন হইয়া গেল। বধূ পথে বসিয়া কাঁদিতে লাগিল। তখন দেবীর দয়া হইল, দেবী তাহার নিকট

১। অথবা 'শক্রজিৎ' কিংবা 'সত্রাজিত'। ২। 'নীলা' হইবে বোধ হয়। অথবা, বেশ লইল।
৩। অর্থাৎ দৌবারিক।

আসিয়া কিছু ভৎর্সনা করিয়া তাহার সাত পুত্র ফিরাইয়া দিলেন। মহাসমারোহে বধূ ষষ্ঠীপূজা করিল। ব্রাহ্মণীরূপধারিণী দেবীর নিকট এই ষষ্ঠীমাহাত্ম্য কাহিনী শুনিয়া রাণী সহচরীগণের সহিত ষষ্ঠীপূজা করিলেন।

কৃষ্ণরাম সপ্তগ্রামের এইরূপ বর্ণনা দিয়াছেন[১]—

রাঢ় গৌড় দেখিলাম কলিঙ্গ কপাল। গয়া পইরাগ কাশী নিষধ নেপাল॥
একে একে ভ্রমণ করিলাম দেশ দেশ। দেখিলুঁ দেবীর পূজা অশেষ বিশেষ॥
সপ্তগ্রাম ধরণীতে নাহি তার তুল। চালে চালে বৈসে লোক ভাগীরথী কূল॥
নিরবধি যজ্ঞ দান পুণ্যবান্ লোক। অকাল মরণ নাই নাহি দুঃখ শোক॥
শত্রুজিৎ রাজার নাম তার অধিকারে। বিবরিয়ে যত গুণ কে কহিতে পারে॥

কবিচন্দ্র ও গুণরাজ খাঁ উপাধিক শিবানন্দ কর রচিত ষষ্ঠীমঙ্গল পাওয়া গিয়াছে। এই কাব্য দুইটি ক্ষুদ্রকায়। পরবর্ত্তী শতাব্দীতে লিখিত রুদ্ররামের কাব্যের কাহিনী অভিনব।

কবির যখন বিংশতি বৎসর বয়স তখন তিনি বৈশাখ মাসের প্রথমে কৃষ্ণপক্ষের ত্রয়োদশী তিথিতে দেবীর স্বপ্নাদেশ লাভ করেন। তদনুসারে কালিকামঙ্গল[১] রচিত হয়। এই কাব্যে আত্মপরিচয় স্থলে তিনি স্বীয় গ্রামের প্রধান প্রধান অধিবাসীদিগের উল্লেখ করিতে গিয়া প্রশংসামুখর হইয়াছেন।

অতি পুণ্যময় ধাম সরকার সপ্তগ্রাম, কলিকাতা পরগনা তায়।
ধরণী নাহিক তুল জাহ্নবীর পূর্ব্বকূল, নিমিতা নামেতে গ্রাম যায়॥
বসতি করয়ে তথি সদাচার শুদ্ধমতি ধীর ধরাদেবগণ সুখে।
দেখি হেন মনে লয়, নারদাদি মুনিচয় অবতার কৈল কলিযুগে॥
চৌধুরী গন্ধর্ব্বারি বলে নাহি অধিকারী, অধিকার অনেক ধরণী।
দহিতে অহিত বন ছিলা দারা হুতাশন ভারভরে প্রতাপে তরণি (?)॥
সাবর্ণ চৌধুরী সব, এক মুখে কি বলিব, অশেষ মহিমা অতি স্থির।
শ্রীযুক্ত শ্রীমন্ত রায় সর্ব্বলোকে গুণ গায়, ধার্ম্মিক যেমন যুধিষ্ঠির॥
বিদ্বান্ উত্তম দাতা জিনিয়া কলপলতা জনার্দ্দন রায় মহাশয়।

১। দ্বিতীয় পুঁথির পাঠ।

উপমা কোথায় এত,	কি কহিব গুণ যত,	সহস্রবচন মোর লয় ॥
প্রতাপে তিমিরহর	যশের যামিনীকর	শুদ্ধমতি কাশীশ্বর রায়।
পুণ্যের অবধি নাই,	দেখি ইন্দ্র ভয় পাই,	কলিকালে এমন কোথায় ॥
সেই গ্রামের মধ্যে বাস	নাম ভগবতীদাস,	কায়স্থকুলেতে উতপতি।
তাঁহার তনয় হই,	নিজ পরিচয় কই,	বয়ঃক্রম বৎসর বিংশতি ॥
শুন সভে একচিত	যেমনে হইল গীত,	কৃষ্ণপক্ষে ত্রয়োদশী তিথি।
প্রথম বৈশাখ মাসে	স্বপনে আপন বাসে	দেখিনু সারদা ভগবতী ॥

আওরঙ্গজীবের রাজত্বকালে যখন শায়িস্তা খাঁ বাঙ্গালার স্থবেদার ছিলেন তখন কৃষ্ণরাম কালিকামঙ্গল[১] রচনা করেন। কবি রচনার শকাব্দও জানাইয়াছেন। তবে এই অংশটি—পাঠবিকৃতির জন্যই হউক বা কূট বলিয়াই হউক—আমাদের বোধগম্য নহে।

অরং শাহা ক্ষিতিপাল	রিপুর উপরে কাল,	রামরাজা সর্ব্বজনে বলে ॥
নবাব শায়িস্তা খাঁ	অধিকারী সাতগাঁ,	বহু সরকার করতলে ॥
সারসা সানের নেত্র	ভীমাক্ষি বর্জ্জিত মিত্র	তেজিয়া ঋষির পক্ষ তবে।
বিধুর মধুর ধাম	রচনাতে কহিলাম,	বুঝ শক বিচারিয়া সভে ॥

শ্রীযুক্ত ত্রিদিবনাথ রায় 'সারসা সানের' স্থলে 'সায়িস্তা খানের' পাঠ ধরিয়া কিছু কষ্টকল্পনার সাহায্যে ইহা হইতে ১৫৯১ শকাব্দা অর্থাৎ ১৬৬৯-৭০ খ্রীষ্টাব্দ পাইয়াছেন।[২] শায়িস্তা খাঁ বাঙ্গালায় দুইবার স্থবেদারি করেন। প্রথমবার ১৬৬৪ হইতে ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দ এবং দ্বিতীয়বার ১৬৭৯ হইতে ১৬৮৯ খ্রীষ্টাব্দ। কৃষ্ণরাম ১৬৭৯ খ্রীষ্টাব্দে ষষ্ঠীমঙ্গল ও ১৬৮৬ খ্রীষ্টাব্দে রায়মঙ্গল রচনা করেন। কালিকামঙ্গল রচনাকালে তাঁহার বয়স ছিল বিশ বছর। স্থতরাং এইটি তাঁহার প্রথম রচনা হওয়াই সম্ভব। এই হিসাবে কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গল শায়িস্তা খাঁর প্রথম স্থবেদারির কালে অর্থাৎ ১৬৬৪ হইতে ১৬৭৬ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে রচিত হইয়াছিল বলিয়া ধরিয়া লইতে পারি।

১। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সর্ব্বপ্রথম সাহিত্য পত্রিকায় [১৩০০, পৃ ১১১-১১৯] এই কাব্যটির পরিচয় প্রকাশ করেন। ব-সা-প পুঁথি (খণ্ডিত)। ২। ব-সা-প-প ৪২, পৃ ৫৩-৫৪।

কৃষ্ণরামের কালিকামঙ্গলে বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীধর কবিরাজের কাব্যের পর ইহাই বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম বিদ্যাসুন্দর কাব্য। প্রাণরাম চক্রবর্ত্তী তাঁহার কাব্যে কৃষ্ণরামকে বিদ্যাসুন্দর কাব্যের আদি কবি বলিয়াছেন।

বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ। বিরচিলা কৃষ্ণরাম নিমতা যার বাস ॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই। রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা নাই ॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে। রচিলেন উপাখ্যান প্রসঙ্গের ছলে ॥

যে পুঁথি লইয়া হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় সাহিত্য পত্রিকায় কালিকামঙ্গলের উপর প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার লিপিকাল ১১৫৯ সাল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল রচনা সমাপ্ত হইবারও পূর্ব্বেকার।

রায়মঙ্গল[১] কবির তৃতীয় এবং সম্ভবতঃ শেষ রচনা। রচনাকালে কবি নিজেকে "শিশু" বলিয়াছেন বটে কিন্তু, নীলকণ্ঠ দাস যদি কবির পুত্র হন তবে "শিশু" হন কি করিয়া? 'শিশু' শব্দের অর্থ এখানে 'অজ্ঞান' বুঝিতে হইবে।

তোমার চরিত্র আমি নাহি জানি কিছু ॥
কেমনে রচিব গীত আমি অতি শিশু ॥

রায়মঙ্গল রচনার কাল হইতেছে ১৬০৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৮৬-৮৭ খ্রীষ্টাব্দ।

কৃষ্ণরাম বিরচিল রায়ের মঙ্গল।
বসু শূন্য ঋতু চন্দ্র শকের বৎসর ॥

"রায়ের মঙ্গলে" বা রায়মঙ্গলে ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের মাহাত্ম্য কীর্ত্তিত হইয়াছে এবং আনুষঙ্গিক ভাবে কুম্ভীরদেবতা কালু রায়ের এবং পীর বড় খাঁ গাজীর[২] মহিমাও উল্লিখিত হইয়াছে। ব্যাঘ্রদেবতা দক্ষিণরায়ের সম্বন্ধে কৃষ্ণরামের কাব্য এখন প্রাচীনতম হইলেও আদিকাব্য নহে, কেননা দক্ষিণরায়ের মুখ দিয়া কৃষ্ণরাম নিজেই বলিয়াছেন যে তাঁহার পূর্ব্বে মাধব আচার্য্য এই বিষয়ে কাব্য রচনা করেন।

পূর্ব্বে করিল গীত মাধব আচার্য্য।

১। ব-সা-প-প ৩, পৃ ২২৬-২৪৮, ২৯৭-৩০২, ব সা-প-প ৬, পৃ ৭০; কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ১৭৯৮।

২। গাজীর গান সম্বন্ধে পরে দ্রষ্টব্য। ময়মনসিংহ জেলাতেও গাজী সাহেব ও তাঁহার মিত্র কালুর গল্প প্রচলিত আছে [ব-সা-প-প ৩৯, পৃ ২২৭-২৮ দ্রষ্টব্য]।

রায়মঙ্গল রচনার ইতিহাস কবি এইরূপ দিয়াছেন—

একদা ভাদ্রমাসে এক সোমবারের কোন রাত্রিতে বড়িশা বেহালার নিকটবর্ত্তী গ্রামে এক গোয়ালার গোলা-ঘরে কবি শুইয়াছিলেন। রাত্রি শেষে তিনি ব্যাঘ্রোপরি উপবিষ্ট ধনুঃশরহস্তে দক্ষিণরায়কে স্বপ্নে দেখিলেন। রায় তাঁহাকে স্বীয় মাহাত্ম্যকাব্য রচনা করিতে বলিলেন, যেহেতু মাধব আচার্য্যের চাষা-ভুলানো গীতে রায়ের সন্তোষ জন্মায় নাই। কবিকে আশ্বাস দিয়া রায় আরও বলিলেন যে কৃষ্ণরামের কাব্য যাহার ভাল লাগিবে না তাহাকে সবংশে বাঘে খাইবে।

শুনহ সকল ধীর অপূর্ব্ব কথন। যেমনে রচিল এই কবিতা-বচন ॥
খাসপুর পরগনা নামে মনোহর। বড়িস্যা তাহার এক তপা বিশ্বাম্বর ॥
তথায় গেলাম ভাদ্রমাস সোমবারে। নিশিতে শুইলাম গোয়ালার গোলাঘরে ॥
রজনীর শেষে এই দেখিলাম স্বপন। বাঘ-পিঠে বারাইল এক মহাজন ॥
করে ধনুঃশর চারু সেই মহাকায়। পরিচয় দিলা মোরে দক্ষিণের রায় ॥
পাঁচালীপ্রবন্ধে কর মঙ্গল আমার। আঠার-ভাটীর মাঝে হইবে প্রচার ॥
পূর্ব্বে করিল গীত মাধব আচার্য্য। না লাগে আমার মনে নাহি তার কার্য্য ॥
মশান নাহিক তাহে সাধু খেলে পাশা। চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হইল ভাষা ॥
মোর গীত না জানিয়া যতেক গায়ন। অন্য গীত ফিরাইয়া গায় জাগরণ ॥
ফাকুটি-নাকুটি আর করে রঙ্গি-ভঙ্গী। পরম কৌতুকে শুনে মউল্যা মলঙ্গী ॥
তোমার কবিতা যার মনে নাহি লাগে। সবংশে তাহারে তবে সংহারিবে বাঘে ॥

কবি স্বপ্নে উত্তর দিলেন, আমি ছেলে মানুষ, তোমার মাহাত্ম্য কিছুই জানিনা, কি করিয়া বর্ণন করিব? তখন রায় স্বীয় মাহাত্ম্যকাহিনী মোটামুটি কবিকে বলিয়া দিলেন।

হাসিয়া কহেন রায় মধুর বচন। আমার কৃপায় গীত হবে অখণ্ডন ॥
হেলা না করিও তবে পাইবা সকলি। তুমি যে করিবা গীত শুন তাহা বলি ॥
মুনি মুখে শুনিয়া ভূপতি প্রভাকর। সদাশিব সেবিয়া পাইল পুত্রবর ॥
আপুনি হইনু গিয়া তাহার নন্দন। বসাইল নব রাজ্য কাটিয়া কানন ॥
বিবাহ করিনু ধর্ম্মকেতুর কুমারী। দম্পতি কৈলাসে গেনু যোগে তনু ছাড়ি ॥

হরবরে দক্ষিণের ঈশ্বর হইয়া। প্রথমে লইনু পূজা পাটনে ছলিয়া॥
কালু রায় পাঠাইল হিজলী সহরে। না মানে আমারে তবে নরসিংহ নরে॥
মারিয়া তাহার পুত্র দিনু জিয়াইয়া। যতনে পূজিল বহু বলিদান দিয়া॥
বড়দহে দেবদত্ত নাম সদাগর। বহুদিন বন্দী ছিল তুরঙ্গসহর॥
পুষ্পদত্ত তার পুত্র আমার বচনে। সাত ডিঙ্গা লইয়া গেল পিতা অন্বেষণে॥
পথেতে ছলনা দেখি রাজারে কহিল। না জানিয়া নরপতি কাটিতে লইল॥
মরণে শরণ কৈল সাধুর নন্দন। সঙ্কটে আমি গিয়া করিব রক্ষণ॥
বাঘ লইয়া আপুনি সমরে দিনু হানা। বধিনু সুরথ রাজা আর যত সেনা॥
রাজা রাণী আসিয়া অনেক কৈল স্তব। জিয়াইনু দিনু আমি কৃপা অনুভব॥
রত্নাবতী তনয়া সাধুরে বিভা দিল। পিতাপুত্রে দুইজনে দেশেরে আইল॥
করিয়া আমার পুরী আমার মন্দির। যতনে পূজিল পুষ্পদত্ত মহাবীর॥
এমনি প্রকারে কর আমার মঙ্গল। এতেক বলিয়া রায় গেল নিজ স্থল॥

কৃষ্ণরামের কাব্যের যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ভূপতি প্রভাকরের কথা, পাটনে পূজাগ্রহণ ও হিজলীর নরসিংহের কাহিনীগুলি নাই। শুধু দেবদত্ত-পুষ্পদত্তের কাহিনীটি আছে এবং আনুষঙ্গিকভাবে দক্ষিণরায় ও বড় খাঁ গাজীর বিরোধ ও তাহার পরিণতির কথাও উল্লিখিত হইয়াছে।

গঙ্গানদী পলি ফেলিয়া বাঙ্গালার দক্ষিণ পরিসর ক্রমাগত বাড়াইয়া চলিয়াছেন। নদীমুখে চর উত্থিত হইলে তাহা পরে জঙ্গলে পরিণত হয় এবং বাঘ ও কুমীর ইত্যাদির আবাসস্থান হয়। ইহাই সুন্দরবন। তাহার পর লোকে জঙ্গল কাটিয়া প্রথমে আবাদ তাহার পর গ্রাম ইত্যাদি স্থাপিত করে এবং সুন্দরবন আরও দক্ষিণে সরিয়া যাইতে থাকে। এই সকল অঞ্চলে স্বভাবতঃই ব্যাঘ্রাদির অত্যাচাব অধিক। সেই কারণে চব্বিশ পরগনার দক্ষিণাংশে হাবডা ও মেদিনীপুর জেলার দক্ষিণাংশে খুলনায় যশোহরে নোয়াখালিতে এবং সুন্দরবন হইতে উদ্ভূত অন্যান্য অঞ্চলে পূর্ব্বাপর ব্যাঘ্রদেবতার পূজা বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল ও অদ্যাপি কিছু কিছু আছে। দেবতা দুই প্রকার, ভক্তির দেবতা ও ভয়ের দেবতা। বাঙ্গালায় ভয়ের দেবতা অনেকগুলিই আছেন, তন্মধ্যে প্রাণিঘটিত দেবতা

প্রধানতঃ দুইটি, মনসা ও দক্ষিণরায় ; ইহার সহিত কালু রায়েরও নাম করা যায়। ইহার কারণ, নদীমাতৃক বাঙ্গালা দেশে সর্প ও ব্যাঘ্র এবং কতক পরিমাণে কুম্ভীরের ভয় সমধিক।

চব্বিশ পরগনার দক্ষিণাংশে অনেক গ্রামেই দক্ষিণরায়ের স্থান আছে। "সাধারণতঃ বনাঞ্চলের মউল্যা, মলঙ্গী, পোদ, বাগদী, কাঠুরিয়া, শীকারী, বুনো, নৌজীবী প্রভৃতি লোকেই ইঁহার পূজা করে। ইঁহার পূজাবিধিও বহুকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। ঐ অঞ্চলের মুসলমানেরাও ইঁহাকে পীর গাজীর ন্যায় ভক্তি করে, পূজা দেয়।" "সভ্য গ্রামের মধ্যেও দক্ষিণরায় দেবতার কোথাও কোথাও মন্দির আছে, কিন্তু সাধারণতঃ বৃহৎ প্রাচীন বট, অশ্বত্থ, বিল্ব, নিম্বাদি বৃক্ষতলেই তাঁহার আশ্রম। কোথাও মাটির ঢিবি, কোথাও সিন্দূরমণ্ডিত প্রস্তর খণ্ড, কোথাও বা দেবতার কল্পিত মুণ্ডমাত্র প্রতিমারূপে স্থাপিত'। সুন্দরবনের প্রত্যেক নদী ও খালের তীরবর্ত্তী প্রায় প্রত্যেক প্রাচীন বৃক্ষতলেই এই দেবতার পূজা হয়। অনেকস্থলে বৃক্ষের শাখার উপরও দেবতার মুণ্ডমাত্র প্রতিষ্ঠিত আছে।" "দক্ষিণরায় দেবতা মনুষ্যাকার, বলিষ্ঠদেহ, মহিষাসুরের ন্যায় দাঁত-খামাটি মারা, সিপাহীবেশী, ব্যাঘ্রবাহন। পৌষ সংক্রান্তির দিন ইঁহার বিশেষ পূজা হয়। নতুবা প্রয়োজনমত, মানসিকমত, যখন ইচ্ছা পূজা হইয়া থাকে।"[১] "কোন কোন স্থলে দক্ষিণরায় একাকী পূজিত হন না। কালুরায় নামে কুম্ভীরারোহী আর এক বীর দেবতার মূর্ত্তি (মুণ্ডমাত্র) পূজিত হয়।"[২]

রায়মঙ্গলের পুঁথি একটিমাত্র পাওয়া গিয়াছে, তাহাও আবার খণ্ডিত। সুতরাং যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহার আরম্ভ বড়ই আকস্মিক। কবিকে স্বপ্ন দিয়া রায় চলিয়া গেলেন এবং কবি "বসু শূন্য ঋতু চন্দ্র" শকাব্দে "রায়ের" মঙ্গল রচনা করিলেন, ইহা বলিয়াই কাহিনী আরম্ভ হইল।

ডিঙ্গা গঠাইব সাধু পাটন যাইতে। আদেশ করিলা কাষ্ঠ কাটিয়া আনিতে॥
চলিল শিরোপা পাইয়া বাউল্যা রতাই। লইয়া প্রধান পুত্র আর ছয় ভাই॥

কাহিনীর যথার্থ আরম্ভ হওয়া নিম্নোক্তভাবে উচিত ছিল।

বড়দহের সদাগর দেবদত্ত সিংহলের অপেক্ষাও দূরে তুরঙ্গসহরে বাণিজ্যযাত্রা

করিয়াছিল। চণ্ডীমঙ্গল কাহিনীর ধনপতি যেরূপ কমলে-কামিনী দর্শন করিয়াছিল দেবদত্তও তদনুরূপ রাজদহে আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়াছিল, সাগর মধ্যে সুন্দরবনের প্রতিচ্ছবি।

সাগরের মাঝে পড়িল চর। কত মনোহর সোনার ঘর॥
সিংহাসনে[১] বসিলা নারায়ণ। সমুখে সকল কিঙ্করগণ॥
বামে লীলাবতী মূরতি জায়া। সকলি জানিবে দেবের মায়া॥
ডাহিনে সুগ্রীব আদিক পায়। সমীরণ করে রায়ের গায়॥
নানা পরকার চৌদিকে তরু। অকালে সকল সরস চারু॥
নারিকেল কুল রসাল গুয়া। দেখিল বহুল জানি[২] কমুয়া॥
ক্ষেণে ক্ষেণে উঠে ক্ষেণেক বৈসে। বকুল বহুত অলি হরিষে॥
নানা রসাবেশে সকল পক্ষ। একস্তরে চরে ভক্ষকে ভক্ষ্য॥
হরিণ মহিষ মানুষ বাঘ। পূরে বসুমতী দারুণ ডাক॥
ময়ূর ভুজঙ্গ করয়ে খেলা। কুঞ্জর কেশরী করয়ে মেলা॥

এই ব্যাপার পরে ধনপতি সুরথ রাজাকে বলিল, কিন্তু রাজাকে দেখাইয়া প্রত্যয় জন্মাইতে না পারায় তুরঙ্গসহরে কারারুদ্ধ হইয়া রহিল। বহুদিন কাটিয়া গেল, দেবদত্তের পুত্র পুষ্পদত্ত পিতার কোন সংবাদ না পাইয়া নিজেই তুরঙ্গ সহরে যাইতে প্রস্তুত হইল। নৌকা গড়িবাব জন্য রতাই নামক বাউল্যাকে কাঠ কাটিয়া আনিতে আদেশ দিল।

এইবার কবিবর্ণিত কাহিনী অনুসরণ করি।

রতাই ও অন্যান্য বাউল্যারা বিস্তর কাঠ কাটিতে লাগিল। সেই বনে দক্ষিণরায়ের অধ্যুষিত একটি বড় গাছ ছিল। সেই গাছ কাটাতে অনুচরেরা দক্ষিণরায়ের নিকট গিয়া নালিশ করিল। রায় এই ছয় বাঘকে প্রেরণ করিলেন—

মামুদা কুমুদা শুদা বাঘ টঙ্গভাঙ্গা।
বজ্রদন্ত খান দাউদা চক্ষু যার রাঙ্গা॥

১। পাঠ 'সিংহাসন মাঝে'। ২। ঐ 'জানিয়া'।

বাঘেরা রতাইয়ের ছয় ভাইকে মারিয়া ফেলিল। রতাই ভ্রাতৃশোকে আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইলে দক্ষিণরায় দৈববাণী দিলেন,

আমারে না জানি নর পূজ্য জানি তরুবর কাটিয়াছে কুঠারি ধরিয়া।
সেই অপরাধ রাগে আসিয়াছে ছয় বাঘে, ছয় ভাই ফেলিল মারিয়া॥
আমি দক্ষিণের রায়, সর্ব্বলোকে গুণ গায়, আঠারো-ভাটিতে পূজে সভে।
পুত্র দিয়া বলিদান পূজ আমা সাবধান, ছয় ভাই জিয়াইব তবে॥

দৈববাণী শুনিয়া রতাই সেই স্থানেই দেবতার পূজা করিয়া পুত্রকে বলিদান দিল। তখন দক্ষিণরায় আবির্ভূত হইয়া রতাইয়ের পুত্র ও ছয় ভাইকে বাঁচাইয়া দিলেন।

রতাই ও তাহার পুত্র এবং ভাইয়েরা কাঠ লইয়া দেশে আসিল। নৌকা গড়িবার জন্য "উপযুক্ত কারিগর পাঠাইবার আশায় পুষ্পদত্ত জননীর আদেশে সোনার চেঙ্গড়া নগরে ঘুরাইতে লাগিলেন, অর্থাৎ যে নৌকা গড়িতে সমর্থ হইবে সে আসিয়া সেই চেঙ্গড়া ধরিবে। কৈলাসের শিব হনুমান্ ও বিশ্বকর্ম্মাকে এই কার্য্যের জন্য পাঠাইলেন। তাঁহারা মনুষ্যরূপে আসিয়া চেঙ্গড়া ধরিলেন, অর্দ্ধেক রাত্রিতে সাতখান ডিঙ্গা গড়িয়া জলে ভাসাইয়া দিয়া চলিলেন এবং স্বপ্নে সে কথা সাধুকে জানাইয়া আপনাদের পরিচয় দিয়া গেলেন। পরদিন পুষ্পদত্ত এই দৈব ডিঙ্গা পূজা করিয়া তাহার মধ্যে যেখানি প্রধান তাহার নাম মধুকর রাখিলেন। তাহার পর স্বদেশের রাজা মদন নামক নৃপতির আদেশ লইয়া আসিলেন। পুষ্পদত্তের মাতা সুশীলা এ সকল শুনিয়া খুল্লনা লহনার ন্যায় না কাঁদিয়া দক্ষিণ-রায়ের স্তবপূজা করিতে বলিলেন। দেবতা প্রীত হইয়া প্রসাদান্ন দান করিলেন ও তাঁহার পুত্রকে সঙ্কটে রাখিতে প্রতিশ্রুত হইলেন।"[১]

পুষ্পদত্ত পিতার অন্বেষণে ডিঙ্গা ভাসাইলেন। কতকদূর গিয়া খনিয়া নামক স্থানে পৌছিলেন।

তার কত দূরে দেখে পীরের মোকাম। ঘিরিয়া ফকির করে হাজৎ সেলাম॥
হাল-আল[২] মোরগ জবাই করে খাসি। মনোহর কুসুম সন্দেশ রাশি রাশি॥

১। ব-সা-প-প ৩, পৃ ২৪১-৪২। ২। অর্থাৎ হালাল।

শিরনি অনেক দিলা সদাগর ভূপ। কর্ণধারে জিজ্ঞাসিল এহি অপরূপ॥
মূরতি বানান নাহি মৃত্তিকার ঢিবি। পূজা করে ফকিরেরা কেমন দেবাদেবী॥
বাঘের উপরে নাঞি দক্ষিণের রায়। একখানি মুণ্ড মাত্র বারা বলে তায়॥
এমন প্রকারে পূজা কেন হয় এথা। জান যদি কেহ শুনি এই দুই কথা॥

তখন কর্ণধার বড় খাঁ গাজীর কথা এবং কেন দক্ষিণরায়ের মুণ্ড এবং বড় খাঁ গাজীর মৃত্তিকাস্তূপ পূজিত হয় তাহার কারণ বলিতে লাগিল,

শুন্যা বড় খাঁ গাজী পরতেক পীর। ঠাকুর দক্ষিণরায় আঠারো-ভাটির॥
দুইজনে দোস্তানি হইয়াছিল আগে। তারপর হুড়াহুড়ি মহাযুদ্ধ লাগে॥
অধিকার বড় ধন সভে নিতে ধায়। ভাই ভাই বিরোধ কতেক ঠাঞি যায়॥
দক্ষিণরায়ের বুকে মারে বড় গাজী। পড়িয়া উঠিল রায় বলে মায়াবাজী॥
বড় খাঁ হানিল খাঁড়া গলায় তাঁহার। মায়ামুণ্ড ক্ষিতি পড়ে এমনি প্রকার॥
বিরোধ ভাঙ্গিয়া দিল আসিয়া ঈশ্বর। তারপর দোস্তানি পাইল দোঁহে বর॥
কাটামুণ্ড বারা পূজা সেই হইতে করে। কোন খানে দিব্য মূর্ত্তি বাঘের উপরে॥
বড় খাঁ গাজীর নামে যেথানে মোকাম। সেইখানে অধিষ্ঠান মৃত্তিকার ধাম॥
মূরতি বানান নাহি কেবল ভাবনা। ভকত জনের পূর্ণ করএ কামনা॥

পুষ্পদত্ত তখন বিস্তৃতভাবে রায় ও গাজীর বিরোধ-মিলনের কথা শুনিতে চাহিলে কর্ণধার সেই কাহিনী আমূল বিবৃত করিল।

ধনপতি সদাগর যাইতে পাটনে। এই ঘাটে চাপাইল বিধির ঘটনে॥
দক্ষিণরায়ের বারা দেখিলেক কূলে। হরবর পুত্র জানি পূজে গন্ধ ফুলে॥
নানা রত্নভূষণ তেমনি দিবা কেবা। বিদায় মাগিল শেষে জোড়হাতে সেবা॥
বড় খাঁ গাজীর পূজা না করিয়া যায়। অনেক ফকির গিয়া ঘিরিলেক তায়॥
কুপিল কুবুদ্ধি পাইল সদাগরসুত। ঢেকা দিয়া করিল তাহার ঘরে দূর॥
ডিঙ্গায় উঠিয়া চলে নগর সিংহল। পীরেরে কহিতে যায় ফকির সকল॥
সেই ত গ্রামেতে আছে গাজীর অন্দর। নগর বাজার হাট দেখিতে সুন্দর॥
কাঁদিয়া পড়িল গিয়া ফকিরেরা সভে। মুল্লুকের খবর না লও বাবা এবে॥
পূজিয়া দক্ষিণরায় যায় সাধু বেটা। তোমাকে নাহিক মনে দুঃখ বড় এটা॥

বাঙ্গালী গোঁয়ার ভয় নাহিক তিলেক। মারিয়া আমার ঘর[১] খেদায়ে দিলেক ॥
সরমে লোকের আগে নাহি তুলি মুখ। না লও ফকিরপনা আজি হইতে থুক ॥
হেন কালে বলে বাঘ নাম কালানল। শীকার করিতে বনে না পাই আমল ॥
দক্ষিণরায়ের বাঘে মুড়ি লয় কড়্যা। শুনিয়া তোমার নাম সভে দেয় তাড়্যা ॥
মহুল্যা মলঙ্গী আর বাউল্যার ঠাঁই। দোহাই দক্ষিণরায় বিনে আর নাই ॥
এক বেটা মলঙ্গী খাইতেছিলাম রাগে। ধরে লয়ে গেল মোরে তিন কুড়ি বাঘে ॥
দেখিয়া ঠাকুর কত লাগিল আটিতে। পীরের আমল নাই আঠারো-ভাটীতে ॥
আমার মলঙ্গা ধরে এই রাগ বড়। আজ্ঞা দিল কাণ কাট আর মাথা মুড় ॥
আমার শালার পিশি নকনথী[২] ছিল। পড়িয়া রায়ের পায়ে বারণ করিল ॥
জামীন হইয়া মোরে দিয়াছে খালাস। জানাইতে আইলাম সাহেবের পাশ ॥
একথা ওকথা শুন্যা গাজী গোঁসা খান। শাপ দিল সাধুরে সভার বিদ্যমান ॥

গাজী ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন,

ভাগ গিয়া [শালা] এবে কিয়া করে আব। হোগা হারামজাদ খানে খারাব ॥
শোন্তে হো দক্ষিণরায় এসা দাগাবাজী। বাঁধকে লে আনেসে তবে হাম গাজী ॥

গাজীর আদেশে কালানল বাঘ ও ফকীরেরা গিয়া রায়ের মূর্ত্তি ও ঘর ভাঙ্গিয়া ফেলিয়া দিল, পুরোহিত ব্রাহ্মণকে ধরিয়া নাস্তানাবুদ করিল, সে পলাইল। এদিকে

খাঁড়ির বাড়ীতে রায় লইয়া পরিবার।
বটে বেণে আসিয়া কহিল সমাচার ॥

বেণের মুখে এই ব্যাপার শুনিয়া রায় গাজীর সহিত যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইলেন। তাঁহার অনুচর "নানাবিধ নানাবর্ণের বাঘ সংবাদ পাইয়া আসিয়া উপস্থিত হইল। তাঁহার পাত্র এই সময়ে বলিল, গাজী আপনার বন্ধু ছিল, হঠাৎ লোকের কথায় তাহার সহিত যুদ্ধ করা উচিত হয় না, একটা নিজের লোক পাঠাইয়া সঠিক সংবাদ লওয়া উচিত। রায় তাহাই করিলেন। লোহাজঙ্গ[৩] দানা দূত হইয়া গেল, সে গাজীর নিকট তিরস্কৃত হইয়া আসিল। গাজীরও সেনাদল বাঘমাত্র। বনের বাঘ দুইদলে বিভক্ত হইয়া রণক্ষেত্রে উপস্থিত হইল। গাজীর

১। পাঠ 'আমার গর' অর্থাৎ আমাদিগকে। পূর্ব্ব পৃষ্ঠায় 'তাহার ঘরে' দ্রষ্টব্য।
২। নকলকী ? ৩। অর্থাৎ লৌহজঙ্ঘ।

বাহন ও প্রিয় ব্যাঘ্রের নাম খান দাউদা (দাউদ খাঁ) এবং রায়ের বাহন ও প্রিয় ব্যাঘ্রের নাম হীরা।"[১] রায় তাঁহার সেনা লইয়া উত্তরমুখে চলিলেন। খনিয়ায় উভয় সেনায় যুদ্ধ বাধিল। দলে দলে ফকীর মারা যাইতেছে দেখিয়া

নিষেধ করেন প্রভু রায় মহারাজ।
ভিখারী মারিব মোর কত বড় কাজ ॥

এদিকে ফকিরেরা পলাইয়া আসিয়া গাজীকে বলিল,

কি কর বসিয়া গাজী কার মুখ চাও। মটুকের বেটী লইয়া উঠিয়া পলাও ॥
আসিয়া ঘিরিল রায় বাঘে বেড়ে গাঁ। বুঝিয়া বিধান কর গাজী বড় খাঁ ॥

তাহার পর রায় ও গাজীর মধ্যে ঘোর যুদ্ধ চলিল। শেষে গাজী পয়গম্বর-দত্ত "খরশান খাঁড়া" লইয়া রুখিয়া দাঁড়াইলেন এবং সাত হাজার বাঘ মারিয়া অবশেষে রায়ের গলায় কোপ বসাইলেন। দক্ষিণরায়ের মুণ্ড কাটিয়া পড়িয়া গেল বটে কিন্তু পুনর্ব্বার স্কন্ধে জোড়া লাগিয়া গেল। পুনরায় যুদ্ধ চলিল। পৃথিবী রসাতলে যায় দেখিয়া ঈশ্বর অর্দ্ধশ্রীকৃষ্ণ-পয়গম্বর বেশে আবির্ভূত হইয়া দুইজনকে ঠাণ্ডা করিলেন এবং পুনরায় তাঁহাদের মধ্যে সৌহার্দ্দ্য সংস্থাপন করিয়া দিলেন।

কবি কৃষ্ণরাম ভণে, দুই সিংহ যেন রণে, কারে না করিহ অল্পবোধ।
শুন অপরূপ কথা, ঈশ্বর আসিয়া তথা উত্তরিলা ভাঙ্গিতে বিরোধ ॥
অর্দ্ধেক মাথায় কালা একভাগে চূড়া টালা, বনমালা ছিলম্বিনী হাতে।
ধবল অর্দ্ধেক কায়, অঙ্গ নীলমেঘ প্রায়, কোরাণ পুরাণ দুই হাতে ॥
এইরূপ দরশন পাইয়া যে দুইজন ধরিয়া পড়িল দুই পায়।
তুলিয়া অখিলনাথ বুঝাইয়া হাতে হাত দুইজনে দোস্তানি পাতায় ॥

মিটমাটের সর্ত্ত হইল,

বড় খাঁর মহাকায়, গোরে কেরামত তায়, হইবে লোকের কাম ফতে।
যেখানে পীরের নাম বানান মোকাম থান যত ফয়তালা নাম হতে ॥
মায়ামুণ্ড এইরূপ দক্ষিণ দেশের ভূপ পূজা করিবেক যত জন।
বারা তার রক্ষে যাবে, হইবে ঠাঁই ঠাঁই তবে কোন খানে মূরতি সকল ॥

১। অর্থাৎ টুপী।

এখানে দক্ষিণ রায়[১] সব ভাটী অধিকার, হিজলীতে কালুরায় থানা।
সর্ব্বত্র সাহেব পীর সবে নোয়াইবে শির, কেহ তাহে না করিবে মানা॥
এত বলি অন্তর্ধান হইলেন ভগবান্, কাহার শকতি মায়া বুঝে।
অলঙ্ঘ্য তাঁহার বাণী, নরে ঘরে ঘরে জানি তদবধি এইরূপ পূজে॥

এই কাহিনী শুনিয়া পুষ্পদত্ত সেখান হইতে ডিঙ্গা ছাড়িল, তাহার পর "ছত্রভোগে পহুঁছিয়া ত্রিপুরা ভবানীর পুজা করিয়া মগরা অতিক্রম পূর্ব্বক গঙ্গাসাগরে উপনীত হইলেন। এখানে প্রসঙ্গতঃ সগরবংশধ্বংস ও গঙ্গার উৎপত্তি-কথার বর্ণনা আছে। তৎপরে উড়িষ্যার কূলে আসিলে প্রসঙ্গতঃ জগন্নাথের কথাও হইল। তৎপরে রামেশ্বরে পহুঁছিয়া প্রসঙ্গতঃ রামায়ণও হইল।" পুষ্পদত্ত সমুদ্রের মধ্যে রায়ের আশ্চর্য্য মহিমা প্রত্যক্ষ করিলেন। শেষে তুরঙ্গ সহরে উপস্থিত হইলেন।

তাহার পর নগরের বর্ণনা—

চৌহরা বাজার দেখে অনেক দোকান। পুরুষ রমণী কাম রতির সমান॥
যোগসিদ্ধ যোগিগণ আছে যোগাসনে। বিভূতিভূষণ বিনে অন্য নাহি জানে॥
... ...
অবিলম্বে উত্তরিল রাজার নগরে। বালকে ফারসী পড়ে আখন হুজুরে॥
সোনার কলম কাণে দোয়াতি সম্মুখে। কিতাবৎ নিপুণ কায়স্থগণ লেখে॥

ইহার পর পুঁথি খণ্ডিত।

দক্ষিণরায় ও বড় খাঁ গাজীর ব্যাপার হইতে মনে হয় যে কাহিনীর এই অংশ-টুকুতে কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার আভাস রহিয়া গিয়াছে। চব্বিশ পরগনার দক্ষিণ অঞ্চলে সুন্দরবনে আবাদ পত্তন করিবার সময় কখনো কি কোন হিন্দু ও মুসলমান দলপতির মধ্যে বিবাদ হইয়াছিল?

রায়মঙ্গলে কবিত্বের পরিচয় কিছু নাই। কাব্যটির গৌরব সম্পূর্ণভাবে বিষয়বস্তুর জন্য।

[১] অর্থাৎ দক্ষিণরায়ের।

পঞ্চত্রিংশ পরিচ্ছেদ

শিবায়ন ও শিবমাহাত্ম্য কাব্য

শিবমাহাত্ম্যগীতি বাঙ্গালা সাহিত্যে পূর্ব্বাপর প্রচলিত ছিল। মনসামঙ্গল ও চণ্ডীমঙ্গল কাব্যে প্রকারান্তরে শিবমাহাত্ম্য বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু স্বতন্ত্রভাবে রচিত শিবমাহাত্ম্য কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে পাওয়া যায় নাই। এই শতাব্দীতে রচিত অন্ততঃ দুইটি এইজাতীয় কাব্য পাওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে একটি পৌরাণিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত শিবচতুর্দ্দশী-মাহাত্ম্যব্যঞ্জক কাব্য, অপরটি যথার্থ শিবায়ন কাব্য।

"দ্বিজ" রতিদেবের মৃগলুব্ধ[1] ১৫৯৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৭৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়, অন্ততঃ ঐ সালের ২৭শে কার্ত্তিক বৃহস্পতিবার কাব্য রচনা আরম্ভ হয়।

রস অঙ্ক বায়ু শশী শাকের সময়।[2] তুলা মাসে সপ্তবিংশতি গুরুবার হয়॥
মৃগলুব্ধ পোথারম্ভ মহাদেবের পায়ে। ভব তরিবার হেতু রতিদেবে গায়ে॥
পৃ ২॥

কবির জন্মস্থান ছিল চাটিগ্রামে চক্রশালা পরগনার (অধুনা পটিয়া চাকলা) অন্তর্গত সুচক্রদণ্ডী গ্রাম। এই গ্রাম পটীয়া গ্রামের পাশে। কবির পিতার নাম গোপীনাথ, মাতার নাম মধুমতী (পাঠান্তর 'বসুমতী')। কবির দুই জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ছিলেন, রাম ও নারায়ণ। কবির শাশুড়ীর নাম অন্নপূর্ণা, শ্বশুরের নাম মহেশ (পাঠান্তর 'শঙ্কর')। গুরুর নাম মোক্ষদাঠাকুর। কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

পিতা গোপীনাথ বন্দম মাতা মধুমতী। জন্মস্থল সুচক্রদণ্ডী চক্রশালা খ্যাতি॥

১। শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৩২২)। দুইখানি আধুনিক (১২০৩ ও ১২১৬ মঘী সনে অনুলিখিত) পুঁথি অবলম্বনে গ্রন্থটি সম্পাদিত হইয়াছে। অপর একটি পুঁথির পরিচয় নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় দিয়াছেন [ব সা-প-প ৪, পৃ ৩৩২]। এটি কোথাকার পুঁথি? ২। পাঠান্তর 'রস অঙ্ক রবি শশী শাকের সময়।' 'রবি' পাঠ ভ্রান্ত বলিয়া মনে হয়।

জ্যেষ্ঠ দুই ভাই বন্দম রাম নারায়ণ। ধরণী লোটাইয়া বন্দম যত গুরুজন ॥
অন্নপূর্ণা শাশুড়ী বন্দম মহেশ শ্বশুর। মন্ত্রগুরু দয়াশীল মোক্ষদাঠাকুর ॥ পৃ ৪-৫ ॥

কাব্যের বিষয়বস্তুর সূচী দিতেছি। শিববন্দনা, গ্রন্থানুবাদ, গ্রন্থরচনারম্ভকাল, দেবদেবীবন্দনা, আত্মপরিচয়, মধুকৈটভবধ, দেবী কর্ত্তৃক শিবের স্তুতি, শিবকর্ত্তৃক দেবীকে এক উত্তম ব্রতের বিধান কথন, লিঙ্গপূজার উৎপত্তি, দক্ষযজ্ঞনাশ ও দেবীর মৃতদেহ স্কন্ধে শিবের ভ্রমণ, শিবকর্ত্তৃক মুনিপত্নীলঙ্ঘন, মুনির শাপে শিবের লিঙ্গভ্রংশ, ভ্রষ্ট লিঙ্গের প্রভাব, লিঙ্গপূজা প্রবর্ত্তন, শিবকর্ত্তৃক শিবরাত্রি ব্রত কথন, দেবীর ব্রত আচরণ, মর্ত্ত্যলোকে ব্যাধের দ্বারা এই ব্রত প্রচার, মুচুকুন্দ ও রুক্মিণীর কথোপকথনে ব্যাধের কাহিনী বর্ণন, বিদ্যাধর চিত্রসেনের শাপ ও মর্ত্ত্যলোকে বিন্ধ্যপর্ব্বতে ব্যাধরূপে জন্মগ্রহণ, শিবচতুর্দ্দশী রাত্রে বনে অকস্মাৎ শিলা-বৃষ্টি, ব্যাধের বিল্ববৃক্ষে আরোহণ ও পত্র ছিঁড়িয়া ভূতলে নিক্ষেপ, জলবিন্দুযুক্ত বিল্বপত্রে বৃক্ষতলস্থিত শিবলিঙ্গের তৃপ্তি, প্রভাতে ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক পশুশব্দজ্ঞানলাভ ও অন্তে কৈলাসপ্রাপ্তি বর দান, ব্যাধের গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন, পর দিন ব্যাধের জালে হরিণ বদ্ধ, হরিণীর বিলাপ, হরিণ হরিণীর উক্তিপ্রত্যুক্তি, ব্যাধের প্রতি হরিণীর উক্তি, হরিণীর নিকট ব্যাধের ধর্ম্মকথা (পাপ পুণ্যাদির ফলাফল) জিজ্ঞাসা ও শ্রবণ, ব্যাধকর্ত্তৃক হরিণ মোচন ও তাহাদের নিকট ক্ষমা ভিক্ষা, হরিণ ও হরিণীর শাপমুক্তি ও স্বর্গগমন, হরিণীর উপদেশে ব্যাধকর্ত্তৃক চন্দ্রভাগা নদীতীরস্থ বিল্ববৃক্ষমূলে অবস্থিত শিবলিঙ্গ পূজা, পূজক ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক অপমান ও প্রহার, ব্যাধের কাতরোক্তিতে ব্রাহ্মণের দয়া, ব্যাধকে শুচি হইয়া বিধানমত পূজা করিতে উপদেশ, শিব সদয় হইয়া নন্দীকে পাঠাইলেন ব্যাধকে কৈলাসে আনিতে, সপরিবার ব্যাধের কৈলাস যাত্রা, শিবদূত ও যমদূতে যুদ্ধ, যমদূতের পরাজয়, ধর্ম্মরাজ কর্ত্তৃক শিবের নিকট অনুযোগ, ব্যাধ উপবাসী থাকিয়া শিবরাত্রিতে শিবলিঙ্গের উপর সজল বিল্বপত্র দিয়াছিল এই পুণ্যে তাব পাপক্ষয়, ধর্ম্মরাজের সন্তোষ, মুচুকুন্দ রাজা ও রুক্মিণী মহিষীর চন্দ্রভাগাতীরে গমন ব্যাধপূজিত শিবলিঙ্গ পূজা করিতে, শিবপূজা, প্রজাগণ সহিত রাজা ও রাণীর কৈলাস গমন ও হরগৌরীর বন্দনা স্তুতি, শিব রাজাকে কৈলাসে রাজা করিয়া দিলেন, গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি।

মৃগলুব্ধ কাব্যটি ছোট ; ইহাতে অনধিক ৯০০ পয়ার শ্লোক আছে। হরিণীর ধর্ম্মকথা অংশই কাব্যটির বেশী স্থান অধিকার করিয়াছে। কবি ভক্ত ছিলেন ; আর রচনাও বেশ সরল এবং স্থানে স্থানে মধুর। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া গেল।

ব্যাধের ফাঁদে হরিণ ধরা পড়ায় হরিণী বিলাপ করিতেছে,

আজু কালরাত্রি প্রভু পোহাইল তোহ্মার। দারুণ ব্যাধের হাতে হইলা সংহার ॥
চৈতন্য লভহে[১] প্রভু ঘরে চলি যাই। কি জানি কপালে আজি লেখিছে গোসাঁই ॥
সম্মতি না দেহ কেনে অয়ে প্রাণেশ্বর। আহ্মা ছাড়ি কোথায়ে যাও শূন্য একেশ্বর ॥
তুহ্মি বিনে কে পালিব বাল্য শিশুগণ। তোহ্মার মরণে আজি সবের মরণ ॥
প্রভুরে লইয়া কোলে মৃগী সুবদনী। মুখে মুখ দিয়া কাঁদে আঁখির পড়ে পানী ॥
উজ্জ্বল মন্দির মোর অন্ধকার করি। অকস্মাৎ কোন বিধি লৈয়া যায়ে হরি ॥
কেবা হরি নিল মোর পূর্ণিমার চান্দ। সোণার শরীর প্রভু কেবা নিল বান্ধ ॥
আহ্মার পোহাইল যেন আজু কালরাতি। কাল ব্যাধের হাতে বন্দী হইল প্রাণপতি ॥
পৃ ৩৫-৩৬ ॥

কবির ভণিতার কিছু নমুনা প্রদত্ত হইল।

হরগৌরীপাদপদ্মে বন্দিয়া সানন্দে।
দ্বিজ রতিদেব গাহে পাঞ্চালীর ছন্দে ॥

অথবা,

আহ্মার মাথাটি খাও, বোল দিয়া ঘরে যাও, মৈলে আর নাই দরশন।
দিয়ার[২] মেলানি মোরে, এড়ি যাইতে প্রাণী পোড়ে, গোপীনাথ-সুতে বিরচন ॥
ইত্যাদি।

মুদ্রিত মৃগলুব্ধের পরিশিষ্টে মনসার ধূপাচার বলিয়া যে ৪৩ পয়ার শ্লোকাত্মক কবিতাটি মুদ্রিত হইয়াছে তাহা এই "দ্বিজ" রতিদেবের হইতেও পারে।

রামরাজ বা রামরাজা বিরচিত মৃগলুব্ধ বা মৃগলুব্ধ-সংবাদ[৩] বিষয়বস্তুতে দ্বিজ রতিদেবের কাব্যের অনুরূপ। তবে ইহাতে লিঙ্গপূজাপ্রবর্ত্তন আখ্যানটি নাই।

১। পাঠ 'লভয়ে' ২। ঐ 'দিআরে'।

৩। শ্রীযুক্ত মুন্সী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত এবং বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৩২২)। একটি পুঁথির লিপিকাল ১১৪২ মঘী সন।

ভাষায় এবং ভাবে উভয় কাব্যে বিশেষ ঐক্য আছে।[১] কবিরা কে কাহার নিকট ঋণী তাহা স্থির করা দুঃসাধ্য। হয়ত উভয়েই কোন তৃতীয় কাব্য হইতে অনুপ্রেরণা পাইয়াছিলেন।

ভণিতাতে যে নাম পাওয়া যায় তাহা ছাড়া কবির অন্য কিছু পরিচয় পাওয়া যায় নাই। ভণিতা এইরূপ—

শঙ্করকিঙ্কর শিশু রামরাজে গায়।
মৃগলুব্ধ গাইল প্রথম অধ্যায়।[২]

শঙ্করকিঙ্কর রামরাজা ভণে।
দ্বিতীয় অধ্যায় নরকলক্ষণে॥ ইত্যাদি।

রামরাজার স্থলে 'রাম রায়' পাঠও পাওয়া যায়। গ্রন্থে কবির প্রকৃত নাম কি 'রাম রায়' বা 'শিশুরাম রায়' ছিল? শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহেব অনুমান করেন যে "কবি রামরাজ কোন বড়ুয়া মগ বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন," কেননা "সাধারণতঃ চট্টগ্রামের বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী বড়ুয়া মগদের মধ্যেই নামের সহিত 'রাজা' শব্দের ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অধিক দেখা যায়।"[৩]

ভাষায় ও কবিত্বে রামরাজার কাব্য রতিদেবের কাব্য হইতে নিকৃষ্ট। উদাহরণ হিসাবে হরিণীর বিলাপ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

কেমন দিবসে প্রভু আইলা এই বনে। পাপিষ্ঠ ব্যাধের হাতে হারাইলা জীবনে॥
চরণে পড়িয়া প্রভু করম কাকুতি। উঠ উঠ প্রাণনাথ দেহ যে সম্মতি॥
যখনে শুনিলুম প্রভু বিপরীত রাও। তখনে জানিলুম মোর বুকে দিল ঘাও॥
উঠ উঠ অয়ে প্রভু চলি যাই ঘর। অখনে আসিব ব্যাধ যমের দোসর॥ পৃ ৩০

চট্টগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি তৃতীয় মৃগলুব্ধ কাব্যের কিঞ্চিৎ পরিচয় শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহেব সংগ্রহ করিয়াছেন।[৪] কবির নাম জানা নাই। পুঁথিটি প্রাচীন অক্ষরে লেখা, পুরাতন ও জীর্ণ। পত্রসংখ্যা ১৬, উভয় পৃষ্ঠে লেখা। কাব্যের আরম্ভ এইরূপ—

। ভূমিকা, পৃ ৬-১১। ২। পাঠান্তর 'মৃগলুব্ধ সম্বাদের প্রথম অধ্যায়'।
। ভূমিকা, পৃ ২-৩। ৪। বা-প্রা-পু-বি ১-১ পৃ ১৩৪ ৩৫; মৃগলুব্ধসংবাদ ভূমিকা, পৃ ১২-১৪।

রাম রাম প্রভু রাম জীবের জীবন। কৃপা কর দীনবন্ধু লইলুম শরণ ॥
শুন শুন সর্ব্বলোক হইয়া একত্রিত। মৃগলুব্ধ শুনি হয়ে শরীর পবিত্র ॥

কবিচন্দ্রের শিবমঙ্গল বা শিবায়ন কাব্য মল্লাবনীমহীন্দ্র বীরসিংহের রাজ্যকালে রচিত হয়।

বীরসিংহ মহারাজা অবনীতে মহাতেজা,
সদা মতি ইষ্টের চরণে।
সংকীর্ত্তন-অভিলাষী তাহার দেশেতে বসি
দ্বিজ কবিচন্দ্র রস ভণে ॥[১]

বীরসিংহের রাজ্যকাল ১৬৫৬ হইতে ১৬৮২ খ্রীষ্টাব্দ। কবি এই রাজ্যকালের শেষের দিকে কোন সময়ে শিবায়ন কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। "কবিচন্দ্র" সম্ভবতঃ মল্লরাজসভাকবির উপাধি ছিল। পরবর্ত্তীকালে রঘুনাথ সিংহের ও গোপাল সিংহেব সভায় যে কবিচন্দ্রকে পাই তাঁহার নাম শঙ্কর চক্রবর্ত্তী। উভয় কবিচন্দ্র এক হওয়া সম্ভবপর নহে।

১। কবিচন্দ্রের ভাগবতামৃত শ্রীযুক্ত মাখনলাল মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত (১৩৪১) ভূমিকা, পৃ ।৶৹।

ষট্‌ত্রিংশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি ও ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য

ধর্ম্মপূজা বাঙ্গালাদেশে কোন সময় হইতে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে তাহা নিশ্চিত করিয়া বলা দুষ্কর। পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ব্বে ধর্ম্মপূজার কোন উল্লেখ বা বিবরণ বাঙ্গালা সাহিত্যে পাওয়া যায় নাই। ১৪৯৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত বিপ্রদাসের মনসামঙ্গলে ধর্ম্মকর্ত্তৃক জগৎসৃষ্টির বিবরণ পাওয়া যায়। অনুরূপ বিবরণ আছে মাণিক দত্তের চণ্ডীমঙ্গলে এবং বিষ্ণু পালের মনসামঙ্গলে। মাণিক দত্ত এবং বিষ্ণু পালের সময় জানা নাই। ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত চণ্ডীমঙ্গল-মনসামঙ্গলাদি কাব্যে শুধু ধর্ম্মঠাকুরের বন্দনা পাওয়া যায়।

ধর্ম্মপূজাবিষয়ক কোন গ্রন্থই সপ্তদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত নহে, তবে শূন্যপুরাণ নামে প্রকাশিত ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিজাতীয় গ্রন্থের দুই একটি ষোড়শ শতাব্দীর কিংবা পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগের রচনা হইলেও হইতে পারে। এই গ্রন্থগুলি স্থূলতঃ দুই শ্রেণীতে পড়ে—(১) রামাই পণ্ডিতের কাহিনী-সংবলিত ধর্ম্মপূজার ইতিহাস বা পদ্ধতি, অর্থাৎ "ধর্ম্মপুরাণ" এবং (২) ধর্ম্মঠাকুরের অনুগৃহীত ভক্ত লাউসেনের কাহিনী।

ধর্ম্মপূজার প্রথম প্রবর্ত্তক বলিয়া উল্লিখিত রামাই পণ্ডিতের ব্যক্তিত্ব এবং কাল লইয়া অনেকে আলোচনা করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন রামাই ১০০০ খ্রীষ্টাব্দের লোক। আবার কেহ বলেন ১৫০০ খ্রীষ্টাব্দের লোক। এ বিষয়ে কোনই মীমাংসা হয় নাই, এবং হওয়াও সম্ভব নয়। রামাই পণ্ডিতের কাহিনীর যদি কিছু ঐতিহাসিকত্ব থাকে তবে তাহা উচ্চগ্রামের হোমিওপ্যাথিক মাত্রায়; তাহা হইতে ইতিহাস গঠন করা যায় না, উপন্যাসের পরিকল্পনা হইতে পারে।

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয়ের সম্পাদকতায় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক ১৩১৪ সালে "শূন্যপুরাণ" নামে যে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা এযাবৎ বাঙ্গালা

ভাষার একটি প্রাচীনতম পুস্তক এবং রামাই পণ্ডিতের রচনা বলিয়া চলিয়া আসিতেছে।[১] শূন্যপুরাণের প্রথম পরিচয় দেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়।[২] ইনি যে পুঁথি পাইয়াছিলেন তাহা ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি। শূন্যপুরাণ তিনটি পুঁথির পাঠ মিলাইয়া প্রস্তুত হইয়াছে। পুঁথি তিনটির কোনটিতেই গ্রন্থের কোন নাম নাই। "শূন্যপুরাণ" নাম সম্পাদকপ্রদত্ত। এই কল্পনাপ্রসূত নামটি অনেককেই ভ্রান্ত পথে পরিচালিত করিয়াছে ও করিতেছে। প্রথমতঃ গ্রন্থটি—যথার্থপক্ষে পুঁথিগুলি—কোন ধর্ম্মঠাকুরের পুরোহিত বা পুরোহিতগণের পদ্ধতি বা সংগ্রহ গ্রন্থ, কোন মতেই পুরাণ নহে। শুধু এক আঁখরে সৃষ্টিতত্ত্ব এবং আধ আঁখরে ধান ও ছাগলের উৎপত্তির কাহিনী থাকিলেই যদি কোন পুঁথিকে পুরাণ বলিতে হয় তবে পুরাণের সংখ্যা অষ্টাদশ সহস্রেরও অধিক হইয়া যায়। গ্রন্থটির কোন নাম যদি দিতেই হয়, তবে দেওয়া উচিত "রামাই পণ্ডিতের কড়চা।"

এখন প্রশ্ন উঠে গ্রন্থটি কাহার রচনা? প্রায় সব গান বা ছড়াগুলিতে রামাই পণ্ডিতের ভণিতা আছে, সুতরাং রামাই পণ্ডিতের রচনা বলিলে বিশেষ দোষ হয় না। এখন এই রামাই কে? ছড়াগুলির মধ্যে ভণিতা-অতিরিক্ত স্থলেও প্রায়ই রামাই পণ্ডিতের উল্লেখ আছে। এরূপস্থলে রচয়িতার পক্ষে নিজেকে সর্ব্বদা প্রথম-পুরুষে উল্লেখ করা অযৌক্তিক, সুতরাং আদি রামাইকে বাদ দিতে হয়। ভণিতা-গুলিতে প্রায়ই "শ্রীযুত রামাই" এইরূপ উল্লেখ আছে। গ্রন্থকারের পক্ষে কোন কালেই ভণিতায় নিজনামে "শ্রীযুক্ত" যোগ করা শোভন নহে এবং এইরূপ প্রয়োগ অন্যত্র নাইও। অতএব সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে ভণিতাগুলি কৃত্রিম, পরবর্ত্তী কোন লেখক বা পূজকের যোজনা। কতকগুলি পদে বা ছড়ায় আবার ভণিতাও নাই।

শূন্যপুরাণের ভণিতা বিচার করিয়া শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় পাঁচটি বিভিন্ন কবির হস্তাবলেপের উদ্দেশ পাইয়াছেন। তিনি আরও মনে করেন যে এই রচনাগুলি কাল হিসাবে তিন পর্য্যায়ে পড়ে, প্রথম পর্য্যায় ত্রয়োদশ-চতুর্দ্দশ শতাব্দী, দ্বিতীয় পর্য্যায় পঞ্চদশ-ষোড়শ শতাব্দী, তৃতীয় পর্য্যায় সপ্তদশ-অষ্টাদশ

১। বসুমতী সাহিত্য মন্দির হইতে শূন্যপুরাণের এক অভিনব সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছে।
২। ব সা প-প ৪, পৃ ৬০-৬৮।

শতাব্দী।[১] বিদ্যানিধি মহাশয়ের এই কালবিশ্লেষণ অনুমানের উপরে উঠে না। তবে একাধিক কবির বা পূজকের রচনা যে শূন্যপুরাণের মধ্যে গ্রথিত হইয়াছে তাহা বইখানির পাতা উল্‌টাইলে বুঝিতে বিলম্ব হয় না।

শূন্যপুরাণের ভাষা খুব প্রাচীন এইরূপ একটা প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে শূন্যপুরাণের ভাষার প্রাচীনত্ব দুইটি মাত্র বিভক্তিতে আসিয়া ঠেকে, "-বাক" প্রত্যয়ান্ত তুমর্থ ভাববচন ও "অন্তি, -অন্ত, -আন্ত" বিভক্ত্যন্ত প্রথম পুরুষের পদ। কিন্তু এই "প্রাচীনত্বজ্ঞাপক" বিভক্তিগুলি সপ্তদশ শতাব্দীর রচনাতেও যথেষ্ট দেখা যায়। "-কর" বিভক্ত্যন্ত ষষ্ঠীবিভক্তির পদগুলি মূলে "-কের" বিভক্ত্যন্ত ছিল। "-এর" যেরূপ "-র" হইয়াছে, "-কের" সেইরূপ "-কর" হইয়াছে! এই "-কের" বিভক্তি ষোড়শ-সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনায় অনেক পাওয়া যায়। শূন্যপুরাণের ভাষা বিচার করিতে গেলে প্রথমেই মনে করিতে হইবে যে, দুই স্বরের পরবর্ত্তী য়-কার লোপ করিলে এবং ষ-কার ও শ-কারের স্থলে স-কার বসাইলে কিছু ভাষা প্রাচীন হইয়া যায় না।

রামাই পণ্ডিত রচিত (পূজাপদ্ধতি ?) গ্রন্থের কথা ঘনরাম একস্থলে বলিয়াছেন। রামাইয়ের গ্রন্থ না দেখিলেও বোধ হয় জনশ্রুতিতে ইহার অস্তিত্ব অবগত ছিলেন।

তবে রঞ্জাবতী বলে করি নিবেদন।
পণ্ডিত গোঁসাই গ্রন্থে কহিল যেমন॥ পৃ ৩১॥

শূন্যপুরাণ সাহিত্যের শ্রেণীতে পড়ে না, সুতরাং গ্রন্থের অধিক পরিচয় দেওয়া নিষ্প্রয়োজন। নানাদিক দিয়া কৌতুককর বলিয়া "নিরঞ্জনের রুষ্মা[২]" অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। এই অংশটি কেবল একটি পুঁথিতেই ছিল। ১৭৩৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত সহদেব চক্রবর্ত্তীর অনিলপুরাণে এটি আছে। সুতরাং ইহা সহদেব চক্রবর্ত্তীর রচনা হওয়া কিছুমাত্র অসম্ভব নহে,। ভাষাও অর্ব্বাচীন। অপপাঠের দরুন অনেক স্থলে মর্ম্মগ্রহণ দুরূহ।

জাজপুর পুরবাসী[৩] যোল শঅ ঘর বসি[৪]
বসিল যে কেবল দুর্জ্জন[৫]।

১। ব-সা-প-প ৩৮, পৃ ৯২-৯৩। ২। উষ্মা, ক্রোধ। ৩। পাঠ 'পুয়বাদি'।
৪। ঐ 'বেদি'। ৫। 'বেদি লয় কন্নয় যুন'।

দক্ষিণা মাগিতে যায়, যার ঘরে নাহি পায়
শাপ দিয়া পোড়ায় ভুবন ॥
মালদহে লাগে কর, না চিনে আপন পর,
জালের নাহিক দিশপাশ।
বলিষ্ঠ হইল বড়, দশবিশ হইয়া জড়
সদ্ধর্ম্মীরে করয়ে বিনাশ ॥
বেদ করে উচ্চারণ বাহিরায়[১] অগ্নি ঘনে ঘন
দেখিয়া সভাই কম্পমান।
মনেত পাইয়া মর্ম্ম সভে বোলে রাখ ধর্ম্ম,
তোমা বিনা কে করে পরিত্রাণ ॥
এইরূপে দ্বিজগণ করে সৃষ্টিসংহরণ,
ই বড় হইল অবিচার।
বৈকুণ্ঠে থাকিয়া[২] ধর্ম্ম মনেতে পাইয়া মর্ম্ম
মা াতে হইল অন্ধকার[৩] ॥
ধর্ম্ম হইলা যবনরূপী, মাথায়ে ত কাল টুপি,
হাতে শোভে ত্রিকচ[৪] কামান।
চাপিয়া উত্তম হয়, ত্রিভুবনে লাগে ভয়,
খোদায় বলিয়া এক নাম ॥
নিরঞ্জন নিরাকার হৈলা ভেস্ত অবতার,
মুখেত বলয়ে দম্বদার[৫]।
যতেক দেবতাগণ সভে হয়্যা একমন
আনন্দে ত পরিল ইজার ॥
ব্রহ্মা হৈল মহামদ, বিষ্ণু হৈল পেগাম্বর,
আদম্ফ হইল শূলপাণি।
গণেশ হইল গাজী, কার্ত্তিক হইল কাজী,
ফকির হইল যত মুনি ॥

১। পাঠ 'বেরাাঅ'। ২। ঐ 'ডাকিয়া'।
৩। প্রকৃত পাঠ সম্ভবত 'খোন্দকার'। পর পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।
৪। পাঠ 'ত্রিরূচ'। ৫। অর্থাৎ 'দম্‌মাদার' (পীরের নাম)।

তেজিয়া আপন ভেক নারদ হইলা শেখ,
পুরন্দর হইল মলনা[১]।
চন্দ্র সূর্য্য আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সেবে,
সভে মিলি বাজায় বাজনা ॥
আপনি চণ্ডিকা দেবী তিঁহ হৈলা হায়া বিবি,
পদ্মাবতী হৈল বিবি নূর।
যতেক দেবতাগণ হয়্যা সভে একমন
প্রবেশ করিল জাজপুর ॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে, কাড়্যা ফিড়্যা খায় রঙ্গে,
পাখড় পাখড়[১] বোলে বোল।
ধরিয়া ধর্ম্মের পায় রামাঞি পণ্ডিত গায়
ই বড় বিষম গণ্ডগোল ॥[২]

বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির ৫৪৩৮ সংখ্যক পুঁথি অবলম্বনে শ্রীযুক্ত ননীলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদকতায় বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক ১৩২৩ সালে ধর্ম্মপূজাবিধান নামে যে গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে তাহাতে 'রাম', 'পণ্ডিত রাম', 'রামাঞি', 'রামাঞি পণ্ডিত' ইত্যাদি ভণিতায় কতকগুলি ছড়া পাওয়া যাইতেছে। এই ছড়ার অনেকগুলি শূন্যপুরাণ নামে মুদ্রিত পুস্তকেও পাইতেছি। একটি ছড়াতে "নিরঞ্জনের রুষ্মা" কবিতাটির রূপান্তর পাওয়া যাইতেছে। এখানে ছড়াটির নাম "কলিমা জালাল।" ছড়াটি এইরূপ—

জাজপুর পূয়বাদি সোল শয় ঘর ভেদি বেদি লয় কেবল দুর্জ্জন।
দক্ষিণা মাগিতে জান জার ঘরে নাঞি পান সাঁপ দিয়া পোড়ান ভুবন ॥
বেদে করি উচ্চারণ মাল জাঠ্যাল্যা গগন জলের জাম্বুক অধিবাস।
কৈলাস তেজিয়া ধর্ম্ম অন্তরে জানিয়া মর্ম্ম মায়ারূপে হৈল খনকার ॥
হইয়া যবনরূপী শিরে নিল কাল টুপি হাথে শোভে ত্রিকচ কামান।
চাপিয়া উত্তম হয় ত্রিভুবনে লাগে ভয় খোদায় হইল এক নাম ॥

১। অর্থাৎ পাকড়াও পাকড়াও।
২। বঙ্গীয় রয়াল এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি ৫৪২৪; শূন্যপুরাণ, পৃ ১৪০-৪২

বিষ্ণু হল্যা পয়গম্বর ব্রহ্মা হল্যা পাকাম্বর মহেশ হইল বাবা আদম।
কার্ত্তিক হইলা কাজী গণেশ হইল গাজী ফকির হইল মুনিগণ॥
ছাড়িয়া আপন ভেক নারদ হইলা শেক পুরন্দর হইল মলনা।
ব্রহ্মা বিষ্ণু আদি দেবে পদাতিক হয়্যা সভে উচ্চস্বরে বাজায় বাজনা॥
দেখিয়া চণ্ডিকা দেবী তিহোঁ হৈলা হাওয়া বিবি পদ্মা হইলা বিবি নূর।
যতেক দেবতাগণ করিল দারুণ পণ প্রবেশ করিলা জাজপুর॥
দেউল দেহারা ভাঙ্গে কাড়্যা ফেড়্যা খায় রঙ্গে পাখড় পাখড়' বলে বোল।
সেবিয়া ধর্ম্মের পায় শ্রীরাম পণ্ডিত গায় ই বড় কৌতুক গণ্ডগোল॥

পৃ ২১৯-২০॥

অশ্বমেধ যজ্ঞে যেমন হোতা ও অধ্বর্য্যুর মধ্যে 'ব্রহ্মোদ্য' হইত এবং মহাভারতে বক যুধিষ্ঠির সংবাদে যেরূপ পাইতেছি, ধর্ম্মঠাকুরের পূজাতেও পাটভক্ত্যা (?) ও ধর্ম্মাধিকরণিকের মধ্যে সেইরূপ বাকোবাক্য বা উত্তরপ্রত্যুত্তর হইত। ধর্ম্ম-পূজাবিধানে এইরূপ কয়েকটি উক্তিপ্রত্যুক্তি পাওয়া যাইতেছে। যেমন—

[উক্তি]

বাড় কোথা পণ্ডিতের কোন দেব ভজ। কোন মূর্ত্তি ধ্যান কর কোন দেব পূজ॥
কোন মুখে পূজা কর কোন বেদ পড়। শীঘ্রগতি কহিলাম চাতুরালি ছাড়॥
কোথা পা[ই]লে তাম্রবালা কেবা দিল করে। কিরূপে জন্মিল তামা কহ না আমারে॥

[প্রত্যুক্তি]

বাড়ি মোর বল্লুকায়। পূজি শ্রীনৈরাকার॥
শূন্য মূর্ত্তি ধ্যান করি। সাকার মূর্ত্তি ভজি॥
পূর্ব্বমুখে পূজা করি পঞ্চম বেদ পড়ি। শীঘ্রগতি কহিলাঙ চাতুরালি ছাড়ি॥
বিশ্বকর্ম্মা এই তাম্র করিলা নির্ম্মাণ। এ কথা কহিলাঙ আমি তব বিদ্যমান॥

পৃ ১৬৫॥

[উক্তি] তাঁত্যেতে ফুড়িল তুলা তাঁতি ভাতাইল মাড়ে।
কিসে শুদ্ধ হল্যে ভক্তা মাড় কর‍্যা কান্ধে॥

[প্রত্যুক্তি] সাবিত্রী কাটিল সুতা বিশ্বকর্ম্মার নির্ম্মাণ।
তে কারণে বস্ত্র কান্ধে পূজা করি নিরঞ্জন ॥ পৃ ১৬৮ ॥
[উক্তি] অম্বুলিপ্তমৎস্যানাং গাবী-আমিষ গোরসং।
ক্ষিতি-আমিষ লবণং কথং ভক্তা নিরামিষঃ ॥
[প্রত্যুক্তি] বায়ুনা[১] শুদ্ধিতং তোয়ং আত্মনা শুদ্ধিতং পয়ঃ।
রজসা শুদ্ধিতা নারী তেন ভক্তা নিরামিষঃ ॥ পৃ ১৬৮ ॥
[উক্তি] তিল প্রমাণ দেউল আকাশ প্রমাণ দে[২]।
কোথা থুবে ফুলের সাজি কোথা পূজিবে দেব ॥
[প্রত্যুক্তি] হউ[৩] না তিল প্রমাণ দেউল আকাশ প্রমাণ দে।
হৃদয়ে থুব ফুলের সাজি ভাবে পূজিব দেব ॥ পৃ ১৬৯ ॥

ধর্ম্মপূজাপদ্ধতিতে একটি সূর্য্যের ছড়া এবং একটি শিবের ছড়াও রহিয়াছে। শিবের ছড়াটিতে শিবের চাষ ও ধানের উৎপত্তি বর্ণিত হইয়াছে [পৃ ২২৭-৩৭]। সূর্য্যের ছড়াটি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

অশোক পলাশ গোসাঞি মহুলের পাত।
স্নান সন্ধ্যা করেন গোসাঞি চম্পানদীর ঘাট ॥
উদয় করিলা প্রভু সপ্ত সমুদ্রের পার।
প্রভুর রথে সিন্দূর লাগে নব লক্ষ ভার ॥
হীরা নীলা প্রবাল লাগে মুক্তামণি।
হেন রথে উদয় করেন প্রভু দেব চক্রপাণি ॥
ধবলবর্ণে সপ্ত ঘোড়া সূর্য্যের রথ বহে।
কনকরচিত রথ ত্রিভুবন মোহে ॥
ষোল ফুলে গোসাঞির সাজিল রথখান।
কোন কোন ষোল ফুল বিপ্র তাহার শুন নাম ॥
কেয়া কেতকী পালিধা মন্দার।
অশোক কিংশুক চাঁপা নাগেশ্বর আর ॥

১। পাঠ 'বায়ুর্ণ'। ২। অর্থাৎ দেহ। ৩। পাঠ 'হয়'।

ওড় টগর আর কস্তুর কাঞ্চনপুষ্প পারিজাত।
অখণ্ড দূর্ব্বা কালাতুলসীর পাত॥
শ্বেত উৎপল পুষ্প পুরাণে বাখানি।
হেন রথ সাজিয়া দিল অরুণ-সাহিনী॥
সুবর্ণের বেদি শোভা করে রথের উপর।
হেন রথে উদয় প্রভু ভানু ভাস্কর॥
যোল পাত্র ধরিল গোসাঞির রথের শিকল।
বার আদিত্য তবে বসিলা থরে থর॥
কনকপদ্মের মালা প্রভুর অঙ্গে শোভা করে।
আপনে ইন্দ্ররাজ তুলিয়া ছত্র ধরে॥
যোড়হাথে প্রভুকে পাত্র করেন গোচর।
সকল জীবজন্তুর গোসাঞি চিন্তা কর [দূর]॥
অধনীকে ধন দিহ (গোসাঞি) অপুত্রকে পুত্র দান।
রাজপুত্রকে রাজ্য দেহ (গোসাঞি) ব্রাহ্মণে বিদ্যাদান॥
আর্দ্দাস করেন পাত্র যুড়ি দুই হাথ।
উদয় করিল প্রভু চিন্তামণিনাথ॥
কেহ বলে নিকট কেহ বলে দূর।
ভাবিয়া না পায় যারে দেবতা অসুর॥
হাথে অর্ঘ্য করিয়া দানপতি সূর্য্য পানে চাহে।
সপ্ত-ঘোড়া গোসাঞির রথ অন্তরীক্ষে বহে॥
সূর্য্যাষ্টক কহিল পণ্ডিত সূর্য্য আবাহন।
আশা পূরিয়া বর দিবেন বিরিঞ্চি নারায়ণ॥ পৃ ১২৪॥

রামাই (রমাই) পণ্ডিতের কাহিনী বিষয়ে একাধিক ছড়া ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি-জাতীয় পুঁথিতে পাওয়া যায়। বিনোদবিহারী বিদ্যাবিনোদ মহাশয় এইরূপ একটি ছড়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।[১] ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি পুঁথিগুলি প্রায় সবই দক্ষিণরাঢ়ে ইন্দাস-বিষ্ণুপুর অঞ্চলে রচিত ও প্রাপ্ত।

১। ব-সা-প-প ১৩, পৃ ৮৪-৯১।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের প্রায় সকল কবি পথিকৃৎ বলিয়া ময়ূর ভট্টের উল্লেখ করিয়াছেন।

ময়ূর ভট্টকে বন্দিয়া মস্তকে
সীতারাম দাস গায়॥

শ্রীধর্ম্মের মায়া কহনে না যায়।
ময়ূর ভট্ট বন্দি দ্বিজ রূপরাম গায়॥

ময়ূর ভট্ট বন্দি দ্বিজ ঘনরাম গায়॥

বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট কবি সুকোমল।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে শ্রীধর্ম্মমঙ্গল॥

আছিল ময়ূর ভট্ট সুকবি পণ্ডিত।
রচিল পয়ারছাঁদে অনাদ্যের গীত॥
ভাবিয়া তাঁহার পাদপদ্মশতদল।
রচিল গোবিন্দ বন্দ্য ধর্ম্মের মঙ্গল॥ ইত্যাদি।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় একদা ময়ূর ভট্টের ধর্ম্মমঙ্গলের একখানি পুঁথি পাইয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায়। এই পুঁথিটির এখন আর খোঁজ পাওয়া যায় না। এই পুঁথির যৎকিঞ্চিৎ বিবরণ বীরভূমি পত্রিকায় [আষাঢ়, ১৩০৭] প্রকাশিত হইয়াছিল।

এই পুঁথিটির যে কয়টি পাতা পাওয়া গিয়াছিল তাহার আরম্ভ এবং শেষ যথাক্রমে এই—

মন দিয়া শুন সভে ধর্ম্মপুরাণ।
সকীয় মহিমা শুন হঞা সাবধান॥
যথা তুমি উপনীত তথাই···গীত
তোমা বিনু আনন্দে চঞ্চল।
দ্বিজ ময়ূরভট্ট বঙ্গে ···গায়ন স্কন্ধে
গাই গীত [ধর্ম্মের] মঙ্গল॥

সীতারাম দাসের উক্তি হইতে মনে হয় যে তাঁহার সময়ে ময়ূর ভট্টের কাব্য লোপোন্মুখ হইয়াছিল।

ময়ূর ভট্ট মহাশয়ের সুন্দর পাঁচালী।
আনন্দে (?) হইল নষ্ট দুই এক কলি॥[১]

শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সম্পাদকতায় ১৩৩৭ সালে বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক "ময়ূরভট্ট বিরচিত শ্রীধর্ম্মপুরাণ" নামে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হইয়াছে। "বহু পুরাতন কীটদষ্ট পুস্তক হইতে" ১৩১০ সালে লিখিত অনুলিপিই গ্রন্থটির একমাত্র উপাদান। গ্রন্থের ভাষা সর্ব্বত্র এবং ভাব প্রায়ই উৎকটরূপে আধুনিক। সম্পাদক মহাশয়ও তাহা স্বীকার করিয়াছেন।

আসল কথা, গ্রন্থটি অত্যন্ত অর্ব্বাচীন। ভূমিকার ১।/০—১৷৷০ পৃষ্ঠায় যে সংস্কৃত "ধর্ম্মপুরাণ" হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে, আলোচ্য পুস্তকটি তাহারই আধুনিক অনুবাদ। বসন্তবাবুর সম্পাদিত ধর্ম্মপুরাণের বিষয়ে শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় মহাশয় যাহা বলিয়াছেন তাহা সমীচীন।[২] বিদ্যানিধি মহাশয় বলিয়াছেন "থিয়েটারী ভাষা পড়িয়া নব্য কবির বৃত্তান্ত জানিতে কৌতূহলী হইয়াছিলাম। এই প্রবন্ধ সমাপ্ত হইবার পর জানিতে পারিলাম, পুথীলেখক শ্রীআশুতোষ পণ্ডিত কলিকাতা অঞ্চলে ও আরামবাগে ২।৩ বৎসর করিয়া যাত্রার দলে ছিলেন। এখন (১৩৩৭ সাল) তাঁহার বয়স ৩২ বৎসর। অর্থাৎ তিনি ৫ বৎসর বয়সে "বহু পুরাতন কীটদষ্ট পুস্তক" হইতে "সঞ্জাত খণ্ড" উদ্ধার করিয়াছিলেন। সে "কীটদষ্ট পুস্তক" আর নাই, ছাপা হইয়া গিয়াছে! সে ছাপা পুস্তকে, এই ময়ূরভট্ট। তাঁহার নিবাস গোঘাট থানায় বটে, কিন্তু বদনগঞ্জের তিন মাইল দক্ষিণে ভেউটা বা ভেঙটে গ্রামে। তিনি ডোম পণ্ডিত, বাংলা লেখাপড়া ভাল জানেন, ইস্কুলে ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষা পর্য্যন্ত পড়িয়াছিলেন।"

প্রকাশিত গ্রন্থটি প্রথম অংশ—"সঞ্জাত খণ্ড"—মাত্র। ইহার মধ্যে রামাই পণ্ডিতের এবং হরিশ্চন্দ্রের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। একটা নূতন কাহিনী—

১। বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ৩৫। ২। ব-সা-প-প ৩৮, পৃ ৬৭ পাদটীকা।

স্থানীয় ভূস্বামী রণজিৎ রায়ের কাহিনীও[১] অন্তর্ভুক্ত করা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয়ে গ্রন্থকার বলিতেছেন,

দ্বিতীয় চরিত্র খণ্ড অতি সুললিত।
তাহাতে আছয়ে লাউসেনের চরিত॥ পৃ ১৫১।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের মূল আখ্যায়িকা লাউসেনের কাহিনীর গল্পাংশ দেওয়া গেল। ইহার মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-বলরামের কাহিনীর প্রভাব লক্ষণীয়।

গৌড়েশ্বরের সামন্ত ময়নার অধিপতি কর্ণসেনের পুত্রগণ বিদ্রোহী সামন্ত ঢেকুরের অধিপতি সোম ঘোষের পুত্র দেবী-অনুগৃহীত ইছাই ঘোষকে দমন করিতে গিয়া তাহার হস্তে নিহত হয়। বৃদ্ধবয়সে পুত্রহীন হইয়া কর্ণসেন অশেষ মনস্তাপ ভোগ করিতে থাকে। অতঃপর তাঁহার সহিত গৌড়েশ্বরের শ্যালিকা রঞ্জাবতীর বিবাহ হয়। এই বিবাহ গৌড়েশ্বরের শ্যালক ও মন্ত্রী মাহুদ্যা বা মহামদের আদৌ অভিপ্রেত ছিল না। কর্ণসেন ক্রমশঃ অধিকতর জরাগ্রস্থ হইয়া পড়িতেছেন দেখিয়া রঞ্জাবতী সন্তানলাভে হতাশ হইয়া পড়েন। অবশেষে কঠোর তপস্যা করিয়া ধর্ম্মের আরাধনা করিলেন। ধর্ম্মের বরে পুত্র লাউসেনের জন্ম হইল। লাউসেন শাপভ্রষ্ট দেবতা, পৃথিবীতে ধর্ম্মঠাকুরের মহিমাখ্যাপন করিবার জন্যই মর্ত্ত্যলোকে তাঁহার আগমন।

ভগিনীর পুত্রলাভ হইয়াছে এই বার্ত্তা পাইয়া মহামদ দারুণ ঈর্ষ্যান্বিত হইল, এবং শিশুকে অপহরণ করিয়া আনিবার জন্য চর পাঠাইল। তাহারা শিশুকে অপহরণ করিয়া লইয়া গেল। রঞ্জাবতীর পুত্রশোক অপ-নোদনের জন্য ধর্ম্মঠাকুর কর্পূরবিন্দু হইতে এক শিশু সৃষ্টি করিয়া রঞ্জাবতীকে দিলেন। এদিকে ঠাকুরের অনুচর হনুমান্ চিলের রূপ ধরিয়া দস্যুদিগের নিকট হইতে শিশুকে আনিয়া মাতাকে প্রত্যর্পণ করিলেন। লাউসেন কর্পূরধবল এই দুই সন্তান যুগপৎ প্রাপ্ত হইয়া রঞ্জাবতী দ্বিগুণ আনন্দিত হইলেন। ক্রমে লাউসেন বয়ঃপ্রাপ্ত হইলেন। লেখাপড়া শিখিবার পর যুদ্ধবিদ্যা শিখিবার সময় উপস্থিত হইল। ধর্ম্মঠাকুরের আদেশে হনুমান্

১। ঐ, পৃ ৬৮ দ্রষ্টব্য।

বৃদ্ধ মল্লের রূপ ধরিয়া আসিয়া লাউসেনকে উত্তমরূপে মল্লবিদ্যা শিখাইয়া দিলেন। কি রূপে, কি বিদ্যায়, কি চরিত্রবলে সর্ব্বথা লাউসেন মহীয়ান্ হইয়া উঠিলেন। এক রাত্রিতে দেবী মোহিনীমূর্ত্তি ধরিয়া লাউসেনকে পরীক্ষা করিয়া আসিলেন, এবং সন্তুষ্ট হইয়া জয়খড়্গ দিয়া গেলেন। বিশ্বকর্ম্মা এই জয়খড়্গের ফলা নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। এখন স্বীয় শৌর্য্যের পরিচয় দিয়া পুরস্কারলাভের নিমিত্ত লাউসেন গৌড়ে যাইতে ইচ্ছুক হইলেন। রঞ্জাবতীর নিকট হইতে এই সংবাদ পাইয়া মহামদ ময়নায় আটজন মল্ল পাঠাইয়া দিলেন, তাহারা যেন লাউসেনের হাত পা ভাঙ্গিয়া দেয়, তাহা হইলে লাউসেন আর গৌড়ে আসিতে পারিবেন না। বলা বাহুল্য লাউসেন আটজন মল্লকে অবিলম্বে পরাস্ত করিয়া কর্পূরধবলকে সঙ্গে করিয়া গৌড়ের পথে যাত্রা করিলেন। পথে কামদল বাঘবধ, কুম্ভীরবধ, জামতিতে বারুই স্ত্রীর অসৎ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান ও ফলে কারাগারবাস এবং পরে তাহার মৃতপুত্র-উজ্জীবন, গণিকা সুরিক্ষার হস্তে লাঞ্ছনা এবং হনুমানের সাহায্যে তাহা হইতে নিস্তার লাভ এবং সুরিক্ষার অবমান ইত্যাদি বহুবিধ অসম্ভাবিত কার্য্যের পর অবশেষে লাউসেন গৌড়ে প্রবেশ করিলেন। মহামদের মন্ত্রণায় কারাবাস ভোগ করিয়া অবশেষে হস্তিবধ ও পুনরুজ্জীবন এবং বৃক্ষধ্বংস ও পুনরুজ্জীবন ইত্যাদি কেরামতি দেখাইয়া শেষে গৌড়েশ্বরের নিকট ময়না তালুক ইজারা পাইলেন। একটি ঘোড়াও পুরস্কার পাইলেন। এই ঘোড়াটি ছদ্মবেশী পক্ষিরাজবিশেষ। রাজা ও রাণীর নিকট অভ্যর্থনা লাভ করিয়া লাউসেন গৌড়ে ফিরিলেন। পথিমধ্যে কালু ডোম, তাহার পত্নী লখ্যা ও তাহাদের পুত্র ও অনুচরাদির সহিত পরিচয় হইল। লাউসেনের কথায় তাহারা ময়নায় বাস উঠাইয়া আনিল।

এদিকে মহামদ ভাবিতেছে, কি করিয়া লাউসেনকে নষ্ট করা যায়। অবশেষে সে রাজাকে পরামর্শ দিল, কামরূপ রাজাকে দমন করিতে লাউসেনকে পাঠান হউক। গৌড়েশ্বর লাউসেনকে ডাকাইলেন। লাউসেন গৌড়ে আসিয়া রাজার কথামত কামরূপবিজয়ে বহির্গত হইলেন। লাউসেন যাহাতে ধ্রুব বিজয়লাভ করে এই উদ্দেশ্যে ধর্ম্মঠাকুর হনুমান্‌কে দিয়া গৌড়েশ্বরের মাতার নিকট হইতে

জয়পদ্মালা ও জয়-কাটারি আনিয়া লাউসেনকে দিলেন। কালু ডোমের সাহায্যে লাউসেন কামরূপ জয় করিয়া রাজকন্যা কলিঙ্গাকে বিবাহ করিলেন। গৌড় হইতে ময়না ফিরিবার পথে বর্দ্ধমানের রাজা কালিদাসের অমলা ও বিমলা নামক দুই কন্যাকে বিবাহ করিয়া লইলেন।

কিছুদিন পরে মহামদের মন্ত্রণায় বৃদ্ধ গৌড়েশ্বর সিমুলের রাজা হরিপালের কন্যা কানড়াকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইলেন। কন্যাপক্ষ প্রস্তাব প্রত্যাখান করায় গৌড়েশ্বর হরিপালের বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রা করিলেন। কানড়া এবং তাঁহার দাসী ধুমসী দেবীর অনুগৃহীত ভক্ত। দেবী এক লোহার গণ্ডার নির্ম্মাণ করাইয়া দিলেন, যে এই লৌহ গণ্ডারের মুণ্ডচ্ছেদ করিতে পারিবে সেই কন্যালাভ করিবে। রাজা বা মহামদ কেহই পারিল না। তখন মহামদ রাজাকে যুক্তি দিয়া লাউসেনকে আনাইল। উদ্দেশ্য লাউসেন যদি না পারে তবে অবমানিত হইবে, আর যদি পারে তাহা হইলে তাহার কাছ হইতে কন্যা কাড়িয়া লইয়া রাজার সহিত বিবাহ দেওয়া হইবে। লাউসেন কৃতকার্য্য হইলে পর তাঁহাকে অন্যকার্য্যে পাঠান হইল, এবং ইতিমধ্যে গৌড়েশ্বর সিমুল আক্রমণ করিলেন। কানড়া ও ধুমসী যুদ্ধে নামিলেন, দেবীর সাহায্যে তাঁহারা গৌড়েশ্বরকে পরাজিত করিলেন। এদিকে লাউসেন আসিয়া পড়িলেন। তিনি যথার্থই লাউসেন কিনা তাহা পরীক্ষার জন্য কানড়া লাউসেনের সহিত যুদ্ধে নামিলেন। দেবীর কৃপায় তাঁহার সন্দেহ দূর হইল। কানড়ার সহিত লাউসেনের বিবাহ হইল। তাঁহারা ময়নায় চলিয়া আসিলেন।

তাহার পর লাউসেনকে ঢেকুরে পাঠানো হইল ইছাই ঘোষকে দমন করিতে। লাউসেন ও কালু অজয়ের ধারে উপনীত হইলেন। লোহাটা সর্দ্দারকে বধ করিয়া কালু তাহার কাটামুণ্ড গৌড়ে মহামদের নিকট পাঠাইয়া দিল। সেই মুণ্ড লাউসেনের মুণ্ডের মত সাজাইয়া মহামদ ময়নায় পাঠাইয়া দিল। ময়নায় হাহাকার উঠিল। লাউসেনের চারি ভার্য্যা সেই মুণ্ডের সহিত অগ্নিতে প্রবেশ করিতে উদ্যত হইলেন। ধর্ম্ম চিলের আকারে ছোঁ মারিয়া সেই মুণ্ড লইয়া গেলেন এবং

কলিঙ্গার নিকট আবির্ভূত হইয়া প্রকৃত ঘটনা জানাইয়া তাঁহাদিগকে নিশ্চিন্ত করিলেন।

এদিকে লাউসেন ঘোড়ায় চড়িয়া অজয় নদ পার হইতে গিয়া নদীর জলে পড়িয়া গেলেন, অজয় তাঁহাকে বন্দী করিয়া বরুণের নিকট লইয়া গেল। লাউসেনের অনুচরবৃন্দ জলে ঝাঁপ দিল। ইহাতে ধর্ম্মঠাকুর অজয়ের জল হাঁটুভর করিয়া দিলেন এবং লাউসেন ও তাঁহার অনুচরদিগকে উদ্ধার করিলেন। অজয়ের তীরে ঢেকুরের গড়ে ইছাইয়ের সহিত লাউসেনের যুদ্ধ বাধিল। ইছাই দেবীর অনুগৃহীত ভক্ত। লাউসেন যতবার ইছাই ঘোষের মাথা কাটিয়া ফেলে, ততবারই কাটা মাথা ধড়ে জোড়া লাগে। শেষে দেবী ইছাইকে বর দিলেন যে, তিনি লাউসেনকে মারিবেন। মায়া লাউসেন নির্ম্মিত হইল, দেবী তাঁহার প্রতিজ্ঞা বিতথ করিলেন না। এদিকে দেবতারা ষড়যন্ত্র করিয়া দেবীকে মহেশের নিকট লইয়া গেলেন, আর ইত্যবসরে লাউসেন ইছাইয়ের মুণ্ডচ্ছেদ করিলেন। বিষ্ণুর কৃপায় কাটামুণ্ড মুক্তি লাভ করিল। দেবী তখন আর ইছাইকে পুনর্জীবিত করিতে পারিলেন না। ইছাইয়ের জন্য দেবী শোক করিতে লাগিলেন এবং পরে তাহার প্রেতকৃত্যাদি করিলেন। লাউসেন সোম ঘোষকে গৌড়াধিপতির বশ্যতা স্বীকার করাইলেন। অতঃপর তিনি গৌড় হইয়া ময়নায় ফিরিলেন।

কিছুকাল পরে লাউসেনের পুত্র চিত্রসেন জন্মগ্রহণ করিল। এদিকে মহামদ ভক্তিহীনভাবে ধর্ম্মপূজা করিতে গিয়া বিপদ ঘটাইল, গৌড়ে ভীষণ বর্ষা ও তৎসহ জলপ্লাবন আসিল। বেগতিক দেখিয়া লাউসেনকে আনাইয়া এই বিপদের প্রশমন করা হইল।

তাহার পর লাউসেনকে বলা হইল, পশ্চিমে সূর্য্য উদয় করাইবার জন্য। ময়না হইতে লাউসেনের মাতাপিতাকে আনিয়া প্রতিভূস্বরূপে বন্দী করিয়া রাখা হইল। লাউসেন পশ্চিমে সূর্য্যোদয় করাইতে পারিলে তাঁহারা মুক্ত হইবেন। লাউসেন সামুলা বা শাফুলাকে সঙ্গে করিয়া নৌকায় চড়িয়া হাকন্দে ধর্ম্ম-আরাধনা করিতে যাত্রা করিলেন।

লাউসেন হাকন্দে তপস্যা করিতে গেলেন, এদিকে ময়নায় গণ্ডারের অত্যাচার

নিবারণ করিবেন এই ছলে মহামদ ময়না অধিকার করিতে সসৈন্যে যাত্রা করিলেন। মহামদ কালুকে লোভ দেখাইল, তাহাকে রাজা করিয়া দিবে। সুতরাং কালু নিশ্চেষ্ট রহিল। লখ্যা একাই যুদ্ধ করিয়া মহামদের সৈন্যকে ঠেকাইয়া রাখিল। মন্ত্রবলে রাত্রিতে ময়নার তাবৎ লোককে নিদ্রাভিভূত করিয়া মহামদ ময়না অধিকার করিতে উদ্যুক্ত হইল। লখ্যা তাহার পুত্রকে যুদ্ধে পাঠাইল, সে নিহত হইল। তখন লখ্যা বলিয়া কহিয়া কালুকে যুদ্ধে পাঠাইল, কালুও নিহত হইল। তখন কলিঙ্গা যুদ্ধ করিতে গেলেন, তিনিও নিপতিত হইলেন। অবশেষে কানড়া এবং ধুমসী রণে অবতীর্ণ হইলেন। মহামদ পরাজিত ও অপমানিত হইয়া পলায়ন করিল। কলিঙ্গার মৃতদেহ প্রাসাদে সুরক্ষিত হইল।

এদিকে লাউসেন হাকন্দে মহাবিদ্যা জপ করিতেছেন এবং শরীরের মাংস কাটিয়া হোম করিতেছেন। ধর্ম্ম তাহাতেও প্রসন্ন হইলেন না। তখন শাফুলার পরামর্শ অনুসারে তিনি স্বীয় মস্তক ছেদ করিয়া অগ্নিতে আহুতি দিলেন। তখন ধর্ম্ম থাকিতে পারিলেন না, আসিয়া লাউসেনকে জীয়াইলেন এবং পশ্চিমে সূর্য্যোদয় করাইয়া তাঁহার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলেন। পশ্চিমে যে সূর্য্যোদয় হইল তাহার সাক্ষী লাউসেন হরিহর বাইতিকে রাখিলেন। তাহার পর গৌড়ে প্রত্যাগমন করিলেন।

মহামদ বাইতিকে মিথ্যাসাক্ষ্য দিবার জন্য প্রলোভিত করিতে লাগিল। সভায় কিন্তু বাইতি সত্যসাক্ষ্যই দিল। তখন মহামদ চুরির অপবাদ দিয়া বাইতিকে শূলে দেওয়াইল। শূলে প্রাণত্যাগ করিয়া হরিহর বাইতি সশরীরে স্বর্গে গমন করিল। মহামদের অশেষ লাঞ্ছনা আরম্ভ হইল। মাতাপিতা ও ভ্রাতার সহিত লাউসেন দেশে ফিরিয়া আসিলেন। ধর্ম্মের কৃপায় কলিঙ্গা কালু ও তাহার পুত্র সকলেই পুনর্জ্জীবন লাভ করিয়া সুখে কাল কাটাইতে লাগিল। পরে যথাকালে সকলে স্বর্গে চলিয়া গেল। চিত্রসেন ময়নায় রাজত্ব করিতে লাগিল।

লাউসেনের ঐতিহাসিকত্ব লইয়া অনেকেই মাথা ঘামাইয়াছেন। রামাই পণ্ডিতের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছি, লাউসেনের সম্বন্ধেও তাহাই খাটে। লাউসেন বলিয়া কোনকালে কেহ ছিলেন বলিয়া মনে করিবার কোন হেতু নাই।

ধর্ম্মমঙ্গল কাহিনীকে ইংরাজীতে Adventures অথবা Exploits of Lausena বলা যাইতে পারে। লাউসেনের কাহিনীগুলি প্রকৃতপক্ষে মধ্যযুগের বাঙ্গালার Folk-tale বা উপকথা মাত্র; ইহার মধ্যে ঐতিহাসিক তথ্য খুঁজিতে গেলে ঠকিব। Adventure বা কেরামতি-কাহিনী বলিয়া ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য মনসামঙ্গল কাব্যের অপেক্ষা অনেক অংশে সুখপাঠ্য। নারী-পুরুষের শৌর্য্যবীর্য্যের কাহিনী আখ্যানের মধ্যে সজীবতা আনিয়া দিয়াছে। কর্পূরধবলের বালসুলভ চপল চরিত্র বেশ কৌতুককর। ধুমসীর চরিত্র উপভোগ্য। লখ্যা ও হরিহর বাইতির চরিত্র নমস্য।

আজ অবধি যে সকল ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে খেলারামের ধর্ম্মমঙ্গল প্রাচীনতম বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। হারাধন দত্ত মহাশয়ের নিকট একখানি অসম্পূর্ণ পুঁথি ছিল বলিয়া শোনা যায়।[১] সে পুঁথির আর সন্ধান পাওয়া যায় না। দত্ত মহাশয়ের পুঁথিতে নাকি নিম্নোদ্ধৃত পয়ার দুইটি ছিল।

> ভুবন শকে বায়ু মাস শরের বাহন।
> খেলারাম করিলেন গ্রন্থ আরম্ভণ ॥
> হে ধর্ম্ম এ দাসের পূরাও মনস্কাম ॥
> গৌড়কাব্য প্রকাশিতে বাঞ্ছে খেলারাম ॥।[২]

ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে, ১৪৪৯ শকাব্দের অর্থাৎ ১৫২৭ খ্রীষ্টাব্দের কার্ত্তিক মাসে খেলারাম কাব্য রচনা সুরু করেন। কিন্তু এই তারিখের যথার্থতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহের কারণ আছে। নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলিয়াছেন—"কিন্তু আমরা যে সকল পুঁথি দেখিয়াছি, তাহাতে রচনা কালের কোন প্রসঙ্গ নাই।"[৩]

ধর্ম্মমঙ্গলকে "গৌড়কাব্য" বলিয়া উল্লেখ করা প্রাচীনত্বদ্যোতক বটে। পুঁথি জাহানাবাদ (আরামবাগ) অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছিল। কবি কি ওই অঞ্চলের লোক ছিলেন?

১। ব-সা-প-প ১২, পৃ ১১। ২ ঐ, পৃ ৬। ৩। বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ৩৫।

খেলারামের কথা ছাড়িয়া দিলে ষোড়শ শতাব্দীতে রচিত কোন ধর্ম্মমঙ্গল পাই না। অথচ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদ হইতে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পর্য্যন্ত এই একশত বৎসর কালের মধ্যে দামোদরের উভয় তীরে, বর্দ্ধমান জেলায় এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী অঞ্চলে অনেকগুলি ধর্ম্মমঙ্গল রচিত হইয়াছিল। ইহার মধ্যে শুধু চারিজন মাত্র কবির কাব্য সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল, এইরূপ সিদ্ধান্ত বা অনুমান করা যাইতে পারে।

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের একতম কবি রূপরামের বাসস্থান ছিল বর্দ্ধমান জেলায় কাইতি গ্রামের নিকটবর্ত্তী শ্রীরামপুর গ্রামে। গ্রন্থের রচনাকাল যাহা পাওয়া যায় তাহা হেঁয়ালী-বিশেষ।

তিন বাণ চারি যুগ বেদে যত রয়।
শাকে সনে জড় করিলে যত সন হয়॥
রসের উপরে রস তার রস দেহ।
এই সনের গীত হইল লেখা করি নেহ॥

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় এই পাঠান্তর পাইয়াছেন—

শাকে সীমে জড় হৈলে যত শক হয়।
চারি বাণ তিন যুগে বেদে যত রয়॥
রসের উপরে রস তাহে রস দেহ।
এই শকে গীত হৈল লেখা কর‍্যা লেহ॥[১]

ইহা হইতে বিচার করিয়া বিদ্যানিধি মহাশয় ১৫২৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬০৪-০৫ খ্রীষ্টাব্দ পাইয়াছেন। বিদ্যানিধি মহাশয়কে যেরূপ কষ্টকল্পনার সাহায্য লইতে হইয়াছে তাহাতে তাঁহার নির্দ্ধারিত তারিখ যথার্থ কিনা বলা দুষ্কর।

মাণিকরাম গাঙ্গুলি রূপরামের পরবর্ত্তী। তিনি স্বীয় কাব্যে রূপরামের উল্লেখ করিয়াছেন।

বন্দিয়া ময়ূর ভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্ম্মগুণগান॥

১। প্রবাসী পৌষ ১৩৩৬, পৃ ৩৫২-৫৩।

এখানে সকলেই " আদি রূপরাম " বুঝিতে একাধিক রূপরামের কল্পনা করিয়াছেন। প্রকৃত অর্থ হইবে, " ময়ূরভট্ট রূপরাম আদি ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতাদিগকে বন্দনা করিয়া " ইত্যাদি।

আত্মপরিচয় এবং কাব্যরচনার ইতিহাস রূপরাম বেশ মনোগ্রাহিভাবে বর্ণনা করিয়াছেন।[১] নিম্নে তাহা সমগ্রভাবে উদ্ধৃত হইল। এটিকে সে যুগের একটি চমৎকার ছোট গল্প বলিয়া নেওয়া চলে। নিষ্ঠুরভাষী জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভয়ে ভীত মাতৃস্নেহনীড়কাতর গৃহকোণবিচ্যুত পড়ুয়া বালকের যে ছবি ইহাতে আঁকা হইয়াছে তাহার জোড়া আধুনিকপূর্ব্ব বাঙ্গালা সাহিত্যে দেখি নাই।

অনেক দিবস বাড়ী কাইতি-শ্রীরামপুর। চারি ভাই ঘর করি বিধাতা নিষ্ঠুর॥
পরমপণ্ডিত পিতা কেবা নাঞি জানে। বিশা-শয় পড়ুয়া পড়ে যার বর্ত্তমানে॥
বড় দাদা রত্নেশ্বর বড় নিদারুণ। খাইতে শুইতে বাক্যবাণ জ্বলন্ত আগুন॥
খাইতে শুইতে মন্দবাক্য বলে রত্নেশ্বর। মনে হইল পড়িতে যাইব দেশান্তর॥
মনঃকথা মরমে বান্ধিল খুঙ্গি পুঁথি। মণিরাম রায় দিল পরিবার ধুতি॥
পথের সম্বল দিল পক্ষ আনা কড়ি। পাসণ্ডা পড়িতে যাব ভট্টাচার্য্যের বাড়ী॥
রঘুরাম ভট্টাচার্য্য কবিচন্দ্রের পো। খুঙ্গি পুঁথি দেখিয়া জন্মিল মায়া মো॥
বেটা বলি বাসা দিল নিজ নিকেতনে। জুমব অমর বেদ হৈল অল্পদিনে॥
মাঘ রঘু নৈষধ পড়িল যথাবিধি। বাখানিতে ভারত বিস্তর পাইল নিধি॥
বাখানিতে কারক আগুন জ্বলে তায়। গুরু শিষ্যে দুজনে অনর্থ বয়্যা যায়॥
তিনবার পূর্ব্বপক্ষ করিল সঞ্চার। সহিতে নারিল গুরু পাবক-আকার॥
ঐমনি পুথির বাড়ি বসাইল গায়। পড়াতে নারিল বেটা এখনি বিদায়॥
বিদ্যানিধি ভট্টাচার্য্য নবদ্বীপে আছে। ভারতী পড়িতে বেটা চল তার কাছে॥
নহে জউগ্রাম চল কনাতের[২] ঠাঞি। তার সম ভট্টাচার্য্য শান্তিপুরে নাঞি॥
বলিতে বলিতে বাক্য পাবকের কণা। চিটঙ্গ মুখের শোভা বসন্তের চিনা
এমন বচন শুনি মনে লাগে ডর। সূর্য্যের সমান গুরু পরমসুন্দর॥
মনে দুঃখ বিষম বান্ধিল খুঙ্গি পুঁথি। নবদ্বীপে পড়িতে যাইব দিবারাতি

১। ব-সা-প প ৩৬, পৃ ১৩৫-১৩৬ দ্রষ্টব্য ২। কণাদের?

হেনকালে জননী পড়িয়া গেল মনে। পুনর্ব্বার ফির‍্যা আইল শ্রীরামপুরের গনে[১]
আড়ুয়া করিল পাছু ডানি দিগে বাসা। পুরাণ জাঙ্গালে নাঞি জীবনের আশা॥
ঘুর‍্যা ঘুর‍্যা বুলি শুধু পলাসনের বিলে। দুটা শঙ্খচিল উড়ে বিষ্ণুপদতলে[২]॥
বাঘ দুটা দুদিকে বসিয়া লেজ নাড়ে। গোটা তিন কাছাড় খালাম গোপাল-
দীঘির পাড়ে॥

সন্ধিটীকা পড়িল সুবন্তটীকা নাঞি। আপনি কারকটীকা কুড়াইল গোসাঞি॥
প্রথমে আপনি ধর্ম্ম কুড়াইল পুঁথি। সম্মুখে দাণ্ডাল যেন ব্রাহ্মণ-মূরতি॥
সুবর্ণ-পইতা গলে পতঙ্গসুন্দর। কলধৌতকাঞ্চনকুণ্ডল ঝলমল॥
তরাসে কাঁপিল তনু প্রাণ দুর-দুর। আপনি বলেন ধর্ম্ম দয়ার ঠাকুর॥
আমি ধর্ম্মঠাকুর বাঁকুড়ারায় নাম। বার দিনের গীত গাও শুন রূপরাম
চামর মন্দিরা দিব অপূর্ব্ব মাদুলি। তুমি গেছ পাঠ পড়িতে আমি খুঁজ্যা বুলি
পূর্ব্বেতে আছিলে তুমি সখা যে চরণে। অতেব দেখিলে দুটী কমলচরণে॥
এত বলি অনাদ্য আপনি অন্তর্ধান। তরাসে কাঁপিল তনু চঞ্চল পরাণ॥
দিবসে তিমির ঘোর দেখিতে না পাই। খুঙ্গি পুঁথি বান্ধিয়া ঐমনি দিলাম ধাই॥
আকাশে অনেক বেলা তৃষ্ণায় বিকল। শাঁখারীপুখুরে খাইল পরিপূর্ণ জল॥
সন্ধ্যাকালে আচম্বিতে ঘরে দরশন। প্রণাম করিল গিয়া মায়ের চরণ॥
সোনা রূপা দুটী বোন দুয়ারে বসিয়া। রূপরাম দাদা আইল খুঙ্গি পুঁথি লইয়া॥
হেনকালে আইল ঘর ভাই রত্নেশ্বর। দাদাকে দেখিয়া বড় গায়ে আইল জ্বর॥
তরাসে কাঁপিল তনু তালপাত পারা। পালাবার পথ নাঞি বুদ্ধি হইল হারা॥
দাদা বড় নিদারুণ বলে উচ্চস্বরে। কালি গিয়াছ পাঠ পড়িতে আজি আইলা
ঘরে॥

কাছাড়িল অমর জুমর অভিধান। বাহিরে সুবন্তটীকা গড়াগড়ি যান॥
কুড়াইল যতেক পুথি মনস্তাপ মনে। তখনি বিদায় আমি মায়ের চরণে॥
শানিঘাট গ্রামে গিয়া দরশন দিল। পথের পথিকে দেখ্যা জিজ্ঞাসা করিল॥
ঠাকুরদাস পাল তারা বড় ভাগ্যবান। না বলিতে ভিক্ষা দেন আড়াই সের ধান॥

১। গহনে অর্থাৎ সঙ্কীর্ণ বা বন পথে। ২। অর্থাৎ আকাশে।

আড়াই সের ধানের কিনিল চিড়া ভাজা। দামোদরের জলে করিলাম স্নান পূজা॥
জল পান করি বস্থা বড় অভিলাষে। হেন বেলা চিড়া ভাজা উড়াইল বাতাসে॥
চিড়া ভাজা উড়্যা গেল শুধু খাই জল। খুঙ্গি পুঁথি বয়্যা যাত্যে অঙ্গে নাঞি বল॥
দীঘলনগর গ্রামে গিয়া দরশন দিল। তাঁতীঘরে ধর্ম্ম বড় পথেতে শুনিল॥
ধাওয়া ধাই তাঁতীঘরে দিল দরশন। চিড়া দধির ঘটা দেখি আনন্দিত মন॥
মনে হইল পরিপূর্ণ খাব চিড়া দই। তাঁতীঘরে ধর্ম্মঠাকুর নাঞি দিল খই॥
দক্ষিণা আনিয়া দিল দশ গণ্ডা কড়ি। দৈবের ঘটনে তার কানা দেড় বুড়ি॥
পাঁচদিন উপবাসে দৈবের ঘটন। বাহাদুর এড়ানে দিলাঙ দরশন॥
গোয়ালাভূমের রাজা গণেশ তার নাম। রিপুকুলচূড়ামণি বড় ভাগ্যবান্॥
তারে গিয়া স্বপনে কহিলা মায়াধর। প্রভাতে ভূপতি দিলা মন্দিরা চামর॥
সেই হইতে গীর্ত গাই ধর্ম্মের আসরে। অদ্যাবধি পুথি তোলা রহিলেন ঘরে॥
রূপরাম গীত গান শ্রীরামপুরে ঘর। কলমে বসিয়া খেলা করে মায়াধর॥

একটি ভণিতা হইতে জানা যায় যে রূপরামের মাতার নাম ছিল দময়ন্তী।

শ্রীধর্ম্মমঙ্গলগীত শুন সর্ব্বজন।
গায় গীত রূপরাম দৈবন্তি-নন্দন॥[১]

৫ শ্যাম পণ্ডিতের ধর্ম্মমঙ্গলের এখন একটি মাত্র পুঁথির অস্তিত্ব জানা যায়।[২] পুঁথিটি বীরভূম জেলায় বোলপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছিল। অপর একটি খণ্ডিত পুঁথির কিছু বিবরণ ১৩০৭ সালে বীরভূমি পত্রিকায় [পৃ ৩৪] বাহির হইয়াছিল। পরে এই পুঁথিটি হারাইয়া কিংবা নষ্ট হইয়া যায়।

জ্ঞাত পুঁথিটি ১৬২৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত। গ্রন্থ-স্বামীর "সাকিন শ্রীরামনগর।" কাব্যটিতে শ্যাম পণ্ডিতের ভণিতা আছে। মধ্যে মধ্যে "ধর্ম্মদাস" ভণিতাও আছে। ইহা শ্যাম পণ্ডিতের বিশেষণস্থানীয় হওয়াই সম্ভব।

১। বঙ্গরত্ন অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী প্রণীত (দেনুড় হইতে প্রকাশিত) প্রথমভাগ, পৃ ৩৯।
২। বর্ত্তমানে পুঁথিটি বিশ্বভারতীর গ্রন্থাগারিক শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অধিকারে আছে। তাঁহার ও শ্রীযুক্ত মনোমোহন ঘোষ মহাশয়ের সৌজন্যে পুঁথি হইতে অল্পস্বল্প অংশ ব্যবহার করিতে পারিয়াছি।

শ্যামরূপা বিনা আন মনে না করিবে[১] ধ্যান,
একভাবে করেন শ্রবণ।
ভজিঞা ধর্ম্মের পাএ শ্রীশ্যাম পণ্ডিত গাএ,
অবধান শুন সর্ব্বজন ॥

নিরঞ্জনমঙ্গলের অপূর্ব্ব বন্দনা।
শ্রীশ্যাম পণ্ডিত ভাষে করিঞা ভাবনা ॥

শুনিয়া দত্তের বাণী ভবনে চলিলা রাণী
মনে মনে করিয়া ভাবনা।
নিরঞ্জনপদ আশে শ্রীশ্যামপণ্ডিত ভাষে,
অবধানে শুন সর্ব্বজনা ॥

বোলপুরের পুঁথির আরম্ভ এইরূপ—

পূজার কারণ প্রভু চিন্তিঞা নিরঞ্জন। আপনার পূজা আগে করেন ভাবন।
[নিরঞ্জন]রূপে প্রভু পৃথিবী স্থষ্টি করি। পূজার কারণ হেতু ধর্ম্মরূপ ধরি ॥
যার নাম লইলে পাতক না রয়। যে পথে থাকিলে আপদ নাহি হয় ॥
হেন ধর্ম্মরূপী হইলা নিরঞ্জন। অবনীতে ল[ব] পূজা অর্থে[র] কারণ ॥
ধর্ম্ম অধর্ম্ম যেবা পথ না রইব। কোন পথ থাকিলে জীব নিস্তার পাব ॥
এমন বচন যবে বলি নিরঞ্জন। যোড়-করে বলে নারদ তপোধন ॥
ব্রহ্মা যা[হা]র মায়া নারে জানিবারে। কেমনে জানিব তোমা মনুষ্য-শরীরে ॥
আপনার পূজা [তুমি] প্রচার আপনে। তবে ধর্ম্ম বলিয়া জানে ত্রিভুবনে ॥
জাম্বুবতী[২] নাম ধরে ইন্দ্রের নাচনী। তারে শাপ দিঞা [তুমি] পাঠাহ অবনী ॥
রঞ্জাবতী বল্যা তার খ্যাতি হইব। তার গর্ভে লাউসেন জন্ম হইব ॥
তাথে হইতে [হৈব] পূজা পৃথিবী ভুবনে। শুনিঞা নারদের কথা বলেন নিরঞ্জনে ॥

শেষে আছে—

ধর্ম্মপূজা কৈলে শমনের নাহি ভয়। একান্ত হইঞা যদি পূজে পদদ্বয় ॥

১। করয়ে ? ২। "অম্বুবতী" ঘনরাম।

অধনীর ধন হয় বন্ধ্যা পুত্রবান্। অন্ধজনা যদি পূজে পায় চক্ষুদান ॥
কুজা খোড়া কুষ্ঠী-ব্যাধি ধর্ম্মসেবা করে। কন্দর্পসমান হয় নিরঞ্জনের বরে ॥
অহঙ্কারে ধর্ম্মঘট লজ্ঘে যে[ই] জন। অষ্টাঙ্গে ধবল হয়ে বংশের নিধন ॥
বারমতী করিঞা যেবা ধর্ম্মসেবা করে। পুনরপি গতায়াত না করে সংসারে ॥
যত দেখি নদনদী সমুদ্রকে যায়। নিরঞ্জনপূজা কৈলে সর্ব্বদেবে পায় ॥
রহিলা গোলকধাম ধবল আসনে। হরি হরি বল সকল বন্ধুজনে ॥
এত দূরে নিরঞ্জনব্রতকথা সায়। প্রভুর চরণে ধর্ম্মদাস গীত গায় ॥'

শ্যাম পণ্ডিত বীরভূম অঞ্চলের লোক বলিয়া এই ধর্ম্মমঙ্গলের মধ্যে অনেক স্থানীয় বিশেষত্ব আছে যাহা অপর ধর্ম্মমঙ্গলগুলিতে নাই। "শ্যামপণ্ডিত ইছাই ঘোষকে ঈশ্বর ঘোষ ও তাঁহার অনুজকে বিজয় ঘোষ নামে অভিহিত করিয়াছেন। ইঁহার পুঁথিতে ঢেকুরগড়ের নাম ত্রিহট্টগড়[১]। মাণিক গাঙ্গুলী ঘনরাম প্রভৃতি জলন্দার গড়ের রাজার নাম লিখিয়াছেন জল্লাদ শেখর। শ্যাম পণ্ডিতের পুঁথিতে সামন্ত শেখর নাম পাওয়া যায়, সুতরাং স্থানীয় প্রবাদকথিত নামের সঙ্গে শ্যাম পণ্ডিতের মিল আছে।"[২]

ঈশ্বর ঘোষের পিতা সোম ঘোষ শ্যামরূপা বা শ্যামারূপার উপাসক ছিলেন। শ্যামরূপার মন্দির গড়ের জঙ্গলে অদ্যাপি বিদ্যমান আছে। সোম ঘোষ যখন পূজা করিতেছিলেন তখন দেবীর সেবক চণ্ডীদাস তাঁহাকে বিশেষ সাহায্য করিয়াছিলেন।

নিরঞ্জনমঙ্গলে চণ্ডীর ইতিহাস।
সোম ঘোষে কহিলা সিদ্ধি[৩] চণ্ডীদাস ॥ [পত্রাঙ্ক ১০ক] ॥
উচ্চৈঃস্বরে চণ্ডীদাস করে বেদধ্বনি।
একমনে সোম ঘোষ পূজেন ভবানী ॥ [পত্রাঙ্ক ১১খ] ॥

রাঢ়ের কবিদের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য হইতেছে অল্পবিস্তর আত্মপরিচয়ের সহিত বিস্তৃত গ্রন্থোৎপত্তির বিবরণ দেওয়া। এই বৈশিষ্ট্য মুকুন্দরাম ক্ষমানন্দ প্রভৃতির কাব্যে সুপরিস্ফুট। অধিকাংশ প্রাচীন ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতারাও এই প্রথা

১। ঘনরামে "ত্রিষষ্টির গড়"। ২। বীরভূমবিবরণ ৩, পৃ ১৯১। ৩। সিদ্ধ?

অনুসরণ করিয়াছেন। ফলে রূপরাম সীতারাম রামদাস মাণিকরাম প্রভৃতির কাব্যে প্রাপ্ত গ্রন্থোৎপত্তিবিবরণ হইতে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর দক্ষিণরাঢ় অঞ্চলের অপূর্ব্ব পল্লীচিত্র পাওয়া যাইতেছে। বর্ণনা অত্যন্ত বাস্তব এবং আধুনিক ছোট গল্পের মত উজ্জ্বল ও নিখুঁত। রূপরামের বিবরণ পূর্ব্বে দিয়াছি। এখন সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগের কবি সীতারামের আত্মকথা বলিতেছি তাঁহার নিজের লেখা উদ্ধৃত করিয়া।[১]

সীতারামের প্রপিতামহ ছিলেন গোপীনাথ দে। গোপীনাথের চারি পুত্রের অন্যতম (কনিষ্ঠ?) ছিলেন মদন। মদনের পুত্র দেবীদাস। দেবীদাসের দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ সীতারাম, কনিষ্ঠ প্রভুরাম। কবির মাতামহ ছিলেন বাল্মীকি-গোত্রীয়, ইন্দাসের প্রসিদ্ধ অম্বগোষ্ঠীর সন্তান, নাম শ্যামদাস। কবিরা ছিলেন ভরদ্বাজ-গোত্রীয় কায়স্থ, চিত্রপুর সমাজ।

ধন্য পুণ্যবান্ ছিল গোপীনাথ দে। তাহার পুণ্যের কথা কহিবেক কে॥
তাহার আছিল দেখ চতুর্থ নন্দন। ম[থুরাদাস] ধর্ম্মদাস বল্লভ মদন॥
ধর্ম্মদাসের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীহরি নামেতে। প্রথমে রাজীবদাস লিখিলাম পুথিতে॥
দুর্য্যোধন কুশলরাম কনিষ্ঠ সভার। মদন-নন্দন দেবীদাস[২] নাম তার॥
দেবীর নন্দন দেখ সীতারাম নামে। যারে ধর্ম্ম দেখা দিল জামকুড়ির বনে॥
আমার কনিষ্ঠ ভাই নাম সভারাম। মাতামহকুল মোর ইন্দাসেতে ধাম॥
শ্যামদাস মাতামহ গোত্র বাল্মীকে[৩]। ইন্দাসের অম্ব-গোষ্ঠী জানে সর্ব্বলোকে॥
সীতারাম দাস গান ভাবিয়া ঠাকুর। ভরদ্বাজ গোত্রের সমাজ চিত্রপুর[৪]॥

সীতারাম গৃহদেবতা (?) গজলক্ষ্মীর কৃপায় সন্ন্যাসিবেশী ধর্ম্মের দর্শন লাভ করেন।

বিশেষে গীতের কথা শুন সব্বজন। কেবল ভরসা মোর শ্রীগুরুচরণ॥
[সদা পূজি দেব][৫] গুরু দিয়ে সুঁদি ফুল। গজলক্ষ্মী মহামায়া হল্য অনুকূল।
রাত্রিদিন স্বপনে গীতের কথা শুনি। [মনে না করহ][৫] ভয় বলেন ভবানী॥

১। ১২৬৩ সালে অনুলিখিত পুঁথি অবলম্বনে। ২। পাঠ 'দেবী দোস'। ৩। ঐ 'বালিমিকে'। ৪। ঐ 'চির্ত্তপুর'। ৫। বন্ধনীস্থিত পাঠ কল্পিত।

সাবধানে করহ ধর্ম্মের সঙ্কীর্ত্তন। প্রভুর সঙ্গেতে তোর হব দরশন॥
[অযোধ্যারাম] চক্রবর্ত্তীর খণ্ডঘোষে ধাম॥ কিছু কিছু জানেন তিনি ইহার সন্ধান॥

ধর্ম্মঠাকুরের প্রথম চকিত দর্শনলাভ হয় মেড়াল (?) গমনাগমনের পথে।

আনাগোনা মেড়াল[১] দিবস দুই চারি। [পথে দেখিলাম] দীঘী কুমুদের পুরী[২]॥
কোকনদ শালুক অনেক ফুটে তায়। ফুল তুলে ঘর যাই দুফর বেলায়॥
............জলে শনিবার দিশি। হাওয়া রূপে ফুল মাগে কমন সন্ন্যাসী॥
বাতাসে লুকায়ে থাকে দেখি বা না দেখি। [সভয়ে মুদিয়া] চক্ষু হেটমুখে থাকি॥

এইরূপে মাস ছয় কাটিয়া গেল। তাহার পর বৈশাখ মাসে দেশে ফৌজের উপদ্রব হইল। লস্করেরা কবিদের ঘরদরজা পোড়াইয়া দেশ লুট করিয়া চলিয়া গেল। এখন নূতন গৃহ নির্ম্মাণ করা আবশ্যক। গৃহনির্ম্মাণের জন্য খুড়ার আদেশে কবি গেলেন জামকুড়ির বন হইতে কাঠ কাটিয়া আনিবার জন্য। তখন উষাকাল। কমলার মাঠে সূর্য্য উঠিলে সীতারাম দারিদিঘীর ঘাটে মুখ প্রক্ষালন করিয়া লইয়া বনের দিকে চলিলেন।

এইরূপে কতদিন গেল মাস ছয়। প্রথম বৈশাখ মাস হইল উদয়॥
[লস্কর আইল তা]এ লুটিল মহাপুর। ঘর-দুয়ার পোড়াইয়া সব কৈল চুর॥
কুশলরাম সরকার খুড়া কহিলেন মোরে। [শাওড়াবুনি যাও] তুমি কাষ্ঠ আনিবারে॥
উষাকালে দেখিনু শৃগাল চলে বাম। প্রাচী ত পশ্চাৎ করি রাণীসায়ের গ্রাম॥
প্রভাতপতঙ্গরুচি কমলার[৩] মাঠে। মুখপ্রক্ষালন কৈলাম দারিদীঘীর ঘাটে॥

সীতারাম যখন বনে পৌছিলেন তখন বেলা দুই দণ্ড। শুভশকুন দেখা গেল, মাথার উপরে আকাশে শঙ্খচিল উড়িতেছে। একটু অগ্রসর হইয়া কবি জামকুড়ির চৌকিতে পৌঁছিয়া সেখানে একটু বসিলেন তামাক খাইতে। (—প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে তামাক খাওয়ার কথা এই প্রথম পাওয়া গেল।—) এমন সময় একজন

১। পাঠ 'মেরাল'। ২। ঐ 'কুমুদয় পুরি'। বন্ধনীস্থিত পাঠ কল্পিত। এইরূপ পরেও।
৩। পাঠ 'কোমলার'।

লোক দৌড়াইয়া আসিয়া বলিল, ও পথে যাইও না, যে যাইতেছে তাহাকে বেগার ধরিয়া লইতেছে। কবি একথা শুনিয়া মনে ভীত হইলেন।

দুই দণ্ড দিবসে প্রবেশ কৈলাম বন। শঙ্খচিল মাথায় উড়িছে ঘনে ঘন॥
জামকুড়ির চৌকিতে তামাক খাই বস্যা। ধাওয়া-ধাই এক জন উত্তরিল এস্যা॥
যেও নাই ও পথে বেগার কত ধরে। শুনিয়া তাহার কথা ডরাল্যাম অন্তরে॥

অন্য পথ জানা নাই, সুতরাং কবি সাহস করিয়া হোবপুকুরের বনে ঢুকিয়া পড়িলেন। রাঙ্গামেটের নিকটে গিয়া দেখিলেন এক ইরাকী ঘোড়া। ঘোড়া দেখিয়া সিপাহীর অস্তিত্ব কল্পনা করিয়া আতঙ্কে কবি পুকুরের গাবা দিয়া পলাইলেন। বনে চারিদিকে হরিণ হরিণী নিঃশঙ্কে বিচরণ করিতেছে।

যাই মেন বন দিয়ে যা করে গোসাঞি। সেই পথ বিনা] আর পথ জানি নাঞি॥
সাহসে ঢুকিলাম গিয়া হোবপুকুরের[১] বন। রাঙ্গামেট্যার কাছে গিয়া দিলাম দরশন॥
ডাগর [ডাগর] গাছ গোটা গোটা জোড়া। দেখিলাম সম্মুখে এক এরাকের ঘোড়া॥
পালাইয়া যাই আমি পুকুর-খড়া দিয়া। অন্ধকার [গহ]নে হরিণী বুলে ধায়্যা॥

বৈশাখের মধ্যাহ্নে বনের অপূর্ব্ব শোভা। বাতাসে নাড়া খাইয়া কুড়চি ফুল ঝুপঝুপ করিয়া খসিয়া পড়িতেছে; কৃষ্ণসার মৃগ মৃগী কোথাও কোথাও চরিয়া বেড়াইতেছে; কোথাও দিবসের আলো কোথাও বা বৃক্ষলতাবিতানের ঘনান্ধকার।

বৈশাখ সময় তায় কুড়চির ফুল। ঝুপঝুপ ফুল খসে বাতাসে আকুল॥
কথি কথি[২] কাননে হরিণী কালসার। ক্ষণেক দিবস হয় ক্ষণেক আন্ধার॥

হঠাৎ শোনা গেল অশ্বপদধ্বনিবৎ মেঘগর্জ্জন, সঙ্গে সঙ্গে ঝড় উঠিল, আকাশ মেঘে ছাইয়া গেল। কবি দিশাহারা হইয়া বনে ঘুরিতে লাগিলেন এবং কাতর হইয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতে লাগিলেন।

সেথা হইতে শুনিলাম ঘোড়ার দড়বড়ি। আইল [হঠাৎ] এক মায়াময় ঝড়ি॥
অপার[৩] আন্ধার বড় কাঁপে সর্ব্বতনু। দিবসে আন্ধার হইল লুকাইল ভানু॥
পথ নাই পাই তবে বুলি বনে বনে। রক্ষা কর রঘুনাথ ভাবি মনে মনে॥

১। পাঠ 'হোবপুকুরের', পরে 'হস্‌পুকুরের'। ২। ঐ 'কতি কতি'। ৩। ঐ 'আপার'।

ঘুরিতে ঘুরিতে সীতারাম এক সন্ন্যাসীকে দেখিতে পাইয়া আশ্বস্ত হইলেন। সন্ন্যাসীর পায়ে প্রণাম করিতে সন্ন্যাসী হাসিয়া তাঁহার গন্তব্য স্থান জানিতে চাহিলেন। কবি বলিলেন যে তিনি শেওড়াবুনি যাইতেছেন কাঠ কাটিয়া আনিতে। সন্ন্যাসীর নিকট তিনি হোবপুকুরের পথ জিজ্ঞাসা করিলেন। সন্ন্যাসী বলিলেন, আমার সঙ্গে আইস, দুইজনে কথা কহিতে কহিতে যাইব।

কতদূরে দেখিলাম সন্ন্যাসী একজন। দেখিয়া হইল বড় আনন্দিত মন॥
প্রণাম করিনু আমি সন্ন্যাসীর পায়। হাসিয়া সন্ন্যাসী তবে মোর পানে চায়॥
কোথা যাবে আমাকে জিজ্ঞাসে ব্রহ্মচারী। সাওড়াবুনি যাব আমি কাষ্ঠ আনিবারি॥
ঘর দুয়ার পোড়াইয়া গিয়াছে লস্করে। সাওড়াবুনি যাব আমি কাষ্ঠ আনিবারে॥
পথ নাই জানি আমি বনে দিশা লাগে। কহ মোরে হোবপুকুর যাব কোন দিগে॥
সন্ন্যাসী বলেন বাছা আইস মোর সঙ্গে। দুইজনে কথায় কথায় যাব রঙ্গে॥

কতদূর গিয়া সীতারাম সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, আপনি কোথায় যাইবেন? সন্ন্যাসী বলিলেন, আমি বিষ্ণুপুর যাইব; কিন্তু তোমার সঙ্গে কিছু কাজ আছে, সেইজন্য সুখসাগর দিয়া ঘুরিয়া তোমাকে খুঁজিয়া আসিলাম। এই কথা শুনিয়া কবির মনে ভয় হইল। তিনি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করিলেন, আমার কাছে আপনার কি প্রয়োজন?

কতক্ষণে সন্ন্যাসীকে জিজ্ঞাসিনু আমি। কহ প্রভু আমাকে কোথাকে যাবে তুমি॥
সন্ন্যাসী বলেন আমি যাব বিষ্ণুপুরে। সুখসায়ের[১] দিয়ে তোরে খুঁজে এল্যাম ঘরে॥
তোর স্থানে কার্য্য কিছু আমার আছিল। তেকারণে তোর সনে বনে দেখা হইল॥
শুনিয়া আমার মনে বড় হইল ভয়। মোর স্থানে কিবা কার্য্য কহ মহাশয়॥

সন্ন্যাসী তখন নিজের পরিচয় দিয়া সীতারামকে ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিতে আদেশ করিলেন।

পরিচয় দিল মোরে জটিল ঠাকুর। নিবাস আমার বটে ইন্দাস হরিপুর॥
বহুদিন আমার ইন্দাসে আছে ধাম। নারায়ণ পণ্ডিতের ঘরে আমার বিশ্রাম॥

প্রভু বলে নিরঞ্জন নৈরাকার আমি। আমার মঙ্গল গীত কর গিয়া তুমি ॥
পূর্ব্ব জন্মে জন্মে কত তপ জপ কৈলা[১]। তেকারণে তুমি মোর বনে দেখা পাইলা[২] ॥
গীত কর আমার না কর মন হীন। তোর কীর্ত্তি রহিব শিলের যেন চিন ॥
কপালের লেখা তোর আমি কি করিব। বাহুড়িয়া ঘর চল তোর সঙ্গে যাব ॥

একথা কবির মনঃপূত হইল না।

বাত শুনে আমার মনস্থ হয় নাঞি। রক্ষা কর মোরে প্রভু অনাদ্য গোসাঞি ॥
অতিমূর্খ হীন আমি ছাওয়াল তাহাতে। গীত-নাট কি জানি করিব কোন মতে ॥

সন্ন্যাসী তখন সীতারামকে অশেষ ভরসা দিয়া আশীর্ব্বাদস্বরূপ কুড়চি ফুল দিলেন। গজলক্ষ্মীর আশীর্ব্বাদ মনে করিয়া সীতারাম তাহা নিলেন এবং সন্ন্যাসী যাইতে উদ্যত হইলে তাঁহাকে প্রণাম করিলেন।

বাত শুনি তখন বলেন নিরঞ্জন। শুন সীতারাম তুমি আমার বচন ॥
লিখিতে তোমার যখন না চলিবে পুথি। হাথের কলম লয়্যা রেখ্য তুমি তথি ॥
সেই কালে সরস্বতী বসিব বদনে। লেখ্যা যেও পুথি তুমি যেবা আইসে মনে ॥
তোর পুথি নিন্দিতে নারিব কোন নরে। ভবানী বসিব তোর কলম উপরে ॥
আজি হইতে যে পথে চলিয়া যাবে তুমি। সেই পথে তোমার সহিত যাব আমি ॥
যখন স্মরণ তুমি করিবে আমারে। ইন্দাসি হইতে বাছা দেখা দিব তোরে ॥
হের আয় আশিষ কুড়চি ফুল নে। তোর পারা পুণ্যবান্ সংসারে আছে কে ॥
গীত গাইবারে ধর্ম্ম হাথে দিল ফুল। গীত দেখি মহামায়্যা হইল অনুকূল ॥
বিদায় করহ মোরে কহেন বাঁকুড়ারায়। পড়িনু অমনি গিয়া সন্ন্যাসীর পায় ॥

তখন কবির পরকালের ভয় হইল, বলিলেন,

নর মধ্যে অধম আমার সম নাই। তব বাক্য মহাপ্রভু লজ্যা গেল নাই ॥
পরকালে কি হব কহ না মহাশয়। প্রাণ কাঁপে সঘনেতে শমনের ভয় ॥

ধর্ম্মঠাকুর হাসিয়া সান্ত্বনা দিলেন।

বাক্য শুনি তখন জটিলদেব হাসে। পরিণামে মোর পদ পাবে অনায়াসে ॥

১। পাঠ 'কৈলে'। ২। ঐ 'পেল্যা'।

সন্ন্যাসী অন্তর্হিত হইলে সীতারাম দেখিলেন যে দুর্য্যোগ কাটিয়া গিয়াছে। তখন বাড়ীমুখা হইলেন।

এত বোল্যা অন্তর্দ্ধান হইল গোসাঞি। চেয়্যা দেখি ঝড় বৃষ্টি অন্ধকার নাই॥
গগনেতে দেখিলাম সূর্য্যের উদয়। ফিরে ঘর যাব মনে এই যুক্তি হয়॥

সন্ধ্যা হব-হব এমন সময়ে কবি গৃহে ফিরিলেন। গৃহের দরজা পার হইয়া আগে মায়ের কাছে ভাত চাহিয়া তবে মুখ হাত ধুইতে গেলেন।

অবসান দিন দেখ্যা হনু চলাচল। ঘরকে প্রবেশ কৈনু হল্য সন্ধ্যাকাল॥
মায়েরে কহিনু অন্ন আনহ তৎপর। পদ ধুয়ে প্রবেশ করিনু গিয়ে ঘর॥

দক্ষিণ-দুয়ারী ঘরের দাওয়াতে কবির পিতা শুইয়াছিলেন। ভাত খাইতে খাইতে কম্প দিয়া সীতারামের জ্বর আসিল। [তখনও ম্যালেরিয়া ছিল!] হাতমুখ ধুইয়া গায়ে কাপড় দিলেন। শরীর খারাপ হইলেও ঘরে থাকিতে মন টিকিল না। কবি চলিলেন ছোট খুড়ার কাছে আড্ডা দিতে। তখন তিনি গৃহদ্বারে বসিয়া ছিলেন। দেখা হইতেই কাঠের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন। কবি বলিলেন যে ওকথা তাঁহার মনেই ছিল না।

দক্ষিণ-দুয়ারী পিড়া[য়] শুয়েছিলেন বাপ। ভোজনেতে জ্বর এল্য দিয়ে বড় কাঁপ॥
আচমন করি তবে বস্ত্র দিলাম গায়। ঘরে রহিবারে নাই মনে ইচ্ছা যায়॥
ঘরে হইতে যাই আমি ছোট খুড়ার কাছে। দেখিলাম সরকার খুড়া বস্যা আছে নাছে॥
জিজ্ঞাসিল খুড়া মোরে কাষ্ঠের কারণ। সে সকল কথা মোর হয়্যাছে পাসরণ॥

জ্বরগায়ে সীতারাম চণ্ডীমণ্ডপে শুইলেন। নিশীথে স্বপ্নে গজলক্ষ্মী দেবী তাঁহার শিয়রে বসিয়া ধর্ম্মের গীত রচনা করিতে বলিলেন।

রাত্রিকালে শুতিলাম চণ্ডিকা-মেলায়। দুফর যামিনী যবে জ্বর মোর গায়॥
শিয়রে বসিল মোর গজলক্ষ্মী মা। উঠ বাছা সীতারাম গীত লেখ গা॥

দেবী ধর্ম্মমঙ্গল লিখিবার হদিস বলিয়া দিলেন। তখনি উঠিয়া সীতারাম গীত রচনা করিতে বসিলেন। শরীর মন দুইই অবসন্ন এবং প্রেরণারও অভাব, সুতরাং গান লেখা বেশীক্ষণ চলিল না।

সকল কহিল মোরে গীতের সন্ধান। লিখিতে বসিলাম পুথি করি অনুমান॥
চিত্ত নাই স্থির হয় করি কি উপায়। যত লিখি পুথি তত পদ ভেঙ্গে যায়॥

একদিকে দেবতার আদেশ অপরদিকে চঞ্চল চিত্ত। কবি ঘরে তিষ্ঠিতে পারিলেন না। ভবঘুরে বাউল-বৈষ্ণবের মত গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া বেড়াইতে লাগিলেন। ইন্দাস গ্রামে গেলে নারায়ণ পণ্ডিত সীতারামের পরিচয় পাইয়া নিজ গৃহে যত্ন করিয়া দিন কতক রাখিলেন।

বাউল হয়্যা গাঁয়ে গাঁয়ে ফিরি নিরন্তর। মনে ইচ্ছা নাই হয় যাই নিজ ঘর॥
বৈষ্ণবের মত বুলি করি রাম নাম। দিন কত করিলাম ইন্দাসেতে ধাম॥
নারায়ণ পণ্ডিত মোর পরিচয় পেয়্যা। অনেক যতনে মোরে রাখিল ধরিয়া॥

নারায়ণ পণ্ডিতকে ধর্ম্মঠাকুর স্বপ্নযোগে জানাইলেন যে সীতারামকে তিনি জামকুড়ির বনে দর্শন দিয়া ধর্ম্মমঙ্গল গীত রচনা করিতে আদেশ করিয়াছেন, পণ্ডিতও যেন সীতারামকে ধর্ম্মের গান লিখিতে নির্ব্বন্ধ ও সহায়তা করে।

নিশিযোগে স্বপন তারে দিল নিরঞ্জনে। ইহারে দিয়েছি[১] দেখা জামকুড়ির বনে॥
সন্ন্যাসীর বেশে দেখা দিয়াছিলাম আমি। পুথি লিখিবার কথা কয়ে দেহ তুমি॥
আমার মঙ্গলগীত প্রকাশ করিতে। এই হেতু দেখা আমি দিয়েছি[১] বনেতে॥
এই কথা পণ্ডিতে কহিল দেব হরি। হইল প্রভাতকাল পোহাইল[২] শর্ব্বরী॥

তাহার পর ধর্ম্মঠাকুরের সেবায়েত নারায়ণ পণ্ডিতের বংশপরিচয় দিয়া কবি তাহার প্রতি অশেষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিয়াছেন।

যদু পণ্ডিতের পুত্র পণ্ডিত মোহন। তার দুই পুত্র ছিল রাম নারায়ণ॥
জ্যেষ্ঠপুত্র নারায়ণ ধর্ম্ম-অধিকারী। বেদ পঞ্চ হুঙ্কার[৩] সাক্ষাৎ ব্রহ্মচারী॥
নারায়ণ পণ্ডিত বড়ই মহাশয়। যাহা হইতে হইল গীতের পরিচয়॥
সেই মোরে কয়ে দিল গীতের সন্ধান। তাহার চরণে মোর লক্ষ পরণাম॥

নারায়ণ পণ্ডিতের সস্নেহ যত্নে ধর্ম্মঠাকুরের মন্দিরে বসিয়া সীতারাম স্বচ্ছন্দে ধর্ম্মের গান রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন।

১। পাঠ 'দিয়েচি'। ২। ঐ 'পুহালা'। ৩। ওঙ্কার?

লিখিতে বসিলাম পুথি প্রভুর ঘরেতে। লিখি যাই পুথি আমি যেবা আইসে চিতে ॥

নারায়ণ পণ্ডিত মোরে লেখাইল গীত। পুত্রসম পালন করিল নিতি নিত ॥

গৃহে সংবাদ পৌছিল, সীতারাম ধর্ম্মঠাকুরের পূজারীর বাড়ীতে আশ্রয় লইয়াছেন। ইহাতে পিতামাতা বিশেষ কাতর হইলেন। খুড়া একদিন কর্ম্মোপলক্ষ্যে ইন্দাসে আসিয়াছিলেন, তিনি সীতারামকে বাড়ী ফিরাইয়া লইয়া গেলেন। তাঁহারা যখন গৃহে পৌছিলেন তখন সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে।

ঘরে সমাচার পেয়্যা জনকজননী। কান্দিতে লাগিল মাতা দিবসরজনী ॥
একদিন খুড়া মোর গেল কাছারিতে। সমাচার পেয়্যা গেল পণ্ডিত-বাড়ীতে ॥
পণ্ডিত কহিল শুন ইহার বচন। ইহারে করিল দয়া প্রভু নিরঞ্জন ॥
কবিশক্তি [পাইল] এই ঈশ্বরের বরে। খুড়া বলে তবে আমি লয়ে যাব ঘরে ॥
এত বলি নিল মোরে সংহতি করিয়া। দুইজনে ঘরে গে[নু] আনন্দিত হইয়া ॥
ঘরেতে প্রবেশ কৈনু অস্ত দিনমণি। বন্দিলাম দুই জন জনকজননী ॥

পিতামাতা সীতারামকে দোয়াতকলম আগাইয়া দিলেন, কবি আনন্দে লিখিয়া চলিলেন। ধর্ম্মমঙ্গলের স্থাপনা পালা সীতারাম ইন্দাসে রচনা করিয়াছিলেন। বাকী অংশ গৃহে বসিয়া রচনা করিলেন। সমগ্র কাব্য চল্লিশ দিনের মধ্যে রচিত হইল।

দুয়াতি কলম মো[রে দিল] বোলাইয়া। আনন্দেতে পুথি সব লিখিনু বসিয়া ॥
থাপনা পালা লিখিলাম ইন্দাস মোকামে। আদি[১] [আর] হরিশ্চন্দ্র লিখিলাম দুদিনে ॥
বারমতী করিলাম সাঙ্গ চল্লিশ দিবসে। যেবা মনে করি ভাষা লিখি অনায়াসে ॥

তাহার পর কবি পিতৃ- এবং মাতৃ-বংশের পরিচয় দিয়াছেন। ইহা পূর্ব্বে উল্লেখ করিয়াছি। শেষে রচনার তারিখ।

সীতারাম দাস গায় ধর্ম্মপদতলে।
এই পুথি হইল হাজার চারি সালে ॥

১। অর্থাৎ ঢেকুর পালা। পাঠ 'আদ্রী'।

হাজার চারি (১০০৪) সাল সম্ভবতঃ মল্লাব্দ, কেননা ইন্দাস অঞ্চল মল্লরাজধানী বিষ্ণুপুরের নিকটবর্ত্তী। তাহা হইলে সীতারামের কাব্যসমাপ্তির কাল হইতেছে ১৬৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দ।

কবির বাসগ্রামের নাম উপরের বিবরণ হইতে নির্দ্ধারণ করা যায় না।[১] তবে ইহা ইন্দাসের এবং জামকুড়ির অনতিদূরে ছিল, এইটুকু বলা যায়। সম্ভবতঃ সুখসায়ের গ্রামে কবির বাস ছিল।

ধর্ম্মের পূজা ও গান করা তখনকার দিনে উচ্চবর্ণের পক্ষে গর্হিত ছিল। মাণিকরাম গাঙ্গুলি লিখিয়াছেন, "জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান।" সীতারামের আত্মবিবরণ হইতেও ইহা বোঝা যায়। আত্মবিবরণের গোড়াতেই কবি যে খেদ করিয়াছেন তাহা এই ভয়েই।

নম ধর্ম্মঠাকুর অধর্ম্ম কর দূর। আমার কপাল দোষে বিধাতা নিষ্ঠুর॥
ওহে [প্রভু তোর] দয়া বুঝা নাই গেল। তুমি কি করিবে আমার কপালে আছিল॥
কপালের লেখা কভু না হয় খণ্ডন। [জামকুড়ির বনে] দেখা দিল নিরঞ্জন॥

সন্ন্যাসীর বেশে ধর্ম্ম যখন তাঁহাকে গীত রচনা করিতে আদেশ করিলেন তখন সমাজের ভয়ে কবি দ্বিমনা হইয়া বলিয়াছিলেন,

তব বাক্য মহাপ্রভু লজ্যা গেল নাই।

ধর্ম্মমঙ্গলের সঙ্কীর্ণ খাতে কবিত্ব ফলাইবার অবকাশ খুব বেশী নাই। সে হিসাবে সীতারামের কাব্যের অনন্যসাধারণ উৎকর্ষ নাই। তবে সীতারামের যে কবিদৃষ্টির কিঞ্চিৎ পরিচয় গ্রন্থোৎপত্তিবিবরণে পাই তাহা অসামান্য। খর বৈশাখের মধ্যাহ্নে দক্ষিণরাঢ় অঞ্চলের বনের ছবি অপূর্ব্ব বাস্তবতায় মণ্ডিত হইয়া চোখের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে এই দুই ছত্রে—

বৈশাখ সময় তায় কুড়চির ফুল।
ঝুপঝুপ ফুল খসে বাতাসে আকুল॥

এক সীতারাম রচিত মনসামঙ্গলের একাধিক খণ্ডিত পুঁথি বিষ্ণুপুর অঞ্চল

১। অনেকে ইন্দাস মনে করেন [ব-সা-প-প ৬, পৃ ৪৯], তাহা ঠিক নহে। ইন্দাসে কবির মাতুলালয় ছিল।

হইতে পাওয়া গিয়াছে। একটির লিপিকাল ১০৯৬ সাল (সম্ভবতঃ মল্লাব্দ)।[১] উভয় কবি এক হইতেও পারেন।

রামদাস আদক তাঁহার কাব্যের নাম দিয়াছেন অনাদ্যমঙ্গল, অনাদিমঙ্গল অথবা ধর্ম্মপুরাণ।[২] মুদ্রিত পুস্তকের ভণিতা হইতে শুধু এইটুকুই জানা যায় যে কবি ছিলেন জাতিতে কৈবর্ত্ত, তাঁহার পিতার নাম ছিল রঘু, কবি জাড়গ্রামের ধর্ম্মঠাকুরের কৃপাপ্রাপ্ত ছিলেন, এবং পাড়া-বাগনান গ্রামে ধর্ম্মের সাক্ষাৎকার লাভ করিয়াছিলেন।

রামদাস গীত গায় কৈবর্ত্তনন্দন ॥

রঘুর নন্দন গীত বিরচন,
গাইল রামের দাসে।

গান কবি রামদাস কপালের লেখা।
পাড়া-বাগনানে ধর্ম্ম যারে দিলেন দেখা ॥

জাড়গ্রামে[৩] বন্দিলাম ঠাকুর কালুরায়।
যাহার কৃপায় কবি রামদাস গায় ॥

মুদ্রিত পুস্তকখানি বিশেষ অর্ব্বাচীন পুঁথি হইতে প্রস্তুত, যদিও সম্পাদক একথা একবারও বলেন নাই। ভাষা নিতান্ত আধুনিক তো বটেই, তাহা ছাড়া দিগ্‌বন্দনা প্রভৃতি অংশের অকৃত্রিমত্ব সন্দেহজনক।

কোন কোন গায়কের মুখে ও পুঁথিতে (?)[৪] কবির আত্মবিবরণী পাওয়া যায়। এই আত্মবিবরণী কতকটা পরিমাণে মুকুন্দরামের ও ক্ষমানন্দের বর্ণনার অনুরূপ। ইহা হইতে নিম্নে কথিত তথ্য মিলিতেছে।

কবির পৈতৃক বাস ছিল (হুগলী জেলায়, আরামবাগ মহকুমায়) হায়াৎপুর গ্রামে। এই গ্রাম ভুরশুট পরগনার অন্তর্গত। সেখানকার জমিদার ছিলেন প্রতাপনারায়ণ রায়।[৫] গ্রামের মণ্ডল চৈতন্য সামন্ত ছিল নিদারুণ অত্যাচারী।

ভুরশুটে রাজা রায় প্রতাপনারায়ণ। দানে কল্পতরুতুল্য কর্ণের সমান ॥

১। ব-সা-প পুঁথি ১৪২। ২। ব-সা-প প্রকাশিত (১৩৪৫)।
৩। পাঠ 'জাড়াগ্রামে' (অধিকাংশ স্থানে)। ৪। বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ৩৭, অনাদিমঙ্গল, ভূমিকা পৃ ১/০—১।৶০ (সাহিত্যসংহিতা হইতে)। ৫। ভারতচন্দ্রের পূর্ব্বপুরুষ।

তাঁহার রাজত্বে বাস বহুদিন হৈতে। পুরুষে পুরুষে চাষ চষি বিধিমতে ॥
চৈতন্য সামন্ত ছিল গ্রামের মণ্ডল। মুখে মধুস্বর সুধা অন্তরে গরল ॥

একদা পিতা গৃহে না থাকায় খাজানার দায়ে রামদাস বিপাকে পড়িলেন।
পৌষ মাসের খাজানা কিস্তি আদায়ের কালে। পিতা ঘরে নাই দুঃখ রামের কপালে ॥

মণ্ডলের মন্ত্রণায় রাজকর্ম্মচারী। অপমানে অতিশয় আনিলেক ধরি ॥
বিষম বন্ধনে বন্দী রাখে বন্দীখানা। শিশুমতি বড় প্রাণে পাইল যন্ত্রণা ॥
তিন দিন অনশনে বড় কষ্ট পাই। কর্ম্মফলভোগ বড় দিলেন গোসাঁই ॥

কোন গতিকে কারামুক্ত হইয়া কবি পলাইলেন গোরটি (গোরুটি) গ্রামে মামার বাড়ীতে। পথে নানা সুমঙ্গল দেখা গেল।

পথে যেতে সুলক্ষণ দেখে বহুতর। সব্যে শিবা দক্ষে দেখে উরু অজগর ॥
মাথার উপরে ঘুরে বুলে শঙ্খচিল।[১] চৌতুলী ধরেছে মাছে শুখায়েছে বিল ॥
নববৎস গাভী সনে আগুপাছু ধায়। দধিভাণ্ড মাথে লয়ে গোয়ালিনী যায় ॥
শেওড়া গাছে ফুটে আছে চারু চাঁপা ফুল। অনুভবে হবে হেথা দেব অনুকূল ॥
তুলিল চাঁপার ফুল গন্ধমনোহর। বিনাসূতে হার হৈল পরমসুন্দর ॥

তারপর কবির জীবনের পরম ক্ষণ আসিল।

সাতমাসা পাউনান গড় মান্দারণে। পশ্চাতে রাখিয়া রাম যায় বাগনানে ॥
দিবস দ্বিযাম শুভগগনে যখন। অনুকূল চক্ষে হেরিলেন নারায়ণ ॥
শ্বেত অশ্বে চাপি ধর্ম্ম রাউতের বেশে। দয়া করি দেখা দিল দীন রামদাসে ॥

সিপাহী দেখিয়া কবি ভাবিলেন, তাঁহাকে বুঝি ধরিতে আসিয়াছে।

দেশে খাজনার তরে পলাইয়া যাই। বিদেশে ধরিয়া বুঝি লইল সিপাই ॥
ক্ষুধায় তৃষ্ণায় হায় ফেটে যায় বুক। ভাগ্যহীন জনার জনমে নাই সুখ ॥
সম্মুখে সিপাই শোভে শমনসমান। হায় বুঝি বিদেশে বিপত্ত্যে যায় প্রাণ ॥

সিপাহীবেশী ধর্ম্ম রামদাসের মাথায় মোট চাপাইয়া দিলেন,

১। তুলনীয় 'দুটা শঙ্খচিল উড়ে বিষ্ণুপদতলে' [রূপরাম]।

মনে কর বেটা তুমি যাবে পলাইয়া।
এতক্ষণ ঘুরিলাম বেগারী খুঁজিয়া॥
গোলাড় যাইব আমি সঙ্গে তুমি চল।
এত বলি শিরে দিল ঝারি আর কম্বল॥

কবি বলিতেছেন,

ছোট মোট বটে কিন্তু অতিশয় ভারি।
বহিতে না পারি বোঝা বুক ফেটে মরি॥

সিপাহী তখন শাসাইলেন,

আমার সম্মুখে যদি ফেলে দিস মোট।
দ্বিখণ্ড করিব তোরে মারি এক চোট॥

তাহার পর কবি বলিতেছেন,

সিপাইয়ের কথা শুনে মুদে গেল আঁখি। কোথায় সিপাহী ঘোড়া আর নাহি দেখি॥
মনে মনে চিন্তে রাম দুঃখ কেন পাই। কাণাদিঘীর জল খেয়ে মামাবাড়ী যাই॥
ঢলঢল কমল অমল অতিশয়। হেরিয়া পূরিত হইল আনন্দে হৃদয়॥
জল পান করিবারে জলেতে নামিল। অভাগাপরশে জল শুকাইয়া গেল॥

হতাশ হইয়া রামদাস কাঁদিতে লাগিলেন, এমন সময় ধর্ম্মঠাকুর দিব্য ব্রাহ্মণ-মূর্ত্তি ধরিয়া স্বর্ণকমণ্ডলু হস্তে আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,

ক্ষুধায় তৃষ্ণায় রাম ক্লেশ পাও তুমি। তোমার লাগিয়া জল আনিয়াছি আমি॥
এত বলি বদনে দিলেন গঙ্গাজল। আজি হৈতে রামদাসের জীবন সফল॥
জলপানে রামদাস প্রাণ পেলে তুমি। ধর্ম্মের সঙ্গীত গাও শুনি কিছু আমি॥

কবি উত্তর করিলেন,

পাঠ পড়ি নাই প্রভু চঞ্চল হইয়া। গোধন চরাই মাঠে রাখাল লইয়া।
খেলা-ছলে ধর্ম্মপূজা কর্ম্মকাণ্ডহীন। জানি না ধর্ম্মের গীত তায় অর্ব্বাচীন॥

ধর্ম্মঠাকুর সান্ত্বনা দিলেন,

আজি হৈতে রামদাস কবিবর তুমি। জাড়গ্রামে কালুরায় ধর্ম্ম হই আমি॥
আসরে জুড়িব গীত আমার সোঙরণেঃ। সঙ্গীত কবিতা ভাষা ভাসিবে বদনে॥

ইত্যাদি বলিয়া নিজমূর্ত্তি দেখাইয়া নারায়ণ অন্তর্দ্ধান করিলেন। ইহার পর এই রচনাকালজ্ঞাপক পয়ার পাওয়া যায়—

বেদ বসু তিন বাণ শকে সুপ্রচার। ভাদ্র আদ্য পক্ষ আট দিবস তাহার॥
যাত্রাসিদ্ধি বন্দিলাম গ্রাম হায়াৎপুরে। প্রথম প্রচার গীত যাহার দুয়ারে॥

ইহা হইতে পাই ১৫৮৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৬৬২ খ্রীষ্টাব্দ। ইহা স্বচ্ছন্দে রামদাসের কাব্যের রচনাকাল হইতে পারে।

মূল কাহিনীতে কিছু বৈচিত্র্য নাই, তবে অবান্তর বিষয়ে রামদাসের কাব্যে কিছু কিছু নূতনত্ব দেখা যায়। সৃষ্টিপত্তন বিবরণ কতকটা রতিরাম দাসের ও ব্রহ্মহরি দাসের বর্ণনার অনুরূপ। রামদাসের মতে পাঁচ সিদ্ধার জন্ম ধর্ম্মের চিতাভস্ম হইতে।

চিতাভস্ম সকলি উড়িয়া যায় যায়।
গোরক্ষনাথ মহাশয়ের জন্ম হইল তায়॥
চরণে চৌরঙ্গিনাথ হাড়িপা হইল হাড়ে।
যার গুণে গোবিন্দচন্দ্র রাজপাট ছাড়ে॥
পাঁচ সিদ্ধার জন্ম হইল ধর্ম্ম হইতে। পৃ ১০॥

শ্রীচৈতন্যের বন্দনায় কবি কিছু নূতন কথা শুনাইয়াছেন।

ভেদ মন্ত্র সুবন্ত অভেদ মন্ত্র খড়ি। সুবন্তসাধন হইতে খড়ির হইল ডেরি॥
খড়ি আনি দিতে হরি গুরুকে কহিল। নিদারুণ গুরু তায় পুথি প্রহারিল॥
মারিল পুথির বাড়ি দুর্ব্বৃত্ত ব্রাহ্মণ। সেইখানে চতুর্ভুজ হৈলা নারায়ণ॥
তাহা দেখি দ্বিজবর জুড়ে দুই হাত। না বুঝিয়া মারিলাম ক্ষম অপরাধ॥
.. ..
শিশুগণ লয়ে খেলা হয় দিবারাতি। প্রভুর বাজারে ছিল নীলকণ্ঠ তাঁতী॥
দৈবের বিপাকে তার বস্ত্র গেল পুড়ে। চৈতন্যের নাম লইতে বিকাল বাজারে॥
পোড়া বস্ত্র বিকাইল অমূল্য রতন। কাটোয়াতে দিল গৌরচাঁদের ভুবন॥
পৃ ৩-৪॥

মাহুদার অত্যাচারের বর্ণনায় মুকুন্দরামের প্রভাব আছে।

সাক্ষাৎ হইল পাত্র কালান্তক যম। পনের কাঠায় কুড়া বাণ কাঠা কম।
পাইকে জমিকে মাপে কোণে কোণে দড়ি। বেতন বেয়াজ করি পাইকে চায় কৌড়ি॥
বকেয়া আদায় করে নহে কম কড়া। সুদ রফা বাদ নাঞি সুদের সুদ দেড়া॥
প্রমাদ শুনিয়ে পাইলে[১] পলাইয়ে যায়। ধন জন আটকি সর্ব্বস্ব কাড়ি লয়॥
আশ্রয়ে অধিক কষ্ট পলায়নে দুখ। দুঃখ সয়ে রয় কেউ ভাবে পরে সুখ॥
বিমুখ বিধাতা যারে বিদেশে পলায়। স্বদেশের মায়ামোহ পাসরিয়া যায়॥

পৃ ১৭॥

মুদ্রিত পুস্তক আধুনিক গায়কের পুঁথি অবলম্বনে প্রকাশিত। ইহাতে অন্যান্য ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের মিশ্রণ যে কিছু কিছু ঘটিয়াছে তাহা অসম্ভাবিত নয়। অতএব ইহা অবলম্বন করিয়া রামদাসের কবিত্বশক্তির সম্বন্ধে বড় কিছু বলা চলে না।

অধিকাংশ ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতাদিগের নামে 'রাম' শব্দ আছে। ইহা কি নিতান্তই আকস্মিক, না 'বামাই' নামের প্রভাবজাত?

১। পাঠ 'পাল্য'

সপ্তত্রিংশ পরিচ্ছেদ

রামায়ণ ও মহাভারত কাব্য

উত্তরবঙ্গে একদা সুপ্রচলিত একটি রামায়ণ[1] কাব্যের কবি সাধারণতঃ "অদ্ভুতাচার্য্য" নামে উল্লিখিত হইয়া থাকেন। ইঁহার আসল নাম "বড়ু" নিত্যানন্দ বা নিত্যানন্দ আচার্য্য। পিতার নাম শ্রীনিবাস (মতান্তরে কাশী) আচার্য্য, মাতার নাম মেনকা। কবিরা ছিলেন চারি ভাই। বাসস্থান ছিল সোনাবাজু পরগনায়, আত্রেয়ীর উত্তর করতোয়ার পশ্চিম বড়বাড়ী বা অমৃতকুণ্ডা গ্রামে। অল্পবয়সে কবি শ্রীরামচন্দ্রের অনুগ্রহ পাইয়া রামায়ণ গান করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। এই সংবাদ পাওয়া যায় বিভিন্ন পুঁথিতে প্রদত্ত বিবরণী হইতে। কবি-পরিচয়ের বিভিন্ন পাঠ মিলাইলে নিম্নলিখিতরূপ নিষ্কর্ষ খাড়া করা যাইতে পারে।

প্রপিতামহ বন্দো যাহার আদি[2] খণ্ড। তাহার পুত্র উপজিল নামেতে মার্কণ্ড ॥
তার পুত্র উপজিল নামে শ্রীনিবাস। গুণের সাগর তাঞে নারায়ণদাস ॥
তাহার ঘরেত হইল মেনকা-জঠরে।[3] জনমিল চারি পুত্র চারি সহোদরে ॥[4]
চারি সহোদর তারা পণ্ডিত গুণনিধি। ভারতীপ্রসাদে পাইল অপেক্ষিত সিদ্ধি ॥[5]

১। আদিকাণ্ড রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৩২০)। ২। পাঠ 'আইদ'।

৩। পাঠান্তর 'তাতে উপজিল পুত্র মানিক প্রবর।'

৪। ঐ 'চারি পণ্ডিত ভাল জন্মিলা তার ঘরে।'

৫। অতঃপর কোন কোন পুঁথিতে আছে [ব-সা-প-প ৫, পৃ ২৮২-৮৩, বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ৮৭]—

'সোনাবাজু নামে ছিল বড়বাড়ী গ্রাম। শুভক্ষণে হইল যে নিতানন্দ নাম ॥'

পাঠান্তর 'আত্রাই কূলেতে বাস বড়বাড়িয়া গ্রাম। শুভক্ষণে হইল জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ নাম ॥'

মুদ্রিত গ্রন্থের অতিরিক্ত পাঠ—

'সেরসাবাদ সরকার সোনাবাজু গ্রাম। অদ্ভুত নাম সে যে অতি অনুপাম ॥
আত্রাইর কূলে তার বাড়িতে আশ্রম। শুভক্ষণে জন্মিল বড়ু নিত্যানন্দ নাম ॥
আত্রাইর তীর সেহি কুরুক্ষেত্র সমান। মহা পুণ্যস্থান সেই পুরাণে ব্যাখ্যান ॥

ইহার পাঠান্তর

'শিবসার যোগে সুবর্ণপুরী গ্রাম। অমৃতাখ্যা নাম তাহে অতি অনুপাম ॥
আত্রাই পূর্ব্বমুখী যথা কুরুক্ষেত্র ধাম। করতোয়ার পশ্চিমে জাহ্নবী অনুপাম ॥'

[ব-সা-প-প ১৩, পৃ ১৬৪-৬৫, বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ৮৭]।

করতোয়ার পশ্চিমে আত্রাইর উত্তর কূলে। মহাপুণ্যস্থান সেই পুরাণেতে বোলে॥
অমৃতকুণ্ডা গ্রাম নাম অধিকারী তার। শ্রীনিবাস আচার্য্য সাধুর আচার॥[১]
তার ঘরে জন্মিলেন এ চারি তনয়। মেনকা উদরে জন্ম চারি মহাশয়॥[২]
জ্যেষ্ঠ তিনজন অতি বিচক্ষণমন্ত। অতি মূর্খ আছিল কনিষ্ঠ নিত্যানন্দ॥[৩]
সপ্ত বৎসরের শিশু অক্ষর নাহি চিনে। খেলাইয়া ফেরে সব রাখালের সনে॥
মাঘ মাসের ভীম-একাদশী তিথি। স্বপ্নাদেশে সাক্ষাৎ হইল রঘুপতি॥[৪]
সঙ্গেতে জানকী আর অনুজ লক্ষ্মণ। শিয়রে বসিয়া কহে কমললোচন॥
রাম বোলে নিত্যানন্দ কিছু গাও শুনি। নিত্যানন্দ বোলে কিছু গাইতে না জানি॥
টোন হইতে অস্ত্র খসাইয়া লৈল হাতে। এক মহামন্ত্র তার লিখিল জিহ্বাতে॥
হৃদয়েত সেই মন্ত্র করিল স্মরণ। পূর্ব্ব অনুক্রমে রচিল রামায়ণ॥
... ...
জন্মে নাহি পড়ে কিছু অক্ষরের লেশ।[৫] যত যত কহে কথা রাম-উপদেশ॥
পয়ার প্রবন্ধে পদ করিল প্রচার। তপোবলে হৈল তার এ তিন কুমার॥
জয় বিজয় হৈল আর নিত্যানন্দ। একত্রে তিনেক বর দিলা রামচন্দ্র॥[৬]

স্বপ্নদর্শন ব্যাপারের এইরূপ বর্ণনান্তর পাওয়া যায়—

করতোয়া-কূলে বাড়ী অমৃতকুণ্ড গ্রাম। শুভক্ষণে হইল বটু নিত্যানন্দ নাম॥
মহাপুরুষ নিত্যানন্দ জন্মিলা সংসারে। যত শাস্ত্র পাঠ করে পঞ্চ বৎসরে॥
যজ্ঞোপবীত না হইলেক সপ্ত বৎসরে। গোরক্ষ হইয়া ফিরে বনের ভিতরে॥[৭]
ব্রাহ্মণরূপেতে আইলা দেব নারায়ণ। আনন্দিত হইয়া তাথে দিলা দরশন॥
ব্রাহ্মণ বোলেন শিশু শুন মোর বাণী। কিছু গান কর আমি কাণ পাতি শুনি॥

১। পাঠান্তর—'অমর্ত্তকুণ্ডা সোনগ্রাম অধিকারী তার।
শ্রীকাশী আচার্য্য তাহে সুধীর সদাচার॥'

২। ঐ 'মেনকার উদরে চারি ব্যাস অবতার॥'

৩। ঐ 'জ্যেষ্ঠ তিনজন হৈল মহা বিচক্ষণ। অতি মুর্খ আছিলেন কনিষ্ঠ নিত্যানন্দ॥'

৪। ঐ 'মাঘ মাসে শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী তিথি। ব্রাহ্মণবেশে পরিচয় দিলেন রঘুপতি॥'

৫। ঐ 'জন্মি নাহি জানে বিপ্র অক্ষরের লেশ।'

৬। অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ, পৃ ২-৩, ব-সা-প-প ৫, পৃ ২৮২-৮৩, ১৩, পৃ ১৬৪-৬৫; বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ৮৭।

৭। পাঠান্তর 'যজ্ঞপবিত্র নাহি বয়সে সপ্তবৎসর। রামায়ণ গাইতে আজ্ঞা দিলা রঘুবর॥'

বটু বোলেন শুন গোসাঞি তুমি মোর বাণী। রাখালের গান ভিন্ন অন্য নাহি জানি॥
বিপ্র বলে গাও তুমি যে আইসে মনে। রাখাল হইয়া গান কইলা প্রভুর দেবের স্থানে॥
শুনি তুষ্ট হইলা তবে প্রভু নারায়ণ। গলা ধরি রাখালেরে দিলা আলিঙ্গন॥
তৃণ হতে খসাইল প্রভু দিব্য শর। মহামন্ত্র লিখিলা তার জিহ্বার উপর॥
মাথে হস্ত দিয়া বর দিলা নারাযণ। আজি[১] হইতে যত কথা সকলি আমার গুণ॥
রঘুনাথ নাম তার থুইলা আপনি। সপ্তকাণ্ড রামায়ণ কণ্ঠস্থলে শুনি।
মাঘ মাসে শুক্লপক্ষ ত্রয়োদশী তিথি। ব্রাহ্মণবেশে পরিচয় দিলা রঘুপতি॥
রাম আজ্ঞা করিল রচিতে রামায়ণ। অদ্ভুত-আচার্য্য নাম তাহার কারণ॥
পয়ারপ্রবন্ধে পোতা করিল রচন। প্রভুর আশীর্ব্বাদে হইল তিনটা নন্দন॥
জয় বিজয় হইল আর শিবানন্দ। তিন ভাইরে এক বর দিলা প্রভু রামচন্দ্র॥[২]

অতিশয়োক্তির বাহুল্যে কবিপরিচয় অংশ অকৃত্রিম (অর্থাৎ কবিরচিত) বলিতে প্রবৃত্তি হয় না। দ্বিতীয় বিবরণে স্বপ্নদর্শন ব্যাপারকে বাস্তব বলা হইয়াছে, সুতরাং ইহার কৃত্রিমত্ব সুস্পষ্ট।

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণের যত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার কোনটিই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগের পূর্ব্বে লিখিত হয় নাই, অধিকাংশ পুঁথি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকের। কাব্যরচনার কালও জানিবার উপায় নাই। অনুমান হয়, কবি সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ইহার অধিক কিছু বলা চলে না। শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয় দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে অদ্ভুতাচার্য্য ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে বর্ত্তমান ছিলেন।[৩]

"অদ্ভুতাচার্য্য" কবির নামও নহে উপাধিও নহে। ইহা রামায়ণ-গায়কদের উদ্ভাবিত। বাঙ্গালা রামায়ণ কাব্যমাত্রেই অদ্ভুত-রামায়ণের কাহিনী গৃহীত হইয়াছে বলিয়া "অদ্ভুত আশ্চর্য্য রামায়ণ" বা "অদ্ভুত" এইরূপে উল্লিখিত হইয়াছে দেখা যায়। "অদ্ভুত আশ্চর্য্য" হইতে "অদ্ভুত আচার্য্য" কথা উদ্ভূত হইয়াছে।

১। পাঠ 'আইজ'। ২। মালদহের পুঁথি [ভূমিকা, পৃ (১)-(২)], ব-সা-প-প ৫, পৃ ২৮২-৮৩।
৩। ভারতবর্ষ, ১৩৪১ মাঘ, পৃ ১৭৭-৮৫।

এই প্রসঙ্গে ইহাও স্মর্ত্তব্য যে কবির কৌলিক উপাধি ছিল "আচার্য্য"। ভণিতায় "অদ্ভুত আচার্য্য" ও "অদ্ভুত" ছাড়া কবির অন্য কোন নাম পাওয়া যায় নাই।[১]

অদ্ভুতাচার্য্যের রামায়ণ কৃত্তিবাসের কাব্য অপেক্ষা আকারে বৃহৎ। তাহার কারণ প্রধানতঃ এই যে ইহাতে অপর কবির রামায়ণ কাব্যের সংমিশ্রণ ঘটিয়াছে। কাব্যটিতে কবিত্বের বালাই বিশেষ কিছু নাই।

বৈদ্য ("ভিষক্") রামশঙ্করের রামায়ণ[২] সপ্তদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে অথবা অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। "কবি রামশঙ্কর দত্ত (রায়ের) বাসভূমি মাণিকগঞ্জের অন্তর্গত খোলাপাড়া ও তৎসন্নিহিত (৩ মাইল দূরে) বায়রা গ্রামে ছিল। তিনি তথাকার প্রসিদ্ধ বৈদ্যবংশ সম্ভূত ছিলেন। বায়রার রায় মহাশয়েরা বলেন,—তাঁহাদের বংশীয় শ্রীচন্দ্র রায়ের পিতামহ মুরশিদাবাদ বটতলা নিবাসী বলবন্ত রায় চতুর্দ্দশ সহস্র সেনার অধিনায়ক হইয়া বিদ্রোহ দমনার্থে মুরশিদাবাদ হইতে ঢাকায় আগমন করেন এবং বিদ্রোহ দমনে কৃতকার্য্য হওয়াতে পুরস্কার স্বরূপ সাহ উজিয়ান পরগণায় জমিদারী প্রাপ্ত হন। উক্ত পরগণার তপা পারিল। এই পারিলেই বৈদ্যবাটী ও খোলাপাড়া এক একটি পাড়া মাত্র। রাজকীয় ষড়যন্ত্রের মধ্যে পড়িয়া বলবন্ত রায় এদেশ ত্যাগ করিয়া পুনরায় মুরশিদাবাদ চলিয়া যাইতে বাধ্য হন। তৎপর শ্রীচন্দ্র রায় মহাশয় নবাব সায়েস্তা খাঁর সঙ্গে ১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে এদেশে আসিয়া তাঁহার পৈত্রিক সম্পত্তি ভোগ করিতে থাকেন। তিনি পারিল হইতে বায়রা আসিয়া বসতি করেন। তাঁহার সঙ্গে, কি তাঁহার সময়ে রামশঙ্কর দত্ত রায় বায়রাতে একটি বাড়ী নির্ম্মাণ করিয়া বাস করেন; কিন্তু খোলাপাড়াতেও (পারিলেও) তাঁহার একটি বাড়ী ছিল। সুতরাং রামশঙ্কর শ্রীচন্দ্র রায়ের সমসাময়িক লোক ছিলেন।"[৩]

১। মালদহ অঞ্চলের পুঁথিতে "অদ্ভুত নরসিংহ ভণে," "অদ্ভুত মাধব ভণে," "নীলমাধব ভণে" ইত্যাকার ভণিতা মধ্যে মধ্যে আছে। কিন্তু রঙ্গপুর অঞ্চলের পুঁথি দুইটিতে (১২২৭ সালে অনুলিখিত) এইরূপ ভণিতা নাই [মুদ্রিত সংস্করণের ভূমিকা দ্রষ্টব্য]।

২। DCBM, Vol. I, পৃ ১৪৭ ; বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ১০৯-১১০।

৩। বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ১১০ (ঢাকা রিভিউ ও সম্মিলন দ্বিতীয় বর্ষ একাদশ সংখ্যায় প্রকাশিত "পূর্ব্ববঙ্গের প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য" প্রবন্ধ হইতে)।

কবির ভণিতা এইরূপ—

বাল্মীকি রচিত গ্রন্থ শ্লোক মনোহর। পাঁচালী প্রবন্ধে কহে শ্রীরামশঙ্কর॥
বন্দিয়া জানকীনাথ শ্রীশঙ্কর গায়। আরণ্যকাণ্ডের দশ অধ্যায় হল সায়॥
বাল্মীকি রচিত গ্রন্থ শ্লোক অনুসারে। কৃত্তিবাস আদি কবি পদবন্ধ করে॥
বাল্মীকি বশিষ্ঠ আর অদ্ভুত গ্রন্থকার[১]। মহাভাগবত আদি পুরাণ প্রচার॥
এই সব গ্রন্থ শুনি শ্লোক অনুসারে। পদবন্ধ করি কহে ভিষক্ শঙ্করে॥
অদ্ভুত কৃত্তিবাসের কবিত্ব শুনিয়া। কহিল শঙ্কর কিছু সংক্ষেপ করিয়া॥

বোধ হয় তখনকার দিনের রামায়ণ-রচয়িতা মাত্রেই "অদ্ভুত আচার্য্য (<অদ্ভুত আশ্চর্য্য)" নাম বা উপাধি ব্যবহার করিতেন। রামশঙ্করও করিয়াছেন।

অদ্ভুত আচার্য্য কবি সরস্বতীবরে।
পদবন্ধ করি কহে শ্রীরামশঙ্করে॥

পূর্ব্ববঙ্গে ১১০৫ সালে অর্থাৎ ১৬৯৮-৯৯ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত "দ্বিজ" লক্ষ্মণ রচিত শিবরামের যুদ্ধ পালার এক পুঁথি এবং পশ্চিমবঙ্গে ১০৬১ সালে (মল্লাব্দে?) অনুলিখিত আর একটি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কবি পূর্ব্ববঙ্গের অথবা পশ্চিম-বঙ্গের যে স্থানেরই হউন, তাঁহার যশ বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে কাব্যটি বঙ্গদেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে প্রসার লাভ করিতে নিশ্চয়ই কিছু সময় লাগিয়াছে। সুতরাং কবির সময় সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পরে নহে, পূর্ব্বে। কবি ভণিতায় নিজেকে "দ্বিজ লক্ষ্মণ," "শ্রীলক্ষ্মণ" ও "শ্রীযুত লক্ষ্মণ" বলিয়াছেন।

কবি সম্ভবতঃ অধ্যাত্ম-রামায়ণ সম্পূর্ণভাবে অনুবাদ করিয়াছিলেন। একটি পুঁথির ভণিতায় পাওয়া যাইতেছে—

আধ্যাত্মিক-রামায়ণ আদিখণ্ড সায়।
রামপদরজ ভাবি শ্রীলক্ষ্মণ গায়॥[২]

বন্দ্যঘটীয় লক্ষ্মণ রচিত মহাভারতের কোন কোন পর্ব্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৩] উভয় রচনা একই কবির লেখনীপ্রসূত হওয়া সম্ভব।

১। অর্থাৎ অদ্ভুত রামায়ণ প্রণেতা। ২। ব-সা-প-প ৬, পৃ ৬৭, ৭২, DCBM, Vol. I পৃ ১৲।
৩। ব সা-প-প ৪, পৃ ২৯৯।

কৈলাস বসুও অদ্ভুত-রামায়ণ[১] অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কবির কাল জানা নাই। কাব্যের ভণিতা এইরূপ—

দশরথসুতকান্তা জন্মবিবরণ শ্রবণ করিলে হয় বৈকুণ্ঠে গমন॥
ভরদ্বাজ কহিলা বাল্মীক তপোধন। সেই কথা দ্বিজমুখে করিয়া শ্রবণ॥
ভাষাছন্দে বিরচিল বসু শ্রীকৈলাস। সীতারামচরণ লভিতে অভিলাষ॥

কবি মহাভাগবত অবলম্বনেও একটি কাব্য রচনা করেন।[২] এই কাব্যের ভণিতা এইরূপ—

শিব-উক্ত পুরাণ রচিলা বেদব্যাস।
ভাষাতে প্রকাশ কৈলা বসু শ্রীকৈলাস॥

এই কাব্যের অনুবাদ কার্য্যে কবি ত্রিলোচন তর্করত্ন নামক পণ্ডিতের সাহায্য লইয়াছিলেন।

ত্রিলোচন তর্করত্ন গ্রন্থ-অর্থ করি যত্ন
উপদেশ করেন প্রদান।
শ্রীকৈলাস বসু দাস ভাষাতে করে প্রকাশ
মহাভাগবত যে পুরাণ॥

(৮) ভবানীদাস বিরচিত লক্ষ্মণ-দিগ্বিজয়, শত্রুঘ্ন-দিগ্বিজয় ও রামচন্দ্রের স্বর্গারোহণ ইত্যাদি পালার একাধিক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৩] ইঁহার পিতার নাম যাদবানন্দ, মাতার নাম যশোদা। জাতিতে কায়স্থ পদবী ঘোষ, বাসস্থান ছিল পাতণ্ডা (বা পাণ্ডুণ্ডা বা পাতুণ্ডা) গ্রামে।

একটি পুঁথিতে পাওয়া যায়—

নবদ্বীপপুরী বন্দোঁ। অতি বড় ধন্য। যাহাতে উৎপন্ন হৈল ঠাকুর চৈতন্য॥
গঙ্গার সমীপে আছে বদরিকাশ্রম। তাহাতে বসতি করে ভবানীদাস নাম॥
যাদবানন্দ[৪] পিতা তথা যশোদা জননী। সপুত্রে বন্দম যারে[৫] সর্ব্বলোকে জানি॥

১। ব-সা-প পুঁথি ৫৬৬। ২। ব-সা-প পুঁথি ৭৯৯,৮০১।
৩। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ২২১-২২, ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩৩৫-৩৬, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ১৫১৪, শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পরিশিষ্ট ১, পৃ ১১।
৪। পাঠান্তর 'বামনদেব'। ৫। পাঠ 'যবে'।

শিশুকাল হতে তান আন নাহি চিত্তে। কণ্ঠে সরস্বতী তার করএ কবিত্বে ॥
দেবতার কৃপা তার হইল প্রকাশ। রামস্বর্গ-আরোহণ রচিতে অভিলাষ ॥[১]

অপর একটি পুঁথিতে আছে—

নবদ্বীপপুরী বন্দোম অতি বড় ধন্য। যাহাতে প্রবীণ হইল ঠাকুর চৈতন্য ॥
নিজ্জুত নিগুঢ় প্রেম ভেদ নাহি জানে। জগৎ তরাইলা প্রভু দিয়া প্রেমদানে ॥
নিজ দেশ বন্দোম অতি অনুপাম। গঙ্গার সহিত বন্দোম শঙ্করপ্রধান ॥
জনক যাদব বন্দোম যশোদা জননী। সর্ব্বলোকে[২] বোলে নর সতীব্রতা জানি ॥
ইত্যাদি।[৩]

ভবানীদাস একটি রাধাকৃষ্ণলীলা বিষয়ক কাব্য লিখিয়াছিলেন। কাব্যটির নাম রাধাকৃষ্ণবিলাস বা রাধাবিলাস। ইহাতে কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

পাতগুা নিবাসী ঘোষ ভবানী অবোধা।
জনক যাদবানন্দ জননী যশোদা ॥[৪]

রাধাবিলাস কাব্যের পুঁথির লিপিকাল ১০৫৬ সাল (—মল্লাব্দ মনে করিবার কোন হেতু নাই—) অর্থাৎ ১৬৪৯-৫০ খ্রীষ্টাব্দ। এই কাব্যের দানখণ্ডের এক পুঁথি উত্তরবঙ্গ হইতে পাওয়া গিয়াছে।[৫] এই লীলাবর্ণনা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের দানখণ্ডের কতকটা অনুযায়ী বটে।

১৬১৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৩-৯৪ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত এবং কান্দী অঞ্চলে প্রাপ্ত ভবানীদাস রচিত গজেন্দ্রমোক্ষণ পালায় এক পুঁথিতে বন্দনা অংশের পরে এই পাঠতুষ্ট আত্মপরিচয় দেওয়া আছে—

দ্বিজগণের গুরুজনের বন্দিয়া চরণ। ভবানীদাস কহে গজেন্দ্রমোক্ষণ ॥
পাগুগুা গ্রামে বসত সর্ব্বলোকে জানে। সৌকালীন ঘোষ তেঁহো বিদিত ভুবনে ॥
সে স্থানে করিয়ে দণ্ডবৎ প্রণাম। সাম্প্রতিক বন্দো বিরাট গ্রাম ॥
সভার চরণে করিয়ে বিনয়। গজেন্দ্রমোক্ষণ নামে করি পঞ্চালি ॥

১। ব-সা-প প ৪, পৃ ৩৩৬। ২। পাঠ 'পূর্ব্বলোকে'।
৩। বা-প্রা-পু বি ১-১, পৃ ২২২। ৪। ব-সা-প-প ৮, পৃ ৩৮-৩৯।
৫। শ্রীমান্ শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী লিখিত ভবানীদাসের দানপূর্ব্বখণ্ড প্রবন্ধ [আনন্দবাজার পত্রিকা ৫ই ফাল্গুন ১৩৪৬] দ্রষ্টব্য।

বাওন হইয়া মনে ধরিতে চাহে চান্দ। ভাগবত শাস্ত্র করি পাঁচালির ছন্দ ॥[১]

ভবানীদাসের সময় সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমভাগের পরে নহে। মালদহ এবং শ্রীহট্ট অঞ্চলেও ইহার কাব্যের পুঁথি পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং ইনি কতকটা প্রতিষ্ঠাপন্ন কবি ছিলেন, বলিতে হইবে। এক ভবানীদাসের ব্রহ্মপুরাণের পুঁথি শ্রীহট্ট অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।[২]

মণ্ডল-উপাধিক চন্দনদাস দত্ত বিরচিত প্রমীলার সহিত অর্জ্জুনের যুদ্ধ পালার যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার লিপিকাল ১০২৭ সাল (মল্লাব্দ?)।[৩] কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

আগরি কুলেতে জন্ম নিবেদন করি।
পিতামহ নারায়ণ দত্ত কহিয়ে গোচরি ॥
পিতা পুরুষোত্তম দত্ত করি নিবেদন।
আকুরোল গ্রামেতে বাস শুন সর্ব্বজন ॥
দত্ত পদ্ধতি মোদের কেহ নাই জানে।
মণ্ডল বলিয়া দেশে বলে সর্ব্বজনে ॥

১। ব-সা-প-প ৫, পৃ ২৮৭-৮৮। ২। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পরিশিষ্ট ১, পৃ ১১।
৩। বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ১, পৃ ৬৯৪।

অষ্টাদশ শতাব্দী

অষ্টত্রিংশ পরিচ্ছেদ

অষ্টাদশ শতাব্দীর ভূমিকা

পদাবলী বৈষ্ণব মহান্ত-জীবনী বৈষ্ণব কড়চা নিবন্ধ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রামায়ণ-কাহিনী মহাভারতের কাহিনী মনসামঙ্গল ইত্যাদিতে স্থূলতঃ সপ্তদশ শতাব্দীর ধারা পরবর্ত্তী শতাব্দীতেও চলিয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গে এই সময়ে চণ্ডীমঙ্গল ও দেবীমাহাত্ম্য কাহিনী লোকপ্রিয় ছিল, আর পশ্চিমবঙ্গে বিশেষ করিয়া দক্ষিণ রাঢ়ে ধর্ম্মমঙ্গল এবং সত্যনারায়ণ পাঁচালী বহু বহু কবির উপজীব্য হইয়াছিল। বিদ্যাসুন্দর-কাহিনীমূলক দেবীমাহাত্ম্য কাব্য এই সময়ে অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল। এই সময়ে রচিত অন্যান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেবীমাহাত্ম্যসূচক "মঙ্গল" নামে অভিহিত ব্রতকথাজাতীয় কাব্য অনেকগুলি পাওয়া যাইতেছে।

উত্তর ও উত্তরপূর্ব্ব বঙ্গে এই সময়ে শৈব নাথপন্থীদিগের গোরক্ষনাথ ও অন্যান্য সিদ্ধার মাহাত্ম্যসূচক গাথা জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ আদর লাভ করিয়াছিল। এইজাতীয় গীত একটিমাত্র পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পদাবলী ও শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল বিশেষভাবে আদৃত হইত, বিশেষ করিয়া পশ্চিমবঙ্গে। পদসংগ্রহ গ্রন্থগুলি প্রায় সবই এই শতাব্দীতে সঙ্কলিত হইয়াছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে দেশের শাসনভার ইংরেজের হাতে চলিয়া যায়। কিন্তু বাঙ্গালাদেশ এবং ভারতবর্ষের এই যে অন্যতম প্রধান গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা সাহিত্যে কোন ছাপ রাখে নাই। ইহার কারণ এই যে, ইংরেজ একদিনে এদেশের রাজা হয় নাই, ধীরে ধীরে একটির পর একটি ক্ষমতা গ্রহণ করিয়া পূর্ণ রাজশক্তি করতলগত করিতে যথেষ্ট সময় লাগিয়াছিল। দ্বিতীয় কারণ হইতেছে, দেশের অভ্যন্তরীণ শাসন অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্থানীয় জমিদারদিগের হস্তেই ছিল। সুতরাং জনসাধারণ রাষ্ট্রীয় পরিবর্ত্তনের কোনই আঁচ পায় নাই। সাহিত্যে ইংরেজ-শাসনের সর্ব্বপ্রথম ইঙ্গিত পাই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে লিখিত পুঁথির

পুষ্পিকায়। কোন কোন লিপিকার পুঁথির শেষে তারিখ ইত্যাদি দিয়া শেষে স্থানীয় ইংরেজ শাসনকর্ত্তার নাম করিয়াছে।

যে সকল জমীদার বা ব্যবসায়ী ইংরেজের সম্পর্কে আসিয়া ধনী হইল তাহারা সমাজে প্রতিপত্তিশালী হইয়া উঠিল, এবং অনায়াসলব্ধ অপর্য্যাপ্ত অর্থ পাইয়া অস্তায়মান মোগলসাম্রাজ্যের ম্লান রাজসভার চাকচিক্য ও বিলাসব্যসনের অনুকরণ করিতে লাগিল। ইহার ফলে সমাজের উচ্চস্তরে (—এখানে প্রধানতঃ পশ্চিমবঙ্গের কথাই বলিতেছি—) বাহ্যাড়ম্বর প্রাণহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দেখা দিল। ইহারই প্রতিচ্ছবি পাই অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যে। এই উচ্ছৃঙ্খলতা চরমে দাঁড়ায় ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে কলিকাতা অঞ্চলে।

দক্ষিণরাঢ় অনেকটা স্বতন্ত্র ছিল বলিয়া এই অঞ্চলে সাহিত্যসাধনার মধ্যে তখনও সবল প্রাণস্পন্দন ছিল। মল্লভূমিতে এবং তাহার সংলগ্ন অঞ্চলে রচিত ধর্ম্মমঙ্গল শিবায়ন রামায়ণ মহাভারত ইত্যাদিতে এবং লৌকিক ছড়া গানে তাহার পরিচয় পাওয়া যায়।

স্থানীয় ঘটনা লইয়া অথবা ব্যক্তিগত কীর্ত্তি অবলম্বন করিয়া ছড়া রচনা করা বরাবরই প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে রচিত এইরূপ কিছু হস্তগত হয় নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত এইধরণের ছড়া বা গাথা অনেক-গুলিই পাওয়া গিয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীতে দেখিয়াছি যে আরাকান রাজসভার আশ্রয়ে লৌকিক প্রণয়ঘটিত বা নীতি-উপদেশমূলক কাব্য রচিত হইতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে সমগ্র বাঙ্গালায় এইজাতীয় চিত্তাকর্ষক কাহিনী বা উপন্যাস কাব্য রচনা করা বিশেষ চলিত হইয়াছিল। মুসলমান কবিরা ধর্ম্মমূলক বা আরবী-ফারসী-হিন্দী উপাখ্যানমূলক অনেক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বটে কিন্তু সাহিত্য হিসাবে সেগুলি একান্ত মূল্যহীন। তবে এই শতাব্দীতে দুই একটি উৎকৃষ্ট মুসলমান পদকর্ত্তা পাইতেছি।

এই শতাব্দীতে বাঙ্গালা শিখিবার প্রয়োজনে পোর্ত্তুগীস ইংরেজ প্রভৃতি বিদেশীরা বাঙ্গালা শব্দকোষ এবং ব্যাকরণজাতীয় পাঠ্যপুস্তক কিছু কিছু রচনা

করিতে আরম্ভ করে। পোর্ত্তুগীসেরা যে সপ্তদশ শতাব্দীতে বাঙ্গালায় গদ্য গ্রন্থ রচনা করিয়াছিল সে কথা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। পোর্ত্তুগীস পাদ্রী মানোএল্-দা-আস্‌সুম্প্‌সাম্ (Manoel Da Assumpcam) ১৭৩৪ খ্রীষ্টাব্দে পোর্ত্তুগীস ভাষায় একখানি বাঙ্গালা ব্যাকরণ রচনা করেন। ইহাই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম ব্যাকরণ। এই গ্রন্থ ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে পোর্ত্তুগাল দেশের রাজধানী লিস্‌বন নগরে রোমান হরফে ছাপা হয়।[১] এই গ্রন্থের প্রথম চল্লিশ পৃষ্ঠা ব্যাকরণ এবং বাকি অংশ বাঙ্গালা-পোর্ত্তুগীস এবং পোর্ত্তুগীস-বাঙ্গালা শব্দসংগ্রহ। খ্রীষ্টানী মত প্রচারের জন্য এই পাদ্রী সাহেব কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদ (Crepar Xaxtrer Orthbhed) নামে বাঙ্গালায় এক পোর্ত্তুগীস গ্রন্থ অনুবাদ করেন। কৃপার শাস্ত্রের অর্থভেদও লিস্‌বন্ নগরে ১৭৪৩ খ্রীষ্টাব্দে রোমান হরফে মুদ্রিত হয়।[২] ইহাই বাঙ্গালা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গদ্য গ্রন্থ।

গম্ভীর রচনায় গদ্যের প্রয়োগ বাঙ্গালীর হাতে এই সময় হইতেই আরব্ধ হয়। ১১৮১ সালে অর্থাৎ ১৭৭৪-৭৫ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত ভাষাপরিচ্ছেদের গদ্যানুবাদের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীর অষ্টম দশকে বাঙ্গালা ভাষার ও সাহিত্যের ইতিহাসে এক যুগপ্রবর্ত্তনকারী ঘটনা ঘটে। তাহা হইতেছে বাঙ্গালা মুদ্রাঙ্কণ প্রবর্ত্তন। চার্‌ল্‌স্ উইল্‌কিন্স্ (Charles Wilkins) নামক ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর জনৈক কর্ম্মচারী প্রথম বাঙ্গালা অক্ষরের ছেনি কাটেন। এই উইল্‌কিন্স্‌ই ইংরেজীতে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা অনুবাদ করেন এবং স্যার চার্‌ল্‌স্ উইল্‌কিন্‌স্ নামে বিখ্যাত হন। তাঁহার নিকট পঞ্চানন কর্ম্মকার ছেনি কাটা শিখিয়া লয়। এইরূপে বাঙ্গালা অক্ষর প্রস্তুত হইলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর অপর এক কর্ম্মচারী নাথানিয়েল ব্রাসি হাল্‌হেড্ (Nathaniel Brassey Halhed) ইংরেজীতে লেখা স্বরচিত বাঙ্গালা ব্যাকরণ হুগলি হইতে প্রকাশ করেন। তাহাতেই বাঙ্গালা হরফ প্রথম ব্যবহৃত হয়।

১। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত প্রিয়রঞ্জন সেন কর্তৃক অনূদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত (১৯৩১)।

২। রঞ্জন প্রকাশালয় হইতে পুনর্মুদ্রিত (১৩৪৬)। ৩। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩২৫।

ঊনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ও বিবিধ বৈষ্ণব পৌরাণিক কাব্য

বলরাম দাসের কৃষ্ণলীলামৃত রচিত হয় ১৬২৪ শকাব্দে ১১০৮ সালে অর্থাৎ ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে।[১] কাব্যটিতে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইলেও সহজিয়া-সাধনঘটিত কথাও কিছু কিছু আছে। কবি যে রূপকচ্ছলে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল। ইহা হইতে জানা যায় যে কবি ছিলেন ধনিসন্তান, পরে বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়া বৃন্দাবনে গিয়া বাস করেন। এখানে তারা নামক এক "পাঞ্চালদেশীয়া" বিধবা রমণীকে সাধনসঙ্গিনীরূপে গ্রহণ করেন।

মন দিয়া শুন ভাই গ্রন্থবিবরণ। যেমত প্রকারে হৈল গ্রন্থের সৃজন॥
অজমুখ ভুজ অঙ্গ অশ্বিনী সহায়[২]। এই পরিমাণে শকাদিত্য শক যায়॥
মগধ দেশেতে এক রাজার কুমার। শূদ্রেতে কুলীন ছিল মহা অধিকার॥
ভুঞ্জিয়া বিষয়-বাস তিক্ত হৈঞা মনে। সকল ছাড়িঞা তেঁহো গেলা বৃন্দাবনে॥
ব্রজেতে করিল বাস বরিষ দশেক। সর্ব্বশাস্ত্র পড়ি গ্রন্থ দেখিল অনেক॥
ইষ্টদেব স্থানে তেঁহো বিদায় হইয়া। প্রতি দেশে দেশে তেঁহো বেড়ান ভ্রমিয়া॥
ভ্রমিতে ভ্রমিতে গেলা মৎস্য রাজার দেশে। পঞ্চাল নগরে রাজা করিলা প্রবেশে॥
যমুনা বহেন তথা দুকূলে নগর। তটের উপরে দিব্য স্থান মনোহর॥
ব্রাহ্মণ কায়স্থ গোপ তিলি মালাকার। নানা জাতি বৈসে তথা কে করে বিচার॥
নদীর তীরেতে এক বটবৃক্ষ আছে। পথশ্রম পাঞা তেঁহো গেলা তার কাছে॥
পরমশীতল ছায়া স্থান মনোহর। দেখিয়া হরিষ বড় হইল অন্তর॥
বসিলা বিবেকী গ্রন্থ রাখিয়া ভূমিতে। বেলা অবসান দেখি লাগিলা ভাবিতে॥
একে ভাদ্র মাস তাহে মেঘে আচ্ছাদিত। মেঘের গর্জ্জন শুনি স্থির নহে চিত॥
মনে মনে বিবেকী করেন আলোচন। দিব্য এক নিতম্বিনী তথা আগমন॥

১। ব-সা-প-প ২, পৃ ১৯২-৯৩ (পুঁথির লিপিকাল ১১০৮ সাল); বা-প্রা-পু-বি ৩-১, পৃ ১৪৬-৪৯, ব-সা-প পুঁথি ৩৫৯. ব-সা-প-প ৬, পৃ ২৬২। ২। পাঠ 'সকায়।'

কুঞ্জরগমনী কঞ্জলোচন-বয়ান। চৌস্থতি সুবর্ণহার হৃদয়ে উজ্জল॥

... ...

ধীরে ধীরে গেলা সেই বিবেকি-সাক্ষাৎ। ভূমিতে পড়িয়া কন্যা কৈল প্রণিপাত॥
বিবেকী বোলেন তুমি আইলা কোথা হৈতে। কেনে দাঁড়াইলে তুমি আমার সাক্ষাতে॥

. ...

তবে সেই রূপবতী ঈষৎ হাসিয়া। কহে আপনার কথা আগে ত বসিঞা॥
গোকুলেতে জন্ম মোর নাম সত্যবতী। শিশুকাল হৈতে করি গোবিন্দ-ভকতি॥
তোমাকে দেখিলাম রাজকুমারলক্ষণ। বিশেষে বৈরাগ্যধর্ম্মে তুমি বিচক্ষণ॥

আমার বাসাতে চল বৈষ্ণব গোঁসাই। করিবে তোমার সেবা মোর জ্যেষ্ঠ ভাই॥
আর এক আছে মোর কনিষ্ঠা ভগিনী। অলপ-বয়সে রাঁড়ী সেই অভাগিনী॥
বালক অবধি হৈতে বৈষ্ণবেতে রতি। পরমবৈষ্ণবী তেঁহো কৃষ্ণেতে ভকতি॥
তোমার সংসর্গ হৈলে হবে কৃষ্ণলাভ। আমার বিপদ হরি গৃহাদিক তাপ॥
কিন্তু আর এক আমি করি নিবেদন। সতত করিহ কৃষ্ণকথা-উদ্দীপন॥
দেখাইল বাড়ী কন্যা অঙ্গুলি তুলিয়া। উফাইল সেই স্থানে মায়াবাদী হৈয়া॥
তবে বিবেকীর মনে হৈল দিব্যজ্ঞান। কোন দেবকন্যা আইল মোর বিদ্যমান॥
কি জানি কিরূপে কোথা করিল গমন। অনেক সন্তাপ করি চলিল তখন॥
অঙ্গুলি তুলিয়া যে বাড়ী দেখাইল। সন্ধ্যা সময়ে তথা যাইয়া উত্তরিল॥
বাধাকৃষ্ণ স্মৃতি করি প্রবেশিলা পুরে। গোপগণ দেখি তবে প্রণমিলা দূরে॥
প্রধান গোপের তবে বিধবা ভগিনী। প্রণমিলা তেঁহো আসি বলি স্তুতিবাণী॥
বসিতে আসন দিয়া ধোয়াইল চরণ। অনুনয়বাক্য বলি তুষিলেন মন॥
বিবেকী বলেন শুন আমার উত্তর। কহিব সকল কথা তোমার গোচর॥
ব্রজেন্দ্রনন্দনপাদপদ্ম অভিলাষ। কৃষ্ণলীলামৃত কহে বলরাম দাস

ভণিতা হইতে জানা যায় যে এই গোপরমণীর নাম তারা।

তারা বড় ভাগ্যবতী পুণ্যশীলা মহামতি,
গোপকুলে যার উপাদান।
নিবাস পঞ্চালদেশে, যাহার কৃপার লেশে
বলরাম দাস রস গান॥

পুঁথির শেষে কবি গদাধরের নাম করিয়াছেন। ইনি কবির গুরু হইবেন।

শ্রীযুত গদাধরচরণ-ভরসে।
কৃষ্ণলীলামৃত কহে বলরাম দাসে॥

অন্যত্র প্রাপ্ত একটি পদের ভণিতা এইরূপ—

গদাধরপদে আশ   দীন বলরাম দাস
শ্লোক ভাঙ্গি রচিল পয়ার॥[১]

এটিও নিশ্চয় কৃষ্ণলীলামৃতের অন্তর্গত পদ। কৃষ্ণলীলামৃতের পুঁথিতে ইঁহার "দীন বলরাম দাস" ভণিতা পাওয়া যায়।

কৃষ্ণের কিঙ্কর দীন বলরাম দাস।
কৃষ্ণলীলামৃত পদ করিল প্রকাশ॥

আলোচ্য পুঁথিটি বার পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ইহাতে কৃষ্ণের মথুরাগমন ও গোপীদিগের খেদ এই পর্য্যন্ত ব্রজলীলা বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু মূল পুস্তকে ইহার পরেও যে কৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ পাইতেছি অন্যত্র প্রাপ্ত একটি পদের ভণিতায়—

কৃষ্ণের কিঙ্কর দীন বলরাম দাস।
উদ্ধবসন্দেশ পদ করিল প্রকাশ॥[২]

কবি বলিয়াছেন যে তিনি শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণ অবলম্বনে কাব্যটি রচনা করিয়াছেন।

বিবেকী বলেন প্রিয়া   শুন তুমি মন দিঞা,
কহিব সকল বিবরণ।
ব্রহ্মবৈবর্ত্তের মতে   যে কহিল ভাগবতে
তাহা আমি করি বিবেচন॥

মল্লাবনীনাথ গোপালসিংহদেবের ভণিতাযুক্ত একটি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কাব্য পাওয়া গিয়াছে।[৩] কাব্যটিতে পুরাণের ধাঁচে রাধাকৃষ্ণলীলা বর্ণিত হইয়াছে। প্রথমে কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ তাহার পর রাধিকার জন্মলীলা লইয়া কাহিনী সুরু হইয়াছে।

১। HBL, পৃ ৪০৫।   ২। ব-সা-প পুঁথি ১২৬৯।   ৩। ব-সা-প পুঁথি ১২৬৯।

কাব্যটি কতকগুলি পালায় বিভক্ত। পুঁথি খণ্ডিত বলিয়া মূলে কতগুলি পালা ছিল তাহা বলা যায় না। লীলাবর্ণনায় কবি গোস্বামিগ্রন্থের অনুসরণ করিয়াছেন।

উজ্জ্বলগ্রন্থানুসারে করি নিবেদন।
পরমদুর্ল্লভ কথা শুন ভক্তজন॥

কাব্যের ভণিতা এইরূপ—

অর্জ্জুন বিস্ময় পাঞা রহে কৃষ্ণমুখ চাঞা অসম্ভব বচন শ্রবণে।
সুধী মল্লমহীপতি গোপালসিংহের রতি রহু সদা শ্রীগুরুচরণে॥

গাইল গোপালসিংহ মল্লাবনীনাথ। শ্রীগুরুপদারবিন্দে করি প্রণিপাত॥

শ্রীগুরুচৈতন্যপদভজনচতুর। নরেন্দ্র গোপালসিংহ গাইলা মধুর॥

"ভূপাল," "নরেন্দ্র," "মল্লাবনীনাথ" ইত্যাদি উপাধি ভণিতায় থাকায় স্বয়ং গোপালসিংহদেব যে কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন এমন বোধ হয় না। তাঁহার কোন সভাকবির রচনা হওয়াই সম্ভব।

"দ্বিজ" রমানাথের শ্রীকৃষ্ণবিজয়[১] শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্য। অন্যান্য অধিকাংশ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের মত ইহাতেও দানলীলা ও নৌকাবিলাস বর্ণিত হইয়াছে। কবির ভণিতা এইরূপ—

শ্রীকৃষ্ণবিজয় নর শুন এক মনে।
দ্বিজ রমানাথে বলে গোবিন্দচরণে॥

গোকুলেতে গোবর্দ্ধন ধরিলে গোবিন্দে।
দ্বিজ রমানাথ বলে পাঁচালী-প্রবন্ধে॥

দানখণ্ডের ঘটনা এইরূপে বর্ণিত হইয়াছে—

রাধিকা বলেন সভে এক যুক্তি করি। পসরা সাজায়া কালি যাব মধুপুরী॥
সভে মেলি গোবিন্দে ভেটিব দানছলে। শ্রীকৃষ্ণবিজয় দ্বিজ রমানাথ বলে॥
এইরূপে শিশু সঙ্গে রহিলেন গোঠে। আর রূপে গেলা কৃষ্ণ যমুনার ঘাটে॥
দানছলে রহিলেন কদম্বের তলে। হোথা সে শ্রীমতী গিয়া জটিলাকে[২] বলে॥
বিধাতা করিল যদি (গো) গোয়ালার জাতি। দধি দুগ্ধ বিকি কিনি এই মোদের বৃত্তি॥

১। ব-সা-প পুঁথি ১২৯৩। ২। পাঠ 'সখি ডাকে'।

আমি সে থাকিতে তুমি নিতি যাহ বিকে। অপযশ দেই মোরে মন্দ বলে লোকে ॥
তুমি থাক ঠাকুরাণী ঘরেতে বসিয়া। আমি ত যাইব আজি প্রসরা লইয়া ॥
মোহিনীপ্রবন্ধে গুরুজনেরে ভুলায়্যা। হরষিতে বড়ায়েরে আনিল ডাকিয়া ॥
কৃষ্ণচিত্রে পুলকিত ব্রকভানুর নন্দিনী। দ্বিজ রমানাথ বলে গোপীর সাজনি ॥

কবির পাণ্ডিত্য বিশেষ কিছু না থাকিলেও সারল্য ছিল। তাহার ফলে স্থানে স্থানে কবির সহজ সরল উক্তি মর্ম্মস্পর্শ করে। উদাহরণস্বরূপ কৃষ্ণ-বলরামের মথুরাগমন প্রারম্ভে যশোদার উক্তি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

বিদায়ের কথা বাছা না আনহ মুখে। বিদায় বাক্য বলিলে মোর শেল বাজে বুকে ॥
কি বোল বলিলে বাছা কৃষ্ণ বলরাম। কালিকার কথা বাছা আজি হইল আন ॥
ধড়ার আঁচল ধরি কান্দে নন্দরাণী। যাদবের মুখ হেরি লোটায় ধরণী ॥
অভাগিনী মায়ে ছাড়ি যাবে কোথাকারে। বুঝিলাম কাঙ্গালিনী করিবে আমারে ॥
হিয়ার পুতুলী তুমি নয়নের তারা। তিল আধ না দেখিলে জীয়ন্তে হই মরা।
হাপুতীর বাছা তুমি আন্ধালার নড়ি। নির্ধনের ধন তুমি কৃপণের কড়ি ॥
না যাহ না যাহ বাছা জননী ছাড়িয়া। তোমা না দেখিলে বুক যায় বিদরিয়া ॥
ঘর বনবাস হব তোমার বিহনে। গোকুল নগর শূন্য হইল এতদিনে ॥
অন্ধকার করি পুরী যাবে যদুমণি। শূন্য ঘরে কেমনে বঞ্চিব একাকিনী ॥
আমার পরাণ আগে যাকু যমঘরে। তবে সে যাইবে তুমি মথুরা নগরে ॥
অনেক বিনতি কৈলাম ক্ষীরোদের কূলে। নীলমণি মাণিক পায়্যাছি তপের ফলে ॥
অনেক সাধের পুত্র কানাই বলাই। এ বৃদ্ধ সময়ে কেন ছাড় বাপ মায় ॥
ক্ষীরোদে কহিয়াছিলে তোমার পুত্র হব। ইহকালে পরকালে সঙ্গেতে রাখিব ॥
সে সকল কথা মোর হৃদয়ে জাগয়ে। ছাড়িতে উচিত নহে এ বৃদ্ধ সময়ে ॥
চুরি করি নবনী বাছা খায়েছিলে তুমি। ক্রোধ করি উদূখলে বান্ধেছিলাম আমি ॥
সেই অপরাধ পারা দেখিয়া আমার। ক্ষুদ্র অপরাধে বাছা ছাড়িবি গোপাল ॥
নেয় নেকু কংস রাজা ধন ধান্য ধেনু। তথাপি ছাড়িয়া নাঞি দিব রাম কানু ॥
তোমা দোহাকারে আমি গলেতে বান্ধিয়া। নগরে নগরে ভিক্ষা খাইব মাগিয়া ॥
পুত্রশোকে উচ্চস্বরে কান্দে নন্দরাণী। মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে লোটায়া ধরণী ॥

পুঁথি বিষ্ণুপুর অঞ্চলের, ভাষাও তাই। কবিও কি তবে সেই অঞ্চলের ?

রোসাঙ্গের আলাওলের মত এক বহুরচয়িতা কবি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ এবং অষ্টাদশ্ শতাব্দীর প্রথম পাদে বর্ত্তমান ছিলেন। আলাওল যেমন একাধিক স্বাধীন রোসাঙ্গরাজ ও রাজামাত্যের আশ্রয়ে লৌকিক কাহিনী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন এই কবিও সম্ভবতঃ একাধিক স্বাধীন মল্লরাজের আশ্রয়ে বিবিধ ধর্ম্মকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। তবে "কবিচন্দ্র" যদি মল্লরাজসভাকবির উপাধি হয় তবে একাধিক কবির অস্তিত্বকল্পনা অপরিহার্য্য।

আলোচ্য কবির নাম শঙ্কর চক্রবর্ত্তী, উপাধি কবিচন্দ্র। কবি নিজেকে কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তীও বলিয়াছেন। ইঁহার পিতার নাম মুনিরাম চক্রবর্ত্তী। বাসস্থান মল্লভূমির অন্তঃপাতী লেগো গ্রামের সন্নিকট পানুয়া গ্রামে। একস্থলে কুঞ্জলালের উল্লেখ আছে, সম্ভবতঃ ইনি কবির পুত্র। এই সব খবর পাওয়া যায় কাব্যগুলির ভণিতা হইতে।

চক্রবর্ত্তী মুনিরাম অশেষ গুণের ধাম, তস্য সুত কবিচন্দ্র গায়॥
শ্লোকার্থসঙ্গীতপ্রথা ভাগবতামৃত কথা শ্রবণে সকল পাপ যায়॥

চক্রবর্ত্তী মুনিরাম অশেষ গুণের ধাম,
তস্য সুত গাইল শঙ্করে॥
ভাবার্থ ভাবের ব্যাখ্যা, ভক্তে প্রভু কর রক্ষা,
কবিচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কয়॥

চক্রবর্ত্তী মুনিরাম অশেষ গুণের ধাম, তস্য পুত্র শ্রীকবি শঙ্কর।
ব্যাসের আদেশ পায় পুরাণ সঙ্গীত গায়, কুশলে রাখিবে গদাধর॥
ব্যাসের আদেশ পায় দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়, মল্লভূমি পানুয়ায় বসতি।
দ্বিজ কবিচন্দ্র কয় ভাবি রমাপতি।
লেগোর দক্ষিণে ঘর পানুয়ায় বসতি॥
ব্যাসের আদেশ পায় দ্বিজ কবিচন্দ্রে গায়,
কুঞ্জলালে রক্ষ নারায়ণ॥

কবিচন্দ্র ভণিতা যুক্ত এই কাব্যগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে—**শিবমঙ্গল** বা শিবায়ন, গোবিন্দমঙ্গল বা ভাগবতামৃত, রামায়ণ, মহাভারত, মনসামঙ্গল,[১] ধর্ম্মমঙ্গল,[২] লক্ষ্মীচরিত্র এবং শীতলামঙ্গল। শেষের দুইখানি ক্ষুদ্র কাব্য, সম্ভবতঃ শঙ্কর কবিচন্দ্রের রচিত নহে। শঙ্কর কবিচন্দ্র প্রণীত অভয়ামঙ্গল পাঁচালীর পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে।[৩]

শিবমঙ্গল বা শিবায়ন কাব্য মল্লরাজ বীরসিংহদেবের রাজত্বকালে (১৬৫৬-৮২ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত হইয়াছিল।

বীরসিংহ মহারাজা অবনীতে মহাতেজা সদা মতি ইষ্টের চরণে।
সঙ্কীর্ত্তন-অভিলাষী তাহার দেশেতে বসি দ্বিজ কবিচন্দ্র রস ভণে॥[৪]

সম্ভবতঃ এই "কবিচন্দ্র" শঙ্কর চক্রবর্ত্তী নহেন।

রামায়ণ কাব্য রচিত হয় মল্লরাজ দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেবের আশ্রয়ে। দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেবের রাজ্যকাল ১৭০২ হইতে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দ।

দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় পানুয়ায় বসতি।
রঘুনাথসিংহের জয় কর রঘুপতি॥[৪]

কবিচন্দ্রের রামায়ণ "বিষ্ণুপুরী রামায়ণ" বলিয়া মল্লভূমি ও দক্ষিণরাঢ়ে প্রচলিত ছিল। কাব্যটি জনপ্রিয় ছিল বলিয়া মনে হয়। পশ্চিমবঙ্গে প্রাপ্ত কৃত্তিবাসের রামায়ণের পুঁথিতে এবং প্রচলিত সংস্করণে কবিচন্দ্রের রচনা বিস্তর ঢুকিয়াছে। কৃত্তিবাসী রামায়ণের কয়েকটি বিশিষ্ট অংশ (যেমন অঙ্গদরায়বার ও তরণীসেনবধ ইত্যাদি) কবিচন্দ্রেরই রচনা।

দ্বিতীয় রঘুনাথসিংহদেবের পুত্র মল্লরাজ প্রথম গোপালসিংহদেবের নিকট কবি বিশেষ সংবর্দ্ধনা প্রাপ্ত হন এবং তাঁহারই আদেশে মহাভারত রচনা করেন। প্রথম গোপালসিংহদেবের রাজ্যকাল ১৭১২ হইতে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দ। অতএব কবিচন্দ্রের মহাভারত রচনার কাল ১৭১২ হইতে ১৭৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ২৪৮৯; বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি ৪৯৯৭।
২। ব-সা-প পুঁথি ২৬৭১। ৩। বঙ্গীয় রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি ৪৩ (খাস সংগ্রহ)।
৪। ভাগবতামৃত ভূমিকা, পৃ ।৵০।

শ্রীযুত গোপালসিংহ প্রবলপ্রতাপ। যার কীর্ত্তি দেখিলে ঘুচয়ে মনস্তাপ ॥
নৃপশ্রেষ্ঠ বৈষ্ণবাগ্র্য সবাকার মান্য। পরমদেবতা সদা মানেন শ্রীচৈতন্য ॥
হেন রাজা সমাদরে লইয়া আমারে। বীরবৌলী নিজে দিলা পরম সাদরে ॥
তারপর মহারাজা দিয়া ভূমিদান। আদেশিলা রচ মহাভারত পুরাণ ॥
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ করিয়া ভাবনা। দ্বিজ কবিচন্দ্র কৈল ভারত বর্ণনা ॥

ভাগবতামৃত বা গোবিন্দমঙ্গল কবির দ্বিতীয় রচনা বলিয়া মনে করি। কবিচন্দ্রের কাব্যাবলীর মধ্যে শুধু এইটিই এযাবৎ প্রকাশিত হইয়াছে।[১] কাব্যটির বিভিন্ন পালার পুঁথি বিস্তর পাওয়া যায়, কিন্তু সমগ্র কাব্যের পুঁথি একটিও পাওয়া যায় নাই। প্রকাশক মহাশয় বিভিন্ন পালা একত্র করিয়া কাব্যটিকে সম্পূর্ণাঙ্গ করিয়া মুদ্রিত করিয়াছেন।

ভাগবতামৃতে—অন্ততঃ মুদ্রিত সংস্করণে—কোন মল্লরাজের উল্লেখ পাওয়া যায় নাই। অনুমান করি কাব্যটি বীরসিংহদেবের পুত্র মল্লরাজ তৃতীয় দুর্জ্জনসিংহদেবের রাজ্যকালে (১৬৮২ হইতে ১৭০২ খ্রীষ্টাব্দে) রচিত হইয়াছিল। কবি বোধ হয় তখনও রাজানুগ্রহ লাভ করিতে পারেন নাই। সেই জন্য কবি রাজার নাম না করিয়া বলিয়াছেন "ধন্য রাজা মল্লবংশে সার্থক জীবন।" যাহা হউক কাব্যটি যে ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দের পরে রচিত হইয়াছিল তাহার প্রমাণ আছে। ভাগবতামৃতের বন্দনা অংশে কবিচন্দ্র বিষ্ণুপুরের সুবিখ্যাত মদনমোহনদেবের মন্দিরের উল্লেখ করিয়াছেন।

হরিদ্বারে ভক্তিভাবে বন্দো[২] বারে বারে। দ্বারিকার মদনমোহন বন্দো যোড়করে ॥
পূর্ব্বেতে আছিল প্রভু ব্রাহ্মণের ঘরে। কৃপা করি মল্লবংশে আইলা বিষ্ণুপুরে ॥
নবরত্ন তুলি দিলা দিব্য অট্টালিকা। প্রভুর পাশে শোভিতেছে শ্রীমতী রাধিকা ॥
পৃ ৩ ॥

মদনমোহনের মন্দির ১০০০ মল্লাব্দে অর্থাৎ ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে দুর্জ্জনসিংহদেব কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হয়।

১। ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গল পণ্ডিত শ্রীযুক্ত মাখনলাল মুখোপাধায় কর্ত্তৃক সংগৃহীত ও প্রকাশিত (১৩৪১)। ২। পাঠ 'বন্দ' সর্ব্বত্র।

শ্রীরাধাব্রজরাজনন্দনপদাম্ভোজেষু তৎপ্রীতয়ে
মল্লাব্দে ফণিরাজশীর্ষগণিতে মাসে শুচৌ নির্ম্মলে।
সৌধং সুন্দররত্নমন্দিরমিদং সার্দ্ধং স্বচেতোহলিনা
শ্রীমদ্দুর্জ্জনসিংহভূমিপতিনা দত্তং বিশুদ্ধাত্মনা॥

পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্র তাঁহার গৌরীমঙ্গলে কবিচন্দ্র-রচিত গোবিন্দ-মঙ্গলের উল্লেখ করিয়াছেন।

কবি বলিয়াছেন যে তিনি স্বপ্নে ব্রাহ্মণবেশী ব্যাসের আদেশ পাইয়া ভাগবতামৃত রচনা করেন।

শ্রীকবি শঙ্কর গান ব্যাসের আদেশে।
স্বপ্নে কৃপা কৈলা যারে ব্রাহ্মণের বেশে॥ পৃ ৬০॥
দ্বিজ কবিচন্দ্র কহে ব্যাসের আদেশে।
স্বপ্নে কৃপা কৈলা যারে ব্রাহ্মণের বেশে॥ পৃ ১৮৬॥

ভাগবতামৃতে শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলা বিস্তৃতভাবে বিবৃত হইয়াছে। কবি ভবিষ্যপুরাণ[১] এবং হরিবংশ[২] হইতেও সাহায্য গ্রহণ করিয়াছেন। ভাগবতের অপর স্কন্ধগুলির প্রধান প্রধান কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। কবি স্বতন্ত্র-ভাবে রামায়ণ রচনা করিবেন (অথবা করিয়াছিলেন) বলিয়া কাব্যটিতে রামলীলা বিবৃত হয় নাই। ইহাতে দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড লীলা নাই। তবে কতকগুলি নূতন অর্ব্বাচীন কাহিনী দেওয়া আছে। যেমন, লুকালুকি খেলা রাখালরাজা খেলা হাড়ুডুডু ও গেণ্ডুখেলা মূষিকমার্জ্জার-লীলা কলঙ্কভঞ্জন মুক্তাচাষ কৃষ্ণকালী ইত্যাদি। শ্রীমদ্‌ভাগবতমতে রাসলীলা খুব বিস্তারিত করা হইয়াছে। এই পালায় শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত, বিদগ্ধমাধব, যদুনন্দন দাস কৃত রসকদম্ব ও গোবিন্দ-লীলামৃত, গীতগোবিন্দ, শ্রীরূপচিন্তামণি, শ্রীকৃষ্ণকর্ণামৃত এবং অভিরাম দাস বিরচিত গোবিন্দবিজয় হইতে পয়ার এবং শ্লোকাদি উদ্ধৃত হইয়াছে।

১। 'বাললীলা বিবরিয়া ভবিষ্যের মত। শ্লোকার্থসঙ্গীত রাগ রচিলাম যত॥' পৃ ১২৪
২। 'হরিবংশে ব্যাস উক্তি কবিচন্দ্রে ভাষে॥' পৃ ৩৪৩॥

গুরুদক্ষিণা পালাটি [পৃ ২৫১-৫৫] কবিচন্দ্রের রচনা নহে, ইহা অপর এক শঙ্কর নামক কবির রচনা বলিয়া অনুমান হয়। এই পালায় কবিচন্দ্রের বিশিষ্ট ভণিতা নাই। এই পালাতে যে দুইটি মাত্র পদ আছে তাহার ভণিতা এইরূপ—

কৃষ্ণের চরিত্র এই গাইল শঙ্কর।
এ ঘোর সাগরে পার কর দামোদর ॥ পৃ ২৫২ ॥
দুষ্কর্ম্মের পথি হৈয়া কুল করে নাশ।
শঙ্কর রচিল যার কুলচণ্ড বাস ॥ পৃ ২৫৫ ॥

দ্বিতীয় ভণিতা হইতে বোঝা যায় যে এই শঙ্কর কবির বাস ছিল কুলচণ্ড গ্রামে। বস্তুতঃ, এই পালাটি একেবারে স্বতন্ত্র রচনা, ইহা শিশুদিগের জন্য লিখিত এবং ইহাতে কয়েকটি চাণক্যশ্লোক ও সেগুলির ভাবার্থ দেওয়া আছে।

কবিচন্দ্র ভাগবতামৃতে যেরূপ ভণিতা দিয়াছেন তাহার কিছু উদাহরণ পূর্ব্বেই দিয়াছি। এখানে আরও কয়েকটি বিশিষ্ট ভণিতার উদাহরণ দিলাম।

ভাগবতামৃত দ্বিজ কবিচন্দ্র বলে ॥
শঙ্কর দ্বিজের আশা কৃষ্ণপাদারবিন্দ ॥
চতুর্থ স্কন্ধের কথা কবিচন্দ্র গান ॥
শ্লোকার্থসঙ্গীতরস কবিচন্দ্র ভাষে ॥
ভারত ভাবের ব্যাখ্যা কবিচন্দ্র বলে ॥
অষ্টম স্কন্ধের কথা গাইল শঙ্কর ॥

গোবিন্দমঙ্গল গীত কৃষ্ণের কৃপায়। ভবিষ্যপুরাণ দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥
গোবিন্দমঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র গায় ॥

রাধিকামঙ্গল ইত্যাদি যেসকল আপাতস্বতন্ত্র কবিচন্দ্রের কাব্যের পুঁথি পাওয়া যায় সেসব স্বতন্ত্র কাব্য নহে, ভাগবতামৃতেরই পালা।

কবিচন্দ্রের কবিত্বশক্তির বিশেষ কিছু পরিচয় কাব্যটিতে নাই। কবিচন্দ্রের লেখার অল্প কিছু নমুনা উদ্ধৃত করা গেল।

কৃষ্ণ অক্রূরের সঙ্গে মথুরায় চলিয়া যাইবেন এই ভাবনায় গোপীরা আক্ষেপ করিতেছে,

প্রাণ ধরিবারে নারে, অনুতাপ সবে করে,
শোকাবেশে হইল আকুল।
বেশভূষা দূরে গেল, জ্ঞানহত সবে হইল,
ক্ষীণকায় খসায় দুকূল ॥
শুন রে দারুণ বিধি, দিয়া হরে নিলি নিধি[১],
তাপ দিলি তো বড় নিঠুর।
মোরা অতি অভাগিনী, বসাইতে হাটখানি
কেন মাইলি[২] মাথায় মুগুর ॥
সখা সঙ্গে শিশু যত হয়ে সবে উনমত
প্রেমাবেশে পথ মাঝে খেলে।
রচয়ে ধূলার ঘর নানা চিত্র থরে থর,
খেলা সাঙ্গে ভাঙ্গি তারা চলে ॥
তেমনি কৃষ্ণের সঙ্গ কৈল ধাতা প্রেমভঙ্গ,
মোদের হইল বধভাগী।
তো সনে না খাটে বাদ, ঘুচালি সকলি সাধ,
পরাণ বিদরে কৃষ্ণ লাগি ॥
অক্রুর বড়ই ক্রুর আইল হইতে মধুপুর,
আমাদের প্রাণ কাড়ি নিল।
কে বলে বৈষ্ণব তায়, কুটিল অজ্ঞান প্রায়,
খলমতি কভু নহে ভাল ॥
অন্য এক গোপী কয়, কৃষ্ণ কার বশ নয়,
কেন রবে তোমাদের সাথে।
মথুরানাগরী যত করিয়াছে পুণ্যব্রত,
ভুলায়ে রাখিবে রাধানাথে ॥

১। পাঠ 'নিল বিধি'। ২। ঐ 'মেলি'।

গোবিন্দ থাকিবে সেথা, আর না আসিবে হেথা,
নাগরিকা জানে নানা রস।
কামকলা কত জানে, হাস্যে কটাক্ষের বাণে
কৃষ্ণে করিবেক তারা বশ ॥
কৃষ্ণ বিনে না বাঁচিব, বন্ধুবান্ধব কি করিব
আমাদের কালা কানু গতি।
রভস কৌতুক রঙ্গে প্রাণমুকুন্দের সঙ্গে
নিমেষে বিচ্ছেদে ফাটে ছাতি ॥
রাসোৎসব যার সনে নিভৃত শ্রীবৃন্দাবনে
একরাত্রি হইল ক্ষণ প্রায়।
দৈবেতে বিচ্ছেদ করে, পাসরিতে নারি তারে .
রসনিধি বটে যদুরায় ॥
তা ছাড়ি কি আর জীব, তেমন নাগর নাহি পাব,
এত বলি ধরণী লোটায়।
নন্দভয় ত্যজি কান্দে, মোহে বুক নাহি বান্ধে,
দ্বিজ কবিচন্দ্র রস গায় ॥ পৃ ২২৮ ॥

জীবন চক্রবর্ত্তীর কাব্য এককালে খুব চলিত ছিল, যদিও সম্পূর্ণ পুঁথি একখানিও পাওয়া যায় নাই। কাব্যের নাম কবি কখনো বলিয়াছেন "কৃষ্ণমঙ্গল" এবং কখনো "শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল"।[১] শেষের নাম অভিনব বটে।

জীবন চক্রবর্ত্তীর কাব্যের প্রাচীনতম পুঁথির লিপিকাল ১০৮৮ সাল, সম্ভবতঃ মল্লাব্দ। তাহা না হইলে কবি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক হইবেন। কবির পিতার নাম ছিল নারায়ণ।

চক্রবর্ত্তী নারায়ণ, তস্য সুত শ্রীজীবন
বিরচিলা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল।
শ্রবণে কল্মষ নাশ, পূরে যার যেই আশ,
ভবসিন্ধু [তরণে] সম্বল ॥

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ১০৩৬, ৩৪৬৭ . ব-সা-প-প ২, পৃ ৭৬ , ৪, পৃ ৩০৭, ৩২১।

ভণিতা এইরূপ—

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত রচিল জীবন।
শ্রবণে কলুষনাশ বৈকুণ্ঠে গমন॥

শ্রীবিষ্ণুমঙ্গল দ্বিজ জীবনেতে গায়।
হরি হরি বল সবে পালা হল সায়॥

হয়পৃষ্ঠে আরোহণ হইল ব্রাহ্মণ।
রচিল জীবন দ্বিজ ভারতকীর্ত্তন॥

কব্যের মধ্যে কবি সম্ভবতঃ মহাভারতের কোন কোন আখ্যান গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাই "ভারতকীর্ত্তন" বলিয়াছেন।

বীরভূম জেলায় বোলপুর থানার অন্তর্গত পাঁড়ুই গ্রামনিবাসী "দ্বিজ" মাধবেন্দ্র ভাগবতসার বা ভাগবতামৃত নামে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এই কাব্যের কিয়দংশ পাওয়া গিয়াছে।[১] কবির ভণিতা এইরূপ—

ভণে দ্বিজ মাধবেন্দ্র ভাগবতসার।
শ্লোক ভাঙ্গি এই গ্রন্থ করিল পয়ার॥

ভণে দ্বিজ মাধবেন্দ্র পাঁড়ুএ নিবাস।
ভাগবতভাষা কৈল পয়ারে প্রকাশ॥

"দ্বিজ" নরসিংহ রচিত উদ্ধবসংবাদ পালার কতকগুলি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[২] ভণিতা হইতে অনুমান হয় যে ইনি একখানি সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

উদ্ধবের বোলে রাণী প্রবোধ না মানে।
শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ নরসিংহ ভণে॥

শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল দ্বিজ নরসিংহ ভণে।
দশম স্কন্ধের কথা উদ্ধবগমনে॥

নরসিংহ শ্রীরূপ গোস্বামীর হংসদূতেরও অনুবাদ করিয়াছিলেন। এই কাবের একটি পুঁথির লিপিকাল ১৭১২ শকাব্দ।[৩]

১। বা-প্রা-পু-বি ২-১, পৃ ৬৪। ২। ঐ ৩-৩, পৃ ১০১। ৩। ব-সা-প-প ৬, পৃ ৭৯-৮০।

জগন্নাথ দাস,[১] ঘনশ্যাম দাস,[২] উদ্ধব দাস,[১] হরিবোল দাস[৩] এবং হরিধন দাস (? হরিবোল দাস)[৪] রচিত নৌকাখণ্ডের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইঁহাদের কেহ কেহ হয়ত সপ্তদশ শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন। ইঁহারা সকলেই সম্পূর্ণ শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন কিনা বলা দুষ্কর।

নন্দরাম ঘোষের শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল বা শ্রীকৃষ্ণবিজয় কাব্যের একটি খণ্ডিত এবং একটি তালভক্ষণ পালার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৫] ভণিতা এইরূপ—

নন্দরাম ঘোষ বলে গোবিন্দচরণে।
শ্রীকৃষ্ণবিজয় তালভক্ষণ শুন এক মনে ॥
বড়ই অপূর্ব্ব কথা শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল গীত।
কৃষ্ণলীলা নন্দরাম ঘোষ [বি]রচিত ॥

বৃন্দাবন দাসের কাব্যের দধিখণ্ড, গোপিকামোহন ও অন্যান্য পালার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৬] গোপিকামোহন পালার পুঁথির লিপিকাল ১১২০ সাল। ভণিতা এইরূপ—

গৃহসেবা করি রাধা করিল শয়ন।
বৃন্দাবন দাসে কহে গোপিকামোহন ॥

"দ্বিজ" রামেশ্বরের গোবিন্দমঙ্গলের পুঁথির লিপিকাল ১৭১৬ শকাব্দ ১১৯১ সাল। পুঁথি রঙ্গপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।[৭] কাব্যের শেষাংশ এইরূপ—

এহেন মঙ্গল যেবা ভক্তি করি শুনে। তবে তার ইষ্টদেব রাখিব চরণে ॥
সপ্তম দিবসে গীত গায় গুণী জনা। বিভার স্বরূপ দিব ইহার দক্ষিণা ॥[৮]
সবাকারে দয়া কর ভকতবৎসল। সম্পূর্ণ হইল পুঁথি গোবিন্দমঙ্গল ॥

শেষের ভণিতা এইরূপ—

জন্মে জন্মে নারায়ণ না হইবে বাম।
কহে দ্বিজ রামেশ্বর করিয়া প্রণাম ॥

১। HBL, পৃ ৪৯১। ২। ঐ, পৃ ৪৪৮। ৩। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩২১।
৪। ব-সা-প পুঁথি ৩৯৭। ৫। ব-সা-প-প ৬, পৃ ৭৫, বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৪৯।
৬। HBL, পৃ ৩২২, ৪৯৬, ব-সা-প-প ২, পৃ ৭৩, ৫, পৃ ৭২-৭৩, ১৯৮।
৭। ব-সা-প-প ২, পৃ ১৮৪। কবি কি শিবায়ণ-প্রণেতা রামেশ্বর? ৮। আশা তো কম নয়!

"দ্বিজ" প্রভুরাম বিরচিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গলের খণ্ডিত পুঁথিও উত্তরবঙ্গে পাওয়া গিয়াছে।[১] ভণিতা এইরূপ—

কৃষ্ণ জয় কৃষ্ণ জয় বলে শিষ্যগণ।
দ্বিজ প্রভুরাম ইহা করিল রচন॥

শ্রীহট্ট অঞ্চলের এইসকল কবি বিরচিত কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে— গঙ্গারামের গোপালচরিত,[২] রামদাসের শ্রীকৃষ্ণচরিত,[৩] সানন্দরাম দত্ত-সুত শিবানন্দ রচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়,[৩] "বণিক" যুগলকিশোর রচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়[৪], মনোহর সেন রচিত শ্রীকৃষ্ণবিজয়,[৪] এবং রামানন্দ মিশ্রের রসতত্ত্ববিলাস।[৫]

মনোহরের কাব্যের ভণিতা এইরূপ—

সেন মনোহরে বলে শুন হে কালিয়া।
নিভাইল প্রেমের আগুন কে দিল জ্বালিয়া॥

কবি পদকর্ত্তা ছিলেন এবং একটি হাস্তনাথের পাঁচালীও রচনা করিয়াছিলেন।

রামানন্দ মিশ্রের রসতত্ত্ববিলাসে রাধাকৃষ্ণের অষ্টকালীন লীলা বর্ণিত হইয়াছে। কবি ছিলেন শ্রীচৈতন্যের জ্ঞাতিবংশীয়। ইহাতে শ্রীচৈতন্য সম্বন্ধেও কিছু কথা আছে। রামানন্দ বলেন যে, তাঁহার দুই পূর্ব্বপুরুষ জ্ঞানবর মিশ্র ও কল্যাণবর মিশ্র শ্রীচৈতন্যের আদেশে ১৪৭৫ শকাব্দে পূর্ব্বদেশে বৈষ্ণবধর্ম্ম প্রচার করিতে গিয়াছিলেন।

চৌদ্দশত পাছত শাকে প্রাচ্যে উত্তরিলা।

শেষের ভণিতা এইরূপ—

তাহার কুলেতে জন্ম শ্রীরূপ রামানন্দ। জয় জয় ইষ্টদেব প্রেমরসকন্দ॥
এহেন গুরুর পদে করিয়া বন্দন। রসতত্ত্ববিলাস গ্রন্থ কৈলা সুগঠন॥
পতিতের অগ্রজ রামানন্দ মতিহীন। সব শ্রোতার পদরেণু মস্তকভূষণ॥

"দ্বিজ" লক্ষ্মীনাথ-রচিত[৬] এবং ভক্তরাম দাস-রচিত[৭] শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্যের

১। র-সা-প-প ২, পৃ ৩৫-৩৬। ২। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পরিশিষ্ট ১, পৃ ১০।
৩। ঐ, পৃ ১২। ৪। ঐ তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৯৮। ৫। ঐ, পৃ ১৪০-৪৪।
৬। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১০৭, ২৩৩।
৭। ঐ, পৃ ১১৩, বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ১০২, সাহিত্য ১৩১০, পৃ ৯১-১০৪।

পুঁথি চাটিগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। ভক্তরামের কাব্যের নাম গোকুলমঙ্গল। কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে বর্ত্তমান ছিলেন।

একটি অতি অর্ব্বাচীন গোপালমঙ্গলের পুঁথিতে কোন ভণিতা পাওয়া যায় নাই।[১]

জয়কৃষ্ণ দাসের রচিত গোবিন্দমঙ্গলের একখানি সম্পূর্ণ পুঁথি বরাহনগরে শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত আছে। পুঁথির লিপিকাল ১১৮০ সাল। ইনিই সম্ভবতঃ পদকর্ত্তা জয়কৃষ্ণ দাস।[২]

মঙ্গলডিহি গ্রামনিবাসী জগদানন্দ অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে শ্যামচন্দ্রোদয় নামে একটি কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্য রচনা করেন।[৩] ইঁহার খুল্লতাত নয়নানন্দের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

হরিচরণ বিরচিত শুকপরীক্ষিৎসংবাদ পালার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৪] কবি কি বিস্তৃতভাবে শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন? কবির এইরূপ পরিচয় পাওয়া যাইতেছে—

দ্বিজ মিশ্র রমাকান্ত কামদেব মিশ্র তাত
রমাকান্ত স্থত দাশরথি।
মুনিরাম তার স্থত কৃষ্ণ ভজে অবিরত
সদাকাল নারায়ণে মতি॥
তাহার অনুজ ভাই অবিরত গুণ গাই
কৃষ্ণের চরণ অভিলাষী।
ভাবিয়া গুরুর পায় শ্রীহরিচরণ গায়
ঘরে বাহিরে বনে বসি॥

রসিক রচিত পারিজাতহরণ উপাখ্যানের একটি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৫] কবির ভণিতা এইরূপ—

১। ব-সা-প-প ৮, পৃ ৩৩, পুঁথির লিপিকাল ১২৫৯ সাল। ২। HBL দ্রষ্টব্য।
৩। বীরভূম বিবরণ ১, পৃ ১৭৯, পরিশিষ্ট পৃ ৵—।/০।
৪। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩৩৯-৪০। ৫। বা-প্রা-পু-বি ২-১, পৃ ৩৭।

শ্রীকবি রসিক কন হঞা এক মন।

ভবানীনাথের পারিজাতহরণ পালা পাওয়া গিয়াছে।[১] কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম রঘুমণি বা রামচন্দ্র।

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রঘুমণি, তাহান অনুজ আমি,
জানাইতে সকল বিশেষ।
বোলএ ভবানীনাথে রামচন্দ্র বন্দি মাথে,
বোলে ব্যাস মুনির আদেশ॥

কৃষ্ণরাম দত্ত বিরচিত রাধিকামঙ্গলের[২] কাহিনী এইরূপ—কৃষ্ণের আদেশে উদ্ধব গোপগোপীদিগকে সান্ত্বনা দিবার জন্য গোকুলে আসিলেন। যশোদা ও রাধা উদ্ধবের নিকট নিজ নিজ দুঃখ প্রকাশ করিলেন। এই উপলক্ষ্যে কৃষ্ণের ব্রজলীলা সংক্ষেপে উদ্ধবের নিকট বর্ণনা করা হইল। উদ্ধব কৃষ্ণের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া সকল কথা বলিলেন। এদিকে কৃষ্ণকে আনিবার জন্য রাধা এক সখীকে পাঠাইয়া দিলেন। সখীর মুখে রাধার অবস্থা শুনিয়া কৃষ্ণ উদ্ধবকে আর সেই সখীকে গোকুলে পাঠাইয়া দিলেন রাধাকে আনিবার জন্য। রাধাকৃষ্ণের মিলন হইল। কৃষ্ণের দৃঢ় আলিঙ্গনে বদ্ধ হইয়া রাধা কৃষ্ণ-অঙ্গে লীন হইয়া গেলেন।

বিষয়বস্তুর মত কাব্যের রচনাভঙ্গিও সুন্দর। ভাবে ভাষায় ও ধরণে ভবানন্দের হরিবংশের সহিত কৃষ্ণরামের রাধিকামঙ্গলের মিল আছে। এখানেও রাধার নামান্তর তিলোত্তমা, সখীর নাম শ্রীমতী; মহোদাও আছে। উভয় কবিই কি এক অঞ্চলের লোক? কৃষ্ণরামের কাব্যের পুঁথি চাটিগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।

রাধিকামঙ্গলে কয়েকটি পদ আছে। কবির লেখার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

সেই ঘর সেই দ্বার সেই বৎস ধেনু।
সকল ছাড়িয়া কোথা গেল রাম কানু॥ পৃ ৪।

১। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ২১১।

২। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৩১২)।

কি ক্ষণে পিরীতি কৈল চিকনিয়া কালা।
গলায় বাঁধিয়া দিলুম কলঙ্কের মালা॥ পৃ ২০।

অঙ্গুরী বলয়া হৈল বলয়া হৈল তাড়।
তাড় হৈল গ্রীবাপত্র জীবন অসার॥ পৃ ১৯।

কুলটা করিল মোরে, জীবন হরিল চোরে,
দুইকুলে রাখিল খাঁথার।
আকাশ উপরে তুলি করিল বিবিধ কেলি,
ধরণীতে মারিল আছাড়॥ পৃ ২১।

ভণিতা—

কৃষ্ণরাম দত্তে বলে রাধিকামঙ্গল।
শুনিলে অধর্ম্মনাশ শরীর নির্ম্মল॥ ইত্যাদি।

পরমানন্দের কাব্যের নাম জানা নাই।[১] ইহা শ্রীমদ্ভাগবত অবলম্বনে রচিত। কবিব পিতার নাম ছিল দুর্ল্লভ। ভণিতায় কবি পুনঃ পুনঃ নিজেকে "দুর্ল্লভপুত্র" বলিয়াছেন। কেবল একটি পদের এবং প্রথম স্কন্ধের ভণিতায় কবির নাম পাওয়া যাইতেছে।

গোরা গোসাঞি তুলনা রে গৌর গোসাঞি সাথে।
পরমানন্দের মনের আকুতি বিচার করিয়া দেখ সভে॥

গোবিন্দপদারবিন্দমকরন্দ-আশে।
প্রথম স্কন্ধ প্রবন্ধ পরমানন্দ ভাষে॥

কাব্যটিতে বহু রাগ তালের উল্লেখ আছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন ছাড়া এত রাগ-রাগিণীর উল্লেখ অন্যত্র দেখি নাই। ইহা হইতে অনুমান হয়, কাব্যটি পুরাতন। ষোড়শ শতাব্দীর রচনা হওয়াও অসম্ভব নয়।

অনেক কবি শুধু এক একটি আখ্যান লইয়াই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন,

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ১০২৭। লিপিকাল ১০৪৫ সাল। পুঁথিটি খণ্ডিত, নবম স্কন্ধের কিয়দংশ অবধি আছে।

সমগ্র কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করেন নাই। এই শ্রেণীর কতকগুলি কবি ও কাব্যের নাম করিতেছি। কাব্য হিসাবে এগুলির মূল্য নিতান্তই কম।

রসিকনন্দনের গোপীগোষ্ঠ নামক ক্ষুদ্র পালার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে উত্তরবঙ্গে।[১] মদনচাঁদ ও গোলকচাঁদ রচিত রাধিকার কলঙ্ক-উদ্ধার পালার পুঁথির লিপিকাল ১১৩৪ সাল।[২] শেষের ভণিতা এইরূপ—

অজ্ঞান মদনচান্দে করযোড়ে কহে। অন্তকালে প্রভু মোরে না দিও শমনভয়ে॥
মনে এই আশা করি আমি জাতিহীন। শ্রীরাধাগোবিন্দনাম বল প্রতিদিন॥
অজ্ঞান গোলোকচাঁদে বলয়ে বচন। এই হনে কলঙ্ক-উদ্ধার সমাপন॥

উদ্ধবানন্দের রাধিকামঙ্গল ক্ষুদ্র কবিতা। ইহা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায়[৩] প্রকাশিত হইয়াছে।

রাধার চৌতিশা, রাধাকৃষ্ণের বারমাসী, উদ্ধবসংবাদ ইত্যাদি কবিতা অনেক পাওয়া গিয়াছে। অধিকাংশ পুঁথিই চাটিগ্রাম অঞ্চলের। এই কবিদের নাম হইতেছে—আনন্দী-সুত মদন দত্ত[৪], "মুরারি ওঝার নাতি" শ্রীধর বানিয়া,[৫] রামশরণ,[৬] বিষ্ণুরাম নন্দী,[৭] "ক্ষীণ" দেবীদাস।[৮]

গদাধর দাসের রচিত রাসপঞ্চাধ্যায়ের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৯] ভণিতা হইতে অনুমান হয় যে ইনি শ্রীমদ্ভাগবতের সমগ্র দশম স্কন্ধের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

গোপালচরণে আশ কহে গদাধর দাস
দশমের ভাষা অনুমানে।
শ্রীকৃষ্ণ জীবদাসে দয়া কর হৃষীকেশে
কৃষ্ণপ্রাণ আর বৃন্দাবনে॥

শেষোক্ত চারি পাঁচ জন কবির পুত্র ছিলেন কি?

১। ব সা-প-প ২, পৃ ৩৯। ২। ব-সা-প-প ৮, পৃ ৪৫।
৩। তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২১৭ হইতে। ৪। বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ২১।
৫। ঐ, পৃ ৫, ৪৬-৪৭, ৪৯, ৮২।
৬। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৪৪, ১২৭। কবি বোধ হয় মুক্তারাম দাসের রচনা আত্মসাৎ করিয়াছেন [ঐ, পৃ ১৪ , ১-২, পৃ ৯৬]। ৭। আরতি ১৩০৮।
৮। বা-প্রা-পু বি ১-২, পৃ ৬। ৯। বা-প্রা পু-বি ৩-৩, পৃ ৮৯।

অন্যান্য পুরাণের মধ্যে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের এবং পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসার অংশ একাধিক কবির দ্বারা অনূদিত হইয়াছিল। গয়ারাম দাসের ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে উত্তরবঙ্গে।[১] রামলোচনের কাব্য ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মুদ্রিত হইয়াছিল।[২] কাব্য হইতে কবিপরিচয় এইটুকু পাওয়া যায়—

বিশ্বেতে ব্যাপক পরগনে কাগমারি। তেরথি নামেতে গ্রাম অধীন তাহারি ॥
নদীতীরে এ নগরী বসতি প্রচুর। মিশ্রিত হইতে গ্রাম সহদেবপুর ॥
... ...
অম্বষ্ঠ জাতির শ্রেষ্ঠ গরিষ্ঠ আখ্যাত। এ গ্রামে নিবাস নরদাস সুবিখ্যাত ॥
কবিকণ্ঠহার করি কৃপা সুপ্রকাশে। কুলে কৈলা মর্য্যাদাক এই নরদাসে ॥
সেই বংশে শিব-অংশে আবির্ভাব হন। যশঃসরোবরে ফুল্ল কমল যেমন ॥
গুণেতে তাঁহার নাম সর্ব্বত্র বিকাশ। পুণ্যকীর্ত্তিমন্ত শান্ত কৃষ্ণকান্ত দাস ॥
তাহার তনয় অতি ঘোর মূর্খ জন। সর্ব্বসাধারণে বলে শ্রীরামলোচন ॥
... ...
শ্রীগুরুচরণ ভাবি শ্রীরামলোচন। বিরচিল ভাষাগান কৃষ্ণসংকীর্ত্তন ॥

রামেশ্বর নন্দী[৩] এবং অনন্তরাম দত্ত[৪] এই দুই কবি ক্রিয়াযোগসার অনুবাদ করিয়াছিলেন।

অনন্তরাম দত্তের ক্রিয়াযোগসার কাব্যের ভণিতা এইরূপ—

পরাশরসুত ব্যাস বিষ্ণু-অবতার।
শ্লোকবন্ধে রচিলেক ক্রিয়াযোগসার ॥
সেই শ্লোক বাখান কবিয়া পদবন্ধে।
রচিল অনন্তরাম হরিগুণানন্দে ॥

কবির পিতার নাম রঘুনাথ। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম রামকৃষ্ণ। মাতামহের নাম রামদাস। ইঁহারা জাতিতে বৈদ্য ছিলেন। নিবাস পূর্ব্ববঙ্গে। ইঁহার মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত ছিলেন কবিরাজ।

১। র-সা-প-প ২, পৃ ১৮৫-৮৬।
২। ঐ, পৃ ১৯৯-২০০ ; ব-সা-প-প ১৩, পৃ ১৭৭।
৩। ব-সা-প-প ৫, পৃ ১৯৭।
৪। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৬-৮, ১-২, পৃ ৫২-৫৩

কহেন অনন্ত দত্তে কবিরাজ ভ্রাতৃসুতে
রামকৃষ্ণ রায়ের অনুজ।
রঘুনাথ সন্ততি সেই দীন হীনমতি
স্মরিয়া শিবের পদাম্বুজ ॥

উপরের ভণিতাটি বাণযুদ্ধের একটি পুঁথিতে পাওয়া গিয়াছে।

অনন্তরাম এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

তীর্থরাজ সন্নিহিত রম্য এক স্থান। উত্তম আশ্রমপুরী সর্ব্বত্রে বাথান ॥
বৈদ্যশ্রেষ্ঠ তথা ছিল অতি মহাজন। বৈবস্বত নাম তার ধর্ম্মপরায়ণ ॥
অতি জ্ঞাতা ছিল তবে সেই মহামুনি। চিরকাল দানধর্ম্মে বঞ্চিল অবনী ॥
সর্ব্বক্ষণ আছিলেক ধর্ম্ম অনুসারী। প্রতি নিতি মুনিবর বিষ্ণুসেবা করি ॥
তিন বিদ্যা তার স্থানে দিছিল ঈশ্বরে। তিন বিদ্যা তিন পুত্রে লইছে অংশ করি ॥
রামচন্দ্র নামে তার প্রথম সন্ততি। শাস্ত্রেতে নিপুণ [ছিল] অতি বড় খ্যাতি ॥
আর এক পুত্র ছিল দ্বিতীয় সন্ততি। চিত্রগুপ্ত লজ্যিতে সেই মহামতি ॥
রঘুনাথ নাম তার তৃতীয় নন্দন। পরম তপস্বী ছিল সেই মহাজন ॥
সংসার ধর্ম্মেতে থাকি রাজা সেবা করি। তথাপি তপস্বী ছিল ভক্তি বাঞ্ছা করি ॥
সর্ব্বক্ষণ আছিলেক রাজসেবা করি। তথাপি তপস্বী ছিল ভজিয়া শ্রীহরি ॥
রামদাসসুতাগর্ভে তাহার ঔরসে। জন্মিল অনন্তরাম হরিপদ-আশে ॥[১]

ভণিতায় এবং অন্যত্র কবি যেভাবে বিশারদের বন্দনা করিয়াছেন তাহাতে মনে হয় না যে ইনি কবির গুরু ছিলেন। ইহা গৃহদেবতার নাম হওয়াই সম্ভব।

বিশারদ প্রণমহ সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞাতা।
সেই সে পরমধর্ম্ম সৃষ্টির যে কর্ত্তা

ক্রিয়াযোগসার ষোড়শ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ। প্রত্যেক অধ্যায়ের শেষে এইরূপ ভণিতা আছে—

বিশারদপদে সেই রেণু অভিপ্রায়।
পদবন্ধে রচিলেক ষোড়শ অধ্যায় ॥

১। বা-প্র-পু-বি ১-১, পৃ ১৬।

"দ্বিজ" তিলকরামের গোবিন্দবিলাস[১] বরাহপুরাণ অবলম্বনে রচিত। কবি বোধ হয় বৃন্দাবনে শ্রীরাধামদনমোহনের পূজারী ছিলেন। গ্রন্থারম্ভে

প্রথমে বন্দিব শ্রীরাধামদনমোহন। যাঁহার সমান নাহি পতিতপাবন।
সর্ব্বগুণহীন দেখি মোরে দয়া কৈল। পূজারী করিয়া মোকে পদছায়া দিল॥

শেষের ভণিতা এইরূপ—

শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদপদ্মে সদা করি আশ। দ্বিজ তিলকরাম কহে গোবিন্দবিলাস॥

নারদীয়পুরাণ অবলম্বনে রচিত দুইখানি কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ভুবনেশ্বর বাচস্পতির নারদীরসামৃত রচিত হয় ১৬৫২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৩০-৩১ খ্রীষ্টাব্দে।[২]

হরিধ্বনি কর গ্রন্থ হৈল সমাপন। ষোল শত বায়ান্ন শকেতে হৈল লিখন॥
তাম্রধ্বজ মহারাজ ছিলা মহাভাগ। সর্ব্বলোকে যারে করে সদা অনুরাগ॥
তান পুত্র রাজা শূরদর্প মহাশয়। চন্দ্রপ্রভা নামে দেবী তান মাতা হয়॥
কবি বাচস্পতি তান কাব্য অনুসারে শ্রীনারদীরসামৃত রচিলা পয়ারে॥

মহীধর দাস রচিত একাদশীমাহাত্ম্যের খণ্ডিত পুঁথি চাটিগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।[৩] কবি বলিতেছেন, তিনি নারদীয়পুরাণ মতে স্বীয় নিবন্ধ রচনা করিয়াছেন।

নারদী-পুরাণ মতে শ্লোক সংকথন।
মহীধর দাসে কহে পয়ার রচন॥

নারদী-পুরাণ বাণী অমৃতসমান জানি শ্লোকবন্ধে করিল প্রকাশ।
দেশীভাষা বুঝিবারে পয়ার রচিল তারে দীনহীন মহীধর দাস॥

"দ্বিজ" রাধাকান্ত রচিত কণ্বমুনির পারণাভঙ্গ পালার পুঁথি চাটিগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।[৪] ভণিতা এইরূপ—

রাধাকান্ত দ্বিজের বাণী, শুন শুন কণ্ব মুনি,
নররূপে অবতার হরি।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ১৮৩০। ২। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পরিশিষ্ট ২, পৃ ১১-১২।
৩। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ২১৭। ৪। বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ২৫।

শ্যামদাস বিরচিত একাদশী ব্রতকথা পালার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[১] গুরুদক্ষিণা পালা অবলম্বনে কবিতা লিখিয়াছিলেন—অযোধ্যারাম,[২] শঙ্কর আচার্য্য (ব্রাহ্মণ),[৩] শ্যামদাস দত্ত।[৪] লক্ষ্মীকান্ত দেব রচিত উঞ্ছবৃত্তি পালার পুঁথির লিপিকাল ১০৬৩ সাল, সম্ভবতঃ মল্লাব্দ।[৫]

কৃষ্ণদাসের নারদপুরাণ[৬], বা কণ্বমুনির পারণা অতি ক্ষুদ্র নিবন্ধ। ইহার বহু পুঁথি পাওয়া যায়। একটি পুঁথির শেষে আছে—

দোষাদোষ মোর না লইবে কৃপা করি। রচিলাম যেমন ঘটে বুদ্ধি দিলা হরি॥
রচিলাম শ্রীগুরু বৈষ্ণবের কৃপায়। নারদপুরাণ হৈল এতদূরে সায়॥
শ্রীগুরুগোবিন্দপাদপদ্ম করি আশ। পুরাণ প্রমাণ রচিলেন কৃষ্ণদাস॥
অতঃপর কহি শুন নিজ সমাচার। সুবর্ণবণিককুলে উৎপত্তি আমার।
পৈতৃক বসত পূর্ব্বে অম্বিকানগর। হাঁসপুকর নাম যথা তাহার উত্তর॥
পিতামহ নাম ছিল মদনমোহন। পিতা তারাচাঁদ নাম ধর্ম্মপরায়ণ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই নাম ছিল রামনারায়ণ। ভেকাশ্রয় হয়্যা তীর্থ করেন ভ্রমণ॥
রঘুনাথ মধ্যম ভাই অধিক পুণ্যবান। স্বর্গবাসে গেলা তিঁহ চাপিয়া বিমান॥
আপনি কনিষ্ঠ মোর রামকৃষ্ণ নাম। সাকিন কলিকাতা বহুবাজারেতে ধাম॥
সন দশ শও নিরেনব্বুই সালে। মাহ জ্যৈষ্ঠ মধ্যে এই পুস্তক রচিলে॥[৭]

এই রামকৃষ্ণই কি গ্রন্থকার? এই পুঁথিটির লিপিকাল ১১০৮। ইহা মল্লাব্দ হইবে। ১০৯০ সালও মল্লাব্দ ধরিতে হইবে।

কৃষ্ণদাসের কাব্যের একটি পুঁথির পয়ার সংখ্যা প্রায় ১৫০। পুঁথিটি ৮ই শ্রাবণ ১১৩৪ সালে (সম্ভবতঃ মল্লাব্দ) "পঠনার্থে শ্রীশ্রীরাজকন্যা সাবিত্রীকোঙারি সাং সহায় বিষ্ণুপুর" লিখিত হইয়াছিল।[৮]

১। ব-সা-প-প ৬, পৃ ৫০। ২। ঐ, পৃ ৫৩। ৩। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১১৭, ১২৬-২৭। ৪। ব-সা-প পুঁথি ৩৮৬ (দাস সংগ্রহ), কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ৯২২, লিপিকাল ১১০০ সাল (মল্লাব্দ?)। ৫। বরাহনগর শ্রীগৌরাঙ্গ গ্রন্থমন্দিরে রক্ষিত। ৬। বটতলা হইতে প্রকাশিত। ৭। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩২০। ৮। ঐ ৬, পৃ ৫০-৫১।

পদ্মপুরাণে বিবৃত তুলসীচরিত্র বা তুলসীমাহাত্ম্য বিষয়ক একাধিক কবিতা পাওয়া গিয়াছে। কংসারি সেনের (!) পুত্র "দ্বিজ" ভগীরথ রচিত[১] কাব্যের ভণিতা এইরূপ—

কংসারি সেনের পুত্র দ্বিজ ভগীরথ।
পদ্মপুরাণে কহে তুলসীমাহাত্ম্য ॥

কংসারি পণ্ডিত সুত দ্বিজ ভগীরথ।
পদ্মপুরাণে কহে তুলসীমহত্ত্ব ॥

এক "দ্বিজ" কংসারি রচিত প্রহ্লাদচরিত্র কাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[২] ইনিই কি ভগীরথের পিতা?

প্রহ্লাদচরিত্র বিষয়ে অপর কবি হইতেছেন ভরত পণ্ডিত[৩] ও সীতারাম দত্ত।[৪] ধ্রুবচরিত্র বিষয়ে কবিতা লিখিয়াছিলেন ভরত পণ্ডিত[৫] ও "দ্বিজ" লক্ষ্মীকান্ত।[৬] লক্ষ্মীকান্ত মধ্যে মধ্যে পিতার ভণিতা দিয়াছেন। ভণিতা হইতে কবির পরিচয় কিছু কিছু পাওয়া যায়।

বিপ্র নতুপাড়া[৭] ধাম লক্ষ্মীনারায়ণ নাম
দ্বিজবর করিল রচন।
দ্বিজ লালবিহারী সুত সেহ বড় গুণান্বিত,
তার সুত লক্ষ্মীনারায়ণ ॥
গণেশ অনুজ হরি, তস্য ভ্রাতা লালবিহারী,
বিপ্র নতুপাড়াতে নিবাস।
তাহার সুতের সুত জ্ঞানশূন্য লক্ষ্মীকান্ত
ধ্রুবকথা করিল প্রকাশ ॥

অধিকাংশ মনসামঙ্গল কাব্যে উষাহরণ উপাখ্যান পাওয়া যায়। স্বতন্ত্রভাবে

১। ব-সা-প-প ৪, পৃ ২৮৭, ৫, পৃ ২৮৭, ৬, পৃ ৫৯, ৮, পৃ ৩৪, বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৮, ১-১, পৃ ২৭-২৮, ২-১, পৃ ২৩। একটি পুঁথির লিপিকাল ১৬৫৬ শকাব্দ।

২। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৯৯-১০০, ২-১, পৃ ২৩। ৩। ব-সা-প প ৪, পৃ ৩২২-২৩।

৪। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৪৮। ৫। ঐ পৃ ৬০।

৬। ঐ ১-২, পৃ ২-৩। ৭। 'নওপাড়া' পাঠও হইতে পারে।

উষাহরণ বিষয়ে কবিতা লিখিয়াছিলেন ভৈরবচন্দ্র দাস,[১] "দ্বিজ" রামচন্দ্র,[২] অনন্তরাম দত্ত, গৌরীচরণ গুহ, শ্রীনাথ ও দয়াময়।[৩] ভৈরবচন্দ্রের কাব্য রচিত হয় ১৭০০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৭৮ খ্রীষ্টাব্দে, কবির বয়স তখন পনের।

পঞ্চদশ বৎসর বয়ঃক্রম যবে মোর
শ্লোক ভাঙ্গিয়া পয়ারে গাঁথিল।
সপ্তদশ শত শকে জ্যৈষ্ঠ মাস শুক্লপক্ষে
সপ্তদশ দিনেতে রচিল॥

কবিপরিচয় এইটুকু পাওয়া যায়—

উগ্রক্ষত্রি-কুলে জন্ম, বাণিজ্যকরণ ধর্ম্ম,
যশরে পলুয়া যেই গ্রাম।

"বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ" কমলাকান্ত রচিত মণিহরণ পালার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে উত্তরবঙ্গে।[৪] ভণিতা এইরূপ—

দুর্গাপদ হৃদে ভাবি রচিল নৌতুন কবি
কমলাকান্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ॥

মুকুন্দ দাসের অর্জ্জুনসংবাদ পালার পুঁথির লিপিকাল ১১৪০ ফাল্গুন।[৫] দণ্ডী রাজার উপাখ্যানের উপর কাব্য লিখিয়াছেন—মহীন্দ্র[৬] এবং রাজারাম দত্ত।[৭]

ভক্তিদাস রচিত বৈষ্ণবামৃতে [৮] কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদচ্ছলে বৈষ্ণব ভক্তিতত্ত্ব ব্যাখ্যাত হইয়াছে।

চাটিগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত হরিশ্চন্দ্রের স্বর্গারোহণ পালার পুঁথিতে[৯] "মাধব," "মাধবানন্দ," "মাধব দাস," "মাধবানন্দ স্থত," "মাধবস্থত নন্দ"—এই সব ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। কবি কি মাধবানন্দ, না মাধবস্থত নন্দ? অপর একটি পুঁথিতে শুধু "স্থকবি" ভণিতা আছে।[১০]

১। বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ৯৬। ২। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৬। ৩। ঐ ১-২, পৃ ৩।
৪। ব-সা-প-প ১৩, পৃ ১৬১। ৫। ঐ ৮, পৃ ২৬৩-৬৪। ৬। ঐ চতুর্থ খণ্ড।
৭। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৪৮।
৮। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ২১৭৭ (খণ্ডিত), লিপিকাল ১০১৮ সাল (মল্লাব্দ)।
৯। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৩৪-৩৫। ১০। ঐ, পৃ ১৫৫।

সহস্রগিরি রাবণবধ পালার পুঁথিতে[১] রামকেশব দেব বা কেশবরাম দেবের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে।

দেব রামকেশবে বলে গতি হীন[২] অতি [দীন] মতি
কালীরূপে শত্রু করে ক্ষয়।

মোহমুদ্গরচরিত্র নামে দুইটি নিবন্ধ চাটিগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া যাইতেছে। একটির রচয়িতা রাঘব দাস।[৩] অপরটির রচয়িতা পুরুষোত্তম দাস।[৪] রাঘব দাসের ভণিতা এইরূপ—

অধম রাঘব দাস যুগপাণি হৈয়া।
বিষ্ণুভক্তগুণ কহে সংক্ষেপ করিয়া॥

পুরুষোত্তমের কাব্যের আরম্ভ এইরূপ—

একদিন শিব স্থানে পুছিলা ভবানী। ভারতের কথা কিছু কহ শূলপাণি॥
অভিমন্যুযুদ্ধে যদি প্রলয় হইল। যেন মতে অর্জ্জুনকে কৃষ্ণ সান্ত্বাইল॥
সেই সব কথা মোরে কহ শূলপাণি। তোমার প্রসাদে আজ কৃষ্ণের কথা শুনি॥
এতেক শুনিয়া তবে দেব ত্রিলোচনে। সাধু সাধু করিয়া যে দেবীক বাখানে॥

ভণিতা এইরূপ—

শ্লোকবন্ধে সংহিতা যে আছএ বিশেষে।
পয়ার কহিল কিছু পুরুষোত্তম দাসে॥

"ভারতযুদ্ধে অভিমন্যু নিহত হইলে অর্জ্জুন পুত্রশোকে একান্ত বিধুর হয়েন। তাঁহাকে সান্ত্বনা করিতে যাইয়া শ্রীকৃষ্ণ কামক্রোধাদিরিপুজয়ী ভক্তের কথা পাড়েন। তাহাতে অর্জ্জুন কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া কৃষ্ণ মোহমুদ্গর রাজার ভক্তি পরীক্ষা। তাঁহাকে প্রকৃত ভক্ত দেখান।"

বীরভূম অঞ্চল হইতেও মোহমুদ্গর অনুবাদ কাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৫]

বিশ্বম্ভর দাস বিরচিত জগন্নাথমঙ্গলের রচনাকাল পাওয়া যায় নাই। তথাপি

১। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৪৩। ২। পাঠ 'গতি অতি মতি হীন'।
৩। বা-প্রা-পু-বি ২-১, পৃ ৫৭-৫৮, ১৮০। একটি পুঁথির লিপিকাল ১৭০১ শকাব্দ।
৪। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৫৭, ঐ ১-২, পৃ ১-২। ৫। ঐ ২-১, ভূমিকা পৃ /০।

কবি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে কিংবা তৎপরে কাব্যটি[১] রচনা করিয়াছিলেন তাহা বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের কলিকাতায় স্থিতির উল্লেখ হইতে উপলব্ধি হয়।

বিষ্ণুপুরে বন্দিলাম মদনমোহন।
এবে গঙ্গাতীরে যার করহ দর্শন॥

শ্রীনিবাস আচার্য্যের সুতাবংশীয় ব্রজনাথ কবির গুরু ছিলেন। এক ব্রজনাথ রচিত পদ পাওয়া গিয়াছে;[২] ইনি সেই ব্রজনাথ হইতে পারেন। কবির বাসস্থান ছিল হুগলি জেলায় কৃষ্ণনগরের নিকটে। পিতার নাম কানাইচরণ দাস, মাতার নাম রত্নমণি। গ্রন্থশেষে কবি এই আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

মম জন্মভূমি কৃষ্ণনগর দক্ষিণে। গোপীনাথ রাধাদামোদর সেইখানে॥
গোপীনাথ হৈতে অর্দ্ধ যোজন প্রমাণ। তথায় নিবাস মোর জানিবে বিধান॥
মাতা সতী শুদ্ধমতি রত্নমণি নাম। তাঁহার উদরে জন্ম করি কৃষ্ণনাম॥
কানাইচরণ দাস জনক আমার। বৈষ্ণবসমাজে সদা প্রশংসা যাঁহার॥
মহাদাতা ছিলা তিঁহো সর্ব্বত্র বিদিত। সত্যবাদী সদাচার ধর্ম্মে নিয়মিত॥
পিতৃব্যগণের মধ্যে শ্রীরামসুন্দর। রাধাদামোদরে অনুরক্ত নিরন্তর॥
শিশুকালে পিতৃহীন আমি দুরাচার। লালন পালন তিঁহ করিল আমার॥
তাহাতে দুর্দ্দৈব আর শুন সর্ব্বজন। হইনু পিতৃব্যহীন বিধির লিখন॥

কবি অন্যত্র পিতামহ পিতা ও পিতৃব্যগণের নাম করিয়াছেন।

কিশোরী গোপী রামানুজ মোহন সুন্দরাগ্রজ
নীলাম্বর আত্মজ কানাই।
তাঁর সুত বিশ্বম্ভর দাস গীত মনোহর
কৈল ব্রজনাথ-কৃপা পাই॥

কুলদেবতা ও গ্রামদেবতা বন্দনা প্রসঙ্গে কবি পশ্চিমবঙ্গের অনেক সুবিখ্যাত দেবদেবীর নাম করিয়াছেন।

উৎকলখণ্ড অবলম্বনে বিশ্বম্ভর দাস জগন্নাথমঙ্গল রচনা করেন। গ্রন্থটি তিন

১। পাঁচকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৩১২)। বটতলা হইতেও একাধিকবার মুদ্রিত হইয়াছে। ২। HBL, পৃ ৩৩৪-৩৫।

খণ্ডে বিভক্ত—সূত্রখণ্ড, লীলাখণ্ড ও ক্ষেত্রখণ্ড। সূত্রখণ্ডে আছে বন্দনাদি, গ্রন্থারম্ভ, জগন্নাথের রূপমাহাত্ম্য, মহাপ্রসাদতত্ত্ব, নৈমিষারণ্যে মুনিগণের প্রশ্ন, পুরুষোত্তমক্ষেত্রের উৎপত্তি, যম-লক্ষ্মী সংবাদ, পুণ্ডরীক-অম্বরীষ প্রসঙ্গ। লীলাখণ্ডে বর্ণিত বিষয়—ইন্দ্রদ্যুম্ন বিবরণ, বিদ্যাপতি ও রাজার প্রসঙ্গ, নীলাচলে রাজার অভিষেক, রাজার একাম্রকাননে উপস্থিত ও নারদ কর্তৃক হরপার্ব্বতী কাহিনী বর্ণন, শিববিবাহ বর্ণন, হরগৌরীর বারাণসীপুরীতে গমন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত কাশীরাজের যুদ্ধ, হরিনামমাহাত্ম্য, রাজার কপোতেশ্বরে বিশ্রাম, বিল্বেশ্বর মাহাত্ম্য, সুবিস্তৃত-ভাবে পুরাণমতে শ্রীকৃষ্ণলীলা বর্ণনা। ক্ষেত্রখণ্ডে বর্ণিত হইয়াছে—ইন্দ্রদ্যুম্নের শ্রীক্ষেত্রগমনান্তর কার্য্য, রাজার নীলাদ্রিতে গমন, ইন্দ্রদ্যুম্নের পুরুষোত্তমস্তুতি, রাজার নৃসিংহমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা, রাজার অশ্বমেধ যজ্ঞারম্ভ, রাজার ভগবদ্দর্শন, দারুব্রহ্ম-প্রতিমা নির্ম্মাণ, মূর্ত্তিচতুষ্টয়রূপে ভগবানের আবির্ভাব, প্রিয়ংবদের গণেশরূপে জগন্নাথ দর্শন, ইন্দ্রদ্যুম্ন সরোবরের উৎপত্তি কথন, রাজার দেউল-প্রতিষ্ঠা, রাজার ব্রহ্মলোকগমন, ব্রহ্মার উক্তি, ব্রহ্মলোক হইতে রাজার প্রত্যাগমন, দেউল-প্রতিষ্ঠার আয়োজন, জগন্নাথদেবের রথযাত্রা, দেবগণসহ ব্রহ্মার নীলাচলে আগমন, প্রতিষ্ঠাবিধান, প্রভুর নৃসিংহমূর্ত্তি ধারণ, স্নানযাত্রা, অন্যান্য যাত্রার বিবরণ, ব্রহ্মা ও দেবগণের স্বস্থানে গমন, শ্বেতরাজে সেবা সমর্পণপূর্ব্বক রাজার ব্রহ্মলোক গমন, শ্রীমহাপ্রসাদতত্ত্ব, শ্রীমহাপ্রসাদমাহাত্ম্য, ক্ষেত্রখণ্ড কথা, শাণ্ডিল্য কর্ত্তৃক স্তব, মহাপ্রসাদভক্ষণে শাণ্ডিল্যের ব্যাধিমুক্তি, দ্বাদশ যাত্রা, দোলারোহণ যাত্রা, দমনক-মালা তত্ত্ব, নির্ম্মাল্যমহিমা, দ্বাদশমাসের পুষ্প ফল, ক্ষেত্রযাত্রা ফল, সমস্ত ব্রাহ্মণের মুক্তিলাভ, গ্রন্থকারের দৈন্যোক্তি, গ্রন্থানুবাদ, গ্রন্থফল তত্ত্ব ও আত্মপরিচয়।

বিশ্বম্ভর দাসের কাব্যে কবিত্বের বালাই নাই। কবি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, ইহা মুখবন্ধে গুরুবন্দনার নয়টি শ্লোক হইতে বোঝা যায়।

একটি ছোট জগন্নাথমঙ্গলের রচয়িতা (গায়ক ?) হইতেছেন দ্বিজ মধুকণ্ঠ।[১] শেষের ভণিতা এইরূপ—

১। ব-সা-প পুঁথি ৮৪৭।

দ্বিজ মধুকণ্ঠ বোলে শুন সাধুজন।
কলির ভব তরিবারে ভজ নারায়ণ ॥

"দ্বিজ" মুকুন্দ বা মুকুন্দ ভারতী রচিত জগন্নাথমঙ্গল বা জগন্নাথবিজয় বা ব্রহ্মপুরাণ কাব্যের অনেক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[১] কবি সপ্তদশ শতাব্দীর লোক হইতেও পারেন।

ভূকৈলাসের রাজা জয়নারায়ণ ঘোষাল[২] ১৭১৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে কাশীখণ্ড অবলম্বনে একটি কাব্য রচনা আরম্ভ করান। কবি লিখিয়াছেন—

কাশীবাস করি পঞ্চগঙ্গার উপর। কাশীগুণগান হেতু ভাবি নিরন্তর ॥
মনে করি কাশীখণ্ড ভাষা করি লিখি। ইহার সহায় হয় কাহারে না দেখি ॥
সতর শত চৌদ্দ শক পৌষ মাস যবে। আমার মানস মত যোগ হইল তবে ॥
শূদ্রমণি কুলে জন্ম পাটুলী নিবাসী। শ্রীযুক্ত নৃসিংহ দেব রায়াগত কাশী ॥
তার সঙ্গে জগন্নাথ মুখুর্য্যা আইলা। প্রথম ফাল্গুনে গ্রন্থ আরম্ভ করিলা ॥

গ্রন্থরচনায় জয়নারায়ণ যাঁহাদের সাহায্য পাইয়াছেন তাঁহাদের উল্লেখ করিতে বিস্মৃত হন নাই।

শ্রীরামপ্রসাদ বিদ্যাবাগীশ ব্রাহ্মণ। ভাঙ্গিয়া বলেন কাশীখণ্ড অনুক্ষণ ॥
মুখুর্য্যা করেন সদা কবিতা পাতড়া। তাহারে করেন রায় তর্জ্জমা খসড়া ॥
রায় পুনর্ব্বার সেই পাতড়া লইয়া। পুস্তকে লিখেন তাহা সমস্ত শুধিয়া ॥
এই মত চল্লিশ লাচাড়ী হৈল যবে। বিদ্যাবাগীশের কাশীপ্রাপ্তি হৈল তবে ॥
ভাদ্র মাসে মুখুর্য্যা গেলেন নিজবাটী। বৎসর স্থগিত ছিল গ্রন্থ পরিপাটী ॥
পরন্তু বাঙ্গালীটোলা গেলা যবে রায়। বলরাম বাচস্পতি মিলিলা তথায় ॥
পচাত্তরী অধ্যায় পর্য্যন্ত তার সীমা বক্রেশ্বর পঞ্চাননে সমাপ্ত সরিমা (?)
কাশী পঞ্চক্রোশী আর নগর ভ্রমণ। এই দুই অধ্যায় পঞ্চাননে সমাপন ॥
পরে সম্বৎসরাবধি স্থগিত হইলা। শ্রীউমাশঙ্কর তর্কালঙ্কার মিলিলা ॥
যদ্যাপি নয়ন দুটি দৈবযোগে অন্ধ। তথাপি তাঁহার গুণে লোকে লাগে ধন্ধ
ইষ্টনিষ্ঠ বাক্‌নিষ্ঠ কাশীপুরে জন্ম। পরানিষ্টপরাঙ্মুখ বিজ্ঞ মর্ম্মী মর্ম্ম ॥

১। বা-প্রা-পু-বি ৩-৩, পৃ ৮৪-৯১। ২। ব-সা-প-প ৭, পৃ ১-২৫।

লোক-উপকারে সদা ব্যাকুল অন্তর। গ্রন্থের সমাপ্তি হেতু হৈলেন তৎপর
শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যালঙ্কার আখ্যান। তর্কালঙ্কারের পিতা সুধীর বিদ্বান্ ॥
নিজে তার সহিত করিয়া পর্য্যটন। ছয় মাসে বহু গ্রন্থ করি সঙ্কলন ॥
ঋতু মাস তিথি বার বর্ষ যাত্রা যত। পদ্যেতে আনিয়া সংস্কৃত অভিমত ॥
তর্কালঙ্কারের বন্ধু বিষ্ণুরাম নাম। সিদ্ধান্ত আখ্যান অতি ধীর গুণবান্ ॥
পদ্ধতি ভাষাতে করিলেন পরিষ্কার। রায় করিলেন সর্ব্ব গ্রন্থের প্রচার ॥
ঘোষাল বংশের রাজা জয়নারায়ণ। এই খানে সমাপ্ত করিলা বিবরণ ॥
তাঁহার আদেশ ক্রমে কিতাব করিয়া। রামতনু মুখোপাধ্যায় লইল লিখিয়া ॥
সেই বহি দৃষ্টি করি নকলনবিশী। কৃষ্ণচন্দ্র মুখোপাধ্যায় চাতরা নিবাসী ॥

কাশীখণ্ডের শেষে সমসাময়িক কাশীর যে বর্ণনা দেওয়া আছে তাহা নানা দিক দিয়া অমূল্য। এই অংশটি জয়নারায়ণের নিজের রচনা হওয়া অসম্ভব নহে।

জয়নারায়ণের শ্রীকরুণানিধানবিলাস কাব্য কাশীখণ্ডের অনেক পরে ১২২০ সালে অর্থাৎ ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে আরব্ধ হইয়া ১২২১ সালে সমাপ্ত হয়। রচনা সমাপ্ত হইবার অনতিকাল পরেই কাব্যটি মুদ্রিত হইয়াছিল।

বারশত বিশ সাল মাস অগ্রহায়ণ।
রচিতে কৃষ্ণের লীলা কৈলা আয়োজন ॥
ইতি শ্রীকরুণানিধানবিলাস গান।
বারশত একুইশ সালে হইল পূরণ ॥

কাব্যটির বিষয়সূচী এখানে দেওয়া গেল। গৌরচন্দ্রিকা, "পীঠবন্দনা" অর্থাৎ কৃষ্ণরূপ বর্ণনা,[১] ভগবৎ প্রার্থনা ও স্তব, গুরুস্তব, কৃষ্ণলীলার মঙ্গলাচরণ, মহাদেব, ব্রহ্মা, ভগবতী, ভানু, ধর্ম্ম, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও জগৎ বন্দনা। শ্রীকৃষ্ণাবতারের সূচনা,

---

১। এই অংশের পর একটু গদ্য আছে। সেটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতে এবং অন্যান্য স্থানের উক্তি হইতে মনে হয়, জয়নারায়ণ কর্ত্তাভজা সম্প্রদায়ের অনুবর্ত্তী ছিলেন।

জয়নারায়ণকল্পদ্রুম সংস্কৃত পুস্তকের নাম রঘুনাথ পণ্ডিত রাখিলেন এই বাঙ্গালা ভাষা পুস্তকের নাম শ্রীকরুণানিধানবিলাস ভক্তজনের আজ্ঞামত হইল কেবল গোকুল বৃন্দাবন লীলা বার বৎসর যেমত শ্রীকৃষ্ণ করিয়াছেন তাহার সংক্ষেপ রচনা কিঞ্চিৎ করিতে উদ্যোগমাত্র কর্ত্তা এক গুরু এক ভক্তজন অনেক কিন্তু ভাব এক।

গোলোকের বর্ণনা, দেবকী ও কংসের জন্মবিবরণ, শ্রীকৃষ্ণের জন্মকথা, নন্দালয়ে রক্ষা, কংসপীড়ন ও বসুদেবপ্রসাদন, নন্দোৎসব, শ্রীকৃষ্ণের শৈশবলীলা, পূতনাবধ, কাকাসুরবধ, গাভীবৎসপ্রদর্শন, শকটভঞ্জন, একইশা পূজা, তৃণাবর্ত্তবধ, নামকরণ, নৃত্য, ঘুটুঙ্গু খেলা, সাতাশনক্ষত্র পূজা, গোপীগণের গর্ভা গীত, শ্রীধর ব্রাহ্মণ দমন, অন্নপ্রাশন, ব্রহ্মখেদ, চন্দ্রদর্শন, মহাদেবাগমন, ঋষিগণের শ্রীকৃষ্ণদর্শন, কণ্বমুনির আগমন, মৃত্তিকাভক্ষণ, কর্ণবেধ, দ্বিতীয় বৎসরের জন্মতিথি পূজা, রামকাহিনী বলিয়া নিদ্রা আনয়ন ও নিদ্রাঘোরে সীতাবিরহ, শালগ্রাম'গ্রাস, স্নান, ভোজন, গোয়াল সঙ্গে আঁখমুতুলি খেলা, গেঁদ খেলা, হাউ লীলা, ফলহারী লীলা, মোতিক্রয় লীলা, গোপগণের গোকুল ত্যাগ ও বৃন্দাবনে বাস, রাধাকৃষ্ণের ক্রীড়াচ্ছলে বিবাহ, রাধাকৃষ্ণের বিলাস, কৃষ্ণকালী (আয়ান জটিলা কুটিলা ইত্যাদি ব্যতিরেকে), সাঁজিলীলা, বার মাসে তের পার্ব্বণ লীলা, ভ্রাতৃদ্বিতীয়া লীলা, দশ-অবতার লীলা, কোজাগরী লীলা, মনসাপূজা লীলা, গণেশপূজা লীলা, দুর্গোৎসব লীলা, কালীপূজা লীলা, কার্ত্তিকপূজা লীলা, চড়কপূজা লীলা ইত্যাদি। তাহার পর অতি অল্প কথায় শ্রীকৃষ্ণের মথুরা ও দ্বারকা লীলার বর্ণনা করিয়া গ্রন্থ সমাপ্ত হইয়াছে।

উপরের সূচী হইতে দেখা যাইবে যে জয়নারায়ণ কৃষ্ণলীলার বর্ণনায় অনেক কিছু নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। কৃষ্ণলীলার প্রসঙ্গে কবি তখনকার বাঙ্গালী সংসার ও সমাজের একখানি নিখুঁত চিত্র আকিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালীর সামাজিক ইতিহাস রচনায় এই কাব্যটি মূল্যবান্ উপকরণ যোগাইবে। নিম্নে কিছু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

মোতিক্রয় লীলা—

বিদেশী বঞ্জারা বলদ ভরিয়া। আনিল উজ্জ্বল মোতি নাহিক রদিয়া॥
কংসধামে বেচিবে মনে করিয়া। উত্তরিল সন্ধ্যাকালেতে আসিয়া॥
জল স্থল সুন্দর বাজার দেখিয়া। নন্দপুরে রহিল বলদ লইয়া॥
খেলার বিশ্রামে দ্বারে দাঁড়াইয়া। তঙ্গিতে মোতিভরা জানিয়া কানাইয়া॥
নিকটে গেল শিশু কিনিব বলিয়া। শিশুরে বঞ্জারা দিল দেখাইয়া॥

রাগেতে কহেন কৃষ্ণ শুনরে ভায়্যা। কাড়ি ছিঁড়ি লও ভারা ঝোলা ভরিয়া॥
শিশুজাল মিলি শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া। ভাত যেন কাক লইল লুটিয়া॥
মারিতে বালকে উদ্যত হইয়া। বঞ্জারার গুলি করকা জিনিয়া॥
মন্দবৃন্দ বালজাল বঞ্জারা দেখিয়া। বন্দুকে রঞ্জক দিল দারুতে ভরিয়া॥

কৃষ্ণ গোপীদিগের নিকট যে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন তাহাতে ভূগোল জ্যোতিষ ইত্যাদি বিষয়ে কবির মনোভাব বেশ কৌতুকাবহ ঠেকিবে। ভবিষ্যৎ ধর্ম্মপ্রচারকদিগের মধ্যে লামা, গুরু নানক, রামশরণ (পাল, কর্ত্তাভজা) এবং যিশুখ্রীষ্টের নামও আছে!

তিন যুগ অবশেষে কলির পত্তন। এই যুগে হবে সার আমার কীর্ত্তন॥
একাচার এক নাম হইবে যখন। প্রকাশ হইব আমি আসিয়া তখন॥
... ...
সু-আনন্দ নিরানন্দ চিন্তারূপ জরা। এ সকল দেহ মধ্যে রহিবেক ভরা॥
জীবের স্বভাব এই করিতে হইবে। অহঙ্কারে সদামত্ত কঠোর [ভাষিবে]॥
চারি ভাগ পৃথিবীর গণনা করিবে। পশ্চিমে বিলাত আখ্যা [তখন লভিবে]
দক্ষিণেতে এফরিকা সকলে জানিবে। পূর্ব্বদিকে হিন্দুদেশ এসিয়া বলিবে॥
পৃষ্ঠদেশে এমেরিকা ধরা গোলাকার। আকাশে ঘুরিবে সদা তারা সহকার॥
মধ্যেতে থাকিবে ভানু চাঁদ বেড়া তায় উদয় অস্তের গুণে দিবানিশি কয়॥
ষষ্টি দণ্ড দিবানিশি এই ছোট দিন। বাড়িবে দেশের গুণে ছয় মাস দিন॥
... ...
অসুর মরিয়া জীব জন্ম লবে যত। পৃথক্ পৃথক্ মত বলাবে সতত॥
করিতে জীবের ত্রাণ কিছুকাল পরে। সত্যনাম অবনীতে আসিবে সত্বরে॥
চারি দেশে সত্য নাম হইবে প্রকাশ। কাটিবেক দুষ্টজনে নাম চন্দ্রহাস॥
উত্তরেতে লামা গুরু নানক পশ্চিমে। রামশরণ নামে এক হবে পূর্ব্বধামে॥
পুত্ররূপী অবতার হইবে পশ্চিমে। ইষু ক্রাইষ্ট নাম তার রাখিবেক জনে॥
তিন দেশী তিন পন্থ করিয়া মিলন। ইষুকে সকলে তারা করিবে প্রধান॥
এই কালে মম নাম হইবে ঘোষণা। ইষু বিনা গতি নাই হইবে মন্ত্রণা॥

শ্রীকরুণানিধানবিলাস কাব্য রচনার ইতিহাস কবি গ্রন্থারম্ভে এইরূপ দিয়াছেন—

বহু দেশে বহু শাস্ত্র আছে নিরূপিত। কেহ কেহ ভিন্নদেশী বিশেষ বিদিত॥
দেশে দেশে লোকাচার ভিন্ন ভিন্ন জাতি। উপাসনা দেশে দেশে শুনি নানা ভাঁতি॥
পুরাতন গ্রন্থ পুথি স্বদেশী ভাষাতে। দৈবপরাক্রম কথা লিখিত তাহাতে॥
এইক্ষণ পূর্ব্বদৃষ্টে ব্যবহার যত। বিচারিতে সর্ব্বতত্ত্ব দেশে ভিন্ন মত॥
ইহাতে ভারতখণ্ডে পূর্ণ অবতার। বিচারিতে শাস্ত্র মধ্যে কৃষ্ণরূপ সার॥
একমনে দুইরূপ স্থির নাহি লয়। অতএব এক কর্ত্তা সাধন নিশ্চয়॥
কাশী মধ্যে সৎসঙ্গ যতেক ঘটিল। গোরও যবন চীন বহু জাতি ছিল॥
হিন্দু মধ্যে শৈব শাক্ত বৈষ্ণব বহুত। গণেশের উপাসক মহারাষ্ট্র যত॥
তপনের উপাসক কাশীতে কিঞ্চিৎ। অঘোরী নানকপন্থী কবীর-শাসিত॥
হিন্দু জাতি ইচ্ছাময় হীন রাজনীতি। কলিযুগ অল্প ধর্ম্ম জীব পাপান্বিত॥
মুক্তি যুক্তি জ্ঞান ভক্তি এই দুই মার্গ। সর্ব্বদেশে এই সার স্বর্গ অপবর্গ॥
কর্ত্তার নিশ্চয় বিনা ভক্তি কিবা করে। কর্ত্তাকে বিশ্বাস বিনা জ্ঞান সদা হরে॥
প্রথম বয়স মম বিষয়েতে গেল। মধ্য বয়স শেষ রোগেতে ভোগিল॥
পঞ্চাশ বিগত পরে জরায় ঘেরিল। মরণের ভয় আসি অন্তরে পশিল॥
চিন্তামণি কোথা পাব এই আশা করি। কাশীমধ্যে দেবালয়ে কিছুকাল ফিরি॥
কৃষ্ণরূপ মনে কিছু আদর করিল। ইতিমধ্যে কৃষ্ণলীলা নকল দেখিল॥
অমৃত রায়ের দ্বারা তাহা প্রকাশিল। অবিরত সেই লীলা নয়নে হেরিল॥
দেখিতে দেখিতে লীলা হইল উদয়। সেইমত রচিবারে হইল নিশ্চয়॥
বাঙ্গালী ভাষাতে লীলা করিতে রচন। রঘুনাথ ভট্ট আদি মিলিল সুজন॥
সংস্কৃত পরাকৃত নিজ শক্তি মত। আরব্ধ করিল দোঁহে হয়ে একচিত॥
বারশত বিশ সাল মাস অগ্রহায়ণ। রচিতে কৃষ্ণের লীলা কৈলা আয়োজন॥
স্বপনেতে দেখি যাহা লিখি সেই মত। সেই ভাষা তরজমা করেন পণ্ডিত॥
যার পর নাই আর সে বস্তু কানাই। নিশ্চয় প্রকাশ ইহা জানিবে সবাই॥
ভাবের উদয় ধন্য কভু নাহি কবি। ভুলিয়ে রহিল মন হেরি কৃষ্ণছবি॥
অতএব গ্রন্থদোষ করিবে মার্জ্জনা। ভকত-জনার পায় আমার বন্দনা॥

কাব্যের শেষে কাব্যের ও কাব্যরচনার সম্বন্ধে কবি কিছু কথা বলিয়াছেন, তাহাতে অন্যান্য তথ্যও অল্পস্বল্প আছে বলিয়া এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। ইহা হইতে জানা যায় যে কবি ব্রজভাষায় (?) কৃষ্ণলীলা রচনা করিয়াছিলেন বা করাইয়াছিলেন এবং হিন্দীতে মহাভারত রচনা কার্য্যে কাশীনরেশকে সাহায্য করিয়াছিলেন।

নবতি অধ্যায়ে সাঙ্গ সুখের রচন। মম বুদ্ধি হীন বড় করিতে বর্ণন ॥

ইতি বাহুলীলা সাঙ্গ ॥

দশমস্কন্ধ মধ্যে কৃষ্ণের চরিত্র। এই কথা ত্রিভুবন করিবে পবিত্র ॥
ইতি শ্রীকরুণানিধানবিলাস গান। বার শত একুইশ সালে হইল পূরণ ॥
একশত চোয়াল্লিস মাসে কৃষ্ণলীলা। নিজ বৃন্দাবনে হরি অনেক করিলা ॥
তার মধ্যে স্থূললীলা দ্বিশত তেত্রিশ। যথাশক্তি লিখিলাম শ্রীকৃষ্ণ-উদ্দেশ ॥
লিপির অনেক দোষ করিতে শোধন। আশ্রয় কেবলমাত্র ভক্তের চরণ ॥
প্রতিদিনে নব লীলা করিতে রচন। অসম্ভব আশা ছিল না হৈল পূরণ ॥
তিন শত পঞ্চষষ্টি একই বৎসরে। বার গুণে তেতাল্লিশ শত আশী পূরে ॥
জনাজাত এই লীলা রচ কবীশ্বরে। সূত্রমাত্র স্থূল লীলা পৃথিবী ভিতরে ॥
পাঁচ ভাব ছয় রস নব ভক্তি সার। অন্তর্গত বহু লীলা নাহি পারাপার ॥
কিছুকাল মৃজাপুরে করিয়া যাপন। কৃষ্ণদাস বৈষ্ণবের সেবিল চরণ ॥
ভাগবত দ্বাদশ স্কন্ধ করি গান। ব্রজের ভাষাতে তাহা করিল রচন ॥
শ্রীমহাভারত ভাষা কাশীরাজে কৈল। পঞ্চম বৎসরে তাহা পূরণ করিল ॥
সদস্য তাহাতে আমি নিযুক্ত রহিল। বাঙ্গালাতে কাশীদাসী সংক্ষেপে কহিল ॥
স্বর্গ-আরোহণ পর্ব্ব ধর্ম্মের শাসন। শুনি স্তব্ধ মনে দুখী জয়নারায়ণ ॥
শ্রীউদিতনারায়ণ বারাণসীপতি। ব্রজের ভাষাতে সাঙ্গ করিলেন পুঁথি ॥
জয় জয় ত্রিভুবনে হউক মঙ্গল। রাজার মঙ্গল মাগি সদাই কুশল ॥
মম বংশে কৃষ্ণভক্ত হও যেই জন। মাধুর্য্য সুখদলীলা করিবে বর্ণন ॥
এই পুঁথি মধ্যে যত থাকে চুক ভুল। করিবে ইহার শুদ্ধ হয়্যা অনুকূল ॥

অতঃপর কবি স্বীয় বংশের বর্ণনা দিয়াছেন, দুঃখের বিষয় ইহার শেষাংশটি পাওয়া যায় নাই।

চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

বিবিধ বৈষ্ণব নিবন্ধ : অনুবাদ ও মৌলিক

সপ্তদশ শতাব্দীর মত অষ্টাদশ শতাব্দীতেও কতিপয় গোস্বামিগ্রন্থ বাঙ্গালা ছন্দে অনূদিত হইয়াছিল, তবে এই সকল গ্রন্থ প্রায় সবই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সন্দর্ভ মাত্র। এই শতাব্দীতে রচিত বৈষ্ণব গ্রন্থ বেশীর ভাগই সাধনতত্ত্বঘটিত, কতকগুলি বিশেষ করিয়া তান্ত্রিক বা পরকীয়া নারী লইয়া সাধন ঘটিত।

বীরভূম জেলায় মঙ্গলডিহি গ্রামনিবাসী নয়নানন্দ ১৬৫২ (অথবা ১৬৫৫) শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৩০ (অথবা ১৭৩৩) খ্রীষ্টাব্দে শ্রীকৃষ্ণভক্তিরসকদম্ব নামক নিবন্ধ রচনা করেন।[১] কাব্যটি শ্রীরূপ গোস্বামীর ভক্তিরসামৃতসিন্ধু অবলম্বনে রচিত।

যুগ্ম বাণ ঋতু চন্দ্র শকে পরিগণি। বৃষরাশি গত ভানুমাস তাহে জানি ॥
ভূমিপুত্র বারে তথা কুহূ তিথি শেষে। হইলেন গ্রন্থ সাঙ্গ পঞ্চম দিবসে ॥

১৬৫৩ শকাব্দে নয়নানন্দ প্রেয়োভক্তিরসার্ণব নামক নিবন্ধ রচনা করেন।[২]

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের একতম শিষ্য কৃষ্ণদাস রচিত অথবা সঙ্কলিত কতিপয় গ্রন্থ অবলম্বনে কয়েকটি বাঙ্গালা পদ্যাত্মক নিবন্ধ রচনা করেন। চক্রবর্ত্তী মহাশয় ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে দেহত্যাগ করেন। কৃষ্ণদাসের কাব্য এই সময়ের কাছাকাছি রচিত হইয়া থাকিবে। কৃষ্ণদাসের রচিত নিবন্ধগুলির পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল।

মূলের মত কৃষ্ণদাসের চমৎকারচন্দ্রিকা[৩] চারি "কুতূহল" নামক অধ্যায়ে সমাপ্ত। কবি রাধাকুণ্ড তীরে বাস করিতেন, বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর কৃপা লাভ করিয়াছিলেন এবং কানুদাস নামে তাঁহার এক সুহৃদ ছিল—এই কথা চমৎকারচন্দ্রিকা হইতে

১। বীরভূমবিবরণ ১, পৃ ১৭৭-৭৮। ২। ঐ, পরিশিষ্ট পৃ ।৶।
৩। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী কর্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত (শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪১৮)।

জানিতে পারি। বৈষ্ণবোচিত দীনতার সঙ্গে সঙ্গে কবির রচনাশক্তিও বেশ ছিল। কবি বলিয়াছেন,

মুঞি মূর্খ দুরাচার, নাহি জানি সারাসার, কামক্রোধে সদাই তাপিত।
শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ সে অমূল্য সম্পদ, কহি মাত্র তাহার আশ্রিত॥
কপট বৈষ্ণব হৈয়া ফিরি লোক দেখাইয়া, মন মাত্র শয়ন ভোজনে।
পাপ অপরাধ যত তাহা বা কহিব কত, কোটি মুখে না যায় কথনে॥
রাধাকুণ্ডে দিল বাস, তাহে নাহি বিশোয়াস, মন সদা দুষ্টপথে ধায়।
নিজগুণে কৃপা কর, উদ্ধারহ এ পামর, নহে আর না দেখি উপায়॥
রাধাকৃষ্ণের লীলাসিন্ধু তাহার তরঙ্গবিন্দু তার স্পর্শযোগ্য চিত্ত নয়।
তবে যে করিয়ে আশ সে কেবল উপহাস, বস্তুগুণে লোভ উপজয়॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁর কৃপাবলে স্ফূর্ত্তি এ লীলাবর্ণনে হৈল আশ।
কানুদাস-সঙ্গ পাঞা সাহসে পূরিল হিয়া, কহে দীনহীন কৃষ্ণদাস॥
পৃ ১০-১১॥

চমৎকারচন্দ্রিকায় বিচিত্র ও অদ্ভুত উপায়ে রাধাকৃষ্ণের গোপনমিলন বর্ণিত হইযাছে। ভণিতা এইরূপ—

শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দপদে করি আশ।
প্রথম কুতুহল লীলা কহে কৃষ্ণদাস॥

কাব্যটিতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর প্রভাব সুস্পষ্ট। প্রকাশভঙ্গি মধ্যে মধ্যে বেশ সুন্দর। যেমন,

অতএব প্রেম নাম অতর্ক্য বিচিত্রধাম, তাহে মোর অনেক প্রণতি।
সে প্রেম-আশ্রয়জনে চন্দ্র হয় হুতাশনে আনল শীতল হয় অতি॥ পৃ ১০॥

মাধুর্য্যকাদম্বিনীর অনুবাদ[১] মূলের মত আট "বৃষ্টি" বা "অমৃত বৃষ্টি" নামক অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। নিবন্ধটিতে বৈধীভক্তি ও বৈধীসাধনতত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ভণিতা প্রায় সর্ব্বত্র এইরূপ—

শ্রীগুরুচরণপদ্ম মনে করি আশ।
মাধুর্য্যকাদম্বিনীর প্রথম বৃষ্টি কহে কৃষ্ণদাস॥

১। শরচ্চন্দ্র শীল প্রকাশিত (১৩৩৩) ভক্তিবর্ত্ম প্রদর্শক, পৃ ১৬৪-২৮০।

ষষ্ঠ বৃষ্টির ভণিতা হইতে জানা যায় যে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী কবির গুরু ছিলেন।

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী গুরু, তাঁহার চরণ ধ্যানে।
ষষ্ঠ অমৃত বৃষ্টি তার ভাষা দীন কৃষ্ণদাসে ভণে॥ পৃ ১৯২॥

গ্রন্থের শেষে কবি বলিয়াছেন—

মাধুর্য্যকাদম্বিনী গ্রন্থ জগৎ কৈল ধন্য। চক্রবর্ত্তী-মুখে বক্তা আপনি (শ্রীকৃষ্ণ) চৈতন্য॥
কেহ কহেন চক্রবর্ত্তী-রূপে অবতার। কঠিন যে তত্ত্ব সরল করিতে প্রচার॥
ওহে গুণনিধি শ্রীবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী। কি জানিব তোমার গুণ মুই মূঢ়মতি॥
তোমার গ্রন্থ ভাষায় করিল প্রচারে। অশুদ্ধ অযথার্থ যা[হা] ক্ষমিবা আমারে॥
ওহে সাধুগণ মোর এই নিবেদন। অশুদ্ধ যে থাকে তাহা করিবে শোধন॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম মনে করি আশ। মাধুর্য্যকাদম্বিনী (অষ্টামৃত) ভাষা কহে কৃষ্ণদাস॥

রাগবর্ত্মচন্দ্রিকাতে বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রাগানুগা ভক্তি ও তাহার সাধন-প্রণালী বিবৃত করিয়াছেন। মূলের মত কৃষ্ণদাসের অনুবাদও[১] ছয়টি "প্রকাশ" নামক অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত।

নিবন্ধটির প্রথমে কৃষ্ণদাস বলিয়াছেন,

শ্রীবিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী রসামৃতের বিন্দু কৈল। তাতে রাগানুগা ভক্তি সংক্ষেপে কহিল॥
সেই রাগানুগা ভক্তি বিস্তার কারণ। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকাগ্রন্থ করিলেন পুনঃ॥
তাঁহার কৃপাতে সেই গ্রন্থ ভাষা করি। রাগানুগা ভক্তিপথ কহিয়ে বিস্তারি॥

শেষে বলিয়াছেন,

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী রাগবর্ত্ম প্রকাশিল। তাঁহার কৃপাতে গ্রন্থ সংক্ষেপে কহিল॥
শ্রীগুরুচরণপদ্ম মনে করি আশ। রাগবর্ত্ম ষষ্ঠ প্রকাশ কহে কৃষ্ণদাস॥

শ্রীরূপগোস্বামী বিরচিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু লঘুভাগবতামৃত এবং উজ্জ্বলনীলমণি এই তিনখানি গ্রন্থের সংক্ষিপ্তসার সংকলন করেন বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এই তিন

১। শরচ্চন্দ্র শীল প্রকাশিত ভক্তিবর্ত্মপ্রদর্শক, পৃ ২০৮-২৪।

নামে—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুবিন্দু, ভাগবতামৃতকণা এবং উজ্জ্বলনীলমণিকিরণ। কৃষ্ণদাস এই তিনখানি সংকলন-গ্রন্থেরও সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করিয়াছিলেন।[১] এই গ্রন্থ-গুলিতে ভণিতায় নাম ছাড়া কবিসম্বন্ধে আর কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।

অজ্ঞাতনামা কবি রচিত গোস্বামিদিগের স্তবাদির অনুবাদ কতকগুলি পাওয়া যায়। যেমন, রঘুনাথ দাস গোস্বামীর স্বনিয়মদশক,[২] শ্রীরূপ গোস্বামীর চাটু-পুষ্পাঞ্জলি,[৩] ইত্যাদি। এই কাব্যগুলি অর্ব্বাচীন হওয়াই সম্ভব। এক অজ্ঞাতনামা কবি রচিত প্রবোধানন্দ সরস্বতীর চৈতন্যচন্দ্রামৃতের অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে।[৪]

রসময় দাস কৃত গীতগোবিন্দের একাধিক পুঁথি পাওয়া যায়।[৫] কবির ভণিতা এইরূপ—

অতি দীন অতি হীন রসময় দাস।
শ্রীগীতগোবিন্দভাব করিল প্রকাশ॥

রঘুনাথ দাসের গীতগোবিন্দ কাব্যের সম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৬]

তৃতীয় কবি ভগবান দাস (?) ১৬৫৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে গীতগোবিন্দের অনুবাদ করেন।[৭] কাব্যের শেষে কবি নিজ বাসস্থানের উল্লেখ হেঁয়ালীতে করিয়াছেন। সম্ভবতঃ গ্রামের নাম নলহাতী (নলহাটী) বা হাতীনল। পয়ার সংখ্যা প্রায় ১২০০।

সমাপ্ত করিল গজ ইষু রস সোমে॥
কৃষ্ণপক্ষ আষাঢ়ের দিবস পঞ্চমে॥
পটের তৃতীয়ে কর মধ্যেতে আকার।
সেই নদীর নিকটে কেবল পূর্ব্বাধার॥
ইন্দ্রের বাহন পরে দময়ন্তীপতি।
বিরচিল সেই গ্রামে করিয়া বসতি॥

১। ঐ, পৃ ১ ১৬৩। প্রকাশিত নিবন্ধগুলিতে কিছু কিছু ছাড়-বাদ আছে বলিয়া মনে হয়।
২। বা-প্রা-পু-বি ৩-৩, পৃ ১৫৭। ৩। ঐ, পৃ ১৬০। ৪। ব-সা-প-প ৬, পৃ ২৬৩। পুঁথি দক্ষিণখণ্ডে প্রাপ্ত। ৫। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩০৮-০৯। ৬। ব-সা-প পুঁথি ১৬২ (দাস সংগ্রহ)।
৭। ঐ, পৃ ৩০৯, ব সা-প-প ৬, পৃ ৫৩, বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ১২৭-২৮।

ইতি শ্রীগীতগোবিন্দে মহাকাব্যে প্রাকৃতভাষায়াং স্বাধীনভর্তৃকাবর্ণনে সুপ্রীত-গীতাম্বরো নাম দ্বাদশঃ সর্গঃ।

তাহার পর (লিপিকারের ?) ভণিতা—

স্বাক্ষর লিখিল দীন ভগবান দাস।
জয়দেবপাদপদ্ম মনে করি আশ॥

ইতি সন ১১৩০ সাল (মল্লাব্দ ?) তারিখ ২০ বৈশাখ শুক্লপক্ষ বুধবার সমাপ্ত।

জয়দেবপ্রসাদাবলী[১] নামক গীতগোবিন্দের অনুবাদ কাব্যের যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে কবির নাম আর রচনাকাল ছাড়া প্রায় সব পরিচয়ই পাওয়া যাইতেছে। খণ্ডিত অংশে কবির নাম ছিল বলিয়া বোধ হয়। গ্রন্থের শেষে কবি বলিতেছেন,

শ্রবণে মঙ্গল হয় সর্ব্বরসসার। বক্রনাথকৃপাবলে হইল পয়ার॥
অনুকূল গোপীকান্ত মহান্ত সন্তান। অম্বিকানিবাসী এবে শঙরা বিশ্রাম॥
শান্ত দান্ত অতি ধীর দয়াকৃপাবান্। পড়াইল গীত[২] মোরে টীকা প্রণিধান॥

সাকিম মুকশুদাবাদ হয় গঙ্গাতীর। যোজনার্দ্ধ হয় গ্রাম নগর বাহির॥
তেলিয়া নিবাসী উত্তরাংশে বেগবতী। যোজনপ্রমাণ হয় না হয় সঙ্গতি॥
ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব সভে বসতি সুন্দর। পূর্ব্বপশ্চিমাংশে গ্রাম দীর্ঘ বহুতর॥
ক্রোশেক প্রমাণ গ্রাম বাস গড়ের ভিতর। লোচন নৃসিংহ দুই হয় সহোদর॥
পিতামহ পূর্ব্বখ্যাতি [যতি] ব্রহ্মচারী। করিয়া সকল তীর্থ সংসার বিহারি॥
মহাতেজমন্ত হয় কুলের প্রধান। ... ...
ব্রহ্মচারী যতি[৩] বলি জানয়ে সকলে। তৃতীয় নন্দন তার আছয়ে কুশলে॥
তার মধ্যে আমি অতি হই কৃপাহীন। না যজিল কুলধর্ম্ম এই নষ্ট চিহ্ন॥
দ্বিতীয় তনয় সেহো আর বনিতা। শ্রীকৃষ্ণ আপন করি জগৎবঞ্চিতা॥
গঙ্গা গোবিন্দ দুই পুত্রের আখ্যান। অবশ্য গোবিন্দ তারে করিবে কল্যাণ॥
তাহা না গণিয়ে আমি অনিত্য বচন। কৃপা কর গোপীনাথ লইনু শরণ॥

১। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৬৯। ২। অর্থাৎ গীতগোবিন্দ। ৩। পাঠ 'ক্ষতি।

কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বিরচিত দ্বাদশ শ্লোকাত্মক শ্রীরূপমঞ্জরীপাদপ্রার্থনা নামক স্তব বৈষ্ণবচরণ দাস কর্ত্তৃক অনূদিত হইয়াছিল। ভণিতা এইরূপ—

শ্রীরূপমঞ্জরীপদ হৃদয়ে ধরিয়া।
বৈষ্ণবচরণ দাস কহে আর্দ্র হঞা ॥[১]

নীলাম্বর দাস রচিত সংগৃহীতসুধাসার[২] শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উদ্ধৃত শ্লোক-গুলির সংগ্রহ এবং অনুবাদ মাত্র। কবি অদ্বৈত প্রভুর অনুচর শ্যামদাস আচার্য্যের বংশধর ছিলেন। পয়ার সংখ্যা প্রায় দুই শত।

শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত করিয়া উদ্ধার। সংক্ষেপে রচিল (গ্রন্থ) সংগৃহীত-সুধাসার ॥

... ...

তিন লীলার নানা পরিচ্ছেদ করিয়া সন্ধান। সংগ্রহ করিলা মুঞি অতি গুহ্য জ্ঞান ॥
শ্যামদাস আচার্য্য-বংশ নীলাম্বর দাস। সংগৃহীতসুধাসার করিলা প্রকাশ ॥

১৭০২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৮০-৮১ খ্রীষ্টাব্দে কিশোরীদাস একটি ছোট নিবন্ধ রচনা করেন, নাম অয়ি-দীন-শ্লোকার্থ-সিন্ধুর বিন্দুপ্রকাশ।[৩] নাম হইতেই বোঝা যাইতেছে যে নিবন্ধটি মাধবেন্দ্রপুরীপাদ কর্ত্তৃক বিরচিত এবং তিরোভাবকালে আস্বাদিত নিম্নোদ্ধৃত সুবিখ্যাত শ্লোকের ভাব অবলম্বনে লিখিত।

অয়ি দীনদয়ার্দ্রনাথ হে মথুরানাথ কদাবলোক্যসে।
হৃদয়ং ত্বদলোককাতরং দয়িত ভ্রাম্যতি কিং করোম্যহম্ ॥

নিবন্ধটির আরম্ভ এইরূপ—

জয় জয় গুরু গোসাঞি চরণারবিন্দ।
ভক্ত অলি পিয়ে যাতে ভক্তিমকরন্দ ॥

শেষে কবি আত্মপরিচয় ও গ্রন্থরচনাকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন।

স্বরূপ রূপ রঘুনাথ কৃষ্ণদাস পদ। হৃদয়ে ধরিয়া কহি এই সুসম্পদ ॥
জয় জয় রুদ্রদেব বক্রেশ্বর নাম। তাহার নিকটে যেই বৈষ্ণবের গ্রাম ॥
সপ্তদশ দুই শকে গ্রন্থ পূর্ণ হৈল। ব্রজবাসী দ্বারে গ্রন্থ সমর্পণ কৈল ॥
অয়িদীনশ্লোকার্থসিন্ধুর বিন্দুপ্রকাশ। অতি দীনহীন কহে এ কিশোরীদাস ॥

১। ব-সা-প-প-৫, পৃ ৭৯-৮০; ৮, পৃ ৪০। ২। ব-সা-প-প ৬, পৃ ৭৫।
৩। ব-সা-প-প ৮, পৃ ১৮৭। পুঁথিটি ৯ পত্রাত্মক।

গোবিন্দদাস রচিত নিগমগ্রন্থ বা গৌরাখ্যান[১] নিবন্ধে শ্রীচৈতন্যের অবতার-তত্ত্ব বর্ণিত হইরাছে। শ্রীনিবাস (শ্রীবাস) শ্রোতা, গদাধর দাস বক্তা।

শুন শুন আরে ভাই এক মন আশে। শ্রীনিবাস সঙ্গে কথা গদাধর দাসে॥
শ্রীনিবাস কহে শুন গদাধর দাস। গোলোক ছাড়িয়া নবদ্বীপেতে নিবাস॥
গোলকবৈভব ছাড়ি নবদ্বীপে পরকাশ। ইহার বিশেষ কথা কহ গদাধর দাস॥
গদাধর বলে প্রভু শুন শ্রীনিবাস। পূরবে ভকত-সঙ্গে না পূরিল আশ॥

শেষে ভণিতা এইরূপ—

নিগমগ্রন্থ যেই নিগম রচন। হেন রসে আছে যে তার বৃন্দাবন॥
কহেন গোবিন্দদাস হৃদয়ে আকুল। বৈষ্ণব গোসাঞি চারি যুগের হয়েন মূল॥
... ...
কহেন গোবিন্দদাস বৈষ্ণবচরণে। বৈষ্ণব গোসাঞি মোর শুদ্ধ কর মনে॥

গোপাল দাসের রচিত জগন্নাথবল্লভনাটকের অনুবাদের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[২] ভণিতা ইত্যাদিতে কবির নাম নাই। শেষে আছে "অত্র ভাষারচিতং॥ শ্রীগোপালদাসস্য॥" কাব্যটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের রচনা হওয়া অসম্ভব নয়। লিপিকাল ১২৩৫ সাল।

কৃষ্ণচন্দ্র দাস রঘুনাথ দাস গোস্বামীর বিলাপবিবৃতিমালার একটি অনুবাদ করেন। ইহা ১৭১৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৯৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। ইঁহার জ্যেষ্ঠ প্রপিতামহ রতিকান্ত ঠাকুর, গুরু লালবিহারী। ইঁহারা শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দনের গোষ্ঠী।[৩]

ভবানীদাসের রামরত্নগীতা[৪] অর্জ্জুনের প্রশ্ন এবং শ্রীকৃষ্ণের উত্তর এই ছলে রচিত। কবির মতে ইহার মূল বেদব্যাস-রচিত গ্রন্থবিশেষ।

শ্রীরামরতন-গীতা অতি সুখোদয়। একান্ত মনেতে শুন বীর ধনঞ্জয়॥
ব্যাসমুনি শ্লোকছন্দে করিল রচন। শ্রীভবানীদাস কৈল পয়ারে প্রেরণ॥

কবির কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কবি গোঁড়া বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া মনে হয়। কৃষ্ণের মুখ দিয়া বহু বৈষ্ণব সিদ্ধান্ত বিবৃত হইয়াছে। তাহা ছাড়া

১। ব-সা-প-প ৫, পৃ ৭৬, ৬ পৃ ৫৫। ২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ২৫৮২।
৩। ব-সা-প-প ২, পৃ ২০২। ৪। ব-সা-প-প ৬, পৃ ৩২৩-৩২৭।

ইহাতে যবনোৎপত্তি, চতুর্ব্বেদোৎপত্তি, বেদহরণ ও বেদ-উদ্ধার কাহিনী, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের বরলাভ, কৈলাস নির্ম্মাণ, শিবদুর্গার বিবাহ, শক্তি কর্তৃক ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবকে প্রসব, তজ্জন্য শক্তির বিংশতিবার দেহত্যাগের পর শিবকে বিবাহ, সৃষ্টিপ্রকরণ, ইন্দ্রের প্রতি দুর্ব্বাসার শাপ, লক্ষ্মীর উৎপত্তি, মুচিরাম দাসের উপাখ্যান, কৃষ্ণনামের মহিমা, বিভিন্ন পাপের শাস্তি, চণ্ডালের লক্ষণ, ভেলানী (রামায়ণোক্ত শবরী শ্রমণা) নিষাদীর উপাখ্যান, ভক্ত ব্যাধের কাহিনী, মালা জপের নিয়ম, গুরুকরণের নিয়ম, নবরত্নের লক্ষণ, এক কৃষকের উপাখ্যান, অঙ্কবঙ্কের উপাখ্যান, বিশ্বরূপদর্শন, দ্বাদশ বৈষ্ণবের উপাখ্যান, বৈষ্ণবাচার, সতীধর্ম্ম, মদন-বেদবতীর উপাখ্যান, রাধার মহিমা, জীবহত্যার দোষ ইত্যাদি বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।

উপরি-উক্ত উপাখ্যানগুলির দুই একটি ভক্তমালে পাওয়া যায়। গ্রন্থে অনেকগুলি শ্লোক আছে, সেগুলির পাঠ বড়ই বিকৃত। কাব্যটিতে যেরূপ উচ্চবর্ণেব নিন্দা আছে তাহাতে অনুমান হয় যে কবি নীচজাতীয় ছিলেন।

পুঁথিটি নিতান্ত আধুনিক, ১২৭৫ সালে মালদহ অঞ্চলে অনুলিখিত। কবির কাল অষ্টাদশ শতাব্দীর উর্দ্ধে যাইবে বলিয়া মনে করি না। পরেরও হইতে বাধা নাই।

কবির মতে মুসলমান বিশ্বাবসুর সন্তান, এবং মুসলমান ধর্ম্ম অথর্ব্ববেদোক্ত! অর্জ্জুনের প্রশ্নসূত্রে শ্রীকৃষ্ণ যেরূপে যবনোৎপত্তি বিবৃত করিলেন সেই অংশটি বিশেষ কৌতুকাবহ বলিয়া এখানে দেওয়া গেল।

পার্থ বলে রমানাথ করি নিবেদন। এক ব্রহ্ম তুমি যদি নহে অন্য জন॥
ঋক্‌বেদে সামবেদে গোহত্যাবারণ। অথর্ব্ববেদে গোহত্যাদি করয়ে যবন॥
বহিমান নাম বোলাইলা তার তরে। কোরাণ স্বদিষ্টে তারা গোহত্যাদি করে॥
কৃষ্ণ বোলে ধনঞ্জয় শুনহ কারণ। গোহত্যাপাতকী জীব হয়ত যবন॥
পুনঃ পুনঃ নানা যোনি মধ্যে জন্ম লয়। কুকর্ম্মাদি পাপকর্ম্ম সতত আচরয়॥
ইতিমধ্যে যে যবন ধর্ম্মপথে যায়। স্বর্গভোগ কর্ম্ম অনুসারে সেই পায়॥
বিস্তার কহিব আমি যবন-জনম। শ্রবণ করহ পার্থ পাণ্ডুর নন্দন॥

কৃষ্ণ বোলে সময়েতে জন্মিবে নন্দন। পরমসুন্দর রূপ যেমন মদন ॥
পুত্র দেখি বিশ্বাবসু অতি হাস্য মন। সযত্নেতে সেই শিশু করিবে পালন ॥
শুন পার্থ সেই কথা কহিব বিশেষে। যবনের বাক্য সব শিশুমুখে আইসে ॥
জলকে কহিবে পানী অন্নেরে জেতাম (?)। রহিমান নাম জপে জ্যোতি করে ধ্যান ॥
এ সকল আশ্চর্য্য শুনিবে দ্বিজমণি। চিন্তিত হইবে অগ্নির অভিশাপ গণি ॥
জানিলাম অগ্নিশাপ ফলিল আমারে। যবনের জন্ম বুঝি হৈল মোর ঘরে ॥
নগরে নগরে কথা হইবে ঘোষণ। বিশ্বাবসুর ঘরে জন্ম লইল যবন ॥
এই বাক্য সকলে কহিবে পরস্পরে। যবন কেমন ভাই চল দেখিবারে ॥
শুন পার্থ সে সকল কহিব তোমায়। বিদ্বান্ হইবে শিশু আমার কৃপায় ॥
অথর্ব্ববেদের পাঠ করিবে যে জন। এই হেতু তারে আমি করিব রক্ষণ
যবনের বাক্য'যে শিখিবে ইতিহাস। নূতন নূতন বাক্য করিবে প্রকাশ ॥
তোবা তোবা বলিবেক দিনে লক্ষবার। বিশ্বাবসু চিত্তে বড় মানিবে বিকার ॥
দ্বাদশ বৎসর শিশুর বয়ঃক্রম যবে। তবে বিশ্বাবসু সব ব্রাহ্মণে ডাকিবে ॥
আপ্তগণ লৈয়া দ্বিজ করিবে বিচার। দেখিয়া শিশুর ক্রিয়া সবে চমৎকার ॥
বেদপাঠ দ্বিজধর্ম্ম করিবে বর্জ্জন। সবে বোলিবেক শিশু করহ নিধন ॥
একান্ত যুক্তিতে সভার হইবে সম্মতি মারিতে উদ্যত তারে হবে শীঘ্রগতি ॥
সবে বলে শিশুরে করাহ বিষপান। কার্য্যসিদ্ধ হবে কেহ না হবে জ্ঞাপন ॥
অন্ন সঙ্গে বিষ দিবে শিশুকে খাইতে। তাহাতে বাঁচিবে শিশু আমার কৃপাতে ॥
নিদ্রাযোগে ঘরে তারে দিবেক দাহন তাহাতে বাঁচিবে শিশু নহিবে মরণ ॥
লক্ষ লক্ষ অস্ত্র খণ্ড হবে তার গায়। তাহাতে বাঁচিবে শিশু আমার কৃপায় ॥
তার পরে পথ মাঝে শিশুকে পুতিবে। ছুমাস ছমাস অন্ন জল নাহি দিবে ॥
নানা চেষ্টা করিবেক শিশু না মরিবে। মোর অনুগ্রহে শিশু সর্ব্বত্র বাঁচিবে ॥
যদি সেই শিশু পার্থ প্রহারে মরিত। অথর্ব্ববেদ স্তুতিপাঠ খ্যাত না হইত ॥
বিংশতি বৎসর যবে বয়ঃক্রম হবে। কোরাণ যবনশাস্ত্র মুখে অভ্যাসিবে ॥
বলবুদ্ধিশক্তিমন্ত সেই হয়ে পরে। কলেমা পড়ায় লোকে আপ্তসঙ্গ করে ॥
ক্রমে ক্রমে বহু লোক যবন হইবে। ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় কত কলেমা পড়িবে

ক্রমে যবন হবে আটাশী হাজার। সাপক্ষ হইবে তারা বহু পরিবার॥
কেহ অশ্বে কেহ গজে করিবে ভ্রমণ। নিরন্তর ভ্রমিবেক সকল ভুবন॥
প্রতিজ্ঞা করিবে তবে সকলে বসিয়া। সকল সংসার দেহ যবন করিয়া॥
এইমত অহঙ্কার করিয়া মনেতে। সাজিবেক সকলে দিগ্‌বিজয় করিতে॥

গ্রন্থের সমাপ্তি এইরূপ—

পার্থ বলে মহাপ্রভু তুমি আদি অন্ত। তোমা হইতে জানিলাম সকল বৃত্তান্ত॥
এত দূরে সাঙ্গ হৈল গীতার আখ্যান। যে জন শুনয়ে তার জন্মে দিব্য জ্ঞান॥
দ্বাদশ বৈষ্ণবে আনি বীর ধনঞ্জয়। প্রত্যেকে তুষিল সবে আনন্দহৃদয়॥
যেইমাত্র বৈষ্ণবেরে করিল তোষণ। স্বর্গেতে দুন্দুভি বাদ্য বাজে ঘনে ঘন॥
পাণ্ডুর খণ্ডিল দুঃখ কৃষ্ণপ্রাপ্তি হৈল। গোবিন্দচরণে দিব্য ভকতি লভিল॥
গয়া গঙ্গা বারাণসী নানা তীর্থ আর। সকলই মনের ভ্রম নানা তীর্থ [অ]সার॥
ধন্য ধন্য কুন্তীপুত্র বীর ধনঞ্জয়। নিস্তারের মূল গীতা কৈল সমুদায়॥
বিশ্বাস করিবে জীব এ বড় বচন। বিষ্ণুমায়াপাশ তবে হইবে মোচন॥
শ্রীরামরতন-গীতা সর্ব্বগ্রন্থসার। শ্রীভবানীদাস কহে রচিয়া পয়ার॥

কবি বেশ সুকৌশলে দ্বাদশ বৈষ্ণব ভোজন ও তাহার ফলের উল্লেখ করিয়াছেন!

কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে অনেকগুলি ক্ষুদ্র ও মাঝারি নিবন্ধ প্রচলিত আছে।[১] ইহার বেশীভাগই সহজসাধন সম্পর্কীয়। এই সকল পুস্তিকার প্রকৃত রচয়িতৃগণ কৃষ্ণদাস কবিরাজের নামে স্বীয় রচনা চালাইয়া দিবার জন্য এত উদ্‌গ্রীব ছিলেন যে পাছে লোকে অন্য কৃষ্ণদাস কবিরাজ বলিয়া মনে করে এই জন্য অনেক স্থলেই আত্মপরিচয়ে রচয়িতা বলিয়াছেন যে তিনি সেই কৃষ্ণদাস কবিরাজ যিনি চৈতন্যচরিতামৃত রচনা করিয়াছেন। গ্রন্থগুলি যে জাল তাহা শুধু এই উক্তি হইতেই প্রতিপন্ন হইবে, কেননা চৈতন্যচরিতামৃত কবিরাজ গোস্বামীর সুবৃদ্ধ বয়সের রচনা এবং তাহার পর এইরূপ নিবন্ধ রচনায় উন্মাদেরও প্রবৃত্তি হইতে পারে না।

১। যথা—আত্মজিজ্ঞাসা, আত্মসাধন, জ্ঞানরত্নমালা, বাল্যরসবিলাস, শুদ্ধরতিকারিকা, সারসংগ্রহ (বা পাষণ্ডদলন), রাগরত্নাবলী, জবামঞ্জরী, মনোবৃত্তিপটল, রত্নসার ইত্যাদি।

স্বরূপবর্ণন বলিয়া যে পুস্তিকাটি কৃষ্ণদাসের নামে চলে[১] তাহাতে শ্রীচৈতন্যের অনুচর ও পারিষদদিগের সহিত ব্রজলীলার গোপগোপীগণের সম্বন্ধ বা ঐক্য নির্ণয় করা হইয়াছে। এই পুস্তিকার শেষে যে কবিপরিচয় ও গ্রন্থরচনার ইতিহাস দেওয়া হইয়াছে তাহাতেও দেখি যে পুস্তিকাটি কবিরাজ গোস্বামীর নামে চালাইবার চেষ্টা সুস্পষ্ট। এই অংশটির কিছু ঐতিহাসিক মূল্য থাকিতেও পারে এই বিবেচনা করিয়া এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। কয়েকটি ছত্র চৈতন্যচরিতামৃত হইতে গৃহীত।

শুন[২] শ্রোতাগণ মনে না করিহ রোষ। স্বরূপ লিখিতে মোর কিছু নাহি দোষ॥
কৃপার সমুদ্র গৌর হইলা অবতার। অদ্বৈত শ্রীনিত্যানন্দ যত ভক্ত আর॥
রাধাকৃষ্ণলীলা প্রেম গৌরাঙ্গ বিলাস। আপনে করিলা শক্তি রূপের প্রকাশ॥
তবে সনাতনে কৈল শক্তির সঞ্চার। শক্তি দিয়া সঙ্গে দিল অন্তরঙ্গগণ আর॥
রঘুনাথ ভট্ট আর রঘুনাথ দাস। লোকনাথ গোপাল ভট্ট সঙ্গের বিলাস॥
সভাই করিলা রাধাকুণ্ডতীরে বাস। রাধাকৃষ্ণনিত্যলীলা করিলা প্রকাশ॥
কুণ্ডতীর্থ প্রকট করিল বৃন্দাবন। বৈরাগ্যের চেষ্টা যত করিল ঘটন॥
পতিত অধম আমি নীচ নীচাচারে। প্রভু নিত্যানন্দ অতি কৃপা কৈলা মোরে॥
মস্তকে চরণ দিয়া কহিল আমারে। অবিলম্বে বৃন্দাবন কৃপা করু তোরে।
শ্রীরূপ রঘুনাথ ভট্ট পতিতপাবন। ভরসা করিয়া চিতে লইনু শরণ॥
চরণমাধুরী আমি কিছু না জানিল। তথাপি আমারে সভে অতি কৃপা কৈল॥
আমার প্রভুর প্রভু গৌরাঙ্গ সুন্দর। এহি শুনি ভরসা মনে বাড়ে নিরন্তর॥
তার গুণে লিখি তার লীলারস গুণ। কি লিখএ ভাল মন্দ না জানি সন্ধান॥
শ্রীগৌরাঙ্গলীলামৃত করিলা বিস্তার। লীলাক্রমে না জানিয়ে মুঞি সারাসার॥
তথাপি লালসা বাড়এ অনুক্ষণ। তবে রাধাকৃষ্ণলীলা করিএ লিখন।
একদিন আজ্ঞা কৈল ছয় মহাশয়। বান্ধহ গোবিন্দলীলামৃত রসময়॥

১। অনেক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এইজাতীয় সিদ্ধিনাম নামক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, ইহাও কৃষ্ণদাসের রচনা। দুইটি কি একই গ্রন্থ? সিদ্ধিনামের ১৭১৮ শকাব্দের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে [ব-সা-প-প ৬, পৃ ৭৭], ইহার পয়ার সংখ্যা প্রায় ৩৮০।

২। পাঠ 'শুদ্ধ'।

আমার অভাগ্যকথা শুন সর্ব্বজন। প্রাণত্যাগ নাহি হয় কহিতে কারণ ॥
সভে মেলি একদিন রহিল নির্জ্জনে[১]। গৌরলীলা অপ্রকট শুনিলাম কানে ॥
শ্রীগোপালভট্ট গোসাঞির শিষ্য আচার্য্য শ্রীনিবাস। তার স্থানে রহি সদা বৃন্দাবনে বাস ॥
শ্রীলোকনাথ গোসাঞির শিষ্য কহি তার নাম। ঠাকুর শ্রীনরোত্তম অতি অনুপাম ॥
আচম্বিতে আল্য সভে প্রভুর অগ্রেতে। কোথাকারে গেলা সভে না পাই দেখিতে ॥
তথাপি প্রাণ মোর শরীরে রহিল। সে সব বিচ্ছেদ লিখা বর্ণন নহিল[২] ॥
একদিন দুঃখে কুঞ্জে রহি তিন জন। আজ্ঞা হৈল শ্রীরূপের শুনহ বচন ॥
মোর ভ্রাতুস্পুত্র শ্রীজীব গোসাঞি। গ্রন্থের অধিকার দেহ তাহারে আনাই ॥
শ্রীজীব আনিয়া গ্রন্থ অধিকার দিল। গোপাল গোবিন্দ গোপীনাথ কৃপা কৈল ॥
অনেক সন্দর্ভগ্রন্থ কৈল মহাশূর। নিত্যলীলাস্থাপন যাহে ব্রজরসপূর ॥
শ্রীরূপ ব্রজলীলা করিলা বিস্তার[৩]। পরকীয়া মত যত করিল প্রচার ॥
পূর্ব্বে সেই মত তাহা গ্রন্থে বিরচন। নিজ গ্রন্থে স্বকীয়া করিয়া প্রচারণ ॥
এক দুই দুঃখ আর এসব কথন। লজ্জাগত প্রাণমাত্র করিএ ধারণ ॥
একদিন নিবেদন করিল তাহারে। শ্রীরূপের কৃপা হৈল তোমার উপরে ॥
তিন জনে কৃপা কর কিছু গ্রন্থ আর। গৌড়দেশ লৈঞা তাহা করিব প্রচার ॥
তেঁহো কৃপা কৈল গ্রন্থ এই তিন জনে। নমস্করি গৌড়দেশ করিল গমনে ॥
এমন দয়াল নাহি শুনি ত্রিভুবনে। রাধাকৃষ্ণলীলা জানি যাহার স্মবণে ॥
অবশেষে সেই গ্রন্থ করিতে লিখন। প্রভুর নিষেধ হইল না কৈল লিখন ॥
শ্রীরূপের আজ্ঞায় তাহা রাধাকৃষ্ণলীলা। সুখে গৌড়দেশবাসী তাহা আচরিলা ॥
শ্রীরূপ রঘুনাথ পদে যার আশা। স্বরূপবর্ণন কহেন কৃষ্ণদাস ॥[৪]

কবিরাজ গোস্বামীর শিষ্য অথবা অনুশিষ্য বলিয়া যিনি পরিচয় দিয়াছেন এমন মুকুন্দদাস নামক এক কবির বা সাধকের নামে তান্ত্রিক সাধন অথবা বৈষ্ণব রসতত্ত্ব

১। পাঠ 'নিৰ্জ্জীবে।' ২। ঐ 'কহিল।' ৩। ঐ 'প্রকাশ।' ৪। ব-সা-প-প ৮, পৃ ৫০-৫১।

ঘটিত অনেকগুলি নিবন্ধ ও কড়চা চলিতেছে। এই সকল গ্রন্থের মধ্যে সিদ্ধান্ত-চন্দ্রোদয় মূল্যবান্। ইহার আলোচনা পরে করিতেছি।

মুকুন্দ দাস রচিত অমৃতরত্নাবলীতে[১] একটি বৃহৎ রূপকের সাহায্যে অধ্যাত্মতত্ত্ব বিবৃত হইয়াছে।

"দ্বিজ" ব্রহ্মহরি বা ব্রহ্মহরি দাস রচিত একটি নামহীন নিবন্ধে[২] বর্ণিত সৃষ্টি-প্রক্রিয়া বলরাম দাস রতিরাম দাস প্রমুখ সাধক কবির বর্ণিত সৃষ্টিপ্রক্রিয়ার অনুরূপ। রামদাস আদকের ধর্ম্মমঙ্গলেও সংক্ষেপে এই বিবরণ পাই।' নিবন্ধটির রচয়িতা সহজিয়া মতের সাধক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। সৃষ্টিবর্ণনাটি এই—

অহঙ্কারে ভাবিলা তুমি অনাদিকুমার। বিলম্ব না হইব পিণ্ড পড়িব তোমার॥
এহি বুলি ঈশ্বর করিলেক সমাধান। ছায়ারূপে মহামায়া হৈলা অধিষ্ঠান॥
অনাদি সাক্ষাতে আদ্যা আইলা আচম্বিত। অদ্ভুত মূরতি দেখি হইলা বিস্মিত॥
কামের তরঙ্গে[৩] দেব হইল বিভোল। আদ্যাক ধরিয়া দেব চাপিয়া দিল কোল॥
তিন গুণে তিন দেব হইল অবতার। ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর অংশ তাহার॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জন্মিলা এহিমতে। সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় এহি তিন দেব হইতে॥
সংক্ষেপে কহিল তবে সে সব কথন[৪]। মন দিয়া শুন কহি অন্যের বিবরণ॥
আদ্যাক দেখিয়া দেব বুঝিল অন্তরে। কামকলা কুতূহল চাহে ভুঞ্জিবারে॥
আদ্যা বোলে শুন প্রভু হইয়া একচিত। রসযুক্ত নাহি মোর কামের চরিত॥
এত শুনি অনাদি দেব হয়া একমন। গুপ্তস্থল করিলেক নখে বিদারণ॥
মহাদীপ্ত হইল ভোগর লক্ষণ। ... .
আদ্যার রূপ দেখি[৫] অনাদি ঈশ্বর। কামেত আকুল চিত্ত দহে কলেবর॥
তবে অনাদি [ঈশ্বর] পরম কৌতুকে। কামকলা কুতূহল ভুঞ্জিলেক সুখে॥
হস্ত আরোপি দেব হস্ত চাপিল। জীবের আধাবর্ণ (?) সেই ক্ষণে হৈল॥

১। ব-সা-প-প ৫, পৃ ৭১। ২। ব-স-প প ৫, পৃ ২৮৮-৯১।
৩। 'কামেত তরঙ্গ হইয়া।' ৪। ঐ 'কথা।' ৫। ঐ 'নদখি।'

এহি মতে স্থষ্টি স্থিতি অনাদি করিল। ভোজন করিতে তবে মনেত ভাবিল॥
আত্মাক বোলেন তবে অনাদি ঈশ্বর। ক্ষিদাএ আকুল চিত্ত দহে কলেবর॥
এত শুনি আত্মা তবে মনেত ভাবিল। স্বর্গ হনে আত্মা রন্ধন করিল॥
হেন কালে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ আইল। . . . . . .
পরা হরিষে[1] করিল দেব জনার্দ্দন। পঞ্চ দেব সঙ্গে করি করিলা ভোজন॥
. . . .
অখনে অনাদি দেব ভাবিয়া মনে মনে। আত্মায় সমর্পিল [তবে] মহাদেব স্থানে॥
অনাদি [দেবের] পুত্র হইয়া মহেশ্বর। দেহ ছাড়িয়া নৈরাকার অনাদি ঈশ্বর॥
নিরাময় হইয়া সেহি নিরঞ্জন। বিন্দুরূপ হইয়া রহিল শূন্যে অধিষ্ঠান॥

ভণিতা এইরূপ—

বৈষ্ণব গোসাঞি পদে সদা রহুক মন। দ্বিজ ব্রহ্মহরি বোলে এহি নিবেদন॥
কুলশীল জাতি মুঞি তিলাঞ্জলি দিনু। ব্রহ্ম নাম উপদেশ সকলি সমর্পিনু॥
এ ঘোর সংসারের মধ্যে দেখি মায়া পাশ। পদগতিছায়া মাঙ্গে ব্রহ্মহরি দাস॥

শঙ্কর দাস রচিত যমপ্রজাসংবাদ[2] বৈষ্ণবতত্ত্বনিবন্ধ। ভণিতা এইরূপ—

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ শিরেত বন্দিয়া।
কহেন শঙ্কর দাসে মিনতি করিয়া॥

চাটিগ্রাম অঞ্চল হইতে শ্রীকৃষ্ণের দোললীলা পালার একটি পুঁথি[3] পাওয়া গিয়াছে, যাহাতে 'পাগল শঙ্কর' এবং শঙ্কর দাস ভণিতা আছে। যথা—

যে শুনে দোলের বাণী তারে তুষ্ট চক্রপাণি,
তাহার শমনের নাহি ডর।
পাঞ্চালী প্রবন্ধ করি প্রণমিয়া শ্রীহরি
রচিলেক পাগল শঙ্করে॥

নিস্তারের হেতু কথা শুন সর্ব্বজনে।
কহে ত শঙ্কর দাস কৃষ্ণের চরণে॥

শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় 'পাগল শঙ্কর' ভণিতাযুক্ত কয়েকটি বৈষ্ণব পদ পাইয়াছেন।

১। পরিবেশন? ২। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ২৫৩-৫৪। ৩। ঐ, পৃ ২৫৪-৫৫।

শ্যামানন্দ দাসের সাধনবর্ত্ম নিবন্ধের পুঁথির লিপিকাল ১৭১৫ শকাব্দ।[১] শঙ্কর দাসের যমসংহিতার লিপিকাল ১২৩৪ সাল।[২] গ্রন্থটি অর্ব্বাচীন হওয়াই সম্ভব। রামচন্দ্র দাসের সিদ্ধান্তচন্দ্রিকার একটি মাত্র পাতা পাওয়া গিয়াছে।[৩] অকিঞ্চন দাসের ভক্তিরসাত্মিকা[৪] বা ভক্তিরসকারিকা বা চৈতন্যভক্তিতত্ত্ববিলাস এবং ভক্তিরসালিকা[৫] এই দুই নিবন্ধের একাধিক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এই ক্ষুদ্র নিবন্ধটিতে বক্তা শ্রীচৈতন্য, শ্রোতা নিত্যানন্দ প্রভু।

রতিরাম দাসের সারগীতার[৬] একটি পুঁথির শেষে একবার মাত্র শ্যামদাসের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে।

অতি দীন অতি হীন নীচ নীচাচার।
রতিরাম দাসে এহি করিল প্রচার॥
শ্রীগুরু বৈষ্ণব পদে হউক মনে আশ॥
সারগীতা কিছু কহে শ্যামদাস॥

শেষোক্ত ভণিতার পাঠ প্রক্ষিপ্ত বলিয়া মনে হয়। অন্য পুঁথিতে ইহা পাওয়া যায় নাই।[৭] গ্রন্থটিতে পুরাণাদি হইতে নানা শ্লোক প্রমাণরূপে উদ্ধৃত হইয়াছে। শেষের দিকে যে সৃষ্টিবিবরণ দেওয়া আছে তাহা অদ্ভুত বটে। এই অংশটির মর্ম্ম দেওয়া গেল। পূর্ব্বে উল্লিখিত ব্রহ্মহরি দাসের বর্ণনা দ্রষ্টব্য।

সৃষ্টির বিনাশ হইলে কিছুই রহিল না, না চন্দ্র না সূর্য্য না বায়ু। কেবল অখণ্ডমণ্ডল স্থানে বেদপরাৎপর প্রভু যুগলকিশোর বসিয়া রহিলেন। যখন তাঁহার সৃষ্টি করিবার ইচ্ছা হইল তখন তাঁহার চক্ষু হইতে জল নিঃসৃত হইয়া চতুর্দ্দিক প্লাবিত করিল। মহাপ্রভু এক ডিম্ব সৃষ্টি করিয়া তাহা সেই জলে বটপত্রের উপর ভাসাইয়া দিলেন। সেই ডিম্ব ভেদ করিয়া অনাদি কুমার জন্মগ্রহণ করিল। তাহার

১। বা-প্রা-পু-বি ৩-৩, পৃ ১৩৪। ২। ঐ ২-১, পৃ ৩৮-৩৯। ৩। ঐ, পৃ ৯৯।
৪। ঐ ২-১, পৃ ৯০-৯১।
৫। ঐ ৩-৩, পৃ ১৩৫, ব-সা-প-প ৫, পৃ ৭২, ৬. পৃ ২৬২ (লিপিকাল ১১৮৩ সাল)।
৬। বা-প্রা-পু-বি ৩-৩, পৃ ১৩৯-১৪১। ৭। ঐ ১-১, পৃ ৬২-৬৩।

হস্ত নাই পদ নাই শরীর আধার[১]। লক্ষিতে লখন না যায় নির্ম্মল আকার॥
চতুর্দ্দিকে চাহিয়া অনাদি কুমার। আপনারে আপনি নাহি দেখে আর॥

তাঁহার মনে মনে অহঙ্কার হওয়ামাত্র মহাপ্রভু তাহার নিকট আবির্ভূত হইয়া বলিলেন,

মুঞি মুঞি করিয়া তুমি করিলা দাপ।
এই ক্ষণে সৃজিলাম না চিনিলা বাপ॥

পরে অন্ধকার দূর হইয়া চতুর্দ্দিক দীপ্তিমান্ হইয়া উঠিল। অনাদি কুমার আপনার অঙ্গচ্ছায়া দেখিতে পাইলেন।

তবে অনাদি ছায়া ধরিবারে যাএ। বায়ুর সমান ছায়া ধরিতে না পাএ॥
ছায়া পাছে ধাইয়া তবে করিল চুম্বন। চারি কোণে চারি নাম হৈল এ কারণ[২]॥
সংসার সৃজন হেতু করিলেক মায়া। উত্তরদিগে ত গিয়া ধরিলেক্ ছায়া॥
তবে তার মস্তক উপর হাত দিল। নাক মুখ চক্ষু কর্ণ সকল জন্মিল॥

ইনি কেতকা দেবী। তাঁহার শরীর হইতে সূর্য্য চন্দ্র নক্ষত্রাদি সৃষ্টি হইল। তাহার পর দেবী হইতে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরের উৎপত্তি হইল। অনাদি দেহত্যাগ করিবার সময় দেবীকে মহেশ্বরের হাতে দিয়া গেলেন। মহেশ্বর সেই দেহ মাটিতে পুঁতিলেন, বিষ্ণু তাহা তুলিয়া জলে ভাসাইয়া দিলেন, পরে জল হইতে তুলিয়া উভয়ে মিলিয়া দাহ করিলেন। এইরূপে সৃষ্টির সূত্রপাত হইল।

গ্রন্থটিতে কয়েকটি পদ আছে। যেমন,

ভজ রে ভজ রে ভাই গোরা গুণমণি। কলিযুগে ধন্য ধন্য করিলা অবনী॥
ধন্য কলিযুগে [শ্রী]চৈতন্য অবতার। পাইয়া ধন হারাইলাম অক্ষয় ভাণ্ডার॥
না জানি[৩] প্রেমের রতিকৌতুক বাখানে! গোপাল গৌরা[ঙ্গ]চাঁদ পাইব কেমনে॥
সত্য ত্রেতা দ্বাপরেতে কলিযুগ শেষ। জীবের করুণা দেখি চৈতন্য প্রবেশ॥
শিব বিরিঞ্চি যাঁরে ধ্যায়ে নিরন্তরে। সে পন্থে যাচেন প্রভু প্রতি ঘরে ঘরে॥
অস্ত্রযুদ্ধ ছাড়ি পরিলা ডোর কৌপীন। উদ্ধারিলা জগজন আমি দীন হীন॥
কান্দিতে কান্দিতে কহে রতিরাম দাস। সবাইরে কৈলে দয়া আপনে নৈরাশ॥[৪]

১। পাঠ 'আকার'। ২। ঐ 'হৈলে কারন'।
৩। ঐ 'জানা'। ৪। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৬৩।

নন্দকিশোর দাসের বৃন্দাবনলীলামৃত[১] সুবৃহৎ গ্রন্থ, বড় বড় পঞ্চাশটি অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। কাব্যটি বরাহপুরাণ অবলম্বনে বরাহ ও পৃথিবীর কথোপকথনচ্ছলে রচিত। প্রত্যেক অধ্যায়ের আরম্ভ এইরূপ—

জয় জয় গৌরচন্দ্র জয় নিত্যানন্দ।
জয়াদ্বৈতচন্দ্র জয় গৌরভক্তবৃন্দ॥
শ্রীগুরু গোসাঞি জয় কৃপা কর মোরে।
রাধাকৃষ্ণলীলা গাই আনন্দ-অন্তরে॥

ভণিতা এইরূপ—

শ্রীগুরু বৈষ্ণব পাদপদ্ম করি আশ।
এ নন্দকিশোর রাসলীলারস ভাষ॥

জয়কৃষ্ণ দাসের তত্ত্বসারের[২] ভণিতায় জয়গোপালের উল্লেখ আছে। ইনি কবির গুরু হইবেন।

শ্রীজয়গোপাল প্রভুর চরণ ভরসা।
জয়কৃষ্ণ দাসের আর নাহি কোন আশা॥

লীলামৃতরসপূর[৩] রচয়িতা রসিকানন্দ শ্রীখণ্ডের শিষ্য ছিলেন। গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের পরিচয় এইরূপ—

নরহরি প্রভুর চরণকৃপাবলে। প্রকাশিল প্রেমরস ঠাকুর গোপালে॥
ঠাকুর গোপাল মোর পরা[২]পর গুরু। তাহারি পাদপদ্ম ভক্তিকল্পতরু॥
সেই পাদপদ্মমধু করিয়া চিন্তন। লীলামৃতরসপূর করিল বর্ণন॥
সূত্র আরম্ভিয়া প্রভু বৃত্তি করিবারে। প্রেমপাত্র হরি ভার[৪] দিলেন তাহারে॥
শ্রীহরিচরণ প্রভু গুরু-আজ্ঞা পাঞা। প্রকাশিল লীলামৃতরসপূর দিয়া॥
সেই বৃত্তি আস্বাদয়ে প্রভু রামচন্দ্র। শ্রীহরিচরণ চিন্তি হৃদয় আনন্দ॥
আস্বাদিতে আস্বাদিতে কৌতুক উঠিল। ভাষা করিবারে প্রভু মোরে আজ্ঞা দিল॥
আজ্ঞা পাঞা নিবেদিলুঁ মো অতি অধম। কাতর দেখিয়া প্রভু কহয়ে বচন॥

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ২১৮৮, শরচ্চন্দ্র শীল কর্তৃক প্রকাশিত (তৃতীয় সংস্করণ ১৩৩৩)।
২। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১-২। ৩। বা-প্রা পু-বি ৩-৩, পৃ ১৩৫-৩৬। ৪। পাঠ 'তার'।

চৈতন্যচন্দ্রের কৃপা জানিব ইহাতে। এ বৃত্তির ভাষা যদি হয় দীন হৈতে॥
এই আজ্ঞা পাঞা হৈল হৃদয় আনন্দ। লীলামৃতরসপূর করিল আরম্ভ॥
মুঞি ছার মূঢ়মতি কি বলিব আন। তাঞি লিখি প্রভু রামচন্দ্র যে বোলান॥

ভণিতা এইরূপ—

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপদ মনেত ভরসা।
রসিকানন্দ দাস কহে রসপূর ভাষা॥

বীরভূম জেলায় মঙ্গলডিহি গ্রামনিবাসী নয়নানন্দ একজন পদকর্ত্তা ছিলেন।[১] ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ। ইঁহার রচিত দুইখানি তত্ত্বনিবন্ধ পাওয়া গিয়াছে, প্রেয়োভক্তিরসার্ণব[২] এবং ভক্তিমাধ্বীকণা[৩]। প্রেয়োভক্তিরসার্ণব ১৬৫৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৩১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইঁহার কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

অচ্যুতদাসের গোপীভক্তিরসের একটি খণ্ডিত পুথি পাওয়া গিয়াছে।[৪]

ভণিতা এইরূপ—

মজিয়া অচ্যুতদাস সেই রাঙ্গা পায়।
গোপীভক্তিরসগীত আনন্দেতে গায়॥

রাধাকৃষ্ণ দাসের রসভক্তিলহরী[৫] ছয় অধ্যায়ে বিভক্ত। "প্রথম অধ্যায়ে গুরু, বৈষ্ণব, গোস্বামী প্রভৃতির বন্দনা। দ্বিতীয় অধ্যায়ে প্রবর্ত্ত সাধক ও সিদ্ধ দশায় ভক্তগণের আশ্রয় ও রাগ (আশ্রয়, আলম্বন ও উদ্দীপন) নির্ণয় এবং দেশ কাল ও পাত্র বিচার। শান্ত, দাস্য, সখ্যাদি পঞ্চভাবের পাত্র ও গুণ বর্ণন। সমর্থা ও সমঞ্জসা রতি নির্দ্দেশ ও তৎসমুদয়ের গুণপর্য্যায়। তৃতীয় অধ্যায়ে রাগ, ভক্তি ও প্রেম। রাগাত্মিকা—মুখ্য ও গৌণ এবং কামরূপা ও সম্বন্ধরূপা পরিচয়। চতুর্থ অধ্যায়ে পঞ্চগুণ ও পঞ্চবাণ—গৌরলীলা মাহাত্ম্য—রাধাভাব—প্রকট ও অপ্রকট লীলা—গৌরলীলার কাল নির্দ্দেশ। পঞ্চম অধ্যায়ে নবদ্বীপ ও বৃন্দাবন লীলার একত্ব নিরূপণ—নরলীলা—গৌরলীলার কারণ—বৃন্দাবনমহিমা। অভি-সারিকা ইত্যাদি অষ্ট রস। বিপ্রলম্ভ ও সম্ভোগ—প্রত্যেক চতুর্ব্বিধ—অষ্ট রসের

১। HBL, পৃ ৩১১-১৩। ২। বীরভূমবিবরণ ১, পৃ ১১৭, HBL, পৃ ৩১২।
৩। বা-প্রা-পু বি ৩-৩, পৃ ১৪৫। ৪। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩২০।
৫। বা-প্রা-পু-বি ২-১, পৃ ১৮-২০, ৪৫, বীরভূমি ১৩২০, পৃ ৬৪২।

লক্ষণ—অষ্ট রসের অষ্ট সখী নির্দ্দেশ। ষষ্ঠ অধ্যায়ে মন্ত্রের মহত্ত্ব—কামগায়ত্রীতত্ত্ব। ২৪৷৷৹ অক্ষর চন্দ্রের নির্ণয়। কামবীজবিচার। ২৫৷৷৹ অক্ষর চন্দ্রের নির্ণয়। অষ্ট পথ লক্ষণ ও সংস্থান নির্দ্দেশ। অনুরাগের মহত্ত্ব, বর্ণ, বস্ত্র ও বয়ঃসন্ধিতত্ত্ব।"[১]

গ্রন্থকার গৌরীদাস পণ্ডিতের পাটের নিমাইচাঁদ ঠাকুরের শিষ্য। ইঁহার শিক্ষা-গুরু পীতাম্বর বৈরাগী।

শ্রীপাট অম্বিকা বন্দোঁ হঞা প্রণিপাত। যেথানে বিরাজে প্রভু অখিলের নাথ॥
জয় জয় শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত গোস্বামী। যাঁর বশ হঞাছিলা চৈতন্য নিতাই॥
শ্রীনিমাইচাঁদ ঠাকুর প্রভু যে আমার। জন্মে জন্মে বিকাইল চরণে তোমার॥
কৃপা করি মোরে প্রভু মন্ত্র দান কৈল। সেই মন্ত্রে রাধাকৃষ্ণ স্বরূপ দেখাইল॥
... ...
শিক্ষাগুরু বন্দোঁ মোর আলম্বন কর্ত্তা। যাঁহার কৃপাতে হৈনু কৃষ্ণতত্ত্বজ্ঞাতা॥
হৃদয়ে যতেক অন্ধকার ছিল মোর। তাহা নাশি দীপ্তিমান করিল উজোর॥
হৃদি মধ্যে তিঁহো মোর বসাইল দর্পণ। যে দর্পণে করে কৃষ্ণপ্রেম আকর্ষণ॥
শিক্ষাগুরু শ্রীপীতাম্বর বৈরাগী গোসাঞী যাঁর কৃপালেশে মোর এতেক বড়াই॥
তার পাদপদ্ম বন্দোঁ মস্তক উপরি। যেঁহো মোরে শিক্ষা দিল বৈরাগ্য-মাধুরী॥
রাধাকৃষ্ণলীলারস প্রেমতত্ত্ব আর। ক্রমে ক্রমে শিক্ষা দিল করিয়া বিস্তার।

ভণিতা এইরূপ—

শ্রীপদ্মমঞ্জরীপাদপদ্ম করি আশ।
চরণে শরণ মাগে রাধাকৃষ্ণ দাস॥

"দ্বিজ" শ্যামদাসের আত্মজিজ্ঞাসা[২] ১৬৯৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৭৫ খ্রীষ্টাব্দে রচিত। কবির নিবাস গোপভূমে করট্যা গ্রামে। বীরভূম জেলায় খন্না ইন্দ্রা-গাছার নৈঋর্তে শিবপুর গ্রামে কাব্যরচনা সমাপ্ত হইয়াছিল। গ্রন্থ সমাপ্তি এইরূপ—

শকাব্দা ষোড়শ শত সতালব্বি নামে। বর্ণনা সমাপ্ত কৈল বসি বীরভূমে॥
শিবপুর খন্না ইন্দ্রাগাছার নৈরিতে। সেই গ্রামে সাঙ্গ কৈল বসিয়া বাসাতে।

১। বা-প্রা-পু-বি ২-১, পৃ ১৯-২০। ২। বা-প্রা-পু-বি ৩-৩, পৃ ১৪১-৪২।

আষাঢ় দ্বিতীয়া গুরুবার শুভক্ষণ। অষ্টাদশ বাসরে হৈল শুভক্ষণ ॥
গোপভূমি নামে গ্রাম করট্যায় স্থিতি। বৈষ্ণবের পাদপদ্মে সদা রহু মতি ॥
পুনঃ পুনঃ কহি নাথ পড়িয়া চরণে। দ্বিজ শ্যাম দোঁহে যেন পাই বৃন্দাবনে ॥

যুগলকিশোর দাসের চৈতন্যরসকারিকা[১] সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের অথবা আরও পূর্ব্বের রচনা হওয়া কিছু বিচিত্র নহে। কবি নিত্যানন্দ প্রভুর কোন পারিষদের শিষ্য অথবা অনুশিষ্য ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। "হেলোদ্ধূলিতখেদয়া" ইত্যাদি শ্লোকের পর এইরূপে গ্রন্থারম্ভ হইয়াছে—

জয় নবদ্বীপচন্দ্র গৌর গুণধাম।
দয়ার ঠাকুর মোর নিত্যানন্দ নাম ॥

শেষের ভণিতা—

যুগলকিশোর দাসের আর কেহ নাঞি।
এইবার মোর হও চৈতন্য নিতাই ॥

যুগলকিশোর দাস রচিত প্রেমবিষয়বিলাসের[২] পয়ার সংখ্যা প্রায় ৪৫০। গ্রন্থ শেষে ভণিতায় কবি স্নেহমঞ্জরীর উল্লেখ করিয়াছেন।

আমারে করহ সবে কৃপাবলোকন। যুগলকিশোর দাসের এই নিবেদন ॥
শ্রীস্নেহমঞ্জরীর পাদপদ্ম করি আশ। এই যে কহিল প্রেমবিষয়বিলাস ॥

গৌরীদাস রচিত নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলীতে[৩] মুকুন্দদাসের অমৃতরত্নাবলী-প্রোক্ত রূপকেরই বিস্তার করা হইয়াছে। নিবন্ধটি নেহাত ক্ষুদ্র নহে। শ্লোক সংখ্যা প্রায় দেড় হাজারের উপর। গ্রন্থশেষে ভণিতা এইরূপ—

রত্নসার রত্নেশ্বর সদা ভাবি মনে। অধন জনের এই রত্নসার ধনে ॥
নিগূঢ়ার্থপ্রকাশাবলী হইল পূরণে। দীন গৌরীদাস কহে নিজ প্রভুর গুণে ॥

এক যুগলদাস রচিত আগমগ্রন্থে কৃষ্ণ এবং চৈতন্য অবতারের বর্ণনা করা হইয়াছে; বক্তা শিব, শ্রোতা পার্ব্বতী। রচনাকাল ১১৬৪ সাল। পুঁথিটি দক্ষিণখণ্ডে পাওয়া গিয়াছে।[৪]

১। ব-সা-প-প ৫, পৃ ৭২। ২। ঐ, পৃ ৭৭। ৩। ঐ, পৃ ৭৪-৭৫।
৪। ঐ ৬, পৃ ২৫৬।

বলরাম দাসের সারাবলীর[১] পয়ার সংখ্যা প্রায় পাঁচ শত। গ্রন্থশেষে ভণিতা এইরূপ—

সার ভাঙ্গি ব্যক্ত অর্থ করিনু বর্ণনে। সারাবলী গ্রন্থ ইবে হইল লিখনে॥
সারাবলী গ্রন্থ বলে বলরাম দাস। সার সার সার এই জানিবে নির্য্যাস॥

বলরাম দাস রচিত বৈষ্ণববিধান নিতান্ত ক্ষুদ্র কবিতা মাত্র।[২] ইহারই নামান্তর বোধ হয় বৈষ্ণবচরিত।[৩]

শ্যামানন্দ বিরচিত অদ্বৈততত্ত্বের[৪] পুঁথি শ্রীহট্ট অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। কবি শেষে এইরূপ ভণিতা দিয়াছেন—

শ্রীরূপ রঘুনাথ কৃপা অনুসারে।
লিখিল এ গ্রন্থ পূর্ব্ব শ্লোক অনুসারে॥

"দুঃখী" কৃষ্ণদাস রচিত বৃন্দাবনপরিক্রমার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৫] কবি যদি শ্যামানন্দ হন তবে ষোড়শ শতাব্দীর শেষ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পুস্তিকাটি রচিত হইয়াছিল।

শ্রীস্বরূপ বিরচিত উপাসনাপটল ক্ষুদ্র পুস্তিকা মাত্র।[৬]

প্রেমানন্দ দাস চন্দ্রচিন্তামণি নিবন্ধে ভণিতায় কনকমঞ্জরীর উল্লেখ করিয়াছেন।

কনকমঞ্জরীপাদপদ্ম অভিলাষে।
চন্দ্রচিন্তামণি কহে প্রেমানন্দ দাসে॥[৭]

হরিদাস বিরচিত চৈতন্যমহাপ্রভু নিবন্ধের পয়ার সংখ্যা প্রায় ২৫০।[৮]

নরহরি বিরচিত নামামৃতের পয়ার সংখ্যা প্রায় ৩০০।[৯] কবি পূর্ব্ববর্ত্তী এক নরহরির উল্লেখ করিয়াছেন, সুতরাং ইনি শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর নহেন। নরহরি চক্রবর্ত্তী হইতেও পারেন।

১। ব-সা-প-প ৫, পৃ ৮০। ২। ঐ ৬, পৃ ৭২, ৮. পৃ ৩৭, বা প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৪৭-৪৮।
৩। ব-সা-প-প ৮, পৃ ৪৭; পুঁথির লিপিকাল ১২০৫ সাল। ৪। ঐ ৫, পৃ ১৯৭।
৫। ঐ, পৃ ২০৩। ৬। ঐ, ৬, পৃ ৫০। ৭। ঐ, পৃ ৫৫।
৮। ঐ, পৃ ৫৭, পুঁথির লিপিকাল ২৩ পৌষ ১২২০ সাল। ৯। ঐ, পৃ ৬০।

রসময় দাসের ভাণ্ডতত্ত্বসারের পয়ার সংখ্যা আনুমানিক ২৫০।[১] এক রসময় দাস রচিত কৃষ্ণভক্তিবল্লিকা নিবন্ধের ১১৮২ সালে অনুলিখিত একটি পুঁথি রঙ্গপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।[২] শেষের ভণিতা এইরূপ—

কৃষ্ণভক্তিবল্লিকা গ্রন্থের সব কথা। শুনিতে পরম সুখ পাইব সর্ব্বথা ॥
শ্রীরূপপাদপদ্ম শিরোপরে ধরি। রসময় দাস কহে প্রেমের লহরী ॥

চৈতন্য দাস বিরচিত রসভক্তিচন্দ্রিকা বা আশ্রয়নির্ণয় বা ভজননির্ণয় নিবন্ধের পয়ার সংখ্যা প্রায় ১০০।[৩]

রঘুনাথ (দাস ?) গোস্বামীর নামে লিখিত রাগমার্গলহরী নিবন্ধের পয়ার সংখ্যা আনুমানিক ৪০০।[৪]

কালিদাস রচিত চৈতন্যনিত্যানন্দগীতার পয়ার সংখ্যা অনধিক ১৫০। পুঁথি রঙ্গপুর অঞ্চলের।[৫] ভণিতা এইরূপ—

বৈষ্ণব ভাবিলে দয়া করেন হৃষীকেশ। বৈষ্ণবচরিত্র কথা ভণে কালিদাস ॥
শ্রীকৃষ্ণচরণে থাকুক মোর আশ। চৈতন্য পরম জ্ঞান ভণে কালিদাস ॥

রাধাবল্লভ দাসের সহজতত্ত্বের পয়ার সংখ্যা প্রায় ২০০।[৬] নরসিংহ দাস রচিত পদ্মশৃঙ্গার ক্ষুদ্র নিবন্ধ।[৭]

জগন্নাথ দাস বিরচিত তিন মানুষ বিবরণ নিবন্ধের যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহা ৮ পৃষ্ঠাত্মক।[৮]

গুণরাজ খান ভণিতাযুক্ত একটি অজ্ঞাতনামা সাধনঘটিত নিবন্ধ চাটিগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া যাইতেছে।[৯] কবির গুরু বা গুরুস্থানীয় ছিলেন শচীপতি মজুমদার। একস্থানে হরিদাস রায়ের (?) উল্লেখ আছে। কবি যে ভাবে প্রমদনের উল্লেখ করিয়াছেন তাহাতে ইহা ব্যক্তির নাম কিনা বোঝা দুষ্কর।

গুরু প্রমদনের পায় রহোক ভকতি। যাহার প্রসাদে জন্ম কহি নানা রীতি ॥
মজুমদার শচীপতি রসিকের গুরু। প্রতাপে কেবল সূর্য্য দানে কল্পতরু ॥

১। ব-সা-প-প ৬, পৃ ৬২-৬৩ ; পুঁথির লিপিকাল ১২৭৬ মাঘ। ২। ঐ ১৩, পৃ ১৬৯।
৩। ঐ ৬, পৃ ৬৬ , পুঁথির লিপিকাল ১২৬৫ সাল। ৪। ঐ পৃ ৬৭।
৫। ঐ ১৩, পৃ ১৭১। ৬। ঐ ৬, পৃ ৭৬. ৭৭ , একটি পুঁথির লিপিকাল ১১৯৫ সাল।
৭। ঐ ৭, পৃ ১২৮। ৮। ঐ ৮, পৃ ৩৩-৩৪। ৯। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৭।

হেন শচীপতির পাই সন্বিধান। কহে জন্মবিবরণ গুণরাজ খান ॥

... ...

এ ভূত ভাঙ্গিতে যদি মনে কর আশ। কতুয়া বাজারে চল প্রমদনের পাশ ॥
শুদ্ধকে আছএ এক গ্রাম করিপুর। স্থনগরে স্থনগরী[১] সুসাধু প্রচুর ॥
তথা গেলে জানিবা যে এই স্থান স্থিতি। হরিদাস রায় তথা পূরিব আরতি ॥
সেই প্রমদনের চরণে যেবা রয়। গুণরাজ খানে কহে যোগেন্দ্র সে হয় ॥

সৈয়দ সুলতানের জ্ঞানপ্রদীপ পুঁথিতে যে প্রেমানন্দের উল্লেখ আছে[২] তিনি বা তাহাই কি এই প্রমদন বা প্রমোদন ?

রাধাদামোদর দাস রচিত সখীরস-পয়ারের পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।[৩] গোপীকৃষ্ণ দাস রচিত হরিনাম-কবজ একটি ক্ষুদ্র কবিতা মাত্র।[৪]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে কয়টি বৈষ্ণব অলঙ্কার গ্রন্থ রচিত হইয়াছিল তাহার পরিচয় দিতেছি। ইহার মধ্যে এক আধ খানি পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দীতে রচিত হইয়া থাকিতে পারে। পদসংগ্রহ গ্রন্থগুলি এই পর্য্যায়ে পড়ে বটে, কিন্তু সেগুলি পদাবলীর সঙ্গে আলোচনা করা শ্রেয়ঃ।

নায়িকারত্নমালা[৫] ক্ষুদ্র নিবন্ধ। ইহার বিষয়বস্তু পীতাম্বর দাসেব রসমঞ্জরীর অনুরূপ। ইহাতে পঁয়ষট্টিটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। তন্মধ্যে পঁয়তাল্লিশটি চন্দ্রশেখরের এবং চৌদ্দটি শশিশেখরের রচনা। ইহা হইতে অনুমান করা যাইতে পারে যে নিবন্ধটি হয়ত চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর এই দুই ভাইয়েরই রচনা। ইঁহারা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বর্ত্তমান ছিলেন এইরূপ অনুমান হয়।

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের[৬] বিষয়বস্তু রামগোপাল দাসের রাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লীর অনুরূপ হইলেও ইহাতে অনেক তত্ত্বকথা আছে। রচয়িতা মুকুন্দ দাস বলিতে চাহেন যে

১। 'সুনাগর সুনাগরী' হইবে ? ২। বা প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৯।
৩। ঐ, পৃ ২৩৭। ৪। ব-সা-প-প ১৩, পৃ ১৭৭।
৫। সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ও ভক্তিপ্রভা কার্য্যালয় আলাটি হুগলী হইতে প্রকাশিত (১৯২৮)। ৬। রাসবিহারী সাংখ্যতীর্থ সম্পাদিত ও কাশীমবাজার হইতে প্রকাশিত (১৯০৫); HBL, পৃ ৯ দ্রষ্টব্য।

তিনি কৃষ্ণদাস কবিরাজের শিষ্য। এই জাতীয় সহজিয়া-গন্ধী ও সহজিয়া বিষয়ক বহু নিবন্ধের রচয়িতা হয় নিজেকে কৃষ্ণদাসের শিষ্য মুকুন্দদাস বলিয়াছেন, নয় বলিয়াছেন তিনিই চৈতন্যচরিতামৃত-রচয়িতা কৃষ্ণদাস কবিরাজ! সুতরাং এই কথার কিছুই মূল্য নাই।

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের অষ্টম প্রকরণে বিভিন্ন কবি কৃত একষট্টিটি পদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। তাহার মধ্যে তরুণীরমণের পদের সংখ্যাই তেতাল্লিশ। "তরুণীরমণ" কি গ্রন্থকারের ছদ্মনাম?

মুকুন্দ দাসের নামে অমৃতরসাবলী, সাধনোপায় ইত্যাদি বহু তান্ত্রিকমতের নিবন্ধ ও কড়চা গ্রন্থ পাওয়া গিয়াছে।

গোবিন্দরতিমঞ্জরীর মত রসনির্য্যাসও[১] সংস্কৃতে রচিত। ইহার গ্রন্থকার বৃন্দাবন দাসের গুরুর নাম রাধামাধব, ইনি শ্রীনিবাস আচার্য্যবংশীয় ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। গ্রন্থ মধ্যে পূর্ব্ববর্ত্তী পদকর্ত্তাদিগের অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। রতিপতি ঠাকুরের রামগোপাল দাসের এবং 'হরিবল্লভ' ভণিতায় বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর পদও উদ্ধৃত হইয়াছে। সুতরাং কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের পূর্ব্বেকার লোক হইতে পারেন না। রসনির্য্যাসে গোবিন্দদাস কবিরাজ লিখিত একটি শিবশক্তি বিষয়ক পদ পাওয়া গিয়াছে।[২] গোবিন্দদাস বৈষ্ণবী দীক্ষা গ্রহণ করিবার পূর্ব্বেই এই পদটি রচনা করিয়াছিলেন। এই পদের শুধু ভণিতা অংশটি প্রেমবিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে।

শচীনন্দন বিদ্যানিধি রচিত উজ্জ্বলচন্দ্রিকা[৩] শ্রীরূপ গোস্বামীর উজ্জ্বলনীলমণির সংক্ষিপ্ত বঙ্গানুবাদ ও ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে। গ্রন্থকার ইহাকে উজ্জ্বলনীলমণির স্পষ্টব্যাখ্যা বলিয়াছেন। শচীনন্দন বর্দ্ধমান জেলার চানক গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। উজ্জ্বলচন্দ্রিকার রচনা ১৭০৭ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই পৌষ সোমবার তারিখে সমাপ্ত হয়। গ্রন্থের শেষ ভাগে এই শ্লোকে কবি রচনা-কাল ও নিজ নামধাম জানাইয়াছেন—

১। HBL, পৃ ৩১৭-২০। ২। গোবিন্দদাসের প্রসঙ্গে পদটি উদ্ধৃত করিয়াছি।

৩। শিবরতন মিত্র সম্পাদিত ও সিউড়ী হইতে প্রকাশিত (১৩৩৩)।

মুনি-খ-মুনি-শশাঙ্কে সংজ্ঞিতে শাকে বর্ষে
তুহিনকিরণবারে পৌষমাসে দশম্যাম্।
দ্বিজবরকুলজাতশ্চানকগ্রামবাসী
রচিতসরলব্যাখ্যঃ শ্রীশচীনন্দনাখ্যঃ ॥

উজ্জ্বলচন্দ্রিকা ষোড়শ অধ্যায়ে সমাপ্ত। যাঁহারা মূল উজ্জ্বলনীলমণি পড়িতে পারিবেন না তাঁহারা উজ্জ্বলচন্দ্রিকা দেখিলে উপকৃত হইবেন। গ্রন্থে শচীনন্দনের রচিত চারিটি পদ আছে।[১] অন্য কাহারো পদ উদ্ধৃত হয় নাই।

১। HBL, পৃ ৩৩১।

একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

রামায়ণ ও মহাভারত পাঁচালী

সম্পূর্ণ রামায়ণ কাব্য ছাড়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে রামায়ণ কাহিনীর স্বতন্ত্র পালা অবলম্বনে কতকগুলি পাঁচালীও রচিত হইয়াছিল। শেষোক্ত শ্রেণীর পালার মধ্যে লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত অঙ্গদ-রায়বার কাহিনী বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। অঙ্গদ বিভীষণ কালনেমি ইত্যাদির রায়বার পালার প্রায় সকল কবিই মল্লভূমির লোক। রায়বার শব্দের অর্থ, রাজদ্বার বা রাজসভার বর্ণনা এবং রাজস্তুতি। ষোড়শ শতাব্দীর শেষ হইতে মোগল শাসনের প্রভাবে যখন ছোটখাট হিন্দুরাজ্য একে একে লোপ পাইতে লাগিল, তখন জনসাধারণের মনেও প্রকৃত রাজমহিমা এবং রাজদ্বারের ঐশ্বর্য্যাদির স্মৃতি ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিতে লাগিল। তাহারই চরম ফলরূপে আমরা পাইতেছি রায়বার পালায় রাজৈশ্বর্য্যের প্রতি অবজ্ঞা এবং রাজ-সভায় ইতরজনোচিত ভাব ও ভাষায় উত্তরপ্রত্যুত্তর। মল্লরাজাদিগের সভায় নাগরী অক্ষর, হিন্দী ভাষা এবং উত্তরপশ্চিমাঞ্চলের আচারব্যবহার প্রচলিত ছিল। এই কারণে এই অঞ্চলে হিন্দীর প্রভাবে রায়বার কাহিনীর উৎপত্তি এবং বিকাশ হইয়াছিল, এবং এই কারণেই দেখা যায় যে ইহার ভাষা প্রায়শঃ ভাঙ্গা হিন্দী। রায়বার পালার ভাঙ্গা হিন্দীকে যাঁহারা মধ্যযুগের চারণদিগের পিঙ্গল-ডিঙ্গলের পরিণতি বলিয়া মনে করিয়াছেন তাঁহারা ঐতিহাসিক দৃষ্টি এবং ভাষাজ্ঞান দুইয়েরই অভাব দেখাইয়াছেন। রায়বার পালার প্রাচীনতম কবিতাগুলির কোন কোনটির ভাষা বিশুদ্ধ বাঙ্গালা। রায়বার পালার ছন্দ লঘুতম ত্রিপদী (নাচাড়ী) অথবা মালঝাঁপ। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত লোচনদাসের পদাবলীতে এই নাচাড়ী পাওয়া গিয়াছে, সুতরাং এই ছন্দকে অর্ব্বাচীন অথবা হিন্দী ছন্দ-উদ্ভূত বলা চলে না। এখন রায়বার পালার রচয়িতাদিগের বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে।

"কবিরাজ" ফকিররাম কবিভূষণের লঙ্কাকাণ্ড বা অঙ্গদ-রায়বারের ১০০৮

মল্লাব্দে অর্থাৎ ১৭০২-০৩ খ্রীষ্টাব্দে অনুলিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[১] ভাষা হিন্দী মিশ্রিত। ইনি একখানি সত্যনারায়ণ পাঁচালীও রচনা করিয়াছিলেন। তাহা ১০১৭ মল্লাব্দে অর্থাৎ ১৭১১-১২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। ফকিররাম মল্লভূমির অধিবাসী ছিলেন।

কাশীনাথের কালনেমির রায়বার বাঙ্গালায় রচিত।[২] কবির বাস ছিল (বাঁকুড়া জেলায় ?) লক্ষ্মীপুর গ্রামে। ভণিতা এইরূপ—

কাশীনাথ বলে রাম পদতলে কালনিমার রায়বার।
বাস মোর লক্ষ্মীপুরে আছি টেরে ভরসা রামের নাম॥

ছন্দের বহরে সন্দেহ হয় কাশীনাথ সম্ভবতঃ লিপিকার।

"দ্বিজ" তুলসীর অঙ্গদ-রায়বার বাঙ্গালায় লেখা।[৩] ভণিতা এইরূপ—

দ্বিজ শ্রীতুলসী কহে রামপদ সার।
এত দূরে সমাপ্ত হইল রায়বার॥

"দ্বিজ" রামের বিভীষণ-রায়বারও বাঙ্গালায় রচিত।[৪] কবির নিবাস ছিল জয়রামপুর গ্রামে।

বিভীষণের রায়বার সমাপ্ত এত দূর।
দ্বিজ রাম রচিল নিবাস জয়রামপুর॥

এই কয়জন কবির রায়বারের ভাষা ভাঙ্গা হিন্দী—খোসাল শর্ম্মা,[৫] ফকিররাম কবিভূষণ,[৬] রামনারায়ণ,[৭] ও মতিরাম।[৮]

"দ্বিজ" দয়ারাম রচিত তরণীসেন যুদ্ধ পালার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইঁহার পুত্রের নাম দেবীদাস।[৯]

এতদ্ব্যতীত মহানন্দ চক্রবর্ত্তী,[১০] "দ্বিজ" দুলাল,[১১] হটু শর্ম্মা,[১২] "দ্বিজ" গঙ্গানারায়ণ,[১৩] "দ্বিজ" পঞ্চানন,[১৪] "দ্বিজ" দুর্গারাম,[১৫] প্রভৃতির কাব্যের পালার

১। ব-সা-প-প ৬, পৃ ৬৯, পুঁথিটি কবির সমসাময়িক। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২৯ সংখ্যক পুঁথি দ্রষ্টব্য। ২। DCBM, Vol. I, পৃ ১৫০-৫১। ৩। DCBM, Vol. I, পৃ ১৫১। ৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ২৭০, ২২৬০। ৫। ঐ ২৬৮, ৩৪০২। ৬। ঐ ২২৫৩, ২৭৩৫। ৭। ঐ ২২৫১। ৮। ঐ ২৭৩৫। ৯। ব-সা-প-প ২, পৃ ৫৪৯-৫২। ১০। ব-সা-প পুঁথি ১৯৬২-৬৪। ১১। ঐ ২৬২৯। ১২। ঐ ১০৬০। ১৩। ঐ ২৭৩১, লিপিকাল ১২৩৯ সাল। ১৪। ঐ ২৩৫। ১৫ বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ৮৯।

পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের আবির্ভাব কাল জানিবার উপায় নাই এবং সকলেই যে সমগ্র রামায়ণ কাব্য রচনা করিয়াছিলেন এমন অনুমান করিবারও কোন হেতু নাই।

কবিচন্দ্রের রামায়ণ ১৭০২ হইতে ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। ইহার বিশেষ বিবরণ উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

"দ্বিজ" ভবানীনাথের রামায়ণ[১] অধ্যাত্মরামায়ণ অবলম্বনে রচিত। কবি ছিলেন জয়চন্দ্র নামক রাজার সভাসদ, তাঁহারই আদেশে কাব্যটি রচিত হয়।

জয়চন্দ্র[২] নরপতি রসিক সুজন অতি,
সভাসদ ভবানী ব্রাহ্মণ।
নৃপতি আদেশ পাইয়া ব্যাসের সংহিতা চাইয়া
সুরচিত কৈল পদবন্ধ ॥

জয়ছন্দ[২] নরপতি সদস্য[৩] ব্রাহ্মণ।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ করিল রচন ॥

রাজা জয়চন্দ্র ভবানীনাথকে রচনাকার্য্যের জন্য প্রত্যহ দশ মুদ্রা করিয়া প্রদান করিতেন। প্রজারা যাহাতে এই পুণ্যকাহিনী শ্রবণ করিয়া পাপ হইতে মুক্ত হইতে পারে ইহাই ছিল রাজার উদ্দেশ্য। রাজার মহত্ত্ব ও ঔদার্য্য স্মরণীয়।

জয়ছন্দ[২] নরপতি রাম-ইতিহাস অতি,
যত্নে সে করিল পদবন্ধ।
দ্বিজবর ভবানী আপনা সাক্ষাৎ আনি
দিনে দিনে দশমুদ্রা দান ॥
... .
শুন শুন দ্বিজবর ভবসিন্ধু পার কর
লিখিয়া রামের গুণকথা ॥

১। বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ১, ১১১, DCBM, Vol. I, পৃ ১৯৩। ২। পাঠ 'জয়ছন্দ'।
৩। ঐ 'স্বদেশী,' 'সাদাশ,' 'সদেসি' ইত্যাদি।

আহ্মার যে অধিকার প্রজা সব তুর্ব্বার,
দিনে দিনে যত পাপ করে।
করএ অশেষ পাপ মহাতুঃখ সন্তাপ,
এহা হতে উদ্ধার আহ্মারে॥

জয়চন্দ্র চাটিগ্রাম অঞ্চলের ছোটখাট ভূস্বামী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। "পণ্ডিত ভবানীনাথ" ভণিতাও পাওয়া যায়।

পণ্ডিত ভবানীনাথে রচিল পয়ার[১]।
ইতিহাস ভবসিন্ধুপাপ তরিবার॥

ভবানীশঙ্কর রচিত রামায়ণের কোন কোন কাণ্ড পাওয়া গিয়াছে। কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ডের একটি পুঁথিতে যে পরিচয় পাওয়া যায় তাহা হইতে জানিতে পারি যে কবিরা ছিলেন পাঁচ ভাই, তাহার মধ্যে তিনিই বড়, পিতার নাম "দ্বিজ" রাম বা বিজয়রাম, পিতামহের নাম গোবিন্দ। ইঁহারা সাগরদিয়ার বন্দ্যঘটী বংশীয়, রবিকরী সর্ব্বানন্দ মেল।

সাগরদিয়ার বন্দ্য রবিকরী সর্ব্বানন্দ
গোবিন্দ-তনয় দ্বিজ[১] রাম।
তস্য পঞ্চপুত্র দ্বিজ ভবানীশঙ্করাগ্রজ
রচিল তারার তত্ত্বজ্ঞান॥[২]

রামগোবিন্দ দাসের রামায়ণে[৩] এইরূপ কবিপরিচয় পাওয়া যায়—

কুঞ্জবিহারী পিতামহ সিদ্ধ-অভিলাষ। তাহার তনয় বটে শোভারাম দাস॥
গাইল গোবিন্দ দাস তাহার অনুজ। কে যাবে বৈকুণ্ঠপুরী শ্রীরামেরে ভজ॥
... .
শোভারাম দাসের তনয় তুঃখী দীন। শ্রীরামগোবিন্দ দাস ভজনেতে হীন॥
দয়া করি পদছায়া দিলা হনুমান। তেঞি ত করিল সুখে রামগুণগান॥
হনুমন্তের পাদপদ্ম করিয়া ধিয়ান। পয়ারপ্রবন্ধে রচি গীত রামায়ণ॥
... ...
সাধু শোভারাম দাস বৈষ্ণব প্রকাশ। তাহার তনয় ভণে হনুমন্তদাস॥

১। 'বিজয়' কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ৭৪। ২। ব-সা-প-প ৬, পৃ ৬৯, DCBM, Vol. I, পৃ ৫৮। ৩। ব-সা-প-প ৫, পৃ ৩২৯-৩১

গ্রন্থের শেষ এইরূপ—

গোলোকেতে রামচন্দ্র করেন বিলাস। স্বর্গ-আরোহণ গায় বাল্মীকির দাস ॥
এই অবধি উত্তরকাণ্ড রামায়ণ। এই তক রামায়ণ হৈল সমাপন ॥
শোভারাম দাসের তনয় দীন হীন। শ্রীরামগোবিন্দ দাস অতি বড় দীন ॥
রামপ্রিয়া সরস্বতী করিলেন দয়া। গাইল গোবিন্দ দাস পায়্যা পদছায়া ॥
গাইল গোবিন্দ দাস করিয়া ভকতি। হরির চরণযুগে রহু মোর মতি ॥
রামায়ণ সাঙ্গ হইল হনুর কৃপায় পূর্ণ করি বল হরি দিন বয়্যা যায় ॥

কৃষ্ণদাস রচিত একটি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ কাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[১] ভণিতায় কাশীরামের অনুকরণ সুস্পষ্ট।

রামের চরিত কথা অমৃতসমান।
কৃষ্ণদাস কহে ইহা শুনে পুণ্যবান্।

"ভিক্ষু" রামচন্দ্র বা রামচন্দ্র যতির সংক্ষিপ্ত রামায়ণের একখানি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, পুঁথির পত্রসংখ্যা ১৯৫, সুতরাং গ্রন্থটি ক্ষুদ্র নহে।[২] পুথির আরম্ভ এই প্রকার—

গণেশ সরস্বতী লক্ষ্মী শিবদুর্গা গঙ্গা কৃষ্ণ চৈতন্য বন্দনা এবং দিগ্‌বন্দনা। মঙ্গলচণ্ডিকাতে পাইবা। বাগেশ্বরী ধূয়া। প্রভু রাম কি আমার মনোদুঃখ কিছু জানে নারে। দয়াল রাম কিছু জানি নারে ॥

রামপদে মন নামে কাঁপে যম, চিদানন্দ অবতার।
দেব মুনি ভয় শাসিতে হৃদয় ধ্রুব হইলা গুণাপার।
মায়ারূপধারী রাবণ সংহারি দিলা মুক্তিপদধাম।
অহল্যার শাপ নিবারিলা তাপ মোরে দয়া কর রাম ইত্যাদি।

তাহার পর এই শ্লোকটি আছে—

যৎপাদপঙ্কজরজঃপ্রভয়া সুতাপং শান্তিং প্রয়াতি ভবভূস্মৃতিমাত্রতোঽপি।
[শ্রী]রামচন্দ্রমনিশং সততং প্রণম্য শ্রীবামতত্ত্বমমলং বিতনোতি ভিক্ষুঃ ॥

১। র-সা-প-প ২, পৃ ৫৩-৫৮। ২। ব-সা-প-প ৫, পৃ ২০১-০২।

ভণিতা এইরূপ—

রামানন্দ যতি কয়, অই রূপ হৃদে রয়,
তবে জানি মনোমোহিনী॥

পুঁথির শেষ এইরূপ—

এইরূপে হরিশ্চন্দ্র রহিল আকাশে। রাজা মাত্র একবার যায় স্বর্গবাসে॥
হরিশ্চন্দ্র রাজার কইলাম[১] বিবরণ। রাম রাম বল জীব এড়াইবা শমন॥
রাম নামে জীবন্মুক্ত রাম অন্যা গাইন। তরে মুখে শুনিলে কারুর নাহি হাইন॥
প্রমাণ ভাগবত গীতা ব্রহ্মগীতা আর। ভাষাতে কত না আমি করিব বিচার॥

তাহার পর "পঞ্চদশ গ্রহন্দ শঙ্খ্যা"—অর্থাৎ পনেরোটি গ্রন্থের সংখ্যা করিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে। এই গ্রন্থ কয়টি রামানন্দ ভিক্ষুর রচনা বলিয়াই অনুমান করা সঙ্গত।' গ্রন্থ তালিকাটি উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

১। গীতার টীকা। ২। শান্তিশতক টীকা। ৩। ষট্‌চক্র টীকা। ৪। মোহমুদ্‌গর টীকা। ৫। গায়ত্রীর টীকা। ৬। কুণ্ডতত্ত্বপ্রকাশিকা। ৭। তন্ত্রসার। ৮। জ্ঞানবৈভবতন্ত্র। ৯। অদ্বৈতরহস্য। ১০। জ্ঞানাবলী। ১১। অধ্যাত্মসার। ১২। ভাগবতাশয়। ১৩। যোগসারাবলী। ১৪। অত্যাচারদীধীতি। ১৫। রামায়ণ ভাষা।

তাহার পরে এই পয়ারগুলি আছে। ইহা হইতে জানিতে পারি যে ১৭২৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে (ফরিদপুর জেলায় প্রাপ্ত) অনুলিপিখানি প্রস্তুত হইয়াছিল।

বসু পক্ষ শৈল চন্দ্র শকে রামায়ণ। বাণ মাস ভাদ্রপদে কুজে হল্য সমাপন॥
যুগ্মচন্দ্র দিবসেতে শুক্লা ত্রয়োদশী। হইল পুস্তক চণ্ডীমণ্ডপেতে বসি॥
রাজচন্দ্র শর্ম্মণঃ স্বাক্ষর হল্য ভাষা। প্রভু রামচন্দ্র মোর পূর্ণ কর আশা॥
দুর্গাপুর নিবাসী দুর্গার পদে মতি। কাশীনাথ দ্বিজের পাঠার্থে হল্য পুথি॥
মনের বাসনা ছিল পুথি লিখাবার। প্রভু রামচন্দ্র আশা পূর্ণ কইলা[২] তার॥
পাঠক পণ্ডিত জানে এই পরিহার। শুদ্ধাশুদ্ধ অকারণ লিখিতে পয়ার॥

১। পাঠ 'কল্লাম'। ২। ঐ 'কল্যা।'

পরাৎপর হলে ভাষা হয় ব্যভিচার। মূল ভাষার ছায়া নহে এই পরিহার ॥
দুর্গাচরণসরোজে মম ভক্তিরস্তু। শ্রীগুরুচরণারবিন্দে মন [মোর] বস্তু॥
শ্রীরামচন্দ্র চরণ [সরো]রুহে ভক্তিরস্তু ॥

হরিচরণের রামায়ণ কাব্যের পুঁথিতে[১] মধুকণ্ঠ ভণিতায় কতকগুলি পদ আছে। "মধুকণ্ঠ" রামায়ণগায়কের উপাধি হইত। এই হরিচরণই কি শুকপরীক্ষিৎসংবাদ কাব্যের রচয়িতা?

"দ্বিজ" পঞ্চানন্দ,[২] "দ্বিজ" মাণিকচন্দ্র,[৩] এবং রামরুদ্র[৪] প্রণীত যথাক্রমে উত্তরকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড এবং সুন্দরকাণ্ডের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। শিবরাম রচিত লক্ষ্মণশক্তিশেল পালার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৫]

রামশঙ্কর রচিত রামায়ণের অরণ্যকাণ্ডের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৬] ভণিতা এইরূপ—

ভাবিয়া রাঘব- চরণ কমল
শ্রীরামশঙ্কর ভাষে ॥
বন্দিয়া জানকীনাথ শ্রীশঙ্কর গায়।
আরণ্যকাণ্ডের দশ অধ্যায় হল সায় ॥

ইনিই বোধ হয় শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল-রচয়িতা "ভিষক্" রামশঙ্কর।

"দ্বিজ" সীতাসুত রচিত রামায়ণের অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, লঙ্কা প্রভৃতি কয়েকটি কাণ্ডের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৭] কবি ভণিতার মধ্যে মল্লরাজ গোপালসিংহ-দেবের নাম করিয়াছেন।

বাল্মীকি আদেশে দ্বিজ সীতাসুত গায়।
মহারাজা গোপালসিংহনাথের জয় জয় ॥

ইনি প্রথম গোপালসিংহদেব হইবেন। তাহা হইলে কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন।

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ২৮৬।
২। DCBM, Vol. I, পৃ ১৮২-৮৩। ইনিই পূর্ব্ব-উল্লিখিত পঞ্চানন।
৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ১৯১। ৪। ঐ ৯৬। ৫। ঐ ১৯৩। ৬। ঐ ১৯০।
৭। ব-সা-প পুঁথি ৩০৩, ৩০৪, ৩০৮ (দাসসংগ্রহ); লিপিকাল ১২২৬ সাল।

"রসিক কবি" ভণিতাযুক্ত তাড়কাবধ পালার দুইটি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে বীরভূম অঞ্চলে।[১] একটির লিপিকাল হইতেছে ১২১৩ সাল। ভণিতা এইরূপ—

কোলাকুলি দুটি ভাই কৈল সেইখানে।
সেই চরণে আশ করিঞা রসিক কবি ভণে॥

রামনারায়ণ বিরচিত রামায়ণের কয়েকটি খণ্ডিত ক্ষুদ্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[২] পুঁথির লিপিকাল ১০৮১ মল্লাব্দ অর্থাৎ ১৭৭৫-৭৬ খ্রীষ্টাব্দ। এই ভণিতা হইতে অনুমান হয় কবির গুরুর নাম রাসানন্দ।

শ্রীরাসানন্দপদ রাতোদিন ধ্যাই।
শ্রীরামচরিত্রসুধা রামনারায়ণ বলাই॥

ভাষা মধ্যে মধ্যে মিশ্র হিন্দী।

চাটিগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত লঙ্কাকাণ্ডের অন্তর্গত পদ্মলোচনবধ পালার একটি খণ্ডিত পুঁথিতে জয়দেব দাস বা জয়দেব কবির ভণিতা পাওয়া গিয়াছে।[৩]

জয়দেব কবি কহে অমৃতভাণ্ডার।
লঙ্কাকাণ্ডে পদ্মলোচন হইল সংহার॥

কহে জয়দেব দাস, পুরাও মনের আশ,
সংসারেতে অবশ্য মরণ॥

পুঁথির লেখক ফকিরচাঁদ দাস শেষ পদটিতে নিজের ভণিতা জুড়িয়া দিয়াছেন।

চাটিগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত কৃত্তিবাস ভণিতাযুক্ত লক্ষ্মণ-শক্তিশেল পালার একটি পুঁথিতে শেষ পদে "দ্বিজ" রামচন্দ্রের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে।[৪]

দ্বিজ রামচন্দ্র ভণে লোক শুনিবার।
পাপ ছাড়ি পুণ্য করে বৈকুণ্ঠে হয়ে সার॥

"দ্বিজ" রামচন্দ্র কি গায়ক ছিলেন?

১। বা-প্রা-পু-বি ২-১, পৃ ১২।
২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ২৬৬, ২৮৫, ২২৫১।
৩। বা-প্র-পু-বি ১-১, পৃ ১৯১-৯২। ৪। ঐ ১-২, পৃ ৯৭-৯৮।

বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত এইরূপ একটি কৃত্তিবাসের অযোধ্যাকাণ্ডের পুঁথির শেষে "দ্বিজ" দর্পনারায়ণের ভণিতা পাইতেছি।[১]

ইহা বই সংসারেতে সুখ নাই আর।
দ্বিজ দর্পনারায়ণ বলে করিএ বিচার॥

পুঁথিটি আধুনিক, ১২৬৫ সালের। দর্পনারায়ণ লেখক নহেন। তবে ইনি রামায়ণ গায়ক কিংবা আদর্শ পুঁথির লেখক হইতে পারেন।

বাঁকুড়ায় প্রাপ্ত একটি অরণ্যকাণ্ডের পুঁথিতে কোন ভণিতা নাই।[২] পুঁথিটি কোন প্রচলিত রামায়ণের নহে বলিয়া বোধ হয়। ভাষা বেশ সরল। পুঁথিটির লেখক ভিকন শুক্লদাস 'ওলদে' কৃপারাম শুক্লদাস। লিপিকাল ১২০৬। পুঁথিটির রচয়িতা কে?

"দ্বিজ" কানুরাম[৩] ও "দ্বিজ" নিধিরাম[৪] ভণিতায় দুইটি রামায়ণের পদ পাওয়া গিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে বন্দ্যঘটীয় জগদ্রাম রায় জ্যেষ্ঠ পুত্র রামপ্রসাদের সহযোগিতায় একটি সুবৃহৎ অষ্টকাণ্ড রামায়ণ কাব্য রচনা করেন।[৫] কবির বাসস্থান ছিল রাণীগঞ্জের নিকটে দামোদরের অপর পারে ভুলুই গ্রামে। জগদ্রামের পিতার নাম রঘুনাথ, মাতার নাম শোভাবতী। পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথ সিংহের সময়ে কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিতরামের আদেশে কাব্যটি রচিত হয়। এই পরিচয় কাব্যের শেষে প্রদত্ত বিবরণ এবং ভণিতা হইতে পাওয়া যাইতেছে।

পিতা রঘুনাথ রায় মাতা শোভাবতী। দোঁহে জন্মদাতা আমি অধম অকৃতী॥
সে দোঁহার পাদপদ্মে নতি বহুবার। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিতরাম পদে নমস্কার॥
যাঁহার আদেশে হৈল এ গ্রন্থ রচনা। নিরন্তর তাঁর পদ করিয়ে বন্দনা॥
শ্রীমাধব রাধাকান্ত রমাকান্ত আর। শ্রীরামগোবিন্দ ভ্রাতা কনিষ্ঠ আমার॥

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ৩৭; DCBM, Vol. I, পৃ ২৯।
২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ৪৫; DCBM, Vol. I, পৃ ৩৫-৩৬।
৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ১২৫, DCBM, Vol. I, পৃ ৯৬।
৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ১৫৪, DCBM, Vol. I, পৃ ১৯৯।
৫। কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত ও কালিকাপুর (বাঁকুড়া) হইতে প্রকাশিত (তৃতীয় সংস্করণ)। মুদ্রিত গ্রন্থে স্থানে স্থানে সম্পাদকের হস্তক্ষেপের চিহ্ন সুস্পষ্ট।

শ্রীরামপ্রসাদ জ্যেষ্ঠ পুত্র সর্ব্বগুণে। শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ রামনারায়ণ তিনে॥
নিজ পদে রতি মতি দিবে রামচন্দ্র। যেন সর্ব্ব পরিবারে পূজে পদদ্বন্দ্ব॥
দেশ অধীপ শ্রীরঘুনাথ নারায়ণে। সবংশ সহিত তাঁরে রাখিও চরণে॥
পৃ ৪৪৯॥

বিপ্র বংশে বন্দ্যঘাটী ভুলুই গ্রামেতে বাটী
জগতে রচিল মহাকাব্য॥ পৃ ৫৩॥

হিন্দুস্থ[1] শিখরভূমে ভবন ভুলুই গ্রামে ,
বন্দ্যঘটী বিপ্রের নফর। পৃ ৮০॥

কাব্যের নাম "অদ্ভুত আশ্চর্য্য রামায়ণ"।

দ্বিজ জগদ্রামে রামে সমর্পিয়া কায়।
অদ্ভুত আশ্চর্য্য রামায়ণ কাব্য গায়॥

কাব্যটি নয় অংশে বিভক্ত—আদিকাণ্ড, অযোধ্যাকাণ্ড, অরণ্যকাণ্ড, কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড, সুন্দরাকাণ্ড, লঙ্কাকাণ্ড, পুষ্করকাণ্ড, রামরাস[2] এবং উত্তরাকাণ্ড।

জগদ্রাম প্রথমে সমগ্র কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, পরে পুত্রকে লঙ্কাকাণ্ড এবং উত্তরাকাণ্ড বিস্তার করিতে আদেশ করেন। সেই হেতু এই দুই অংশের বেশী স্থানেই রামপ্রসাদের ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। এ বিষয়ে রামপ্রসাদ এই কথা বলিয়াছেন,

শুন শুন সভাজন বালকের নিবেদন, বিবরণ বলি যোড়হাতে।
পিতা জগদ্রাম মোরে রামলীলা বর্ণিবারে উপদেশ দিলেন যেমতে॥
সীতারামলীলা নব্য রচিলা সুন্দর কাব্য শ্রীঅদ্ভুত-রামায়ণ নাম।
অদ্ভুত-অধ্যাত্ম-মত একত্র করিয়া যুত রচনা বিবিধরসধাম॥
... ...
এ সব রহস্যকথা বিস্তারে বর্ণিলা পিতা, সমূলে শুনিলে সুধীজন।
তারপর জ্ঞাত করি, লঙ্কাকাণ্ড পরিহরি সংক্ষেপেতে করিলা বর্ণন।
লঙ্কাকাণ্ড সুপ্রকাশ রচিলা সে কৃত্তিবাস, বিস্তারে শুন্যেছ সর্ব্বজন।
এই মনে করি পিতা ছাড়িয়া লঙ্কার কথা অদ্ভুতপ্রসঙ্গে দিলা মন॥

১। অর্থাৎ হিন্দুস্থান। ২। কৃত্তিবাস ভণিতায় ব্রজবুলিতে লেখা রামরাসের পদ পাওয়া গিয়াছে।

সন্তুষ্ট হইয়া তাত আজ্ঞা কৈলা অকস্মাৎ, রামলীলা করহ বর্ণন।
এই প্রত্যাদেশ পরে কৃপা করি কন মোরে, কোন কাব্য করিবে রচন॥
লঙ্কা ও উত্তরাকাণ্ড যেমত অমৃতভাণ্ড, সংক্ষেপে বর্ণন আছে ইথে।
মোর লৈয়া অনুমতি বিস্তার করিয়া অতি রচনা করহ রামপ্রীতে॥
পৃ ১৮০-৮১॥

রামপ্রসাদ পিতৃরচনার সঙ্গে নিজের রচনার তুলনা দিয়া বলিয়াছেন,

পিতার রচিত কাব্য তাথে অতিশয় ভব্য, প্রত্যক্ষরে সুধা ক্ষরে যাথে।
কেবল রসের সিন্ধু প্রকাশেতে পূর্ণ ইন্দু, মোর কাব্য খদ্যোতলিখিতে॥

রামপ্রসাদের ভণিতা এইরূপ—

জগদ্রাম-সুত রামপ্রসাদেতে গায়।
সীতারাম রাধাশ্যাম রেখো রাঙ্গা পায়॥

অথবা

জগৎনন্দন প্রসাদে গায়।
রাজীবলোচন রাখহ পায়॥ ইত্যাদি।

কাব্যের রচনা সম্পূর্ণ হয় ১৭১২ শকাব্দে ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ১৭৯১ খ্রীষ্টাব্দে।

সপ্তদশ শকাব্দ দ্বাদশ যুক্ত তাথে। ফাল্গুনের শুক্লপক্ষ তিথি পঞ্চমীতে॥
উনত্রিশ দিবস বারেতে বৃহস্পতি। জন্মভূমি ভুলুই গ্রামেতে করি স্থিতি॥
দ্বিজ জগদ্রাম কাব্য করিল সম্পূর্ণ। রামধ্বনি কর পাপতাপ হৌক শীর্ণ॥ পৃ ৪৫০॥

এই তারিখ জগদ্রামের রচনা সমাপ্তির নহে, রামপ্রসাদের রচনা সমাপ্তির। কেন না, ইহার বিশ বৎসর পূর্ব্বে ১৬৯২ শকাব্দে বৈশাখ মাসে অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে পিতাপুত্রে দুর্গাপঞ্চরাত্রি[১] কাব্য রচনা করিয়াছিলেন, রামায়ণ তাহার পূর্ব্বে রচিত হইয়াছিল। এই কাব্যের শেষে রামপ্রসাদ লিখিয়াছেন,

পিতা জগদ্রাম মোর রামপরায়ণ। যেঁহ কাব্য রচিলা অদ্ভুত-রামায়ণ॥
পঞ্চদিন গান মধ্যে শুন বিবরণ। তিন দিবসের গান আমার রচন॥
নবমী দশমী দুই দিবসের গান। রচনা করিতে মোরে দিলা আজ্ঞাদান॥
অঙ্গীকার কৈনু আমি পিতার বচনে। আগু পাছু কিছু মাত্র না গণিনু মনে॥

১। কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত (১৩০৮)।

দ্বাবিংশতি বর্ষ মোর বয়ঃক্রম যবে। এ কাব্য রচিল পিতা-আদেশেতে তবে॥
শিশুমতি মূর্খ অতি কাব্যরসহীন। স্বগুণে গ্রহণ কর পণ্ডিত প্রবীণ॥
ভুজ রন্ধ্র রস চন্দ্র শাক পরিমাণে। মাধব মাসেতে শুক্লপক্ষে শুভদিনে॥
ষোড়শ দিবসে পুঁথি হৈল গুরুবারে। সমাপ্ত দশমী পালা হৈল এতদূরে॥[১]

রামচন্দ্র কর্ত্তৃক অকালে দেবীপূজা দুর্গাপঞ্চরাত্রির বিষয়। শারদীয়া পূজার পাঁচ দিন লইয়া কাব্যটি ষষ্ঠী, সপ্তমী, অষ্টমী, নবমী ও দশমী এই পাঁচ পালায় বিভক্ত। প্রথম তিন পালা জগদ্রামের রচনা, শেষের দুই পালা রামপ্রসাদের।

দুর্গাপঞ্চরাত্রি কাব্যে কবিপরিচয় এইভাবে দেওয়া আছে—

রঘুনাথ রায় তাত, শোভা মাতা গর্ভজাত, এক মনপ্রাণ ছয় ভাই।
রায় জিত জগদ্রাম মাধব রাধাকান্ত নাম রমাকান্ত রামগোবিন্দাই॥
জ্যেষ্ঠ জিতরাম মতে পঞ্চরাত্রি দুর্গাপ্রীতে রচয়ে প্রার্থয়ে জগদ্রামে।
এ গোষ্ঠী তোমার দাস, দরো[২] দুঃখ কর্য্য নাশ, সেবে যেন প্রতি বংশধরে॥ পৃ ২॥

রামপ্রসাদ সম্ভবতঃ কৃষ্ণলীলারস নামে একখানি কৃষ্ণায়ণ কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন।

পিতাপুত্রের একত্র কাব্যরচনা বড় দেখা যায় না। এ বিষয়ে জগদ্রাম ও রামপ্রসাদ সৌভাগ্যবান্ বলিতে হইবে। আরও আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পিতাপুত্র উভয়েই কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন এবং উভয়েই ছিলেন ছন্দো-নিপুণ। পিতাপুত্রের রচনার কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

ভরত-শত্রুঘ্নের অযোধ্যায় আগমন দৃষ্টে অযোধ্যাবালকগণের অনুযোগ—

ফিরে রাম আইলো রে।
অযোধ্যাবালক মারিছে মালক, পুলক হইল রে॥
ভরত সবার আগে, শত্রুঘন পাছুভাগে।
ফিরে রাম এল, চলো সবে চল, এই বলি ধায় বেগে॥

১। ব-সা-প-প ২, পৃ ৩০২ (১২৯১ সালে ভাদ্র মাসের পাক্ষিক সমালোচক পত্রিকায় প্রকাশিত শিবদাস ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের প্রবন্ধ হইতে)। মুদ্রিত পুস্তকে এই অংশ নাই। প্রবাসী পৌষ ১৩৩৬, পৃ ৩৫০-৫১ দ্রষ্টব্য। শেষ ছত্রের পাঠান্তর—'কৃত্তিকা নক্ষত্র যোগ সৌভাগ্যসুন্দরে।' ২। উদর?

ভরত রামের প্রায় শ্যামলসুন্দরকায়।
লক্ষ্মণসমান কাঞ্চনবরণ শত্রুঘনে দেখি ধায়॥
যূথ যূথ শিশু মেলি ধাইছে দুভুজ তুলি।
কেহ বলে, আগে কহি গিয়া বেগে, কৌশল্যা আছয়ে ঢলি॥
কালি শোকে পিতা মৈল, সে শুনিয়া ফিরে আইল।
ভাল হৈল ভাল হৈল, রাম এল, মনের আঁধার গেল॥
করুণা করিয়া বিধি ফিরালো গুণের নিধি।
আসিয়া সদন মদনমোহন পুনঃ নাহি যায় যদি॥
কেহ বলে, মৈল পিতা, সে ছিল এ দুঃখদাতা।
শ্রীরামরতনে পাঠাইতে বনে আর কে বলিবে কথা॥
একজন বলে, তথা আছয়ে ভরতমাতা।
কৈকেয়ী বাঁচিতে, কে রাখে গৃহেতে শ্রীরাম লক্ষ্মণ সীতা॥
এই নানা মনে করে, চিনিতে না পারে দূরে।
জলবিন্দু-আশে পীড়িত পিপাসে চাতক যেমন ফিরে॥

পৃ ১১০-১২॥

ইন্দ্রজিৎ কর্তৃক নাগপাশে রাম বদ্ধ হইলে সীতা অন্তরীক্ষপথে রণক্ষেত্রে রামের বন্ধন মোচন করিতে আসিতেছেন দেখিয়া সকলে ভাবিতেছে,

শূন্য মাঝে কে বটে কামিনী।
সেই এ সংসারের সার ঐ বটে যার ভামিনী॥

একি দেখি আচম্বিতে, গগন উপরে রথে চেপে এল রাক্ষসী ও রমণী।
বিঘটন দেখি তায় পশ্চাতে রাক্ষসী ধায়, আগে কেনে ধায় রমণী অমনি॥
রাক্ষসীরে করি ডর, পবনে করিয়া ভর শূন্যে ধায় ধন্য কার কামিনী।
আর এক জনা কয়, রাক্ষসী রমণী নয়, বটে পাছে মেঘের কাছে দামিনী॥
আরবার কেউ কহে, দামিনী কামিনী নহে, পূর্ণ চাঁদে রাহু ধায় গ্রাসিতে।
তারে কেউ বলে হাসি, পাব কোথা রাহু শশী আজিকার অমাবস্যানিশিতে॥
বটে যেন দেববালা ছলে করে কোন লীলা, কার পারা বটে রামা বল না।

কেউ বলে কি কহিব, কাহার উপমা দিব, ভুবনে এ রূপের নাই তুলনা॥
চঞ্চলা কমলা যিনি, প্রখরা মুখরা বাণী, অর্দ্ধ অঙ্গী বটে নিজে উমা।
অনঙ্গ যাহার পতি সহজে দুঃখিতা রতি, এ সবে না হয় রূপের উপমা॥
সৃজন পালন লয় ইঁহারি ভ্রূভঙ্গে হয়, আদ্যাশক্তি হবে ব্রহ্মময়ী।
মনে হয় এ ভরসা, মোদের এ দেখি দশা দয়াময়ী কে এল তরাতে ওই॥
অপরূপ রূপ দেখি কেউ না পালটে আঁখি, অনিমেষে চেয়ে রয় অমনি।
রামপ্রসাদেতে কয়, মোর মনে এই হয়, ভাবে বুঝি হবে রামের রমণী॥
পৃ ২৫৮॥

জগদ্রাম-রামপ্রসাদের কাব্য দুইখানি প্রচুর পরিমাণে স্থানীয় সমাদর লাভ করিয়াছিল।

শিবচন্দ্র সেন রচিত সারদামঙ্গল হইতেছে সংক্ষিপ্ত রামায়ণ কাব্য। কবি একখানি সত্যনারায়ণ পাঁচালী কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন।[১]

কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

বৈদ্যকুলে জন্ম হিঙ্গু সেনের সন্ততি। সেনহাটি গ্রামে পূর্ব্বপুরুষের বসতি॥
রামচন্দ্র নাম গুণধাম প্রতিষ্ঠিত। যশে কুলে কীর্ত্তিতে বিখ্যাত বিরাজিত॥
রত্নেশ্বর গুণরাজ তাহার তনয়। রত্নস্বরূপ কুলে হইলা উদয়॥
এহান তনয় হৈলা ভুবনে বিখ্যাত। রামনারায়ণ সেন ঠাকুর আখ্যাত॥
সেন ঠাকুরের পুত্র তুলনায় অতুল। রামগোপাল নাম উভয় শুদ্ধকুল॥
গঙ্গাদেবদত্ত পুত্র তাহার পবিত্র। শ্রীগঙ্গাপ্রসাদ সেন নাম সুপবিত্র॥
বিক্রমপুরেতে কাঁটাদিয়া গ্রামে ধাম ধন্বন্তরি বংশে জন্ম প্রাণনাথ নাম॥
এহান তনয়া মহামায়া তান নাম। সরকারে সুপাত্রে করিলা কন্যা দান॥
গঙ্গাপ্রসাদ সেন ঠাকুর কীর্ত্তিমান্। জন্মিল তাহার এই তৃতীয় সন্তান॥
শিবচন্দ্র শম্ভুচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্র নাম। সম্প্রতি বসতি স্থান কাঁটাদিয়া গ্রাম॥[২]

নড়াইল গ্রামবাসী কায়স্থবংশীয় গঙ্গারাম দত্ত কয়েকখানি কাব্য রচনা

১। প্রদীপ ১৩১০, পৃ ২৮৪-৮৬। ২। ব-সা-প-প ৫, পৃ ২০৩।

করিয়াছিলেন।[১] ইনি ছিলেন নড়াইলের জমিদার বংশের প্রতিষ্ঠাতা রূপরাম দত্তের কনিষ্ঠ ভ্রাতা। কবি তাঁহার রামায়ণ কাব্যে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

বালি-সমাজীয় দত্ত শ্রীপুরুষোত্তম। সেই বংশে নারায়ণ নারায়ণ সম॥
মদনগোপাল নাম তাহার নন্দন। সুত রামগোবিন্দ কীর্ত্তিবিবর্দ্ধন॥
রূপরাম দত্ত নাম তাহার তনয়ে। তাহার অনুজে এই ভাষা করি কহে॥
নিবাস নড়াল গ্রাম নলদ্বীপ মাঝে। চাকলে ভূষণা নাম (মহীদেব) রাজে॥

সুবৃহৎ রামায়ণ পাঁচালী ছাড়া কবি আরও অন্ততঃ তিন খানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—উষাহরণ,[২] সুদামা-চরিত্র এবং সত্যনারায়ণের পাঁচালী। সুদামা-চরিত্রের পুঁথির লিপিকাল হইতেছে ৬ই শ্রাবণ ১১৭৭ সাল। কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন।

"বুদ্ধাবতার" রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ কাব্যের প্রধান এবং অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব হইতেছে ভণিতা অংশে প্রদত্ত কবির ধর্ম্মমত ও আধ্যাত্মিক বিশ্বাসের কথা।[৩] নাম ছাড়া কবির পরিচয় কিছু জানা যায় নাই। কবি নিজেকে কখনো বলিয়াছেন "শক্তিহেতু দ্বিজ-অংশে হইল প্রচার," আবার পরক্ষণেই বলিয়াছেন "শূদ্রকুলে রামানন্দ জন্ম লয়েছিল।"

পুঁথি সম্পূর্ণ পাওয়া যায় নাই, লঙ্কাকাণ্ড অবধি পাওয়া গিয়াছে। লিপিকাল ১১৮৬ সালের পৌষ হইতে ১১৮৭ সালের পৌষ পর্য্যন্ত। লিপিকারের এই পরিচয় পাওয়া গিয়াছে—

এই পুস্তক হইল শ্রীরামকানাই হাজরাব।
লিখিতং শ্রীরামশঙ্কর চন্দ ভাগিনা তাহার॥
নিবাস অম্বিকার দক্ষিণ নাথুয়াবাসাই।
ইবে বাস রাণীহাটী শিমুল নবনাই॥

কবি বলিতেছেন, দেশে ম্লেচ্ছের অত্যাচারে আর কোন উপায় না দেখিয়া কালী শাপ দিয়া বুদ্ধদেবকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করাইলেন। ইনিই রামানন্দ।

১। ভারতবর্ষ, শ্রাবণ ১৩৪৬, পৃ ২৪৭-৫২। ২। নড়াইল হইতে প্রকাশিত আচার্য্য পত্রিকায় (১২৮৯) এই কাব্য ও কবি সম্বন্ধে আলোচনা হইয়াছিল।

৩। হরপ্রসাদ-সংবর্দ্ধন-লেখমালা ব-সা-প (১৩৩৮) প্রথম খণ্ড, পৃ ২৩০-৫৮।

রামানন্দ কহে ভাই সংসারের লোক। বুদ্ধভাষা শুনিয়া ঘুচাও দুঃখ শোক॥
সর্ব্বশক্তিমত আর ইচ্ছা কালিকার। কলিযুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার॥
কলিতে জাগ্রত হৈতে ত্রিলোকজননী শাপ দিয়া বুদ্ধদেবে আনিল অবনী॥
আদিকাণ্ড॥

ম্লেচ্ছভোগ্য বসুন্ধরা হইল সংসারে। দাসীরূপা হৈলা লক্ষ্মী নীচজাতিঘরে॥
ইহাতে সতের আর না দেখি নিস্তার কোনরূপে না মিলে ইহার প্রতিকার॥
কালী বৈলা তোমা হইতে হইবেক পথ। একেবারে সিদ্ধ হবে জগমনোরথ॥
অযোধ্যাকাণ্ড॥

রামানন্দও এই অভিপ্রায় লইয়া পৃথিবীতে "অবতীর্ণ" হইলেন—

বাজিবে ঘোষের ডঙ্কা ভুবন ভিতরে। পঞ্চশক্তি-ইঙ্গিত বারণ কেবা করে॥
হেলায় তরাব পশু পতঙ্গ পামর। কালী জপি কাল হয়্যা ভুবন ভিতর॥
আদিকাণ্ড॥

বিমল বৈষ্ণবীপূজা জগতে টুটাইব। পাপ কলি ক্ষিতি হৈতে দূর করি দিব॥
রাধা কালী লক্ষ্মী বাণী গঙ্গা গুণবতী। পঞ্চশক্তি প্রকাশ করিব এই ক্ষিতি॥
দান যশ পৌরুষের সীমা করি যাব। এই ঘটে আর অন্য মূর্ত্তি প্রকাশিব॥
যজাব ত্রেতার ধর্ম্ম কলির ভিতরে। এই দেহে বিশ্বরূপ দেখাব সংসারে॥
যবন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব। একচ্ছত্রে রাজা করি দারুব্রহ্মে দিব॥
তার পর ভৈরবীনগরে পাব ধাম। দেখি কিবা করে কালী কল্পতরু নাম॥
আদিকাণ্ড॥

বলাবাহুল্য কবির এই অভিপ্রায় সিদ্ধ হয় নাই। কবি শেষে বলিয়াছেন,

রামানন্দ কহে ভবে আসি সিদ্ধদেহ পায়্যা।
কালীশাপে রহিলাম আচ্ছন্ন হইয়া॥

রামানন্দ ছিলেন দারুব্রহ্মের অর্থাৎ জগন্নাথমূর্ত্তির উপাসক। তাঁহার নিকট দারুব্রহ্ম ও রামচন্দ্র অভিন্ন ছিল।

মিথ্যা কভু নাহি হবে ঘোষের অক্ষর।
দারুরূপী রাজা রাম ভুবন ভিতর॥

কবি আসলে ছিলেন অদ্বৈতবাদী গুহ্যসাধনপন্থী। তাঁহার অবলম্বিত মার্গে বৈষ্ণব ও শাক্তমতের সমন্বয় হইয়াছিল।

বৃদ্ধবয়সে যখন ব্যর্থকাম কবি লঙ্কাকাণ্ড রচনা করেন তখন তাঁহার অদ্বৈতজ্ঞান সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে, তিনি স্বধামে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য উদ্‌গ্রীব হইয়াছেন।

বৃদ্ধ [তবে] কহে কালী রহিবারে নারি। স্বধাম আমারে দান দেহ শীঘ্র করি॥
দারুব্রহ্ম সেবা করি জেরবার হৈল। বৃথা কাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নহে ভাল॥
বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ। নিজ কষ্ট দায় আর লোকমধ্যে লাজ॥
সংকার্য্যে বিকার্য্য হৈল করি নিবেদন। করিতে না পারি আর ভৌতিক সেবন॥
লঙ্কাকাণ্ড॥

রামানন্দ বোধ হয় যৌবনে পত্নীত্যাগ করিয়া বৈরাগ্য আশ্রয় করিয়াছিলেন। বৃদ্ধাবস্থায় তজ্জন্য তাঁহাকে অনুতাপ করিতে হইয়াছিল। দুশ্চর সাধনায়ও বোধ হয় সিদ্ধি মিলে নাই। কবির আন্তরিকতা প্রশংসার্হ।

শরীর করিনু পণ আমি এ পামর। না হৈল [বস্তু] চর্ম্মচক্ষের গোচর॥
ধনীতে বান্ধয়ে ধন জলে বান্ধে জল। নাহি মিলে কাঙ্গালের কড়ার সম্বল॥
এই দেহ দিনে দিনে হয়্যা গেল জরা। ভ্রমিতে ভ্রমিতে প্রাণে হইলাম সারা॥
ক্ষুধায় না মিলে অন্ন পিয়াসে না পানী। মিথ্যাধন্ধে গেল মোর দিবস রজনী।
যবন হইতে মেলে দুই রাজ্যেশ্বর।[১] বৃথা কাষ্ঠ সেবি মোর টুটিল পাঁজর॥
দন্ত অস্ত কেশবেশ কর‍্যাছে পয়াণ। দূরের মনুষ্য নাহি দেখিয়ে নয়ান॥
শেষকালে কষ্ট পাইব নিজ কর্ম্মপাকে। মোর অন্তে সেবা যায়্যা হাস্য হবে লোকে॥
দারা ছাড়ি পাপভরা ভরিনু অপার। অস্থিচর্ম্ম সার কৈলা অভিশাপ তার॥
দারা সুত সুতা আর বন্ধু কেহ নাই। অবশেষে কি হইবে নাহি মিলে থাই॥
কিষ্কিন্ধ্যাকাণ্ড॥

রামায়ণ রচনার উদ্দেশ্য ছিল, দারুব্রহ্ম বাঙ্গালা দেশের রাজা হইলে কাব্যটি তাঁহার সম্মুখে গীত হইবে।

ঘোষের বচন যেন অমৃতের ধার। সাঁতারে অগাধপ্রেমে ভাগ্য থাকে যার॥

১। ইহা হইতে এই অনুমান অসঙ্গত নয় যে রামানন্দ দুই মোগল সম্রাটের রাজ্যকালে বর্ত্তমান ছিলেন।

সুধাফল ঘোষপুত্র আনিয়া সংসারে। রামচন্দ্রলীলামৃত ভব তরাবারে ॥
দারুব্রহ্ম রাজা হয়্যা করিবা শ্রবণ। প্রকাশ হইল গ্রন্থ ইহার কারণ ॥ আদিকাণ্ড ॥

কাব্য হিসাবে যত না হউক কবি রামানন্দ ঘোষের জীবনীর যতটুকু পাওয়া যায় ততটুকুর জন্যই গ্রন্থটি অমূল্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মহাভারত কাব্যরচনা রামায়ণের মত অত বেশী রচিত হয় নাই। যাঁহারা সমগ্র মহাভারত পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কবিচন্দ্র ছিলেন প্রধান। কবিচন্দ্রের মহাভারত ১৭১২-৪৮ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। এবিষয়ে উনচত্বারিংশ পরিচ্ছেদে আলোচনা করা গিয়াছে।

ষষ্ঠীবর সেন এবং তৎপুত্র গঙ্গাদাস উভয়েই মহাভারত পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। তবে একত্রে কি স্বতন্ত্রভাবে তাহা বলিবার উপায় নাই। ইঁহাদের বাসস্থান ছিল বিক্রমপুর পরগনায় দিনারদি বা ঝিনারদি গ্রামে। ইঁহারা জাতিতে সুবর্ণবণিক ছিলেন, এই কথা কেহ কেহ বলিয়াছেন।

নিম্নে উদ্ধৃত পয়ার দুইটি হইতে অনুমান হয় যে ষষ্ঠীবর সমগ্র ভারত-পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন।

গঙ্গাদাস সেন কবি রচিলেক সর্ব্ব।
শ্লোক ভাঙ্গি রচিলেক অষ্টাদশ পর্ব্ব ॥[১]

গঙ্গাদাস কবি রচিলেক সর্ব্ব।
ব্যাস মুনি বাক্য জান অষ্টাদশ পর্ব্ব ॥[২]

ষষ্ঠীবর রচিত কাব্যের স্বর্গারোহণ পর্ব্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৩] ভণিতা এইরূপ,

পাঞ্চালীপ্রবন্ধে পোথা রচিল সংসারে।
নারায়ণ পদতলে ভণে ষষ্ঠীবরে ॥

ষষ্ঠীবর এবং তৎপুত্র গঙ্গাদাস সেন একটি মনসামঙ্গল কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন।[৪] ইহার একটি ভণিতা হইতে জানা যায় যে ইঁহারা বণিক্‌জাতীয় ছিলেন।

১। বিজয় পণ্ডিতের মহাভারত ব-সা-প-প প্রকাশিত, দ্বিতীয় অংশ, মুখবন্ধ পৃ ১৮৶০।
২। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৭২। ৩। ঐ, পৃ ২৫৫; পুঁথির লিপিকাল ১১২২ (মঘী?) সাল। ৪। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩২১-২২।

বিরচিল গঙ্গাদাস বণিক্যতনয়।[১]

গঙ্গাদাস একটি (সংক্ষিপ্ত ?) রামায়ণ রচনা করিয়াছিলেন। ইহার একটি লবকুশের যুদ্ধ পালার পুঁথিতে[২] এই ভণিতা পাওয়া যাইতেছে

গঙ্গাদাস সেনে কহে ষষ্ঠীবর সুত।
সীতার চরিত্র কথা শুনিতে অদ্ভুত ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে সব কবি মহাভারতকাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই পর্ব্ববিশেষ অথবা উপখ্যানবিশেষ লইয়া ছিলেন, সমগ্র মহাভারতকাহিনী বর্ণনা করেন নাই। এই শ্রেণীর কবিদিগের কথা বলিতেছি।

উত্তরবঙ্গের উপভাষায় লিখিত ভারতপাঁচালীর স্বর্গারোহণ পর্ব্বের এক খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৩] ইহার রচয়িতা হইতেছেন বাসুদেব নামে এক "জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ" অর্থাৎ দৈবক। ইঁহার গুরু রাম ঠাকুর ছিলেন মৈথিল ব্রাহ্মণ।

শিবদেব ঠাকুরের কনিষ্ঠ সন্ততি। ভবানীর সেবা করি কৈল রসবতী ॥
মৈথিল ব্রাহ্মণ তাকে জানিবা নিশ্চয়। শ্রীরাম ঠাকুর হেন লোকেতে বোলয় ॥
তার উপাসক এক জ্যোতিষ ব্রাহ্মণ। বাসুদেব নাম তার কহে সর্ব্বজন ॥
সেহি মূঢ ভারতের রচিলেক পদ। তাক জানি সবে দোষ ক্ষেম সভাসদ ॥
হ্রস্ব দীর্ঘ বাড়া টুটা পদের লক্ষণ। না ধরিবা দোষ মোর শুন সাধুজন ॥
ভারতের কথামাত্র মনত লইবা। অল্পমতি বলি মোক হাস্য না করিবা ॥

অন্যত্র

রাম ঠাকুরের এক উপাসক ব্রাহ্মণ। স্বর্গ-আরোহণ পদ করিল রচন ॥
নাম তার বাসুদেব গোবিন্দের দাস। বাসুদেব নৃপতির রাজ্যত নিবাস ॥
তার সম মূঢ়মতি নাহি একজন। গোষ্ঠী কুটুম্বক ছাড়ি করন্ত ভ্রমণ ॥

গোপীনাথ দত্ত শ্রীহট্টের লোক ছিলেন। ইঁহার জীবিতকাল অষ্টাদশ শতাব্দী।[৪] ইঁহার রচিত দ্রোণ ও নারী পর্ব্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইনি দত্তবংশাবলী নামক একটি কুলপরিচয় কাব্যও লিখিয়াছিলেন।

১। ব-সা-প-প ২, পৃ ২৫০-৫৯। ২। DCBM, Vol. I, পৃ ১৮২।
৩। ব-সা-প-প ২, পৃ ১৯৭-৯৮। ৪। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২৯২।

গোপীনাথ পাঠকের ভণিতায় ভারত-পাঁচালীর সভাপর্ব্বের এক পুঁথি উত্তর-বঙ্গে পাওয়া গিয়াছে।[১]

রামনারায়ণ ঘোষ রচিত নলোপাখ্যান পালার পুঁথি রঙ্গপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।[২] পুঁথির পত্র সংখ্যা ৩৪। ভণিতা এইরূপ—

সত্যবতীসুত ব্যাস করিল প্রকাশ শ্লোকবন্ধে ভারত রচিল।
সেহি সব কথালেশে রামনারায়ণ ঘোষে পদবন্ধে সঙ্গীত করিল॥

"দ্বিজ" ঘনশ্যাম বিরচিত জৈমিনি-ভারত বা অশ্বমেধপর্ব্বের প্রাচীনতম পুঁথির লিপিকাল ১০৩৫ মল্লাব্দ অর্থাৎ ১৭২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দ।[৩] ভণিতা এইরূপ—

ভজ কৃষ্ণপদদ্বন্দ্ব চিত্ত-অভিলাষ।
ভকতি করিয়া বোলে ঘনশ্যাম দাস॥

শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ- মধুপানে মত্ত ভৃঙ্গ শুনি ভেল ঘনশ্যাম দাস।
নতুন মঙ্গল গাথা জৈমিনি-ভারত পোথা ভকতজনার অভিলাষ॥

ইনিই কি শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল রচয়িতা ঘনশ্যাম?

"দ্বিজ" কৃষ্ণরাম স্বীয় জৈমিনি-ভারত অর্থাৎ অশ্বমেধপর্ব্বের অনুবাদকে যজ্ঞ-পর্ব্ব বলিয়াছেন।[১] কাব্যটি ৬৬ অধ্যায়ে সমাপ্ত। অধ্যায়ের শেষে ভণিতা এইরূপ—

পুণ্যকথা অনুপাম অমৃতরসময়।
বাগীশ্বরী প্রণমিয়া কৃষ্ণদাসে কয়॥

পুণ্যকথা জৈমিনি[৪]-ভারত অনুপাম।
পদবন্ধে কহন্তি পণ্ডিত কৃষ্ণরাম॥

ভণে অনুপাম শর্ম্ম কৃষ্ণরাম
হরিপদ গতিমতি।

শেষের ভণিতাংশ এইরূপ—

জয়মুনি[৫] কহিলেন জনমেজয় তরে। অশ্বমেধপর্ব্বে সুত কহে শৌনকেরে॥
পুরাণ ভারতকথা বিচিত্র কাহিনী। ফলশ্রুতি কেহ তাব কহিতে না জানি।
ছয়ষষ্টি অধ্যায় পুথি হইলেন পূর্ণে। কৃষ্ণরাম দ্বিজে তাহা পদবন্ধে ভণে॥

১। রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ ষষ্ঠ বর্ষের কার্য্যবিবরণ, পৃ ৭। ২। ব-সা-প-প ১৩, পৃ ১৮১।
৩। ব-সা-প-প ২, পৃ ৫৪১-৪৯। ৪। ব-সা-প-প ৫, পৃ ২৮৫-৬, ৮৭, একটি পুঁথির লিপিকাল ১১৬৪ সাল ১৬৭৯ শকাব্দ, পুঁথি রঙ্গপুর অঞ্চলের। ৫। পাঠ 'জয়মুনি।'

রাজীব সেন বিরচিত উদ্যোগপর্ব্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[১] ভণিতা এইরূপ

উদ্যোগপর্ব্বের কথা সরসমধুর।
সেন রাজীবে কহে কৌতুক প্রচুর[২] ॥

রচনার নিদর্শন কিছু দেওয়া গেল।

এথা দেব হৃষীকেশ স্নান পূজা অবশেষ, মুকুট কিরীট শিরে শোভে।
শ্রীবৎস কৌস্তুভমণি কোটি ভানু দীপ্তি জিনি, শ্রীমুখ ত্রিভুবন দেখে মোহে ॥
অঙ্গদবলয়া করে, অঙ্গুলে অঙ্গুরী ধরে, চরণে মঞ্জীর ধীরগতি।
পরিধান পীতবাস, সরস মধুর হাস, উরে দোলে মালা বৈজয়ন্তী ॥
ভুরুযুগ কামধনু, উপমা রহিত তনু, দশনকিরণ মুক্তা [শোভা]।
কণ্ঠে মুক্তার হার, বেড়ি বেড়ি শত[৩] ধার, হেরইতে জগমন লোভা ॥
কপালে চন্দনচান্দ ভুবনমোহন ফান্দ, দশনে মুক্তার পাঁতি [ভাতি]।
সেন রাজীব বোলে, কৃষ্ণপদকমলে অবিরত রহুক মোর মতি ॥

সীতারামের পৌত্র, রামনারায়ণের পুত্র রামলোচনের রচিত নারীপর্ব্ব পাওয়া গিয়াছে।[৪] কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

অশ্রুত সন্তান আমি জাতিএ ব্রাহ্মণ। কাশী অনুসারে কহি করিএ ভঞ্জন ॥
জনক রাজার সুতা শেষে রাম নাম। তস্য সুত রাম নারায়ণ গুণধাম ॥
তার পুত্র ভণে নাম শ্রীরামলোচন। জগন্নাথে জান যার সমান জীবন ॥

রাজেন্দ্র দাস শুধু শকুন্তলা উপাখ্যান অবলম্বন করিয়াছিলেন।[৫] লোকনাথ দত্তের উপজীব্য নলদয়মন্তী উপাখ্যান।[৬] এই কাব্য শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত অবলম্বনে রচিত হইয়াছিল। লোকনাথ দত্তের ভণিতা এইরূপ—

দময়ন্তীর বাক্য শুনি হংস বলিলেক পুনি,
কেনে তুমি হওসি কাতর।
তোমার পুণ্যের বলে মিলিব নৈষধদলে,
কহে লোকনাথ দত্তবর ॥

রাজারাম দত্তের শুধু দণ্ডীপর্ব্ব নামক আখ্যানের পালা পাওয়া গিয়াছে।[৭]

১। ব-সা-প পুঁথি ৭৯৩। ২। পুঁথি 'প্রচার।' ৩। ঐ 'যত।' ৪। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ১৮৭০ ; লিপিকাল ১২০২ সাল। ৫। প্রদীপ ১৩০৭, পৃ ২৩৯-৪০। ৬। ব-সা-প পুঁথি ৭৮৬। ৭। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ১৮৪৪, ১৮৪৭।

দ্বাচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

মনসামঙ্গল কাব্য

রামজীবন বিদ্যাভূষণের রচিত মনসামঙ্গল ব্যতিরেকে একটি সূর্য্যমঙ্গল পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে। এই দুই গ্রন্থ হইতে জানা যায় যে পিতার নাম গঙ্গারাম, খুল্লতাতের নাম নারায়ণ। ইঁহার এক জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাও ছিলেন। ইঁহারা ব্রাহ্মণ। কবি বোধ হয় চাটিগ্রাম অঞ্চলের লোক ছিলেন।

মনসামঙ্গলে কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন [১]—

অল্পবয়স মোর দ্বিজকুলে জাত। পণ্ডিত না হওঁ[২] মুই কহিলু সভাত॥
মনসার নাম মাত্র হৃদয় ভায়া। মহাসিন্ধু খেয়া দিয়ে[৩] উড়ুপ লইয়া॥
জনক আমার জান গঙ্গারাম খ্যাতি। তাহান চরণ বন্দো করিয়া ভকতি॥
তাহান অনুজ বন্দো নামে নারায়ণ। করযোড়ে তান পদে করম বন্দন॥
... ...
গুরুর চরণ বন্দো করিয়া ভকতি। গ্রামেশ্বরী দেবী বন্দো যে গ্রামে বসতি॥

সূর্য্যমঙ্গল পাঁচালী বা আদিত্যচরিতে কবি এইরূপ পরিচয় দিয়াছেন—

জ্যেষ্ঠ ভাই বন্দম দ্বিজ বয়ঃশ্রেষ্ঠ।[৪]

অল্পবয়স মোর দ্বিজকুলে জাত। পণ্ডিত না হম্ মুই কহিনু তোমাত॥
মনেতে ভাবিয়া মাত্র দ্বাদশ আদিত্য। কবিতা কহিতে মোর প্রকাশিল চিত্ত॥
গুরুগণে আদেশিল পরমসন্তোষে। ব্রাহ্মণ সজ্জন তথা বৈসয় বিশেষে॥
গ্রামাধিপ মহারাজা ধর্ম্মেতে তৎপর। ব্রাহ্মণ পণ্ডিতে সভা আছে নরেশ্বর॥
সেই গ্রামে নিবসতি শ্রীরামজীবন। সূর্য্যের চরিত্র মাত্র করিব রচন॥[৫]

কবি ১৬২৫ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে মনসামঙ্গল এবং ১৬৩১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭০৯ খ্রীষ্টাব্দে আদিত্যচরিত রচনা করেন।

১। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১২০ ; সাহিত্য ১৩১০, পৃ ৯-২২। ২। পাঠ 'হম' সর্ব্বত্র।
৩। ঐ 'দিছে।' ৪। বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ৪১। ৫। ঐ, পৃ ১১।

শর কর ঋতু বিধু শক নিয়োজিত।
মনসামঙ্গল রামজীবন রচিত ॥[১]

ইন্দু রাম ঋতু বিধু শক নিয়োজিত।
শ্রীরামজীবনে ভণে আদিত্যচরিত ॥[২]

দ্বিতীয় পয়ারটির প্রথম চরণের পাঠান্তর পাওয়া যায় "বিন্দু রাজ ('রাম' হইবে) ঋতু বিধু;"[৩] ইহা যথার্থ হইলে আদিত্যচরিতের রচনাকাল হইবে ১৬৩০ শকাব্দ।

কবি "রামজীবন" এবং "বিদ্যাভূষণ" দুই ভণিতাই ব্যবহার করিয়াছেন। কবি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, এবং কাব্যদ্বয় একেবারে বিশেষত্ববর্জ্জিত বলিয়া বোধ হয় না। পুঁথিতে দুই এক স্থলে "দ্বিজ" গৌরচন্দ্র, কবিচন্দ্র ও শিবচরণদাসের ভণিতা পাওয়া গিয়াছে।

"পণ্ডিত," "দ্বিজ," "বিপ্র" উপাধিধারী জানকীনাথ ও "বৈদ্য" উপাধিধারী জগন্নাথ একটি করিয়া সম্পূর্ণ মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।

বিপ্র জানকীনাথ মনসার দাস।
পাঁচালীপ্রবন্ধে পোথা করিল প্রকাশ ॥[৪]

বৈদ্য শ্রীজগন্নাথে রচিল পুরাণ।
স্বরচিত কহি শুন লাচাড়ির ছান্দ ॥[৫]

"বিপ্র" উপাধিধারী জগন্নাথেরও মনসার গীত কিছু কিছু পাওয়া যায়। ইনি স্বতন্ত্র ব্যক্তি কিনা বলা যায় না।

নিম্নে উল্লিখিত কবিগণের সকলের লেখা সম্পূর্ণ মনসামঙ্গল পাওয়া যায় নাই। তথাপি মনে হয়, তাঁহাদের কেহ কেহ সম্পূর্ণ মনসার গীত রচনা করিয়া থাকিবেন। ইঁহাদের মধ্যে দুই একজন কবি ষোড়শ শতাব্দীর হওয়াও আশ্চর্য্য নহে।

বর্দ্ধমান দাস (কৌলিক উপাধি "দত্ত")[৬]; কবিচন্দ্রপতি (বা কবি চন্দ্রপতি);

১। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১২০। ২। ঐ ১-২, পৃ ১১। ৩। ঐ, পৃ ৪১।

৪। ব-সা-প-প ৪ পৃ ৩২৮। কলিকাতা বিদ্যালয়ের পুঁথি ১৩৫৭। শ্রীযুক্ত রজনীমোহন চক্রবর্ত্তী কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৩৪৫)। গ্রন্থে অন্য কবির রচনাও আছে।

৫। ঐ, পৃ ৩২৬। ৬। ব-সা-প-প ১৯, পৃ ১৭২।

পুরুষোত্তম দাস ; রায় বিনোদ (বা রাম বিনোদ) ; যদুনাথ পণ্ডিত ; গুণানন্দ সেন ; ষষ্ঠীবর সেন ; গঙ্গাদাস সেন ; রতিদেব সেন ; গুণাকর ; রূপনারায়ণ, মধুসূদন দৈ (দে ?) ; হরিসুত নন্দলাল ; "দ্বিজ" বলরাম ; "দ্বিজ" জয়রাম ; বিশ্বনাথ ; হৃদয় ; কবি কর্ণপূর (বা কবিকর্ণপূর) ইত্যাদি।

শেষোক্ত কবি বৈদ্যজাতীয় ছিলেন। ইঁহার পিতার নাম দিবাকর, মাতার নাম রুক্মিণী।

মাতা যাহার রুক্মিণী বাপ দিবাকর। তাহারে সদয় হউক দেব মহেশ্বর ॥
ভণে কবি কর্ণপূর মধুর প্রবন্ধ। পয়ার এড়িয়া বল লাচাড়ির ছন্দ ॥[১]

ভণে বৈদ্য কবি কর্ণপূরে ॥[২]

সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহ একটি মনসার পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। ইনি আরও দুইটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন রাজমালা ও ভারতীমঙ্গল। রাজমালা ও মনসার পাঁচালী মুদ্রিত হইয়াছে। রাজসিংহ ১২২৮ সালে অর্থাৎ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ৭২ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করেন।[৩] অতএব এই মনসামঙ্গল অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের শেষে বা চতুর্থ পাদের প্রারম্ভে রচিত হইয়াছিল এইরূপ ধরা যাইতে পারে।

জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের মনসার পাঁচালী[৪] বৃহৎ কাব্য। কাব্যটির রচনাকাল ১১৫১ সাল ১৬৬৬ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দ। কাব্য মধ্যে কবি একাধিকবার রচনা-কালের উল্লেখ করিয়াছেন।

মহী পৃষ্ঠে শশী দিয়া বাণ বিধু[৫] সমর্পিয়া বুঝহ সনের পরিমাণ।
লাহিড়িপাড়াত স্থিতি দ্বিজকুলে উৎপত্তি শ্রীমৈত্র জীবন কবি গান ॥

১। বিজয়গুপ্তের পদ্মাপুরাণ, পৃ ৪০। ২। ঐ, পৃ ৪৫। ৩। আরতি তৃতীয় বর্ষ ষষ্ঠ সংখ্যা পৃ ১৬৮ ; বা প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ২৩১। ৪। কতক অংশ বগুড়া নিবাসী সারদানাথ খাঁ বি-এল কর্তৃক "বিষহরী পদ্মপুরাণ" নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ব-সা-প-প ৩, পৃ ৬৬-৬৮ ; ঐ ৪, পৃ ১৮৪-২০৩, ব-সা-প প ১৩ পৃ ১৬২-৬৩। শ্রীমান্ শম্ভুচন্দ্র চৌধুরী কাব্যটি সম্পাদন করিতেছেন।
৫। পাঠান্তর 'বিধি'।

অম্বুজের পৃষ্ঠে রস ঋতু রিপু জান।
এই শকে শ্রীজীবন মৈত্র কবি গান ॥

কবি ছিলেন বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ। বাসস্থান করতোয়া তীরে লাহিড়িপাড়া গ্রামে। কবির পিতামহের নাম বংশীবদন মৈত্র, পিতার নাম অনন্তরাম, মাতার নাম স্বর্ণমালা, পত্নীর নাম ব্রজেশ্বরী। কবিরা পাঁচ ভাই ছিলেন—দুর্গারাম, আত্মারাম, সর্ব্বেশ্বর, প্রাণকৃষ্ণ, জীবনকৃষ্ণ। আত্মারামের দুই পুত্র—অনুপরাম ও অমর। অনুপরামের পুত্র আনন্দীরাম। কবি "কবিভূষণ" উপাধি পাইয়াছিলেন। যেহেতু কবি মধ্যমাগ্রজের পৌত্রের নাম করিয়াছেন, অতএব অনুমান হয় যে কবি অন্ততঃ প্রৌঢ় বয়সে কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন। সে সময়ে কবির দেশের ভূস্বামী হইতেছেন রাণী ভবানী।

নিম্নে উদ্ধৃত ভণিতাগুলি হইতে উপরি-উক্ত কবিপরিচয় সঙ্কলিত হইয়াছে।

স্বর্ণমালা-সুত কবি বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ।
শ্রীমৈত্র জীবন গান অনন্ত-নন্দন ॥

বিরচিল গান ব্রজেশ্বরীর প্রাণেশ্বর ॥

উজানির যত নারী দেখে সবে সারি সারি
জীবনকৃষ্ণ মৈত্র কবি গায় ॥

সর্ব্বাগ্রজ দুর্গারাম, তস্যানুজ আত্মারাম, সর্ব্বেশ্বর প্রাণকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ।
শ্রীকবিভূষণ নাম বাস লাহিড়িপাড়া গ্রাম জীবন মৈত্র চতুর্থের কনিষ্ঠ ॥

আত্মারামের দুই পুত্র অনুপরাম অমর মৈত্র আন্দিরাম অনুপ-নন্দন।

মহারাজা রামকান্ত ভুবনবিখ্যাত। তাঁহার জামাতা বটে রাজা রঘুনাথ ॥
তাঁহার রাজ্যেতে থাকি ভিক্ষা করি খাই। ভিক্ষুকের কর্ম্মদোষ নিন্দয় গোসাঞি ॥
শ্রীবংশীবদন মৈত্র জান মহাশয়। চৌধুরী অনন্তরাম তাহার তনয় ॥
অনন্ত-নন্দন কবি শ্রীমৈত্র জীবন। লাহিড়িপাড়ায় বাস বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ ॥

মহারাজা রামকান্ত ভুবনবিখ্যাত। তাহার জামাতা বটে রাজা রঘুনাথ ॥
তাহার দম্পতী বটে তারা ঠাকুরাণী। আপনি পৃথিবীশ্বরী তাহার জননী ॥

সতী অতি পুণ্যবতী শ্রীরাণী ভবানী। মহারাণীর নিজার্থে ভুবনে বাখানি॥
তাহার রাজ্যেতে বাস চাকলা ভাতুরিয়া। পরগণে প্রতাপবাজু তরফ সাত
সিমানিয়া॥
লাহিড়িপাড়া গ্রামখানি কবির নিবাস। কহে কবি জীবন মৈত্র করিয়া প্রকাশ॥

জগৎজীবনের কাব্যের মত জীবন মৈত্রের কাব্যও প্রধানতঃ দুই অংশে বিভক্ত—দেবখণ্ড ও বণিক্ খণ্ড। প্রথম অংশে বন্দনা ও সৃষ্টিপ্রকরণ ('সৃষ্টিখণ্ড') এবং দ্বিতীয় অংশে চাঁদ সদাগরের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। "জীবনের গ্রন্থে যুবক নখিন্দর কর্ত্তৃক কামগঞ্জনগর স্থাপন নামক একটি অভিনব বিষয় আছে"।[১]

জীবন মৈত্রের কাব্যের ভাষা সরল বটে, কিন্তু কাব্যটিকে অযথা ফেণাইয়া বাড়ান হইয়াছে। গল্পের কাঠামোর ধরণ কতকটা অভিনব বটে।

জীবন মৈত্র রচিত উষাহরণ পালার স্বতন্ত্র পুঁথি পাওয়া যায়। অনেকে এটিকে স্বতন্ত্র কাব্য বলিয়া মনে করেন।[২] কিন্তু প্রকৃত প্রস্তাবে এটি মনসা-মঙ্গলেরই পালা বিশেষ।

জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল[৩] খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে রচিত হইয়াছিল। গ্রন্থটি সুবৃহৎ তবে ইহাতে (অন্ততঃ যে পুঁথি লইয়া আলোচনা করা যাইতেছে) তাহার মধ্যে "কবি" কালিদাসের ভণিতা আছে। কালিদাসের কাব্যের আলোচনা পূর্ব্বে করা গিয়াছে।

কবির পিতার নাম অনুরাম, মাতার নাম রেবতী, পত্নীর নাম পদ্মমুখী। পিতামহ ঘনশ্যাম, প্রপিতামহ রূপরায় চৌধুরী, বৃদ্ধ প্রপিতামহ জয়ানন্দ। ইঁহারা ঘোষাল উপাধিক রাঢ়ীয় শ্রেণীর ব্রাহ্মণ। বাসস্থান কোচআ-মোরাত (দিনাজপুর জেলা)—পাঠান্তর 'কুড়িয়ামোড়া।' ইহা রাজা প্রাণনাথের অধীন ছিল। প্রাণনাথের পুত্র রামনাথ ১৬৭৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৫২ খ্রীষ্টাব্দে কান্তনগরে একটি

১। র-সা-প-প ৪, পৃ ১৮৪-২০৩। ২। ব-সা-প-প ১৩, পৃ ১৬৩।
৩। র-সা-প-প- ২, পৃ ৩১-৩৯; এই পুঁথির লিপিকাল ১১০২ সাল। সাহিত্য ১৩১০, পৃ ৬১৬-৬২।

মন্দির নির্ম্মাণ করেন। সুতরাং অনুমান করা যাইতে পারে যে কবি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ পাদে ও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন।

নিম্নে উদ্ধৃত ভণিতা হইতে কবিপরিচয় সংগৃহীত হইল।

দেবের বচনে পদ্মা আনন্দিত মন।
জগৎজীবন গায় রেবতী-নন্দন ॥

চৌধুরী রূপরায়[১] সর্ব্বদেশে গুণ গায়, জয়ানন্দ দ্বিজের নন্দন।
তার পুত্র ঘনশ্যাম তার পুত্র অনুরাম[২] বিরচিল জগৎজীবন ॥

ঘোষাল ব্রাহ্মণ রাঢ়ী, কোচআ-মোরাত বাড়ী প্রাণনাথ নরপতি দেশে।
বন্দিয়া মনসা পায় জগৎজীবন গায়, পুরাণ সমাপ্ত তার শেষে ॥

বীরনারায়ণ নাম লক্ষ্মীনাথ অনুপাম তার সুত প্রাণন্যারায়ণ।
তার দেশে প্রাণরায়, তাহার নন্দন গায় দ্বিজ কবি জগৎজীবন ॥

জগৎজীবনের কাব্য দুইখণ্ডে বিভক্ত, দেবখণ্ড ও বণিক্‌খণ্ড। বণিক্‌খণ্ডে বেহুলা-লখিন্দরের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

একটি পুঁথির আরম্ভ এইরূপ—

সেই হরি বিলাসিতে বসুধা কৈলা বাস নররূপে বসুদেবসুত হৃষীকেশ ॥
সকলের গতি পতি অকিঞ্চন ধারা। গোকুলেতে রাধাকৃষ্ণ করিল পসরা ॥
বন্দো সরস্বতী দেবী বাক্যস্বরূপিণী। লক্ষ্মীর চরণ বন্দো বিষ্ণুর ঘরণী ॥
হংসরথে ব্রহ্মা বন্দো গজে পুরন্দর। সপ্তঋষি বন্দিব নারদ কামচর ॥
বন্দিব সাগরশায়ী আগু লোন খির (?)। ছাগলে অগ্নি বন্দো হরিণে গম্ভীর ॥
বন্দিব গণেশ গঙ্গা সিংহে ভগবতী। বন্দিব বিনয় করি গুণী গণপতি ॥

ইত্যাদি।

জগৎজীবনের মতে লখিন্দরের পিতার নাম চন্দ্রপতি, পিতামহের নাম কোটীশ্বর। "কবি তর্ত্তিপুরের নিকট গঙ্গা দিয়া বেহুলার মান্দাস ভাসাইয়া লইয়া

১। পাঠান্তর 'চতুর্ভুজ রূপ রায়,' 'চতুরবুদ্ধি রূপ যার,' 'চিত্রবুদ্ধি রূপ রায়'।
২। অনুপরাম? পাঠান্তর 'অনুপাম।' পাঠান্তর 'পুত্র' স্থলে 'শিশু' এবং 'শিষ্য।'

গিয়াছেন।" জগৎজীবনের রুচি সর্ব্বত্র অনিন্দনীয় নহে। "মাতুলানীর সহিত নখিন্দরের কুব্যবহারের কুচিত্রাঙ্কন জগৎজীবনের গুরুতর অপরাধ।"

জগৎজীবনের রচনার উদাহরণ হিসাবে বেহুলার বিলাপ অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

প্রাণ তেজিল গন্ধবানিয়ার নন্দন। নিদ্রা ভাঙ্গি বিদ্যাধরী পাইল চেতন॥
স্বামীর চরণ বামা হাত দিয়া চায়। দেখে অচেতন তনু পাথর মিশায়॥
প্রদীপ জ্বালিয়া বালী বদন নেহালে। নিশ্চয় জানিলে প্রভু নাগিনী খাইলে॥
চোখ আছে মুখ আছে প্রভু মোর মৈল। সুবর্ণপঞ্জর আছে শুয়া উড়ি গেল॥
এখনি খাইলাম প্রভু এক বাটায় গুয়া। কে মোর হরিয়া নিল পঞ্জরের শুয়া॥
হায় হায় করে বালী গালে খায় চড়। মূর্চ্ছা হৈঞা পড়ে বালী ভূমির উপর॥
স্বামীর চরণ ধরি কান্দে বাণিয়ানী। সুমেরু উপরে যেন চক্ষে পড়ে পাণি॥
আকুলহৃদয়ে বালী কান্দে উচ্চস্বরে। জগৎজীবন গায় মনসার বরে॥

শ্রীরামবিনোদের মনসামঙ্গলের পুঁথি পশ্চিমবঙ্গ এবং পূর্ব্ববঙ্গ উভয়ত্রই পাওয়া গিয়াছে।[১] কবির ভণিতা এইরূপ—

শ্রীরামবিনোদ ভণে মনসার চরণে
যাএ দেবী শঙ্কুর নগরী।

"দ্বিজ" রসিকের বাস ছিল বাঁকুড়া-বর্দ্ধমান সীমান্তে আখড়াশাল গ্রামে। পিতার নাম শিবপ্রসাদ, পিতামহের নাম মহেশ মিশ্র, প্রপিতামহের নাম কালিদাস। কবির দুই ভ্রাতা ও এক ভগিনী ছিল, নাম যথাক্রমে রাজারাম, অযোধ্যা এবং সাবিত্রী। রসিকের বোধ হয় দুইটি উপাধি ছিল, কবিকঙ্কণ ও কবিবল্লভ।[২]

শ্রীকবিকঙ্কণ গায় মনসার পায়।
মনসামঙ্গল গীত রসিকেতে গায়॥

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে উত্তরপূর্ব্ব বঙ্গে, বহু কবি মনসামঙ্গলকাহিনী লইয়া কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। যেমন, ষষ্ঠীবর (দত্ত?), হৃদয়ানন্দ (দত্ত?),

১। ব-সা-প-প ২, পৃ ২৮৯-৯২, বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ২১২-১৩।
২। বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ১, ২৯২-৯৯ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি।

বিনোদরাম রায়, কাশীনাথ সেন, "মালী" ধর্ম্মদাস, কালা রায়, "দ্বিজ" গোপীকান্ত, "দ্বিজ" ত্রিলোচন, "দীন" ভবানন্দ (ইনিই কি হরিবংশ কাব্য রচয়িতা ?), "বৈদ্য" ভানুদাস শুক্ল, মুরারি মিশ্র, হরিহর দত্ত, রামেশ্বর নন্দী, আনন্দরাম চক্রবর্ত্তী (কাব্যরচনাকাল ১২০৫ সাল) ইত্যাদি।[১] ইহাদের মধ্যে কেহ কেহ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের লোক হইতে পারেন।

ষষ্ঠীবরের পদ্মাপুরাণ মুদ্রিত হইয়াছে।[২] মুদ্রিত কাব্য হইতে কবির নাম ছাড়া আর কিছু জানা যায় না। সম্পাদক ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "কবি ষষ্ঠীবর খাঁটি শ্রীহট্টের লোক। বিদেশাগত শাণ্ডিল্য দত্ত-বংশীয় মেদিনীধর দত্ত মৌলবী-বাজার মহকুমার ইটা পরগণায় গয়ঘর গ্রামে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁহারই বংশে এই কবি জন্মগ্রহণ করেন" [পৃ ১১]।

শ্রীযুক্ত রজনীমোহন চক্রবর্ত্তী সম্পাদিত মনসামঙ্গলের কিছু কিছু অংশে ষষ্ঠীবরের ভণিতা আছে। ইহাতে একস্থলে নিম্নোক্ত কবিপরিচয় মিলিতেছে।

শ্রীহট্টের দত্তগ্রাম হয় ষষ্ঠীবর-ধাম,
মাতৃদেবী অতি পুণ্যশীলা।
তার গর্ভে জনমিয়া পদ্মাপুরাণ বিরচিয়া
দত্তবংশ কীর্ত্তি প্রকাশিলা ॥ পৃ ২৪২ ॥

ষষ্ঠীবরের কাব্যে বিষয়ঘটিত বৈচিত্র্য কিছু কিছু আছে। প্রথমে যে হরপার্ব্বতীর কাহিনী আছে তাহাতে একটু নূতন কথা পাইতেছি। গৌরী পুষ্প তুলিতেছিলেন, এমন সময় শিব তাঁহাকে দেখিতে পাইয়া মুগ্ধ হন এবং জোর করিয়া আলিঙ্গন করেন। গৃহে ফিরিলে গৌরীর আলুথালু বেশ দেখিয়া মেনকা ভর্ৎসনা করেন। গৌরীর উত্তর মনঃপূত না হওয়ায় তাঁহারকে অষ্ট পরীক্ষা উত্তীর্ণ হইতে হয়। পরে একদিন শিবের মন্ত্রপূত ফুল হিমালয়ের মাথায় দেওয়ায়

১। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৩২৩-২৪, চতুর্থখণ্ড, পৃ ১৯, ১২০; পরিশিষ্ট ১, পৃ ২, ৫, ৯, ১০-১২।

২। শ্রীযুত বিরজাকান্ত ঘোষ সম্পাদিত এবং শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ দাস কর্ত্তৃক শ্রীহট্ট হইতে প্রকাশিত (১৩৩২)। মুদ্রিত গ্রন্থ সর্ব্বাংশে অকৃত্রিম বলিয়া বোধ হয় না। অনেক ছাড়-বাদও আছে।

হিমালয় শিরঃপীড়ায় আকুল হইলেন। কিছুতেই উপশম হইতেছে না দেখিয়া গৌরী কাব্যদেবীর মানত করিলে হিমালয় সুস্থ হইলেন। কাব্যদেবীর পূজার অন্যতম অঙ্গ হইতেছে কাপালিকের নাটগীত। শিব আসিলেন "কেওয়ালী" অর্থাৎ কাপালিক সাজিয়া নাটগীত করিতে।[১] শিবের গানে সকলে মুগ্ধ হইয়া গেল। তাহার পর যখন নাচ আরম্ভ করিলেন তখন প্রলয়ের সূচনায় সকলে অস্থির হইয়া পড়িল। তাঁহাকে কিছুতেই থামান যায় না। অবশেষে গৌরীর সহিত বিবাহ দিবার অঙ্গীকার করায় শিব নাচে ভঙ্গ দিলেন। যথারীতি শিবগৌরীর বিবাহ হইল।

কবির কাল জানা নাই। সম্ভবতঃ তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বিদ্যমান ছিলেন। প্রকাশিত কাব্যের ভাষা নিতান্ত আধুনিক। স্থানে স্থানে ভারতচন্দ্রের প্রভাব অতিশয় সুস্পষ্ট [পৃ ৮৫]।

অনেকের মতে হৃদয়ানন্দ ছিলেন ষষ্ঠীবরের ভাই।[২] ষষ্ঠীবরের কাব্যের কোন কোন পুঁথিতে মধ্যে মধ্যে হৃদয়ানন্দের ভণিতাও পাওয়া যায়।

শ্রীযুক্ত রজনীমোহন চক্রবর্ত্তী মহাশয় সম্পাদিত মনসামঙ্গলের দুই স্থানে [পৃ ১১২, ১১৩] শিবরাম দাসের ভণিতা পাওয়া যায়। ইঁহার বিষয়ে আর কিছু জানা যায় না।

১। 'কৈলাস শিখরে আছে শঙ্কর কেওয়ালী।
সেই সে গাহিতে পারে কাব্যের পাঁচালী।

২। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয়খণ্ড, পৃ ২৯৫।

ত্রিচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য

প্রথম মুদ্রিত ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য[1] হইতেছে ঘনরাম চক্রবর্ত্তীর রচনা। ইঁহার উপাধি ছিল কবিরত্ন। বাসস্থান ছিল বর্দ্ধমান জেলায় দামোদর পারে কৈয়ড় পরগনার অন্তর্ভুক্ত কৃষ্ণপুর গ্রামে। কবির পিতা গৌরীকান্ত, মাতা সীতা, প্রপিতামহ পরমানন্দ, পিতামহ ধনঞ্জয়। ধনঞ্জয়ের দুই পুত্র, শঙ্কর জ্যেষ্ঠ, গৌরীকান্ত কনিষ্ঠ। ইঁহারা ছিলেন পৌষন্বান্ গোত্রীয়। ঘনরামের মাতুলালয় ছিল রায়না গ্রামে। মাতামহের নাম গঙ্গাহরি। ইনি কৌকুসারী গোত্রীয়, কুশধ্বজ-রাজবংশীয়। ঘনরামের চারি পুত্র—রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ ও রামকৃষ্ণ। বর্দ্ধমানের মহারাজা কীর্ত্তিচন্দ্রের আশ্রয়ে কাব্যটি রচিত হয়। কবি ছিলেন শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক এবং সম্ভবতঃ রামায়ণ-গায়কও। এই সব তথ্য পাওয়া যায় ভণিতা হইতে।

মাতা যার মহাদেবী সতীসাধ্বী সীতা।
কবি কান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা॥
প্রভু যার কৌশল্যানন্দন কৃপাবান্।
ঘনরাম কবিরত্ন[2] মধুরস গান॥ পৃ ২২, ৮২, ১০৬, ১৯৯॥

চক্রবর্ত্তী ধনঞ্জয়, তাহার তনয় দ্বয়,
কবিবর শঙ্কর প্রধান।
তদনুজ গৌরীকান্ত কাব্যসিন্ধু শান্ত দান্ত,
তত্তনুজ ঘনরাম গান॥ পৃ ২২৩॥

ঠাকুর পরমানন্দ পৌষন্বান্ বংশে।
ধনঞ্জয় সুত তাঁর সংসারে প্রশংসে॥

১। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত (১২৯১), বর্ত্তমান আলোচনা তৃতীয় সংস্করণ (১৩১৮) অবলম্বনে। ২। পাঠান্তর 'তার সুত।'

তত্তনুজ শঙ্কর অনুজ গৌরীকান্ত ।
তাঁর সুত ঘনরাম গুরুপদাশ্রান্ত[১] ॥ পৃ ৪৪, ৮৯ ॥

কৌকুসারী অবতংসে কুশধ্বজ রাজবংশে
দ্বিজ গঙ্গাহরি পুণ্যবান্ ।
তাঁহার দুহিতা সীতা সত্যবতী পতিব্রতা
তার সুত ঘনরাম গান ॥ পৃ ২৩০ ॥

পরে রাম পূর্ব্বে রাম গোপাল গোবিন্দ ।
রামকৃষ্ণ প্রতি প্রভু রাখিবে সানন্দ ॥ পৃ ২০৫ ॥

শ্রীরামদাসের দাস দ্বিজ ঘনরাম । কবিরত্ন ভণে প্রভু পুর মনস্কাম ॥
শ্রীরাম পূর্ব্বকে প্রভু গোপাল গোবিন্দে । তথাপি শ্রীরামকৃষ্ণে রাখিবে আনন্দে ॥
জগৎ-জানিল রায় ধার্ম্মিক সুধীর । মহারাজা পুণ্যবন্ত নিষ্পাপশরীর ॥
জগৎ রায় পুণ্যবন্ত পুণ্যের প্রভায় । মহারাজচক্রবর্ত্তী কীর্ত্তিচন্দ্র রায় ॥
আশীর্ব্বাদ করি তায় বসিয়া বারামে[২] । কইয়ড় পরগনা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রামে ॥
পৃ ২৬৩ ॥

কবি জ্যেষ্ঠ পুত্র রামরামকে বোধ হয় অধিক স্নেহ করিতেন এইজন্য ভণিতায় একাধিকবার তাহার জন্য দেবতার আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়াছেন,

প্রভু মোর রামরামে রাখিবে কল্যাণে ॥

ঘনরাম ১৬৩৩ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দে ৮ই অগ্রহায়ণ শুক্লা তৃতীয়া তিথি শুক্রবার দিবসে কাব্যরচনা সমাপ্ত করেন ।

শক লিখি রাম গুণ রস সুধাকর ।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর ॥
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি ।
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি ॥

রূপরাম সীতারাম রামদাস প্রভৃতি পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মমঙ্গল-রচয়িতার মত ঘনবাম গ্রন্থোৎপত্তিবিবরণ দেন নাই, অন্ততঃ পক্ষে মুদ্রিত গ্রন্থে নাই ।

---

১ । পাঠ 'পদাক্রান্ত' বা 'পদে শ্রান্ত ।' ২ । পাঠ 'বিরামে' ।

ঘনরামের কাব্য এই চব্বিশ পালায় বিভক্ত—স্থাপন, ঢেকুর, রঞ্জাবতীর বিবাহ, হরিশ্চন্দ্র, শালে ভর, লাউসেনের জন্ম, আখড়া, ফলা নির্ম্মাণ, গৌড়যাত্রা, কামদল-বধ, জামতি, গোলাহাট, হস্তিবধ, কাঙুর-যাত্রা, কামরূপ-যুদ্ধ, কানড়ার স্বয়ংবর, কানড়ার বিবাহ, মায়ামুণ্ড, ইছাই-বধ, বাদল, পশ্চিম-উদয় আরম্ভ, জাগরণ, পশ্চিম-উদয়, স্বর্গারোহণ।

ঘনরামের ভাষা প্রাঞ্জল। ভাষা ও ভাব যথাসম্ভব গ্রাম্যতাবর্জ্জিত। তৎসম শব্দের বাহুল্য থাকিলেও উৎকটতা নাই। তবে সর্ব্বত্র অনুপ্রাসের চেষ্টা প্রকট। অনুপ্রাস বেশীর ভাগ পাই পয়ারের দ্বিতীয় চরণে। যেমন,—

বিপক্ষ দেখিয়া বড় নদে বাড়ে বান।
কুলকুল কুরব কমল কানে কান॥

রাজসভা প্রবেশ করিতে তড়বড়ি।
রামরাম প্রণাম সেলাম হুড়াহুড়ি॥

পিছে রাখে বর্দ্ধমান সরাই সহর।
দিগ্ দণ্ড দিবায় দাখিল দামোদর॥

পাছে ভর করিতে আগলে বেড়াবেড়ী।
চারি চক্ষু চাপিয়ে চঞ্চল চায় চেড়ী॥

নয়জন নাবিকে নৃপতি নিল নায়।
বাটুয়া কুকুর কেন্দে গড়াগড়ি যায়॥

অল্প দুই এক কথায় অত্যন্ত কৃতিত্বের সহিত ঘনরাম স্বীয় কাব্যের পাত্রপাত্রীর চরিত্রের স্বরূপ ফুটাইয়া তুলিয়াছেন। কর্পূরধবল অত্যন্ত বালকস্বভাব, যেখানে সেখানে বাঘ দেখিতেছে, "প্রতি ঝোপে ঝাড়ে বলে দাদা ঐ বাঘ॥"

সুরিক্ষা লাউসেনকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়াছে, চিরদিন না হউক তাহাকে দুইদণ্ড ধরিয়া রাখিতে চায়। প্রথম দর্শনেই তাহার মুখে কোমল কথা আসিয়া পড়িতেছে, কিন্তু তাহা বলিবার উপায় নাই। বলিলেই লাউসেন ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করিয়া চলিয়া যাইবে।

কহিলে কোমল কথা পাছে করে হেলা।
এত ভাবি বচন কহিছে কাঠ-চেলা॥

বেশ্যার সংসর্গে দোষ নাই, ইহার বহু বহু পৌরাণিক উদাহরণ দেখাইয়া সুরিক্ষা শেষে নারীসুলভ বিনতি করিয়া বলিল,

মনে কর এ ছার অধম জাতি মেয়ে।
গগনে গণিতে তারা শক্তি আছে চেয়ে॥

লাউসেন কিন্তু অটল,

ঠেকিল সুড়ির হাতে গণ্ডকীর শিলা॥

মহামদ লখ্যাকে লোভ দেখাইতেছে, কালুকে ময়নার রাজা করিয়া দিবে, লখ্যা রাজরাণী হইবে এবং লাউসেনের চারি মহিষী তাহার চেড়ী হইয়া সেবা করিবে। ইহার উত্তরে কবি লখ্যার মুখে যে কয়টি কথা বলাইয়াছেন তাহাতে এই ডোমরমণীর চরিত্র সরল মাধুর্য্যে ও মহত্ত্বে ফুটিয়া উঠিয়াছে।

এত শুনি সম্ভ্রমে ডোমনী কাটে জি। কোপে কয় কেমনে বদনে কৈলি কি॥
ডোম হল আপন ভাগিনা হলো পর। এই বুদ্ধ্যে এতকাল রাজার পাত্তর॥
ঠাকুরাণী-সকলে বিরূপ বড় বাড়া। হেন বুঝি লখেকে ধরাবি ঢাল খাঁড়া॥

যথার্থ সাক্ষ্য দিবার অপরাধে হরিহর বাইতির শূলদণ্ড হইয়াছে। দণ্ড ভোগ করিবার প্রাক্কালে হরিহর ঈশ্বরের নিকট অনুযোগ করিতেছেন,

শূলিতে পরাণ যায়, আমি নাহি কান্দি তায়,
কান্দিয়া কাতর এই শোকে।
তোমার দাসের দাস মিথ্যাবাদে হয় নাশ,
ধর্ম্ম মিথ্যা পাছে বলে লোকে॥

শুকের গলায় বাঁধিয়া লাউসেন কলিঙ্গাকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন ইহার মধ্যে সেকালের পত্রলিখনপ্রণালীর কিছু পরিচয় পাওয়া যায়।

প্রথমে লিখিলা স্বস্তি সর্ব্বগুণান্বিতা। শ্রীমতী কলিঙ্গারাণী সুচারুচরিতা।
সুপরমশুভাশী[ঃ] লিখিল বিজ্ঞাপন। তোমার কল্যাণ মোর কল্যাণকারণ॥
পরন্তু কারণ লিখি পীড়া পাই চিতে। শুভ সমাচার প্রিয়ে পাঠাবে ত্বরিতে॥

হাকন্দ আনন্দকন্দ নিরানন্দময়। ইহার কারণ কিছু না বুঝি নিশ্চয় ॥
বিবরি বিশেষ বার্ত্তা লিখিবে সকল। প্রাণের কর্পূর চিত্রসেনের মঙ্গল।
অপর সকল শুভ লিখিবে বিশেষ। এখানে আমার প্রাণ হলো অবশেষ ॥
প্রভুপদ প্রসন্নে পূজিনু এতদিন। এবে অতি দুর্গতি হইল দশাহীন ॥
প্রাণপণ করেছি না যাব বর বিনে। কালুকে কহিবে পুরী রাখে রাত্রদিনে ॥
অপর আপনি লবে সবাকার তত্ত্ব। পিতামাতার চরণে জানিবে দণ্ডবত ॥
প্রতি মাসে পাঠাইবে প্রচুর খরচ। বিভাব যে হনু বাপা দানে বড় সচ (?) ॥
সুপালনে সুন্দরী পালিবে বসুমতী। জ্ঞানবতী প্রিয়ে লেখা কিমধিকমিতি ॥
বিতারিখ বৈশাখ বিগ্রহবার লেখা। বান্ধিল পক্ষীর গলে প্রতিবর্ণ দেখা ॥
পৃ ২৫৫ ॥

কাব্যটি পাঠ করিলে বোঝা যায় যে ঘনরাম ধর্ম্মশীল উদারচিত্ত ব্রাহ্মণ ছিলেন। পশ্চিম-উদয় পালার শেষে ঘনরাম যে উক্তি করিয়াছেন তাহা তাঁহার মহৎচিত্ততার পরিচায়ক। বৃন্দাবনদাসের চৈতন্যভাগবতে প্রথম পাইয়াছিলাম সার্ব্বভৌম উদার অনুকম্পা—"জীব প্রতি কর প্রভু শুভদৃষ্টিপাত।" আর ঘনরামের ধর্ম্ম-মঙ্গলে প্রথম পাইলাম দেশাত্মবোধের উন্মেষ,

রাজার মঙ্গল চিন্তি দেশের কল্যাণ।
দ্বিজ ঘনরাম কবিরত্ন রস গান ॥

সহদেব চক্রবর্ত্তীর পিতার নাম বিশ্বনাথ, পিতামহের নাম রাজারাম। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম মহাদেব। ইঁহাদের বাসস্থান ছিল বালিগড় পরগনার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে। এই গ্রাম হুগলী জেলায় দ্বারহাটার নিকটে।[১]

চক্রবর্ত্তী রাজারাম অশেষ পুণ্যের ধাম,
বিশ্বনাথ তাহার নন্দন।
মহাদেব তস্য সুত যাহার অনুজ ভ্রাত
সহদেব সুকবি রচন ॥

দ্বিজ সহদেব গান অনাদি ভাবনা।
রাধানগর বাড়ী যার বালিগড় পরগনা ॥

১। অম্বিকাচরণ গুপ্ত মহাশয়ের প্রবন্ধ [ব-সা-প-প ৪, পৃ ২৭৭ হইতে] দ্রষ্টব্য।

সহদেব লিখিয়াছেন, তিনি ৪১ সালে ৪ঠা চৈত্র পূর্ণিমার দিনে শিবের দয়া লাভ করিয়াছিলেন।

দ্বিজ সহদেব গায় পূর্ব্ব তপ ফলে।
যাহারে করিলে দয়া একচল্লিশ সালে ॥
আগমের কথা ইহা কে বলিতে পারে।
কালাচাঁদ স্বপনে সদয় হৈলা যারে ॥
চৈত্রের চতুর্থ দিন পূর্ণিমার তিথি।
হেন দিনে যারে দয়া কৈল যুগপতি ॥

এই ৪১ সাল সন ১১৪১ সাল অর্থাৎ খ্রীষ্টীয় ১৭৩৫ সাল হইবে। ইহার অবান্তর প্রমাণও আছে। সহদেবের পুঁথি ১১৯৩ সালে অনুলিখিত হইয়াছিল, লিপিকার ভাঙ্গামোড়া নিবাসী আনন্দীরাম পণ্ডিত। এই আনন্দীরামের পিতামহ বৃন্দাবন পণ্ডিত সহদেবের কাব্যে তাঁহার সমসাময়িক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। স্থতরাং ১১৪১ সালের কিছুকাল পরেই যে সহদেবের কাব্য রচিত হইয়াছিল এইরূপ অনুমান করা যুক্তিসঙ্গত হইবে।

সহদেব স্বগ্রামের কালাচাঁদ এবং ভাঙ্গামোড়ার বাঁকুড়ারায় এই তুই ধর্ম্মঠাকুরের বন্দনা করিয়াছেন।

অনিলপুরাণ দ্বিজ সহদেব ভণে।
কালাচাঁদ যারে কৃপা করিলা স্বপনে ॥

বন্দিব বাঁকুড়ারায় ভাঙ্গামোড়ায় স্থিতি।
অনুপমগুণধাম অনন্তমূরতি ॥
সদ্বংশে উৎপত্তি পণ্ডিত বৃন্দাবন।
যাহার সেবায় বশ দেব নিরঞ্জন ॥

তারকনাথের বন্দনায় সহদেব বলিয়াছেন,

মনে হয় মৃত্যুঞ্জয় একচল্লিশ সালে।
বস্যা ছিলে বৃষধ্বজ শ্রীফলের মূলে ॥

বাঘছাল আসন বিভূতিভূষা গায়।
কিবা সে লাবণ্যছটা কহা নাহি যায়॥
পঞ্চম অক্ষর মন্ত্র শম্ভু দিলে কানে।
বদনে নাচয়ে বাণী তথির কারণে॥
গান দ্বিজ সহদেব শঙ্করভাবনা।
গায়কের পূর্ণ কর মনের বাসনা॥

সহদেব তাঁহার কাব্যকে কখনও বলিয়াছেন ধর্ম্মপুরাণ বা অনিলপুরাণ, আবার কখনও বলিয়াছেন ধর্ম্মমঙ্গল।

শ্রীধর্ম্মপুরাণ দ্বিজ সহদেব গায়।
ভক্ত নায়কেরে দয়া কর কালুরায়॥

শ্রীধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ সহদেব গায়।
ধনে বংশে নায়কে বাড়াবে কালুরায়॥

কিন্তু কাব্যটি ঠিক ধর্ম্মমঙ্গল পর্য্যায়ে পড়ে না, কারণ ইহাতে লাউসেনের কাহিনী আদৌ বিবৃত হয় নাই। ইহাকে একত্র শিবায়ন ধর্ম্মপুরাণ ও গোরক্ষবিজয় বলা যাইতে পারে, কেন না ইহাতে হরগৌরীর উপাখ্যান, ধর্ম্মমাহাত্ম্য বর্ণনা এবং মীননাথ-গোরক্ষনাথ কাহিনী বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যটির সূচী হইতে বোঝা যাইবে কাব্যের বিষয়বস্তু কিরূপ বিচিত্র এবং মূল্যবান্। শূন্যপুরাণে উদ্ধৃত "নিরঞ্জনের উষ্মা" শীর্ষক কবিতাটি ইহাতে পাওয়া যাইতেছে। কাব্যের সূচী এই—

গণেশবন্দনা, ধর্ম্মবন্দনা, সরস্বতীবন্দনা, লক্ষ্মীবন্দনা, চৈতন্যবন্দনা, তারকেশ্বর বন্দনা, সর্ব্বদেবদেবীবন্দনা, পিতামাতাবন্দনা। সৃষ্টিপ্রক্রিয়া, নিরঞ্জনের নিঃশ্বাস হইতে উলুকপক্ষিরূপী মুনির জন্ম, তদুপরি আরূঢ় হইয়া আদ্যাকে সৃষ্টি, আদ্যার গর্ভে ধর্ম্মের ঔরসে ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বরাদির উদ্ভব। আদ্যার শতবার দেহান্তর গ্রহণ, মহাদেবকে পতিত্বে বরণ, হিমালয়ের কন্যারূপে আবির্ভাব, বাল্যলীলা, বিবাহ, কার্ত্তিক গণেশের জন্ম, ঘরকরণা, শিবের ভিক্ষা, কামদা নামক ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য, বাগ্দিনীবেশে শিবকে ছলনা, উভয়ের মাছধরা, কামদা ক্ষেত্র হইতে ভগবতীর

অকস্মাৎ অন্তর্ধান, কৃষিজাত মৎস্যাদি লইয়া শিবের কৈলাস যাত্রা, তথায় মহাজ্ঞান পিপাসিতা ভগবতীর শিবসমীপে প্রার্থনা, উভয়ের বল্লুকাতীরে প্রস্থান। গৌরীকে মহাজ্ঞান উপদেশকালে মৎস্যগর্ভশায়ী মীননাথের মহাজ্ঞান লাভ, মীননাথের গৌরীনিন্দা, তদ্ধেতু ভগবতীর অভিশাপ, সেই হেতু কদলীপাটনে স্ত্রীজাতির মোহনমন্ত্রে মীননাথের মেষরূপে অবস্থিতি, শিষ্য গোরক্ষনাথ কর্ত্তৃক উদ্ধার, কানুপা, হাড়িপা, মীননাথ, গোরক্ষনাথ ও চৌরঙ্গী নামক যোগিপঞ্চকের একত্র মিলন, হরগৌরীস্তুতি, মহানাদে মীননাথের রাজত্বলাভ। সগরবংশের উপাখ্যান, গঙ্গার উৎপত্তি। ডোমবেশে অমরানগরে শিবের ধর্ম্মপূজা, অমরানগরের অধিপতি ভূমিচন্দ্র কর্ত্তৃক উক্ত ধর্ম্মসেবক ডোমের নির্য্যাতন ও ধর্ম্মনিন্দা, সেই অপরাধে সর্ব্বাঙ্গে ধবল হওয়া, ধর্ম্মপূজান্তে ব্যাধিমুক্তি। জাজপুর নিবাসী রামাই পণ্ডিত নামক সেবক ব্রাহ্মণের পুত্র শ্রীধর কর্ত্তৃক ধর্ম্মনিন্দা, তজ্জন্য অবদাপাটন নামক স্থানে তাহার প্রাণনাশ, পিতা কর্ত্তৃক পুনরুজ্জীবন। জাজপুরবাসী ব্রাহ্মণদিগের ধর্ম্মদ্বেষ, তৎপ্রতিকারার্থ তাঁহাদের গৃহে ধর্ম্মের জন্মগ্রহণ ও ম্লেচ্ছত্ব অবলম্বনে সকলের জাতিনাশ, তদ্ধেতু সকলের ধর্ম্মভীতি ও পরিত্রাণলাভ। ভূমিচন্দ্র রাজার আপন মুণ্ড ছেদ করিয়া ধর্ম্মপূজা ও ফলে স্বর্গারোহণ। হরিশ্চন্দ্র রাজার ধর্ম্মনিন্দা, তৎফলে অপুত্রকত্ব, পুত্রলাভার্থ রাণীর সঙ্গে বনগমন, নানা দেবদেবীর উপাসনা, তাহাতে নিস্ফলতা, বনে পিপাসায় প্রাণত্যাগ, রাণী কর্ত্তৃক ধর্ম্মস্তুতি, ধর্ম্মের অনুগ্রহে রাজার পুনর্জীবন লাভ, পুত্র লুইচন্দ্রের জন্ম, রাজা ও রাণীকে ধর্ম্মের ছলনা, রাজহস্তে লুইচন্দ্রের শিরশ্ছেদ, রাণীকর্ত্তৃক পুত্রমাংস রন্ধন, ব্রাহ্মণরূপী ধর্ম্মকর্ত্তৃক ভোজনকালে লুইচন্দ্রের প্রাণদান।

সহদেব সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, তৎসত্ত্বেও ভাষা স্থানে স্থানে বেশ প্রাঞ্জল। সহদেব এই স্থানীয় ধর্ম্মঠাকুরগুলির বন্দনা করিয়াছেন—

গবপুরে বন্দিব স্বরূপনারায়ণ। আখুটীর ধর্ম্ম বন্দো হয়ে একমন ॥
জাড়গ্রামে বন্দিব ঠাকুর কালুরায়।[১] দিবানিশি কতেক গায়নে গীত গায় ॥
পূর্ব্বদ্বারী কোঠা সম্মুখে দামোদর। দুদিকে তুলসীমঞ্চ দেখিতে সুন্দর ॥

১। ইঁহারই অনুগ্রহে রামদাস আদক ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

বন্দিব বাঁকুড়ারায় ভাঙ্গামোড়ায় স্থিতি। অনুপমগুণধাম অনন্তশকতি ॥
সদ্‌বংশে উৎপত্তি পণ্ডিত বৃন্দাবন। যাহার সেবায় বশ দেব নিরঞ্জন ॥
নুয়াদার কালাচাঁদ বন্দো হাতে-তালে। পাইল গোপের সুত তপস্যার বলে ॥
বন্দীপুরে বন্দিব ঠাকুর শ্যামরায়। দামোদর যাহার দক্ষিণে বয়্যা যায় ॥

নিম্নে উদ্ধৃত দেবীস্তোত্রটি হৃদয়গ্রাহী।

শরণ লইনু জগতজননী ও রাঙ্গা চরণে তোর।
ভবজলধিতে অনুকূল হৈতে কে আর আছয়ে মোর ॥
দুগ্ধকণ্ঠ শিশু দোষ করে, রোষ না করয়ে মায়।
যদি বা রুষিবে পড়িয়া কান্দিব ধরিয়া ও রাঙ্গা পায় ॥
হরিহর ব্রহ্মা যে পদ পূজয়ে তাহে কি বলিব আমি।
বিপদসাগরে তনয় ফুকারে, বুঝিয়া যা কর তুমি ॥

ধর্ম্মের বন্দনা এইরূপ—

করিয়া যুগলকর প্রণমহ মায়াধর শূন্যমূরতি নৈরাকার।
দ্বিভুজ ধবলকায় প্রণাম তোমার পায়, তোমা বই দেবতা নাহি আর ॥
বসিয়া পরম শূন্যে শান্তি নাহিক মনে, ডাকিছে উলূক মুনিজন।
স্বর্গ মর্ত্ত্য রসাতল গণনা করিয়া বল, কেবা মোরে করয়ে সঙরণ ॥
শুনি গোঁসাঞের বাণী আনন্দে উলূক মুনি একে একে করয়ে গণন।
জম্বুদ্বীপের মাঝে ভক্তগণ তোমা পূজে লইয়া সকল বন্ধুগণ ॥
ভক্তের স্মরণ জানি তবে[1] ধর্ম্ম চূড়ামণি সেইখনে শূন্য তেয়াগিয়া।
ত্রিভুবনে অনুপম শূলপাণি যার নাম তার ধামে উত্তরিল গিয়া ॥
উপরে পুষ্পের ঝারা, মধ্যে গণেশের বারা, জগতী উপরে সিংহাসন।
ধূপদীপে অন্ধকার পূজা দিছে উপচার, দেখি ধর্ম্ম উরিছে আসন ॥
দড়া ধরি আসে ছাল্যা,[2] কাঁদি কাঁদি চাঁপা কলা, বোঝা-ভারে গুবাক নারিকেল।
যাত্রী আসে লেখা নাঞি, আনন্দিত গোসাঞি, কলসে কলসে গঙ্গাজল ॥
উর উর ধর্ম্মরাজ, সিদ্ধ কর মোর কাজ, দানপতি আছে মুখ চেয়্যা।

১। পাঠ 'বলে।' ২। ঐ 'ছেল্যা।'

মনে বড় বাসি ভয়, না জানি কেমন হয়, পার কর আপনি আসিয়া ॥
বিষম ধর্ম্মের ঘর দেখ্যা বড় লাগে ডর, একমন হল্যা হয় পার।
দুই মন করে যদি তারে বাম হয় বিধি, আচম্বিতে পড়ে মহামার ॥
হরিচন্দ্র মহারাজা আনন্দে করিল পূজা নিজ পুত্র দিয়া বলিদান।
মদনা তাহার রাণী চোখে না পড়িল পাণি, আগু পূজা দিল সাবধান ॥
ব্রহ্মা বিষ্ণু পুরন্দর পূজা করে নিরন্তর, জাজপুরে আদ্যের দেহারা।
এ তিন ভুবন মাঝে শ্রীধর্ম্মের পূজা আছে, রামাই করিল ঘর-ভরা ॥
সোনার নূপুর পায় উর বাপা কালুরায় যারে কৃপা করিলা স্বপনে।
বসিয়া শ্রীফলমূলে সত্য করি কুতুহলে নিজ মন্ত্র শুনাইলে কাণে ॥
আপনি করিল দয়া, মোরে দিলে পদছায়া, পূর্ব্বজন্মে আছিল তপস্যা ॥
জন্মিয়া ব্রাহ্মণবংশে মনে ছিল তুয়া অংশে, তেঞি ধর্ম্ম দেখা দিলা আস্যা ॥
তেপান্তর[১] ঘোর বিলে তুমি মোরে আজ্ঞা দিলে, সঙ্গীত হইল নিরমাণ।
অনাদিচরণরেণু তথি লোটাইয়া তনু দ্বিজ সহদেব রস গান ॥

প্রমীলা এইরূপে মীননাথকে প্রলোভন দেখাইতেছে—

যেখানে সন্ন্যাসী বসি কদম্বের তলা। সখীগণ সঙ্গে তথা আইলা প্রমীলা ॥
প্রণাম করিয়া রামা কহে কৃতাঞ্জলি। বঙ্কিমনয়নে চাহে কনকপুতলী ॥
সকালে বৈকাল কেন দেখি মহাশয়। নবীনবয়সে হেন উপযুক্ত নয় ॥
কদলীনগরে থাক হৈয়া মহারাজা। ষোল শত কামিনী তোমার হব প্রজা ॥
তুমি রাজা হবে আমি হব পাটরাণী। সদাই সুখেতে রব দিবসযামিনী ॥
অবিরত যোগাব অনেক উপহার। কানন ভ্রমিয়া কষ্ট কেন পাবে আর ॥
কুম্‌কুম্‌ কস্তুরী মাখাব সোনা গায়। কাঞ্চন-মাদুলী করি পরিব গলায় ॥
নবীন লাবণ্য সদা হেরিব নয়নে। করিয়া চাঁপার মালা পরিব লোটনে ॥
আমি হব শতদল তুমি সে ভ্রমর। তুমি চাঁদ হবে আমি হইব চকোর ॥

নিম্নে উদ্ধৃত হেঁয়ালী ছড়া বলিয়া গোরক্ষনাথ আত্মবিস্মৃত মীননাথের চেতনা করাইয়াছিলেন।

১। পাঠ 'তেবান্তর।'

গুরুদেব, নিবেদি তোমার রাঙ্গা পায়।
পূতকীর দুগ্ধে সিন্ধু উথলিল, পর্ব্বত ভাসিয়া যায়॥
গুরু হে, বুঝহ আপনা গুণে।
শুষ্ক কাষ্ঠ ছিল, পল্লব মঞ্জরিল, পাষাণ বিন্ধিল ঘুণে॥
হের, দেখহ[১] বাঘিনী আইসে।
নেতের আঁচলে চর্ম্মমণ্ডিত কায়া ঘর ঘর বাঘিনী পোষে॥
শিল নোড়াতে কন্দল বাঁধিল, সরিষা ধরাধরি করে।
চালের কুমড়া গড়ায়ে পড়িল, পুইশাক হাসিয়া মরে॥
এ বড় বচন অদ্ভুত।
আকাট-বাঁঝিয়া প্রসব হইল, (ছেলে) চায় পায়রার দুধ॥
অনেক যতনে নৌকা বাঁধিনু, কাঁকড়া ধরিল কাছি।
মশার লাথিতে পর্ব্বত ভাঙ্গিল, ক্ষুদ্র পিপীলিকার হাসি॥
(আগে) নৌকা চড়িল, পশ্চাৎ পুড়িল, (মাঝে) বায় উড়িল ধূলা।
সরিষা ভিজাইতে জলবিন্দু নাঞি, ডুবিল দেউলচূড়া॥
বাঘে বলদে হাল জুড়িনু, মর্কট হৈল কৃষাণ।
জলের কুম্ভীর হুড়া ঝাড়ি গেল, মূষিকে বুনিল ধান॥
তালের গাছে শোলের পোনা, ময়তান ধরিয়া খায়।
সাগর মাঝে কই মৎস্য মুড়লি, পঙ্গু পলুই লয়্যা ধায়॥
মধ্যসমুদ্রে দুয়াড়ি পাতিনু, সাজকি পড়ে ঝাঁকে ঝাঁক।
মহিষ গণ্ডার ডরায়ে মৈল, হরিণী পলায় লাখে লাখ॥
তৈল থাকিতে দীপ নিবাইনু, আঁধার হইল পুরী।
সহদেব গায় ভাবিয়া কালুরায় শরীরবর্ণন চাতুরী॥

"দ্বিজ" রামচন্দ্রের বাস ছিল চামট বা চামোট গ্রামে। ইনি ছিলেন বন্দ্যঘটীয় ব্রাহ্মণ। মল্লরাজ দুর্জ্জনসিংহদেবের পুত্র গোপালসিংহদেবের রাজ্যকালে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। এই তথ্য নিম্নে উদ্ধৃত ভণিতাগুলি হইতে জানা যাইতেছে।[২]

১। পাঠ 'দেখ।' ২। ব-সা-প-প ৫, পৃ ৭৪ ; বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ২, পৃ ৪১১-২০ , পঞ্চপুষ্প পৌষ ১৩৩৬, পৃ ১৩১৯-৩৫।

নিজ দুঃখ কহে সেন রাজার নিকটে।
দ্বিজ রামচন্দ্রে গায় নিবাস চামটে॥

বসনভূষণে রাজা করিল সম্মান।
রামচন্দ্র বাঁড়ুয়্যা ধর্ম্মের গীত গান॥

দুর্জ্জনসিংহ-সুত গোপালসিংহ খ্যাত বৈষ্ণব প্রহ্লাদসমান।
তস্য দেশে বাস ধর্ম্মের ইতিহাস দ্বিজ রামচন্দ্রে গান॥

কাব্যের রচনাসমাপ্তিকাল হইতেছে ১০৩৮ মল্লাব্দ অর্থাৎ ১৭৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দ।

মল্লভূমে নিবসি মল্লের লেখি শক।
হাজার আটত্রিশ সালে হইল পুস্তক॥

ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের রচয়িতা নরসিংহ বসুর বাসস্থান ছিল বর্দ্ধমান জেলায় শাঁখারী গ্রামে। ইহার পিতার নাম ঘনশ্যাম বসু, মাতার নাম নবমল্লিকা। কবি বীরভূমে রাজনগরের নবাব আসাদুল্লা খানের উকীল ছিলেন। ১৭৩৬ খ্রীষ্টাব্দে নরসিংহ লক্ষ টাকা খাজনা লইয়া মুর্শিদাবাদ নবাব সরকারে জমা দিতে যাইতেছিলেন। পথে আউষগ্রামে তাঁহার পিসির বাড়িতে এক রাত্রি বিশ্রাম করেন। সে রাত্রিতে সেখানে ধর্ম্মের গাজন উপলক্ষ্যে উৎসব ছিল। উৎসবস্থলে এক অপরিচিত সন্ন্যাসী নরসিংহকে একটি নূতন ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিতে আদেশ করেন। মুর্শিদাবাদ হইতে ফিরিলে পর কবি তাঁহার বন্ধু খেলারাম আচার্য্য হরি সোম এবং শম্ভু বসু এই তিনজনের নির্ব্বন্ধে ১৬৫৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৩৭ খ্রীষ্টাব্দে ১০ই শ্রাবণ তারিখে ধর্ম্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিতে আরম্ভ করেন।[১]

কবির ভণিতা এইরূপ—

এত শুনি মহাপাত্র ভাবে মনে মন।
ভণে নরসিংহ নবমল্লিকা-নন্দন॥

হাতে পান কর‍্যা চোর পালায় সকল।
ভণে নরসিংহ বসু ধর্ম্মাপেক্ষা বল॥

১। বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ২, পৃ ৪৫৬-৮১।

বসু ঘনশ্যামাত্মজ　　সেবি ধর্ম্মপদরজ
রচিল ত্রিপদীচ্ছন্দে পদ ॥ ইত্যাদি।

লাউসেনের হাকণ্ডে যাত্রা প্রসঙ্গে দক্ষিণ রাঢ়ের কতকগুলি স্থানের উল্লেখ আছে। যেমন,

হরি বল্যা তরী বায় যত নায়্যাগণ।　সন্ধ্যাপুরে ধর্ম্মরাজ করিলা দর্শন ॥
তরণী ছুটিল যেন খস্যা পড়ে তারা।　বাহিল দারুকেশ্বর বহে দুই ধারা ॥
বাম দিকে পীরের মোকাম দরশন।　তার আগু কতদূর শিঙ্গাবেতার বন ॥
দেখিল উসংপুর ধর্ম্মের দেহরা　স্নান পূজা অর্ঘ্যদান তথা কৈল সারা ॥
তমোলুক দক্ষিণে সমুখে সোনজড়া।　রাতারাতি পার হৈল ফিরিঙ্গীর পাড়া ॥
হিজলী দক্ষিণে রহে হোগলের বন　বন্যজন্তু পাড়ে কত গণ্ডক বারণ ॥
জলের উপর ভাসে কুম্ভীর ঘড়্যাল।[১]　জুয়ারের জল উভে উঠে সাত তাল ॥

হৃদয়রাম সাউ "সন ১১৫৬ সালের ২রা আশ্বিন ধর্ম্মমঙ্গল রচনা শেষ করেন। হৃদয়রামের পূর্ব্বনিবাস ছিল বর্দ্ধমান জেলার খুরুল গ্রামে, খুরুল বনপাশ ষ্টেসনের নিকটবর্ত্তী। সেখানে মাতামহের বাড়ীতে চাঁদরায় ধর্ম্মঠাকুরের সেবার অংশ লইয়া মামাদের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া গ্রামত্যাগ করেন। মাতৃপিতৃহীন বালক মাতুলালয়ে পালিত হইয়াছিলেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে বড়মামা তাঁহাকে কিছু সম্পত্তি দিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু চাঁদরায়ের সেবার অংশ দিতে চাহেন নাই, হৃদয় মনের দুঃখে গ্রামপ্রান্তে তুলসীপুকুরে আত্মহত্যা করিতে গেলে ধর্ম্মঠাকুর দেখা দিয়া অজয়ের সিদিয়াদহ হইতে তাঁহার মূর্ত্তি উদ্ধার করিতে আদেশ দেন। হৃদয়রাম সিদিয়াদহ হইতে ঠাকুরের মূর্ত্তি সংগ্রহ করিয়া উচকরণে চলিয়া আসেন। উচকরণ নান্নুরের দক্ষিণে প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম, সে গ্রামে হৃদয়রামের বংশধরগণ আজিও বাস করিতেছেন। উচকরণ আসিয়া তিনি ধর্ম্মের গীত রচনার জন্য স্বপ্নাদেশ প্রাপ্ত হন এবং ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করেন। কবির পিতার নাম গোবিন্দ, মাতার নাম মুকুতা, পিতামহের নাম কমল, জাতিতে শুঁড়ি।"[২]

১। পাঠ 'হত্যাল।'　২। বীরভূমবিবরণ ৩, পৃ ১৯১।

হৃদয়রামের রচনার উদাহরণ নিম্নে দিতেছি। ইহাতে সেকালের গহনার ফর্দ্দ মিলিবে।

(কি আরে) বাড়ে রঞ্জা জনকের মন্দিরে।
গগন উপরে মেলা যেন বাড়ে শশিকলা
তেনমতি বাড়ে নিরন্তরে॥
নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে যেন নির্ম্মাণ,
কামান জিনিয়া ভুরুখানি।
মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম যেন মুকুতার দাম,
অক্ষ পসি (?) যেন পদ্মমণি॥
পদ আধ গজহস্তী পথে চলে সেই রীতি,
তাথে অধিক চলনমাধুরী।
(দুই) চক্ষু গগনের তারা, কেশ চামরের ঝারা,
মাঝাখানি জিনিয়া কেশরী॥
পক্ক বিম্বফল জিনি দেখিতে অধরখানি,
কিবা যে কহিব তার আভা।
কিবা সে দশনের জ্যোতি যেন মুকুতার পাঁতি,
মনোহর অতি তাহে শোভা॥
দুসতি তেসতি হার গলেতে শোভিত তার,
অতি শোভা সোনার হাঁসলী।
মুকুতা প্রবাল জাল শোভা ত পাইছে[১] ভাল,
হৃদে দোলে হেমের মাদুলী॥
রজত পাসলি পায়ে, গেট্যামল শোভা তাএ,
পাতামল অতি শোভা তার।
বিরাজিত তার মাঝে[২] রতন নূপুর বাজে
দুই ভুজে কনকের তাড়॥

১। পাঠ 'শোভিত পাএছে।' ২। ঐ 'তার মাঝে বিরাজিতে।'

কনক কঙ্কণ করে, চলি টলমল করে,
শোভে শঙ্খ শ্রীরামলক্ষ্মণ।
তাহার উপরে বেড়া বাজুবন্দ ছড়া ছড়া,
আঙ্গুলে অঙ্গুরী সুশোভন ॥
চলিতে নূপুর বাজে, গাট্টা-বউলি কানে সাজে,
নাকেতে বেসর বৌলি রত।
ভালেতে সিন্দুর শোভা প্রভাতে ভানুর আভা,
বিন্দু বিন্দু চন্দনে বেষ্টিত ॥
কুন্তীনন্দন-মূলে বেশ বেণী ঢেড়ী দোলে,
লোটন শোভিত নানা ফুলে।
যেন তিমিরবিনাশিনী দীপ্ত করে মহীমণি •
তেনমতি জাদ পীঠে দোলে ॥
সদা সই সন্ধি মেলা, হাতে টুকুই কৌড়ি ডালা,
অবিরত নানা খেলা করে।
করে নানা উপভোগ, নাই দুখ শোক রোগ,
বাড়িতে লাগিল বাপঘরে ॥

ভণিতা—
নিরঞ্জনের মহিমা কহনে না যায়।
ময়ূর ভট্টে বন্দিয়া হৃদয়রাম গায় ॥[১]

মাণিকরাম গাঙ্গুলির[২] পিতার নাম গদাধর, মাতার নাম কাত্যায়নী। পিতামহ সুদাম, বৃদ্ধ প্রপিতামহ গোপাল। ইঁহারা ছিলেন বাঙ্গাল গাঙ্গুলি গাঁই। বাসস্থান ছিল বর্ত্তমান হুগলী জেলা আরামবাগ মহকুমায় বেলডিহা (অধুনা বেল্‌টে) গ্রামে। মাণিকরামেরা ছয় ভাই এক ভগিনী, তাঁহাদের নাম যথাক্রমে দুর্গারাম, মুক্তরাম, ছকুরাম, রামতনু, নয়ান ও অভয়া। মাণিকরাম জ্যেষ্ঠ। গ্রন্থসমাপ্তির

১। বীরভূমবিবরণ ৩, পৃ ১৯২-৯৩।
২। মাণিকরামের ধর্ম্মমঙ্গল বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে (১৩১২)। মুদ্রিত গ্রন্থে বহু পাঠপ্রমাদ আছে।

কালে সহোদরা জীবিত ছিলেন না বলিয়া বোধ হয়। মাণিকরামের তিন পুত্র—কাশীনাথ, বিশ্বনাথ ও রমানাথ। পত্নীর নাম শৈব্যা।

গোপাল গাঙ্গুলি-সুত গাঙ্গুলি সুদাম। তদাত্মজ বিখ্যাত অনন্তরাম নাম॥
তদাত্মজ গদাধর গুণে অকুপার। শীতলসিংহ সদাই আপনি সখা যার।
এই নিবেদন করি ও রাঙ্গা চরণে। কাশীনাথে বিশ্বনাথে রাখিবেক মনে॥
রমানাথে রক্ষা কর রাজরাজেশ্বর। ও রাঙ্গা চরণে প্রভু মাগি এই বর॥
পতিতপাবন নাম শুনেছি পুরাণে। অন্তকালে দিও স্থান অভয়চরণে॥
বাঙ্গাল গাঙ্গুলি গাঞি বেলডিহায় ঘর। পিতামহ অনন্তরাম পিতা গদাধর॥ পৃ১১।

বাঙ্গাল গাঙ্গুলি গাঞি পিতা গদাধর। স্বসাহীন সম্প্রতি ছয় সহোদর॥
দুর্গারাম দ্বিতীয় বিখ্যাত গুণধাম। মুক্তরাম তৃতীয় চতুর্থ ছকুরাম॥
রামতনু পঞ্চম রসিক রসে পূর্ণ। সর্ব্বানুজ নয়ান সকলে ধন্য ধন্য॥
এক কন্যা অভয়া আখ্যাত অতি ভব্যা শান্তমতি সুলক্ষণা সীমন্তিনী শৈব্যা[১]॥
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে কাত্যায়নী-সুত। সত্যগুণে ধর্ম্ম জাগে সদয় সদত॥ পৃ ২২৭।

গ্রন্থসমাপ্তির কাল মাণিকরাম এই হেঁয়ালীতে প্রকাশ করিয়াছেন—

শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ সহ যুগ পক্ষ যোগ তার সনে॥
বারে হল মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।
শর্ব্বরী শরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল গীত॥

ইহা হইতে রায় শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন বাহাদুর ১৪৬৯ শকাব্দ পাইয়াছিলেন।[২] শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ দত্ত মহাশয় ১৪৮৯ অথবা ১৫২৯ শকাব্দ পাইয়াছেন।[৩] কিন্তু শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় বিচার করিয়া ১৭০৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৮১ খ্রীষ্টাব্দ পাইয়াছেন।[৪] এই গণনায় মাস বার তিথি নক্ষত্র সব মিলিয়া যায়। "১৭০৩ শকের পাঁজি গণিয়া দেখি, ঠিক তাই। সেদিন মঙ্গলবার

১। মুদ্রিত পাঠ 'শাখা।' ২। ব-সা-প-প ১৩, পৃ ১০-১১। ৩। ঐ ৩৫, পৃ ২৫-২৬। ৪। ঐ ১৫, পৃ ৪৭ হইতে; প্রবাসী পৌষ ১৩৩৬, পৃ ৩৪৮-৪৯।

(মহীপুত্র), কৃষ্ণাষ্টমী ৬১ দণ্ড, ২৩ নক্ষত্র ২৮ দং গতে ২৪ নক্ষত্র।"[১] কবির বংশলতা বিচার করিলেও প্রায় এই কালই পাওয়া যায়।

যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে মাণিকরাম ষোড়শ শতাব্দীর লোক ছিলেন তাঁহারা নিশ্চয়ই মাণিকরামের কাব্যের ভাষা ও ভাব উত্তমরূপে বিচার করিয়া দেখেন নাই। সত্য বটে, পুঁথি আধুনিক হইলে ভাষাও কতকটা পরিমাণে আধুনিক হইতে বাধ্য। তাহা হইলেও একথা ভুলিলে চলিবে না যে এই আধুনিকতাপ্রাপ্ত ভাষা তাহার পূর্ব্বতন রূপ হইতে একেবারে বিচ্ছিন্ন হইতে পারে না। অর্থাৎ এই আধুনিক ভাষাকে সহজেই প্রাচীন ভাষায় রূপান্তরিত করা চলে এবং তাহাতে ছন্দোভঙ্গ হয় না। বাঙ্গালায় মধ্যমপুরুষে আপনি শব্দের প্রয়োগ অত্যন্ত অর্ব্বাচীন, মাণিকরামের লেখায় এই প্রয়োগ পাইতেছি—

যদি বল আপনি আমাকে দেশে যেতে।
নিবেদি সে কর্ম্ম না হবে আমা হতে॥ পৃ ১৪ ॥

ভাবের দিক দিয়া দেখিলে দেখি মাণিকরামের কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীসুলভ অত্যন্ত গ্রাম্যতা দোষদুষ্ট।

ইহা ছাড়াও কতকগুলি হেতু আছে যেগুলি কাব্যটির আধুনিকতা নিঃসন্দিগ্ধ-রূপে প্রতিপন্ন করিতেছে। যথা—

(১) বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের উল্লেখ [পৃ ৬]। বিষ্ণুপুরে মদনমোহনদেবের প্রতিষ্ঠা হয় ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দে।

(২) রূপরামের উল্লেখ [পৃ ১৮৪, ২০৯]। পূর্ব্বে দেখা গিয়াছে, রূপরামকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্বে লওয়া যায় না।

(৩) রাধার কলঙ্কভঞ্জন কাহিনীর বিবরণ [পৃ ১৫৩]। আজ পর্য্যন্ত কোন ষোড়শ অথবা সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত কোন গ্রন্থে বা পদে এই কাহিনীর উল্লেখ পাওয়া যায় নাই।

(৪) সুরিক্ষার বশীকৃত ভৃত্যদিগের যে নাম দেওয়া আছে তাহার মধ্যে

১। প্রবাসী পৌষ ১৩৩৬, পৃ ৩৪৮-৪৯।

কাশীরাম চণ্ডীদাস ঘনরাম ইত্যাদি কয়জন সুপরিচিত পূর্ব্ববর্ত্তী কবিও আছেন। কবি যে ঘনরামের কাব্যের সহিত পরিচিত ছিলেন তাহার স্বতন্ত্র প্রমাণ আছে।

রূপরাম-সীতারামের পন্থানুসরণে মাণিকরাম যে ধর্ম্মানুগ্রহ ও গ্রন্থোৎপত্তি-বিবরণ দিয়াছেন তাহা নিম্নে দেওয়া গেল।

যেরূপে করিলা কৃপা জগৎবল্লভ। শুন শুন বন্ধুজন নিবেদিএ সব ॥
পাঠার্থে ভ্রমণ করে বুলি দেশে দেশে তুঙ্গাড়ি গেলাম তর্ক পড়িবার আশে ॥
আরম্ভ করিতে পাঠ একমাস গেল। বিষম ধর্ম্মের মায়া বিয়োগ হইল ॥
দেখিলাম রাত্রিকালে দুর্ঘট স্বপন। মায়ের হয়েছে হেথা অকালমরণ ॥
উচ্চৈঃস্বরে কান্দিয়া কপালে মারি ঘা। কি হইল হায় হায় কোথা গেলে মা ॥
শিরোদেশে বসে এক ব্রাহ্মণসন্তান। প্রবোধ করেন মোরে কহিয়া পুরাণ ॥
নিয়তি খণ্ডিতে নারে হরি হর ধাতা। মা বাপে লইয়া ঘর কে করেছে কোথা ॥
শরণপঞ্জর ধর্ম্ম সবাকার গতি। মঙ্গল হবে করগে তার প্রতি মতি ॥
না কান্দ না কান্দ বাছা নিদ্রা ত্যেজে উঠ। ভট্টাচার্য্যে কহিয়া ভবনে যাহ ঝট ॥
স্বপ্ন দেখে সবিস্ময় সুখ নাহি মনে। প্রভাত হইল রাত্রি পরম যতনে ॥
বিদায় হইয়া আমি লয়ে খুঙ্গি পুঁথি। উভ রড়ে ধেয়ে যাই অতি শীঘ্রগতি ॥
বেতানলে উপনীত বেলা দণ্ড ছয়। দৈবে নদী পার হয়ে দিশেহারা হয় ॥
সূর্য্য-অভিমুখ করে গমন সত্বর। খাঁটুল পৌছিতে হল ক্ষীণ কলেবর ॥
কপালে থাকিলে লেখা কালে এসে ঘটে। এক দ্বিজের সঙ্গে দেখা দেশাড়ার[১] মাঠে ॥
পূর্ব্বমুখে তরুতলে দাণ্ডাইয়া পথে। অপূর্ব্ব অদ্ভুতমূর্ত্তি আশাবাড়ি হাতে ॥
অতিবৃদ্ধ অনন্যবচন অতি স্থির। দেখিতে দেখিতে হল যুবত্ব শরীর ॥
পরিচয় পালাম পণ্ডিত বিচক্ষণ। আভাষে কিঞ্চিৎ হল শাস্ত্র-আলাপন ॥
বাহুল্য করিয়া মোরে কহিলেন নাম। রাজ্যধর বিদ্যাপতি রঞ্জাপুরে ধাম ॥
সঙ্গোপনে কহিলেন সাবধান হইবে। অধ্যয়ন করিতে আমার কাছে যাবে ॥
জগতে তোমার যশ হবেক যেরূপে। সেই বিদ্যা দিব আমি সত্যের স্বরূপে ॥
অগ্রসর হয়ে যাও কহিলেন হেসে। আমিহ এলাম তিনি রহিলেন বসে ॥

১। পাঠ 'দেশতা।'

আঁখি পালটিতে হল অন্ধকারময়। বিপ্রে না দেখিয়া বড় হইলাম বিস্ময় ॥
বৃক্ষমূলে বসিলাম রেখে খুঙ্গি পুঁথি। এক জনা পণ্ডিত আসিয়া উপনীতি ॥
ধর্ম্মের পাদুকা দুটি বাঁধা আছে গলে। বসিলা বিশ্রাম আশে সেই বৃক্ষতলে ॥
জিজ্ঞাসা করিল মোরে যতনে ত্বরিতে। রাজ্যধর বিদ্যাপতি গেলা এই পথে ॥
কি হেতু তাঁহাকে খোঁজ কিবা প্রয়োজন। পণ্ডিত কহেন তবে প্রভূত বচন ॥
চিনিতে নারিছ বাছা দ্বিজবর কেবা। পদ্মতুল্য সম্প্রতি পাদুকা কর সেবা ॥
পরে তাঁর পরিচয় পাবে অচিরাৎ। সত্য মিথ্যা মোর কথা বুঝিবে সাক্ষাৎ ॥
চমকিত হল শুনে চাহি চারি পানে। দিব্য এক সরোবর দেখি সন্নিধানে ॥
পাড়ে গিয়া দেখিলাম পীযূষতুল্য জল। প্রফুল্ল হইয়া আছে পদ্ম শতদল ॥
পূজিব প্রভুর পদ প্রেমানন্দমতি। তোয়ে নেবে তামরস তুলিলাম কতি ॥
সচেল করিয়া স্নান গমন সত্বর। ফিরে চেয়ে দেখি ফের নাই সরোবর ॥
এখনে পণ্ডিত নাই নাহিক পাদুকা। বৃক্ষমূলে বসিয়া বিয়োগ ভাবি একা ॥
ধ্যান করি তখন ধর্ম্মায় নমঃ বলে। সে পদ্ম অ[তঃ]পর সলিলে দিলাম ফেলে ॥
বেলা-অবসান কালে উপনীত বাসে। রঞ্জাপুরে যাই তার তৃতীয় দিবসে ॥
হাজিপুর পার হৈয়া হলাম ত্বরিত। তারামুনি তীরে গিয়ে তূর্ণ উপনীত ॥
পূর্ব্বরূপ সেই বিপ্র দাঁড়াইয়া পথে। আশাবাড়ি নাহিক দারুণ বাড়ি হাতে ॥
নির্জ্জন নিভৃত স্থানে নাহি লোকজন। সমীপে আ[ই]লেন দ্বিজ সাক্ষাৎ শমন ॥
বধিয়া তোমাকে আজি বাড়ির নির্বৃ্তি। কাতর হইয়া কত করিলাম স্তুতি ॥
দ্বিজ হইয়া দস্যুবৃত্তি দেখি বিপরীত। আমি কি বুঝাব তুমি আপনি পণ্ডিত ॥
বিপ্র কন তোর পারা না দেখি বর্ব্বর। দস্যুবৃত্তি করেছেন বাল্মীকি মুনিবর ॥
বুঝি তোর আজ হল বিঘোর মরণ। এত শুনি মোর হল অঝোর নয়ন ॥
বিনয় করিয়া বহু বলিলাম শেষে। তোমার নিকট যাই অধ্যয়ন আশে ॥
ঈষৎ হাসিয়া তবে কহিলেন দ্বিজ। হাজিপুর যাই আমি আছে কিছু কাজ ॥
তুমি যাও বস গিয়া আমার ভবনে। না করিব বিলম্ব [আমি] আসিব এক্ষণে ॥
বিমুখ হৈয়ে দেখি না দেখিয়ে বিপ্র। তরাসে গেলাম ছুটে রঞ্জাপুর ক্ষিপ্র ॥
জনে জনে জিজ্ঞাসা করিলাম ঘরে ঘরে। রাজ্যধর বিদ্যাপতি নাই রঞ্জাপুরে ॥

ব্যামোহ বিস্তর পেয়ে ফিরে এলাম ঘর। যথোচিত চিন্তায় উৎকট হল জ্বর ॥
শয়নমন্দিরে শুয়ে শয়নে অধৈর্য্য। দেখিলাম শিরোদেশে বসে সেই দ্বিজ ॥
কহেন কিসের চিন্তা কিসের ব্যামোহ। উঠ বাছা আমার বচনে মন দেহ ॥
গীত রচ ধর্ম্মের গৌরব হবে বাড়া। নকল লেখিয়া দিব লাউসেনী দাঁড়া ॥
জিজ্ঞাসা করিলাম আমি তুমি বট কেবা। দ্বিজ কন দেশাড়ায় কৈলে যার সেবা॥
বিশ্বের কারণ আমি বাঁকুড়ারায় নাম। না করিবে প্রকাশ হইবে সাবধান ॥
... ...
সত্য কর কবিতা করিবে সুনিশ্চয়। তবে মোর তথাস্তু প্রত্যয় মনে হয় ॥
অঙ্গীকার করিলাম অনেক যতনে। ভক্তিরস্তু মম পদে ভগবান ভণে ॥
বারদিনে সমাপ্ত হইবেক বারমতি। বিলম্ব করহ যদি হবেক বিগতি ॥
নিজ বীজমন্ত্র লিখি দিলেন নকল। ইহা দেখে কবিতা রচিবে অবিকল ॥
গায়েন হবেক তোর চতুর্থ সোদর। জগৎ ভরিয়া যশ হবেক বিস্তর ॥
এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ। জাতি যায় তবে প্রভু যদি করি গান ॥
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে। স্বপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে ॥
জগৎ-ঈশ্বর কন আমি তোর জাতি। তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি॥
আমি যার সহায় এতেক ভয় কেন। ময়ূর ভট্টের কথা মন দিয়া শুন ॥
বৈকুণ্ঠে রেখেছি তারে বিষ্ণুভক্তি দিয়া। অদ্যাপি অপার যশ অখিল ভরিয়া ॥
স্বপক্ষে বিপক্ষে আমি করিব সমান। এতেক বলিয়া প্রভু হৈলা অন্তর্দ্ধান ॥
দুর্ব্বোধ বুঝিতে নারে দেবতার মায়া। এইরূপে অকিঞ্চনে করিলেন দয়া ॥

ঘনরামের মত মাণিকরামও অনুপ্রাসের বড় ভক্ত ছিলেন। উৎকট তৎসম শব্দ প্রয়োগ করায় মাণিকরামের রচনা অনেকস্থলে বিসদৃশ হইয়া পড়িয়াছে। যেমন,

তোয়ে নেবে তামরস তুলিলাম কতি ॥
নিম্নাপের মীন যেন ঘেরা গেল জালে ॥
গেল নাই জন্য ত্যেজে যুঝে হয়্যা যুঞ্জ ॥
স্নান করে চপলে চড়ায়ে দেই পাক।
অহ হল অতীত অতিথি অগ্রবাক্ ॥

চাঁপায়ের চারি ঘাট চামীকরে বাঁধা।

অম্ভোরুহ-অঙ্ঘ্রি-যুগে আমার প্রণাম॥

পশ্চিমে উদয় হল পূর্ব্বের পূষণ। ইত্যাদি।

দুই একস্থলে, বিশেষ করিয়া প্রবাদগুলিতে, বাগ্‌ভঙ্গি মন্দ নহে। যেমন,

বাউটা হরিণ যেন চারিপানে চায়।

যেই অঙ্গে দৃষ্টি পড়ে সেই অঙ্গে রয়।

বরণ-বৈশাখ চাঁপা বচন পীযূষ॥

পিপীলা পালক বাঁধে মরিবার তরে॥[১]

মনে ভয় মাথা হেট মুখে করে আঁট।

কঠিন যাঁতির কাছে গুয়া কত ডাঁট॥

চাকর কুকুর তুল্য ডাকে কেন এত॥ ইত্যাদি।

মাণিকরামের কাব্যে মধ্যে মধ্যে বেশ সরসতা আছে। যেমন, কামদল "বাঘটা বৈষ্ণব বড়, বুঝিলেক মনে" যে হরপার্ব্বতী তাহার উপর তুষ্ট হইয়াছেন। সে তাঁহাদের স্তব করিলে "হরিভক্তি মাগ বাছা, হৈমবতী কন।" ইহাতে

বাঘ বলে বাঁচি নাই বড়ই বিতথা।

এ সময় হরিভক্তি হেন ছার কথা॥

আমার উসব জ্ঞান অবধিয়া (?) গেছে।

কৃপা করি কহিবে কিসেতে প্রাণ বাঁচে॥

মাণিকরাম ভক্তিমান্ বৈষ্ণব ছিলেন, ইহা তাঁহার কাব্য পড়িলে স্পষ্টই বোঝা যায়। ঘনরামের কাব্যেও বহু বহু স্থলে শ্রীকৃষ্ণলীলার উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু মাণিকরামের কাব্যে তাহা পাতায় পাতায় পাইতেছি।

"দ্বিজ" ক্ষেত্রনাথ রচিত ধর্ম্মমঙ্গলের আদ্যন্তখণ্ডিত পঞ্চপত্রাত্মক একটি পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রক্ষিত আছে।[২] পুঁথির লিপি অর্ব্বাচীন।

১। তুলনীয় মুকুন্দরাম, 'পিপীড়ার পাখা উঠে মরিবার তরে।' ২। পুঁথি ১৬৫১।

কবির ভণিতার এইরূপ—

এইরূপে রক্ত নিল ভরিল শরায়।
ধর্ম্মমঙ্গল দ্বিজ ক্ষেত্রনাথে গায়॥

বন্দ্যঘটীয় গোবিন্দরামের ধর্ম্মমঙ্গল কাব্যের প্রাচীনতম পুঁথির লিপিকাল হইতেছে ১০৭১ মল্লাব্দ অর্থাৎ ১৭৬৩-৬৫ খ্রীষ্টাব্দ।[১] ভণিতা এইরূপ—

বন্দিয়া ধর্ম্মের পাদপদ্ম স্থকোমল।
রচিল গোবিন্দ্য বন্দ্য ধর্ম্মের মঙ্গল॥

রামনারায়ণ রচিত ধর্ম্মমঙ্গলের ১১৯৩ সালে লিখিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[২] কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার নাম ছিল রামকৃষ্ণ।

ভরসা কেবল শ্রীধর্ম্মের পদাম্বুজ।
গায় রামনারায়ণ রামকৃষ্ণানুজ॥

নিধিরাম গাঙ্গুলি কবিচন্দ্রের অনাদিমঙ্গলের অসম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৩]

নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় লিখিয়াছেন যে তিনি প্রভুরামের ধর্ম্মমঙ্গলের প্রায় তিনশত বৎসরের পুরাণো পুঁথি দেখিয়াছিলেন।[৪] এ পুঁথির সংবাদ আর কিছু পাওয়া যায় নাই।

১। বঙ্গসাহিত্য পরিচয় ২, পৃ ৩৭৯-৮৪।
২। ঐ, পৃ ৪২১-৩৬।
৩। ব-সা-প পুঁথি ৩৯৪ (দাস সংগ্রহ)
৪। বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ৩৫।

চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শিবায়ন কাব্য ঃ রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী

রামেশ্বর চক্রবর্ত্তী (ভট্টাচার্য্য) অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি। ইঁহার রচিত দুইখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে—শিবায়ন[১] ও সত্যনারায়ণের পাঁচালী।[২] "দ্বিজ" রামেশ্বর প্রণীত একটি গোবিন্দমঙ্গল কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, তবে এই রামেশ্বর অন্য কবি হইতেও পারেন।[৩]

রামেশ্বরের পিতার নাম লক্ষ্মণ চক্রবর্ত্তী, পিতামহ গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী, পিতামহ নারায়ণ চক্রবর্ত্তী। ইঁহারা ভট্টনারায়ণ-বংশীয় কেশরকোণীয়-গ্রামীণ ব্রাহ্মণ। মাতার নাম রূপবতী, ভ্রাতার নাম শম্ভুনাথ। রামেশ্বরের দুই বিবাহ, এক পত্নীর নাম সুমিত্রা অপর পত্নীর নাম পরমেশ্বরী। কাব্য মধ্যে রামেশ্বর ভাগিনী ভাগিনেয় ও ভাগিনেয়ীপুত্রেরও নাম করিয়াছেন। কবি পরমানন্দ ও হৃদয়রাম নামক দুই জনের উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা কি কবির পুত্র, না অন্য আত্মীয়? রামেশ্বরের আদি বাস ছিল মেদিনীপুর জেলায় বরদাবাটী বা বরদা পরগনার অন্তর্গত যদুপুর গ্রামে। পরে ইনি অযোধ্যানগরে গিয়া বাস করেন। এই অযোধ্যানগর মেদিনীপুরের নিকটবর্ত্তী কর্ণগড়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

সত্যনারায়ণের পাঁচালী শিবায়নের পূর্ব্বে রচিত হয়, কবি তখনও যদুপুরে

১। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত (১২৯৩)। ২। অক্ষয় চন্দ্র সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১২৮৫ ?) ; পরে বহু সংস্করণ হইয়াছে।

৩। র-সা-প-প ২, পৃ ১৮৪-৮৫। এই পুঁথিখানি বৃহৎ, ১৩৪ পত্রাত্মক। অনুলিপির কাল ১৭১৪ শকাব্দ ১১৯১ সাল। পুঁথির শেষ এইরূপ—

এহেন মঙ্গল যেবা ভক্তি করি শুনে। তবে তার ইষ্টদেব রাখিব চরণে॥
সপ্তম দিবসে গীত গায় গুণিজনা। বিভার স্বরূপ দিব ইহার দক্ষিণা॥
সবাকারে দয়া কর ভকতবৎসল। সম্পূর্ণ হইল পুঁথি গোবিন্দমঙ্গল॥
... ...
জন্মে জন্মে নারায়ণ না হইবে বাম। কহে দ্বিজ রামেশ্বর করিয়া প্রণাম॥

বাস করিতেছেন। আর শিবায়নের রচনার সময় তিনি কর্ণগড়ের রাজা রামসিংহ ও তাঁহার পুত্র যশোমন্ত সিংহের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন।

শিবায়ন ও সত্যনারায়ণের পাঁচালী হইতে কবির আত্মপরিচয়জ্ঞাপক অংশগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

ভট্টনারায়ণ মুনি- সন্তান কেসরকনি যতি চক্রবর্ত্তী নারায়ণ।
তস্য সুত কৃতকীর্ত্তি গোবর্দ্ধন চক্রবর্ত্তী, তস্য সুত বিদিত লক্ষ্মণ॥
তস্য সুত রামেশ্বর, শম্ভুরাম সহোদর, সতী রূপবতীর নন্দন।
সুমিত্রা পরমেশ্বরী পতিব্রতা দুই নারী, অযোধ্যানগর নিকেতন॥
পূর্ব্ববাস যদুপুরে হেমৎসিংহ ভাঙ্গে যারে, রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিকীতটে করিয়া পুরাণ পাঠে রচাইল মধুব সঙ্গীত।[১]

সাকিম বরদাবাটী যদুপুর গ্রাম।
... ...
রচিল লক্ষ্মণাত্মজ দ্বিজ রামেশ্বর।
সনাতনে শুদ্ধমতি শম্ভুসহোদর॥[২]

শম্ভুনাথ ভায়ার ভরণ কর প্রভু। পদছায়া দিহ মোরে ছেড় নাহি কভু॥
গৌরী পার্ব্বতী সরস্বতী স্বসাত্রয়। দুর্গাচরণাদি করি ভাগিনেয় ছয়॥
ভাগিনেয়ীপুত্র কৃষ্ণরাম বন্দ্যঘটী। এ সকলে সুকুশলে রাখিবে ধূর্জ্জটি॥
সুমিত্রার শুভোদয় পরেশীর প্রিয়। পরকালে প্রভু পদতলে স্থান দিহ॥
পরমানন্দের কর পরম আনন্দ। হৃদয়রামের কর সকল সচ্ছন্দ॥[৩]

রঘুবীর মহারাজা রঘুবীর সমতেজা ধার্ম্মিক রসিক রণধীর।
যাহার পুণ্যের ফলে অবতীর্ণ মহীতলে রাজা রামসিংহ মহাবীর॥
তস্য সুত যশোমন্ত- সিংহ সর্ব্বগুণযুত শ্রীযুত অজিত সিংহের তাত।
মেদিনীপুর অধিপতি, কর্ণগড়ে অবস্থিতি ভগবতী যাহার সাক্ষাৎ॥

১। শিবায়ন, পৃ ১৭৫-৭৬। ২। সত্যনারায়ণের পাঁচালী, পৃ ৩, ১৬।
৩। শিবায়ন, পৃ ৩৪১।

রাজা রণে ভৃগুরাম, দানে কর্ণ রূপে কাম, প্রতাপে প্রচণ্ড যেন রবি।
শক্রের সমান সভা জ্বলন্ত পাবকপ্রভা সুবেষ্টিত পণ্ডিত সৎকবি॥
দেবীপুত্র নৃপবরে স্মরণে পাতক হরে, দরশনে আনন্দ বর্দ্ধন।
তস্য পোষ্য রামেশ্বর তদাশ্রয়ে করি ঘর বিরচিল শিবসঙ্কীর্ত্তন॥[১]

সত্যনারায়ণ পাঁচালী কাব্যের রচনাকাল জানা যায় না। শিবায়ন ১৬৩২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১০-১১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।

শকে হল্য চন্দ্রকলা রাম করতলে[২]।
বাম হল্য বিধিকান্ত পড়িল অনলে॥
সেই কালে শিবের সঙ্গীত হল্য সারা।
অবনীতে হল্য যেন অমৃতের ধারা॥[৩]

শিবায়নের কয়েকটি উপাখ্যান কবি দুই একটি পুরাণ হইতে গ্রহণ করিয়াছেন, ইহা ভণিতায় উল্লেখ করিয়াছেন।

চতুর্দ্দশাধ্যায় পদ্মপুরাণে প্রকাশ। পৃ ১২৭।

ভাবিয়া শ্রীভাগবত ভাষিল ব্যাসের মত
লক্ষ্মণজ শম্ভুসহোদর॥ পৃ ১৪২।

বিরচে রামেশ্বর শ্রীনন্দিকেশ্বর-
পুরাণ সুসঙ্গত যথা॥ পৃ ১৮৬।

ভণে রামেশ্বর নন্দিকেশ্বরের মত।
এত দূরে সাঙ্গ হৈল শিবরাত্রি ব্রত॥ পৃ ১৯৮।

রামেশ্বরের কাব্যের সাধারণ ভণিতা এইরূপ—

মধুক্ষর মনোহর মহেশের গীত।
রচে রাম রাজা রামসিংহ প্রতিষ্ঠিত॥

১। শিবায়ন, পৃ ৬, প্রবাসী পৌষ ১৩৩৬, পৃ ৩৪৮।

২। পাঠান্তর 'কল্য কোলে।' ৩। বঙ্গবাসী সংস্করণে এই পয়ার দুইটি নাই। সম্পাদক ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় ভূমিকায় বলিয়াছেন যে ১২৬০ সালে (১৭৭৫ শকে) সংবাদপূর্ণচন্দ্রোদয় যন্ত্রে মুদ্রিত সংস্করণে আছে। ১২৭৬ সালে মুদ্রিত এক সংস্করণেও আছে [ব-সা-প-প ৬, পৃ ৩৭]।

চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্র কাব্য ভণে রামেশ্বর॥ ইত্যাদি।

শিবসঙ্গীতকে রামেশ্বর গ্রাম্যতা হইতে উদ্ধার করিয়া যথার্থই ভদ্রকাব্য করিয়াছেন।

রামেশ্বরের শিবায়ন কাব্যের বিস্তৃত স্থচী দেওয়া গেল।

গণেশ বন্দনা, শিব বন্দনা, নারায়ণী বন্দনা, চৈতন্য বন্দনা, সর্ব্বদেব বন্দনা। অথ প্রথমদিবসীয় নিশাকালে স্থাপনা পালারম্ভ : গ্রন্থের স্থচনা (মুক্তি ও হরিভক্তি লাভ এবং নানা উপাখ্যান পরিচয়), স্থত প্রতি প্রশ্ন, স্থতের কথারম্ভ, স্থষ্টির দেবতা (মহাবিষ্ণু হইতে তিন দেবের এবং আদ্যাশক্তি হইতে তিন দেবীর উৎপত্তি), স্থষ্টিপ্রকরণ, পৃথিব্যাদির উৎপত্তি। দ্বিতীয়দিবসীয় পালারম্ভ : দক্ষযজ্ঞ, শিবের নিকট নারদের গমন, দক্ষযজ্ঞে সতীর গমনোদ্যোগ, সতীর দক্ষালয়ে গমন, শিবনিন্দায় সতীর দেহত্যাগ, নন্দীর সহিত দক্ষসেনার সংগ্রাম, বীরভদ্রের সহিত দক্ষসেনার সংগ্রাম, দক্ষসেনা নাশ, দক্ষযজ্ঞ নাশ, দক্ষের ছাগমুণ্ড। তৃতীয়-দিবসীয় দিবাপালা আরম্ভ : হিমালয়ে গৌরীর জন্ম, গৌরীর বাল্যলীলা, গৌরীর লীলাবিবাহ দান, লীলাবিবাহে বরকন্যা বিদায়, গৌরীর বিবাহ বিবরণ, বিবাহ সম্বন্ধ, হিমালয়গৃহে শিবের গমন, মহাদেবের তপস্যাভঙ্গ ও মদনভস্ম, রতির বিলাপ, রতির প্রতি সরস্বতীর আশ্বাস, ভগবতীর তপস্যা, ভগবতীর প্রতি হিতোপদেশ, মহাদেবের মহিমা ব্যক্ত, শিবের বরসজ্জা। নিশা পালা আরম্ভ : শিবের বরযাত্রা, অধিবাসাদি নান্দীমুখের বিবরণ, এয়োগণের নাম, স্ত্রী-আচার, শিবের মূর্ত্তি দর্শনে মেনকার খেদ, শিবের মদনমোহন মূর্ত্তি ধারণ, শিবরূপের প্রশংসা, শ্বাশুড়ীদিগের জামাই নিন্দা, কন্যাসম্প্রদান, বরকন্যার যৌতুক। চতুর্থদিবসীয় দিবা পালা আরম্ভ : শিবের শ্বশুরালয়ে বাস, শিবের কোঁচনীপাড়ায় প্রবেশ, শিবের ভিক্ষায় গমন, কাত্তিক গণেশের কোন্দল, ভগবতীর রন্ধন, পিতাপুত্রের ভোজন, কৈলাসের শোভা, হরপার্ব্বতীর কোন্দল, ঝুলি হইতে রত্নপ্রাপ্তি, হরপার্ব্বতীর রসস্যালাপ। নিশা পালা আরম্ভ : শিব কর্ত্তৃক তত্ত্ববার্ত্তা কথন, শিব কর্ত্তৃক সতীর গুণ কথন, হরিনাম মাহাত্ম্য ও দিলীপ উপাখ্যান, নামমাহাত্ম্য ও রুক্মিণীর ব্রতবিবরণ, হরিনাম-

মাহাত্ম্য, নামমাহাত্ম্যে জয়ন্তী উপাখ্যান, বিষ্ণুদূত এবং যমদূতের যুদ্ধ, যমের সহিত দূতদিগের কথা, রামনামের মাহাত্ম্য, শবর উপাখ্যান, শবরকে বরদান। পঞ্চম-দিবসীয় দিবা পালা আরম্ভ : রুক্মিণীহরণ বৃত্তান্ত, রুক্মিণীর বিবাহোদ্যোগ, রুক্মিণীর লিপিবৃত্তান্ত, রুক্মিণীহরণার্থ কৃষ্ণের যাত্রা, রুক্মিণীর বিবাহে নান্দীমুখ ক্রিয়া, রুক্মিণীর খেদ, বৈদর্ভনগরে কৃষ্ণের আগমন, রুক্মিণীর বরপ্রার্থনা, রুক্মিণীর রূপ, রুক্মিণীহরণ, রাজগণের সহিত যুদ্ধ, রুক্মের যুদ্ধ, রুক্মিণীসহ কৃষ্ণের দ্বারকা যাত্রা। নিশা পালা আরম্ভ : বিস্তৃতভাবে বাণ রাজার উপাখ্যান। ষষ্ঠদিবসীয় দিবা পালা আরম্ভ : বৃকাসুরের উপাখ্যান, পার্ব্বতীর ধর্ম্ম জিজ্ঞাসা, শিবরাত্রের বিধি, ব্যাধের মৃগয়ায় গমন, ব্যাধ কর্ত্তৃক শিবপূজা, ব্যাধের পরলোকপ্রাপ্তি, শিবদূত ও যমদূতে যুদ্ধ, ব্যাধের শিবলোকে গমন, যমের সহিত নন্দীর কথা, শিবরাত্রি ব্রতপ্রতিষ্ঠা, যমের সহিত নন্দীর কথা, একাদশীমাহাত্ম্য কথন। নিশা পালা আরম্ভ : চাষের বিবরণ, ব্যবসায়ের বিচার, হরপার্ব্বতীর বাক্‌কলহ, শূলের গুণ বর্ণন ও চাষের সজ্জা, চাষের উদ্যোগে শিবের গমন, ইন্দ্রের নিকট চাষভূমির পাট্টা গ্রহণ, চাষের সজ্জার নিমিত্ত শূলভঙ্গ চেষ্টা, চাষের সজ্জা প্রস্তুত করণ, বীজ ধান্যের চেষ্টা, বীজধান্য সংস্থান, শিবের চাষ করিতে গমন, শিবের চাষারম্ভ, ভীম ভৃত্যের ভোজন, শিবের ক্ষেত্রে শস্যোৎপত্তি। সপ্তমদিবসীয় দিবা পালা আরম্ভ : নারদের কৈলাস গমন সজ্জা, নারদের কৈলাসে যাত্রা, পার্ব্বতীর প্রতি নারদের মন্ত্রণা দান, শিবের নিকট উঙানি মশা ও মাছি ডাঁশ প্রেরণ, মশার উৎপাত, ভীম ভৃত্যের সহিত শিবের পরামর্শ, জোঁকের উৎপাত। বাগ্‌দিনীর পালা আরম্ভ : ভীমের সহিত বাগ্‌দিনীর কলহ, বাগ্‌দিনীর রূপবর্ণন, বাগ্‌দিনীর পরিচয়, শিবের জলসিঞ্চন, বাগ্‌দিনীকে শিবের অঙ্গুরী দান, শিবের সহিত বাগ্‌দিনীর বচনবিদগ্ধতা, ছলনান্তর বাগ্‌দিনীর প্রস্থান, শিবের কৈলাস গমন ও ভগবতীর সহিত কলহ। জাগরণ আরম্ভ : হর-গৌরীর মিলন মন্ত্রণা, ভগবতীর শঙ্খপরিধানের কথা, উমাকে ছলনা করিতে নারদের পরামর্শ, ভগবতীকে শিবের ছলনা, ঝড়বৃষ্টি, কার্ত্তিক গণেশের সহিত অম্বিকার কথা, বৃদ্ধবেশী শিবের সহিত গৌরীর সাক্ষাৎ, বৃদ্ধের সহিত গৌরীর কথোপকথন, ঈশ্বরের মায়ানদী সৃজন, তারিণীর মায়া নদী উত্তরণ, ইন্দ্রকর্ত্তৃক

রথ প্রেরণ, হিমালয় গৃহে গৌরীর আগমন, হিমালয়ে দুর্গোৎসব, শঙ্করের শঙ্খ-নির্ম্মাণ, শিবের শাঁখারী বেশ ধারণ ও শাঁখারী বেশে হিমালয় গমন, শাঁখাব নিমিত্ত নারীগণের গোলযোগ, শাঁখারীর সহিত হৈমবতীর কথোপকথন, শাঁখারার প্রতি শঙ্করীর ধর্ম্ম কথা, শাঁখারী কর্ত্তৃক সতীধর্ম্ম কথন, শঙ্খপরিধানোদ্যোগ, পদ্মার সহিত পার্ব্বতীর পরামর্শ, শঙ্খপরিধান জন্য পার্ব্বতীর সুসজ্জা, শঙ্খপরিধান আরম্ভ, দেবীর দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ পরিধান, শাঁখারী কর্ত্তৃক অম্বিকার করমর্দ্দন, শাঁখারীর পুরস্কার, দেবীর কালীমূর্ত্তি ধারণ, সপুত্র শিবের ভোজন, বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক কৃষ্ণলীলাচিত্র সম্বলিত কাঁচলী নির্ম্মাণ, দেবীর বাসর সজ্জা, শিবদুর্গার বাসর, বাসরে দেবীর বাগ্‌দিনী বেশ ধারণ, বাসর সম্পূর্ণ, হরগৌরীর কৈলাস গমন, মাত্র আড়াই হালা ধান প্রাপ্তি, শিবের আদেশে তাহাতে অগ্নি প্রদান, দগ্ধ শস্য হইতে দেবীর অনুগ্রহে পৃথিবীতে শস্য বাহুল্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবিদিগের মধ্যে রামেশ্বর অন্যতম। ইঁহার কাব্যে ভারতচন্দ্রের মত ভাষার চটক নাই সত্য, কিন্তু সহানুভূতি এবং মানবিকতা রামেশ্বরের শিবায়নে যেমন আছে এমন অষ্টাদশ শতাব্দীর অপর কোন কবির কাব্যে পাই না। এক হিসাবে শিবায়ন চাষীর কাব্য, আদিম বাঙ্গালীর জাতীয় কাব্য। শব্দালঙ্কারের মধ্যে অনুপ্রাস খুবই আছে, কিন্তু কুত্রাপি শ্রুতিকর্কশ অথবা উৎকট নহে।

কবি যে তত্ত্বদর্শী ভক্ত লোক ছিলেন তাহার কিছু পরিচয় নিম্নোদ্ধৃত তত্ত্বকথা প্রসঙ্গে মিলিতেছে।

কতবার সংসার সংহার হয়ে গেছে। এক ব্রহ্ম সনাতন সর্ব্বকালে আছে॥
সংসার কৌতুকাগার দেখিবার তরে। একমাত্র অরূপ অশেষ রূপ ধরে॥
সূক্ষ্ম হতে স্থূল কিন্তু মায়া মূল তার। আচ্ছাদিয়া বিজ্ঞান অজ্ঞান অন্ধকার॥
অনাত্মাতে আত্মবুদ্ধি আত্মা নাহি জানে। ঘরে নিধি হারা করি খুঁজি বুলে বনে॥
চুম্বক দেহের আত্মা দেহ সহকার। অন্ধ কি দেখিতে পায় কণ্ঠে রত্নহার॥
বিজ্ঞান প্রদীপ দীপ্ত না হয় যাবৎ। জন্ম মৃত্যু সুখ দুঃখ না ঘুচে তাবৎ॥
ব্রহ্মারে বলিল বিষ্ণু বৈষ্ণবতা কর। ভগবৎভক্তি করি ভবসিন্ধু তর॥

অতএব হরিভক্তি তরিবার মূল। হরিনাম কেবল কলিতে অনুকূল॥
তার পরে যদি করে ক্রিয়াযোগ সার। কলিকালে তাহার তুলনা নাহি আর॥
পৃ ১৮-১৯॥

সত্যনারায়ণ পাঁচালী কাব্যের প্রারম্ভের বন্দনা অংশ হইতে জানা যায় যে বৈষ্ণব তত্ত্ববিচারের সহিত কবির বিশেষ পরিচয় ছিল।

সেকালের সমাজচিত্র রামেশ্বরের কাব্যে বিশেষভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিছু দৃষ্টান্ত দিই। সেকালের দিনে কন্যার মাতা জামাইয়ের নিকট কন্যার জন্য এইটুকু মাত্র সুখস্বাচ্ছন্দ্য বাঞ্ছা করিত—

কুলীনের পোকে অন্য কি বলিব আমি। কন্যার অশেষ দোষ ক্ষমা কর তুমি॥
আঁঠু ঢাকি বস্ত্র দিহ পেট ভরি ভাত। প্রীতি করো যেমন জানকী রঘুনাথ॥
পৃ ৫১॥

পার্ব্বতীর বাল্যক্রীড়া বর্ণনার মধ্যে সেকালের ছোট মেয়েদের খেলার পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।

খেলে লুকলুকানি আপনি হয়ে বুড়ি। এক চোর সভাকারে করে তাড়াতাড়ি॥
লুকাইলে খেড়ি খুঁজি ধরে সব ঠাঁই। বুড়ীকে না ছুঁলে কার পরিত্রাণ নাই॥
যাবৎ বুড়ীর পদস্পর্শ নাহি করে। পুনঃ পুনঃ ধেয়ে ধেপে পুনঃ পুনঃ ধরে॥
চক্ষু চেপে ছেড়ে দিলে পড়ে যায় ভঙ্গ। খল খল হাসে বুড়ী বসে দেখে রঙ্গ॥
খেলে দশ-পঁচিশ ছকড়া লয়ে কড়ি। দান ধর্ম্ম বুঝি দান ফেলে রড়ারড়ি॥
সাতঘরী সুন্দরী সুন্দর খেলা করে। বুড়ি বুড়ি কড়ি কত কড়া দিয়া হরে॥
খেলি ফুল ঘুটিং পুখুর দেই গায়। বেনা গাছে ঝুঁটি বেঁধে গড়াগড়ি যায়॥
আঁটুলবাঁটুল খেলে পসারিয়া পা। আর লীলাখেলা যত কত কব তা॥
পৃ ৫৩॥

গণেশ কার্ত্তিককে লইয়া শিব খাইতে বসিয়াছেন, দেবী পরিবেশন করিতেছেন।

হাসিয়া অভয়া অন্ন বিতরণ করে। ঈষদুষ্ণ সূপ দিল বেসারির পরে॥
লম্বোদর বলে শুন নগেন্দ্রের ঝি। সূপ হৈল সাঙ্গ আন আর আছে কি॥
দড়বড় দেবী এনে দিল ভাজা দশ। খেতে খেতে গিরীশ গৌরীর গান যশ॥

সিদ্ধিদল কোমল ধুতূরা ফল ভাজা। মুখে ফেলে মাথা নাড়ে দেবতার রাজা॥
উল্বণ চর্ব্বণে ফের ফুরাল ব্যঞ্জন। এক কালে শূন্য থালে ডাকে তিন জন॥
চটপট পিশিত মিশ্রিত করি যূষে। বায়ুবেগে বিধুমুখী ব্যস্ত হয়ে আইসে॥
চঞ্চল চরণেতে নূপুর বাজে আর। রণরণ কিঙ্কিণী কঙ্কণ ঝণৎকার॥
দিতে নিতে গতায়াতে নাহি অবসর। শ্রমে হৈল সজল কোমল কলেবর॥
ইন্দুমুখে মন্দমন্দ ঘর্ম্মবিন্দু সাজে। মৌক্তিকের পঙ্‌তি যেন বিদ্যুতের মাঝে॥
খরবাদ্যে সুপদ্যে নর্ত্তকী যেন ফিরে। সুরস পায়স দিল পিষ্টকের পরে॥
পৃ ৯৫-৯৬॥

শিবের চাষ চষিবার কল্পনা—

গৌরী সনে জ্ঞানগোষ্ঠে গেল কত কাল। পর্ব্বতপুত্রিকা পুনঃ পাতিল জঞ্জাল॥
শিবে বলে সেই যে সম্পত্তি দিয়াছিলে। মনে কর মহাপ্রভু কত দিন খাইলে॥
গৃহস্থের গৃহ চলে গৃহিণীর গুণে। ফেলে দিয়া পুরুষ পাসরে সে কি জানে॥
পুণ্যবান্ লোক পান লক্ষ্মীরূপা নারী। উত্তম উদ্যোগ করি উথলায় গারি॥
অভাগার ঘরে আসে অলক্ষণা মেয়ে। শতেকের গারি দেয় পঞ্চাশে উড়ায়ে॥
লঙ্কার বাণিজ্য যদি এনে দেয় ঘরে। মেয়ে হলে উলুই উড়ায় আঁখিঠারে॥
আমি আত্ম-বড়াই বাড়ায়ে কব কত। গঙ্গাধরে গোচর গৌরীর গুণ যত॥
শোধন করিয়া সর্ব্ব সাধবের[১] ঋণ। কায়ক্লেশ করিয়া কুলানু কত দিন॥
ছমাসের সম্বল এখন ঘরে আছে। ফুরাইলে ফেরে কান্ত কষ্ট পাও পাছে॥
সঞ্চ রাখি বঞ্চিবারে বাঞ্ছা কর শূলী। বসে খেতে বাঁচে নাই বারিধির বালি॥
পূর্ব্বে উদাসীন ছিলে গৃহী হৈলে এবে। আর নাকি ভিখ-মাগা শোভা করে শিবে॥
পুরুষে উপায় নাই খেতে হৈল ঢের। দিন দুটি ছেল্যায় ছড়ায় পাঁচ সের॥
বিনা অবলম্বনে কেমনে যাবে দিন। ভেবে ভেবে ভবানীর তনু হৈল ক্ষীণ॥
চিন্তিলাম চন্দ্রচূড় চাষ বড় ধন। চাষ চষ বারেক বর্ত্তুক পরিজন॥
চাষী বিনা চাষের মহিমা কেবা জানে। লঙ্কার বাণিজ্য বসি বাকুড়ির কোণে॥
পরিজন পোষে চাষী শুধে সাধু রাজা। লক্ষ্মী পোষি চাষী করে সবাকারে তাজা॥

১। অর্থাৎ সাধুর, উত্তমর্ণের।

জীবের নিমিত্ত শিবে করিবেন চাষা। এইরূপে ঈশ্বরকে ইজ্যাদির ভাষা॥
চণ্ডীর চরিত্র শুনে চাঁদে দিয়া হাত। চেয়ে রয় চন্দ্রচূড় চিন্তে জগন্নাথ॥
চন্দ্রচূড়চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর। ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর॥
চরণে ধরিয়া চণ্ডী চন্দ্রচূড়ে সাধে। নরমে গরমে কয় ভয় নাহি বাধে॥
চষ ত্রিলোচন চাষ চষ ত্রিলোচন। নহে উদাসীন হও ছাড পরিজন॥
বিপরীত নীত ভীত শুনিয়া বিস্তর। বিশদ বিষাদ ভাবি দিলেন উত্তর॥
বল বিলক্ষণ কিন্তু শুন শৈলসুতা। দেবতার পোদবৃত্তি বড়ই লঘুতা॥
ভিক্ষাদুঃখে সুখে আছি অকিঞ্চন পণে। চাষ চষে বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে॥
শুনিতে সুন্দর চাষ আয়াস বিস্তর। সকল সম্পূর্ণ যার তার নাহি ডর॥
চাষ বলে ওরে চাষী আগে তোকে খাব। মোরে খাবি পশ্চাতে যদ্যাপি ক্ষেতে হব।
অনেক আয়াসে চাষে শস্য উপস্থিত। শুখা হাজা পড়িলে পশ্চাতে বিপরীত॥
গরিবের ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা। বাব-করে সকল বেচিয়া লয় রাজা॥
ক্ষেতে দেখে খন্দ যদি খেতে নাহি পায়। কুত-কাতে কায়েত কিফাতি কবে তায়॥
কাদা-পানী খেয়ে খেটে করে চাষিপনা। নরোত্তম ছাড়ি নরাধম-উপাসনা॥
চাষ-অভিলাষ ক্ষমা কর ক্ষেমঙ্করী। আর কিছু ব্যবসায় বল তাহা করি॥
বিচক্ষণা ব্যবসায় বিচারিয়া কয়। বাণিজ্যে বসেন লক্ষ্মী সে তোমাকে নয়॥
পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল। মহেশের সেত নাহি সকলি অনুল॥
আর এক ব্যবসায় রাজসেবা আছে। সেব্য হয়ে যাবে কোন সেবকের কাছে॥

পৃ ২০২-০৫॥

বাসরে দেবীর বাগ্‌দিনীরূপ ধারণ—

বিমলা বন্দিয়া হরে বাগদিনী বেশ ধরে, পূর্ব্বরূপ সকলি লক্ষণ।
দশনে বিজুলী খেলে, গজেন্দ্র গমনে চলে, বলে বাণী বল্লকী যেমন॥
দুহাতে দুগাছা মেটে, কাপড় পরেছে এঁটে খাট করি হাঁঠুর উপর।
গলায় রসের কাটি, হিঙ্গুলের পলা দুটি, পুঁতি বেড়ে সেজেছে সুন্দর॥
অঞ্জনরঞ্জন আঁখি গঞ্জন-খঞ্জন-পাখী, সুললিত নাকে নাকচোনা।
নবীননীরদ তনু অরুণ তিমির ভানু রূপে আলো কৈল কালসোনা

ভুবনমোহন খোঁপা, সুন্ধী শালুকের ঝাঁপা, পেট্যা পাড়ি পরেছে সিন্দুর।
কমলকলিকা কুচ বুকেতে হয়েছে উচ, কদম্বকুসুম কর্ণপূর ॥
পিত্তলের ঝুট্যা পায়, যাবক রঞ্জিত তায়, করাঙ্গুলে পিত্তল অঙ্গুরী।
সর্ব্ব[১] অঙ্গ সুধাময় অনঙ্গতরঙ্গ বয় মহামেঘে যেমন বিজলী ॥
পৃ ৩৩১ ॥

রামেশ্বরের কাব্যে বিস্তর সূক্তি আছে। যেমন,—

বর দেখে দেই দোষ ঘটকের ঘাড়ে। পুরস্ত্রীর প্রগল্‌ভতা বিবাহেতে বাড়ে ॥ পৃ ৫৪ ॥

বাপের বিভব নাহি কি করিবে মায়। স্বামীর সম্পদ বিনা শিশু পোষা যায় ॥

বুভুক্ষিত বালক বচনে বোধ হয়। দুগ্ধ পোষ্য ক্ষুদ্ধ নাকি চুম্ব দিলে হয় ॥ পৃ১০০ ॥

মদ্দের করজ[২] হৈলে মেয়ে দেয় ঠেলে। কোণে রয় কুলবধূ কথা কয় ছেলে ॥ পৃ২১৭ ॥

আঁতে পুতে চাষ ভাল অভাবে সোদর। অন্যথা হা-ভাতে হেলা বিকায় সত্বর ॥
পৃ ২২৩ ॥

তোকে দুঃখ দিতে মামী মোকে দেয় যুড়ে। মটরের মর্দ্দনে মুসুর গেল উড়ে ॥
পৃ ২৩৯ ॥

রামকৃষ্ণ দাস কবিচন্দ্রের শিবায়নের একটি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৩] ইহার প্রথম তিন পত্র নাই, পয়ার সংখ্যা প্রায় আট হাজার। পুঁথির লিপিকাল ১১ শ্রাবণ, ১০৯১ সাল (মল্লাব্দ কি ?)। কবি কাশ্যপগোত্রীয় কায়স্থ ছিলেন, পিতামহের নাম যশশ্চন্দ্র।

কায়স্থ কাশ্যপ গোত্র যশশ্চন্দ্রের পৌত্র কবিচন্দ্র রচিল সঙ্গীত।
নানা পুরাণের কথা প্রবন্ধে গিয়াছে গাঁথা, শুনিলে সভার হয় প্রীত ॥

ভণিতা হইতে জানা যায় যে কাব্যটি অংশতঃ কাশীখণ্ড অবলম্বনে রচিত।

রামকৃষ্ণ দাস গায় কাশীখণ্ড-মতে।
সদা দিও রহুক মোর হরের পদেতে ॥

রামরাম দাস রচিত শিবমাহাত্ম্যের পুঁথি রঙ্গপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।[৪]

১। পাঠ 'শুধু।' ২। 'গরজ' হইবে ?
৩। ব-সা-প-প ৬, পৃ ৭৩। ৪। ঐ ১৩, পৃ ১৯২।

পঞ্চচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

শ্রীচৈতন্য ও বৈষ্ণব মহান্ত জীবনী

১৬৩৪ শকাব্দে (অর্থাৎ ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে) প্রেমদাস কবিকর্ণপূর রচিত চৈতন্য-চন্দ্রোদয় নাটকের অনুবাদ করেন। অনুবাদ বেশ মূলানুগত এবং মূলের মত দশ অঙ্কে বিভক্ত, নাম চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী।[১] গ্রন্থের শেষে কবি যে আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে এই কথা জানা যায় যে কবির আসল নাম পুরুষোত্তম মিশ্র, উপাধি সিদ্ধান্তবাগীশ, গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস। কবির দুই বড় ভাই ছিলেন, গোবিন্দরাম এবং রাধাচরণ। আরও তিন ভ্রাতা ছিলেন, তাঁহারা পূর্ব্বেই পরলোকগত হইয়াছিলেন। পিতা গঙ্গাদাস, পিতামহ মুকুন্দানন্দ, প্রপিতামহ জগন্নাথ মিশ্র। ইঁহারা কাশ্যপগোত্রীয়। বাসস্থান ছিল বর্দ্ধমান জেলায় মানকরের কাছে কুলনগরে। ষোল বৎসর বয়সে কবি বৃন্দাবনে পলাইয়া গিয়া গোবিন্দদেবের মন্দিরে পাচক হন। কয় বৎসর পরে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তাঁহাকে ফিরাইয়া আনেন। কবি স্বপ্নে শ্রীচৈতন্য ও দুই প্রভুর অনুগ্রহ লাভ করেন।

কর্ণপূর ইহা বলি চৈতন্যে নমস্করি নাটক করিল সমাপন।
ষোল শত চৌত্রিশ শকে লৌকিক ভাষাতে সুখে প্রেমদাস করিল লিখন॥
ভক্তবৃন্দে নমস্করি কিছু বিজ্ঞাপন করি, প্রভু যবে প্রকট আছিলা।
বৃদ্ধ প্রপিতামহ কুলনগর গ্রামে সেহ গৃহাশ্রমে বর্ত্তমান হৈলা॥
কশ্যপ মুনির বংশ বিপ্রকুল অবতংস, জগন্নাথ মিশ্র তাঁর নাম।
তাঁর পুত্র কুলচন্দ্র নাম শ্রীমুকুন্দানন্দ, তাঁর পুত্র শ্রীল গঙ্গাদাস॥
তাঁর ছয় পুত্র ছিলা, তিন পূর্ব্বে কৃষ্ণ পাইলা, তিন ভ্রাতা থাকি অবশিষ্ট
জ্যেষ্ঠ শ্রীগোবিন্দরাম রাধাচরণ মধ্যম রাধাকৃষ্ণপাদপদ্মনিষ্ঠ॥

১। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক নামে মুদ্রিত হইয়াছে। আমার নিকট যে বইটি আছে তাহাতে নামপৃষ্ঠা নাই। সম্ভবতঃ বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত।

কনিষ্ঠ আমার নাম মিশ্র শ্রীপুরুষোত্তম গুরুদত্ত নাম প্রেমদাস।
সিদ্ধান্তবাগীশ বলি নাম দিলা বিজ্ঞাবলী, কৃষ্ণদাস্যে মোর অভিলাষ॥
যবে ষোল বর্ষ বয়ঃ তবে হৈল ভাগ্যোদয়, গিয়াছিনু মথুরামণ্ডলে।
তীর্থ ভ্রমি হর্ষমনে গেলাম কাম্যকবনে শ্রীগোবিন্দদেবের মন্দিরে॥
গোঁসাই কৃষ্ণচরণ সেবার অধ্যক্ষ হন, গোবিন্দপূজক সেবা করে।
তাঁরা মোরে দেখি অতি প্রীতি করি মোর প্রতি পাকসেবা সমর্পিল মোরে॥
গোবিন্দের পাকক্রিয়া করি আনন্দিত হৈয়া ব্রজে ছিনু কতক বৎসর॥
জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ব্রজে গেলা, মোরে সঙ্গে লৈয়া আইলা, মোরে স্নেহ বিস্তর তাঁহার॥
পৃ ৪০২-০৩॥

প্রেমদাসের লেখার বাঁধুনি চমৎকার। পড়িলে অনুবাদ বলিয়া বোধ হয় না।

প্রেমদাস ১৬৩৮ শকে তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ বংশীশিক্ষা রচনা করেন।

শকাদিত্য ষোল শত চৌত্রিশ শকেতে। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটক সুখেতে॥
লৌকিক ভাষাতে মুঞি করিনু লিখনে। ষোলশত অষ্টত্রিংশ শকের গণনে॥
শ্রীশ্রীবংশীশিক্ষা গ্রন্থ করিনু বর্ণন। শ্রীনন্দনন্দন হরি করিয়া চিন্তন॥ পৃ ২৩৬॥

প্রেমদাস বাঘনাপাড়ার পাটের শিষ্য ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। বন্দনা অংশে কবি তিন প্রভুর পরেই বংশীবদন, জাহ্নবী ঠাকুরাণী, রামাঞি ঠাকুর এবং হরি গোঁসাঞির নাম করিয়াছেন।

প্রেমদাসের বংশীশিক্ষা[১] মূলতঃ বৈষ্ণবতান্ত্রিক "রসরাজ" সাধন সম্পর্কীয় গ্রন্থ। বইটি চারি উল্লাসে সমাপ্ত। তাহার মধ্যে সাড়ে তিন উল্লাসে শ্রীচৈতন্য কর্তৃক বংশীবদনকে শিক্ষাদান উপলক্ষে তত্ত্বকথা বলা হইয়াছে। চতুর্থ উল্লাসের শেষভাগে শ্রীচৈতন্যের গৃহত্যাগ ইত্যাদি এবং বংশীবদন ও তাঁহার পুত্র পৌত্র প্রপৌত্রাদির বিষয়ে অনেক কথা বলা হইয়াছে। জাহ্নবাদেবী এবং বীরভদ্র গোস্বামী সম্বন্ধেও অনেক কথা জানা যায়। এই হিসাবে এই গ্রন্থটিকে জীবনী কাব্যের শ্রেণীতেই আলোচনা করা গেল।

১। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দে কর্তৃক প্রকাশিত (১৩৩১)।

বংশীশিক্ষা হইতে জানিতে পারি যে রামচন্দ্র গোস্বামী কড়চা, অনঙ্গমঞ্জরী-সম্পুটিকা এবং পাষণ্ডদলন নামক তিনখানি নিবন্ধ রচনা করেন। ইঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র, শচীনন্দনের তিন পুত্র, রাজবল্লভ বল্লভ এবং কেশব যথাক্রমে বংশীবিলাস,[১] শ্রীবল্লভ-লীলা এবং শ্রীকেশবলীলা রচনা করেন। শেষোক্ত গ্রন্থ দুইটি পদাবলী বলিয়া মনে হয়।[২] তিন পুত্রের রচনা দেখিয়া শচীনন্দন পরে গৌরাঙ্গবিজয় রচনা করেন। এটিও পদাবলী বলিয়া অনুমান করি।[৩]

শচীর হস্তেতে সেবা করিয়া অর্পণ। তিন গ্রন্থ বর্ণিলেন চৈতন্যনন্দন ॥
কড়চা [অ]নঙ্গমঞ্জরীসম্পুটিকা নাম। পাষণ্ডদলন আর অতি অনুপাম ॥
শ্রীরাজবল্লভ কৈলা শ্রীবংশীবিলাস। বংশীর মহিমা যাহে বিস্তার প্রকাশ ॥
শ্রীবল্লভ শ্রীবল্লভলীলা প্রকাশিল। শ্রীকেশব শ্রীকেশবসঙ্গীত রচিল ॥
তিন পুত্রকৃত তিন সন্দর্ভ দেখিয়া। গৌরাঙ্গবিজয় শচী বর্ণে হৃষ্ট' হৈয়া ॥
পৃ ২৩২ ॥

বংশীবদনের শিষ্য জগদানন্দ বংশীলীলামৃত গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন, এই সংবাদও প্রেমদাসের নিকট হইতে পাওয়া যাইতেছে।

বন্দো সেন শিবানন্দ-পুত্র কর্ণপূর। গৌরলীলা বহুগ্রন্থ বর্ণিলা মধুর ॥
শ্রীজগদানন্দ বন্দো মধুরচরিত। যিঁহ বরণিলা গ্রন্থ বংশীলীলামৃত ॥ পৃ ৮১ ॥

বংশীশিক্ষায় আনুষঙ্গিকভাবে তেতাল্লিশটি পদ উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তন্মধ্যে বংশীবদন রচিত তিনটি, বিদ্যাপতি রচিত চারিটি, চণ্ডীদাস রচিত তেরটি, গোবিন্দদাস রচিত তেরটি, লোচনদাস রচিত একটি, রাজবল্লভ রচিত একটি, (এই পদটি মুরলীবিলাসে আছে) এবং প্রেমদাস রচিত তিনটি। বাকি পাঁচটি পদে কোন ভণিতা নাই।

চণ্ডীদাসের পদ সবকয়টিই বাঙ্গালায় রচিত, সাধনসংক্রান্ত পদ। চণ্ডীদাসের এইরূপ পদ এই প্রথম পাওয়া গেল। 'বিদ্যাপতি' ভণিতার একটি পদও এই জাতীয় [পৃ ১২৮]।

১। নামান্তর মুরলীবিলাস ; পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।
২। HBL, পৃ ৪২৭। ৩। HBL, পৃ ২৯৬-০৭।

বংশীবদনের পিতা ছকড়ি চট্ট "রসরাজ" সাধনার অন্যতম প্রবর্ত্তক।[১] বংশী-শিক্ষায় ইঁহার রচিত যে কয়টি শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা হইতে এই অনুমান অনিবার্য্য। যেমন,

সর্ব্বগোপীষু মুখ্যা সা রাধা বৃন্দাবনেশ্বরী।
মহাভাবস্বরূপা চ শ্রীরতিমঞ্জরী পরা ॥ পৃ ১৩ ॥

যাদৃশী কামিনাং নাথ কামিন্যামনপায়িনী।
প্রসীদেতি মমাপ্যাস্তাং প্রীতির্হি তাদৃশী ত্বয়ি ॥ পৃ ১০৬ ॥

বিদগ্ধং ভবতো ভক্তং জ্ঞাতুং যথাঽস্মি শক্নোমি (?)।
স্বর্ণবণিগিব স্বর্ণং কুরু প্রসাদমিত্যপি ॥ পৃ ১১৩ ॥
হ্লাদিনীপ্রকৃতী রাধা শ্রীরাসরঙ্গিণী রমা।
সর্ব্বগোপ্যংশিনী দেবী শ্রীকৃষ্ণানন্দদায়িনী ॥ পৃ ১১৪ ॥

শ্রীমদ্‌গুরুপ্রসাদেন মন্মথমথনং মনুম্।
লভন্তে মানবা নূনং শ্রুতিরেষা পুরাতনী ॥ পৃ ১৪১ ॥

বংশীং কৃষ্ণপ্রিয়াং রামামনঙ্গমঞ্জরীং পরাম্।
শ্রীকৃষ্ণসেবিকাং কৃষ্ণকরস্থাং সরলাং শুভাম্ ॥ পৃ ১৬৪ ॥[২]

বংশীবদন এই সাধনার ধারা বিস্তারিত করেন। ইহাতে তিনি নরহরি সরকার ঠাকুরের সহযোগিতা কতটুকু পাইয়াছিলেন তাহা ভাবিবার কথা। তবে প্রায় একই সময়ে শ্রীখণ্ডে নরহরি কর্ত্তৃক এবং কুলিয়ায় ছকড়ি বা বংশীবদন কর্ত্তৃক বৈষ্ণব তান্ত্রিক সাধনার ধারা প্রবর্ত্তিত হয়। নরহরি এবং বংশীবদন প্রায় একই সময়ে এইরূপ সাধনাঘটিত পদ রচনা করেন। ইঁহাদের শিষ্যানুশিষ্যদিগের মধ্যেও এই প্রকার পদরচনার পদ্ধতি চলিয়া আসে। বংশীবদন রচিত এই শ্রেণীর পদ পূর্ব্বে উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

১। অপর প্রবর্ত্তক হইতেছেন শ্রীখণ্ডের নরহরি সরকার ঠাকুর।
২। প্রেমদাস বলেন এই শ্লোকটি ছকড়ি চট্টের রচিত বেণুমাহাত্ম্যে আছে, "শ্রীমচ্ছকড়িদেবকৃত-বেণুমাহাত্ম্যে।"

চণ্ডীদাসের এই ধরণের পদ খুবই সুপরিচিত। আমার অনুমান হয় যে এই চণ্ডীদাস বংশীবদনের পৌত্র রামচন্দ্রের শিষ্য ছিলেন। এই অনুমানের হেতু হইতেছে যে রামচন্দ্রের শিষ্য তালিকার মধ্যে এক বড়ু বা বড়ু ঠাকুর পাইতেছি। ইঁহার বাস ছিল শালডাঙ্গা মনস্থবপুর।

বিপ্রকুলে জন্ম ধীর শ্রীবড়ু ঠাকুর।
নিবাস শ্রীশালডাঙ্গা মনস্থবপুর ॥ পৃ ২৩২ ॥

ইহাও স্মর্ত্তব্য যে চণ্ডীদাসের সাধনঘটিত পদ বংশীশিক্ষা বিবর্ত্তবিলাস প্রভৃতি বাঘনাপাড়া পাটের শিষ্যগণের রচিত গ্রন্থ দ্বারাই অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে প্রসার লাভ করিয়াছে।

বংশীশিক্ষায় আধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ অংশে চৈতন্যচরিতামৃতের প্রভাব সুস্পষ্ট, কবি বহু স্থানে কবিরাজ গোস্বামীকে হুবহু অনুসরণ করিয়াছেন। এক হিসাবে বংশী-শিক্ষাকে চৈতন্যচরিতামৃতের সম্প্রদায়বিশেষের ব্যাখ্যা বলা যাইতে পারে।

বাঘনাপাড়া পাটের অর্থাৎ রামচন্দ্র গোস্বামীর বংশধরের শিষ্যানুশিষ্যের শিষ্য অকিঞ্চন দাস বিবর্ত্তবিলাস[১] নামে একটি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এই অকিঞ্চন দাস ভক্তিরসালিকা প্রভৃতি সাধনঘটিত নিবন্ধের রচয়িতা কিনা বলা দুষ্কর। বিবর্ত্তবিলাসের বিষয়বস্তু বংশীশিক্ষার অনুরূপ বটে, তবে ইহাতে সহজিয়া ভাব বিশেষ সুস্পষ্ট। ইহাতেও 'চণ্ডীদাস' ভণিতাযুক্ত কয়েকটি পদ পাওয়া যাইতেছে। বিবর্ত্তবিলাসে কৃষ্ণদাস কবিরাজ সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন কথা আছে। চৈতন্য-চরিতামৃতের অপব্যাখ্যাই অকিঞ্চন দাসের অন্যতম উদ্দেশ্য। কবির গুরুর নাম রসিকবিহারী। গুরুর গুরুর নাম রঘুনাথ।

আমার প্রভুর প্রভু রঘুনাথ নাম।
... ...
শ্রীপাট অম্বিকা বাঘনাপাড়া গুণিগ্রাম।
তাহার নিকট গ্রাম নাহি কহিলাম ॥

১ বেণীমাধব দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৩৩২)

সেই গ্রামে রহেন পরম আমার গুরু।
... ...
শ্রীবিহারীর পদে যেন মোর হয় আশ।
... ...
রঘুনাথ সঙ্গে যেন রসিকেরে পাই ॥
... ...
শ্রীরূপ রঘুনাথ বিহারী পদে আশ।
অকিঞ্চন হইয়া করি বিবর্ত্তবিলাস ॥

এই ভণিতাও আছে—

শ্রীরূপ রঘুনাথ রসিক পদে মম আশ।
অকিঞ্চন হইয়া করি বিবর্ত্তবিলাস ॥

সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্টে শ্রীচৈতন্যের জ্ঞাতিগোষ্ঠীর পরিচয় ও কার্য্যাবলী সংবলিত অনেকগুলি নিবন্ধ রচিত হইয়াছিল। এইজাতীয় কয়েকটি গ্রন্থের রচয়িতাও ছিলেন এই বংশের ব্যক্তি। রামরত্ন ভট্টাচার্য্য রচিত শ্রীচৈতন্য-রত্নাবলীতে[১] এবং জগজ্জীবন মিশ্র রচিত মনঃসন্তোষিণীতে[২] আনুষঙ্গিকভাবে মহাপ্রভুর পিতৃভূমি শ্রীহট্টে আগমনকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীহট্টে বিরচিত শ্রীচৈতন্যবিষয়ক অপর নিবন্ধ হইতেছে—রামশরণ দে রচিত চৈতন্যবিলাস,[৩] ধূপরাজ বিরচিত গৌরাঙ্গসন্ন্যাস,[৪] পুরন্দর রচিত চৈতন্যচরিত,[৫] রামানন্দ রচিত রসতত্ত্ব-বিলাস,[৬] এবং "বৈদ্য" জগন্নাথ বিরচিত শ্রীচৈতন্যের পাঁচালী।[৭]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে শ্রীহট্ট অঞ্চলে কয়েকটি বৈষ্ণব মহান্ত জীবনীও রচিত হইয়াছিল। লবনীদাসের জগন্মোহন-ভাগবত শ্রীচৈতন্যভাগবতের অনুসরণে লেখা

১। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৪, ১১-১২। ইনিই কি রামভদ্র তর্কালঙ্কার? [ঐ পরিশিষ্ট ১, পৃ ৮]।

২। শ্রীযুক্ত অচ্যুতচরণ চৌধুরী মহাশয় কর্তৃক সঙ্গিনী পত্রিকায় প্রকাশিত; শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২৩-৩৫, ৩৯।

৩। ঐ চতুর্থ খণ্ড, পৃ ২৬০; পরিশিষ্ট ১, পৃ ১২। ৪। ঐ তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২৯, ৩০।

৫। ঐ তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৯৯। ৭। ঐ চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৭২-৭৩।

হয়।[১] জগন্মোহনের জীবিতকাল, লবনীদাসের মতে, ১৪৫০-১৪৮১ শকাব্দ। ইনি কয়েকজন মুসলমানকেও স্বমতে আনয়ন করিয়াছিলেন।

মনস্থর খাঁর নাম হৈল মনোহর দাস। হিম্মৎ খাঁর হইল নাম হৃদানন্দ দাস ॥
বাণেশ্বর দাস নাম বাহাদুর খাঁর হৈল। সর্ব্বপরিত্যাগী তিনে বৈরাগ্য করিল ॥

জগন্মোহন কতকটা নিরাকারবাদী ছিলেন। ইঁহার একতম শিষ্য এই ভাবের কিছু কিছু পদ লিখিয়াছিলেন।

গঙ্গারাম (নামান্তর "বঞ্চিত") ঘোষের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে রাধাচরণ দাস রচিত বঞ্চিতচরিত্র গ্রন্থে।[২] বঞ্চিত নিজেও একজন পদকর্ত্তা ছিলেন। কবীর দাস রচিত রামকৃষ্ণচরিতে রামকৃষ্ণ গোস্বামীর (৯৮৩-১০৫৯ সাল) জীবনী বিবৃত হইয়াছে।[৩] চরিত্রচিন্তারত্ন গ্রন্থের বিষয় হইতেছে বাণীকিশোর, যিনি ঠাকুর-বাণী নামে পরিচিত ছিলেন, তাঁহার চরিত্র।[৪]

কৃষ্ণচরণ দাস প্রণীত শ্যামানন্দপ্রকাশ[৫] গ্রন্থে শ্যামানন্দের বৈরাগ্য ও পরবর্ত্তী জীবনী অল্পকথায় বর্ণিত হইয়াছে। গ্রন্থকার শ্যামানন্দের প্রশিষ্যের প্রশিষ্য। সুতবাং তিনি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ বা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদের লোক হইবেন।

শ্রীরাধামোহন দাস ঠাকুর হামারি। তাঁর দুই পাদপদ্ম মস্তকেতে ধরি ॥
বন্দিব শ্রীনয়নানন্দ দেবের চরণ। পরমেষ্ট গুরু তেঁহ সাধন স্মরণ ॥
বন্দিব শ্রীরসিকানন্দ পাদপদ্ম সাবধানে। পরমেষ্টি গুরু তিঁহো হয়েন জন্মে জন্মে ॥
বন্দিব শ্রীশ্যামানন্দ দেবের চরণ। পরমেষ্ট পরাৎপর গুরু তেঁহ হন ॥
বন্দিব শ্রীহৃদয়ানন্দ দেবের চরণ। পরমেষ্টি পরাৎপর গুরু তেঁহ হন ॥
বন্দিব শ্রীগৌরীদাস পণ্ডিত ঠাকুর। জন্মে জন্মে হঙ তাঁর উচ্ছিষ্টের কুকুর ॥

১। ঐ চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৭৪-৮১। ২। ঐ তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৩১৩, চতুর্থ খণ্ড, পৃ ৩৯-৫০।
৩। ঐ চতুর্থ খণ্ড, পৃ ১৯৪-২০৪। ৪। ঐ চতুর্থ খণ্ড, পৃ ১১৯-২১।
৫। শ্রীশ্রীশ্যামানন্দপ্রকাশ-গ্রন্থ, শ্রীযুক্ত অমূল্যধন রায়ভট্ট সম্পাদিত (১৩৩৫)। এই নামের একটি দ্বিতীয় পুঁথি পাওয়া গিয়াছে যাহার সহিত প্রকাশিত গ্রন্থের মিল যৎসামান্যই [ব-সা-প-প ৬, পৃ ৩১-৩২]।

গ্রন্থকার স্বপ্নে ব্রজধামে শ্যামানন্দের অনুগ্রহ লাভ করেন। তিনি তাঁহাকে কৃষ্ণচরণ নাম দেন এবং তাঁহার "মঙ্গল" রচনা করিয়া নয়নানন্দকে দেখাইতে বলেন। এই স্বপ্ন অনুযায়ী গ্রন্থটি রচিত হয় [পৃ ৫৩-৫৭]। শ্যামানন্দপ্রকাশ দশা নামিত চারি অধ্যায়ে সমাপ্ত। গ্রন্থকার ভণিতায় শ্যামানন্দ এবং রূপমঞ্জরীকে স্মরণ করিয়াছেন।

বৈষ্ণব ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ ভক্তিরত্নাকর।[১] এই সুবৃহৎ গ্রন্থকে বৈষ্ণব ইতিহাসের বিশ্বকোষ বলা যাইতে পারে। গ্রন্থের রচয়িতা নরহরি চক্রবর্ত্তী, নামান্তর ঘনশ্যাম। গ্রন্থকারের পিতা জগন্নাথ সুবিখ্যাত বৈষ্ণব দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর শিষ্য ছিলেন। ইঁহাদের বাসস্থান ছিল গঙ্গার পূর্ব্বতীরে সৈয়দাবাদের নিকটে। কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে। পূর্ব্ববাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে॥
বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত। তাঁর শিষ্য পিতা মোর বিপ্র জগন্নাথ॥
না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম। নরহরি দাস আর দাস ঘনশ্যাম॥
গৃহাশ্রম হইতে হইলুঁ উদাসীন। মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রিদিন॥[২]

নরহরি অনুরাগবল্লীর উল্লেখ করিয়াছেন, "তথাহি শ্রীশ্রীনিবাসাচার্য্যঠক্কুরস্যানু-শাখাশ্রীমনোহররায়কৃতশ্রীমদনুরাগবল্ল্যাম্।"[৩] সুতরাং ভক্তিরত্নাকর ১৬৯৪ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হইতে পারে না। বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী আনুমানিক ১৭০৫ খ্রীষ্টাব্দের দিকে দেহত্যাগ করেন। সুতরাং ভক্তিরত্নাকর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম পাদে রচিত হইয়াছিল বলা যাইতে পারে।

ভক্তিরত্নাকর পঞ্চদশ তরঙ্গে বিভক্ত। প্রথম তরঙ্গে শ্রীনিবাসের জন্মাদি সূত্র, দ্বিতীয়ে শ্রীনিবাসের পিতার কথা, তৃতীয়ে শ্রীনিবাসের নীলাচল গমন, চতুর্থে গৌড়ে ভ্রমণ, পঞ্চমে শ্রীনিবাস ও নরোত্তমের ব্রজে গমন, ষষ্ঠে শ্যামানন্দের ব্রজে গমন এবং গোস্বামিগ্রন্থ লইয়া শ্রীনিবাসাদির গৌড়ে প্রত্যাবর্ত্তন, সপ্তমে বিষ্ণুপুরের অরণ্যে গ্রন্থচুরি এবং বীরহাম্বীরের প্রতি অনুগ্রহ প্রদর্শন ও শ্যামানন্দের উৎকলে

১। বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত দ্বিতীয় সংস্করণ (শ্রীচৈতন্যাব্দ ৪২৬)।
২। গ্রন্থানুবাদ। ৩। চতুর্থ তরঙ্গ।

গমন, অষ্টমে নরোত্তমের ক্ষেত্রে গমন এবং রামচন্দ্রাদিকে দীক্ষাদান, নবমে শ্রীনিবাসের দ্বিতীয়বার বৃন্দাবন গমন, দশমে কাঞ্চনগড়িয়ায় এবং খেতরীতে মহোৎসব বর্ণন, একাদশে খেতরীতে জাহ্নবাদেবীর আগমন এবং খড়দহে বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা, দ্বাদশে শ্রীনিবাসাদির নবদ্বীপ ভ্রমণ এবং নিত্যানন্দ প্রভুর বিবাহ বর্ণন, ত্রয়োদশে শ্রীনিবাসের দ্বিতীয়বার দারপরিগ্রহণ, বীরচন্দ্রের বিবাহ, ব্রজে গমন এবং প্রত্যাবর্ত্তন, চতুর্দ্দশে বোরাকুলিতে মহোৎসব বর্ণন, পঞ্চদশে উৎকলে শ্যামানন্দের ভক্তি প্রচার এবং তাহার পর গ্রন্থানুবাদ।

তিন প্রভু, ছয় গোস্বামী এবং শ্রীনিবাসাদি বৈষ্ণব মহান্তদিগের বিষয়ে অনেক প্রামাণিক কথা ছাড়াও ভক্তিরত্নাকরে বহু বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। ব্রজপরিক্রমা ও নবদ্বীপপরিক্রমা অংশ দুইটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ বলিলেও হয়।[১] পঞ্চম তরঙ্গ প্রকৃত প্রস্তাবে একটি সঙ্গীতশাস্ত্র বিষয়ক গ্রন্থ। নরহরি সঙ্গীতবিদ্যায় যেমন নিপুণ ছিলেন পদরচনাতেও তেমনি কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। ভক্তিরত্নাকরে নরহরি রচিত অনেকগুলি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। অপর পদকর্ত্তাদিগের পদও কম নাই।[২] গ্রন্থকারের পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায় বিভিন্ন সংস্কৃত গ্রন্থ হইতে বচন উদ্ধারে। অধুনালুপ্ত অনেক গ্রন্থের উদ্দেশ ভক্তিরত্নাকরে মিলিতেছে।

নরহরি চক্রবর্ত্তীর দ্বিতীয় গ্রন্থ নরোত্তমবিলাস।[৩] নামেই প্রকাশ, ইহাতে প্রধানতঃ নরোত্তম ঠাকুরের ক্রিয়াকলাপ বর্ণিত আছে। গ্রন্থটিকে ভক্তিরত্নাকরের পরিপূরক বলা চলে। ইহা দ্বাদশ বিলাসে সম্পূর্ণ। প্রথম বিলাসে লোকনাথ গোস্বামীর কথা এবং নরোত্তমের জন্মের হেতু বর্ণিত হইয়াছে, দ্বিতীয়ে জন্ম ও বৃন্দাবন গমন, তৃতীয়ে নবদ্বীপ ও দক্ষিণরাঢ় ভ্রমণ, চতুর্থে নীলাচল গমন, পঞ্চমে উত্তররাঢ় ভ্রমণ, ষষ্ঠ হইতে অষ্টমে খেতরী মহোৎসব বর্ণন, নবমে জাহ্নবাদেবীর বৃন্দাবন ভ্রমণ, খেতরীতে পুনরাগমন ও শ্রীখণ্ড কাটোয়া আদি ভ্রমণ, দশমে নরোত্তমের মাহাত্ম্য ও শিষ্যকরণ, একাদশে বীরচন্দ্র প্রভুর আগমন ও নরোত্তমের পুনর্জ্জীবন ও তিরোধান, এবং দ্বাদশে নরোত্তমশাখা বর্ণন।

১। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ হইতে স্বতন্ত্র পুস্তক বলিয়া প্রকাশিত।

২। HBL, পৃ ২৭৮ দ্রষ্টব্য। ৩। বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র এবং বটতলা হইতে প্রকাশিত।

ভক্তিরত্নাকর এবং নরোত্তমবিলাস ছাড়া আরও একটি এইজাতীয় গ্রন্থ নরহরি রচনা করিয়াছিলেন। ইহার নাম শ্রীনিবাসচরিত্র। এই গ্রন্থটি এখন লুপ্ত হইয়াছে। ভক্তিরত্নাকরের ত্রয়োদশ ও চতুর্দ্দশ তরঙ্গে শ্রীনিবাসচরিত্রের ইঙ্গিত ও উল্লেখ আছে।

যৈছে ইষ্টগোষ্ঠী দোঁহে সর্ব্বত্র প্রচার। অন্য গ্রন্থে বিস্তারি বর্ণিল গ্রন্থকার ॥ ১৩ ॥
শিষ্যগণ নাম এথা লিখিতে নারিনু। শ্রীনিবাসচরিত্র গ্রন্থেতে বিস্তারিনু ॥ ১৪ ॥

নরোত্তমবিলাসে ভক্তিরত্নাকরের উল্লেখ আছে, আর ভক্তিরত্নাকরে কবি বলিয়াছেন যে তিনি নরোত্তমবিলাস রচনা করিবেন। সুতরাং ধরিতে হয় শ্রীনিবাসচরিত্র প্রথমে, তাহার পর ভক্তিরত্নাকর এবং তাহার পর নরোত্তমবিলাস রচিত হয়।

সে সবার গতি এথা কহি সংক্ষেপেতে।
বিস্তারিব নরোত্তমবিলাস গ্রন্থেতে ॥ ১০ ॥

নরহরি গীতচন্দ্রোদয় নামে একটি পদসংগ্রহ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। ইহার একটি অসম্পূর্ণ পুঁথি ত্রিপুরা দরবার গ্রন্থশালায় আছে। তাহার কিয়দংশ ছাপা হইয়াছিল।[১] নরহরির অপর দুই গ্রন্থ ছন্দঃসমুদ্র এবং পদ্ধতিপ্রদীপ। পদ্ধতিপ্রদীপের সম্বন্ধে কিছু জানা নাই। ছন্দঃসমুদ্র লইয়া সাহিত্য পত্রিকায় একটু আলোচনা হইয়াছিল।

রচনাকাল জানিবার উপায় নাই এমন কয়েকখানি শাখাবর্ণন জাতীয় গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে। তাহার মধ্যে কতকগুলি নিবন্ধের রচয়িতার নাম জানা যায় না। যেমন, পণ্ডিত গোঁসাঞির সখাগণ,[২] চৈতন্যগণোদ্দেশ,[৩] ইত্যাদি।

"দীনহীন" রচিত কিরণদীপিকা নামক কবিকর্ণপূরের গৌরগণোদ্দেশের অনুবাদের পুঁথি শ্রীখণ্ড হইতে পাওয়া গিয়াছে।[৪] গ্রন্থশেষে ভণিতা এই—

শ্রীগুরুপাদাম্বুজ করিয়া চিন্তন।
কিরণদীপিকা দীনহীন করিল বর্ণন ॥

১। HBL, পৃ ৬, ২০৯-১০, ২৭৬ ৭৭, ২৭৯-৮০, ৩০৩।
২। ব-সা-প-প ৮, পৃ ৩৪-৩৫। ৩। ঐ, পৃ ৩৩। ৪। ব-সা-প-প ৬, পৃ ২৫৮।

রূপচরণদাসের রচিত একটি অনুবাদও পাওয়া গিয়াছে।[১]

অভিরামদাসের মাহাত্ম্যবিষয়ক নিবন্ধ অনেকগুলিই পাওয়া যাইতেছে। পূর্ব্বে কতকগুলির কথা বলিয়াছি। রাইচরণ দাসের অভিরামবন্দনার পুঁথি ১০৯৫ সালে অনুলিখিত।[২] সাল মল্লাব্দ হওয়াই সম্ভব। অভিরামবন্দনায় জাহ্নবাদেবী সম্বন্ধেও অনেক কথা আছে। পুঁথিতে দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতার একটি পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। অভিরামলীলামৃত গ্রন্থখানি সম্ভবতঃ মুদ্রিত হইয়াছিল।

রমাই বিরচিত চৈতন্যগণোদ্দেশদীপিকার পুঁথি রঙ্গপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। পুঁথির পত্রসংখ্যা তিন।[৩]

বনমালী দাসের জয়দেবচরিত্রে[৪] জয়দেব ও তাঁহার স্ত্রী পদ্মাবতী সম্বন্ধে প্রচলিত কাহিনী লিপিবদ্ধ আছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় অনুমান করিয়াছিলেন, শ্রীনিবাস আচার্য্যের শিষ্য বনমালী দাস বৈদ্যই জয়দেবচরিত্রের রচয়িতা।[৫] জয়দেবচরিত্রে পরিচ্ছেদ বিভাগ নাই, ভণিতার দ্বারা পরিচ্ছেদ বিভাগ সূচিত হইয়াছে। গ্রন্থটিতে দুইটি ত্রিপদী পদ ছাড়া নয়টি ভণিতা আছে। তন্মধ্যে একটিতে শ্রীচৈতন্যনিত্যানন্দের উল্লেখ আছে, একটিতে শ্রীরূপ গোস্বামীর উল্লেখ আছে, দুইটিতে গোপালভট্ট গোস্বামী ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের উল্লেখ আছে এবং একটিতে শ্রীরূপ, শ্রীগোপালভট্ট ও শ্রীনিবাস আচার্য্যের উল্লেখ আছে। শ্রীরূপ শ্রীগোপালভট্ট ও শ্রীনিবাসের উল্লেখ হইতে শাস্ত্রী মহাশয়ের অনুমান যথার্থ বলিয়া মনে হয়। তবে বর্দ্ধমানরাজ কর্ত্তৃক যে মন্দির নির্ম্মাণের উল্লেখ করা হইয়াছে [পৃ ৯] তাহা যদি বর্ত্তমান মন্দির হয় তবে বনমালী দাস অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক হইবেন, কেননা বর্ত্তমান মন্দির বর্দ্ধমানের মহারাণী নৈরাণী দেবী কর্ত্তৃক ১৬১৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৬৯২-৯৩ খ্রীষ্টাব্দে নির্ম্মিত হইয়াছিল। পুরাতন মন্দির এখন ভগ্নস্তূপে পরিণত, উহার কথা উল্লিখিত হইলে, বনমালী দাস ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগের লোক হইবেন।

১। ঐ, পৃ ৩২৮। ২। ব-সা-প-প ১৩, পৃ ১৯২। ৩। ব-সা-প প ৪, পৃ ২৯৯-৩০০

৪। শ্রীযুক্ত অতুলকৃষ্ণ গোস্বামী সম্পাদিত, বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৩১২)।

৫। ঐ, মন্তব্য পৃ ৩২-৩৩।

ষট্‌চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

সত্যনারায়ণ পাঁচালী ও পীর-মাহাত্ম্য কবিতা

তুর্কীগণ কর্ত্তৃক বাঙ্গালা লুণ্ঠনের কাল হইতে আরম্ভ করিয়া স্বাধীন সুলতান-দিগের আমল পর্য্যন্ত এবং তাহার পরেও মুসলমান ফকীরেরা এদেশের শাসন-রক্ষা এবং বিজয়কার্য্যে প্রত্যক্ষভাবে অংশ গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিলেন।[১] ধর্ম্ম প্রচার কার্য্যের তো কথাই নাই। এই কারণে বঙ্গে মুসলমান শাসনের প্রথম হইতেই বাঙ্গালী হিন্দুর মনে, বিশেষ করিয়া সমাজের নিম্নস্তরের জনসাধারণের মধ্যে, মুসলমান ফকীরদিগের প্রতি ভয়মিশ্রিত ভক্তির ভাব আসিয়া গিয়াছিল। ইহার একটি প্রাচীন দৃষ্টান্ত পাইতেছি সেকশুভোদয়ায়। আকবরের রাজ্যকালে রচিত এই গ্রন্থখানির সব কথাই ঐতিহাসিক সত্য নহে; জলালু-দ্‌-দীন তব্রিজি লক্ষ্মণসেনদেবের সভায় আসিতে পারেন না, কারণ বঙ্গে তুর্কীর আগমনের কয়েক বৎসর পূর্ব্বেই লক্ষ্মণসেনদেবের তিরোধান ঘটিয়াছিল। দ্বিতীয়তঃ এই জলালু-দ্‌-দীন তব্রিজির ঐতিহাসিকত্ব সম্বন্ধে যথেষ্ট সন্দেহের কারণ আছে।[২] তথাপি ইহা অস্বীকার করা যায় না যে সেকশুভোদয়ার গল্পগুলিতে ফকীর সাহেবের যে মাহাত্ম্য ও প্রভাব প্রচার করা হইয়াছে তাহা ভাবের দিক দিয়া হয়ত সত্য। সেকশুভোদয়ার মধ্যে শেখ শাহ্‌ জলালের মাহাত্ম্যসূচক দুই একটি বাঙ্গালা "আর্য্যা" বা ছড়া আছে, সেগুলিই পীরমাহাত্ম্য কবিতার প্রাচীনতম নিদর্শন। এই ছড়াগুলি নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

মকদম সেক শাহ জলাল তবরেজ, তব পাদে করোঁ পরণাম।
চৌদীশ মধ্যে জানিবে যাহার নাম,
বারেক রক্ষা কর মোর পণ প্রাণ,
দেশে গেলে দিব তোমার নামে অর্দ্ধেক দান ॥ পৃ ১২ ॥

১। বাঙ্গালার ইতিহাস, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, দ্বিতীয় ভাগ দ্রষ্টব্য।
২। সেকশুভোদয়া, ভূমিকা পৃ xxx-xxxi দ্রষ্টব্য।

মধ্যে আছে পীরের মোকাম,
তস্যোপরি বিশ্বতে প্রধান পুরুষের স্থান,
তীয়াঞ্জলি তাহার নামে দান ॥
পূর্ব্বে উদয়াচল পর্ব্বতের নাম,
উদয় সূর্য্য প্রত্যুষ বিহান,
কিরাত জানিয়া আমার মোকামের করিব সম্মান,
চতুর্থ অঞ্জলি তাহার নামে দান ॥
উত্তরে হিমাচল দেবের অবস্থান,
তথা আমি করিব প্রয়াণ,
আমি গেলে তারা করিব সম্মান,
পঞ্চম অঞ্জলি তাহার নামে দান ॥
আমার বাপ মাহ দরিদ্রের পুত্র,
আমা জনীতে তাহারা পাইল বড় দুঃখ,
আমার জলে তাহার হৌক আপ্যান,
ষষ্ঠ অঞ্জলি তাহার নামে দান ॥
পৃথিবীর লোকে আমার জানে নাম,
কেহো বলে ভাল কেহো করে অপমান,
সপ্তম অঞ্জলি তাহার নামে দান ॥
রাজা হৈঞা আমার করিব সম্মান,
প্রথমে আইলে দিবেক আমার নামে অন্নদান,
অষ্টম অঞ্জলি তাহার নামে দান ॥
আমার গ্রামে যে করিব অবস্থান,
সহিঞা দুঃখ যদি না করে আন,
পুনঃ পাছে দেয় সম্মান,
নবম অঞ্জলি তাহার নামে দান ॥

আমার মোকামে সাধিয়া অনেক লোক করিব প্রণাম,
কেহ বাঞ্ছে ধন পুত্র কেহ আরোগ্য দান,
আমি তাহার করিব ত্রাণ,
দশম অঞ্জলি তাহার নামে দান ॥ পৃ ৯৩-৯৪ ॥

এই ছড়াটির প্রথম দিকে কতিপয় চরণ নাই বলিয়া মনে হয়। এই অংশে পশ্চিম ও দক্ষিণদিকের এবং প্রথম ও দ্বিতীয় অঞ্জলির কথা ছিল, অনুমান করা যাইতে পারে।

বনের শাক খায় সেক বনের গোনা।
ঝিকরির পোটলি বান্ধিঞা দেয় সেক
হাটে বিকাইলে হয় সোনা ॥ পৃ ৯৫ ॥

পীরদিগের সিদ্ধাই এবং তাহার প্রতি জনসাধারণের ভক্তি মুসলমান ধর্ম্মের দান নহে, ইহা স্বাধীনভাবে উত্তরপূর্ব্ব ভারতে উদ্ভূত হইয়াছিল। বৌদ্ধ তান্ত্রিক এবং শৈব তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য্যদিগের প্রভাবে সিদ্ধাইয়ের প্রতি জনসাধারণের মোহ জন্মিয়াছিল। নাথপন্থীদিগের গ্রন্থে ইহার উদাহরণ মিলিবে।

পীর-মাহাত্ম্য সাহিত্যের বিষয়বস্তু হইয়া উঠিতে অনেক দেরী লাগিয়াছিল। ষোড়শ শতাব্দীর এবং সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত কোন পীর-মাহাত্ম্য কাব্য পাওয়া তো যায়ই নাই, এমন কি অন্য কোন গ্রন্থেও উল্লিখিত হয় নাই। সেক-শুভোদয়ার কথা ছাড়িয়া দিতে হইবে, কারণ ঐ গ্রন্থের উৎপত্তি হইয়াছিল বিশেষ কারণে। সপ্তদশ শতাব্দীতে দক্ষিণরায়, কালুরায় ও পীর বড় খাঁ গাজীর কাহিনীতে পীর-মাহাত্ম্য কাব্যের প্রথম উন্মেষ। তাহার পর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে আমরা অজস্র সত্যপীরের পাঁচালী পাইতেছি।

পীর-মাহাত্ম্য কাব্যের মধ্যে প্রধান হইতেছে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী। অন্যান্য পীরের পাঁচালী স্থানবিশেষের বাহিরে প্রচারিত হয় নাই, এবং সেগুলি সাহিত্যেও কোন স্থান লাভ করিতে পারে নাই।

স্কন্দপুরাণের রেরাখণ্ডে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা আছে। তাহাতে ফকীরের স্থলে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের উল্লেখ আছে। ইহাতে তিনটি কাহিনী আছে—(১) দরিদ্র

ব্রাহ্মণের কাহিনী, (২) বণিক ও তাহার জামাতার কাহিনী, এবং (৩) রাজা ও গোপদিগের কাহিনী। স্কন্দপুরাণের এই অংশের প্রাচীনত্ব নিতান্ত সন্দেহজনক।

বঙ্গে মুসলমান শাসনের শেষের দিকে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ কাহিনীর মধ্য দিয়া হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের একটা সামাজিক রফার প্রচেষ্টা হইয়াছিল। এই প্রচেষ্টা সম্পূর্ণরূপে হিন্দুর দিক্ হইতে, সুতরাং ইহার দ্বারা উভয় ধর্ম্মের মিলনের পথ স্পষ্ট হইলেও সেই মিলন কার্য্যকর হইতে পারে নাই। সত্যনারায়ণ কাব্য-কাহিনীর সাহিত্যে স্থান লাভ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে হইতে পারে, তবে ঐ শতাব্দীতে লিখিত অথবা লিখিত বলিয়া অনুমান করা যাইতে পারে এমন একটির বেশী পাঁচালী আমাদের হস্তগত হয় নাই। সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্মপুরাণে যে "নিরঞ্জনের রুষ্মা" পদটি আছে (যাহা শূন্যপুরাণেও উদ্ধৃত হইয়াছে) তাহাতে পীর-মাহাত্ম্য কাব্যের পূর্ব্বাভাস মিলিতেছে।

সত্যপীর কাহিনীর মধ্যে দুইটি উপাখ্যান আছে। একটি মুখবন্ধস্বরূপ। উহাতে আছে যে শ্রীহরি কোন দরিদ্র ব্রাহ্মণের উপর দয়াপরবশ হইয়া ফকীর বেশ ধরিয়া দেখা দেন এবং তাঁহাকে সত্যনারায়ণের সিন্নি দিয়া পূজা করিতে উপদেশ দেন, তাহাতে ব্রাহ্মণ ঐশ্বর্য্যশালী হয়। দ্বিতীয় উপাখ্যানটি যথাসম্ভব অদল বদল ও সংক্ষেপ করিয়া ধনপতি-খুল্লনা উপাখ্যান হইতে গৃহীত। এক সদাগর সত্যনারায়ণের কৃপায় কন্যাসন্তান লাভ করে। পরে কন্যার বিবাহ হইলে জামাতাকে লইয়া বাণিজ্যে যায় এবং সত্যনারায়ণের পূজা না করায় রাজদ্বারে বিপন্ন হয়। এদিকে সদাগর পত্নী সত্যনারায়ণের পূজা করায় তাহারা বিপন্মুক্ত হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিতে থাকে। যখন সদাগর গৃহের নিকটবর্ত্তী হইয়াছে তখন তাহার কন্যা সত্যনারায়ণের প্রসাদ অবজ্ঞা করিয়া স্বামিসন্দর্শনে ছুটিয়া যায়। ইহাতে ঘাটের নিকটে ভরাডুবি হয়। তখন পুনরায় সত্যনারায়ণের পূজা করায় সদাগর ও তাহার জামাতা বাণিজ্যতরী সমেত জল হইতে উত্থিত হয়।

যতদূর জানা গিয়াছে তাহাতে মনে হয়, ভৈরবচন্দ্র ঘটকের সত্যপীরের পাঁচালীই প্রাচীনতম।[১] কাব্যটি রচিত হয় ১৬২২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭০০-০১ খ্রীষ্টাব্দে।

১। রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক প্রকাশিত; র-সা-প-প ১৩, পৃ ৫১-৬০।

ভূদেব ভৈরবচন্দ্র কবি তুষ্ট মন।
ষোল শত বাইশ শকে করিল রচন॥

"দ্বিজ" রামকৃষ্ণের সত্যনারায়ণ পাঁচালীর একাধিক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[১] তন্মধ্যে একটির লিপিকাল ১৬৫৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৩২ খ্রীষ্টাব্দ।[২] এইটি সম্ভবতঃ পশ্চিমবঙ্গের পুঁথি। পূর্ব্ববঙ্গের পুঁথিটির শেষ এই প্রকার—

ভকতি প্রণতি স্তুতি কিছু নাহি জানি। ক্ষম অপরাধ হরি প্রভু চক্রপাণি॥
ভক্তি করিয়া লও নারায়ণের নাম। কহিল পাঁচালী এই করহ প্রণাম॥
দ্বিজ রামকৃষ্ণ বলে করিয়া প্রণতি। এই হনে পুস্তক যে হইল সমাপতি॥

সত্যনারায়ণ পাঁচালী কাব্য রচয়িতাদিগের মধ্যে অবিসংবাদিতরূপে শ্রেষ্ঠ হইতেছেন রামেশ্বর ভট্টাচার্য্য।[৩] ইঁহার কাব্য এখনকার দিনে পশ্চিমবঙ্গে একচ্ছত্র হইয়াছে। কাব্যটির রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৭১০ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে।[৪] এক "দ্বিজ" রামেশ্বর রচিত জন্মাষ্টমীব্রত কথা পাওয়া গিয়াছে।[৫] ইনি স্বতন্ত্র রামেশ্বর কিনা বলা যায় না।

"বিদ্যাভূষণ" ফকীররাম দাসের কাব্যের রচনাকাল হইতেছে ১০১৭ মল্লাব্দ অর্থাৎ ১৭১১ খ্রীষ্টাব্দ।

ইতি সন হাজার সতের জ্যৈষ্ঠ মাসে।
সাঙ্গ কৈল পুস্তক ফকীররাম দাসে॥[৬]

ফকীররাম একটি অঙ্গদ-রায়বার পালা লিখিয়াছিলেন। একথা পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।

বিকল চট্টের সত্যনারায়ণের পাঁচালী[৭] বীরভূম অঞ্চলে বিশেষ প্রচলিত আছে। ইঁহার পিতার নাম বারাণসী, পিতামহের নাম রমানাথ। ১৬৩৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭১২ খ্রীষ্টাব্দে ভাদ্রমাসে ইনি কবিতাটি রচনা করিতে আরম্ভ করেন। গ্রন্থারম্ভে আছে—

১। ব-সা-প-প ৮, পৃ ৪৭; ঐ ৪, পৃ ৩৪০। ২। ঐ ৪, পৃ ৩৪০। ৩। চতুশ্চত্বারিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। ৪। একটি পুঁথির লিপিকাল ১১১২ সাল। ইহা মল্লাব্দ কিনা জানি না। ৫। বা-প্রা-পু-বি ২-১, পৃ ৪১। ৬। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩৪০; ব-সা-প-প ৬, পৃ ৭৬। ৭। বা-প্রা-পু-বি ২-১, পৃ ১৩।

আগেতে বন্দিব আমি প্রধান পুরুষ। জ্যোতির্ম্ময় হেন ভাবি যাহার স্বরূপ ॥
যার তিনগুণে হৈলা ব্রহ্মা হরি হর। তাহার চরণে মোর প্রণাম বিস্তর ॥
তবে ত বন্দিব আমি দৃঢ় করি মন। একদন্ত স্থূলতনু গজেন্দ্রবদন ॥
করজোড়ে স্তুতি করি করিয়া সেবন। সুমেরুশিখর যেবা করয়ে ভ্রমণ ॥
অনেক প্রণাম করি বৈকুণ্ঠনিবাসী। ভুবনে করিলা খেলা হঞা গর্ভবাসী ॥

... ...

বন্দনা করিতে যত দেবতা এড়ায়। কোটী কোটী নতি মোর সেই দেব পায় ॥
নবদ্বীপে বন্দো প্রভু শচীর নন্দন। হরিনামে ত্রাণ কৈল অখিল ভুবন ॥
হইল ভুবনে নাম সত্যনারায়ণ। যেরূপে করিল লীলা করি নিবেদন ॥
বেদ পূর্ব্বে নেত্র দিহ তাহার পূর্ব্বে রস। তার পূর্ব্বে চন্দ্র আলা কৈল দিগ দশ[১] ॥
তার ঘরে ভাদ্রমাসে হয়্যা অভিলাষী। বুধবারে আরম্ভিল তিথি দ্বাদশী ॥
পিতামহ রমানাথ তাত বারাণসী। রচিল বিকল চট্ট হয়্যা অভিলাষী ॥

বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকার অষ্টম খণ্ডে তিনখানি সত্যনারায়ণ মাহাত্ম্য কাব্য প্রকাশিত হইয়াছিল—(১) অযোধ্যারাম কবিচন্দ্রের সত্যনারায়ণ কথা,[২] (২) "দ্বিজ" রামভদ্রের সত্যদেবসংহিতা,[৩] এবং (৩) "দ্বিজ" বিশ্বেশ্বরের সত্যের পাচালী।[৪] তিনখানি কাব্যই সংক্ষিপ্ত আকারের। প্রথম দুইটি কবিতা টাকী অঞ্চলে যথাক্রমে রাঢ়ীয় ও বঙ্গজ কায়স্থ সমাজে প্রচলিত আছে।

অযোধ্যারামের কবিতায় সদাগরের নাম রত্নাকর, কন্যার নাম সুশীলা, জামাতা কাটোয়া নিবাসী সদানন্দ নাগ। কবি উত্তররাঢ়ের লোক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। সদাগরের বাণিজ্যযাত্রার অংশটি এখানে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। অধিকাংশ সত্যনারায়ণ কাহিনীতে এইরূপ স্থানাদির উল্লেখ দেখা যায় না। প্রাচীন কলিকাতার পার্শ্ববর্ত্তী বহুগ্রামের উল্লেখ পাইতেছি।

বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর। এড়াইল নিজ রাজ্য বাগীশনগর ॥
বেণীপুর রহে বামে ডাহিনে সনত। উজানি পশ্চাতে করি চলে বায়ুবৎ ॥
বড়জাঁহাপুর ত্যজি আইল সাকাই[৫]। কাটোয়া ইন্দ্রাণী বাহি পাটুলি এড়াই ॥

১। পাঠ 'দিগদরণ।' ২। পৃ ৩৫-৭২। পুঁথিতে কাব্যটির কোন নাম দেওয়া নাই।
৩। পৃ ১৩১-৩৬। ৪। পৃ ১৯৩-১০০। ৫। বিপ্রদাসের বর্ণনায় 'শাখাই।'

ত্যজিয়া কুবজপুর সাধু গুণনিধি। নবদ্বীপ রহে পাছে আর খড়ে নদী॥
গুপ্তিপাড়া ডাহিনে রহিল বহুদূর। বামেতে রহিল গ্রাম নাম শান্তিপুর॥
জিরাট করিয়ে পাছে সাধুর সন্ততি। ত্রিবেণী ত্রিধারা যথা হৈল ভাগীরথী॥
মুহূর্ত্তেকে এড়াইল হুগলি সহর। চুঁচুড়ায় পূজিল ঠাকুর ষাঁড়েশ্বর॥
দেগঙ্গে আইল তরী বায়ু অনুকূল। যথায় নিমের গাছে ফোটে চাঁপা ফুল॥
চাকলে পূজিল হর হরিষ বিশেষ। জগন্নাথ পূজা কৈল আকিনা[১] মাহেশ॥
ভদ্রখালি বালি বামে বরাহনগর। ডিহি কলিকাতা বাহি চলে সদাগর॥
ধুলন্ত রহিল বামে ডাহিনে জিরাট। ত্যজিয়া ভবানীপুর গেল কালীঘাট॥
বিধির স্থাপিত কালী পূজিলেন তায়। তরণীতে উঠিল অযোধ্যারামে গায়॥

কালীঘাট পরিহরি বাহে তবে সাত তরী মহা আনন্দিত সদাগর।
বাজে দামা দড়মশা, বামে রহে গ্রাম রসা, গীত গায় ঘাটের গাবর॥
শাখা বাহি সারভাট্টা, ডাহিনে বৈষ্ণবঘাট্টা, তীরের সমান তরী চলে।
বামে মহামায়াপুর মালঞ্চ করিয়ে দূর উপনীত হৈল ম্রদনমলে[২]॥
বারুইপুরের পর রত্নাকর সদাগর সাধুঘাট্টা করিল পশ্চাৎ।
বারাসত গ্রামে গিয়ে নানা উপহার দিয়ে পূজিল অনাদ্য বিশ্বনাথ॥
অবিলম্বে হেতেগড় এড়াইল দড়বড়, করে সবে হরি হরি রব।
তবে গঙ্গা পরশিয়ে কপিলেরে প্রণমিয়ে পূজে গঙ্গাসাগরে মাধব॥
বন্দিয়া দক্ষিণরায় সিন্ধু মধ্যে তরী বায়, বিষম তরঙ্গ কূল নাই।
বেণীতরণের পুর এড়াইল বহুদূর, নীলগিরি দরশন পাই॥
উড়িষ্যায় জগন্নাথে সুভদ্রা বলাই সাথে দরশন কৈল সদাগর।
যেবা দেখে একবার পুনর্জ্জন্ম নাই তার, মহিমা মহেশ অগোচর॥

শেষের ভণিতা এইরূপ—

রচিল অযোধ্যারাম কবিচন্দ্র রায়।
হরি হরি বল সবে পুস্তক হইল সায়॥

১। পাঠ 'একেলা।' ২। অর্থাৎ মেদনমল্লে।

"দ্বিজ" রামভদ্রের কবিতায় সাধুর নাম ধনেশ্বর,[১] জামাতার নাম চন্দ্রকেতু। সদাগর সিংহল পাটনে নহে, সুরত বন্দরে বাণিজ্য করিতে গিয়াছিলেন। সদাগরের ক্রয়বিক্রয়বর্ণনায় সেকালের বাণিজ্যদ্রব্যের তালিকা পাওয়া যায় বলিয়া ইহার ঐতিহাসিক মূল্য যৎকিঞ্চিৎ থাকিতে পারে।

সুরত বন্দর আইল সদাগর, আগে ভেটে নৃপমণি।
রাজভেট দিয়া সাক্ষাৎ করিয়া তথা করে বিকিকিনি॥
হীরা লাল চুনি চন্দ্রকান্ত মণি প্রবাল পরশশিলা।
রজত কাঞ্চন চামর চন্দন শঙ্খ মুকুতার মালা॥
গজমোতি কিনি পূরিল তরণী, বস্ত্র কেনে কুতূহলী।
আশমানি তুষি নানাবর্ণ সুশি খাসা মলমল চেলি॥
রাজরাণী ভুনি সোনালি উড়ানি রেশমি পশমি জুরি।
মালদহী চিরে সেতুবন্ধ ডুরে সফেদ পামরি বারি॥
ছিট গুজরাটী বন্ধবি কর্ণাটী জোড় ধুতি কৃষ্ণচেলি।
চাকুলে বনাত ভোট সকলাত হাজিবেকা ধনেখালি॥
সাহল পামরি পেয পোয জরি বালাবন্ধ আতলসি।
অগৌর আতর লবঙ্গ কর্পূর শঙ্খরস শিলারসি॥
অশ্ব নানা রঙ্গ কিনিল তুরঙ্গ তুরকি টাঙ্গন তাজি।
ইহা রূহ (?) হাল মুস্কি মৌজে ঢাল নীল আবলখা বাজী॥

মধ্যের ও শেষের ভণিতা এইরূপ—

দ্বিজ রামভদ্র বলে ভাবি ভগবান।
আপনার দোষে দুঃখ পাইল অজ্ঞান॥

যে জন একথা শুনে সর্ব্বদুঃখ বিমোচনে, অন্নকষ্ট দরিদ্রতা নাশে।
রাজ্যভ্রষ্ট রাজ্য লভে, রামভদ্র এই ভাবে সত্যদেবসংহিতা প্রকাশে॥

"দ্বিজ" বিশ্বেশ্বরের কবিতায় সদাগরের নাম শঙ্খপতি, কন্যার নাম কলাবতী এবং জামাতার নাম লক্ষপতি। শেষের ভণিতা এইরূপ—

১। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় 'ধলেশ্বর' পড়িয়া ইহাকে নদীর নাম মনে করিয়া কবিকে ধলেশ্বরী-তীরনিবাসী মনে করিয়াছিলেন [ব-সা-প-প ৮, পৃ ৫৬]।

দ্বিজ বিশ্বেশ্বর বোলে ভাবিয়া নারায়ণ।
[শ্রী]হরিচরণে সদা রহুক মোর মন ॥

রাজসাহী অঞ্চল হইতেও বিশ্বেশ্বরের কাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে এই অঞ্চলের নদীর নাম পাওয়া যায়। একটি পুঁথির লিপিকাল ১১৫১ সাল।

ভারতচন্দ্র রায়ের সত্যনারায়ণমাহাত্ম্য বিষয়ক ক্ষুদ্র কবিতা দুইটির একটি ১১৪৩ বা ১১৪৪ সালে অর্থাৎ ১৭৩৬-৩৮ খ্রীষ্টাব্দে দেবানন্দপুরে রচিত হয়। তখন ভারতচন্দ্রের বয়স অল্প, সেখানে রামচন্দ্র মুনশীর আশ্রয়ে থাকিয়া ফারসী পড়িতেছিলেন। কাব্যের শেষে এইরূপ কবিপরিচয় পাওয়া যায়—

ভরদ্বাজ-অবতংস ভূপতি-রায়ের বংশ সদা ভাবে হতকংস ভুরশুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভারতীযুত ফুলের মুখুটী খ্যাত দ্বিজপদে সুমতি॥
দেবের আনন্দ ধাম দেবানন্দপুর নাম, তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায় হয়ে মোরে কৃপাদায় পড়াইল পারসী॥
সবে কৈল অনুমতি, সংক্ষেপে করি পুঁথি, তেমতি করিয়া গতি না করিও দূষণা।
গোষ্ঠীর সহিত তায় হরি হৌন বরদায়, ব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা॥

কবিবল্লভ বা "কবি" বল্লভ বিরচিত সত্যনারায়ণ পাঁচালী কাব্যের ১১৬২ সালে লিখিত যে পুঁথি মুর্শিদাবাদ অঞ্চল হইতে পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে কাব্যের একটি অংশ মাত্র পাওয়া যাইতেছে। এই অংশটির নাম মদনসুন্দর পালা।[১] ইহাতে যে কাহিনী পাই তাহা অভিনব বটে। সদানন্দ ও বিনোদ সদাগর দুই ভাই রাজাজ্ঞায় সফর যাইবার কালে সমুদ্রবক্ষে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য দেখিল।

সদাগরে বিড়ম্বনা করেন খোদায়। পাথরের গোর এক ভাসয়ে দরিয়ায়॥
নৃত্য করে নর্ত্তকী কিন্নরে গীত গায়। দরিয়ার বিচেতে অপূর্ব্ব শোভা পায়॥
মৃগছাল পানির উপরে ডাল্যা দিয়া। চারি ফকীর নিমাজ করে পশ্চিম মুখ হয়্যা॥

যথারীতি সদাগরেরা রাজাকে এই দৃশ্য দেখাইতে না পারায় কারারুদ্ধ হইল। ওদিকে বাড়ীতে উহাদের স্ত্রী এক ফকিরের পাল্লায় পড়িয়া সিদ্ধাই শিখিয়া গাছে চড়িয়া দেশে বিদেশে যাইতেছে। একবার তাহাদের সঙ্গে লুকাইয়া গিয়া সদাগরদের

১। ব-সা-প প্রকাশিত (১৩২২)।

ছোট ভাই মদন এক রাজকন্যাকে বিবাহ করিয়া পলাইয়া আসিল। পরে নানা বিড়ম্বনার পর রাজকন্যার সহিত মিলন হইল। তখন দুই যা বুঝিতে পারিল যে মদন তাঁহাদের কাণ্ডকারখানা জানিয়াছে। তাহারা তুক করিয়া মদনকে শ্যেন পক্ষী করিয়া দিল। খোদা বাজ পাখী হইয়া তাহাকে তাড়া করিয়া পাটনে লইয়া গেলেন, যেখানে তাহার দুই ভাই বন্দী আছে। তাহার পর দেওয়ান (খোদা) রাজাকে স্বপ্ন দিলেন,

শুনহ বেইমান রাজা বাত কহুঁ তোরে। রাখ্যাছ গোলাম মেরা কিসের খাতিরে ॥
সাত হাজারের মার্ত্তা লইয়াছে ভাঁড়্যা। মহল ভিতরে নাচে সাত শত নাড়্যা ॥
হান হান কাট কাট করিয়া ফুকুরে। রুধিরের নদী বহে মহল ভিতরে ॥
তামাম সহরে আগ লাগাইয়া দিল। জরু জাতি মাল মার্ত্তা জ্বলিতে লাগিল ॥

রাজা ভয় পাইয়া সদানন্দ বিনোদকে ছাড়িয়া দিল। তাহারা দেশে ফিরিল। আসিবার কালে সেই শ্যেন পক্ষীকে ধরিয়া লইল, কারণ মদন এই পাখী একটি আনিবার কথা বলিয়াছিল। দেশে ফিরিয়া ভাইকে না দেখিয়া দুইজনে শোক করিতে লাগিল। তাহার পর খোদা ফকীরের বেশ ধরিয়া মদনের পত্নী কুন্তলাকে সত্যনারায়ণের পূজা দিতে বলিলেন। কুন্তলা তাহাই করিল এবং পিঞ্জরস্থ শ্যেন পক্ষীকে কিছু সিন্নি দিল। সিন্নি খাইয়া মদন নিজের পূর্ব্বরূপ ফিরিয়া পাইল।

ভণিতায় শ্রীকবিবল্লভ নাম পাওয়া যায়, একবার মাত্র শ্রীবল্লভ। সম্ভবতঃ ইহাই কবির নাম ছিল।

রাজকন্যা কহে কিছু ফকিরের পায়।
হুকুম পীরের শ্রীবল্লভ কবি গায় ॥ পৃ ৪৭ ॥

সদাগর দুইজনের সফরের বর্ণনায় যে সব স্থানের নাম পাওয়া যায় তাহাতে মনে হয় যে কবির বাসস্থান ছিল পশ্চিমবঙ্গে, ভাগীরথীর পশ্চিমকূলে ত্রিবেণীর নিকট। হুগলী সহর তখন জাঁকাইয়া উঠিয়াছে। যাইবার কালে

বাহ বাহ বলিয়া ডাকেন সদাগর। হাথে দণ্ড কেরুয়ালে বসিলা গাবর ॥
সপ্তগ্রাম বাহি সাধু পাইলা ত্রিবেণী[১]। হুগলী প্রবেশ হল্য সাধুর তরণী ॥

১। পাঠ 'ত্রিপীনি।'

নাএ বসি সদাগর দেখে নানা রঙ্গ। তিন দিন বাহি সাধু পাইল দিগঙ্গ ॥
সাধুর প্রতাপে কেহ নাহি বলে রহ। ডাহিনে বাহন (?) বাএ বামে খড়দহ ॥
মগরা সাগর রাখি সঙ্গম বাহিল। কহর দরিয়ায় সাধু উপনীত হল্য ॥ পৃ ২ ॥

ফিরিবার বেলায়

দুর্জ্জয়[১] মগরা রাখি পাইল দিগঙ্গ। তিন দিন হুগলী সহরে দেখে রঙ্গ ॥
সপ্তগ্রাম বাহি ডিঙ্গা আপনার ঘাটে। নানা দ্রব্য ভরা সাধু দিলেন শকটে ॥
পৃ ৪৪ ॥

বর্দ্ধমান জেলার উত্তর ও উত্তরপূর্ব্ব অংশে বহু সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচিত হইয়াছিল। "দ্বিজ" গিরিধরের নিবাস ছিল মন্তেশ্বর থানার অধীন ভারুহা গ্রামে। অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মতে গিরিধরের কাব্য রচিত হয় ১০৭০ সালে অর্থাৎ ১৬৬৩-৬৪ খ্রীষ্টাব্দে।[২] ইহা সত্য হইলে এইটিকেই প্রাচীনতম সত্যনারায়ণ পাঁচালী বলিতে হয়। কবির ভণিতা এইরূপ—

পিতামাতা বন্দো শিক্ষাগুরুর চরণে। বাস করি ভারুহা সাহাবাদ পরগণে ॥
পীরের পীরিতে হরি বল সর্ব্বজনে। পূর্ব্বকথা অনুক্রমে দ্বিজ গিরি ভণে ॥

মৌজিরাম ঘোষালের বাস ছিল পাটুলীর নিকটবর্ত্তী নারায়ণপুর গ্রামে।

নারায়ণপুরে ধাম কবি নাম মৌজিরাম জাতিতে ঘোষাল ব্রাহ্মণ ॥[৩]

কৃষ্ণকান্তের কাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে কালনার নিকটবর্ত্তী ধাত্রীগ্রামে।[৪] অম্বিকাচরণ ব্রহ্মচারী মহাশয়ের মতে শিবচরণের কাব্যও এই অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল।[৫]

রামশঙ্কর সেনের নিবাস ছিল সাতসইকা পরগনার অন্তর্গত সাহাপুর গ্রামে। পিতার নাম বাবুরাম সেন।

বাবুরাম সেন-সুত শ্রীরামশঙ্কর খ্যাত
সাতসইকা সাহাপুর ধাম ॥[৬]

১। ঐ 'দুর্জ্জন।' ২। ব সা-প-প ১৯, পৃ ১৩২। ৩। ঐ, পৃ ১৩৪। ৪। ঐ, পৃ ১৩৩।
৫। ঐ, পৃ ১৩২। নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় এক কবি শিবরামের নাম করিয়াছেন [বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ১৫৫]। উভয় নাম কি একই ব্যক্তির?
৬। শ্রীযুক্ত ক্ষীরোদচন্দ্র সেন মহাশয়ের নিকট এই সংবাদ পাইয়াছি।

"দ্বিজ" কৃপারামের নিবাস ছিল বর্দ্ধমানের উত্তরে দেবগ্রামে। ইনি বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের আমলে (রাজ্যকাল ১৭৭৯-১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ) সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনা করেন।[১]

কহে৷ দ্বিজ কৃপারাম নিবাস এই দেবগ্রাম,
সদা প্রভু রাখুন সুস্থির ॥
পীরের মঙ্গল কথা হৈল সমাধান।
নৃপতি তেজশ্চন্দ্রের বাড়ুক কল্যাণ ॥

একটি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচয়িতা "শ্রীকবি পণ্ডিত" গুণনিধি চক্রবর্ত্তী বর্দ্ধমান জেলার অন্তর্গত পাটুলী-নারায়ণপুর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন, এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে।[২] কাব্যটিতে বর্দ্ধমান জেলায় প্রচলিত বহু চলিত শব্দের প্রয়োগ আছে, ইহা উক্ত প্রসিদ্ধির সমর্থক। ভণিতা এইরূপ—

বিরচিল শ্রীকবি পণ্ডিত গুণনিধি।

সত্যপীরের বর্ণনা এইরূপ—

অসত্য গো-ধরা শুনি, বন্দো দেবশিরোমণি সত্যপীর পতিতপাবন।
সুরাসুর তপোধন শঙ্কর চতুরানন সেব্যমান শার্দ্দূলবাহন ॥
বিরাজিত মনোহর জিনিয়া কুসুমশর তনুবর সুন্দর নবীন।
সোনার খড়ম পায়, বাঘের চামড়া গায়, পরিধান কেবল কৌপীন ॥
সত্যবান্ সত্যপীর দয়াময় ধর্ম্মধীর অবধূত বেশে অবতীর্ণ।
চরণে যে করে নতি সুখে সেই মহামতি কলি-কালকূট করে জীর্ণ ॥

আখ্যানাংশের অবতারণা এইরূপে করা হইয়াছে—

কাশীপুর নগরে নিবাস বাড়ী-ঘর। এক জন ব্রাহ্মণ দরিদ্র দামোদর ॥
ব্রাহ্মণীর হাতে নাই পিতলের খাড়ু। জলপাত্র কেবল মাত্র পুরাণ গোছের গাড়ু ॥
বেড়ার কুঁড়িয়াঘর খড় নাই চালে। পরঘর নিবাস বরষা বৃষ্টিকালে ॥
হাঁড়ি নড়ে বাতাসে দুয়ারে নাই টাটী। ওড়ন পাড়ন মাত্র খেজুরের চাটী ॥

১। ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি প্রথম খণ্ড (বসুমতী কার্য্যালয়, দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ ৫৪০-৪৮। এই গ্রন্থে আরও দুইটি সত্যনারায়ণ পাঁচালী প্রকাশিত হইয়াছে। একটি শঙ্কর আচার্য্য রচিত, অপরটি ভণিতাহীন। শেষেরটি একেবারে আধুনিক হওয়াই সম্ভব। ২। ব-সা-প-প ১৯, পৃ ১২৯।

এক সত্যনারায়ণ পাঁচালীর রচয়িতা রামভদ্র পূর্ব্বোক্ত গুণনিধি চক্রবর্ত্তীর সমসাময়িক হইতে পারেন।[১]

কাশীনাথ ভট্টাচার্য্য সার্ব্বভৌম বর্দ্ধমান জেলায় মন্তেশ্বর থানার অধীন নাশীগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম বৈদ্যনাথ বিদ্যালঙ্কার। ইতি ১৭৪০ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮১৮-১৯ খ্রীষ্টাব্দে সত্যনারায়ণ পাঁচালী কাব্য রচনা করেন।[২]

অন্তরীক্ষ বেদ অব্ধি নিশাকর শকের গণনা করি।
পাঁচালী বিধান হৈল সমাধান, সবে বল হরি হরি॥

কবির ভণিতা এইরূপ—

কহে দ্বিজ কাশীনাথ করপুট করি।
পার কর প্রভু মোরে ভব পারাবারি॥

কবি সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন, এই কারণে ইহাঁর কাব্যে তৎসম শব্দ ও অনুপ্রাসের আতিশয্য দেখা যায়। যথা—

বিবিধবিধানে বিষ্ণু বানাইল বেশ। বিবরণ বিধানেতে বলিব বিশেষ॥
বারিবপুসম্ভবা বসিল বামপাশে। বিরাজে দক্ষিণে বাণী বীণা বাহুদেশে॥
চতুর্ভুজ চক্রপাণি চঞ্চললোচন। চরণনখরচন্দ্র চকোরের ধন॥
চরাচরপতিচারুচরণকমলে॥ চতুর্ব্বেদ চমকিত চতুর্ব্বর্গফলে॥

"দ্বিজ" জনার্দ্দনের সত্যনারায়ণ পাঁচালীর একটি পুঁথির লিপিকাল ১১৭০ সাল অর্থাৎ ১৭৬৩ খ্রীষ্টাব্দ। এখানি কবির স্বহস্তলিখিত পুঁথির অন্যতম বলিয়া প্রসিদ্ধ।[৩] প্রসিদ্ধি এই, "সন ১১৫০ সালে মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দি উপবিভাগের অন্তর্গত ভরতপুর থানার অধীন আলুগ্রাম নামক গ্রামে রাঘবেন্দ্র বিদ্যাভরণ ভট্টাচার্য্যের পুত্র এবং বাণীকান্ত ভট্টাচার্য্যের পৌত্র কবি জনার্দ্দন ভট্টাচার্য্য জন্মগ্রহণ করেন।" কথিত আছে, কবির যেদিন জন্ম হয় সেই দিন তাঁহার পিতামহ বর্গীদের হস্ত হইতে আশ্চর্য্যভাবে রক্ষা পান, সেই কারণে তিনি পৌত্রের নাম জনার্দ্দন রাখেন।[৪]

১। ব-সা-প-প ১৯, পৃ ১৩১-৩২। ২। ঐ, পৃ ১৩৫।
৩। বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ৬১-৬২। ৪। এডুকেশন গেজেট ১৩১০ সাল ৩১শে ভাদ্র সংখ্যা [বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ৬১-৬২]।

ভণিতা হইতে অনুমান হয়, কবি বিশেষ মাতৃভক্ত ছিলেন।

জননীর পাদপদ্ম করিয়া স্মরণ।
পাঁচালীপ্রবন্ধে গায় দ্বিজ জনার্দ্দন ॥
মনে করি অভিলাষ, দশ দিন দশ মাস
যিঁহো মোরে ধরিলা উদরে।
শাস্ত্রেতে নাহিক জ্ঞান, কত হব সাবধান,
সেই পদ বন্দি সহস্রারে ॥

"দ্বিজ" অমরসিংহ সম্ভবতঃ বীরভূম জেলার লোক ছিলেন। ইঁহার কাব্য প্রাচীনতর হওয়াই সম্ভব। ভণিতা এইরূপ—

ভণে দ্বিজ অমর সিংহ, কৃষ্ণকথা মধু-ভৃঙ্গ
পিয় নর কর্ণপুট[১] ভরি ॥[২]

বীরভূমের ইন্দ্রাগাছা গ্রামনিবাসী "দ্বিজ" রামচন্দ্র উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে একটি সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনা করেন।[৩]

ইন্দ্রাগাছা গ্রামেতে নিবাস হয় যার।
দ্বিজ রামচন্দ্রে ভণে মধুর পয়ার ॥

ইঁহার পুত্র নিকুঞ্জলাল চক্রবর্ত্তীও একখানি সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন।[৪]

চাটিগ্রাম অঞ্চলের বহু কবি সত্যনারায়ণ পাঁচালী কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। যথা—"দ্বিজ" রামানন্দ,[৫] "দ্বিজ" রঘুনাথ,[৬] "দ্বিজ" রামকৃষ্ণ,[৭] ফকিরচাঁদ (নিবাস শুচিয়া গ্রাম),[৮] এবং "দ্বিজ" দীনরাম।[৯]

নয়নানন্দ বিরচিত সত্যনারায়ণমঙ্গলের পুঁথি উত্তরবঙ্গে রঙ্গপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু "কবি উত্তরবঙ্গের লোক নহেন, গঙ্গাতীরবর্ত্তী ভূভাগে তাঁহার জন্মস্থান, ইহা পুঁথির একটি শ্লোক পাঠে অবগত হওয়া যাইতেছে।"[১০]

১। পাঠ 'করপুট।' ২। বা-প্রা-পু-বি ২-১, পৃ ৪৯। ৩। ঐ, পৃ ১৪। ৪। ঐ, পৃ ১৪-১৫। ৫। ঐ ১-১, পৃ ২৩। ৬। ঐ, পৃ ৯৭-৯৮। ৭। ঐ, পৃ ২৪৩। ব-সা-প-প ২৪, পৃ। ৮। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ২৩। ৯। ঐ ১-২, পৃ ৫-৬; ব-সা-প-প ১২, পৃ ১৮৯-৭২। ১০। র-সা-প-প ৪, পৃ ৬১; ১৩, পৃ ৫৫-৫৬।

পুঁথির লিপিকাল (কাব্যের রচনাকালও) " শক ১৬৬৪ সন ১১৫০।" ভণিতা এইরূপ—

গিরিজাতনয় ভাবি রচিল পাঁচালী।
কহিল নয়নানন্দ বল হরি হরি ॥

শঙ্কর আচার্য্য রচিত সত্যপীরকথার একটি পুঁথির লিপিকাল ১০৬২ মল্লাব্দ অর্থাৎ ১৭৫৬ খ্রীষ্টাব্দ।[১] পুঁথির শেষ এই প্রকার—

আমিন আমিন বলি সভে সার কার্য্য। আজ্ঞায় রচিল ইহা শঙ্কর আচার্য্য ॥
শুনিলে সে অবশ্য হয় সিদ্ধি কার্য্য। ধনপুত্রলক্ষ্মীলাভ সুখে করে রাজ্য ॥

শঙ্কর আচার্য্যের কাব্যের বর্ণনীয় বিষয় সাধারণ পাঁচালীর মত নহে। ইহাতে সত্যপীর মানব সন্তান, সুলতান আলা বাদশাহের অনূঢ়া কন্যার গর্ভজাত। কাব্যটিতে ইহারই কেরামতী ও বুজরুকি বর্ণিত হইয়াছে। অনুরূপ কাহিনী লালমোনের কেচ্ছা পুস্তকে দেখা যায়। কৃষ্ণহরি দাসের কাব্যও এই শ্রেণীর।

রঙ্গপুর জেলার অন্তর্গত মহীপুর গ্রামনিবাসী কৃষ্ণহরি দাস নামক এক সহজিয়া মতাবলম্বী বৈষ্ণব স্থানীয় মুসলমান জমিদার তাহের মামুদের আশ্রয়ে থাকিয়া এক অপূর্ব্ব সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেন।[২] কবির পিতার নাম রামদেব। কাব্যরচনাকালে কবি বলিয়া যাইতেন আর হরনারায়ণ দাস লিখিয়া লইত। ভণিতা হইতে এই তথ্যগুলি পাওয়া যায়।

সত্যের পাঁচালী গান শুনিতে মধুর।
কৃষ্ণহরি দাস ভণে নিবাস মহীপুর ॥

নম নারায়ণ বলি বন্দিল চরণ।
কৃষ্ণহরি দাস ভণে রামদেব-নন্দন ॥

১। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩৪১। মল্লাব্দ বলিয়া উল্লেখ নাই বটে, কিন্তু পুঁথি বিষ্ণুপুর অঞ্চলের সুতরাং ইহা মল্লাব্দ বলিয়া গ্রহণ করাই সঙ্গত। কাব্যটি শ্যামাচরণ কবিরত্ন কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। অপর আর একজন শঙ্কর আচার্য্য ছোট একখানি পাঁচালী লিখিয়াছিলেন।

২। র-সা-প-প ৫ (ষষ্ঠ বর্ষের কার্য্য বিবরণী), পৃ ৭ (পুঁথির লিপিকাল ১২৯০ সাল), ঐ ৭ (সপ্তম বর্ষের কার্য্য বিবরণী), পৃ ১৭ ঐ ৬, পৃ ৪৩-৪৪।

তাহের মামুদ সরকার সমস-নন্দন।
তাহার সেবক কবি কৃষ্ণহরি গান ॥
হরনারায়ণ দাসে লেখে রচে কৃষ্ণহরি।
মোছলমানে বলে আল্লা বৈষ্ণবে বলে হরি ॥

কাব্যটির রচনা কাল জানা নাই। কবি চোরের পাঁচালী বা চোর চক্রবর্ত্তী নামে আর একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়।

কৃষ্ণহরির মতে সত্যনারায়ণ বা সত্যপীর মহীদানবের কন্যার গর্ভে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

সত্যপীরের মাতা রাজা মৈদানবের কন্যা।

"মালঞ্চা নগরের পশ্চিমে নুর নদীর তীরে বালক সত্যনারায়ণ একখানি পুঁথি পড়িয়া পাইলেন। মালঞ্চার রাজা মৈদানবের পুরোহিত, তাহার পালক পিতা কুশল ঠাকুরকে তাহা দেখাইলেন। কুশল ঠাকুর দেখিলেন "কোরাণ" এবং বলিলেন ;—যেখানে পাইয়াছ সেইখানে রাখিয়া আঁইস ; এই গ্রন্থ পড়িলে ব্রাহ্মণের জাতি যায়। সত্যনারায়ণ পুনরায় বলিলেন—কোরাণে কি আছে, যাহার জন্য ব্রাহ্মণের জাতি যায় ? কুশল ঠাকুর বলিলেন,

বিছমোল্লা হরফ আছে কোরাণের আউয়ালে। ব্রাহ্মণের জাতি যায় সেই নাম নিলে ॥
ব্রাহ্মণ হইয়া যদি বিছমিল্লা কয়। শেষ কালে সেই জন বৈকুণ্ঠ না পায় ॥
এক ছাড়ি যেই জন দুই ভাব করে। সংসার তরিবে কি দোজখে পড়ি মরে ॥

অর্থাৎ বিষ্ণু ও বিছমোল্লা পৃথক্। এক জাতি দুই ভাবিলে নরক গমন ধ্রুব। কবি সত্যনারায়ণমুখে বলাইতেছেন,

হাসিয়া কহিছে কথা সত্যনারায়ণ। নাম নিলে জাতি নষ্ট করে কোন জন ॥
এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর দুই ব্রহ্ম নাই। সংসারের কর্ত্তা এক নিরঞ্জন গোসাঞী ॥
হস্ত পদ নাহি তার করিছে বিহার। মুখ নাহিক তার করিছে আহার ॥
কর্ণ নাই কথা শুনে চক্ষু নাই দেখে। দেখিতে না পারে কেহ সর্ব্বঘটে থাকে ॥
সেই নিরঞ্জনের নাম বিছমোল্লা কয়। বিষ্ণু আর বিছমোল্লা কভু ভিন্ন নয় ॥"

কবির উদ্দেশ্য মহৎ, হিন্দু ও মুসলমান ধর্ম্মের বিরোধ দূর করিয়া উভয় সমাজের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপন করা।

বিদ্যাপতি বিরচিত সত্যনারায়ণের পাঁচালীর পুঁথির লিপিকাল ১০৯০ (মল্লাব্দ) সাল।[১] কাব্যে একাধিক স্থানীয় পীরের নাম করা হইয়াছে। যেমন,

গোসা দিয়া জমিনে হাতেতে দিয়া কর। বন্দিব রসুল মহামদ পেয়কম্বর ॥
আম্বুয়ার অম্মর[২] বন্দিব উসনমান[৩]। হালিসহরের বন্দো মোক্কার মোকাম ॥
বন্দিব দুন্ন (?) ঘোড়া বড়ি যার বেগ। কাফির কাদির বন্দো যুগল ফাক্কা পর তেগ ॥

দেপুরে সায়াতার গড়ে বন্দো সইদ[৪] ব্রাহ্মণ।
বর্দ্ধমানে বন্দো পীর বাহারাম ॥
জোমা[৫] দুই রোজে যার হয় যে বারাম। ইত্যাদি।

ভণিতা এইরূপ—

নিয়ত হাসিল সত্যপীরের কালাম।
কহে বিদ্যাপতি করি হাজার সালাম ॥

সত্যপীর সাহেব অনেক রহিমান।
কহে বিদ্যাপতি করি হাজার সালাম ॥

কবি বর্দ্ধমানের লোক ছিলেন বলিয়া মনে হয়।

দুর্গাপ্রসাদ ঘটকের সত্যনারায়ণ পাঁচালীর এক পুঁথির লিপিকাল হইতেছে ১২১০ সাল। কাব্যটি নিতান্ত ক্ষুদ্র,[৬] এবং আগাগোড়া ভুজঙ্গপ্রয়াত ও তোটক ছন্দে রচিত।

অন্যান্য সত্যনারায়ণ পাঁচালী কাব্যের রচয়িতাদিগের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন—নরহরি,[৭] মধুসূদন,[৮] "দ্বিজ" কালিদাস,[৯] "দ্বিজ" বিশ্বনাথ (নদীয়া জেলায় বেলপুখুরিয়া গ্রামনিবাসী কন্দর্প বাচস্পতির পুত্র),[১০] গোবিন্দ

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ২০৭৭। ২। উমর ? ৩। ওসমান ?
৪। শহীদ, না সৈয়দ ? ৫। জুম্মা। ৬। শ্রীযুক্ত ধীরেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় প্রকাশিত (সেনহাটি, ১৩৩৩)। ৭। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩৪০। ৮। ক্রিয়াকাণ্ডবারিধি প্রথম খণ্ড (বসুমতী কার্য্যালয়, প্রথম সংস্করণ), ব-সা-প-প ১৩, পৃ ৫৭-৬০। ৯। কালীপ্রসন্ন ঘোষ কর্ত্তৃক প্রকাশিত; ব-সা-প-প ১৩, পৃ ৫৭-৬০। ১০। ব-সা-প-প ১৩, পৃ ৫৫-৫৬।

ভাগবত, শিবচন্দ্র সেন (বিক্রমপুরের কাঁটাদিয়া গ্রামনিবাসী), "দ্বিজ" রামকিশোর, বিপ্রনাথ সেন (শ্রীহট্ট নিবাসী)।[১]

সত্যপীরের পূজা ও পাঁচালীর অনুকরণে পূর্ব্ববঙ্গে চাটিগ্রাম অঞ্চলে ত্রৈলোক্য-পীরের পূজা ও পাঁচালীর প্রচার হইয়াছিল। এই ব্যাপার অনেকটা আধুনিক বলিয়া মনে হয় এবং ইহার যে বিশেষ প্রসার হইয়াছিল তাহাও মনে হয় না। ত্রৈলোক্য-পীরের পাঁচালী কয়েকটি পাওয়া গিয়াছে।[২] তাহার মধ্যে দুইটিতে কবির নাম পাই। একটির রচয়িতা হরিনারায়ণ বা হরিরাম দাস, অপরটির রচয়িতা "দ্বিজ" রামগঙ্গা বা রামগঙ্গা দাস।

হরিনারায়ণের কাব্যের আরম্ভ এইরূপ—

পূর্ব্বদিগে বন্দিব আমি শ্রীভানু ভাস্কর। একদিগে উঠে ভানু চৌদ্দিকে পসর ॥
উত্তরে বন্দিব আমি হিমালয় মহাজন। যাহার হিমালে কাঁপে এই তিন ভুবন ॥
দক্ষিণে বন্দিব আমি ক্ষীরনদী সাগর। যাহার প্রসাদে জীয়ে মাছ সদাগর ॥
... ...
স্তুতি করি কহি শুন হইয়ে এক মন। কহিব পাঁচালী কিছু পীরের কারণ ॥
এক দিন সত্যপীর পৃথিবীতে আসি। মোকাম করিয়া বৈসে তীর্থ বারাণসী ॥
হেনকালে তথাতে আসিয়া মোচরা পীর। আসা হাতে করিয়া যে আগে হইল স্থির ॥
... ...
মোচরা পীরে কহে কথা সত্যপীরের ঠাই। ত্রৈলোক্য পীর আছে মোর জ্যেষ্ঠ ভাই ॥

ভণিতা এইরূপ—

যদি ঘোড়া না পাই আমি তথাপিহ গতি তুমি, প্রাণ দিব তোমার উপর।
কহে হরিনারায়ণ, পীরের চরণে মন ভক্তি কর পাইবা ঘোটক ॥
সংক্ষেপে কহিল কিছু পীরের ইতিহাস।
ভক্তি করি শুন কহে হরিরাম দাস ॥

১। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পরিশিষ্ট ১, পৃ ১১।
২। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৫০ ; ঐ ১-২, পৃ ২৪, পৃ ৯৪-৯৫।

রামগঙ্গার কবিতার ভণিতা এইরূপ—

দ্বিজ রামগঙ্গা কহে করিয়া স্তবন।
সাধুর পুণ্যের কথা না যায় কহন॥

রামগঙ্গা দাসে কহে,[১] প্রচুর পুণ্যের ফলে
সাধু পাইল ভুবন-ঈশ্বর॥

শ্রীহট্ট অঞ্চলে এই ধরণের হাস্তনাথের পাঁচালী উদ্ভূত হইয়াছিল। জয়কৃষ্ণ দত্ত, বিপ্রনাথ সেন প্রভৃতি কবির রচিত হাস্তনাথের পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে।[২]

এই প্রসঙ্গে চব্বিশ পরগনা জেলার দক্ষিণাংশে এবং পূর্ব্ববঙ্গের স্থানবিশেষে প্রচলিত বড় খাঁ গাজী ও মোবারক গাজীর উপাখ্যান উল্লেখযোগ্য। বড় খাঁ গাজীর উল্লেখ কৃষ্ণরামের রায়মঙ্গলে আছে।[২] নগেন্দ্র নাথ বসু মহাশয় গাজী সাহেবের গানের একটি আধুনিক রূপ প্রকাশিত করিয়াছেন।[৩] এই কাহিনীগুলি লোকমুখে গীত হইত, সত্যপীরের কাহিনীর মত্য সাহিত্যিক মর্য্যাদা লাভ করিতে পারে নাই। ইহার অপর কারণ এই যে ইহারা নিতান্তই স্থানীয় পীর, সার্ব্বভৌম পদবী লাভ করিতে পারেন নাই। বঙ্গের প্রায় সব প্রদেশেই মাণিকপীর অথবা অনুরূপ পীরের গান প্রচলিত আছে। এগুলি সংগৃহীত হওয়া খুবই আবশ্যক।

১। 'বলে' হইবে। ২। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পরিশিষ্ট ১, পৃ ১০, ১১; ঐ তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৯৮।
৩। ব-সা-প-প ৩৫, পৃ ৪৩-৫৬।

অষ্টচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ

পদাবলী ও পদসংগ্রহ গ্রন্থ

অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বিস্তর পদকর্ত্তা জন্মিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহাদের অধিকাংশেরই কবিত্বের বালাই বিশেষ কিছু ছিল না। তথাপি কয়েকটি পদকর্ত্তা কবিত্বে এবং রচনাভঙ্গিতে যথেষ্ট বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন। নিম্নে এই পদকর্ত্তা-দিগের সম্বন্ধে আলোচনা করা যাইতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পদকর্ত্তৃগণের বিস্তৃত বিবরণ মৎপ্রণীত A History of Brajabuli Literature গ্রন্থের একাদশ দ্বাদশ উনবিংশ ও বিংশ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

নরহরি চক্রবর্ত্তীর ভক্তিরত্নাকর ও নরোত্তমবিলাস ইত্যাদি গ্রন্থের আলোচনা করিয়াছি। ইনি একজন বড় পদকর্ত্তা ছিলেন। ইনি 'নরহরি' এবং 'ঘনশ্যাম' উভয় ভণিতায় পদ রচনা করিয়াছিলেন। ছন্দঃচাতুর্য্যে ইঁহার কয়েকটি ব্রজবুলি পদ বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। নরহরির রচনার নমুনা হিসাবে নিম্নে একটি পদ উদ্ধৃত করিলাম। পদটি শ্রীচৈতন্য ও বিষ্ণুপ্রিয়া দেবীর বিবাহবিষয়ক।

দেবরমণী- বৃন্দ বিরচি বেশ বিবিধ-ভাঁতি।
রাজত থল- মাহি অতুল, ঝলকে কনককাঁতি ॥
ভ্রমত গগন- পথ অগণন- যূথ হিয়-উৎসাহ।
মানত দিঠি সফল নিরখি গৌরবর-বিবাহ ॥
মিশ্র-ভবন রীত রুচির উচরি পুলক-গাত।
নবনব অভি- লাষ করই, ধৃতি ধরই ন যাত ॥
নিরুপম পহু- প্রেয়সী-ছবি লোচন ভরি নেত।
নরহরি কত ভাখব সবে প্রাণ নিছনি দেত ॥[১]

গীতচন্দ্রোদয় নামে একটি পদসংগ্রহ গ্রন্থ নরহরি সঙ্কলন করিয়াছিলেন।

১। ভক্তিরত্নাকর, পৃ ৮১৩-১৪, HBL, পৃ ২৮২।

পদকল্পতরু-সঙ্কলয়িতা 'বৈষ্ণবদাস' ছদ্মনামা গোকুলানন্দ সেনের বন্ধু এবং গুরু-ভ্রাতা কৃষ্ণকান্ত মজুমদার 'উদ্ধবদাস' ভণিতায় অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন। দুই বন্ধুর বাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার কান্দী মহকুমায় টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রামে। ইঁহারা "দ্বিজ" হরিদাসের বংশধর রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন।[১] পদকল্পতরুতে 'উদ্ধবদাস' ভণিতার পদসংখ্যা প্রায় শতাবধি। ইহার কতকগুলি পূর্ব্ববর্ত্তী কবি প্রথম উদ্ধবদাসের রচনা।[২] দ্বিতীয় উদ্ধবদাস বাঙ্গালা এবং ব্রজবুলি উভয়বিধ পদ রচনাতে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

সঙ্কীর্ত্তনামৃত সঙ্কলয়িতা দীনবন্ধু দাস লঘুছন্দে রচিত ব্রজবুলি পদে কিছু নূতনত্ব দেখাইয়াছেন। এইরূপ চটুল অথচ শাণিত পদরচনায় পরে চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর আরও কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। দীনবন্ধুর দুইটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

ধনী সাজত শ্যামমনোহর বেশ। কসি কানড়ছাঁদে বাঁধাওল কেশ॥
সীঁথি সিন্দূর চন্দনবিন্দুছটা। রবিমণ্ডল বেঢ়ল চাঁদঘটা॥
মৃগনাভিবিচিত্রিত গণ্ড-দুকূল। বরবেশর লম্বিত নাসিকমূল॥
ঘনকুঙ্কুম ঘোরি লেপি কুচভার। তহি শোভিত সুন্দর মোতিমহার॥
করকঙ্কণ হেরি অনঙ্গ বিভোর। কটি কিঙ্কিণীমণ্ডিত নীল নিচোল॥
পদপঙ্কজরঞ্জিত যাবকরঙ্গ। দীনবন্ধু নেহারি প্রফুল্লিতঅঙ্গ॥[৩]

চলল দূতী কুঞ্জর জিতি মন্থরগতিগামিনী।
খঞ্জনদিঠি অঞ্জন মিঠি চঞ্চলমতি চাহনী॥
জঙ্গলতট পন্থ নিকট আসি দেখিল গোপিনী॥
গোপ সঙ্গে শ্যাম রঙ্গে গোঠে কয়ল সাজনী॥
না পাঞা বিরল আঁখি ছলছল ভাবিঞা আকুল গোপিকা।
নাহ-রমণ- দরশন বিনু কৈছে জীয়ব রাধিকা॥
যামুনকূল চম্পকমূল তাঁহি বসিল নাগরী।
দীনবন্ধু পড়ল ধন্ধ, হইল বিপদ পাগলী॥[৪]

১। ব-সা-প-প ১২, পৃ ৬৫-৬৯, HBL, পৃ ৪৮৯। ২। HBL, পৃ ৮৫-৬।
৩। সংকীর্ত্তনামৃত ৪৪; HBL, পৃ ৩০৯। ৪। সংকীর্ত্তনামৃত ৩১০, HBL, পৃ ৩১০।

এই পদটির সহিত পরে উদ্ধৃত চন্দ্রশেখরের একটি পদের ভাব ও ভাষাগত ঐক্য লক্ষণীয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠতম পদকর্ত্তা হইতেছেন চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর। দুই ভ্রাতা ছিলেন বর্দ্ধমান জেলায় কাঁদড়া গ্রাম নিবাসী গোবিন্দানন্দ ঠাকুরের পুত্র।[১] এই কাঁদড়া গ্রামে জ্ঞানদাসের বাস ছিল। নায়িকারত্নমালা গ্রন্থে ইঁহাদের পদের সংগ্রহ আছে।[২] পদকল্পতরু প্রভৃতি অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সঙ্কলিত কোন পদসংগ্রহগ্রন্থে ইঁহাদের কোন পদ পাওয়া যায় না।

চপল ছন্দে লেখা চটুল পদ রচনায় দুই ভাইই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তবে শশিশেখর বেশী। আর চন্দ্রশেখর বিলম্বিত ছন্দে গুরুগম্ভীর পদরচনায় অসামান্য বিশেষত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ইঁহাদের মানঘটিত পদ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ হইতে এত জনপ্রিয় হইয়াছে যে অধিকাংশ কীর্ত্তন গায়ক ও শ্রোতা গোবিন্দদাস কবিরাজের পদ অপেক্ষা ইঁহাদের পদ বেশী পছন্দ করেন। এই দুই ভাইয়ের পদ গান করিলে সহজেই আসর জমিয়া যায়। নিম্নে ইঁহাদের পদ কয়েকটি উদ্ধৃত করিতেছি।

জিতি কুঞ্জর- গতি মন্থর চলত সো বরনারী।
বংশীবট যাবট তট বনহি বন ফেরি॥
মদনকুঞ্জে শ্যামকুণ্ড- রাধাকুণ্ড-তীরে।
দ্বাদশ বন হেরত সঘন শৈলহুঁ কিনারে॥
যাহাঁ ধেনু সব করতহি রব তাহিঁ চলত জোরে।
শ্রীদাম সুদাম মধুমঙ্গল দেখত বলবীরে॥
যমুনাকূলে নীপহিঁ মূলে লুঠত বনয়ারী।
চন্দ্রশেখর ধূলায় ধূসর কহত প্যারী প্যারী॥[৩]

নিম্নে উদ্ধৃত দুইটি পদ জয়দেবের "বদসি যদি কিঞ্চিদপি" পদের ছন্দে রচিত।

১। বীরভূমবিবরণ ৩, পৃ ১৫৩ হইতে, HBL, পৃ ৩২৩-৩২৯।
২। রমণীমোহন মল্লিক মহাশয় রচিত শশীশেখর গ্রন্থে (১৩০৮) চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের অনেকগুলি পদ সংগৃহীত হইয়াছে।
৩। কীর্ত্তনগীতরত্নাবলী ২৭৪।

কাহে তুহুঁ কলহ করি কান্তসুখ তেজলি, অব সে বসি রোয়সি কাহে রাধে
মেরুসম মান করি উলটি ফিরি বৈঠলি নাহ যব চরণ ধরি সাধে ॥
তবহুঁ উহে নাগরি ভর্ৎসন করি তেজলি, মান বহুরতন করি গণলা।
অবহুঁ তুহুঁ ধরমপথ- কাহিনী উগারসি, রোখে হরি বিমুখ ভই চললা ॥
কাতরে তুয়া চরণযুগ বেঢ়ি ভুজপল্লবে নাহ নিজ শপতি বহু দেল।
নিপট কুটিনাটি কটু কঠিনী বজরাবুকী কৈছে কর চরণ পর ঠেল ॥
অবহুঁ সব সখিনী তব নিকটে নাহি বৈঠব, হেনই অবিচার যদি করলি।
চন্দ্রশেখর কহে, কতয়ে সমুঝায়ল মঝু বচন উপেখি প্রেম ভাঙ্গলি ॥[1]

চিরদিবস ভেল হরি রহল মথুরাপুরী, অতএ হাম বুঝিয়ে অনুমানে।
মধুনগর যোষিতা সবহুঁ তারা পণ্ডিতা, বান্ধল মন সুরতরতিদানে ॥
গ্রাম্য কুলবালিকা সহজে পশুপালিকা হাম কিয়ে শ্যাম-উপভোগ্যা।
রাজকুলসম্ভবা ষোড়শী নবগৌরবা, যোগ্যজনে মিলয়ে যেন যোগ্যা ॥
তত দিবস জীবই নিম্বফল চাখই অমিয়ফল যাবৎ নাহি পাওয়ে।
অমিয়ফল ভোজনে উদর পরিপূরণে নিম্বফল দিগে নাহি ধাওয়ে ॥
তবেত অলি গুঞ্জরে যাই ধুতুরা ফুলে মালতী ফুল যাবৎ নাহি ফুটে।
রাইমুখ কাহিনী শশিশেখর শুনি, রোখে ধনী কহয়ে কিছু ঝুটে ॥[2]

অতি শীতল মলয়ানিল মন্দমধুর-বহনা।
হরিবৈমুখ হামারি অঙ্গ মদনানলে-দহনা ॥
কোকিলকুল কুহু কুহরই, অলি ঝঙ্করু কুসুমে।
হরিলালসে তনু তেজব, পাওব আন জনমে ॥
সব সঙ্গিনী ঘিরি বৈঠলি, গাওত হরিনামে।
যৈখনে শুনি তৈখনে উঠি নবরাগিণী গানে ॥
ললিতা কোরে করি বৈঠল, বিশাখা ধরে নাটিয়া।
শশিশেখরে কহে গোচরে যাওত জীউ ফাটিয়া ॥[3]

১। কীর্ত্তনগীতরত্নাবলী ২৩১; HBL, পৃ ২২৪।
২। কীর্ত্তনগীতরত্নাবলী ৭৪৪; HBL পৃ ৩২৭। ৩। কীর্ত্তনগীতরত্নাবলী ৭১৩।

শেখর ভ্রাতৃদ্বয়ের রচিত কয়েকটি পদে বাঙ্গালা ও সংস্কৃতের মিশ্রণ দেখা যায়। উদাহরণস্বরূপ একটি পদ নিম্নে তুলিয়া দিলাম।

[রাধা] কস্ত্বং শ্যামলধামা।
[উদ্ধব] হরিকিঙ্কর হাম উদ্ধবনামা॥
[রাধা] অস্য হরিঃ স কুত্র।
[উদ্ধব] মধুপুরে বসই বরজ-জনমিত্র॥
[রাধা] কুরুতে কিং মধুনগরে।
[উদ্ধব] কংসক পক্ষ দলন করি বিহরে॥
পুন পুন পূছই গৌরী।
চন্দ্রশেখর কহে প্রেমভিখারী॥[১]

এইবার প্রাচীন পদসংগ্রহ গ্রন্থের কথা বলিব। এইজাতীয় গ্রন্থ প্রায় সবই অষ্টাদশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত। দুইখানি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সঙ্কলিত হইয়াছিল।

বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের সঙ্কলিত গীতচিন্তামণি বা ক্ষণদাগীতচিন্তামণিই[২] প্রাচীনতম পদসংগ্রহ গ্রন্থ। বিখ্যাত বৈষ্ণব দার্শনিক বিশ্বনাথ বৃন্দাবনে রাধাকুণ্ড-তীরে ১৬২৬ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের টীকা রচনা করেন।

ঋত্বক্ষি ষড়্‌ভূমিমিতে শাকে রাধাসরস্তটে।
শুক্লষষ্ঠ্যাং সিতে মাঘে টীকেয়ং পূর্ণতামগাৎ॥

ইহার অনতিকাল পরেই তাঁহার দেহত্যাগ হয়। সুতরাং ধরিতে হয় ক্ষণদাগীতচিন্তামণি ১৭০৪ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সময়ে রচিত হইয়াছিল। ইহাতে শুধু পূর্ব্ববিভাগ আছে। অতএব মনে হয় যে বিশ্বনাথ মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে এই সঙ্কলনে হাত দিয়াছিলেন, মৃত্যু হওয়ায় গ্রন্থটি সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই।

ক্ষণদাগীতচিন্তামণিতে প্রায় ৪৫ জন বিভিন্ন কবি রচিত তিন শতাধিক পদ

১। নায়িকারত্নমালা ৫৪; HBL, পৃ ৩২৬;

২। বহু সংস্করণ হইয়াছে। বর্ত্তমান আলোচনায় নৃত্যলাল শীলের এবং রাধানাথ কাবাসীর সংস্করণ দুইটি অবলম্বিত হইয়াছে।

সংগৃহীত হইয়াছে। বিশ্বনাথের নিজের পদগুলিও আছে। বিশ্বনাথ 'হরিবল্লভ', ছন্দঃ অনুরোধে 'বল্লভ', এই ভণিতায় পদ রচনা করিতেন এইরূপ প্রসিদ্ধি আছে। ইহাতে চণ্ডীদাসের কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই।

অধ্যায়ের নাম "ক্ষণদা।" কৃষ্ণপক্ষের প্রতিপদ হইতে আরম্ভ করিয়া পূর্ণিমা পর্য্যন্ত এই তিরিশটি ক্ষণদায় অর্থাৎ উৎসবরাত্রিতে সঙ্কলনটি বিভক্ত। প্রথম ক্ষণদায় সংক্ষিপ্তসম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে, দ্বিতীয়ে বয়ঃসন্ধি, তৃতীয়ে মুগ্ধা ইত্যাদি ক্রমে পদগুলি সাজান হইয়াছে।

(2) নরহরি চক্রচর্ত্তী গীতচন্দ্রোদয়[1] নামক একটি পদসংগ্রহ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। এই গ্রন্থের পুঁথি খুবই দুর্ল্লভ, সম্পূর্ণ পুঁথি এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই। ত্রিপুরা দরবার গ্রন্থাগারে যে পুঁথিটি আছে তাহা খণ্ডিত হইলেও পুস্তকের বেশী ভাগই তাহাতে পাওয়া যাইতেছে। ত্রিপুরার পুঁথিতে ১৪৪৬টি পদ পাওয়া গিয়াছে। গীতচন্দ্রোদয়ের কিয়দংশ ১২৯৮ ত্রিপুরাব্দে বীরচন্দ্র দেববর্ম্মন কর্ত্তৃক আগরতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে শুধু তিনশত ত্রিশটি পদ আছে।

গীতচন্দ্রোদয় এই আট অংশে বিভক্ত ছিল—গৌরকৃষ্ণভাবনামৃত, গৌরকৃষ্ণ-চরিতামৃত, গৌরকৃষ্ণবিলাসামৃত, গৌরকৃষ্ণলীলামৃত, নিত্যসেবামৃত, নামামৃত এবং প্রার্থনামৃত।

গীতচন্দ্রোদয়ের অপর একটি পুঁথিতে পূর্ব্বরাগবর্ণন পর্য্যন্ত পাওয়া গিয়াছে।[2] এই পুঁথির পুষ্পিকা নিম্নে দেওয়া গেল, ইহাতে কবির ভণিতাও পাওয়া যাইতেছে।

"ইতি গীতচন্দ্রোদয়ে গৌরকৃষ্ণরসামৃতে শ্রীকৃষ্ণস্য পূর্ব্বরাগে সংক্ষিপ্তসম্ভোগ-রসোদ্গারে সংক্ষিপ্তসম্ভোগবর্ণনং নাম একত্রিংশত্তমো আস্বাদঃ ॥ ৩১ ॥ ২৭৮ ॥ পূর্ব্ব ১০৩ ॥ ৩৮২ ॥ শ্রীরাধিকায়াঃ ॥ ৭৯৪ ॥

শুন ওহে পরমবান্ধব শ্রোতাগণ। পূর্ব্বরাগ গীত এই অতি রসায়ন ॥
ইথে ক্রমভঙ্গ যে বুঝিতে তাহা নারি। শুধিয়া লইবে মোরে অনুগ্রহ করি ॥
মুই মহাঅজ্ঞ তাহা জানাইব কত। এই কর ইথে যেন হই অনুরত ॥

১। HBL, পৃ ২৭৯-৮০। ২। ব-সা-প-প ৮, পৃ ১৮৬। পুঁথির পত্রসংখ্যা ২০৫।

শ্রীগুরুবৈষ্ণবপাদপদ্ম শিরে ধরি। পূর্ব্বরাগ সংক্ষেপে গাইল নরহরি ॥

ইতি শ্রীপূর্ব্বরাগবর্ণন সমাপ্ত ॥"

শ্রীনিবাস-আচার্য্যের বৃদ্ধ প্রপৌত্র, মহারাজা নন্দকুমারের গুরু রাধামোহন ঠাকুর অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে পদামৃতসমুদ্র[১] নামে এক পদসংগ্রহ গ্রন্থ সঙ্কলন করিয়াছিলেন। তাহার একটি সংস্কৃত টীকাও লিখিয়াছিলেন, নাম মহাভাবানুসারিণী। পদামৃতসমুদ্রে সংগৃহীত পদসংখ্যা সর্ব্বসমেত ৭৪৬; তন্মধ্যে দুইশত আটাশটি রাধামোহনের স্বরচিত।

'বৈষ্ণবদাস' নামে সমধিক পরিচিত গোকুলানন্দ সেন গীতকল্পতরু বা পদকল্পতরু[২] নামে যে পদসংগ্রহ গ্রন্থ করিয়াছেন তাহা বৈষ্ণবপদাবলীর ঋগ্বেদসংহিতা বলা চলে। ইঁহার বাসস্থান ছিল কাটোয়ার কয়েক ক্রোশ উত্তরে টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রামে। ইনি যে রাধামোহন ঠাকুরের শিষ্য ছিলেন তিনি পদামৃতসমুদ্রের সঙ্কলয়িতা শ্রীনিবাস আচার্য্যের বংশধর নহেন, তিনি ছিলেন টেঞা নিবাসী "দ্বিজ" হরিদাসের অধস্তন পুরুষ।[৩] এই রাধামোহনও পদকর্ত্তা ছিলেন। পদকল্পতরুতে রাধামোহন ভণিতার যে পদগুলি পদামৃতসমুদ্রে নাই, বুঝিতে হইবে যে এগুলি বৈষ্ণবদাসের গুরুর রচনা। শ্রীনিবাস আচার্য্যের সন্তান রাধামোহনের রচনা হইলে পদামৃতসমুদ্রে অবশ্যই থাকিত। বৈষ্ণবদাস যেখানে আচার্য্যসন্তান রাধামোহন ঠাকুরের উল্লেখ করিয়াছেন সেখানে তাঁহাকে গুরু বলেন নাই, ইহা লক্ষণীয়।

পদকল্পতরু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পদামৃতসমুদ্রের পর সঙ্কলিত হইয়াছিল। এই শতাব্দীর মধ্যভাগের কোন পদকর্ত্তার পদ ইহাতে উদ্ধৃত হয় নাই। ইহাতে অবশ্য পদামৃতসমুদ্রের উল্লেখ আছে।

বৈষ্ণবদাসের সংগ্রহের নাম গীতকল্পতরু, পরে গায়কের মুখে মুখে নাম পরিবর্ত্তিত হইয়া পদকল্পতরু হইয়া গিয়াছে। বৈষ্ণবদাস তাঁহার সঙ্কলনের ইতিহাস দিয়াছেন এইরূপ—

শ্রীআচার্য্য-প্রভুবংশ শ্রীরাধামোহন। কে করিতে পারে তার গুণের বর্ণন ॥

১। বহরমপুর রাধারমণ যন্ত্র হইতে প্রকাশিত।

২। বহু সংস্করণ আছে, তন্মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে সতীশচন্দ্র রায় সম্পাদিত ও ব-সা-প প্রকাশিত (১৩২২-৩৮)। ৩। ব-সা-প-প ১২, পৃ ৬৫-৬৯ ; HBL, পৃ ৪৮৯।

যাহার বিগ্রহে গৌরপ্রেমের নিবাস। হেন শ্রীআচার্য্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ॥
গ্রন্থ কৈলা পদামৃতসমুদ্র আখ্যান। জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্য্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া। তাহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া॥
সেই মূলগ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল। প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥
এই গীতকল্পতরু নাম কৈলুঁ সার। পূর্ব্বরাগাদি ক্রমে চারি শাখা যার॥

পদকল্পতরু চারি শাখায়, এবং প্রত্যেক শাখা কতকগুলি করিয়া পল্লবে বিভক্ত। প্রথম শাখায় পূর্ব্বরাগ ও সংক্ষিপ্তসম্ভোগ বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে একাদশ পল্লব। দ্বিতীয় শাখায় অভিসারিকা, বাসকসজ্জা, খণ্ডিতা, কলহান্তরিতা, মানিনী ইত্যাদি নায়িকার প্রকারভেদ বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে চতুর্বিংশতি পল্লব। তৃতীয় শাখায় স্বয়ংদৌত্য, সম্ভোগ, রসোদ্গার, অনুরাগ, রূপোল্লাস, নিত্যরাস, নন্দোৎসব, বাল্যলীলা ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে একত্রিশ পল্লব। চতুর্থ শাখায় কালিয়দমন, গোষ্ঠ, অক্রূরাগমন, বিরহ, দিব্যোন্মাদ, দশদশা, ভাবোল্লাস ইত্যাদি, গৌরাঙ্গলীলা, নিত্যানন্দলীলা, তিন প্রভুর গুণ, ভক্ত ও বৈষ্ণব মহাত্মাদিগের গুণ, অষ্টকালীয় নিত্যলীলা, নামসংকীর্ত্তন, প্রার্থনা ইত্যাদি বর্ণিত হইয়াছে, ইহাতে ছত্রিশ পল্লব।

পদকল্পতরুতে প্রায় এক শত ত্রিশ জনের অধিক কবির রচিত তিন সহস্রাধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। বৈষ্ণবদাসের এই সংগ্রহ সেই সময়ের পক্ষে জগতের একটা কীর্ত্তি বলা যাইতে পারে। ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের অক্ষয় গৌরব। বৈষ্ণবদাস ভাল পদকর্ত্তা ছিলেন না সত্য, কিন্তু পদকল্পতরুসংগ্রহ করিয়া তিনি শ্রেষ্ঠ পদকর্ত্তাদিগের সমান মর্য্যাদার অধিকারী হইয়াছেন।

পদকল্পতরুতে পদগুলি সাজাইবার সময় বৈষ্ণবদাস বৈষ্ণব অলঙ্কারশাস্ত্রের মোটামুটি সকল কথাই সুন্দর করিয়া বলিয়াছেন। শুধু এই অংশ স্বতন্ত্র করিয়া প্রকাশ করিলে বৈষ্ণবরসশাস্ত্রের একটি সুন্দর নিবন্ধ হইয়া যাইবে।

(৫) সঙ্কীর্ত্তনানন্দ বা কীর্ত্তনানন্দ[১] গ্রন্থের সঙ্কলয়িতা গৌরসুন্দর দাস বৈষ্ণবদাসের সমসাময়িক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। কীর্ত্তনানন্দে প্রায় ষাট জন কবি রচিত

১। বনোয়ারীলাল গোস্বামী মহাশয়ের সম্পাদকতায় বহরমপুর হইতে প্রকাশিত।

ছয় শত একান্নটি পদ আছে, তাহার মধ্যে কতকগুলি পদকল্পতরুতে পাওয়া যায় না।[১]

সঙ্কীর্ত্তনামৃত[২] অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। যে পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে তাহার লিপিকাল ১৬৯৩ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৭১ খ্রীষ্টাব্দ। ইহার দ্বিতীয় পুঁথির সন্ধান অদ্যাপি পাওয়া যায় নাই। সঙ্কীর্ত্তনামৃতের সঙ্কলয়িতার নাম দীনবন্ধু। পিতা বল্লবীকান্ত, পিতামহ নন্দকিশোর, প্রপিতামহ হরি ঠাকুর।

প্রপিতামহের নাম শ্রীঠাকুর হরি। তার পাদপদ্মধূলি নিজ শিরে ধরি॥
পিতামহ ঠাকুর নাম শ্রীনন্দকিশোর। তাহার করুণাবলে হেন ইচ্ছা মোর॥
পিতা শ্রীবল্লবীকান্ত ঠাকুরের দয়া। সেই বলে লিখি আমি ভক্তিশক্তি পাঞা॥

মধুমতীর উল্লেখ হইতে বোঝা যায় যে কবি শ্রীখণ্ডের সন্তান অথবা শিষ্য ছিলেন।

মধুমতী-পদপাশে লুকাইঞা অভিলাষে
দীনবন্ধু রভস দেখিব॥ ৪৮৯॥

ভণিতায় দীনবন্ধু নন্দকিশোরের নাম করিয়াছেন। কবি কি পিতামহের শিষ্য ছিলেন?

সঙ্কীর্ত্তনামৃত দুই খণ্ডে বিভক্ত, পূর্ব্ব আর উত্তর। পূর্ব্বখণ্ডে পনেরো পরিচ্ছেদ, উত্তরে পাঁচ। ইহাতে প্রায় চল্লিশ জন বিভিন্ন কবিকৃত চারি শত একানব্বইটি পদ আছে, তন্মধ্যে দীনবন্ধুর নিজের লেখাই দুই শতের উপর। সঙ্কীর্ত্তনামৃতকে রসশাস্ত্র বলা সঙ্গত। পদগুলি কেবল উদাহরণের মত দেওয়া হইয়াছে। ব্যাখ্যা বেশ সরল।

দীনবন্ধু বেশ সংস্কৃতজ্ঞ ছিলেন। সঙ্কীর্ত্তনামৃতে বহু শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে। দীনবন্ধুর স্বকৃত শ্লোকও কয়েকটি রহিয়াছে। বাঙ্গালা-সংস্কৃত মিশ্র ভাষায় রচিত দুইটি শ্লোক উদ্ধৃত করা হইয়াছে। একটি উদাহরণ হিসাবে তুলিয়া দিতেছি। শ্লোকটি শিখরিণী ছন্দে রচিত।

১। HBL, পৃ ৬২, ৩০২-৩। ২। ব-সা-প প্রকাশিত (১৩৩৬)।

নিজাঙ্কে যা কার্য্যা অপি যুবতিবর্য্যাঃ কিল শপে
লিখেতি ত্বং সাক্ষী করিব নিজপক্ষী সহচরী।
করিষ্যেঽথো গাঢ়ং প্রণয়মথ বাঢ়ং বদ সখে
বিপর্য্যাসে পাশে পড়সিগণ হাসে কি করিব ॥

সঙ্কীর্ত্তনামৃতে চণ্ডীদাসের কোন পদ নাই। গোবিন্দদাস কবিরাজের পুত্র দিব্যসিংহের একটি পদ উদ্ধৃত আছে। দিব্যসিংহের কোন পদ অন্যত্র পাওয়া যায় নাই।

পদামৃতসমুদ্র সঙ্কীর্ত্তনানন্দ এবং পদকল্পতরুর রচনার পরে রাধামুকুন্দ দাস রচিত মুকুন্দানন্দ নামে একটি পদসংগ্রহ গ্রন্থ পাওয়া যাইতেছে।[১]

পদামৃতসমুদ্র শ্রীসংকীর্ত্তনানন্দ। পদকল্পতরু মত পদ ভক্তানন্দ ॥
শ্রীমুকুন্দানন্দ গ্রন্থ মুকুন্দবর্ণন। মহাকৃপা প্রকাশে শুধিবেন মহাজন ॥

সঙ্কলয়িতা শ্রীনিবাস আচার্য্যের অন্যতম মুখ্য শিষ্য গোবিন্দচরণ চক্রবর্ত্তীর বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম ছিল পতিতপাবন। ইহা ছাড়া অন্য কোন পরিচয় পাওয়া যাইতেছে না।

জয় জয় চক্রবর্ত্তী গোবিন্দচরণ। ছয় চক্রবর্ত্তী মধ্যে মুখ্যেতে গণন ॥
শ্রীআচার্য্য প্রভু কৃপাপাত্র সর্ব্বোত্তম। তার বংশে জন্ম প্রভু মুই নরাধম ॥
জয় জয় আচার্য্য প্রভু শ্রীনিবাস। তব পাদপদ্ম বিনা অন্য নাহি আশ ॥
... ...
চৈতন্যচরণাম্বয় পতিতপাবন-সুত। পতিত উদ্ধার প্রভু অতিকৃপাযুত ॥

মুকুন্দানন্দ পূর্ব্ব ও উত্তর এই দুই ভাগে এবং ষোড়শ স্তবকে গ্রথিত। সর্ব্ব-সমেত পদসংখ্যা ছয় শত উনষাট।

শ্রীমুকুন্দানন্দ গ্রন্থ অনুক্রমণিকা। ভক্তরসাধিকা ভক্তগণের তোষিকা ॥
পূর্ব্বোত্তর ভাগদ্বয় গ্রন্থের বর্ণন। কৃপা করি শুধিবেন রাধাকৃষ্ণজন ॥
শ্রীমুকুন্দানন্দ রাধামুকুন্দপদদাতা। পূর্ব্বোত্তর ভাগদ্বয় ভক্তিকল্পলতা ॥
ষোড়শ স্তবক ভক্তিলতাপুষ্পচয়। ষট্‌শত নব পঞ্চাশৎ পদ ফল প্রেমময় ॥
সুভক্ত কোকিল ভক্তিরস আস্বাদয়। অভক্ত কুকাক বিষবিষয় ভুঞ্জয় ॥

কবি বিরচিত পদ মাত্র পনেরোটি। ইনি 'রাধামুকুন্দ' এবং 'মুকুন্দ' উভয় ভণিতাই ব্যবহার করিয়াছেন। কবির কাল জানা যাইতেছে না, তবে অনুমান হয় ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে গ্রন্থটি সঙ্কলন করিয়া থাকিবেন।

১। বা-প্রা-পু-বি ২-১, পৃ ৪-৭ ; এইটিই কবির স্বহস্তলিখিত মূল গ্রন্থ। HBL, পৃ ৩৪৯-৫১।

ঊনপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

বিদ্যাসুন্দর কাব্য ঃ বলরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ

অধিকাংশ বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচিত হইয়াছিল অষ্টাদশ শতাব্দীতে। এই সময়ের পূর্ব্বে রচিত তিনখানি মাত্র বিদ্যাসুন্দর কাব্যের নিদর্শন মিলিয়াছে, ষোড়শ শতাব্দীতে "দ্বিজ" শ্রীধরের কাব্য এবং সপ্তদশ শতাব্দীতে গোবিন্দদাসের (?) ও কৃষ্ণরাম দাসের কাব্য।[১] অষ্টাদশ শতাব্দীর শ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রমুখাৎ এবং সহর অঞ্চলে রুচিবিকৃতির জন্য এই জাতীয় প্রণয়কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অতিশয় লোকপ্রিয় হইয়াছিল। এবিষয়ে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করিব।

বলরাম চক্রবর্ত্তী কবিশেখরের কালিকামঙ্গলের রচনাকাল জানা নাই। যে পুঁথি অবলম্বনে কাব্যটি মুদ্রিত হইয়াছে[২] তাহা শেষে খণ্ডিত, সুতরাং গ্রন্থশেষে রচনাকাল দেওয়া ছিল কিনা বলিবার উপায় নাই। তবে কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের পরের লোক নহেন বলিয়া অনুমান হয়।

কবির নাম বলরাম চক্রবর্ত্তী, উপাধি কবিশেখর। পিতা দেবীদাস আচার্য্য, মাতা কাঞ্চনী, পিতামহ চৈতন্য। এই তথ্য পাওয়া যায় ভণিতা হইতে।

বলরাম চক্রবর্ত্তী মাগে তব পদে ভক্তি,
অপরাধ ক্ষম একবার॥
চৈতন্যচরণপদ্ম চিত্তেতে করিয়া সদ্ম
বিরচিলা দ্বিজ বলরাম॥

১। শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় সৌরভ পত্রিকায় [১৩২৪, ১৩২৫-২৬] পূর্ব্ববঙ্গীয় কবি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর কাব্যের পরিচয় দিয়াছেন। কবি এটিকে সত্যনারায়ণের মাহাত্ম্যকাব্য হিসাবে রচনা করিয়াছিলেন। অন্ততঃ এই কারণেই কঙ্কের কাব্যকে ষোড়শ শতাব্দীর রচনা বলা চলে না।

২। ব-সা-প প্রকাশিত (১৩৩১)।

শ্রীকবিশেখর করিয়া যোড়কর
বলে কালী পদতলে॥
পিতামহ চৈতন্য লোকেতে বলয়ে ধন্য,
জনক আচার্য্য দেবীদাস।
জননী কাঞ্চনী নাম, তার সুত বলরাম
কালিকা পূরিল যার আশ॥ পৃ ১৪৪॥

বলরাম পশ্চিমবঙ্গের, দক্ষিণরাঢ়ের লোক ছিলেন।[১] দিগ্‌বন্দনায় কবি যে সকল স্থানীয় দেবদেবীর উল্লেখ করিয়াছেন তাহা সবই দক্ষিণরাঢ়ের। যথা,

তিলটকোণায়[২] বন্দোঁ দেবী সিদ্ধেশ্বরী। বিক্রমআদিত্য যথা নিত্য পূজা করি॥
আম্বুয়া মুলুকে বন্দোঁ দেবী ভদ্রকালী। কালীঘাটে ভদ্রকালী করহ শিয়লি॥
বালিডাঙ্গায় ধন্দিলাম দেবী রাঢ়েশ্বরী। ভাস্তাড়া[৩] ধামেতে বন্দোঁ চামুণ্ডাসুন্দরী॥
সমুখে সরোবর দেখি সুশোভন। ব্রত সাঙ্গ কৈল যথা বিদ্যাধরীগণ॥
ক্ষীরগ্রামে যোগাদ্যার বন্দিনু চরণ। পাড়া-আম্বুয়ায় কামারবুড়ী বন্দোঁ এক মন॥
মৌলায় রক্ষিণী বন্দোঁ যোড় করি পাণি। ভাণ্ডারহাটে বন্দিলাঙ সাবিত্রী গোসানি॥
বিক্রমপুরে বিশালাক্ষী বন্দিলাম খাটে। রাজবল্লভী [বন্দিলাম] রাজবলহাটে॥
জরুড়ের ভগবতীর চরণ বন্দিয়া। আমতার মেলাই বন্দোঁ এক মন হৈয়া॥
দাধার চণ্ডিকা বন্দোঁ যোড় করি পাণি। বালিয়ায় বন্দিলাম জয়সিংহবাহিনী॥
ঘুরাল্যে মাখাল বন্দোঁ পলাশের[৪] ঘাটু। তালপুরে ষষ্ঠী বন্দোঁ হাসনানের বটু॥
কালীঘাটে বন্দিলাম দেবী ভদ্রকালী। ব্রহ্মা স্থাপিয়া যথা দিল অঙ্গ বলি॥
সঙ্গীত রচিতে মাতা কহিলে আপনি। উরহ আসর মাঝে কঙ্কালমালিনী॥

১। মুদ্রিত কাব্যের সম্পাদক শ্রীযুক্ত চিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী বলেন, "কবিশেখরকেও পূর্ব্ববঙ্গবাসী বলিয়াই মনে হয়। তাঁহার পুস্তকের অনেক স্থানে পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত শব্দাদি ব্যবহৃত হইয়াছে, দেখিতে পাওয়া যায় [ভূমিকা ৸৶৹]।" এই সিদ্ধান্তের পোষকতায় চক্রবর্ত্তী মহাশয় শব্দসূচীতে মাত্র দুইটি শব্দ নির্দেশ করিয়াছেন, নাভরা এবং পলাকড়ি। প্রথম শব্দ এখন পশ্চিমবঙ্গে কুত্রাপি বলা হয় না এমন কথা বলিতে পারি না, কারণ পশ্চিমবঙ্গের সকল উপভাষার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় নাই, তবে লাফরা ব্যঞ্জনের উল্লেখ বহু পশ্চিমবঙ্গীয় কবির কাব্যে পাওয়া যায়। পলাকড়ি শব্দ পশ্চিমবঙ্গে এখনও বিশেষ চলিত আছে।

২। কিরীটকোণায়? ৩। পাঠ 'ভাস্তাড়া।' ৪। ঐ 'পুরাসের।'

স্বপনে কহিলে মোরে দেবী কাত্যায়নী। স্মরণ করিলে মাত্র আসিবে আপনি॥

... ...

শ্রীকৃষ্ণনগরে বন্দোঁ দেবী সিদ্ধেশ্বরী। চাম্পা[ই]নগরে বন্দোঁ দেবী বিষহরি॥

পৃ ৮-১০॥

এই সকল দেবদেবীর উল্লেখ মুকুন্দরাম ক্ষমানন্দ ঘনরাম মাণিক গাঙ্গুলি ইত্যাদি দক্ষিণরাঢ়ীয় কবির কাব্যে পাওয়া যাইবে।

সুন্দরের যাত্রা পথে কবি খুরদা, শালগিরি পর্ব্বত ও বিষ্ণুপুরের নাম করিয়াছেন। নীলাচল বর্ণনা ও কাহিনী বিস্তারিতভাবে দিয়াছেন।

বলরামের কাব্যে সুন্দরের পিতার নাম গুণসাগর, মাতার নাম গুণমতী, বাসস্থান "উৎকল দ্রাবিড়দেশ" মাণিকানগর। বিদ্যার পিতার নাম বীরসিংহ, মাতার নাম কুন্তী, বাসস্থান বর্দ্ধমান। বিদ্যার গর্ভে সুন্দরের যে সন্তান হইয়াছিল তাহার নাম সদানন্দ। উপাখ্যানাংশে কিছু কিছু নূতনত্ব আছে।[১]

বলরামের কাব্য সুন্দর, সাবলীল। ইহাতে অশ্লীলতা কিছু নাই। কবির ভাষাও বাহুল্যবর্জ্জিত। রচনার নমুনা হিসাবে চৈতন্যবন্দনা এবং অন্য কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত করা গেল।

নবদ্বীপে বন্দোঁ হরি দ্বিজরূপে অবতারি চৈতন্য চৈতন্য দিল নরে।
অনাথ জনেরে ধরি সঘনে বলায় হরি, পার কৈল এ ভবসাগরে॥
কনকগৌরদেহা, কপটসন্ন্যাসী নেহা, নিত্যানন্দ দোসর সন্ন্যাসী।
অনেক ভকত সঙ্গে ফিরিয়া বুলয়ে রঙ্গে, [হরি]প্রেমে তনু অভিলাষী॥
ঘন বলে হরিবোল, বাজান কর্ত্তাল খোল, সঘনে নাচয়ে বাহু তুলি।
কমললোচনে ঘন প্রেমজল বরিষণ হরিরসে হইয়া আকুলি॥
হরিরসে হৈয়া ভোর পরিয়া কৌপীন ডোর হরি হরি সঘনে বলাই।
ধন্য শচী ঠাকুরাণী, পুত্রভাবে চক্রপাণি নিজ ঘরে রাখিবারে চাই॥
না শুনে মায়ের বোল, হরিরসে হৈয়া ভোল সন্ন্যাসে চলিল দ্বিজমণি।
নিত্যানন্দ আদি সঙ্গে ফিরিয়া বুলয়ে রঙ্গে, হরিনামে উদ্ধারে ধরণী॥

১। ভূমিকা, পৃ ১৸০-১৷০।

জগাই মাধাই নাম অশেষ পাপের ধাম প্রাণ বধে হইয়া দুরন্ত।
দিয়া তারে হরিরস করিলে জীবের বশ, হরিরসে হৈলা[২] তারা অন্ত॥
কলি ঘোর দরশনে উদ্ধারিলে সর্ব্বজনে অকিঞ্চনে দিয়া হরিনাম।
চৈতন্যচরণপদ্ম চিত্তেতে করিয়া সদ্ম বিরচিলা দ্বিজ বলরাম॥ পৃ ৫-৬॥

কবি স্বল্পাক্ষরে যে গুরুর এবং পিতামাতার বন্দনা করিয়াছেন তাহা অকৃত্রিম। এই প্রসঙ্গে বলিয়া রাখি পিতামাতার বন্দনা দক্ষিণরাঢ়ের কবিগণের নিজস্ব।

ভকতি করিয়া বন্দোঁ গুরুর চরণ। যাঁহার কবিত্ব আমি গাই অনুক্ষণ॥
অজ্ঞানতিমির মহা ঘোর দরশন। প্রসন্ন করিলে দিয়া জ্ঞান-অঞ্জন॥
পিতার চরণ বন্দোঁ হৈয়া একমন। অবনী লোটায়্যা বন্দোঁ মায়ের চরণ॥
মাতা হৈতে দেখিলাম সয়ালের মুখ। আমা পুত্র হৈতে মা পাইলা বড় দুঃখ॥
পৃ ১০-১১॥

ভারতচন্দ্রের জীবনী প্রথমে সংগ্রহ করেন ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত। কবির কাহিনী এখন সকলের সুবিদিত, যেহেতু তাহা ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর প্রায় সকল সংস্করণের ভূমিকায় দেওয়া আছে। কবির নিজের লেখা হইতে যতটুকু জানা যায় তাহা বলিতেছি।

ভারতচন্দ্রের পিতৃভূমি ইতিহাসবিখ্যাত ভুরশুট বা ভুরশিট পরগনা। ভরদ্বাজ-গোত্রীয় ফুলিয়া মেলের মুখুটি উপাধিক ব্রাহ্মণ জমিদার রায়-বংশে ইঁহার জন্ম। এক পূর্ব্বপুরুষ (প্রপিতামহ?) প্রতাপনারায়ণ বিখ্যাত ছিলেন, রামদাস আদকের কাব্যে ইঁহার উল্লেখ আছে। দেবানন্দপুর গ্রামে (ব্যাণ্ডেল ষ্টেশনের নিকটে, যেখানে শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের আদি বাস ছিল) কায়স্থবংশীয় রামচন্দ্র মুনশীর আশ্রয়ে থাকিয়া কবি ফারসী শিক্ষা করেন। কাব্যচর্চ্চার হাতেখড়িও এইখানে। বর্দ্ধমানরাজ কীর্ত্তিচন্দ্রের (?) দেওয়ান রাজবল্লভ কবির পিতা নরেন্দ্রনারায়ণের জমিদারী খাস করিয়া লয়েন। পরবর্ত্তী কালে মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে আশ্রয় দেন ও "কবিরায়গুণাকর" উপাধি এবং ভূসম্পত্তি দিয়া মূলাজোড়ে বাস করান। এখানে মধ্যে রামচন্দ্র নাগ নামক এক ব্যক্তি পত্তনিদার হইয়া

২। মুদ্রিত পাঠ 'হৈয়া।'

কবিকে উদ্ব্যস্ত করিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্রের হস্তক্ষেপের ফলে কবি নাগের কবল হইতে উদ্ধার লাভ করেন। ভারতচন্দ্রের তিন পুত্র হয়, পরীক্ষিত, রামতনু ও ভগবান। অন্নদামঙ্গল[১] বা অন্নপূর্ণামঙ্গলকাব্যের প্রথম অংশে দুইটি গানের ভণিতায় রাধানাথ নাম পাওয়া যায়। ইহা হইতে অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না যে কবিপত্নীর নাম ছিল রাধা।

ভরদ্বাজ-অবতংস ভূপতি রায়ের বংশ সদাভাবে হতকংস ভুরশুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভারতীযুত ফুলের মুখটি খ্যাত দ্বিজপদে সুমতি॥
দেবের আনন্দধাম দেবানন্দপুর নাম, অধিকার রাম রামচন্দ্র মুনশী।
ভারতে নরেন্দ্র রায় দেশে যার যশ গায় হয়ে মোরে কৃপাদায় পড়াইল পারসী॥[২]

কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ সুরেন্দ্র ধরণী মাঝ, কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে শশী ঝাঁপ দেয় দুখে[৩] যার যশে হয়ে অভিমানী॥
তার পরিজন নিজ ফুলের মুখুটি দ্বিজ ভরদ্বাজ ভারত ব্রাহ্মণ।
ভুরিশিট রাজ্যবাসী নানা কাব্য-অভিলাষী, যে বংশে প্রতাপনারায়ণ॥
রাজবল্লভের কার্য্য কীর্ত্তিচন্দ্র নিল রাজ্য, মহারাজা রাখিলা স্থাপিয়া।
রসমঞ্জরীর রস ভাষায় করিতে বশ আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া॥[৪]

কবিরায়গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া।
ভারতেরে আজ্ঞা কৈল গীতের লাগিয়া॥[৫]

ভারত যাচয়ে বর, অন্নপূর্ণা দয়া কর
পরীক্ষিত তনু ভগবানে॥[৫]

রাধানাথের দুঃখ ভরা নাশ গো সত্বরা।
কালের কামিনী কালী করুণাসাগরা গো॥[৫] ১, পৃ ২৩॥

রাধানাথ তব দাস, পুরাও তাহার আশ
তবে ঋণিচক্র ঋণে তরে গো॥ ১, পৃ ৪২॥

১। সংস্কৃত যন্ত্র তৃতীয় সংস্করণ (সংবৎ ১৯১৭)। ২। সত্যনারায়ণ ব্রতকথা পাঁচালী।
৩। ইহা হইতে ১১৩৭ সাল পাওয়া যায়। ইহা কি কৃষ্ণচন্দ্রের জন্মাব্দ?
৪। রসমঞ্জরী। ৫। অন্নদামঙ্গল।

কাব্যচর্চ্চায় ভারতচন্দ্রের হাত মক্‌শ হয় দুইখানি নিতান্ত ক্ষুদ্র সত্যনারায়ণ ব্রতকথা পাঁচালী লিখিয়া। কবি তখন দেবানন্দপুরে ফারসী শিখিতেছেন। যেখানি ত্রিপদী ছন্দে লেখা সেটি রচিত হয় হীরারাম রামের জন্য, এবং অপরটি, যেটি চতুষ্পদী ছন্দে লেখা, সেটি রচিত হয় মুনশী রামচন্দ্র রামের জন্য। শেষেরটিতে এই রচনাকাল দেওয়া আছে—

ব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা ॥

এখন ইহা হইতে দুই সাল পাওয়া যাইতে পারে। 'চৌ' পৃথক ধরিলে হইবে ১১৪৩, আর 'চৌগুণা' একসঙ্গে ধরিলে ১১৪৪ ('রুদ্র' এবং 'চতুর্গুণ' রুদ্র)। সম্ভবতঃ শেষের অর্থই ঠিক। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে সকলেই ইহা হইতে ১১৩৪ সাল বাহির করিয়া থাকেন!

কৃষ্ণচন্দ্রের আশ্রয়ে আসিয়া কবির প্রথম কাব্য রচনা হইল রসমঞ্জরী। ইহা ভানুদত্তের মূল সংস্কৃত গ্রন্থের অনুবাদ। এটি একটি অলঙ্কারের বই, নায়ক নায়িকার প্রকারভেদের বর্ণনা ইহাতে আছে। তাহার পর অন্নদামঙ্গল বা অন্নপূর্ণামঙ্গল রচিত হয়।[১] রচনার সমাপ্তিকাল হইতেছে ১৬৭৪ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দ।

বেদ লয়ে ঋষি রসে ব্রহ্ম নিরূপিলা।
সেই শকে এই গীত ভারত রচিলা ॥

মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্র অন্নপূর্ণাপ্রতিমা এবং অন্নপূর্ণাপূজা প্রবর্ত্তন করেন। এই পূজাপ্রবর্ত্তনের পূর্ব্ব ইতিহাস হিসাবে মহারাজা কবিকে কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত করাইয়াছিলেন। কবি অবশ্য অগ্রগামীদিগের পন্থানুসরণে বলিয়াছেন যে দেবী কবি এবং মহারাজা উভয়কেই স্বপ্নাদেশ দেন। কবির মতে কাব্যরচনার হেতু হইতেছে এই—

নবাব আলিবর্দ্দী কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট বার লক্ষ টাকা নজরানা চাহেন। টাকা

১। কেহ কেহ মনে করেন যে কাব্যের আসল নাম হইতেছে কালিকামঙ্গল। কিন্তু "কৃষ্ণনগর রাজবাটীর মূল পুস্তক দৃষ্টে" বিদ্যাসাগর মহাশয় যে চমৎকার সংস্করণ (সংস্কৃত যন্ত্র) বাহির করেন তাহাতে অন্নপূর্ণামঙ্গল অথবা অন্নদামঙ্গলই দেখা যায়, ইহাই যথার্থ নাম।

দিতে দেরী হওয়ায় তাঁহাকে মুশিদাবাদে কয়েদ করা হয়। সেখানে মহারাজা দেবীর স্তব করায় দেবী অন্নপূর্ণা মূর্ত্তি ধরিয়া স্বপ্নে আবির্ভূতা হইয়া বলিলেন,

শুন রাজা কৃষ্ণচন্দ্র না করিহ ভয়। এই মূর্ত্তি পূজা কর দুঃখ হবে ক্ষয়॥
আমার মঙ্গলগীত করহ প্রকাশ। কয়ে দিলা পদ্ধতি গীতের ইতিহাস।
চৈত্র মাসে শুক্লপক্ষে অষ্টমী নিশায়। করিহ আমার পূজা বিধিব্যবস্থায়॥
সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়। মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥
তুমি তারে রায়গুণাকর নাম দিও রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও
আমি তারে স্বপ্ন কব তার মাতৃবেশে। অষ্টাহ গীতের উপদেশ সবিশেষে॥

বলা বাহুল্য,

সেই আজ্ঞা মত রাজা কৃষ্ণচন্দ্র রায়।
অন্নপূর্ণা পূজা করি তরিলা সে দায়॥ ১, পৃ ১৫॥

তখন হইতে দেশের দশের নিকট কৃষ্ণচন্দ্রের সম্মান বাড়িয়া গেল।

দেবীপুত্র নামে রাজা বিদিত সংসারে। ধর্ম্মচন্দ্র নাম দিলা নবাব যাহারে॥
সেই রাজা এই অন্নপূর্ণার প্রতিমা। প্রকাশিয়া পূজা কৈলা অনন্তমহিমা॥
কবিরায়গুণাকর খ্যাতি নাম দিয়া। ভারতেরে আজ্ঞা দিলা গীতের লাগিয়া॥
অন্নপূর্ণা ভারতেরে রজনীর শেষে। স্বপন কহিলা মাতা তার মাতৃবেশে॥
অরে বাছা ভারত শুনহ মোর বাণী। তোমার জননী আমি অন্নদা ভবানী॥
কৃষ্ণচন্দ্র অনুমতি দিলেন তোমারে। মোর ইচ্ছা গীতে তুমি তোষহ আমারে॥
ভারত কহিলা আমি নাহি জানি গীত। কেমনে রচিব গীত একি বিপরীত॥
অন্নদা কহিলা বাছা না করিহ ভয়। আমার কৃপার বলে বোবা কথা কয়॥
গ্রন্থ আরম্ভিয়া মোর কৃপা সাক্ষী পাবে। যে কবে সে হবে গীত আনন্দে শিখাবে॥
এত বলি অমৃতান্ন মুখে তুলি দিলা। সেই বলে এই গীত ভারত রচিলা॥
১, পৃ ২০॥

অন্নপূর্ণামঙ্গল কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় গীত হইত। প্রথম গায়ক ছিল নীলমণি গোঁসাই, একথা কবির উক্তি হইতে জানা যাইতেছে।

ভূরিশিটে মহাকায় ভূপতি নরেন্দ্র রায়, তাঁর সুত ভারত ব্রাহ্মণ।
কৃষ্ণচন্দ্র নৃপাজ্ঞায় অন্নদামঙ্গল গায়, নীলমণি প্রথম গায়ন॥ ৩,পৃ ২৮॥

ডীউসাঁই নীলমণি কণ্ঠআভরণ।
এই মঙ্গলের হবে প্রথম গায়ন ॥ ৩, পৃ ৮৫ ॥

বিহ্লনের চৌরপঞ্চাশিকার দ্ব্যর্থক (বিদ্যাপক্ষে ও কালীপক্ষে) অনুবাদ স্বতন্ত্র কাব্য নহে, ইহা বিদ্যাসুন্দর উপাখ্যানেরই অন্তর্ভুক্ত। কারাগারে পড়িয়া সুন্দর এই শ্লোকগুলির সাহায্যে এক ঢিলে দুই পাখী মারিয়াছিলেন, অর্থাৎ দেবীর স্তব করিয়া বন্ধন মুক্তির এবং বিদ্যার রূপগুণ চিন্তা করিয়া বিরহবিনোদনের উপায় করিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্রের অন্যান্য যে ছোট ছোট কবিতা পাওয়া যায় সেগুলি শেষ জীবনের লেখা হওয়াই সম্ভব। কতকগুলি কবিতায় ভারতচন্দ্র হিন্দী ও ফারসীকে আশ্রয় করিয়া রসসৃষ্টির প্রয়াস করিয়াছেন। শেষ জীবনের কবিতাগুলির মধ্যে সংস্কৃতে বাঙ্গলায় রচিত নাগাষ্টক বেশ উপভোগ্য।

অন্নপূর্ণামাহাত্ম্যখ্যাপন অন্নপূর্ণামঙ্গল রচনার একমাত্র উদ্দেশ্য নহে, প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে কৃষ্ণচন্দ্রের বংশকর্ত্তা ভবানন্দ মজুমদারের কীর্ত্তিবর্ণন উপলক্ষ্যে কৃষ্ণনগর রাজবংশের প্রশস্তি রচনা। কাব্যটিতে তিনটি স্বতন্ত্র উপাখ্যান ক্ষীণতম যোগসূত্রের সাহায্যে যোজনা করা হইয়াছে। দেবীমঙ্গল কাব্য অষ্টমঙ্গলা হইতে হইবে, সুতরাং ভারতচন্দ্রও তাঁহার কাব্যকে আট পালায় ভাগ করিয়াছেন। এই পালা-বিভাগ সর্ব্বত্র আখ্যানের অনুযায়ী নহে।

প্রথম উপাখ্যানে সতীর দেহত্যাগ ও উমারূপে জন্ম, শিবের সহিত বিবাহ এবং ঘরকরণা, এবং অন্নপূর্ণা মূর্ত্তিধারণ কাশীপ্রতিষ্ঠা ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। এই অংশটিই প্রকৃত অন্নদামঙ্গল। তাহার পর হরি হোড়ের বৃত্তান্ত আছে। গঙ্গার পশ্চিম এবং গাঙ্গিনীর পূর্ব্বতীরবর্ত্তী বড়গাছি গ্রামের অধিবাসী সুদরিদ্র বিষ্ণু হোড় দেবীর কৃপায় হরি হোড়কে পুত্ররূপে পাইল। হরি হোড় দেবীর বরপুত্র, দেবীর অনুগ্রহে ঘুঁটে-বেচা হইতে লক্ষপতি হইল, শেষ জীবনে দ্বিতীয় পক্ষে তরুণী ভার্য্যা বিবাহ করিয়া সাংসারিক অশান্তিতে পড়িল। দেবীও বিচলিত হইলেন, তিনি হরি হোড়ের আবাস হইতে ঝাঁপি লইয়া চলিলেন গাঙ্গিনী পার হইয়া আন্দুলিয়া গ্রামে। সেখানে বাস করিতেন

ব্রাহ্মণ রাম সমাদ্দার ও তাঁহার পত্নী সীতা। ইঁহাদের পুত্র ভবানন্দ মজুমদারের উপর দেবীর অনুগ্রহ করিতে ইচ্ছা হইল। এইখানে কাব্যের প্রথম অংশ শেষ।

দ্বিতীয় অংশ আরম্ভ হইয়াছে মানসিংহের বর্দ্ধমানে আগমন লইয়া। মানসিংহ আসিয়াছেন প্রতাপাদিত্যকে দমন করিতে। আর ভবানন্দ হইতেছেন কানুনগো, তিনিও রসদ যোগাইতে বর্দ্ধমানে আসিয়াছেন। মানসিংহ বর্দ্ধমানে থাকিবার সময় সুন্দরের সুড়ঙ্গ দেখিয়া ভবানন্দের নিকট বিদ্যাসুন্দর কাহিনী শুনিতে চাহিলেন। এই উপলক্ষে কবি বিস্তৃতভাবে বিদ্যাসুন্দর কাহিনী বর্ণনা করিলেন। বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যানেই দ্বিতীয় অংশের শেষ। যথার্থভাবে দেখিলে এই অংশটিকে অন্নপূর্ণামঙ্গলের অংশ বলা যায় না, এটিই কালিকামঙ্গল।

তৃতীয় অংশে বর্ণিত হইয়াছে মানসিংহের যশোর গমন, দেবীর মাহাত্ম্যে ভবানন্দের সাহায্যে প্রতাপাদিত্য বিজয় এবং ভবানন্দকে খেলাৎ দেওয়াইবার জন্য দিল্লী লইয়া যাওয়া। সেখানে দিল্লীশ্বরের নিকট দেবী অন্নপূর্ণার মাহাত্ম্য জাহির হইল এবং ভবানন্দ অবশেষে রাজা খেতাব পাইলেন। এইখানে কাব্যের পরিসমাপ্তি।

সুতরাং দেখা যাইতেছে যে অন্নপূর্ণামঙ্গল বা অন্নদামঙ্গল তিনটি কাব্যের সংহিতা, (১) শিবায়ন-অন্নদামঙ্গল, (২) কালিকামঙ্গল এবং (৩) মানসিংহ-ভবানন্দ-অন্নপূর্ণামঙ্গল।

এইবার ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভার আলোচনা করিব। অন্নদামঙ্গলের প্রথম দুই অংশের কাহিনী ভারতচন্দ্রের নিজস্ব নহে, কিন্তু শেষের অংশ বটে। বিদ্যাসুন্দরের গল্পাংশেও ভারতচন্দ্র মৌলিকত্ব কিছু দেখাইয়াছেন, যেমন চোর ধরার ব্যাপার। পাত্রপাত্রীর পিতৃপরিচয়েও কিছু কিছু নূতনত্ব আছে। তবে ভারতচন্দ্রের প্রধান মৌলিকত্ব হইতেছে ছোট ছোট কবিতাগুলির বিষয়বস্তুতে এবং গানগুলির রচনায়। 'বর্ষা,' 'বসন্ত,' 'হাওয়া,' 'বাসনা,' 'ধেড়ে ও ভেড়ে' ইত্যাদি কবিতার বিষয়বস্তুতে প্রথম গতানুগতিকতা ভঙ্গ হইল (কেননা ইহার পূর্ব্বে সব কবিতাই দেবদেবীলীলা অথবা অধ্যাত্ম বিষয়ক হইত), আর অন্নপূর্ণা-মঙ্গলের গানগুলিতে বাক্‌ভঙ্গির নূতন প্রকাশ দেখা দিল।

প্রকাশভঙ্গির এবং কবিপ্রকৃতির দিক দিয়া বিচার করিলে দেখি যে কাব্য-শিল্পী প্রধানতঃ তিন ধরণের হইয়া থাকে—শব্দকুশলী, চিত্রকুশলী এবং ভাবকুশলী। ভারতচন্দ্র একান্তভাবে শব্দকুশলী কবি। ছন্দের পারিপাট্যে, বাগ্‌বিন্যাসের চটকে ভারতচন্দ্রের কাব্য শব্দশিল্পের নিখুঁত উদাহরণ। রবীন্দ্রনাথের কথায়, "রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান, রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা তেমনি তাহার কারুকার্য্য।" সুললিত এবং রসাল শব্দচয়নে পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদের অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের অধিকতর যোগ্যতা ছিল, কেন না ইনি সংস্কৃত ছাড়া ফারসী ও হিন্দী ভাষাও জানিতেন। সংস্কৃত বাঙ্গালা ফারসী ও হিন্দী এই চারি ভাষার শব্দ ভাণ্ডার হইতে ইচ্ছামত শব্দচয়ন করিবার সামর্থ্য একালের বাঙ্গালী কবিদেরও পরমপ্রার্থনীয়। যেখানে যে রকম শব্দ দিলে শ্রুতি-সুখ এবং রসদিগ্ধ হইবে তাহা ভারতচন্দ্র সম্পূর্ণভাবে বুঝিতেন। এই কারণেই কৈফিয়ৎ দিয়াছেন,

মানসিংহ পাতশায় হইল যে বাণী। উচিত সে আরবী পারসী হিন্দুস্থানী॥
পড়িয়াছি সেইমত বর্ণিবারে পারি। কিন্তু সে সকল লোকে বুঝিবারে ভারি॥
না রবে প্রসাদ গুণ না হবে রসাল। অতএব কহি ভাষা যাবনী মিশাল॥
প্রাচীন পণ্ডিতগণ গিয়াছেন কয়ে। যে হৌক সে হৌক ভাষা কাব্য রস লয়ে॥

ছন্দে ভারতচন্দ্রের যেরূপ দক্ষতা ছিল তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী এক গোবিন্দদাস কবিরাজ ছাড়া আর কাহারও ছিল না। ভারতচন্দ্রের পয়ার ত্রিপদী মসৃণ ও সাবলীল বাঙ্গালায় নানারূপ সংস্কৃত ছন্দ প্রয়োগ করিয়া ভারতচন্দ্র যে দক্ষতা দেখাইয়াছেন তাহা অসামান্য। যেমন,

ভুজঙ্গ প্রয়াতে কহে ভারতী দে।
সতী দে সতী দে সতী দে সতী দে॥
মৈল দক্ষ ভূত যক্ষ সিংহনাদ ছাড়িছে।
ভারতের তূণকের ছন্ধবন্ধ বাড়িছে॥
জয় দেবকীসুত মাধবাচ্যুত শঙ্করস্তুত বামন।
জয় সর্ব্বতোজয় সজ্জনোদয় ভারতাশ্রয়জীবন॥

নাগাষ্টকের মূল সংস্কৃত এবং বাঙ্গালা অনুবাদ দুইই শিখরিণী ছন্দে রচিত। একটি শ্লোক উদাহরণ দিতেছি।

অয়ে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরসি নহি কিং কালিয়হ্রদং
পুরা নাগগ্রস্তং স্থিতমপি সমস্তং জনপদম্।
যদীদানীং তৎ ত্বং নৃপ ন কুরুষে নাগদমনং
সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি ॥ ৬ ॥

ওহে কৃষ্ণ স্বামিন্ স্মরণ কর না কালিয়হ্রদে,
ছিলো নাগগ্রস্ত প্রথমসময়ে সব জনপদে।
কবে রাজন্ চেষ্টা করিবে তুমি হে নাগদমনে,
বিরাগে হে নাগে সকলি গ্রাসিতেছে হরি হরি ॥

ধামালী জাতীয় শ্বাসাঘাতপ্রধান ছন্দে ভারতচন্দ্র পূর্ব্ববর্ত্তী এবং পরবর্ত্তী বহু কবিকে ছাড়াইয়া গিয়াছেন। কবির এই জাতীয় ছন্দোবিন্যাসের উদাহরণ দিই।

আমার উমা মেয়ের চূড়া, ভাঙ্গড় পাগল ওই না বুড়া,
ভারত কহে, পাগল নহে, ওই ভুবনেশ্বর লো ॥

ভারতচন্দ্র শব্দকুশলী কবি, তাঁহার কাব্যে শব্দ ও অর্থালঙ্কারের প্রাচুর্য্য যথেষ্ট। শব্দালঙ্কারের মধ্যে যমক আর শ্লেষই প্রধান, অনুপ্রাস ভদ্রগোছের। যমকের প্রকৃষ্ট উদাহরণ পাই হীরা মালিনীর বেসাতির বিবরণে। "আটপণে আধসের আনিয়াছি চিনি" ইত্যাদি অংশ পাঠ্যপুস্তকের কল্যাণে সকলেই জানে। কৃষ্ণচন্দ্রের সভাবর্ণনা, অন্নদার ভবানন্দভবনে যাত্রা, বিদ্যার রূপবর্ণনা ইত্যাদি অংশেও যমক এবং শ্লেষের সুন্দর উদাহরণ মিলে। এই অংশগুলিও সুপরিচিত।

ভারতচন্দ্রের অনুপ্রাস কদাপি বিকট নহে, সুললিত। এবং এই অনুপ্রাস যতির প্রথমে বা শেষে পড়িয়া ছন্দকে দোল খাওয়াইয়াছে। যেমন,

বাঘের বিক্রম সম মাঘের হিমানী।

খুন হয়েছিনু বাছা চূণ চেয়ে চেয়ে।

ফারসী শব্দের মিশ্রণে ভাষার যে লালিত্য ভারতচন্দ্রের অনন্যসাধারণ বিশেষত্ব

তাহার কিছু নিদর্শন দিই। বলা বাহুল্য এই রীতি প্রথম ও দ্বিতীয় অংশে একেবারেই নাই, আর তাহা থাকিতেও পারে না। ঐ দুই অংশ পৌরাণিক এবং প্রাচীন আখ্যানমূলক। শুধু মানসিংহ-ভবানন্দ উপাখ্যানেই ফারসী-হিন্দী শব্দ প্রয়োগের অবকাশ আছে।

বিবিরে পাইল ভূতে প্রলয় পড়িল। পেশবাজ ইজার ধমকে ছিঁড়া দিল ॥
চিৎপাত হয়ে বিবি হাত পা আছাড়ে। কত দোয়া দবা দিনু তবু নাহি ছাড়ে ॥
শুনি মিয়া তসবী কোরান ফেলাইয়া। দড় বড় রড় দিলা ওঝারে লইয়া ॥ ইত্যাদি
৩, পৃ ৩২ ॥

ভারতচন্দ্রের সরসতা বিশেষ করিয়া প্রকাশ পাইয়াছে নারীচরিত্রে। বলা বাহুল্য প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যের ভাণ্ডারে নারীর কোন্দল, বৃদ্ধার ভাবভঙ্গী, বৃদ্ধা বেশ্যার শঠতা ইত্যাদি কতকগুলি বাঁধাধরা রসিকতার বিষয় চিরকালই ছিল। ভারতচন্দ্র মোটামুটি তাহাই বর্ণনা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাঁহার চাঁছাছোলা ভাষা ও ছন্দোনৈপুণ্য যে অনেকটা নূতনত্ব দিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হয়। একটি চমৎকার উদাহরণ হইতেছে নারদের কোন্দল মন্ত্র।

কোন্দলে পরমানন্দ নারদের ঢেঁকি। আঁকশলী পোয়া মোনা গড়ে মেকামেকি ॥
পাখা নাহি তবু ঢেঁকি উড়িয়া বেড়ায়। কোণের বহুড়ী লয়ে কোন্দলে জড়ায় ॥
সেই ঢেঁকি চড়ে মুনি কান্ধে বীণাযন্ত্র। দাড়ী লয়ে ঘন পড়ে কোন্দলের মন্ত্র ॥
আয় রে কোন্দল তোরে ডাকে সদাশিব। মেয়েগুলা মাথা কোড়ে তোকে রক্ত দিব ॥
বেনা ঝোড়ে ঝুটি বান্ধি কি কর বসিয়া। এয়ো-স্থয়া এক ঠাঁই দেখ রে আসিয়া ॥
ঘুরুলে বাতাস লয়ে জলের ঘুরুলে। সেহাকুল কাঁটা হাতে ঝাঁট এসো চলে ॥
একঠাই এত মেয়ে দেখা নাহি যায়। দোহাই চণ্ডীর তোরে[১] আয় আয় আয় ॥
১, পৃ ৫৭ ॥

কতক ক্ষেত্রে সরসতা একটু গ্রাম্য হইলেও অশ্লীল হইয়া পড়ে নাই। যেমন, ঝড়বৃষ্টিতে মানসিংহের শিবিরের ঘেসেড়ানীর অবস্থা ও উক্তি—

ঘাসের বোঝায় বসি ঘেসেড়ানী ভাসে। ঘেসেড়া মরিল ডুবে তাহার হাবাসে[২] ॥

১। পাঠান্তর 'হাড়িঝি চণ্ডীর আজ্ঞা।' ২। পাঠ 'হা ভাষে।'

কান্দি কহে ঘেসেড়ানী হায়রে গোসাঁই। এমন বিপাকে আর কভু ঠেকি নাই॥
বৎসর পনর ষোল বয়স আমার। ক্রমে ক্রমে বদলিনু এগার ভাতার॥
হেদে গোলামের বেটা বিদেশে আনিয়া। অনেকে অনাথ কৈল মোরে ডুবাইয়া॥
৩, পৃ ৩-৪॥

কোন কোন স্থানে সরসতা বেশ সূক্ষ্ম ও উপভোগ্য। যেমন, জগন্নাথবিষয়ক গানে—

খাইয়া প্রসাদ ভাত মাথায় মুছিব হাত, নাচিব গাইব কুতূহলে॥
ভবসিন্ধু বিন্দু জানি পার হৈনু হেন মানি, সাঁতার খেলিব সিন্ধুজলে॥ পৃ ১৩॥

অথবা সুন্দরদর্শনে পতিনিন্দা উপলক্ষ্যে কবিপত্নীর জবানী—

মহাকবি মোর পতি কত রস জানে। কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে। চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে॥
.. ..
শাঁখা সোণা রাঙ্গা শাড়ী না পরিনু কভু। কেবল কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু॥
ভাবে বুঝি এই চোর কবি হৈতে পারে। তেঁই চুরি করি বিদ্যা ভজিল ইঁহারে॥

এখানে ভারতচন্দ্র কবিদের উপর বেশ এক হাত লইয়াছেন।

ইউরোপীয়দিগের আচার ও ধর্ম্মমত সম্বন্ধে ভারতচন্দ্র যে অল্প কথা বলিয়াছেন তাহার উপর এখন পর্য্যন্ত কেহ বলিতে পারিয়াছেন কিনা জানি না।

যবনেরে কত ভাল ফিরিঙ্গির মত। কর্ণবেধ নাহি করে না দেয় সুন্নত॥
শৌচ আচমন নাহি যাহা পায় খায়। কেবল ঈশ্বর আছে বলে এই দায়॥
৩, পৃ ২৫॥

ভারতচন্দ্রের কাব্যে কোন রক্তমাংসের মানুষ নাই। সব চরিত্রগুলিই টাইপ বিশেষ, তাহার মুখের কথার মানুষ। সুতরাং এবিষয়ে মুকুন্দরামের সহিত ভারতচন্দ্রের তুলনা উঠিতে পারে না। মুকুন্দরামের হাতে দেবীর অনেকটা মানবীকরণ হইয়াছে, ভারতচন্দ্র তাহা করিতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্রের দরিদ্রগৃহস্থালীর বর্ণনাও বাস্তব নহে। ভারতচন্দ্রের বৃহৎকাব্যের মধ্যে রক্তমাংসের মানুষ, অর্থাৎ human man পাই একটি, তাও ঠিক নয়, একটি মানুষের একটু ক্ষণিক আবির্ভাব। এ হইতেছে ঈশ্বরী পাটুনী—গাঙ্গিনীর তীরে

"সেই ঘাটে খেয়া দেয় ঈশ্বরী পাটুনী।" দেবীর গাঙ্গিনীর পার হওয়ার অল্প সময়টুকুর মধ্যে ঈশ্বরী পাটুনীর সরল মুগ্ধ চিত্র পাঠকের মনোহরণ করিয়া লইতে একটুকুও বিলম্ব করে না। "আমার সন্তান যেন থাকে দুধে ভাতে" এই সামান্য প্রার্থনার মধ্যে শুধু ঈশ্বরী পাটুনীর নহে, অনাদিকালের দৈবহত মূক বাঙ্গালী নরনারীর চিরকালের স্নেহব্যাকুলতা ধ্বনিত হইয়াছে।

মুকুন্দরামের কাব্যের সহিত ভারতচন্দ্রের যে ঘনিষ্ট পরিচয় ছিল তাহা বুঝিতে পারি হড়ি হোড়ের উপাখ্যানে। কবিকঙ্কণের ভাঁড়ুদত্তকে কবিরায়গুণাকর হরি হোড়ের দ্বিতীয়পক্ষের তরুণী ভার্য্যা সোহাগীর অন্যতম পূর্ব্বপুরুষরূপে খাড়া করিয়াছেন।

আমলহাঁড়ার দত্ত ছিল ভাঁড়ু দত্ত। তার বংশে ঝড়ু দত্ত ঠক মহামত্ত।
ধূমী নামে তাঁর নারী বড় কোন্দলিয়া। তার গর্ভে বসুন্ধরা জনমিল গিয়া॥
শিশুকাল হৈতে তার কোন্দলে আবেশ। এক বোলে দশ বলে নাহি আঁটে দেশ॥
মনোমত তার মাতা তাহারে পাইয়া। সোহাগী দিলেক নাম সোহাগ করিয়া॥
ভবিতব্যং ভবত্যেব খণ্ডিতে কে পারে। বৃদ্ধকালে হরি হোড় বিয়া কৈল তারে॥
পৃ ১৭৭॥

ভারতচন্দ্রের অনেক সূক্তি প্রবচনের মত চলিয়া গিয়াছে। যেমন,

নগর পুড়িলে দেবালয় কি এড়ায়।
খুলিল মনের দ্বার না লাগে কবাট॥
মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পতন॥
যতন নহিলে কোথা মিলয়ে রতন॥

নীচ যদি উচ্চ ভাষে সুবুদ্ধি উড়ায় হাসে
কড়িতে বাঘের দুগ্ধ মিলে।
বাতাসে পাতিয়া ফাঁদ ধরে দিতে পারি চাঁদ
বেড়া নেড়ে যেন গৃহস্থের মন বুঝা॥

রাঁড় হয়ে যেন ষাঁড়ের নাট।
গুণ হয়ে দোষ হৈল বিদ্যার বিদ্যায় ॥
ভাবিতে উচিত ছিল প্রতিজ্ঞা যখন ॥ ইত্যাদি।

অন্নদামঙ্গল কাব্যের বিস্তর শ্লোক প্রবচনের মত গাঢ়বন্ধ। যেমন,

জনক হইতে স্নেহ জননীর বাড়া। মার কাছে পুত্র যায় বাপে দিলে তাড়া ॥
সে কহে বিস্তর মিছা যে কহে বিস্তর। মেয়ের আশ্বাসে রহে সে বড় পামর ॥
আমি হৈনু বাসি ফুল ফুরাইল মধু। কেবল কথায় নাহি রাখা যায় বঁধু ॥
সাকার না ভাবিয়া যে ভাবে নিরাকার। সোণা ফেলি কেবল আঁচলে গিরা সার ॥

নিম্নের কয়ছত্রের গাঢ়বন্ধ অতিশয় উপভোগ্য। কোটাল ধূমকেতু পরামর্শ দিতেছে যে সুড়ঙ্গে নিকট ফাঁদ পাতিতে হইবে, কেন না

লোভের নিকটে যদি ফাঁদ পাতা যায়। পশুপক্ষী সাপ মাছ কে কোথা এড়ায় ॥
দেব উপদেব পড়ে মন্ত্রতন্ত্রফাঁদে। নিরাকার ব্রহ্ম দেহফাঁদে পড়ি কাঁদে ॥
পৃ ৯১ ॥

ভারতচন্দ্রের কবিপ্রতিভার যথার্থ পরিচয় মিলে অন্নপূর্ণামঙ্গলের মধ্যে নিবিষ্ট কয়েকটি গানে। বৈষ্ণব কবির ভক্তি ও ভাব, নিজস্ব ভাষা এবং আধুনিক সময়োচিত বর্ণনা ও দৃষ্টিভঙ্গি গানগুলিকে অসামান্যের শ্রেণীতে উন্নীত করিয়াছে। কিছু উদাহরণ দিই।

শুন শুন সুনাগর রায়।
আপনার মণি মন বেচিনু তোমায় ॥

তুমি বাড়াইলে প্রীতি, মোর তাহে নাহি ভীতি,
রহে যেন রীতি নীতি, নহে বড় দায়।
চুপে চুপে এসে যেয়ো, আর দিকে নাহি ধেয়ো,
সদা একভাবে চেয়ো এই রাধিকায় ॥
তুমি হে প্রেমের বশ, তেঁই কৈনু প্রেমরস,
না লইও অপযশ বঞ্চিয়া আমায়।

মোর সঙ্গে প্রীতি আছে না কহিও কারো কাছে,
ভারত দেখিবে পাছে, না ভুলায়ো তায় ॥

বেলা হৈল অন্নপূর্ণা রান্ধ বাড় গিয়া।
পরম আনন্দ দেহ পরমান্ন দিয়া ॥

তোমার অন্নের বলে অদ্যাবধি আছে গলে
কালরূপী কালকূট অমৃত হইয়া।
একহাতে পানপাত্র আর হাতে হাতা মাত্র,
দিতে পার চতুর্বর্গ ঈষৎ হাসিয়া ॥
তুমি অন্ন দেহ যারে অমৃত কি মিঠা তারে,
সুধাতে কে করে সাধ এ সুধা ছাড়িয়া।
পারশিয়া অন্নসুধা ভারতের হর ক্ষুধা,
মা বিনা বালকে অন্ন কে দেয় ডাকিয়া ॥

নিম্নের গানটি বাঙ্গালাসাহিত্যের শ্রেষ্ঠ লিরিক কবিতার অন্যতম।

ওহে বিনোদরায় ধীরে যাও হে।
অধরে মধুর হাসি বাঁশীটি বাজাও হে ॥
নবজলধর তনু, শিখিপুচ্ছ শক্রধনু,
পীতধড়া বিজুলীতে ময়ুরে নাচাও হে।
নয়নচকোর মোর দেখিয়া হয়েছে ভোর,
মুখসুধাকর-হাসি-সুধায় বাঁচাও হে ॥
নিত্য তুমি খেল যাহা নিত্য ভাল নহে তাহা,
আমি যে খেলিতে কহি সে খেলা খেলাও হে।
তুমি যে চাহনি চাও সে চাহনি কোথা পাও,
ভারত যেমন চাহে সেইমত চাও হে ॥ পৃ ১০-১১ ॥

ভারতচন্দ্রের কাব্য রচিত হইবার পর হইতে যে সকল প্রণয়কাহিনীমূলক কাব্য উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি অজস্র রচিত হইয়াছিল সে সকলের উপর অশেষ প্রভাব বিস্তার করে। উনবিংশ শতাব্দীর বহু কবিই ভারতচন্দ্রের প্রভাব

এড়াইতে পারেন নাই। ঈশ্বরগুপ্তের কাব্যে ইহা সুস্পষ্ট। মধুসূদনের ব্রজাঙ্গনা কাব্যে বৈষ্ণব পদাবলীর অপেক্ষা ভারতচন্দ্রের গানের প্রভাবের মাত্রাই বেশী। ভাবে ও ভাষায় ভারতচন্দ্রের দুইটি গানের নিম্নোদ্ধৃত অংশ পড়িবামাত্র ব্রজাঙ্গনা কাব্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

রহিতে না পারি ঘরে, আকুল পরাণ করে,
চিতে না ধৈরজ ধরে পিক কলকল।
দেখিব সে শ্যামরায়, বিকাইব রাঙ্গাপায়,
ভারত ভাবিয়া তায় ভাবে ঢলঢল॥
লোকে হৈল জানাজানি, সখীগণে কানাকানি,
আপনা বেচিয়া এত সহিতে কে পারে।
যায় যাক জাতিকুল, কে চাহে তার মূল,
ভারতে সে ধন্য শ্যাম ভালবাসে যারে॥

কবিরঞ্জন উপাধিক রামপ্রসাদ সেন ১৬৪০ হইতে ১৬৪৫ শকাব্দের অর্থাৎ ১৭১৮ হইতে ১৭২৪ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যে কোন সময়ে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন। রামপ্রসাদ জাতিতে বৈদ্য ছিলেন, বাসস্থান ছিল হালিসহরের নিকট কুমারহট্ট গ্রামে। রামপ্রসাদের পিতার নাম রামরাম, প্রপিতামহের নাম রামেশ্বর। নিধিরাম কবির বৈমাত্রেয় ভ্রাতা ছিলেন, আর বিশ্বনাথ সহোদর কনিষ্ঠ ভ্রাতা এবং অম্বিকা ও ভবানী সহোদরা ভগিনী ছিলেন। জগন্নাথ ও কৃপারাম দুই ভাগিনেয়। বিদ্যাসুন্দর রচনার সময় কবির এক পুত্র রামদুলাল ও দুই কন্যা পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী জন্মিয়াছে। বিদ্যাসুন্দর[১] বা কালিকামঙ্গল কাব্য হইতে কবির সম্বন্ধে এইটুকু মাত্র জানা যায়।

ধনবন্ত মহাকুল পূর্ব্বাপর শুদ্ধ মূল, কীর্ত্তিবাস তুল্য কীর্ত্তি কহি।
দানশীল দয়াবন্ত শিষ্ট শান্ত গুণানন্ত, প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥
সেই বংশ সমুদ্ভূত ধীর সর্ব্বগুণযুত ছিল কত কত মহাশয়।
অনচিরদিনান্তর জন্মিলেন রামেশ্বর দেবীপুত্র সরলহৃদয়॥

১। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত (১২৯৩)।

তদঙ্গজ রামরাম মহাকবি গুণধাম সদা যারে সদয়া অভয়া।
প্রসাদ তনয় তার কহে পদে কালিকার, কৃপাময়ি ময়ি কুরু দয়া॥ পৃ ৫৩-৫৪ ॥[১]

ধরাতলে ধন্য সে কুমারহট্ট নাম। তত্র মধ্যে সিদ্ধপীঠ রামকৃষ্ণধাম॥
শ্রীমণ্ডপ জাগ্রত শৈলেশপুত্রী যথা। নিশাকালে চরিতার্থ শ্রীরঞ্জন তথা॥
কিঞ্চিৎ তিষ্ঠিলে ফলাপেক্ষা ছিল কিবা। ক্ষীণপুণ্য দেখি বিড়ম্বনা কৈলা শিবা॥[২]
শ্রীমতী পরমেশ্বরী সর্ব্বজ্যেষ্ঠ সুতা। শ্রীকবিরঞ্জনে ভণে অদ্ভুত কবিতা॥ পৃ ৯৭॥

শ্রীকবিরঞ্জন এই কহে কৃতাঞ্জলি।
শ্রীরামদুলালে মাতা দেহ পদধূলি॥ পৃ ৬৩ ইত্যাদি।
জগদীশ্বরীকে কৃপা কর মহামায়া।
মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥ পৃ ১৬৭॥

জ্যেষ্ঠা ভগ্নী ভবানী সাক্ষাৎ লক্ষ্মী দেবী। যার পাদপদ্ম আমি রাত্রিদিবা সেবি॥
ভগ্নীপতি ধীর লক্ষ্মীনারায়ণ দাস। পরমবৈষ্ণব কলিকাতায় নিবাস॥
ভাগিনেয়যুগ্ম জগন্নাথ কৃপারাম। আমাকে একান্ত ভক্তি সর্ব্বগুণধাম॥
সর্ব্বাগ্রজ ভগ্নী বটে শ্রীমতী অম্বিকা। তার দুঃখ দূর কর জননী কালিকা॥
গুণনিধি নিধিরাম বৈমাত্রেয় ভ্রাতা। তারে কৃপা দৃষ্টি কর মাতা নগজাতা॥
জগদীশ্বরীকে দয়া করা মহামায়া। মমানুজ বিশ্বনাথে দেহ পদছায়া॥
শ্রীকবিরঞ্জনে মাতা কহে কৃতাঞ্জলি। শ্রীরামদুলালে মাগো দেহ পদধূলি॥ পৃ ১৭৯॥

রামগতি ন্যায়রত্ন প্রমুখ সকলেই বলিয়াছেন যে রামপ্রসাদের কাব্য ভারতচন্দ্রের কাব্যরচনার আগে অর্থাৎ ১৬৭৪ শকাব্দের বা ১৭৫২-৫৩ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বে রচিত হয়।[৩] কিন্তু এই অনুমানের পোষকতায় কোন ভারসহ যুক্তি নাই। বরং বিপরীত যুক্তি একটু আছে। রামপ্রসাদ বলিয়াছেন যে তিনি রাজকিশোরের আদেশে বিদ্যাসুন্দর বা কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

শ্রীরাজকিশোরাদেশে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহা অন্ধের[৪] ঔষধ অঞ্জন॥[৫]

১। পৃ ১৪৩-৪৪, ১৫৩-৬৪, ১৮০-৮১ দ্রষ্টব্য। ২। কবি যে তান্ত্রিক সাধক ছিলেন তাহা এই কয় ছত্র হইতে বোঝা যায়। ৩। ভূমিকা, পৃ ১৮-২৮ দ্রষ্টব্য। ৪। 'মোহান্ধের' হইবে? ৫। জীবনবৃত্তান্ত পৃ ২৬; কোন কোন পুঁথিতে (?) পাওয়া যায়। মুদ্রিত পাঠে পাইলাম না।

এই রাজকিশোর ছিলেন হুগলীর দেওয়ান। কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল যখন তীর্থযাত্রা করেন তখন হুগলীতে ইঁহার বাড়ীতে মধ্যাহ্নে আহারাদি করিয়াছিলেন, এই কথা তীর্থমঙ্গলে বিজয়রাম বলিয়াছেন। কৃষ্ণচন্দ্র ১৭৬৯ খ্রীষ্টাব্দে তীর্থযাত্রা করেন। সুতরাং রামপ্রসাদের কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয় পাদের পূর্ব্বে রচিত হওয়া সম্ভবপর নহে, সম্ভবতঃ পরে। ভারতচন্দ্রের অনুকরণ তো আছেই।

রামপ্রসাদের কাব্যের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। গণেশ, সরস্বতী, লক্ষ্মী ও কালী বন্দনার পর আখ্যায়িকা আরম্ভ হইয়াছে। বর্দ্ধমানের রাজা বীরসিংহের কন্যা বিদ্যা বিবাহের উপযুক্ত হইলে রাজা পাত্রান্বেষণে মাধব ভাটকে নিযুক্ত করিলেন। মাধব দেশবিদেশ ঘুরিতে ঘুরিতে কাঞ্চীদেশে গিয়া পড়ুয়া সুন্দরকে দেখিয়া পছন্দ করিল। তাহার মুখে বিদ্যার কথা শুনিয়া সুন্দর উতলা হইল। রাত্রিতে সুন্দর দেবীর স্বপ্নাদেশ পাইয়া প্রভাতে বর্দ্ধমান যাত্রা করিল। পথে দেবী এক মায়ানদী সৃষ্টি করিলেন। নদীতীরে সুন্দর বিমূঢ় হইয়া দাঁড়াইয়া আছে, এমন সময় এক যোগী আবির্ভূত হইলেন। যোগী পরিচয় জিজ্ঞাসা করাতে

সুন্দর কহেন নিবেদন মহাশয়। কাঞ্চীদেশ ধাম গুণসিন্ধুর তনয়॥
সুন্দর আমার নাম বিদ্যাব্যবসায়ী। বিদ্যা-অন্বেষণে বীরসিংহ-দেশ যাই॥

যোগী বলিলেন, তুমি পথঘাট জান না, কিরূপে যাইবে? সুন্দর বলিল, দেবী আমার সহায়। যোগী তখন সুন্দরকে বলিলেন, তুমি কালীমন্ত্র ত্যাগ করিয়া আমার নিকট হরমন্ত্র নাও। সুন্দর ক্রুদ্ধ হইয়া যোগীকে সমুচিত উত্তর দিল। তখন যোগী আর মায়া নদী দুইই অন্তর্হিত হইল, সুন্দরও পথ চলিতে লাগিল। কাঞ্চীপুর হইতে বর্দ্ধমান সহর ছয় মাসের পথ, কালীর কৃপায় সুন্দর দশম দিবসে পৌঁছিল। তাহার পর বর্দ্ধমানের বর্ণনা।

গোধন রক্ষক যারা সঙ্কীর্ত্তন ভাষে তারা,
কে বুঝে পণ্ডিত কেবা চাষা॥

তাহার পর সহর গড় বাজার ইত্যাদির বর্ণনা, মালিনীর সহিত সুন্দরের পরিচয়। মালিনী কর্ত্তৃক বিদ্যার রূপ বর্ণনা।

চাঁচর চিকুরজাল জলধর জিনি। শ্রুতিযুগে পরাভব পাইল গৃধিনী॥

ডুবিল কুরঙ্গশিশু মুখেন্দুসুধায়। লুপ্তগাত্র তত্র মাত্র নেত্র দেখা যায়॥
নয়নের চঞ্চলতা শিখিবার তরে। অদ্যাপি খঞ্জন নিত্য কর্ম্মভোগ করে॥
অমিয়াজড়িত ভাষা নাসা তিলফুল। বিম্বাধর দশনে মুকুতা নহে তুল॥
পুষ্পধনু অনু[কারী] কি ভুরুভঙ্গিমা। বাহুতুল নহে বিসে কিসের গরিমা॥
যৌবনজলধি মধ্যে মগ্ন মত্তগজ। উরে দৃষ্ট কুম্ভস্থল সে নহে উরজ॥
নাভিপদ্ম পরিহরি মত্ত মধুপান। ক্রমে ক্রমে বাড়িল বারণকুম্ভস্থান॥
কিবা লোমরাজি ছলে বিধি বিচক্ষণ। যৌবন কৈশোরে দ্বন্দ্ব করিল' ভঞ্জন॥
কেহ বলে মধ্যস্থল নাহি কি রহস্য। কেহ বলে দেবসৃষ্টি থাকিবে অবশ্য॥
সূক্ষ্ম বিবেচনা তাহে বুঝিবে প্রবীণ। বিজ্ঞ বট ভাব দেখি কি প্রকার ক্ষীণ॥
নিবিড় বিপুল চারু যুগল নিতম্ব। কামপারাবারপার সার অবলম্ব॥
যদ্যপি অচিরপ্রভা চিরস্থির হয়। তবে বুঝি তনুশোভা হয় কিবা নয়॥
মন্দ মন্দ গমনে যদ্যপি বাঁকা চায়। মনোভব পরাভব লইয়া পলায়॥
কোন বা বড়াই তার পঞ্চশরতূণে। কত কোটি খরশর সে নয়নকোণে॥
পোড়াইয়া কাম নাম বটে স্মরহর। তাঁহার অসহ্য বালা হানে দৃষ্টিশর॥
পৃ ২৮-২৯॥

সুন্দর কর্ত্তৃক মাল্য রচনা। হীরা মালিনীর হাট করার বিবরণ।

প্রথমেতে বণিকের হাতে দিতে টাকা। টঙ্কারিয়া হাতে নিতে মুখ করে বাঁকা॥
ছটা ছিল গরশাল ছটা ছিল মেকী। হরে-দরে বুঝিতে টাকার নাই সিকি॥
বাটাবাদে পাইলাম আড় কাট নয়। কিনিতে বণিক্ দ্রব্য থোকে গেল ছয়॥
তবে বটে বাপু বাকি তিন টাকা থাকে। মুখে মুখে লও লেখা দিতেছি তোমাকে॥
অগ্নিতুল্য দ্রব্য যত কব আর কি। দু টাকায় লইলাম দুই সের ঘি॥
এক টাকা সবেমাত্র রহে অবশেষ। কিনিলাম তাহে বলি-উপযুক্ত মেষ॥
উপহার দ্রব্য কিছু কিনা যায় নাই। হাতকর্জা লইলাম তেলিনীর ঠাঁই॥
তাও বুঝি হতে পারে সিকা ছয় সাত। খুচরার লেখাজোখা বড়ই উৎপাত॥
স্নান করি খাই দাই লেখা দিব শেষে। উচক্ক সময় এত মনে নাহি আসে॥
পাঁচ কড়া কড়ি বাপু খাই নাই মুই। প্রত্যয় না কর বল গঙ্গাজল ছুঁই॥

টাকা সিকা কোন বস্তু কতকাল খাব। বিশ্বাসঘাতকী করে নরকেতে যাব ॥
পূর্ব্বজন্মপাপে এত পরিতাপ পাই। দুকূলে এমন নাহি তার মুখ চাই ॥
বিধি গুণনিধি মিলাইলা তোমা হেন। চোরবাদ হবে মোর না মরিনু কেন ॥
এই যে তোমার মাসী বোধে নহে টুটা। কে পারে ভুলাতে কার ঘাড়ে মাথা দুটা ॥
পুরুষের কান কাটে ধরে শক্তি হীরা। ফাঁকী দিয়া চাকি ভুক্তে গায় করে কিরা ॥ পৃ ৩৬-৩৭ ॥

পুষ্প ও মাল্য লইয়া বিদ্যার নিকট মালিনীর গমন, মালা দেখিয়া মালিনীর নিকট তাহার রচয়িতার পরিচয় জানিবার জন্য বিদ্যার উৎকণ্ঠা, মালিনী কর্ত্তৃক সুন্দরের পরিচয় প্রদান, স্নানছলে সরোবরতীরে বিদ্যা ও সুন্দরের প্রথম সাক্ষাৎ ও পরস্পর প্রণয়সঞ্চার, বিদ্যা কর্ত্তৃক দেবীর স্তব, সুন্দর কর্ত্তৃক দেবীর স্তব, দেবীর প্রসাদে সুড়ঙ্গপথের আবিষ্কার, সুড়ঙ্গপথে গিয়া রাজপ্রাসাদে বিদ্যার কক্ষে সুন্দরের মিলন, গান্ধর্ব্ববিবাহ, দাম্পত্যসুখসম্ভোগ, বিদ্যার গর্ভসঞ্চার, তাহা বুঝিয়া রাণীর ভৎ'সনা, রাণী নিকট বিদ্যার গর্ভবৃত্তান্ত শুনিয়া বাঘাই কোটালকে দরবারে ডাকিয়া আনিতে রাজা কর্ত্তৃক সওয়ার প্রেরণ, কোটালের রাজসভায় উপস্থিতি, কোটালকে ভৎ'সনা করিয়া সাত দিনের মধ্যে চোর ধরিতে রাজার আদেশ, রাণীর নিকট হইতে কোটালেরপত্নীর চোরের অপকর্ম্ম অবগতি, কোটাল ও কোটালপত্নী কর্ত্তৃক ভদ্রকালীর স্তব, কোটালের চোর অন্বেষেণ সজ্জা।

চোর ধরিবার জন্য কোটাল পাঁচ শত চর নিযুক্ত করিল। কেহ পাটনী হইয়া খেয়া দিতে লাগিল, কেহ বা দানী হইয়া দানঘাট আটক করিয়া রহিল। বীরসিংহের রাজ্যে বৈষ্ণবের বড় খাতির, সেই জন্য অনেক চর বৈষ্ণব সাজিয়া ঘুরিতে লাগিল।

গৌড়রাজ্যে গোঁড়াগুলা চলে যে যে ঠাটে। সেরূপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে মাঠে॥
খাসা চীরা বহির্ব্বাস রাঙ্গা চীরা মাথে। চিকণ গুধড়ী গায় বাঁকা কোঁৎকা হাতে ॥
মুঞ্জ গুঞ্জছড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব। দুই ভাই ভজে তারা সৃষ্টিছাড়া ভাব ॥
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে থান সাত আট ভেকা লোকে ভুলাইতে ভাল জানে ঠাট ॥

এক এক জনার ধুমড়ী দুটি দুটি। দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবার কুটী॥
ভুগলামি-ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে। বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে॥
সে রসে রসিক নবশাক লোক যত। উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবত॥
সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী। ভাল মতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি॥
গোষ্ঠীশুদ্ধ খাড়া থাকে বাবাজির কাছে। মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে॥
নানা রস ভুঞ্জায় শোয়ায় দিব্য খাটে। শেষে মেয়ে পুরুষেতে পত্রশেষ চাটে॥
বৈষ্ণববন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ায়। ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্র জড়ায়॥
কেমন কলির কর্ম্ম কব আর কি। মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝী॥ পৃ ৯০-৯১॥

কেহ কেহ রামানন্দী সাধু, ফকীর, অবধূত, ভিক্ষুক ইত্যাদির বেশ ধারণ করিয়া চোর অন্বেষণে ফিরিতে লাগিল।

শতাবধি জনে হয় খাসা রামানন্দী। অঙ্গসঙ্গোপনে তারা ভাল জানে সন্ধি॥
পাঁচ হাতিয়ার বান্ধা বিষম দুরন্ত। জনেক তাহার মধ্যে প্রাচীন মহান্ত॥
দেবল দেখিলে যেন পায় ভক্ষ্য লাড়ু ধাক্কা মেরে ফেলে দিয়া কেড়ে লয় গাড়ু॥
মারপিটে ধূমধাম করয়ে লহর। ভয় নাই লুট্যা খায় বাজার[১] সহর॥
কেহ বা বিষম বাঁকা জালালি ফকির কাঁকালে কুঠার গাঁথা পায়েতে জিঞ্জির॥
বাঁ হাতে লোহার খাড়ু শিরে পাগ কালা। কান্ধে ঝুলি গলে কত তর[বে]তর মালা।
যার বাটী যায় তার নাকে আনে দম। কয়ে যেতে চুরচুর নদারদ গম॥
কত অবধৌত কত যতী ব্রহ্মচারী। হাজারে হাজারে ফিরে নানা ভেকধারী।
হেকমতে কতগুলা হইল কাঙ্গালী। মরা পারা পড়্যা পড়্যা থাকে গলিগলি।
লোকে জিজ্ঞাসিলে কেহ নাহি কাড়ে রা। দুই চক্ষু বুজে থেকে থেকে করে হা॥
মেয়ে হরকরা গৃহস্থের ঘরে ঘরে। চোর অন্বেষণ করে কত মায়া ধরে॥
পৃ ৯১-৯২॥

পাঁচ দিন কাটিয়া গেল, এত করিয়াও চোর ধরা পড়িল না। তখন হীরা রায় নামে কোটালের এক খুড়া পরামর্শ দিয়া

১। মুদ্রিত পাঠ 'রাজার।'

কহে বাপু কেন হাপু গণ যুক্তি আছে। সঙ্গোপনে যাও বিদু ব্রাহ্মণীর কাছে ॥
তাহার অসাধ্য কর্ম্ম ভূমণ্ডলে নাই। অবশ্য চোরের তত্ত্ব পাবে তার ঠাঁই ॥

খুড়ার পরামর্শে বাঘাই কোটাল দুপুর বেলায় বিদু বামনীর কাছে গেল, গিয়া সাষ্টাঙ্গ প্রণাম করিয়া হাতযোড় করিয়া রহিল। হাসিয়া বিদু তাহাকে বসিতে অনুমতি করিয়া বলিল,

কোন ঘাটে মুখ আজি ধুয়েছিনু মুই। বৌও বেটা বুঝেছি নিষ্ঠুর বড় তুই ॥
ভাগ্যধর হবে বাপু কুড়ায়েছি ফুল। শুভচণ্ডী পূজে কত ছিঁড়িয়াছি চুল ॥
পঞ্চম বৎসরে তোর মা মরে যখন। মৃত্যুকালে হাতে হাতে সুঁপেছে তখন ॥
এবে বাছা ঠাকুরালি দেশের ঠাকুর। আমি সেই ভাব ভাবি তুমি সে নিষ্ঠুর ॥পৃ ৯৩॥

কোটাল কহিল, মাসী মিছা কথা রাখিয়া দাও, আমি মুস্কিলে পড়িয়াছি। এই বলিয়া চোরধরার বৃত্তান্ত বলিল। বিদু আশ্বাস দিল, এবং বিদ্যার সহিত দেখা করিয়া কুৎসিত প্রস্তাব করিল। বিদ্যার সখীরা তাহাকে অপমান করিয়া তাড়াইয়া দিল। ছয় দিন কাটিয়া গেল, একদিন মাত্র বাকি। বাঘাই দেবীকে স্মরণ করিয়া এক গাছতলায় বসিয়া চিন্তা করিতে লাগিল, এমন সময় তাহার ছোট ভাই মাঘাই আসিয়া তাহাকে সুযুক্তি দিল,

সিন্দূরমণ্ডিত কর রাজকন্যা গৃহ।
অবশ্য মিলিবে চোর নাহিক সন্দেহ ॥

কোটাল এই পরামর্শ গ্রহণ করিয়া রাজার অনুমতি লইল এবং রাজকন্যার মহল সর্ব্বত্র সিন্দূরলিপ্ত করিল। সুন্দর রাত্রিতে আসিলে তাহার কাপড়ে সিন্দূর লাগিয়া গেল। মালিনীর গৃহে ফিরিয়া সুন্দর গোপনে কাপড় শীঘ্র কাচিয়া ফেলিতে হীরাবতীকে রজকের বাড়ী পাঠাইয়া দিল। সেখানে কোটালের চর ছিল, সে ধরিয়া ফেলিল। তাহার পর রজকের নিকট সন্ধান পাইয়া কোটাল হীরাবতীকে ধরিল। তাহাকে নির্য্যাতন করায় সে সুন্দরের কথা বলিয়া দিলে সুন্দর সুড়ঙ্গ মধ্যে পলাইল। সুড়ঙ্গ খনন করা হইল, কিন্তু চোর পাওয়া গেল না। তখন কোটাল অনুমান করিল, চোর নিশ্চয়ই নারীবেশ ধরিয়া বিদ্যার সখীদিগের মধ্যে আছে। তখন সখীদিগের মধ্যে পুরুষ আছে কিনা পরীক্ষার জন্য কোটাল খানা খুঁড়িয়া

একে একে ডিঙ্গাইতে বলিল। নারী হইলে বামপদ অগ্রে ফেলিবে, পুরুষ হইলে দক্ষিণ। বিদ্যা সুন্দরকে যুক্তি দিল বামপদ অগ্রে ফেলিয়া ডিঙ্গাইতে। সুন্দর রাজি হইল না, বলিল, তাহা হইলে মিথ্যাচরণ হইবে এবং কোটাল সংবশে মারা যাইবে। দেবীর দয়ার উপর নির্ভর করিয়া সুন্দর স্বাভাবিক ভাবে ডাইন পা আগে বাড়াইয়া খানা পার হইল এবং যথারীতি ধরা পড়িল।

তাহার পর বিদ্যার খেদ ও কোটালের প্রতি অনুনয়, বিদ্যার প্রতি রাণীর আক্ষেপ ও বিলাপ, বিদ্যার স্তবে দেবীর অভয়প্রদান, চোর সুন্দরকে দেখিয়া নাগরিকজনের খেদ, মশানে সুন্দর কর্তৃক শ্লেষের সাহায্যে দেবীর স্তব ও বিদ্যার বর্ণনা (চৌরপঞ্চাশিকার পাঁচটি মাত্র শ্লোকের অনুবাদ)। রাজার আদেশে পাত্র সুন্দরের জাতি ও পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে সুন্দর বলিল,

দাড়ি ভুঁড়ি সার কোন জ্ঞান নাহি মাত্র। হবচন্দ্র রাজা যেন গবচন্দ্র পাত্র॥
বনপশু বুঝেছি বলিয়া দেন তুড়ি। রাঙ্গা বট যেন সার কাঁঠালের গুঁড়ি॥
ছয়মাস গতে কর্ম্ম শুধাও কি জাতি। কেন না হইবে তুমি নিজে হও কাতি॥
তব চর্য্যা চর্চ্চিলাম আলাপে ক্ষণেক। দ্বিপাদ পশুর মধ্যে তুমি হে জনেক॥
কদাচিৎ মিলে যদি তোমার দোসর। চাষায় পরশ পায় চুনা বাড়ে দর॥পৃ ১২৯॥

তখন ব্রাহ্মণেরা সুন্দরের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। সুন্দর উত্তর করিল,

জনম মানবকুলে শম্ভুধাম ধাম।
পিতামাতা শিবশিবা কালিদাস নাম॥

কোনমতে পরিচয় জানিতে না পারিয়া রাজা কোটালের সহিত পরামর্শ করিয়া স্থির করিলেন যে সুন্দর রাজপুত্র বটে এবং ইহাকে কন্যা দান করিতে হইবে। আরও একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য সুন্দরকে দক্ষিণ মশানে লইয়া গিয়া কাটিয়া ফেলিতে কোটালকে রাজা আজ্ঞা দিলেন। বধ্যস্থলে সুন্দর চৌতিশ অক্ষরে দেবীর স্তব করিল। কালী সুন্দরকে অভয় দিলেন। এমন সময় দেবীর কৃপায় মাধব ভট্ট সেখানে আসিয়া পড়িল।

জরির পোষাক পরা বেশ চিরা মাথে। কনকে জড়িত হীরা নবরত্ন হাতে॥
চিক্কণ পাথর শিরে চকমক করে। বহুমূল্য তরুণতপনতেজো ধরে॥

ডোরে লট্‌কা তলোয়ার কোমরে খঞ্জর। চাঁদমুখে চাঁপদাড়ি পরমসুন্দর॥
বুকেতে চাপ্পানি ঢাল তুরকীর পৃষ্ঠে। বাঘাই কোটাল পানে চাহে কোপদৃষ্টে॥ পৃ ১৩৭॥

সুন্দরকে বধ করিতে উদ্যত দেখিয়া মাধব ভট্ট কোটালের প্রতি "ভট্টভাখা" অর্থাৎ হিন্দীমিশ্রিত ব্রজবুলিতে কটূক্তি করিল [পৃ ১৩৭-৩৮]। কোটালও সেই ভাষায় প্রত্যুত্তর দিল। উত্তর পাইয়া

মানভঙ্গমলিন মাধব মনোদুখে। কাষ্ঠবৎকায় কথা নাহি সরে মুখে॥
পদ্য দেখি গদ্য কথা যদ্যপিহ করে। বৈদ্যগ্রন্থে সদ্যফল বৈদ্যক হাকরে॥
নব্যলোক ভব্য হয় সভ্যসঙ্গে বটে। গুণ যেন দ্রব্যযোগে দিব্য গুণ ঘটে॥পৃ১৪০॥

মাধব রাজার কাছে গিয়া সুন্দরের পরিচয় দিলে রাজা পাত্রমিত্র সহ মশানে আসিয়া সুন্দরের নিকট ক্ষমাভিক্ষা করিলেন, রাণীও বিদ্যাকে যথোচিত সমাদর করিলেন। বিদ্যা দেবীর পূজা করিল। রাজা সুন্দরকে রাজসিংহাসনে নিজের পাশে বসাইলেন।

সুন্দর শ্বশুরালয়ে আনন্দে আছে, গৃহে ফিরিবার নাম নাই। অগত্যা দেবী সুন্দরের মাতৃরূপে তাহাকে স্বপ্ন দিলেন। সুন্দর বিদ্যার নিকট বিদায় চাহিল, বিদ্যা সঙ্গে যাইতে বদ্ধপরিকর হইল। রাজা রাণীর নিকট বিদায় লইয়া সস্ত্রীক সুন্দর স্বদেশে চলিল। পিতামাতা পুত্র ও পুত্রবধূকে আদরে বরণ করিয়া লইলেন, রমণীরা আসিয়া বধূ দেখিয়া গেল। রাজা গুণসিন্ধু পুত্রকে সিংহাসনে বসাইয়া সস্ত্রীক বারাণসী বাস করিলেন। যথাসময়ে বিদ্যা পুত্রসন্তান প্রসব করিল। নাম হইল পদ্মনাভ। পদ্মনাভ অল্পবয়সে কৃতবিদ্য হইয়া উঠিল এবং মাতার নিকট "একাক্ষরী মন্ত্র" লইল। ত্রয়োদশ বর্ষে কুমারের বিবাহ হইল। কিছুকাল পরে সুন্দর এক বিচিত্র দেউল তুলিয়া দক্ষিণাকালিকা মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিল। তাহার পর সুন্দর শবসাধনা করিয়া সিদ্ধ হইল, এবং পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করিয়া যথোপযুক্ত উপদেশ দিল। দেবীর আদেশে শেষে দেবীমন্দির সমীপে বিল্ববৃক্ষ-মূলে যোগাসনে বসিয়া বিদ্যা ও সুন্দর যোগবলে একত্র তনুত্যাগ করিল এবং

হারাবতী মালাধর হইয়া শিবসন্নিধানে চলিয়া গেল। শেষে অষ্টমঙ্গলায় দেবীর কাহিনী অতি সংক্ষেপে উক্ত হইয়াছে।

উপাখ্যান অংশে রামপ্রসাদ কিছু কিছু মৌলিকতা দেখাইয়াছেন। শব-সাধনার বিস্তৃত বিবরণ শুধু রামপ্রসাদের কাব্যেই পাওয়া যাইতেছে। কবি যে শক্তিসাধক ছিলেন ইহা তাহার অন্যতম নিদর্শন।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের সহিত রামপ্রসাদের কাব্য তুলনা করিলে দেখা যায় যে, শিল্পচাতুর্য্যে এবং ভাষার মনোহারিত্বে ভারতচন্দ্রের কাব্য রামপ্রসাদের কাব্যের তুলনায় অনেক শ্রেষ্ঠ, কিন্তু চরিত্রচিত্রণে অপকৃষ্ট। রামপ্রসাদের কাব্যে সকল চরিত্রগুলিই স্বাভাবিক হইয়াছে, কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যে চরিত্রগুলি typical, প্রায় যেন satirical, এবং এইজন্য ভারতচন্দ্রের কাব্যের কাছে রামপ্রসাদের কাব্য অনেকটা নিষ্প্রভ। রামপ্রসাদের কাব্যের আর একটি মহৎ গুণ আছে, কাব্যটি ঘরুয়া ভাবে (human touch) ওতপ্রোত। তবে রামপ্রসাদের ভাষা বিষয়ে শ্লীলতাজ্ঞান বিশেষ ছিল না। শব্দশিল্পী হিসাবে ভারতচন্দ্রের সহিত তিনি তুলনায় দাঁড়াইবার যোগ্য নহেন।

ভারতচন্দ্রের মত চটকদার না হইলেও রামপ্রসাদের উক্তি মধ্যে মধ্যে অতি চমৎকার। যেমন,

স্বপ্নরূপ কন্যাগুলা ভেঙ্গে গেল ধূলাখেলা…॥ পৃ ১৬১॥

অপরাহ্নে তরুছায় অতি দূরতর যায়, সে যেমত ছাড়া নহে মূল।
অন্যতম ভাব পাছে, মানস তোমার কাছে থাকিল, গমন সেই তুল॥ পৃ ১৬২॥

ভণ্ড বৈষ্ণব ও অন্যান্য সাধুদিগের বর্ণনা ইত্যাদিতে রামপ্রসাদের রসরচনায় দক্ষতার পরিচয় রহিয়াছে। সাধারণ লোকের গুজবপ্রিয়তার বর্ণনা অতিমাত্রায় বাস্তব। এই অংশটুকু এখানে উদ্ধৃত করিতেছি।

সহরে গুজব উঠে একে একশত। গল্প বাড়ে বড়ই আঠারমেসে যত॥
দরজায় বস্তে কেহ মণ্ডলের ঠাট। পথের মানুষ ডেকে লাগাইছে হাট॥
এক শরা ভরা টিকা হুঁকা চলে ছুটা। পোয়া দেড় গুড়াকু তামাকু ঢেঁকিকুটা॥
হেসে কহে তোমরা শুনেছ ভাই আর। শুনিলাম এখনি আশ্চর্য্য সমাচার॥

হাতকাটা একটা মানুষ গেল কয়ে। চোরের সহিত নাকি ছিল দুটা মেয়ে॥
পরমরূপসী তারা স্বর্গবিদ্যাধরী। বিপুলনিতম্ব হরিণাক্ষী কৃশোদরী॥
চোর কাটা গেল যদি কোটালের হাতে। সেইক্ষণে তারা পুড়ে মৈল তার সাথে॥
পৃ ১০৪॥

ভারতচন্দ্রের মত না হইলেও রামপ্রসাদ ছন্দোবৈচিত্র্য কিছু কিছু দেখাইয়াছেন। মধ্যে মধ্যে অনুপ্রাসের চেষ্টা আছে, কিন্তু তাহা প্রায়ই শোভন নহে। একটি অংশে আদ্য ও অন্ত্য যমকের প্রয়োগ আছে। যেমন,

বারণ বারণ মন কদাচ না মানে। ক্ষপা ক্ষপাদিবা ছোটে কি করিবে মানে॥
সর্ব্ব সর্ব্বকাল পূজি পীড়া এই ধারা। নিত্য নিত্যাবধি দিলা দুনয়নে ধারা॥
তারা তারাপতি যদি মিলাইলা করে। ফের ফের দিয়া বিধি বঞ্চনা বা করে॥
হর হরবধূ দুঃখ তনয় প্রসাদে। বিদ্যা বিদ্যা কবিবরে করহ প্রসাদে॥ পৃ ৪৭॥

রামপ্রসাদ কৃষ্ণলীলাত্মক পদ কিছু কিছু লিখিয়াছেন। কৃষ্ণের বাল্যলীলার ছাঁচে তিনি যে গৌরীর বাল্যলীলাঘটিত পদগুলি লিখিয়াছিলেন সেগুলি কালী-কীর্ত্তন[1] নামে প্রসিদ্ধ। কাব্যাংশে এই পদগুলি একেবারে বিশেষত্ববর্জ্জিত।

রামপ্রসাদের আধ্যাত্মিক পদগুলি অপূর্ব্ব। এগুলির কথা পরে আলোচনা করিব। রচনাভঙ্গির দিক দিয়া এগুলি এতই স্বতন্ত্র যে অন্য কবির রচনা বলিতে ইচ্ছা হয়। এটাও ঠিক যে জনশ্রুতি ভিন্ন এমন কিছু প্রমাণ নাই যাহাতে বিদ্যাসুন্দর-রচয়িতা রামপ্রসাদ গীত-রচয়িতা রামপ্রসাদ হইতে অভিন্ন হইতে পারেন।

নিধিরাম আচার্য্য কবিরত্নের কালিকামঙ্গল[2] ১৬৭৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৫৬-৫৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।

শকাব্দা ষোড়শ শত জলনিধি বসু।
দৈববিৎ বিরচিত নিধিরাম শিশু॥

নিধিরামের পিতার নাম দুর্ল্লভ আচার্য্য, মাতার নাম লক্ষ্মী, মাতামহের নাম

১। শ্রীনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিহারীনাথ নন্দী কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৭৭৭ শকাব্দ)।
২। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৩০-৩১, ১-২, পৃ ১০, ব-সা-প-প ৭, পৃ ২৪৩।

গঙ্গারাম। ইঁহারা দৈবক ছিলেন। বাসস্থান চাটিগ্রাম অঞ্চলে। কবির গুরুর নাম রামচন্দ্র।

আনন্দে নয়নের জলে পাখালিল পায়ে।
দুর্ল্লভ-আচার্য্য সুত নিধিরামে গায়ে॥

গুরু রামচন্দ্র-পদ ধরিয়া মাথায়ে।
লক্ষ্মীর নন্দন কবি নিধিরামে গায়ে॥

বন্দি বাণীপদাম্বুজ গঙ্গারাম-সুতাসুত,
জ্যোতির্ব্বিদ কুলেতে উৎপত্তি।

যোড়হস্তে মালিনীরে জিজ্ঞাসয়ে বাত।
শ্রীকবিরতনে ভণে জ্যোতির্ব্বিদ্‌জাত॥

নিধিরামের কাব্যে সুন্দরের পিতা গুণাসার,[১] মাতা কলাবতী, রাজধানী রত্নাবতী। বিদ্যার পিতা বিক্রমকেশরী, মাতা চন্দ্ররেখা, রাজধানী উজ্জয়িনী।

বিদ্যার রূপ বর্ণনা—

সুন্দরীর মুখখানি দেখি যুবরাজ। কলঙ্কশরীর চান্দে পাইলেক লাজ॥
কষ্টতপ করে চান্দে পাই অপমান। মাসে মাসে মরে জীয়ে না হয়ে সমান॥
পূর্ণিমার চন্দ্র যে না হয়ে তুলনা। আর কারে আসিয়া করিমু বিড়ম্বনা॥
তিলফুল জিনি চারু নাসিকার ঠাম। রূপগুণ খগ পক্ষীর চঞ্চুর সমান॥
লজ্জায় আকুল হইয়া পক্ষী খগেশ্বর। বিষ্ণুসেবা করে পক্ষী হইতে সমসর॥
তথাপিহ না পারিল নাসা সমান হইতে। লজ্জা পাইয়া তদবধি না আইসে ভারতে॥
খঞ্জন চকোর আর কুমুদ কুরঙ্গ। নয়নে দেখিয়া তারা অপমানে ভঙ্গ॥
খঞ্জন উড়িয়া গেল মৃগ বনমাঝে। চকোর চান্দের আড়ে রহিলেক লাজে॥

মধুসূদন কবীন্দ্রের কাব্যে প্রধানতঃ পৌরাণিক দেবীচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে, বিদ্যাসুন্দরকাহিনী খুব সংক্ষিপ্তভাবে দেওয়া আছে। এই কথা নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় লিখিয়াছেন।[২]

১। গুণসাগর?

২। বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ৬৫।

প্রাণরাম চক্রবর্ত্তীর কাব্য ভারতচন্দ্রের কাব্যের পরে রচিত হইয়াছিল। ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী বিদ্যাসুন্দরকাব্য-রচয়িতাদিগের উল্লেখ করিয়াছেন।

বিদ্যাসুন্দরের এই প্রথম বিকাশ। বিরচিলা কৃষ্ণরাম নিমিতা যাঁর বাস॥
তাঁহার রচিত গ্রন্থ আছে ঠাঁই ঠাঁই। রামপ্রসাদের কৃত আর দেখা নাই॥
পরেতে ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গলে। রচিলেন উপন্যাস প্রসঙ্গের ছলে॥[১]

ক্ষেমানন্দ এবং বিশ্বেশ্বর দাস এই দুইজন বিদ্যাসুন্দর কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া উল্লিখিত হইয়া থাকেন।[২]

১। সাহিত্য ১৩০০, পৃ ১১৬। ২। দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় রচিত History of Bengali Language and Literature, পৃ ৬৬৫, বলরাম কবিশেখর রচিত কালিকামঙ্গল ভূমিকা, পৃ ॥৵০।

পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

চণ্ডীমঙ্গল ও দেবীমাহাত্ম্য কাব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত দেবীমাহাত্ম্য কাব্যের মধ্যে দুইচারিখানি বাদে সবই হয় মার্কণ্ডেয়পুরাণ অবলম্বনে রচিত, নয় ব্রতকথাজাতীয় ক্ষুদ্র কাব্য।

কৃষ্ণজীবনের অম্বিকামঙ্গল বা অভয়ামঙ্গল[১] ক্ষুদ্র গ্রন্থ নহে। যে পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে তাহার পত্রসংখ্যা ২৪৬। কবি জাতিতে মোদক ছিলেন। ইনি রাজা রামকৃষ্ণের আশ্রয়ে থাকিয়া কাব্যটি রচনা করেন। কবি বাহারবন্দ পরগনার অন্তর্গত বোজরা (বা বোজড়া) গ্রামে বাস করিতেন। নিম্নোদ্ধৃত ভণিতাগুলি হইতে কবিপরিচয় কিঞ্চিৎ পাওয়া যায়।

বোজরা গ্রামেতে বাস রামকৃষ্ণ রাজা। কবি কৃষ্ণজীবন হয় তার প্রজা॥
ভূপতিকে ভগবতী করহ কুশল। যাহার আশ্রয়ে থাকি রচিল মঙ্গল॥

শ্রীকৃষ্ণজীবন দাস বোজড়া গ্রামত বাস,
পূর্ণ হইল নর্ত্তন কবিতা।

বিদায় হইতে গেল পতির সদন।
অম্বিকামঙ্গল গান শ্রীকৃষ্ণজীবন॥

শ্রীকৃষ্ণজীবন দাস রচিল সরসভাষ
রামকৃষ্ণ রাজার সভাতে।

অভয়ামঙ্গল গান শ্রীকৃষ্ণজীবন নাম
[যাহার] জনম মোদককুলে।

মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল[২] ১৬৬৯ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৪৭-৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। গ্রন্থমধ্যে যে কালজ্ঞাপক পয়ার আছে সেটি এই—

১। র-সা-প-প ২, পৃ ৪১-৪৪, পুঁথিটির অনুলিপিকাল ১৭৩১ শকাব্দ ১২১৬ সাল।

২। শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ কর্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (১৩২৪)।

গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিয়া ভবানী ॥ পৃ ৫ ॥.

এখানে 'কায়' পাঠ না ধরিলে অথবা 'কাল' অর্থে ছয় না ধরিলে সঙ্গতি হয় না।[১]

কবি ছিলেন জাতিতে বৈদ্য। বাসস্থান চাটিগ্রামের অন্তর্গত দেবগ্রাম (বর্ত্তমান আনোয়ারা)। কবির পিতার নাম মধুরাম, দুই ভ্রাতার নাম গোবিন্দ ও ব্রজলাল। কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

চাটিগ্রাম রাজ্যেতে বন্দোম নিজ গ্রাম। বন্দহু জনমভূমি দেবগ্রাম নাম ॥
আদ্য গোত্র আদ্য সেন তেয়জে বিশ্রাম। বসতি জাহ্নবীকূলে রাঢ়া হেন নাম ॥
স্বদেশেতে বংশাবলী ছিল পূর্ব্বাপর। বেদের উদ্ভব বৈদ্য পঞ্চম প্রবর ॥
আদ্য অত্রি অর্জ্জুন ভার্গব বার্হস্পত্য। স্বকীয় বিদ্যাতে পর-উপকারী চিত্ত ॥
তথা হইতে আইলা কেহ রাজসঙ্গী হইয়া। বাড়বাখ্য চাটেশ্বরী রাজ্য উদ্দেশিয়া ॥
সে বংশে প্রপিতামহ রায় জয়দেব। তান পুত্র নিধিরাম স্বাগত পারব (?)।
পিতা মোর মধুরাম[২] তাহান সন্ততি। তিন পুত্র লৈয়া কৈল দেয়াঙ্গে বসতি ॥
সেন গোবিন্দ ব্রজলাল মুক্তারাম। সদায়ে ভবানীপদে মানস বিশ্রাম ॥
দয়ারাম দাস ভরদ্বাজকুলমণি। তান জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃসুতা আমার জননী ॥
পৃ ৬-৭ ॥

সারদামঙ্গলে মধ্যে মধ্যে "হরিলাল" ভণিতা আছে। এটি কবির নামান্তর বলিয়া মনে হয়, অন্ততঃ নিম্নোদ্ধৃত ভণিতাটি এই অনুমান সমর্থন করে।

কালীপদ নখচন্দ্রযুগল সদায়ে।
হরিলাল মুক্তারাম নাম রাখ মায়ে ॥ পৃ ৬০ ॥

শ্যামা-অঙ্গে শোভে ফাগু রকত মিশালে।
তছু পদধূলি মাগে সেন হরিলালে ॥[৩]

ব্রজলাল রচিত চণ্ডীমঙ্গলের পুঁথির কতিপয় পত্র পাওয়া গিয়াছে। ইনিই কি কবির মধ্যম ভ্রাতা? ইহার সম্বন্ধে পরে আলোচনা করিতেছি।

১। ঐ ভূমিকা, পৃ ॥/ দ্রষ্টব্য। ২। পাঠান্তর 'নন্দরাম।' ৩। বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ১১৩।

মুক্তারামের কাব্যটি নিতান্ত ছোট। ইহাতে কালকেতুর কাহিনী ধনপতির কাহিনী অপেক্ষা অনেক সংক্ষিপ্তরূপে বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যটির সংক্ষিপ্ত সূচী এই—

বন্দনাদি, গ্রন্থানুবাদ, আত্মপরিচয়। মঙ্গল অসুরের শিবের নিকট বরলাভ করিয়া ইন্দ্রত্ব প্রাপ্তি, দেবীকর্ত্তৃক মঙ্গল অসুরকে নিহত করিয়া মঙ্গলচণ্ডী খ্যাতিলাভ, অহল্যাহরণের ফলে ইন্দ্রের শাপ, দেবীকে পূজিয়া ও পঞ্চ কন্যা দান করিয়া ইন্দ্রের শাপমোচন, কংসনদীর তীরে বিশ্বকর্ম্মাকে দিয়া মন্দির নির্ম্মাণ করাইয়া দেবী কর্ত্তৃক কলিঙ্গরাজকে স্বপ্ন দেওয়া, রাজার দেবীপূজা। নীলাম্বরের শাপপ্রাপ্তি, কালকেতুর জন্ম, ফুল্লরার সহিত বিবাহ, গোধিকারূপে দেবীর ছলনা ও অনুগ্রহ, কালকেতু কর্ত্তৃক গুজরাট নগর স্থাপন, কলিঙ্গরাজ কর্ত্ত‍ৃক কালকেতুকে কারাগারে নিক্ষেপ, দেবীকর্ত্ত‍ৃক কালকেতুকে উদ্ধার। ধনপতি ও খুলনার জন্ম, বিবাহ, ধনপতির গৌড়ে গমন, খুলনার ছাগলচরানো ও দেবীপূজা, ধনপতি ও খুলনার মিলন, খুলনার সতীত্ব পরীক্ষা, ধনপতির বাণিজ্যযাত্রা, কালিদহে কমলেকামিনী দর্শন, মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হইয়া ধনপতির কারাবাস, শ্রীমন্তের পিতার অন্বেষণে যাত্রা, দেবীর কৃপায় পিতাপুত্রের উদ্ধার, রাজকন্যার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ, পুত্র ও পুত্রবধূ লইয়া ধনপতির দেশে প্রত্যাবর্ত্তন, কালী নামক রাজকন্যার সহিত শ্রীমন্তের বিবাহ, খুলনা-কর্ত্ত‍ৃক দেবীপূজা। ফলশ্রুতি।

কবির ভণিতা এইরূপ—

গৌরীপদনখচন্দ্রসুধা-অভিলাষে।
চকোর হইতে সেন মুক্তারামে ভাষে॥

অথবা

দেবীর চরণসিন্ধু তাহে নখ যেন ইন্দু উপজিয়া গগনে উঠিছে।
মুক্তারাম দুইটি আঁখি চকোর চকোরা পাখী সেই সুধা লাগিয়া ভুলিছে॥

সারদামঙ্গলের ভাষা সরল, বিন্দুমাত্র পাণ্ডিত্য ফলাইবার চেষ্টা নাই। কবির রচনার নমুনা হিসাবে ধনপতির বাণিজ্যযাত্রারম্ভ বর্ণনাটুকু উদ্ধৃত করা গেল।

তদন্তরে দৈবজ্ঞ বোলাএ সদাগর। যাত্রা করি চলে সাধু স্মরিয়া শঙ্কর॥

দক্ষিণ থাকিয়া সর্প বামদিগে স্থিতি। যোগিনী মাগয়ে ভিক্ষা দেখয়ে কুরীতি ॥
তৈলের পসার দেখে দক্ষিণেত শিবা। এত অমঙ্গলে কিবা না টলয়ে জীবা ॥
শঙ্কর স্মরিয়া সাধু ডিঙ্গাতে চড়িল। পালঙ্কি বিছানি করি রৈঘরে বসিল ॥
একে একে মেলিলেক সপ্ত মধুকর। ভ্রমরা বাহিয়া নদী বাহিল বিস্তর ॥
যত যত বাঁক বাহে কত দিব লেখা। ত্রিপিনীর ঘাটে গিয়া সাধু দিল দেখা ॥
গঙ্গার জলে শিব পূজে ভাবে হইয়া লোল। উদ্দেশে জাহ্নবী স্মরি মুক্তারাম বোলে ॥
পৃ ৪৫-৪৭ ॥

ব্রজলাল রচিত চণ্ডীমঙ্গল ছড়ার একটি খণ্ডিত পুঁথি চাটিগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।[১] কাব্যটি মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত দুর্গাসপ্তশতী অবলম্বনে রচিত। কবি কি মুক্তারাম সেনের ভ্রাতা ব্রজলাল ?

ভণিতা এইরূপ—

এইমতে মার্কণ্ডপুরাণ অভিমত। একাদশ মাহাত্ম্য স্তবন দেব যত ॥
চণ্ডিকাচরণ-অব্জমধুপমানসে। চণ্ডীমঙ্গল ছড়া[২] ব্রজলালে ভাষে ॥

এই মতে মার্কণ্ড [পুরাণ] অনুমত দ্বাদশ মাহাত্ম্য হৈল পূর্ণ চণ্ডীব্রত[৩] ॥
চণ্ডিকাচরণ-অব্জমধুপমানসে। চণ্ডীমঙ্গল ছড়া ব্রজলালে ভাষে ॥

ভবানীশঙ্কর দাসের মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকা[৪] কাব্যের বিষয়বস্তু মুক্তারাম সেনের সারদামঙ্গল কাব্যের অনুরূপ। তবে কাহিনীগুলি আরও বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে। মুক্তারামের মত ভবানীশঙ্করও চাটিগ্রামের লোক। কবির বাসস্থান ছিল চক্রশালা (বর্ত্তমান পটীয়া)। ইনি জাতিতে কায়স্থ ছিলেন। কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

মোর আদি পুরুষ জন্মিল রাঢ়াগ্রাম। আত্রেয় গোত্র কুলে জন্ম নরদাস নাম ॥
মহাভাগ্যবন্ত কায়স্থ ছিলেন নরদাস। রাঢ়া ভৌমে বদিখি[৫] (?) প্রদেশেতে নিবাস ॥
নিত্য নিত্য অর্চ্চিলেক জাহ্নবীর পায়ে তান বরে সিদ্ধিশিলা পাইল তথায়ে ॥
শিলার প্রসাদে সেই হৈল মহাধনী। দানধর্ম্ম করি সুখে বঞ্চিল অবনী ॥

১। বা প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১০০-০১। ২। সর্ব্বত্র পাঠ 'ছলা।' ৩। ঐ 'মত।'
৪। কবির স্বহস্তলিখিত পুঁথি অবলম্বনে শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র দত্ত কর্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (১৩২৩)। ৫। পাঠান্তর 'বাঁকি' [বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ৬১]।

তান বংশে জন্মিলেক কৃষ্ণহৃদানন্দ। পূর্ব্বদিকে ব্রজ কৈল হইয়া আনন্দ ॥
নিরন্নের নিয়ম যে না যায় খণ্ডন। চাটিগ্রামে আসিলেক ত্যাগি সেই স্থান ॥
চাটিগ্রাম রাজ্যে এক দেবগ্রাম স্থানে। তথা গিয়া নিজ পুরী কৈলানন্দমনে।
কৃষ্ণানন্দের সন্তান জন্মিল বিষ্ণুদাস। মহানন্দে সেই সাধু করিল নিবাস ॥
তান পুত্র নারায়ণ বঞ্চে নানা রঙ্গে। কুলপুরোহিত রামচন্দ্র লৈয়া সঙ্গে ॥
তান পুত্র জন্মিলেক শ্রীমধুসূদন। মোর পিতৃপিতামহ সেই মহাজন ॥
নিজ কুলধর্ম্মে রত আছিল বিশেষ। দৈবহেতু কিন্তু তথা পাইলেন্ত ক্লেশ ॥
গতি করিলেন সেই স্থান ত্যাগ করি নিবাস করিলেন স্থখে চক্রশালা পুরী ॥
তান মুখ্য পুত্র জন্মে নাম শ্রীয়মন্ত। মহাস্থখে বঞ্চিলেক সেই ভাগ্যবন্ত ॥
শ্রীযুত নয়ন রায়[১] তাহান তনয়ে। আহ্মার জনক জান সেই মহাশয়ে ॥
কুলধর্ম্মে রত পূত ছিল অনুক্ষণ। শঙ্কর আহ্মার নাম তাহান নন্দন ॥
নিজ পরিচয় দিয়া সভাকার তরে। দেবীর প্রস্তাব গায়ে ভবানীশঙ্করে ॥

পৃ ১১-১২

কাব্যটির ১৭০১ শকাব্দ অর্থাৎ ১৭৭৯-৮০ খ্রীষ্টাব্দ।

ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে।
ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে ॥ পৃ ৩, ১৮১ ॥

কবি শিক্ষিত ছিলেন, তাহা তৎসম শব্দের প্রচুর প্রয়োগ হইতেই বুঝা যায়। তবে ভক্তির প্রাচুর্য্য থাকিলেও কবির রসবোধ কিঞ্চিৎ কম ছিল। ইনি পশ্য, দদস্ব, শৃণুধ্বং ইত্যাদি সংস্কৃত ক্রিয়াপদ যথেষ্ট ব্যবহার করিয়াছেন, এবং তদ্‌ভব শব্দের সহিত তৎসম শব্দের সন্ধি করিয়াছেন। তৎসম শব্দের বিসদৃশ প্রয়োগও স্থপ্রচুর। কিছু কিছু উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে।

যা হোন্তে হইলোৎপত্তি (= হইল + উৎপত্তি) ভবাচ্যুতধাতা ॥ পৃ ১ ॥
শৃণুধ্বং সাধব সব কর অবধান। ঐ ॥
বন্দমাম্বিকারাঙ্ঘ্রিতে (= বন্দম্ + অম্বিকার + অঙ্ঘ্রিতে)
লোটাই বিশেষ ॥ পৃ ২ ॥
দেখি আইস বাচ (= বাক্) যদি না যাও প্রতীত ॥ পৃ ১৮ ॥

১। পাঠান্তর 'নয়নরাম।'

সংক্ষেপেতে বর্ণিবামি (=বর্ণিব+আমি) সে সব বৃত্তান্ত ॥ পৃ ২২ ॥
ক্রমাশ্রমে বৈসে বীর রুদিতে রুদিতে ॥ পৃ ৪১ ।
ধন রাখি আশু মূল্য দদস্ব আহ্মারে ॥ পৃ ৫১ ॥ ইত্যাদি।

কবির তৎসমশব্দপ্রিয়তা ও পণ্ডিতম্মন্যতা অনেক সময় হেঁয়ালির সৃষ্টি করিয়াছে। যেমন, দেবীর বাক্যে ফুল্লরা ভীত হইয়া চিন্তা করিল,

বিধাতায় উপস্থিত কৈল শত্রু গুরু। জীবনের কার্য্য নাহি মৃত্যু দেখি চারু ॥
রামমন্ত্রিসুতা পতিরাগ্রজ-অনুজা। তাহান নন্দনাত্মজ হয়ে যেই রাজা ॥
তাহান রিপুর কণ্ঠে স্থিতি যাহা হয়ে। তাহা ভক্ষি প্রাণী আহ্মি তেজিব নিশ্চয়ে ॥
পৃ ৪৭ ॥

ভবানীশঙ্করের রচনার আরও কিছু পরিচয় নিম্নে দেওয়া গেল। দেবীর নিকট ফুল্লরা আত্মদুঃখ নিবেদন করিতেছে,

মেষ রাশি মধ্যে ভাস্করোদয় হয়ে যবে। যত ক্লেশ ক্রমে আহ্মি বঞ্চি এই ভবে ॥
আতপপ্রতাপ হয়ে ধনঞ্জয় সমা। হেন সমে[১] মাংস লৈয়া ভ্রমি আহ্মি বামা ॥
দিবাকর বৃষস্থ হয়েন যেই মাসে। আহ্মার বিপত্তি দেখি শত্রু সর্ব্বে হাসে ॥
বিপিনেতে যায়ে প্রভু কার্ম্মুকাস্ত্র লৈয়া। ক্ষৌণীতে লোটাই আহ্মি ক্ষুধাতুর হৈয়া ॥
মিথুনস্থ যেই মাসে হয়ে তিমিরারি। বিপিনেতে যায়ে ধব কার্ম্মুকাস্ত্রধারী ॥
হাহাকার করে প্রাণে ক্ষুধার কারণে। নিরক্ষিয়া থাকি ধব আসিব কতক্ষণে ॥
কর্কটস্থ লোকচক্ষু হয়ে যেই কালে। কোন দিন অনশন কোন সমে[১] মিলে ॥
কাদম্বিনী নিত্য অনিবার বৃষ্টি করে। জীবন পতন হয়ে মন্দিরাভ্যন্তরে ॥
সিংহেতে উদয় যখন হয়ে প্রভাকর। সেই মাসে যে দিবসে মেঘে করে ঝড় ॥
গৃহে বন পতন হয়ে ধারারূপ হৈয়া। দুইজন বঞ্চি মানদল মুণ্ডে দিয়া ॥
বিকর্ত্তন কন্যাতে যখনে করে গতি। সেই মাসে অর্চ্চে লোকে দেবী ভগবতী ॥
নানা মহোৎসব করে যত ভক্তগণ। মাংসবোঝা লৈয়া আহ্মি করিয়ে ভ্রমণ ॥
পৃ ৪৫-৪৬ ॥

১। অর্থাৎ সময়ে।

ভাঁড়ুদত্তের হাট করা—

পত্নীবাক্যে ভাঁড়ুদত্ত চলিল ত্বরিতে। কত বট ভগ্ন কপর্দ্দক লৈয়া সাথে॥
পুত্র সঙ্গে যায়ে ভাঁড়ু ত্বরিতগমন। দোকানী সভার স্থানে মিলে ততক্ষণ॥
ভাঁড়ু বোলে দোকানী আহ্মারে দেহ অন্ন। কপর্দ্দক কালুকা আসিয়া দিব তূর্ণ॥
পসারীয়ে বোলে তোর বাক্য নহে সত্য। মিথ্যাবাদীর বচন মানসে নহে সত্য॥
চক্ষু প্রকাশিয়া ভাঁড়ু কাম্পে থরথর। তোহ্মা থাকি অবশ্য লইব আহ্মি কর॥
অকস্মাৎ গেল আহ্মি বীরের সদন। বীরে মোরে ছাড়ি দিল নিজার্দ্ধ আসন॥
বোলে তুহ্মি কুলবন্ত আহ্মার রাজ্যতে। তোহ্মারে রাখিব প্রজা থাকি কর লৈতে॥
ভাঁড়ুবাক্যে পসারী মানসে পাইল ভীত। ত্বরাযুক্তে মাপি চাউল দিলেক ত্বরিত॥

পৃ ৫৪-৫৫॥

খুল্লনার সহিত স্বামীর বিবাহপ্রস্তাব শুনিয়া লহনার বিলাপ—

ক্রন্দন করয়ে রামা শিরে হানি ঘাত। কেহ্নে মোর মুণ্ডে প্রভু বজ্র কৈলে পাত॥
সহিতে নারিব সপত্নীর ধনঞ্জয়ে। অবিরত দগ্ধ মোরে করিব নিশ্চয়ে॥
সেই বহ্নি ধ্বংসিবারে নাহি পারে বনে। হেন বৈশ্বানর প্রভু আনি কি কারণে॥
সতানলে দগ্ধ হইয়া মৃত্যু নহে চারু। অকস্মাৎ মৃত্যু হৈলে এই ভয় গুরু॥
শুন প্রাণনাথ থলু দৃঢ় কৈলু মনে। অকস্মাৎ মৃত্যু আজি চিন্তিব অখনে॥
মার্জ্জার ভক্ষকে থরেরাম্বার (?) যে পতি। তাহান কণ্ঠেরোপরে যাহা হয়ে স্থিতি॥
তাহা ভিক্ষা করিয়া লইব করযোড়ে। গণ্ডূষ করিয়া প্রাণ ত্যজিব সত্বরে॥
এইরূপে লহনা করয়ে ক্রন্দন। শঙ্করে বোলয়ে ভাবি ভবানীর চরণ॥

পৃ ৬৯॥

মঙ্গলচণ্ডীপাঞ্চালিকার মধ্যে অনেকগুলি ভক্তিমূলক পদ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এগুলিকে কবি "ঘোষা" বলিয়াছেন। ইহার মধ্যে অনেকগুলি পদ রাধাকৃষ্ণ-লীলাবিষয়ক। নিম্নে একটি উদ্ধৃত করা হইল। কবিত্ব হিসাবে পদটি নিন্দনীয় নহে। বস্তুতঃপক্ষে এই পদগুলি দিয়াই ভবানীশঙ্করের কবিত্বশক্তির যথার্থ মূল্য অবধারণ করা যাইতে পারে।

বোল হে বড়াই, কে চলিছে যমুনার কূলে।
কাহার সুন্দরী নারী গোপীগণ সঙ্গে করি
চলিয়াছে মন কুতূহলে ॥
বক্তে নিন্দিয়াছে ইন্দু, কপালে সিন্দূর বিন্দু,
কটিমাঝে পূর্ণকুম্ভ সাজে।
হেরিতে ও রূপখানি হরি নিলা মোর প্রাণী,
জিজ্ঞাসা না কৈলুম মুই লাজে ॥
বড়াই বোলে, শুন কহি, বৃকভানুর সুতা এই
কুম্ভ ভরিবারে চলি যায়ে।
শুনহ নাগর কানু, রাধা বলি পূর বেণু,
বাঁশী রবে আসিব এথায়ে ॥
বড়াইর সন্ধান পাইয়া অধরে মুরলী দিয়া
রাঙ্গা রাধা বোলে শ্যামরায়ে।
শুনিয়া বাঁশীর ধ্বনি আসিলেক বিনোদিনী,
ভবানীশঙ্কর দাসে গায়ে ॥ পৃ ৬৮ ॥

শিবচরণ সেনের গৌরীমঙ্গল কাব্য মার্কণ্ডেয়পুরাণান্তর্গত চণ্ডীকাহিনী অবলম্বনে রচিত।[১] তবে ইহাতে কালকেতু উপাখ্যানটিও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। কবি এইরূপ গ্রন্থানুবাদ দিয়াছেন—

নিরাকার সাকার শকতি দুইজন। শুনাইব সেই কথা শিবের বচন ॥
অপরূপ যে কথা সে কথা শুন সবে। কালীকুঞ্জে যুদ্ধ শিবচরণে তা কবে ॥
ত্রিজগৎজননী জননী দেখিবারে। যা কহিল শিবেরে মাতা তা কব বিস্তারে ॥
ভগবতী কহিলেন, যাইব পিতার ভবন। ভয়ে দক্ষযজ্ঞকথা কহিলা ত্রিলোচন ॥
শিবে ভয় দিয়ে তায় অনুমতি লইলা। দশ মহাবিদ্যারূপ এমতে হইলা ॥
শারদা-উৎসব কথা আছে এই গানে। শুনিয়া আনন্দ কথা ভকতিবিধানে ॥
মহিষাসুরজন্মস্তব যতেক কথন। বিস্তারিয়া কব কথা করিবা শ্রবণ ॥

১। বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ৬১-৬২।

নিরাকার শক্তি দশভুজা হইলা যাথে। দেবস্তবে তেজোময় আকার পশ্চাতে ॥
যে কথায় নরে হবে জ্ঞানের উদয়। কহিব এমন কথা কথা সুধাময় ॥
কায়ভেদ অভেদশকতি হরিহরে। ভেদ-অঙ্কুর ভস্ম হয় শুনিলে অন্তরে ॥
দশমীর কথা যত মহাভক্তিময়। করুণাকোমল কথা বিদরে হৃদয় ॥
নিশুম্ভ শুম্ভের কথা কব সুযতন। কালীরূপ দেখিবার কহিলা বহুজন ॥
শক্তিমত কালীপদ কথা কহিয়াছি। শ্রীনিবাসে কথা তার মুক্তি পাইয়াছি ॥
শিবিরাজ উপাখ্যান কথা সত্যমত। নাহিক এমন ঘোর ধর্ম্মপথে রত ॥
কালকেতু দুঃখ কথা আছে সবিস্তার। ধন দিয়া দয়াময়ী করিলা নিস্তার ॥
শিবচরণে কয় শুন সর্ব্বজনে। কত মত ভক্তিকথা আছে এই গানে ॥

হরিশ্চন্দ্র বসুর চণ্ডীবিজয় বা দেবীমঙ্গল[১] ১৬৫২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৩০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। ইহাও মার্কণ্ডেয়পুরাণের দুর্গাসপ্তশতী অবলম্বনে রচিত। রঙ্গপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত কালিয়া গ্রামে কবির বাস ছিল। কবি বঙ্গজ কায়স্থ ছিলেন। কাব্য হইতে এই কবিপরিচয় পাওয়া যায়—

চন্দ্রদ্বীপ স্থানে মুখ্য কায়স্থসমাজ। বসু বংশে প্রতাপ-আদিত্য মহারাজ ॥
সেই চন্দ্রদ্বীপ সর্ব্বজগৎ প্রকাশ। তথাতে আছিল পূর্ব্বপুরুষনিবাস ॥
দৈবযোগে পিতামহ বাস বঙ্গে আসি। যোগ সন্ধ্যা সাধি হইলা স্বর্গবাসী ॥
সেই বসু বংশেতে আমার উপাদান। ... ...
হরিশ্চন্দ্র বলে মম তোমাতে মিনতি। জীবনমরণে দেবীর পদেত ভকতি ॥

বোধ হয় কবির গুরুর স্থান ছিল মিতোড়া।

মিতোড়া কৈলাসপুরী যথা প্রভু অবতরি
নিজলীলা করিল প্রকাশ।

গ্রন্থশেষে আছে—

কালিয়াতে বসতি ছিল অতি সুখানন্দ। তাহাতে বঞ্চিত হৈল দেবের নির্ব্বন্ধ ॥
সর্ব্বগুণে স্থান যায় তিন নদী (?) তীর। স্মরিতে স্থানের গুণ দগধে শরীর ॥
বিধাতা রক্ষিত কার্য্য না যায় খণ্ডন। তথা হৈতে কিঞ্চিৎ উত্তরে আগমন ॥

১। র-সা-প-প ৩, পৃ ৬৪-৬৬। ব-সা-প পুঁথি ১৭৭৮।

বৃৎদন্ত (?) রায় সপ্ত লোকের সংহতি। গঙ্গাদিয়া গ্রামেতে হৈল অবস্থিতি ॥
রাজধানী আসল কালিয়া নামে পুর। যার নামসৌরভে ব্যাপিত অতি দূর ॥
চিরকাল শাসিত তাহাতে এক পুরী। রাজকার্য্য অনুরোধে তথা বাস করি ॥
সেই সালে হৈল দেবীর মঙ্গলরচনা। পদবন্ধ দৃষ্টি করিবে বিবেচনা ॥
সপ্তশতী গ্রন্থ দেব ব্যাসের ভাষিত। কিঞ্চিৎ আভাষে ইএ রহে প্রকাশিত ॥

... ...

পক্ষ ভূত[১] ঋতু চন্দ্র শকের বিশেষে। বৈশাখের চতুর্বিংশতি দিবসে ॥
সিত বর্ইতর পক্ষ তিথি সপ্তমীতে। ভূমিসুত দিনত তপন অক্ষ মিতে ॥
মস্তকে বন্দিয়া গুরুর চরণযুগল। রচিল পুস্তক নামে দেবীমঙ্গল ॥

প্রত্যেক পরিচ্ছেদের শীর্ষে একটি করিয়া গান আছে। কবি ইহাকে "মাসী" বলিয়াছেন।

"দ্বিজ" কালিদাসের কালিকাবিলাস বা কালীবিলাসের[২] সহিত হরিশ্চন্দ্রের দেবীমঙ্গলের কিছু কিছু মিল আছে। কালিদাসের কাব্যে কতকগুলি গান আছে, এগুলি ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে প্রচলিত গানের অনুরূপ। কবি সম্ভবতঃ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনিও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীপুরাণকাহিনী অবলম্বনে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

কবির ভণিতা এইরূপ—

কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
রচিলা শ্রীকালিদাস কালিকাবিলাস ॥

গোপকুলোদ্ভব হরিনারায়ণ দাসের চণ্ডিকামঙ্গলও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীপুরাণকাহিনী অবলম্বনে বিরচিত।[৩] কবি সুরথকে কিরীটকোণার রাজা বলিয়াছেন।

কিরীটকোণার রাজা সুরথ নাম ধরে।
সুখে রাজ্য করে রাজা আপন নগরে ॥

১। 'পক্ষ' স্থলে 'পঞ্চ' মূল পাঠ হইলে গ্রন্থরচনা কাল ১৬৫৫ শকাব্দ হইবে। ২। র-সা-প-প ৫, পৃ ২৬, ব-সা প-প ৪, পৃ ৩০৬, বটতলা হইতে একাধিক সংস্করণ বাহির হইয়াছে।
৩। ব-সা-প পুঁথি ৮০৪।

কবিপরিচয় এইটুকুমাত্র পাওয়া যায়—

হরিনারায়ণ নাম, নিবাস বনস্থগ্রাম, গোপবর্ণ কুলে উপাদান।
গিরিস্থতাপদে গতি নিশিদিশি করি মতি বিরচিল চণ্ডীর আখ্যান॥

রামশঙ্কর দেবের অভয়ামঙ্গল[১] বৃহৎ গ্রন্থ। কবি দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থ ছিলেন, বাসস্থান নদীয়া জেলার অন্তর্গত ধর্ম্মদা। কবির পিতার নাম রামকৃষ্ণ দেব। কাব্য হইতে এইটুকু কবিপরিচয় পাওয়া যায়—

মামদানিপুর কোট চাকলে হুগুলী। পরগনে ফজুল্লাপুর তরফ'পাটুলি॥
শূদ্রমুনি মহারাজা বিদিত সংসারে। ধর্ম্মদ নিবাস করি তার অধিকারে॥
শ্রীকরণে উৎপত্তি দক্ষিণরাঢ়ী শ্রেণী। মৌদ্গল্য প্রবর পঞ্চদেব কর্ণসেনি॥
শ্রীহরিবদন-স্থত তাতের[২] মহাশয়। রামকৃষ্ণ রাধাকৃষ্ণ তাহার তনয়॥
রামকৃষ্ণ দেব-স্থত শ্রীরামশঙ্কর। শ্রীগুরু আদেশে গান ভাবি লম্বোদর॥

কবি স্বীয় গুরু নদীয়ানিবাসী কবিবর পরমদেবের (নাম ?) আদেশে অভয়া-মঙ্গল রচিত করেন।

কবিবর পরমদেব নদীয়ানিবাসী।
অভয়ামঙ্গল গীতে হৈলা অভিলাষী॥

গৌতমপুত্র শতানন্দপ্রোক্ত আগমশাস্ত্র ও মার্কণ্ডেয়পুরাণ অবলম্বনে কাব্যটি রচিত হয়, এই কথা কবি বলিয়াছেন।

সতানন্দ গৌতমস্থতে বিচারি আগম গীতে
শ্লোকচ্ছন্দে করিলে বাখান।
পরমদেব-আদেশা শঙ্কর রচিল ভাষা,
নাচাড়ীপ্রবন্ধে কৈল গান॥

অন্যত্র

আগমে ইহার মূল, মার্কণ্ডপুরাণে স্থূল,
ভারতী রচিলা শ্লোকছন্দে।

কাব্যটিতে স্বষ্টিতত্ত্ব, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের উৎপত্তি, ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবের তপস্যা শিবমাহাত্ম্য, দক্ষযজ্ঞ, হিমালয়ে গৌরীর জন্ম, হরগৌরীর বিবাহ, একাম্রকাননে

১। বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ৬৭-৬৮. ২। 'শ্রীহরিবদন দেব তাত মহাশয়' হইবে ?

শিবের তপস্যা, ধূম্রলোচন শুম্ভ নিশুম্ভ প্রভৃতি অসুর বধ, হরিহর সংবাদ, উৎকল-মাহাত্ম্য, নীলমাধব ও ইন্দ্রদ্যুম্ন কথা, মহিষাসুর বধ, মহিষাসুরের দেবীর বাহনত্ব-প্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয় বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

রামনারায়ণের দেবীমাহাত্ম্য কাব্যের একটি পালার পুঁথির শুধু দুইখানি পাতা পাওয়া গিয়াছে।[১] প্রাপ্ত অংশের ভণিতা এই—

রায় শঙ্করের পদ ভাবি মনে মনে।
হরগৌরীর কন্দল রামনারায়ণে ভণে॥

তিলকচন্দ্রের কাব্যের শুধু হরগৌরীর বিবাহের পালার একটু অংশ পাওয়া গিয়াছে।[২] কবি জাতিতে গন্ধবণিক ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

এই নিবেদন মোর সভার সাক্ষাতে।
গন্ধবণিকের জন্ম হইল হেন মতে॥
ভাবি ইষ্টদেবের শ্রীপাদপদ্মদ্বন্দ্ব।
পুরাণের সূত্র পেয়ে লেখে তিলকচন্দ্র॥

পরাণবল্লভের কালিকাপুরাণের একটি নিতান্ত অসম্পূর্ণ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৩]

বনদুর্ল্লভ বিরচিত দুর্গাবিজয়[৪] মার্কণ্ডেয়পুরাণ অবলম্বনে রচিত। পুঁথি চাটিগ্রাম অঞ্চলের। শেষাংশ এইরূপ—

দেব ঋষি মুনিগণ কীটপতঙ্গ। এড়াইতে পারে কেবা বিধাতানির্ব্বন্ধ॥
শিবের রাশিতে শনি একদিন ভোগ। এই মতে নবগ্রহ জান মহারোগ॥
দুঃখ সুখ না চিন্তিহ স্থির কর মতি। দুর্গার চরণ পরে আর নাহি গতি॥
বনদুর্ল্লভে ভাবে দুর্গার চরণে। রক্ষা কর মহামায়া জগৎভুবনে॥

জগন্নাথ রচিত দুর্গাপুরাণও মার্কণ্ডেয়পুরাণের কাহিনী অবলম্বনে বিরচিত।[৫]

১। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ১৫৮৯, লিপিকাল ১০৭৯ মল্লাব্দ। ২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ১৭৩০। কবি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগের লোক হইতেও পারেন।
৩। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ১৯৩৪।
৪। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ২১০-১১, সাহিত্য ১৩০০, পৃ ৫৮৩-৮৮। ৫। আরতি ১৩০৮।

দীনদয়াল বিরচিত দুর্গাভক্তিচিন্তামণির যে পুঁথি চাটিগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে তাহা আদ্যন্ত খণ্ডিত।[১] এইটুকু জানা যায় যে কবির পিতার নাম রূপনারায়ণ, মাতার নাম তারিণী। কবি মহাভাগবত অর্থাৎ দেবীভাগবত অনুসারে কাব্যটি রচনা করিয়াছিলেন।

মহাভাগবত পুণ্য পবিত্র নির্ম্মল। শ্রবণে অধিক সুখ চরিত্র মঙ্গল ॥
পিতা রূপনারায়ণ মা যার তারিণী। বিরচে দয়াল দুর্গাভক্তিতরঙ্গিণী ॥

মহাভাগবতসার তত্ত্বকথা সুবিস্তার পরমপবিত্র সুধাশ্রেণী।
শ্রীনাথচরণ আশে দয়াল সরসভাষে গায় দুর্গাভক্তিচিন্তামণি ॥

দয়াল শ্রীনাথপদ মনে করি আশা।
দুর্গাভক্তিচিন্তামণি বিরচিল ভাষা ॥

শ্রীদীনদয়াল গায়, মতি রহুক তুয়া পায়, সদয় হইবে শূলপাণি।
দুর্গতিনাশের হেতু প্রচার করহে সেতু রচি দুর্গাভক্তিচিন্তামণি ॥

"দ্বিজ" দুর্গারাম রচিত কালিকাপুরাণের খণ্ডিত পুঁথি ফরিদপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।[২] ভণিতা এইরূপ—

কালিকাপুরাণ কথা করিল প্রচার।
দ্বিজ দুর্গারামে কহে রচিয়া পয়ার ॥

বিক্রমপুরের অন্তর্গত জপসা নিবাসী বৈদ্যবংশীয় লালা জয়নারায়ণ রায় চণ্ডিকা-মঙ্গল এবং হরিলীলা এই দুইখানি কাব্য রচনা করেন। চণ্ডিকামঙ্গলে রচনা-কালের উল্লেখ নাই, হরিলীলা ১৬৯৪ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭৭২-৭৩ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রামগতি রায় তাঁহার রচিত যোগশাস্ত্রবিষয়ক মায়াতিমিরচন্দ্রিকা[৩] গ্রন্থে এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

ব্রহ্মপুত্র মহাতীর্থ পূর্ব্বেতে প্রচার। পশ্চিমেতে পদ্মাবতী বিদিত সংসার ॥
মধ্যেতে বিক্রমপুর রাজ্য মনোহর। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তাহে সদ্জ্ঞানী বিস্তর ॥
বিশিষ্ট অম্বষ্ঠশ্রেণীর বসতির স্থান। জপসা নামেতে গ্রাম তথায় প্রধান ॥

১। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ২১৩-১৪। ২। ব-সা-প-প ৫, পৃ ১৯৭। ৩। মুদ্রিত হইয়াছিল, কিন্তু প্রকাশিত হয় নাই বলিয়া মনে হয়। ব-সা-প-প ৭, পৃ ১৫২-১৬২ দ্রষ্টব্য।

শ্রীরামপ্রসাদ রায় বিখ্যাত তাহাতে। বৈদ্যশ্রেষ্ঠ লালা খ্যাতি যাঁর নিজামতে ॥
জপসা উত্তম গ্রাম বসতি আলয়। রামগতি নামে তাঁর প্রধান তনয় ॥

জয়নারায়ণের মাতার নাম সুমতি, ইহা তিনি হরিলীলা কাব্যের এক ভণিতায় উল্লেখ করিয়াছেন।

সুমতিসুতের বাক্য শুন হে পুণ্ডরীকাক্ষ,
লক্ষ্য নাই তুমি পরে ভবে ॥

রামগতি জ্যেষ্ঠ, তাহার পর রাজনারায়ণ, তাহার পর কবি এবং সর্ব্বকনিষ্ঠ কীর্ত্তিনারায়ণ। মায়াতিমিরচন্দ্রিকা ব্যতিরেকে রামগতি যোগকল্পলতিকা নামে একটি সংস্কৃত গ্রন্থ সঙ্কলন করেন। রাজনারায়ণ কালীকল্পলতিকা ও পার্ব্বতী-পরিণয় নামে দুইখানি সংস্কৃত গ্রন্থ রচনা করেন। জয়নারায়ণের হরিলীলা অবলম্বনে কীর্ত্তিনারায়ণ সংক্ষেপে একটি সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচনা করেন।

কবি নারায়ণের অনুজ নারায়ণ।
সংক্ষেপে রচিল পুঁথি ক্রিয়ার কারণ ॥

চণ্ডিকামঙ্গলের মধ্যে একস্থলে জয়নারায়ণ বলিয়াছেন,

নারায়ণ অগ্রজের নূতন রচন। মন দিয়া তাহা যে যে করহ শ্রবণ ॥
লিখিয়াছে পুঁথি ভবকলহভঞ্জিকা। বোধ হেতু শুন মায়াতিমিরচন্দ্রিকা ॥
অনুজ তাহার দিব্য সুকাব্য রচিছে। পার্ব্বতীর পরিণয় নাম রাখিয়াছে ॥
মহাভক্তিসার গ্রন্থ করেছে রচনা। সে রহস্য শুনিলে ভুলিবে সুলোচনা ॥

রামগতি কি ভবকলহভঞ্জিকা নামে আরও একখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন ?

চণ্ডিকামঙ্গলের বিষয়বস্তু কবিকঙ্কণ ইত্যাদির চণ্ডীমঙ্গলের অনুরূপ, উপরন্তু ইহাতে মাধব-সুলোচনার উপাখ্যান সংযোজিত হইয়াছে। কবি বলিয়াছেন যে এই তৃতীয় উপাখ্যানটি গঙ্গা ও দয়াময়ীর অনুরোধেই সংযোজিত হইল।

গৌড়রাজ্য পূর্ব্বভাগ বিক্রমপুরেতে। রচিলাম এই গ্রন্থ ধর্ম্মপ্রসঙ্গেতে ॥
গঙ্গা দয়াময়ী অনুরোধে এতদূর। শুনিলে কলুষ খণ্ডে একথা মধুর ॥

গঙ্গা কবির ভাগিনেয়ী এবং দয়াময়ী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রী ছিলেন।

চণ্ডিকামঙ্গল হইতে মদনভস্ম অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

একবার নাহি পারে,	পুনশ্চ সন্ধান করে	স্মর নিজ শরে চুম্ব দিয়া।
ছোয়ায়ে রতির বুকে	ধনুকে পুনশ্চ তাকে	যুড়িলেক সাবধান হৈয়া
নিরখে শঙ্কর পানে	করিয়া জন লোকনে	দেখে যেন রজত অচল॥
তেজ শত সূর্য্যপ্রায়,	শত চন্দ্র সম তায়	রত্নবেদি পরে ঝলমল॥
বিমুদ্রিত ত্রিলোচন	ব্রহ্মেতে অর্পিত মন,	স্পন্দহীন সকল শরীর॥
স্থির বায়ু পরে যেন	শুভ্র জলধর তেন	জলশূন্য না পড়িছে নীর॥
জটাতে মণ্ডিত শির,	ভালে আধ শশধর,	বিভূতিরাজিত সর্ব্বগায়।
গলে নাগরাজমালে,	কালকূট কণ্ঠে জ্বলে,	নিত্যানন্দ ঢড়ঢড় কায়॥
দেখি হেন ত্রিপুরারি	মার বলে মরি মরি,	ব্যস্তভাবে দুই হস্ত কাঁপিল।
হাত হতে ছুটি শর	মহাদেব হৃদিপর	স্পর্শমাত্র ভাঙ্গিয়া পড়িল॥
ছিল মন ব্রহ্মযোগে,	সে মনে মদন জাগে,	প্রভু মনে বিচার করিল।
কেন হেন হল মন,	অকস্মাৎ কি কারণ	পাষাণেতে কর্দ্দম হইল॥
সকলি জানিল ধ্যানে	আপনি আপন জ্ঞানে	দেবচক্রে যা কৈল মদন।
অন্তরে জন্মিল বোধ,	জানিয়া মদনদোষ	মেলিলেক ললাটলোচন॥
কামাগ্নি বিদ্যুৎ হৈল,	হুঙ্কারের পবন বৈল,	পৈল যেয়ে মদনের অঙ্গে।
পরশে পুড়িল তেন	অগ্নিতে আহুতি যেন	দাবানলে যেমন পতঙ্গে॥
দহনে পতঙ্গ হৈল,	হুতাশনে হবি পাইল,	হল বাদ দীপে ঝঞ্ঝাবাতে।
গরুড়-অহিতে রণ,	সিংহ মৃগে হনাহন,	মূষিক যুঝিল করি সাথে॥
নিরখিয়া দেবগণ	ঘন ডাকে, ত্রিলোচন	রক্ষ রক্ষ দয়াল দীনেশ।
যাবৎ এ দেববাণী	শিব কর্ণে হল ধ্বনি	তাবৎ মদন ভস্মশেষ॥

হরিলীলা[১] ১৬৯৪ শকাব্দে বা ১৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। গ্রন্থ শেষে আছে—

অত্রিপুত্র জ্বর নেত্র ষড়াননানন। বসুমতী শাকে পুথি হল সমাপন।
নারায়ণ প্রভুপদে করি দঢ় মন। ষোড়শ চৌরানৈ শাকে পুস্তক লিখন॥

১। দীনেশ চন্দ্র সেন ও শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে প্রকাশিত (১৯২৮)।

হরিলীলা সত্যপীর কাহিনী অবলম্বনে রচিত একটি অলঙ্কৃত কাব্য, ইহা সাধারণ সত্যনারায়ণ পুঁথির মত সংক্ষিপ্ত পাঁচালীমাত্র নহে। ভারতচন্দ্রের মত জয়নারায়ণও ইহাতে পাণ্ডিত্য ও ছন্দোদক্ষতার যথেষ্ট প্রমাণ দিয়াছেন। কিছু উদাহরণ দিতেছি। জলমগ্ন চন্দ্রভান হরির কৃপায় জল হইতে জীবিত উঠিয়াছে।

উদিত হইল চন্দ্রভান জলাকাশে। ঊর্দ্ধ হতে দেখি কুমুদিনী পরকাশে ॥
কি কহিবে ধীর সবে বলিবে অত্যুক্তি। না মানিবে নৈয়ায়িকে না থাকিলে যুক্তি ॥
বিনা দেবাসুরের মন্থনে পরস্পর। সমুদ্রের মধ্য হৈতে উঠে সুধাকর ॥
বিপরীত উপমাতে কে করে বিশ্বাস। জলে চন্দ্র দেখি ঊর্দ্ধে নলিনী-উল্লাস ॥
নব নব সব দ্রব্য জগতে বাখান। কত গুণে জন্মিল নবীন চন্দ্রভান ॥
সে শশাঙ্কে কলঙ্ক এ কলঙ্করহিত। তাথে মৃত পদ্মিনী ইহাতে পুলকিত ॥
তাহাতে তাপিনী বিরহিণী ইথে তুষ্ট। গরল সহ জন্মায় কত হৈল শ্রেষ্ঠ ॥
দেবাসুরে দ্বন্দ্ব তাথে ইথে দ্বন্দ্বহীন। সব গুণ ঢাকা তার হৃদয়ে মলিন ॥
একযোগে দিবাকর নিশাকর দেখি। পদ্মিনী হাসিল ইন্দীবর মেলে আঁখি ॥
ফুটিলেক রবি শশী দেখি একত্তর। নয়নেতে ইন্দীবর বদনে পুষ্কর ॥
পৃ ১২৫-২৬ ॥

হরিলীলার মধ্যে কবির অন্যতমা ভ্রাতুষ্পুত্রী আনন্দময়ীর রচনা অল্প স্বল্প আছে বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। ভুজঙ্গপ্রয়াত ছন্দে রচিত সুনেত্রা ও চন্দ্রভানের বাসি-বিবাহ অংশটি [পৃ ৫৬-৬০] আনন্দময়ীর রচনা হইতে পারে, ইহার ভণিতায় "আনন্দে" পদটি সম্ভবতঃ আনন্দময়ীর নাম দ্যোতিত করিতেছে। ইহা হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

প্রভাতে উঠিয়া আসিয়া বাহিরে। করি নিত্যকর্ম্ম হরিষে অপারে ॥
ধনেশাত্মজানাথ সুপ্রীতচিত্তে। মনে মত্ততা সুন্দরী রত্নবিত্তে ॥
বসিয়া সুবর্ণের পীঠে হাসিছে। প্রবালাধরে মন্দ মন্দ ভাষিছে ॥
পুরী পূরিতা সুন্দরীজালমালে। বলে গো উঠ গো চল গো সকালে ॥
সুনেত্রার বাসিবিবাহ হইবে। বিলম্বে কৌতুক কিমতে দেখিবে ॥
শুনি কামিনীবর্গ ধায় লড়াইয়া। পুন পুন মালা ধরাতে গড়াইয়া ॥

সুমঙ্গল্য দ্রব্য প্রচুরে গণিয়া। রাখে সাবধানে বিধান জানিয়া ॥
সমস্তে মিলিয়া স্ত্রী-আচার রীতে। উলুলু ধ্বনিতে নানা বাদ্যগীতে ॥
....
হেরে চৌদিকে কামিনী লক্ষে লক্ষে। সমক্ষে পরোক্ষে গবাক্ষে কটাক্ষে ॥
কতি প্রৌঢ়রূপা ও রূপে মজন্তি। হসন্তি স্খলন্তি দ্রবন্তি পতন্তি ॥
কত চারুবক্ত্রা সুবেশা সুকেশা। সুনাসা সুহাসা সুবাসা সুভাষা ॥
কত ক্ষীণমধ্যা সুভঙ্গা সুযোগ্যা। রতিজ্ঞা রসজ্ঞা মনোজ্ঞা মদজ্ঞা ॥
দেখি চন্দ্রভানে কত চিত্তহারা। নিকারা বিকারা বিহারা বিভোরা ॥
করে দৌড়াদৌড়ি মদমত্ত প্রৌঢ়া। অনূঢ়া বিমূঢ়া নবোঢ়া নিগূঢ়া ॥
কোন কামিনী কুণ্ডলে গণ্ডঘুষ্টা প্রহৃষ্টা সচেষ্টা কেহ তুষ্টদৃষ্টা ॥
... .
আগো মঙ্গলা মাধবী চন্দ্ররেখা। বরে আর কে কে দিতে পার দেখা।
ডাক কামিনী সুভদ্রা জয়াকে। ও রাজেশ্বরী চিত্ররেখা দয়াকে ॥
তোমরা আর ছুঁইতে যে যে পারে। বরস্নান চেষ্টা কর নির্ব্বিকারে ॥
... ...
ভুজঙ্গপ্রয়াতে এ বাসিবিবাহ। দ্বিতীয় দিনেতে আনন্দে নির্ব্বাহ ॥

"দ্বিজ" জনার্দ্দনের চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালীর[১] মত কতকগুলি মঙ্গলচণ্ডীর ছড়া পাঁওয়া গিয়াছে। এগুলির মধ্যে কতকগুলি উনবিংশ শতাব্দীর রচনা হইতে পারে।

ঘোরমঙ্গলচণ্ডী নামক ক্ষুদ্র পাঁচালী পুঁথিতে কবির নাম পাওয়া যায় নাই। পুঁথির লিপিকাল ১১০৪ সাল (মল্লাব্দ কিনা বলা যায় না)। চাটিগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত জয়মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালীর পুঁথিতেও কবির নাম নাই।[২] "দ্বিজ" রঘুনাথ বিরচিত নিত্যমঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালীর পুঁথি চাটিগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।[৩] ভণিতা এইরূপ—

নিয়তমঙ্গলচণ্ডী বন্দিয়া যে মাথে।
পাঞ্চালী রচিয়া কহে দ্বিজ রঘুনাথে ॥

চাটিগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত তৃতীয় একটি নিত্যমঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে।[৪] পুঁথি খণ্ডিত, সুতরাং কবির নাম বা রচনাকাল জানা যায় নাই।

১। ব-সা-প-প ৮, পৃ ৪৪। ২। বা প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৪৬-৪৭।
৩। ঐ পৃ ১৫। ৪। ঐ ১-২, পৃ ৯৯-১০০।

এই অঞ্চলে প্রাপ্ত আর একটি নিত্যমঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালীর পুঁথিতে "চণ্ডীদাস দেয়[১] শিবনারায়ণ" ভণিতা পাওয়া যায়।[২] পুঁথির লিপিকাল শকাব্দ, খ্রীষ্টাব্দ, সন এবং মঘী সালে দেওয়া আছে, "সন ১৭৩৯ শকাব্দ সন ১২২৪ বাঙ্গালা সন ১৮১৭ ইং[রে]জী সন ১১৭৯ মঘী।" রচয়িতা কি দুইজনেই? ভণিতা—

ব্রতীগণ ভাগ্যবতী কি কৈমু কথন।
চণ্ডীদাস দেয় কহে শিবনারায়ণ॥

মদন দত্ত রচিত মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালীর পুঁথিও চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে,[৩] ইহাতে শুধু ধনপতি-খুল্লনার কাহিনীটি আছে।

"দ্বিজ" কৃষ্ণচন্দ্র বিরচিত মঙ্গলচণ্ডীর গীতেও শুধু ধনপতি-খুল্লনার কাহিনী আছে।[৪] ভণিতা এইরূপ—

মঙ্গলচণ্ডিকাপাএ দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্র কহে, দয়া কর জগৎজননী।
শ্লোক ভাঙ্গি পদবন্ধ রচিলেক থর্ব্বছন্দ, রচে গীত ভাবিয়া ভবানী॥
দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্রে ভণে চণ্ডীর চরণ।
মঙ্গলচণ্ডীর গীত কৈল সমাপন॥

চাটিগ্রাম অঞ্চলে দুইটি চণ্ডীমঙ্গল ঘটিত চৌতিশা পাওয়া যাইতেছে। একটি দেবীদাস সেন রচিত শ্রীমন্তের চৌতিশা,[৫] অপরটি শ্রীচাঁদ দাস রচিত কালকেতুর চৌতিশা।[৬] ভণিতা যথাক্রমে—

ক্ষয় করি রিপু সৈন্য ক্ষওয়াও আপদ।
ক্ষীণ দেবীদাস সেনে মাগে মুক্তিপদ॥

ক্ষেমঙ্করী খড়্গ ধরি ক্ষয় কৈলা যত অরি, ক্ষম দোষ অভয়া পার্ব্বতী।
ক্ষণে ক্ষণে প্রণমিয়া ক্ষিতিতলে লোটাইয়া শ্রীচান্দদাসের কাকুতি॥

দেবীদাস সেন এবং শ্রীচাঁদ দাস সম্পূর্ণ চণ্ডীমঙ্গল বা পালা লিখিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায় না।

১। অর্থাৎ 'দেব' বা 'দে।'
২। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ২৩-২৪।
৩। ঐ, পৃ ৬।
৪। ঐ, পৃ ৫১-৬২; পুঁথির লিপিকাল ১২৩৩ সাল।
৫। ঐ, পৃ ২১।
৬। ঐ ১-২, পৃ ৭।

চাটিগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত চৈত্রমাহাত্ম্য নামক পুঁথিটি একটি ক্ষুদ্র মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী।[১] ইহাতে ধনপতি-খুল্লনার কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। কবির নাম অভিরাম বলিয়া মনে হয়। পাঁচালীর শেষাংশ এইরূপ—

জয় জয় জননী জগৎসনাতনী। নরকে না কর গতি নম নারায়ণী॥
ভবানী ভীতিকা ভূতা হর ভগবতী। জন্মে জন্মে হৌক তুয়া চরণেতে গতি॥
ইহ জন্ম অরোগিতা বিপক্ষবিনাশ। পরলোকে হৌক গৌরীপুরেতে নিবাস॥
পুত্রে পৌত্রে অভিরামে বাড়ে ঠাকুরাল। তিলমাত্র আপদে না লজ্যে কোন কাল॥
যাবৎজীবন মাতা তুয়া গুণ গাই। মৃত্যুকালে রাতুল চরণে দিবেন ঠাই॥

তাহার পর এই অশুদ্ধিপূর্ণ অর্থহীন কালজ্ঞাপক (?) শ্লোক আছে—

শাকে রসাবান শৈলেন্দু বামা।
ঋষে ভানু প্রাহ সূর্য্য সুতঃ খরামা॥

হয়ত ইহা কালজ্ঞাপক নহে, পুঁথির লিপিকার শ্রীরামগতি আচার্য্য নিজের জ্যোতিষবিদ্যা ফলাইয়াছেন মাত্র।

সমাচারচন্দ্রিকার সম্পাদকের মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে গোবিন্দানন্দ কবিকঙ্কণ মার্কণ্ডেয়পুরাণের দেবীমাহাত্ম্য অবলম্বনে একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[২]

১। প্রদীপ পত্রিকায় [১৩১০, পৃ ৪৫৪-৫৮] প্রকাশিত, বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৫৭।
২। সমাচারচন্দ্রিকা ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৮৩০ [সংবাদপত্রে সেকালের কথা প্রথম খণ্ড, পৃ ৪৬]

একপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

বিবিধ "মঙ্গল" বা দেবদেবীমাহাত্ম্য কাব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে চণ্ডী ব্যতিরিক্ত দেবীমাহাত্ম্য কাব্যের মধ্যে প্রধান হইতেছে গঙ্গামঙ্গল। অপরাপর কাব্যের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছে লক্ষ্মীমঙ্গল, ষষ্ঠীমঙ্গল ও সরস্বতীমঙ্গল। শীতলামঙ্গল সৃষ্ট হইল শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে। অপ্রধান দেবমাহাত্ম্যকাব্যের মধ্যে প্রধান হইতেছে সূর্য্যমঙ্গল।

যে কয়খানি গঙ্গামঙ্গল পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে মাধবাচার্য্যের গঙ্গামঙ্গল প্রাচীনতম। ষোড়শ শতাব্দীর ইতিহাসপ্রসঙ্গে এই কাব্যটির বিষয়ে আলোচনা করা গিয়াছে। যে সকল কবি গঙ্গামঙ্গল রচনা করিয়াছেন তাঁহারা সকলেই গঙ্গার পশ্চিমতীরবাসী ছিলেন। নিম্নে আলোচিত কাব্যগুলির কোন কোনটি সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় নহে।

"দ্বিজ" গৌরাঙ্গ একখানি গঙ্গামঙ্গল[১] কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার সময় জানা নাই। শুধু এইটুকু জানা যায় যে ইনি কাশ্যপগোত্রীয় এবং গঙ্গাতীরে কাষ্ঠশালী গ্রামে ইঁহার বাস ছিল। কাব্যটির পয়ার সংখ্যা আনুমানিক আড়াই হাজার।

গৌরাঙ্গ শর্ম্মার নিবেদন শুন রাম। গঙ্গাতীরে মরি যেন লইয়া তব নাম॥
কাষ্ঠশালী গ্রাম বলি বসতি সুন্দর। চারি বর্ণ পরিপূর্ণ গঙ্গার উপর॥
তাহাতে বসত করি শুন সর্ব্বজন। আশ্রম কাশ্যপ গোত্র নিজ পরিজন॥

জয়রাম বিরচিত গঙ্গামঙ্গল[২] ক্ষুদ্র কাব্য, পয়ার সংখ্যা প্রায় সাড়ে তিন শ। কবির পিতার নাম রামচন্দ্র, জাতি বৈদ্য, বাসস্থান গুপ্তিপাড়া।

গঙ্গার পশ্চিমতীর যথা রাম যদুবীর গুপ্তপল্লী যশোহর ধাম।
বৈদ্য বংশে সমুদ্ভূত দ্বিজ রামচন্দ্র সুত বিরচিত দাস জয়রাম॥

১। বঙ্গীয় রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির পুঁথি। ২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ২৪৫৭, ব-সা-প-প ৬, পৃ ৫২-৫৩, পুঁথির লিপিকাল ১২৪৮ সাল।

জয়রাম বলিয়াছেন যে তিনি ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ মতে গঙ্গামঙ্গল রচনা করিয়াছেন। কবি বলেন, গঙ্গাকে দৈত্যেরা পূর্ব্বাভিমুখে লইয়া যাইতেছিল, শেষে না পারিয়া পদ্মাকে লইয়া যায়।

শঙ্খধ্বনি করি দৈত্য লয়্যা যায়। ইহা দেখি ভগীরথ কাঁদে পরিত্রায়॥
দক্ষিণেতে পিতৃগণ আছে অবগতি। পূর্ব্বদিকে যায় মাতা কাহার সংহতি॥
দয়া করি ভগীরথে ফিরেন[১] তখন। গিরিয়ার মোহানা দিয়া দক্ষিণাগমন॥
দৈত্যাসুর লৈয়া গেল নাম পদ্মাবতী। দক্ষিণদিগেতে যান মাতা ভাগীরথী॥

জয়রামের কাব্যে বাঙ্গালা দেশে গঙ্গাতীরবর্ত্তী স্থানের মধ্যে নবদ্বীপ শান্তিপুর আম্বুয়া ত্রিবেণী বালী ও হেতেগড়ের উল্লেখ আছে।

কবির ভণিতা এইরূপ—

মহেশমহিমা-তুল্য গুপ্তপল্লীগ্রাম।
গঙ্গার চরণ আশে রচে জয়রাম॥

শেষের ভণিতা এইরূপ—

ভগীরথের পদে মোর অযুত প্রণাম।
গঙ্গামঙ্গল সাঙ্গ রচে জয়রাম॥

"দ্বিজ" কমলাকান্ত রচিত গঙ্গার পাঁচালীর[২] পয়ারসংখ্যা আনুমানিক পাঁচ শত। কবির বাসস্থান কি কোগ্রামে ছিল? আত্মপরিচয় এইটুকু পাওয়া যায়—

মনু মহীপাল আদি রাজা সিংহ নাম। তার রাজ্যে আছে এক অণ্ডচড়া গ্রাম॥
পূর্ব্বে সেই গ্রামে আছিলা নরপতি। গঙ্গার সমীপে বসত কোগ্রামেতে স্থিতি॥
গঙ্গার পাঁচালী দ্বিজ কমলাকান্ত ভণে। পান[৩] কর সর্ব্বজন হয়ে দিব্যজ্ঞানে॥

শঙ্করাচার্য্য রচিত গঙ্গার পাঁচালীর নাম বিষ্ণুপদতীর্থমালা।[৪] কাব্যটি নিতান্ত ক্ষুদ্র। বিষ্ণুর দশাবতার বর্ণনার পর ভগীরথ কর্ত্তৃক গঙ্গানয়ন বর্ণিত হইয়াছে।

ছোট ছোট গঙ্গাবন্দনা গঙ্গাদেবীর চৌতিশা ইত্যাদি কবিতা অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে।[৫] এগুলি প্রায়ই কোন কাব্যের বন্দনা অংশ হইতে উদ্ধৃত।

১। পাঠ 'ফিরান'। ২। বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ৭৮-৭৯। ৩। 'গান' হইবে?
৪। ব-সা-প-প ৬, পৃ ৭১, বিষ্ণুপুর অঞ্চলের পুঁথি।
৫। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩০৮, বা-প্রা-পু বি ১-১, পৃ ১৪।

দুই চারিটি স্বতন্ত্র রচনাও হইতে পারে। কবিকঙ্কণের কবিতার প্রথমাংশ নিধিরামের কবিতার অনুরূপ, সম্ভবতঃ উহারই সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। শিশুবোধকে উদ্ধৃত হওয়ায় কবিতাটি সুপ্রচলিত হইয়াছে। কবিতাটি অযোধ্যারামের এবং কবিচন্দ্রের ভণিতাতেও পাওয়া যায়।

প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে তাবৎ গঙ্গামঙ্গল কাব্যের মধ্যে অবিসংবাদিতভাবে শ্রেষ্ঠ হইতেছে দুর্গাপ্রসাদ মুখুটির গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী। এই কাব্যটির সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা করা যাইতেছে।

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী[১] কাব্যের রচয়িতা দুর্গাপ্রসাদ মুখুটির নিবাস ছিল উলা। ইহার পিতার নাম আত্মারাম, মাতার নাম অরুন্ধতী। কবির পত্নী হরিপ্রিয়া ছিলেন ভূকৈলাসের গোকুলচন্দ্র ঘোষালের জ্যেষ্ঠা কন্যা। এই পরিচয় কবি নিজেই দিয়াছেন।

নবদ্বীপ নিবসতি নরেন্দ্র ভূপতিপতি, গোষ্ঠীপতিপতি যাঁরে বলে।
তাঁর অধিকারে ধাম দেবীপুত্র আত্মারাম মুখুটি বিখ্যাত মহীতলে ॥
খড়দা কুলের সার, বশিষ্ঠ তুলনা যার, জায়া অরুন্ধতী ঠাকুরাণী।
কি দিব উপমা তার, শিবশিবা অবতার, ব্যবহারে হেন অনুমানি ॥
তাঁহার তনয় দীন শ্রীদুর্গাপ্রসাদ ক্ষীণ, দারা যার হরিপ্রিয়া সতী।
প্রত্যাদেশ হয় যাঁরে ভাষাগান রচিবারে, স্বপনে কহিলা ভগবতী ॥ পৃ ১৯৬ ॥

ঘোষাল বংশেতে জন্ম কৃষ্ণচন্দ্র ধীর। অনুজ গোকুলচন্দ্র পুত্র ভবানীর ॥
বুদ্ধি কীর্ত্তি নিরুপম দেওয়ানজীর দান। কাঙ্গালীর পিতা যার নামের ব্যাখান ॥
তার জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ তার সুতা হরিপ্রিয়া। গঙ্গা যারে দেখা দিল স্বপনে আসিয়া ॥
পৃ ২৮৩ ॥

গ্রন্থোৎপত্তিবিবরণ এইরকম— কবিপত্নী একদা রাত্রিতে স্বপ্ন দেখেন যে, দেবী জাহ্নবী ব্রাহ্মণবালিকার বেশে আসিয়া বলিতেছেন যে গঙ্গামাহাত্ম্য-বিষয়ক বাঙ্গালা কাব্য নাই, তাঁহার পতি যেন এইরূপ একখানি কাব্য রচনা

১। হরিমোহন মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত ও বসুমতী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত প্রাচীন কবির গ্রন্থাবলী, দ্বিতীয় ভাগ।

করেন। পরদিন প্রভাতে কবিপত্নী স্বামীকে এই বৃত্তান্ত বলিলেন এবং কবিও অনুরূপ শুভশকুন দেখিয়া কাব্যরচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। তাঁহার সম্মুখে এইশ্রেণীর কাব্যের কোন আদর্শ ছিল না, তিনি পুরাণাদি হইতে বক্তব্য খুঁজিয়া লইলেন।

কোটি চন্দ্রশোভা যেন জাহ্নবীর রূপ হেন, ব্রাহ্মণবালিকা বেশ ধরি।
নানা আভরণ গায়, রতননূপুর পায়, বিচিত্র বসনখানি পরি॥
কহেন করুণাময়ী, শুন হরিপ্রিয়া কই, ভাষায় আমার গান নাই।
তোমার পতিরে কবে, প্রকাশ হইবে তবে, যে বাঞ্ছা করিবে দিব তাই॥
আমার সঙ্গিনী ছিলে, সেবাদোষে জন্ম নিলে, আর জন্ম হবে না তোমার।
দেব দ্বিজ নিজ পতি তাতে তোর নিষ্ঠামতি দেখি দয়া হয়েছে আমার॥
তোমারে যে শ্রদ্ধা করে, সুখমোক্ষ দিই তারে, নিন্দিলে আমার নিন্দা হয়।

(কবির কথায় কেহ যদি পত্নীভক্তির আতিশয্য খুঁজিয়া পান, তবে তাহার উত্তরে কবি মন্তব্য করিয়াছেন,

একথা পণ্ডিত বিনে বুঝিবে কি বুদ্ধিহীনে, শক্তিনিন্দা করা মত নয়॥)
সুস্বপ্ন দেখিয়া সতী প্রভাতে উঠিয়া অতি ভক্তিভাবে পতিরে কহিল।
নিবাস উলায় যার শ্রীদুর্গাপ্রসাদ তার কথা শুনে ভাবিতে লাগিল॥
কবি নই, ভাবি মনে স্বপ্ন কিছু নয়। হেনকালে নরাঙ্কিতে স্বপ্ন সত্য কয়॥
লোমাঞ্চ শরীর, গ্রন্থ না পাই ভাবিয়া কৃপা করে বাণী যেন দিলেন বলিয়া॥
নানাশাস্ত্র পুরাণ দেখিয়া তন্ত্রসার। সংগ্রহ করিয়া কিছু লিখি সমাচার॥
পৃ ১৯৬-৯৭॥

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী গঙ্গামঙ্গল কাব্য। গঙ্গামঙ্গল কাব্য কতদিনের পুরাতন তাহা ঠিক কয়িয়া বলা যায় না, তবে ষোড়শ শতাব্দী হইতে পাইতেছি। সম্ভবতঃ কবির সময়ে প্রাচীন গঙ্গামঙ্গল কাব্য লুপ্ত হইয়াছিল, নতুবা কবি গঙ্গার জবানীতে "ভাষায় আমার গান নাই" বলিতেন না।

যতগুলি গঙ্গামঙ্গল কাব্য পাওয়া গিয়াছে (—অধিকাংশই ব্রতকথাজাতীয়), তাহার মধ্যে দুর্গাপ্রসাদের কাব্য বৃহত্তম। গল্পাংশেও যথেষ্ট নূতনত্ব আছে।

অবশ্য প্রধান বর্ণনীয় বিষয় হইতেছে ভগীরথ কর্তৃক মর্ত্ত্যে গঙ্গাবতারণ। কাব্যের প্রথম অংশ হইতেছে— মেনকার কন্যারূপে সতীর অংশে গঙ্গার জন্ম, বাল্যলীলা, শিবের সহিত বিবাহ ও মেনকার শাপে বারিত্বপ্রাপ্তি। ইহার মধ্যে গঙ্গাবারির ও দুর্গানামের মাহাত্ম্যখ্যাপক জয় রাজার পুত্র কাশী ও জামাতা বিভুর ক্ষুদ্র আখ্যানটি আছে। এই কাহিনী অভিনব বটে। এই অংশে কবিকঙ্কণ ও ভারতচন্দ্রের কাব্যের প্রভাব সুস্পষ্ট। দ্বিতীয় এবং প্রধান অংশ হইতেছে গঙ্গা-ভগীরথ কাহিনী। দিবোদাসের কাহিনীও ইহার অন্তর্গত। তৃতীয় অংশে বলি-বামন উপাখ্যান বিবৃতি হইয়াছে।[১] তাহার পর নিতান্ত দুই চারি কথায় ত্রিপুরবধ কাহিনী বলিয়া কাব্য সমাপ্ত হইয়াছে।

গঙ্গাতীরবর্ত্তী এই সকল স্থানের বর্ণনা বা উল্লেখ করা হইয়াছে— প্রয়াগ, বিন্ধ্যপর্ব্বত, কাশী, ভোজপুর, পাটনা, মুঙ্গের, সকরী, বসন্তপুর, ভাগলপুর, কহলগাঁ, পইতীর, রাজমহল, উধুয়া, গৌড়দেশ, সুতি, কিরীটকোণা, চূণাখালি, সয়দাবাদ, পলাশী, কাটোয়া, বারহাট ইন্দ্রাণী, মাটিয়ারী, অগ্রদ্বীপ, পাটুলী, নবদ্বীপ, অম্বিকা, শান্তিপুর, গুপ্তিপাড়া, উলা, চাকদহ, ত্রিবেণী (মুক্তবেণী), কুমারহট্ট, রাণী-নাগরী, ভাটপাড়া, ফরাসডাঙ্গা, মূলাযোড়, ভদ্রেশ্বর, দীর্ঘাঙ্গ, খড়দহ, বালি, কালীঘাট, হেতেগড়।

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী অষ্টমঙ্গলা কাব্য, গান করিবার জন্য রচিত হইয়াছিল। কবি বলিয়াছেন,

সমাপ্ত হইল এই গঙ্গাগুণগান।
অষ্টাহসম্মিত গান অমৃতসমান॥

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর প্রচার হইতে বিলম্ব হয় নাই। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য-ভাগেও চব্বিশ পরগনা অঞ্চলে গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণীর যথেষ্ট সমাদর ছিল। রাজ-নারায়ণ বসু মহাশয় বলিয়াছেন, "ভারতচন্দ্রের অব্যবহিত পরেই গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী-প্রণেতা দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায় বিদ্যমান ছিলেন। গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী একখানি শ্রেষ্ঠ কাব্য বলিয়া গণ্য করা যাইতে পারে না, কিন্তু উহা প্রচলিত

১। মাধবাচার্য্যের কাব্যের ইহাই প্রথম আখ্যান।

ধর্ম্মাবলম্বীদিগের একটি অতি শ্রদ্ধেয় গ্রন্থ। গায়নেরা চামর ঢুলাইয়া ও মন্দিরা বাজাইয়া চণ্ডী ও রামায়ণ যেমন গান করিয়া থাকে, তেমনি এই কাব্যটিও গান করিয়া থাকে। আমার স্মরণ হয়, আমার বাল্যকালে আমার সর্ব্বাপেক্ষা নিকট সম্পর্কীয় কোন ভক্তিভাজন স্ত্রীলোক সর্ব্বদা গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী ভক্তির সহিত পাঠ করিতেন।"[১]

গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী হইতে কবির বাস্তবদৃষ্টির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। মধ্যে মধ্যে বেশ সরসতাও আছে। উদাহরণস্বরূপ একটু অংশ তুলিয়া দিতেছি।

গঙ্গা চাকৃদহের নিকটে আসিয়াছেন। এখানে পূর্ব্ববঙ্গের লোক গঙ্গাস্নান করিতে আসিল। তাহাদের কবি এই বর্ণনা দিয়াছেন—

কহিব কৌতুক কিছু, বঙ্গদেশী লোক নীচু অবভাষা কন কতগুলি।
যখন বলেন 'শুন,' শুনিতে শুনায় 'হুন,' বালকের নাম 'পোলাপুলি॥'
তুম্বা আঁচলা ঝোলাঝুলি পোলাপুলি কতগুলি লইয়া আইসেন সেইখানে।
গুড়াকু তামাকুকোটা, কারো সঙ্গে ডাব[২] দুটা, গল্প কত হয় টানে টানে॥
কারো আছে এই ভার দেড়বুড়ির তালুকদার, ইহাতে কে টেকে তার ধূমে?
মাদুলীতে ভরা হাত, নাম রামজগন্নাথ, বাদসার নানা যেন জুমে॥
দেখেন সুধারা যার কাঁধেতে উঠেন তার, তার আর নাহিক নিস্তার।
পড়িলে শক্তের ঠাঁই আজ্ঞাকারী তার ভাই, কত কব আর অনাচার॥
সঙ্গে কুলবধূ যত কত রূপ কব কত, পোষাক দেখিলে হরে বুদ্ধি।
ডুবেড়া কাপড় পরা, কম্বুই তক্ শঙ্খভরা, কথা শুনে উড়ে ভূতশুদ্ধি॥
উর্ব্বশী সমান যারা, পরিচ্ছদ বিনা তারা জ্ঞান হয় সর্ব্বদা অশুচি।
'যামু থামু' ডাক দিল, কোভায়কে নিল মিল, কথা যেন কপির কিচিমিচি।

পৃ ৬৩-৬৪॥

যে দুই একখানি ক্ষুদ্র সূর্য্যমঙ্গল কাব্য বা সূর্য্যের পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে তাহার মধ্যে রামজীবন বিদ্যাভূষণের আদিত্যচরিত[৩] কাব্যই প্রাচীনতম। এটি

১। বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ক বক্তৃতা, পৃ ২০।
২। অর্থাৎ ডাবা হুঁকা। ৩। ব-সা-প-প ১৩, পৃ ৬৫-৭৯।

১৬৩১ শকাব্দে অর্থাৎ ১৭০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়। জীবেন্দ্রকুমার দত্ত মহাশয় কর্তৃক কাব্যটি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।

ইন্দু রাম ঋতু বিধু শক নিয়োজিত।
শ্রীরামজীবনে ভণে আদিত্যচরিত ॥[১]

ইহার পাঠান্তর আছে "বিন্দু রাজ ('রাম' হইবে) ঋতু বিধু"। এই পাঠ ঠিক হইলে গ্রন্থরচনাকাল ১৬৩০ শকাব্দ হইবে। এটি গ্রন্থারম্ভকালও হইতে পারে।

রামজীবন ১৬২৫ শকাব্দে বা ১৭০৩ খ্রীষ্টাব্দে মনসামঙ্গল রচনা করেন। রামজীবনের পরিচয়াদি মনসামঙ্গল প্রসঙ্গে দিয়াছি।

অধিকাংশ লৌকিক ব্রতকথা বা অর্ব্বাচীন পাঁচালী কাব্যের মত সূর্য্যপাঁচালী-কাহিনীও উপকথামূলক। রামজীবন বলিয়াছেন,

গুরুজন মুখে শুনি কথার শিকলি।
সূর্য্যদেব অনুসারে রচিনু পাঞ্চালী ॥
পূর্ব্বেত আছিল এই ব্রতের যে কথা।
পরমহরিষে কৈনু প্রকাশ কবিতা ॥

রামজীবনের কাহিনীর মর্ম্ম মোটামুটি এই—

এক দরিদ্র ব্রাহ্মণ পত্নীর বিয়োগে দুই কন্যা রুমুনা ও ঝুমুনা লইয়া অতিশয় কষ্টে পড়িল। একদিন পিতা ভিক্ষায় বাহির হইয়া গেলে ভগিনীদ্বয় বনে শাক তুলিতে গেল। সেখানে এক রম্য সরোবরের তীরে দেবকন্যাদিগকে সূর্য্যপূজা করিতে দেখিয়া তাহারাও সূর্য্যপূজা করিল। গৃহে ফিরিয়া দেখে সূর্য্যের কৃপায় তাহাদের ধনৈশ্বর্য্য হইয়াছে। তাহারা প্রত্যহ সূর্য্যপূজা করিতে লাগিল। এদিকে সে দেশের রাজার কন্যা বিবাহযোগ্যা হইয়াছে, উপযুক্ত পাত্র না পাইয়া রাজা হতাশ হইয়া স্থির করিলেন যে পরদিন প্রাতে যাহার মুখ আগে দেখিবেন তাহাকেই কন্যা সম্প্রদান করিবেন। ঘটনাক্রমে রাজা সেই ব্রাহ্মণের

১। ব-সা-প-প ১৩, পৃ ৭৯।

মুখই আগে দেখিলেন। তাহার সহিত রাজকন্যার বিবাহ হইল। রাজকন্যা স্বামিগৃহে প্রাত্যহিক সূর্য্যপূজা হয় ইহা পছন্দ করিলেন না। সপত্নীকন্যাদ্বয়ের প্রতি ঈর্ষ্যাও হইল। তিনি স্বামীকে বলিলেন কন্যা দুইটিকে বনবাস দিতে। ব্রাহ্মণ অগত্যা মেয়ে দুইটিকে মাসীর বাড়ীর নাম করিয়া বনে লইয়া গেল, এবং তাহাদিগকে নিদ্রাগত অবস্থায় পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া আসিল। নিদ্রাভঙ্গে বালিকারা পিতাকে না দেখিতে পাইয়া কাতর ক্রন্দন করিতে লাগিল। বেলা হইলে তাহারা পুষ্করিণীতে স্নান করিতে নামিল এবং জল মধ্যে একটি স্বর্ণ কলস পাইল। সেটি লইয়া তাহারা গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল, কিন্তু বিমাতার নিষ্ঠুর বাক্যে মর্ম্মাহত হইয়া বনে ফিরিয়া গেল। সূর্য্যদেব অনুগ্রহ করিয়া বনে এক টঙ্গ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। ভগিনীদ্বয় সেই টঙ্গে বাস করিতে লাগিল।

একদিন সেই বনে পার্ব্বতীপুরের রাজা অনঙ্গশেখর মৃগয়া করিতে আসিয়া তৃষ্ণায় কাতর হইয়া ভগিনীদ্বয়ের নিকট জল প্রার্থনা করিলেন। তৃষ্ণা নিবারণ হইলে রাজা জ্যেষ্ঠা কন্যার পাণিগ্রহণ করিলেন আর কোতোয়ালের সহিত কনিষ্ঠার বিবাহ দিলেন এবং রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। একদিন জ্যেষ্ঠা রাণী সূর্য্যপূজা করিতেছিলেন এমন সময় রাজা আসিয়া পূজার সামগ্রী পায়ে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিলেন। ইহাতে সূর্য্যের কোপে রাজার রাজ্যনাশ হইল। এদিকে সূর্য্যের কৃপায় কোতোয়ালের ধনসম্পদ দিন দিন বাড়িতে লাগিল। রাজা ভাবিলেন যে তাঁহার স্ত্রীই অসৌভাগ্যের কারণ। তিনি রাণীকে কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। কোতোয়াল রাণীকে না কাটিয়া রাজাকে শৃগালের রক্ত দেখাইয়া রাজাকে জানাইল যে রাণীকে হত্যা করা হইয়াছে। রাণী বনে বাস করিতে লাগিলেন।

কিছুদিন পরে দুই ভগিনীই পুত্রসন্তান প্রসব করিল। রাজপুত্রের নাম হইল দুখরাজ, আর আর কোটাল পুত্রের নাম হইল সুখরাজ। দুখরাজ সূর্য্যের কৃপায় অস্ত্রশস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া উঠিল। দুখরাজ একদিন পক্ষিরূপধারী আদিত্যদেবকে মারিবার জন্য তীর ছুঁড়িল। পক্ষী কুমারকে বিদ্রূপ করিয়া বলিল, তোমার বাপ কে জানা নাই, তোমার জন্ম শুদ্ধ নহে। বালক মনে কষ্ট পাইয়া মাতাকে এই

কথা বলিলে রাণী তাহাকে সকল বৃত্তান্ত বলিল। তখন বালক মাসীর নিকট চলিল ধন আনিতে। বালক মাসীর কাছে কিছুদিন থাকিয়া ধনরত্ন লইয়া মায়ের নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিল। কিন্তু পথে সূর্য্যদেব ব্রাহ্মণবেশে বালকের নিকট হইতে ধনরত্নাদি সব কাড়িয়া লইলেন। কিছুদিন পরে মাতাপুত্রে কোতোয়ালের বাড়ীতে আগমন করিল। বহুদিন পরে আবার দুই ভগিনী মৃত্তিকার পিষ্টক খাইয়া সূর্য্যপূজা করিল। সূর্য্যদেব প্রসন্ন হইলেন। রাজার মনেও পত্নীশোক জাগিয়া উঠিল। রাজা কোতোয়ালকে বলিলেন রাণীকে যেমন করিয়া হউক আনিয়া দিতে, নতুবা তাহার প্রাণ যাইবে। স্ত্রীর পরামর্শে কোতোয়াল রাজাকে নিমন্ত্রণ করিল। নিমন্ত্রণ খাইতে আসিয়া রাজা পরিবেশন-কারিণীকে রাণী বলিয়া চিনিতে পারিলেন। পত্নী ও পুত্রের সহিত রাজার মিলন হইল।

আহারান্তে পত্নীপুত্রসহ গৃহে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে রাজা অমঙ্গল দেখিয়া এক হাড়ির সাত পুত্রকে কাটিয়া ফেলিলেন। হাড়ির পত্নী পুত্রবিয়োগে যার পর নাই কাতর ক্রন্দন করিতে লাগিল। রাণী তাহার বিলাপে কাতর হইয়া তাহাকে ডাকাইয়া আনিলেন এবং তাহার সহিত সূর্য্যপূজা করিলেন। পূজায় প্রসন্ন হইয়া সূর্য্যদেব হাড়ির সাত পুত্রকে জীয়াইয়া দিলেন। রাজা সূর্য্যদেবের প্রভাবের সম্যক্‌পরিচয় পাইয়া মহাসমারোহে সূর্য্যপূজা করিলেন। সূর্য্যপূজার ফলে রাজার পিতৃপুরুষ দর্শন হইল। তিনি পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করিয়া পিতা মাতার সহিত সূর্য্যলোক প্রাপ্ত হইলেন।

কাব্যের আরম্ভ এইরূপ—

প্রণমহো সরস্বতীচরণযুগল। একে একে প্রণমহো দেবতা সকল ॥
ইষ্টদেব প্রণমহো মনে মহারঙ্গে। আনন্দে জনক বন্দো জননীর সঙ্গে ॥
গুরুপদযুগ বন্দো পরমসন্তোষে। তান প্রিয়া প্রণমহো মনের হরিষে ॥
করজোড়ে প্রণমহ মমাগ্রজ ছাত্র। ইষ্টমিত্র প্রণমহো আছে যত্র তত্র ॥
কবিগণ প্রণমহো মনে [অনু]রুদ্ধ। অশুদ্ধ দেখিলে পদ করিবেক শুদ্ধ ॥
জ্যেষ্ঠ ভাই প্রণমহো দ্বিজ বয়োজ্যেষ্ঠ। জ্ঞানাধিক বয়োধিক বন্দোম গরিষ্ঠ ॥

অল্পবয়সে মুই দ্বিজকুলজাত। পণ্ডিত না হমু মুই কহিনু সভাত ॥
মনেতে ভাবিয়া মাত্র দ্বাদশ আদিত্য। কবিতা করিতে মোর প্রকাশিল চিত্ত ॥[১]

শেষ এইরূপ—

[গুরু]মুখে শুনি এই কথার শিকলি[২]। সূর্য্যদেব অনুসারে রচিনু পাঞ্চালী ॥
পূর্ব্বে আছিল এই ব্রতের যে কথা। পরম হরিষে কৈনু [প্রকাশ কবিতা] ॥
যেই জনে শুনে ভণে সূর্য্যের চরিত্র। মনবাঞ্ছা সিদ্ধি হয়ে শরীর পবিত্র ॥
ইন্দু রাম ঋতু বিধু শক নিয়োজিত। শ্রীরামজীবনে ভণে আদিত্যচরিত ॥[৩]

"দ্বিজ" কালিদাসের সূর্য্যের পাঁচালীও অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে রচিত বলিয়া অনুমান হয়। কালিদাসের মতে ব্রাহ্মণের কন্যা দুইটির নাম যথাক্রমে কুন্তী ও পার্ব্বতী।[৪]

সরস্বতীমাহাত্ম্য কাব্য দুই একখানি মাত্র পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে দয়ারামের সারদাচরিত বা সারদামঙ্গল কাব্যটি অধিক পরিচিত।[৫] কাব্যটির রচনাকাল জানা নাই, তবে অষ্টাদশ শতাব্দীর লেখা বলিয়াই মনে হয়। দয়ারামের পিতার নাম জগন্নাথ, পিতামহের নাম পরীক্ষিৎ এবং প্রপিতামহের নাম রামেন্দ্রজিৎ। বাসস্থান ছিল মেদিনীপুর জেলায় কিশোরচক পরগনার অন্তর্গত কাশীজোড়া গ্রামে। এই স্থানের ভূস্বামীর আশ্রয়ে কবি সারদামঙ্গল রচনা করেন।

কর্ত্তা রামেন্দ্রজিৎ, বিদ্যাবন্ত পরীক্ষিৎ, জগন্নাথ তাহার তনয়।
তাহার পুণ্যের ফলে অবতীর্ণ মহীতলে দয়ারাম তাহার তনয় ॥
সারদাচরিত্র কথা রচে দয়ারাম।
বসবাস কাশীজোড়া কিশোরচক গ্রাম ॥
কাশীজোড়া মহাস্থান, মহারাজা পুণ্যবান্, ধন্য সে ধার্ম্মিক জপধ্যান।
হই তার প্রতিষ্ঠিত দয়ারাম রচে গীত সারদাচরিত উপাখ্যান ॥

দয়ারামের কাব্যটি ছোট, প্রায় পাঁচ শত শ্লোকাত্মক ও সতেরো পরিচ্ছেদে

১। ব-সা-প-প ১৩, পৃ ৬৬-৬৭। ২। পাঠ 'চিগলি।'
৩। ব-সা-প-প ১৩, পৃ ৭৮-৭৯। ৪। বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ১৭৪।
৫। বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ৭৬-৭৮।

বিভক্ত। উপাখ্যানটি লৌকিক কাহিনী বা উপকথা জাতীয়। গল্পটি মোটামুটি এই—

সুরেশ্বর দেশের রাজা সুবাহু শিবপূজার ফলে এক পুত্রসন্তান লাভ করেন, তাহার নাম হইল লক্ষধর। লক্ষধর সরস্বতীপূজা করিয়া বিদ্যারম্ভ করিল, তথাপি বার বৎসর যাবৎ কিছুই শিখিতে পারিল না। পণ্ডিতের মুখে রাজা এই বৃত্তান্ত জানিয়া পুত্রের শিরশ্ছেদের আজ্ঞা দিলেন। কোটাল অনুকম্পা করিয়া রাজপুত্রকে বনে ছাড়িয়া দিয়া শৃগালের মুণ্ড কাটিয়া আনিয়া রাজাকে দেখাইল। লক্ষধর বনে কষ্ট পাইতেছে দেখিয়া দেবী সরস্বতী বৃদ্ধা ব্রাহ্মণী সাজিয়া বনে আসিয়া কুটীর বাঁধিয়া বসিলেন। লক্ষধর তাঁহার ধর্ম্মপুত্র হইল। লক্ষধর কাঠ কাটিয়া আনে, দেবী তাহা বাজারে বেচিয়া আসেন, এইরূপে কাল যায়। একদিন দেবী ভাগবতের পুঁথি ফেলিয়া বাজারে গিয়াছেন। লক্ষধর পুঁথি দেখিয়া রুষ্ট হইয়া সমুদ্রের জলে ফেলিয়া দিল। তাহাতে লেখা "রাধা কৃষ্ণ" নাম দুইটি মুছিয়া গেল। দেবতারা ইহা অবগত হইয়া নারদকে দিয়া দেবীকে সংবাদ দিলেন। দেবী লক্ষধরকে তিরস্কার করিয়া সমুদ্র হইতে পুঁথিখানি উদ্ধার করিলেন। লক্ষধরের নিকট পুঁথি ফেলিবার হেতু অবগত হইয়া দেবী দয়াপরবশ হইয়া বলিলেন যে রাজপুত্র গুরুদক্ষিণা দেয় নাই বলিয়া তাহার বিদ্যালাভ হয় নাই। বৈদর্ভদেশে এক কৃষ্ণভক্ত রাজা আছে, তাহার পাঁচ কন্যা—কালিন্দী, কেশরী, উমা ইত্যাদি। দেবী সেই পাঁচ কন্যার সেবা করিতে লক্ষধরকে উপদেশ দিলেন, তাহা হইলে সে সর্ব্ববিদ্যা লাভ করিতে পারিবে। লক্ষধর তাহাই করিল। শ্রীপঞ্চমীর দিনে রাজকন্যারা সরস্বতী পূজা করিল এবং লক্ষধরকে রাত্রিতে জাগরণ করিতে বলিল। গভীর রাত্রিতে নীলবস্ত্রপরিহিতা দেবী যখন আবির্ভূত হইলেন তখন লক্ষধর তন্দ্রাচ্ছন্ন ছিল, কিন্তু দেবীর হাতের শাঁখার শব্দে তাহার তন্দ্রা ছুটিয়া গেল। লক্ষধর মনে করিল, কেহ দেবীপূজার সামগ্রী চুরি করিতে আসিয়াছে। এই ভাবিয়া সে দেবীকে ধরিয়া খাটের পায়ায় বাঁধিয়া রাখিল। দেবী অবশেষে তাহাকে বর দিয়া নিষ্কৃতি পাইলেন।

পরদিন দেবীর কৌশলে রাজকন্যাদের শিক্ষক জনার্দ্দন পণ্ডিত রাজকন্যাদিগকে

বিদেশে লইয়া পলাইবার মতলব করিল। দেবী বিশ্বকর্ম্মাকে আদেশ দিয়া নৌকা নির্ম্মাণ করাইলেন এবং মায়া নদীর সৃষ্টি করিলেন। সন্ধ্যায় রাজকন্যারা ধনরত্নাদি লইয়া নৌকায় উঠিল এবং লক্ষধরও মাঝি হইয়া বসিল। এদিকে দেবীর চক্রান্তে জনার্দ্দন রাজার নিকট ধরা পড়িল। দেবী নৌকা চালাইয়া দিলেন। কন্যারা অগত্যা ভৃত্য লক্ষধরকে বিবাহ করিল। দেবীর স্বপ্নাদেশে বিজয় দত্ত নামে এক সাধু লক্ষধরকে নিজের বিশ বৎসর পূর্ব্বেকার হারানো ছেলে মনে করিয়া তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া লইল। দেবীর কৃপায় লক্ষধর সেই স্থানে জঙ্গলাদি কাটিয়া এক নূতন রাজ্যের পত্তন করিল। একদিন লক্ষধর সমস্ত রাজাকে নিমন্ত্রণ করিল, সেই উপলক্ষে লক্ষধরের পিতা সুবাহুও আসিলেন। কিন্তু সুবাহু পুত্রহারা হইয়া রাজ্যে উদাসীন হইয়া পড়ায় তাঁহার রাজ্য শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে, অতিকষ্টে তাঁহার দিন কাটিতেছে। দরিদ্র রাজা বলিয়া সুবাহুকে মাটির পাত্রে আহার করিতে দেওয়া হইল। সুবাহু ক্রুদ্ধ হইয়া লক্ষধরের রাজ্য গ্রাস করিতে আকাঙ্ক্ষা করিলেন এবং বৃদ্ধ কোটালকে লক্ষধরের বিরুদ্ধে যুদ্ধে প্রেরণ করিলেন। কোটাল কিছুই করিতে পারিল না, রাজা তাহার মাথা কাটিয়া ফেলিতে আদেশ দিলেন। তখন দেবীর উপদেশে লক্ষধর আসিয়া কোটালকে ধর্ম্মপিতা বলিয়া সম্বোধন করিল এবং অর্দ্ধরাজ্য গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিল। কিন্তু কোটাল রাজপুত্রকে চিনিতে পারিয়াছে, সে অর্দ্ধরাজ্য গ্রহণ করিল না। দেবীর কৃপায় সুবাহুও তাঁহার পত্নী পুত্রকে ফিরিয়া পাইলেন। লক্ষধরের পত্নীরা পতিকে রাজপুত্র জানিয়া আনন্দিত হইল। রাজা সুবাহু মহাসমারোহে দেবী সরস্বতীর পূজা করিলেন। সেই হইতে দেবীমাহাত্ম্য কথা জগতে প্রচারিত হইল।

অপর সরস্বতীমঙ্গল-রচয়িতা হইতেছে "দ্বিজ" বীরেশ্বর।[১] বাসুদেব দাস রচিত সরস্বতীর বন্দনা ছড়ামাত্র।[২]

যে কয়খানি ক্ষুদ্র লক্ষ্মীমঙ্গল বা কমলামঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল তাহার

১। ব-সা-প পুঁথি ২৭১৬। ২। ব-সা-প পুঁথি ৪১৪ (দাস সংগ্রহ)।

মধ্যে প্রাচীনতম হইতেছে "গুণরাজ খান" উপাধিযুক্ত শিবানন্দ কর বিরচিত কাব্যটি। কবির ভণিতা এইরূপ—

লক্ষ্মীর চরিত্র শুনে যে তারে দেন বর।
পাঁচালীপ্রবন্ধে রচিলেন বৈশ্য শিবানন্দ কর ॥[১]

অপর লক্ষ্মীমঙ্গলজাতীয় কাব্য বা ব্রতকথার কবির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন "দ্বিজ" বসন্ত,[২] ধনঞ্জয়,[৩] যাদবদাস[৪] ও কিঙ্কর।[৫] শেষোক্ত তিন জন উনবিংশ শতাব্দীর লোক হইতে পারেন।

রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তীর ষষ্ঠিকামঙ্গল ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যের মধ্যে বৃহত্তম।[৬] কাব্যের রচনাকাল জানা নাই, সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধ হইবে। কবির উপাধি ছিল বিদ্যাভূষণ এবং পিতার নাম ছিল গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তী। এই তথ্য ভণিতা হইতে পাওয়া যায়।

দীন রুদ্ররাম চক্রবর্ত্তী রস গান।
শ্রবণে কলুষ নাশে চতুর্ব্বর্গ পান ॥ পৃ ৭ ॥
গঙ্গারাম চক্রবর্ত্তী ধীর বিচক্ষণ।
তার পুত্র বিরচিলা শ্রীবিদ্যাভূষণ ॥ পৃ ১২ ॥

কাব্যের বিশিষ্ট ভণিতা হইতেছে—

ষষ্ঠিকামঙ্গল গীত অতিশয় সুললিত
বিরচিলা শ্রীবিদ্যাভূষণ ॥
ষষ্ঠিকার পাদপদ্মে সমর্পিয়া মন।
আনন্দে রচিলা রুদ্র শ্রীবিদ্যাভূষণ ॥

গ্রন্থোৎপত্তি বিবরণ এই—

নিশি শেষ চৈত্র মাস বুধবার দিনে। গীত রচিবারে দেবী কহিলা স্বপনে ॥

১। বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ৭৫। ২। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথি ১৭৯৭, (লিপিকাল ১০৯৪ মল্লাব্দ)। ৩। ঐ ৩৫৭১। ৪। ঐ ২৮৪৭ ইত্যাদি। ৫। ঐ ৩৪৫৭।

৬। শ্রীযুক্ত আশুতোষ দত্ত গুপ্ত কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত (১৩৩৯)। কাব্যটির প্রথম দুই উপাখ্যান মাত্র প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদকের হস্তক্ষেপের চিহ্ন যথেষ্ট রহিয়াছে। পুঁথি খুলনা অঞ্চলের।

সে কথা অনুসারে করিলাম বর্ণন। দেবলীলা রসশাস্ত্র কাব্য প্রবর্ত্তন ॥
ব্যাধিসঙ্কটেতে মোর তনয়া পীড়িত। তার রক্ষা হেতু মোরে করাইলে গীত ॥
ত্রয়োদশ পালা গীত কহিলা রচিতে। আজ্ঞা প্রমাণে গীত রচিনু সেই মতে ॥
তনয়া রক্ষিলে মোর দিয়া পদছায়া। এমতি রাখিবা আমা শুন মহামায়া ॥
পৃ ১০-১১ ॥

কাব্যটিতে তিনটি উপাখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম উপাখ্যানে ষষ্ঠীর ও কার্ত্তিকেয়ের জন্ম, তারকাসুর বধ, কার্ত্তিকেয়ের তীর্থভ্রমণ ও বিবাহে অসম্মতি ইত্যাদি পৌরাণিক কাহিনী বিবৃত হইয়াছে। দ্বিতীয় উপাখ্যানে কোলাঞ্চ দেশের রাজ্যচ্যুত রাজা ক্ষেত্র মিশ্রের ষষ্ঠীর বরে পুত্রলাভ ও সেই পুত্র দেবীবর কর্ত্তৃক পিতৃরাজ্য উদ্ধার বর্ণিত হইয়াছে। তৃতীয় উপাখ্যানে কলাবতীর কাহিনী, এই অংশ প্রকাশিত হয় নাই।

"দ্বিজ" হরিহরের সুত "দ্বিজ" সুন্দর অথবা "দ্বিজ" মণিরাম বৈদ্যনাথমঙ্গল[১] নামে একটি শিবমাহাত্ম্য কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি বৃহৎ নহে, আনুমানিক নয়পত্রাত্মক। পুঁথির লিপিকাল ১২১০ সাল। সুন্দর "দ্বিজ" এবং "দ্বিজ" মণিরাম উভয় ভণিতাই দেখা যায়।

দ্বিজ হরিহর সুত মূঢ় অল্পমতি।
স্বপ্নে শঙ্করপদে নাহিক ভকতি ॥

মহামায়ার কৃপা কিছু না হৈল আমারে।
দ্বিজ মণিরাম কহে ভবানী-পদারে ॥

অন্যত্র

বৈদ্যনাথমঙ্গল লোক শুন এক মনে।
বোলেন সুন্দর দ্বিজ শঙ্কর চরণে ॥

কবি শিবের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন—

সত্ত্ব সম শুভ্র তেজঃ শিরে পঞ্চানন ॥
হেম গৌরাঙ্গ রূপ বৃষভবাহন। কর্ণেতে বাসুকি নাগ তুহিন শোভন ॥
পঞ্চশিরে পঞ্চমণি শোভে মন্দাকিনী। মহাদিব্যাকাব জটা আর শোভে মণি ॥
করতলে শ্রীঅঙ্গুরী পৈরে বাঘাম্বর। কর্ণে ধুতুরাপুষ্প শোভে মনোহর ॥

১। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩৩৮; বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ৪২।

রাধাকৃষ্ণ দাসের গোসানীমঙ্গলে উত্তরবঙ্গের এক স্থানীয় দেবতার কাহিনী উপলক্ষ্যে কোচবিহারের রাজা কান্তেশ্বরের অলৌকিক জীবনবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।[১] কবির পিতা করুণাকর দাস কোচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের প্রজা ছিলেন। কাব্যটি হয়ত উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ায় লেখা হইয়াছিল।

দুইতিনখানি কপিলামঙ্গল[২] বা গাভীমাহাত্ম্য কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। বিষয়বস্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতে উক্ত ব্রহ্মার গোধনচুরি কাহিনীরই রূপান্তর মাত্র। এক-খানি "দ্বিজ" কবিচন্দ্রের রচনা, সম্ভবতঃ এটি ভাগবতামৃতের অন্তর্গত ছিল।

শুন সর্ব্বজন মন দিয়া ইতিহাস। শুনিলে সকল পাপ হইব বিনাশ॥
কপিলামঙ্গল গীত শুনিতে রসাল। শুনিলে সকল পাপ হরে ত তৎকাল॥

এইরূপে সমাপ্ত হইয়াছে—

লীলাবতী কপিলার চরণ ধরিয়া। কপিলার পূজা কৈল পাদ্য অর্ঘ্য দিয়া॥
এই পুথি যতনে যেবা রাখে নিকেতনে। অষ্টশত পাল তার বাড়ে দিনে দিনে॥
এই মত রহিল গাই মথুরামণ্ডলে। ব্যাসের আদেশে দ্বিজ কবিচন্দ্রে বলে॥

দ্বিতীয় কাব্যটিতে কেতকা দাস এবং ক্ষুদিরাম দাস এই উভয় ভণিতাই দেখা যায়। পুঁথির লিপিকাল ১২২৮ সাল। কাব্যের শ্লোক সংখ্যা আনুমানিক দেড় শত। কাব্যের আরম্ভ এইরূপ—

নারদ বলেন বোল করিতে বিড়ম্বনা। ব্রহ্মমূর্ত্তি হতে মোর নাঞিক বাসনা॥
ব্রহ্মমূর্ত্তি হইয়া সব কপিলা ছলিতে। গোবাঘা বলিয়া মোরে ঘুষিবে জগতে॥

ভণিতা এইরূপ—

দিতে নিজ পরিচয় বলে মুনি মহাশয়,
সুকবি কেতুকাদাস কয়॥

রামের সনে যাব বনে বলিছেন লক্ষ্মণ।
ক্ষুদিরাম দাসে মাগে চরণে শরণ॥

চাটিগ্রাম অঞ্চলের অজ্ঞাত কবি রচিত এক কপিলামঙ্গলের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৩] পুঁথির লিপিকাল ১২০৬ মঘী সন।

১। বা-প্রা-পু-বি ১-২, ৪৪-৪৫; সাহিত্য ১৩১২, পৃ ১৫৬-৫৯। গ্রন্থটি ১৩০৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। ২। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩০৫। ৩। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৪৪।

দ্বিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

মুসলমান কবি ও মুসলমানী কাব্য

কবি হায়াৎ মামুদের বাস ছিল ঘোড়াঘাট সরকারে স্থলঙ্গা বাগ্‌দ্বার পরগনার অন্তর্গত ঝাড়বিশিলা গ্রামে, এই গ্রাম এখন রঙ্গপুর জেলার পীরগঞ্জ থানার অন্তর্গত। কবির পিতার নাম শাহা কবীর এবং ভ্রাতার নাম শেখ জামাল। মহরমপর্ব্ব কাব্যে কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

শুন আর নিবেদন, কহি আমি বিবরণ যেইমতে রচিনু পয়ার।
ঝাড়বিশ্লিা গ্রাম, চতুর্দ্দিগে যার নাম, পরগনে স্থলঙ্গা বাগ্‌দ্বার ॥
সরকার ঘোড়াঘাট, কি দিব তাহার ঠাট, নানান রাজার ছিল যাত[১]।
সেই গ্রামে আমার ঘর, আছে লোক বহুতর, ছাওয়াল পণ্ডিত বলি তাত[২]
বসতির নাহি সীমা, দিব কি তার উপমা, অমরা জিনিয়া গ্রামখানি।
যথা তথা রসরঙ্গ, নাহি যাতে প্রীতভঙ্গ, একো জন গুণে মহাগুণী ॥
ইষ্টমিত্র সেই গ্রামে আছে যত একি ছামে নিরবধি কহেন আমারে[৩]।
ইমামের জঙ্গ কথা কতেক শুনিব বেথা, কহ তুমি কেতাব উত্তরে ॥
তাহার আদেশক্রমে অশেষ করিয়া শ্রমে করিলাম পুস্তক প্রচার।
কেতাবে দেখিনু যেহি পয়ারে রচিনু সেহি, দোষ মোর না ধরিব ইহার
পড়িব শুনিব লোক, [কহি] বিনয় পূর্ব্বক, বহির আমার নামখানি।
এই সে আমার আশ, তাথে কেহ উপহাস অবিচারে কর কেহ জানি
পদ সমস্বর যেন রচিলাম আমি তেন, নাহি কোন পুস্তকের পোথা।
নাহি পদ বড় ছোটা, কেবল নিজের কাটা মিত্রাক্ষর দেখহ সর্ব্বথা ॥
শাহা কবীরের সুত সব গুণে যশোভূত, নানা বাণী আইসে জীভাতে।
করিয়া ত পদবন্ধ গাইল করুণাছন্দ বিরচিয়া মহমদ হেয়াতে ॥

১। অর্থাৎ যাত্রা বা মেলা। ২। পাঠ 'তার।' ৩। ঐ 'আমাক।'

শেখ জামাল কয় সেবিয়া ভাইয়ার পাএ, আমা প্রীতে পুস্তক প্রচার।
পিতামাতার বচন শিরে করি বন্দন আরম্ভিল ইমামের পয়ার ॥[১]

হায়াৎ মামুদ রচিত এই চারিখানি কাব্যের সন্ধান পাওয়া যাইতেছে—আম্বিয়াবাণী, মহরমপর্ব্ব (বা জঙ্গনামা), চিত্ত-উত্থান এবং হিতজ্ঞান।

আম্বিয়াবাণীর রচনাকাল ঠিক করিয়া বলা যায় না। কেহ বলেন ইহা ১১০৬ সালে অর্থাৎ ১৬৯৯-১৭০০ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল,[২] আবার কেহ বলেন ১১৬৫ সালে অর্থাৎ ১৭৫৮-৫৯ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।[৩]

মহাভারতের অনুকরণে হায়াৎ মামুদ তাঁহার দ্বিতীয় কাব্যটির নাম রাখেন মহরমপর্ব্ব। এই কাব্য হইতে যে আত্মপরিচয় উদ্ধৃত করা গিয়াছে তাহা হইতে বোঝা যাইবে যে কবির লেখনী নিতান্ত শক্তিহীন ছিল না। মহরম পর্ব্ব ১১৩০ সালে ১৭২৩-২৪ অর্থাৎ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।

শকাব্দা পরগনাতি (?), তাথে বিরচিল পুথি, সন এগার শ ত্রিশ সাল।
মোহামদ হেয়াৎ বলে রসুলের পদতলে, মোকে দয়া কর সর্ব্বকাল ॥[৪]

সংস্কৃত হিতোপদেশের ফারসী অনুবাদ অবলম্বন করিয়া কবি চিত্ত-উত্থান কাব্য রচনা করেন ১১৩৯ সালে অর্থাৎ ১৭৩২-৩৩ খ্রীষ্টাব্দে।

সর্ব্বভেদ নামে পুঁথি শ্রম করি দিবারাতি বিরচিনু ছাড়িয়া আলিস।
কহি সে সালের কথা যাতে বিরচিনু পোথা, সন এগার শও উনচাল্লিশ ॥[৫]

হেতুজ্ঞান কাব্যে মুসলমান মতে তত্ত্বকথা বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যটি ১১৬০ সালে অর্থাৎ ১৭৫৩-৫৪ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়, কবি তখন সুবৃদ্ধ।

বৃদ্ধযোগে ভাবি অতি বিরচিনু এই পুথি
সন এগার শ যাট[৬] সালে।[৭]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুসলমান কবি কর্ত্তৃক মুসলমান শাস্ত্র অথবা লৌকিক আখ্যানাদি লইয়া অনেকগুলি কাব্য রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়। তন্মধ্যে

১। র-সা-প-প ৬, পৃ ২৮। ২। র-সা-প-প ১৭, পৃ ২৯।
৩। ব-সা-প-প ২৩, পৃ ৯৫-১২১। ৪। র-সা-প-প ৬, পৃ ২৮। ৫। ঐ, পৃ ৩৬।
৬। পাঠ 'আট।' ৭। র-সা-প-প ৩, পৃ ১২৯।

যেগুলি যথার্থই এই শতাব্দীতে রচিত বলিয়া মনে করিবার কারণ আছে সেই গুলি সম্বন্ধে নিম্নে আলোচনা করিতেছি।

নসরুল্লা খান রচিত জঙ্গনামা[১] কাব্যে হজরৎ মহম্মদের জামাতা আলির যুদ্ধ বিবরণ বর্ণিত হইয়াছে। কবির পিতা সরিফ মনস্থর, পিতামহ ইশহাক খান, প্রপিতামহ বাবু খান, তস্য পিতা সুজাউদ্দীন খান, তস্য পিতা ইব্রাহিম খান, তস্য পিতা বুর্হানুদ্দীন যাঁহাকে "ধবলমাতঙ্গেশ্বর রোসাঙ্গের মহীপাল" নিজ মুখে প্রশংসা করিয়াছিলেন, তস্য পিতা হামিদুল্লা খান।

ধৈর্য্যবন্ত বীর্য্যবন্ত মর্য্যাদায় নাহি অন্ত, পিতামহ হামিদুল্লা খান।
তান পুত্র কল্পতরু বোরহানদ্দি জগগুরু, রূপান্তর ইউসুফ সমান॥
মহীপাল রোসাঙ্গের ধবল মাতঙ্গেশ্বর, নিজমুখে প্রশংসিলা যারে।
তান পুত্র মহাবীর অস্ত্রেশস্ত্রে রণে স্থির ইব্রাহিম খান নাম ধরে॥
তান পুত্র জ্ঞানবান্ শ্রীশুজাউদ্দীন খান, পুণ্যবন্ত সঙ্গে তান মেলা।
অনেক গ্রামের পতি যাকে কৃপা করি অতি নিজ কন্যা সমর্পিয়া দিলা॥
তান পুত্র রূপবান্ শ্রীযুত [শ্রী]বাবু খান অবিরত ফকীরিতে মন।
ত্যজিয়া সংসার মায়া প্রভু ভাবে চিত্ত দিয়া, করিলেন্ত আগমে গমন॥
আছিলেন পুত্র তান শ্রীইশহাক খান [নাম], সরিয়ৎ খাদেম প্রধান।
তান পুত্র শীল-ধর্ম্ম সৈয়দানী উদরে জন্ম সরিফ মনস্থর গুণবান্॥
তান পুত্র অল্পজ্ঞান হীন নসরুল্লা খান পঞ্চালী রচিল শিশুবুদ্ধি।
শুন সব গুণিগণ কৌতূহল করি মন, ক্ষম মোর দোষ পাও যদি॥[২]

অন্যত্র—

কল্পতরু জগগুরু শাস্ত্রেতে বিজ্ঞান। পিতামহ কাজি ইশহাক গুণবান॥
তান পুত্র সরিফ মনস্থর খোন্দকার। ... ...
রাস্তু দেশ নরপতি নাম ফতে খান। যারে মান্য করি বসাইল বিদ্যমান॥
রোসাঙ্গের নরপতি ভুবনবিখ্যাত। যেবা গেছিলেন দিল্লীশ্বরের সাক্ষাত

১। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৩৬-৩৯. পুঁথি চাটিগ্রাম অঞ্চলের।
২। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৩৮।

গ্রাম ভূমি আপনার অধীন করিয়া। আনিলেক দিল্লীশ্বরব্যূহে যেবা গিয়া ॥
হেন জনে যাহাকে করিয়া আগুয়ান। নমাজ করন্ত সঙ্গে যত মুসলমান ॥
যাহার মধুর স্বর খোতবা শুনন্ত। যাহাকে আলিম সব নিতি প্রশংসেন্ত ॥
তান পুত্র নসরুল্লা আমি হীনজ্ঞান। পাঞ্চালী পয়ারে কহি গুণিগণ স্থান ॥[১]

কবির গুরু ছিলেন পীর হামিতুদ্দীন।

অস্ত্রে শাস্ত্রে জগগুরু দান ধর্ম্মে কল্পতরু পীর হামিদাদ্দি গুণবান্।
আখেরে তরান পার, করিবারে মোরে সার সেই বিনে গতি নাই আন ॥

ভণিতায় কবি গুরুকে বন্দনা করিয়াছেন,

তান পদপাদুকা মস্তকেত বান্ধিয়া।
হীন নছরোল্লা কহে পঞ্চালী রচিয়া ॥

বসিরহাট মহকুমার অন্তর্গত জিরিকপুর নিবাসী ও বালিয়া প্রবাসী ইয়াকুব আলির ভণিতায় জঙ্গনামার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[২] রচনাকাল ১১০১ সাল (?)।

বাঙ্গালা এগারশত এক সাল আর।
মাঘ মাসের জুমা বার সময় ফজর ॥
আল্লার মেহেরে আর নবিজীর তোফেলে।
জঙ্গনামা সায় হৈল ইয়াকুবেতে বলে ॥

চাটিগ্রাম অঞ্চলে প্রাপ্ত একটি অজ্ঞাত নামা পুঁথিতে "গৃহবন্ধন, খঞ্জন-দর্শন, বস্ত্র পরিধান, ভূমিকম্প, গোছল্ বা স্নান, স্বপ্নফল, চন্দ্র-দর্শন, নহছ্ বা অশুভযোগ প্রভৃতি মুসলমানের জ্ঞাতব্য কয়েকটি বিষয় লিপিবদ্ধ আছে। পুঁথির বর্ত্তমান মালিক ইহার নাম 'ছাহাৎ নামা' বলেন।"[৩] পুঁথির পত্র সংখ্যা ১০, প্রথম পৃষ্ঠা নাই। শেষে "শাকে ১৬৭৯ সনে" লেখা আছে। কবির নাম মুজম্মিল, গুরুর নাম পীর শাহ বদরুদ্দীন।

শাহা বদরুদ্দীন পীর কৃপাকুল হরি। নতমুখে সেই বাখান কহিতে না পারি ॥
তাহান আদেশমাল্য মস্তকে ধরিয়া। রচিলেক মুজম্মিলে মনে আকলিয়া ॥

১। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৩৮-৩৯। ২। ব-সা-প-প ২৪, পৃ ১২৩-৪৮।
৩। বা-প্র-পু-বি ১-১, পৃ ১৭৭।

দৌলৎ উজীর বহ্‌রাম রচিত লায়লি-মজনু[১] কাব্যের পুঁথি প্রাচীন না হইলেও কবিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর পরবর্ত্তী বলিয়া বোধ হয় না। ইনিই কি আরাকান রাজামাত্য সতী ময়নামতী-রচয়িতা দৌলৎ কাজী? আত্মপরিচয় অংশে কবি পূর্ব্বপুরুষ হামিদ খানের কেরামতি বর্ণনা করিয়াছেন। হোসেন শাহ ও তাহার মন্ত্রী মহম্মদ খানের কথা থাকায় এই অংশটির কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে।

তাহান নন্দন নাম সবগুণ অনুপাম, পীর শাহা জনুদ সুমতি।
ধর্ম্মবন্ত কলেবর, পাপ তাপ দুঃখহর, দয়াশীল আন নাহিঁ গতি॥
তান সুত গুণসিন্ধু দরিদ্রদুঃখিতবন্ধু মহম্মদ সৈয়দ সুজন।
অবিরত শত শত ধর্ম্মমতি সদারত, প্রভু বিনে আন নাহি মন॥
পীর স্থিরধীরমতি বীর বলবন্ত অতি মহম্মদ সৈয়দ তনয়।
ছিদ্দিক সমান জ্ঞান, হাতিম সমান দান, আছাওদ্দীন দীন দয়াল॥
বঙ্গদেশ মনোহর, তার মধ্যে শোভাকর নগর ফতেয়াবাদ নাম।
আছাওদ্দিন পীর নির্ম্মলশরীর ধীর তথাতে বসতি অনুপাম॥
... ...
মুই পাপী দীনমতি, তুমি বিনে নাহি গতি, এ ভবসাগরে কর পার॥
সর্ব্বলোক নরপতি ভুবনবিখ্যাত অতি আছিল হোসেন শাহা বর।
তান রত্নসিংহাসন অতি মায়া বিলক্ষণ গৌড়েত শোভিত মনোহর॥
প্রধান উজীর তান মহম্মদ খান নাম, তাহান গুণের অন্ত নাহি।
অন্যস্থলে স্থানে স্থানে মস্‌জিদ সুনির্ম্মাণে, পুষ্করণী দিল ঠাঁই ঠাঁই॥
প্রতিদিন মহামতি পিপীলা মক্ষিকা প্রতি সর্ব্বরাত্রি দিলেন খাইবার।
কাক পিক পক্ষী আদি শিব শিবা চতুষ্পদী পাঠাইলা সভান আহার।
অন্ধল আতুর যত পালিলেন্ত অবিরত, দানধর্ম্ম করিলা বিশেষ।
... ... প্রশংসা হইল সর্ব্বদেশ॥
শুনিয়া দানের ধ্বনি ক্রোধ হৈল নৃপমণি, যত ধন লুটায়ে সদায়।
কেমন ধার্ম্মিক সার এক অব্দ বারে বার তাহাকে বুঝিমু পরীক্ষিয়া॥

১। বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ১৪-১৭; পুঁথির লিপিকাল ১১৯১ মঘী সন। পুঁথির পাঠ অত্যন্ত অশুদ্ধ ও অস্পষ্ট।

প্রথম কোপে বাঘের জালে ফেলিল, দেখিলা তারে ব্যাঘ্র দেখি নামাইল মাথা।
দ্বিতীয়ে বান্ধিয়া শিলা সাগরেত পরীক্ষিলা, নামাজ পড়িল সুখে তথা॥
তৃতীয়ে বান্ধিয়া রাগে দিলেন্ত হস্তীর আগে, গজে দেখি সালাম করিলা।
চতুর্থে জোতের[১] ঘরে রাখিলা হামিদ খাঁরে, আনলে দহিয়া পরীক্ষিলা॥
পঞ্চমে খড়্গের ঘাতে পরীক্ষিলা নরনাথে, খড়্গ ভাঙ্গি হৈল খানখান।
ষষ্ঠমে হানিয়া শর পরীক্ষিলা নৃপবর, অঙ্গে না লাগিল এক বাণ॥
সপ্তমে গরল দিলা, মহারাজ পরীক্ষিলা, করিলেন্ত প্রশংসা অধিক।
দেখিয়া জন্মায় সুখ ... ... প্রসাদ করিলা ... ॥
নগর ফতেয়াবাদ, দেখিতে পূরয়ে সাধ, চাটিগ্রাম সুনাম প্রকাশ।
মনোহর মনোরম অমরনগর সম, শতে শতে অনেক নিবাস॥
... ... কর্ণফুলী নদীতট শুভপুরী অতি দীপ্যমান।
চৌদিকে ... উচল বিস্তর সর তাহে শাহা বদর পয়াণ॥
আদেশিল গৌড়েশ্বরে উজির হামিদ খাঁরে, অধিকারী হৈল চাটিগ্রাম।
আত্মরূপ দানধর্ম্ম করিলা পুণ্যের কর্ম্ম, আনন্দে রহিলা সেই ঠাম॥
অনুক্রমে বংশ কত গোঞালেক এই মত, গৌড়ের কুদিন হৈল দূর।
চাটিগ্রাম অধিপতি নানামত মহামতি নৃপতি নিজাম শাহা শূর॥
এক শত ছত্রধারী সভানের অধিকারী ধবল অরুণ গজেশ্বর[২]।
রজনী সময় হৈলে মাণিক্যপ্রদীপ জ্বলে অপরূপ পুরীর অন্তর॥
ঐ যে হামিদ খান আন্ত্যের উজীর তান, তাহান বংশেতে উৎপতি॥
মোবারক খান নাম রূপে গুণে অনুপাম, সদা ধর্ম্মে কর্ম্মে তান মতি।
তান প্রতি মহীপাল খিতাপ অধিক ভাল স্থাপিলেন্ত দৌলৎ উজীর॥
সাধু সৎলোক সঙ্গে জনম বঞ্চিলা রঙ্গে, ধর্ম্মরূপে ত্যজিলা শরীর॥
তান সুত মূঢ় সম, নাম মোর বহ্‌রাম, মহারাজ গৌরব অন্তরে।
পিতাহীন শিশু জানি দয়াধর্ম্ম অনুমানি বাপের খেতাপ দিলা মোরে।

১। অর্থাৎ জতুর। ২। পাঠ 'গড়েশ্বর।'

আছাওদ্দিন বন্ধু, তান পদ জ্ঞানসিন্ধু ... ...
পুস্তক পয়ার সার যেন মুকুতার হার রচিলেন্ত দৌলৎ উজীর ॥[১]

ভণিতা এইরূপ—

আছাওদ্দিন শাহা কল্পতরু সম।
উজীর দৌলতে কহে পুস্তক উত্তম ॥[২]

কিছু কিছু অংশ ব্রজবুলিতে রচিত। মনে হয় কবির কাব্যশক্তি নেহাত হীন ছিল না।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বহু মুসলমান কবি পদাবলী রচনা করিয়াছিলেন। এবিষয়ে মদীয় A History of Brajabuli Literature গ্রন্থের একবিংশ অধ্যায় দ্রষ্টব্য।

ব্রান উল্লা রচিত কেয়ামতনামা গ্রন্থে "সৃষ্টি বিবরণ, মহম্মদের জন্মবৃত্তান্ত, পাপ-পুণ্যের বিচার ইত্যাদি" "বিশদরূপে বর্ণিত" হইয়াছে। "মুসলমান হইয়া হিন্দুব দেবী পূজা দেখিয়া তিনি দুঃখ করিয়া যে চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন, তাহা হিন্দু ও মুসলমান উভয়ের পক্ষে সমভাবে প্রযোজ্য।"[৩] কবির পিতার নাম শেখ মসএদ, গুরু শেখ দিদার মামুদ।

মহাগুণবান্ শেখ দিদার মামুদ। তাহার কৃপায় পাই পরমসম্পদ ॥
সেই সাহেব হয় আমার পীর মুরশিদ। তাহার ঠাঁই হৈয়াছি তালিম মুরিদ ॥
শেখ মসএদ নামে পিত্রি তাহার তনয়। শেখ গিন্দিতে আমার কুরশিকুন (?) হয় ॥
শতকোটী বন্দগী মোর ওস্তাদের পায়ে। অজ্ঞান শরীরে জ্ঞান দিয়াছে মহাশয়ে ॥

ভণিতা এইরূপ—

কহে কবি ব্রান উল্যা শুন ধনিগণ।
মন্দ কর্ম্মেতে ধন নষ্ট না কর কদাচন ॥[৪]

তন তেলাওৎ মুসলমানী মতে যোগশাস্ত্রের নিবন্ধ।[৫] রচয়িতার নাম জানা নাই। পুঁথির লিপিকাল সন ১১৫৬ মঘী অর্থাৎ ১৭৯৪-৯৫ খ্রীষ্টাব্দ। শাহা

১। বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ১৪-১৬। ২। ঐ, পৃ ১৭।
৩। র-সা-প-প ২, পৃ ৯০-৯১। পুঁথির লিপিকাল ১১৫৪। রঙ্গপুর অঞ্চলের পুঁথি।
৪। ঐ, পৃ ৯১। ৫। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৪-১৫।

বদিউদ্দীন রচিত ফাতেমার সুরৎনামা[১] কাব্যের পুঁথির লিপিকাল দেওয়া নাই। ভাষা দেখিয়া মনে হয় নিবন্ধটি অষ্টাদশ শতাব্দীতে লিখিত হওয়া সম্ভব। কাব্যটিতে হজরৎ মহম্মদের কন্যা ফাতিমার রূপগুণ বর্ণনা করা হইয়াছে।

ভণিতা এইরূপ—

হীন শাহা বদিউদ্দীনে কহে হস্ত যোড় করি।
দোষ ক্ষেম সভাগণ হীন জন জানি ॥[২]

পুঁথির শেষে কবি রচিত একটি পদ দেওয়া আছে। পদটি চমৎকার, নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

দেখা দিয়া জুড়াও পরাণ ॥ ধুয়া ॥

অবলা মন্দিরে বসি, প্রাণের নাথ বাজায় বাঁশী, অভাগিনী শুনি বাঁশীর গীত।
বন্ধের বাঁশীর সানে ধৈরজ না মানে প্রাণে, আকুল করিল নারীর চিত ॥
শুনিয়া মোহনবাঁশী হইলুম তোমার দাসী, ভজিলুম তুই শ্যামের চরণে।
না দেখি তোমার জ্যোতি থির নহে মোর মতি, একবার দেখা কর নারীর সনে ॥
দয়ার ঠাকুর তুমি, তোমার ভাবক আমি, তুমি দয়া না করিলে মোরে।
তুমি প্রাণনাথ বিনে আর দয়া করিব কোনে, তুমি বিনে কে আছে সংসারে ॥
তোমার কৃপার ফলে মোহর ভাগ্যের বলে আসিয়াছ অবলামন্দিরে।
এই ঘর আন্ধার করি একদিন যাইবা ছাড়ি, কেনে দেখা না দেও রাধারে ॥
তনুর অন্তরে পশি মনুরা রহিছে বসি, কিরূপে ভজিলে দেখা পাই।
কহন্ত বদিউদ্দীনে, গুরুর আদেশ বিনে দেখিবার আর লক্ষ্য নাই ॥[৩]

মঘী ১২০৩ সনে লিখিত একটি পুঁথিতে শের তনু ভণিতা পাওয়া যাইতেছে।[৪]

রসুলবিজয়[৫] কাব্যের যে খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহাতে জানা যায় কবির নাম জৈনুদ্দীন। ইনি ভূস্বামী ইউসুফ খানের আদেশে কাব্যটি রচনা করেন। ইঁহার গুরু (?) ছিলেন পীর শাহ মহম্মদ।

১। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৬৩-৬৫। পুঁথিটি আরবী অক্ষরে লিখিত। ২। ঐ, পৃ ৬৪। ৩। ঐ, পৃ ৬৫। ৪। বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ৪৯। ৫। বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ১০৬-০৮।

শ্রীযুত ইউসুফ[১] খান রাজ্যেশ্বর গুণবান্ সুচরিত সুবুদ্ধি সুঠান।
রসুলবিজয় বাণী অতি আনন্দিত শুনি মনপ্রীতে বসিলা সভায় ॥[২]

করুণাসাগর পীর গুণের সাগর। অসীম মহিমা পীর ধীর সিন্ধুবর ॥
শাহা মোহাম্মদ পীর রূপে পঞ্চবাণ। অনন্ত কি কহিব অন্ত তাহার বাখান ॥
কমলচরণরেণু শিরেত করিয়া। হীন জৈনুদ্দীন কহে পাঞ্চালি রচিয়া ॥
শ্রীযুত ইউসুফ খান জ্ঞানে গুণবন্ত। রসুলবিজয় বাণী কৌতুকে শুনন্ত ॥[৩]

দানে কর্ণ মানে কুরু জানে শুক্র জ্ঞানে গুরু ধ্যানেত শঙ্কর সম জান।
শান্ত দান্ত গুণবন্ত ধৈর্য্যবন্ত বীর্য্যবন্ত পীর মোহাম্মদ খান নাম॥
তান পদরেণু লইয়া নয়ানে কাজল দিয়া জৈনুদ্দীনে রচিল পয়ার।[৩]

আমীর উদার বাণী শুনি গুণসার। শ্রীযুত ইউসুফ মন আনন্দ অপার ॥
শিশু জৈনুদ্দীন কহে পাঞ্চালী পয়ার। কে মারিতে পারে যারে রাখে করতার ॥[৪]

উপরে উদ্ধৃত ভণিতাংশ হইতে কবির লেখার কিছু পরিচয় পাওয়া যাইবে। প্রাপ্ত অংশে "কাফের-রাজ জয়কুমের সহিত হজরতের যুদ্ধবৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে।"[৩] নামেই প্রকাশ, কাব্যটি নবীবংশজাতীয়।

কতকগুলি বৈষ্ণব পদাবলী ব্যতীত আলী রাজা রচিত তিনখানি গ্রন্থের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে— জ্ঞানসাগর, সিরাজকুলুপ ও ধ্যানমালা। কবির গুরুর নাম শাহা কেয়ামদ্দীন। শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় বলেন যে কবির নিবাস ছিল চাটিগ্রাম জেলায় আনোয়ারা থানার অন্তর্গত ওশখাইল গ্রামে।[৫] কবি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে বিদ্যমান ছিলেন।

জ্ঞানসাগর পুস্তক নাম ধরি। আলী স্থানে রসুলে কহিল কৃপা করি ॥
শাহা কেয়ামদ্দীন গুরু রূপে পঞ্চশর। হীন আলী রাজা কহে রূপের লহর ॥
শাহা কেয়ামদ্দিন গুরু হৃদের কলিকা। আগমেত পূর্ণোদধি নিগমে সারিকা ॥
গুরুর কমলপদে ভজি কায়মনে। ষষ্ঠ ঋত পঞ্চালিকা আলী রাজা ভণে ॥ পৃ ৮২ ॥

১। পাঠ 'ইছপ।' ২। বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ১০৭। ৩। ঐ, পৃ ১০৭-০৮।
৪। জ্ঞানসাগর ভূমিকা, পৃ ২। ৫। ঐ, পৃ ৪১-৪২।

জ্ঞানসাগর[১] বাউল-দরবেশী সাধনতত্ত্ব ঘটিত নিবন্ধ। বক্তা রসুল (মহম্মদ), শ্রোতা আলী। কবির ভাষা খুব সরল, বর্ণনাভঙ্গীও মনোরম। শ্রীকৃষ্ণ (নারায়ণ) রাধার সঙ্গে, রাবণ মন্দোদরীর সঙ্গে, ইন্দ্র শচীর সঙ্গে, ব্রহ্মা সংজ্ঞার[২] সঙ্গে, চন্দ্র রোহিণীর সঙ্গে, সূর্য্য ছায়ার সঙ্গে, ইউসুফ জোলেখার সঙ্গে, আমীর হোসেন জয়নবের সঙ্গে, দাউদ উরিয়ার ভার্য্যার সঙ্গে ইত্যাদি প্রকারে অনেক দেবতা ও নরনারী পিরীতি সাধন করিয়া গিয়াছেন এই কথা বলিয়া আলী রাজা সমর্থনে চমৎকার কথা বলিতেছেন,

নর পরী পশু পক্ষী কীট তরুবর। প্রেমরস বিনু কার নাই মুক্তি বর ॥
করতারে আপনে ঈশ্বর নাম ধরে। ডুবিয়া লুকি ত সেহ প্রেমের সাগরে ॥
সংসারসাগরে পাতি প্রেমরসজাল। জীব সবে মীনরূপে সেবি কতকাল ॥
মায়াজালে ভুলি জীব সমস্ত বাঁধিয়া। সর্ব্ব জগ আছে প্রেমরসেতে ডুবিয়া ॥
প্রথমে বহ্নির সঙ্গে বারির পিরীতি। হইল মাটির প্রেম জলের সঙ্গতি ॥
এ সব প্রেমে যদি মন না ডুবিত। স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল আদি কিছু না জন্মিত ॥
গগনের সঙ্গে হইল স্বর্গের পিরীতি। স্বর্গ সঙ্গে মর্ত্ত্যের পিরীতি আছে অতি ॥
ত্রিভুবনে প্রভুপ্রেম আছএ জড়িত। নরক পাতাল সঙ্গে আছএ পিরীত ॥
মার্ত্তণ্ড চন্দ্রিমা গুরু বৃক্ষ যত ধরি। প্রেম হেতু গগনেত রহিলেক জড়ি ॥
সাগরের সঙ্গে বারি জল সঙ্গে মীন। ইন্দু সঙ্গে যামিনী রবি সঙ্গে দিন ॥
প্রেমেত জগত বন্দী বৃক্ষ বন্দী মূলে। কমলে ভোমর বন্দী মীন বন্দী জলে ॥
পুরুষের মন বন্দী নারীপ্রেমরসে। নারী বিনু পুরুষের অসিদ্ধি মানসে ॥
তন সঙ্গে মন বন্দী প্রেমের কারণ। মন সঙ্গে সমন্বিত রহিছে পবন ॥
পিরীতি জগৎপ্রাণী গোপত বচন। প্রেমমূলে জগতের জীয়ন মরণ ॥
প্রেম বিনু জন্ম নাই রাজ্য ক্রিয়া রস। প্রেম বিনা সিদ্ধি নাহি জগৎমানস[৩] ॥
প্রেম হেতু শিশু রাখে উদরে জননী। প্রেম হেতু বৃক্ষমূল গ্রাসিল মেদিনী ॥

১। মুন্সী শ্রীযুক্ত আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (১৩২৪)। পুঁথিগুলি প্রাচীন নহে।
২। মুদ্রিত পাঠ 'সন্ধ্যা।' ৩। পাঠান্তর 'প্রেম বিনু যোগসিদ্ধি না পূরে মানস।'

ভূমি সঙ্গে ভক্ত মূল বৃক্ষের সকল। মূলে গাছ বৃক্ষ শাখা ডালে ফুল ফল
ফলের অন্তরে রস অতি ভক্ত হইয়া। প্রেম হেতু ফল রস রহিল লুকিয়া ॥[১]
রূপ মূল প্রেম বৃক্ষ বিরহ সে ডাল। দুঃখ ফুল সিদ্ধি ফল রস জগপাল ॥

যোগতত্ত্ব বর্ণনার কিছু উদাহরণ দিতেছি।

ঈশ্বরভজনা জ্ঞান আছে নানামতে। সে সব প্রধান নহে অজপার হস্তে ॥
যাহাকে অজপা কহে সেই জ্ঞান মূল। আর সব জ্ঞান তনু শাখা ডাল তুল ॥
শাহা কেয়ামদ্দীন গুরু সিদ্ধা জ্ঞানবান্। গুরুর কৃপায় মোর আগমে বেড়ান ॥
সাউক পড়ুয়া হস্তে অজপা প্রধান। সকল জ্ঞানের রাজা অজপার জ্ঞান ॥
তিন নাম হস্তে চলে অজপার কাম। তিন হস্তে মূল হএ হংস সে উপাম ॥[২]
তন মধ্যে সরোবর ত্রিবেণীর[৩] মাঠ। ত্রিবেণীর তিন নাম পূরে ইন্দ্র নাট ॥
ত্রয় শব্দ ভঙ্গি এক হংস মহারাজ। পূরক রেচক হএ ত্রিবেণীর মাঝ ॥
কায়া মনে সমন্বিত গুরুর চরণে। আগম পাঞ্চালী রচি আলী রাজা[৪] ভণে ॥
পৃ ৫৬-৫৭ ॥

পওৎ[৫] ধর্ম্মসম্বন্ধীয় নিবন্ধ। ইহাতেও কবি স্বীয় গুরুর নাম ভণিতায় এবং অন্যত্র করিয়াছেন।

সহরিষে ভজি শাহা পীরের চরণ। যাহার প্রসাদে পাইলাম ভাবের কথন ॥
ত্রিভুবনে আউলিয়া ত গুরু মহাধন। শিশুবুদ্ধি মোহর করিছে স্থির মন ॥
শ্রীযুক্ত কেয়ামদ্দীন আলিম ওলমা। অনন্ত অপার সেই পীরের মহিমা ॥

ধ্যানমালা[৬] সঙ্গীতবিষয়ক গ্রন্থ। ইহাতে আলী রাজার নিজের এবং অন্য কবির রচিত অনেকগুলি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। আলী রাজা রচিত বৈষ্ণব পদগুলিতে বিরহকাতরতার সুন্দর ব্যঞ্জনা রহিয়াছে। একটি পদ নিম্নে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

সই না লো হে আমার দুঃখসাক্ষী পীতাম্বর,
সর্ব্ব জগৎ দেখি ধান্ধা ॥

১। পাঠান্তর 'প্রেম হেতু ফলে রস রহিল জড়িআ ॥'
২। পাঠান্তর 'তিন হস্তে এক হংস নাম সে উপাম ॥' ৩। পাঠ 'ত্রিপিনীর।'
৪। পাঠান্তর 'কানু সাহা।' ৫। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৭৬-৭৭। ৬। ঐ, পৃ ৭৭-৭৮।

তাই চতুর্ভুজ বিনে আন যে না মানে মনে
সে রাঙ্গা চরণে প্রাণী বান্ধা ॥

বিষ লাগে বসন্তের বাও।
নগরে বেড়াও তুমি, কুলবতী বধ্ আমি,
অবলাকে দেখা দিয়া যাও ॥

রহিতে না দিলা সুখে।
আলী রাজা গাহে, কালা সহন না যায় জ্বালা,
বিষানল দিলা মোর বুকে ॥[১]

ফক্রনামা নামক ধর্ম্মতত্ত্ব সম্বন্ধীয় নিবন্ধের রচয়িতা শের বাজ। এই কাব্যের একটি খণ্ডিত অনুলিপি ১১৩৮ (মঘী ?) সালে লিখিত হইয়াছিল।[২] এই শের বাজ কিনা জানি না, এক শের বাজ রচিত মল্লিকার হাজার সওয়াল নামক কাব্যের একাধিক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।[৩] কবি ভণিতায় সৈয়দ বাজি, হাসন সরিফ ও বদিউদ্দীনের নাম করিয়াছেন।

সৈ[য়]দ বাজি পদেত মাগিএ পরিহার।
ঘরে ঘরে প্রণামিএ পদেত তাহার ॥

পদাবলী করিয়া যে করিমু রচন।
হাজার প্রণাম করি মীরের চরণ ॥

হাসন সরিফ নাম সেই গুরু অনুপাম,
তান পদ শিরেত বন্দিয়া।

হীন শের বাজে বোলে সভার চরণ। যে পড়ে যে শুনে হয় পাপবিমোচন ॥
বদিউদ্দীন পদে সহস্র প্রণাম। সমাপ্ত হইল পঞ্চালিকা অনুপাম ॥

কাহিনীটি এই— রুমের রাজকন্যা মল্লিকা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন, যে তাঁহার

১। জ্ঞানসাগর ভূমিকা, পৃ ৫।
২। বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ৬৪।
৩। ঐ ১-১, পৃ ১৯০-৯১। একখানির লিপিকাল সন ১১৬০ মঘী।

হাজার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতে পারিবে তাহাকেই তিনি বিবাহ করিবেন। বহু বহু রাজপুত্র আসে, কেহই সফলকাম হয় না। অবশেষে তুর্ক দেশ হইতে আবদুল হালিম গদা নামক এক ফকীর সেই হাজার প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিয়া রাজনন্দিনী এবং রুমরাজ্য লাভ করেন।

এই কাহিনী লইয়া আর এক কবি কাব্য লিখিয়াছিলেন।[১] তাঁহার নাম শেখ সাদী, ইনি বাঙ্গালী শেখ সাদী। কবির ভণিতা এইরূপ—

সএক সাদিএ কএ মোহম্মদ বিনে।
মুই গোনাগর নিস্তার না দেখি নয়ানে॥

ত্রিপুরাব্দ ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় ও তৃতীয় দশকে লিখিত কয়েকটি মুসলমানী পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, এগুলি মূলে অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা হওয়া অসম্ভব নহে।[২]

ক্বচিৎ হিন্দু কবিও মুসলমানী বিষয়ে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। এইজাতীয় একখানি কাব্যের রচয়িতা হইতেছে শ্রীহট্ট অঞ্চলের "মালী" ধর্ম্মদাস। কাব্যটির নাম হুসেনপর্ব্ব।[৩]

১। বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ৯০-৯১, পুঁথিতে লিপিকাল নাই, তবে প্রাচীন বলিয়া অনুমান হয়।
২। ঐ, পৃ ৫৭-৫৮, ৫৮-৫৯, ৫৯-৬০। ৩। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত চতুর্থ খণ্ড, পৃ ১২০।

ত্রিপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

শৈব সিদ্ধা মাহাত্ম্য ও গোবিন্দচন্দ্রের গীত

শৈব যোগীদিগের লিখিত কয়েকটি সাধনঘটিত পদ পাওয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে। মীননাথ গোরক্ষনাথ হাড়িপা ও কানুপা এই চারি সিদ্ধার মাহাত্ম্যসূচক অলৌকিক কাহিনী বা গালগল্প বাঙ্গালা দেশে বহুকাল হইতেই প্রচলিত আছে। অবশ্য যাহারা বলেন যে বৃন্দাবনদাস "যোগীপাল মহীপাল ভোগীপালের গীত" বলিতে এই কাহিনীগুলিকেই উল্লেখ করিয়াছেন, তাঁহারা ভ্রান্ত। যোগীপাল বা ভোগীপাল কোন রকমেই 'গোপীচাঁদ' রূপে পরিণত হইতে পারে না। আর যাঁহারা বলেন যে বর্ত্তমানকালে প্রচলিত গোপীচাঁদের পাঁচালী অথবা মুদ্রিত ময়নামতীর গান ইত্যাদি পুস্তক মুসলমান আমলের পূর্ব্বে প্রথমে রচিত হইয়াছিল তাঁহারা আরও ভ্রান্ত, কেননা এতদ্বিষয়ক কোন পুঁথির তারিখই খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর চতুর্থ পাদের উর্দ্ধে নহে এবং এই কাহিনীর প্রাচীনতম উল্লেখ যে পুস্তকে পাই তাহাও অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের রচনা। তবে কাহিনীগুলি যে প্রাচীন তাহাতে সন্দেহ নাই। এই চারি সিদ্ধা বাঙ্গালা দেশে শিবের অবতাররূপে গৃহীত হইতেন, তাঁহাদের মহিমা বহুপূর্ব্ব হইতেই প্রখ্যাত হইয়াছিল।

চারি সিদ্ধার মাহাত্ম্যপাঁচালী দুই ভাগে ভাগ করা যায়, (১) মীননাথের (নামান্তর মৎস্যেন্দ্রনাথ) কাহিনী এবং (২) হাড়িপা ও গোবিন্দচন্দ্র বা গোঙ্গীচন্দ বা গোপীচাঁদের কাহিনী। মীননাথের কাহিনীর বিষয়বস্তু এই[১]—

আদ্য ও আদ্যা কর্ত্তৃক দেবাদি সৃষ্ট হইল, তাহার পর চারি সিদ্ধার উৎপত্তি হইল। তাহার পর এক কন্যা উৎপন্ন হইল, নাম গৌরী। আদ্যের আদেশে শিব গৌরীকে বিবাহ করিয়া পৃথিবীতে চলিয়া আসিলেন। এদিকে চারি সিদ্ধা

১। ফয়জুল্লা ও শ্যামদাস সেনের গোরক্ষবিজয় বা মীনচেতন অবলম্বনে।

বায়ুমাত্র ভক্ষণ করিয়া যোগাভ্যাসে রত হইলেন। গোরক্ষনাথ মীননাথের এবং কানফা (অর্থাৎ কানপা, কানুপা বা কৃষ্ণপাদ) হাড়িপার (পূর্ব্ববঙ্গের পুঁথিতে 'হাড়িফা,' নামান্তর জালন্ধরিপাদ) ভৃত্যরূপে পরিচর্য্যা করিতে লাগিলেন। মীননাথ এবং হাড়িপা শিবের পরিকররূপে রহিয়া গেলেন।

শিবের দক্ষিণ বামে হাড়িফা মিনাই।
পৃষ্ঠযোগে গৌরী আছে জগতের আই ॥

একদিন গৌরী শিবকে হাড়ের মালা পরিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। তাহাতে শিব বলিলেন যে গৌরী সাতবার মরিয়াছিলেন এবং প্রত্যেকবার মরিবার পর একটি করিয়া হাড়রূপে পরিণত হইয়াছিলেন। সেই স্মৃতি বহন করিয়া শিব হাড় পরিয়া থাকেন। তখন গৌরী বলিলেন,

তুহ্মি কেনে তর গোসাঞি আহ্মি কেনে মরি।
হেন তত্ত্ব কহ দেব যুগে যুগে তরি ॥

তাহাতে শিব বলিলেন, এ সকল গুহ্য কথা এখানে বলা সঙ্গত হইবে না, ক্ষীরোদ সাগরে চল, সেখানে টঙ্গের উপর বসিয়া তত্ত্বালোচনা করা যাইবে। দুজনে ক্ষীরোদ সাগরে গিয়া টঙ্গে বসিয়া তত্ত্বালোচনা করিতে লাগিলেন, এদিকে মীননাথ মৎস্যরূপ ধরিয়া টঙ্গের নীচে থাকিয়া শুনিতে লাগিলেন। মহাদেব যখন মহাজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞান অর্থাৎ পরমতত্ত্বসঙ্কেত বলিতেছিলেন তখন দেবীর নিদ্রাবেশ হইতেছিল। মীননাথ সেই মহাজ্ঞান শুনিয়া লইলেন এবং দেবী ঘুমাইয়াছেন ইহা শিব জানিতে না পারেন এই জন্য দেবীর হইয়া "হুঁ" দিলেন। তাহাতে দেবীর নিদ্রাবেশ কাটিয়া গেল। দেবী বলিলেন, কই আমি তো মহাজ্ঞান শুনিলাম না। শিব তখন ভাবিলেন, তবে "হুঁ" করিল কে? তখন টঙ্গের নীচে মীনরূপী মীননাথকে দেখিতে পাইয়া তাহাকে অভিশাপ দিলেন, তুমি এক সময়ে মহাজ্ঞান বিস্মৃত হইবে।

আদিগুরু শিব কৈলাস পর্ব্বতে চলিয়া গেলেন এবং তথায় গৃহবাস করিতে লাগিলেন। চারি সিদ্ধা গৃহবাসহীন হইয়া যোগপথে বিচরণ করিতে লাগিলেন।

পূর্ব্বদেশে গেলেন হাড়িপা, দক্ষিণে কানুপা, পশ্চিমে গোরক্ষনাথ এবং উত্তরে মীননাথ। এদিকে গৌরী শিবকে জপাইতে লাগিলেন যাহাতে চারি সিদ্ধা বিবাহ করিয়া গৃহবাস করে, কারণ গুরু শিব যখন গৌরী আর গঙ্গা এই দুই স্ত্রী গ্রহণ করিয়াছেন তখন তাঁহার শিষ্যেরা সৃষ্টিকার্য্যের জন্য পত্নী গ্রহণ করিবে না কেন? মহাদেব বলিলেন, তাহারা স্ত্রীপরিগ্রহ করিবে না, কেন না তাহাদের অন্তরে কামাদি রিপু একেবারেই নাই। গৌরী বলিলেন, মনুষ্যদেহে কাম একেবারে নাই তাহা হইতেই পারে না, তুমি আমাকে আজ্ঞা দাও আমি উহাদিগকে কটাক্ষমাত্রে মুগ্ধ করি। দেবীর বাক্যে স্বীকৃত হইয়া মহাদেব তাঁহার সিদ্ধ শিষ্যদিগকে ধ্যান-যোগে আহ্বান করিলেন। তাঁহারা আসিয়া উপবেশন করিলেন। ভুবনমোহিনী-রূপ ধরিয়া গৌরী তখন তাঁহাদিগকে অন্ন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। দেবীর রূপে চারি সিদ্ধাই মুগ্ধ হইলেন। মীননাথ মনে মনে কল্পনা করিলেন, এমন সুন্দরী নারী পাইলে তাহার সঙ্গে রঙ্গকৌতুকে রাত্রি কাটাই। দেবী মীননাথের মনোভাব জানিয়া তাঁহাকে শাপ দিলেন, তুমি কদলীর দেশে গিয়া রাজা হও এবং ষোল শত কদলী (নারী) লইয়া বিলাস কর। হাড়িপা মনে করিলেন, এমন সুন্দরী আমি যদি পাই তবে তাহার নিকটে থাকিয়া হাড়ির কাজ করি। ইহাতে দেবী শাপ দিলেন,

> হাড়িরূপ ধরি যাও ময়নামতী ঘর ॥
> হাতে ঝাড়ু লও তুম্হি কাঁধেতে কোদাল।

কানুপার বাসনা হইল,

> এরূপ সুন্দরী যদি থাকে মোর ঘর ॥
> তার সঙ্গে কেলি করি যদি মরি যাই।
> তবেহ তাহান সঙ্গে আনন্দে খেলাই ॥

তাঁহাকে দেবী শাপ দিলেন,

> তুরমানে চলি যাও ডাহুকা হইয়া ॥

গাভুর (শিশুপা, হাড়িপার পুত্র বা শিষ্য) সিদ্ধা ইচ্ছা করিলেন, এমন কামিনী লাভ করিতে হাত পা কাটা গেলেও আমি নিজেকে শালিবাহন-পুত্রবৎ সৌভাগ্যবান্ জ্ঞান করিব।

এমন কামিনী যদি ভজে মোর ঠাই ॥
তার লাগি যদি যাএ হাত পাও কাটা।
তথাপিহ হই আহ্মি শালবানের বেটা ॥

দেবী তাঁহাকে শাপ দিলেন,

বর পাইলা চল তুহ্মি সৎমাএর পাশ ॥
সৎমাএ ভজিব তোরে দেখিয়া জোয়ান।
তাহার কারণে তোহ্মি পাইবা অপমান ॥[1]

গোরক্ষনাথের মনে আদৌ কামভাব জাগিল না। গোরক্ষনাথ ভাবিলেন,

এরূপ জননী যদি থাকএ আহ্মার ॥
তাহান কোলেত বসি সুখে দুগ্ধ খাই।
এমন জননী আহ্মি কভো নাহি পাই ॥

গোরক্ষের মনোভাব জানিয়া দেবী তাঁহাকে বর দিলেন বটে তবে আরও ছলনা করিতে মনস্থ করিলেন।

বর পাইয়া মীননাথ কদলীর দেশে চলিয়া গেলেন, হাড়িপা ময়নামতীর পুরীতে হাড়ি হইয়া রহিলেন, গাভুর সিদ্ধা (শিশুপা) নিজ স্থানে চলিয়া গেলেন। মীননাথ কদলীর দেশে গিয়া নারীর মোহে আত্মজ্ঞান বিস্মৃত হইয়া সংসারধর্ম্ম করিতে লাগিলেন।

১। দুর্ল্লভ মল্লিক-রচিত গোবিন্দচন্দ্রগীতে আছে—

পাটীকানগরে রাজা গোবিন্দচন্দ্র ভূপ। জালন্ধরি হাড়িপা হইল হাড়িরূপ ॥
শিশুপা কুমার এক সঙ্গে করি নিল। নগরবাহিরে হাড়ি আশ্রম করিল ॥
... ...
গুপ্তবেশে হাড়িপা আছয়ে তথায়। শিশুপা কুমার তার পশ্চাতে গোড়ায় ॥
বাহড় বাহড় তারে বলে জালন্ধরি। এখনি আসিব পুত্র তোর বরাবরি ॥ পৃ ৪৪-৪৬ ॥

ময়নাবতীই কি তাহা হইলে শিশুপার সৎমা হইল? হাড়িপার সহিত ময়নামতীর অবৈধ সম্পর্কের কথা গোপীচাঁদের পাঁচালীর অনেকগুলিতেই ইঙ্গিত করা হইয়াছে।

এদিকে গোরক্ষনাথ বকুলবৃক্ষের তলায় ধ্যানে বসিয়া রহিয়াছেন। তাঁহাকে যোগভ্রষ্ট করিবার জন্য দেবী লোভাইতে আসিলেন। তিনি গোরক্ষনাথের দৃষ্টির বাহিরে বিবস্ত্রা হইয়া পথে শয়ন করিয়া রহিলেন। গোরক্ষনাথ আগাইয়া আসিয়া এই দৃশ্য দেখিলেন এবং উঠিয়া গিয়া বৃক্ষপত্র (মতান্তরে বিল্বপত্র) দিয়া দেবীকে সবস্ত্রা করিলেন। দেবী লজ্জিত হইলেন। তবুও গোরক্ষনাথকে ছাড়িবেন না। দেবী মাছি হইয়া গোরক্ষের উদরে পীড়া জন্মাইলেন। গোরক্ষনাথ দেবীর ছলনা বুঝিতে পারিয়া তাঁহার সকল ইন্দ্রিয়দ্বার রুদ্ধ করিলেন, গোরক্ষের উদরে অবরুদ্ধ হইয়া দেবী ছটফট করিতে লাগিলেন। শেষে দেবীর কাকুতিমিনতিতে গোরক্ষ হাসিয়া তাঁহাকে পায়ুপথে বাহির করিয়া দিলেন। দেবী কাঁকাল ভাঙ্গিয়া পথে পড়িয়া রহিলেন, সেখানে রাক্ষসীরূপে নরবলি গ্রহণ করিতে লাগিলেন। এদিকে শিব গৌরীকে দেখিতে না পাইয়া খুঁজিতে খুঁজিতে গোরক্ষের কাছে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। গোরক্ষ বলিলেন,

ভাঙ্গ ধুতুরা খাও [তুমি] কি বলিব তোরে।
কথাত হারাইছ নারী ধর আসি মোরে ॥

পরে শিব ও গোরক্ষ দেবীকে কাঁকাল ভাঙ্গিয়া রাক্ষসী বেশে পড়িয়া থাকিতে দেখিলেন। সেই দেশে (রাঢ়ে?[১]) গোরক্ষ এক দেবী (কালী?) মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করিয়া রাখিয়া দেবীকে শিবের সহিত কৈলাসে পাঠাইয়া দিলেন।

দেবী গোরক্ষকে যে বর দিয়াছেন তাহা সফল হওয়া উচিত এই ভাবিয়া শিব স্বামিহেতু তপস্যাপরায়ণা এক কন্যাকে গোরক্ষের পত্নীত্ববর প্রদান করিলেন। কন্যা গোরক্ষকে বিবাহ করিয়া পতিসহ গৃহে চলিয়া গেলেন। গৃহে প্রবেশ করিয়া

১। শ্যামদাস সেনের মীনচেতনে আছে—

সেই সে গোরক্ষ তবে নিবন্ধ করিল।
কালী বলি এক মূর্ত্তি রাড়াত রাখিল ॥ পৃ ৭ ॥

গোরক্ষবিজয়ে এই ছত্রটি নাই, তৎস্থলে আছে—

তবে নাথে সেই দেশে নির্ব্বন্ধ করিল।
বৎসরেত একবার পুজিতে বলিল ॥ পৃ ৩৪ ॥

গোরক্ষনাথ দুগ্ধপোষ্য শিশুরূপ ধারণ করিলেন। কন্যা বিস্মিত ও দুঃখিত হইয়া কাঁদিতে লাগিল।

যতি সতী গোর্খনাথ জ্ঞানে কৈল ভর। ছয় মাসের শিশু হইল মন্দির ভিতর॥
দুগ্ধ খাইবার চাহে কান্দে ওয়া ওয়া। তা দেখিয়া রাজকন্যা হইল আচাভুয়া॥
ভাল স্বামী পাইল দুগ্ধ খাইবার চাহে। শুনি কি বলিব মোরে বাপ আর মাএ॥
হাসিব সকল লোক কি করিলুম কাজ। বর না পাইলুম মুই পাইলুম বড় লাজ॥

শেষে ভাবিয়া গোরক্ষনাথের মায়া বলিয়া বুঝিতে পারিয়া তাঁহার নিকট মিনতি করিতে লাগিল। গোরক্ষনাথ উত্তরে বলিলেন,

তোহ্মারে ভাণ্ডিল হর কপট করিয়া। আহ্মি নহি স্ত্রী পুরুষ তোহ্মারে বর দিয়া॥[১]
স্ত্রী পুরুষ নহি আহ্মি নাহি বীর্য্য বল। শুখুনা যে কাষ্ঠ মোর শরীর সকল॥
গন্ধহীন পুষ্প আহ্মি মান্দারের ফুল। শরীরেত রস নাহি কাঠা সমতুল॥

শেষে গোরক্ষনাথ তাঁহার পত্নীকে পুত্রলাভ হইবে এই বর দিয়া তাঁহার কৌপীন ধুইয়া পান করিতে বলিলেন।

অমর পাইবা পুত্র জানিয় নিশ্চয়। মোহর কাছটি জান সর্ব্বসিধা হয়॥
এহি কর্পটি পাখালি কর জল পান। সিদ্ধা পুত্র জন্মিব দেখিবা বিদ্যমান॥

গোরক্ষের বচন শিরোধার্য্য করিয়া কন্যা "কর্পটি পাখালি পানি খাইলেক গিয়া।" ফলে গর্ভধারণ ও দশদণ্ডের মধ্যে পুত্রপ্রসব। পুত্রকে মন্ত্র দিয়া ও কর্পটিনাথ নাম রাখিয়া গোরক্ষ বিজয়ানগরে বকুলতলায় চলিয়া গেলেন।

গোরক্ষ বকুলতলায় বসিয়া আছেন এমন সময় আকাশ পথে যাইতে যাইতে কানুপা তাঁহাকে দেখিতে পাইলেন। গোরক্ষও ছায়া দেখিয়া মুখ তুলিলেন ও আকাশ পথে কানুপা যাইতেছে দেখিয়া ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহার একপাটি জুতা ছুঁড়িয়া দিলেন তাঁহাকে বাঁধিয়া আনিতে।

এমত আছএ তবে সিদ্ধার ভিতর। আহ্মারে না করে মান কিসের অন্তর॥
মনেত ভাবিয়া তবে গোর্খেত কহিল। বান্ধিয়া আনিতে তারে পানাক আদেশিল॥
কানফারে মূর্খ গোর্খে বোলিলেক রোষে। মোর পরে আসন যাএ কেমত সাহসে॥

১। 'কহিব সকল কথা না করিবু মায়া॥' শ্যামদাস সেনের মীনচেতন।

কানুপা বলিল, তুমি বড় সিদ্ধা বটে, কিন্তু তোমার গুরুর খবর রাখ কি ? তোমার গুরু যে ওদিকে কদলীর "ভোলে" পড়িয়াছে। আমার গুরুর সন্ধানে ঘুরিতে ঘুরিতে মীননাথকে দেখিলাম, তিনি শক্তিহীন হইয়া আহারার্থী বকের মত বসিয়া আছেন, তিনি নারীর মোহে পড়িয়া জরাজীর্ণ ও মৃত্যুগ্রস্ত হইয়া রহিয়াছেন (মতান্তর ভেড়া হইয়া রহিয়াছেন)। যমের দপ্তরে গিয়া দেখিলাম যে তাঁহার আয়ু আর তিনদিন মাত্র অবশিষ্ট আছে। তোমার যদি কলঙ্কের ভয় কিছুমাত্র থাকে তবে তুমি শীঘ্র গিয়া গুরুর প্রাণ রক্ষা কর।

দেখিলুম মীননাথ বল শক্তি নাই। বঁগুলাটি ঝুরে যেন আহার ধ্যায়াই ॥
দশন গলিত তার আয়ু হইছে শেষ কামিনীর কোলে মীন তেজে নিজ ভেস ॥
.. ..
তাহার পশ্চাতে গেলুম যমের ভুবন। তথাতে দেখিলুম গিয়া তাহার লিখন ॥
তিন দিন আয়ু তার আছএ বিশেষ। নিবারে দূতেরে যম করিছে আদেশ ॥
যদি সে আছএ গোর্থ কলঙ্কের ডর। ঝাটে গিয়া তোহ্মার গুরুর প্রাণিরক্ষা কর ॥

গোরক্ষনাথ বলিলেন, তুমি আমাকে দোষ দিতেছ, কিন্তু তুমি নিজের গুরুর খোজ রাখ না। মেহারকুলের মহাজ্ঞানশীলা রাণী ময়নামতীর পুত্র গোপীচাঁদ তোমার গুরুকে মাটীর নীচে ঘর করিয়া তাহাতে বন্দী করিয়া রাখিয়াছে।

এইরূপে পরস্পরের কাছে পরস্পর গুরুর সংবাদ পাইয়া দুইজনে স্ব স্ব গুরুর অন্বেষণে চলিলেন। গোরক্ষনাথ প্রথমে যমপুরী গিয়া গুরুর দপ্তর দেখিলেন এবং সমস্ত লেখা মুছিয়া দিয়া বকুলতলায় ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর লঙ্গ মহালঙ্গ এই দুই শিষ্য লইয়া ব্রাহ্মণবেশে গুরুর উদ্ধারে কদলীর দেশে চলিলেন। সেখানে সকলে ব্রাহ্মণ দেখিয়া গোরক্ষকে প্রণাম করিতে লাগিল, গোরক্ষকেও অগত্যা তাহাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে হইল। উলটা ফল দেখিয়া গোরক্ষ ফিরিয়া আসিলেন।

যতিনাথে বোলে লঙ্গ উলটিয়া যাই। ব্রাহ্মণরূপে গুরুর দেখা নাহি পাই ॥
ব্রাহ্মণ দেখিলে লোকে করে নমস্কার। আশীর্ব্বাদ না করিলে বলিবেক ছার ॥
সিদ্ধার বচন ব্যর্থ নাহিক নিশ্চয়। আশীর্ব্বাদ কৈলে সভে হওন্ত অক্ষয় ॥

ভাবিয়া চিন্তিয়া গোরক্ষনাথ যোগীর বেশ ধারণ করিয়া গুরু-উদ্ধার কার্য্যে পুনরায় চলিলেন। শূন্যপথে গিয়া কদলীনগরে পৌঁছিয়া সেখানকার ঐশ্বর্য্য দেখিয়া গোরক্ষ বিস্মিত হইলেন। তিনি এক পুকুরের পাড়ে বকুলগাছের তলায় বসিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে সেই পুকুরে জল লইতে আসিয়া এক কদলী নারী গোরক্ষের রূপে মুগ্ধ হইল। তাহার নিকট গোরক্ষ জানিতে পারিলেন যে মীননাথ মঙ্গলা ও কমলা এই দুই পাটরাণী এবং ষোলশত সেবিকা পাইয়াছেন। সেখানে কোন যোগী প্রবেশ করিলে লাঞ্ছিত ও প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত হয়।

মঙ্গলা কমলা দুই রাজপাটেশ্বরী। তাহার সেবক জান ষোল শত নারী॥
বুড়া যোগী পাইলে চোপাড়ে ভাঙ্গে গাল। গাভুর যোগী পাইলে তুলিয়া দেন শাল॥
অধব(য়)স যোগী পাইলে মধ্যদেশে কাটে। পোলা যোগী পাইলে পাটাত তুলি বাটে॥

কদলী বলিল যে নর্ত্তকী ভিন্ন কেহ মীননাথের সাক্ষাৎ পায় না। এই কথায় গোরক্ষনাথ নর্ত্তকী সাজিয়া গুরুর নিকটে উপস্থিত হইলেন। নর্ত্তকীর রূপে ও সজ্জায় মীননাথের দ্বারীর চিত্ত আকৃষ্ট হইল। রাণীদ্বয়কে নবাগত নর্ত্তকীর কথা জানাইতে তাহারা নর্ত্তকীকে মীননাথের সভায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করিল, কারণ মীননাথের চিত্ত উহার উপর পড়িতে পারে। গোরক্ষনাথ দ্বারীকে অনেক প্রলোভন দেখাইলেন, কিন্তু দ্বারী তাঁহাকে কিছুতেই রাজসভায় প্রবেশ করিতে দিল না। তখন ক্রুদ্ধ হইয়া গোরক্ষনাথ সভাদ্বারে মাদলের ধ্বনি করিলেন। মাদলের ধ্বনি শুনিয়া উচ্চকিত হইয়া মীননাথ নর্ত্তকীকে তাঁহার সমক্ষে আনিতে বলিলেন। গোরক্ষনাথ আসিয়া সভায় নৃত্যগীত আরম্ভ করিলেন। মাদলের সঙ্কেতে গোরক্ষনাথ মীননাথকে পূর্ব্বকথা স্মরণ করাইতে ও আত্মজ্ঞান দিতে চেষ্টা করিলেন। ভোগসুখে আসক্ত মীননাথ কেবলই আত্মপক্ষ সমর্থন করিতে লাগিলেন। গোরক্ষ তীব্রভাষায় তত্ত্ব উপদেশ দিতে লাগিলেন, শেষে গুরুর কর্ণে মহাজ্ঞান শুনাইলেন। তখন মীননাথের চৈতন্য হইল। এদিকে মহাদেবীদ্বয় পুত্র বিন্দুনাথকে ক্রোড়ে করিয়া মিনতি করিতে লাগিল, তাহাতে মীননাথের মন একটু আবার যেন বিচলিত হইল।

গোরক্ষনাথ পুনরায় তত্ত্ব উপদেশ দিলেন, আর ভাবিলেন যে কদলীর মোহ দূর না করিলে মীননাথের সম্পূর্ণ চৈতন্য হইবে না। ইত্যবসরে বিন্দুনাথকে স্নান করাইয়া আনিবার জন্য গোরক্ষকে মীননাথ আদেশ করিলেন। সরোবরে গিয়া গোরক্ষ বিন্দুনাথকে আছাড়িয়া মারিয়া ফেলিলেন, তাহাতে মীননাথ ও কদলীরা শোকে মুহ্যমান হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। গোরক্ষনাথ তখন তত্ত্বজ্ঞান উপদেশ করিয়া তুড়ি মারিয়া বিন্দুনাথকে বাঁচাইয়া দিলেন। ইহাতে মীননাথের চেতনা হইল। এদিকে কদলীরা মায়াধর রাক্ষস মনে করিয়া গোরক্ষকে মারিয়া ফেলিবার উপায় চিন্তা করিতে লাগিল। তাহাদের মনোভাব জানিয়া গোরক্ষনাথ তাহাদিগকে শাপ দিলেন, সব কদলী বাদুড় হইয়া উড়িয়া গেল। মীননাথ গোরক্ষনাথ ও বিন্দুনাথ স্বস্থান বিজয়নগরে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন।

দুর্ল্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্রের গীত অনুসারে হাড়িপা ও গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনীর বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

জালন্ধরিপাদ বা হাড়িপা শিবের শাপে হাড়ি হইয়া 'পাটীকাভুবনে' (অথবা 'মেহারকুলে') রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও তাঁহার সিদ্ধা মাতা ময়নামতীর আবাসে নীচকর্ম্ম করিতে লাগিলেন। ময়নামতী একদিন অলক্ষ্যে হাড়িপার মাহাত্ম্য দেখিতে পাইয়া জানিলেন যে ইনি সামান্য হাড়ি নহেন, ইনি সিদ্ধাচার্য্য হাড়িপা। তখন রাণীমাতা সঙ্কল্প করিলেন যে পুত্র গোবিন্দচন্দ্রকে ইঁহার শিষ্য করাইতে হইবে। এই মনে করিয়া রাণীমাতা গোবিন্দচন্দ্রের নিকট গিয়া উপস্থিত হইলেন। গোবিন্দচন্দ্র তখন উদুনা (অদুনা) পুদুনা (পদুনা) ইত্যাদি ছয়কুড়ি রাণী লইয়া বিলাস করিতেছিলেন। ময়নামতী পুত্রকে আড়ালে ডাকিয়া বলিলেন, তোমাকে যোগী হইতে হইবে। রাজা বলিলেন, সিদ্ধ গুরু পাইব কোথায়? রাণীমাতা উত্তর করিলেন, আমাদের আবাসে যে হাড়ি আছে তিনি একজন সিদ্ধাচার্য্য, তাঁহাকে গুরু করিতে হইবে। রাজার মাথায় আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়িল, তিনি বলিলেন,

পাইসালে খাটে হাড়ি না করে সিনান।
তার ঠাঞি কেমনে আছয়ে ব্রহ্মজ্ঞান॥

আমি রাজা গোবিন্দচন্দ্র সর্ব্বলোকে জানে।
কেমনে ধরিতে বল হাড়ির চরণে ॥

ময়নামতী বলিলেন, "হাড়ি নহে হাড়িপা বাউল ব্রহ্মজ্ঞানী।" রাজা তখন বলিলেন, তোমার মনে যদি এতই ছিল তবে আমার বিবাহ দিলে কেন? উত্তরে ময়নামতী বলিলেন, তিনি যখন পিতৃগৃহে ছিলেন তখন মীননাথ ও তাঁহার ষোলশত যোগী শিষ্যকে ভিক্ষা দিয়া সন্তুষ্ট করিয়াছিলেন, ফলে মীননাথ তাঁহাকে মহাজ্ঞান দিয়া চারি যুগে অমর করিয়া দেন। এই কথা শুনিয়া গোবিন্দচন্দ্র বলিলেন, তাহা হইলে তুমি থাকিতে আমার পিতার মৃত্যু হয় কেন? উত্তরে ময়নামতী স্বামীর মৃত্যুকাহিনী বলিতে লাগিলেন। রাজা মাণিকচন্দ্র ময়নামতীকে বিবাহ করিয়া শ্বশুরবাড়ীতে অবস্থান কালেই ময়নামতীর অলৌকিক ক্ষমতার কিছু পরিচয় পান এবং তাঁহাকে রাক্ষসী মনে করিয়া পলাইয়া যান, কিন্তু ভয়ে তাঁহাকে পরে স্বগৃহে লইয়া আসেন। একদিন ময়নামতী যোগবলে গণিয়া দেখিলেন যে স্বামীর মরণ সন্নিকট। তখন তিনি স্বামীকে পাথরের দেওয়াল ও লোহার কপাট দেওয়া ঘরে রাখিয়া দ্বারে পাহারায় বসিলেন, যাহাতে যম বা যমদূত রাজার কাছে ঘেঁষিতে না পারে। যমদূত আসিল বটে কিন্তু ময়নামতীর প্রভাবে কাছে ঘেঁষিতে পারিল না। সাতদিন এইরূপে গেল। শেষে যমের মায়ায় মাণিকচন্দ্র দারুণ ক্ষুধা বোধ করিলেন, তিনি পত্নীকে সুখাদ্য রন্ধন করিয়া আনিতে বলিলেন। ময়নামতী বলিলেন, আমি রন্ধনশালে গেলে যমদূত গৃহে ঢুকিয়া তোমাকে লইয়া যাইবে। এই কথায় রাজা কান দিলেন না। শেষে নির্ব্বন্ধাতিশয়ে রাণীকে রন্ধনশালায় যাইতে হইল। ইত্যবসরে যমদূত রাজার প্রাণ লইয়া চলিয়া গেল। রন্ধনশালাতে থাকিয়া ময়নামতী ধ্যানে রাজার মৃত্যু জানিতে পারিয়া ভ্রমর রূপ ধরিয়া যমালয়ে গেলেন। যম ময়নামতীর প্রভাবে ভীত হইয়া স্বামীর জীবন ফিরাইয়া দিতে চাহিল, তবে তাহার জন্য আপোড়া মাটি চাই। এইরূপ মাটি কোথাও পাওয়া গেল না। যাহা একটু গঙ্গাগর্ভে আছে তাহা সম্বল করিয়া সংসারের তাবৎ জীব বাঁচিয়া আছে। সুতরাং সে মাটি নেওয়া চলে না। অতএব মাণিকচন্দ্রকে পুনর্জ্জীবিত করা গেল না।

এই কাহিনী বলিয়া রাণী পুত্রকে উপদেশ দিলেন,

আমার বচন শুন রাজা গোবিন্দাই।
মায়ে পোয়ে যোগী হইলে জঞ্জাল এড়াই॥

রাজা বলিলেন, তোমার সিদ্ধাই কিছু না দেখিলে বিশ্বাস হইতেছে না।

দেখিতে না পাই যাহা আপন নয়ানে।
প্রবোধ নাহিক মানে অবোধপরাণে॥
ছয় মাসের পথ হয় শ্রবণ নয়ান।
তবে ত প্রবোধ যদি দেখি বিদ্যমান॥

অগ্নিতে তোমার যদি মরণ নাই তবে প্রজ্বলিত জতুগৃহে প্রবেশ কর, ইহাতে তোমার কথার যথার্থতা দেখিলে তখন যোগী হইব।

রাণী জতুগৃহে প্রবেশ করিয়া নিজের সিদ্ধাই দেখাইলেন। তখন রাজা যোগী হইতে রাজি হইলেন বটে, কিন্তু হাড়িকে গুরু করিতে দ্বিধাবোধ করিতে লাগিলেন। ইহাতে রাণী বলিলেন,

না বল এমন বাছা শুনে পাছে হাড়ি। গুরুশাপে হাড়িপা আছেন তব বাড়ি॥
সর্ব্বঘটে আছে হাড় হাড়ি এক জন। হাড়িপা মনুষ্য নহে হাড়ের স্বজন॥
সকল সংসার সৃষ্টি হাড়ে করি ভর। পরাণপুতলী বেশে চক্ষে করি ঘর॥
হাড়িপা হাড়ের সিদ্ধা কুলে হাড়ি নয়। তাহার চরণ সেব করিয়া বিনয়॥

মায়ের কথায় রাজা সন্তুষ্ট হইয়া পরদিন দীক্ষা লইতে সম্মত হইলেন। অন্তঃপুরে আসিলে ছয় কুড়ি রাণী তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল এবং নানাবিধ অনুনয় বিনয় করিতে লাগিল। রাজা নারীর মায়ায় মোহিত হইয়া গেলেন। ধ্যানযোগে পুত্রের চিত্তচাঞ্চল্য জ্ঞাত হইয়া ময়নামতী হুঙ্কার ছাড়িয়া যমপুরীতে গেলেন এবং মহিষীগণের আলিঙ্গনবদ্ধ গোবিন্দচন্দ্রের প্রাণ লইয়া আসিতে যমকে আজ্ঞা করিলেন। যম তাহাই করিলেন। রাজাকে বিগতপ্রাণ দেখিয়া রাণীরা করুণভাবে বিলাপ করিতে লাগিল। সৎকারের সময় রাণীমাতাকে সংবাদ দেওয়া হইল। ময়নামতী

বৃদ্ধব্রাহ্মণের রূপে আসিয়া পাটরাণী দুইজনকে সহমরণে যাইতে নিষেধ করিলেন. বলিলেন যে তিনি যোগবলে রাজাকে পুনর্জীবন দান করিবেন। কর্ণে ব্রহ্মজ্ঞান জপিতে রাজা প্রাণ পাইয়া উঠিয়া বসিলেন। পুত্রকে মাতা বলিলেন, দেখ তুমি মরিয়াছিলে, আমি যোগবলে বাঁচাইলাম, অতএব "মায়ে পোয়ে যোগী হইলে জঞ্জাল এড়াই।"

মায়ের কথায় এখন রাজার প্রতীতি হইল। তিনি হাড়িপার পাদস্পর্শ করিয়া বলিলেন, "জ্ঞানমন্ত্র দেহ গোসাঞি শুভক্ষণ বেলা।" হাড়িপা নানা ওজর করিলেন কিন্তু গোবিন্দচন্দ্র মানিলেন না। তখন হাড়িপা বলিলেন, "কালি জ্ঞান দিব আজি ভিক্ষা মাগ্যা আন।" গোবিন্দচন্দ্র অঙ্গে ভস্ম মাখিয়া ভিক্ষার্থ নগরে বাহির হইলেন। এদিকে হাড়িপা মায়া পাতিয়া দৈবজ্ঞবেশে নগরবাসীকে নিষেধ করিয়া দিলেন যেন গোবিন্দচন্দ্রের মত চেহারার কোন নবীন যোগীকে কেহ ভিক্ষা না দেয়, দিলে অমঙ্গল হইবে। ফলে রাজা কোথাও এক মুষ্টি ভিক্ষা পাইলেন না, এমন কি উদুনা পুদুনার কাছেও নয়। শেষে ময়নামতীর কাছে গেলে, ময়নামতী তাঁহাকে তত্ত্বকথা জিজ্ঞাসা করিলেন। রাজা ফাঁফর হইয়া গুরুকে স্মরণ করিলেন, গুরু তাঁহাকে মনে মনে ব্রহ্মজ্ঞান পাঠাইয়া দিলেন।

চলিলা [ত] ব্রহ্মজ্ঞান তারা হেন ছুটে।
আসিয়া বসিল জ্ঞান গোবিন্দচন্দ্র-ঘটে॥

ব্রহ্মজ্ঞান পাইয়া গোবিন্দচন্দ্রের দিব্যচক্ষু খুলিয়া গেল। তিনি দেখিলেন,

সংসার জলের বিম্ব সব মিছা মায়া। এ তিন ভুবন দেখে আপনার কায়া॥
ভিন্ন ভিন্ন তনুখানি বন্দি মায়াজালে। জীবা মাত্র দিবা দশ সংহারিব কালে॥
ইষ্টমিত্র বন্ধুবান্ধব [সব] মিছা-কায়। কাষ্ঠের পুত্তলা যেন বাদিয়া নাচায়॥

তত্ত্বজ্ঞান পাইয়া গোবিন্দচন্দ্র মাতার প্রশ্নের যথাযথ উত্তর দিলেন। ময়নামতী উত্তর শুনিয়া হৃষ্ট হইয়া পুত্রকে ভিক্ষা দিলেন। হাড়িপা মায়াবলে প্রাপ্ত ভিক্ষা উড়াইয়া দিলেন। রাজা কাঁদিতে কাঁদিতে রিক্তহস্তে গুরুর নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। হাড়িপা তখন রাজাকে দেশান্তরে গিয়া ভিক্ষা সংগ্রহ করিতে বলিলেন। রাজা বলিলেন, আপনি যথায় লইয়া যাইবেন তথাই চলিব। অগত্যা হাড়িপা

দেশান্তরে প্রস্থান করিলেন, সঙ্গে রাজা গুরুর ঝুলি কাঁথা বহিয়া অশেষ কষ্ট ভোগ করিতে করিতে চলিলেন। উত্তর হইতে আসিয়া পশ্চিমদেশ ভ্রমণ করিয়া অবশেষে গুরুশিষ্যে দক্ষিণদেশে সমুদ্রতীরে বারাঙ্গনা হীরার গ্রামে আসিয়া পৌছিলেন। হীরার নিকট শিষ্যকে চারি কড়া কড়ির বদলে বাঁধা রাখিয়া হাড়িপা চলিয়া গেলেন। গোবিন্দচন্দ্র হীরার বাড়ীতে ভৃত্যোচিত হীন কর্ম্ম করিতে লাগিলেন। হীরা গোবিন্দচন্দ্রের রূপে মুগ্ধ হইয়া তাঁহাকে প্রলোভিত করিতে লাগিল, কিন্তু রাজা তাহাকে মাতৃজ্ঞান করিতে লাগিলেন। ইহাতে হীরা ক্রুদ্ধ হইয়া তাঁহাকে পরিশ্রমসাধ্য ও হীনতর কর্ম্মে নিযুক্ত করিল। রাজা গুরুর স্মরণে মনের শান্তিতে কাল কাটাইতে লাগিলেন।

চঞ্চল হইল চিত্ত গুরুকে ধেয়ায়।
দুঃখের শরীর তবু আনন্দে বেড়ায়॥

এইরূপে দ্বাদশ বৎসর কাটিয়া গেল। এদিকে উতুনা পুতুনা স্বামিবিরহে অবিচ্ছেদে অশ্রুবর্ষণ করিতেছে। বহুকাল স্বামীর উদ্দেশ না পাইয়া তাহারা শুক সারীর পক্ষমধ্যে পত্র লিখিয়া রাজার সন্ধানে উড়াইয়া দিল। নানা দেশ ঘুরিয়া শুকসারী অবশেষে গোবিন্দচন্দ্রের সন্ধান পাইল। গোবিন্দচন্দ্র পত্নীদ্বয়ের পত্র পাইয়া অঙ্গ চিরিয়া রক্তে উত্তর লিখিয়া পাঠাইলেন, "বন্ধকেতে আছি হীরা দারীর ভবন।" হীরার চর এই ব্যাপার জানাইলে হীরা গোবিন্দচন্দ্রকে ভেড়া বানাইয়া শিকলে বাঁধিয়া রাখিল।

এদিকে রাজার পত্র পাইয়া বধূদ্বয় শাশুড়ীকে জানাইল। ময়নামতী হুঙ্কার করিয়া গুরুকে উদ্বুদ্ধ করিলেন। হাড়িপা চমকিয়া উঠিলেন। তাঁহার মনে পড়িল, এই বার বৎসর যাবৎ গোবিন্দচন্দ্রকে হীরার নিকট বন্ধক রাখিয়া আসিয়াছেন। তিনি হীরার বাড়ী গিয়া চারি কড়া কড়ি দিয়া শিষ্যকে ফেরৎ চাহিলেন। হীরা বলিল, তাঁহার চেলা অনেক দিন হইল মরিয়া গিয়াছে। হাড়িপা সকল ব্যাপার বুঝিয়া হুঙ্কার ছাড়িলেন। হুঙ্কারে মেষের শিকল ছিঁড়িয়া গেল, মেষ হাড়িপার নিকট চলিয়া আসিল। হাড়িপা গোবিন্দচন্দ্রকে মনুষ্যমূর্ত্তি পরিগ্রহ করাইলেন।

অতঃপর গোবিন্দচন্দ্র গুরুর সঙ্গে যমালয়ে চলিলেন। সেখানে দুষ্কৃতির পরিণাম দেখিয়া রাজার নির্ব্বেদ জন্মিল।

রাজা বলে যোগী হব না যাইব ঘর। সেবিয়া তোমার পদ হইব অমর ॥
যোগসিদ্ধা হইলে যমেরে নাহি ডরি। যোগসিদ্ধা কর মোরে গুরু জালন্ধরি ॥

তখন হাড়িপা রাজাকে মহাজ্ঞান দিলেন, আর উভয়ে নরলোকে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। গুরু শিষ্যের মন বুঝিবার জন্য গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে বলিলেন, মোহমুক্ত রাজা রাজি হইলেন না, তিনি মাথা মুড়াইয়া কর্ণে মুদ্রা পরিয়া যোগীর বেশ ধারণ করিতে আগ্রহশীল হইলেন। গুরু বলিলেন, কল্য হইবে, অদ্য গৃহে ফিরিয়া যাও। গুরুর কথায় রাজা গৃহে ফিরিলেন এবং পত্নীদিগকে নানারূপ যোগবিভূতি দেখাইতে লাগিলেন। ধ্যানবলে হাড়িপা জানিলেন যে তাঁহার চেলা নারীসমাজে সিদ্ধাই দেখাইতেছে। তিনি ক্রুদ্ধ হইয়া হুঙ্কার ছাড়িয়া রাজার ব্রহ্মজ্ঞান হরণ করিলেন। গোবিন্দচন্দ্র আর সিদ্ধাই দেখাইতে পারেন না, তাহাতে উদুনা পুদুনা মুখে কাপড়চাপা দিয়া হাসিতে লাগিল এবং বলিল যে রাজা সিদ্ধাই পান নাই, বাজীকর হাড়িপার নিকট ভোজবিদ্যা শিখিয়াছেন মাত্র। ইহাতে "হাড়ির উপর হইল রাজা জ্বলন্ত আগুনি।" রাজা হাড়িপাকে পরদিন সাজা দিবেন ঠিক করিলেন।

প্রভাতে সভায় বসিয়া কোটালকে আজ্ঞা দিলেন হাড়িপাকে শীঘ্র বাঁধিয়া আনিতে। বৃদ্ধ বধির বাউলবেশধারী ধ্যানস্থ হাড়িপাকে কোটাল বাঁধিয়া আনিল। রাজা হাড়িপাকে ভুতুড়ে বাজীকর মনে করিয়া ভর্ৎসনা করিতে লাগিলেন। ক্ষণেক পরে ধ্যান ভাঙ্গিলে হাড়িপা বলিলেন, আমার সঙ্গে দেশান্তরে চল, তবে পুনরায় তত্ত্বজ্ঞান দিব। রাজা মহিষীদ্বয়ের পরামর্শে হাড়িপাকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিলেন। হাড়িপা মাটির ভিতর জীবিত রহিয়া দ্বাদশ বৎসর কাটাইয়া দিলেন।

বহুকাল গুরুর কোন উদ্দেশ না পাইয়া কানুপা তাঁহার সন্ধানে বাহির হইলেন। পথে গোরক্ষনাথের নিকট শুনিলেন যে তাঁহার গুরু "জালন্ধরি গাড়া আছে মাটীর ভিতরে।" গোরক্ষনাথের যুক্তিতে কানুপা শিশুযোগীর রূপ ধরিয়া গোবিন্দ-চন্দ্রের রাজধানীতে আসিলেন। কোটাল তাঁহাকে বাঁধিয়া রাণী উদুনার নিকট

লইয়া গেল। রাণী তাঁহার বন্ধন ঘুচাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "যে দেশে নাহিক যোগী তুমি আইলা কেনি।" শিশুবেশী কানুপা বলিলেন,

গুরুহীন শিশু আমি নাহি মোর জ্ঞান। নাহি জানি যোগতত্ত্ব নাহি জানি ধ্যান॥
গৃহস্থ বালক আমি গেনু খেলাইতে। এক যোগী সন্দেশ দিলেন মোর হাথে॥
অজ্ঞান হইয়া আমি ফিরি একেশ্বর। জানিতে না পারি আমি কোথা দেশ ঘর॥
প্রাণরক্ষা কর মোর পাটরাণী মাই। আশীর্ব্বাদ কর যেন দেশেরে তরে যাই॥

রাণী শিশুকে মুক্ত করিয়া দিলেন। কানুপা তখন গোবিন্দচন্দ্রের নিকট গেলেন। হুঙ্কারের বলে তাঁহার নিকট হাড়িপার ষোল শত চেলা আসিয়া উপস্থিত হইল। রাজা বিস্মিত হইলেন। তিনি তাঁহাদিগকে আহার করাইতে বসাইলেন। কিন্তু যোগীদের পেট আর কিছুতেই ভরে না। তখন রাজা কানুপাকে সিদ্ধা বলিয়া জানিলেন এবং তাঁহার শরণ লইলেন। হাড়িপার ক্রোধ উপশম করাইবার জন্য কানুপা রাজার অনুকৃতি তিনটি স্বর্ণপুত্তলিকা নির্ম্মাণ করাইতে বলিলেন। পুত্তলিকা নির্ম্মিত হইলে তাহা লইয়া কানুপা ও রাজা যেখানে হাড়িপা গাড়া আছেন সেখানে গিয়া মাটি কোপাইয়া হাড়িপাকে মুক্ত করিলেন। হাড়িপার ধ্যানভঙ্গ হইল। কানুপা তাঁহার সম্মুখে সেই পুতুল তিনটি রাখিলেন। হাড়িপার ক্রোধদৃষ্টি সেগুলির উপর তিনবার পড়িল তাহাতে রাজার প্রতিমা তিনবার ভস্ম হইল। গোবিন্দচন্দ্র এই উপায়ে ফাঁড়া কাটাইলেন।

এইবার রাজা মাথা মুড়াইয়া, কানে শঙ্খকুণ্ডল পরিয়া গায়ে ভস্ম মাখিয়া ঝুলিকাঁথা লইয়া প্রকৃত যোগীর বেশ ধারণ করিলেন। মাতা ময়নামতী ভার্য্যা উদনা পুদুনা ইত্যাদি সকলে কাতর হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিল। রাজার পত্নীদিগের ক্রন্দনে হাড়িপা দয়াপরবশ হইয়া গোবিন্দচন্দ্রকে সংসারে ফিরিতে বলিলেন। রাজা ইহা শুনিয়া কানে হাত দিলেন। শেষে কোপদৃষ্টি দিয়া উদুনা ও পুদুনাকে প্রস্তরীভূত করিয়া দিয়া রাজা গুরুর সঙ্গে পুনরায় দেশভ্রমণে বহির্গত হইলেন। ভ্রমণ শেষ হইলে রাজা দক্ষিণদেশে সমুদ্রের ধারে রহিয়া গেলেন, কেবল বৎসরে একবার করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসিতেন। গোবিন্দচন্দ্র যোগী হইয়া অমর হইলেন, ইহাতে রাণী ময়নামতী পরমসুখ লাভ করিলেন।

মীননাথের কাহিনী উপকথাজাতীয়, কিন্তু গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যান বাস্তবতা-গন্ধী। কিন্তু তাই বলিয়াই যে উপাখ্যানটি সম্পূর্ণভাবে ঐতিহাসিক হইবে এমন কোন কথা নাই। ১৮৭৮ খ্রীষ্টাব্দ হইতে অদ্যাবধি গ্রীয়ার্সন প্রভৃতি যাঁহারা গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যান লইয়া আলোচনা করিয়াছেন তাঁহারা কেবলই ঐতিহাসিকত্ব বিচারে মাথা ঘামাইয়াছেন বেশী। গোবিন্দচন্দ্র কোন অঞ্চলে রাজত্ব করিতেন, তাঁহার রাজধানীর নাম কি, তাঁহার পৈতৃক মাতৃক বংশলতা, উদুনা পুদুনা কোন্ রাজার কন্যা ইত্যাদি প্রশ্ন তাঁহাদিগকে বিব্রত করিয়াছে। কিন্তু এই আলোচনা পণ্ডশ্রম মাত্র। হইতে পারে যে উপাখ্যানটির মূলে ঐতিহাসিক বীজ ছিল, কিন্তু সে বীজ সুদূর ইতিহাসের, এবং তাহা অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে রচিত পাঁচালীগুলির পরস্পরবিরোধী ঘটনা ও নামের অন্তরালে চিরকালের জন্য আত্মগোপন করিয়াছে। গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যানের কোন সুপ্রাচীন রূপ আবিষ্কৃত না হইলে এই বিষয়ে আলোচনা করিয়া কোন তথ্য উদ্ধার করা যাইতে পারে না।

মীননাথ গোরক্ষনাথ জালন্ধরিপাদ (হাড়িপা) কৃষ্ণপাদ (কানুপা), ইহারা ঐতিহাসিক ব্যক্তি ছিলেন। অন্ততঃ এই নামে পরিচিত যোগী বা শৈব তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য্যদিগের দুইজনের ভণিতাযুক্ত রচনা পাওয়া যাইতেছে। তবে ইঁহারা সকলেই সমসাময়িক ছিলেন কিনা বলা বড় শক্ত। মীননাথ সিদ্ধাচার্য্যদিগের আদিগুরু বলিয়া কথিত হইয়াছেন। চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ের টীকাকার মীননাথের রচনা বলিয়া একটি পদ আংশিকভাবে উদ্ধৃত করিয়াছেন। কবিতাটির ভাষা বাঙ্গালা।[১] পদটি মীননাথের না হইতেও পারে। হয়ত কোন নাথপন্থী শৈব তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য্য বা সাধক মীননাথের নামে চালাইয়া দিয়াছেন। শ্রীযুক্ত প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহাশয় লুইপাদ ও মীননাথ বা মৎস্যেন্দ্রনাথ অভিন্ন ব্যক্তি বলিয়া মনে করেন। লুইপাদ ভণিতাযুক্ত দুইটি বাঙ্গালা পদ চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে পাওয়া গিয়াছে। গোরক্ষনাথের ভণিতাযুক্ত কোন বাঙ্গালা বা অপভ্রংশ পদ পাওয়া যায় নাই। কৃষ্ণপাদ বা কানুপা ভণিতাযুক্ত বারোটি পদ চর্য্যাচর্য্যবিনিশ্চয়ে পাওয়া

১। তৃতীয় পরিচ্ছেদে [পৃ ৪৭] উদ্ধৃত করিয়াছি।

গিয়াছে। শৈব ও তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য্যদিগের মধ্যে একাধিক কানুপা ছিলেন। একটি পদে জালন্ধরিপাদের উল্লেখ আছে,

সাখি করিব জালন্ধরিপাএ।
পাখি ন রাহই মোরি পাণ্ডিআচাএ ॥

এই কানুপা তাহা হইলে নিশ্চয়ই হাড়িপার শিষ্য কানুপা।

মীননাথের কাহিনী উপকথামূলক, সুতরাং এই কাহিনীর উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করা কঠিন। তবে গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যানের উৎপত্তি বাঙ্গালাদেশে হওয়াই সম্ভব। এই কাহিনী ভারতবর্ষের যে যে অঞ্চলে প্রচলিত আছে সর্ব্বত্রই গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গভূমির নৃপতি বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন, সুতরাং বাঙ্গালাদেশ হইতেই যে এই উপাখ্যান তত্তৎ দেশে প্রচারিত হইয়াছিল এ অনুমান অযথার্থ নহে। পূর্ব্বে বাঙ্গালাদেশের নাথপন্থী শৈব যোগীরা ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এই গান গাহিয়া বেড়াইত। বাঙ্গালায় বিহারে উত্তরপশ্চিম প্রদেশে পঞ্জাবে সিন্ধুদেশে মহারাষ্ট্রে মধ্যভারতে ও উড়িষ্যায় এখনও "যোগী" অর্থাৎ গোরখপন্থী ভিখারীরা একতারা গোপীযন্ত্র অথবা সারেঙ্গ সহযোগে বঙ্গেশ্বর গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাসের গান গাহিয়া ভিক্ষা করিয়া বেড়ায়।

ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রদেশে এবং খাস বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত গানে বা প্রাপ্ত পুঁথিতে ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র উপাখ্যানের কিছু কিছু রূপভেদ দেখা যায়।[১] গল্পের মূল কাঠামো প্রায় একই, তবে অবান্তর কাহিনীতে এবং অপ্রধান পাত্র-পাত্রীর নামাদিতে সামান্য সামান্য পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়।

হিন্দী ভাষায় গোবিন্দচন্দ্র (গোপীচন্দ্র) উপাখ্যানের সর্ব্বপ্রথম উল্লেখ পাই মালিক মুহম্মদ জায়সী রচিত পদুমাবৎ কাব্যে। এই উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা গ্রীয়ার্সন (Grierson) সম্পাদিত পদুমাবৎ কাব্যের ভূমিকায় আছে। গল্পাংশ মোটামুটি বাঙ্গালায় প্রচলিত কাহিনীরই মত, তবে ইহাতে গোবিন্দচন্দ্র কর্ত্তৃক জালন্ধরির পরীক্ষা ব্যাপার নাই। গুজরাটী ভাষায় প্রচলিত উপাখ্যানে

১। Proceedings and Transactions of the Sixth Oriental Conference, Patna, পৃ ২৬৭-২৬৯।

আছে যে গোবিন্দচন্দ্রের পিতা গৌড়বঙ্গের তিলকচন্দ্র জালন্ধরির শাপে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েন। শাপের হেতু এই— একদা চোরে রাণী "মিনাবী" বা "মেনাবন্তী" দেবীর কণ্ঠহার চুরি করিয়া ধরা পড়িবার ভয়ে ধ্যানস্থ জালন্ধরির কণ্ঠে পরাইয়া দেয়। কোটাল জালন্ধরিকে চোর মনে করিয়া রাজসভায় ধরিয়া লইয়া যায় এবং রাজার আদেশে নির্য্যাতন করা হয়। নির্য্যাতনের ফলে ধ্যানভঙ্গ হইলে যোগী রাজাকে শাপ দেন।

গুজরাটী উপাখ্যানে স্বর্ণপুত্তলিকার পরিবর্ত্তে দাইলপূর্ণ পাত্রের কথা আছে, যোগীর কোপদৃষ্টিতে সেগুলি ভস্ম হইয়া যায়। সন্ন্যাস করিয়া রাজা গুরুর সঙ্গে ভ্রমণ করিতে করিতে ধারানগরীতে স্বীয় ভগিনীর সহিত সাক্ষাৎ করেন, ইহাও নূতন।

মারাঠী উপাখ্যানে আছে, রাণী "মৈনাবতী" রাজধানী কাঞ্চননগরের পথে জালন্ধরিনাথকে কাষ্ঠের ভার বহিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার মাহাত্ম্য উপলব্ধি করেন ও শিষ্যা হন। তাহার পর কাহিনীটি গুজরাটীর মত। তবে পরিশেষে গোপীচন্দ্র গৌড়ে ফিরিয়া আসেন এবং হাজার বছর ধরিয়া রাজত্ব করেন।

পঞ্জাবী কাহিনী অনুসারে গোপীচন্দ্রের জন্মভূমি "গৌড়বঙ্গাল" বটে, কিন্তু তিনি "উজ্জৈন" বা উজ্জয়িনীর রাজা ছিলেন, তাঁহার মাতা "মৈনাবন্তী" রাজা "ভরথরি" বা ভর্ত্তৃহরির ভগিনী। রাণী পুত্রকে অনিত্য সংসার ত্যাগ করিয়া জালন্ধরিনাথের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়া অমরত্ব লাভ করিতে উপদেশ দেন। রাজা কিন্তু মন্ত্রীর পরামর্শে ধ্যানস্থ যোগীকে কূপমধ্যে নিক্ষেপ করিয়া পাথর ফেলিয়া কূপ বুজাইয়া দেন। ওদিকে "মচ্ছন্দর"-নাথও কামসুখে মত্ত হইয়া আছেন, তাঁহার শিষ্য কানুফা গিয়া তাঁহাকে নারীমোহপাশ হইতে উদ্ধার করিলেন। এদিকে "জলন্ধর"-নাথের শিষ্য গোরখনাথ গুরুকে কূপ হইতে উদ্ধার করিবার জন্য রাজধানীতে আসিলেন। তাঁহার কথায় রাজা ভয় পাইয়া যোগীকে উদ্ধার করিলেন। যোগীও তাঁহাকে ক্ষমা করিয়া শিষ্যত্বে গ্রহণ করিলেন। গুরুর আদেশে রাজা মহিষী "পটমৃদঈ" বা পট্টমহাদেবীকে মা বলিয়া সম্বোধন করিয়া ভিক্ষা চাহিলেন। রাজাকে সংসারে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার জন্য রাণী এবং কন্যা কাতর ক্রন্দন করিতে

লাগিল। রাজা গুরুর সঙ্গে ভ্রমণে চলিলেন এবং গৌড়ে আসিয়া স্বীয় ভগিনী চম্পার গৃহে ভিক্ষা মাগিতে গেলেন। চম্পা যোগীকে ভাই বলিয়া চিনিতে পারিল এবং গৃহে ফিরাইতে যথেষ্ট চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু অনুনয় বিনয় বৃথা হইল। ভগিনী মনঃকষ্টে প্রাণত্যাগ করিল। জালন্ধরি তাহাকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন ভগিনীর কাতর অনুনয় উপেক্ষা করিয়া রাজা গুরুর সহিত চলিয়া গেলেন।

নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় উড়িষ্যায় প্রচলিত একটি গোবিন্দ-চন্দ্রের গীত লিপিবদ্ধ করিয়া আনেন। এই পাঁচালীর কিয়দংশ বঙ্গসাহিত্য পরিচয়ে[১] মুদ্রিত হইয়াছে। ইহা বাঙ্গালা উপাখ্যানেরই অনুরূপ।

বাঙ্গালায় প্রচলিত গীতের কথা বলিবার পূর্ব্বে নেপালে লিখিত একটি পুঁথির বিষয় আলোচনা করিব। গোবিন্দচন্দ্রের উপাখ্যানের আলোচনায় এই পুঁথির প্রয়োজনীয়তা যথেষ্ট।

পুঁথিটি বাঙ্গালা এবং নেওয়ারী ভাষায় রচিত গোবিন্দচন্দ্রের সন্ন্যাস বিষয়ক একটি নাটক। ইহা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে। শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তথা হইতে এই গ্রন্থের প্রয়োজনীয় অংশ নকল করিয়া আনিয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের সৌজন্যে আমি এই অনুলিপি ব্যবহার করিতে পারিয়াছি। গ্রন্থটি নেপালের অধীশ্বর সিদ্ধিনৃসিংহদেবের রাজ্য-কালে (১৬২০-৫৭ খ্রীষ্টাব্দ) লিখিত হয়। উপযুক্ত অংশ উদ্ধৃত করিয়া নাটকটির সারাংশ নিম্নে দেওয়া গেল। বলা বাহুল্য কবিতাংশের পাঠ শুদ্ধ করিয়া দিয়াছি।

প্রথমেই রাজা গোবিন্দচন্দ্র ও তাঁহার দুই মহিষী উদনা পদুমা অন্তঃপুরে কথোপকথন করিতেছেন, এই দৃশ্যের অবতারণা।

বাপ রূপচন্দ্র হে মএনাবতী মাএ।
যার কোখি[২] জনমিয়া বোলাইল বাএ॥
আইল হে গোবিন্দচন্দ্র বঙ্গের অধিপতি।
উদনা পিদুমা লৈয়া কেলি করন্তি॥

১। প্রথম খণ্ড, পৃ ৮৫-১০১। ২। অর্থাৎ কুক্ষিতে।

তাহার পরের দৃশ্যে বঙ্গকুমারের সহিত (রাজার শ্যালক ?) খেতু পাত্র কলিঙ্গা কোটাল ও ভাগীখেলের ষড়যন্ত্র। বঙ্গকুমার গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যে উৎপাত করিতে আরম্ভ করিল। রাজা খেতু পাত্র ও কলিঙ্গা কোটালের সঙ্গে নব লক্ষ সৈন্য প্রেরণ করিলেন বঙ্গকুমারকে বিনাশ করিবার নিমিত্ত। এদিকে খেতু বঙ্গকুমারের সহিত যোগ দিয়া রাজার সমস্ত সৈন্য ধ্বংস করিল। রাজা খেতুর উপর বধদণ্ড আদেশ করিলেন। রাণীরা কলিঙ্গা কোটালের নিকট খেতুর প্রাণভিক্ষা করিলেন,

শুনহ কলিঙ্গা আমার বচনে।
এককাল প্রাণ রাখো খেতু দেও দানে॥
না মারহ কোটবাল না মার পরাণে।
দিবো তোরে কোটবাল অমোলরতনে॥

রাণীদের কথায় কোটাল খেতুকে ছাড়িয়া দিল, আর ছাগল মারিয়া রক্ত লইয়া রাজাকে দেখাইল।

এমন সময় রাণী ময়নামতী আসিয়া পুত্রকে বলিলেন যে তাঁহার শুভ হইবে না। তখন গোবিন্দচন্দ্র ব্যাকুল হইয়া বলিলেন, তবে উপায় কি? রাণী বলিলেন, লোক পাঠাইয়া খুঁজিয়া পরমসিদ্ধ যোগী আনাও, তাহার উপদেশে তুমি অমর হইতে পারিবে। রাজা দুঃখিত হইয়া বলিলেন, আহা আমি নিষ্ঠুর হইয়া খেতুকে বধ করিলাম, এখন পাঠাই কাহাকে। রাণী বলিলেন, বধূরা খেতুকে লুকাইয়া রাখিয়াছে। রাজা খেতুকে সন্তোষ করিয়া সিদ্ধ যোগীর অনুসন্ধানে পাঠাইলেন। খেতু সিদ্ধ যোগী জালন্ধরির সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহাকে সম্মত করিয়া রাজসভায় লইয়া আসিল। যোগীকে বহুপ্রকারে পরীক্ষা করা হইলে শেষে রাজা নিজে যোগী হইতে বাঞ্ছা প্রকাশ করিলেন। যোগী তাঁহাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিলেন। শেষে ঠিক হইল, তিনবার পাশা খেলা হইবে। তাহাতে যোগী হারিলে রাজার ভৃত্য হইবেন আর রাজা হারিলে যোগীর ভৃত্য হইবেন।

প্রথম দাও পড়িয়া গেল সাথা। গুণজ্ঞান কিছু না জানে মিথ্যা মুড়ায় মাথা॥
দোসারি দাও পড়িয়া গেল বিদু। পঢ়িয়া শুনিয়া উফলি বুফলি মেল ভদু (?)॥

তেসরি দাও পড়িয়া গেল বিতি (?)। অষ্কলাক দরপণ মুকুথক পুথি ॥
চৌঠ দাও পড়িয়া গেল দশ। রাজা যোগী পাশা খেলে বাঁধয় মহারস ॥

রাজা হারিয়া গেলেন এবং যোগী হইতে স্বীকৃত হইলেন। যোগী প্রথমে সন্ন্যাসের কষ্ট বর্ণনা করিয়া রাজার দৃঢ়চিত্ত দেখিয়া জগতের নশ্বরত্ব ইত্যাদি তত্ত্বকথা বলিতে লাগিলেন। শেষে তাঁহাকে স্বীয় ঐশ্বর্য্য বিলাইয়া দিতে বলিলেন,

চন্দ্রকেতু নাম রাজা এই বঙ্গে ছিল।
রাজ্যখানি আছে বাবা রাজা কোথা গেল ॥
যদি বা শিখিবে বাবা ব্রহ্মগেয়ানে।
হস্তী ঘোড়া পয়দল[১] ব্রাহ্মণে কর দানে ॥

তাহার পর জালন্ধরি যোগিচক্র করিয়া নানাবিধ সুখাদ্য ইত্যাদি ভোজন করিলেন। তাহার পর উত্তর পূর্ব্ব দক্ষিণ ও পশ্চিম দিকে যোগীদিগকে বিদায় দেওয়া হইলে জালন্ধরি শিঙ্গা বাজাইয়া রাজাকে আহ্বান করিলেন, রাজা শিঙ্গাধ্বনি শুনিয়া অন্তঃপুর হইতে চলিয়া আসিলেন। গুরুশিষ্যে তত্ত্বকথা হইতে লাগিল। এমন সময় দুই রাণী আসিয়া রাজাকে ভুলাইয়াছে বলিয়া যোগীকে নিন্দা করিতে লাগিল, যোগীও উত্তর দিতে লাগিলেন। শেষে না পারিয়া উঠিযা তাঁহাদিগকে শাপ দিয়া ভস্ম করিবার ভয় দেখাইলেন। রাজা তখন রাণীদের বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন,

হের কি দেখসি মহাদেবী জগৎসংসার। মানুষ পোড়ায়া দেখো হৈল ছারখার ॥
সে দেখিয়া মহাদেবী আমি হৈল শঙ্কা। উপেখিব জনধন লৈব ঝোলিকন্থা ॥
পাইল পরমপদ রাখিব শরীরে। উপেখিব রাজ্যপাট ই মধ্যমন্দিরে ॥

রাণীরা তখন যোগীকে অনুনয় করিতে লাগিল,

গুরু হে, মোরা ধরমের ভায়ি।[১] রাজা মোর দেহ বাহুড়ায়ি ॥
নেত পাট দিব কন্থা। মণি মুকুতা দিব মাথা ॥

১। তুলনীয়—

হস্তি ঘোড় পয়দল যত দেখ আর।
আনলের মধ্যে যেন ভস্মেতে অঙ্গার ॥ দুর্লভ মল্লিক [পৃ ৫৭]।

১। অর্থ 'আমরা ধর্ম্মভার্য্যা,' অথবা '(তুমি) আমাদের ধর্ম্মভাই।'

গুরু হে, ষোড়শ বরিষ মোর হিয়া। পঁচিশবরিষ মোর পিয়া॥
তে বিধি কএল মিলাই। হৃদয়ন দেহ মোর সায়ি[১]॥

যোগী বলিলেন, বেশ আমি চলিলাম। আমি ত নিজে আসি নাই, রাজাই ডাকিয়া আনিয়াছিল।

যোগী চলিয়া যাইতেছেন দেখিয়া রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া রাণী দুইজনকে বুঝাইতে লাগিলেন। রাণীরা রাজাকে বলিল, তুমি ঘরে বসিয়া থাক, আমরা তোমার হইয়া ভিক্ষা মাগিব।

প্রভাতে বিহান হৈলে ঘৃত অন্ন যোগাইব,
ভৃঙ্গার ভরিয়া দিব পানী।
সুয়িবাকে শয্যা দিব এ খাটপালঙ্কে রে,
যোগী হৈয়া কোন সুখ জানি॥

রাজা বলিলেন, এ সব বস্তু আগুন দিয়া জ্বালাইয়া দাও, আমার ওসবে প্রয়োজন নাই। রাণীরা বলিল, তোমার বড় কষ্ট হইবে,

পালঙ্কি এড়িয়া রাজা ভূমিতে দিল পাও।
শ্রীখণ্ড এড়িয়া রাজা ভসম লগাও॥
দুধ এড়িয়া রাজা খাইল কালাবিষ॥
বড় কষ্ট পাইল রাজা মুড়ায়িয়া শীষ॥

তখন যোগী স্ত্রীজাতির নিন্দা করিতে লাগিলেন,

গঙ্গা যার শিরে রহে দুর্গা যার নারী। লখিমী সরস্বতী কুবের ভাণ্ডারী॥
হেন দেব মাথা মুড়ায় যম রাজা ডরে। বসহ[২] চড়িয়া ভিক্ষা মাগে ঘরে ঘরে॥

তাহার পর গোরক্ষনাথের ছড়া বলিতে লাগিলেন,

নাচন্তি গোরক্ষনাথ ঘাঘরের বোলে। সবধন না থাকিল কামিনীর কোলে॥
তিহড়িতে[৩] বুন্দ নাহি নাহি বহে ভাঠা। শুখাইব মহারস কায়া হৈব নাঠা॥
সরোবর শুখায়িল মাছ নিবে চিলে। কেহ্নে পুতা পড়ি মরে কামিনীর কোলে॥

এই বলিয়া যোগী বলিলেন, রাজা তুমি দুইটি নারী ত্যাগ করিতে পারিতেছ

১। অর্থাৎ 'স্বামী'। ২। অর্থাৎ 'বৃষভ।' ৩। বা 'তেহাঁড়িতে।'

না, আর আমি দিল্লী নগরের রাজা ছিলাম, সাত শত রাণী ত্যাগ করিয়া আসিয়াছি।

হাথে লাঠি কাঁধে কাপড় মাথে ঘোড়াচুলি।
সত্য বদন্তি গোরখনাথ নাচে জালন্ধরি॥
জালন্ধরি নৃপতি জালন্ধর দেশ।
শ্রীআদিনাথ কহিয় উপদেশ॥

শেষে যোগী বলিলেন, রাজা তোমার যদি যথার্থ ই যোগী হইবার বাসনা হইয়া থাকে তবে উদনা পদুমাকে মাতৃসম্ভাষণ কর। রাজা তাহাই করিলেন,

দূরে থাক উদনা পদুমা তুহে মোরি মাও।
মএ যাওঁ গুরু সঙ্গে খেতু লৈয়া যাও॥
দূরে ঘুচ উদনা পদুমা না আসিহ মোর পাশ।
তুমি তো ছুয়িতে মোর পিণ্ডবিনাশ।
... ...
আজকা দিনতে তুমি আমার মাতা হৈলে॥

রাণীরা জালন্ধরির নিকট সকাতর হইয়া স্বামিদান চাহিতে লাগিলেন। যোগী বলিলেন, আমি কি করিব? তখন উদনা পদুমা শোকের আতিশয্যে প্রাণত্যাগ করিল। রাজাকে স্ত্রীবধপাতক হইতে উদ্ধার করিবার জন্য যোগী তাহাদিগকে জীয়াইয়া দিলেন। রাজা তখন সর্ব্বস্ব ত্যাগ করিলেন।

হাথেত ধরিয়া পাত্র কোলেতে বৈসাইল। অষ্ট আভরণ রাজা খেতুকে পহিরাইল॥
নবদণ্ড স্বর্ণচ্ছত্র খেতুকে সোপিল। উদনা পদুমা রাণী হাথে হাথে দিল॥
শুন হে দেখত সব বঙ্গের পরজা। আজ হৈতে বঙ্গদেশে খেতু ভেল রাজা॥
ডাক দিয়া আন ব্রাহ্মণ সজ্জন। সভাকে বৈসিতে রাজা দিলেক আসন॥
কর জোড়ি করিয়া মিনতি আমার। আজ হৈতে ভালমন্দ না লাগে আমার॥
বাহুড় পরজা সব যাও বাসা ঘরে। আমাকে মেলায়া দেহ যাইব দেশান্তরে॥

রাজা নাপিত ডাকাইয়া আনিয়া মাথা মুড়াইয়া দিতে বলিলেন। কিন্তু

ছার[১] কাঁদে হাথে লৈয়া খুরে।
মা ময়নামতী কাঁদে অন্তঃপুরে ॥··
··· ···
পায় ধরিয়া কাঁদে উদনা সুন্দরী।
না মুড়াহ মাথা গোসাঁই না ধরহ পানী ॥

রাজা মাথা মুড়াইলেন।

মাথা মুড়িয়া রাজা মনে মনে হাসে।
বড় বড় মুনিজন পায়িল তরাসে ॥

তাহার পর রাজা ও যোগী স্থানান্তরে গেলেন।

হাথেত ভৃঙ্গার লৈয়া গেল বঙ্গেশ্বরে।
বাহুড়িয়া না আইসিল রাজা বাসাঘরে ॥

রাণীরা বিলাপ করিতে লাগিলেন,

রাজা মোরা লৈয়া গেল চণ্ডাল যোগিয়া ॥

কিছুক্ষণ পরে রাজা ও যোগী ফিরিয়া আসিলেন। তাহার পর বিধিমত রাজাকে বিভূতি কন্থা শৃঙ্গ পাত্র যষ্টি মৃগচর্ম্ম ইত্যাদি দান করা হইল। রাজার নূতন নাম হইল 'শৃঙ্গারিয়া।' তাহার পর "কুটুম্বযাত্রা" করিতে রাজা স্বগৃহে ভিক্ষার্থ আসিলেন। ভিক্ষা দিতে গিয়া রাণীরা রাজাকে চিনিতে পারিল।

কাহের ডরে রাউল মুড়ায়িল মাথা।
কাহের ডরে বাউল গলে দিল কাঁথা ॥
হাথ পাও দেখো যোগী পদুমের ফুল।
তুহ্মে যোগী আমি দেখিল রাজা সমতুল ॥

রাজা গুরুর নিকট ফিরিয়া জানাইলেন যে উদনা পদুমা তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে। জালন্ধরি তাঁহাকে গৃহে ফিরিতে আজ্ঞা দিয়া পৃথিবী প্রদক্ষিণে চলিয়া গেলেন।

উপরের উদ্ধৃতাংশ হইতে প্রতীয়মান হইবে যে নাটকটির মূলে ছিল কোন বাঙ্গালা পাঁচালী বা গীতিকা এবং এই গীতিকা কাব্যাংশে নিতান্ত নিন্দনীয় ছিল না।

১। অর্থাৎ 'ক্ষৌরকার' নাপিত।

না। ভাষার সারল্য ও ঋজুতা প্রাচীনত্বদ্যোতক। গল্পের মধ্যে এখানে নূতন পাওয়া যাইতেছে, কোন রাজবংশীয় কুমার অথবা সামন্ত কর্ত্তৃক বঙ্গেশ্বর গোবিন্দচন্দ্রের রাজ্যে উৎপাত করা। খেতুপাত্রের বিশ্বাসঘাতকতাও লক্ষণীয়। বাঙ্গালায় প্রচলিত পাঁচালী ও গীতিকাতে খেতু বা খেতুয়া নামমাত্রে পর্য্যবসিত। দুর্ল্লভ মল্লিকের মতে গোবিন্দচন্দ্র গোলাম খেতুকে বিবাহের যৌতুক হিসাবে পাইয়াছিলেন।

উদুনা করিয়া বিভা পুদুনা পাইলাম দান।
হস্তী ঘোড়া পাইনু আর খেতুয়া গোলাম॥

খেতুর প্রাণরক্ষায় রাণীদিগের আগ্রহ এবং সন্ন্যাসগ্রহণ করিবার প্রাক্‌কালে রাজা কর্ত্তৃক খেতুর হস্তে রাণীদিগকে সমর্পণ হইতে মনে হয় যে খেতু রাজার শ্বশুরবাড়ীর সম্পর্কের লোক ছিল। স্কুর মামুদের মতে খেতুয়া নফর ছিল। রঙ্গপুরে প্রচলিত কাহিনীতে আছে, ময়নামতী খেতুয়াকে কুড়াইয়া পাইয়া গোবিন্দচন্দ্রের সহিত মানুষ করিয়াছিলেন। সন্ন্যাসের পর রাজার গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন দাক্ষিণাত্যে প্রচলিত কাহিনীতে এবং রঙ্গপুরের পাঁচালীতেও আছে। নেপালের নাটকের কাহিনীর শেষাংশের সহিত দুর্ল্লভ মল্লিকের গোবিন্দচন্দ্র গীতের শেষাংশের বেশ মিল আছে।

দুর্ল্লভ মল্লিক বিরচিত গোবিন্দচন্দ্র গীতের গল্পাংশ ও কিছু কিছু কবিতাংশ পূর্ব্বে প্রদত্ত হইয়াছে। বাঙ্গালা দেশে অদ্যাবধি গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে রচিত পাঁচালী বা গীতিকা যাহা পাওয়া গিয়াছে তন্মধ্যে এইখানিই প্রাচীনতম। কাব্যটি শিবচন্দ্র শীল মহাশয় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইয়া ১৩০৮ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল। তখনকার দিনে এইরূপ সুসম্পাদিত প্রাচীন বাঙ্গালা গ্রন্থ আর দ্বিতীয় প্রকাশিত হয় নাই। যে পুঁথি অবলম্বনে কাব্যটি সম্পাদিত হইয়াছে তাহার লিপিকাল ১২০৬ সাল।[১] পুঁথিখানি পশ্চিমবঙ্গে বর্দ্ধমান জেলায় লিখিত ও প্রাপ্ত। পশ্চিমবঙ্গে নাথপন্থী শৈব যোগীদিগের বিষয়ে বিরচিত গ্রন্থের পুঁথি বিশেষ কিছু

১। সম্পাদক মহাশয় ভূমিকায় ১১০৬ সাল লিখিয়াছেন।

অদ্যাবধি পাওয়া যায় নাই। দুর্ল্লভ মল্লিক যেভাবে গল্পের কাঠামো দিয়াছেন তাহা পুরাতন বটে। ভাষাও অনেকটা প্রাচীন। কবি আত্মপরিচয় কিছু দেন নাই। কাব্যটিতে ৭২২ পয়ার শ্লোক আছে। কবির ভণিতা এইরূপ—

দুর্ল্লভ মল্লিকে কহে পয়ারের ছন্দ।
অধোমুখ হইয়া শুন গোবিন্দচন্দ্র ॥

গীতিকাটির ভাষা সরল এবং সবল, এই কারণে এবং বর্ণনায় আড়ম্বর আদৌ না থাকায় বেশ মনোহারী। পূর্ব্বে উদ্ধৃত অংশ হইতে পরিচয় পাওয়া যাইবে। আরও কিছু উদ্ধৃতি দেওয়া গেল।

উদুনা ও পুদুনার কাতরোক্তি—

কার বোলে মহারাজা মুড়াইলে কেশ। কার বোলে যুগী হইয়া যাও দূর দেশ ॥
ফুকরি ফুকরি কান্দে ভালে মারি ঘা। নিদারুণ হইল তোমায় চণ্ডালিনী মা ॥
সভাকার মা পুত্রে আশীর্ব্বাদ করে। ময়নামতী[১] মা বলে যাও দেশান্তরে ॥
খোপের পায়রা নাই ছাড়য়ে পায়রী। কারে দিয়া যাবে তুমি এতেক সুন্দরী ॥
যৌবন হইলে ভাটী দেশান্তরে যাইও তবে যোগ সাধিয়া অমর তখন হইও ॥
ঘর হইল বাহির বাহির হইল বন। আপনার বৈরী হইল আপন যৌবন ॥
পৃ ১৩২-৩৩ ॥

দুর্ল্লভ মল্লিকের গীতে একটি নূতন চরিত্র পাওয়া যাইতেছে—শিশুপা। শিশুপা বা শিশুপাদ জালন্ধরির পুত্র (শিষ্য ?) ছিলেন। শিশুপার প্রসঙ্গে দুর্ল্লভ মল্লিক যাহা বলিয়াছেন সে অংশটুকু নিম্নে সম্পূর্ণ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

যোগসিদ্ধা হাড়িপা কানুফা গোর্ক্ষ মীন। সাতসিদ্ধা অবতার গৃহবাসহীন ॥
ধর্ম্ম-অবতার হইল সিদ্ধা সাত জন। গুরুশাপে হাড়িপা যান পাটীকা ভুবন ॥
গুরুশাপে মীননাথ কদলীর বনে। ফাঁফর হইল যোগী হারাইয়া মহাজ্ঞানে ॥
পাটীকা নগরে রাজা গোবিন্দচন্দ্র ভূপ। জালন্ধরি হাড়িপা হইল হাড়ি রূপ ॥
শিশুপা কুমার এক সঙ্গে করি নিল। নগর-বাহিরে হাড়ি আশ্রম করিল ॥
পাইশালে খাটে হাড়ি রাজার আওয়াসে। বারো বৎসর শাপ হইল অবশেষে ॥

১। পাঠ 'ময়নাতন্ত্রি

রজনী প্রভাতে মুখ করিয়া পাখাল। রাজপুরে গেল হাড়ি ঝুড়িয়ে কোদাল ॥
গুপ্তবেশে হাড়িপা আছয়ে তথায়। শিশুপা কুমার তার পশ্চাতে গোড়ায় ॥
বাহড় বাহড় তারে বলে জালন্ধরি। এখনি আসিব পুত্র তোর বরাবরি ॥
ছাওয়াল চরিত্র তোমার নারিব যাইতে। প্রবোধ না মানে শিশু লাগিল কান্দিতে ॥
বিকল হইল হাড়িপা ক্রন্দন দেখিয়া। প্রবোধ করিলা শিশু নাড়ু কলা দিয়া ॥
সমুখেতে রম্যবন তাহে দিব্য ফল। একে একে জালন্ধরি চাহিল সকল ॥
প্রথমে মাটীর গড় লঙ্ঘিল ত্বরায়। দ্বিতীয়ে লঙ্ঘিল গড় বংশীবট তায় ॥
চারি দিগে চাহি যোগী ধ্যান আরম্ভিল। হুঙ্কারে বৃক্ষ সব ভূমেতে ঠেকিল ॥
হেটমুণ্ড হইল গাছ লোটে ভূমিতল। ছিণ্ডিয়া পুত্রের হাথে দিল নানা ফল ॥
হুহুঙ্কার দিয়া পুন চারিপানে চায়। ততক্ষণে বৃক্ষডাল উঠিয়া দাণ্ডায় ॥
বালাখানায় বসিয়া দেখিল রাজার মা। হাড়ি নয় জানিলাম এই হাঁড়িপা ॥
গুপ্তবেশে বাউলরূপে আছে এই ঠাই। ইহার চেলা করিবা রাজা গোবিন্দাই ॥

পৃ ৩৯-৪০ ॥

এই শিশুপা কে? ইনিই কি গোরক্ষবিজয়ে বা মীনচেতন পাঁচালীতে উক্ত গাভুর (গাবুর) সিদ্ধাই যাঁহাকে দেবী শাপ দিয়াছিলেন?

আজ্ঞা দিল ভবানী বুঝিয়া তার আশ।
বর দিল চলি যাও সংমায়ের পাশ ॥
ভজিবেক সংমাএ দেখিয়া যৌবন।
এহার কারণে তুমি পাইবা অপমান ॥[১]

এই সংমা ময়নামতী কি? তিব্বতীয় তেঙ্গুর গ্রন্থমালায় মহাচার্য্য গর্ভপাদ ও আচার্য্য গর্ব্বরিপাদের রচিত গ্রন্থের উল্লেখ আছে। গর্ভ বা গর্ব্বরিই কি এই গাভুর (গর্ভরূপ)?

দুর্ল্লভ মল্লিক গল্পের কাঠামোয় সুরুচি রক্ষা করিয়াছেন। গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী যে সামাজিক স্তরে উদ্ভূত ও বিকশিত হইয়াছিল তাহা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মাশ্রিত

১। গোরক্ষবিজয়, পৃ ২১, মীনচেতন, পৃ ৪।

ভদ্র জনসাধারণের সমাজ নহে। সে সমাজে নরনারীর সম্পর্কে উচ্ছৃঙ্খলতার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। ইহার প্রমাণ পাইতেছি দেবী কর্ত্তৃক সিদ্ধাদিগকে নিকৃষ্ট-ভাবে ছলনায় ও গোরক্ষনাথকে জুগুপ্সিত প্রলোভন প্রদর্শনে, স্বামীর কর্ত্তৃত্ব ব্যতিরেকে ময়নামতীর সন্তানলাভে[১] এবং খেতুর হস্তে উদনা ও পতুনার সমর্পণে।[২] বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত পাঁচালীর মধ্যে শুধু দুর্ল্লভ মল্লিকের গীতেই এই রুচি ও সমাজবিরুদ্ধ ব্যাপার চালিয়া সাজা হইয়াছে। দুর্ল্লভ মল্লিক রাণী ময়নামতীর মুখে বলাইয়াছেন,

তোর পিতা মোর তরে করয়ে তরাস।
মোরে ভয় করি রাজা বঞ্চে গৃহবাস॥
তখন আমার গর্ভ হইল ছয় মাস।
সেই গর্ভে গোবিন্দচন্দ্র তোমার প্রকাশ॥

গোবিন্দচন্দ্র যখন রাণীদিগকে বলিলেন,

আমারে দেখিতে যেমন ছয় কুড়ি রাণী।
খেতুয়া লইয়া রাজ্য করহ তেমনি॥

দুর্ল্লভ মল্লিক রাণীদিগকে বলাইতেছেন,

রাণী বলে হায় হায় কহ একি কথা। তোমার মনে নহে বুঝি মোরা পতিব্রতা॥
নারী দোচারিণীর পুরুষ সিদ্ধ নয়। স্বামীর অর্দ্ধ অঙ্গ নারী সর্ব্বশাস্ত্রে কয়॥

সিদ্ধাদের শাপপ্রাপ্তি দুর্ল্লভ মল্লিকের মতে দেবী হইতে নহে, গুরু হইতে। ইহা উপরে উদ্ধৃত অংশে দ্রষ্টব্য।

মল্লিক মহাশয় ধর্ম্মঠাকুরের উপাসক ছিলেন, ইনি সর্ব্বপ্রথমে ধর্ম্মকে বন্দনা করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন।

প্রথমে বন্দিলাম ধর্ম্ম আদ্যের গোসাঞী।
যার অগোচর কিছু ত্রিভুবনে নাঞী॥

১। এক রাত্রি না বঞ্চিল স্বামীর বাসরে।
এক পুত্র হইল মুনি গোরখের বরে॥ সুকুর মামুদ রচিত পাঁচালী [গোপীচন্দ্রের গান, পৃ ৩৯৮]; রঙ্গপুরের পাঁচালী [ঐ, পৃ ৪৮] দ্রষ্টব্য।

২। নেপালের নাটককাহিনী দ্রষ্টব্য।

সাত সিদ্ধাকে ইনি ধর্ম্মের অবতার বলিয়াছেন,

ধর্ম্ম অবতার হৈল সিদ্ধা সাত জন। পৃ ৪২ ॥

দুর্ল্লভ কহেন হাড়ি ধর্ম্ম অবতার।

বিপদসাগরে গুরু মোরে কর পার ॥ পৃ ৬৩ ॥

ভবানীদাস এবং স্কুর মামুদ উভয়েই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে কিংবা ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। ভবানীদাসের পাঁচালীর পুঁথি ত্রিপুরা ও চাটিগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। ভবানীদাস সম্ভবতঃ ত্রিপুরা অঞ্চলের লোক ছিলেন, ইনি স্থানগুলি সব এই অঞ্চলেই ফেলিয়াছেন। ভবানীদাসের গীতে হাড়িপাকে মাটিতে পুঁতিয়া ফেলিবার কথা নাই। ইনি অদুনা পদুনা ছাড়া আরও দুই রাণীর নাম করিয়াছেন—রতনমালা ও কাঞ্চনমালা। ভবানীদাসের পাঁচালী শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী ও শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ দত্ত কর্ত্তৃক ময়নামতীর গানে[১] এবং বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত গোপীচন্দ্রের গানে[২] মুদ্রিত হইয়াছে।

ভবানীদাসের ভণিতা এইরূপ—

শুন হে রসিক জন একচিত্তমন।

কহেন ভবানীদাস অপূর্ব্ব কথন ॥

স্কুর মামুদের পাঁচালী ১৩১৯ সালে মুন্‌শী গোলাম রসুল খোন্দকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত হয়। এই প্রকাশিত সংস্করণই গোপীচন্দ্রের গানে [পৃ ৩৯৭-৫০৩] পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে। গ্রন্থ মধ্যে কবির এইটুকু পরিচয় পাওয়া যায় যে, ইঁহার প্রকৃত নাম ছিল আবদুল স্কুর।

আবদুল স্কুর নাম পিতায় রাখিল।

স্কুর মামুদ নাম কুলেতে রাখিল ॥ পৃ ৪৮৪ ॥

শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী বলিয়াছেন যে তাঁহার নিকট স্কুর মামুদের

১। ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ গ্রন্থমালা ৩ (১৩২১)।

২। শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য, দীনেশ চন্দ্র সেন এবং শ্রীযুক্ত বসন্তরঞ্জন রায় সম্পাদিত (১৯২২-২৪), পৃ ৩১৩-৩৯৪।

পাঁচালীর এক পুঁথি আছে, তদনুসারে কবির বাসস্থান সিন্দুরকুসুমী গ্রামে, এই গ্রাম রামপুর বোয়ালিয়ার প্রায় ছয় মাইল উত্তর পূর্ব্বে। ইহা ব্যতীত সুকুর মামুদ সম্বন্ধে আর কিছু জানা যায় না।

সুকুর মামুদের ভণিতা এইরূপ—

মায়ের বচনে যোগী ছাড়ে গৃহবাস।
সুকুর মামুদে কয় রাজার সন্ন্যাস॥

এক স্থলে 'আলিমউদ্দীন' ভণিতা আছে।

লিখি পাঠ পত্রেতে দিল পদুনার হাথে,
তিন রাণী মনে হৈল দুখী।
আলিমউদ্দীন কয়, ভাবিলে বাড়িবে লয়,
ছাত্রগণ আছে ইহার সাক্ষী॥ পৃ ৪৭৮॥

সুকুর মামুদের গীতে অদুনা পদুনা ছাড়া আর দুই রাণীর উল্লেখ আছে, চন্দনা ও ফন্দনা। ইহাতে ময়নামতীর পরীক্ষার কথা নাই। সুকুর মামুদের মতে হাড়িপাকে রাজা বিষ খাওয়াইয়াছিলেন।

রঙ্গপুর অঞ্চলে প্রচলিত গীতির একটি সংক্ষিপ্ত রূপ গ্রীয়ার্‌সন সাহেব ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দে বঙ্গীয় রয়্যাল এসিয়াটিক সোসাইটির পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই গীতির পূর্ণাঙ্গ রূপের পরিচয় শ্রীযুক্ত বিশ্বেশ্বর ভট্টাচার্য্য মহাশয় ১৩১৫ সালের বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত করেন। পরে উভয় পাঠ মিলাইয়া ও অপর পাঠান্তর বিবেচনা করিয়া ভট্টাচার্য্য মহাশয় রঙ্গপুরের পাঁচালী কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত গোপীচন্দ্রের গানে প্রকাশিত করিয়াছেন। ভবানীদাসের পাঁচালীর সহিত রঙ্গপুরের গীতির ভাবে ও ভাষায় বিশেষ সৌসাদৃশ্য আছে, এমন কি অনেক স্থলে ছত্রে ছত্রে মিল আছে।[১]

সমাজের নিম্নস্তর হইতে উদ্ভূত হইলেও গোবিন্দচন্দ্রের গাথা শুধু বঙ্গদেশে নহে ভারতবর্ষের প্রায় সর্ব্বত্রই প্রচারিত হইয়াছিল। তরুণ রাজপুত্রের সন্ন্যাস-

১। ঐ ভূমিকা, পৃ ১৩, ৪৪-৫০।

গ্রহণ কাহিনী ভারতবাসীর কোমল চিত্ত অতি সহজেই আকৃষ্ট করিয়াছিল। তাহার উপর মা হইয়া পুত্রকে সন্ন্যাসী করাইতেছেন—ইহার মত করুণ কাহিনী আর কি হইতে পারে? উত্তর বঙ্গের শৈব যোগী বা "যুগী" ভিখারীরা ইহা গাহিয়া মহারাষ্ট্র হইতে উড়িষ্যা পর্য্যন্ত সমগ্র উত্তরাপথের জনসাধারণের চিত্ত মুগ্ধ ও আর্দ্র করিয়া দিয়া কাহিনীটিকে রামায়ণ কথার তুল্য মর্য্যাদা দিয়া গিয়াছেন। উত্তর এবং উত্তরপূর্ব্ববঙ্গ ছাড়া বাঙ্গালা দেশের অন্যত্র এই কাহিনী বিশেষ আদৃত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয় না। রাঢ় ও সমতট অঞ্চল বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ্য ধর্ম্মের ও তদুচিত শিষ্টাচারের বিশেষ অনুগত ছিল। ইহাতে কোন দেবতার মাহাত্ম্য গীত না হওয়ায় এবং তথাকথিত নীচ জাতির মধ্যে প্রচলিত থাকায় দক্ষিণপশ্চিম ও দক্ষিণ বঙ্গে গোবিন্দচন্দ্রের কাহিনী মোটেই সমাদর লাভ করিতে পারে নাই। পশ্চিমবঙ্গের কবিদিগের মধ্যে কেবল দুর্ল্লভ মল্লিক এই কাহিনী অবলম্বনে গীত রচনা করিয়াছিলেন। ইনি ধর্ম্মঠাকুরের পূজারী ছিলেন বলিয়া বোধ হয়। রাঢ়ে যুগীরা ধর্ম্মের উপাসকদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছিল। সহদেব চক্রবর্ত্তীর ধর্ম্ম-পুবাণের একটি প্রধান অংশ লইয়াছে মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী।

ময়নামতী-গোবিন্দচন্দ্র কাহিনী বিশ্লেষণ করিলে এই মূল তথ্যগুলি পাওয়া যায়—

(১) ময়নামতী শৈব তান্ত্রিক যোগিনী ছিলেন, এবং হাড়িপা ইঁহার সাধনসঙ্গী ছিলেন।

(২) পুত্র গোবিন্দচন্দ্রের জন্মে ইঁহার স্বামীর কর্ত্তৃত্ব ছিল না।

(৩) পুত্র বড় হইলে তাহাকে সিংহাসন হইতে অন্ততঃ কিছু কালের জন্যও অপসৃত করিয়াছিলেন এবং এই কার্য্যে হাড়িপা তাঁহার সহযোগিতা করিয়াছিলেন।

মীননাথ-গোরক্ষনাথের কাহিনী দুর্ল্লভ মল্লিকের এবং সুকুর মামুদের গীতে উল্লিখিত হইয়াছে।

দুর্ল্লভ মল্লিক বলিয়াছেন,

মাটীর ভিতর হাড়ি দ্বাদশ বৎসর। মীননাথ বন্দী আছে কদলী নগর॥
মীননাথের গুরু গোর্ক্ষনাথ চেলা। করিয়া গুরুর তত্ত্ব অনেক ভ্রমিলা॥

হাড়িপার চেলা নাম কানুফা যুগিয়া। সেহ বেড়ায় আপন গুরুরে চাহিয়া॥
গুরু অন্বেষণে দুহে করিছে ভ্রমণ। অন্তরিক্ষে দুই চেলায় হইল মিলন॥
কানুফা বলেন গোর্ক্ষ কর অবধান। কদলীতে তোমার গুরু হারায়েছে জ্ঞান॥
ভেড়ারূপে বান্ধা আছে কদলী নগরে। উদ্ধার কর পাছে আজি কালি মরে॥
সহরে পুরুষ নাই সব নারীগণ। নটিনী হইয়া যাও গুরু-অন্বেষণ॥
তবে গোর্ক্ষনাথ কয় কানুফা যুগীরে। জালন্ধরি গাড়া আছে মাটীর ভিতরে॥
পাটীকানগরের কথা গোর্ক্ষনাথ কয়।[১] অজ্ঞান বালক হয়্যা পাটীকাতে যাও॥
গোর্ক্ষনাথ গেল চলি কদলী শহর। শিশু যে কানুফা আইলা পাটীকানগর॥
পৃ ১২৩-২৪॥

স্কুর মামুদ হাড়িপার জবানীতে বলিয়াছেন,

এইরূপে ভ্রমিনু আমি গুরু তলাসিতে। রাত্রি হইল আমার সহর কদলীতে॥
তোমার গুরু মীন্যাথ আছে কদলী সহরে। রাত্রদিন থাকে নাথ নটিনীর বাসরে॥
নটী লয়ে মীন্যাথ সিদ্ধা হয়্যাছে বিভোর। চুল দাড়ি পাকেছে সিদ্ধা যাবে যমনগর॥[২]

সহদেব চক্রবর্ত্তী ১৭৩৫-৩৬ খ্রীষ্টাব্দে ধর্ম্মপুরাণ বা অনিলপুরাণ রচনা করেন। এই কাব্যে বর্ণিত কাহিনীর মধ্যে মীননাথ-গোরক্ষনাথের উপাখ্যান অন্যতম। এ বিষয়ে পূর্ব্বে ধর্ম্মমঙ্গল প্রসঙ্গে আলোচনা করিয়াছি।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎকর্ত্তৃক মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্য-বিশারদ মহাশয়ের সম্পাদকতায় ১৩২৪ সালে প্রকাশিত গোরক্ষবিজয় এবং ঢাকা সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক শ্রীযুক্ত নলিনীকান্ত ভট্টশালী মহাশয়ের সম্পাদকতায় ১৩২২ সালে প্রকাশিত মীনচেতন একই গ্রন্থ বলিলে ভুল করা হয় না। একটি পুঁথির পুষ্পিকায় আছে "ইতি মীননাথচৈতন্য গোরক্ষবিজয় সমাপ্ত।" উভয় নামই তুল্যরূপে উপযোগী। মীনচেতন পুস্তকে কেবল দুই স্থানে মাত্র রচয়িতা শ্যামদাস সেনের নাম আছে, অন্যত্র ভণিতা নাই। আর গোরক্ষবিজয়ের আটখানি পুঁথির মধ্যে কেবল একখানিতে অন্য ভণিতার সহিত শ্যামদাস সেনের ভণিতা আছে,

১। অতিরিক্ত চরণ—'কপট করিয়া তুমি শিশুরূপ হও।'
২। গোপীচন্দ্রের গান, পৃ ৪২৫।

একটিতে কবীন্দ্র বা কবীন্দ্র দাসের ও ফয়জুল্লার ভণিতা আছে, তিনখানি পুঁথিতে ভীমদাস এবং ফয়জুল্লার ভণিতা আছে, আর বাকি তিনটি আদ্যন্তখণ্ডিত পুস্তকে শুধু ফয়জুল্লার ভণিতা আছে।[১] এইরূপ অবস্থায় প্রকৃত রচয়িতা কে তাহা নির্ণয় করা দুরূহ। সম্ভবতঃ শ্যামদাস ফয়জুল্লা ভীমদাস ইত্যাদি গায়ক ছিলেন মাত্র, মূল রচয়িতা হয়ত কবীন্দ্র দাস কিংবা আর কেহ হইবেন।[২] গোরক্ষবিজয়ের মুদ্রিত সংস্করণের ভাষা মীনচেতনের ভাষা হইতে বিশুদ্ধতর, ইহাতে কয়েকটি অধ্যাত্মতত্ত্বঘটিত আরবী-ফারসী শব্দ আছে। সুতরাং যে পুঁথি বা পুঁথিগুলি অবলম্বনে পুস্তকটি সম্পাদিত হইয়াছে তাহার রচনায় অথবা সংস্কারে ফয়জুল্লার হাত ছিল বলিয়া মনে হয়। গোরক্ষবিজয়ের প্রাচীনতম পুঁথির লিপিকাল ১১৮৪ সাল, আর মীনচেতন পুঁথির লিপিকাল ১২২৪ সাল।

শ্যামদাস সেন অথবা ভীমদাস সম্বন্ধে কিছুই জানা নাই। কবীন্দ্র দাস সম্বন্ধেও তাহাই। ইঁহাকে যাঁহারা পরাগলী মহাভারতের রচয়িতা কবীন্দ্র বলিয়া মনে করেন তাঁহারা শুদ্ধ নামসাদৃশ্যে ভ্রান্ত হইয়াছেন। ফয়জুল্লা নামে এক মুসলমান পদকর্ত্তার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।[৩] ইনিও চাটিগ্রাম অঞ্চলের লোক, সুতরাং ইনি গোরক্ষবিজয়ের রচয়িতা বা সংস্কর্ত্তা ফয়জুল্লার সহিত অভিন্ন হইলেও হইতে পারেন।

উপরে প্রদত্ত মীননাথের উপাখ্যানের বর্ণনা হইতে গোরক্ষবিজয় পাঁচালীর কিঞ্চিৎ পরিচয় পাওয়া যাইবে। ইহাতে কবিত্বের বালাই বড় নাই, তবে অধ্যাত্মবিষয়ক ছড়াগুলির বর্ণনা সরল ও মনোরম। যেমন, গোরক্ষনাথ সঙ্কেতে গুরুকে আত্মচৈতন্য দিতেছেন,

পখরীতে পানি নাই পাড় কেনে বুড়ে। বাসা ঘরে ডিম্ব নাই ছাও কেনে উড়ে॥
নগরে মনুষ্য নাহি ঘরে ঘরে চাল। আন্ধলে দোকান দিয়া খরিদ করে কাল[৪]॥

১। গোরক্ষবিজয় পৃ [৬]-[৮], (২)-(৩)।

২। কবীন্দ্র বচন শুনি ফজুল্লাএ ভাবিয়া।
মীননাথ গুরুর চরিত্র বুঝাইয়া॥ গোরক্ষবিজয়, পৃ ১৩০।

৩। HBL, পৃ ৪৬৪।

৪। অর্থাৎ কালা।

ঝিম যাউক তরিতে বরিষা যাউক মীন। ঝাঁপিয়া তরিতে পারে সমুদ্র গহীন ॥
মুখখানি ছাল গুরু জিহ্বাখানি ফাল। অমর পাটনে যেন যেতে করে হাল (?) ॥[১]
উচ্চনীচ ভূমিখানি তাতে কৃষি হয়। যদি হয়ে গৃহবাসী সে ভূমি চষয় ॥
প্রথম প্রহর রাত্রি আলস্য বিস্তরে। আতুর তাহাতে নিদ্রা সদা বসি করে ॥
ইঙ্গলা পিঙ্গলা দুই উজানি বাহিয়া। আনন্দে শুনহ ধ্বনি চৈতন্য রহিয়া ॥

১। পাঠান্তর দ্রষ্টব্য [পৃ ১১৮]।

চতুঃপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

বিবিধ লৌকিক কাহিনীঃ গীত

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিক্রমাদিত্যের কাহিনী, দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকা, বেতাল পঞ্চবিংশতি প্রভৃতি গালগল্প অবলম্বনে কাব্যকাহিনী রচনা বিশেষরূপে প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইহাতে হিন্দী অথবা ফারসীর প্রভাব কম ছিল না। পূর্ব্বে দেখিয়াছি যে মুসলমান কবিদিগের হস্তে সপ্তদশ শতাব্দী হইতে ফারসী উপকথা কাব্যের উপজীব্য হইয়াছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে এই জাতীয় উপাখ্যান কাব্য প্রচুর পরিমাণে রচিত হইয়াছিল, ইহা পরে আলোচিত হইবে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত বলিয়া নিঃসন্দেহে জানা গিয়াছে এমন দুই একটি মাত্র কাব্যের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে।

কলিকাতা হইতে ১৭৯৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত ফর্স্‌টারের অভিধানে (Forster's Vocabulary, English and Bengali) রামলোচন দে দাস বিরচিত বিক্রমাদিত্যরাজোপাখ্যান বা বিক্রমাদিত্যচরিত্র হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত হইয়াছে। উদ্ধৃত অংশ হইতে কবির সম্বন্ধে এইটুকু পরিচয় পাওয়া যাইতেছে যে, ইঁহার বাস ছিল ভাগীরথীর পশ্চিমে ও সরস্বতীর পূর্ব্বে চন্দনপুর গ্রামে।

স্বর্ধুনীর পশ্চিমে পূর্ব্বেতে সারদার। অগ্নিকোণে কাছে হুগ্লি রাজধানী তার॥
চন্দনপুরেতে বাস শ্রীরামলোচন। দেব দাস পাঁচালীতে করিল যোটন॥

পৃথ্বীচন্দ্র ১৮০৬-০৭ খ্রীষ্টাব্দে রচিত তাঁহার গৌরীমঙ্গল কাব্যে তাঁহার সময়ে প্রচলিত সাহিত্যের যে ফিরিস্তি দিয়াছেন[১] তাহা হইতে জানিতে পারি যে বিক্রমাদিত্যের কাহিনী চোরচক্রবর্ত্তী কাহিনী ইত্যাদি কাব্য এবং রাধাবল্লভ শর্ম্মা রচিত স্মৃতিশাস্ত্র ও আয়ুর্ব্বেদ এবং জ্যোতিষ শাস্ত্রের পদ্যানুবাদ প্রচলিত ছিল।

১। ষট্‌পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

স্মৃতি ভাষা কৈল রাধাবল্লভ শর্ম্মন ॥
বৈদ্যক করিয়া ভাষা শিখে বৈদ্যগণে।
জ্যোতিষ করিয়া ভাষা শিখে সর্ব্বজনে ॥
চোরচক্রবর্ত্তী-কীর্ত্তি ভাষায় করিল।
বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি ভাষায় রচিল ॥

"পশুপতি কাশীশ্বর দেব" রচিত এবং গোলাম মওলা সিদ্দিকী সংশোধিত চোর চক্রবর্ত্তীর পাঁচালী বলিয়া একটি গ্রন্থ হবিবি প্রেস হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচয়িতা কৃষ্ণহরি দাসও এই জাতীয় একখানি কাব্য রচনা করেন।[১]

অষ্টাদশ শতাব্দীতে গদ্যে রচিত একটি বিক্রমাদিত্যের গল্প পাওয়া গিয়াছে।[২] গল্পটির ভাষা ও বর্ণনভঙ্গী মুখের কথার মত সরল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহ (মৃত্যুকাল ১২২৮ সাল) ভারতীমঙ্গল নামে যে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন তাহাতে কালিদাসের বরলাভ কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।[৩] ইনি একটি মনসামঙ্গল কাব্য এবং রাজমালা নামে একটি ঐতিহাসিক কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। শেষোক্ত কাব্য দুইটি রাজা কমলকৃষ্ণ সিংহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতীমঙ্গল রাজসিংহের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা কিশোরীসিংহের জীবৎকালে রচিত হইয়াছিল। কিশোরীসিংহের মৃত্যুকাল ১১৯২ সাল। সুতরাং কাব্যটি ১৭৮৫-৮৬ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই রচিত হইয়াছিল।

সীতানাথ করের তামাকুপুরাণের পুঁথির লিপিকাল ১২১২ সাল।[৪] পুঁথি কবির মূল লেখা না হইলে কাব্যটি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষপ্রান্তে রচিত হইয়া থাকিবে।

বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের রাজ্যকালে (১৭৭৯-১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ) বর্দ্ধমান জেলার উত্তরাংশে বলগনা গ্রামবাসী রামমোহন ন্যায়বাগীশ শান্তিশতকের পদ্যানুবাদ করেন। কবিপরিচয় এই—

১। অলকা আষাঢ় ১৩৪৬, পৃ ৩৬৪-৬৬ ; ব-সা-প-প ৪৫, পৃ ২১৫-২২১।
২। ব-সা-প-প ১৯, পৃ ১২১-১২৪, বাঙ্গালা সাহিত্য গদ্য, পৃ ১২-১৬।
৩। আরতি তৃতীয় বর্ষ, পৃ ১৬৮, বা-প্র-পু-বি ১-১, পৃ ২৩১।
৪। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত পরিশিষ্ট ১, পৃ ১২।

বর্দ্ধমানপুরে ধাম, তেজশ্চন্দ্র যার নাম মহারাজাধিরাজ বিদিত।
তাঁর রাজ্যে আছে গ্রাম বলগনা বিখ্যাত ধাম, সাহাবাদ পরগনা ঘটিত॥
সেই গ্রাম নিজধাম, শ্রীরামমোহন নাম, উপনাম শ্রীন্যায়বাগীশ॥
শান্তিশতকের অর্থ পয়ারেতে কহে তথ্য, শুনি সভে করিবে আশীষ॥[১]

পদাবলীর ঢঙ্গে নহে, সাধারণ সঙ্গীতের ঢঙ্গে গান রচনা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বিশেষ করিয়া প্রচলিত হয়। এই গান দেবদেবীর মাহাত্ম্য বা অধ্যাত্ম বিষয়ক অথবা আদিরসঘটিত ছিল। ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলে এইরূপ গান কয়েকটি পাইতেছি। রামপ্রসাদ অনেকগুলি চমৎকার অধ্যাত্মবিষয়ক গান রচনা করিয়াছিলেন।

ক্লাইবের পরবর্ত্তী গভর্ণর ভ্যান্‌সিটার্টের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ভূকৈলাসের মহারাজা জয়নারায়ণের পিতা কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল ৺১৭৬৯ সালের দিকে বহু লোক জন লইয়া গঙ্গার উপর দিয়া নৌকা করিয়া তীর্থযাত্রা করেন। ইছামতী নদীতীরস্থ ভাজনঘাট নিবাসী বৈদ্য বিজয়রাম সেন বিশারদ কৃষ্ণচন্দ্রের একজন সহযাত্রী ছিলেন। তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে যাতায়াতের বিবরণ লইয়া একটিঃ কাব্য রচনা করেন, কাব্যটির নাম তীর্থমঙ্গল।[২] ইহা ১১৭৭ সালে অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দে ভাদ্র মাসে সম্পূর্ণ হয়।

সাতাত্তরি সনেতে আর ভাদ্রপদ মাসে। বিশারদে কহে পুথি কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে॥
শিবানবাস সন্নিধানে ভাজনঘাট নাম। কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে কহে সেন বিজয়রাম॥
পৃ ২২৭॥

গঙ্গাতীরের উভয় পার্শ্বস্থ অনেক গ্রাম নগরাদির কিছু কিছু বর্ণনা থাকায় কাব্যটির যথেষ্ট ঐতিহাসিক মূল্য আছে। তখনকার দিনের সামাজিক ব্যাপারেরও আভাস কিছু কিছু ইহাতে পাওয়া যায়।

১। বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ১৮১।
২। কবির স্বহস্তলিখিত ১৬৯২ শকাব্দের মাঘ মাসের অর্থাৎ ১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দের পুঁথি অবলম্বনে নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয় কর্তৃক সম্পাদিত ও বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্তৃক প্রকাশিত (১৩২২)।

গ্রন্থের শেষ ভাগে কবি ঘোষাল পরিবারের মঙ্গলকামনা করিয়াছেন।

কৃষ্ণচন্দ্রে কালীমাতা তুমি দিবা বর। পুত্রে পৌত্রে চিরজীবী রাখ্য নিরন্তর ॥
দুর্গা দুর্গা দুর্গা মাতা তোমার দোহাই। কৃষ্ণচন্দ্রে জয়যুক্ত রাখিবা সদাই ॥
যেই কর্ম্ম কৃষ্ণচন্দ্রে করিলা সবার। এই কর্ম্ম করে হেন শক্তি আছে কার ॥
গোকুলচন্দ্রে কালী মাতা তুমি বর দিবা। বাঙ্গালার কর্ত্তা করি সদাই রাখিবা ॥
দেওয়ানজীর সম দাতা নাহি এই দেশে। তাঁহার গুণের কথা দেশে দেশে ঘোষে ॥
আঠারো শত দীনে করেন নিত্য চালু দান। এ জন্যেতে দেওয়ানজীর সদাই খোস-নাম ॥
চাকর্যা লোকের দুঃখ নাহি তার কাছে। এই হেতু সর্ব্বজন ঘুরে পাছে পাছে ॥
বৈশাখে সলিল দিয়া দেশ করেন মরু। কবিরাজে তুষ্ট কৈলে হবেন কল্পতরু ॥
জয়নারায়ণ বাবুকে চণ্ডী দিবা বর। চিরজীবী পুত্র তাঁর হউক সত্বর ॥
অল্পবয়সে বাবুর অতি তীব্র বুদ্ধি। যেই কর্ম্ম মনে করেন হয়্যা উঠে সিদ্ধি ॥
পৃ ২২৬-২৭ ॥

গঙ্গারাম রচিত মহারাষ্ট্রপুরাণ সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে রচিত কাব্য। ইহাতে ১১৪৯-৫০ সালে মারাঠা বর্গীদিগের দ্বারা বাঙ্গালা দেশ লুণ্ঠন ও মারাঠা সেনাপতি ভাস্করপণ্ডিতের নিধন বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যটি ১৬৭২ শকাব্দে ১১৫৮ সালে অর্থাৎ ১৭৫১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল।[১]

কাব্যের শেষে একমাত্র ভণিতা "কবি গঙ্গারাম" ব্যতীত কবির বিষয়ে কিছুই জানা নাই। শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অনুমান করেন, ইনিই নড়াইলবাসী কবি গঙ্গারাম দত্ত।[২] ঘটনার আট বৎসর পরে কাব্যটি রচিত হইয়াছিল, সুতরাং ইহাতে কবির সাক্ষাদ্দৃষ্ট ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। এই হিসাবে নিবন্ধটি বাঙ্গালা সাহিত্যে একক। বিষয়বস্তুর গৌরব ছাড়া কাব্যটির অন্য কোন গুণ নাই।

১। ব্যোমকেশ মুস্তফী মহাশয় কর্তৃক এই কাব্য সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় [১৩, পৃ ২০৯-৩৬] প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশিত কাব্য ময়মনসিংহ অঞ্চলের পুঁথি হইতে মুদ্রিত [ঐ, পৃ ১৯৩] ইহার পুষ্পিকায় আছে "ইতি মহারাষ্টা পুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাস্কর পরাভব ॥ সকাব্দা ১৬৭২ সন ১১৫৮ সাল ॥ তারিখ ১৪ পৌষ রোজ শনিবার।" [ঐ, পৃ ২৩৬]। কবি প্রথম কাণ্ড ছাড়া আর লিখিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তারিখটি রচনাকাল।

২। একচত্বারিংশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

গঙ্গারাম "পুরাণ" রচনা করিতেছেন, সুতরাং কাব্যের আরম্ভও পুরাণের ধাঁচে হইয়াছে—পৃথিবীতে লোকে রাধাকৃষ্ণ না ভজিয়া বিবিধ পাপকর্ম্মের অনুষ্ঠানে মত্ত হইয়াছে। পৃথিবী জর্জ্জরিত হইয়া ব্রহ্মার নিকট গেলেন প্রতীকারের জন্য। ব্রহ্মা পৃথিবীকে লইয়া শিবের নিকট গেলেন। ব্রহ্মার স্তবে শিব সন্তুষ্ট হইলেন এবং সকল কথা শুনিয়া পৃথিবী ও ব্রহ্মাকে আশ্বাস দিয়া বলিলেন,

পাপিষ্ঠ মারিছি আমি দূত পাঠাইঞা ॥

ব্রহ্মাকে বিদায় দিয়া শিব ভাবিতে লাগিলেন, ভাবিতে ভাবিতে এক উপায় তাঁহার মনে পড়িল।

নন্দীকে দেখিয়া শিব বলিছে বচন। দক্ষিণ শহরে তুমি যাহ ততক্ষণ ॥
সাহু রাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে। অধিষ্ঠান হও যাইয়া তাহার কণ্ঠেতে ॥
বিপরীত পাপ হইল পৃথিবী উপরে। দূত পাঠাইঞা যেন পাপীলোক মারে।
পৃ ২১১-১২ ॥

নন্দী গিয়া সাহু রাজার উপর ভর করিল। সাহু রাজা রঘু রাজাকে বলিল, অনেক দিন হইল বাঙ্গালাদেশের চৌথ আসে নাই, তুমি বাদশাহের নিকট পত্র লেখ, বাঙ্গালার চৌথ দিতেছে না কেন। দূত বাদশাহের নিকট হইতে এই লিখন আনিল—

চাকর হইয়া মারিলে স্থবারে। জবর হইল লালবন্দি না দেয় মোরে ॥
লোক লস্কর তবে নাই আমার স্থানে। হেন কোন জন নাই তারে নিয়া আনে ॥
বাঙ্গালা মুলুক সেই ভুঞ্জে পরম স্থখে। দুই বৎসর হইল লালবন্দি না দেএ মোকে ॥
জবর হইঞা সেই আছে বাঙ্গালাতে। চৌথের কারণে লোক পাঠাহ[১] তথাতে ॥[২]

চৌথ আদায় করিতে ভাস্করপণ্ডিতকে বাঙ্গালায় পাঠান হইল। ভাস্কর নাগপুর হইয়া পঞ্চকোটে পহুঁছিল। সেখানে চরের মুখে সংবাদ পাইল,

বর্দ্ধমান সহরে রাণীর দীঘীর পাড়ে[৩]
নবাব আছে সেইখানে ॥

১। পাঠ 'পাঠায়।' ২। পৃ ২১৩। ৩। পাঠ 'পরে।'

ভাস্কর রাতারাতি নিঃশব্দে যাত্রা করিল।

বৈশাখের উনিশা যাএ, বরগী আইলা তাএ মহা আনন্দিত হইয়া মনে ॥
বীরভূঁই[১] বামে থুইয়া গোয়ালা ভুঁইর কাছ হইয়া আসিয়া ঘেরিল বর্দ্ধমানে ॥

বর্গী সৈন্য চুপি চুপি আসিয়া চারিদিকে ঘিরিয়া ফেলিল, নবাবের প্রহরী সৈন্য কিছুই টের পাইল না। প্রভাতে রাজারাম নবাবকে জানাইয়া বলিল,

ইহা আমি না জানিল, আচম্বিতে সৈন্য আইল,
আসিয়া ঘেরিল লস্করে ॥

নবাব কিছুক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, কোথা হইতে সৈন্য আসিয়াছে তাহার সন্ধান কর। হরকরা অবিলম্বে সংবাদ আনিল—

চব্বিশ জমাদার ভাস্কর সরদার চল্লিশ হাজার ফৌজ লইঞা।
সেতারা গড় হইতে বরগী আইল চৌথ নিতে সাহুরাজার হুকুম পাইঞা ॥

নবাব ভাস্করের নিকট উকীল দিয়া বলিয়া পাঠাইলেন, বাঙ্গালার চৌথ তো বাদশাহের কাছ হইতে যায়, বাঙ্গালায় তাহার কি? ভাস্কর বলিল, বাদশাহের হুকুম হইয়াছে বাঙ্গালায় গিয়া চৌথ আদায় করিয়া লইতে, চৌথ না পাইলে আমি যুদ্ধ ও দেশলুণ্ঠন করিব। এই কথা অবগত হইয়া নবাব সিপাহী জমাদারদিগকে চৌথ আদায় করিতে বলিলে তাহারা বলিল,

আমরা যত লোকে মারিব বরগীকে দেশে যেন আইসিতে[২] নাই পারে[৩]।
বরগী সব মারিব, দেশে আসিতে[২] না দিব, কি করিতে পারে ভাস্করে ॥

শুনিয়া নবাব খুসী হইয়া তাহাদিগকে পান দিয়া পুরস্কৃত করিলেন। এদিকে ভাস্করও তাহার সৈন্যদিগকে লুট পাট করিতে হুকুম দিল। ফলে

একদিন দুইদিন করি সাতদিন হইল। চতুর্দ্দিকে বরগীতে রসদ বন্ধ কৈল ॥
মুদী বাণিঞা যত বার হৈতে নারে। লুটে কাটে মারে ছামুতে পাএ যারে ॥
বরগীর তরাসে কেহ বাহির না হএ। চতুর্দ্দিকে বরগীর তরে রসদ না মিলএ ॥
কলার আঁঠিয়া[৪] যত আনিল তুলিয়া। তাহা আনি সব লোকে খায় সিজাইয়া ॥

১। পাঠ 'বিরভুই।' ২। পাঠ 'আইস্তে।'
৩। পাঠ 'পরে।' ৪। পাঠ 'আইঠা।'

ছোট বড় লস্করে যত লোক ছিল। কলার আঁঠিয়া সিদ্ধ সব লোকে খাইল॥
বিষম বিপত্তি[১] বড় বিপরীত হইল। অন্তে[২] পরে কা কথা নবাব সাহেব খাইল॥

এইরূপে চৌদ্দ দিন কাটিল, অনশন সহ্য করিতে না পারিয়া ফৌজ লইয়া নবাব কুচ করিয়া চলিলেন। সম্মুখযুদ্ধে অপারক হইয়া বর্গী নবাবের পিছুপিছু দেশ লুটিতে লুটিতে চলিল। নবাবের পশ্চাদ্‌রক্ষী সেনাপতি মোসাহেব খাঁ নিকুন[৩] সরাইয়ে বর্গীদিগকে আটকাইল, নবাব সাহেব কাটোয়া পহুঁছিলেন। তথায় হাজি সাহেব নৌকায় করিয়া গঙ্গার ওপার হইতে রসদ পাঠাইল।

তবে রসদ আসিয়া কাটঞাতে পহুঁছিল।
নবাব সাহেবের লোক খাইয়া বাঁচিল॥

নবাব কাটোয়ায় পলাইয়া আসিতে পারিয়াছেন দেখিয়া ভাস্কর আফ্‌শোশ করিতে লাগিল।

তবে সব বরগী গ্রাম লুটিতে লাগিল। যত গ্রামের লোক সব পলাইল॥
ব্রাহ্মণপণ্ডিত পলাএ পুথির ভার লইয়া। সোনার বানিয়া[৪] পলায় কত নিক্তি হড়পি লইয়া॥
গন্ধবণিক পলাএ দোকান লইয়া যত। তামা পিতল লইয়া কাঁসারি পলাএ কত॥
কামার কুমার পলাএ লইয়া চাক নড়ি। জালুয়া[৫] মাছুয়া[৬] পলাএ লইয়া জাল দড়ি॥
শঙ্খবণিক পলাএ করা[ত] লইয়া যত। চতুর্দ্দিকে লোক পলাএ কি বলিব কত॥
কায়স্থ বৈদ্য [লোক] যত গ্রামে ছিল। বরগীর নাম শুনিয়া[৭] সব পলাইল॥
ভালমানুষের স্ত্রীলোক যত হাঁটে নাই পথে। বরগীর পলানে পেটারি লইল মাথে॥
ক্ষেত্রি রাজপুত যত তলয়ারের ধনী। তলয়ার ফেলাইঞা তারা পলাএ অমনি॥
গোসাঞি মহান্ত যত চোপালাএ চড়িয়া। বোচকাবুচকি লয় যত বাঁহুকে করিয়া॥
চাষা কৈবর্ত্ত যত যাএ পলাইঞা। বিছন বলদের পিঠে লাঙ্গল লইয়া॥

১। পাঠ 'বিপত্য।' ২। পাঠ 'অন্ত্য।'
৩। বর্ত্তমান নাম নিগন, বর্দ্ধমান-কাটোয়া রেলপথের একটি ষ্টেশন এখানে আছে।
৪। পাঠ 'বাইনা।' ৫। পাঠ 'জাউলা।
৬। পাঠ 'মাউছা।' ৭। পাঠ 'সুইনা।'

সেক সৈয়দ মোগল পাঠান যত গ্রামে ছিল। বরগীর নাম শুনিয়া সব পলাইল ॥
গর্ভবতী নারী যত না পারে চলিতে। দারুণ বেদনা পেয়ে প্রসবিছে পথে ॥
সিকদার পাটআরি যত গ্রামে ছিল। বরগীর নাম শুনিয়া সব পলাইল ॥
দশবিশ লোক আসিয়া[১] পথে দাঁড়াইলা। তা সভারে শুধায়[২] বরগী কোথাএ দেখিলা ॥
তারা সব বলে মোরা চক্ষে দেখি নাই। লোকের পলান দেখিয়া আমরা পলাই ॥

লোকে যাহারা ভাগীরথী নদীর ওপারে চলিয়া গেল তাহারা অব্যাহতি পাইল। বর্গীরা গ্রাম সব জ্বালাইয়া দিতে লাগিল।[৩] নবাব কাটোয়া ছাড়িয়া চলিয়া গেলে ভাস্কর কাটোয়ায় থানা গাড়িল এবং সেখানে জমিদারদিগকে হাত করিয়া খাজানা আদায় করিতে লাগিল। আশ্বিন মাস আসিয়া পড়িল, ভাস্কর পণ্ডিতও দাঁইহাটে দুর্গোৎসবের আয়োজন করিল।

তবে গ্রামে গ্রামে যত জমিদার ছিল। তা সভারে ডাক দিয়া নিকটে আনিল ॥
কহিতে লাগিল তবে তা সভার ঠাঞি। জগৎজননী মায়ের পূজা করিতে চাই ॥
এই কথা ভাস্কর কহিল তা সভারে। শ্রদ্ধা পাইয়া তারা উদ্যোগ করে ॥

পূজার আয়োজন হইতেছে, এদিকে একদিন বর্গীরা ভাগীরথী পার হইয়া ফুটিসাঁকো নামক স্থানে গিয়া উপস্থিত হইল। নবাব আর স্থির থাকিতে পারিলেন না, ষাট হাজার অশ্বরোহী লইয়া তাহাদিগকে আক্রমণ করিলেন, বর্গী পলাইল। পূর্ণিয়া ও পাটনা হইতে ফৌজ আসিয়া নবাবের শক্তিবৃদ্ধি করিল, নবাব কাটোয়ায় আসিলেন। ভাস্কর অষ্টমীর রাত্রিতে প্রতিমা ফেলিয়া পলাইতে বাধ্য হইল।

চৈত্র মাসে ভাস্কর পুনরায় বাঙ্গালায় আসিল এবং পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক লুটপাট ও অত্যাচার লাগাইল। ভাস্কর কাটোয়াতে ছাউনি করিল, নবাব মনকরাতে। এবারে ভাস্কর নবাবের সহিত মিটমাট করিতে চাহিলেন। মুস্তাফা খাঁ ও জানকীরাম ভাস্করের নিরাপত্তার জন্য জামীন হওয়াতে ভাস্কর ২রা বৈশাখ তারিখে

১। পাঠ 'য়াইসা।' ২। পাঠ 'সোধাএ।'
৩। কবি এখানে অনেকগুলি গ্রামের নাম করিয়াছেন [পৃ ২২৪-২৬]।

নিরস্ত্র হইয়া নবাবের শিবিরে আসিল। নবাব ছুতা করিয়া উঠিয়া গেলেন, ভাস্কর ও তাহার সঙ্গিগণ নিহত হইল। নবাবের শিবিরে উৎসব পড়িয়া গেল। তাহার পর কবির ভণিতা—

মনকরা মোকামে যদি ভাস্কর মইল।
মনসুরা দৌড়াইয়া[১] কবি গঙ্গারাম কইল॥

রাধাকৃষ্ণের অথবা অন্যান্য পৌরাণিক কাহিনীর আবেষ্টনীর বাহিরে শুধু আধ্যাত্মিকতত্ত্বরূপক অনুভূতি বা ব্যাকুলতা বিষয়ক এবং নরনারীর প্রণয়ঘটিত গান রচনা অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বিশেষভাবে প্রচলিত হয়। এই ধারা উনবিংশ শতাব্দীতে প্রবলভাবে বর্ত্তমান ছিল, এবং এখনও সাধকদিগের মধ্যে এবং তাহার বাহিরেও চলিতেছে। ভারতচন্দ্রের গান তাঁহার কাব্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। রামপ্রসাদের গান ভাষার ভাবের ও সুরের সারল্যে এবং মর্ম্মস্পর্শী ঐকান্তিকতায় অদ্যাবধি সমানভাবে লোকপ্রিয় রহিয়াছে।

বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ তিলকচন্দ্র রায়ের (রাজ্যকাল ১৭৪৪-৭০ খ্রীষ্টাব্দ) দেওয়ান চুপী গ্রামনিবাসী ব্রজকিশোর রায় মহাশয় এবং মহারাজাধিরাজ তেজশ্চন্দ্র রায়ের (রাজ্যকাল ১৭৭০-১৮৩২ খ্রীষ্টাব্দ) দেওয়ান ব্রজকিশোরের দুই পুত্র নন্দ-কিশোর এবং রঘুনাথ আধ্যাত্মিক বিষয়ে গান রচনা করিয়া খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। রঘুনাথ রায় "অকিঞ্চন" ভণিতায় অনেক গান রচনা করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু এখনও পল্লী অঞ্চলে লোকমুখে শোনা যায়। রামনিধি গুপ্ত মহাশয়ের টপ্পা গান বা প্রণয়গীতি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে শিক্ষিত বাঙ্গালীকে মাতাইয়া রাখিয়াছিল। রামনিধি গুপ্ত মহাশয় নিধু বাবু নামে খ্যাত ছিলেন। আখড়াই গানের প্রসঙ্গে ইঁহার কথা পরে বলিব।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে নদীয়া-শান্তিপুর অঞ্চলে এক ধরণের প্রণয়গীতির প্রচলন হয়। এই গানের ভাব ছিল নিতান্ত গ্রাম্য, এবং ভাষা অনেক সময় শ্লীলতার গণ্ডী উল্লঙ্ঘন করিয়া যাইত। এই গানের নাম ছিল "খেঁড়ু" বা খেউড়। ভারতচন্দ্রের

১। পাঠ 'মনসুবাদ উড়াইয়া।'

উক্তি হইতে জানা যায় যে তাঁহার সময়ে শান্তিপুর খেউড় গানের প্রধান আড্ডা ছিল। ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরকাহিনীতে দেখি যে সুন্দর গৃহগমনোৎসুক হইলে বিদ্যা তাহাকে শ্বশুরালয়ে রাখিবার জন্য যে সব প্রলোভন দেখাইতেছে তার মধ্যে খেউড় গান অন্যতম।

নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব॥

শান্তিপুর হইতে খেউড় গানের কেন্দ্র গঙ্গাস্রোত বাহিয়া উঠিয়া আসে চুঁচুড়ায়, তাহার পর কলিকাতায়। এইস্থানে প্রধানতঃ নিধুবাবুর প্রযত্নে খেউড গানের সংস্কার কার্য্য সাধিত হয়। কবিগানের প্রচলনও এই সময়ে হয়। কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগেই ইহার সমধিক বিকাশ হয়। সেই জন্য এই প্রসঙ্গের আলোচনা ঊনবিংশ শতাব্দীর ইতিহাসে করা যাইতেছে।

ঊনবিংশ শতাব্দী

পঞ্চপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধের ভূমিকা

১৮০০-০১ খ্রীষ্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ স্থাপিত হইলে পর নবাগত সিভিলিয়ান-দিগের দেশী ভাষা শিক্ষার জন্য গদ্য পাঠ্যপুস্তক রচনায় দেশীয় ভাষা বিভাগের অধ্যক্ষ উইলিয়াম কেরী উদ্যোগী হইলেন। ইনি নিজে এবং সহকারী বাঙ্গালী অধ্যাপকগণ ইঁহার দ্বারা প্রণোদিত হইয়া বাঙ্গালা গদ্যে পুস্তক রচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। ইহা হইতেই বাঙ্গালা সাহিত্যের আধুনিক ধারার সম্ভাবনা জাগিল। আধুনিক ধারাকে 'গদ্যবন্ধ' বলা চলে, সেই হিসাবে প্রাগাধুনিক ধারাকে 'পদ্যবন্ধ' বা 'পয়ারবন্ধ' বলা যায়।

সাহিত্যে গদ্য রচনার এমন বিশেষ কোন সহজপ্রাপ্য নিদর্শন ছিল না যাহা অনুসরণ করিয়া পাঠ্যপুস্তক রচনা করা যাইতে পারে। সুতরাং কেরী এবং তাঁহার সহকারী রামরাম বসু মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় গোলোকনাথ শর্ম্মা প্রভৃতি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের পণ্ডিতগণের রচনা সবক্ষেত্রে সহজবোধ্য এবং নির্দ্দোষ হয় নাই। তথাপি এই প্রচেষ্টার ফল ফলিতে বিলম্ব হইল না, তাহাতে করিয়া গদ্যবন্ধের ভবিষ্যৎ অনতিবিলম্বে স্থিরীকৃত হইয়া গেল। ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে কেরীর উদ্যোগে শ্রীরামপুর হইতে সমাচারদর্পণ সংবাদপত্র বাহির হইল, এবং ইহার অত্যল্পকাল মধ্যে সমাচারচন্দ্রিকা প্রভৃতি অন্যান্য সংবাদপত্র প্রকাশিত হইল। ইহার ফলে বাঙ্গালা গদ্য শিক্ষিত লোকের ঘরে ঘরে পৌঁছিল, এবং লোকেও মুখের ভাষার ভঙ্গিতে আধুনিক বৃত্তান্ত পড়িতে এবং বুঝিতে শিখিল, সুতরাং ধীরে ধীরে তাহাদের মনে পদ্যবন্ধ রচনা যে প্রাচীনতাগন্ধী বৈচিত্র্যহীন এবং কতকটা প্রাণহীন এইরূপ বোধ জন্মিয়া গেল। এইভাবে জনসাধারণের মন গদ্যবন্ধের প্রতি উন্মুখ হওয়াতে গদ্য সাহিত্যের প্রসার ধীরে ধীরে বাড়িতে লাগিল।

গদ্যবন্ধের প্রবর্ত্তনের পরও বহুদিন যাবৎ আধুনিক ও প্রাগাধুনিক দুই ধারা পাশাপাশি চলিয়াছিল। প্রথম স্রোতের শক্তিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দ্বিতীয় ধারাটি

ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়া কিয়ৎপরিমাণে প্রথম স্রোতে মিশিয়া যায় ও সেইহেতু অখণ্ড বাঙ্গালা সাহিত্যের ধারাবাহিকতা রক্ষা করে, এবং বাকিটুকু পাঠক এবং শ্রোতৃহীনতার মরুভূমিতে বিনশন প্রাপ্ত হয়। উনবিংশ শতাব্দীতে প্রাগাধুনিক ধারার এই যে জের বিশেষ করিয়া ইহাই বর্ত্তমান পর্ব্বে আলোচনা করা যাইতেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর পঞ্চম দশক পর্য্যন্ত লৌকিক কাহিনী 'উপন্যাস' আদি প্রধানতঃ পদ্যবন্ধেই রচিত হইত। তবে গদ্যপদ্য রচিত চম্পূকাহিনীরও অসদ্ভাব ছিল না। এইগুলি পদ্যকাহিনী এবং গদ্য উপন্যাসের মধ্যবর্ত্তী অবস্থার রচনা। ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচনায় এই তিন শৈলীরই উদাহরণ মেলে। ইঁহার দূতীবিলাস (প্রকাশকাল ১৭৪৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮২৫-২৬ খ্রীষ্টাব্দ), আশ্চর্য্য উপাখ্যান (প্রকাশ তারিখ ১ চৈত্র ১২৪১ সাল অর্থাৎ ১৩ মার্চ্চ ১৮৩৫ খ্রীষ্টাব্দ) ও গয়াতীর্থবিস্তার (প্রকাশকাল ১২৩৮ সাল অর্থাৎ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দ) পদ্যে রচিত, কলিকাতা কমলালয়[১] (প্রকাশকাল ১২৩০ সাল অর্থাৎ ১৮২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দ) ও হিতোপদেশ (প্রকাশকাল ১৭৪৫ শকাব্দ ১২৩০ সাল অর্থাৎ ১৮২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দ) গদ্যে রচিত, এবং নববাবুবিলাস[১] (প্রকাশকাল আনুমানিক ১৮২৩ খ্রীষ্টাব্দ) ও পুরুষোত্তমচন্দ্রিকা (প্রকাশকাল ১৭৬৬ শকাব্দ ১২৫১ সাল অর্থাৎ ১৮৪৪ খ্রীষ্টাব্দ) গদ্যেপদ্যে রচিত। এখানে একটি লক্ষণীয় বিষয় আছে, ভবানীচরণ প্রথমে গদ্য রচনা করিয়া শেষে পদ্য ও গদ্যপদ্যের দিকে ঝুঁকিয়াছিলেন। ইহার কারণ এই হইতে পারে যে সেকালের লোকে তখনও গদ্যবন্ধের অপেক্ষা পদ্যবন্ধ বা গদ্যপদ্যবন্ধ অধিক আদর করিত। যখন দুই ধারা পাশাপাশি চলিয়াছে তখনও পাঠ্যপুস্তকজাতীয় গ্রন্থও পয়ারবন্ধে রচিত হইতেছে দেখিতে পাই। ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে পদ্যবন্ধে রচিত একটি স্মৃতিগ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ইহার কিছুকাল পূর্ব্বে গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য পদ্যে একটি চিকিৎসা গ্রন্থ রচনা করেন। রাধামোহন সেনের সঙ্গীততরঙ্গ সঙ্গীত শাস্ত্র সম্বন্ধে বাঙ্গালায় একটি প্রামাণ্য বই বলা চলে। এটি ১২২৫ সালে অর্থাৎ

১। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস হইতে পুনঃ প্রকাশিত। এই সংস্করণের ভূমিকায় শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ভবানীচরণ সম্বন্ধে যাবতীয় জ্ঞাতব্য তথ্য দিয়াছেন। বইটিতে অল্প পদ্যাংশ আছে।

১৮২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[১] গ্রন্থটি আগাগোড়া ছন্দে রচিত। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা যাইতেছে।

বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জনসাধারণের মধ্যে পয়ারবন্ধের আদর সমধিক ছিল বলিয়া খ্রীষ্টীয় মিশনারীদিগকেও বাধ্য হইয়া তাঁহাদের "সুসমাচার" (gospel) ইত্যাদি ধর্ম্মগ্রন্থ বাঙ্গালা পয়ারে অনুবাদ করিতে হইয়াছিল। প্রাচীন শাস্ত্রগ্রন্থ মনে করিয়া লোকে যাহাতে আদর করিয়া পাঠ ও শ্রবণ করে এই জন্য ইঁহারা বাইবেলী বই পুঁথির আকারে তুলট কাগজে হাতে লিখিয়া পল্লীগ্রাম অঞ্চলে গোপনে প্রচার করিয়া দিতেন। ১২৭২ সালে লিখিত নিস্তাররত্নাকর নামে এই রকম একটি পুঁথি বীরভূম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।[২] নিবন্ধটির আরম্ভ এইরূপ—

শুন হে জগৎস্থলোক শুন একমনে। ঘোর পাপ নিস্তার হে পাইবা কেমনে॥
তাহার উদ্দেশ করে নাহি কোন জন। করয়ে সতত শ্রম সংসার কারণ॥

এই শতাব্দীতে দেবদেবীর মাহাত্ম্যকাব্য যে সকল রচিত হইয়াছিল তাহা প্রায় সবই পুরাণ অবলম্বন করিয়া। অপৌরাণিক মাহাত্ম্যকাব্য ব্রতকথা পাঁচালীতে পর্য্যবসিত হইয়াছিল। এই শতাব্দীতে রচিত কোন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য পাওয়া যায় নাই। মঙ্গলচণ্ডীর ব্রতকথা শুভচণ্ডীর (সুবচনীর) ব্রতকথা লক্ষ্মীর ব্রতকথা ইত্যাদি পাঁচালী প্রচুর পরিমাণে রচিত হইয়াছিল। অন্য দেবদেবীর মধ্যে শনির পাঁচালী চাটিগ্রাম অঞ্চলে এবং সূর্য্যের পাঁচালী পূর্ব্ববঙ্গে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। পশ্চিম-বঙ্গে সত্যনারায়ণ পাঁচালী পূর্ব্বাপর লোকপ্রিয় রহিয়া গিয়াছিল। নূতনের মধ্যে শীতলামঙ্গল পাওয়া যাইতেছে। কয়েকটি মনসামঙ্গল কাব্য এই শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল।

মহাভারত কাব্যের কথা বলিতে পারি না, রামায়ণ কাব্য এই শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে অন্ততঃ তিনখানি রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে একখানি, রঘুনন্দনের রামরসায়ন, উৎকৃষ্ট কাব্য। পুরাণ অবলম্বনে কৃষ্ণকথাসংবলিত কাব্য এই শতাব্দীর শেষ অবধি রচিত হইয়াছে, এমন কি এখনও হইতেছে।

১। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়াছে।

২। ব-প্রা-পু-বি ২-১, পৃ ৭০-৭১। পুঁথির পত্রসংখ্যা ৭।

পদাবলী রচনা পূর্ব্বাপর চলিয়াছে এবং এই পদাবলীর সূত্র দিয়াই প্রাগাধুনিক ও আধুনিক ধারার সংযোগ হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের অখণ্ড ধারাবাহিকতা রক্ষিত হইয়াছে। আধুনিক জগতের শ্রেষ্ঠ কবি রবীন্দ্রনাথ পদাবলী বা গীতি পদ্ধতির শ্রেষ্ঠ কবিও বটেন। কালিদাসের ভাষা ঈষৎ বদলাইয়া ইঁহার সম্বন্ধে বলা যাইতে পারে,

পূর্ব্বাপরৌ তোয়নিধী বগাহ্য
স্থিতঃ কবীনামিব মানদণ্ডঃ॥

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধ আধুনিক বাঙ্গালীর প্রাথমিক শিক্ষার যুগ গিয়াছে। এইসময়ে যাহা কিছু লেখা হইয়াছে সব শিক্ষামূলক (instructive) অথবা প্রচারমূলক (informative) কিংবা বিতণ্ডামূলক (discursive)। শিক্ষা বা প্রচারের একটা দিক ছিল ইংরেজী হইতে অনুবাদ, যাহা প্রধানতঃ শ্রীরামপুরের মিশনারীরা এবং ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যাপকেরা করিতেছিলেন। দ্বিতীয় দিক ছিল সংস্কৃত হইতে অনুবাদ, এই কার্য্য করিতেছিলেন প্রাচীনপন্থী কবিরা এবং ব্রাহ্মণপণ্ডিতমণ্ডলী। আর যে তৃতীয় দিক ছিল বিতণ্ডামূলক, তাহা প্রধানতঃ রামমোহন রায় কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। তবে ইহার মূলে ছিল ষোড়শ ও সপ্তদশ শতাব্দীর পোর্ত্তুগীস মিশনারীদিগের প্রচেষ্টা।

লোকরঞ্জক বা যথার্থ সাহিত্যের ছিল দুইটি দিক। এক প্রাচীন ধারা—রামায়ণ পদাবলী শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল ইত্যাদি ধর্ম্মকাব্য, পাঁচালী ও কবিগান, এবং সংস্কৃত এবং ফারসী হইতে অনূদিত উপাখ্যান 'উপন্যাস' ইত্যাদি। আর আধুনিক ধারা—ব্যঙ্গকাব্য, ইংরেজী হইতে অনূদিত উপাখ্যান এবং ধর্ম্ম নীতি ও শিক্ষা মূলক কবিতা ইত্যাদি। পল্লীগ্রাম অঞ্চলে ধর্ম্মকাব্য পাঁচালী ও ব্রতকথা ছাড়া ঐতিহাসিক ঘটনা বা দৈব উৎপাত ইত্যাদি বিষয়ক ছড়া এই সময়ে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। পূর্ব্ববঙ্গে লৌকিক কাহিনী অবলম্বনে রচিত ছড়ার মধ্যে আরাকান রাজসভার প্রথা ক্ষীণভাবে চলিয়া আসিয়াছিল। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত ময়মনসিংহ-গীতিকা এবং পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকায় এইজাতীয় অনেকগুলি ছড়া আধুনিক ভাষায় ও কিয়ৎ-পরিমাণে আধুনিকভাব পরিমণ্ডিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

ষট্‌পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

দেবদেবী মাহাত্ম্যকাব্য ও ব্রতকথা

পাকুড়ের ভূস্বামী পৃথ্বীচন্দ্র ১৭২৮ শকাব্দে ১২১৩ সালে অর্থাৎ ১৮০৬-০৭ খ্রীষ্টাব্দে গৌরীমঙ্গল[১] কাব্য রচনা করেন।

সতের শ আটাইশ শকে   রচিলাম এ পুস্তকে,   বার শত ত্রয়োদশ সন।
গৌরীমঙ্গলের গীত   শ্রবণে ভক্তের প্রীত,   ভবভয়-উদ্ধার কারণ॥

কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

গৌড়দেশ মধ্যে বাস গঙ্গার দক্ষিণে। কান্যকুব্জ বিপ্র হই ত্রিবেদী আখ্যানে॥
পিতৃপূর্ব্বস্থান নদী সরযূ উত্তরে। এদেশে পৈতৃকবাস আমাড়ি নগরে॥
বিখ্যাত ভুবনে নাম পাকুড়ে[২] আলয়। ভণে পৃথ্বীচন্দ্র বৈদ্যনাথের তনয়॥

"গৌরীমঙ্গল অতি বৃহৎ গ্রন্থ, সমগ্র গ্রন্থ পাঁচ খণ্ডে এবং ৪১৯ অধ্যায়ে বিভক্ত। প্রথম দেবখণ্ড, ২য় অবন্তীখণ্ড, ৩য় যুদ্ধখণ্ড, ৪র্থ নীতিখণ্ড ও ৫ম স্বর্গখণ্ড। দেবখণ্ডে মঙ্গলাচরণের পর দেবদেবীর বন্দনা, সৃষ্টিবর্ণনা, দক্ষযজ্ঞ, শিবের বিবাহ, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম, হরগৌরীর কলহ, নারদ কর্ত্তৃক কৃষ্ণলীলা, গৌরীর পিত্রালয়ে যাত্রাপ্রসঙ্গে দুর্গোৎসবপদ্ধতি প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এই খণ্ড সংস্কৃত পুরাণাদির অনুকরণে বিরচিত। ২য় খণ্ডে অবন্তীনগরের অধিপতি শালবানের উপাখ্যান, উত্তরদেশ হইতে রাজা মদ্রসেনের আগমন এবং শালবানের রাজ্যহরণ, পত্নীর সহিত শালবানের বনগমন, রাণীর গর্ভধারণ, বনে শালবানের মৃত্যু, গর্গমুনি কর্ত্তৃক রাণীর সান্ত্বনা, এই সান্ত্বনাপ্রসঙ্গে রামায়ণ ও মহাভারত কথা বর্ণনা। ৩য় খণ্ডে শালিবাহনের পুত্র জীমূতবাহনের জন্ম, গর্গের নিকট জীমূতবাহনের শিক্ষা ও তান্ত্রিকমতে দীক্ষালাভ, রাজপুত্রের তীর্থভ্রমণ কল্পে

১। ব-সা-প-প ৩, পৃ ৪৯-৫৫। পুঁথি নকলের তারিখ ১৭৫১ শক।

২। মূলে 'পোকড়ে.' অন্যস্থানে 'পোকর।' বর্ত্তমানে এই স্থানের নাম পাকুড়।

তারাপুর নামক তীর্থে ভগবতীর দর্শন ও ভগবতী কর্ত্তৃক বর প্রদান, তৎপরে ভারতবর্ষীয় নৃপতিগণের সাহায্যে জীমূতবাহন কর্ত্তৃক মদ্রসেনের পরাজয় ও তাঁহার পিতৃরাজ্য উদ্ধার প্রসঙ্গ। এই খণ্ডে তান্ত্রিকদীক্ষাপ্রসঙ্গে তান্ত্রিকধর্ম্মের মাহাত্ম্য এবং অপর সকল তীর্থ অপেক্ষা বৈদ্যনাথ, বক্রেশ্বর ও তারাপুর প্রভৃতি প্রাদেশিক তীর্থস্থানের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণিত হইয়াছে। ৪র্থ নীতিখণ্ডে মদ্রসেনের অধর্ম্মাচার ও প্রজাপীড়নের সঙ্গে গোহত্যা প্রভৃতি যে সকল কদাচার প্রচলিত হইয়াছিল, সেই সকল নিবারণ, জীমূতবাহন কর্ত্তৃক ধর্ম্মরাজ্যস্থাপন ও সন্নীতি প্রতিষ্ঠা, জীমূতবাহনের বিবাহ ও তাঁহার গার্হস্থ্য সুখসম্ভোগ। ৫ম স্বর্গখণ্ডে বার্দ্ধক্যে জীমূতবাহনের বানপ্রস্থ আশ্রয়, গর্গমুনির নিকট উপদেশ লাভ, অবশেষে ভগবতীর অনুগ্রহে সশরীরে কৈলাসবাস বর্ণনা প্রসঙ্গে গ্রন্থ সমাপ্তি ॥"[১]

কাব্যরচনার ইতিহাস উপলক্ষ্যে পৃথ্বীচন্দ্র পূর্ব্ববর্ত্তী বাঙ্গালী কবি ও বাঙ্গালা কাব্যের এক ফিরিস্তি দিয়াছেন, তাহা এইখানে উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি। এই তালিকায় প্রদত্ত কয়েকটি কাব্যের সন্ধান অদ্যাপি মিলে নাই।

স্মৃতি করি মুনিগণ সংগ্রহ করিল। কলিযুগে তাহা লোকে বুঝা ভার হইল ॥
মনে আশা ভাষা করি কৈল কবিগণ। স্মৃতি ভাষা কৈল রাধাবল্লভ শর্ম্মন ॥
বৈদ্যক করিয়া ভাষা শিখে বৈদ্যগণে। জ্যোতিষ করিয়া ভাষা শিখে সর্ব্বজনে
বাল্মীকি করিল ভাষা দ্বিজ কৃত্তিবাস। মনসামঙ্গল ভাষা হইল প্রকাশ ॥
মুকুন্দ পণ্ডিত কৈলা শ্রীকবিকঙ্কণ। কবিচন্দ্রে গোবিন্দমঙ্গল বিরচন ॥
ভাগবত ভাষা করি শুনে ভক্তিমান্। চৈতন্যমঙ্গল কৈল বৈষ্ণববিজ্ঞান ॥
বৈষ্ণবের শাস্ত্র ভাষা অনেক হইল। অন্নদামঙ্গল ভাষা ভারত করিল ॥
মেঘ-ঘটা যেন ছটা তড়িতের পাতা। শিবরাম গোস্বামী করিল ভক্তিলতা ॥
অষ্টাদশ পর্ব্ব ভাষা কৈল কাশীদাস। নিত্যানন্দ কৈল পূর্ব্বে ভারত প্রকাশ।
চোরচক্রবর্ত্তী কীর্ত্তি ভাষায় করিল। বিক্রমাদিত্যের কীর্ত্তি ভাষায় রচিল ॥
দ্বিজ রঘুদেব চণ্ডী পাঁচালী করিল। কবিচন্দ্র চোর কবি ভাষায় হইল ॥

১। বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ৭১।

গঙ্গানারায়ণ রচে ভবানীমঙ্গল। কিরীটমঙ্গল আদি হইল সকল ॥
এ সকল গ্রন্থ দেখি মম আশা হইল। গৌরীমঙ্গলের পুঁথি ভাষায় রচিল ॥
সকলে রচিল কথা পুরাণ ভারত। কৌতুকে রচিল কেহ কাহিনীর মত ॥
কেহ না রচিল শক্তিতত্বনিরূপণ। ব্রহ্মলীলা কেহ নাহি করিল রচন ॥
আগম নিগম সব বিচারিয়া মনে। রচিল কিঞ্চিৎ ব্রহ্মলীলা নিরূপণে ॥
ষড়্ দরশনে যার দর্শন না পায়। মম রচা ভাষ্য হাস্য জানিবে সবাই ॥
মূর্খের স্বভাব মনে করিল রচন। দোষ না লইবে কেহ গুণবান্ জন ॥
এই পুঁথি রচিল গীত গানের কারণ। দিলাম দ্বারকানাথে করিতে গায়ন ॥
সেনভূমে বাস রূপপুর নামে গ্রাম। চক্রবর্ত্তী উপাধি বালকরাম নাম ॥
লইলা এ পুঁথি বহু আগ্রহ করিয়া। গান গৌরীমঙ্গলের গীত শুদ্ধ হইয়া ॥
গুণের সাগর হন দয়ার সাগর। নারদ তম্বুরু সম গানে গুণিবর ॥

গৌরীমঙ্গলের রচনার নমুনা হিসাবে কিছু কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

শিবের কোচনীপাড়া গমন—

দেবদেব মহাদেব কৈলাসশিখরে। ইচ্ছা হইল যাইবার কোচনী নগরে ॥
ভিক্ষাছলে বৃষবরে করি আরোহণ। বিশ্বনাথ কোচপাড়া করিল গমন ॥
বাজান ডম্বুর শিঙ্গারব[১] ঘনে ঘন। শুনিয়া ধাইল যত কোচবধূগণ ॥
সভে উনমত্তা হইয়া যায় হরপাশে। কটিতে বসন মাত্র গাত্র নগ্নবেশে ॥
তুঙ্গস্তনী নিতম্বিনী দেখি পঞ্চানন। হৃষ্ট হইয়া দৃষ্টি করে স্থির করি মন ॥
দিগম্বর হরবর জানি নারীগণে। কৌতুক করয়ে সভে মহাদেব সনে ॥
বনপুষ্প তুলি মালা দেয় শিব গলে। হর নাচে নারীগণ নাচয়ে বিভোলে ॥

গোপীগণ কর্ত্তৃক রাধিকাকে মানভঙ্গ করিতে অনুরোধ—

শুন লো শ্রীমতী কহিয়ে ভারতী, কেন কর এত মান ॥
ছাড়িয়া কি হরি থাকিবে পাশরি, ধরিতে নারিবে প্রাণ ॥
নাগরের দোষ ক্ষমা কর, রোষ মান কর রাই দূরে।
আপন শরীরে যদি দোষ করে ছাড়িতে কে পারে তারে ॥

১। মুদ্রিত পাঠ 'শিঙ্গাবর।'

যাহার কারণে না রহে পরাণে তারে কি তেয়াগ ধনী।
বায়ুর গমনে উড়ায় বসনে, তাহা বিনে বাঁচে প্রাণী॥
অনলপরশে সকল বিনাশে, তাহা বিনা না কি চলে।
জলে শীত হয়, বৃষ্টে অতি ভয়, তবে কি তেজিবে জলে॥
শুন লো সুন্দরী, তোমারি সে হরি, অপরাধ ক্ষমা কর।
তেজি মান মনে, নাগরের সনে আনন্দে কুঞ্জে বিহর॥

পৃথ্বীচন্দ্র একটি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ ছড়া রচনা করিয়াছিলেন, নাম ভূষণ্ডী রামায়ণ। কাব্যটি বীরভূমি পত্রিকায়[১] প্রকাশিত হইয়াছে। শেষাংশ এইরূপ—

পৃথিবীতে লক্ষ গ্রন্থ হইল প্রকাশ। আদিকবি বাল্মীকির পুরে মনআশ॥
সকল পুরাণে ব্যাস করিলা রচনা। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে সার হইয়াছে বর্ণনা॥
স্মরণ পঠনে তনু পবিত্র নিতান্ত। ভবার্ণবে পার সার অভয় কৃতান্ত॥
রামায়ণস্মরণে যতেক পুণ্য হয়। কহিতে না পারে কেহ করিয়া নির্ণয়॥
শ্রীরামচরণপদ্ম করিয়া বন্দন। ভূপ পৃথ্বীচন্দ্র রচে গীত রামায়ণ॥

রামচন্দ্র মুখোপাধ্যায় খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ পাদে হরিনাভি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৪৫ খ্রীষ্টাব্দের অল্প কিছুকাল পূর্ব্বে লোকান্তরিত হন।[২] ইঁহারা তিন সহোদর, তন্মধ্যে কবি জ্যেষ্ঠ। পিতার নাম রামধন, পিতামহের নাম গোপাল, মাতামহের নাম বিনোদরাম। ভণিতায় কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

গরিটি সমাজ ধাম, গোপাল মুখুটি নাম,
তার সুত দ্বিজ রামধন।
তাহার তনয় তিন, জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র দীন,
গৌরীগুণ করিল রচন॥

১। ১৩০৯ সালের ভাদ্র-আশ্বিন সংখ্যা, বা-প্রা-পু বি ১-১, পৃ ১৯৭-৯৮। পুঁথির লিপিকাল বৈশাখ ১২৩৯ (লিখিত ১৩৩৯) সাল।

২। ব-সা-প-প ৪০, পৃ ১১৪।

জাহ্নবীর পূর্ব্বভাগ মেদনমল্ল অনুরাগ,
তার মধ্যে হরিনাভি গ্রাম।
তাতে কবি নিজ বাসে শ্রীদুর্গামঙ্গল ভাষে,
দ্বিজকুলে রামচন্দ্র নাম ॥

হরিনাভি ধাম দ্বিজ বিনোদরাম,
তাহার তনয়াসুত।
পাঁচালীপ্রবন্ধে কহে রামচন্দ্রে,
সদাই বিনয়যুত ॥[১]

আপনার পরিচয় দিতে কিছু হয়। সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ কহি নিজ পরিচয় ॥
কানাই ঠাকুর বংশে গোপাল মুখটী। ইষ্টনিষ্ঠ দাতা ধীর কিবা সে গরিটী ॥
ফুলিয়া বিখ্যাত কুল ভঙ্গ নিজে হন। সত্যপুত্র রামধন কুলঘাটি নন ॥
তাহার তনয় জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবি। ভাষায় রচিলা কত কবিত্ব সুচ্ছবি ॥[২]

কবি তর্কপঞ্চানন উপাধিধারী ব্রাহ্মণ পণ্ডিত ছিলেন। কাব্যশক্তির জন্য তিনি কবিকেশরী উপাধি প্রাপ্ত হন। এই উপাধি ভণিতাস্থানে অনেকবার ব্যবহৃত হইয়াছে।

রামচন্দ্র দুইখানি কাব্য রচনা করেন—(১) দুর্গামঙ্গল এবং (২) মাধবমালতী। দুর্গামঙ্গল কাব্য দুই স্বতন্ত্র অংশে বিভক্ত—(ক) গৌরীবিলাস[৩] ও কঙ্কালীর অভিশাপ, এবং (খ) নলদময়ন্তী।[৪] প্রথম অংশটি অষ্টমীর পালা এবং দ্বিতীয় অংশটি নবমীর পালা। গৌরীবিলাস, কঙ্কালীর অভিশাপ এবং নলদময়ন্তী স্বতন্ত্র পুঁথিতে পাওয়া যায় বলিয়া অনেকে এগুলিকে স্বতন্ত্র কাব্য বলিয়া মনে করিয়াছেন। নলদময়ন্তী অংশ শরচ্চন্দ্র শাস্ত্রী কর্তৃক দুর্গামঙ্গল নামে ১৩০৫ সালে প্রকাশিত হয়।

১। দুর্গামঙ্গল; ব-সা-প-প ৫, পৃ ২, নলদময়ন্তী, পৃ ২০, ২৪।
২। মাধবমালতী, ব-সা-প-প ৫, পৃ ২৯৩।
৩। ব-সা-প-প ৪০, পৃ ১১৩-১২৮।
৪। স্বতন্ত্র পুস্তকরূপে বহুবার প্রকাশিত। বর্ত্তমান আলোচনায় নৃত্যলাল শীল কর্তৃক ১২৯৯ সালে প্রকাশিত সংস্করণ অবলম্বিত হইয়াছে।

শ্রীহর্ষের নৈষধচরিত অবলম্বনে রামচন্দ্র দুর্গামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত নলদময়ন্তী কাব্য রচনা করেন, তবে গল্পাংশ তিনি সম্পূর্ণ দিয়াছেন, শ্রীহর্ষের মত নল দময়ন্তীর বিবাহেই কাব্যের অবসান করেন নাই। বিবাহ ইত্যাদির বিবরণে তৎকালীন বাঙ্গালী সমাজের সুন্দর চিত্র রামচন্দ্রের কাব্যে প্রস্ফুটিত হইয়াছে। গড় বা দুর্গের বর্ণনাটি মন্দ নহে।

উপনীত হইল গিয়া গড়ের দুয়ার। মাতঙ্গ তুরঙ্গ বাঁধা হাজার হাজার॥
শেফাই সঙ্গীন চড়া পাহারা ফটকে। কাওয়াজ আওয়াজ ঘন ধড়কে ধড়কে[১]॥
কামান পাতিয়া আছে ফিরিঙ্গী ফরাস। দেখে কাঁপে কায় যায় জীবনের আশ॥
ঘন ঘন গোলা ছুটে চোটে ফাটে মাটী। ক্ষণেকে ক্ষণেকে জয়ঢাকে মারে কাঠি॥
দ্বিতীয় গড়েতে গিয়া দেখে নরপতি। দুয়ারেতে দ্বারপাল ভয়ঙ্কর অতি॥
রাহুত মাহুত আর কত রজপুত। বিষম ভীষণকায় শমনের দূত॥
মাথায় পাগড়ী টেরী লাল কালা পীত। সঘনে মোচড়ে গোফ জুল্‌পি সুশোভিত॥
জবা জিনি দুই আঁখি আসবে আকুলি[২]। গভীর বচন সদা অঙ্গে রাঙ্গা ধূলি॥
কটি ধটি ধড়া যোড়া করে[৩] তলোয়ার। ঢালি পাকি[৪] খেলে কেহ ঘুরাইয়া ঢাল॥
ঘন ঘন ফেলে ডহন[৫] ঘুরায় মুদ্গর। মালশাটে ফাটে মাটী ভাঙ্গে হয় চূর॥
গগনে উড়ায় বাঁশ ঘন ঘন লোফে। কিলাকিলি হুড়াহুড়ি পরস্পর কোপে॥
পৃ ১৬-১৭॥

বিশেষ অশ্লীলতা না থাকিলেও কাব্যটি আদিরসপ্রধান।

খড়দহের কাছে কবির পিতামহের মাতুলালয় রড়া গ্রামের দেবী ভুবনেশ্বরীব স্বপ্নাদেশে দুর্গামঙ্গল রচিত হয়। দুর্গামঙ্গলের গৌরীবিলাস অংশের সূচী এই—বন্দনাদি, অগস্ত্যের কাশী পরিত্যাগ ও কার্ত্তিকেয় কর্ত্তৃক স্কন্দপুরাণ শুনাইয়া সান্ত্বনা, সৃষ্টিতত্ত্ব, সমুদ্রমন্থন—এই অবধি প্রথম পালা। হিমালয়ে উমার জন্ম, শিবের তপস্যা, তারকাসুরের উপাখ্যান, মদনভস্ম, উমার তপস্যা, ব্রহ্মচারী বেশে শিব কর্তৃক উমার পরীক্ষা, নারদের ঘটকালি, শিব পার্ব্বতীর বিবাহ, শিবের শ্বশুরালয়ে স্থিতি,

১। পাঠান্তর 'ধমকে ধমকে।'
২। ঐ 'অঙ্গুলে অঙ্গুলী।' ৩। ঐ 'কোটি কোটি ধড়া করে ঢাল।'
৪। ঐ 'পাক।' অর্থাৎ পাইক। ৫। ঐ 'লড়।'

উমার নির্ব্বেদ ও শিব লইয়া পিতৃগৃহ পরিত্যাগ, বিশ্বকর্ম্মা কর্ত্তৃক কাশী নির্ম্মাণ, তিলভাণ্ডেশ্বরের উপাখ্যান, উমাবিরহে মেনকার দুঃখ, হিমালয় কর্ত্তৃক উমাকে তিন দিনের জন্য গৃহে লইয়া যাওয়া, গণেশের জন্ম ও গজমুণ্ডপ্রাপ্তি, দেবীর স্তব, কার্ত্তিকেয়ের জন্ম, তারকাসুরের সহিত যুদ্ধ, দেবতাদিগের স্বর্গপুরী পুনঃপ্রাপ্তি—এই অবধি দ্বিতীয় পালা। কঙ্কালীর অভিশাপ হয়ত তৃতীয় পালার অন্তর্গত ছিল।

গৌরীবিলাসে কুমারসম্ভবের ছায়া বিশেষ স্পষ্ট। কবি স্থানে স্থানে আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। গৌরীবিলাসে রামচন্দ্র বিশেষ ছন্দঃ-চাতুর্য্য দেখাইয়াছেন, এবিষয়ে তিনি ভারতচন্দ্রকে অনুসরণ করিয়াছেন। নিম্নে উদ্ধৃত অংশ কবির মতে "পিঙ্গল" ছন্দে রচিত।

বাজিল রে রণডঙ্কা

দগড় দগড় ডিমি	বাজয়ে টিমিটিমি	ঘোর ঘোষণ ঝঙ্কা ॥
তা থই থই থই	নাচয়ে ধেই ধেই	মারই [······] রঙ্কা।
সাজয়ে সবদল,	কুলকুল কল কল	ঘন রোল, মা কুরু শঙ্কা ॥
ঝুনু ঝুনু ঝাঁঝর	রুনু রুনু ঘাগর	ঝন ঝন নূপুর বাজে।
কত পরিপন্থী	[······] দন্তী	নিশান খস্তি বিরাজে ॥
তরয়ার চকমকি,	ঝকমক ধকধকি	চর্ম্ম বর্ম্ম পরি বাজে।
মুষল মুদ্গর	কামানে পূরি শর	ধানুকী খরতর গাজে ॥
রণবরে রঞ্জন	ঝঞ্ঝা শন শন	[ঘন] ঘন বাণ ডাকে।
মারই কাটই	তাড়ই [ফাড়ই]	মা ভৈঃ মা ভৈঃ হাঁকে ॥
গজে উরগ সম	চলিল তুরঙ্গম	থম থম দম দম দাপে।
সারি সারি ঢালি ঢাকি	সঘনে সঘনে হাঁকি,	ধানুকী ধরি ধনু কাঁপে ॥
মদভরে গর্ব্বিত	লোচন লোহিত	চর্ব্বিত দন্তই দন্তে।
চলিল দলবল,	মেদিনী টলমল,	প্রলয় হয় বুঝি অন্তে ॥
কম্পিত ফণিফণা	কূর্ম্মের বেদনা,	অধীরা ধরণী হ'য়ে কম্পে
কহে রামচন্দ্র কবি,	ধূলায় ঢাকিল রবি	অচল চলিত হয় লম্ফে ॥

মাধবমালতী কাব্য মহারাজা নবকৃষ্ণের পৌত্র মহারাজা কালীকৃষ্ণ দেবের (১৮০৪-১৮৭৪ খ্রীষ্টাব্দ) অনুমতিক্রমে রচিত ও মুদ্রিত হয়।

মহারাজ নবকৃষ্ণ বিখ্যাত নগরী। তাঁহার বর্ণনা আমি কিরূপে বা করি॥
আরোপিতকথনের নাম হয় স্তব। সে সব বর্ণনা হবে নহে অসম্ভব॥
দ্বিতীয় বিক্রমাদিত্য লইলেন জন্ম। সেই মত তাবৎ ইঁহার দেখি কর্ম্ম॥
তাঁর ছিল নবরত্ন ইঁহার সেরূপ। সভাস্থের কিবা কব নিজে বিদ্যাকূপ॥
সাক্ষাৎ বরদাপুত্র নামে জগন্নাথ। তর্কপঞ্চাননরূপে ভুবনবিখ্যাত॥
মহাকবি বাণেশ্বর ভূদেব[১] শঙ্কর। বলরাম কামদেব আর গদাধর॥
শিশুরাম পসপুরে স্মার্ত্ত কৃপারাম। শান্তিপুরে বাস গোঁসাঞি ভট্টাচার্য্য নাম॥
এই নবরত্ন নিয়া সর্ব্বদা আমোদ। আপনি আছেন লক্ষ্মী কি কব সম্পদ॥
মান্যের কি ক'ব যার উজিরত্ব পদ। হুকুম আছিল যার করিবারে বধ॥
বিলাতের বাদশাহ করিল সম্মান। গবর্ণর ঘরে যিনি সদা চৌকি পান॥
অধিকার হাতেগড়[২] গঙ্গামণ্ডল আদি। হেন জন নাহি ছিল হয়[৩] প্রতিবাদী॥
রূপের তুলনা নাই মানে গোষ্ঠীপতি। মুখ্য বিনা কর্ম্ম নাই তাঁহার সন্ততি॥
তাঁর পুত্র বাহাদুর রাজা রাজকৃষ্ণ। কি কব তাঁহার গুণ ন শ্রুত ন দৃষ্ট॥
পিতাতুল্য মান্যবান্ তাবৎ কর্ম্মেতে। বিশেষ তাঁহার গুণ দয়ায় ধর্ম্মেতে॥
দেবীবর বল্লালের যেবা ছিল ঘাটি। কায়স্থের কুলের করিল পরিপাটী॥
তাঁর পুত্র কালীকৃষ্ণ বাহাদুর নাম। নবীন প্রবীণ জিনি সর্ব্বগুণধাম॥
আদ্যাশক্তি কমলার কবিত্ব[৪] বিশেষ। কবি রামচন্দ্র প্রতি করিলা আদেশ॥
আপনার পরিচয় দিতে কিছু হয়। সংক্ষেপে কিঞ্চিৎ বলি নিজ পরিচয়॥
কানাই ঠাকুর বংশে গোপাল মুখুটী। ইষ্টনিষ্ঠ দাতা ধীর নিবাস গরিটী॥
ফুলিয়া বিখ্যাত কুল ভঙ্গ নিজে হন। তস্য পুত্র রামধন কুলে ঘাটি নন॥
তাহার তনয় জ্যেষ্ঠ রামচন্দ্র কবি। ভাষায় কবিতা বহু বিরচি[৫] সুছবি॥[৬]

১। পাঠান্তর 'নদের।' ২। ঐ 'হাতে জার।' ৩। ঐ 'করে।'
৪। ঐ 'কবিতা।' ৫। পাঠ 'বিরচিতা।' ৬। পাঠান্তর পূর্ব্বে দ্রষ্টব্য।

শেষ পয়ার হইতে বোঝা যায় যে মাধবমালতীর পূর্ব্বে কবি একাধিক কাব্য (তন্মধ্যে দুর্গামঙ্গলও) রচনা করিয়াছিলেন। মাধবমালতী কাব্য ভবভূতির মালতীমাধব নাটকের আখ্যায়িকা লইয়া রচিত।

রামচন্দ্র রচিত তৃতীয় কাব্য হইতেছে অক্রূরসংবাদ বা শ্রীকৃষ্ণলীলামৃতরস। কবি সমগ্র কৃষ্ণলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন কিনা বলিতে পারি না। তবে অক্রূর-সংবাদ কাব্য (বা কাব্যাংশ) মুদ্রিত হইয়াছিল।[১]

কাব্যটির উপাখ্যান অংশের সূচী এই—নারদের মথুরায় গমন, কংসের সহিত নারদের কথোপকথন, কংসের যজ্ঞের উপদেশ, কংসের যজ্ঞারম্ভ, বসুদেব ও দেবকীর নিকট অক্রূরের বিদায় গ্রহণ, অক্রূরের নন্দালয়ে গমন, অক্রূরের সহিত নন্দের কথোপকথন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত অক্রূরের সাক্ষাৎ, যশোদার নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিদায়, যশোদার নিকট যোগ কথন, শ্রীদামের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কথা, রাধিকার বাসর সজ্জা, শ্রীকৃষ্ণের সুসজ্জা, যশোদার নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিদায় গ্রহণ, অক্রূরের সহিত শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় গমন, শ্রীরাধিকার রাজপথে গমন, শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাক্ষাৎ, রাধিকার নিকট শ্রীকৃষ্ণের বিদায় গ্রহণ, ব্রজাঙ্গনার বিরহ বর্ণন, দূতী কর্ত্তৃক রাধিকার প্রবোধ, ভ্রমরের প্রতি শ্রীরাধিকার আক্ষেপ, শ্রীকৃষ্ণের মথুরা প্রবেশ, তন্তুবায় কর্ত্তৃক বস্ত্র পরিধাপন, কুব্জার সহিত শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ, মথুরাবাসিনীর আক্ষেপ, মথুরাবাসিনীর শ্রীকৃষ্ণ দর্শন, অন্ধ ও খঞ্জের শ্রীকৃষ্ণদর্শন।

ভণিতা এইরূপ—

শ্রীকৃষ্ণপদারবিন্দ ভাবি এক মনে।
কৃষ্ণলীলামৃতরস রামচন্দ্র ভণে॥

কৃষ্ণের বচনে নন্দ নিস্তব্ধ হইল।
কৃষ্ণলীলামৃত রামচন্দ্র বিরচিল॥

দ্বিজ রামচন্দ্র বলে, জল আনিবার ছলে
হয় কৃষ্ণদরশনকামী॥

১। বর্ত্তমান আলোচনায় মহেশচন্দ্র ঘোষের সংস্করণ (১২৭৮) ব্যবহৃত হইয়াছে।

কাব্যটিতে কবির পরিচয় নাই, এই হেতু অনুমান করি যে এটি কৃষ্ণলীলামৃতরস কাব্যের শেষাংশ মাত্র, পূর্ব্বাংশে ব্রজলীলা বর্ণিত ছিল।

রচনার নিদর্শন স্বরূপ অক্রূরসংবাদ হইতে রাধার প্রতি দূতীর উক্তি অংশটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

নিবেদিনু বারে বারে না রবে সৌরভ। এত মান ভাল নয় যাইবে গৌরব॥
আমার বচন রাই না শুনিলে কানে। মানে হৈল অপমান বধিলেক প্রাণে॥
সে সকল বুঝি কি কৃষ্ণের মনে নাই। সেই অভিমানে কৃষ্ণ যায় বুঝি রাই॥
রজনী বঞ্চিবে আজি ছিল বড় সাধ। সে সাধে বিধাতা বুঝি ঘটালে বিবাদ॥
সাধে করিয়াছি বেশ সাধি অতি সার। সাধের নাগরে দিবে গাঁথি ফুলহার॥
সে হার প্রহার হৈল বিহার করিয়া। শয্যা সজ্জা করেছিলে লজ্জা ঘুচাইয়া॥
সে শয্যা বর্জ্জন হৈল নিলর্জ্জ আসিয়া।[১] ... ...
প্রাণপণে প্রাণ দিতে করি পরিচ্ছদ। পলাইল প্রাণনাথ প্রাণে করি বধ॥
সাদরে আদর ছিল গৌরবে সৌরভ। সে আদর অনাদর করিল মাধব॥
পৃ ২৯॥

"দ্বিজ" কালিদাস রচিত কালীবিলাস বটতলা হইতে বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মার্কণ্ডেয়পুরাণোক্ত চণ্ডিকাকাহিনী এবং সতী-পার্ব্বতীর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যটিতে কয়েকটি গান আছে। ভণিতা এইরূপ—

কালিকার পাদপদ্ম হৃদে করি আশ।
রচিল শ্রীকালিদাস কালিকাবিলাস॥

দেবীভাগবত বা মহাভাগবতের অন্তর্গত ভগবতীগীতার অনুবাদ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়।[২] রচয়িতার নাম রামরত্ন ন্যায়পঞ্চানন।

বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভগবদ্গীতা ১২২৬ সালে প্রকাশিত হয়।[৩] নিত্যানন্দ প্রভুর দৌহিত্রবংশীয় "দ্বিজ" পীতাম্বরের রাস পঞ্চাধ্যায়ের এবং উদ্ধব-দূতের অনুবাদ ১৭৪২ শকাব্দায় ফাল্গুন মাসে অর্থাৎ ১৮২১ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়।[৪]

চাটিগ্রাম জোয়ারা গ্রামবাসী ভৈরবচন্দ্র (নামান্তর রাধাচরণ) রক্ষিতের চণ্ডিকা-মঙ্গল উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় অথবা তৃতীয় পাদে রচিত হয়। ইহা মার্কণ্ডেয়-

১। এইখানে অন্ততঃ একটি চরণ বাদ পড়িয়াছে। ২। সংবাদ পত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ ৫৭, ৬১; ব-সা-প-প ৪৪, পৃ ৫। ৩। ব-সা-প-প ৪৪, পৃ ৯। ৪। ঐ, পৃ ৩২।

পুরাণ অবলম্বনে রচিত। কবির পৌত্র ক্ষেমেশচন্দ্র রক্ষিত কর্ত্তৃক কাব্যটি প্রকাশিত হইয়াছে।[১] গ্রন্থশেষে প্রদত্ত কবিপরিচিতি এইরূপ—

গুপ্ত ভৈরব নামে নহি পরিচিত। প্রকাশ্য শ্রীরাধাচরণ পদ্ধতি রক্ষিত॥
ভরদ্বাজ গোত্র মম ত্রিপ্রবর ইতি। জোয়ারা গ্রামেতে হয় দীনের বসতি॥

ভণিতা এইরূপ—

দেবীর প্রভাব শুন কহি যে সকল।
ভৈরব রক্ষিত রচে চণ্ডিকামঙ্গল॥

"দ্বিজ" রঘুনাথ রচিত মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী নিতান্ত ক্ষুদ্র কাব্য। পয়ার সংখ্যা প্রায় ৩৫০।[২] শ্রীহট্ট ও চট্টগ্রাম অঞ্চলে ঘোর মঙ্গলচণ্ডীর ও নিয়তমঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালীর বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

ধুলুক পরগনা নিবাসী নন্দকুমার কবিরত্নের কালীকৈবল্যদায়িনী[৩] একটি বৃহৎ অভিনব দেবীমাহাত্ম্য কাব্য। ইহাতে রাবণ কর্ত্তৃক বসন্তকালে দুর্গাপূজা, মার্কণ্ডেয়-চণ্ডী কাহিনী, শ্রীরামচন্দ্রের শারদীয়া দুর্গাপূজা, বিন্ধ্যবাসিনীর উপাখ্যান, গোপীগণের কাত্যায়নীপূজা ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যটির রচনাকাল হইতেছে ১২৩৮ সাল। নন্দকুমারের অপরাপর গ্রন্থের ও বিস্তৃত পরিচয় অষ্ট-পঞ্চাশ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

এই শতাব্দীতে অনেকগুলি মনসামঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল। কতকগুলি কাব্যের তারিখ জানা নাই। এগুলির কয়েকটি পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দীর রচনা হইতে পারে। হরগোবিন্দ শর্ম্মা বিরচিত মনসামঙ্গলের পুঁথি উত্তরবঙ্গে পাওয়া গিয়াছে।[৪] ভণিতা এইরূপ—

মনসার চরণসরোজে দিয়া মন।
হরগোবিন্দ (শর্ম্মন) গান করিল রচন॥

চাটিগ্রাম অঞ্চল হইতে দুইখানি মনসামঙ্গল পাওয়া যাইতেছে। একটির কবি হইতেছেন মধুসূদন "দৈ" (দে অথবা দৈবক ?)।[৫] এই কাব্যের পুঁথিতে

১। বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ৬৩-৬৪। ২। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩২৬।
৩। অনন্তলাল লাহা কর্ত্তৃক প্রকাশিত (চতুর্দ্দশ সংস্করণ ১৩১৭)।
৪। র-সা প-প ২, পৃ ৩৭। ৫। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৯৪-৯৫।

জগৎবল্লভের এবং "হরিসুত" নন্দলালেরও ভণিতা পাওয়া যাইতেছে। অপর কাব্যের রচয়িতা হইতেছে "ছিরা বিনোদ" (শ্রীরামবিনোদ?)।[১] ইহাতে একবার রূপনারায়ণের ভণিতাও মিলিতেছে।

জগমোহন মিত্রের মনসামঙ্গল বিরচিত হয় ১৭৬৬ শকাব্দে ১২৫১ সালে অর্থাৎ ১৮৪৪-৪৫ খ্রীষ্টাব্দে। গ্রন্থরচনার কাল কবি খুব ঘটা করিয়াই বলিয়াছেন।

অতঃপর গ্রন্থসাঙ্গকাল নিরূপণ। ষড়্‌রস সিন্ধু শশী ক্রমেতে গণন ॥
সন শশী বাণ পক্ষ অস্ত্র (?) তদন্তরে। অঙ্কস্য বামা গতি ব্যক্ত চরাচরে ॥
মূর্খের হইবে দুঃখ সূক্ষ্ম ভাবনায়। প্রকাশ করিয়া তাই লিখি পুনরায় ॥
শকাব্দ সতেরো শত ছেষট্টি জানিবে। সন ধল্যে বার শত একান্ন জানিবে ॥

গ্রন্থমধ্যে কবি যথাসম্ভব বিস্তৃতভাবে নিজ বংশপরিচয় দিয়াছেন।[২] জগমোহন একখানি কমলামঙ্গল কাব্যও রচনা করিয়াছিলেন।[৩]

যশোহর জেলার অন্তর্গত মল্লিকপুর গ্রামনিবাসী বন্দ্যঘটীয় "দ্বিজ" কালীপ্রসন্ন বিরচিত মনসামঙ্গল ১২৬৭ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।[৪] মনসামঙ্গল কাব্যের একতম শেষ কবি হইতেছেন শ্রীহট্টের রাধানাথ রায় চৌধুরী (মৃত্যু ১২৮৯ সাল)।[৫] ইনি বহু যাত্রাপালা ও গান লিখিয়াছিলেন।[৬] শ্রীহট্টের অপর এক কবি কমলনারায়ণ রায় চৌধুরী ইঁহার পরেও একখানি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।[৭]

কমলামঙ্গল বা লক্ষ্মীর ব্রতকথা জাতীয় কাব্য অনেকগুলি রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে জগমোহন মিত্রের কাব্যের কথা বলিয়াছি। বোধ হয় এইটিই উনবিংশ শতাব্দীর কমলামঙ্গল কাব্যের মধ্যে সমধিক উল্লেখযোগ্য। রঞ্জিতরাম দাসের পাঁচালী নিতান্ত ক্ষুদ্র কাব্য।[৮] ইহার রচনাকাল হইতেছে ১৭২৮ অথবা ১৭৪৮ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮০৬-০৭ অথবা ১৮২৬-২৭ খ্রীষ্টাব্দ।

১। বা-প্রা পু-বি ১-১, পৃ। ২। ব-সা-প-প ৪, পৃ ৩২৬-২৭। ৩। বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ৭৬।
৪। র-সা-প-প ২, পৃ ১৮৭-৮৮। ৫। কবির পুত্র দ্বারকানাথ চৌধুরী কর্তৃক প্রকাশিত।
৬। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২৩৩। ৭। ঐ, পৃ ২২৯।
৮। প্রদীপ পত্রিকায় (১৩:১, পৃ ৩৮১ ৮৬) প্রকাশিত। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৮২-৮৩।

বসু যুগ সিন্ধু শশী শক পরিমাণ।
কমলার চরিত্র কথা হৈল সমাধান॥

চাটিগ্রাম অঞ্চল হইতে নামযুক্ত ও নামহীন কয়েকটি লক্ষ্মীর ব্রতকথা পাওয়া গিয়াছে।[১] ভরত "পণ্ডিত" রচিত লক্ষ্মীচরিত্রের পুঁথি পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গিয়াছে। ইনি একখানি প্রহ্লাদচরিত্রও রচনা করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর লোক। মহেশচন্দ্র দাস রচিত লক্ষ্মীমঙ্গল ১২৮৩ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।[২] লক্ষ্মীনারায়ণের পাঁচালী রচয়িতা "বিপ্র" যাদবানন্দ পশ্চিমবঙ্গের লোক।[৩]

এই শতাব্দীতে বহু বহু সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচিত হইয়াছিল। এইজাতীয় কাব্য নিতান্তই ক্ষুদ্র এবং একেবারে বৈচিত্র্যবিহীন।

সূর্য্যের পাঁচালী পাওয়া যাইতেছে "দ্বিজ" লক্ষ্মণের ও "দ্বিজ" কালিদাসের। উভয়েই চাটিগ্রাম অঞ্চলের লোক ছিলেন।[৪]

শনির পাঁচালীগুলিও প্রধানতঃ চাটিগ্রাম ও শ্রীহট্ট অঞ্চলে রচিত হইয়াছিল। এই সব কবি রচিত শনির পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে—কালিদাস,[৫] ষষ্ঠীচরণ,[৬] "দ্বিজ" বিনোদ,[৭] "দ্বিজ" রামদয়াল,[৮] যদুনাথ,[৯] অন্নপূর্ণা দাস,[১০] ও গুরুপ্রসাদ চৌধুরী।[১১]

দুইখানি বড় শীতলামঙ্গল পাওয়া যাইতেছে।[১২] একখানির রচয়িতা হইতেছেন "কবিবল্লভ" দৈবকীনন্দন, অপরখানির কবি হইতেছেন নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী। নিত্যানন্দ চক্রবর্ত্তী পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দীর লোক হইতে পারেন। তাঁহার কাব্যের যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে তাহার লিপিকাল হইতেছে ১২১৬ সাল অর্থাৎ ১৮০৯-১০ খ্রীষ্টাব্দ। নিত্যানন্দ এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

১। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ২৪; ১-২, পৃ ৯-১০।

২। র-সা-প-প ৬, পৃ ৪৬।
৩। ব-সা-প-প ৮, পৃ ৩৯।

৪। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৭১-৭২, ১৪২। ৫। ঐ, পৃ ২২-২৩। ইঁহার কাব্যের পুঁথি রঙ্গপুর অঞ্চলেও পাওয়া গিয়াছে [ব-সা-প-প ১৩, পৃ ১৭৯-৮০]। ইনি পূর্ব্ববর্ত্তী শতাব্দীর লোক হইতে পারেন। ৬। বা-প্রা পু-বি ১-১, পৃ ৫৮-৫৯। ৭। ঐ, পৃ ১৬৭-৬৮, প্রদীপ ১৩১০, পৃ ৩০৬-১০। ৮। বা-প্র-পু-বি ১-১, পৃ ২১৮-১৯। ৯। ঐ, ১-২, পৃ ১৭। ১০। ঐ, পৃ ৯৪। ১১। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয় খণ্ড, পৃ ২২৯। ১২। ব-সা-প-প ৫, পৃ ২৭-৭০।

সৌতি সম সর্ব্বশাস্ত্র শ্রীযুত ভবানী মিশ্র, তস্য সুত মিশ্র মনোহর।
তার পুত্র চিরঞ্জীব, কি গুণে তুলনা দিব, যার সখা প্রভু দামোদর ॥
মহামিশ্র তস্যাত্মজ শ্রীরাধাচরণানুজ শ্রীচৈতন্য তাহার নন্দন।
তাহার মধ্যম ভ্রাতঃ নিত্যানন্দ নামযুত গাহে ভেবে শীতলাচরণ ॥

ছোটখাট ব্রতকথার ছড়া অজস্র পাওয়া গিয়াছে। এগুলির সাধারণতঃ সাহিত্যিক মূল্য একেবারে কিছুই নাই। এই শ্রেণীর কয়েকটি ব্রতকথার নাম করিতেছি—অনন্তব্রতকথা,[১] জন্মাষ্টমীব্রতকথা,[২] জিতাষ্টমীব্রতকথা,[৩] সুবচনীর ব্রতকথা,[৪] কালবেলকুমারের ব্রতকথা,[৫] কার্ত্তিকের (বা গুয়ামেলানি) ব্রতকথা,[৬] ইত্যাদি।

এই প্রসঙ্গে স্থানীয় দেবদেবীর বা তীর্থস্থানের মাহাত্ম্যপ্রকাশক কাব্য বা ছড়ার কথা আসে। 'পশ্চিমবঙ্গে রাঢ়ে আমরা পাইতেছি "দ্বিজ" শঙ্কর রচিত তারকনাথের ছড়া,[৭] জয়কৃষ্ণ দাস[৮] ও অন্যান্য কবি রচিত মদনমোহনবন্দনা, নফর দাস ও অন্যান্য কবি রচিত ১২৩০ সালে দামোদরের বন্যার গান (বানভাসী ছড়া)। উত্তররাঢ়ে পাইতেছি কৃত্তিবাস রচিত যোগাদ্যার বন্দনা,[৯] "দ্বিজ" জগন্মোহন রচিত কল্যাণেশ্বরীর শঙ্খপরিধান,[১০] এবং উত্তরবঙ্গে পাই "দ্বিজ" গৌরীকান্ত রচিত মহাস্থানে পৌষনারায়ণী করতোয়াস্নানের ছড়া,[১১] ব্রহ্মপুত্র মাহাত্ম্য,[১২] ইত্যাদি।

রাধাকৃষ্ণ দাস বৈরাগী রচিত গোসানীমঙ্গল কাব্যে গোসানীমারি গ্রামের গোসানী দেবীর মাহাত্ম্য কীর্ত্তনচ্ছলে কান্তেশ্বরের কীর্ত্তিকলাপ বর্ণিত হইয়াছে। কবি উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে জীবিত ছিলেন। বইটি ১২০৬ সালে প্রকাশিত হইয়াছিল।[১৩]

১। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৪৩-৪৪ ; ঐ ২-১, পৃ ৪২।

২। ঐ ২-১, পৃ ৪১। ৩। ঐ, পৃ ৪১। ৪। ঐ ১-১, পৃ ৬৯, ঐ ১-২, পৃ ১২-১৩, ১০১।

৫। ঐ, ১-১ পৃ ২১৮ ৬। ঐ, পৃ ৩৯-৪০, ২২৫

৭। জন্মভূমি ১৩১৩ অগ্রহায়ণ ; বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ১৮। ৮। ব-সা প-প ৬, পৃ ৬৩।

৯। ব-সা-প-প ৫, পৃ ৭৭, বা-প্রা-পু-বি ৩-২, পৃ ১০০-০২। তারিখযুক্ত প্রাচীনতম পুঁথির লিপিকাল ১২১৮ সাল। ১০। বা-প্রা-পু-বি ২-১, পৃ ২২-২৩। ১১। র-সা-প-প ২, পৃ ৪৫-৪৮, ৯১-৯২। ১২। ঐ, পৃ ৯৬-৯৭। ১৩। বা-প্রা-পু বি ১-২, পৃ ৪৪-৪৫।

সপ্তপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

রামায়ণ, মহাভারত, কৃষ্ণায়ণ, বিবিধ পৌরাণিক এবং বৈষ্ণবনিবন্ধ ও পদাবলী

ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেকগুলি রামায়ণ কাব্য রচিত হইয়াছিল। কিন্তু মহাভারত কাব্য সম্ভবতঃ একটির বেশী রচিত হয় নাই।

রামানন্দ যতি প্রণীত রামায়ণ[১] ১৭২৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮০৬ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হইয়াছিল, ইহা অসম্ভব নহে। পূর্ব্বে এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছি।

বস্থ পক্ষ শৈল চন্দ্র শকে রামায়ণ। বাণ মাসে ভাদ্রপদে কুজে হল্য সমাপন॥
যুগচন্দ্র দিবসেতে শুক্লা ত্রয়োদশী। হইল পুস্তক চণ্ডীমণ্ডপেতে বসি॥

ইত্যাদি।

জগৎমোহনের রামায়ণের[২] রচনাকাল হইতেছে ১৭৬০ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮৩৮ খ্রীষ্টাব্দ।

কমললোচন দত্তের রামায়ণ ১৮৪২ খ্রীষ্টাব্দে রচিত।[৩] কবির স্বহস্তলিখিত অরণ্য, সুন্দরা, লঙ্কা এবং উত্তরা কাণ্ডের পুঁথি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে আছে। কবির পিতার নাম কর্ত্তারাম দত্ত, মাতার নাম পদ্মাবতী। ইঁহারা জাতিতে কায়স্থ। বাসস্থান ছিল মেদিনীপুর জেলায় কোণকুড্যা গ্রাম।

রঘুনন্দন গোস্বামীর রামরসায়ন[৪] শুধু ঊনবিংশ শতাব্দীর রামায়ণ কাব্যের মধ্যে নহে, প্রাচীন কাব্যধারার একটি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। কাব্যটি আনুমানিক ১২৩৮ সালে অর্থাৎ ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে রচিত হয়।[৫] কবি ছিলেন নিত্যানন্দ প্রভুবংশীয়, বাসস্থান বর্দ্ধমান জেলায় মানকরের নিকটবর্ত্তী মাড় গ্রামে। রামায়ণের শেষভাগে কবি এই আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

১। ব-সা-প-প ২, পৃ ২০১-০২। ২। ব-সা-প-প ২, পৃ ১ হইতে।
৩। DCBM Vol. II, পৃ ১৶০।
৪। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত (পঞ্চম সংস্করণ ১৩৩৫)। ৫। ঐ ভূমিকা, পৃ [১]।

দেখিয়া কলির রীতি শিখাইতে কৃষ্ণপ্রীতি কৃপাময় প্রভু বলরাম।
অবতার করি লোকে নিস্তারিলা সব লোকে ধরি নিজে নিত্যানন্দ নাম॥
বীরভদ্র তাঁর সুত, তাঁর পুত্র গুণযুত গোপীজনবল্লভ বিদ্বান্।
তাঁর পুত্র গুণধাম শ্রীরামগোবিন্দ নাম, তাঁর পুত্র বিশ্বম্ভরাখ্যান॥
রামেশ্বর তাঁর সুত, নৃসিংহ তাঁহার পুত, তাঁর পুত্র বলদেব নাম।
তিন পুত্র হন তাঁর সর্ব্বগুণ ভাণ্ডাগার জগৎ মাঝারে অনুপাম॥
শ্রীলালমোহন আর শ্রীবংশীমোহন তাঁর কনিষ্ঠ শ্রীকিশোরীমোহন।
শ্রীমধ্যম প্রভু তায় কৃপা করি মো সবায় কর্য্যাছেন মন্ত্র সমর্পণ॥
কনিষ্ঠ সদ্গুণ ধাম ভুবনবিখ্যাত নাম বেদশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত।
অদ্বিতীয় ভাগবতে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমতে করিলা যে গ্রন্থ সুবিদিত॥
সেই প্রভু মোর পিতা, উষা নাম মোর মাতা, বিমাতা শ্রীমতী মধুমতী।
মোর জ্যেষ্ঠ তিন জন, বিশ্বরূপ সঙ্কর্ষণ শ্রীমধুসূদন মহামতি॥
চারি ভ্রাতা বৈমাত্রেয় শ্রীরামমোহন প্রিয় নারায়ণ গোবিন্দ আখ্যান।
সকলের কনীয়ান্ বীরচন্দ্র অভিধান, তিন ভগ্নী সদ্গুণনিধান॥
সহোদর ভগ্নীপতি দীপচন্দ্র মহামতি চট্টরাজ বংশ অগ্রগণ্য।
শ্রীরামগোবিন্দ প্রাজ্ঞ শ্রীদোলগোবিন্দ বিজ্ঞ বৈমাত্রেয় ভগ্নীপতি ধন্য॥
পিতা রাশি-অনুসারে আর এক নাম মোরে ভাগবত বলিয়া অর্পিলা।
কৃপাকণ প্রকাশিয়া নানা শাস্ত্র পড়াইয়া যৎকিঞ্চিৎ জ্ঞান জন্মাইলা॥
বর্দ্ধমান-সন্নিধান গ্রাম মাড় অভিধান, তাহাতেই আমার নিবাস।
সন্তোষিতে বন্ধুজন এই গ্রন্থ বিরচন করিলাম পাইয়া প্রয়াস॥

প্রত্যেক পরিচ্ছদের শেষে কবি স্বীয় মধ্যম জ্যেষ্ঠতাত এবং গুরু বংশীমোহনের নাম করিয়াছেন।

দুইলোকে গতি যার শ্রীবংশীমোহন।
রামরসায়ন গায় সে রঘুনন্দন॥

কবির যে সংস্কৃতে বিশেষ পাণ্ডিত্য ছিল তাহা রামরসায়নের পদগুলি পড়িলেই

বোঝা যায়। ইনি অনেকগুলি সংস্কৃত কাব্যও লিখিয়াছিলেন।[১] রামরসায়ন ছাড়া তাঁহার রচিত আর দুইটি বাঙ্গালা কাব্য আছে, রাধামাধবোদয় ও গীতমালা।

রামরসায়ন সাত কাণ্ডে বিভক্ত, এবং প্রত্যেক কাণ্ডে কতকগুলি করিয়া পরিচ্ছেদ। ইহাতে সীতার পাতালপ্রবেশ বর্ণিত হয় নাই। প্রকৃত পক্ষে বলিতে গেলে রামরসায়নের উত্তরকাণ্ডের বিষয়বস্তু প্রায় সম্পূর্ণরূপে অভিনব।

রামরসায়ন সুবৃহৎ কাব্য, সম্ভবতঃ বাঙ্গালা ভাষায় বৃহত্তম কাব্য। কিন্তু এই বৃহৎ কাব্যের মধ্যে কবির অক্ষমতার চিহ্ন এতটুকু নাই। ভাষায় এবং ছন্দে রঘুনন্দনের সমান দক্ষতা ছিল। কাব্যের মধ্যে অনেকগুলি দীর্ঘ ও হ্রস্ব ত্রিপদী ছন্দে রচিত পদ আছে, তাহার একটি নিদর্শন স্বরূপ তুলিয়া দিলাম।

জয়তি জয়তি ধরণীপতি, জয়তি জয়তি রাম।
জনক-নৃপতি- দুহিতাপতি নির্ম্মল গুণধাম॥
কোটী মদন- মদখণ্ডন পদনখরুচিলেশ।
চরণ-কমল- রুচিমণ্ডল জিত নবদিবসেশ॥
কদলীতরু- সুললিত উরু মধ্যম অতি ক্ষীণ।
রমণীমন- মৃগনর্ত্তন মণিতট উরপীন॥
বনিতাকুল- ধৃতিশৈবল- ভঞ্জন ভুজদণ্ড।
বনিতামদ- তিমিরবিপদ- কর শশধরতুণ্ড॥
মিথিলাপতি- তনয়াধৃতি- দলননয়ন বাণ।
রঘুনৃপকুল- বিমলকমল- বিকশনরবি ভান॥

রামরসায়ন প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্য ধারার শেষ শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। রাধামাধবোদয় কৃষ্ণলীলাত্মক কাব্য। ইহার রচনা সমাপ্ত হয় ১৭৭১ শকাব্দে।[২]

শ্রীরাধামাধবয়োঃ প্রীতয়ে ভবতু শাকেঽব্দে ক্ষমা সপ্ত সপ্ত ক্ষামিতে।
বৃষসংক্রমে গঙ্গাতীরে পাণিহাটিগ্রামেঽয়ং পূর্ণতামগাৎ॥

১। ঐ ভূমিকা, পৃ [২]। ২। বঙ্গভাষার লেখক, পৃ ২৫১।

গীতমালা[১] পদাবলী সমন্বিত শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল কাব্য। কাব্যটি ত্রিশটি "গ্রন্থনে" গ্রথিত। ইহাতে পদসংখ্যা হইতেছে চারি শত উনচল্লিশ। উদাহরণ হিসাবে একটি পদ উদ্ধৃত করিতেছি। ইহাতে শিশু কৃষ্ণের চিত্র বাস্তবভাবে অঙ্কিত হইয়াছে।

কভু নিজ সহচরী- গণ সঙ্গে ব্রজেশ্বরী মিলি নিজ ভবনে বসিয়া।
কৃষ্ণেরে কহেন বাণী, আন দেখি পীঠখানি, বাপধন তুমি রে তুলিয়া॥
শুনি সেই জননী বচন।
পীঠ ধরি দুই করে তুলি লয়্যা স্বজঠরে ঠেকায়্যা করেন আনয়ন॥
যদি কেহ কহে তাঁরে ভারী দ্রব্য আনিবারে, তবে তার নিকটে যাইয়া।
করতলে করি ধরি তুলিবারে নাহি পারি ফিরি যান হাসিয়া হাসিয়া॥
কভু গোঠ হত্যে আসি নন্দ আঙ্গিনায় বসি কৃষ্ণে কন পাদুকা আনিতে।
প্রভু তাহা করে ধরি তুলিয়া মস্তকোপরি আনি দেন আনন্দিতচিত্তে॥
শঙ্করাদি দেববৃন্দে যাঁর পাদপীঠ বন্দে সেহ শিরে যার বাধা বহে।
সে নন্দের যে মহিমা কে কহিবে তার সীমা, শ্রীরঘুনন্দন এই কহে॥
পৃ ১০॥

কোচবিহারের মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণ (রাজ্যকাল ১৭৮৩-১৮৩৯ খ্রীষ্টাব্দ) বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা বিশেষভাবে করিতেন। ইনি নিজে এবং সভাকবিদিগের দ্বারা বহু বাঙ্গালা আধ্যাত্মিক গীতিকবিতা রচনা করিয়াছিলেন[২] এবং মহাভারত, রামায়ণ, স্কন্দপুরাণের ব্রহ্মোত্তরখণ্ড, পদ্মপুরাণের ক্রিয়াযোগসার, বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ এবং হিতোপদেশ এই গ্রন্থগুলির কাব্যানুবাদ করাইয়াছিলেন।[৩]

ব্রহ্মোত্তরখণ্ড রচনা সমাপ্ত হয় কাশীশ্বর কর্ত্তৃক ১৭৫৯ শকাব্দে ("অঙ্ক বাণ ঋষি শশী শাকে নিদাঘেতে") পাটনায়।[৪] ক্রিয়াযোগসার[৫] সমাপ্ত হয় ৩২২

১। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত (দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩১৫)।
২। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী প্রথম খণ্ড গীতাবলী, শরচ্চন্দ্র ঘোষাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত (কোচবিহার ১৩২৭)।
৩। ঐ ভূমিকা, পৃ ১৫। ৪। ঐ ভূমিকা, পৃ ১৯-২০।
৫। মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের গ্রন্থাবলী দ্বিতীয় খণ্ড ক্রিয়াযোগসার, শরচ্চন্দ্র ঘোষাল কর্ত্তৃক সম্পাদিত (কোচবিহার ১৩২৮)।

বিশ্বসিংহ শাকে [পৃ ২৪১] অর্থাৎ ১২৩৮ সালে।. ইহাতে মহারাজার ছাড়া "দ্বিজ" শচীনন্দন, "দ্বিজ" রঘুরাম এবং রিপুঞ্জয় দাস এই তিনজনের ভণিতা পাওয়া যায়। মহাভারতের আদিপর্ব্বও "দ্বিজ" রঘুরামের লেখা।[১] বৃহদ্ধর্ম্ম-পুরাণ রচনা সমাপ্ত হয় ৩২৬ বিশ্বসিংহ শকে ১২৪২ সালে।

ঋতু ভুজ হরনেত্র বিশ্বসিংহ শাকে।
বার শত বিয়াল্লিশ সন বলে যাকে ॥[২]

মহারাজার পরলোকগমনের পর তাঁহার এক কর্ম্মচারী জয়নাথ মুনশী রাজোপাখ্যান নামে গদ্যনিবন্ধে কোচবিহার রাজবংশের ইতিহাস বর্ণনা করেন। এই নিবন্ধের ইংরেজী অনুবাদ করিয়াছিলেন পাদ্রী রবিন্‌সন্, এই অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল।[৩]

শ্রীমদ্ভাগবত ও ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ অবলম্বনে কয়েকখানি কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে এবং উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে রচিত হইয়াছিল এবং কবিত্বের বালাই বিশেষ না থাকিলেও মুদ্রাযন্ত্রের কল্যাণে এবং বিষয়গৌরবে এই কাব্যগুলি প্রায়ই বহুল প্রচারিত হইয়াছিল।

গয়ারাম দাসের ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের একটি পুঁথির লিপিকাল দেওয়া আছে ১১১৭ সাল ১৬৩৮ শকাব্দ।[৪] সালে শকাব্দে মিল নাই। অনুমান করি, ১২১৭ সাল কিংবা ১৭৩৮ শকাব্দ হইবে।

রামলোচন দাস বৈদ্যের জন্ম ১১৯৮ সালে ও মৃত্যু ১২৭৪ সালে ঘটে। ইঁহার বাসস্থান ছিল ময়মনসিংহ জেলায় কাগমারি পরগনার অন্তর্গত তেরখি গ্রামে। ইনি ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের অনুবাদ করেন। দিনাজপুরের রাজা গিরিজানাথ রায়ের পিতা তারক নাথ রায় বাহাদুরের আদেশে কল্কিপুরাণ কাব্য রচনা করেন। ইহা বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ কর্ত্তৃক ১৩২০ সালে প্রকাশিত হইয়াছে। রামলোচন দাস কয়েকটি শক্তিবিষয়ক গীত রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে।

১। ঐ ভূমিকা, পৃ ১০। ২। ঐ ভূমিকা, পৃ ৯।
৩। ঐ প্রথম খণ্ডের ভূমিকা, পৃ ৫-৬। ৪। র-সা-প-প ২, পৃ ১৮৬ ৮৭।

উপেন্দ্রনাথ মিত্র বিরচিত শ্রীমদ্ভাগবত কাব্য ১২৪২ সালে বাঙ্গালী যন্ত্র হইতে মুদ্রিত হইয়াছিল।[১] ইহারও পূর্ব্বে বটতলা হইতে ১৭৩৪ শকাব্দ ১২২৩ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল।[২] সম্ভবতঃ ইহাই প্রথম মুদ্রণ।

কবির পরিচয় এইরূপ পাওয়া যায়—

সূর্য্যবংশ জাত যেই বিশ্বামিত্র কুল। প্রকাশিত এ ভারতে কায়স্থ সংকুল[৩] ॥
বল্লালের মান্যমত বঙ্গের কুলীন। বঁড়িষা সমাজে খ্যাত কালিদাস দীন ॥
তাঁহার বংশীয় বাস কুমারনগর। ব্রাহ্মণ পণ্ডিত তথা অতি শোভাকর ॥
চণ্ডীর চরণ নামে চণ্ডীর সেবনে। পিতামহ পিতা তিনি জ্ঞাত সর্ব্বজনে ॥
কালিদাস পুত্র নাম উমেশ তাঁহার। তাঁহার ঔরসে দাস দেখিল সংসার ॥
প্রথম স্কন্ধের কথা উপেন্দ্র রচিল। হরিপদে দেও মন ত্যজিয়া পঙ্কিল ॥

অন্যত্র

হরিনাম করি সার শিখি শাস্ত্রাচার। করিলাম ভাগবতে পদ্য ব্যবহার ॥
মাধবচৈতন্য স্বামী মহাযোগিবর। গুরুরূপে দিলা জ্ঞান কহি হরিপদ ॥
সেই জ্ঞানে প্রকাশিল এ হরির বাণী। শুনিলে বিমুক্ত হবে জগতে প্রাণী ॥

গোকুল হইতে গোপগণের বৃন্দাবনে উঠিয়া আসা হইতে শেষ পর্য্যন্ত পরাণ-চন্দ্র দাসের রচনা বলিয়া অনুমান হয়।

"দ্বিজ" রামকুমারের ভাগবত[৪] রচিত হয় ১৭৫৩ শকে ১২৩৮ সালে ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে।

শকে শশী সিন্ধু শর নেত্র নিরূপণ। বিধু পক্ষ রাম বসু বাঙ্গালার সন।
গুরু বসু রামচন্দ্র লিখি ইঙ্গরাজিতে। সমাপ্ত হইল রাম কর্কট মাহাতে ॥
সিতপক্ষ আষাঢ়ে যে নবমী সে দিনে। বারে বিধু স্বাতী ইক্ষ নক্ষত্র সে দিনে ॥

কাব্যটি শ্রীমদ্ভাগবতের অনুবাদ হইলেও কৃষ্ণলীলার মধ্যে দানখণ্ড নৌকাখণ্ড

১। র-সা-প প ৩, পৃ ৬২-৬৩।
২। ঐ ২, পৃ ১৮৬-৮৭। পুঁথি রঙ্গপুর অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে। ৩। পাঠ 'সঙ্কুল।'
৪। সুধীরকুমার মুখোপাধ্যায় রচিত দ্বিজ রামকুমারের ভাগবত শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য [ব-সা-প-প ৪৩, পৃ ১২০-২৫]।

বিদেশিনী মান প্রভৃতি অপৌরাণিক আখ্যায়িকাও বর্ণিত হইয়াছে। দানলীলার বর্ণনা অনেকটা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তন কাহিনীর অনুরূপ।

"দ্বিজ" পীতাম্বর রাসপঞ্চাধ্যায়ের অনুবাদ করিয়াছিলেন।[১] পদ্মপুরাণান্তর্গত ক্রিয়াযোগসারেরও একাধিক অনুবাদ হইয়াছিল। পীতাম্বর মুখোপাধ্যায়ের ক্রিয়াযোগসার ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল।[২] মহারাজা হরেন্দ্রনারায়ণের অনুবাদের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কবিরতন রচিত পূর্ণানন্দ গীতার পুঁথি চট্টগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।[৩]

শ্রীমদ্ভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ ইত্যাদি হইতে শুধু কৃষ্ণলীলা অংশ অবলম্বনে ছোট বড় বহু বহু কাব্য তাবৎ উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া বিরচিত হইয়াছিল। এই জাতীয় কাব্য বিশেষ করিয়া বটতলা হইতে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইত। এই সকল কাব্যে পুরাণেতর কাহিনী কিছু কিছু গৃহীত হইয়াছে। তবে এইরূপ অধিকাংশ কাব্যে দানখণ্ড বা নৌকখণ্ড লীলা বর্ণিত হয় নাই। নিম্নে এইজাতীয় কয়েকখানি কাব্য ও কবির উল্লেখ করিতেছি।

শিশুরাম দাস রচিত প্রভাসখণ্ড বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। ইঁহার বাসস্থান ছিল নবদ্বীপের নিকটবর্ত্তী ফুলে বেলগড়ে গ্রাম। পিতার নাম রামানন্দ। কবিরা চারি ভাই ছিলেন, জ্যেষ্ঠ প্রাণকৃষ্ণ, কনিষ্ঠ শিশুরাম। জাতিতে ইঁহারা ছিলেন তন্তুবায়।[৪]

বদনচন্দ্র পালিত রচিত নারদসংবাদ ১৮২৫ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হইয়াছিল।[৫]

নারায়ণ চট্টরাজ গুণনিধি বিরচিত কৃষ্ণলীলারসোদয় কাব্যের ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দের মুদ্রিত সংস্করণ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ গ্রন্থশালায় আছে। মুদ্রিত অংশটি প্রথম বিভাগ মাত্র, ইহাতে পূর্ব্বরাগ হইতে মিলন পর্য্যন্ত আছে। কবি এইরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন—

১। ৯৬৬ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য। নিস্তারিণী যন্ত্রে পুনর্মুদ্রিত (১২৫৯)। ২। সংবাদপত্রে সেকালের কথা প্রথম খণ্ড, পৃ ৬০। ৩। বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ১০০।
৪। র-সা-প-প ৬, পৃ ৪৭। ৫। সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, পৃ. ৬০।

একোনবিংশতি বর্ষ আপন বয়সে। রচিয়াছি এই কাব্য প্রবল সাহসে ॥
অতএব বালকের যত কিছু দোষ। ক্ষমাপন করি সবে হবেন সন্তোষ ॥
কৃষ্ণলীলারসোদয় সুধাসিন্ধুসার। কহিছে শ্রীনারায়ণ এক বিন্দু তার ॥ পৃ ৫৬ ॥

"দ্বিজ" বিশ্বনাথ বা বিশ্বনাথ তর্কালঙ্কার বিরচিত কৃষ্ণকেলিকল্পলতার ১২৬২ সালে মুদ্রিত সংস্করণ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ গ্রন্থশালায় আছে।[১] কাব্যটিতে রাস ও শঙ্খচূড়বধের পর এই কাহিনীগুলি বর্ণিত হইয়াছে—বসন্তবর্ণন ও দোলযাত্রা, মানভঙ্গ উপক্রম, শ্রীকৃষ্ণের বিদেশিনীরূপ ধারণ, বিদেশিনীর রাধিকার নিকটে গমন, বিদেশিনীর সহিত শ্রীরাধার মিলন, বিদেশিনীর সহিত রাধার কথোপকথন, শ্রীকৃষ্ণের কালীরূপ ধারণ, কলঙ্কভঞ্জনের উপক্রম, শ্রীকৃষ্ণের কপটমূর্চ্ছা, শ্রীরাধার কলঙ্কভঞ্জন, গ্রীষ্মবর্ণন ও বৃষাসুর বধ ইত্যাদি।

চাটিগ্রাম্ আনোয়ারা থানার অন্তর্গত বারাশত[২] গ্রাম নিবাসী ঈশানচন্দ্র দে রচিত এবং স্বলিখিত কৃষ্ণলীলা কাব্যের পুঁথির লিপিকাল ১লা জানুয়ারী ১৮৬৮ খ্রীষ্টাব্দ।[৩]

কুশদেব পাল রচিত হরিবিলাসসার নৃত্যলাল শীলের যন্ত্রে ১২৭৯ সালে মুদ্রিত হইয়াছিল। কাব্যটিতে অপৌরাণিক কাহিনীর মধ্যে কৃষ্ণের মোহনবেশধারণ রাধাকৃষ্ণের প্রথমদর্শন দানখণ্ড নৌকাখণ্ড দোলযাত্রা ঝুলনযাত্রা মানভঞ্জন কৃষ্ণকালী কলঙ্কভঞ্জন ও শারীশুকের দ্বন্দ্ব বর্ণিত হইয়াছে। কাব্যটির রচনা ১২৭৮ সালের তেইশে আশ্বিন তারিখে সমাপ্ত হইয়াছিল।

বার শত আটাত্তর তেইশে আশ্বিন।
ইতি গ্রন্থ সমাপ্ত হইল এই দিন ॥ পৃ ১৭৮ ॥

কবি সর্ব্বত্রই 'দেব' এই ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। কাব্যটি আদ্যন্ত পয়ারে রচিত, মধ্যে মধ্যে অনেকগুলি গান দেওয়া আছে। কতকগুলি গানের ভণিতায় 'দেব' শব্দ আছে, এগুলি কবির রচনা হইতে পারে। কতকগুলিতে দাশরথির

১। ১৪৪ পৃষ্ঠার পর খণ্ডিত।
২। পাঠ 'নিবাস বারশত ফাঁড়ি আনোয়ারা।' [বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ২২০।]
৩। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ২১৯-২০।

ভণিতা আছে, এগুলি দাশরথি রায়ের রচনা। অধিকাংশ গানে কোনই ভণিতা নাই। দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ডের বর্ণনা [পৃ ৫৫-৬৩] অনেকটা শ্রীকৃষ্ণকীর্ত্তনের অনুগত।

গোপালচন্দ্র বসুর রাধাকালী অভিনব রাধাকৃষ্ণলীলাত্মক কাব্য।[১]

দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বিরচিত মুক্তালতাবলীর বহু সংস্করণ বটতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছে। কবি এইরূপ আত্মপরিচয় দিয়াছেন—

কলিকাতা রাজধানী বিদিত সংসার। পরগনে মেদনমল্ল দক্ষিণে তাহার॥
রামচন্দ্রপুর নামে গ্রাম সুবিখ্যাত। পশ্চিমবাহিনী পূর্ব্ব অংশে অদূরত॥
সেই গ্রামে নিবসতি বহুদিন হয়। শ্রীরামশঙ্কর বাচস্পতি মহাশয়॥
সর্ব্বশাস্ত্রে সুপারগ সুপণ্ডিত অতি। শ্রীদুর্গাপ্রসাদ দ্বিজ তাহার সন্ততি॥
ধর্ম্মশাস্ত্রে ব্যবসায় করি অকপটে। পুরাণপ্রসঙ্গ করি ভক্তের নিকটে॥

মুক্তালতাবলী ভাষা করিনু রচন। অনায়াসে বুঝিতে পারিবে সর্ব্বজন॥
... ...
শিশুরাম বাক্যে গ্রন্থ সমস্ত পূরণ। এই হেতু করি পদে এই নিবেদন॥
শিশুরাম হরেকৃষ্ণ শ্যামাচরণেরে। নিরাপদ করিয়া রাখ নিরন্তরে॥[২]

কৃষ্ণের দ্বারকালীলা অবলম্বনে বনোয়ারিলাল রায় দ্বারকাকেলিকৌমুদী[৩] গ্রন্থ রচনা করেন। কবি এইটুকু মাত্র আত্মপরিচয় গ্রন্থশেষে দিয়াছেন—

হরিপাল গ্রামে ধাম, বিশেষ বিখ্যাত নাম, গোষ্ঠীপতি শিবদাস রায়।
তাঁহার বংশেতে দীন বনোচারি জ্ঞানহীন কৃষ্ণলীলা রচিল ভাষায়॥

পীতাম্বর সেনের উষাহরণ কাব্য উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়[৪] কবির বাসস্থান ছিল শিবাদহ।

১। হরিহর যন্ত্রে মুদ্রিত (১৭৮৫ শকাব্দ)।

২। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৬৬। বর্ত্তমান সময়ে মুদ্রিত সংস্করণগুলিতে এই অংশ পরিত্যক্ত হইয়াছে।

৩। নৃত্যলাল শীল কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৭৮৫ শকাব্দ)।

৪। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ২২৭-২৯ ; ব-সা-প-প ১৩, পৃ ১৭৫-৭৫।

গুরুপদ ভাবি মনে . পীতাম্বর সেন ভণে শিবাদহ যাহার নিবাস।
শুনহ রসিক জন উষাবতীর হরণ, অসংখ্য দুরিত হয় নাশ॥

উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকে ময়মনসিংহ জেলার আটীয়া পরগনার অন্তর্গত কেদারপুর নিবাসী কেবলকৃষ্ণ বসু স্কন্দপুরাণান্তর্গত কাশীখণ্ড অবলম্বনে একটি কাব্য রচনা করেন।[১] কেবলকৃষ্ণ বিলক্ষণ শাস্ত্রপারদর্শী ছিলেন। তাঁহার শিক্ষাগুরু প্রসিদ্ধ নৈয়ায়িক পণ্ডিত রামনিধি বাচস্পতির অনুমতিক্রমে তিনি ব্যবস্থাদিও দিতেন। এই কারণে তিনি "শূদ্র পণ্ডিত" খ্যাতি লাভ করেন। বৃদ্ধাবস্থায় প্রায় সত্তর বৎসর বয়ঃক্রম কালে কেবলকৃষ্ণ কাব্যটি রচনা করেন। রচনা কাল ১৭৩৭ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮১৪-১৫ খ্রীষ্টাব্দ।

অশ্ব রাম জলনিধি চন্দ্রের উদয়। শকের আখিরি পরে কহি নিরণয়॥
........................মধুমাসে। শুক্লা দ্বাদশী তিথি......দিবসে॥
বৃহস্পতিবার শ্রেষ্ঠ শ্রবণা নক্ষত্রে। সমাপন হৈল বেলা বারয় দণ্ডেতে॥

পূর্ব্বে রাজসাহী বর্ত্তমানে ঢাকা জেলার অন্তর্গত রৌয়া গ্রামনিবাসী পণ্ডিত গঙ্গাপ্রসাদ ভট্টাচার্য্য অনুবাদ কার্য্যে কবিকে সাহায্য করিয়াছিলেন, এ কথা কবি একাধিকবার স্বীকার করিয়াছেন।

ভট্টাচার্য্য গঙ্গাপ্রসাদের স্থিতিবাস। ক্ষিতি মধ্যে রৌয়া গ্রাম সর্ব্বত্র প্রকাশ॥
পুরাণে জ্যোতিষে শ্রেষ্ঠ বিখ্যাত মহীতে। রাজসাহী মধ্যেতে গ্রাম সিন্দুরী চাকলাতে॥
তাহান শ্লোকার্থ শিরে বন্দি সাবহিতে। কহিছে কেবলকৃষ্ণ বসু পয়ারেতে॥

কেবলকৃষ্ণের কাব্য মূলানুগত। ভাষা সরল, মধ্যে মধ্যে অলঙ্কারযুক্ত। কবিত্বের বালাই কিছু নাই। কেবলকৃষ্ণ একটি সত্যনারায়ণের সংক্ষিপ্ত পাঁচালীও রচনা করিয়াছিলেন।

বর্দ্ধমানের নিকটবর্ত্তী রায়ান গ্রামনিবাসী "দ্বিজ" ক্ষেত্রনাথ তর্কবাগীশ হরিভক্তিবিলাসের পদ্যানুবাদ করেন।[২] পুঁথির লিপিকাল ১২৩৭। সম্ভবতঃ ইহাই মূল পুঁথি। কবির ভণিতা এইরূপ—

১। ব-সা-প-প ৬, পৃ ২৩৪-৩৯। ২। পঞ্চপুষ্প ১৩৩৯ চৈত্র, পৃ ৫২৫-৩৮।

মূল টীকা দেখি যথামতি ভাষাছন্দে।
শ্রীক্ষেত্রনাথ দ্বিজ করিল প্রবন্ধে ॥

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে নাভাজী বিরচিত হিন্দী ভক্তমাল গ্রন্থ অবলম্বনে দুইটি কাব্য রচিত হইয়াছিল—জগন্নাথ দাসের ভক্তচরিতামৃত, এবং কৃষ্ণদাস বা লালদাসের ভক্তমাল।

জগন্নাথ দাসের কাব্যের এক অনুলিপির তারিখ ১২৩১ সাল।[১] সম্ভবতঃ কবি তখন জীবিত ছিলেন। রজনীকান্ত চক্রবর্ত্তী মহাশয় লিখিয়াছেন, "জগন্নাথ দাস, মালদহ জেলার অন্তর্গত গিলাবাড়ী নামক স্থানের অধিবাসী ছিলেন। তিনি গৌরদাস পণ্ডিত বাবাজির পিতা ছিলেন। গৌরদাস বাবাজি ৮৪ বৎসর বয়সে লোকান্তরিত হইয়াছেন।...জগন্নাথ দাস এতদ্দেশে জগুদাস নামে পরিচিত।"

ভক্তচরিতামৃত চারিখণ্ডে সম্পূর্ণ। প্রথম খণ্ডে পরিচ্ছেদ সংখ্যা নয়, দ্বিতীয়ে বার, তৃতীয়ে সাত, এবং চতুর্থে চার। কাব্যটি আদ্যোপান্ত পয়ার ছন্দে রচিত। ইহাতে এমন অনেক নূতন উপাখ্যান ও কাহিনী আছে যাহা হিন্দী ভক্তমালে এবং কৃষ্ণদাসের কাব্যে নাই। বিদ্যাপতি এবং চণ্ডীদাস সম্বন্ধে যে কাহিনী উল্লিখিত হইয়াছে তাহার পরিচয় দিতেছি।

বিদ্যাপতি নিশাকালে রাজান্তঃপুরে গমন করিয়া থাকেন, রাজার এইরূপ সন্দেহ জন্মিলে

একদিন জিজ্ঞাসিলা শিবসিংহ রায়। নিশিকালে আমার মহলে চৌর যায় ॥
এ চোর ধরিব কৈছে কহ মহাশয়। তোমা বিনা ইহা বিনির্ণয় নাহি হয় ॥
বিদ্যাপতি কহে রাজা করি নিবেদন। চোর ধরিবার এক আছয়ে কারণ ॥
লৌহকণ্টক গঢ়াইয়া করহ রোপণ। প্রাচীরের চতুর্ভিতে রহিবে বেষ্টন ॥
চৌর পলায়িতে সে কণ্টকে পড়িবে। পায়ে কণ্টক বিদ্ধ হৈঞা বদ্ধ যে হইবে ॥
ভালো ভালো বলি রাজা যুক্তি স্থির কৈল। বিদ্যাপতি আপনার শেল গঢ়াইল ॥
লছিমা রাণীর সঙ্গে কৃষ্ণকথারঙ্গে। রজনী প্রভাত হৈল প্রেমের তরঙ্গে।

১। র-সা-প-প ৬, পৃ ৫৯-৭০।

অন্তঃপুরে গেলা রাজা চৌর ধরিবারে। বিদ্যাপতি লম্ফ দিয়া পড়িলা বাহিরে ॥
সেই লৌহকণ্টকেতে চরণ বিন্ধিল। সেই কালে বিদ্যাপতি এক পদ কৈল ॥

তথাহি পদং

প্রেমক অঙ্কুর জাত আত ভেল, না ভেল যুগল পলাশা।
প্রতিপদ চান্দ উদয় যৈছে যামিনী সুখ লব না ভইল আশা ॥

এতেক কহিতে প্রাণ নির্গত হইল। বিদ্যাপতি ঠাকুরের সিদ্ধিপ্রাপ্তি হৈল ॥
সেই শোকে লছিমা রাণী তেজিলা পরাণ। দোঁহাকার প্রাপ্তি হৈল বৃন্দাবনধাম ॥

চণ্ডীদাসের সম্বন্ধে এই কথা আছে—

পূর্ব্বদেশে আছে এক নানোর নামে গ্রাম। পরম উদার তেঁহো চণ্ডীদাস নাম ॥
তাহার চরিত্র কিছু করহ শ্রবণ। প্রথমে কহিয়ে তার পূর্ব্ব বিবরণ ॥
নবীন যৌবনাবস্থা বিদ্যা না হইল। মূর্খ পুত্র প্রতি পিতা শাসন করিল ॥
চণ্ডীদাসের পিতা মহাক্রোধান্বিত হৈঞা। ভার্য্যা প্রতি আজ্ঞা দিল নিজ দিব্য দিঞা ॥
আজি তুমি চণ্ডীদাসে অন্ন নাহি দিবে। থালি ভরি ভস্ম লৈঞা আগেতে ধরিবে ॥
এত কহি ভোজন করিঞা তেহো গেলা। তবে কতক্ষণ পরে চণ্ডীদাস আইলা ॥
তার মাতা অন্নব্যঞ্জন স্থালী সাজাইঞা। এক পাশে ভস্ম দিলা পতি-আজ্ঞা লাগিঞা ॥
মাতাকে জিজ্ঞাসে চণ্ডীদাস মহাশয়। স্থালীর একপাশে কেন ভস্মগোটা হয় ॥
তাঁর মাতা কহে বাপু শুন কহি তোরে। ক্রুদ্ধ হইয়া তোর পিতা আজ্ঞা দিলা মোরে ॥
মূর্খ পুত্রে অন্ন তুমি না কর প্রদান। স্থালী ভরি ভস্ম দিবে এইত বিধান ॥
তেঁহো মোর পতি আজ্ঞা রাখিতে হইল। পুত্রস্নেহক্রমে একপাশে ভস্ম দিল ॥
ইহা শুনি চণ্ডীদাসের বিবেক জন্মিল। অন্নত্যাগ করি ঐছে উঠিয়া চলিল ॥
গ্রামের বাহিরে এক আছে বাসুলীতলা। নেত্রে জলধারা বহে তাহাঞি বসিলা ॥
চণ্ডীদাস গলে রজ্জু করিলা বন্ধন। মনে হৈল এই স্থানে তেজিব জীবন ॥

বাসুলী আসিঞা কহে দুটি হাত ধরি। কেনে ব্রহ্মহত্যা হবে কহ সত্য করি॥
চণ্ডীদাস কহে আমি ব্রাহ্মণকুমার। মূর্খ হৈলাম বিদ্যালেশ নাহিক আমার॥
অতএব এই প্রাণ ইহাই তেজিব। প্রাণ রাখা বৃথা মোর আর না বাঁচিব॥
মাতাপিতা হৈঞা মোরে ভস্ম দিলা খাইতে। উচিত নহেক মোরে এ প্রাণ রাখিতে॥
সদয় হইলা তবে বাসুলী [জগন্মাতা] চণ্ডীদাস প্রতি কহেন হৈঞা প্রসন্নতা॥
মোর আশীর্ব্বাদে তুমি পণ্ডিত হইবে তোমার কবিত্ব মহীতলে বিখ্যাত হইবে॥
তুমি কৃষ্ণভক্ত কৃষ্ণের পুরাতন দাস। নিজ গৃহে যাও তুমি পূর্ণ হবে আশ॥
দেবীপদে চণ্ডীদাস প্রণাম করিলা। বহু স্তুতিনতি করি বিদায় হইলা॥
গ্রাম প্রবেশিতে দেখেন তারা রজকিনী। দ্বারে দাঁড়াইঞা আছে পরমকামিনী॥
একেতে নবীনা তাহে সৌন্দর্য্যে সুন্দরী। রূপ নিরখিতে প্রথম মনঃকৈলে চুরী॥
রাধাদরশনে কৃষ্ণের যৈছে দশা হৈল। সেই ভাব চণ্ডীদাস বর্ণন করিল॥

তথাহি পদং

আহা মরি মরি কিরূপ হেরিলাম, এ নব রমণী কে।
রূপে অনুপমা নাহিক তুলনা, মরমে পশিলা সে॥
ধৈরজ ধরিতে নারি।
তনুমন জরে উচাটন করে, ঝুরিয়া ঝুরিয়া মরি॥
ধৈর্য্য দূরে গেল, মন ভুলি রৈল, উনমত হৈল চিত।
না দেখি উপায়, কি করিব হায়, কি হেরিলাম আচম্বিত॥
এরূপ হেরিতে নয়ন সহিতে মন গেল তার সনে।
কহে চণ্ডীদাসে বাসুলী আদেশে, মন হারাইলাম মেনে॥

চণ্ডীদাসের রূপ দেখি তারা মুগ্ধ হৈল। দোঁহুরূপে দোঁহে মুগ্ধ মিলন হইল॥
মহাকবি চণ্ডীদাস সভা জয় কৈল। মাতা পিতা রাজা প্রজা সভার মান্য হইল॥

সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়ের মত এখানেও রজকিনীর নাম রামী নহে, তারা।

গঙ্গাগোবিন্দের সম্বন্ধে একটি উপাখ্যান দেওয়া আছে। গঙ্গাগোবিন্দ সিংহ অতিশয় বৈষ্ণবভক্ত ছিলেন। তিনি জাতিনির্ব্বিশেষে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টপ্রসাদ

গ্রহণ করিতেন। তাঁহার পিতৃশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে ব্রাহ্মণেরা এই কারণে নিমন্ত্রণগ্রহণ করিতে স্বীকৃত হইলেন না। শেষে নিমন্ত্রণকারী ব্রাহ্মণের নির্ব্বন্ধাতিশয়ে রাজী হইলেন এই সর্ত্তে যে, গঙ্গাগোবিন্দকে তপ্তলৌহ চাটিয়া দেখাইতে হইবে যে বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্টগ্রহণের মাহাত্ম্য আছে। গঙ্গাগোবিন্দ তাহাই করিলেন।

বাহিরবন্দরের (বাহারবন্দের?) প্রতাপ মণ্ডলের কাহিনীতে আছে যে "প্রতাপ মণ্ডল কোন এক বৈষ্ণবের প্রার্থনায় তাঁহার যুবতী কন্যাকে, বৈষ্ণবের নিকট প্রেরণ করেন। প্রতাপ মণ্ডল বাহিরবন্দরে এক জগন্নাথবিগ্রহ স্থাপন করিয়া মহাসমারোহে রথযাত্রা মহোৎসব করিতেন। তিনি সশরীরে রথে চড়িয়া বৈকুণ্ঠে গিয়াছিলেন।" এই সব কাহিনী হইতে মনে হয় যে কবি সহজিয়া মতের বৈষ্ণব ছিলেন।

বিষ্ণুপুরের রাজা কর্ত্তৃক গোকুল মিত্রের নিকট মদনমোহনবিগ্রহ বন্ধক রাখার কাহিনীও ভক্তচরিতামৃতে স্থান পাইয়াছে।

বাঙ্গালা ভক্তমাল[১] কৃষ্ণদাস (নামান্তর লালদাস) কর্ত্তৃক বিরচিত। ইনি কলিকাতা কম্বুলিয়াটোলায় বাস করিতেন। ইঁহার কাল ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ। মূল ভক্তমাল দোহার আকারে ব্রজভাষায় ১৪৮২ শকাব্দে অর্থাৎ ১৫৬০ খ্রীষ্টাব্দে নাভাজী কর্ত্তৃক রচিত হয়। তাহার পর নাভাজীর শিষ্য প্রিয়দাস বা প্রিয়াদাস ইহার একটি টীকা রচনা করেন। এই মূল ও টীকা অবলম্বনে বহু বহু নূতন আখ্যায়িকা যোগ করিয়া বিশেষ পরিবর্দ্ধিতরূপে কৃষ্ণদাস সাতাশ "মালা" অর্থাৎ অধ্যায়ে "গৌড়ভাখাচ্ছন্দে" ভক্তমাল প্রণয়ন করেন। কৃষ্ণদাসের গ্রন্থ ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে রচিত হইয়া থাকিবে।

ভক্তমাল নাভাজীউ গ্রন্থন করিল। চারি যুগের ভক্তনামগুণ প্রকাশিল॥
অসংখ্য ভক্তের নাম মালা যে গাঁথিয়া। পতিত জনার গলে দিল পরাইয়া॥
তাহার বস্তুর টীকা প্রিয়াদাস সাধু। বর্ণন করিল অতি সুমধুর স্বাদু॥
ভক্তমাল গৌড়ভাখাচ্ছন্দে কৈমু গান। নাভাজীর শ্রীচরণ হৃদে করি ধ্যান॥[২]

১। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে প্রকাশিত। অন্যান্য বহু সংস্করণ আছে, বর্ত্তমান আলোচনায় বঙ্গবাসী সংস্করণই অবলম্বিত হইয়াছে।
২। উপসংহার, পৃ ৩৫৮।

কৃষ্ণদাসের ভক্তমালে মহারাজা নন্দকুমারের নাম উল্লিখিত হইয়াছে, এবং পুঁটিয়ার রাজা রবীন্দ্রনারায়ণ রায়ের কাহিনীও বিবৃত হইয়াছে।[১] কবি শ্রীনিবাস আচার্য্য বংশের শিষ্য ছিলেন বলিয়া বোধ হয়।

[illegible] বন্দোঁ অনন্ত অপার।
বিশেষে শ্রীশ্রীনিবাস আশ্রয় আমার ॥[২]

আনুষঙ্গিকভাবে বহু বৈষ্ণব শাস্ত্র কথা ইহাতে আলোচিত হইয়াছে। বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের একটি সুন্দর নির্য্যাস দেওয়া আছে ত্রয়োবিংশ মালায়। প্রকৃতপক্ষে এই অংশটিকে [পৃ ২৮৫-৩০৩] "রসপ্রকরণ" নামে একটি স্বতন্ত্র নিবন্ধ বলা যাইতে পারে। রসপ্রকরণের মুখবন্ধ এইরূপ—

নাভাজীউ রসতত্ত্ব স্পষ্ট না বর্ণিলা। কেবল কহিলা মাত্র ভট্টে শুনাইলা ॥
অতএব নাভাজীর আশয় অমৃত। বুঝিয়া যে লিখি কিছু শুচি-রসরীত ॥
কর্ণরসায়ন রাধাকৃষ্ণের চরিত। শ্রীল জীবগোস্বামীর শ্রীমুখগলিত ॥
রসপ্রকরণ অন্য সাধুর চরিত। দোঁহা আদি লিখিয়া বর্ণিব মনোনীত ॥

গ্রন্থটিতে কৃষ্ণদাস রচিত অনেকগুলি পদ দেওয়া আছে।

কৃষ্ণদাসের ভক্তমাল অপেক্ষাকৃত অর্ব্বাচীন রচনা হইলেও ইহা বাঙ্গালা সাহিত্যের একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে এবং থাকিবেও। বহু নরনারী ইহা পাঠ করিয়া আনন্দ পাইতেছে এবং আধ্যাত্মিক পথের প্রেরণা লাভ করিতেছে।

শ্রীহট্টে রচিত এবং তথা হইতে প্রকাশিত রঘুনাথলীলামৃত গ্রন্থে সহজসাধক রঘুনাথ ভট্টাচার্য্যের ও তাঁহার সাধক বন্ধু শ্যামকিশোর ঘোষের বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। শ্যামকিশোর (মৃত্যু, ভাদ্র ১২৬০) কয়েকখানি গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন—সহজ-উজ্জ্বলচিন্তামণি, হরিভক্তিতরঙ্গিণী এবং জয়দেবচরিত্র। শ্যামকিশোরের সাধনসঙ্গিনী শ্রীমতী কয়েকটি আধ্যাত্মিক পদ রচনা করিয়াছিলেন। রঘুনাথলীলামৃতে এইরূপ পদ কয়েকটি উদ্ধৃত হইয়াছে।[৩]

১। অষ্টাদশ মালা। ২। প্রথম মালা।
৩। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৩১৮, চতুর্থ খণ্ড, পৃ ১৬৫-৬৯।

সারতত্ত্বাবলী নাতিবৃহৎ নিবন্ধ। ইহাতে বৈষ্ণব ধর্ম্মের তত্ত্ব এবং আনুষঙ্গিক উপাখ্যান বর্ণিত আছে।[১]

নিমানন্দদাসের পদরসসারের[২] একটি মাত্র পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। ইহাতে প্রায় ২৭০০ পদ আছে, তন্মধ্যে প্রায় ৬৫০ পদ পদকল্পতরুতে পাওয়া যায় না। এই নূতন পদ অনেকগুলি সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে[৩] মুদ্রিত করিয়াছেন। সংকলনটি উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পাদের শেষের দিকে রচিত হইয়াছিল বলিয়া অনুমান হয়।

কমলাকান্ত দাসের পদরত্নাকরের সঙ্কলন বর্দ্ধমানে ১৭২৯ শকাব্দে ১২১৪ সালে অর্থাৎ ১৮০৭ খ্রীষ্টাব্দে সম্পূর্ণ হয়। মূল পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদের পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে। সংগ্রহগ্রন্থটি তেতাল্লিশ তরঙ্গে বিভক্ত। সর্ব্বসমেত ইহাতে ১৩৫৮ পদ আছে, তাহার মধ্যে প্রায় কুড়িটি কমলাকান্তের নিজের রচনা।[৪] পদরত্নাকরের অনেকগুলি পদ সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় কর্ত্তৃক অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীতে মুদ্রিত হইয়াছে। কমলাকান্তের কতকগুলি পদ ১২৯২ সালে শ্রীকান্ত মল্লিক কমলাকান্তের পদাবলী নামে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

কমলাকান্তের পিতার নাম ব্রজকিশোর, ছোট ভাইয়ের নাম রুক্মিণীকান্ত। ইহারা জাতিতে করণ। বাসস্থান কাটোয়া হইতে প্রায় চারি ক্রোশ পশ্চিমে সিউর গ্রাম। বর্দ্ধমানের মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের অন্যতম কর্ম্মচারী রাধানাথ বসুর অনুরোধে কমলাকান্ত এই সঙ্কলন করেন। গ্রন্থশেষে কমলাকান্ত এইরূপ আত্ম-পরিচয় দিয়াছেন—

প্রভু মোর কৃপাসিন্ধু পতিতের প্রাণবন্ধু, কাকে দিলা গরুড়ের ভার।
পদরত্নাকর নাম সংগ্রহ সুখের ধাম মূর্খমুখে করিলা প্রচার॥
নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা ভয় হয় চিতে, অন্তরে উপজে অতি ঘৃণা।
তথাপি তেজিয়া লাজ নৃত্য করি সভা মাঝ প্রকাশিতে প্রভুর করুণা॥

১। ব-সা-প-প ২, পৃ ১৯৩-৯৪। ২। ব-সা-প-প ২১, পৃ ১-২০।
৩। যতীশচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। ৪। অপ্রকাশিত পদরত্নাবলীর ভূমিকা, পৃ ৫-৭।

রাঢ় দেশে অনুপাম সৎপল্লী সিউর গ্রাম, সাধু সন্ত মহান্তের স্থিতি।
পূর্ব্বপক্ষ যোজনান্তে কণ্টক নগরপ্রান্তে পতিতপাবনী ভাগীরথী ॥
তথি জাতি শ্রীকরণ সাধুসেবাপরায়ণ পিতা ব্রজকিশোর আখ্যান।
কনিষ্ঠ রুক্মিণীকান্ত সদ্‌গুণ আধার শান্ত বৈষ্ণবের দাস অভিমান ॥

যুগযুগ্ম যুগল সমুদ্র শশী শাকে। গুরুবার সপ্তবিংশ দিবস বৈশাখে ॥
সহস্র অধিক সংখ্যা দুই শত সন। তথি পরি ত্রয়োদশ অধিক গণন ॥
বর্দ্ধমানে নির্জ্জনে বসিয়া নিরন্তর। প্রাণপণে পূর্ণ কৈল পদরত্নাকর ॥
বহু পরিশ্রমে এই পদরত্নচয়। মধুকরবৃত্তে মুঞী করিল সঞ্চয় ॥
... ...
মহারাজ অধিরাজ অবনীর ইন্দ্র। বর্দ্ধমান ভূমির ভূপতি তেজচন্দ্র ॥
কন্দর্প জিনিঞা রূপ গুণের সাগর। বুদ্ধ্যে বৃহস্পতি কৃপাপূর্ণকলেবর ॥
তাঁর কার্য্যকারকগণের অবতংস। কায়স্থকুলেতে রাধানাথ বসু-বংশ ॥

তাঁর অনুরোধে অনবধি পরিশ্রমে। লিখিল পুস্তকরাজ পরম যতনে ॥
নবদ্বার পুরীর দ্বারের বাম ভাগে। পক্ষ বসিয়াছে সমুদ্রের যাম্যদিকে ॥
সমুদ্রের পূর্ব্বতীরে চন্দ্রের উদয়। শাক সংখ্যা সঙ্কেতে কহিল সুনিশ্চয় ॥
বার শত চৌদ্দ সন মার্গশীর্ষ মাসে। বারে বৃহস্পতি ষষ্ঠ বিংশতি দিবসে ॥
বর্দ্ধমানে বিরলে বসিয়া নিরন্তর। সম্পূর্ণ করিল গ্রন্থ পদরত্নাকর ॥

কমলাকান্তের একটি পদের ভণিতা হইতে বোধ হয় যে তিনি গদাধর পণ্ডিতের শাখা নটবরের শিষ্য ছিলেন।[১]

মহারাজা তেজশ্চন্দ্রের সভায় আর এক কমলাকান্ত ছিলেন। ইনি ছিলেন ব্রাহ্মণ, নিবাস অম্বিকা কালনায়। এই তান্ত্রিক সাধক কবির সাধনবিষয়ক ও অধ্যাত্ম সঙ্গীত এককালে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। ইঁহার সাধকরঞ্জন[৩] তান্ত্রিক যোগপদ্ধতির গ্রন্থ।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে যে সকল পদসংগ্রহ গ্রন্থ সঙ্কলিত হইয়াছিল সেগুলির মধ্যে পদকল্পলতিকা[২] ক্ষুদ্র হইলেও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। ইহাতে দুই

১। অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী, পৃ ৪৬৯।
২। হিতবাদী কার্য্যালয় হইতে পুনর্মুদ্রিত (১৩০৪
৩। ব-সা-প প্রকাশিত।

চারি জন নূতন কবির পদ পাওয়া যাইতেছে। অকিঞ্চন ভণিতায় যে ব্রজবুলি পদটি আছে তাহা দেওয়ান রঘুনাথ রায়ের রচনা। "নৃপ" উদয়াদিত্যের পদটি উল্লেখযোগ্য।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগেও পূর্ব্ববৎ যথারীতি বৈষ্ণব পদ রচনা হইতেছিল। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের পিতা জন্মেজয় মিত্র 'সঙ্কর্ষণ' ভণিতায় অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন। ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে তিনি সঙ্গীতরসার্ণব নামে স্বরচিত পদগুলির একটি সংগ্রহ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, ইহাতে তাঁহার পিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র বাহাদুর রচিত কয়েকটি পদও সন্নিবিষ্ট করেন।[১] জন্মেজয় মিত্র মহাশয় প্রাচীনপন্থী পদকর্ত্তাদিগের মধ্যে শেষ কবি। ইঁহার সমসাময়িক রঘুনন্দন গোস্বামীও অনেকগুলি পদ রচনা করিয়াছিলেন।[২] উনবিংশ শতাব্দীর পদকর্ত্তাদিগের সম্বন্ধে বিস্তৃত আলোচনা মদীয় A History of Brajabuli Literature গ্রন্থের দ্বাদশ, ত্রয়োদশ এবং বিংশ পরিচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

উনবিংশ শতাব্দীর সপ্তম পাদ হইতে ইংরেজী শিক্ষিত কবির দ্বারা বৈষ্ণব পদ রচনার নূতন ধারার সূত্রপাত হয়।[৩] এই ধারার প্রবর্ত্তক মধুসূদন দত্ত। ১৮৬১ সালে প্রকাশিত ব্রজাঙ্গনা কাব্যে যে আঠারোটি কবিতা আছে সেগুলিকে পদাবলী বলিয়া চিহ্নিত করিতে পারি না বটে, কিন্তু তাহাতে যে ঐকান্তিকতা ও আবেগ রহিয়াছে তাহা পদাবলী ছাড়া অন্যত্র মিলে না।

বিদ্যাপতি এবং গোবিন্দদাসের অনুকরণে রবীন্দ্রনাথ কৈশোরে ব্রজবুলিতে কতকগুলি কবিতা রচনা করেন, ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী নামে পুস্তকাকারে কতকগুলি কবিতা গ্রথিত হইয়াছে।

১। HBL, পৃ ৩৬৮-৬৯। ব-সা-প-প ৪৪, পৃ ১০-১৬।

৩। HBL ত্রয়োদশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। পূর্ব্বে আলোচনা করিয়াছি।

অষ্টপঞ্চাশ পরিচ্ছেদ

আদিরসাত্মক উপদেশমূলক এবং বিবিধ উপাখ্যান ও আখ্যায়িকা

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে উপকথাজাতীয় আখ্যায়িকা কাব্য জনপ্রিয় হইতে থাকে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে আধুনিক উপন্যাসসৃষ্টির পূর্ব্ব পর্য্যন্ত এই শ্রেণীর কাব্যের প্রচলন খুব বাড়িয়া যায়। হিতোপদেশ শুকসপ্ততি বিক্রমাদিত্যকাহিনী আরব্য উপন্যাস ইত্যাদি উপদেশাত্মক গল্প ও এড্‌ভেঞ্চার আখ্যায়িকা কাব্য এবং বিদ্যাসুন্দরকাহিনীর প্রভাবান্বিত প্রণয়কাব্য অনেকগুলিই এই সময়ে রচিত ও মুদ্রাযন্ত্রের সাহায্যে বিশেষরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসের প্রভাব বিস্তৃত হইতে থাকিলে তবে শিক্ষিত সমাজ—বিশেষ করিয়া নারীমহল—হইতে এই শ্রেণীর কাহিনীকাব্যের আদর চলিয়া যায়।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম হইতে গদ্যবন্ধের প্রবর্ত্তন হইল বটে, কিন্তু সাহিত্যের বাহন হিসাবে পদ্যবন্ধের প্রভাব ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ অবধি অক্ষুণ্ণ ছিল। গদ্যের ব্যবহার ছিল পাঠ্যপুস্তকে, ধর্ম্ম ও সমাজ সম্বন্ধীয় বিতণ্ডামূলক নিবন্ধে এবং সাময়িকপত্রে। অন্যত্র পদ্যবন্ধের একচ্ছত্র রাজত্ব। বিদ্যালয়ের বাহিরে উপাখ্যান জাতীয় পুস্তকে এমন কি ইংরেজী হইতে অনুদিত গ্রন্থও এই সময়ে এবং ইহার কিছুকাল পরেও পদ্যে রচিত হইত। উদাহরণস্বরূপ অভয়াচরণ তর্কবাগীশ প্রণীত ভূপালকদম্ব[১], রাজা কালীকৃষ্ণ বাহাদুর প্রণীত Gay's Fable গ্রন্থের অনুবাদ, ইংরেজী Persian Tales হইতে গিরীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও নীলমণি বসাক কর্ত্তৃক অনূদিত পারস্য ইতিহাস[২], গরিফা নিবাসী, অভিজ্ঞান শকুন্তলের অনুবাদক

১। ইহাতে কিংবদন্তীমূলক ভারতবর্ষের ইতিহাস বিবৃত হইয়াছে। ১৯শে ডিসেম্বর ১৮২৯ সালের সমাচারদর্পণ দ্রষ্টব্য সংবাদপত্রে সেকালের কথা, প্রথম খণ্ড, [পৃ ৭২]।

২। প্রথম খণ্ড, জ্ঞানান্বেষণ যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত (১২৪১ সাল ১৮৩৪ খ্রীষ্টাব্দে)। বইটির সর্ব্বত্র ছেদচিহ্নের স্থলে ইংরেজী ফুল্‌-ষ্টপ্‌ ব্যবহৃত হইয়াছে। গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্য্য রচনা সংশোধন করিয়া দিয়াছিলেন।

নন্দকুমার রায়ের ব্যাকরণদর্পণ[১] ইত্যাদি গ্রন্থের নাম করিতে পারা যায়। কোন কোন গ্রন্থে আবার গদ্যপদ্যের মিশ্রণ দেখা যায়। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করিব।

পাঠ্য পুস্তক নহে এমন উপাখ্যান গ্রন্থের গদ্য অনুবাদ আরম্ভ হইল আনুমানিক ১৮৪০ খ্রীষ্টাব্দ হইতে। কিন্তু এই সময়ের বহুকাল পরেও পদ্য অনুবাদের ধারা ক্ষীণতর হইলেও চলিয়াছিল। বর্দ্ধমানের মহারাজাধিরাজ মহাতাপচাঁদ যেমন একদিকে মহাভারত, রামায়ণ হাতেম তাই, মসনবি ইত্যাদি গ্রন্থের গদ্যানুবাদ করাইয়াছিলেন তেমনি রামায়ণ (আদিকাণ্ড ১৮৫৪ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত), মসনবি, সেকন্দরনামা প্রভৃতি গ্রন্থের পদ্যানুবাদও করাইয়াছিলেন। রামায়ণের পদ্য অনুবাদ ইহার অনেক কাল পরে রাজকৃষ্ণ রায়ও করিয়াছিলেন।

এখন সংস্কৃত ও হিন্দী এবং ফারসী উপাখ্যান গ্রন্থের অনুবাদের কথা বলিতেছি।

উত্তরবঙ্গে প্রাপ্ত "দ্বিজ" কান্তি রচিত হিতোপদেশ কাব্যের পুঁথির (সম্ভবতঃ রচনারও) লিপিকাল ১২২৭ সাল ১৭৪২ শকাব্দ অর্থাৎ ১৮২০-২১ খ্রীষ্টাব্দ।[২] কবির ভণিতা এইরূপ—

বিষ্ণুরাম রচিত পুঁথি আছে পৃথিবীত। শুনিলে সকল লোকের করে সব হিত॥
চারি খণ্ডে এই পুঁথি রচি দ্বিজ কান্তি। শ্লোক ভাঙ্গি পয়ার করিল সেই পুঁথি॥

কালীপ্রসাদ (বা কালীপ্রসন্ন) কবিরাজের বত্রিশ সিংহাসন এবং বেতাল-পঞ্চবিংশতি কাব্য বটতলার প্রসাদাৎ এখনও ছাপা হইতেছে। ইহার অপর দুইখানি কাব্যের কথা পরে বলিতেছি। সেই প্রসঙ্গে ইঁহার পরিচয় দিব।

উমাচরণ মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ মিত্র দুই বন্ধুতে মিলিয়া গোলেবকাঅলি "ইতিহাস" অর্থাৎ উপাখ্যান কাব্য রচনা করেন। কাব্যটি শ্রীরামপুর চন্দ্রোদয় যন্ত্রে ১২৪৯ সাল ১৮৪৩ খ্রীষ্টাব্দে মুদ্রিত হয়। গ্রন্থের শেষে "অথ পাঠকগণের প্রতি গ্রন্থকারের বিনয়" এই শিরোনামায় কবিদ্বয় আত্মপরিচয় এইরূপ দিয়াছেন—

১। বঙ্গভাষার লেখক, পৃ ৪৮৮। ১৮৫২ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত।

২। র-সা-প-প ২, ২৯-৩০।

জাহ্নবীর পূর্ব্বতটে সুবিখ্যাত গ্রাম। চূড়ামণি সমাজ কুমারহট্ট নাম॥
সেই স্থানে বসতি কায়স্থ বংশজাত। উমাচরণ নাম উপাধি মিত্র খ্যাত॥
পূর্ব্বে সুরধুনী পশ্চিমাংশে সরস্বতী। তন্মধ্যে বেযোড়া গ্রাম বিশিষ্ট বসতি॥
প্রাণকৃষ্ণ মিত্র নাম তাহাতে নিবাস। কায়স্থ কুলেতে জন্ম আছয়ে প্রকাশ॥
কুমারহট্টেতে নিজ মাতুল আলয়ে। গতায়াতে মিলন হইল মিত্রদ্বয়ে॥
পারস্য[1] হইতে এই ইতিহাস সার। ইচ্ছা হৈল বঙ্গভাষে করিতে প্রচার॥
বান্ধববর্গের অনুরোধে বিশেষতঃ। ভাষান্তর করা গেল স্ব স্ব সাধ্যমত॥
বালক বালকে মন করিতে রঞ্জন। পয়ারাদি পদ্যছন্দে হইল রচন॥
সুবিজ্ঞ গুণজ্ঞ প্রাজ্ঞ জন সন্নিধানে। বিপুল বিনয়ে বলি বিহিত বিধানে॥
অগণ্য সৌজন্যে দৈন্যে দয়া প্রকাশিয়া। অশুদ্ধ আছয়ে যত দিবেন শোধিয়া॥

সাধারণতঃ 'মিত্রদ্বয়' বা 'মিত্র' এই ভণিতা ব্যবহৃত হইয়াছে ক্বচিৎ দ্ব্যর্থ-সাহায্যে 'উমাচরণ' বা 'প্রাণকৃষ্ণ' ভণিতার প্রয়োগ আছে। শেষের ভণিতা এইরূপ—

মন প্রাণ কৃষ্ণ আর উমার চরণে।
সমর্পিয়া রাজ্য কার্য্য করয়ে যতনে।

আখ্যান ভাগের সূচনা এইরূপ—

ভারতবর্ষের পূর্ব্বে প্রসিদ্ধ নগর। শর্কস্তান নাম তার খ্যাত চরাচর॥
তাহে নরপতি অতি সুমতি প্রধান। জৈনলমলুক যার বিখ্যাত আখ্যান॥
অতুল ঐশ্বর্য্যযুত সৈন্য সংখ্যান্বিত। অন্য অন্য নৃপগণে সদা সশঙ্কিত॥
সুবিচারে প্রজাবর্গ সর্ব্বদা হর্ষিত। চোর দস্যু ঠক আদি রাজ্যেতে বর্জিত॥
দরিদ্র দুঃখিত জন করিতে পালন। স্থানে স্থানে সদাব্রত আগারে স্থাপন॥
প্রজার পীড়ার শান্তি হেতু কত শত। চিকিৎসালয়ে নিযুক্ত বৈদ্য নানা মত॥
ইনামী হকিম আর ইংরেজ ডাক্তর। নিদানে পণ্ডিত বঙ্গ ভেষজ বিস্তর॥
বালকবালিকাদির বিদ্যার কারণ। নানা শাস্ত্রাধ্যয়ালয় কতই সৃজন॥
সংস্কৃত পারস্য আর্বি ফরাসি ইংরাজী। আর্মানি দিনমারি নাগ্‌রি ওলেন্দাজি॥

১। মূলে 'পারষ'।

এই মত স্থানে স্থানে ছাত্রগণ যত। নানা বিদ্যাভ্যাস করে স্ব স্ব ইচ্ছামত॥
প্রজাবর্গ উপসর্গরহিত রহিয়া। বাণিজ্যাদি কর্ম্ম করে ধনার্থী হইয়া॥
নগরে সমস্ত পন্থা প্রস্তরে নির্ম্মিত। সর্ব্বদা কর্দ্দম ধূলি তাহাতে রহিত॥
যামিনীযোগেতে জ্বলে আলো নানা স্থানে। প্রহরে প্রহরে বাজে নওবত বিধানে॥

কাব্যটি রচনায় বেশ বাঁধুনি আছে। অনুপ্রাসের বাহুল্য থাকিলেও প্রসাদগুণ নষ্ট হয় নাই।

এই সময়ে রচিত কাব্যাদিতে প্রায়ই কতকগুলি গান সন্নিবিষ্ট হইত। আলোচ্য কাব্যেও অনেকগুলি গান রহিয়াছে। উদাহরণস্বরূপ নিম্নে একটি উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

যেরূপ এসেছি হেরে কহিতে না পারি হায়।
মনেতে উদয় হলে জ্ঞানশূন্য হয় কায়॥
ব্যাপি এই ত্রিসংসার তেমন না দেখি আর, কিরূপ সে রূপ তার
বল সখী বলা যায়॥
যে হেরেছে সে নাগরে প্রশংসে কি সুধাকরে, কলঙ্কী যে জন।
মনে হয় অনুমান, হেরে তার সে বয়ান শশী হয়্যা দশখান
অভিমানে পড়্যা পায়॥ পৃ ৪৭॥

নন্দকুমার কবিরত্ন বিরচিত শুকবিলাস[১] বটতলা হইতে বহুবার প্রকাশিত হইয়াছে। এই উপাখ্যান কাব্যটির রচনা কাল হইতেছে ১২৫১ সাল।

কবি এইরূপে আত্মপরিচয় এবং রচনাকাল নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন আখ্যা গায়। বিক্রমাদিত্যের কথা বিরচিল তায়॥
নিবাস ধূলুক শূদ্রমণি অধিকারে। সদা আশীর্ব্বাদ করি সভাতে যাহারে॥
শরীর[২] বাহন মাস দিয়া পারাবার। সমাপ্ত হইল গ্রন্থ লোকচক্ষু বার॥
মৈত্র পৃষ্ঠে বাণ চন্দ্র শক[৩] নিরূপণ। সাঙ্গ কৈল ইতিহাস স্মরি জনার্দ্দন॥
শ্রীযুক্ত শ্রীচুণিলাল দাসে আদেশিল। শ্রীনন্দকুমার কবিরত্ন বিরচিল॥ পৃ ১১৪॥

১। বর্ত্তমান আলোচনা হরিদাস শেঠ প্রকাশিত (১২৯১) সংস্করণ অবলম্বনে করা যাইতেছে।
২। 'শরের' হইবে। ৩। 'সন' হইবে।

নন্দকুমারের কালীকৈবল্যদায়িনী কাব্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি।[১] কবি ধুলুক পরগনার অধিবাসী ছিলেন একথা শুকবিলাসে বলিয়াছেন। কালীকৈবল্য-দায়িনী গ্রন্থে এই পরগনার জমিদারের নাম করিয়াছেন, "শূদ্রমণি" হরিচন্দ্র রায়। ১২৩৮ (অথবা ১২৮৩) সালে কাব্যটি রচিত হয়।

বৎসরের পৃষ্ঠে রাম বসু নিয়োজন।
সালবান নৃপতির গণনায় সন ॥ পৃ ২৪৮ ॥

চুনিলাল দাসের কনিষ্ঠ ভ্রাতা "যুগল উদ্যান" অর্থাৎ জোড়াবাগান নিবাসী নৃসিংহ দাসের আদেশে কালীকৈবল্যদায়িনী কাব্য রচনা করেন।

যুগল উদ্যানে বাস শ্রীনৃসিংহ দাস।
রচিতে চণ্ডিকাগুণ তাঁর অভিলাষ ॥ পৃ ২৪৬ ॥

গ্রন্থশেষে কবি নিজের পৃষ্ঠপোষক মহাশয়দিগের পরিচয় এবং রচনাকাল দিয়াছেন [পৃ ২৪৮]।

ভণিতায় কবি অনেক সময়ে পুত্রের নামও করিয়াছেন।

শ্রীনৃসিংহ দাসে কৃপা কর গো অভয়া।
কবিরত্নপুত্র শ্রীগোপালে রেখো দয়া ॥

উনবিংশ শতাব্দীর বহু মুসলমান কবি (অধিকাংশই হাবড়া চব্বিশপরগনা ও চাটিগ্রাম জেলা নিবাসী) আরবী-ফারসী-উর্দ্দু-হিন্দী গ্রন্থ অথবা দেশপ্রচলিত উপাখ্যান অবলম্বনে কাব্য রচনা করেন। এই সব পুস্তকের মধ্যে যেগুলি নিতান্ত আধুনিক তাহাতে আরবী-ফারসী শব্দের সংখ্যা অত্যধিক বলিয়া সাধারণ পাঠকের কাছে অবোধ্য। এগুলির সাহিত্যিক মূল্য নিতান্তই কম, তবে মধ্যে মধ্যে দুই একটি সুন্দর গান পাওয়া যায়। এই গানগুলি সব হয়ত কবিদের স্বরচিত নয়। এই কাব্যের দুই প্রকার রচনাশৈলীর কিছু নমুনা দিই।

অযথা আরবী-ফারসী শব্দহীন বিশুদ্ধ রীতিকাব্যের সুন্দর নিদর্শন হইতেছে চাটিগ্রাম নিবাসী মোহম্মদ রাজা প্রণীত তমিম গোলাল্ চতুর্ন ছিল্লাল।[২] ইহা

১। ষট্পঞ্চাশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২। ১৩২৮ সালের সংস্করণ অবলম্বনে। প্রথম মুদ্রণ হয় ১২৭১ সালে।

হইতে কিছু অংশ উদ্ধৃত সম্ভবতঃ এটুকু কোন শৈব সিদ্ধা গীতি হইতে গৃহীত।

অধীন রাজায়ে কহে মধুরস বাণী। প্রেমবতী ছাড়ি তুমি দেশে যাও পুনি॥
নালা নদী শুখাইল সঙ্গে নাই জল। নিত্য নিত্য যমদূত বলে চল চল॥
শুখাইল সমুদ্রজল ত্রিপিনীর সিন্ধু। লহরে সবন জল নাই এক বিন্দু॥
মলকুতে না বহে পানী জবরুতে নাই মণি। নাছুতে না শুনে শব্দ পবনের ধ্বনি॥
চলিবারে শক্তি নাই কহিবারে বাণী। সর্ব্ব ধন হারাইলা বুদ্ধি হৈল হানি॥
গৃহ ধন হরে নিল আগে হৈল ভোগা। শমনে ধরিলে আসি কারে দিব লাগা॥
মিছা কাজে বন্ধি হই পড়ি রৈলা ভোলে। হারাইলা মাণিক্য ধন কামিনীর কোলে।
পৃ ১০৪॥

বাঙ্গালাদেশের অপর প্রান্ত উড়িষ্যা নিবাসী আবদুল মজিদ প্রণীত রঙ্গবাহার[১] কাব্য অযথা আরবী-ফারসী-হিন্দী শব্দযুক্ত রীতির উত্তম নিদর্শন। গ্রন্থশেষে কবির আত্মপরিচয় হইতে কিছু অংশ উদাহরণ হিসাবে উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

যত আছে দিনদার মরসেদ ও বাপ আর বন্দি আমি ওস্তাদের পায়।
ভুরস্থট পরগণা বিচে উদনা বসতি আছে, তার মাঝে সৈয়দ হামজায়॥
কবিতা করিনু স্থরু, সেই যে আমার গুরু, মলাকাত নাহি মেরা সাথে।
তার ধ্যান মনে রাখি কেতাবে ছেফত দেখি হাতেম তাইর কেচ্ছা হৈতে
আল্লা তালা তার তরে বেহেস্ত নসিব করে, ওফাত হৈয়াছে বহুকাল।
এয়সা কেহু বাঙ্গালার সায়ের না করে আর যব তক দুনিয়া বাহাল॥
তার দেশ বাঙ্গালাতে, মোর ঘর উড়িষ্যাতে বালেশ্বর কটক জেলায়।
বস্তা থানার পাশ কদিমী মোকাম বাস, গড় পদ্দা পরগনা বলায়॥
আর যে বন্দিনু আমি হেম্মত খাঁ সহিদ নামি, বড়া জবরদস্ত সেই পীর।
সদাই ভরসা রাখি তাতে আমি করি সেখি, হামেহাল পীর দস্তগীর॥
জহুরা বড়ই তার, বাঘ পিঠে সে সওয়ার, হৈয়া ফেরে রাত নিশিকালে।
হইলে জুম্মার সাম এসে করে যে সালাম, ফের চলে যায়েন জঙ্গলে॥
ইত্যাদি। পৃ ৪॥

১। ১৩২৮ সালে সংস্করণ অবলম্বনে। এই কাব্যও ১২৭১ সালে প্রথম মুদ্রিত।

আবদুল মজিদ যাঁহার কাব্য আদর্শ করিয়াছিলেন, সেই সৈয়দ হামজা হাতেম তাই ছাড়া আরও বই লিখিয়াছিলেন। ইঁহার রচিত মধুমালতী কাব্যকে আশ্রয় করিয়া গোবিন্দচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মধুমালতী উপাখ্যান[১] রচনা অথবা সম্পাদন করেন। কাব্যটির রচনাকাল হইতেছে ১২৫২ সাল অর্থাৎ ১৮৪৫-৪৬ খ্রীষ্টাব্দ।

মৈত্র পৃষ্ঠে বাণ পক্ষ শক[২] নিরূপণ। শশিসুত বার মাস শরের বাহন ॥
দ্বাদশ দিবসে বেলা দ্বিতীয় প্রহরে। সাঙ্গ কৈল আখ্যান মালতী মনোহরে ॥

উত্তরবঙ্গে এই উপাখ্যানের ছড়া এখনও চলিত আছে। সাকের মামুদ রচিত এইরূপ একটি ছড়া প্রকাশিত হইয়াছে।[৩]

অষ্টাদশ শতাব্দীর একরকম প্রথম হইতেই ভাগীরথীতীরবর্ত্তী নগর অঞ্চলে শিক্ষিত ও উচ্চ সমাজে দেবদেবীমাহাত্ম্য কাব্যের পরিবর্ত্তে বিবিধ গল্প ও প্রণয় কাহিনীমূলক আখ্যায়িকার প্রসার বাড়িতে থাকে এবং ভারতচন্দ্রের কাব্য রচিত হইবার পর হইতে তাহা বিশেষ প্রবল হইয়া উঠে, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সাধারণ লোকে বিক্রমাদিত্য কাহিনী, দ্বাত্রিংশৎ পুত্তলিকার উপাখ্যান, বেতাল পঞ্চবিংশতি এবং পরে আরব্য উপন্যাস, গোলে বকাওলি, হাতেম তাই ইত্যাদিতে মশগুল হইয়া গেল। কিন্তু ধনী সম্প্রদায়ের রুচি ইহাতে সন্তুষ্ট না রহিয়া একটু কড়া আদিরসাত্মক কাব্যের দিকে ঝুঁকিল। এইজন্য একদিকে পাইতেছি খেউড়-আখড়াই-হাফ্ আখড়াই গান, অপর দিকে দেখি বিদ্যাসুন্দর ও তজ্জাতীয় কাহিনী কলিকাতা অঞ্চলে উত্তরোত্তর জাঁকাইয়া উঠিতেছে। বর্ত্তমান প্রসঙ্গে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্দ্ধে যে সকল উল্লেখযোগ্য আদিরসাত্মক কাব্য মৌলিক ও দেশপ্রচলিত কাহিনী আশ্রয় করিয়া রচিত হইয়াছিল সেগুলির বিষয়ে আলোচনা করিব। এই কাব্যগুলিকে দুই ভাগে ভাগ করা যাইতে পারে—(১) উপদেশমূলক (প্রধানতঃ পতিভক্তি ও সতীত্ব বিষয়ক) অথবা অবিমিশ্র আদি রসাত্মক এবং (২) ব্যঙ্গাত্মক (অবান্তরভাবে উপদেশমূলক)। বলা বাহুল্য যে এই দুই শ্রেণীর কাব্যেই অধিকাংশ স্থলে ভাষাগত ও ভাবগত গ্রাম্যতা এখনকার রুচিতে ঘৃণ্য

১। বেণীমাধব দে কর্ত্তৃক প্রকাশিত (১৭৮১ শকাব্দ)। ব-সা-প-প ৫, পৃ ৭-৯।
২। সন হইবে। ৩। র-সা-প-প ৬, পৃ ২০ হইতে।

ঠেকিবে। কিন্তু এ কথা ভুলিলে চলিবে না যে সাহিত্যরুচি যেমনই হউক সে যুগের শ্রোতা ও পাঠক এখনকার দিনের অপেক্ষা নৈতিক চরিত্রে কিছুমাত্র হীন ছিল না।

পঞ্চানন বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রেমনাটক[১] রুচিবিগর্হিত ভাবে লিখিত। ইহাতে গদ্যপদ্য দুইই আছে। রচনাকাল সম্ভবতঃ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দ।[২] ইঁহার অপর কাব্য হইতেছে রসতরঙ্গিণী।[৩]

কালীপ্রসাদ কবিরাজের বত্রিশ সিংহাসন ও বেতাল পঞ্চবিংশতি কাব্যদ্বয়ের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। ইনি আর দুইখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—ভানুমতীর উপাখ্যান[৪] এবং চন্দ্রকান্ত।[৫] এই দুই কাব্যের ভণিতায় কবি "গৌরীকান্ত রায়" এই নাম ব্যবহার করিয়াছেন। ইহা তাঁহার রাশিনাম ছিল।

রাশিনাম ভণি আগে করেছি রচন। এখন বিশেষ কহি নিজ বিবরণ॥
কলিকাতা মধ্যে সুতানুটিতে নিবাস। বৈদ্যকুলোদ্ভব নাম মাণিকরাম দাস॥
কালীপ্রসাদ দাস তাঁহার নন্দন। রচিল পুস্তক চন্দ্রকান্ত বিবরণ॥
লইয়া শ্রীদেবীচরণের অনুমতি। সমাপ্ত হইল গ্রন্থ চন্দ্রকান্ত ইতি॥
শ্রীল শ্রীযুত দেবীচরণ প্রামাণিক। জনক উৎসবানন্দ পরম ধার্ম্মিক॥
সুশীলসম্পন্ন গুণে বিজিত সংসার। পিতামহ রাজচন্দ্র ধন্য কীর্ত্তি যার॥
মাতামহ কীর্ত্তিচন্দ্র কারফরমা নাম। কীর্ত্তিমন্ত শান্ত দান্ত সর্ব্বগুণধাম॥
সংক্ষেপেতে পরিচয় দিলাম ইঁহার। নানামতে তাঁর বংশের আছয়ে প্রচার॥
তাঁর অনুমতি মতে করিলাম প্রকাশ। গোপনীয় কথা চন্দ্রকান্ত ইতিহাস॥

চন্দ্রকান্ত উপাখ্যানের মুখবন্ধ এইরূপ—

পঞ্চপাণ্ডব দ্রৌপদীকে লইয়া যখন বনবাসে ছিলেন তখন তাঁহারা ভ্রমণক্রমে একদা বিভাণ্ডক মুনির আশ্রমে উপনীত হন। দ্রৌপদীকে উপলক্ষ্য করিয়া মুনিরা কথাপ্রসঙ্গে স্ত্রীজাতির শক্তির প্রশংসা করেন এবং উদাহরণচ্ছলে কতিপয়

১। জ্ঞানদীপক যন্ত্রে মুদ্রিত [বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ২৬৪-৬৫]। ২। বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ২০৩।
৩। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৬৪। ৪। ব-সা-প-প ১৩, পৃ ১৬১।
৫। ১৮২৯ খ্রীষ্টাব্দে সচিত্র প্রকাশিত। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৩০ দ্রষ্টব্য।

উপাখ্যান বিবৃত করেন। সীতার ও সাবিত্রীর কথা সংক্ষেপে সারিয়া মুনিরা চন্দ্রকান্তের পত্নী তিলোত্তমার কথা সবিস্তার বর্ণনা করিলেন। শেষোক্ত কাহিনীই কাব্যের উপজীব্য। সংক্ষেপে উপাখ্যানটি এই—

চিত্রসেন নামে গন্ধর্ব্ব অভিশাপ পাইয়া নররূপে জন্মলাভ করেন। তিনিই চন্দ্রকান্ত। তাঁহার পিতা শ্রীকান্ত, নিবাস বীরভূম। চন্দ্রকান্তের বিবাহ হয় শান্তিপুর নিবাসী বণিক রতন দত্তের কন্যা তিলোত্তমার সহিত। বিবাহের কিছুকাল পরে বাণিজ্য উপলক্ষ্যে চন্দ্রকান্তকে গুজরাট যাইতে হইল। সেখানে গিয়া তিনি দেশের ও বাড়ীর কথা ভুলিয়া গিয়া বিলাসব্যসনে প্রমত্ত হইয়া রহিলেন। বহুদিন হইয়া গেল স্বামীর উদ্দেশ নাই দেখিয়া তিলোত্তমা গুজরাটে চলিলেন স্বামীর সন্ধানে। পথে ও গুজরাটে নানা কেরামতি দেখাইয়া তিলোত্তমা অবশেষে স্বামীকে উদ্ধার করিয়া গৃহে ফিরিয়া আসিলেন।

চন্দ্রকান্তের কাহিনী লইয়া রচিত একাধিক ছড়ার পুঁথি চাটিগ্রাম অঞ্চলে পাওয়া গিয়াছে।[১] ভানুমতীর উপাখ্যান লইয়া গঙ্গারাম দাসও একটি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

বিশুদ্ধ আদিরসাত্মক কাব্যের একটি প্রকৃষ্ট নিদর্শন হইতেছে তারাচরণ দাসের মন্মথ কাব্য।[২] কাব্যটিতে কলিঙ্গ রাজপুত্র মনমোহন ও তাহার ছয় মন্ত্রীপুত্র সখা রঙ্গমোহন জ্ঞানমোহন গুণমোহন চিত্রমোহন রত্নমোহন ও রাগমোহন—ইঁহাদের গল্প বর্ণিত হইয়াছে। মনমোহন এবং মণিপুর রাজকন্যা মনমুঞ্জরী স্বপ্নে পরস্পরকে দেখিয়া অনুরক্ত হয়। পিতামাতার অনুমতি লইয়া মনমোহন সখাগণের সহিত মণিপুরে যাত্রা করে নদীপথে।

তবে দামুদরে চলে সুখভরে, বহুগিরি দুইপাশে।
দেখি বহুস্থান তবে বর্দ্ধমান বামে দেখি সবে হাসে॥

১। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ২০১, ২১৬।

২। নবীনচন্দ্র দত্ত কর্ত্তৃক সংশোধিত ও সংবাদ-জ্ঞানরত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত (শ্রাবণ ১২৬৯ সাল)। ইহা প্রথম মুদ্রণ নহে। মহীয়াড়ী সাধারণ পুস্তকালয়ের কর্ত্তৃপক্ষের সৌজন্যে গ্রন্থটি ব্যবহার করিতে পারিয়াছি।

সর্ব্বমঙ্গলায় . প্রণমি তথায় সর্ব্ব মঙ্গলার্থে রায়।
করয়ে প্রার্থনা, পুর মা কামনা যাতে এ যাতনা যায়॥
এতেক কহিয়া চলয়ে বাহিয়া, কত গ্রাম রাখি দূর।
নতু মনপুর রাখি সুচতুর, দক্ষিণেতে শম্ভুপুর॥
লিঙ্গ শম্ভুনাথ করি প্রণিপাত রাখি চলে কত গ্রাম।
কহে, ত্বরাতরি বাহ রে কাণ্ডারী, পৌছিলে দিব ইলাম॥ পৃ ৫৫॥

নীলাচল পারাইয়া ঝড়ে নৌকা বানচাল হইয়া গেল। মনমোহন ও ছয় সখা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িল। মনমোহন নানা অসতীর হাতে পড়িয়া অশেষ লাঞ্ছনা ভোগ করিতে লাগিল। বন্ধুরাও নানা আপদ্‌বিপদের অভিজ্ঞতা ভোগ করিতে লাগিল। শেষে সাত বন্ধু একত্র হইয়া মণিপুরে পৌছিল। সেখানে মনমোহন পক্ষিরূপে প্রাসাদে ঢুকিয়া মনমুঞ্জরীর সহিত মিলিত হইতে লাগিল। তাহার পর স্বয়ংবরসভায় মনমুঞ্জরী যোগীর বেশধারী মনমোহনের গলায় মালা দিল। ইহাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া তাহাকে কারারুদ্ধ করিলেন। তাহার পর যথারীতি দেবী কালিকা কর্ত্তৃক মনমোহনের উদ্ধার ও ছয় সখার সহিত মণিপুরের মন্ত্রীকন্যা রঙ্গমুঞ্জরী জ্ঞানমুঞ্জরী গুণমুঞ্জরী চিত্রমুঞ্জরী রত্নমুঞ্জরী ও রসমুঞ্জরী—এই ছয় জনের বিবাহ। মনমুঞ্জরীর যমজ সন্তান প্রসব। সকলের দেশে প্রত্যাবর্ত্তন ইত্যাদি।

কাব্যটি ভারতচন্দ্রের ছাঁদে রচিত। আদিরসের বাহুল্য কাব্যটিকে প্রায় অপাঠ্য করিয়াছে। ভারতচন্দ্রের অনুসরণে কবি নানারূপ ছন্দ ব্যবহার করিয়াছেন। তবে কবিত্বের প্রকাশ কিছুমাত্র নাই। কতকগুলি অধ্যাত্ম ও প্রণয় গীতি আছে, সেগুলি নিতান্ত মন্দ নহে। তবে সবগুলি তারাচরণের রচনা বলিয়া বোধ হয় না।

কাব্যশেষে তারাচরণ যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিতেছি।

ক্ষিতিতে বিখ্যাত স্থান জেলা বর্দ্ধমান। বিরাজেন রাজলক্ষ্মী ভূপসন্নিধান॥
তার অন্তঃপাতী বড়শৌল[১] গ্রাম। শিষ্ট জাতি অনেক বসতি অনুপাম॥
দামোদর দক্ষিণে উত্তরে বঙ্কেশ্বরী। পূর্ব্বে ভাগীরথী পশ্চিমাংশে খড়্গেশ্বরী॥
ব্রাহ্মণ কায়স্থ বৈদ্য চৌদিক বেষ্টিত। তথিমধ্যে বাস পাড়া অতি সুশোভিত॥

১। অধুনা বড়শূল।

অতঃপর আত্মপরিচয় কিছু কব। দক্ষিণরাঢ়ীয় যে কায়স্থ কুলোদ্ভব॥
বর্ণনে বাহুল্য সংক্ষেপেতে নিবেদিব। দাসাখ্যান শিবপ্রসাদ গুণগণ্যে শিব॥
সর্ব্বগুণান্বিত দুই তাহার নন্দন। মম খুল্লতাত নাম শ্রীরাধামোহন॥
কনিষ্ঠ হয়েন পরোপকারে শ্রেষ্ঠ। ততোধিক তার সহোদর যিনি জ্যেষ্ঠ॥
শ্রীরাইমোহন দাস অতিশুদ্ধমন। তার সুত অকিঞ্চন শ্রীতারাচরণ॥
শ্রীযুত শ্রীনবকৃষ্ণ বাবুর আজ্ঞায়। মন্মথ কাব্য রচি ভাবি সারদায়॥

"নবকৃষ্ণ বাবুর" উল্লেখ হইতে মনে হইতে পারে যে কাব্যটি মহারাজা নবকৃষ্ণের আদেশে রচিত হইয়াছিল।[১] মহারাজা নবকৃষ্ণ দেবের মৃত্যু হয় ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দে। সুতরাং বলিতে হয় কাব্যটি ১৭৯৭ খ্রীষ্টাব্দের পূর্ব্বেই লেখা হইয়াছিল। কিন্তু একটি সংস্করণের শেষে[২] যে কালজ্ঞাপক শ্লোক আছে তাহা হইতে জানা যায় যে কাব্যের রচনাকাল হইতেছে ১৭৬৩ ("শাকে যুগ্ম রসাদ্রি চন্দ্র বিগতে") অর্থাৎ ১৮৪১-৪২ খ্রীষ্টাব্দ। শ্লোকটি প্রক্ষিপ্ত না হইলে বুঝিব যে "নবকৃষ্ণ বাবু" অন্য লোক।

মৌলিক অথবা দেশপ্রচলিত উপাখ্যান অবলম্বনে রচিত না হইলেও মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের বাসবদত্তা[৩] কাব্য এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। সুবন্ধু রচিত সুবিখ্যাত সংস্কৃত গদ্যকাব্য বাসবদত্তা অবলম্বনে এই পদ্য কাব্য রচিত হইয়াছে। মদনমোহন (জন্ম ১২২২ সাল, মৃত্যু ২৭শে ফাল্গুন ১২৬৪ সাল) ১৭৫৮ শকাব্দে অর্থাৎ ১৮৩৬-৩৭ খ্রীষ্টাব্দে বিশ বৎসর বয়সে বাসবদত্তা রচনা সমাপ্ত করেন। তখনও তিনি সংস্কৃত কলেজের ছাত্র।

বসু পশুপতিভাল একত্র মিলেছে ভাল
সঙ্গে ঋষি চাঁদের মেলানী।
সেই শক নিরূপণ এই গ্রন্থ সমাপন
করিলেন শঙ্কর শিবানী॥ পৃ ২৩৬॥

১। সরস্বতীবন্দনার শেষেও নবকৃষ্ণের উল্লেখ আছে। "মায়ের চরণতলে শ্রীতারাচরণ বলে বাবু নবকৃষ্ণের আজ্ঞায়।" ২। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ গ্রন্থাগারের পুস্তক।
৩। যোগেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত তৃতীয় সংস্করণ (১৮৭১) অবলম্বনে। কাব্যটি সম্ভবতঃ ১৮৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হইয়াছিল।

ইহার প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে মদনমোহন রসতরঙ্গিণী রচনা করেন। ইহ অলঙ্কারশাস্ত্রোক্ত নায়কনায়িকাবিচার বিষয়ক গ্রন্থ, এবং ইহাও সংস্কৃত মূল অবলম্বনে রচিত।[১]

বাসবদত্তার কাহিনী বর্ণনা করা এখানে অনাবশ্যক। শুধু মদনমোহনের কাব্যকলার কিছু পরিচয় দিতেছি। বাসবদত্তা ভারতচন্দ্রের ও অপর প্রাচীন কাব্যের মত গান করিবার ধরণে রচিত। কাব্যটিতে পরিচ্ছেদবিভাগ নাই, পদবিভাগ আছে। পদের শীর্ষে এমন কি বর্ণনা অংশের শীর্ষেও রাগ-তালের উল্লেখ আছে এবং শেষে ভণিতা আছে। প্রাচীন প্রথামত প্রথমে বন্দনা—গণেশ বন্দনা (দুই পদে), সূর্য্য বন্দনা, শিব বন্দনা (দুই পদে), জয়দুর্গা বন্দনা (দুই পদে), সরস্বতী বন্দনা (দুই পদে) এবং গুরু বন্দনা। তাহার পর গ্রন্থাবতরণিকা। ইহা হইতে জানা যাইতেছে যে যশোহর জেলায় ইশফপুর পরগনায় নবপাড়া গ্রামনিবাসী কায়স্থবংশীয় শিবচন্দ্র রায়ের দ্বিতীয় পুত্র কালীকান্ত রায়ের অনুরোধে কাব্যটি রচিত হইয়াছিল। তাহার পর ব্যঞ্জনাদি ও স্বরাদি স্তব। তাহার পর উপাখ্যান আরম্ভ হইয়াছে।

কয়েকটি পদ সংস্কৃতে রচিত, কতকগুলি ব্রজবুলিতে এবং মিশ্র হিন্দীতে লিখিত। ভারতচন্দ্রের প্রভাব অত্যধিক। স্বয়ংবরবর্ণনায় কালিদাসের ছাপ আছে। আদিরসাত্মক হইলেও কাব্যটিতে গ্রাম্যতাদোষ সুস্পষ্ট নহে।

মদনমোহন যে সংস্কৃত ছন্দ বাঙ্গালায় প্রয়োগ করিতে অসাধারণ দক্ষ ছিলেন তাহার প্রচুর প্রমাণ বাসবদত্তায় রহিয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি ছন্দ-চাতুর্য্যই কাব্যটির প্রধান বিশেষত্ব। কিছু উদাহরণ দিই।

হে হরসুত বহুগুণযুত, হর দুষ্কৃতিভারং।
হে গণপতি, কুরু সম্প্রতি দুর্গতি অবহারং॥ পৃ ১॥

শুনহে প্রাণ বঁধু, যে সব মধুমধু হাসিয়া মৃদু মৃদু জানালে।
ভাল এ উপদেশ আমারে সবিশেষ করিয়া অবশেষে শুনালে॥ পৃ ৪৬॥

১। কবির জীবিতকালে তাঁহার নামে মুদ্রিত হয় নাই, তাঁহার এক ভগিনীপতির নামে প্রকাশিত হইয়াছিল। ১২৬৯ সালে রামদাস সেন মহাশয় কবির নামে পুনর্মুদ্রিত করেন।

রত্নে কর যত্ন হে সপত্নভয়হারিণী।
দেহি মদনায় দৃঢ়ভক্তি ময়ি তারিণী ॥ পৃ ৬৯ ॥

হৃদি বিলসে পটুবসনা। কুচকলসে কৃতকসনা ॥
স্মর-অলসে মৃদুহসনা। তনু উলসে মদলসনা ॥ পৃ ১৭৯ ॥

নিম্নলিখিত পদটি সংস্কৃত অনুষ্টুপ ছন্দের অনুকরণে রচিত।

আইল নৃপবালিকা। বাজিল করতালিকা ॥
দোলত ফুলমালিকা। সা মনসিজনালিকা ॥
মন্মথ শিখিজ্বালিকা। স্থাণুমনবিচালিকা ॥
কামবিশিখপালিকা। মদনহৃদয়লালিকা ॥ পৃ ১২৪ ॥

বাসবদত্তায় কয়েকটি ছোট ছোট গানও আছে। নিম্নে উদ্ধৃত গানটির ছন্দ ও রচনাভঙ্গি মন্দ নয়।

পরাণবঁধু, চল চল হে।
আবার আঁখি কেন ছল-ছল হে ॥
যদি হে মৃতদেহে মিলন হল দোঁহে ব্যাজ কি আর সহে, বল বল হে ॥
মদন বলে, বটে এ ঘোর বনবাটে আসি বিপদ ঘটে পল পল হে ॥
পৃ ১৩৩ ॥

হালকা ধরণের সরস গানের একটি নিদর্শন দেওয়া গেল।

পিরীতে নাহি সুখ-ফোট্টা।
শেষটা প্রাণের পরে চোট্টা ॥
দেখেছ যেবা সুখ সে সব পেটে ভুখ, শেষ মেনে কেবল দুঃখ মোট্টা।
এরূপে দিন দুটো যে কিছু মজা লুটো, পরে এক সার ফুটো লোট্টা ॥
পৃ ৫২ ॥

আদিরসাত্মক বিশুদ্ধ প্রণয়কাহিনী কাব্যের মধ্যে জীবনতারা, রজনীকান্ত, কামিনীকুমার ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ইহার মধ্যে কামিনীকুমার[1] কাব্যাংশে নগণ্য

১। বিদ্যারত্ন যন্ত্রে মুদ্রিত সংস্করণ (১২৭৯) অবলম্বনে। ১৮৪০-৪১ খ্রীষ্টাব্দে একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল [বা-প্রা-পু-বি ১·১, পৃ ১৬২], সম্ভবতঃ ইহা প্রথম প্রকাশ নহে।

হইয়াও বহুদিন ধরিয়া—উনবিংশ শতাব্দীর শেষ পাদ অবধি—প্রচার লাভ করিয়া আসিয়াছে। সে সময়ে কলিকাতা অঞ্চলের বাঙ্গালা-শিক্ষিত জনসাধারণের বিকৃত সাহিত্যিক রুচির একটি সুন্দর নিদর্শন এই কাব্য। বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে এই শ্রেণীর আখ্যায়িকা কাব্য জনসাধারণ এবং অন্তঃপুরিকাদিগের কাছে উপন্যাসের স্থলাভিষিক্ত ছিল। কামিনীকুমার কাব্যের কাহিনী যৎসামান্য। কুমার এবং নায়িকা কামিনী বিবাহের পূর্ব্বে যথাক্রমে প্রতিজ্ঞা করিয়াছিল যে কুমার তাহার পত্নীকে প্রত্যহ দশ ঘা জুতা মারিবে এবং কামিনী তাহার পতিকে দিয়া তামাক সাজাইবে (বঙ্কিমচন্দ্র বোধ হয় এইখান হইতেই দেবীচৌধুরাণী কাহিনীর সাগর বউ ও ব্রজেশ্বর ঘটিত ব্যাপারের ইঙ্গিত পাইয়াছিলেন)। বিবাহের পর কুমার কাশ্মীরে বাণিজ্যযাত্রা করিল। অল্পকাল পরে কামিনীও কুমারের পিছু পিছু চলিল এবং বিচিত্র ছদ্মবেশে কুমারের সহিত মিলিত হইতে লাগিল।

কামিনীকুমারের মধ্যে সামান্য একটু গদ্য আছে,[১] বাকি সবই বিভিন্ন ছন্দে পদ্যে লেখা। কাব্যটির ভাষা দুর্ব্বল, ছন্দঃ পঙ্গু এবং ভাব জঘন্য।

কামিনীকুমার কাব্যে ভণিতায় সর্ব্বত্র কালীকৃষ্ণ দাস নাম দেখিয়া প্রায় সকলেই ইহাই রচয়িতার নাম বলিয়া ভুল করিয়াছেন। আসল ব্যাপার হইতেছে যে "কালীকৃষ্ণ দাস" কোন লোকের নাম নয়। গ্রন্থকর্ত্তা দুইজন বৈদ্যনাথ বাগচি এবং মধুসূদন দাস (সরকার)—ভণিতায় এই ছদ্মনাম ব্যবহার করিয়াছেন। এই কথা গ্রন্থশেষে আছে।

কালিকার দাস দ্বিজ বৈদ্যনাথ দীন। শ্রীমধুসূদন কৃষ্ণদাস দীন হীন ॥
দুই নামে এক নাম কালীকৃষ্ণ দাস। বিচারিয়া নব কাব্য করিল প্রকাশ ॥

গ্রন্থকারদ্বয়ের বাস ছিল ভবানীপুরে।

ভবানীপুরেতে বাস নাম কালীকৃষ্ণ দাস কালীকৃষ্ণপদে রাখে মন।
রসিকরঞ্জন হেতু বান্ধে নব কাব্যসেতু, অপরেতে করহ শ্রবণ ॥ পৃ ২৫ ॥

১। "রামবল্লভের তামাক সাজা" [পৃ ১৭১-৭২]।

নৈহাটী নিবাসী উমাচরণ চট্টোপাধ্যায়ের সতীত্বচিত্রভানু কাব্যে[১] বিকৃত রুচির কোন পরিচয় নাই। ভূমিকায় কবি বলিয়াছেন, "আমি বিস্তর পরিশ্রম ও যত্নপূর্ব্বক এই অভিনব কাব্য প্রস্তুত করিলাম। ইহার অধিকাংশই মদ্রচিত এবং কিয়দংশ ব্রহ্মখণ্ড ও অন্যান্য মান্য গ্রন্থোদ্ধৃত। এই পুস্তক সুবিবেচক পাঠকবর্গ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে সুন্দর রসে সম্মোহিত হইতে পারিবেন, বিশেষতঃ বঙ্গীয় স্ত্রীলোক ইহার বিবরণ বিশেষ রূপে জানিলে সতীত্বের উদাহরণ স্বরূপে ধর্ম্মজ্ঞান শিক্ষা করিয়া তদনুসরণে সমর্থা হইবে।"

কাব্যের গল্প এই—সরোজ নগরের রাজা হেমাঙ্গের কন্যা স্বপ্নে এক সুরূপ যুবাকে দেখিয়া মুগ্ধ হয় এবং তাহাকে পতিরূপে পাইবার জন্য শিবের আরাধনা করেন। এদিকে কালীপুরের রূপাঙ্গ রাজার পুত্র মন্মথ পিতৃসিংহাসনে আরোহণ করিয়া একদিন বনভোজনে গিয়া শুকশারীর কথোপকথনে মনোমোহিনীর কথা জানিতে পারেন। তাহার পর যথারীতি উভয়ের বিবাহ এবং রাজধানীতে প্রত্যাবর্ত্তন। পরস্পর প্রেমমুগ্ধ দম্পতী বনে গিয়া পৌলব ঋষির অভিশাপ প্রাপ্ত হয়। ফলে সেইখানেই রাজার প্রাণবায়ু বহির্গত হয় এবং রাজার অভিশাপে পৌলবেরও বাক্‌রোধ হয়। রাণী শোক করিতে থাকেন।[২] মন্ত্রীকে রাজ্যভার দিয়া রাণী বনে তপস্যায় নিযুক্ত রহিলেন। এক যুবা রাণীকে প্রলুব্ধ করিতে আসিয়া বলপ্রয়োগে উদ্যত হইলে দেবী কালিকার প্রভাবে সর্পাঘাতে প্রাণত্যাগ করে। অবিচারে পতির প্রাণত্যাগ হওয়াতে রাণী দেবতাদিগকে অভিশাপ দিতে উদ্যত হইলে দেবতাদিগের অনুরোধে বিষ্ণু বিপ্রবালকরূপে আসিয়া রাণীকে বিবিধ উপদেশ দিলেন এবং মৃত্যুকন্যা ও কালযম আদি দেখাইলেন। তাহার পর দেবতাদিগের অনুরোধে বিষ্ণু শাপমোচন করায় রাজা পুনর্জ্জীবিত হইলেন এবং পৌলব ঋষির বাকস্ফূর্ত্তি হইল। অতঃপর রাজা মৃগয়ায় গিয়া এক মায়ামৃগীরূপিণী বিদ্যাধরীর প্রতি আসক্ত হইলেন। রাজার অনুরাগহীনতায় রাণী মানিনী হইলেন। সখীরা রাজার কাছে অনুযোগ করিল। যথারীতি

১। বিশ্বম্ভর লাহার "আদেশানুসারে" "কবিতারত্নাকর যন্ত্রে মুদ্রিত প্রকাশ্য হইল। শকঃ ১৭৮২ মাহ ২৩ কার্ত্তিক।" ২। এইটুকু শুধু গদ্যে লেখা [পৃ ৮৪-৮৬]।

দম্পতীর পুনরায় মনোমিলন হইল। রাজ্যভোগ অন্তে রাজা মন্ত্রীর নিকট হরিভক্তি উপদেশ পাইয়া তীর্থযাত্রায় বাহির হইলেন। কালপূর্ণ হইলে দম্পতী যোগাসনে বসিয়া বিষ্ণুর স্তব করিলেন। দেহান্তে উভয়ের কৈবল্যপ্রাপ্তি হইল।

ছন্দে কবির বেশ হাত ছিল। বিচিত্র ছন্দের কিছু উদাহরণ দিই।

[ললিত প্রবন্ধ]

ফুটিল নানা ফুল, কুটিল অলিকুল ছুটিল সুকুসুমপুঞ্জে।
মগন মধুপানে সঘনে মাতি গানে সগণে গুণু গুণু গুঞ্জে॥ পৃ ৫০॥

[শার্দ্দূলা

সে গুণমণি বিহীনে ধনী।
হৃদয়ে দংশিছে বিচ্ছেদফণী॥ পৃ ৫৪॥

[রসাবলী]

উজ্জ্বল বিনোদবিপিনং।
মন্মথে মুনিজনমতি উদাসীনং॥ পৃ ৫৯॥

পেশাদারী বর্ণনায় কবি মধ্যে মধ্যে শক্তিমত্তা দেখাইয়াছেন। নিম্নে উদ্ধৃত মন্মোহিনীর রূপবর্ণনা ইহার নিদর্শন।

কাঞ্চন লাঞ্ছিয়া তনু, হেরি মোহে ফুলধনু, চঞ্চলাকে চঞ্চলা রাখিল।
কৃশতর কটিদেশ, তাহাতে মদনাবেশ, নীলাম্বর নীরদে ঢাকিল॥
কামের কলস তুচ্ছ কুচযুগ পীন উচ্চ, লোহিত কাঁচলী তাতে শোভা।
প্রফুল্ল কমলদল মুখোৎপল ঢলঢল, মধুলোভে ভ্রমে মধুলোভা॥
তিলফুল জরজর লজ্জিত বিহগবর নেহারিয়া নাসার বলন।
কুন্দকুসুমের পাঁতি মদনমঞ্জন ভাতি ওষ্ঠাধর অরুণ দলন॥
সুন্দর কুরঙ্গ-অক্ষি অথবা খঞ্জন পক্ষী নৃত্য করে কমল উপরে।
ভুরু মনোজের ধনু, ফুলধনু নিজ তনু অপাঙ্গে লুকায়ে দর্প করে॥
মৃগচিহ্ন ভিন্ন ইন্দু ভালে মৃগমদবিন্দু, মুখেতে মধুর মৃদু হাস।
বনপ্রিয় ভাষা জিনি ভাষা ভাষে বিনোদিনী, কাদম্বিনী জিনি কেশপাশ॥
এইরূপ তরুরূপ তরুণ রসের কূপ, রঙ্গে ভঙ্গে মাধুর্য্য গমন।
নিরখি মাতঙ্গবরে অপমানে বনে সরে, মরালের গমন দলন॥ পৃ ১৭-১৮॥

ঊনষষ্টি পরিচ্ছেদ

লৌকিক ছড়া এবং বিবিধ ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক পালা গান

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে স্থানীয় দেবদেবী, ব্যক্তি বা ঘটনা বিশেষ ও দৈবদুর্ব্বিপাক লইয়া বিস্তর ছড়া গান রচিত হইয়াছিল। পূর্ব্বেও এইরূপ ছড়া রচিত হইত, কিন্তু সেগুলি আমাদের হস্তগত হইবার পূর্ব্বেই লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। পশ্চিমবঙ্গে স্থানীয় দেবদেবীর মাহাত্ম্য ছড়া ব্যতীত বর্গীর হাঙ্গামা, পলাশীর যুদ্ধ, বর্দ্ধমানের প্রতাপচাঁদের মামলা, দামোদরের বন্যা ইত্যাদি বিষয়ক ছড়া পাওয়া গিয়াছে। চল্লিশ পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বেও দক্ষিণরাঢ়ে বহু স্থানীয় বীর ও মহাত্মার কাহিনীমূলক ছড়া ও ছবি ভিখারীদিগের মুখে এবং পটুয়াদের পটে শোনা ও দেখা যাইত। বিশেষ আক্ষেপের বিষয় এই যে লুপ্ত হইবার পূর্ব্বে এগুলিকে কেহই সংগ্রহযোগ্য বিবেচনা করে নাই।

তারকনাথের একাধিক ছড়া প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে একটির রচয়িতা "দ্বিজ" শঙ্কর।[১] সহদেব চক্রবর্ত্তীর রচিত ছড়াটিই বোধ হয় প্রাচীনতম। সেটি কবির অনিলপুরাণে দেওয়া আছে। একাধিক কবি রচিত মদনমোহনবন্দনা পাওয়া গিয়াছে। ইহার বর্ণনীয় বিষয় হইতেছে মদনমোহন কর্ত্তৃক দলমাদল কামান দাগিয়া বিষ্ণুপুর হইতে বর্গী বিতাড়ন এবং চৈতন্যসিংহ কর্ত্তৃক কলিকাতায় গোকুল মিত্রের নিকট মদনমোহনবিগ্রহ বন্ধক রাখা। মুর্শিদাবাদ কিরীটকোণার কিরীটেশ্বরীর মাহাত্ম্য কাব্য বা ছড়া কিরীটমঙ্গলের কথা পৃথ্বীচন্দ্র গৌরীমঙ্গলে উল্লেখ করিয়াছেন। ক্ষীরগ্রামের যোগাদ্যার বন্দনা কৃত্তিবাসের নামে চলিতেছে। এ কৃত্তিবাস অনেক পরবর্ত্তী কালের লোক। মুর্শিদাবাদ অঞ্চলে 'বাঘাইর বয়াৎ' বা ব্যাঘ্রদেবতার ছড়াও প্রচলিত আছে। এইরূপ একটি ছড়া বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ পত্রিকায়[২] মুদ্রিত হইয়াছে।

১। ১৩১৩ সালের অগ্রহায়ণ সংখ্যা জন্মভূমি দ্রষ্টব্য [বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ১৮]।

২। ১৯, পৃ ১৬৭-১৭০।

বর্গীর হাঙ্গামা সম্বন্ধীয় বড় ছড়া মহারাষ্ট্রপুরাণের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। সিরাজুদ্দৌলার বিষয়ে ছোট ছোট ছড়া এখনও লোকের মুখে মুখে চলিতেছে। এইরূপ একটি ছড়া হইতে কিয়দংশ উদ্ধৃত করিয়া দিতেছি।

কি হলো রে জান। পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল পরাণ॥
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রয়ে।
একলা মীরমদন সাহেব কত নিবে সয়ে॥
ছোট ছোট তেলেঙ্গাগুলি লাল কুর্ত্তি গায়।
হাঁটু গেড়ে মারে তীর মীরমদনের গায়॥
নবাব কান্দে সিপাই কান্দে আর কান্দে হাতী।
কলকেতায় বসে কান্দে মোহনলালের পুতি॥
দুধে-ধোয়া কোম্পানির উড়িল নিশান।
মীরজাফরের দাগাবাজিতে গেল নবাবের প্রাণ॥
ফুলবাগে মলো নবাব খোসবাগে মাটি।
চান্দোয়া খাটায়ে কান্দে মোহনলালের বেটি॥[১]

আলিবর্দ্দী ও সরফরাজ খাঁর যুদ্ধকাহিনীর একটি ছড়া হইতে কিছু অংশ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

সহর হইতে নবাব হইল বাহির সহর ক'রে খালি।
দিনে দিনে সোনার বরণ হয়ে গেল কালী॥
মারামারি লেগে গেল গিরিয়া ময়দানে।
কান্দে বাঙ্গালার সুবেদার হাপুস নয়নে॥
পূর্ব্বেতে করিল মানা জাফর খাঁ নানা।
ভাল মন্দ হলে নবাব সহর ছেড় না॥
... ...
গিয়াস খাঁ বলিল তখন শুন নবাবজি।
আলিবর্দ্দীর শির কেটে এনে দিব আজি॥

১। ব-সা-প-প ১২, পৃ ৪২।

শুন শুন ওরে গিয়াস পাঠানের জাতি।
ময়দানে পড়িল যেন মার আর কাটি॥

পড়িল নবাবের তাম্বু ব্রাহ্মণের স্থানে। আলিবর্দ্দীর তাম্বু পড়ে গিরিয়া ময়দানে॥
শুন তুমি ওরে গিয়াস বলি যে তোমাকে। ভাইজান মিশিতে আসে লড়াই বল কাকে॥
হায় গো আল্লা বারি তাল্লা খেয়াল দিন রেতে। গিয়াস খাঁর হবে লড়াই আলিবর্দ্দীর সাথে॥
মার মার করে গিয়াস লড়াই করিল। কলার বাগানে যেন ঝুড়িতে লাগিল॥
তীর পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রয়ে। গিয়াস খাঁ করে লড়াই ঢাল মুড়ি দিয়ে॥
ভাল ভাল কামান সব করিলেক বিলি। নবাবের কামানে ভরা ইট আর বালি॥
দশ কাঠা জমি নিয়ে গিয়াস খাঁর ঘোড়া ফিরে। হাজার হাজার পলটন এক চক্করে মারে॥
... ...
হাতী পড়িল তুলতুলিতে ঘোড়া পড়িল রণে। পাঙ্খাদার ডুবাইল সাইস্ বিলের কোণে॥[১]

দামোদরের বন্যার অনেকগুলি ছড়া পাওয়া গিয়াছে। ১০৭২ সালের দামোদরের বন্যার একটি ছড়া ভাঙ্গামোড়া গ্রামনিবাসী অনিরুদ্ধ[২] গুপ্ত রচনা করিয়াছিলেন।[৩] ছড়াটির পয়ার সংখ্যা সত্তর মাত্র। আরম্ভ এইরূপ—

অবধান কর ভাই শুন সর্ব্বজন। মন দিয়া শুন সবে এই বিবরণ॥
সন হাজার বাত্তর সালে প্রথম আশ্বিনে। দামোদরে আইল বান অতি কুলক্ষণে॥

শেষ এইরূপ—

রচিলাম এই কাব্য ধর্ম্মের চরণে।
লোকমুখে শুনি ভাই না দেখি নয়নে॥

"দ্বিজ" রাম রচিত দামোদর বন্যার ছড়ার পুঁথির লিপিকাল ১২৬৮ সাল।[৪] ছড়ার পয়ার সংখ্যা প্রায় ৯০। শেষের ভণিতা এইরূপ—

চণ্ডিকার পাদপদ্ম ভাবি নিরন্তর।
ভণে দ্বিজ রাম তার মির্জ্জাপুরে ঘর॥

১। ঐ, পৃ ৪১-৪২। ২। পাঠ 'অনিরুদ্র।' ৩। ব-সা-প-প ৫, পৃ ৭৩।
৪। ঐ ৬, পৃ ৭০।

নফর দাসের ছড়ার ভণিতা এইরূপ—

বারশ তিরিশ সালে বরষা কালে ভণিল নফর দাস।
কেউ হ'ল পাতুড়ে রাজা কারো সর্ব্বনাশ ॥

পূর্ব্ববঙ্গে এই সব ছড়া পাইতেছি—ভূমিকম্পের ছড়া,[১] বাত্যাবর্ত্তবিবরণ (নরোত্তম কেরাণী রচিত),[২] ফৌজদারের কীর্ত্তিগাথা (রামতনু বিরচিত),[৩] যুদ্ধকথা (দীনদয়াল দাস রচিত),[৪] নিত্যানন্দ বৈদ্যের কবিতা ("দ্বিজ" রামচন্দ্র রচিত),[৫] চৌধুরীর লড়াই,[৬] রাজবল্লভ সেনের জীবনচরিত (গুরুদাস গুপ্ত রচিত),[৭] রাজকুমার কাহিনী (গঙ্গারাম দাস রচিত)[৮] ইত্যাদি।

উত্তরবঙ্গে স্থানীয় দেবতা ও তীর্থাদির মাহাত্ম্য ছড়া যাহা পাওয়া যাইতেছে তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ নিম্নে দেওয়া গেল।

"দ্বিজ" গৌরীকান্ত রচিত মহাস্থান বা পৌষনারায়ণী স্নানের ছড়া একটি পুঁথির লিপিকাল ১২২০ সাল।[৯] ছড়াটি বটতলা হইতে প্রকাশিত হইয়াছিল। ভণিতায় এই কবিপরিচয় পাওয়া যায়।

কবিতা রচিল দ্বিজ গৌরীকান্ত নাম। নিবাস তাহার বটে নারুলি[১০] গ্রাম ॥
বগুড়া পূর্ব্বভাগ বেলপাড়া[১১] গ্রাম। দ্বিজকুলে উৎপত্তি সেই করে গান।

ছড়াটি হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় কর্তৃকও প্রকাশিত হইয়াছে।

ব্রহ্মপুত্র মাহাত্ম্যসূচক একটি ছড়ার পুঁথির লিপিকাল খুব সম্ভব ১১৫৯ সাল।[১২]

ব্যাঘ্রদেবতা সোনারায়ের মাহাত্ম্যসূচক একাধিক ছড়া পাওয়া গিয়াছে। ছড়া দুইটি রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।[১৩]

১। ব-প্রা-পু-বি ১ ২, পৃ ৭। ২। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ৭৫-৭৬।
৩। ঐ, পৃ ২০৮-০৯। ৪। ঐ, পৃ ১৩২। ৫। ঐ, পৃ ১৩৭। ৬। ঐ, পৃ ১৯৮-৯৯।
৭। ঐ .পৃ ২৫৬। ইহার একটি গদ্য রূপ উমাচরণ রায় কর্তৃক বিরচিত হইয়া ১৭৮২ শকাব্দে ঢাকা হইতে প্রকাশিত হয়। ৮। ঐ, পৃ ৪০-৪২।
৯। র-সা-প-প ২, পৃ ৪৭-৪৮, পৃ ৯১-৯২, ব-সা-প-প ১৩, পৃ ১৬২।
১০। পাঠান্তর 'মারুলি।' ১১। পাঠান্তর 'যেন পাড়া।' ১২। র-সা-প-প ২, পৃ ৯৬-৯৭।
১৩। ঐ ৪, পৃ ৯০-৯১, ১৭৪-১৭৮।

রতিরাম দাস রচিত দেবীসিংহের অত্যাচারের ছড়া রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।[১] রতিরাম অনেকগুলি "জাগের গান" অর্থাৎ পৌরাণিক ছড়াও রচনা করিয়াছিলেন।[২] ইনি জাতিতে রাজবংশী ও ইটাকুমারীর রাজা শিবচন্দ্র রায়ের প্রজা ছিলেন। শিবচন্দ্র দেবীসিংহ কর্ত্তৃক কারারুদ্ধ হইয়াছিল।

"দ্বিজ" জগন্নাথ রচিত দিনাজপুরের রাজার কবিতা হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় কর্ত্তৃক রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায়[৩] প্রকাশিত হইয়াছে।

মজনু ফকীর নামক এক দস্যু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে উত্তরবঙ্গে কিছুকাল যাবৎ অত্যাচার করিতে থাকে। ইহার সম্বন্ধে রচিত একটি ছড়ার রচনার (বা পুঁথির) লিপিকাল ১২২০ সাল।[৪]

রামপ্রসাদ রচিত নাটোরের কবিতার পুঁথির লিপিকাল ১২২০ সাল। কবিতাটি হরগোপাল দাস কুণ্ডু মহাশয় কর্ত্তৃক রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে।[৫] রামপ্রসাদ রচিত অপর একটি ছড়া অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় সম্পাদিত ঐতিহাসিক চিত্রের প্রথম খণ্ডে প্রকাশিত হইয়াছিল।

নাটোরের কবিতাটিতে একটি সুন্দর সমসাময়িক চিত্র পাওয়া যায়। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে ইংরাজের আদালতের ব্যাপার বেশ সরসতার সহিত বর্ণিত হইয়াছে। বর্ণনাও বেশ সজীব। ছড়াটি এখানে সমগ্রভাবে উদ্ধৃত করা গেল।

শুন সভে এক মজা, বাঙ্গালার যতেক প্রজা ছিল সুবেদারীতে প্রধান।
ইতিমধ্যে কোন ধাতা সৃষ্টি কৈল কৈলকাতা,[৬] সাহেবরূপে দেবতা অধিষ্ঠান॥
শিরে টুপি মোজা[৭] পায় হাতে বেত কুর্ত্তি গায়, একবর্ণ দেখ সভাকার।
বুঝিলাম অনুভাবে, অবতার দেবতা সভে ভূতলে করিলা অধিকার॥
ইন্দ্রসম পদ পাইয়া[৮] সঙ্গে পরিষদ লইয়া বড় সাহেব বসিলা কৈলকাতা।
শাসিতে বাঙ্গালাভূমি ইংরেজ হইলা স্বামী, প্রজালোকের হইলা বিধাতা॥

১। ঐ ৩, পৃ ১৭৫-৮৬। ২। ঐ, পৃ ১৬৯-৭৫। ৩। ঐ ২, পৃ ৬৯-৭৩।
৪। র-সা-প-প ১৩, পৃ ১৬১। ৫। ঐ, পৃ ১৭৯-৮৩।
৬। অর্থাৎ 'কলিকাতা', এইরূপ সর্ব্বত্র। ৭ পাঠ 'মুজা।' ৮। ঐ 'পায়্যা।'

আদালত ফৌজদারী, কেহ কর্ত্তা কেলট্টরি,[১] আফিলের[২] কর্ত্তা কেহো হৈলা।
নাটইর[৩] প্রধান জিলা আগে বহু আসিছিলা এবে জজ জমেশ গ্রগু[৪] আইলা॥
লোকের প্রসন্ন দশা, বিধাতা পুরাইলা আশা, জজ আইলা ধর্ম্ম-অবতার।
হেন কর্ম্ম করি সাধ্য বাঙ্গালীর সুখে রাজ্য খোসনামীতে হৈল দীপ্তকার॥
বুঝিলাম হক বটে জজ শাহেব ধর্ম্ম বটে[৫] চিত্রগুপ্ত (?) সঙ্গেতে দেওয়ান।
গুণবান্ আমলা যত সাহেবের মনোমত, সাক্ষিরূপে পণ্ডিতপ্রধান॥
কাজের কিছু নাহি ছল, দুধের দুগ্ধ জলের জল জজের আমলার ধর্ম্ম বটে।।
প্রজাক ভরতের শাপ কলিতে প্রধান তাপ, তাহে ভালমন্দ সব ঘটে॥
তখন সন বার শ সালে হুকুম দিলা আদালতে বাকৃরগু[৬] মারফতে কাজ।
আসামী ফৈরাদি যত আছিলেক শত শত সবার মস্তকে পৈল বাজ॥

...

এমত হুকুম যবে সামনে খাড়া হৈলা সবে পিতৃপুণ্য জনের তাহাতে।
কোরাণ মস্তকে থু[ই]য়া কেহ গঙ্গাজল লৈয়া কসম করিলা আদালতে॥
যদি কিছু করিয়াছিল নরকে পতন হৈল তিন কোটি কুলদেব সমাজে॥
এ কথা শুনিয়া সমা তবে হৈলা খাতের জমা বুঝি সভে হইল আরজে॥
ইষ্টদড় যেবা হয়ে গঙ্গাজলে করে ভয়ে তারা সভে হইলেক রুষ্ট।
পরকাল করি পণ্ড কেন হয়ে বাক্‌রগু উষ্ট কার্য্যে ধর্ম্ম কৈলে নষ্ট॥
তবে শুনি নিরূপণ বাকৃরগু ত্রিশ জন কাহাকে দিলেন মনসব।
কার ধর্ম্মজ্ঞান ঘটে কাজে উপযুক্ত বটে কেহ কেহ কাজেতে ব্যাকুব॥
যখন বেলা দশ দণ্ড বাহির হৈল বাক্‌রগু শিরে ধরে মোমজামার ছাতি।
আসামী ফৈরাদি যত চলিলেক শত শত, চলে টর্ণি[৭] দপ্তরি সহিতে॥
মিছিলের চারি পাশে থাম্বা বান্ধা আছে বাঁশে, তক্তা দিয়াছে পাথা করি।
বনাতি বিনামা পায় শিরে পাগ জামা গায় বৈসে বাকৃরগু সারি সারি॥

১। অর্থাৎ কালেকটরি। ২। অর্থাৎ আপীলের। ৩। অর্থাৎ নাটোর।
৪। James Grant. ৫। 'বাঁটে' হইবে?
৬। অর্থাৎ উকীল। ৭। অর্থাৎ এটর্ণি।

বামেতে নাজির খাড়া, মুহুরি মিছিল পড়া, সমুখে মুস্তফি মহাশয়ে।
চৌদিগে অধিষ্ঠিত লোকে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকে, কার ভাগ্যে কথন কিবা হয়ে॥
সারি সারি··· ··· ··· ··· ··· ··· ··· ···
··· ··· ধন্দ ব্যস্ত হয়ে বাক্‌রগু টর্ণি টর্ণি বলি তখন ডাকে॥
জগন্নাথ আদি সভে জনা দশ বারো হবে, উপযুক্ত কাজেতে বুঝায়।
গোলাম হুসন মীর বাক্‌রগু কোম্পানীর মহারাজার (তরফে) চৌধুরী রয়॥
ইহা সেওয়ায় যত জনা সভে মাত্র মাথা গণা, কেহ কিছু না করে সওয়াল।
আসামীর কর্ম্মমতে যে হয় জজের হাতে, বাক্‌রগুে নাহি কিছু ফল॥
তবে যদি খাড়া হয় ডকে কিছু নাহি কয় জোড় হাতে থাকে হ[ই]য়া ধন্দ।
সাহেব যদি পুছে তাকে না বুঝিয়া মাথা ঝাঁকে, সেলাম করে বল্যা খোদাবন্দ॥
যদি সাহেব হয় খোস কিবা করে প্রতিরোষ বুঝিতে না পারে থাকি তথা।
বাক্‌রগু বাহির হৈল, আসামীকে ডাক্যা কৈল, আজি হৈল তোমাদিগের কথা॥
সে কথায় নাহিক তত্ত্ব, যাহা বোলে তাহাই সত্য, অন্ধলোকে যেমতে দেখায়।
সর্ব্বলোক থাকে পাছে, কেহ নাহি যায় কাছে, উকিল আসি যে কিছু বুঝায়॥
কেহ মিছিলে দাঁড়া[ই]য়া থাকে, ডিক্রি ডিস্‌মিস্‌ দেখে, না করে তাহাতে······।
আসামী ফৈরাদির কাজে আইসা[১] বাহির হ[ই]য়া পাছে আমি বাক্‌রগু ছিলাম কার॥

কেহ বা মিছিল শুনে, দাঁড়াইয়া ভাবে মনে, দাই মুদ্দাই কারো···।[২]
হুকুম হয়······মাস, তেবাড়ীতে কর বাস, নিযুক্ত····· মহস্থল থাকে॥
ফাটকে যাবার কালে আসি বাক্‌রগু বোলে, নাহাক[৩] করিলা গণ্ডোগোল।
কর্য্যাছিলা মিছা দাবী, আদালতে কেনে পাবি, আমার রোসনের কি তা বল॥
ডিক্রি ডিস্‌মিস্‌ আদি যে কিছু করা[ই]ল বিধি, উকিলের লোকসান তাতে কিবা।
ডিক্রিতে রোসন মিলে, ঢিস্‌মিসে মিহনত-আনা বোলে, কোন দিগে নাহি যার ফাঁকি॥

১। অর্থাৎ আসিয়া। ২। অতঃপর চারি ছত্র পড়া যায় নাই।
৩। অর্থাৎ নাহক, শুধু শুধু।

কোন বিধি হ[ই]য়া ভণ্ড নির্ম্মাইল বাক্‌রণ্ড, আমরা সভে গরদিশ পাই।
বাক্‌রণ্ড যদি নইত[১] তবে কি এমন হৈত, যার কথা কৈত যা[ই]য়া সেই॥
দারুণ বিধির আদালতে আরজি দিলা পরের হাতে যশ শুনে উকিলের মুখে।
সাহেব যদি পুছে তারে তা না বুঝি সওয়াল করে, বাহিরে থাকিয়া মরি শোকে॥
জজ দিয়াছে পদ করা লাগে খেজালত তাকে রোসন লাগে বাড়া॥
আইজ … .. থাকা লাগে এই ভাবে দুঃখ পা[ই]য়া……ছাড়া
উকিলের মুখে ছাই, ছাড়ান না যায় তাই, দরবারে চড়ে সে যে গাধা।[২]

ভারি মোকদ্দমা যদি হয় মনেতে আনন্দ জয় … … …।
যদি কর্ম্মগুণে জিত হয় তাকে আসি হাসি কয়, শাল ইলাম[৩] দেহ মোকে॥
কড়ি দিয়া উকিল করা চাকর হয়্যা পাছে ফেরা, কপালে ভাল যে হয় মন্দ।
কি আর অধিক কব, উকিল লোকের মর্জ্জি বড় দেখিয়া রামপ্রসাদ হৈল ধন্দ॥

"জাল" প্রতাপচাঁদের কাহিনী লইয়া একাধিক ছড়া রচিত হইয়াছিল। একটির লিপিকাল হইতেছে ১৩ই অগ্রহায়ণ ১৭৬৫ শকাব্দ ১২৫০ সাল। বীরভূমের সাঁওতাল হাঙ্গামার একটি ছড়ার রচনাকাল হইতেছে ১২৬২ সাল।

বিবিধ ব্রত এবং উৎসবে স্ত্রীলোক অথবা পুরুষ কর্ত্তৃক গীত পৌরাণিক অপৌরাণিক গান ও ছড়া—যেমন জাগের গান, জারি গান ইত্যাদি—পূর্ব্ব ও উত্তর বঙ্গে বিশেষ প্রচলিত আছে। চট্টগ্রাম অঞ্চলে 'ভট্ট ভাষায়' অর্থাৎ ভাটদিগের ভাষা ব্রজবুলি বা মিশ্র হিন্দীতে রচিত এইজাতীয় কতকগুলি ছোট বড় পৌরাণিক ছড়া বা কবিতা পাওয়া যাইতেছে, সেগুলির রচয়িতা নিজেরাও ছিলেন ভাট। যেমন, কালীচরণ ভট্ট রচিত রাম পাঁচালী বা সংক্ষেপ রামকাহিনী,[৪] তম্বুরাম ভট্ট রচিত বস্ত্রহরণ গীত,[৫] ভট্ট কৃষ্ণদাস রচিত শিববন্দনা[৬] ও হরগৌরীর কোন্দল,[৭] ঈশ্বরচন্দ্র রচিত হংসবিলাস পাঁচালী[৮] ইত্যাদি।

১। অর্থাৎ না হইত। ২। অতঃপর চারি পাঁচ ছত্র পড়া যায় নাই।
৩। অর্থাৎ ইনাম, বখশিশ। ৪। বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৫০-৫১।
৫। ঐ, পৃ ১৫১। ৬। ঐ, পৃ ২৫৯। ৭। ঐ, পৃ ২৫৯-৬০।
৮। ১৭৮৭ শকাব্দে প্রকাশিত। বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ৪৬।

পূর্ব্ববঙ্গে একাধিক সংক্ষিপ্ত মহাভারত পাঁচালী বা ছড়া পাওয়া গিয়াছে।[১] এই ছড়াগুলির নাম ভারতসাবিত্রী। একটির ভণিতায় 'সঞ্জয়' নাম রহিয়াছে।[২] এই শ্রেণীর রামায়ণ ছড়াও পাওয়া যায়, তাহার নাম ধর্ম্ম ইতিহাস।[৩] এইরূপ একটি ছড়ায় 'গুণরাজ খান ভণিতা পাইতেছি।[৪]

উত্তরপূর্ব্ব এবং পূর্ব্ব বঙ্গে প্রচলিত অনেকগুলি ইতিহাস, কিংবদন্তী এবং আখ্যান মূলক পালা গান মৈমনসিংহ-গীতিকা এবং পূর্ব্ববঙ্গ-গীতিকা নামে চারিখণ্ডে দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয়ের সম্পাদকতায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে। অধিকাংশ পালা শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত। পালাগুলিতে স্থানীয় উপভাষার রূপ বজায় রাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও সাধুভাষার এবং কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষার প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। মধ্যে মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার (এবং সাধুভাষার) শব্দগুলিকে পূর্ব্ববঙ্গীয় রূপ দিবার চেষ্টা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে এই সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে পালাগুলি সর্ব্বাংশে অকৃত্রিম নয়। মৈমনসিংহ-গীতিকার মহুয়া পালা হইতে কিছু কিছু উদাহরণ দিয়া আমার বক্তব্য পরিস্ফুট করিতেছি।

"নতুন এক দল বাইগ্যা আইছে তামসা দেখাইবারে" [পৃ ৬]—এখানে 'নয়া' হইতেছে স্থানীয় উপভাষার শব্দ। "এই কথা শুনিয়া মহুয়া বলে ধীরে ধীরে, মনের আগুন নিবাই সখি বল কেমন কইরে" [পৃ ১১]—এখানে 'শুনিয়া' সাধু-ভাষার পদ, এবং 'কইরে' হওয়া উচিত ছিল 'কর্য্যা', 'ধীরে' পদের সহিত মিল করিবার জন্য তৈয়ারী হইয়াছে। আসলে পয়ারটি হইতেছে সংগ্রহীতার প্রক্ষেপ। "যাইবার কালে একটী কথা বল্যা যাই তোমারে" [পৃ ১৪]—এখানে 'বল্যা' আসিয়াছে সাধুভাষার 'বলিয়া' হইতে, হওয়া উচিত ছিল 'কয়্যা'। এইরূপ "হইয়াছিল" [পৃ ২০], "ভাবিয়া চিইন্ত্যা" [ঐ], "আঁখি" প্রভৃতি আনুনাসিক স্বরযুক্ত পদ, ইত্যাদি।

১। আরতি দ্বিতীয় বর্ষ; বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৭৪, ১৭৫, ২১১, ১-২, পৃ ৭১-৭২।
২। আরতি দ্বিতীয় বর্ষ, বা-প্রা-পু-বি ১-১, পৃ ১৭৪।
৩। ঐ ১-১, পৃ ৬৯-৭০, ১-২, পৃ ৯৫-৯৬। ৪। ঐ ১-১, পৃ ৬৯-৭০।

মধ্যে মধ্যে স্পষ্টতঃ অন্যান্য রচনা হইতে অথবা মৌলিক দুই চারি ছত্র জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। যেমন,

বাজী কর্‌লাম তাম্‌সা কর্‌লাম ইনাম বক্সিস চাই।
মনে বলে নত্যার ঠাকুর মন যেন তার পাই ॥ পৃ ৭ ॥

এটুকু মহুয়ার উক্তি হিসাবে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে, কিন্তু পূর্ব্বাপর সঙ্গতি নাই। পূর্ব্বের ছত্রে "গান করিতে আইলাম আমরা নত্যাঠাকুরের বাড়ী" কোন ব্যক্তিবিশেষের উক্তি নয়, বাজনার ইঙ্গিত—"কর্‌তালের ঝুমুঝুমু ডুলে মাইলো তালি।"

ঘুমাইয়া কানের কাছে দেওয়ার গরজন।
ভিন দেশী অতিথির মুখ দেখয়ে স্বপন ॥ পৃ ২১ ॥

এই দুই ছত্রও প্রক্ষিপ্ত, এই নিতান্ত আধুনিক ধরণের রোম্যান্টিক ভাবও পূর্ব্বাপর সঙ্গতিবিহীন।

ওই শুন বাজে বাঁশী দূরে শুনা যায়।
সন্ধ্যা গুঞ্জরীয়া গেল চল বাসে যাই ॥ পৃ ৩৬ ॥

শুধু এই দুই ছত্র কেন, "বনে পর্য্যটন ও বিপদ" এই অংশের বাঁশী বাজানো motifও প্রক্ষিপ্ত।

অনেকগুলি পালাতে অন্য গল্পের অংশ যোগ করিয়া অথবা অন্যরূপে কাহিনীকে পরিবর্দ্ধিত ও পরিবর্ত্তিত করিয়া রোম্যান্টিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে। মহুয়া পালাটিতে এইরূপ প্রচেষ্টা সুপ্রকট। মহুয়ার আত্মহত্যা কখনোই মূল কাহিনীতে ছিল না। সন্ন্যাসীর ব্যাপারটি স্বকপোলকল্পিত না হইলে অন্য কাহিনী হইতে গৃহীত হইয়াছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক প্রকাশিত গীতিকাগুলির মধ্যে যেগুলি সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের মনোহরণ করিয়াছে সেগুলির কোনটিকেই সর্ব্বাংশে অকৃত্রিম গণ্য করা যায় না। কিন্তু অন্যান্য পালাগুলি, বিশেষ করিয়া যেগুলি অপূর্ণাঙ্গ

সেগুলি অনেকটা অকৃত্রিম বটে। আসলে পালাগুলি যে ভাবে গাওয়া হয় তাহা সম্পূর্ণাঙ্গ নহে। সম্পূর্ণ পালাগুলির কোনটিই যে একজন গায়কের কাছে পাওয়া যায় নাই তাহা সম্পাদক মহাশয়ও স্বীকার করিয়াছেন। স্থতরাং সম্পূর্ণ এবং রোম্যাণ্টিক গীতিকাগুলিকে পুরাপূরি লোক সাহিত্যের নিদর্শন বলিয়া গ্রহণ করা চলে না।

ছড়াগুলিতে মধ্যে মধ্যে দু চারি ছত্র মিলে যাহা ভাবে ও ভাষায় অত্যন্ত চমৎকার। পালা-রচয়িতা এবং গায়কদের কাছে বৈষ্ণব পদাবলী অজ্ঞাত ছিল না, স্থতরাং ইহাতে বিস্ময়ের হেতু কি?

ষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

খেউড় তরজা আখড়াই হাফ্-আখড়াই দাঁড়া কবি কবিগান পাঁচালী ও যাত্রা

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের পূর্ব্ব হইতে এক ধরণের আদিরসাত্মক গানের ঢঙ্গ ভাগীরথীতীরে নদীয়া শান্তিপুর অঞ্চলে প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিল। ইহাকে বলিত খেউড় ('খেঁড়ু')। ভারতচন্দ্র বিদ্যার জবানীতে বলিয়াছেন,

নদে শান্তিপুর হতে খেঁড়ু আনাইব।
নূতন নূতন ঠাটে খেঁড়ু শুনাইব ॥

শতাব্দীর শেষভাগে বাঙ্গালাদেশের বিকৃতরুচি নাগরিক সংস্কৃতি (?) যখন কলিকাতাতে আসিয়া শিকড় গাড়িল তখন খেউড় গানের একমাত্র কেন্দ্র হইল ইংরেজরাজধানী। বাঙ্গালা দেশে বিশেষ করিয়া কলিকাতা অঞ্চলে ইংরেজশাসন সুদৃঢ় করিতে যে বাঙ্গালীর দায়িত্ব সর্ব্বাধিক এবং যিনি ইংরেজ শাসনকর্ত্তার অনুগ্রহলব্ধ মান-ঐশ্বর্য্যের নবগরিমায় মুর্শিদাবাদের রাজসভার দ্রুতম্লানায়মান ঔজ্জ্বল্যের অনুসরণে অনেক কিছু করিয়াছিলেন সেই মহারাজা নবকৃষ্ণ দেব বাহাদুর খেউড় গানের প্রধান পৃষ্ঠপোষক হইলেন। নবকৃষ্ণের অনুচরমণ্ডলীর মধ্যে সে সময়ের কয়েকজন শ্রেষ্ঠ সঙ্গীতজ্ঞও ছিলেন। তাহার মধ্যে একজনের নাম কুলুইচন্দ্র সেন। প্রধানতঃ ইঁহারই প্রচেষ্টায় উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রারম্ভে খেউড় গান ওস্তাদি ঢঙ্গে মণ্ডিত ও মার্জ্জিত হইয়া 'আখড়াই' (অর্থাৎ আখড়া বা সঙ্গীতশালার উপযুক্ত) নামে পরিচিত হয়। কুলুইচন্দ্রের আত্মীয় ছিলেন রামনিধি গুপ্ত।[1] ইনি মার্জ্জিতরুচির প্রণয়গীতি রচনা করিয়া আখড়াই গানকে নাগরিক সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে বিশেষ সহায়তা করেন। রামনিধি

১। নিধুবাবুর পুত্র জয়গোপালের মতে কুলুইচন্দ্র রামনিধির "অতি নিকটসম্পর্কীয় মাতুলপুত্র ছিলেন" [গীতরত্ন গ্রন্থ (তৃতীয় সংস্করণ ১২৭৫), পৃ ।০]। নবীনচন্দ্র দত্তের ও মনোমোহন বসুর মতে রামনিধি ছিলেন কুলুইচন্দ্রের ভাগিনেয় [গীতাবলী (দ্বিতীয় সংস্করণ), পৃ ১৩]।

গুপ্ত মহাশয় 'নিধু বাবু' নামেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। ইঁহার কথা পরে বলিতেছি।

আখড়াই গানের রচনা সংক্ষিপ্ত ও গাঢ়বদ্ধ। তিনটি মাত্র গানে গাওনা শেষ হইত, প্রথমে ভবানীবিষয়ক, তাহার পর প্রণয়গীতি (সাধারণতঃ মিলনের আর্ত্তিসূচক), শেষে প্রভাতী (রজনীপ্রভাতে মিলনের সম্ভাবনা দূর হওয়াতে আক্ষেপ)। ইহাতে ধ্রুপদ খেয়ালের মত রাগের আলাপ ও সুরের বৈচিত্র্য দীর্ঘবিলম্বিত হইত। আখড়াই নাম সেইজন্যই। বাজনা ও সঙ্গতের বিশেষ পরিপাট্য ছিল। আখড়াই গানে বাজনার গতি (tempo) ছিল প্রধানতঃ চারিপ্রকার—পিড়ে- (বা পিঁড়ে) বন্দী (overture), দোলন (swing), সব-দৌড় (full tempo) এবং মোড় (climax)। আখড়াই গাওনায় প্রতিদ্বন্দ্বী দলের মধ্যে উত্তরপ্রত্যুত্তর হইত না, যে দল গান বাজনায় শ্রেষ্ঠ হইত তাহারই জয় হইত।

আখড়াই গীতরচয়িতাদিগের মতে শ্রেষ্ঠ ছিলেন নিধু বাবু। ইঁহার জন্ম হয় ১১৪৮ সালে ত্রিবেণীর নিকটে চাপতা গ্রামে মাতুলালয়ে। ইঁহার পিতা হরিনারায়ণ কবিরাজ এবং পিতৃব্য লক্ষ্মীনারায়ণ কবিরাজ বাস করিতেন কলিকাতায় কুমারটুলিতে। এইখানে থাকিয়া নিধু বাবুর বিদ্যাশিক্ষা হয়। দশসালা বন্দোবস্তের সময় নিধুবাবু কর্ম্মসূত্রে ছাপরায় যান, সেখানে হিন্দুস্থানী সঙ্গীত উত্তমরূপে শিক্ষা করেন এবং হিন্দী গান ভাঙ্গিয়া বাঙ্গালায় 'টপ্পা' (অর্থাৎ সংক্ষিপ্তাকার) গান রচনা করিতে থাকেন। কিছুকাল পরে কর্ম্মত্যাগ করিয়া কলিকাতায় প্রত্যাগমন করেন। কলিকাতায় "শোভাবাজারস্থ বটতলার পশ্চিমাংশে বড় একখানা প্রসিদ্ধ আটচালা ছিল, নিধুবাবু প্রতি দিবস রজনীতে তথায় গিয়া সংগীত বিষয়ের আমোদ করিতেন, ঐ স্থানে এই নগরস্থ প্রায় সমস্ত সৌখিন, ধনী ও গুণী লোকেরা উপস্থিত হইয়া বাবুর সুধাময় কণ্ঠ বিনির্গত সুমধুর সঙ্গীতস্বরে মুগ্ধ হইতেন।

"নিমতলা নিবাসী সুবিখ্যাত বাবু শ্রীনারায়ণ চন্দ্র মিত্র মহাশয় পক্ষির দল করিয়া উক্ত প্রসিদ্ধ আটচালায় সর্ব্বদা উল্লাস করিতেন, পক্ষির দলের পক্ষী সকল ভদ্রসন্তান উপস্থিতবক্তা এবং উপস্থিত কবি ও বাবু এবং সৌখিন নামধারী সুখী

ছিলেন, পক্ষির দলেরা নিধুবাবুকে অত্যন্ত মান্য করিতেন। পক্ষিগণ আপন আপন গুণানুসারে নাম পাইতেন এবং সেই নাম প্রায় নিধুবাবুর দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া সুখী জ্ঞান করিতেন······

"১২১০ সালের পূর্ব্বে মৃত মহামতি মহারাজা নবকৃষ্ণ বাহাদুরের সমাজে বাঙ্গালি মহাশয়দিগের মধ্যে "আখড়াই" গাহনার অত্যন্তামোদ ছিল। তখন উক্ত মহারাজের নিকট কুলুইচন্দ্র সেন নামক এক জন বৈদ্য আখড়াই বিষয়ে অদ্বিতীয় পারদর্শি ছিলেন, তাহাকে আখড়াই গাহনার একজন জন্মদাতা বলাই কর্ত্তব্য হয়, তিনি ৺রামনিধি গুপ্তের অতি নিকট সম্বন্ধীয় মাতুলপুত্র ছিলেন, কিন্তু নিধুবাবু তাঁহার পর আখড়াই বিষয়ে যে সকল নূতন প্রণালী করেন এমত আর কেহই করিতে পারেন নাই, ইঁহার কৃত প্রণালীই অদ্যাপি প্রচলিত রহিয়াছে।

"১২১০ অব্দে যখন মহামান্য রাজকৃষ্ণ বাহাদুর "আখড়াই" আমোদে আমোদী হইলেন তখন শ্রীদাম দাস,[১] রাম ঠাকুর ও নসিরাম সেকরা প্রভৃতি কয়েকজন সর্ব্বদাই "আখড়াই" সংগীতের সংগ্রাম করিত, ইঁহারা তাবতেই এ বিষয়ে পণ্ডিত ছিল কিন্তু সৌখিন ছিল না, পেসাদারি করিয়া টাকা লইত।

"১২১২ কিম্বা ১৩ অব্দে নিধুবাবুর উদ্যোগে এতন্নগরে দুইটি সংশোধিত সখের আখড়াই দলের সৃষ্টি হয়, তাহার এক পক্ষে বাগবাজার ও শোভাবাজারস্থ সমুদায় ভদ্রসন্তান, এবং আর এক পক্ষে মনসাতলা অথবা পাতুরিয়াঘাটা নিবাসী ৺নীলমণি মল্লিক মহাশয় ও তাঁহার বন্ধুবর্গ ব্রতী হইলেন, এই উভয় দলে "বাদী" হইলে নিধুবাবু বাগবাজারের পক্ষ হইয়া গীত ও সুর প্রদান করিলেন, এবং মল্লিক বাবুর পক্ষে শ্রীদাম দাস এবং ৺কুলুইচন্দ্র সেনের পুত্র ৺গোকুলচন্দ্র সেন প্রভৃতি কয়েকজন গীত ও সুর প্রস্তুত করণার্থে প্রবর্ত্ত হইলেন, তাহাতে শ্রীদাম দাস প্রভৃতি ভবানীবিষয় এবং খেউড় প্রস্তুত করিলেন, প্রভাতি প্রস্তুত করিতে গোকুলচন্দ্র সেনের উপর ভারার্পণ হইল······

"এই সংগীত সংগ্রাম শ্রবণ ও দর্শন করত নগরস্থ সমস্ত বিশিষ্ট লোক অপর্য্যাপ্ত

১। শ্রীদাম এবং সুবল দুই ভাই কৃষ্ণযাত্রা গাহনায়ও নাম করিয়াছিল। উভয়ের মৃত্যু হয় ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দে।

আনন্দসাগরে অভিষিক্ত হইয়াছিলেন। এইরূপ সখের আখড়াই স্থাপিত হইলে ব্যবসায়ীদিগের আখড়াইয়ের দল একেবারে উঠিয়া গেল।"[১]

১২৪৫ সালের ২১শে চৈত্র তারিখে নিধুবাবুর দেহত্যাগ হয়।

নিধুবাবুর গানের কিছু উদাহরণ দিই। গানগুলির আকার সংক্ষিপ্ত সংহত ও রসঘন। বিরহের জ্বালার অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের আস্বাদ নিধুবাবুর শ্রেষ্ঠ গীতিগুলিতে অভিব্যক্ত হইয়াছে।

কহনে না যায় সখী তার কত গুণ,
রাত্রদিন প্রাণ প্রাণ করে যারে মন।
হরিষবিষাদ দুই বিচ্ছেদ মিলন,
দুয়ের বাহিরে রাখে সে জন এমন॥ গীতরত্ন, পৃ ১১৯॥

ধীরে ধীরে যায় দেখ চায় ফিরে ফিরে,
কেমনে আমারে বল যাইতে ঘরে।
যে ছিল অন্তরে মোর বাহ্যে দেখি তারে,
নয়ন-অন্তর হলে পুনঃ সে অন্তরে॥ ঐ, পৃ ৩২॥

পিরীতি রতননিধি পাইল যে জন
তাহার মনের মত না হবে কখন।
দুঃখেরে করিয়ে কোলে
ভাসয়ে সুখসলিলে,
অনল শীতল হয় তাহার তখন॥ ঐ, পৃ ১৩৫॥

নিধুবাবুর রচিত একটি আখড়াই গান আদর্শ হিসাবে উদ্ধৃত

[ভবানীবিষয়ক]

ত্বমেকা ভুবনেশ্বরি সদাশিবে শুভঙ্করি,
নিরানন্দে আনন্দদায়িনি।
নিশ্চিত ত্বং নিরাকারা অজ্ঞানবোধ সাকারা,
তত্ত্বজ্ঞানে চৈতন্যরূপিণী॥

১। গীতরত্ন (তৃতীয় সংস্করণ) পৃ [।৶৹]—[॥৵৹]। ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ১২৬০ সালে সংবাদ-প্রভাকরে নিধুবাবুর জীবনী আলোচনা করিয়াছিলেন।

প্রণতে প্রসন্না ভব, ভীমতর ভবার্ণব-
ভয়ে ভীত ভবামি ভবানি।
কৃপাবলোকন করি তরিবারে ভববারি
পদতরী দেহি গো তারিণী ॥

[খেউড়]

মনের যে সাধ ছিল মনেতে রহিল,
তোমার সাধনা করি সাধ না পূরিল।
সাধিয়ে আপন কাজ
এখন বাড়িল লাজ,
আমার গেল সে লাজ, বিষাদ হইল ॥

[প্রভাতী]

যামিনী কামিনী বশ হয় কি কখন,
হলে কি ও বিধুমুখ হেরিয়ে মলিন ?
নলিনী হাসিবে কেন,
কুমুদী বিরসানন,
এ সুখে অসুখ তবে করে কি অরুণ ॥ [ঐ, পৃ ১৪১]॥

নিধুবাবুর অনুবর্ত্তীদিগের মধ্যে কবিরত্ন উপাধিক শ্রীধর কথকের কয়েকটি টপ্পা গানও বেশ চমৎকার। নিম্নে উদ্ধৃত সুপরিচিত গানটি এককালে শিক্ষিত বাঙ্গালীর বিশেষ প্রিয় ছিল।

ভাল বাসিবে বলে ভাল বাসিনে।
আমার সে ভালবাসা, তোমা বই জানিনে।
বিধুমুখে মধুর হাসি,
দেখিলে সুখেতে ভাসি।
তাই আমি দেখিতে আসি, দেখা দিতে আসিনে ॥[১]

১। বঙ্গভাষার লেখক, পৃ ৩৫৮।

আখড়াই গান প্রকৃতপক্ষে ছিল কালোয়াতী বা ওস্তাদী সঙ্গীতের শাখা অতএব কষ্টসাধ্য। এ গানে কথা যৎকিঞ্চিৎ, সুর ও বাদ্যের বাহারই সব। এই কারণে আখড়াই গানের প্রতিপত্তি জনসাধারণের মধ্যে বেশি দিন টিকিল না। আখড়াই ভাঙ্গিয়া এক নূতনতর পদ্ধতি সৃষ্ট হইল, তাহার নাম অর্দ্ধ-আখড়াই নিম-আখড়াই বা হাফ্-আখড়াই। বাগবাজার নিবাসী মোহনচাঁদ বসু নিধুবাবুর নিকট সঙ্গীত শিক্ষা করেন, ইনিই হাফ্-আখড়াই পদ্ধতির সৃষ্টিকর্ত্তা। এ কাজে মোহনচাঁদ নিধু বাবুর সহযোগিতা লাভ করিয়াছিলেন।

কবিগানের আদর্শে হাফ্-আখড়াইয়ে দুই দলের মধ্যে গানের মধ্য দিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর দেওয়া চলিত হইল। গানও সংক্ষিপ্ত আকারের রহিল না, গানের ও সুরের প্রাধান্য প্রায় সমান সমান হইয়া দাঁড়াইল। রাগরাগিণীর elaboration বা পরিবর্দ্ধন অনেক কমিয়া গেল।

হাফ্-আখড়াই গান সাধারণতঃ প্রণয়ঘটিত, তবে রাধাকৃষ্ণের প্রেমলীলার ছাঁচে ঢালা। কখনো কখনো অন্য পৌরাণিক পাত্রপাত্রীর জবানীতেও রচিত হইত। হাফ্-আখড়াই গানের দুই প্রধান অঙ্গ ছিল, সখীসংবাদ ও খেউড়। সখীসংবাদ ও খেউড় অঙ্গের মধ্যে তিন (কখনো কখনো তাহারও বেশী) অংশ—মহড়া, তেহারান (refrain) এবং চিতেন। এক দল সখীসংবাদ গাহিয়া গেলে অপর দল আসিয়া প্রত্যুত্তরে সখীসংবাদ গাহিত। প্রতিপক্ষের গানে উত্তরের সঙ্গে যদি 'চাপান' অর্থাৎ নূতন challenge থাকিত তাহা হইলে প্রথম দলকে আবার আসিয়া দ্বিতীয় সখীসংবাদ গাহিতে হইত। সখীসংবাদ গাওয়া হইলে পর খেউড় গাওয়া হইত। খেউড় গানে ভাবে ও ভাষায় শ্লীলতার সীমা না মানাই ছিল সাধারণ রীতি। এই হিসাবে হাফ্-আখড়াই প্রাচীন খেউড় ও দাঁড়া কবি গানের অনুবর্ত্তী।

আখড়াইয়ের অপেক্ষা হাফ্-আখড়াই আরও অল্পকালস্থায়ী হইল। হাফ্-আখড়াই লোপ হওয়ার জন্য গীতপদ্ধতি দায়ী ছিল না, দায়ী হইল ইংরেজী শিক্ষার প্রসারে কলিকাতা অঞ্চলের ভদ্রসমাজের দ্রুত রুচিপরিবর্ত্তন। ভাষার অসংযম এবং ভাবের গ্রাম্যতার ফলে উনবিংশ শতাব্দী পূর্ণ হইবার বহুপূর্ব্বেই

হাফ্-আখড়াই পদ্ধতির সম্পূর্ণ বিলোপ ঘটিল। শেষের দিকে হাফ্-আখড়াই গান রচনায় নাট্যকার মনোমোহন বসু মহাশয় কিছু সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন। তবে সাহিত্য হিসাবে এই সব গান সম্পূর্ণরূপে মূল্যহীন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর বহুপূর্ব্ব হইতেই ছড়া কাটিয়া ঢোল কাঁসির সঙ্গতে গান করার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল। এইরূপ ছড়াকে বলিত আর্য্যা[১] অথবা তর্জ্জা[২] অথবা আর্য্যা-তর্জ্জা। বৃন্দাবনদাস চৈতন্যভাগবতে বলিয়াছেন, "আর্য্যা তর্জ্জা পড়ে লোক বৈষ্ণব দেখিয়া।" কৃষ্ণদাস কবিরাজ লিখিয়াছেন, "তর্জ্জা প্রহেলী আচার্য্য কহে ঠারে ঠোরে।" বৌদ্ধ ও শৈব সাধকেরা প্রাচীনকাল হইতেই অধ্যাত্মবিষয়ক ছড়া বা প্রহেলিকা রচনা করিতেন, তাহার নিদর্শন পাই চর্য্যাগীতিতে। পরবর্ত্তী কালে শৈবসিদ্ধাদের গীতির মধ্যেও এইরূপ ছড়া ও গান পাই। শ্রীচৈতন্যের সময়েও শৈব সিদ্ধাদিগের ছড়া প্রহেলিকা প্রচলিত ছিল। কৃষ্ণদাস কবিরাজ শ্রীচৈতন্যের মুখে বলাইয়াছেন, "মহাযোগেশ্বর আচার্য্য তর্জ্জাতে সমর্থ।"

পরে এইরূপ বাঁধা ছড়ার সাহায্যে আসরে উত্তরপ্রত্যুত্তর বা বাকোবাক্য পদ্ধতি চলিত হয়। ইহাই দাঁড়া কবি। 'দাঁড়া' শব্দের অর্থ হইতেছে বাঁধা গীত।[৩] অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পশ্চিমবঙ্গে ভাগীরথীতীরভূমিতে দাঁড়া কবির গাওনা জনসাধারণের চিত্তবিনোদনের অন্যতম প্রধান উপায় ছিল।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে অশিক্ষিত তরজাওয়ালাদের হাত হইতে দাঁড়া কবি শিক্ষিত গীতরচয়িতাদের হাতে পড়িয়া কতকটা ভদ্রসমাজের উপযুক্ত হইল। আসরে বসিয়া সঙ্গে সঙ্গে প্রশ্নোত্তর গান রচনার ধারাও প্রবর্ত্তিত হইল। ইহাই 'কবিগান।' এইরূপ গীত যাঁহারা গান করিতেন তাঁহারা কবিওয়ালা নামে উল্লিখিত হইয়া থাকেন। অনেক কবিওয়ালা স্বয়ং গান রচনা করিতেন।

১। মূলে এইজাতীয় ছড়া প্রাকৃতে আর্য্যাচ্ছন্দে রচিত হইত বলিয়া এই নাম হয়।

২। আরবী শব্দ তরজ., অর্থ কাঠামো, রীতি, ধরণ।

৩। তুলনীয় মাণিকরাম গাঙ্গুলির কাব্যে ধর্ম্ম ঠাকুরের উক্তি, "নকল লেখিয়া দিব লাউসেনী দাঁড়া॥" 'দাঁড়া' শব্দকে কবিতার standard অর্থাৎ নির্দ্দিষ্ট আদর্শ বা রূপ বলিয়া ধরা যাইতে পারে। তাহা হইতে 'বাঁধা গান বা ছড়া' অর্থ আসিয়া গিয়াছিল।

যাঁহারা গাহিতেন না শুধু গান রচনা করিতেন, তাঁহাদের বলিত 'বাঁধনদার।' প্রাচীন কবিগান রচয়িতাদের মধ্যে প্রসিদ্ধতর হইতেছেন রাসু-নৃসিংহ, লালু-নন্দলাল, রঘুনাথ দাস, গোঁজলা গুঁই, হরেকৃষ্ণ দীঘাড়ী বা হরু ঠাকুর,[১] রাম বসু,[২] নিত্যানন্দ বৈরাগী,[৩] লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, রামপ্রসাদ ঠাকুর,[৪] নীলু ঠাকুর,[৫] আণ্টুনি ফিরিঙ্গি (Hensman Anthony),[৬] ভোলানাথ নায়ক বা ভোলা ময়রা,[৭] রমাপতি বন্দ্যোপাধ্যায় ইত্যাদি।[৮] উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে যে দুইজন কবি সাহিত্যে আধুনিক ধারায় সূত্রপাত করেন—ঈশ্বরগুপ্ত ও তাঁহার শিষ্য রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—ইঁহারা এবং আরও অনেকে কবির গান বাঁধিয়া দিতেন। বৈষ্ণবীদেরও কবির দল ছিল। ১৮২৬ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় গোলোকমণি দয়ামণি ও রত্নমণি এই তিনজন "নেড়ি কবি" গাওনা করিতে আসিয়া প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল।[১২] কবিগানের মধ্যে শ্লীলতার গণ্ডী প্রায়ই মানা হইত না, সুতরাং আধুনিক সাহিত্যের উদ্ভবের সঙ্গে সঙ্গেই ইহা লোপ পাইল। এখনকার দিনে পল্লীগ্রামে স্থানে স্থানে তর্জ্জা গান ও ইহার রূপান্তর নেটো বা লেটো ('নাটুয়া') গান অশিক্ষিত মুসলমান সমাজে প্রচলিত আছে।

কবিগাহনার প্রথম গান হইত "মালসী" বা ভবানী-বিষয়ক, তাহার পর সখীসংবাদ (ব্রজলীলা বিষয়ক), তাহার পর খেউড়, শেষে প্রভাতী।

পাঁচালী গানের উদ্ভব কীর্ত্তন গান হইতে। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমে কীর্ত্তনের পদ্ধতিতে কৃষ্ণলীলাত্মক পাঁচালী গান লিখিয়া নাম করিয়াছিলেন মধুসূদন

১। জন্ম ১১৪৫ (?) মৃত্যু ২৩ শ্রাবণ ১২৩১। ২। জন্ম আনুমানিক ১১৮৫ সাল, মৃত্যু আনুমানিক ১২৩৬ সাল। ৩। জন্ম আনুমানিক ১১৫৮ সাল, মৃত্যু আনুমানিক ১২২০ সাল।

৪। নীলুঠাকুরের বড় ভাই। ৫। মৃত্যু ২৬ কার্ত্তিক ১২৩২।

৬। আণ্টুনি ফিরিঙ্গির এই নাম হইতে অনুমান হয় যে তিনি পোর্ত্তুগীস জাতীয় ছিলেন না—সম্ভবতঃ তিনি মিশ্র ইউরোপীয় (ইংরেজ ?)-ভারতীয়, অথবা দেশী খ্রীষ্টান ছিলেন।

৭। সাহিত্যসংহিতা ১১, পৃ ২১-২৬, ২৮০-৯১, ৬৫৮-৬০। ৮। সংবাদপ্রভাকর পত্রিকায় [১২৬০-৬১] ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত প্রাচীন কবিওয়ালাদিগের বৃত্তান্ত প্রথম প্রকাশ করেন। অনাথকৃষ্ণ দেব প্রণীত বঙ্গের কবিতা দ্বিতীয় ভাগ [পৃ ২৯৫ হইতে]; বঙ্গভাষার লেখক [পৃ ৩৬৭-৮০]; শ্রীযুক্ত সুশীলকুমার দে রচিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত History of Bengali Literature in the Nineteenth Century দ্রষ্টব্য। ১২। সংবাদপত্রে সেকালের কথা তৃতীয় খণ্ড, পৃ ৫০।

কিন্নর ও রূপচাঁদ অধিকারী। পাঁচালীর পালা বাঁধা থাকিত এবং কীর্ত্তনের মতই ব্রজলীলাবিষয়ক হইত, ক্বচিৎ দেবীলীলাবিষয়ক। পাঁচালীর সহিত কীর্ত্তন গানের তফাৎ হইতেছে যে ইহাতে গায়ক অঙ্গভঙ্গি করিতেন, কখনও পাত্রপাত্রীর সাজও করিতেন এবং মধ্যে মধ্যে হাস্যরসের অবতারণা করিতেন। গানের ঢঙ্গেও কীর্ত্তনের বিশুদ্ধি ছিল না, ইহাতে খেম্‌টা ও কবিগান পদ্ধতির প্রভাবও অনেক পড়িয়াছিল। পাঁচালী হইতেই যাত্রার উদ্ভব হয়। যাত্রার সঙ্গে পাঁচালীর পার্থক্য এই মাত্র ছিল যে পাঁচালীতে মূল গায়ক বা পাত্র একটি, যাত্রায় একাধিক —সাধারণতঃ তিনটি। যাত্রার একটি বড় বিশেষত্ব ছিল নারদ মুনির "কাচ কাচিয়া" হাস্যরসের অবতারণা করা। 'যাত্রা' শব্দের মূল অর্থ হইতেছে দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে শোভাযাত্রা বা অন্যবিধ উৎসব। আধুনিক কালে "নদীর যাত", "মানাদের যাত" এই স্থলে মূল অর্থ অনেকটা বজায় আছে। তাহার পর অর্থ হইল দেবতার উৎসব উপলক্ষ্যে নাটগীতি, তাহা হইতে দেবলীলাত্মক অথবা অন্যকাহিনীময় নাটগীতি। প্রথমে যাত্রার বিষয় ছিল কৃষ্ণলীলা, তাহার মধ্যে বিশেষ করিয়া কালিয়দমন কাহিনী। এইজন্য যাত্রার নামান্তর ছিল কৃষ্ণযাত্রা বা কালিয়দমন। তাহার পর আসিল বিদ্যাসুন্দর যাত্রা। ক্রমে অপর কাহিনী যাত্রার পালার মধ্যে স্থান পাইতে লাগিল। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে যাত্রায় থিয়েটারী ঢঙ্গের আমদানী হয়, ফলে অধুনা যাত্রার মধ্যে প্রাচীনত্বের চিহ্ন অল্পই রহিয়া গিয়াছে।

পূর্ব্বেকার পাঁচালী গানের অশ্লীলতা কবিগানের অপেক্ষা বড় কিছু কম ছিল না। দাশরথি রায়ের হাতে পাঁচালীর কতকটা বিশুদ্ধীকরণ ঘটে। দাশরথি রায়[১] পাঁচালীরচয়িতাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এবং বহুপ্রসূতম। কৃষ্ণকমল গোস্বামী (জন্ম ১২১২, মৃত্যু ১২৬৪) পাঁচালী ও কৃষ্ণযাত্রার পালা লিখিয়া এবং কীর্ত্তনের ঢঙ্গে গাহিয়া পূর্ব্ব ও মধ্যবঙ্গে বিশেষ খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। ঠাকুরদাস দত্ত[২] এবং (১২০৮-১২৮৩) রসিকচন্দ্র রায়[৩] (১২২৭-১৩০০) পাঁচালীর পালা লিখিয়া নাম করিয়াছিলেন।

১। জন্ম ১২১২, মৃত্যু ১২৬৪। ২। ব-সা-প-প ৫, পৃ ২০৫-২২১।
৩। বঙ্গবাসী কার্য্যালয় হইতে ইঁহার গ্রন্থাবলী প্রকাশিত হইয়াছে।

কৃষ্ণযাত্রায় প্রথমযুগে নাম করিয়াছিলেন লোচনদাস অধিকারী, পরমানন্দ অধিকারী এবং দুই ভাই শ্রীদাম দাস ও সুবল দাস। তাহার পর গোবিন্দ অধিকারী।

উপরের আলোচনা হইতে দেখা গেল যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে পশ্চিমবঙ্গের ভাগীরথীতীর অঞ্চলে যে গীতনাটের রীতি দাঁড়াইয়া যায় তাহার তিনটি মূল ধারা ছিল। একটি ধারা আসিয়াছিল প্রাচীন আর্য্যা-তর্জ্জা গান হইতে, দ্বিতীয়টি প্রাচীনতর কীর্ত্তনগান হইতে এবং তৃতীয়টি অচিরোদ্ভূত খেউড় গান হইতে। তর্জ্জাগান ছিল বিতণ্ডা বা প্রতিযোগিতামূলক, ইহা হইতে দাঁড়া কবির সৃষ্টি হয়। কীর্ত্তনগান হইতে ঢপ (অর্থাৎ পাঁচালীর পূর্ব্বরূপ), তুক্ক (ভাঙ্গা কীর্ত্তন), পাঁচালী ও যাত্রার উদ্ভব হয়। খেউড় হইতে হয় আখড়াই। তর্জ্জা খেউড় ও পাঁচালীর সংমিশ্রণে হয় পরবর্ত্তী কালের কবিগান। আর হাফ্-আখড়াই আসে আখড়াই পাঁচালী ও কবিগানের মিলনের ফলে। পদাবলী কীর্ত্তন এবং প্রাচীন পদ্ধতির পাঁচালী (মন্দিরা চামর যোগে দেবমঙ্গলগীত রীতি) পূর্ব্বাপর চলিয়া আসিয়াছে বিশুদ্ধভাবে। কিন্তু পরবর্ত্তীকালের যে পাঁচালীর বিষয়ে উপরে আলোচনা করিলাম তাহা তর্জ্জা খেউড় দাঁড়া কবি কবিগান আখড়াই হাফ্-আখড়াইয়ের মত একেবারে বিলুপ্ত হইয়াছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না।

একষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

অধ্যাত্ম ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক গীতিঃ বাউল গান

অধ্যাত্মবিষয়ক গানের ধারা আউল বাউল দরবেশ সাঁই কর্ত্তাভজা গুরুসত্য ইত্যাদি সাধকসম্প্রদায়ের মধ্য দিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের আদিকাল (চর্য্যাপদের যুগ) হইতে অবিচ্ছিন্ন ভাবে চলিয়া আসিয়াছে। চর্য্যাপদের পর হইতে বাঙ্গালা গীতিকাব্য দুই ধারায় চলিয়া আসিয়াছে। একধারা অধ্যাত্ম ও দেহতত্ত্ব বিষয়ক ছড়া ও গান, অপর ধারা পদাবলী। পদাবলীর ধারা আবহমানকাল হইতে সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ মর্য্যাদা লাভ করিয়া আসিতেছে। অধ্যাত্ম ছড়া ও গানের ধারা সাহিত্যের আসরে প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই, শুধু শৈব সিদ্ধা কাহিনীর মধ্য দিয়া সাহিত্যের দেউড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছিল। ত্রয়োদশ চতুর্দ্দশ পঞ্চদশ ও ষোড়শ শতাব্দীতে লেখা অধ্যাত্ম গান কিছু পাওয়া যায় নাই বটে তবে সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে নাথপন্থীদের লেখা এইজাতীয় গান কিছু কিছু পাওয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনেক শিক্ষিত সাধারণ কবিও অধ্যাত্মবিষয়ক গান রচনা করেন, একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি। কিন্তু এই গান দেহতত্ত্বঘটিত বা mystic শ্রেণীর নহে, প্রধানতঃ ভক্তিমূলক। উনবিংশ শতাব্দীতে রচিত বাউল দরবেশ ইত্যাদি সম্প্রদায়ের লেখা গান অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। বটতলার প্রকাশকেরা প্রয়োজনের চাহিদায় এইজাতীয় সঙ্গীত কিছু কিছু পুস্তিকাকারে ছাপাইয়াছিলেন।

রূপকচ্ছলে আধ্যাত্মিক তত্ত্ব এবং অনুভূতির বর্ণনা খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীরও পূর্ব্ব হইতে পাওয়া যাইতেছে। এই গীতি ঠিক সাহিত্যের উদ্দেশ্যে রচিত হয় নাই। শিষ্যপরম্পরাক্রমে যাহাতে সম্প্রদায়গত সাধনতত্ত্ব অথবা যোগপ্রক্রিয়া চলিয়া আসিতে থাকে অথচ সাধারণ লোকের নিকট ব্যক্ত না হয় এই জন্য গানগুলি রচিত হইত symbolical অর্থাৎ 'সন্ধা' ভাষায়। অপভ্রংশে লেখা এবং প্রাচীনতম বাঙ্গালায় লেখা এই জাতীয় গীতি বা পদ ('চর্য্যাপদ') পাওয়া

গিয়াছে। এবিষয়ে পূর্ব্বে আলোচনা করা গিয়াছে। এই রীতি নাথপন্থী ও অন্যান্য গুহ্যসাধনপন্থী এবং সহজিয়া বৈষ্ণবদের লেখার মধ্য দিয়া চলিয়া আসিয়াছে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীতে বাউল দরবেশ সাঁই ইত্যাদি সাধকদিগের রচনায়। শুধু বাঙ্গালা দেশের মধ্যে নহে, তাবৎ উত্তরাপথের মরমিয়া সাধু সম্প্রদায়ের মধ্যে এইজাতীয় গীতি প্রচুর পরিমাণে রচিত হইয়াছিল। উদাহরণস্বরূপ কবীর দাদূ রইদাস জ্ঞানদাস বঘেলী ইত্যাদির নাম করা যাইতে পারে। এই সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু মুসলমান উভয়ধর্ম্মাবলম্বী লোক থাকিত। সাধারণ সমাজে এই শ্রেণীর লোকের কোন বিশেষ স্থান ছিল না এবং সাহিত্যেও এই আধ্যাত্মিক গীতি কোন মর্য্যাদা লাভ করে নাই। কিন্তু পল্লী অঞ্চলের অশিক্ষিত জনসাধারণ আবহমানকাল বাউল গানের মধ্য দিয়া কিঞ্চিৎ শিক্ষা ও প্রচুর আনন্দ পাইয়া আসিয়াছে। বাউল গান বাঙ্গালা দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত ছিল (এবং এখনও আছে), কোন অঞ্চল বিশেষে সীমাবদ্ধ নহে।

বাউল গানের যে সাহিত্যিক মূল্য থাকিতে পারে এ বিষয়ে শিক্ষিত বাঙ্গালীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন সর্ব্বপ্রথমে রবীন্দ্রনাথ। ইঁহার অনন্যসাধারণ রসপিপাসু কবিচিত্ত বাঙ্গালা দেশের বহু বহু অবজ্ঞাত ও তুচ্ছ বলিয়া পরিগণিত বস্তু ও বিষয়ের মধ্যে নব নব সৌন্দর্য্যের আবিষ্কার করিয়া বাঙ্গালীর রসভাণ্ডারের সম্পদ বহুগুণিত করিয়াছেন। বাউল গান সংগ্রহকার্য্যে রবীন্দ্রনাথের প্রচেষ্টা প্রথমতম এবং শ্রেষ্ঠতম। লালন সাঁই, গগন হরকরা, ঈশান যুগী ইত্যাদির গান সংগ্রহ ও প্রকাশ রবীন্দ্রনাথেরই কীর্ত্তি। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনও এ বিষয়ে বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন। শ্রীযুক্ত মুহম্মদ মন্‌সুরউদ্দীনও অনেকগুলি বাউল গান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন।

অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বাউল কবি—যাঁহাদের রচনা সাধারণ পাঠকের গোচরীভূত হইয়াছে—তাঁহাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছেন গঙ্গারাম বাউল, জগা কৈবর্ত্ত, পদ্মলোচন, বিশা ভূঞিমালী, কাঙ্গালী বাউল, সিরাজ সাঁই, চাকর বাউল ইত্যাদি।

বাউল গানের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত্ত কবিত্বের প্রকাশ আধুনিকপূর্ব্ব বাঙ্গালা সাহিত্যের গতানুগতিকতার বহু উর্দ্ধে উঠিয়াছে। নিম্নে কয়েকটি গান উদাহরণস্বরূপ উদ্ধৃত করিয়া দিলাম।

নিম্নে লিখিত পদটির রচয়িতা হইতেছেন গঙ্গারাম বাউল।

ব্রেথা তারে খুঁইজে মরা মাটির এই বৃন্দাবনে,
ভূইঞে নি সে রসবারি ধন, বসবে হিঞের সিংহাসনে।
ব্রেথা সে যমুনার কূলে, ব্রেথা সে কদম্বমূলে,
ব্রেথা কুঞ্জে মরিস ভুলে, দেখ না চেঞে আপন মনে॥
যৌবন তো নয় সস্তা হাতে ছড়িয়ে দিবি যাতে তাতে,
যাচ্ছে বয়ে দিনে রাতে, দেখ না খুঁজে সযতনে॥[১]

পদ্মলোচনের গানগুলি বিশেষভাবে symbolical বা রূপকারূঢ় হইলেও রচনা-ভঙ্গি সুন্দর। নিম্নে একটি পদ উদ্ধৃত হইল।

চলছে মানুষ বঙ্কনালে।
(আমার) হৃদয়কমল খুলবে যে দল, খবর তারে কে জানালে?
(ওরে) গন্ধ তাহার কে ছড়ালে?
(আমার) কমলরসে ডুববে বলে বন্ধু তুমি ভ্রমর হলে।
(এখন) চল্‌ছ ফিরে গুণগুণিয়ে কমল যে তার দল না মেলে॥[২]

উত্তরবঙ্গের লালন সাঁই ফকীর বহু গান রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার শিষ্যদের অনেকেও গান লিখিয়া গিয়াছেন। লালনের দুইএকটি গান উদ্ধৃত করিতেছি।

(আমার) আপন খবর আপনার হয় না।
(একবার) আপনারে চিনলে পরে যায় অচেনারে চেনা॥
(সাঁই) নিকট থেকে দূরে দেখায়,
(যেমন) কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়, দেখ না।
(আমি) ঢাকা দিল্লী হাতড়ে ফিরি, (আমার) কোলের ঘোর তো যায় না॥

১। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের সংগ্রহ [প্রবাসী শ্রাবণ ১৩২২, পৃ ৫৪১]।
২। ঐ, পৃ ৬৪০।

আত্মারূপে কর্ত্তা হরি, (মনে) নিষ্ঠা হলে মিলবে তাঁরি ঠিকানা।
বেদবেদান্ত পড়বে যত বাড়বে তত লক্ষণা ॥
আমি আমি কে বলে মন, যে জানে তার চরণ শরণ লও না।
সাঁই লালন বলে, মনের ঘোরে হলাম চোখ থাকিতে কাণা ॥[১]

আমি একদিনও না দেখিলাম তারে।
আমার বাড়ীর কাছে আরশীনগর এক পড়শী বাস করে॥
(ও সে) গ্রাম বেড়ে অগাধ পানী, (তার) নাই কিনারা নাই তরণী পারে।
(মনে) বাঞ্ছা করি, দেখব তারে, (আমি) কেমনে সে গাঁয়ে যাইরে॥
(ও সে) ক্ষণেক থাকে শূন্যের উপর, আবার ক্ষণেক ভাসে নীরে॥
(সেই) পড়শী যদি আমায় ছুত তবে যম যাতনা যেত দূরে।
(আবার) সে আর লালন একখানে রয়, থাকে লক্ষ যোজন ফাঁপরে ॥[২]

দধিপ্রিয় বলিয়া "দইখোরা" নামে প্রসিদ্ধ মুনিবউদ্দীন ফকীর শ্রীহট্টের লোক ছিলেন। ইঁহার একটি গানের অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

আমি মিছা কলঙ্কিনী সংসারে।
(সখী রে) পরাণবন্ধে ছাড়িয়া গেল আমারে॥
বৃন্দাবনে মধুপুরে হয় গো রসের খেলা, তাতে হয় মদনজ্বালা—হায় হায় হায়।
(ও গো) শুকনা কমল শুখাইয়া গেল, পায় না মধু ভমরায় ॥[৩]

সাধক কবিরা যে কত অনায়াসে উচ্চ আধ্যাত্মিক অনুভূতির কথা পরম কবিত্বের সহিত প্রকাশ করিয়াছেন তাহার একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ হইতেছে অজ্ঞাতনামা কবি রচিত নিম্নে উদ্ধৃত গান বা গানের অংশটি।

গুরু বলে কারে প্রণাম্ করবি মন ?
তোর অথিক গুরু পথিক গুরু, গুরু অগণন।
গুরু যে তোর বরণডালা, গুরু যে তোর মরণজ্বালা,

১। শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় কর্ত্তৃক সংগৃহীত [প্রবাসী ১৩২২ অগ্রহায়ণ, পৃ ২০৮]।
২। ঐ, পৃ ২৯৪।
৩। শ্রীহট্টের ইতিবৃত্ত চতুর্থ খণ্ড, পৃ ১৪৮।

গুরু যে তোর মনের ব্যথা, (যে) ঝরায় দুনয়ন ॥[১]

নিম্নোদ্ধৃত গানটির রচয়িতার নাম জানা নাই।

আগুন আছে ছাইয়ের ভিতরে।
(আগুন) বার করে নে ছাই নেড়ে ॥
(যদি) দৈবযোগে জন্মাল আগুন, কেউ কেউ বলেরে ভাই পোড়া শোলার গুণ,
(আগুন) ইস্পাতেতে মজুত ছিল (রে ভাই), মজুত আছে পাথরে ॥
রয় না আগুন পাকা দালানে, মাটির ঝিক তায় পোড়ে আগুনে,
(আগুন) ব্রাহ্মণেরি গুরু বটে (রে ভাই), আগুন শব্দে সব করে ॥

উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষিত ভদ্রসমাজে বাউল সুরে দেহতত্ত্ব ও অধ্যাত্ম বিষয়ক গানের রীতি প্রচলিত হয়। এই রীতির অন্যতম প্রধান প্রবর্ত্তক ছিলেন কুমারখালি গ্রামনিবাসী হরিনাথ মজুমদার।[২] ইনি বহু গান রচনা করিয়াছিলেন। ভণিতায় ইনি 'কাঙ্গাল' বা 'ফিকিরচাঁদ' নাম ব্যবহার করিতেন।

রবীন্দ্রনাথের অনেক গান ও গীতিকবিতার মধ্যে বাউল গানের ভাব ভঙ্গি ছন্দঃ ও সুর অপূর্ব্বভাবে রূপায়িত হইয়াছে। উপরে উদ্ধৃত "আগুন আছে ছাইয়ের ভিতরে" এই গানের সহিত গীতিমাল্যের নিম্নোদ্ধৃত গানটির সাধর্ম্ম্য আছে।

তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে,
এ আগুন ছড়িয়ে গেল সব খানে।
যত সব মরা গাছের ডালে ডালে নাচে আগুন তালে তালে
আকাশে হাত তোলে সে কার পানে ?
আঁধারের তারা যত অবাক্ হ'য়ে রয় চেয়ে,
কোথাকার পাগল হাওয়া বয় ধেয়ে।
নিশীথের বুকের মাঝে এই যে অমল উঠ্‌ল ফুটে স্বর্ণকমল
আগুনের কি গুণ আছে কে জানে ॥

১। শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেনের সংগ্রহ।
২। জলধর সেন মহাশয় বিরচিত কাঙ্গাল হরিনাথ গ্রন্থে ইঁহার জীবনী আলোচিত হইয়াছে।

গীতিমাল্যের আর একটি গানের ভাষা সামান্য কিছু অদল বদল করিয়া দিলে অনায়াসে বাউল গান বলিয়া চালানো যাইতে পারে। গানটির প্রথম পয়ার এই—

তুমি আমার আঙিনাতে ফুটিয়ে রাখো ফুল।
আমার আনাগোনার পথখানি হয় সৌরভে আকুল।
ওগো ঐ তোমারি ফুল।

দ্বিষষ্টিতম পরিচ্ছেদ

নূতন-পুরানোর যুগসন্ধি

বাঙ্গালা সাহিত্যে নূতন যুগের সম্ভাবনা জাগে উনবিংশ শতাব্দীর একেবারে প্রথম হইতে, গদ্যে পাঠ্যপুস্তক রচনার পদ্ধতিতে। উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশকের শেষভাগ হইতে যখন বাঙ্গালা সাময়িকপত্রের প্রবর্ত্তন হইল তখন হইতে গদ্যরীতি পাঠ্যপুস্তকের বাহিরে সাধারণ লোকব্যবহারের জন্য প্রতিষ্ঠিত হইল। বাঙ্গালা সাময়িকপত্রের মধ্য দিয়াই শিক্ষিত বাঙ্গালী নূতন সাহিত্যরসের আভাস পাইল। কিন্তু পুরাতন পদ্য পদ্ধতিও পূরামাত্রায় চলিতে লাগিল আরও চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বৎসর ধরিয়া। পদ্যবন্ধের সহিত পরিচয় আবহমান কাল হইতে, সুতরাং সাহিত্যে পদ্যবন্ধের রুচি তো একদিনে বদলাইবার নয়।

সাময়িকপত্রের সাহায্যে যে দুইজন সাহিত্যিক সর্ব্বপ্রথম প্রতিষ্ঠালাভ করিয়াছিলেন তাঁহারা উভয়েই ছিলেন একদিকে নব্য রীতির অগ্রদূত এবং অপরদিকে পুরাতন রীতির অনুরাগী এবং কতক বিষয়ে অনুসারী। সমাচারচন্দ্রিকার সম্পাদক ও অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ভবানীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় (১৭৮৭-১৮৪৮) গদ্যে পদ্যে এবং গদ্যেপদ্যে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন।[১] এই গ্রন্থগুলির শেষ তিনটি হইতেছে পুরানো পদ্ধতির অনুসরণে। যেমন, গয়াতীর্থবিস্তার (বায়ুপুরাণ অবলম্বনে পদ্যে রচিত ১২৩৮), আশ্চর্য্য উপাখ্যান (কালীশঙ্কর রায়ের জীবনী বিষয়ে পদ্যে রচিত ১২৪২) এবং পুরুষোত্তমচন্দ্রিকা (জগন্নাথতীর্থ বিষয়ে গদ্যে পদ্যে রচিত ১৭৬৬ শকাব্দ ১২৫১ সাল)। প্রথমবয়সের লেখা তিনখানি বই পদ্যে ও গদ্যেপদ্যে রচিত হইলেও সেগুলি নূতন পদ্ধতির রচনা। কেন না সেগুলি নূতন সাহিত্যিক দৃষ্টিভঙ্গীতে রচিত। সমাজের কদর্য্যতা দেখাইবার উদ্দেশ্যে রচিত ব্যঙ্গাত্মক নিবন্ধগুলির মধ্যেই বাঙ্গালা সাহিত্যে নবযুগোচিত দৃষ্টিভঙ্গির প্রথম পরিচয়

১। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস হইতে পুনর্মুদ্রিত কলিকাতা কমলালয়ের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

পাই। নববাবুবিলাস (১৮২৩ ?) গদ্যেপদ্যে রচিত, কলিকাতা কমলালয় (১২৩০) ও নববিবিবিলাস (১৮৩০ ?) প্রধানতঃ গদ্যে এবং অংশতঃ পদ্যে রচিত, আর দূতীবিলাস (১৭৪৭ শকাব্দে) সম্পূর্ণভাবে পদ্যে রচিত। হিতোপদেশ অনুবাদ গ্রন্থ, এটি গদ্যে রচিত (১৭৪৫ শকাব্দ ১২৩০ সাল)।

সংবাদপ্রভাকরের[১] সম্পাদক ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত (১৮১২-১৮৫৯) মুখ্যভাবে কবি ছিলেন। তাঁহার আদর্শ ছিলেন ভারতচন্দ্র। এই হিসাবে ঈশ্বর গুপ্ত প্রাচীনপন্থী। তাঁহার নূতনত্ব হইতেছে কাব্যের আশয় নির্ব্বাচনে। ব্যঙ্গরচনা তো ছিলই, কেন না ইহাতে তাঁহার কবিপ্রকৃতির প্রধানভাবে প্রকাশ পাইয়াছে। তাহা ছাড়া নীতি দেশপ্রিয়তা সমাজসেবা ঈশ্বরভক্তি ইত্যাদি বিষয়ে কাব্য লিখিয়া এবং ইংরেজী কবিতার অনুবাদ বা ভাবালম্বন করিয়া নূতন পন্থার সম্ভাবনা জাগাইলেন। ঈশ্বরচন্দ্রের প্রধানতম কৃতিত্বের পরিচয় তাঁহার লেখায় পাই না, পাই তাঁহার সাহিত্যিক শিষ্যদিগের নির্ব্বাচনে ও অনুশীলনে। আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্যের যাঁহারা আদি পথিকৃৎ তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন ঈশ্বরগুপ্তের সাহিত্য শিষ্য অথবা ভাবশিষ্য। ইঁহাদের অন্যতম রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় আধুনিক বাঙ্গালা সাহিত্য ধারার প্রথম কবি।

পূর্ব্ববর্ত্তী কবিদিগের পরিচয়সংগ্রহ ও নষ্ট রচনা উদ্ধার প্রচেষ্টায় ঈশ্বরচন্দ্রের পূর্ব্বগামী কেহই ছিলেন না।[২] এ হিসাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রথম ইতিহাস-সংগ্রাহকের সম্মান তাঁহারই প্রাপ্য। ১৭৫৫ শকাব্দে ১৮৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ঈশ্বরচন্দ্র রামপ্রসাদের কালীকীর্ত্তন প্রকাশ করেন।[৩] ইহার ভূমিকার কিছু অংশ সংস্কৃতে বেশীর ভাগ বাঙ্গালা পদ্যে রচিত। ইহা হইতে বোঝা যাইবে, পদ্য রচনার

১। প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৬ মাঘ ১২৩৭ সাল। প্রথমে ইহা সাপ্তাহিক ছিল। ১লা আষাঢ় ১২৪৬ সাল হইতে দৈনিকরূপে প্রকাশিত হইতে থাকে।

২। সংবাদপ্রভাকরে [১২৬০-৬১] রামপ্রসাদ, নিধুবাবু, নিত্যানন্দ বৈরাগী, হরু ঠাকুর, রাসু-নৃসিংহ, লক্ষ্মীকান্ত বিশ্বাস, আজু গোঁসাই, গোঁজলা গুঁই, কৃষ্ণ মুচি, লালু-নন্দলাল ইত্যাদি গীতিকবি ও কবিওয়ালাদের বৃত্তান্ত সংগৃহীত ও প্রকাশিত হয়।

৩। ব-সা-প-প ৪৪, পৃ ৪৭-৫০।

instinct তখনও কত প্রবল ছিল।[১] ঈশ্বর গুপ্তের দ্বিতীয় গ্রন্থ "কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত" প্রকাশিত হয় ১২৬২ সালে। তৃতীয় গ্রন্থ প্রবোধপ্রভাকর ১২৬৪ সালে ১ চৈত্র প্রকাশিত হয়। প্রবোধপ্রভাকরের নিবন্ধগুলি গদ্যেপদ্যে রচিত। ইহাতে পিতাপুত্রের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে নীতি ও ধর্ম্ম শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে।

চতুর্থ গ্রন্থ হিতপ্রভাকর কবির জীবদ্দশাতেই মুদ্রিত হইতে থাকে, কিন্তু প্রকাশিত হয় মৃত্যুর দুই বৎসর পরে ১১ই চৈত্র ১২৬৭ সালে। ইহাও গদ্যেপদ্যে রচিত, তবে পদ্যের ভাগই বেশী। প্রথম অংশ হইতেছে উপক্রমণিকা বা "হিতপ্রভাকর" [১-২৭ পৃষ্ঠা], বাকী অংশ [২৮-১৯২ পৃষ্ঠা] হিতোপদেশের অনুবাদ বা "হিতহার"। হিতপ্রভাকর ঈশ্বর গুপ্তের জীবদ্দশাতেই মুদ্রাঙ্কিত হইতেছিল। প্রবোধপ্রভাকর প্রথম খণ্ডের বিজ্ঞাপনে ঈশ্বরচন্দ্র লিখিয়াছিলেন, "হিতপ্রভাকর নামে গদ্য পদ্য পরিপূরিত একখানি গ্রন্থ চারি খণ্ডে প্রকাশ করণের অভিলাষ করিয়া তাহার প্রথম খণ্ড মুদ্রিত করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি, ইহাতে কেবল নীতি এবং হিতোপদেশাদি বহুবিধ শিবকর বিষয় লিখিত হইয়াছে···।"

১৮৬২ খ্রীষ্টাব্দ হইতে কবির ভ্রাতা রামচন্দ্র গুপ্ত ঈশ্বরচন্দ্রের কবিতাগুলির একটি সঙ্কলন খণ্ডশঃ প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন।[২]

কৃষ্ণ মিশ্র প্রণীত সংস্কৃত নাটক প্রবোধচন্দ্রোদয় অবলম্বনে রচিত "বোধেন্দু-বিকাস" রামচন্দ্র গুপ্ত কর্ত্তৃক ১২৭০ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথমে সংবাদপ্রভাকরে ১২৬৪ সালে ১লা বৈশাখ হইতে ১লা ভাদ্র অবধি সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। প্রবোধপ্রভাকরের বিজ্ঞাপনে ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন, "যাহা গত ১ বৈশাখের

১। সাময়িকপত্রের সম্পাদকেরাও অনেক সময় ভাবাতিশয্যে পদ্যে কলম হাঁকাইতেন [সমাচার-দর্পণ ২ মার্চ্চ ১৮২২, সংবাদপত্রে সেকালের কথা ৩, পৃ ৪৬ দ্রষ্টব্য]। প্রথম বাঙ্গালী সংবাদপত্র প্রবর্ত্তক গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্য্য চিকিৎসার্ণব নামে একটি বৈদ্যকগ্রন্থ পদ্যে রচনা করেন। বইটি সম্ভবতঃ ১৮২০ খ্রীষ্টাব্দের দিকে প্রকাশিত হইয়াছিল [ব-সা-প-প ৪৪, পৃ ৮-৯]।

২। ব-সা-প-প ৪৪, পৃ ৫২-৫৩। ১২৯২-৯৩ সালে বঙ্কিমচন্দ্রের সম্পাদকতায় গোপালচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক একটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়। তাহার পর ১৩০৬ সালে বসুমতী কার্য্যালয় হইতে একটি এবং ১৩০৮ সালে মণীন্দ্রকৃষ্ণ গুপ্তের সম্পাদকতায় গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক আর একটি সংগ্রহ প্রকাশিত হয়।

প্রভাকরে প্রকাশারম্ভ হইয়া ১ ভাদ্রের প্রভাকরে শেষ হইয়াছে,—তাহার কোনো কোনো স্থান পুনর্ব্বার সংশোধিত পরিবর্ত্তিত এবং নূতনরূপে রচিত হইয়া পুস্তকাকারে মুদ্রিত হইতেছে ·····মূল গ্রন্থে যেরূপ আছে তাহা হইতে আমরা বিস্তর বাহুল্য রচনা করিয়াছি ···· যাঁহারা নাট্যক্রীড়ায় অনুরূপ প্রদর্শনে অনুরত হইবেন তাঁহাদিগের কার্য্য সাধনার্থে প্রত্যেকের বিচারাদি উক্তির শেষ ভাগ অতি সংক্ষেপেই লিখিয়াছি।"

কালীকীর্ত্তন ছাড়া ঈশ্বর গুপ্তের সকল গ্রন্থ পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবার পূর্ব্বে সংবাদপ্রভাকরে ধারাবাহিকভাবে বাহির হইত। প্রবোধচন্দ্রোদয় নামক সংস্কৃতরূপক নাটকের অনুবাদ বোধেন্দুবিকাশও প্রথমে সংবাদপ্রভাকরে প্রকাশিত হইয়াছিল। বই আকারে ছাপিবার পূর্ব্বে ঈশ্বরচন্দ্র অনেক অংশ পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত করিয়াছিলেন এবং জীবদ্দশাতেই ইহা ছাপাইতে আরম্ভ করিয়াছিলেন।[১] ১২৭০ সালে ঈশ্বরচন্দ্রের অনুজ রামচন্দ্র গুপ্ত প্রথম তিন অঙ্ক মাত্র প্রকাশ করেন।[২]

বোধেন্দুবিকাশ নাট্যাকারে গ্রথিত। কবির হয়ত আশা ছিল যে কোনো দিন ইহা অভিনীত হইতে পারে, সেইজন্য ইহাতে অনেকগুলি গান ও মৌলিক কবিতা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। এই গান ও কবিতাগুলির হালকা ভাষা ও ছন্দ উপভোগ্য। গ্রন্থটি ঈশ্বর গুপ্তের লেখার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। বোধেন্দুবিকাশ সাধারণ পাঠকের অপরিচিত বলিয়া ইহার কিছু কিছু অংশ উদ্ধৃত করিয়া কাব্যটির কিছু বিস্তৃত পরিচয় দিতেছি।

প্রস্তাবনায় নটীর উক্তি "প্রকৃতি" ছন্দে—

ও কথা, আর্ বোলো না, আর্ বোলো না, বল্‌ছ বঁধু, কিসের ঝোঁকে ?
এ বড়, হাসির্ কথা, হাসির্ কথা, হাস্‌বে লোকে, হাস্‌বে লোকে ॥
বল হে, জ্বোল্‌বো কত, বোল্‌বো কত, বোল্‌তে হোলো, মনের্ দুখে।
মনের্ দুখে।
এ বড়, অনাসৃষ্টি, বিষম সৃষ্টি, সুধাবৃষ্টি, সাপের্ মুখে।
সাপের্ মুখে ॥ পৃ ৫ ॥

জীবনস্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ কবিতাটির প্রথম দুই কলি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

১। অনুমান হয়, কবির জীবদ্দশায় ২৪ পৃষ্ঠা অবধি ছাপা হইয়াছিল।
২। "সিমুলিয়া নয়ানচাঁদ দত্তের ষ্ট্রীট নং ৫৪" হইতে।

"বীরবিলাসিনী" ছন্দে কামের বক্তৃতা—

কোথা গেল দুরাচার, দেখিতে না পাই আর,
প্রতিকার করি তার, উচিত যা হয় রে, উচিত যা হয়॥
মহামোহ-নাম যথা, ত্রিভুবন কাঁপে তথা,
ছোট-মুখে বড়-কথা, প্রাণে নাহি সয় রে, প্রাণে নাহি সয়॥
ইত্যাদি॥ পৃ ৯॥

দম্ভের বক্তৃতা, "আয় রৌদ্র হেনে, ছাগল দেব মেনে, ছন্দ"—

এই হাত ছাড়্য়ে[১]। গোঁপ বুক্ চাড়্য়ে॥
মৃত্যুবাড়্ বাড়্য়ে। ধেয়ে কোঁক্ ভাঁড়্য়ে॥
ফণিফণা নাড়্য়ে। কোথা যাবে আড়্য়ে॥
ধরাতলে পাড়্য়ে। কাটফাঁড়া ফাঁড়্য়ে॥
কোসে কোসে কাড়্য়ে। এক গাড়ে গাড়্য়ে॥ ইত্যাদি। পৃ ৩১॥

"ধিন্তাধিনা পাকালোনা ছন্দ"—

নোড়বো না তো, লোড়্বো সুখে। পোড়্বো রূকে, চোড়্বো বুকে॥
শত্রু যদি, আসে ঝুঁকে। থাব্ড়া কোসে, মার্ব্ব বুকে॥
জোম্কে আমি, বোল্বো যবে। চোম্কে যাবে, দেবতা সবে॥
ধোম্কে দেব, উচ্চ রবে। সূর্য্য শশী, থোম্কে রবে॥
তুচ্ছ লোকে উচ্চ চলে[২]। পুচ্ছ ধরে, কুচ্ছ ছলে॥
রঙ্গ দেখে, অঙ্গ জ্বলে। দণ্ড দেব, ভণ্ড দলে॥
মেল্বো আঁখি, ভঙ্গি ঠেরে। ঠেল্বো পায়ে, মেরে মেরে॥
খেল্বো খেলা, শত্রু ঘেরে। হেল্বো নাতো, ফেল্বো সেরে॥ পৃ ৩২।

অহঙ্কারের বক্তৃতায় [পৃ ৩৩-৩৫] সে যুগের নব্য বাবুদের উপর কবি বেশ একহাত লইয়াছেন—

কেমন্ পুকুর, কেমন্ কুকুর, কেমন্ হাতের কোড়া।

১। উচ্চারণ-হইবে 'ছাইড়ে।' যেমন 'নিবিয়ে' স্থলে 'নিব্বে', 'হারিয়ে' স্থলে 'হাইরে' উচ্চারণ কোন কোন অঞ্চলে ও সমাজে দেখা যায়। ২। পাঠ 'ছলে।'

কেমন্ এ ঘড়ি, কেমন্ এ ছড়ি, কেমন্ ফুলের তোড়া ॥
দেখ না কেমন্, চিকন বসন, পেয়েছি আমিই সবে।
মনের মতন, এমন রতন, আর কি কাহারো হবে ?
সবে আঁখি পাড়ে, আমার এ ঝাড়ে, দোষ দিতে পারে কেটা।
আলো দেখে ঝাড়ে কটু যদি ঝাড়ে ঝাড়ের কলঙ্ক সেটা ॥ পৃ ৩৫ ॥

নিম্নে উদ্ধৃত বিভ্রমাবতীর গানটি বাউল গীতের parody, এককালে এটি সুপ্রচলিত ছিল।

দিন্ দুপুরে চাঁদ্ উঠেছে, রাৎ পোয়ানো ভার।
হোলো পুন্নিমেতে আমাবস্যা, তেরো-পহর্ অন্ধকার ॥
এসে বেন্দাবনে বলে গেল, বামী বোষ্টমী।
একাদশীর দিনে হবে, জন্ম-অষ্টমী ॥
আর্ ভাদ্দর্ মাসের্ সাতই পোষে, চড়ক্ পূজোর্ দিন্ এবার্ ॥
সেই ময়্রা মাগী মোরে গেল, মেরে বুকে শূল,
বামুন্গুলো ওষুদ নিয়ে মাথায় বোচ্চে চুল,
কাল্ বিষ্টিজলে ছিষ্টি ভেসে, পুড়ে হোলো ছারেখার ॥
ঐ সূজ্জিমামা পূব্ব্ দিগে, অস্তে চোলে যায়,
উত্তুর-দখিন্ কোণ্ থেকে আজ, বাতাস লাগ্চে গায়।
সেই রাজার্ বাড়ীর্ টাটু ঘোড়া, শিং উঠেছে দুটো তার ॥
ঐ কলু রামী, ধোপা শামী, হাস্তেছে কেমন্।
এক্ বাপের্ পেটেতে এরা, জন্মেছে কজন্।
কাল্ কাম্রূপেতে কাক্ মরেছে, কাশীধামে হাহাকার ॥ পৃ ৬৫-৬৬ ॥

দেশের ও সমাজের মধ্যে কবি যেখানে অনাচার ও মূঢ়তা দেখিতেন সেইখানেই ব্যঙ্গের তীব্র কষাঘাত করিতেন। ঈশ্বরচন্দ্রের এই বৈশিষ্ট্য তাঁহার রচনার মূল্য বৃদ্ধি করিয়াছে। নানা বিষয়ে দেশের আচারবিচার ও ধর্ম্মমতের ভণ্ডামিকে কটাক্ষ করিয়া লেখা নিম্নোদ্ধৃত গানটিতে ব্যঙ্গোক্তির কড়া সুর না থাকায় বিশেষ উপভোগ্য হইয়াছে।

প্রাণে, জ্বোল্‌তে গেলেই বোল্‌তে হয়।
পোড়া দেশের্‌ লোকের্‌, আচার দেখে, চোল্‌তে পথে করি ভয়।
ঢুকে কারাগারে, সাধু হোলো চোর্‌,
বন্দিগুলো ফন্দি করে, পালায়্‌ ভেঙে দ্বোর্‌।
এক ফাঁকা-ঘরে, সোল্‌তে জ্বলে, জোর্‌ বাতাসে সে, কি, রয় ?
ওরে পাঁচঘরা আর্‌ দশঘরার মেলা,
সাৎগাঁয়ের লোক এক গাঁয়েতে কোর্ত্তেছে খেলা।
কোরে ঢলাঢলি দশ্‌দিগেতে, ঢোল্‌তে থাকে সমুদয়॥
এরা অগ্রদ্বীপের্‌ মেলা কোরে সায়্‌,
নেড়া হোয়ে নবদ্বীপে চোলে যেতে চায়্‌।
কেটা জলের্‌ ঘরে আগুন্‌ জ্বালে ? সহজ্‌ বড় সহজ্‌ নয়॥
হয়, দেখ্‌তে দেখ্‌তে সাৎ সমুদ্র পার্‌,
কাছে থাক্‌তে পারে, রাখ্‌তে পারে, শক্তি আছে কার্‌,
ওরে, মুখের্‌ বাহির হোলে পরে, সাধ্য কি আর্‌ কথা কয় ?
সুখে প্রেমানন্দ-হাটে কর হাট্‌,
আমার্‌ আমার্‌, তোমার্‌ তোমার্‌, ছাড়ো মিছে ঠাট্‌,
এই ভাঙা হাটে ঢেঁড্‌রা পিটে, দিচ্ছ কারে পরিচয় ?
দেখি সমভাবে, সব্‌গুলো অসৎ,
কেউ বেঁচে থেকে সৎ হোলো না, মোরে হবে সৎ,
যার্‌ মাথা নাই তার্‌ মাথা ব্যথা, খেপেছে সব জগৎময়॥ পৃ ৯৭।

ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত কবি হইলেও কার্য্যতঃ ছিলেন সংবাদপত্রসেবী বা journalist, সুতরাং যেখানে তিনি নীতিশিক্ষা দিতে চেষ্টা করেন নাই সেখানে তাঁহার কবিতা journalism রীতিকে ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই। কবি হিসাবে ঈশ্বরগুপ্তের দাবী বেশী নয়, কিন্তু ছড়া-রচয়িতা হিসাবে তাঁহার আদর বহুকাল থাকিবে।

সংযোজন ও সংশোধন

পৃ ১৭। রামচরিত কাব্যের কবি অভিনন্দ সম্ভবতঃ দেবপালদেবের আশ্রিত ছিলেন। ইহা সত্য হইলে এইটিই বাঙ্গালী কবির লেখা প্রথম মহাকাব্য। কাব্যটিতে বাঙ্গালাদেশে প্রচলিত রামচরিত কাহিনীর অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য—দেবীমাহাত্ম্যখ্যাপন—দেখা যায় [অলকা অগ্রহায়ণ ১৩৪৫, পৃ ২৪০-৪১ দ্রষ্টব্য]।

পৃ ২৯। ১৪ ছত্রে 'সাপক্ষে' স্থলে 'সপক্ষে' হইবে।

পৃ ২০২। ১৪ ছত্রে 'ছিল' স্থলে 'দিল' হইবে।

পৃ ২২৫। "যশোদার বাৎসল্য" নামে জ্ঞানদাস ভণিতায় একটি পালা পাওয়া গিয়াছে। পদগুলি বাঙ্গালায় লেখা। কবি কোন অর্ব্বাচীন জ্ঞানদাস ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। শ্রীমান্ সুকুমার ভট্টাচার্য্য, এম্-এ, পদগুলি সম্পাদন করিতেছেন।

পৃ ৩৫৩। ৯ 'বর্ণিত' বাদ যাইবে।

পৃ ৩৮৭। ১৯ ছত্রের শেষে 'সহিত' বাদ যাইবে।

পৃ ৪৩২। ৬ ছত্রে 'সাতসতীনের' স্থলে 'সতাসতীনের' হইবে। ৯ ছত্রে 'ব্যাঙ্গোক্তি' স্থলে 'ব্যঙ্গোক্তি' হইবে।

পৃ ৪৬৩। ১ ছত্রে 'হইলে' স্থলে 'হইতে' হইবে।

পৃ ৪৯৯। ৩ ছত্রে 'বৃত্তিজলদস্যু' স্থলে 'জলদস্যুবৃত্তি' হইবে।

পৃ ৫১৬। ১৩ ছত্রে 'বাক্যকালে' স্থলে 'বাল্যকালে' হইবে।

পৃ ৫২১। ১৯ ছত্রে 'কবি কর্ণপুর' স্থলে 'কবি-কর্ণপূর' হইবে। এইরূপ অন্যত্র।

পৃ ৬১২। ২ পাদটীকা। এই ফতোয়াবাদ পরগনা চাটিগ্রামের অন্তর্গত হইতেও পারে।

পৃ ৬১৩। ১ পাদটীকা। হবিবি প্রেসের সংস্করণে নিম্নোক্তরূপ বৃত্তান্ত পাওয়া যায়। বলা বাহুল্য পাঠ যথাসম্ভব সংশোধন করিয়া দিলাম।

মুল্লুক ফতোয়াবাদ গৌরবে প্রধান। তাহাতে জালালপুর অতি রম্যস্থান॥
বহু গুণবন্ত লোক খলিফা ওলমা। কতেক কহিব সেই দেশের মহিমা॥
মজলিস কুতুব তাহাতে অধিপতি। আমি দীনহীন তান পাত্রের সন্ততি॥
কার্য্যহেতু যাইতে পন্থে বিধির ঘটন। হার্ম্মাদের নৌকা সঙ্গে হৈল দরশন॥
বহু যুদ্ধ আছিল সহীদ হৈল তাতে। রণক্ষেত্রে শুভযোগে আইলুম এথানে॥
কহিতে অনেক কথা দুঃখ আপনার। রোসাঙ্গে আসিয়া হৈলুম রাজ-আসোয়ার॥
বহু মোসলমান সব সঙ্গেতে বৈসন্ত। সদাচার পণ্ডিত কুলীন গুণবন্ত।
সবে কৃপা করেন্ত সম্ভাষা বহুতর। আলিম ওলমা কহি করেন্ত আদর॥
মুখ্য পাটেশ্বরীর অমাত্য দুইজন। সত্যবাদী তৃতীয় ঠাকুর সুমাগন॥
ভাগ্যোদয় হৈল মোর বিধি পরসন্নে। দুঃখনাশহেতু তার সহিত মিলনে॥
অনেক আদর করি কহি সম্ভাষণে। সদত পোষেন্ত মোরে অন্নবস্ত্র দানে॥
মধুর আলাপে বশ হৈল মোর মন। তান গুণসূত্র হৈল গ্রীবাতে বন্ধন॥
গুণিগণ থাকন্ত তাঁহার সভা ভরি। গীতনাট যন্ত্রতন্ত্র রঙ্গঢঙ্গ করি॥
নানান প্রসঙ্গ কথা কহিয়া সতত। তান সভামধ্যে থাকি হৈয়া সভাসদ॥
একদিন মহাশয় বসিয়া আসনে। নানা প্রসঙ্গ কথা কহে গুণিগণে॥
কেহ গায় কেহ বায় কেহ খেলে খেলা। সুধাকর বেড়ি যেন তারাগণ মেলা॥
হেনকালে শুনি পদ্মাবতীর কথন। পরমহরিষ হৈল পাত্রবরমন॥
কৌতুকে আদেশ কৈল পরমহরিষে। পান্থে দ্বিজরাজ যেন অমিয়া বরিষে॥
এই পদ্মাবতীরসে বশ রসকথা। হিন্দুস্থানী ভাষে শিখে রচিয়াছে পোথা॥
রোসাঙ্গেতে আন লোক না বুঝে এ ভাষ। পয়ার রচিলে পূরে সবাকার আশ॥
যেহেন দৌলৎ কাজী চন্দ্রানী রচিল। লস্কর উজীর আশরফে আজ্ঞা দিল॥
তেন পদ্মাবতী রচ মোর আজ্ঞা ধরি। হেন কথা শুনি মনে বহু শ্রদ্ধা করি॥
তাহার আদেশমাল্য পরিয়া মস্তকে। অঙ্গীকার কৈল আমি রচিতে পুস্তকে॥

পৃ ২১-২২

সয়ফুলমুলুক বদিউজ্জমালে [হবিবি প্রেস, ১৩৩৯] আলাওল বলিয়াছেন,

হই পরদেশী আমি আলাওল হীন। রোসাঙ্গে হইনু বন্দী আপনা কুদিন।
গৌড় মধ্যে প্রধান ফতেয়াবাদ দেশ। আলিম ওলমা হিন্দু বৈসয় বিশেষ॥
বহুল দানিশমন্দ খলিফা আলিম। আলিম জনের কথা দিতে নাহি সীম॥
হিন্দুকুলে ব্রাহ্মণ বৈসেন যাতে সতি। মধ্যেতে গোপাট আর শিব ভাগীরথী॥
সভার কুতব সেই রাজ্যের ঠাকুর। তাহান অমাত্যসুত আমি যে পামর॥
দৈবগতি কার্য্যহেতু যাইতে নৌকাপথে। দরশন হৈল হারামাদের সহিতে॥
সহীদ হইল বাপ যুঝি বহুতর। রণক্ষেত্রে রোসাঙ্গে আইলুম একেশ্বর॥
নিজ দুঃখ কতেক কহিনু বিবরিয়া। রাজ-আসোয়ার হৈলুম এথাতে আসিয়া॥
তালিব-আলিম বলি আমিরে ফকিরে। অন্নবস্ত্র দিয়া আমা পোষেন্ত আদরে॥
আজ্ঞা পাই রচিলুম পুস্তক পদ্মাবতী। যতেক আছিল মোর বুদ্ধির শকতি॥
দ্বিতীয় আদেশ তান হইল যেনমতে। সয়ফুলমুলূক কথা পুস্তক রচিতে॥

ইত্যাদি। পৃ ৯॥

পৃ ৬১৪। ২ পাদটীকা হবিবি প্রেস হইতে প্রকাশিত দারাসেকন্দরনামা (১৩৩৪) পৃ ৩-৬ দ্রষ্টব্য। ভণিতাংশ এইরূপ—

গুরু সে পরমব্রহ্ম গুরুকার্য্য মূল। ঈশ্বর সদয় গুরুকৃপা হন্তে কুল॥
মজলিস কুতুব (?) রাজগুণের সম্পদ। কাব্যরসে শুভকুল মহাবিদগধ॥
আয়ু যশ বৃদ্ধি হৌক সতত কল্যাণ। তাহান আরতি হীন আলওলে গান॥

পৃ ৬৬৬। শেষ ছত্র। খেলারামের বাসস্থান গড় মান্দারণের নিকট পশ্চিমপাড়া গ্রামে ছিল বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। এখানে রামদাস আদকও শেষ-জীবনে বাস করিয়াছিলেন।

পৃ ৬৮২। ৪ পাদটীকা। সাহিত্যসংহিতা পঞ্চম খণ্ড,: পৃ ৫২৩-৫৩৫।

পৃ ৬৮৩। ৬ ছত্রের পাঠান্তর—

কুবাক্যকণ্টকে কত বিন্ধিল হৃদয়।
বিষম বন্ধনে বন্দী রাখিল নির্দ্দয়॥

৭ ছত্রের পর

জলযোগে যাপি নিশি উঠিয়া প্রভাতে।
গুপ্তভাবে চলিলাম মাতুলবাড়ীতে ॥
করিলাম উষাযাত্রা শশিসুতবারে।
শুভলগ্ন শুভক্ষণ সংযোগ সুসারে ॥

১০ ছত্র হইতে পাঠান্তর—

পথে যেতে হেরে কত শত সুলক্ষণ। অপসব্য আঁখি শীর্ষ করিছে স্পন্দন ॥
ঘুরে বুলে শঙ্খচিল মাথার উপর। সব্যে শিবা দক্ষে দেখে উরু অজগর ॥
জীবনবিহীন বিল শবের সদন। চৌদল ধরিয়া মীন করে আকর্ষণ ॥
গাভী সনে নব বৎস আগুপাছে ধায়। দধিভাণ্ড কক্ষে করি গোয়ালিনী যায় ॥
শেওড়া শাখায় ফুটে চারু চাঁপা ফুল। অনুভবে হবে হেথা দেব অনুকূল ॥
তুলিল পাবকরুচি পুষ্প মনোহর। বিনা সূত্রে হার হৈল পরমসুন্দর ॥
ভয়ে ভীত দূরস্থিত করিয়া তাহারে। ত্বরা করি চলি যায় কম্পিত-অন্তরে ॥

১৮ ছত্র হইতে পাঠান্তর—

শ্বেত অশ্বে আরোহিয়া রাউতের বেশে।
দয়া করি দিলা দেখা দীন রামদাসে ॥
... ...
মনে ভাবে রামদাস আতঙ্কে আকুল ॥
দেশে খাজনার তরে পলাইয়া যাই।
বিদেশে বেগারী বুঝি করিল সিপাই ॥

২২ ছত্রের পর—

কাঁপিল সর্ব্বাঙ্গ প্রাণ উড়িল তরাসে।
সিপাই নিকটে আসি কহে রোষভাষে ॥

পৃ ৬৮৪। ১২ ছত্রের পর পাঠান্তর—

আচম্বিতে অলক্ষিতে হৈল অন্তর্দ্ধান। জ্বর এল গায়ে হায় আকুল পরাণ ॥
মনে চিন্তে পথপ্রান্তে দুঃখ কেন পাই। কাণাদীঘীর জল খেয়ে মামাবাড়ী যাই ॥

সুযুক্তিসম্ভব বুঝি করিল গমন। দীঘীর উত্তর ঘাটে দিল দরশন ॥
ঢল ঢল কমল অমল অতিশয়। হেরিয়া হইল বড় আনন্দহৃদয় ॥
সাগ্রহে সলিল পানে নামিল ত্বরায়। অভাগা পরশে হায় জীবন শুখায় ॥
বিলাপ করিয়া রাম কান্দে উচ্চৈঃস্বরে। হায় হায় কোথা যাই মরিনু এবারে ॥
এইরূপে রামদাস করিছে রোদন। নবীন ব্রাহ্মণ এক কৈল আগমন ॥
বিস্মিত হইয়া রাম রোদন সম্বরে। কনকভৃঙ্গার তার শোভা পায় করে ॥
সুতপ্ত সুবর্ণ সম অঙ্গের বরণ। শুভ্র বস্ত্র যজ্ঞসূত্র অতি সুশোভন ॥

২৫ ছত্রের পাঠান্তর

জাড়গ্রামের কালু বামুন হই আমি ॥

২৬ ছত্রের পর

সুচ্ছন্দঃ-বন্ধন গীত সুশ্রাব্য সবার। শ্রীধর্ম্মমাহাত্ম্য মর্ত্ত্যে হইবে প্রচার ॥
তুমি যে পরমভক্ত ভারত ভুবনে। মুখেতে ঠেকিলে গীত চাহিও কর পানে ॥
এত বলি ঠাকুর ধরিয়া ডানি কর। মহামন্ত্র লিখে দেন দ্বাদশ অক্ষর ॥
ভক্তের বাসনা পূর্ণ করি ভগবান্। সেই ক্ষণে অন্তরীক্ষে হৈলা অন্তর্ধান ॥

... ...

স্তুতি কি করিব আমি কিবা আমি জানি। কৃপা করি স্বরূপ দেখাও সীতাজানি ॥
কৃপাবান্ হৈলে যদি অধমের প্রতি। তবে কেন অন্তর্দ্ধান হইলে সম্প্রতি ॥
দয়াময় পতিতপাবন পরমেশ। তবে কেন অধমে নিদয় হইলে শেষ ॥
দেখা দিয়া দারুণ দুর্দ্দশা কর দূর। ভুবনে প্রচার প্রভু দয়ার ঠাকুর ॥
ভক্তের বাসনা পূর্ণ করিবারে হরি। হইলেন শঙ্খচক্রগদাপদ্মধারী ॥

শ্রীযুক্ত মধুসূদন অধিকারী মহাশয় বলিয়াছেন যে রামদাস পিতার মৃত্যুর পর পশ্চিমপাড়ায় আসিয়া বাস করেন। ইঁহার একমাত্র পুত্রের নাম বলাইচাঁদ। রাজারাম এবং অভিরাম নামে কবির দুই দোহার ছিল। রামদাসের বংশ এখনও পশ্চিমপাড়ায় আছে।

পৃ ৬১৫। ৫-৭ ছত্র বাদ যাইবে। কাব্যটির রচয়িতা দুঃখী শ্যামদাস, রামকৃষ্ণ দাস লিপিকারের নাম। আমার কথামত শ্রীমান্ নারায়ণ রায়, এম্-এ, পুঁথিটি

দেখিয়া আসিয়াছেন। জয়গোপাল দাস একখানি গোবিন্দমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন [ব-সা-প-প ৩৪, পৃ ২২৪-২৫]। গুরুচরণ বসুর প্রেমভক্তিসার বৈষ্ণবতত্ত্ব নিবন্ধ [ঐ, পৃ ২৩১-৩২]।

পৃ ৬৮৫। ৫ ছত্রে '১৬৬২' স্থলে '১৬৬১' হইবে।

পৃ ৭২৮। ২ পাদটীকায় 'কাশীপরিক্রমা নামে অংশতঃ ব-সা-প প্রকাশিত' যোগ হইবে।

পৃ ৭৪৯। ৩ ছত্রে 'তাহার' বাদ যাইবে।

পৃ ৭৬৩। ১২ ছত্রে 'রামচন্দ্র' স্থলে 'রামানন্দ' হইবে।

পৃ ৭৭৯। নলচরিত বিষয়ে অপর কবি হইতেছেন বিষ্ণু সেন ও পার্ব্বতীনাথ [বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ৭৮ ; ১-১, পৃ ৯৭]।

পৃ ৮৩৬। ১৪ ছত্রে '"বিদ্যাভূষণ"' স্থলে '"কবিভূষণ"' হইবে।

পৃ ৮৪৪। ৪ ছত্রে 'ইতি' স্থলে 'ইনি' হইবে।

পৃ ৮৪৯। আঁধারে-মাণিক গ্রামনিবাসী রামাকান্ত বন্দ্যঘটীর সত্যনারায়ণ পাঁচালী কাব্যের কিছু বিশেষত্ব আছে। রচনাকাল সম্ভবতঃ উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগ [ব-সা-প-প ৩৪, পৃ ২৩০-৩১]।

পৃ ৯০৮। ঈশানচন্দ্র বসু মহাশয় বাসুলীমঙ্গল কাব্যের সন্ধান পাইয়াছিলেন [শিবায়নের ভূমিকা]।

পৃ ৯০৮। ১৪ ছত্রে এবং ২ পাদটীকায় 'সমাচারচন্দ্রিকা' স্থলে 'সমাচারদর্পণ' হইবে।

পৃ ৯৩৬। অষ্টাদশ শতাব্দীর অপর উল্লেখযোগ্য মুসলমান কবি হইতেছেন শাহ্ মোহাম্মদ সগীর [ব-সা-প-প ৪৩, পৃ ১৪২-৬০] ও শেখ চান্দ [ঐ, পৃ ৯৩-১০৯]। অপরাপর কবি সম্বন্ধে বাঙ্গালা প্রাচীন পুঁথির বিবরণ প্রথম খণ্ড প্রথম সংখ্যা পৃ ৮৩, ৮৭, ১১৮, ১২৬, ১৩২, ১৩৪, ১৪০, ১৫০, ১৮২, ১৮৩, ২০৯, ২৩৪, ২৪০ দ্রষ্টব্য।

পৃ ১০১৬। দশঘরা নিবাসী রাধামাধব ঘোষের বৃহৎ সারাবলী বিরাট গ্রন্থ। ইহা সমাপ্ত হয় ১৮৪৮ খ্রীষ্টাব্দে।

পৃ ১০২০। গদাধর তর্কবাগীশের পুত্র লক্ষ্মীনারায়ণ ন্যায়ালঙ্কার ১৮২২ খ্রীষ্টাব্দে দত্তককৌমুদী নামে দায়ভাগ বিষয়ক গ্রন্থ বাঙ্গালা পদ্যে রচনা করেন [বিশ্বকোষ ১৮, পৃ ১১৯-২০]। ভোজের যুক্তিকল্পতরুর অনুবাদ পাওয়া গিয়াছে। [ব-সা-প-প ৩৪, পৃ ২২৮]।

পৃ ১০২০। রঙ্গাই "ব্রাহ্মণ" একটি বত্রিশ পুত্তলিকা কাব্য রচনা করিয়াছিলেন।

পৃ ১০২৬। ৬ ছত্রে 'বসতরঙ্গিণী' স্থলে 'রসিকতরঙ্গিণী' হইবে।

পৃ ১০৩২। ১৮৩১ খ্রীষ্টাব্দে ১২৩৭ অনুলিখিত কামিনীকুমার কাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে [বা-প্রা-পু-বি ১-২, পৃ ৬৩]। বাণীরাম ধর রচিত শীতবসন্ত কাব্যের সন্ধান মিলিয়াছে [ঐ ১-১, পৃ ১০১- ; ১-২, পৃ ২৬]। রামজীবন দাস শশিচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে কাব্য লিখিয়াছিলেন [ঐ ১১, পৃ ১৩৭-৩৮]।

কাব্য ও কবি : গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

নির্ঘণ্ট

কাব্য ও কবিঃ গ্রন্থ ও গ্রন্থকার

১। পাদটীকায় উল্লিখিত নাম তারকাচিহ্নের দ্বারা দেখান হইয়াছে।

[handwritten annotation] ১০২-১০৮